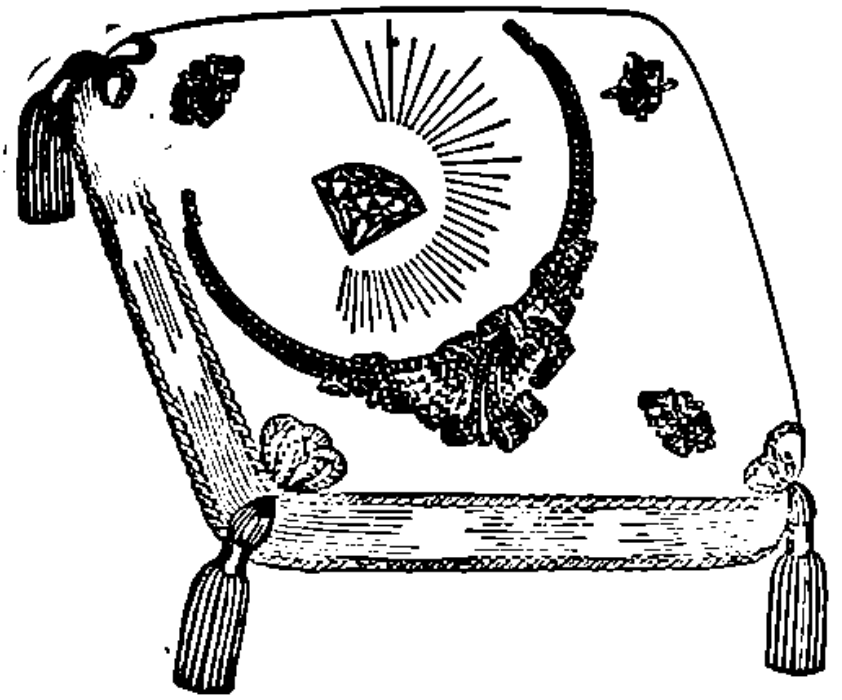

আধুনিকতম রুচির সর্ব্বপ্রকার স্বর্ণ-অলঙ্কার, মণি, মুক্তা, হীরা,
জহরত প্রভৃতির অপূর্ব্ব সম্ভার।
বিবাহ ও উৎসব অনুষ্ঠানে প্রিয়জনকে উপহার দিবার
নানাপ্রকার অভিনব ও চিত্তাকর্ষক অলঙ্কার।

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

স্থাপিত ১৮৮২

১-এ, বেন্টিক ষ্ট্রীট (মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস্), কলিকাতা।

ফোন : ২২-২২৭০

ব্রাঞ্চ :—৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন : ৪৭-১২৫৮

এনামেলের বাসন

- দামে সস্তা
- ভারে লঘু
- ব্যাবহারে টেঁকসই
- বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিঃ

২৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ৭৬,
কলিকাতা—১২

● সদ্য-প্রকাশিত ●

সুখ্যাত কথাশিল্পী সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
নবতম উপন্যাস
আর্য চাঁদ
॥ ভিন টাকা ॥

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ধীরেশচন্দ্র শর্মাচার্যের
নবতম উপন্যাস
গোধূলির রঙ
॥ সাড়ে ভিন টাকা ॥

● সাম্প্রতিক প্রকাশিত ●

প্রখ্যাত কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
বেদনাবিধুর উপন্যাস
রূপ হোল অভিশাপ ৭·০০

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত
শতবর্ষের শতগল্প • ১ম খণ্ড ১০·০০
২য় খণ্ড ১২·৫০

● উল্লেখযোগ্য বই ●

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশ্বেতা (৩য় মুঃ) ৫·৫০ ॥
সৈয়দ মুজতবা আলীর
চতুরঙ্গ (৩য় মুঃ) ৪·৫০ ॥
কমার গুপ্তের
অবরোহণ ২·৫০ ॥
সমরেশ বসুর
বাঘিনী (২য় মুঃ) ৭·০০ ॥

মনোজ বসুর
মানুষ গড়ার কারিগর (৩য় মুঃ) ৫·৫০ ॥
নবগোপাল দাসের
এক অধ্যায় ৩·০০ ॥
বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ ৬·৫০ ॥

অন্নদাশঙ্করের
ন্যায়দণ্ড (৩য় মুঃ) ৬·৫০ ॥
শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নিরুদ্ধিত হেম ৩·০০
দেবেশ দাশের
পশ্চিমের জানলা ৫·০০ ॥
বনফুলের বৈরাগীর নাটক
রূপোলী চাঁদ (৩য় মুঃ) ২·৫০ ॥

মৃত সঞ্জীবনী সুরা

আয়ুর্ব্বেদোক্ত অমৃত তুল্য মহৌষধ।

গুণে, গন্ধে ও বর্ণে যথাযথ ও শাস্ত্রানুরূপ।

মৃতকল্প ব্যক্তিকেও সঞ্জীবিত করে। বল, বীর্য্য, মেধা, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া নূতন জীবন দান করে। সর্ব্বপ্রকার দৌর্ব্বল্যে, কঠিন রোগভোগের পর, প্রসবান্তে ও স্মৃতিশক্তিহীনতায় অমৃতের মত কাজ করে ও স্নায়ুমণ্ডলকে সবল ও সতেজ করিয়া স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জীবন দান করে।

মূল্য—৪৲ টাকা পাইট ও ৭৷৷০ টাকা কোয়ার্ট

অধ্যাপক মথুর বাবুর

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা প্রাঃ লিঃ

কারখানা : ঢাকা (পূর্ব্ব পাকিস্তান) ও চন্দননগর (ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন)

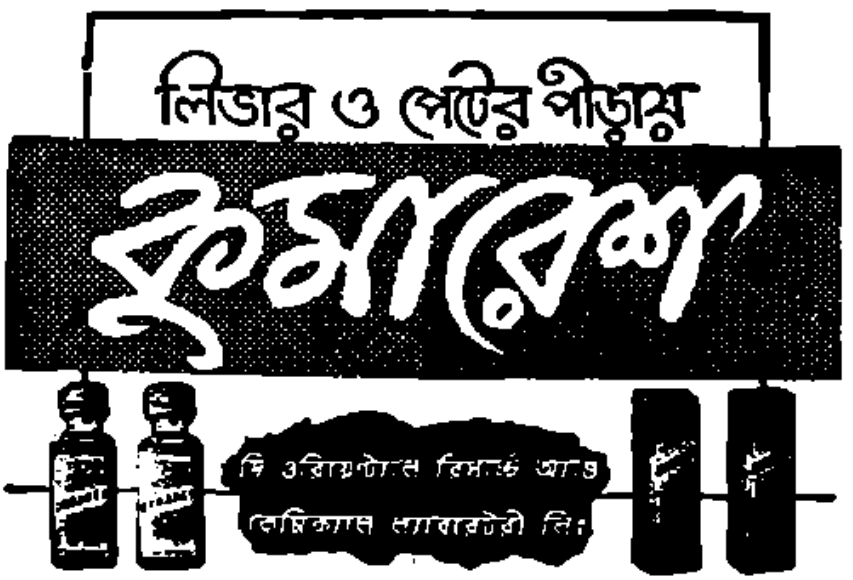

756.3
.05 8/8

(গল্প-ভারতী)

সপ্তদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

আষাঢ়—১৩৬৮

॥ সম্পাদকীয় ॥

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মহাকবি কালিদাস মেঘদূত লিখেছিলেন ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সেই ঘটনাটি আধুনিক সাহিত্যে স্মরণীয় করে গেছেন। তাঁর অমর গীতাঞ্জলীর বহু গান আষাঢ়-শ্রাবণে রচিত সেকথা আমার 'সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে মনে করিয়েছি। ২২শে শ্রাবণ জোড়াসাঁকোর বাড়ী থেকে তাঁকে নামিয়ে লক্ষ নরনারীর সঙ্গে শেষযাত্রা—তা বিশেষ ভাবেই মনে পড়ে। মাত্র কুড়ি বছর আগে তিনি এই বাংলাদেশে আমাদেরই কবি ছিলেন ; সে অমর কণ্ঠ নীরব হলেও আমাদের বুকের স্পন্দন এখনো থামেনি। তবে আমরা চলে গেলে রবীন্দ্রনাথ থাকবেন ছবিতে ও ছাপা বই-এর মধ্যে। তখন সুরু হবে দ্বিতীয় শতাব্দীর সুরু ও প্রথম শতাব্দীর শেষ! এবার ২২শে বৈশাখ তাঁর বিচিত্রা-ভবনের সামনে প্রাঙ্গনে নানা দেশবাসী নানা ভাষায় তাঁকে তাদের প্রীতি ও প্রণতি জানিয়েছিল, সে দৃশ্য ভুলবার নয় ; ফেরার পথে 'গল্প-ভারতী'র ভবনটি চোখে পড়ে ও মনে পড়ে বন্ধুবর সত্যেন্দ্রলাল রায়ের রবীন্দ্র-ভক্তি ও একাগ্র বন্ধুবাণী সেবার কথা। ষোড়শ বর্ষব্যাপী সংগ্রামের পর তিনি এই আষাঢ় সংখ্যায় 'গল্প ভারতী'কে সপ্তদশী দেখে আমাদের সঙ্গে আনন্দ করছেন। রবীন্দ্রযুগের বিপুল সমস্যা ও বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে 'গল্প-ভারতী' বেড়ে উঠছে। পূজনীয় কেদারপ্রসাদ ঘোষের মত প্রাচীন সাহিত্যিক থেকে সুরু করে অনেক 'সপ্তদশী' লেখিকারাও আমাদের সহযোগিতা করেন দেখে আনন্দ পাই। কচি ও কাঁচা থেকে সুরু করে ডাঁসা ও পাকা সব রকম রচনাই আমরা পাচ্ছি এবং আশা রাখি 'গল্প-ভারতী'র মাধ্যমে আমাদের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রসার হবে। ভাব-প্রধান রচনা ত আছে ও থাকবে সেই সঙ্গে গঠনমূলক চিন্তাধারাও আমরা জোটাতে চেষ্টা করি কারণ আমাদের বাংলা সাহিত্যেই প্রথম বিশ্ব-চিন্তা ও সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল। মনীষী রামমোহন থেকে সুরু করে

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সব নেতা বাংলা এবং বাঙালীদের বিশ্ব-চিন্তার ধারক ও বাহক হবার অধিকার দিয়ে গেছেন। সেই সমগ্রতার বোধ যদি বজায় রেখে যাই তাহলে আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা অনেক মিটবে ও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হবে। একাজ একটি দলের বা একটি পত্রিকার দায়িত্ব নয়; একাজে সবাইকে ব্রতী হতে হবে; সে দীক্ষাও দিয়ে গেছেন স্বদেশীযুগের রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কল্যাণ-মিত্র রামেন্দ্রসুন্দর যাঁর অপূর্ব্ব রচনা "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা" আজকে পড়তে অনুরোধ করি। এমনি কত অমূল্য চিন্তাকণিকা আজ বিস্মৃতপ্রায়! সেসব নূতনরূপে বাঙালী ছেলেমেয়েদের উপহার দিতে হবে, শতাব্দী উৎসব আমাদের তবেই সার্থক হবে। সেজন্য আশু প্রয়োজন বাংলাদেশে এক জাতীয় প্রকাশনীর পরিকল্পনা। কোটী কোটী টাকার বাঁধ গাঁথা নয়, বিনা বাগুলে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। সে নির্ঝর অলক্ষ্যে এই আমাদের আঙ্গিনার তীর বেয়ে মহাসাগরে পৌঁছেছিল রবীন্দ্রনাথই তার মৃত্যু-হীন সাক্ষী! তাঁকে প্রণাম করে যেন আমরা সব বাধা বিঘ্ন লঙ্ঘন করে সত্য ও সুন্দরের সেবায় ধন্য হই। "গল্প-ভারতীর" বর্ষ-বরণে সেই প্রার্থনা আমাদের পূর্ণ হোক!

রবীন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমার

নাট্যশালার সুযোগ্য ঐতিহাসিক বন্ধু অমল মিত্র আমাদের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় একটি নূতন তথ্য ছোট প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন যে কবি-নাট্যকার মধুসূদনের গুরু D. L. Richardson, রোজার্স সাহেব রচিত The Bag of Gold গল্প অবলম্বনে একটি নাটক (তিন অঙ্কে) রচনা করেন এবং ১৮৪১ সালে Sans Souci থিয়েটারে সেটি পার্ক ষ্ট্রীটে অভিনীত হয়। এর ৪।৫ বছরের মধ্যে Othello অভিনয়ে বৈকুণ্ঠচরণ আঢ্য (শাদাদের মধ্যে একমাত্র কালা-আদমী!) নাম ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসা পান। এ আবিষ্কারটিও অমলবাবুর, তাই তাঁকে অনুরোধ, সে যুগ থেকে নটগুরু শিশির ভাদুড়ী পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক কাহিনী প্রকাশ করুন।

'অভিনেতা' রবীন্দ্রনাথের কথা বাংলা ও ইংরেজীতে আমি প্রকাশ করেছি শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে। অনেক রবীন্দ্র নাট্যপ্রযোজনায় দেখেছি নট-রাজ সস্নেহে শিশিরকুমারকে কাছে ডেকেছেন, তার বিশদ বর্ণনা আমরা ক্রমশ প্রকাশ করব। আজ স্মরণ করাতে চাই যে অমরেন্দ্র দত্তের পর বছর শিশির ভাদুড়ী বাংলা রঙ্গমঞ্চের ছত্রপতি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নট। যাঁরা চাণক্য, আলমগীর, মধুসূদন প্রভৃতি নামভূমিকায় শিশিরকুমারকে দেখেছেন, তাঁরা একথা স্বীকার করবেন। অধ্যাপক শিশিরকুমার যখন বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াতেন তাঁর ব্যাখ্যা ও আবৃত্তি ছাত্রদের মুগ্ধ করত। সেই পেশা ছেড়ে নাটকের ভেলায় যখন ভাসলেন শিশিরকুমার, তাঁর অকুতোভয়তাও মনীষা দেখে সবাই বিস্মিত হয়েছিলাম। 'সীতা'র অভিনয়ে ও প্রযোজনায় তিনি যুগান্তর এনেছিলেন। তাই সুদূর আমেরিকা থেকে তাঁকে সাদরে নিমন্ত্রণ করেছিল তার সাক্ষ্য আজ দিয়ে যাই কারণ কবিগুরু যখন শেষবার (U. S. A.) সমুদ্র পাড়ি দেন তখন তাঁর সঙ্গে আমিও ছিলাম এবং New York মঞ্চে শিশিরকুমার প্রযোজিত সীতা অভিনয় আমি দেখেছিলাম।

আমেরিকায় শিশিরকুমার

১৯৩০-৩১ সালে আমি প্রথম আমেরিকা থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে অতলান্তিক থেকে প্যাসিফিক কূলের শিক্ষায়তনগুলিতে বক্তৃতা দিয়ে ঘুরেছি। গুরুদেবের ৭০ জন্মোৎসবে Golden Book of Tagore ছাপার উৎসাহে যেমন সারা ইউরোপের তেমনি আমেরিকার মনীষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমি লেখা জোগাড় করেছি; প্রায় ১০।১২ জন তার মধ্যে Nobel আকেদেমী পুরস্কৃত। Sinclare Lewis ১৯৩০ সালে মার্কিন সাহিত্যিক হিসাবে প্রথম Nobel পুরস্কার পান।

গুরুদেব Carnegie Hall-এর বিরাট সভায় সম্বর্ধিত হন ও তাঁর শেষ ভাষণের পর আমাদের জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন অধিনায়ক" নিজে আবৃত্তি করেছিলেন ও বহু নরনারী বাংলা শুনে মুগ্ধ হয়েছিল স্বচক্ষে দেখেছি।

সেই বাংলাভাষায় নাটক "সীতা" শিশিরকুমার New York রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে প্রখ্যাত নাট্যসমালোচকগণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছিলেন সেগুলি New York Sun প্রভৃতি পত্রিকায় পড়ে গর্ব্ব বোধ করেছি। রামায়ণের মূল সংস্কৃত ও তার ইংরেজী অনুবাদ বহু মার্কিন কলেজে দেখেছি কিন্তু বাঙালী নটশিল্পী মনীষী শিশিরকুমার তাদের বাংলা ভাষাতে নাট্যাভিনয় দেখিয়ে এক নূতন অধ্যায় সুরু করলেন। তাই রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে—যেমন U. S. A. তেমনি U. S. S. R.তে বাংলা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। শিশির-জীবনী রচনার সময় এসব কথা কাজে লাগবে। বাঙালী কেদার নাথ দাশগুপ্ত ("ভাণ্ডার"-সম্পাদক) আমার সঙ্গে 'সীতা' অভিনয় দেখেছিলেন; আজ তিনি নেই কিন্তু London ও New York রঙ্গমঞ্চে কেদারবাবু শকুন্তলাদি সংস্কৃত নাটক অভিনয় আগে করান। তার East and West সংঘের আমন্ত্রণে আমি অনেক বক্তৃতা দিয়েছি। তিনি ও হরি গোডীল—এই দুই মার্কিন প্রবাসী বন্ধুদের আজ স্মরণ করি। কারণ পরলোক থেকে তাঁরা রবীন্দ্র শতাব্দীতে যোগদান করছেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কথা প্রসঙ্গে

অর্থনীতিক সমস্যা

অধ্যাপক গ্যালব্রেথ অর্থনীতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তিনি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন এবং ইতঃপূর্বেও অর্থনীতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একাধিকবার ভারতে আসিয়াছেন। সম্প্রতি ভারতে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হইয়া আসিয়া তিনি প্রথমেই তিনটি বক্তৃতায় তাঁহার অর্থনীতি সম্বন্ধে বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রথম বক্তৃতার স্থান—মাদ্রাজ। দ্বিতীয় বক্তৃতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হইয়াছে। ইহাতে তিনি ভারতের বর্তমান অর্থনীতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধেই তাঁহার মত ব্যক্ত করেন নাই, সরল সাধারণ ভাবেও কতকগুলি উক্তি করিয়াছেন। কথায় বলে—

পড়ল কথা সভার মাঝে
ঘর কথা তার গায়ে বাজে।

সে সকলের অনেকও ভারতের পক্ষে বিশেষ বিবেচ্য। ভারতের বর্তমান শাসকরা স্বদেশকে অনুন্নত দেশ অভিহিত করিয়া আমেরিকা, ইংলণ্ড ও পশ্চিম জার্মানী হইতে জাপান পর্যন্ত সমস্ত "উন্নত" দেশ হইতে অর্থ, উৎপাদন-পদ্ধতি ও বিশেষজ্ঞ আনিয়া দেশের শিল্পাদির প্রতিষ্ঠার ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন। অধ্যাপক গ্যালব্রেথ প্রথমেই বলিয়াছেন, সকল অনুন্নত দেশ একই অবস্থাপন্ন নহে; সুতরাং সকলের প্রয়োজন একরূপ নহে। অনেক "উন্নত" দেশ শ্রমিকের স্বল্পতাহেতু—যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, ভারতের মত দেশের পক্ষে সে সকল অনাবশ্যক; কারণ, সে সকল দেশে শ্রমিকের স্বল্পতা না থাকিয়া বাহুল্যহেতুই বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশেষজ্ঞ সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা যায়; কেননা তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা দেশের অবস্থা-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে; এমনকি যে বিদেশে তাঁহাদিগকে আনয়ন করা হয় তাহার অবস্থা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতাই সাফল্যের অন্তরায় হইতে পারে। অধ্যাপক গ্যালব্রেথের মত এই যে,—ভারতরাষ্ট্র এখন যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহাতে সে বৈদেশিক ঋণ ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু নির্বিচারে ঋণ গ্রহণের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে ভারত সরকারের ঋণগ্রহণ নীতির প্রতি কোনরূপ ইঙ্গিত আছে কি না আশা করি, ভারত সরকার তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অধ্যাপক গ্যালব্রেথের মতে উন্নতির প্রথম অবস্থায় প্রয়োজন—

(১) উপযুক্ত শাসনব্যবস্থা

(২) সেই ব্যবস্থা ও অন্যসকল বিভাগে আবশ্যক কর্মচারী সরবরাহ করিবার জন্য শিক্ষিত জনসাধারণ।

এইস্থানে বলা যাইতে পারে যে, রাজনীতিক দলের এবং তাঁহাদিগের দলীয় মন্ত্রী প্রভৃতির অকারণ হস্তক্ষেপে শাসনব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হয় এবং চাকুরীয়াদিগের মনে হতাশার সঞ্চার অনিবার্য হয়। আর ভারত সরকার যে আজও দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিয়া লোককে রাষ্ট্র-সচেতন ও অধিকার-সচেতন করেন নাই, তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ভারত সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ে পরলোকগত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মন্তব্য করিয়াছিলেন, এদেশে মন্ত্রীরা অর্থাৎ যাঁহারা নীতি স্থির ও প্রবর্তিত করেন তাঁহারা

অন্ত অনেক কথা ভাবিতেছিলেন সেই সময় একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি অসতর্ক অবস্থায় ঐ অসঙ্গত উক্তি করিয়াছিলেন। ইহা যে কোন সভ্যদেশের প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে যে লজ্জার কারণ তাহা বলা বাহুল্য।

অর্থনীতিক আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা সংবিধান পরিবর্তনের বিষয়ের উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না।

অধ্যাপক গালব্রেথ বলিয়াছেন, দেশের অবস্থানুসারে তাহার উন্নতির গতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া অনিবার্য।

কাজেই অযাচিত ঋণ গ্রহণের দ্বারা দেশের শিক্ষাবিস্তার, গ্রামসংগঠন, পরিবার-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সমবসাধ্য কাজ সম্পন্ন করিবার আশা অনেক ক্ষেত্রেই দুরাশা।

স্বল্পায়াসে ও স্বল্পসুদে ঋণ পাওয়ার আর এক বিপদ এই যে, তাহাতে দেশের লোকের বিদেশ হইতে অর্থার্জনে কারমানুভূতি ও আগ্রহ হ্রাস পায়। অথচ বিদেশ হইতে উপার্জন ব্যতীত কোন দেশের অর্থনীতিক ভিত্তি দৃঢ় হইতে পারে না।

সরকারের অর্থবিনিয়োগের অব্যবস্থার একটি দৃষ্টান্ত সম্প্রতি পাওয়া যাইতেছে। সরকার বহু অর্থ ঋণ হিসাবে এবং সুযোগ দিয়া এদেশে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত কলকারখানা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা প্রতিযোগিতায় এবং প্রয়োজনে দ্রব্যের মূল, নির্দ্ধারণ-ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া ইক্ষুর সর্বনিম্ন মূল্য এবং শ্রমিক-বেতনের হারও নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ফলে এদেশে যে চিনি উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বিদেশের বাজারে অন্যান্য দেশের চিনির সহিত মূল্যে প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে না। ইহাতে সরকারের উৎসাহ হ্রাস পাইয়াছে এবং এখন তাঁহারা অতিরিক্ত মাল বিক্রয়ের জন্ত উহা গড়তা অপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রয়ের সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইক্ষুদণ্ডের সর্বনিম্ন মূল্য কম করিয়া দিবেন কিনা তাহা বিবেচনা করিতেছেন। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইবে যে, যেরূপ বিচার বিবেচনা করিয়া শর্করা শিল্পের প্রসার বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা প্রশংসনীয় নহে। বলাবাহুল্য এইসকল কারখানার কলকব্জা সবই বিদেশ হইতে আসিয়াছে এবং তাহাতে অন্যান্য দেশ লাভবান হইয়াছে।

বিদেশী ঋণগ্রহণ করিয়া ভারতসরকার যে সকল বড় বড় ব্যাপার করিয়াছেন ও করিতেছেন সে সকলের সাফল্য সম্বন্ধেও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। জলনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি যে অভূতপূর্ব বন্যায় পুণাসহরের শোচনীয় ক্ষতি হইয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। উড়িষ্যার যে বন্যায় কটক সহর এবার বিপন্ন না হইলেও তাহার বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। টেনিসিস্যালি উপত্যকার সাফল্যে চমকিত হইয়া এ দেশে ইংরেজ সরকার দামোদরের জল-নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ভারতের জাতীয় সরকার তাহাই একটু পরিবর্তিত করিয়া রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই জলনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ—

(১) বন্যা নিবারণ

(২) স্বল্পব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন

(৩) ক্ষেতের জন্ত আবশ্যক জল সরবরাহ।

কার্যকালে দেখা যাইতেছে,বহুব্যয়ে আশানুরূপ পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হইতেছে না এবং প্রয়োজনকালে সেচের জন্য আবশ্যক জলও দিতে পারা যাইতেছে না।

এদিকে বন্যার উপদ্রব দূর না হইয়া বিকটরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কাজেই এই কোটি কোটি টাকা ব্যয় সমর্থনযোগ্য কি না সে বিষয়ে লোকের মনে সন্দেহ উদ্রেক অনিবার্য।

উন্নতির নামে বৈদেশিক ঋণ যাহা গৃহীত হইয়াছে ও হইবে তাহা পরিশোধের ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকিবে কি না তাহা যেমন বিবেচ্য, অর্থনীতিক্ষেত্রে "মুক্ত দ্বার" ব্যবস্থায় বিদেশী মিলের সহিত একযোগে যেসব কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে সে সকল দেশের প্রকৃত উন্নতির পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়াইবে কিনা তাহাও তেমনই বিবেচ্য।

অধ্যাপক গালব্রেথ সংক্ষেপে যে সকল কথা বলিয়াছেন, সে সকল সতর্কতার বাণী বলিয়া মনে করিলে ভারত সরকার উপকৃত হইবেন। ভারতরাষ্ট্রে যে সকল দেশের নিকট হইতে খাদ্যশস্য হইতে কলকব্জা পর্যন্ত ঋণরূপে গ্রহণ করিতেছেন সে সকল দেশের মধ্যে আমেরিকা প্রধান। সেই আমেরিকার বিশেষজ্ঞ রাষ্ট্রদূতের উক্তি, কোবিদ অর্থনীতিকের যুক্তি ও মহাজন দেশের উক্তি বলিয়া অনায়াসে গৃহীত হইতে পারে।

—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

—"মানুষের চিন্তা এবং প্রবৃত্তিই তার কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু পরের নির্দ্ধারিত চিন্তা ও প্রবৃত্তিকে দিয়ে সে যখন তার নিজের স্বাধীন চিন্তার মুখ চেপে ধরে তখন তার চেয়ে বড় আত্মহত্যা মানুষের আর হতেই পারে না।"

—শরৎচন্দ্র

এখানে উত্তর ভারত থেকে কোন তীর্থযাত্রী আসেনা। এমন কি বেড়াবার জন্যেও যারা উত্তর থেকে দক্ষিণে আসে তারাও এদিকে আসেনা। তীর্থ করবার জন্যেই হোক আর বেড়াবার জন্যেই হোক, উত্তর ভারত থেকে যারা বেশ ক'দিন ক'রাত ট্রেণে কাটিয়ে মাদ্রাজে এসে পৌছায় তাদের বেশীর ভাগটাই চায় দক্ষিণের বিশিষ্ট কারুকলার নিদর্শন বহুল মন্দিরগুলি দেখতে। তাই তারা এগ্‌মোর ষ্টেশন থেকে দক্ষিণের ট্রেণে চেপে সটান যায় চিঙ্গেলপেট দিয়ে পক্ষীতীর্থম্ আর মহাবলীপুরম দেখতে। তারপর তাঞ্জোর কুম্ভ কোনাম্, মায়াভরম্, চিদাম্বরম্ হয়ে রামেশ্বরম্। ফেরবার পথে তারা আসে মাদুরার বিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দির দেখতে। বহুকোটি, রামেশ্বরম্ হয়ে মাদুরা। যারা ভারতের শেষ দেখতে চায় তারা মাদুরা থেকে ট্রেণ বদলে যায় মানিয়াচী হয়ে তিরুনেলভেলী। সেখান থেকে বাসে করে কন্যাকুমারী ঘন্টা তিনেকের পথ। এখানেই ভারতবর্ষের শেষ। যারা এসব দেখতে চায় না তাদের সংখ্যা অনেক কম। তারা মাদ্রাজ থেকে ট্রেণে চেপে চলে যায় পণ্ডীচেরী আশ্রমে, বাঙ্গালোর, উটকামণ্ড কি মহীশূরে। কেউ কেউ আবার মাদুরা হয়ে কেরলের ত্রিবান্দ্রামও যে না যায় এমন নয়।

কিন্তু এ পথে উত্তর ভারতীয়েরা কদাচিৎ আসে। এ লাইনটা মাদুরা থেকে বের হয়ে বিরুধনগর হয়ে, মানিয়াচিতে না বেঁকে সটান দক্ষিণ সাগরের তীরে এসে শেষ হয়ে গেছে যে ষ্টেশনে তার ইংরেজী নাম হল টিউটিকোরিন। তামিলে বলে তুত্তুকুড়ি। সহজ ভাষায় এর অর্থ করলে দাঁড়ায়—তেঁতো মেটাতে হলে গভীরে খোঁড়।

নাম থেকেই এ জায়গাটার স্বরূপ পরিচয় পাওয়া যাবে। গেরুয়া বালির রুক্ষ, ঊষর, অনুর্বর রাজত্ব। মরুভূমির পরিচয় এর প্রকৃতিতে। শ্যামলতার মধ্যে কেবল কাঁটা ভরা, দাক্ষিণ্যহীন বাবলা গাছের জংগল মাঝে মাঝে। আর সমুদ্রের তীর ঘেঁসে শুধু রুক্ষ, উদ্ধত, মাটীর দিকে দৃক্‌পাতহীন তালের গাছ। একশো-দুশো, হাজার-হাজার, লাখে-লাখে, কোটিতে-কোটিতে, অর্বুদে-অর্বুদে। মাটীর দিকে চাইলে বালির রুক্ষ রঙে চোখ আর মন দুই-ই ক্লান্ত হয়ে ওঠে। তালকুঞ্জের মধ্য দিয়ে নজর পাঠালে চোখে ধাঁধা লাগে, দৃষ্টি পথ হারায়। তবে সমুদ্রের বুক থেকে উপকূল রেখার দিকে নজর করলে, চোখে পড়বে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বর্ণাভ তটের ওপর তরঙ্গেদের আলপনা। আর তারই কোল ঘেঁসে "তালি বনরাজি নীলা।"

এই সব তাল আর বাবলা বনের ভিতরে ভিতরে দেখা যাবে তালপাতার ছাউনী-দেয়া বাঁশের কুঁড়ে। কোন কোনটা বা তাদের মধ্যে টিনের চাল দিয়ে ছাওয়া। বহুকোটীর দক্ষিণ থেকে ত্রিভাকারাই, ত্যাগুর হয়ে টিউটিকোরিণের ওপর দিয়ে মান্নার উপসাগরের এই উপকূলরেখা বরাবর চলে গেছে আরও দক্ষিণে। এরই পাশে পাশে বড় বড় গ্রাম। পিল্লাকোলেল, পেরিয়া তালই, কুলশেখর পাটনম্, মনপড়,

ওতারি, ইড়িম্বাকারাই। উপকূল শেষ হয়েছে গিয়ে আরও দক্ষিণে লী-তরম্, কন্যাকুমারীতে যেখানে তালের সারির বদলে চোখে পড়বে নয়নাভিরাম নারিকেল কুঞ্জ। ব্যস, এখানেই পূর্ব উপকূল শেষ হল।

পূর্ব উপকূলের ধারে ধারে এই গ্রামগুলির সবকটাই হল জেলেদের গ্রাম। এখানে হাজার হাজার বছর ধরে বাস করে আসছে তামিলনাদের জেলে সম্প্রদায়—মীনপারোয়ারা। এরা হল সমুদ্রের সন্তান—তাই পেশা এদের মাছধরা আর নৌকাবাওয়া। ধর্মে এরা গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক। তুত্তুকুড়ি হল ক্যাথলিক মীন পারোয়ারদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। তাছাড়া তুত্তুকুড়ি পিল্লাকোয়েল, পেরিয়া তালই আর মনপাডের জেলেদের অবস্থা অন্য সবার চেয়ে অনেক ভাল। তার কারণ প্রথমতঃ হল তুত্তুকুড়ি একটা বড় বন্দর। সেখানে মাল বওয়া নৌকোর কাজ করে এরা বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। দ্বিতীয়তঃ হল মান্নার উপসাগরের মুক্তোর ক্ষেত। ভ্যাম্বার থেকে মনপাড পর্যন্ত যে বিশাল মুক্তোর ক্ষেত জলের তলায় ছড়িয়ে আছে তাদের সব চেয়ে বড় ক্ষেত হল তোলাইয়ামপার। তুত্তুকুড়ি থেকে সুরু করে দক্ষিণে প্রায় ১০ মাইল লম্বালম্বি চলে গেছে। এই প্রাচীন জগৎবিখ্যাত মুক্তোর ক্ষেতের মালিক যদিও সব সময়েই থেকেছেন রাজারা; তবুও মুক্তো ফসল তোলার কাজ করে আসছে এই মীনপরোয়ারা বংশ পরম্পরায় হাজার বছর ধরে। ভ্যাম্বার, তুত্তুকুড়ি, পিল্লাকোয়েল আর মনপাডের জেলেরা এই ডুবুরীর কাজে বিশেষ ওস্তাদ। ওতারি, ইড়িম্বাকারাই, কন্যাকুমারীর জেলেরাও মাঝে মাঝে ভাগ্যোন্নতির চেষ্টায় এসে মুক্তা সমুদ্রে ডোবে। তবে তারা সংখ্যায় কম।

এই সব মীন-পরোয়ারদের বেশীর ভাগ থাকে গ্রামাঞ্চলে তালপাতা কি টিনের ছাউনী দেওয়া কুঁড়ে ঘরে। সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে তারা জীবিকা অর্জন করে। এদের বেশীর ভাগেরই চেহারা হল মেদলেশহীন, পেশীবহুল সাড়ে ছ'ফিট লম্বা। প্রকাণ্ড বুকের ছাতি, ছড়ান-ছোঁতা নাকের ডগা, চেপ্টা প্রকাণ্ড মাথাওয়ালা এই মিশ কালো হাসিখুশী সরল, সাহসী লোকগুলি হল প্রকৃতির আপন সন্তান। ক্যাথলিক চার্চের ওপর এদের ভয়ভক্তি যেমন প্রবল তেমনিই প্রবল এদের সমুদ্র দেবতা, ভূত-প্রেত, দত্যি-দানবের ওপর ভয় ও ভক্তি। জীবনের জটীল সমস্যাগুলির কথা এরা বোঝেও না বুঝতে চায়ও না। এরা সমুদ্রে ডোবে, শাঁখ-মুক্তো তোলে, মাছ মারে। তাদের থেকেই তাদের রুজি রোজগার হয়। দু'বেলার অন্ন সংস্থান এতেই হয়ে যায়, দু'পয়সা হাতে জমেও। তাতে তারা তালপাতার ছাউনীর জায়গায় টিনের চালা তোলে। রাজনীতি, সমাজনীতি ও অন্যান্য নীতির ধুর বেশী একটা ধার এরা ধারে না। ক্যাথলিক ধর্ম পাপপুণ্য বোধকে এদের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেও এরা প্রকৃতির তাড়ায় নীতিবিরুদ্ধ কাজ প্রায়ই করে থাকে এবং রবিবার চার্চে গিয়ে সেকথা চার্চ মিনিষ্টারের কাছে নিঃসঙ্কোচে কনফেস করে পাপের বোঝা নামিয়ে দেয়। এরা জানে বাঁচতে গেলে এসব পাপ করতেই হয়, তাই তা নিয়ে কেউ একটা বিশেষ মাথা ঘামায় না। এ সব হল গ্রামের মীন পারোয়ারদের কথা।

কিন্তু তুত্তুকুড়ীর মীন পরোয়ারদের কথা অন্যরকম।

গত তিন শতাব্দী ধরে তুত্তুকুড়ি হল এ অঞ্চলের বিখ্যাত বন্দর সহর। যদিও পিল্লাকোয়েল, মনপাড, ওতারি, ইড়িম্বাকারাই থেকে মীন পরোয়া এসে এই সহরের পত্তন করেছে তবুও এই সহরের পারোয়ারদের সঙ্গে অন্য পারোয়ারদের তফাৎ অনেক। এখানকার পারোয়ারদের একটা অংশ অর্থকৌলিন্যে বেশ বড় কুলীন। তাই তারা জাতে মীন-পারোয়া হয়েও অন্য মীন পারোয়ারদের থেকে তারা সম্পূর্ণ আলাদা। তারা তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাসভ্যতায় পুষ্ট, মোটরগাড়ীচড়া জীব। সাধারণ মীন পারোয়ারদের থেকে এদের জীবনযাত্রা অনেক উন্নত, সুতরাং অনেক জটিলতর।

কিন্তু মীন-পারোয়াদের সমাজ তা সে সহরের হোক বা গ্রামেরই হোক, অনেকটা নিস্তরঙ্গ, অনেক নিরুদ্বেগ। এরা এদের চিরাচরিত ধর্মের গোঁড়ামি, চার্চ আর তার হরেক রকম ক্রিয়াকলাপ, তার সঙ্গে পয়সা রোজগারের ধান্দা, এইসব নিয়ে যুগযুগান্তর একই গতিতে চলে আসছিল। বাইরের সংঘাত এ সমাজের মধ্যে বড় একটা পৌঁছবার পথই কোনদিন পায় না, পৌঁছায়ও না। মাঝে মাঝে ঠিক এই ক্ষুদ্র কুড়ির সমুদ্রের মতোই এই পারোয়া সমাজে উঠত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ছোট ছোট ঢেউ। কিন্তু একদিন সে সমাজে তুফান উঠেছিল। ঝড়ের দেবতার মতো ঝড় বয়ে নিয়ে এসেছিল গডউইন ফার্ণাণ্ডোর ছেলে এটনি ফার্ণাণ্ডো।

মান্নার উপসাগরে সূর্যোদয় হচ্ছে। ভোর এখনও পাঁচটা হয়নি। পুবের আকাশে ফিকে আলো গুণ্ঠনবতী নববধূর হাসির মতো ফুটবো ফুটবো করছে। সমুদ্রের জলের মিশকালো রং ঘুচে গিয়ে গেটের রং ধরেছে। আলো আঁধারি খেলা সুরু হয়েছে আকাশে, সমুদ্রে। পাড়ের ওপর তালের সারির মাথায় মাথায় দু' একটা ঘুম ভাঙা পাখীর অস্ফুট ডাক মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভাঙছে। আর একটু পরেই ওরা সব জাগবে—কলকাকলী সুরু হবে তখন গাছে গাছে। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস উঠছে সমুদ্রের ওপর। আট মাইল দূরে হেয়ার আইল্যাণ্ডের ওপারে মাল বওয়া জাহাজগুলো দাঁড়িয়ে আছে ঠিক ভূতের মতো অস্পষ্ট আবছা।

দেখতে দেখতে পুব আকাশ আরও পরিষ্কার হল। দিগন্তের মেঘের পাঁচীল কেটে সবুজ আলো হেসে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল রঙএর খেলা। গাঢ় রক্তাভ রঙে সারা আকাশ রাঙা হয়ে উঠল। সমুদ্রের ঘুপছায়া জলে সেই রঙের আভা এসে ঠিকরে পড়ল। আবির গুলে দিল যেন সমুদ্রের জলে। সেই আবিরের গুঁড়োগুলো ছড়িয়ে পড়ল এসে হেয়ার আইল্যাণ্ডের বালির চড়ায়, পাড়ের তালগাছের সারির নীচে বালিহাড়িগুলোর ওপরে। পাখীরা কলরব করে উঠল একসঙ্গে। সমুদ্রের জল সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল। ইষৎ উঁচু ঢেউয়ের দল যেন হঠাৎ কাজে ছোটাছুটি করতে সুরু করে দিলে দিগ্বিদিকে। এটনি একলা দক্ষিণের পাড়ে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে এই রঙের খেলা দেখছিল। তার সারা শরীরটা লম্বা একটা সিল্যুট ছবির মতো মনে হচ্ছিল এতক্ষণ। কেবল তার লম্বা লম্বা চুলগুলোতে ঝলকে ঝলকে সমুদ্রের বাতাস এসে লুটোপুটি খাচ্ছিল।

চক্রবালে রক্তগোলকের মতো সূর্যদেব দেখা দিলেন। নির্মেঘ, পরিষ্কার চক্রবাল। সেই প্রথম সূর্যের একটা রশ্মি এসে পড়ল এটনির মুখে, চোখে, সারা শরীরে।

এ যেন পৃথিবীর আদিমতম দিনের প্রথম সূর্যোদয়, মনে করল এটনি। সারা দেহমন দিয়ে সে রশ্মিটুকুকে নিজের মধ্যে তবে নিচ্ছিল। আস্তে আস্তে তার দু'চোখ বুজে এল। মনে হল পৃথিবীর আদিমতম দেবতা এই সূর্য। এর কাছেই সে প্রার্থনা করবে মণিমেখলার শান্তির জন্যে, কল্যাণের জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখ ভরে উঠল জলে। একটা গভীর আবেগ তার সমস্ত মনকে ছেয়ে ফেলল ধীরে ধীরে। মণিমেখলা আজ তিন দিন চার রাত্রি অসহ্য বেদনায় কাতরাচ্ছে। তীব্র, নিষ্ঠুর, মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর সে বেদনা, সন্তান জন্মানর বেদনা।

এটনির দুটো হাত আপনা থেকে জোড়া লেগে গেল। চোখ ছাপিয়ে জলের ধারা দু'গাল বেয়ে নেমে এল। আপনা থেকেই কতকগুলো কথা তার মনের মধ্যে জেগে উঠল। হে জ্যোতির্ময়, হে তিমিরনাশন, হে পৃথিবীর আদিমতম দেবতা, তুমি মণিমেখলাকে শান্তি দাও।

কিন্তু তার ধরা গলা দিয়ে একটা কথাও বার হল না। শুধু সে গভীর ধ্যানের মধ্যে আস্তে আস্তে ডুবে যেতে লাগল। আর প্রভাত সূর্য্যের আলো তার ওপর বর্ষার ধারার মতো, দেবতার অনাবিল আশীর্ব্বাদের মতো ঝরে পড়তে লাগল। স্বামী, আইয়া (কর্ত্তা)—

হঠাৎ ধ্যানটা ভেঙে গেল এন্টনির। ডাকটা কি সমুদ্র থেকে এল? দূরে একের পর এক সার বেঁধেছে মুক্তোতোলা নৌকোগুলো! পাল তুলে হংসবলাকার সারির মতো জলের ওপর ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাতাসও আজ অনুকূল। সেদিকে চেয়ে মনে হল গোমেস কী তাকে ডাকল তার নৌকা থেকে? আজ সে মুক্তো তুলতে যাবে না। তাই সে আজ নৌকো জলে নামায়নি। লেডী ডাক্তার বলেছে আজ যদি প্রসব না হয় তবে মণিমেখলার প্রাণসংশয়। হয়তো পেট চিরে ছেলে বের করতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে রোগে ভুগে মণির যে অবস্থা হয়েছে পেটে অপারেশন হলে তার বাঁচার আশা অনেক কম। তাই এন্টনি আজ সমুদ্রে যায়নি। সারারাত বসে বসে যন্ত্রণাকাতর মণির গায়ে মাথায় হাত বুলিয়েছে। ভোরবেলা সে ঘুমিয়ে পড়তেই এন্টনী এসে দাঁড়িয়েছে সমুদ্রের পাড়ে। এই সমুদ্র তার প্রকাণ্ড আশ্রয়। এই সমুদ্রের প্রত্যেকটি ঢেউ তাদের আওয়াজের মধ্যে সে শুনতে পায় বরাভয়। এতবড় জীবন্ত, এত বেশী প্রাণচঞ্চল পদার্থ বিশ্বে আর কী আছে? তাই সে সান্ত্বনার আশ্রয় খুঁজতে এসেছে সমুদ্রের পারে। স্বামী,—

পিছনে ফিরে তাকাল এন্টনী। দেখল গোমেশ দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনেই। এন্টনীর সঙ্গে মুখোমুখি হতেই গোমেশের মুখটা হাসিতে ভরে গেল। মুখের ভিতরকার সবকটি ঝকঝকে দাঁত রোদে মেলে ধরে হাত কচলে গোমেশ বললে—আইয়া, আম্মার এখুনি একটা ছেলে হয়েছে। লেডী ডাক্তার আসবার আগেই ছেলেটি বেরিয়ে পড়েছে। কি সুন্দর ছেলে। আমি এখুনি ডাক্তারকে ডেকে দিয়ে এসেছি। আপনি বাড়ী আসুন। খেবড়া নাক হেঁড়ে মাথা গোমেশ এমনিতে একটু রুক্ষ কিন্তু আজ যেন সেও চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

এন্টনীর স্বর উত্তেজনায় ফেটে পড়ল।

এঁ্যা, ছেলে হয়েছে? বলিস কি? আম্মা কেমন আছে?

আম্মা ভালই আছে আইয়া। আপনি বাড়ী যান এখুনি। আপনার জন্যে সাইকেল এনেছি।

এন্টনীর লম্বা, পাল্‌তুড়ির মতো শক্ত চেহারাটা থর থর করে কাঁপতে লাগল। কান্নাটা আসছে বুকের ভিতর থেকে। দেবতা তাহলে তার কথা শুনেছেন। মনের সংশয় যেন ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ে যেতে চায়। কিন্তু সে অন্যকথা। ছেলে হয়েছে, এখুনি তার ব্যাপ্টিস্মালের জন্যে চার্চে যেতে হবে। কি নাম দেবে তার? গতানুগতিক ক্যাথলিক নাম? তার বাপ-পিতামহ বংশ পরম্পরায় যে নাম রেখে এসেছে। একথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ল চার্চে যাওয়া তার নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক চিরে। বাড়ী যাবার জন্যে সে একটুও তাড়াহুড়ো করল না। আবার সে সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। মনে মনে বলতে লাগল—

এ ভালই হল, এ ভালই হল। যে নতুন জীবটি জন্মাল সে হবে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের স্বাধীন মানুষ কোন সংস্কারই তাকে কোন বন্ধনের মধ্যে রাখতে পারবে না। সে হবে একান্ত মুক্ত, একান্ত স্বাধীন। তার চিন্তাধারায় তার জীবন বোধে তার শিক্ষায় আর কর্মে, সমস্ত রকমে মুক্তির আনন্দের মধ্যে বেড়ে উঠবে এই মুক্ত জীবটী। সে চার্চেও যাবে না, মন্দিরে-মসজিদে যাবারও তার প্রয়োজন হবে না কোনদিন। দেবতাকে, ঈশ্বরকে সে দেখতে শিখবে সমস্ত বিশ্বে, প্রকৃতির বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে, আর সবচেয়ে বেশী করে সে দেবতাকে

দেখবে এই প্রাণময় মানব জাতির মধ্যে। বিশেষ কোন জাতি নয়, বিশেষ কোন ধর্ম নয়, সে যেন এই সমগ্র মানব জাতিকে অন্তরে আলিঙ্গন করতে পারে তার পরমাত্মীয়রূপে। সেবা করতে পারে তার পরম আরাধ্যরূপে। এ শিক্ষা এন্টনীর এই দীর্ঘ উত্থান-পতনে ভরা জীবনের শিক্ষা। এ শিক্ষা সে পেয়েছে জীবনের অনেক কিছু সুখ বিসর্জন দিয়ে; সুখতীর দুঃখ ভোগের মধ্যে এই শিক্ষাই সে দেবে তার ছেলেকে। আজ সে মুক্তো তুলতে না যাবার জন্তে তার লোকসান হয়েছে নিঃসন্দেহে। তবু যে রত্ন সে আজ পেল তা অর্বুদ মুক্তোর চেয়ে অনেক দামী। তার আশায়, তার সারা জীবনের সুখদুঃখ সমুদ্রমন্থন করা ধন। ছেলের নাম রাখবে সে যুত্তু (যুক্তো)।

এন্টনী সমুদ্রের থেকে এক অঞ্জলী জল তুলে নিল। তারপর প্রার্থনার মতো বলতে লাগল—হে বিশ্বস্রষ্টা, হে সর্বমানবের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, আমি তোমার নামে, তোমার কাজে আমার এই নবজাতককে অর্পণ করলাম। এ আমার হয়েও তোমার আমার এ সন্তান জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে সর্বমানবের।

হাতের অঞ্জলীভরা জল সে সমুদ্রে অর্ঘ দিয়ে ফিরে এল। তালগাছের গা থেকে সাইকেলটা নিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁকিয়ে চলল বাড়ীর দিকে। তার ভিতর এখন চিন্তা এসেছে মণিমেখলা সত্যি সত্যি আছে কেমন।

বিচিত্র জীবন এন্টনী ফার্ণাণ্ডোর। সে কোথায় ছিল আর কোথায় এসেছে। ভাবতে তার নিজেরই মাঝে মাঝে বিস্ময় লাগে। নবজাতকের মুখের দিকে চেয়ে এন্টনি দেখছিল নিজেকেই। মণিমেখলা ডাক্তারের চিকিৎসায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। এন্টনীর মুখে তার ক্লান্ত দুচোখ মেলে সে শুয়ে শুয়ে শুধু দেখছিল এন্টনীকে। তাঁর চাপার কলির মতো আঙুলগুলো ধরে ছিল এন্টনীর নৌকো-বাওয়া শক্ত কালো হাতের একটা অংশ। এন্টনীকে সে চেনে। এমন এক নিমেষে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে ধ্যানে ডুবে যেতে আর কোন মানুষকে সে দেখেনি।

একটু চুপ করে থাকার পর মণিমেখলা ক্ষীণ অথচ মিষ্টি গলায় শুধাল—আন্‌তে (প্রিয়তম), কি ভাবছ এত?

এন্টনী আস্তে আস্তে নিজের মধ্যে ফিরে এল। একটু হেসে জবাব দিল—কি ভাবছিলাম জান? আমি যেন এতদিন তীর্থ-যাত্রা করেছিলাম। অনেক পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই ভেঙে, অনেক কাঁটা, অনেক ধারাল নুড়ি পাথরে ক্ষত-বিক্ষত পায়ে ক্লান্ত হয়ে এসে পৌঁছালাম দেবতার মন্দিরে। বোধ হয় আমার এই চলার শেষ হল এখানেই। কিন্তু আবার সেই সঙ্গে ভাবছি নতুন আর এক যাত্রা এখনিই সুরু করতে হবে। পাথরের দেবতাকে প্রাণ দিতে হবে, চিন্ময় করে তুলতে হবে। এ যাত্রাও বড় কঠিন যাত্রা। এর জন্তে এখন থেকেই প্রস্তুত হওয়া দরকার। মণিমেখলার মুখে একটা অদ্ভুত স্নেহ-ভরা হাসি ফুটে উঠল। এন্টনী যখনই এই রকম কোন কিছু ভাবে এই হাসিটাও মণির চোখে মুখে দেখা যায়। মণি বললে—পাথরের দেবতা-টেবতা এসব কি বলছ? আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না।

এন্টনী ছোট্ট শিশুকে টপ করে দু'হাতের চেটোয় তুলে নিল। বললে—এইযে এইযে পাথরের দেবতা। একে প্রাণময় করে তুলতে হবে। মুক্ত-সংস্কারবিহীন আনন্দময় জীবনের অধিকারী করতে হবে একে। এর কি নাম দেব জান?

কি? তোমার বাবার নাম অনুসারেই তো?

না, ওর ভাক নাম থাকবে মুক্তা। আর ভাল নাম—

বলে একটু চিন্তা করে বললে—ওর যখন জ্ঞান হবে, বিচারবুদ্ধি হবে তখন ওর ভাল নামটা ও নিজেই রাখবে। আমি সেটা এখন থেকেই ওর ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না।

মণিমেখলা তাকাচ্ছে দু'জনেরই মুখের দিকে। ছোট্ট বাচ্চা ছেলেটা হাতপা নাড়ছে। পিট পিট করে তাকাচ্ছে এস্টনীর বিশাল দুই খাবার মধ্যে। পরম যত্নে তাকে শুইয়ে দিল এস্টনী।

মণিমেখলা প্রশ্ন করল—আচ্ছা ও কার মতো হবে বলত?

দ্বিধাহীন স্বরে এস্টনী জবাব দিল—আমাদের দুজনেরই মতো।

মণি বললে—না-না ওর যে লালচে রং দেখছ ওটা থাকবে না। আমি শুনেছি বাচ্চারা যতো লাল হয় বড় হলে তারা তত কালো হয়। ও তোমার মতো হবে।

এস্টনী বললে—এই বাঁশীর মতো নাকের ডগা আর বড় বড় পাতাওয়ালা লম্বা-টানা চোখ এ পারোয়ারের ভিতর ঢুঁড়েও তুমি একটা পাবে না। এ সব হল তোমার। কিন্তু এখন কথা থাক। তুমি খুব দুর্বল আর ক্লান্ত। তুমি চুপ করে ঘুমোও লক্ষ্মী মেয়ের মতো। বাচ্চাটাকে দেখবার জন্যে আমি একটি আয়া ঠিক করেই রেখেছি। সে এসেছে, তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বলে গভীর স্নেহে এস্টনী মণিমেখলার কপালে একটা চুমু খেল। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে এসে বসল তার নিজের পড়ার ঘরে।　　[ক্রমশঃ]

যোগিলম্ব মৈত্রেয়

ওল্ হিণ্ডেনবার্গ একবার এক সামান্য জার্মান সৈনিককে দল ছেড়ে পালাবার জন্য কোর্ট মার্শাল করবার আদেশ দিলেন।

সৈনিকের বৃদ্ধ মাতা ও কেঁদেই আকুল। বললে, আমার জন্যে বাছার আমার প্রাণ যায়। কেননা আমার কঠিন অসুখের খবর পেয়েই সে লুকিয়ে আমাকে দেখতে এসেছে।

—তোমার অন্য ছেলেরা ছিল না? প্রশ্ন করলেন হিণ্ডেন বার্গ।

—তারা সব ক্রাঙ্কো প্রাসিয়ান যুদ্ধে মারা গেছে। ঐ একটিমাত্র ছেলেই এখন জার্মান সৈন্য বিভাগে কাজ করে।

হিণ্ডেন বার্গ গম্ভীর হয়ে বললেন,—তুমি বীর প্রসবিনী,—তোমার আবেদন গ্রাহ্য হোক,—তোমার ছেলে মুক্তি পাবে।

বিশ্ব-বার্তা

জার্মানিতে ভারতীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিক

ভারত ও জার্মানির সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আজকের নয়। বহুযুগের মধ্যে দিয়ে বয়ে এসেছে এই সাংস্কৃতিক ধারা। একই সভ্যতা থেকে উৎপন্ন দুই দেশ চিরকাল থেকে পরস্পরের প্রতি জিজ্ঞাসু হয়ে আছে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সাহিত্যের গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন জার্মানির কবিশ্রেষ্ঠ গোয়টে আর দার্শনিক শোপেনহাওয়ার। কালিদাসের 'শকুন্তলা' গোয়টের কবি মনকে নাড়া দিয়েছিল যার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লিখিত 'শকুন্তলা' নামক লেখা থেকে। আর উপনিষদের গভীর দার্শনিক তত্ত্বের অধ্যয়ন করে শোপেনহাওয়ার উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখলেন, ভারতীয় উপনিষদের প্রত্যেক গ্রন্থের পাতায় পাতায় আমি একটি গভীর মৌলিক ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারা পেয়েছি। এই চিন্তাধারার মধ্যে আছে একটি আদর্শ যেখানে একটি সম্পূর্ণতাকে কেন্দ্র করে পবিত্র ও নির্মল ভাব বাদ করে। বিলিয়ম ফন্ হুমবোল্ট নামের আর একজন দার্শনিক কবি গীতা পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে লেখেন, আমি ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, কারণ তিনি আমাকে এতো দীর্ঘ আয়ু দিয়েছেন যে যার মধ্যে আমি গীতাপাঠের সৌভাগ্য পেয়েছি। এ ধরণের অনুভূতি আরও জার্মান কবি ও দার্শনিকরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলেছেন।

জার্মানিতে ভারতীয় সাহিত্যকে প্রচার করার প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে যে অগ্রদূতের কথা মনে আসে তাঁর নাম হলো মাক্স মুল্লর। ইনি ছিলেন জার্মান ভাষা ও সাহিত্যের প্রকাণ্ড পণ্ডিত। সেই সঙ্গে নিজের পরিশ্রম ও অধ্যয়নের দ্বারা অর্জন করলেন সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান। তারপর প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ধারাকে জার্মানিতে বহন করে নিয়ে এলেন তিনি ! তাঁর অনুবাদিত গ্রন্থগুলি আজও জার্মানির প্রায় প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রামাণিক বলে সম্মানিত।

আধুনিক কালে মাক্স মুল্লরের প্রচেষ্টায় উৎসাহিত হয়ে বহুসংখ্যক জার্মান পণ্ডিতগণ ভারতে গিয়ে সেখানকার সাহিত্যভাণ্ডার থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। এঁরাই পরে ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থের রচনা করেন। যার ফলে ধীরে ধীরে এখানে সংগৃহীত হয়ে গেলো প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সাহিত্যভাণ্ডার! এবং তার ফলে আজ জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই হলো প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি অধ্যয়নের পীঠস্থান!

কাব্য ও সাহিত্যের দিক্ থেকে কালিদাসের সংস্কৃত সাহিত্য এখানে অত্যন্ত সম্মানিত। একাধিক জার্মান পণ্ডিতরা 'শকুন্তলা'র জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে এখানে মঞ্চস্থও হয়েছে এই নাটকটি! রামায়ণ, মহাভারত ও গীতা সম্বন্ধে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের একটি স্পষ্ট ধারণা আছে। রাজনীতি ও অর্থনীতির অধ্যয়নের ক্ষেত্রে 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র' একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এ ছাড়াও বহুসংখ্যক ভারতীয় গ্রন্থ এখানকার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখতে পাওয়া যায়।

এ তো হ'লো প্রাচীন সাহিত্যের কথা। ভারতীয় আধুনিক সাহিত্যকে জানবার আগ্রহও জার্মানির কম নয়। বর্তমানে এখানকার প্রায় প্রত্যেক পুস্তক বিক্রেতার কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক বইয়ের জার্মান অনুবাদ পাওয়া যাবে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এদেশে চার বার এসেছিলেন।

একবার তাঁর এখানে থাকাতেই তাঁর প্রসিদ্ধ নাটক 'ডাকঘর' অভিনীত হয়ে ছিল। জার্মান ভাষায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত 'গীতাঞ্জলী' এবং অন্যান্য বইয়ের মধ্যে 'সাধনা' 'মালঞ্চ' 'ডাকঘর' 'সাহিত্য' ইত্যাদি জার্মানির প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। আর তা ছাড়া 'রবীন্দ্র-শতাব্দী' উপলক্ষে আরও অনেক অনুবাদ হচ্ছে।

সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধীর সুপ্রসিদ্ধ 'আত্ম-কথা'র জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীজওহর-লাল নেহরুর ও একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এখানকার লোকেরা মুলকরাজ আনন্দের নামও জানেন।

যাতায়াতের দ্বারা অনুভব ও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার জার্মানিতে এসেছিলেন। সেইভাবে আজও জার্মানিতে ভারতীয় সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদের আগমন হয়ে থাকে। সম্প্রতি যে সকল ভারতীয় সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দ এখানে এসেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন—প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃতভাষার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী, হিন্দীভাষার সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত জৈনেন্দ্রকুমার ও শ্রীযুক্ত বাবুরাম সক্সেনা এবং পুরাতত্ত্ববিদ্ ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়।

বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন পরমাণুপদার্থ বিজ্ঞানী ডাঃ ডোনাল্ড গ্লেসার

বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞানী ডাঃ ডোনাল্ড তিনি তিন সপ্তাহের জন্য ভারতে এসেছেন। ডাঃ গ্লেসারের বয়স মাত্র ৩৪ এবং বিশ্বের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ।

"বাবল চেম্বার" নামক একটি যন্ত্র উদ্ভাবনের জন্য ডাঃ গ্লেসার ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই যন্ত্রে পরমাণু কণার আলোকচিত্র গ্রহণ করা যায়। বর্তমানে পৃথিবীর যেখানেই পরমাণু শক্তির গবেষণা চলেছে সেইখানে এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেক বিশেষজ্ঞ এই যন্ত্রের উদ্ভাবনকে পরমাণু ভাঙার যন্ত্রের সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

ডাঃ গ্লেসার ১৯২৬ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর ওহায়োর ক্লিভল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে কেস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে ভর্তি হন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার হবার উদ্দেশ্য নিয়ে। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি মত পরিবর্তন করে পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন।

১৯৪৬ সালে কেস ইনস্টিটিউট থেকে তিনি ক্যালিফোর্ণিয়ায় গমন করেন এবং ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। এইখানে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মির সন্ধান।

১৯৪৯ সালে তিনি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের ইনস্ট্রাক্টরের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৭ সালে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। সহকারী অধ্যাপকের পদে কাজ করার সময় ডাঃ গ্লেসার পরমাণু কণার চেয়েও ক্ষুদ্র বস্তু নিরীক্ষণের সমস্যাদি নিয়ে গবেষণা করেন এবং তারই ফলে "বাবল চেম্বারের" উদ্ভাবন হয়। এর তিন বছর পর তিনি বার্কেলেস্থিত ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লরেন্স রেডিয়েশন লেবরেটরির কাজে যোগ দেন। বর্তমানে এই গবেষণাগারেই পৃথিবীর বৃহত্তম "বাবল চেম্বার"টি রয়েছে।

পরমাণু কণার আভ্যন্তরীণ রহস্য সম্পর্কে গবেষণার জন্য ডাঃ গ্লেসার নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পরমাণু কণা এত ক্ষুদ্র যে, অতিশয় শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তা দেখা যায় না।

ডাঃ গ্লেসার সম্প্রতি জীববিদ্যা অধ্যয়নে মন দিয়েছেন। জীববিজ্ঞান সম্পর্কীয় বহু সমস্যা সমাধানে তিনি হয়ত পদার্থ বিজ্ঞানের প্রয়োগও করতে পারেন। তিনি কেবল বিজ্ঞানীই নন, যাদুমন্ত্রেও তাঁর পারদর্শিতা রয়েছে।

পর্য্যটন সম্বন্ধে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনীতে ভারতের সাফল্য। বিদেশী মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পর্য্যটনের বিশেষ স্থান……ভারত অভিমুখে জার্মান পর্য্যটনকারীর দল।

পশ্চিম জার্মানীর ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিখে ভোজনবিলাস ও পর্য্যটন সম্বন্ধে তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও মেলায় আগন্তুক তিন লক্ষ পরিদর্শকের কাছে "একদিনের বিশ্ব প্রদক্ষিণ" বাস্তবরূপ ধারণ করেছিল। এই বিরাট মেলায় ভারত সমেত কয় করে পৃথিবীর ৬১টি দেশ যোগদান করে। ভারতীয় অর্থনীতি ও বিদেশী মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পর্য্যটন যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে সে সম্বন্ধে আজ সব দেশই বিশেষভাবে সচেতন।

মিউনিখের প্রদর্শনীতে ভারতীয় শিবিরটি অতি সুন্দর ও সুচারুরূপে সাজিয়ে আকর্ষনীয় করে তোলা হয়েছিল। সুন্দরবন, চটকদার শাড়ী, নানাবিধ খোদাইকরা শিল্পবস্তু ও ভারতের নৈসর্গিক দৃশ্যের বিরাট চিত্রাবলীতে শিবিরটি মেলায় সকলের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠেছিল। সবচেয়ে ভীড় জমেছিল ভারতীয় রেস্তোরাতে; এখানের তৈরী "পাকোরা" ও "চাটনি" অতিথিদের খুবই মুখরোচক লেগেছিল। চায়ের দোকানে কিভাবে চা তৈরী করতে হয় দেখিয়ে আগন্তুকদের ভারতীয় চায়ের সংগে কাজু বাদাম পরিবেশন করা হয়।

জার্মানরা ভারতকে ভালরূপে দেখতে যথেষ্ট ইচ্ছুক এবং যথেষ্ট খরচ করতেও রাজী। ভারতীয় ভ্রমণ ও পর্য্যটক দপ্তরের কুমারী বিশ্বাসেরও সেই ধারণা। প্রদর্শনীতে পর্য্যটন সম্বন্ধে একটি আন্তর্জাতিক কোরামের ব্যবস্থা হয়। কোরামে কুমারী বিশ্বাস ভারতীয় হোটেল ও ভোজশিল্প সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী চিত্র ফুটিয়ে তোলেন। ভারতীয় সুদৃশ্য শিবির ও কুমারী বিশ্বাসের ভাষণে মুগ্ধ হয়ে এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জুরীরা ভারতকে "ব্যাভেরিয়ান হোটেলে ও ভোজ্যসংস্থা"র সম্মানে পুরস্কৃত করেন।

প্রদর্শনী চলার সময় একদিন "ভারত দিবস" পালন করায় ভারত সম্বন্ধে জার্মানদের আগ্রহ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় রাজদূত শ্রী পি, অচ্যুত মেনন উপস্থিত ছিলেন। ভারত-জার্মান আর্থিক ও মানবিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার জন্য পশ্চিম জার্মানীতে বহুকিছু করা হচ্ছে। এটি ঠিক যে এখন বহু জার্মান ভারত দর্শনের রঙীন স্বপ্ন দেখছে।

রম্যাণি বীক্ষ্য

উৎকল পর্ব

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

রাধানন্দবাবু এবারে আর কোন নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন না। মনে হল, তাঁর ব্যর্থতায় তিনি মর্মাহত হয়েছেন। একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারার জন্য তাঁর সারা রাত্রির পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেছে মনে করছেন। আমি কিছু বলব ভাবছিলুম, এমন সময় আমার পাশের ভদ্রলোক আমাকেই একটা প্রশ্ন করে বসলেন : বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি ?

ভদ্রলোকের উচ্চারণ ঠিক বাঙালীর মতো নয়। হয়তো এই দেশীয় মানুষ, কিন্তু বাঙলা জানেন। বললুম : কী করে জানলেন ?

আপনাদের আলোচনা থেকে।

বেড়াতে বেরলে আমি নিজেই এই রকমের মানুষের সঙ্গে পরিচয় করি। প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে দিই। কিন্তু এবারে সে রকম উৎসাহ আর কিছুতেই পাচ্ছি না। এবারে আমার চুপ করে থাকতেই ভাল লাগছে। তবু আমি ঘলে দেখলুম : আপনি বুঝি কাজে যাচ্ছেন ?

কাজেই যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে বাসে উঠছি, কিন্তু টুরিস্ট বাস বলে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল।

একটু থেমেই প্রশ্ন করলেন : এখানে আপনারা কী কী দেখবেন ?

ঠিক জানিনে।

ভুবনেশ্বরে নতুন রাজধানী তো দেখবেনই, উড়িষ্যার নতুন পরিকল্পনা কিছু দেখবেন কি ?

বোধ হয় সময় হবে না।

সময়ের কথা বলবেন না। সমুদ্র আর মন্দিরে উড়িষ্যার শেষ নয়, এখানেও সভ্যতার প্রসার হচ্ছে। হিরাকুদ আর রাউরকেলা দেখে ফিরবেন।

সে তো পুরীর কাছে নয়।

দূরেও নয়। কটক থেকে ধেনকানল হয়ে সম্বলপুর যাবার রাস্তা আছে। সম্বলপুরেই তো নতুন উড়িষ্যা জাগছে। অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরি আর ব্রহ্মরাজ নগরের কাগজের কল। মহানদীর উপর হিরাকুদ বাঁধ তৈরী হয়ে গেছে। এখন রাউরকেলায় ইস্পাতের কারখানা। সবই কাছাকাছি। সম্বলপুর থেকে রাউরকেলা শাখা লাইন আছে। কলকাতা মাত্র আড়াইশো মাইল।

অন্যমনস্কভাবে বলে ফেলেছিলুম : এসব জায়গা বুঝি আপনার দেখা ?

এই প্রশ্ন ভদ্রলোক আমার কৌতূহল বলে মনে করলেন। গল্প বলার আগ্রহ তাঁর নিজেরও ছিল। আমার পরিচয় নিলেন, নিজেরও পরিচয় দিলেন। মহাজি ব্যবসাদার, উড়িষ্যা গভর্নমেন্টকে নানা রকমের মাল সরবরাহ করেন। নানা জায়গায় নানা রকমের জিনিষ। রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিমে মচকুণ্ড নদীর বাঁধ থেকে উত্তর পূর্বের মযূরভঞ্জ রাজ্য পর্যন্ত। দক্ষিণে নূতন রাজধানী ভুবনেশ্বর থেকে উত্তরে কারখানা নগরী

রাউরকেলা পর্যন্ত। বললেন : পুরনো উড়িষ্যার পাশে নতুন উড়িষ্যা কেমন করে গড়ে উঠছে, ভুবনেশ্বরে গেলেই তা দেখতে পাবেন। বড় দরিদ্র দেশ, বড় নির্যাতিতের দেশ, এ দেশের মানুষ বড় অবহেলার মধ্যে কোনরকমে বেঁচে ছিল। স্বাধীনতার পর আমাদের ঘুম ভেঙেছে, আমরা জেগেছি। মানুষের মতো বাঁচার চেষ্টা আমাদের শুরু হয়েছে।

একে একে ভদ্রলোক ভুবনেশ্বর কটক সম্বলপুরের গল্প বললেন, বললেন ধেনকানল কেওনঝড় ময়ূরভঞ্জের গল্প। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, রামানন্দ বাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর মাথা হেলে পড়েছে নীরদ বাবুর কাঁধের উপর। শুভা মুখ ফিরিয়ে একবার রামানন্দ বাবুকে, একবার আমাকে দেখল। একটুখানি হেসে আবার মুখ ফিরিয়ে নিল।

প্রাচীন কলিঙ্গের রাজধানী ছিল ভুবনেশ্বর। এইখানেই অশোকের বিখ্যাত কলিঙ্গযুদ্ধ হয়েছিল। ইতিহাসের বিখ্যাত জৈন রাজা খারবেলাও এই শহরে তাঁর রাজধানী রেখেছিলেন। কিন্তু মহান্তি এসব কথা বললেন না। বললেন : প্রাচীন শহরের পাশেই নতুন রাজধানী স্থাপন হয়েছে। বনবাদাড় কেটে এই শহর গড়তে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা খরচ হল।

এর আগে রাজধানী কটকে ছিল। সেইখান থেকে উঠে আসবার কারণও ভদ্রলোক বললেন। মহানদী আর কাঠজুরি এই দুই নদী কটককে তিনদিক ঘিরে আছে। শহর বাড়াবার প্রচুর প্রয়োজন। অথচ তার উপায় নেই। স্থানাভাব। কাজেই কটক পরিত্যাগ করতে হল।

কটক দেখেছেন ?

না।

দেখেননি ! কটকের ওপর দিয়েই তো আপনারা এসেছেন।

তা এসেছি বটে। ঘুমিয়ে এসেছি।

তাহলে ফেরার সময় অবশ্য নামবেন। কয়েকটা জিনিষ না দেখে গেলে দুঃখ থেকে যাবে।

ভেবেছিলুম, তিনি ঐতিহাসিক কিছু বলবেন। সপ্তম শতাব্দীর শহর, মুসলমান আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত এ রাজ্যের রাজধানী ছিল। অনন্তভীম বা মুকুন্দদেব নির্মিত দুর্গের কথা, দশম শতাব্দীর বিখ্যাত কাঠজুরি বাঁধের কথা বলবেন। কিন্তু মহান্তি সে ধার দিয়েও গেলেন না, বললেন : কটকের খার্মাল স্টেশন আর কাগজের কলের পরিকল্পনা দেখবেন। কলিঙ্গ রেফ্রিজেরেটার কর্পোরেশান, কোল্ড স্টোরেজ প্লান্ট। কটক জেলার কাপড় আর কাচের কারখানা।

বাধা দিয়ে আমি বললাম : একটা দুর্গের কথা শুনেছিলুম।

সে তো ভাঙা দুর্গ। ন' তলা বাড়ি একেবারে ভেঙে পড়েছে। শহরের মাইল খানেক উত্তরে। নাম বড়বাটি দুর্গ।

কাঠজুরি বাঁধের কথাও ভদ্রলোক এমনি সংক্ষেপে বললেন। এখন আর তারও কিছু পুরনো অবশিষ্ট নেই। শুধু বন্যার হাত থেকে শহরটা রক্ষা করবার ক্ষমতা আজও আছে। কেশরী রাজাদের এই কীর্তির এখনও সুখ্যাতি করতে হয়।

ইতিহাসে যে আরও একটি কটকের উল্লেখ মেলা যায়, মহান্তি তা বললেন না। মাদলা পঞ্জীর মতে কটকের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কেশরী বংশের কোন রাজা। কিন্তু তবগুপ্তের অনুশাসনে কটকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন পঞ্চম শতাব্দীর রাজা। বর্তমানের কটকের মাইল তিনেক ঘুরে কপালেশ্বর নামে

একটি দুর্গ আছে। তার মধ্যে চোরগঙ্গার পুকুর নামে একটি জলাশয় আছে। উৎকল রাজ চোরগঙ্গার নামে নাম। গ্রামের নাম কটক চৌধার। জনমেজয় এই নগর স্থাপন করেছিলেন সর্পযজ্ঞের সময়। গ্রামের আজ কোন শ্রী নেই। কিন্তু প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় আছে ছড়ানো।

বড় বাটির দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন রাজা অনঙ্গ ভীম চতুর্দশ শতাব্দীতে। দুধারে পাথরের প্রাচীর। পরিখা চারিদিক ঘিরে। ভিতরে এক পাথরের স্তম্ভে রাজার পতাকা উড়ত। আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায় যে এই দুর্গের মধ্যেই রাজা মুকুন্দদেবের প্রাসাদ ছিল নতুনা উঁচু। আজ তার কোন চিহ্ন নেই।

আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, ভদ্রতা এখন আমাকেই লক্ষ্য করে হাসছে। তার বৌদির কানের কাছে মুখ এনে যা বলল, তার কিছু আমার কানে গেল। বাকিটুকু আমি অনুমান করে নিলুম। বলল, আর এক রামানন্দ বাবু ধরেছেন।

আমি বলতে পারতুম, ভদ্রতাও তো আমাকে ধরেছে। কিন্তু কেন এরা আমাকে ধরে! আমি কি ভাল শ্রোতা, না ভাল সঙ্গী! আমি তো কাউকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করি না। বরং আঘাত দিয়ে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি অনেককে। তবু কেন আমাকে এরা গল্প শোনায়! অবহেলায় কেন দূরে ঠেলে দেয় না! এ আমার দৌভাগ্য ছাড়া আর কী মনে করব!

রামানন্দ বাবুর নাক ডাকছে অল্প অল্প। যাত্রীরা কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে কথা কইছিল। ওধারের এক ভদ্রলোক কঠিন দৃষ্টিতে আমাদের লক্ষ্য করছিলেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। গলাবন্ধ কোটের উপর গরম চাদর। নাকের পাশ দুটো একটু কুঁচকে উঠেছে। মনে হচ্ছিল, আমাদের কথাবার্তাই তার বিরক্তির কারণ, কিংবা আমাদের আলোচনার বিষয়। তাঁর চোখের দিকে চেয়ে আমি কোন প্রশ্ন করবার সাহস পেলুম না।

মহান্তি বললেন : কটক থেকে সম্বলপুরের রাস্তা সোজা উত্তরে গেছে। কলকাতা-মাদ্রাজ লাইনে কটক। আর কলকাতা-নাগপুর লাইনে রাউরকেলা প্রায় সমান রাস্তা। রাউরকেলা থেকে সম্বলপুর শাখা লাইন। সম্বলপুর থেকে কটক পাকা রাস্তা। রায়পুর বিজয়নগরের মতো রেলে যুক্ত হলে এ মুলুকের সমৃদ্ধি বাড়ত। সম্বলপুর থেকে ছ মাইল উত্তরে মহানদীর দুই ধারার মধ্যে হিরাকুদ একটি দ্বীপ ছিল। নতুন বাঁধ হয়ে তার রূপ একেবারে পালটে গেছে। তেমনি রাউরকেলার চেহারা।

সামনের ভদ্রলোক বোধ হয় আর নীরব থাকতে পারলেন না। উড়িয়া ভাষায় যা বললেন তার অর্থ বোধ হয় : কল-কারখানা ছাড়াও এ দেশে অনেক দেখবার জিনিষ আছে।

তা আছে বৈকি : মহান্তি মেনে নিলেন : সম্বলপুর সহরেই আছে সমলেশ্বরী দেবীর মন্দির। সম্বলপুরের প্রাচীন রাজাদের গৃহদেবতা বলে শুনেছি।

বেদব্যাসের কথা বলুন।

বেদব্যাস ?

হ্যাঁ, সুন্দরগড় জেলায় বেদব্যাস।

মহান্তি বোধ হয় তাঁদের নিজেদের ভাষায় তাঁর অজ্ঞতা স্বীকার করলেন। ভদ্রলোক তখন আমার দিকে চেয়ে বললেন : মহাভারত রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাসের নাম শুনেছেন তো, তাঁরই জন্মস্থান। পনপোশ নামে রেল ষ্টেশনের মাইল খানেক দূরে শঙ্খ ও কঙ্কেল নদীর সঙ্গম থেকে ব্রাহ্মণী নদীর জন্ম। বেদব্যাসের জন্ম হয়েছিল এই তীর্থে।

মহাস্তি নাক সেঁটকালেন। মনে হয়, একথা তাঁর বিশ্বাস হয়নি। ভদ্রলোক কিন্তু এই কথাই জিজ্ঞাসা করলেন: কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন: যুক্তি ছেড়ে পাংলুন ধরেছেন, সংস্কৃত ছেড়ে ইংরেজী। সাহেবদের শেখানো কথাইতো ভাল লাগবে।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: সাহেবরা আমাদের ধর্মে অবিশ্বাস করতে শিখিয়েছে। বেদ হল বুনো লোকের কথা। উপনিষদ পাগলামি, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ হল রূপকথা। এই সব কথা প্রচার করলেই তো পৃথিবীতে পরোপকারী নাম নেওয়া যায়। একটা অসভ্য জাতকে গড়ে-পিটে মানুষ করবার মহৎ দায়িত্ব নিয়েছিল।

বুঝতে পারলুম যে এ আমার যুক্তি পাঞ্জাবীর কদর হল। আমার বিশ্বাসের প্রশ্ন না তুলেই তিনি ধরে নিলেন যে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে। থাকা অনুচিত নয়। কিছু অসম্ভব ঘটনা আছে বলেই না আমরা আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলিকে ইতিহাস না বলে রূপকথা বলছি। কিন্তু এই ইকনমিক অগ্রগতির যুগে অনেক অসম্ভব ঘটনাই তো সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। এই কিছুদিন আগে পুষ্পক রথে আকাশে ওড়ার কথা ছিল আমাদের কল্পনায়। আজ তো সবাই আমরা আকাশে উড়ে সেই স্বপ্ন সার্থক করছি। আজ শুধু শব্দভেদী বাণ নয়, যে কোন অস্ত্র যে কোন দিকে নিক্ষেপ করছি। সমুদ্রের নীচে পাতালে নামছি স্বচ্ছন্দে। কোন কোন রাষ্ট্রনেতা আজ শিবের মত তাণ্ডব নৃত্য শুরু করলেই পৃথিবী রসাতলে যাবে। সত্যতা আরও উন্নত হলে পুরাণের সমস্ত অসঙ্গতিই বাস্তব বলে বিশ্বাস হবে।

প্রশ্ন করলুম: এ রকমের তীর্থস্থান আরও কিছু আছে নাকি?

আছে বৈকি। কেওনঝড়ের মাইল দশেক দূরে আছে গন্ধমাদন পর্বত। সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু। রামায়ণের গন্ধমাদন কিনা জানিনা, কিন্তু, এই পাহাড়ও নানারকম ওষধির জন্য বিখ্যাত। তারপর যাজপুর। যাজপুরের নাম নিশ্চয়ই জানেন?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন: মহাভারতের বন পর্বে এই তীর্থের উল্লেখ পেয়েছেন। পঞ্চপাণ্ডব এখানে এসেছিলেন। কেন আসবেন না। এই তীর্থের স্থষ্টিমাহাত্ম্য পুষ্করের মত পবিত্র। ব্রহ্মা এই বৈতরণী তীরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। সেই থেকে যজ্ঞপুর নাম। যজ্ঞের হোমাগ্নি থেকে দুর্গা বিরজা মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মী তাঁর প্রতিমা করেন। সেইজন্য বিরজাক্ষেত্র নামেও এই তীর্থ প্রসিদ্ধ হয়েছে। পুরাণান্তরে অন্য কথা আছে! গয়াসুর যখন বিষ্ণুর চরণে তার দেহ বিস্তার করে, তখন তার মাথা ছিল গয়ায়। পীঠানুরমে পা ও নাভিদেশ এই যাজপুরে। যাজপুর তাই নাভি গয়া নামেও পরিচিত। যে প্রস্রবণে যাত্রীরা পিণ্ডদান করে, তারই নাম গয়াসুরের নাভি। বৈষ্ণবরা এই তীর্থকে বলেন গদাক্ষেত্র। বিষ্ণু নাভি এইখানে তাঁর গদা রেখেছিলেন। তীর্থ সম্বন্ধে শেষ কথা, যাজপুর একটি পীঠস্থান। তাঁর বিরজা নামানুসারে এই পীঠের নাম বিরজাক্ষেত্র।

মহাস্তি তাঁর পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধূমপানে মনোনিবেশ করেছিলেন। বাহিরের দিকে তাকিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে এই সব অবিশ্বাস্য প্রসঙ্গে তাঁর কান নেই। না থাক, আমাদের বর্তমান বক্তা তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। বললেন: আপনারা ইতিহাসকে আজকাল খুব বেশী প্রাধান্য দেন। তাতেও এই স্থানের প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। উড়িষ্যার সোম বংশীয় রাজা মহাশিবগুপ্ত

যযাতি এই স্থানে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। রাজধানীর নাম হয় যযাতি নগর বা যযাতিপুর। প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসনে এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। একদা যে এই নগর সমৃদ্ধ ছিল, তাতে আজ কোন সন্দেহ নেই। যত মন্দির, যত সৌধ অট্টালিকা। কালের কবলে যত ভেঙে পড়েছে, তার চেয়ে বেশী ধ্বংস করেছে কালাপাহাড়। উৎকলের রাজা মুকুন্দদেব হরিচন্দন মোগলের সঙ্গে মিত্রতা করেছেন শুনে পাঠানেরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা তখন গৃহশত্রু দমনে ব্যতিব্যস্ত। উড়িষ্যার সমস্ত দেবমন্দির ধ্বংস হয়ে গেল। যাজপুরের মন্দির মুসলমানদের সম্পত্তি হল। আমির ওমরাহের আবাস হল ভাঙা মন্দিরের পবিত্র পাথরে, রাজার প্রাসাদ হল পাঠানের আস্তাবল। ইংরেজের আমলে এগুলিও রক্ষা পায়নি। এই সব শক্ত ইঁট পাথরে ট্রাঙ্ক রোডের সেতু নির্মিত হচ্ছে।

তাই হয়। অপরকে শ্রদ্ধা করেই নিজে শ্রদ্ধা পাওয়া যায়। পৃথিবীতে রাজার সংখ্যা আকাশের তারার মতো অগণিত, যাঁরা নিজে ভোগ করতে চেয়েছেন সুখ ও সম্মান, পৃথিবীর লোক তাঁদের ভুলে গেছে। যাঁরা প্রজাকে কিছু দিয়েছেন, তাঁরাই আজও বেঁচে আছেন। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশুকে কেউ ভোলে না। মানুষের জন্য যে তাঁরা জীবন দিয়েছেন।

ভদ্রলোক বললেন : মুহম্মদের সম্বন্ধেও একটি কাহিনী এদিকে প্রচলিত আছে।

কিন্তু সেই কাহিনী বলার অবকাশ তিনি পেলেন না। আমি একটা হাই তুলেছিলুম। তাই দেখে ঋতা হেসে উঠল, বলল : ঘুম পাচ্ছে তো ?

মনে হল, ঋতা আমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করল। তাই তাড়াতাড়ি উত্তর দিলুম : ঘুম ভাঙলেও হাই ওঠে।

আপনি কি ঘুমিয়েছিলেন এতক্ষণ ?

ঘুম নয়, জেগে স্বপ্ন দেখছিলুম।

বেশ অদ্ভুত মানুষতো আপনি। এই ঝাঁকানিতেও স্বপ্ন দেখেন।

আমি আমার পাশের দুজনকে দেখিয়ে বললুম : ওঁরা যদি অকাতরে ঘুমতে পারেন তো স্বপ্ন দেখলে আমার দোষ ?

কী স্বপ্ন দেখলেন ?

আকাশ কুসুমের।

সে আবার কী ?

আমি সামনের ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, বিরক্ত হয়ে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। বিরক্ত হবারই কথা। আর একটি কাহিনী বলবার জন্যে তিনি তৈরি হয়েছিলেন। বাধা পেলে কে না বিরক্ত হয়। কিন্তু আমি খুশি হয়েছিলুম। মুহম্মদের গল্প আমাকে শুনতে হয়েছিল। এ জোন্ মুহম্মদ জানিনে। অসম্ভব গল্প শোনাতেও বিপদ আছে, ঋতার উত্তর দিতে আমি তাই দেরী করলুম না : নীল আকাশে এক ঝোকা চাঁপা ফুল দুলছে।

সহসা ঋতা যে তার নিজের দেহে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল, আমি তা লক্ষ্য করতে ভুল করিনি। তার বৌদিকেও একবার সে দেখে নিল। সে মহিলাও দুলছিলেন। আমি অমনি বললুম : ভারি সুন্দর সজীব ফুল।

আকাশে কি ফুল দোলে ?

গাছের ফুল দোলে না, দোলে আকাশ-কুসুম।

আপনি তো চাঁপা ফুল বলছেন!

সত্যি চাঁপার কি ধোকা হয়! কিন্তু এত প্রশ্ন করলে স্বপ্নটা বলি কী করে!

আচ্ছা বলুন, আমি আর প্রশ্ন করব না।

বললুম: মাটিতে একটা দাঁড় কাক বসেছিল। বিশ্রী দেখতে। কিন্তু তার চোখ সেই আকাশ কুসুমের দিকে।

কথা বলতে বারণ করেছেন, তা না হলে বলতুম, এ অসম্ভব কথা। ব্রহ্মদৈত্য নয়, প্রজাপতি নয়, টিয়ে পাখী বললেও আপত্তি ছিল না। দাঁড় কাক ফুলের শোভা দেখছে, এ কথা বিশ্বাস করতে রীতিমত কষ্ট হয়।

আপনার কষ্ট হলে আমি কী করতে পারি। স্বপ্নটাতো আমি দেখেছিলাম, আর আপনাকে দেখিনি।

আচ্ছা, তারপর বলুন।

দাঁড়কাক ভাবল, ফুলটা বেশ।

মেয়েটা প্রবল ভাবে আপত্তি জানাল: দাঁড়কাক এ কথা ভাবতেই পারে না।

তবে থাক।

না, না, থাকবে কেন, বলুন আপনি।

দাঁড়কাকের ইচ্ছা হল, ঐ ধোকাটাকে তার চাই। কিন্তু আকাশ কুসুম তো গাছের ফুল নয় যে গাছের ডালে বসে ঠোকরানো চলে!

তবে কি।

উঁহু, দাঁড় কাকও সে পাত্র নয়, উড়ল ফুলের পেছনে।

মেয়েটার মুখে ভারি প্রসন্ন হাসি। সে যে বেশ কৌতুক বোধ করছে তাতে সন্দেহ নেই।

বললুম: কিন্তু ফুল ছোঁয়া কি তার কর্ম। সে যত ওড়ে, ফুলও তত সরে যায়। কখনও ওপরে, কখনও নীচে। কখনও বা আলোয় লাগে ধাঁধাঁ, আকাশের নীলে হারিয়ে যায় হলদে চাঁপা।

আমি থামতেই মেয়েটা বলল: তারপর?

তার পরের কথা আপনার বিশ্বাস হবে না।

এ কথা কি বিশ্বাস করেছি ভাবছেন?

কোন অসম্ভব আজগুবি কথা তো বলিনি। বিশ্বাস করার বিশেষ বাধা নেই।

কী বলছেন আপনি! আকাশ কুসুমের গল্প কি বিশ্বাস করা যায়।

বেশ যাবে না! আকাশ কুসুমের বদলে চীনে লণ্ঠন ভাবুন, আর দাঁড়কাকের বদলে পাতিহাঁস। মাটির উপরে পাতিহাঁস লাফাচ্ছে, উড়ছেও। কিন্তু চীনে লণ্ঠন কিছুতেই ছুঁতে পারছে না। এইবারে বলুন তো, এর ভেতরে অসম্ভব কি আছে!

সবই তো আজগুবি কথা।

তাহলে শুনবেন না।

আচ্ছা আর ঘাম বাড়াবেন না। বলুন বাকিটুকু।

হঠাৎ সেই দাঁড়কাক পাখা ঝাড়তে শুরু করল। পাখা ঝাড়ছে তো ঝাড়ছেই। আর সেই

তার ঘুমের রঙ বদলাচ্ছে রামধনুর রঙের মতো। ঘুম তো হতেই, এ আবার কী! এ তো দাঁড়কাক নয়, এ কী এলো তাকে ছলনা করতে!

বেশ জমেছে তো এবারে।

জমবেই তো। স্বপ্ন যদি না জমে তো গল্প জমবে কি আপনার আমার!

আপনার ঘুম ভাঙছে না দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। ঠিক এই রকম সময়ে আমার ঘুম যায় ভেঙে, স্বপ্নের শেষটুকু আর দেখা হয় না।

আপনারও তাই? ঠিক এইখানেই বুঝি আপনার ঘুম ভেঙে গেল?

একটু পরে।

তবু ভাল, গল্পের শেষ শোনা যাবে।

শেষটুকু আর দেখলুম কোথায়!

না না, আর দেরী করবেন না। বাকিটুকু এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলুন।

বললুম: দাঁড় কাককে আর চেনা যাচ্ছে না। মানুষের মতো দেখতে হয়েছে, ঠিক কার মতো চিনতে পারছি না। ফুলের দিকে তাকিয়ে দেখি, ওমা, ফুলও যে আর ফুল নয়, সেও মানুষ। কেমন চেনা চেনা, অমন মেয়ে যেন কোথায় আমি দেখেছি।

সকৌতুকে শুভা বলল: নিজেকেই আপনি দাঁড় কাক দেখেননি তো?

হঠাৎ একটা ধাক্কা দিয়ে বাসটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রশ্নটা শুভা তেবেছিল ধাক্কার আগে, করেছিল পরে। আচমকা ধাক্কা খেয়ে বেশ জোরেই প্রশ্ন করেছিল।

বাসের ভিতর সবাই সচকিত হয়ে উঠলেন। যাঁরা ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁরা জেগে উঠলেন। পড়তে পড়তেও সাম্‌লে নিলেন কয়েকজন। দুর্ঘটনা নয়। ভুবনেশ্বরের রাস্তায় আমরা চলছিলুম। পথের একটা ভিখারীকে বাঁচাতে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়েছে।

রামানন্দ বাবু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালেন শুভার মুখের দিকে। অত্যন্ত কাতর স্বরে বললেন: আমাকে দাঁড়কাক বললেন?

নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় গায়ের রঙ দেখলেন। বড় করুণ অসহায় দৃষ্টি। বড় বিপন্ন।

উত্তর না দিয়ে শুভা খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল: আপনি বেশ স্বপ্ন দেখেন।

—ক্রমশঃ

একবার রবীন্দ্রনাথ বোলপুর যাচ্ছেন কিন্তু ট্রেনের যে প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠেছেন হঠাৎ এক বেয়াড়া গোছের অসভ্য ধনী যাত্রী সেই কামরাটি তার লটবহর নিয়ে উঠে পড়ল। উঠেই নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের বিরক্তি উৎপাদন করতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ কিছু না বলে আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

লোকটা হঠাৎ রেগে উঠে রবীন্দ্রনাথকে বলল -কি মশাই, অমন করে আমার দিকে দেখছেন কি? আমি জানোয়ার নই, মানুষ, বুঝলেন।

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "আপনার কথা শুনে এইবার বুঝেছি।"

স্মৃতি

এক

ডাক পিয়নের কড়া নাড়ার শব্দ শোনবার জন্ত উৎকর্ণ হয়ে বসেছিল মণিকা।

কি যে ব্যবস্থা করে গেছেন কিদ্‌ওয়াই সাহেব, রবিবারে কোন চিঠি আসবার যো নেই। কেন, রবিবার দিন বুঝি ঘুমিয়ে কাটাতে হয়? কিদ্‌ওয়াই সাহেবের নিশ্চয়ই বাহাত্তুরে ধরেছিল, নইলে তিনি এই সোজা কথাটা ভুলে গেলেন কি করে যে সারা সপ্তাহের মধ্যে রবিবারই হচ্ছে চিঠি পাবার এবং লেখার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত সময়। অথও অবসর, অফিসের বা স্কুলের কোন তাড়া থাকে না, দুপুরের খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে, বিশিষ্ট লোকের লেখা দু' একখানা চিঠি হাতে করে শোবার ঘরে ঢোকার যে আনন্দ, যে আরাম, এত কম খরচে আর কোন উপায়ে পাওয়া যায় কি? কিদ্‌ওয়াই সাহেব বলেন কি না, বিলেত দেশেও ত রবিবারে চিঠি বিলি বন্ধ থাকে।···আরে, বিলেত আর আমাদের দেশ কি এক? বিলেত দেশে ত টেলিগ্রামের রসিদ দেওয়া হয় না, আমাদের দেশে সেটা চালু করা হচ্ছে না কেন, শুনি?···আবার বলা হয়, সপ্তাহে একটা দিন ডাক পিয়নদের বিশ্রাম দেওয়া দরকার। বিশ্রাম দিতে কে বারণ করছে, বাপু? ডিউটি কি এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া যায় না যাতে প্রত্যেক পিয়নই সপ্তাহে একটা দিন বিশ্রাম পায়, অথচ চিঠি বিলি একদিনের জন্তও বন্ধ না থাকে? সব পিয়নকেই যে রবিবারে বিশ্রাম নিতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে?

আর অমলেরও যে আজকাল কি হয়েছে। বেশী দিনের কথা নয়, বছর তিনেক আগেও সে নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন মণিকার কাছে চিঠি লিখেছে। প্রথম গোলমাল বাধালেন কিদ্‌ওয়াই সাহেব, সাতখানার জায়গায় চিঠির সংখ্যা এসে দাঁড়াল ছয়খানায়।···তারপর একদিন অন্তর একখানা, সপ্তাহে তিন বা চারখানা চিঠি। এ চলেছিল গত বছর অবধি।···আর এ বছর? কোন হপ্তায় দু'খানা, কোন হপ্তায় মাত্র একখানা। গত হপ্তায় ত চিঠিই আসেনি'। অনুযোগ করলে মামুলি জবাব আসবে, আমি কি করতে পারি যদি তোমাদের ডাক বিভাগ সময়মত চিঠি ডেলিভারি না করে?··· যেন ডাক বিভাগটা মণিকার নিজস্ব এবং তার সব ত্রুটি বিচ্যুতির জন্ত মণিকা দায়ী।···চিঠিটা শুক্রবার দিন সন্ধ্যার পোষ্ট না করে বেলা বারোটার মধ্যে বাক্সে ফেললেই ত শনিবার দিন পাওয়া যেত।···না, মণিকাও এবার প্রতিশোধ নেবে, সেও সপ্তাহে একখানার বেশী চিঠি লিখবে না, এবং সেও হিসেব করে সেটা বাক্সে ফেলবে শুক্রবারের শেষ ক্লিয়ারেন্সের পরে।

কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে কি? অমল আজকাল যেরকম নির্বিকার হয়ে গেছে তাতে তার গায়ে হয়ত এতটুকু আঁচড়ও লাগবে না? বরং সময়মত চিঠি পোষ্ট না করার আরেকটা অজুহাত সে পাবে। বলবে, দেখছ ত, ডাক বিভাগের এই গোলমাল উভয় পক্ষেরই ইচ্ছাকৃত নয়।

পিয়নদের আজকাল হয়েছে কি? সারা রবিবার ছুটি ভোগ করেছে, সোমবার দিনটায় যে একটু তাড়াতাড়ি চিঠি বিলি করবে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

অবশেষে সত্যি কড়া নড়ে উঠ্‌ল। দরজার নীচ দিয়ে দু'খানা চিঠি ঢুকিয়ে দিয়ে নিরুপম তাড়াতাড়ি চলে গেল অন্য এক ফ্ল্যাট-এ।

একখানা চিঠি অমলের। আরেকটা অপরিচিত হাতে লেখা—কিন্তু চিঠিটা মণিকারই নামে।

অমলের চিঠিটাই সে প্রথমে খুল্‌ল। সেই ইন্‌ল্যাণ্ড এয়ার লেটারে লেখা। এটাও নতুন সুরু হয়েছে, গত কয়েক বছর থেকে। সম্বোধনটা ঠিক আগের মতই রয়েছে, কিন্তু চিঠির ভেতরে সারপদার্থ কিছুই নেই।

"আমার মণি"। মণি না, ছাই! বল্‌বার মত কথা যদি কিছু না থেকে থাকে তাহ'লে এসব সম্বোধন করার কি মানে হয়?…না, এবার মণিকা সোজাসুজি লিখে দেবে যে আদিখ্যেতা না করে অমল যেন চিঠিতে তাকে "কল্যাণীয়াসু" বা ঐ জাতীয় কোন একটা সম্বোধন করে। আর সেও লিখ্‌বে "শ্রীচরণেষু"। আগেকার দিনের বৌ-ঝিরা স্বামীদের ত এই প্রকারে সম্বোধন করত, আর স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের ডাকত "অমুকের মা" বলে, সেটা সম্ভব না হলে "গিন্নী" বা ঐ জাতীয় একটা কিছু।

তবু "আমার মণি" এই সম্বোধনটা পড়্‌লে গায়ে এখনও একটু শিহরণ জাগে সেই কি, যতই অন্তঃসারশূন্য হোক্‌না এই সম্ভাষণের অন্তরাল।…না, মণিকা বারণ করবেনা, খোলসটাই মন্দ কি? খোলসের সাহায্যে ভেতরের শাঁসও হয়ত একদিন পুনরুদ্ধার হতে পারে।

কিন্তু কি কাঠখোট্টা অমলের চিঠিটা। নতুন কোন খবর নেই, দিন একই ভাবে চলেছে। বম্বের আবহাওয়া কল্‌কাতার চেয়ে ভাল, যদিও মে মাস এসে পড়েছে তবু অমলের ততটুকু গরম লাগ্‌ছে না। সমুদ্রের হাওয়া একটা মস্ত বাঁচোয়া।…তারপর মণিকার খবর কি? তার ছবিআঁকা গান বাজনায় আশা করি কোন ব্যাঘাত হচ্ছে না। অন্যান্য সব খবরও আশা করি ভাল।

এরকম চিঠি না লিখলেই হয়! অভিমানে মণিকার চোখ জলে ভরে এল। তাড়াতাড়ি সে নিজেকে সংবরণ করে নিল। ছিঃ, চাকরটা হয়ত এখ্‌নি দেখে ফেল্‌বে, কি ভাব্‌বে সে?

এবার দ্বিতীয় চিঠিটা (এটা সত্যি চিঠি, অর্থাৎ খামে ভর্তি কাগজে লেখা) মণিকা খুল্‌ল।

লিখেছে নিরুপম, কল্‌কাতা থেকেই।

"মণিকাদি',

আমার এই চিঠি পেয়ে আপনি নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাবেন, হয়ত ভাব্‌বেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু চিঠি না লিখে পার্‌লাম না। সেদিন সন্ধ্যায় আপনি যে দুটো গান গেয়েছিলেন তার সুরের লহরী এখনও আমার কানে বাজছে। কেবলই ভাব্‌ছি আরও অনেক আগে আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'ল না কেন? তাহলে আরও কত গান আমি শুন্‌তে পেতাম।…সে যাই হোক, এখন কিন্তু আপনাকে আর ছাড়ছি না। যখনই আস্‌বে, অবশ্য যদি আস্‌বার অনুমতি পাই, গান শোনাতেই হবে। জানেন ত, আমি গান পাগ্‌লা। সুকণ্ঠের গান শুন্‌লে আমি খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত ভুলে যাই।

আজ চলি।　　—বিনীত নিরুপম।"

মণিকার বুকের মধ্য দিয়ে একটা বিদ্যুতের ঢেউ খেলে গেল যেন।…নাঃ, ছেলেটা সত্যি পাগল, নইলে এমন চিঠি লেখে? আর কি গানই বা সেদিন মণিকা গেয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে, সেদিনের গানগুলো মোটেই সুসই হয়নি, তারচেয়ে অনেক ভাল গান তার গলা দিয়ে বেরোয়। সে যে

কতখানি নৈপুণ্য অর্জ্জন করেছে, কতখানি হৃদয় দিয়ে গাইতে পারে, তার নিদর্শন একদিন নিরুপমকে দেখাবে।

কিন্তু অমলের চিঠির জবাব দেওয়া দরকার। মণিকা তার কর্ত্তব্যে এতটুকু আলস্য দেখাবেনা, অমল তাকে যতই অবহেলা করুক না কেন।

চিঠির প্যাডটা কাছে টেনে নিয়ে মণিকা লিখ্‌তে সুরু করল।

দুই

মাত্র কয়েক লাইন লিখেছে এমন সময় টেলিফোন্ বেজে উঠল। আচ্ছা জ্বালাতন দেখছি!

—হ্যালো।

—কে? মণিকা?

—হ্যাঁ। আপনি কে কথা বলছেন?

—আমি সুকোমলবাবু। চিন্‌তে পারোনি'?

—ওঃ, সুকোমলবাবু? সত্যি চিন্‌তে পারিনি'। আপনার গলাটা কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছিল। কল্‌কাতায় কবে এলেন?

—হপ্তাখানেক হ'ল এসেছি। একমাসের ছুটি নিয়েছি। ···তুমি কেমন আছ? বরে যাওনি' এখনও?

—আছি ভালই। বরে যাইনি, দেখতেই পাচ্ছেন। উনি এখনও ফ্ল্যাট পান্‌নি'।···তা' মালতীদি' কেমন আছেন? উনিও এসেছেন নিশ্চয়?

—মালতীর জন্যই ত কলকাতায় আসা। ওকে একজন স্পেশালিষ্ট দেখাতে হবে। মফঃস্বলের ডাক্তারে আর কুলোচ্ছে না।

উদ্বিগ্নভাবে মণিকা প্রশ্ন করল, সে কি? মালতীদির আবার এমন কি অসুখ করল যার জন্য জলপাইগুড়ি থেকে আপনাকে ছুটি নিয়ে কল্‌কাতায় চলে আস্‌তে হল?

—সে অনেক ব্যাপার। অসুখটা প্রধানতঃ এনিমিয়া, অন্ততঃ কলকাতার ডাক্তারেরা ত তাই বল্‌ছেন।

—আমি মালতীদি'কে দেখতে যাব। আপনারা কোথায় উঠেছেন?

সুকোমলবাবু ঠিকানা দিলেন না। বল্‌লেন, আমি নিজে এসে তোমাকে একদিন নিয়ে যাব। বাগবাজারের এঁদোগলি খুঁজে বার করা তোমার পক্ষে মুস্কিল হবে।

—বেশ ত!···প্রসন্নমুখে মণিকা জবাব দিল।

—তুমি আজ বিকেলের দিকে বাড়ীতে থাকবে কি? যদি কোথাও না বেরোও তাহ'লে একবার আসতে পারি।

—আসুন না। আমি আজ কোথাও যাচ্ছিনা। ক'টায় আসবার আসবেন?

—এই ধরো দু'টা সাড়ে দু'টায়। ঠিক আছে ত?

—ঠিক আছে।

টেলিফোনটা ছেড়ে মণিকা আবার চিঠিলেখায় মনঃসংযোগ করল। কয়েকটা কড়া কড়া কথা অমলকে লিখবে ভেবে রেখেছিল, সব কেমন যেন গুলিয়ে গেল।

প্রায় দু'বছর পরে সুকোমলবাবু আসছেন, যদিও খুব চেষ্টা করেছেন মণিকার সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহটা লুকিয়ে রাখতে, তবু সক্ষম হননি। কথার সুর এবং ভঙ্গীতে এক নিমেষে মণিকা বুঝে নিয়েছে যে তার প্রতি সুকোমলবাবুর সস্নেহ প্রীতি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি'।

মণিকা খুশী হ'ত (হাঁ, সত্যি খুশী হ'ত) যদি সুকোমলবাবু একা না এসে মালতীদিকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। কিন্তু মালতীদি' অসুস্থ, হয়ত শয্যাশায়ী, তাইতো তাঁর আসা সম্ভবপর নয়। যত শীঘ্র সম্ভব মণিকা মালতীদি'কে দেখতে যাবে। বাগবাজারের এঁদো গলি! যতসব অনাসৃষ্টি কথা সুকোমলবাবুর। যেন মণিকা কোনদিন কোন এঁদো গলিতে পা' দেয়নি'।

নাঃ, অমলের কাছে চিঠি লেখাটা আপাততঃ স্থগিত থাকুক। সুকোমলবাবু এতদিন পরে আসছেন, ওঁর জন্ত একটু জলখাবারের ব্যবস্থা করা দরকার। চাকরটা বেরিয়ে গেছে তার মধ্যাহ্নভ্রমণে—ফিরবে সেই চারটেরও পরে। ওর জন্ত অপেক্ষা করলে দেরী হয়ে যাবে। কিছু আহার্য্য তৈরী করে মণিকা ঢুকবে বাথরুমে, তারপর বৈকালিক প্রসাধন। সুকোমলবাবু মোহনভোগ আর লুচো নিমকি খেতে খুব ভালবাসেন, আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে মণিকা ইলেকট্রিক ষ্টোভটা জ্বালল।

নানাদিক দিয়ে সুকোমলবাবুর কাছে সে সত্যি অত্যন্ত ঋণী। এই সেবার যখন বি,এ, পরীক্ষা দেবার জন্ত সে তৈরী হচ্ছে তখন সুকোমলবাবুর সাহায্য না পেলে সে কি ফিলসফি পেপারে পাশ করতে পারত? ইংরেজী সাহিত্যেও সুকোমলবাবুর কাছ থেকে সে কম ডাইরেক্‌শন পায়নি'। অর্থনীতির ছাত্র অমল তাকে এতটুকু এগিয়ে দেয়নি। বলেছে, তুমি বেছে বেছে এমন বিষয় নিলে যার মধ্যে আমার দন্তস্ফুট করবার যো নেই! তা' ভালই হয়েছে, অধ্যাপনা করে সুকোমলবাবুর হাত পেকে গেছে, উনি যে ভাবে তোমাকে গাইড করতে পারবেন অর্থনীতি নিলেও আমার পক্ষে সে ভাবে গাইড করা সম্ভবপর হ'তনা।

তারপর হেসে অমল বলেছে, তাছাড়া কোন স্বামীরই স্ত্রীর পড়া দেখাবার দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়, তাতে শুধু অশান্তির সৃষ্টি হয়!

রাগ করে মণিকা জবাব দিয়েছিল, চিরকালই জানি, আমি বি, এ, পাশ করি এটা তোমার কোন-দিক থেকেই মনঃপুত নয়। তোমার কেবলই ভয়, আমি স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাব, তোমার ঘরের শেকল কেটে বেরিয়ে পড়ব।

অভিযোগটা অমল মোটেই গায়ে মাখেনি'। নির্ব্বিকারভাবে বলেছে, আমাকে যতটা বোকা ভাব, মণি, আমি ততটা বোকা নই। বি,এ, পাশ না করেও তুমি শেকল কেটে বেরিয়ে পড়তে পার এ বুদ্ধিটুকু আমার আছে।

মণিকা প্রশ্ন করেছে, তাহ'লে পরীক্ষা বিষয়ে তুমি আমাকে এতটুকু উৎসাহ দিচ্ছনা কেন?

অমল জবাব দিয়েছে, তার কারণ, এটা তোমার একটা বিলাস মাত্র। বি, এ, পাশ করলেই তোমার একটা নতুন হাতপা গজাবে না, তুমি যে মণিকা সেই মণিকাই থাকবে।

—অথচ তোমাদের অর্থাৎ পুরুষদের বেলায় ত এসব নজির দেখতে পাই না।

—তার কারণ, আমাদের অন্নসংস্থান করতে হয়। চাকরীর বাজারে ডিগ্রীর ছাপ না থাকলে চলে না। বাড়ীতে বসে আমি কতখানি বিদ্যা আয়ত্ত করেছি তা পরীক্ষা করবার মত দুঃসৎ চাকুরী-

দাতাদের নেই।·· তাছাড়া, আমিত তোমাকে কোন বাধা দিচ্ছিনা। একবারও বলছিনা, বি, এ, পরীক্ষাটা দিয়ো না!

—যেন তুমি বাধা দিলেই আমি শুনতাম! আমার একটা স্বকীয় ব্যক্তিত্ব নেই?

—তোমার ব্যক্তিত্বকে আমি সম্মান করি বলেইত বাধা দিইনি, দেবনা।

এমন স্বামীর সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক। মণিকা চুপ ক'রে গেছে। অমলের উপর তার অভিমান হয়েছে। কিন্তু বেশীক্ষণ তা জাঁকড়ে ধরে থাকতে পারেনি'। অন্য কোন একটা অছিলায় সে অমলের বুকের কাছে এগিয়ে এসেছে, জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছে তার আদর, তার ভালবাসা।

অমল তখন বলেছে, দেখত, মণি, এই হচ্ছে তোমার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র। তুমি হচ্ছ আমার প্রিয়া, আমার ভার্য্যা।

—আমি বুঝি তোমার সহধর্মিণী হতে পারি না?···মণিকা প্রশ্ন করেছে।

—নিশ্চয়ই পারো। কিন্তু আমাদের ধর্মটা কি? আমাকে ভালবাসা হচ্ছে তোমার ধর্ম। তোমাকে ভালবাসা আমার ধর্ম।

—যাও!···রাগ করে বলেছে মণিকা। কিন্তু মনে মনে খুসীও হয়েছে।

সত্যি, পনেরো বছর তাদের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এখনও মনে হয় এই সেদিন তার শুভদৃষ্টি হয়েছিল অমলের সঙ্গে। তাদের যুগ্ম জীবন মোটামুটি সুখেই কেটেছে এতদিন। তাদের ভালবাসার প্রতীক, একটিমাত্র ছেলে। অলক তাদের দু'জনের চোখের তারা।

অমলের সঙ্গে বেশীদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি এই প্রথম। ছয় মাসেরও বেশী হ'ল অমল বদলি হয়ে চলে গেছে বম্বেতে—লিখেছে যে সুবিধামত ফ্ল্যাট খুঁজে পাচ্ছে না, তার নাম এখনও ওয়েটিং লিষ্টএ, এষ্টেট অফিসার কেবলই আশ্বাস দিচ্ছেন যে আর দু'একমাস বাদেই একটা ফ্ল্যাট পাওয়া যাবে। মণিকা যেন ধৈর্য্য ধরে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে। তাছাড়া অলকের বার্ষিক পরীক্ষাটা শেষ হওয়াও দরকার, নইলে বছরের মাঝখানে স্কুল বদলানো মানেই হচ্ছে বিরাট ক্ষতি।

অলকের কথা মনে হতেই মণিকার খেয়াল হ'ল চারটা বাজে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই অলক স্কুল থেকে ফিরবে।

তিন

প্রসাধন শেষ করে মণিকা ভাঁজ করা একখানা শাড়ী খুলে পরল। নীল রংএর শাড়ীটাই এগিয়ে এল তার হাতে। এই শাড়ীটা পরে সুকোমলবাবুর সামনে সে যেদিন উপস্থিত হয়েছিল সেদিন তাঁর চোখের মুগ্ধভাব সে আজও ভুলতে পারেনি।

কিন্তু এ শাড়ীটা পরা কি উচিত হবে? একটু ইতস্ততঃ করছিল মণিকা। কি প্রয়োজন পুরাণো স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলার?

অবশেষে জয়ী হ'ল চিরন্তন নারী। মণিকা তার খুসীমত শাড়ী পরবে, তাতে যদি কারো চিত্তবিভ্রম হয় তার জন্য কি দায়ী হবে সে? তাছাড়া, সুকোমলবাবু নিশ্চয়ই দু'আড়াই বছর আগেকার কথা মনে গেঁথে রাখেননি'। হয়ত তিনি হো হো ক'রে হেসে উঠবেন যদি মণিকা বা আর কেউ তাঁকে এই শাড়ীর ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেয়।

—তুমি একটুকু বদ্‌লাওনি' মণিকা। ঠিক যেমনটি ছিলে তেমনটি রয়েছ, যেন অনন্তযৌবনা উর্বশী!···বিমুগ্ধ চোখে সুকোমলবাবু বল্‌লেন।

—কি যে যা' তা' বলেন আপনি!···মণিকা যেন একটু লজ্জিত, বিব্রত বোধ করল।···তাছাড়া দু'বছরে মানুষ কতটুকুই বা বদ্‌লায় বলুন!

—আমার দিকে তাকিয়ে দেখো না!···দু'বছরে চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে, উদরে স্ফীতি এসেছে, চশমাকেরার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে প্রৌঢ়ত্বের আলস্য!

চেহারার এই তুলনামূলক আলোচনা এড়িয়ে গেল মণিকা। নাঃ, নীল শাড়ীটা পরে সে ভুলই করেছে। এখনত আর উপায় নেই।

—আসুন, ভেতরে চলুন।···বল্‌ল মণিকা।

দুজনে এসে ভেতরের দিকের বারান্দায় বস্‌ল।

—অলককে দেখছিনা যে? সে গেল কোথায়?···সুকোমলবাবু প্রশ্ন করলেন।

—স্কুল থেকে ফিরে এসে খেলতে গেছে। ওর এক নতুন নেশা হয়েছে, ফুটবল।

—তারপর, তোমার খবর কি বলো?

—মালতীদির, আপনার ছেলেমেয়েদের, খবর আগে বলুন আপনি।

সংক্ষেপে সুকোমলবাবু দিলেন সব ইতিবৃত্ত। মালতীর খবর ত টেলিফোনে দেওয়া হয়েছে। না, সে শয্যাশায়ী নয়। তবে খুব বেশী হাঁটাহাঁটি ঘোরাঘুরি করা বারণ। আর মিণ্টু, মিণ্টু, রুনুকি? মিণ্টু এখন কলেজে পড়ে, সিণ্টুটা আগের মতই দুষ্টু রয়েছে, রুনুকি সামনের বছর মাট্রিক দেবে।

—তুমি বম্বে যাচ্ছ কবে?···সুকোমল বাবু প্রশ্ন করলেন।

—জানিনা। উনি এখনও থাকবার উপযোগী একটা আস্তানা খুঁজে পাননি। চেষ্টা করছেন।

—আমাদেরই লাভ অমলবাবুর যত দেরী হয় আস্তানা খুঁজে পেতে। তোমার বম্বে যাওয়ার মানেই হচ্ছে একেবারে বরাবরের বাইরে চলে যাওয়া।

—কেন, আমি বছরে একবার করে কলকাতায় নিশ্চয়ই আস্‌ব। তাছাড়া আপনাকে কি কখনও ওদিকে যেতে হয়না? ঐ সব য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষক হিসেবে?

—শিক্ষার ক্ষেত্রে এতটা খ্যাতি এখনও অর্জন করতে পারিনি, মণিকা, যাতে বাংলা দেশের বাইরের নানা য়ুনিভার্সিটি থেকে আমন্ত্রণপত্র আস্‌তে পারে। সে যাই হোক, আরও পড়াশুনো করছ নাকি? এম্, এ, দেবার ইচ্ছা আছে?

সুরে খানিকটা চপলতা এনে মণিকা জবাব দিল, ইচ্ছা ত ছিল। কিন্তু আপনার মত সহায়ক পাই কোথায়? আপনি ত জলপাইগুড়ির জঙ্গলে গিয়ে বসে আছেন, মণিকার কি হল না হ'ল তা ভাববার সময় আপনার আছে কি?

খানিকক্ষণের জন্য চুপ করে রইলেন সুকোমলবাবু।

তারপর গলাটা একটু নিবিড় করে বল্‌লেন, তুমি কখনও বুঝেছ কিনা জানি না, মণিকা। তোমাকে পড়িয়ে, তোমার সাহচর্যে আমি যে আনন্দ, যে প্রেরণা পেয়েছি তা' আর কারো সংস্পর্শে এসে পাইনি। এই যে ছুটি নিয়ে জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় চলে এসেছি এর পেছনে আছে তোমাকে দেখবার, তোমার সঙ্গে কথা বলবার গূঢ় আকাঙ্ক্ষা। মালতীর চিকিৎসার প্রয়োজন অত্যন্ত গৌণ কারণ।

মণিকার মুখ দিয়ে জবাব আসছিল, এসব কি ম' তা' বল্‌লেন, সুকোমলবাবু!···কিন্তু স্মৃতি চিরমধুর, ভুলিয়ে দেয় নানা ব্যর্থতার যন্ত্রণা।···সুকোমলবাবুর উচ্ছ্বাসের কোন জবাব মণিকা দিল না, শুধু বল্‌ল, চা'টা নিয়ে আস্‌ছি।

চা' নিয়ে আসার পর আলাপটা আর তেমন যেন জম্‌ল না। আরও যে আধঘণ্টাকাল সুকোমলবাবু ছিলেন তা কাটল অত্যন্ত অপ্রয়ত্ন সংবাদ বিনিময়ে। আর একদিন এসে মণিকাকে তাঁর বাগবাজারের বাসায় নিয়ে যাবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই সন্ধ্যার মত সুকোমলবাবু বিদায় নিলেন।

শিথিলতায় কবরীর মধ্যে সুকোমলবাবুর দেওয়া সোনাপটি গুঁজতে গুঁজতে মণিকা এসে দাঁড়াল তার আয়নার সাম্‌নে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকাল তার যৌবনোচ্ছল দেহলতিকার দিকে। তার নজর গেল ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রাখা অমলের ফটোটার প্রতি। অনুভব কর্‌ল, বধে কল্‌কাতার দুই প্রান্তরেখা যেন এসে মিশেছে এই নীরব মুহূর্ত্তটিতে।

চার

অমলের কাছে চিঠিটা পোষ্ট ক'রে দিয়েছে মণিকা। চিঠির ভাষা সে যথাসম্ভব ঘোলায়েম করেছে, তার মধ্যে টেনে আন্‌তে চেষ্টা করেছে স্মৃতির শিখায় উজ্জ্বল বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েক বছরের নবীনতা। মনের গভীরে তার আশা, অমল এবার সাড়া দেবে, এবার পেটারের বদলে এবার আস্‌বে খামে ভরা অন্ততঃ চার পৃষ্ঠাব্যাপী চিঠি।

পরের দিনের অলস মধ্যাহ্ন। সংসারের কাজকর্ম শেষ হয়ে গেছে, অলক স্কুলে, ফিরবে সেই সাড়ে চারটা পাঁচটার আগে নয়। বারান্দায় বসে মণিকা একাগ্রমনে ছবি আঁকছিল।

হঠাৎ এসে হাজির হ'ল সরোজ।

সরোজ মণিকার সমধর্ম্মী, অর্থাৎ চিত্রশিল্পী। তার চেয়েও বড় পরিচয় সে হচ্ছে মণিকার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। অত্যন্ত সরল, সাদা মনের ছেলে, হয়ত একটু বেশী স্পষ্টভাষী। তার বয়স পঁচিশেরও কম, নিরুপমের চেয়ে চার পাঁচ বছরের ছোট সে। মণিকাকে ডাকে "মণিদি" ব'লে—সেই প্রথম পরিচয় অবধি যখন মণিকা তার তথাকথিত হাতিয়োতে যেতে আরম্ভ করেছে, মডেল থেকে ছবি আঁকা শিখতে। এই দু' তিন বছরে মণিকার হাত অনেকখানি পেকে এসেছে, এবং এজন্য সরোজ গর্ব্ব অনুভব করে অনেকখানি। তার ধারণা, সুযোগ এবং উপযুক্ত পরিবেষ্টনী পেলে মণিকা একজন প্রথম শ্রেণীর চিত্রশিল্পী হয়ে দাঁড়াবে, তাকে (সরোজকে) ও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

—বাঃ, মেঘের আড়াল থেকে মুখখানা সুন্দর আস্‌ছে তা।···মণিকার পেছনে দাঁড়িয়ে সরোজ মন্তব্য কর্‌ল।

চম্‌কে উঠ্‌ল মণিকা। অগোচরে সরোজ কখন যে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে হুঁসই তার ছিল না।

—রীতিমত ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে, সরোজ। এরকম আর কখনও ক'রো না, কোন্‌দিন তোমার মণিদি' হার্টফেল্ করে মারা যাবে, তখন তোমার অনুতাপের অবধি থাক্‌বে না।

—মণিদি'র হার্ট অনেক সুস্থ, সবল। এত সহজে তার ক্রিয়া বন্ধ হয় না।

—সরল না ছাই! জানো, গত কয়েকদিন ধরে মাঝ রাত্তিরে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, কেবলই মনে হয় বুকের মধ্যে যেন তাণ্ডব নৃত্য চলেছে।

—ওটা আপনার বিলাস। তাণ্ডবের প্রশ্রয় দেন কেন?

তুলিটা একপাশে রেখে মণিকা প্রশ্ন করল, তার মানে?

—মানে আপনি নিজেই জানেন, মণিদি'। আপনার চারদিকে যে স্তাবক এবং মুগ্ধ ভক্তের দল দাঁড়িয়ে থাকে তাদের বাহুভেদ করে আমরা সাধারণ মানুষেরা প্রবেশ করতেই পারি না!

—এইত প্রবেশ করেছ। কারোর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই।

—আমার ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন। তাই উপকূলে কোন জঞ্জাল নেই। নইলে···

বলতে বলতে সরোজ থেমে গেল।

—নইলে কি? থামলে কেন? যা' বলতে চেয়েছিলে বলে ফেলো।

—সাহস হচ্ছে না, মণিদি'। অবশেষে মাঝে মাঝে আপনার কাছে আসবার এই সুযোগটুকুও হারাব?

—যত সব ফাজলামি হচ্ছে, না? আমি কিন্তু ভয়ানক রাগ করছি।···মণিকা বলল।

আসলে মণিকা উপভোগই করছিল এই বাক্য বিনিময়। সরোজের আবেগপ্রবণতার মধ্যে অনুভব করছিল নতুন এক আবেগের আস্বাদ।

—সত্যি কথা বললে অনেকেই রাগ করে, আপনিও তার ব্যতিক্রম নন্।···সরোজ জবাব দিল।

তারপর বলল, সুকোমলবাবু যে এখানে এসেছিলেন সে খবর আমি জানি। দেখা হয়ে গেল গলির মোড়ে, এই পাড়ায়ই আমি এসেছিলাম আমার এক বন্ধুর কাছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি হঠাৎ এখানে? হকচকিয়ে গেলেন ভদ্রলোক, তারপর মুখ চোখ লাল করে বললেন, ছুটিতে কলকাতায় এসেছি, মণিকার সঙ্গে দেখা করে এলাম।···আচ্ছা, বলুন ত, মণিদি', এরকম হকচকিয়ে যাবার অর্থ কি হয়? আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন একথা স্বীকার করতে এত লজ্জাই বা কেন?

—তুমি বিশ্রী ইঙ্গিত করছ, সরোজ। সুকোমলবাবু তাঁর প্রাক্তন ছাত্রীকে দেখতে এসেছিলেন, এর মধ্যে অন্যায়টা কোথায়?

—কোন অন্যায়ই থাকা উচিত নয়, কিন্তু সুকোমলবাবুর মুখ চোখে পিপাসা, নতুন উত্তাপ পাবার পিপাসা, যার জন্য আপনিও অংশতঃ দায়ী।

মণিকা এবার সত্যি রাগ করল। বলল, আমি যদি বলি তোমার মধ্যেও আছে এই পিপাসা?

—আমি অস্বীকার করবনা, মণিদি'।···বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে সরোজ জবাব দিল।··· তবে একটু তফাৎ আছে। উত্তাপ পাবার পিপাসা আমাকে পায়নি, আমার পিপাসা হচ্ছে স্নিগ্ধ শীতল একফোঁটা জলের জন্য।

এই জন্যই সরোজকে এত ভাল লাগে মণিকার। কোনপ্রকার লুকোচুরি নেই, নেই কোন অভিনয়ের আয়োজন। নিজেকে সকলের সামনে বে-আব্রু করে তুলে ধরতে তার এতটুকু দ্বিধা হয় না।

—তুমি আমার বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী, সরোজ। তুমি আমাকে বলো কি ব্যবহার এঁদের সঙ্গে করলে কোন অনর্থের সৃষ্টি না হ'তে পারে।

একটু হেসে সরোজ বল্‌ল, বয়সে, অভিজ্ঞতায় আমি আপনার অনেক ছোট। আপনাকে উপদেশ দেওয়া আমার শোভা পায়না। তবু বল্‌ব, আপনি আপনার দুর্ব্বলতার ঊর্দ্ধে উঠবার চেষ্টা করুন।

—দুর্ব্বলতা? কিসের দুর্ব্বলতা?··· বিস্মিতস্বরে মণিকা প্রশ্ন করল।

—এই স্তুতি, এই গুণগান শোন্‌বার দুর্ব্বলতা। কি দৈন্য আপনার? আপনি আপনাকে নিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে থাকুন, সর্ব্বদা পরে থাকুন ঐশ্বর্য্যের কেয়ূর। আপনাকে দেখে কেউ যেন কখনও মনে না করে যে আপনার কোন অভাব আছে, যে আপনাকে উদ্ধার করতে হবে আপনার একাকীত্ব থেকে।

চুপ করে শুন্‌ল মণিকা। খানিকক্ষণ পরে বইখাতার র‍্যাক থেকে বার করল নিরুপমের চিঠিটা, যেটা, আগের দিন অমলের চিঠির সঙ্গে এসেছিল।

—এই দেখ আর একখানা স্তুতিবচন। এই চিঠির জন্যও কি তুমি আমাকে দায়ী করবে?

সরোজ চিঠিটা পড়ল। তারপর বল্‌ল, না, এখনও দায়ী করবনা। কিন্তু এরপর আপনি যদি নিরুপমের অনুরোধে গলে গিয়ে আপনার সুরের আরও লহরী তাকে পরিবেশন করেন এবং তার ফলে তার ভাবে ভাবার যদি সংক্রমিত হয় আরেকটু বেশী দুঃসাহস, তাহ'লে অপরাধের বোঝা খানিকটা আপনাকে বইতে হবে বই কি!

—মেয়েমানুষদের পদে পদে বিপদ দেখছি। একটু স্বচ্ছ, সাধারণভাবে ব্যবহার করলেই যদি তোমাদের, পুরুষদের, চিত্তবিভ্রম হয়, তাহলে আমাদের উচিত সনাতন প্রথানুযায়ী পর্দ্দার আড়ালে থাকা। সহ-শিক্ষা, সহ-সংমিশ্রণ, এই এর এসব বুকনি আওড়াবার কোনই অর্থ হয় না।

—সত্যি কোন অর্থ হয় না, মণিদি'। এসব নতুন প্রবাহের জন্য আমাদের সমাজ এখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়নি'।

—কখনও যে প্রস্তুত হবে সে সম্ভাবনাও দেখছিনা।·· বেশ একটু বিরক্তির সঙ্গে মণিকা বল্‌ল।

—আপনি চান্ পৃথিবীর সব লোক আপনার খুসীমত চল্‌বে। আপনি যখন হাসির ঢেউ তুল্‌বেন তারাও তখন হাস্‌বে, আপনি যখন গম্ভীর হয়ে থাক্‌বেন তারাও তখন গম্ভীর হয়ে থাক্‌বে। এ অত্যন্ত অন্যায় আবদার, মণিদি'।

—অন্যায়ও নয়, আবদারও নয়, সরোজ। আসল কথা হচ্ছে এই যে বাংলাদেশের পুরুষগুলোর মধ্যে না আছে মনের সংযম, না আছে মেয়েদের ঔদ্ধত্যকে বিধ্বস্ত করে দেবার মত চরিত্রের দৃঢ়তা। ওরা দু' নৌকোয় পা' দিয়ে নদী পার হতে চায়।

—আমি যদি বলি শেষের সংজ্ঞাটা আপনার প্রতিই বেশী প্রযোজ্য, তাহলে কি খুব রাগ করবেন, মণিদি'?

—আর কেউ বল্‌লে নিশ্চয়ই রাগ করতাম। তুমি ছেলেমানুষ, আবোল-তাবোল অনেক কথাই তোমার মুখ দিয়ে বেরোয়, তোমার মন্তব্যে রাগ করলে বন্ধুত্বের ভিতে ফাটল ধরে যাবে যে!

তারপর বল্‌ল, এই দেখ, তোমার সঙ্গে অবান্তর কথার জালে জড়িয়ে গিয়ে ছবিটাই অসম্পূর্ণ হয়ে রইল! এখন আর তুলি হাতে নিতে ইচ্ছা হচ্ছেনা।

সরোজ জবাব দিল, তুলি উজাড়ে যাক্। এখন আমার পিপাসা মেটাবার ব্যবস্থা করুন্ দেখি। হিমশীতল একগ্লাস জল খাওয়ান—না, রূপক করে বল্‌ছিনা, যাকে বলে H_2O, সেই অকাব্যিক জলই চাইছি।

পাঁচ

অবশেষে ফ্ল্যাট মিলল বম্বে সহরে। মণিকাকে অমল লিখল, ফ্ল্যাটটা যদিও ছোট, মাত্র তিনখানা ঘর, তবু তোমার ভাল লাগবে। বারান্দা থেকে একফালি সমুদ্রও দেখা যায়, বর্ষার দিনে ঝড়ঝাপ্টার আঘাত লাগবে এই বারান্দার গায়ে।···আমাদের ছোট্ট সংসার, এর চেয়ে বড় ফ্ল্যাট-এর প্রয়োজনই বা কি?

ফ্ল্যাট পাওয়া গেছে. কিন্তু অমল পরিষ্কার করে লেখেনি' কল্‌কাতায় এসে কখন সে মণিকা-অলককে নিয়ে যাবে।

সরোজকে চিঠিটা দেখাল মণিকা। তার অভিযোগের খানিকটা আভাসও দিল সে।

সরোজ বল্‌ল, এ আপনার ভারী অন্যায়, মণিদি'। সোজা চিঠির সোজা মানে আপনি করতে পারেন না? অমলদা' ফ্ল্যাট জোগাড় করেছেন আপনার এবং অলকের জন্য, আর কার জন্য হতে পারে? এখন যাবার দিনক্ষণ স্থির করবেন আপনি, তারপর যা ব্যবস্থা করবার তা' অমলদা' করবেন।

—কিন্তু একবারও উনি লেখেননি' যে আমার তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। এভাবে উপযাচক হয়ে আমি যাবনা।

—ভক্ত এবং স্তাবকদের স্তুতিগান শুনে শুনে আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, মণিদি'! তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার বয়স কি অমলদার এখন আর আছে! গণ্ডগোল না করে আপনি সোজা লিখে দিন কোন্ তারিখে যেতে চান্। হাঁা, আপনি অবশ্য অমলদাকে বল্‌তে পারেন যে আপনি আশা করছেন উনি ছুটি নিয়ে এসে আপনাকে নিয়ে যাবেন।

—ওসব তোমার অমলদা করবেন না। ওঁর ভাবখানা হচ্ছে, ফ্ল্যাট জোগাড় করেছি, আমার কর্তব্য আমি করলাম, এবার তোমার খুসীমত তুমি আস্‌তে পার। আর যদি না আস্‌তে চাও, কুছ পরোয়া নেই!

—আপনি অমলদার প্রতি ঘোরতর অবিচার করছেন মণিদি'।···সরোজ একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বল্‌ল।

মণিকা যা ভয় ক'রেছিল তাই কিন্তু হ'ল। তার চিঠির উত্তরে অমল লিখল যে তার পক্ষে ছুটি নিয়ে কল্‌কাতায় আসা অসম্ভব। তা'ছাড়া বম্বে থেকে কল্‌কাতা যাতায়াতের ভাড়াও ত সামান্য নয়। মণিকা এখন কচি খুকিটি নয়, সে কি একটা কুপে রিজার্ভ ক'রে চলে আস্‌তে পারে না? ট্রেন বদলাবার কোন হাঙ্গামা নেই, কল্‌কাতায় তার বন্ধুবান্ধবেরা তাকে গাড়ীতে তুলে দেবে। আর এদিকে বম্বের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস্‌এ অমল যথাসময়ে হাজির থাকবে। মণিকা বি, এ, পাশ ক'রেছে, এইটুকু স্বাধীনভাবেও যদি সে পথ চল্‌তে না পারে তাহলে বৃথাই তার ডিগ্রীলাভ।

বি, এ, পাশের সঙ্গে একা কল্‌কাতা থেকে বম্বে যাবার কি সম্পর্ক মণিকা ঠিক বুঝতে পারল না। সে শুম্ হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ।

অমলের চিঠিটা সরোজও পড়ল। তারপর বল্‌ল, আমি অবশ্য আশা করেছিলাম কোন একটা উপায় উদ্ভাবন ক'রে অমলদা চলে আস্‌বেন। কিন্তু ওকে দোষ দেওয়াও যায় না। যে অসুবিধাগুলোর কথা লিখেছেন তা নিতান্ত উড়িয়ে দেবার মত নয়।

—এখন ওঁর দিকে টেনে কথা বল্‌ছ, অথচ আমি যখন বলেছিলাম যে এই হবে, আমার সঙ্গে কি তুমুল তর্ক তুমি ক'রেছিলে!...আমি সত্যি ভাবছি আমার যাবার কোন মানে হয় না।

—আপনার যেতে ইচ্ছা না হয়, যাবেন না, কিন্তু অলক? তাকে তার বাবার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত করবেন কোন্ অধিকারে?

—যে বাবা ছেলেকে কাছে পেতে এতটুকু আগ্রহ দেখায়নি, এতটুকু কষ্ট স্বীকার করতে রাজী নয়, তার কাছে ছেলের যাবার কোনই প্রয়োজন নেই। অলকের তত্ত্বাবধান এতদিন কে করছে শুনি? উনি ত দিব্যি বসে আছেন, সমস্ত দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে!

—আঃ, মণিদি', আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন। অমলদা' যদি কয়েকটা মাস যেতে স্বাধীন ভাবে থেকে একটু আনন্দ পেয়ে থাকেন তার জন্য আপনার এত হিংসা কেন? আপনাকেও ত উনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন!

—হিংসা? স্বাধীনতা? স্বাধীনতা আমি কোনদিনই চাইনি'। আর হিংসা আমার মোটেই হচ্ছে না, হচ্ছে একটু অনুতাপ।

—ও একই কথা। সে যাই হোক, অমলদার এবং আপনার প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্য রয়েছে। আমি আপনাকে আর অলককে যমেগামী ট্রেনে তুলে না দেওয়া পর্য্যন্ত সুস্থির হ'তে পারব না।

—তার মানে তুমি জোর ক'রে আমাকে যমে পাঠাতে চাও?

—হ্যাঁ, জোর ক'রেই। মেয়েদের মস্তিষ্ক যখন বিকৃত হয় তখন তাদের উপর জোর করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকেনা।

হাওড়া ষ্টেশনে অগণিত লোক এসেছিল মণিকাকে প্রত্যুদ্গমন করতে। নিরুপম, সরোজ ত উপস্থিত ছিলই, তাছাড়া এসেছিলেন সুকোমলবাবু, নরেশ বসু, ফ্র্যাঙ্ক ডি-সুজা, এবং আরও অনেকে। মহিলাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সরোজের দিদি এবং ডি-সুজার বাগদত্তা, সিন্ড্রিলা।

মালপত্র যথাস্থানে বোঝাই করে দিয়ে সরোজ এসে দাঁড়াল মণিকার কম্পার্টমেণ্টের সাম্নে। বল্‌ল, এদিকে সব ঠিকঠাক আছে, মণিদি'। আর ওদিকে ত কোন ভাবনাই নেই, অমলদা স্বয়ং হাজির থাকবেন। আমি গার্ডকেও বলে রেখেছি। আপনার কম্পার্টমেণ্টের ওপর নজর রাখবে।

অলকের এই প্রথম ট্রেনে চড়া। আনন্দে, উত্তেজনায় সে এক মুহূর্ত্তও চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারছিল না। বল্‌ল, আপনিও যমে চলে আসুন না, সরোজদাদা!

হেসে সরোজ জবাব দিল, আমার যে এখানে কাজ করতে হয়, ভাই। যমেতে কে আমাকে খেতে দেবে?

—কেন? মা।...অলক জবাব দিল।

—পাত পেড়ে খেতে দেবার কথা বল্‌ছি না। আমাকে রোজগার করতে হবে ত। যমেতে কে আমাকে চাকুরী দেবে?

—ওঃ।

মণিকার কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে এসে সরোজ বলল, দু'এক টুক্‌রো কথার জন্য অত্যাগ্রহের বল হা ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মণিদি'। আমি আর তাঁড় বাড়াব না। যমে থেকে কখনও সখনও চিঠি দিলে খুব খুসী হব।

বলে মণিকাকে কোন জবাব দেবার অবকাশ না দিয়েই সরোজ হঠাৎ দু'হাতে তার পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁড় ঠেলে বেরিয়ে এল।

এই প্রথম সে পায়ে হাত দিয়ে মণিকাকে প্রণাম করল। দূর থেকে সে লক্ষ্য করল, মণিকার চোখে প্রশ্ন: এ আবার কি নতুন আবদার?

ছয়

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসও অমল তার অফিসের পিয়ন সহ উপস্থিত ছিল। তারী মালপত্র পিয়নের জিম্মায় সমর্পণ ক'রে মণিকা এবং অলককে সঙ্গে নিয়ে অমল তাড়াতাড়ি চলে এল তার ফ্ল্যাটএ।

সমুদ্র দেখে অলক খুবই খুসী। প্রশ্নের পর প্রশ্নে সে তার বাবাকে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলল।

মণিকা বলল, দেখছ ত, কি তীষণ চাইছিল তোমার কাছে আসতে। অথচ একটা আস্তানা জোগাড় করতে তোমার লেগে গেল প্রায় এক বছর।

অমল প্রশ্ন করল, শুধু ওই চাইছিল বুঝি? ওর মার কোন অভীপ্সা ছিল না?

রাগের ভাণ ক'রে মণিকা জবাব দিল, ওর মার বিশেষ কোনই অভীপ্সা ছিল না, যেদিকে যেতে বলা হবে সেদিকেই সে যেতে প্রস্তুত ছিল।

—ফ্ল্যাট পেতে দেরী হচ্ছে ব'লে দাদের উৎসাহ বুঝি উবে আসছিল?

—প্রায়।

—আর এখন?

—জানিনা।

—আমি কিন্তু হোটেলে মিথ্যে ছিলাম। সংসারের কোন ঝামেলা নেই, শুধু খাও দাও ঘুমোও। মন খারাপ হলে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সিনেমায় যাও।

মণিকা বিহ্বল ভাবে অমলের দিকে তাকাল। অমল কি ঠাট্টা করছে তার সঙ্গে?…না ত!

অভিমানে মণিকার চোখ জলে ভরে আসবার উপক্রম হ'ল। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টায় সে অশ্রু সম্বরণ করল। এসব ছোটখাট বিষয় নিয়ে পনেরো বছরের পুরানো স্ত্রীর মন খারাপ করা শোভা পায় না। ভাগ্যিস্ সরোজ কাছে নেই, তার তীক্ষ্ণ চোখকে মণিকা কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারত না।

অমল তখনও বলে চলেছে, অবশ্য বেশীদিন এরকম জীবন ভাল লাগে না। তাছাড়া কলকাতায় তোমারও নানা অসুবিধা হচ্ছিল, তাই এষ্টেট অফিস যখন বলল একটা ফ্ল্যাট খালি হয়েছে, তখন ছোট হলেও নিয়ে নিলাম। ফ্ল্যাটটা তোমার পছন্দ হয়েছে ত?

কি জবাব দেবে মণিকা? ঘাড় নেড়ে সে শুধু বলল যে তার পছন্দ হয়েছে।

পথের ক্লান্তিতে এবং নতুন জায়গায় আসবার প্রতিক্রিয়ায় অলক সন্ধ্যার একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। অমলও বাড়ীতে ছিল না—সে গিয়েছিল তারই অফিসের কোন্ এক বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করতে।

অন্ধকার বারান্দায় বেতের একটা আরাম চেয়ারে হেলান দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসেছিল মণিকা, আর শুনছিল সমুদ্রের অস্ফুট কলধ্বনি, অনুভব করছিল তার অন্তহীন প্রগাঢ় স্তব্ধতা।

ভুল, প্রকাণ্ড একটা ভুল করেছে সে। যখেতে আসা তার মোটেই উচিত হয়নি'। তাকে দিয়ে অমলের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, অমল এখন নিজেই সম্পূর্ণ, সমগ্র। মণিকার কি সাধ্য নতুন এই অমলের আকাঙ্ক্ষার নিভৃত কোরক ফুটিয়ে তোলে?

কতক্ষণ সে স্তব্ধভাবে বসে ছিল সে নিজেই জানে না। তার চেতনা হ'ল অমলের ডাকে।

—ওকি? অন্ধকারে বসে রয়েছ যে, মণি? শরীর খারাপ লাগছে না ত?…সস্নেহে অমল প্রশ্ন করল।

মণিকা কোন কথা বলল না।

—দেরী হয়ে গেল, চক্রবর্ত্তীরা কিছুতেই ছাড়ছিলেন না, বিশেষ করে মিসেস্ চক্রবর্ত্তী। উনি আবার আমার একজন গুরু কি না!

মণিকার বুকটায় যেন একটা নতুন আঘাত লাগল। প্রশ্ন করল, মিসেস্ চক্রবর্ত্তী? ওঁর কথা শোননি ত কখনও'।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে অমল জবাব দিল, শোনবার আর কি আছে? চক্রবর্ত্তীর দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী, মাসখানেক হ'ল ওঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। দু'জনেই বড্ড আমুদে লোক। মিসেস্ চক্রবর্ত্তী ত তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য পাগল, আমার সঙ্গেই চলে আসেন আর কি! বুড়ো চক্রবর্ত্তীর তবু একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, বললেন, এতদিন পরে দেশে এসেছে, এসময় বিশ্রম্ভালাপের ব্যাঘাত করাটা হবে ঘোরতর নিষ্ঠুরতা।

বলতে বলতে অমল বসে পড়ল চেয়ারটার পাশে, বারান্দার মেঝের উপর। মণিকার ডান হাতটা নিজের দু'হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে নিল গভীর স্নেহে।

—কাব্য করে কথা বলতে আমি জানিনা, মণি। তবে আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ আমি তোমাকে পেয়ে কত খুসী হয়েছি।

এই কথাটির অপেক্ষায়ই ত মণিকা বসেছিল এতক্ষণ! অশ্রু এবার আর কোন বাধা মানলনা, মণিকা অমলের বুকে মুখ গুঁজল।

তবু কেন তার মনে পড়ছে নিরুপমের স্মৃতি, সুকোমলবাবুর টুকরো কথা, সরোজের স্বচ্ছ উদ্ভাসিত তর্কের ঘূর্ণিবায়ু? কেন চোখের সামনে ভেসে আসছে নরেশ বসুর গভীর মুগ্ধ দৃষ্টিপাত, ক্ল্যাক ডি-সুজার সংক্ষিপ্ত, সলজ্জ বিদায় সম্ভাষণ?

কিন্তু তার মুখ দিয়ে বেরুল একটিমাত্র জিজ্ঞাসা।

—মিসেস্ চক্রবর্ত্তী বুঝি দেখতে খুব সুন্দর?

ডাঃ নবগোপাল দাস

অষ্ট্রিয়ার পার্ব্বত্য উপত্যকায় ফরাসী সৈন্যেরা হঠাৎ আবিষ্কার করল,—তাদের রসদের গাড়ীগুলি পিছনে আসবার সময় হিমবাহে (avalanche) এমন ভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে, যে তাদের আর পুনরুদ্ধারের আশা নেই।

খবরটা নেপোলিয়ানের কাছে গেল। তিনি তখন সৈন্যদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, এই মৃত্যু-উপত্যকায় আমাদের না-খেয়ে মরতে হবে,—যুদ্ধে মরণ অপেক্ষা এ মরণ অতি ভয়াবহ। কিন্তু আমাদের ফিরে গেলে চলবে না,—এগিয়ে যেতেই হবে। কেমন তোমরা প্রস্তুত?

সকলে একসঙ্গে উত্তর দিলে,—আমরা প্রস্তুত।

নেপোলিয়ন হেসে বললেন, তোমাদেরই মত সাহসী সেনা পেলে আমি বিশ্বজয় করতে পারি।

ধনেশ দস্তিদারের সিংহ-শিকার

সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া ফিরিয়া ছোটমামা ঘোষণা করিলেন: আজ একটি রত্ন আবিষ্কার করলাম।

রত্ন আবিষ্কার করা ছোটমামার হবি, প্রায়ই করিতেন। আমরা তাঁহাকে রত্নেশ্বর আখ্যা দিয়াছিলাম। বড়মামা প্রকাশ্যেই বলিতেন, আমরা আড়ালে।

বড়মামা বলিলেন, কি আবিষ্কার করলি রে, ও রতন? বিড়ি-রত্ন না বিড়ি-ও'লা রত্ন?

ছোটমামা বলিলেন, লোকে তাই বলবে তাকে। কিন্তু really he is a genius!

—তা বেশ ত। বল না শুনি কিম্বিধ রত্ন।

ছোটমামা বলিলেন। বহুবাজার অঞ্চলে গিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে বড়রাস্তায় আসিয়া ট্রাম ধরিবেন, গলির মধ্যে নামিল বৃষ্টি। বেগতিক দেখিয়া একটা দোকানের চালার নীচে দাঁড়াইলেন। বৃষ্টি অনেকক্ষণ চলিল। দোকানীর ক্ষুদ্র ঘর, সমাদর করিয়া তাহারই মধ্যে তুলিয়া বসাইল। তাহার সঙ্গে কিছু আলাপ পরিচয়ও হিল।

ভদ্রলোকের ছেলে। এককালে কোন্ অফিসে চাকরি করিতেন। তারপর কোন সম্ভ্রম ঘটিত কারণে চাকরি ছাড়িয়া দেন। একেবারে উগাণ্ডায় চলিয়া যান। সেখানেও একই ব্যাপারে, সাহেবের চোখে বাঙালীর সম্ভ্রমের প্রশ্ন। আবার ছাড়িয়া দিয়া দীর্ঘদিন পরে দেশে ফিরিয়াছেন। সহায় সম্বল নাই, অপরের সাহায্যপ্রার্থী হইতেও অনিচ্ছুক, অতএব পান বিড়ির দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন। একা মানুষ, যা পান তাহাতেই চলিয়া যায়। আর ভাল না চলিলেই বা কি—দাসত্বের কালিয়া পোলাও অপেক্ষা স্বাধীন উপার্জনের শাক ভাত ভাল, ইহাই তাঁহার অভিমত।

বড়মামা বলিলেন, নাম কি ভদ্রলোকের? জিজ্ঞেস করেছিস?

—ধনেশ্বর দস্তিদার।

ধনেশ্বরই বটে। পকেটে না থাক ধন, প্রকৃতিতে আছে কি বলিস। কিন্তু, দস্তিদার মানে? ঘোষ দস্তিদার, ঘরিশাল-গাঙার?

তা ত জিজ্ঞেস করিনি। খেয়াল হয়নি।

বড়মামা একটু ভাবিলেন, বলিলেন, না, ঘোষ-দস্তিদার হলে তাইই বলত। চট্টগ্রামের দস্তিদারও হতে পারে। তাদেরও ত বিরাট বংশ তাদেরই কেউ হবে হয়ত। বা হয়ত তাও নয়, অন্য জায়গারও থাকতে পারে। দস্তিদার নাম।

আমি বললাম, কোথায় দোকানটা, ওঁর?

ছোটমামা বলিলেন, তোর সে জেনে কি হবে?

—যাব। উগাণ্ডায় ছিলেন যখন। নিশ্চয়ই শিকারী লোক। সিংহও মেরেছেন হয়ত। বড়মামা বলিলেন, নাঃ সত্যি ব্রিং আছে তোর। উগাণ্ডায় সিংহ থাকে তাও জানিস? বলতো আর কোথায় কোথায় থাকে সিংহ?

আমি বলিলাম, উগাণ্ডা, কেনিয়া, টাঙ্গানাইকা। ইতিহাসে একদালে খুব বড় জাতের সিংহ

ছিল এখন নেই। এখন যা আছে সে ঘিন্‌ঘিনে পেটরোগা। গুজরাটে আছে। রাজপুতানায় আছে। ইউ পিতে, বিহারে আছে। বাংলাদেশেও আছে কিছুকিছু।

—বাংলাদেশে, আছে মানে?

—মানে, আছে। অবশ্য প্রতাপসিংহ, রামসিংহ'র মত বড় নয়। তবু আছে—রাংপুরে, পাইকপাড়ায়, বেলকুলিয়ায়—

—অ।

—তা থাক। কিন্তু সত্যি ছোটমামা, সে ভদ্রলোককে নিয়ে আসতেই হবে। গল্প শুনব।

—আঃ। আসবেন কেন।

—কেন আসবেন না। বললেই আসবেন। শিকারী লোকরা গল্প শোনাতে ভালবাসে। আর না হয় ও বল আমরাই চলে যাব দল বেঁধে। তবে সেটা হচ্ছে দোকান, মানে বিজ্‌নেস্ আওয়ার্স্—

বড়মামা বলিলেন, বাঃ, তোরা শুনবি। আমরা যাব? ডেকেই নিয়ে আয় একদিন।

ছোটমামা বলিলেন, বেশ বলে দেখব।

পরদিন বিকালবেলায় ছোটমামা বলিতে গেলেন এবং একেবারে সে লোককে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ভাবিয়াছিলাম খুব দর্শনীয় চেহারা হইবে। তাহার কিছুই না। সাধারণ আকৃতি, মাঝারি গড়ন। একটু রোগার দিকে। গায়ের রং এককালে ফর্সা ছিল এখন তামাটে হইয়াছে, উগাণ্ডার রৌদ্রে পুড়িয়া। চক্ষু দু'টি বড় বড়, ভাসাভাসা। কোন একদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকান না। কথা যখন বলিতে থাকেন তখনও চক্ষু দুইটি ইতস্তত চলিয়া বেড়ায়—নিশ্চয়ই শিকারের সময়ে সর্বদা চতুর্দিকে দৃষ্টি রাখার অভ্যাস হইতে এমন হইয়াছে।

আমরা সমাদর করিয়া বসাইলাম; পরমৎ জলখাবার দিলাম। সকলে ঘিরিয়া ফিরিয়া বসিলাম: গল্প বলুন।

ভদ্রলোক বড় লাজুক প্রকৃতির। কথা বলিতেই চান না। বড় বড় শিকারীদের ঐরকম হইয়া যায়, বনের মধ্যে নিঃশব্দে চলাফেরা করিতে করিতে। যত বলি বলুন, ততই বলেন, কি বলব।

আমরা ছাড়িবার পাত্র নই। পাইয়াছি যখন, সিংহ-শিকারের গল্প শুনিবই। বলিলাম, সিংহ-শিকারের গল্প। আপনি উগাণ্ডায় ছিলেন ত, নিশ্চয়ই সিংহ দেখেছেন। নিজেও মেরেছেন?

—সিংহ? আমি? তা মানে—

—বলুন না। মেরেছেন?

—তা, অবশ্য—

—বলুন।

ধনেশ্বরবাবু মাথা নীচু করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। আর ভয় নাই, নিশ্চয়ই শিকারের গল্প মনে করিয়া লইতেছেন—এখনই বলা শুরু করিবেন—লাফ দিবার পূর্বে বাঘ-সিংহ যেমন আড়ি করিয়া লয়।

এইবার বলিবেন মনে হইতেছে, এমন সময়ে বড়মামার ছেলে শিবু গোল বাধাইয়া দিল। সে অত্যন্ত চঞ্চল, কোন অবস্থাতেই ধৈর্য ধরিতে পারে না। ধনেশ্বরবাবু মুখ তুলিলেন। সকলের দিকে একবার করিয়া তাকাইয়া লইলেন। বুঝিলাম গল্প শুরু হইয়েছে।

কিন্তু শিবুর দিকে তাকাইবামাত্র সে বলিয়া উঠিল, আপনি কান্তিবাবুকে চেনেন?

আমরা হুস্‌হাস্ করিয়া তাহাকে থামাইয়া দিতে গেলাম। কিন্তু তাহার আগেই ধনেশ্বরবাবু কথাটা শুনিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইলেন, বলিলেন, কান্তিবাবু কে?

তখন আর থামানো যায় না। শিবু বলল, কেন প্রসিদ্ধ শিকারী কান্তি চৌধুরী?

বৃথা চেষ্টা। তবুও আমি বলিলাম, থাম্ না। তুমছিস উনি ছিলেন উগাণ্ডায়। আর কান্তি চৌধুরী ত ইণ্ডিয়ার। উনি চিনবেন কি করে?

ধনেশ্বরবাবু অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলেন। একটা হাত ঈষৎ তুলিয়া বলিলেন, দাঁড়াও দাঁড়াও। তারপর বলিলেন, আমাকে চেনে বলেছে?

—তা জানিনে। তিনিও বড় শিকারী। তাঁর শিকার-কাহিনী অনেক শুনেছি কিনা।

—উগাণ্ডাতে?

—না। এই যেমেই। মেজদা বলে, ব্যাঙ্গালোরে, আসামে—

—থাম ত। কি রকম চেহারাটা? দেখেছ তাকে?

—হ্যাঁ, কতবার। খুব গ্র্যাণ্ড দেখতে। লম্বা-চওড়া, কর্সা, মস্তবড় নাক—এমন জোয়ান, দেখলে বাঙালী বলেই মনে হয় না।

—বটে? টাক আছে, মাথাজোড়া পেল্লায় টাক? আর কানের ওপরদিকে ছোট ছোট ফুটো?

—ফুটো দেখিনি। টাক আছে, ভীষণ চকচকে টাক।

—তাই বল।

—চেনেন?

—মনে ত হচ্ছে। কিন্তু সে কান্তি চৌধুরী হল কবে?

—কেন? কান্তি চৌধুরী নয় তাঁর নাম?

—হতেও পারে। অনেককাল দেখা নেই, এখন তার নাম কি হয়েছে কে জানে। তবে আমরা যখন চিনতাম তখন নামটা একটু অন্য রকম ছিল।

—কি ছিল?

—সিং। কান্ত সিং।

—সে কি।

বড়মামা বলিলেন, ওরে, এও-যে সিংহ রে।

আমরা বলিলাম, তবে কেন বলেন চৌধুরী?

—তা আমরা অনেক সময় চৌধুরী বলেও ডাকতাম তাকে।

—তাহলে খুব চিনতেন বলুন?

—তা, হ্যাঁ, বলতেও পার।

—কি করে চিনতেন? একসঙ্গে শিকার করতে গিয়ে নিশ্চয়ই? বলুন না—আমরা একসঙ্গে কোলাহল করিয়া উঠিলাম।

ধনেশ্বরবাবু নিঃশব্দে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। আমরা একটু থামিলে বলিলেন, সত্যি শুনতে চাও কান্তি চৌধুরীর কথা?

—হাঁ। হাঁ।

ধনেশ্বরবাবু আবার চুপ করিয়া কি ভাবিলেন। বড়মামার দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি জানেন, একটা লোকের আড়ালে তার নামে আলোচনা করা—

শিবু বলিল, বা। তাহলে ত ইতিহাস পড়াই যায় না মোটে। আলেকজাণ্ডার, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত কাউকেই ত দেখিনি।

আমি বলিলাম, ওরে সেইজন্যেই ইতিহাসের বইয়ে ছবি দিয়ে দেয়। ছবি দেখে দেখে তাদের কথা পড়তে হয়।

বড়মামা বলিলেন, তা, তেমন খারাপ আলোচনা যদি হয়, না হয় নাই বললেন।

ধনেশ্বরবাবু বলিলেন, না, খারাপ আর এমন কি। কিছু নাহয় বাদসাদ দিয়েই বল্‌ব।

শিবু বলিল, আর, সিংহ-শিকারের গল্প?

—একদিনে সব হয় কি করে। সে আরেকদিন তখন হবে।

—আবার আসবেন?

—তা আসব নাহয়। এবার শোন। কান্তি চৌধুরী বললে? তাকে—আসলে লোকটা কান্তিও নয় চৌধুরীও নয়—বাঙালীই নয় আদপে। এক এক করে বলছি শোন।

অনেকদিন আগের কথা, তখন আমার অল্প বয়স। এক সাহেবি ফার্ম, কাঠের কারবার, তাইতে চাকরি করতাম। মস্ত বড় ফার্ম। বিলেতে হেড্ অফিস। আফ্রিকা ইণ্ডিয়া আর বার্মা জুড়ে কারবার। বড় সাহেব ছিলেন আর্চ্চিবিনসন। আমি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি। আমাকে বড় ভালবাসত সাহেব। সাহেব লোক, ব্যবসা খুব ভাল বোঝে, কিন্তু লেখাপড়ায় চুঁ চুঁ। আমরা ভাবি সাহেব হলেই ভাল ইংরিজি জানবে, তা কিন্তু হয় না। সাহেব ইংরেজি বলুক যাহোক একরকম, লিখতে গেলেই কলম ভেঙে একাকার। চিঠিপত্র রিপোর্ট যা কিছু সব আমাকেই লিখতে হত। শক্ত মুখে ছাই দিয়ে ইংরিজি লেখাটা আমার আসতও ভাল। তাছাড়া ফার্মের কাগজপত্রে শুল্ক হিসেব, ভুল হিসেব দু' রকমই লিখতে হয়। সাহেবরা আর যাই বল গুণের কদর বোঝে। আমারও তাই বিশেষ খাতির ছিল সাহেবের কাছে। অনেকের অবশ্য চোখ টাটাত তাই নিয়ে—বাঙালীর মত হিংসুটে জাত নেই। তা টাটায়, আমার কি করবার আছে বল।

একবার, সাহেব লঞ্চে করে টুরে বেরিয়েছে। দেশের সর্বত্র বড় বড় বন ইজারা নেওয়া আছে, নিজের চোখে দেখে না বেড়ালে চলে না। আমার ত সঙ্গে থাকতেই হবে। ডায়মণ্ডহারবার হয়ে কাকদ্বীপের দিকে যাব। খুব ভোরে লঞ্চ ছেড়েছে। মেটেবুরুজ ছাড়িয়ে গেছে। নদী শান্ত, মাত্র রোদ উঠ্‌ছে। সারেং লঞ্চ চালাচ্ছে। সাহেব আর আমি কেবিনে বসে।

হঠাৎ লঞ্চ থেমে গেল। সারেংএর জায়গা থেকে কেবিন অবধি চোঙা থাকে। সাহেব চোঙায় মুখ দিয়ে বললে, কি হ'ল?

সারেং বললে, লাস।

—কই দেখি।

বেরিয়ে এলাম। ভাগ্যিস্ সারেং দেখে ফেলেছিল, নইলে তলায়ই পড়ত। লঞ্চের সামনে একটুখানি পাশের দিকে, একটি দেহ, আধডোবা অবস্থায় চিৎ হয়ে ভাসছে। বিরাট চেহারা, বোঝা যায় হিন্দুস্থানী। সাহেব বললে, তোল।

বোট খুলে লাদকে লকে তোলা হ'ল। তখন দেখি, প্রাণ আছে। সাহেবই ডাক্তারি জানত কিছু কিছু। ক্রমে তার জ্ঞান হ'ল, সুস্থ হল, তার কাহিনী শোনা গেল।

নাম কাল্ত সিং। ভাগলপুর জেলায় বাড়ি। গাঁয়ের নাম বলেছিল, মনে নেই।

নৌকোদারি। সেকালে বিহারী মাঝিরা বড় বড় নৌকো নিয়ে ভাড়া খাটতে আসত। সে বিরাট নৌকো। হাজার মণ পাঁচ হাজার মণ মাল নেয়, কলকাতা থেকে বরিশাল নোয়াখালি ডিব্রুগড় অবধি চলে যায়। এখন আর সেসব নৌকো দেখতে পাইনে। সে নৌকোকে ঠেলে নাড়ানো যায় না। স্রোতের জোরে আর পালের জোরে হাঁটে-কি-হাঁটে-না করে চলত, দুইয়ের ওপরে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে দশ ত্রিশ জোয়ান দশ ত্রিশখানা দাঁড় মেরে তাকে এক আধটুকু এগিয়ে নিত।

এক একটা নৌকোতে লোক থাকত ত্রিশচল্লিশ জন। হয়ত এক গাঁয়ের, হয়ত পাশাপাশি গাঁয়ের। আসত, নৌকো চালাত, বছর পাঁচবছরে একবার দেশে যেত। সব ভাল, কিন্তু একটি ব্যাধি ছিল তাদের। কেউ মরে গেলে, কে ছাগলা করে পোড়াতে যায়, টান মেরে জলে ফেলে দিত। মরবারও তর সইত না অনেক সময়, যদি মনে হল মিথ্যে ঝামেলা, বাঁচবার আশা নেই, হয়ত অ্যাক্সটাকেই দিত চার হাত পা ধরে নদীতে ফেলে। মিটে গেল ঝামেলা, কেই বা জানছে। তারপর দেশে যখন গেল, খুব হাউমাউ করে কেঁদেকেটে বলে দিলে, আহা কত করলাম কত ডাক্তারবদ্যি, কিছুতে ধরে রাখা গেল না। বিশেষ করে কলেরা-টলেরা হলে আর ফেলতে বিলম্ব নয়।

এরও তাই। হয়েছিল প্রচণ্ড জ্বর, বেহুঁস অবস্থা দেখে দিয়েছে জলে ফেলে। ভাগ্যিস সাহেবদের চোখে পড়েছিল। কখন ফেলেছে কোন্ নৌকা সে খোঁজ করা বৃথা। তাকে সঙ্গে নিয়েই আমরা টুর মারতে চলে গেলাম। কলকাতায় ফিরে এলাম প্রায় মাসখানেক পরে।

কলকাতায় এসে সাহেব বললে, তোমার সে নৌকোর মাঝির নাম নম্বর বল। আমি পুলিশকে দিয়ে খোঁজ করাব।

সে বললে, খোঁজ করে কি হবে।

সাহেব বললে, তাহলে দেশেই ফিরে চলে যাও। টাকা দিচ্ছি।

সে বললে, কি হবে গিয়ে। অ্যাদ্দিনে খবর পৌঁছে গেছে আমি বেঁচে নেই। দেশে থাকবার মধ্যে আছে বড় ভাই। সে এতদিন নিশ্চিন্ত হয়ে আমার জমিটুকু দখল করে নিয়েছে। এখন গিয়ে মিথ্যে ঝামেলা বাধানো।

সাহেব বললে, কি করবে তাহ'লে?

সে বললে, আমি ত মরেই গিয়েছি, তুমি বাঁচালে। আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিও না, আমি তোমার কাছেই থাকব।

সাহেব তাকে অফিসের দারোয়ান করে নিলে।

নাম তার কাল্ত সিং। ঐ সময় নৌকোর মাঝিমাল্লাদের অনেকে চৌধরী বলে ডেকে থাকে, যেমন ডাকে কলকাতায় মোষের গাড়ির গাড়োয়ানদের। তাই অফিসেও কেউ কেউ তাকে চৌধরী ব'লে ডাকত। সেই নামকেই বদলে সে কান্তি চৌধুরী বানিয়ে নিয়েছে বুঝতে পারছি।

কাল্ত সিং, বা কান্তি চৌধুরী যাই বলুন, ঘুচে গেল। নামে দরোয়ান, কাজে বড় সাহেবের বডিগার্ড। হ্যাঁ, একটা বলব। সাহেবের ওপরে যা টান অন্ধ নিষ্ঠা তার, সে দেখবার বস্তু। সাহেবের ডাকে এক পায়ে

খাড়া, তাঁর জন্যে প্রাণ দিতে পারে এক কথায়। কিন্তু তেমনই আবার, অন্য কারু কথা কানে নেবে না কারু মান রেখে কথা বলবে না। ফলে অফিসের অনেকে ক্রমশ তার ওপরে চটে যেতে লাগল। আবার সবাই চটা বলেই তার বড় সায়েবও তাকে বেশী বেশী করে আদর দিতে লাগলেন।

চেহারাটা লোকটা ছিল অদ্ভুত। হিন্দুস্থানীর জাত, লম্বা-চওড়া গড়ন, কর্সা রং, মাথায় টাক বলে প্রকাণ্ড পাগড়ি, ঝাঁকালো দাড়ি আর গোঁপ—বয়সটাই পুরুষ। উর্দি এঁটে বন্দুক কিরীচ বেঁধে কাটিজের মালা ঝুলিয়ে যখন টান হ'য়ে দাঁড়াত, যেন যাত্রাগানের আস্ত রাজাটি নেবে এল। বুদ্ধিও রাখত। লেখাপড়া বিশেষ জানে না, অথচ এমন চোস্ত বাংলা বলতে শিখল, কে বলবে তার সাত-পুরুষ কলকাতার বাসিন্দা বাঙালী নয়। শুনে শুনে ইংরাজিও বলতে শিখল কিছু—তার ভাষার ঝোঁড় থাক না থাক চঙে-চাতে একেবারে নিখুঁত। বুদ্ধি রাখত, ভাল বুদ্ধিও, কিচেলী বুদ্ধিও। কিন্তু থাকলে কি হবে, ভাল বুদ্ধিটাকে কাজে লাগাত শুধু বড় সায়েবের কাজ করবার জন্যে—সে বেলায় তার ত্রুটি নেই। অন্যের বেলায় সে বুদ্ধি তার শিকেয় উঠে যায়।

আর এক গুণ। গুল-গল্পের রাজা। আরে বাপরে বাপ, গুল ঝাড়তে বসল ত বসল, অসংখ্য রাজা আর উজীর লাইন করে বড়াবড় পড়ে পড়ে ঘরে যেতে লাগল। তবু হাঁ, ক্ষমতা ছিল—বলতে জানত। এন্তার গুল চালাচ্ছে, সবাই বুঝতে পারছি তার একবর্ণও সত্যি নয়, সম্ভব নয়, তবু কিন্তু চুপ করে শুনে যাচ্ছি—গল্প শুনে হোক না হোক তার বলবার বাহার দেখে। আর সে গল্পই কত রকম—না দেখেছে হেন দেশ নেই, না জানে হেন বস্তু নেই।

চলল। কেটে গেল বছর চারেক।

তারপরের কথা বলি।

বার্মার এক জঙ্গল এলাকা ইজারা নেবার কথা হচ্ছে। নিজেদের ভেকে তার কাগজপত্তর বুঝে নিতে হবে, মাপ-চৌহদ্দি ঠিক করে নিয়ে যখন ফেরে আসতে হবে। বিদেশ, তার বিরাট এলাকা, অনেক টাকার অনেক ঝামেলার ব্যাপার। বড় সায়েব নিজেই যাবেন। যাবার সব ঠিকঠাক, সেখানে চিঠি দিয়ে তারিখ-টারিখ স্থির হয়ে গেছে, সায়েবের মেয়ে অসুখে পড়ল। বাড়াবাড়ি অসুখ, ক'দিন নেবে ডাক্তার বলতে পারছে না। সে মেয়ে, বাপের অতি ন্যাওটা—বাপ চোখের আড়াল হ'লে মেয়ে হেজিয়ে যাবে। ডাক্তার বললে, সায়েবের যাওয়া চলবে না।

বিষম বিপদ। সায়েব বললেন, ধন্যিবার, আমি ত যেতে পারছি নে, তুমিই চলে যাও। গিয়ে যতটা পার কাজকর্ম এগিয়ে রাখ, আমি এদিককার একটু সুরাহা হলেই চলে আসব।

'না' বলা যায় না। আর নতুন দেশ দেখবারও ইচ্ছে নেই এমন নয়। বললাম, বেশ, বল ত যাব। কিন্তু তুমি গেলে যা হ'ত আমি কি সেরকমটা পেরে উঠব।

সায়েব বললে, সেটুকু বিশ্বাস তোমার ওপরে না থাকলে কি আর পাঠাচ্ছি। চলে যাও চিন্তা কোরোনা।

স্থির হ'ল, আমিই যাব, আমার সঙ্গে দরোয়ান, কেরানি, চাকর, ঠাকুর যাবে। আর বনবাদাড়ে কাজ, যদিই বিপদ-আপদ হয়, বলে সায়েব বললেন, বডিগার্ডও যাবে একজন আমার সঙ্গে।

বডিগার্ড মানে খাস্ত সিং। লোকটাকে আমার পছন্দ নয়। অথচ সায়েব নিজে বলছেন, না বলতে পারিনে। বললাম, বেশ, তাই চলুক।

রেঙ্গুনে নেমে নিলেম ডেকে নিলাম। তারপর কাগজপত্র বুঝে নিয়ে জায়গা দখল করতে চললাম। বার্মা রেলওয়ের শেষ স্টেশন মিচিনা—সেখান থেকে আরও অনেকটা যেতে হয়, পাহাড় বন ভেঙে পথ। ফরেস্টার সায়েব একজন আছে, সেই রিসীভ্ করে নিলে। পাশে একটা বাংলো বঙ্গল, অফিসার-টার এলে থাকে। সেইটে খুলে দিলে।

সারাদিন বনে বনে ঘুরি। জরিপ করে করে খোঁটা মারি, রাত জেগে রিপোর্ট লিখে পাঠাই। কাজ বেশ এগোচ্ছে। এদিকে প্রতি ডাকে সায়েবের চিঠি পাচ্ছি, মেমে এখনও সুস্থ হয়নি। একটু কমলেই চলে আসছি, চিন্তা কোরো না।

ফরেস্টার সায়েবটি ভাল লোক, আমাদেরই বয়সী। ফুরসৎ পেলেই এসে বসে, গল্পগুজব জমায়। একা একা বনপুরীতে পড়ে আছে। সঙ্গী পায় না ত। আমাকে পেয়ে তাই তার ফুর্তির শেষ নেই।

প্রথম থেকেই কিন্তু একটা বিপদ দেখা দিলে। যেদিন গিয়ে পৌঁছেছি তার পরদিন সকালবেলা। বন দেখতে বেরোব, তার আগে বাংলোয় বসে ফরেস্টার সায়েব আর আমি, কাগজপত্র দেখছি। এর মধ্যে দুটো মেয়ে এসে বাংলোয় ঢুকল। সেই দেশীয় মেয়ে। ঘাগরা-কাচুলী পরা। বললে, সায়েব, কিছু খেতে দাও। আমি পয়সা বার করছি, সায়েব হাত চেপে ধরলে। বললে, এমন কাজও কোরো না। বলে ধমকে তাদের তাড়িয়ে দিলে।

আমি বললাম, গরীব মানুষ, দু'টো পয়সা দিতাম। তাড়িয়ে দিলে কেন?

সায়েব বললে, এরা কে জান?

—কে?

—এরা হচ্ছে বাবাবর বেদে। ভিক্ষে করে বা ফিরিওয়ালা সেজে বেড়ায়, আসলে এদের ব্যবসা হচ্ছে চুরি ডাকাতি। ভিক্ষে চাইতে এল, সেই তাকে দেখে নিলে কোথায় কি আছে। পয়সা আছে জানলে রাত্রে এসে খুন করে যাবে তোমাকে। এদের কক্ষনো প্রশ্রয় দেবে না। বাংলোর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেবে না।

আমি সেইদিনই খরোয়ান চাকর সবাইকে বারণ করে দিলাম, এদের কোনক্রমেই বাংলোতে ঢুকতে না দেয়। বাইরেও এদের সঙ্গে কথাবার্তা না বলে।

কিন্তু দুদিন না যেতেই চুরি শুরু হ'ল। আজ ক্ষুরের ব্লেড নেই, কাল সাবানখানা উধাও, তার পরদিন পকেটের ছুরিটা নিরুদ্দেশ। যায় কোথায়? সায়েব বললে, বেদেদের কাজ, টুকিটাকির ওপরে প্রচণ্ড লোভ এদের। কিন্তু, তারা নেয় কখন? বাংলোয় ঢুকছে কি করে?

একদিন আমার সোনার বোতামটাই চলে গেল। সায়েব বললে, ও হয়ে গেছে, বেদেদেরকে প্রণাম করেছে।

আমি বললাম, চাপ দিয়ে বার করা যায় না?

সায়েব বললে, অসম্ভব। এদের হাতে মাল গেলে স্বয়ং ব্রহ্মাবিষ্ণুর সাধ্যি নেই খুঁজে বার করেন। আর করবেই বা কে? এদের সার্চ বা অ্যারেস্ট করতে পারে, একমাত্র পুলিশ। তারা থাকে বহুদূরে, শহরে। আমি এক পারি, জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিতে, তাও যদি গাছ কাঁটে বা হরিণ মারে, তবেই। তা যতক্ষণ না করছে, কিছুটি করবার জো নেই।

বেশ। চলুক। আমি কি করব বলুন—সারাদিন থাকি বাইরে, ঘর থাকে চাকরবাকরদের জিম্মায়। আমার আড়ালে তারা কে কি করছে, কি করে লক্ষ্য রাখব। যাক গে, দেখে বিপদ ডেকে আনে যদি, নিজেরাই মরবে।

এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ নজরে পড়ল, গেটের বাইরে দু'টো বেদে মেয়ে দাঁড়িয়ে, কাল্ল সিং তাদের সঙ্গে কি কথা বলছে, যেন খুব গোপন কথা।

আমাকে দেখেই মেয়ে দুটো সট্ করে সরে পড়ল।

কাল্ল সিংকে ডেকে বললাম, কি কথা বলছিলে, ওদের সঙ্গে ?

বললে, ভিক্ষে চাইতে এসেছিল তাই তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম।

বললাম, তাড়িয়ে দিচ্ছিলে ত অতক্ষণ ধরে কথা কিসের ? আর অমন ফিস্‌ফিসিয়ে ?

সে হঠাৎ রুখে উঠল : আমার মর্জি আমি কথা কয়েছি।

আমার অসহ্য বোধ হল। বললাম, মুখ সামলে কথা বলবে তুমি।

সেও সমান তেজে জবাব দিলে, মুখ সামলাবেন আপনি। আমার মালিক আপনি নন।

তাকে হয়ত মেরে বসতাম সেদিন। রেগে গেলে আমার জ্ঞান থাকে না। আর বেয়াদবি সহ্য করাও আমার কোষ্ঠীতে নেই। চড় একটা প্রায় তুলেছি হাতে, ঠেকিয়ে দিলে ফরেস্টার সাহেব—হঠাৎ পেছন থেকে এসে ডাকলে, কি হচ্ছে ?

যাই হোক নিজেদের মধ্যের ব্যাপার, সে হাজার হোক বিদেশী সাহেব, তার অন্ত অফিসের। তার সামনে আর কেলেঙ্কারিটা করলাম না। কাল্লকে বললাম, আচ্ছা যাও পরে হবে।

সে গরগর করতে করতে চলে গেল।

সন্ধ্যের পরে খাতাপত্র নিয়ে বসেছি, দরোয়ান অযোধ্যা সিং এল। বললে, সাহেব এতদিন কথা কইনি, এবার বলতে হ'ল। কাল্ল সিংএর হালচাল ভাল নয়।

বললাম, কি হ'য়েছে ?

—আজই দেখলেন ত। ঐ মেয়েগুলোর সঙ্গে এসে অবধি ভাব জমাচ্ছে। আপনার বোতাম কোথা গেল ? ওরাই নিয়েছে।

—বাংলোয় ঢুকল কি করে ?

—ঢুকতে হবে কেন। বাংলোর ভেতরে কি লোক থাকতে নেই ?

—তুমি প্রমাণ করতে পারবে ?

—প্রমাণ কি করে করব বলুন। আমি থাকি গেটে বসে। ও থাকে যেখানে খুশি—যখন ইচ্ছে ঘরের ভেতরে আসছে যাচ্ছে। বড় সাহেবের পুষ্যিপুত্তুর, কাউকে গ্রাহ্য করে না। আপনি এখানে মালিক আপনাকেই কি রকম শুনিয়ে দিলে, আমি কথা বলব কোন্ সাহসে, বলুন।

—তবে আজ বলছ কেন ?

—আপনার সঙ্গে বেয়াদবি করল, দেখে সহ্য হ'ল না। আর, এরপরে হয়ত আমাদেরই ওপরে দোষ পড়বে।

—কিন্তু, ব্যাপারটা কি খুলে বলত ? ঐ মেয়েগুলোর সঙ্গে ওর ভাব হ'ল কি করে ? খারাপ কিছু, বলছ ?

—তা নয়। সে দোষ নেই, মুষ্ট কেন বলব।

—তবে ?

—কাল্ল সিং বেশাখোর, ভীষণ গাঁজা খায়। তাহাতে কাস্টম ছিল, নিয়ে আসতে পারেনি। এখানে

বনের মধ্যে মাল পাচ্ছে না। বলতে পারছে না আপনাকে, তাই ওদের সঙ্গে খর করেছে। ওরা গাড়া দেয়, ও তার বাদ মেটায় ঘরের জিনিসপত্র দিয়ে।

—ব্লেড্?

—শুধু ব্লেড্ কেন। বোতামও ত আছে। বেদেরা বুনো, টুকিটাকি জিনিসের ওপর ভারি লোভ ওদের।

—তা, জান ত মেরে তাড়িয়ে দাওনি কেন?

—একজন ত নয়। বনের মধ্যে তাঁবু ফেলেছে, ষাট-সত্তর জন। জোয়ান পুরুষ আছে অনেক, বাঘা-বাঘা কুকুর আছে। তাদের ঘাঁটাতে যাওয়া সোজা কথা নয়।

—তাও কথা।

—টাকার ব্যাগ গুণে দেখেছেন? বোতাম বলেই নয়।

—না ত।

—দেখবেন।

সেদিন থেকে আমি নজর রাখলাম। ব্যাগের টাকা গুণে, ব্যাগ টেবিলে দেরাজে ফেলে রেখে দিই—যেমন আগে রাখতাম। পরে যখন গুণে দেখি, দেখি সত্যি কিছু কমেছে। বুদ্ধিমানের চুরি, একেবারে বেশী নেয় না যেন ধরা না পড়ে—ন'শ কিছু বেশকী, হ'শ একটা-দুটো টাকা—এমনিভাবে যাচ্ছে।

কয়েকদিন দেখে দেখে, তারপর আর সন্দেহ রইল না। কান্ত সিংএরও দেখি মেজাজ দিনদিনই কড়া হ'য়ে যাচ্ছে। দুই চোখ লাল হ'য়েই থাকে, দৃষ্টি ঊর্ধ্বমুখী, কথায় কথায় দরোয়ান কেরানি চাকর ঠাকুরের সঙ্গে লেগে যায়।

মহা চিন্তা। অথচ, বলি কাকে। দরোয়ান অযোধ্যা সিং হাজার হোক দরোয়ান, তার সঙ্গে বেশী ফিস্‌ফাস করা যায় না। থাকবার মধ্যে আছে, ফরেষ্টার সাহেব।

শেষে, আর উপায় না পেয়ে তাকেই বললাম।

সে শুনে বললে, খুবই সম্ভব।

বললাম, বনের মধ্যে, ওরাই বা পায় কোথায়?

সাহেব বললে, আবকারীর মাল নয়। বনের মধ্যে বুনো তাং বুনো গাঁজার অভাব নেই। বেদেরা তার চোরাকারবারী। বন থেকে তেড়ে আনছে, দাম যাবদে যা পেলে তাই লাভ। আর এ মালও একেবারে 'ড়', অত্যন্ত কড়া, আবকারীর মাল এর কাছে লাগে না।

—কিন্তু, এখন উপায়?

সাহেব বললে, ভাববার কথা। এই কড়া মাল, তায় অফুরন্ত পাচ্ছে। আর অফুরন্ত খাচ্ছে। এতে মাথা খারাপ হ'য়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। অথচ, যা বললে তা শুনে ত মনে হয় একে কন্ট্রোল করবার সাধ্যি তোমার হবে না।

বললাম, তা হবে না, কারণ ও জানে ওকে বরখাস্ত করবার এক্তিয়ার আমার নেই। মনিবের পুস্তিপুত্তুর হলে যা হয়। কিন্তু, এখন আমি কি করব একটা বুদ্ধি বাৎলাও।

সাহেব বললে, করবার মধ্যে ত আছে দেশে ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়া, সেখানে বেদেও নেই বুনো তাংও নেই। কিন্তু সে ত এখনই হচ্ছে না।

বললাম, না। এখানকার কাজ না সেরে আমি যেতে পারছিনে। বড় সাহেব ঘরে আসতে

পারবেন সে বিধাতাই জানেন। অথচ, এভাবে চলতে থাকলে ও কখন কোন্ কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে তার ঠিক কি। হয়ত একদিন দেখ্‌ব ওকে হাত করে নিয়ে তারা বাংলোতেই হানা দিয়ে বসেছে।

সাহেব বললে, আমারও ঠিক সেই ভয়। এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হচ্ছে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ওকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া, এবং এমন কোন ছুতো করে যাতে আসল কথাটি বুঝতে না পারে। এখন কথা হচ্ছে, সেই ছুতোটা কি হতে পারে? আচ্ছা, ওর বৌ-ছেলেপুলে কোথায়? ধর, হঠাৎ একটা চিঠি এল তাদের কেউ অসুস্থ?

—তবেই হয়েছে। বৌ-ছেলেপুলে পুড়িয়ে খেতেও নেই, অন্তত ও নিজে যতদূর বলে। ঠিক আছে, আমিই ভেবে দেখব কি করা যায়।

অনেক ভেবে শেষটা দরোয়ান অযোধ্যা সিংএর সঙ্গেই আবার পরামর্শ করলাম। লোকটি ভাল, গোটা দশেক টাকা বকশীস্ করলাতেই রাজি হ'য়ে গেল।

দু'একটা দিন তাকে তাকে থেকে, যখন ঠিক দেখা যাচ্ছে কান্ত সিং নেশায় টং হয়ে আছে, দরোয়ান তার সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধালে। এক কথা থেকে পাঁচ কথা—কান্ত সিংএর মেজাজ চ'ড়ে যাচ্ছে। দরোয়ান তাকে খুঁচিয়ে আরও রাগিয়ে দিচ্ছে। বেশীক্ষণ দিতে হ'ল না, কান্ত সিং পাগলা হ'য়ে দরোয়ানকে আক্রমণ করলে, তাকে বেদম মার মারলে। আমি, ফরেস্টার সাহেব, ওৎ পেতেই ছিলাম, হৈ হৈ করে গিয়ে পড়লাম, অনেক কষ্টে তাদের ছাড়িয়ে দিলাম। খুব চোখ্ রাঙিয়ে বললাম, এসব কী ব্যাপার?

কান্ত সিং পাল্টা চোখ রাঙিয়ে বললে, আপনি আমার মালিক নন।

ফরেস্টার সাহেব বললে, কী অসম্ভব বেআদব। একে আপনি সরিয়ে দিন। এ প্রকৃতির লোককে আমি আমার এলাকায় থাকতে দেব না।

আমি বললাম, শুন্‌লে? তোমাকে থাকার দরকার নেই। তুমি কালই কলকাতায় ফিরে যাবে।

কান্ত সিং চোখ আরও লাল করে বললে, ঠিক আছে। আমিও আপনার কাছে থাকব না। কালই ফিরে চলে যাব কলকাতায়।

পরদিন তাকে বিদায় করে দিলাম। ফরেস্টার সাহেবের এক চাপরাশী তার সঙ্গে গেল, একেবারে জাহাজে তুলে দিয়ে এল। যেন যাবার পথে কোন বজ্জাতি না করতে পারে।

অ্যাট্‌কিনসন সাহেবকে আমি চিঠি লিখে দিলাম। বিশেষ কারণে কান্ত সিংকে আমি ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছি। সাক্ষাৎমাত্র সমস্ত ডিটেইলস্ বলব।

এর বেশী লেখা দরকার হবে মনে করিনি। কিন্তু আশ্চর্য, ফেরত ডাকে সাহেবের চিঠি এল: কান্ত সিংএর মুখে সব কথা শুনলাম। তোমার কাছ থেকে এরকম ডিসগ্রেসফুল আচরণ আশা করিনি। তুমি অবিলম্বে কলকাতায় চলে আসবে এবং তোমার কাজের কৈফিয়ৎ দেবে। অবশ্য যদি দেবার মত কৈফিয়ৎ কিছু থাকে।

সেইদিন বুঝলাম, সাহেবেরও মতিভ্রম হয়। এতদিন ধরে এতখানি করে আমাকে চিনেছে সাহেব, একটা গেঁজেল চাকরের মুখে দুকলি শুনে সেই আমার প্রতি এই রকম ব্যবহার? আমার পিত্তি চড়ে গেল। সেইদিনই রেজিগ্‌নেশান লিখে তাকে ছেড়ে দিলাম; কাগজপত্র সব কেরানির জিম্মা করে দিয়ে সে ডাক-বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ফরেস্টার সাহেব অনেক করে বললে, তুমি নিদেন আমার গেস্ট হয়ে থেকে যাও আর কটা দিন।

আমি বললাম, না। এবার অ্যাটর্কিনসন নিজে এসে হাজির হবে। এসেই আমাকে হাতে ধরে অনুরোধ করবে চাকরি না ছাড়ি। কিন্তু আমি সে অনুরোধ রাখতে পারব না। এক্ষেত্রে দেখা না হওয়াই ভাল।

সেকথা ফরেস্টার সাহেবও মেনে নিলে। বললে, দেখ দস্তিদার, সেও সাহেব আমিও সাহেব—আমরা জাতভাই, তুমিই বরং অন্যলোক। তবু একথা বলব তুমিই ঠিক করেছ। তোমার অ্যাটর্কিনসন সাহেব যদি সত্যি বলে থাকে, তাহলেও আমি একথা স্পষ্ট শুনিয়ে দেব, বেয়াৎ করব না।

তারপর বললে, তুমি এখন কোথায় যাবে, কি করবে?

আমি বললাম, কোথায় যাব জানিনে। একটা সেট, যা করে হোক চলে যাবেই। কয়ন কি তাই বা বলি কি করে। তবে এটা স্থির, চাকরি আর আমি করব না।

সাহেব আর কিছু বললে না। ঘণ্টাখানেক পরে, আমি তখন বাক্স গোছাচ্ছি, সাহেব হঠাৎ চলে এল। বললে, ইফ্ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড্ দস্তিদার, তুমি ইস্ট্ অ্যাফ্রিকায় যাবে?

আমি বললাম, আমার কাছে সব সমান। যেতে আপত্তি নেই কিছু। কিন্তু আফ্রিকা মানে, কোথায়?

বললে, উগাণ্ডা। আমার এক কাজিন থাকে সেখানে। রেল লাইন বসানো হচ্ছে, তার ইঞ্জিনীয়ার। তাদের লোক দরকার, আমাকে লিখেছিল। তোমাকে পেলে সে লুফে নেবে।

—মানে চাকরি ত?

বললে, না না। ব্যবসা। রেলের লাইন বসছে, তার গায়ে গায়ে স্টেশনে স্টেশনে স্টল দিতে হবে, লোকালয় গড়ে তুলতে হবে। তুমি খাঁটি লোক, খাটিয়ে লোক, ঠিক পারবে—তোমাকে আমি চিনে নিয়েছি। যাবে, বল তো আমি তাকে চিঠি লিখে দিই।

লোভ হল। বললাম, কিন্তু স্টল দেব যে, টাকা কোথায়?

সাহেব বললে, টাকা দেবে রেল কোম্পানী। তারাই স্টল খাড়া করে দেবে, তুমি সেটা চালাবে। কমিশন পাবে, তাই থেকে কেটে কেটে দাম শোধ করে দেবে। তারপরে স্টল তোমার। দেখ ভেবে।

ভাববার কি আছে। বার্মা থেকেই লোভা জাহাজ ধরলাম। গিয়ে পৌঁছাবার মত টাকা হাতেই ছিল কোনক্রমে। তবু যদি দরকার হয় বলে পাঁচশ টাকা সাহেব নিজে থেকে আমাকে দিয়ে দিলে। আমি অবশ্য সে টাকা দু' তিন মাসেই তাকে শুধে দিলাম।

এই হ'ল আমার উগাণ্ডা যাবার কাহিনী। তারপর সেখানে অনেক বছর কাটিয়েছি, সে অনেক কথা। এখন ধরুন, বয়সও হল। বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে আর ভাল লাগে না। বুড়ো বয়সে দেশের মাটির টানও বাড়ে।

তা ছাড়া উগাণ্ডাও আর সে উগাণ্ডা নেই। উগাণ্ডা বলে নয়, সমস্ত আফ্রিকান কলোনিতেই এখন গবর্মেণ্টের পলিসি বদলে গেছে। আগে হাতে পায়ে ধরে সাধাসাধি করত যাতে ইণ্ডিয়ানরা সে দেশে যায়। এখন উলটো ঠেলা লাগাচ্ছে।

তাই ভাবলাম দুত্তোর ছাই। পরের দেশের মাটি কামড়ে পড়ে থাকব, তাও লাথি ক'টা সয়ে? মনে হল, বাস, দিলাম স্টলটল ছেড়ে; আমগাজমিও কিছু করেছিলাম, সব ফেলে দিয়ে ঘরের ছেলে

ঘরে ফিরে এলাম। এখন যা হোক করে কালী দুমুঠো ফুটিয়েও দিচ্ছেন। চোখ বুজব যেদিন মা গঙ্গাও হাতের কাছেই রইলেন। আর কি চাই বলুন।

রাত্রি হইয়াছিল। আমরা ট্যাক্সি ডাকিয়া তাঁহাকে তুলিয়া দিলাম। বলিলাম, আবার কিন্তু আসতে হবে—উপাওার গল্প আমাদের শোনা হল না।

ঘরে ফিরিবামাত্র বড়মামা বলিলেন, কি হল রে। মুখ লম্বা-লম্বা কেন?

শিবু বলিল, বেং। শিকারই শোনা হল না।

আমি বলিলাম, তুইই ত ভেঙে দিলি।

বড়মামা বলিলেন, শুনলি কি তাহলে, এতক্ষণ ধরে?

শিবু বলিল, সে ত অন্য গল্প।

বড়মামা বলিলেন, এই বুঝি নিয়ে? ওরে মুখ্যু, সিংহ-শিকারই ত করে গেল।

আমরা বলিলাম, তার মানে?

বড়মামা বলিলেন, মানে, তোদের কান্ত সিং বা কান্তি চৌধুরী, যা'ই বলিস। ধরে একেবারে লাল করে দিয়ে গেল না তাকে?

'সমুদ্ধ'

বিখ্যাত অভিনেতা বরিস সেভোরিয়র প্রথম জীবনে ছিলেন সামান্য ফিরিওলা, রাস্তায় রাস্তায় ঠেলাগাড়ীতে মাল ফেরী করে বেড়াতেন।

কিন্তু বিক্রী করবার পদ্ধতিটি ছিল চমৎকার। শিশুমহলে নানারকম মুখভঙ্গি করে ও মজার গান গেয়ে তিনি বেশ সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

একদিন বৃষ্টির সময়ে তিনি জিনিষ বিক্রীর আশা ছেড়ে দিয়ে তাঁর ঠেলাগাড়ীটি নিয়ে এক হোটেলের বারান্দায় একটু আশ্রয় নিয়েছিলেন।

হঠাৎ দেখা গেল, তাঁকে দেখতে পেয়ে অলবৃষ্টি তুচ্ছ করে শিশুর দল ছুটে এসেছে তাঁর কাছে। সকলেরই হাসিমুখ।

হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফ্রান্সের এক বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক দেখলেন এ দৃশ্য। চমকে উঠলেন তিনি। সত্যিই ত এ এক নূতন আবিষ্কার।

তারপরে ছায়াচিত্রে নামতে হোলো তাঁকে। অবশ্য মোটা টাকার চুক্তিতে।

বাংলা রঙ্গালয়ের নব-রূপায়ণ

প্রথম যবনিকা উত্তোলনের আগে

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন—"রেনেসাঁস" শব্দটি। বাংলা রচনাকার্যে নিযুক্ত হয়েও তিনি এই বিদেশী শব্দটির জন্যে কোন পরিভাষা ইচ্ছা ক'রেই ব্যবহার করেন নি। অন্যান্য লেখকগণ "রেনেসাঁস"কে বোঝাতে বাংলায় একাধিক নাম ব্যবহার করেছেন। আমাদের পছন্দসই "নবজাগরণ" কথাটি। সাহিত্য ও আর্টের নবজাগরণ। এখানে দ্রষ্টব্য বাংলা নাট্যকলার নবজাগরণ। কিংবা "নবজাগরণে"র পরিবর্তে এখানে "নব-রূপায়ণ" বললেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। তাই বলব।

কিন্তু তার আগে আমাদের আরো কিছুদূর পিছিয়ে যেতে হবে। কারণ কি-রকম পটভূমিকার উপরে এই নবজাগরণ সম্ভবপর হয়েছে, অন্তত খুব সংক্ষেপেই সর্বাগ্রে সেটা জানা দরকার। তারপর ফিরে আসব আমার সৃষ্টির জগতে।

একেবারে গোড়ার দিকে তাকালে দেখা যায়, বিদেশী লেবেডেফ সাহেব ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় একটি স্বল্পকালস্থায়ী পেশাদার নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। সেটি উঠে যাবার পর সব একেবারে চুপচাপ। প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে সহরের ইংরেজদের অভিনয় দেখে উৎসাহিত হয়ে তারই নকলে বাঙালী বাবুরা যে সব সৌখীন অভিনয়ে মাতেন, তার মধ্যে বাংলা নাটকের স্থান পাবার জো ছিল না। তারও প্রায় সতেরো বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ দেবের ভবনে সৌখীন শিল্পীদের দ্বারা বাংলা নাটকের ("অভিজ্ঞান শকুন্তলা") অভিনয় হয়। তারপর আরো নানা জায়গায় নানা নাটকের অভিনয় চলতে থাকে ক্রমাগত। এবং সেই ধারা চ'লে আসছে আজ পর্যন্ত। অর্থাৎ এই হিসাবে বাংলা নাট্যকলার বয়স শতাব্দীর সীমানা পার হয়ে গিয়েছে।

সে সময়ে সৌখীন নাট্যকলাচর্চার ধুম প'ড়ে গিয়েছিল। তার প্রমাণ পাই সুপরিচিত রামদাস সেনের লিখিত (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) একটুখানি সেকেলে পদ্যে:

"নিত্য নিত্য শুনতে পাই অভিনয় নাম।
অভিনয়ে পূর্ণ হলো কলিকাতা ধাম॥
হায় কি সুখের দিন হইল প্রকাশ।
দুখের হইল অন্ত সুখ বায় মাস॥
দিন দিন বৃদ্ধি হয় সভ্যতা সোপান।
দিন দিন বৃদ্ধি হইল বাঙ্গলার মান॥
হায় কি সুখের দিন হইল উদয়।
এদেশে প্রচার হলো নাট্য অভিনয়॥"

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও লিখেছিলেন: "একণে দেশে নাট্যশালা ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিতেছে।"

কিন্তু এ সব রঙ্গালয়ের স্থায়িত্ব ছিল না—অধিকাংশেরই জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র একরাত্রি। এই সময় কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় নিজের বাড়ীতে বাংলা অভিনয়ের জন্যে প্রথম স্থায়ী "বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ" প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর বোধ করি তাঁরই দৃষ্টান্ত দেখে উৎসাহিত হয়ে পাইকপাড়ার রাজারাও বেলগাছিয়া নাট্যশালাকে পাকা ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দুই বৎসর যেতে না যেতেই প্রতিষ্ঠাতার অকালমৃত্যুর সঙ্গে নাট্যশালার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। তার অন্যতম অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে কবিবর মাইকেল মধুসূদন "নট-কুল-শিরোমণি" ব'লে বর্ণনা করেছেন। এই রঙ্গালয়টি বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বটে, কিন্তু তার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান— মাইকেল মধুসূদন। কারণ এই রঙ্গালয়ের নাটক লেখবার জন্যেই তিনি সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজী ভাষা ছেড়ে মাতৃভাষার আশ্রয় নেন।

এরপর আরো কয়েকটি স্থায়ী নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয় যাদের নাম হচ্ছে "পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়", "শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি," "জোড়াসাঁকো নাট্যশালা" ও "বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়"। অভিনয়কলা যে ধীরে ধীরে উঁচু ধাপে উঠতে থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ কুশীলবদের মধ্যে ছিলেন তখনকার শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে বিখ্যাত ব্যক্তিগণ।

কিন্তু তখনও যে তাঁরা আগেকার মতই গোড়া ধ'রে ছিলেন, এটা অনায়াসেই মনে করা যেতে পারে। অর্থাৎ তাঁরাও অভিনয় এবং মঞ্চকলার আদর্শ গ্রহণ করতেন কলকাতার ইংরেজী থিয়েটারের কাছ থেকে।

এই আদর্শ অল্পবিস্তর পরিমাণে কাজ করেছিল পেশাদার নাট্যজগতে গিরিশ-যুগের শেষ পর্যন্ত। তখনকার নাট্য-পরিচালক ও অভিনেতাদের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল অভিনয় ও দৃশ্যপট। এই দু'য়েরই মূলে ছিল বিলাতী আদর্শ।

এখানে সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হবার আগে যে সৌখীন শিল্পীদের প্রাধান্য ছিল তাঁদের অভিনয় আমি দেখিনি বটে, তবে সেকালকার গণ্যমান্য দর্শকদের মতানুসারে স্বীকার করতে বাধা নেই যে, তাঁদের অনেকেই উচ্চশ্রেণীর অভিনয় করতেন।

এবং এ কথা অনায়াসেই অনুমান করা যেতে পারে যে, তাঁদেরই পথে পদার্পণ ক'রে নাম কিনে ছিলেন সাধারণ রঙ্গালয়ের পেশাদার অভিনেতারা। এঁদের মধ্যে প্রধান তিনজনের নাম হচ্ছে গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল মিত্র। এঁরা ছাড়া আরো যাঁরা উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর অভিনয় করতেন, দুই-তিনজন বাদে তাঁদের প্রত্যেকেরই অভিনয় স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। দু-একবার নয়, বহুবার। দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করতে পারি, এক অমৃতলাল মিত্রের "বিবাহবিভ্রাট" দেখেছিলুম আমি পাঁচ-পাঁচ বার।

আমার ধারণা, এদেশে অভিনয়ের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা একেবারেই অতুলনীয়। আমি আজ পর্যন্ত তাঁর জোড়া দেখলুম না। কোন কোন ভূমিকায় তাঁর কণ্ঠস্বর ও ভাবভঙ্গির কথা স্মরণ করলে আজও মনে মনে বিস্ময়াভিভূত হই। তিনি ভাবাভিব্যক্তির সময়ে যতটা উচ্চে উঠতে পারতেন, আর কোন অভিনেতাই তা পারেন নি আজ পর্যন্ত। নবযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা শিশিরকুমার কারুর কাছে মাথা নীচু করবার পাত্র ছিলেন না। তাঁকেও একাধিকবার বলতে শুনেছি—"আমি মাথা নত ক'রে প্রণাম করি কেবল গিরিশচন্দ্রকেই।"

কিন্তু গিরিশচন্দ্রেরও এই নটনিপুণতার মূলে ছিল ইংরেজী অভিনয়। প্রমাণস্বরূপ স্বর্গীয় অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত "গিরিশচন্দ্র" নামে জীবনীগ্রন্থ থেকে এই কথাগুলি উদ্ধার করা যেতে পারে:

"মিসেস লুইস (সেকালকার কলকাতার অগ্রগণ্য অভিনেত্রী) সওদাগরি অফিসের কোনও হিসাবরক্ষক যুবকের মুখে একজন প্রতিভাবান কলাকৌশলীর ন্যায় সমালোচনা শুনিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতেন। দিন দিন তাঁহাকে এত স্নেহ করিতে লাগিলেন যে, অফিসের ছুটি হইলে, গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার পার্শ্বে বসাইয়া ফিটনে চড়িয়া হাওয়া খাইতে যাইতেন। প্রতিভাশালিনী প্রেটা অভিনেত্রী মিসেস লুইসের সহিত নানারূপ বিদেশীয় নাটক ও অভিনয় সমালোচনায় এবং সেই সঙ্গে প্রায়ই অভিনিবেশ সহ লুইস থিয়েটারের অভিনয় দর্শনে গিরিশ-চন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা ক্রমশঃ স্ফুরিত হইতে থাকে। সেই প্রতিভার প্রথম বিকাশ—স্বীয় পল্লীতে 'সধবার একাদশী' নাটকে 'নিমচাঁদে'র ভূমিকাভিনয়ে।" গিরিশচন্দ্রের বয়স তখন পঁচিশ বৎসর।

এই তো গেল সংক্ষেপে অভিনয়ের ব্যাপার। এর পরে ওঠে দৃশ্যপটের কথা। এ বিভাগে নকলে নকলে আসল খাস্তা হয়ে গিয়েছিল। অনায়াসেই বলা যায়, তখনকার ইংরেজ পটুয়াদের চেয়ে দেশীয় পটুয়াদের হাত ছিল বস্তুতন্ত্র নিরেস। কিন্তু সেই কাঁচা হাতে তাঁরা ইংরেজ দৃশ্যপটশিল্পীদের অনুকরণে যে সব পট আঁকতেন তার কিছু কিছু প্রতিলিপি আমি দেখেছি এবং সেগুলি মৎসম্পাদিত "নাচঘর" পত্রিকার প্রথম বৎসরে প্রকাশিত হয়েছে।

তখনকার জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় ব্যবহৃত দৃশ্যপট সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই আংশিক বর্ণনাটুকুও উল্লেখযোগ্য : "দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীন্‌খানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আঁটা দিয়া জুড়িয়া, অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত।"

আমাদের দেশী নাট্যাভিনয়ে অর্থাৎ যাত্রায় 'সিন-সিনারি'র বালাই ছিল না। থিয়েটারে দৃশ্যপট এসেছে ইংরেজদের দেখাদেখি, বাস্তবতার ওজুহাতে। ভ্রম এইখানেই। 'পশ্চাৎপট' বা কাঁটা সিন—যা দেয়াল-ম্যাপের মত গুটিয়ে তোলা যায়, তার দ্বারা কোনকালেই সত্যিকার বাস্তবতাকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয় বাংলা রঙ্গালয়ে গোড়া থেকেই এই পঙ্গু ও ব্যর্থ বাস্তবতাকে অবলম্বন করা হয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশে এ প্রথা পরিত্যক্ত হবার পরও বাংলা রঙ্গালয় এ বিভাগে তার নকল-ক'রে-পাওয়া তথাকথিত ঐতিহ্যকে ছাড়তে রাজী হয় নি, এমন কি এর দৃষ্টান্ত আজকের দিনেও দুর্লভ নয়।

অভিনয় এবং দৃশ্যপট, প্রধানতঃ এই দুই বিভাগ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন সেকালকার নাট্যাচার্যগণ এবং তার উপরে ছিল নৃত্যগীত বিভাগ। তার বেশী আর কোনদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা কেউ দরকার ব'লে মনে করতেন না। স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে সাজ পোষাক ব্যবহার করা হ'ত না, এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে যাকে বলে team-work, তাও ছিল না বললেই চলে। প্রযোজকর্তার পদ তো দূরের কথা, তাঁর নামও শোনা যেত না কারুর মুখে। বাংলা নাট্যজগতে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে "প্রযোজনৈপুণ্য" কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন ১৩০১ সালে। ঐ ভাবেই চ'লে আসছিল বাংলা রঙ্গালয় গিরিশ-যুগের শেষ পর্যন্ত।

যাঁরা সত্যিকার নাট্যপ্রিয় ছিলেন তাঁরা সেকালে রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহে আসনগ্রহণ করতেন কেবল অভিনয় দেখবার জন্যেই, এ কথা বললে একটুও অত্যুক্তি করা হবে না। তাঁরা ভাবতেন নাচ, গান ও দৃশ্যপটের বাহার, ও-সব হচ্ছে কাউ বা প্রাপ্যের অতিরিক্ত ব্যাপার, না পেলেও অভিযোগ নেই।

"বিল্বমঙ্গল" ও "প্রফুল্ল" প্রভৃতি নাটক যেখানে সেখানে বার বার অভিনীত হ'ত, তবে বেশী লোকের আগ্রহ আকৃষ্ট করত না। কিন্তু যেদিন শোনা যেত বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ও যোগেশের ভূমিকায় পুনরবতরণ করবেন যথাক্রমে অমৃতলাল মিত্র ও গিরিশচন্দ্র, সেদিন অমনি প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠত জনতার কোলাহলে।

অর্দ্ধেন্দুশেখরও ছিলেন প্রথম পঙ্‌ক্তির অভিনেতা। দলের ছোট ছোট নটদের শিক্ষাভার নিয়ে তাঁকে খুব বেশী ব্যস্ত থাকতে হ'ত। এবং মঞ্চের উপরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেও তিনি গ্রহণ করতেন ছোট ছোট ভূমিকা। কিন্তু ওস্তাদের হাতে প'ড়ে সেই সব ছোট ছোট ভূমিকাই আশ্চর্য্য রূপে উৎরে গিয়ে হয়ে উঠত অনুপম ও অননুকরণীয়—দৃষ্টান্ত দিতে গেলে "প্রহাপাদিত্য" নাটকের চতুর ভূমিকার নাম করতে হয়। প্রথমে ঐ ভূমিকাটি আকারে ছিল ক্ষুদ্র, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখরের আত্মপ্রকাশের পরে ঐ ভূমিকাটি এতটা বিখ্যাত হয়ে ওঠে যে, নাট্যকার তাকে বৃহৎ ক'রে তুলে নাটকের একটি প্রধান ভূমিকায় পরিণত করেন।

কিন্তু বড় বড় ভূমিকাতেও অর্দ্ধেন্দুশেখরের শক্তি ছিল অসাধারণ। প্রমাণ, "প্রফুল্ল" ও "বলিদান" নাটকে যোগেশ ও করুণাময়ের ভূমিকায় তাঁর চমৎকার অভিনয়। আসল কথা অর্দ্ধেন্দুশেখর ছিলেন একজন চৌকস শিল্পী—সব রকম ভূমিকাতেই সমান দক্ষতার সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করতে পারতেন। ইংরেজের ভূমিকায় গিরিশযুগে তাঁর জুড়ি কেউ ছিলেন না। 'আবুহোসেন' রূপেও তিনি অদ্বিতীয় হয়ে আছেন। এমনি আরো কয়েকটি ভূমিকার নাম করা যায়।

গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু-অমৃত মিত্র—এই ত্রয়ীর সমকক্ষ না হ'লেও, প্রথম সারিতে আসন পেতে পারেন নানা বিভাগে আরো কয়েকজন অভিনেতাকে দেখেছি গিরিশ-যুগে। কয়েকজন দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর অভিনেতার কথাও স্মরণ হচ্ছে কিন্তু সহরের চার চারটি রঙ্গালয়ের পক্ষে তাঁদের সংখ্যা যথেষ্ট ব'লে মনে করা চলত না। বাজে মার্কা নটরাই ছিলেন দলে ভারি। তাঁদের উপদ্রব ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠত সময়ে সময়ে। এর কারণ আগেই বলা হয়েছে। সেকালের রঙ্গালয়ে team work ব'লে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না-থাকারই-মতো। তাই প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সঙ্গে প্রায়ই দেখা দিতেন প্রথম শ্রেণীরই রাবিশ অভিনেতারা। কিন্তু সে ব্যাপার যে অসহনীয় হ'ত না তার প্রধান কারণ হচ্ছে, সেকালকার দর্শকরা তাঁদের প্রিয় অভিনেতাকে পেলেই খুসি হয়ে যেতেন, রাবিসের খুঁত ধরা অনাবশ্যক ব'লে মনে করতেন।

অন্যান্য দিকে আলগা এবং শ্রেষ্ঠদের অভিনয়ের উপরেই বেশী জোর দিতেও অনেক সময়ে কর্ত্তারা শেষরক্ষা করতে পারতেন না। গিরিশ-যুগেই এটা দেখা গিয়েছে একাধিকবার।

গিরিশচন্দ্রের নিজেরই মুখে প্রকাশ: "কি জান—দেশের ভাগ লোক যায় নাচ দেখতে আর গান শুনতে। থিয়েটারে নাটক দেখতে খুব কম লোকই যায়। শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া এই নাটক ("ম্যাকবেথ") সাধারণের উপযোগী হয় নি। শিক্ষিত-সম্প্রদায় একবার দেখে আর বড় বেশী দেখে না।"

এই কথাগুলি বর্ত্তমান যুগে খাটে না—কারণ নাচ ও গান আধুনিক বাংলা রঙ্গালয় থেকে প্রায় নির্ব্বাসিত হয়েছে এবং চলতি বাংলা রঙ্গালয়ে লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছে গম্ভীর রসাশ্রয়ী নাটকগুলিই। কিন্তু গিরিশ-যুগে তা ছিলনা। তাই ক্লাসিক থিয়েটার যখন গম্ভীর নাটকের ব্যবসায়ে ফেল্ মেরে লাল বাতি জ্বালি-জ্বালি করছে, তখন তাকে মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়ে আবার চাঙ্গা ক'রে তুললে দেখার নাচে-গানে ভরা "আলিবাবা।"

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মনোমোহন থিয়েটার ছেড়ে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভাকে রীতিমত পথে বসিয়ে সদলবলে চ'লে গেলেন নব-প্রতিষ্ঠিত কোহিনুর থিয়েটারে। অন্যান্য রঙ্গালয় থেকেও বড় বড় নট-নটীরা সেখানে গিয়ে জুটতে দেরি করলেন না। নাট্যজগতে এমন আগ্রহ ও কৌতূহল জাগল যে উচ্চমূল্যের টিকিট কিনতে বাধ্য হয়ে আমিও প্রথম রাত্রেই কোহিনুরের প্রেক্ষাগারে হাজিরা না দিয়ে পারলুম না এবং অমৃতলাল বসু মহাশয়ের পাশে ব'সে তাঁর সরস টিপ্পনী শুনতে শুনতে অভিনয় দেখে এলুম। প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি, নাটকের দোষে সে

অভিনয় ঠিকমত হ'য়ে ওঠেনি এবং পালাটিও বেশীদিন চলে নি। কিন্তু সেই প্রথম রাত্রে কোহিনূরে যে বিপুল জনতার সমাবেশ হয়েছিল তার আগে আর তা দেখি নি।

তেরোছিলুম পাঁড়েজীর মিনার্ভা থিয়েটার এইবার বুঝি বন্ধ করবে। কিন্তু তা হ'ল না। দ্বিজেন্দ্রলালের পরপর নাটক "নূরজাহান" যখন আসর জমাতে পারলে না তখন সেখানে খোলা হ'ল "তুকারাম" ও "হিন্দু-রাজত্ব" নামে নূতনরীতিপ্রবর্তক নাটিকা। তিন অঙ্কের পালা এবং অধিকাংশ নট-নটীই মধ্যম শ্রেণীর। কোহিনূরে তখন গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন ধনীবাবু, অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রনাথ মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, অটল দাস, ঘটুবাবু ও মন্মথনাথ পাল এবং তারাসুন্দরী, তিনকড়ি, তুষারকুমারী ও কিরণবালা প্রভৃতি তখনকার লোকপ্রিয় নট-নটীর দল, কিন্তু বড় বড় নাটক নিয়েও তাঁরা মিনার্ভাকে হটিয়ে দিতে পারলেন না, সে পূর্বোদ্যমেই কোহিনূরের সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগল এবং কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল কোহিনূরের চেয়ে মিনার্ভাতেই দর্শকের দল বেশী ভারি হয়ে উঠছে!

'টিট্-ওফার্' ভালো না হবার কারণও ছিল একাধিক। প্রধান কারণ হচ্ছে, প্রায়ই যেসব মহলার প্রধান কয়েকজনকে অভিনয় দেখাচ্ছেন গিরিশচন্দ্র এবং বাকী নট-নটীদের তার নিয়েছেন অর্দ্ধেন্দুশেখর। অথচ এঁদের দুজনের শিক্ষাপদ্ধতি ও মতামত একরকম ছিল না। গিরিশচন্দ্র ভাবগত সুর পছন্দ করতেন এবং অর্দ্ধেন্দুশেখর ছিলেন সুরের বিরোধী। সুতরাং একই নাটকে অভিনয়ের 'ষ্টাইল' হ'ত দু'রকম।

ধনীবাবু ছিলেন অমৃতলাল মিত্র ও গিরিশচন্দ্রের শিষ্য—তিনি অতিশয় সুরেলা অভিনয় করতেন। আবার অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রধান শিষ্য তারক পালিতের অভিনয়ে ছিলনা সুরের প্রাধান্য। বড় বড় নাটকে প্রায়ই এঁদের দুজনেরই বড় বড় ভূমিকা থাকত। মঞ্চের উপরে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে এঁরা দুইজনে যখন কথোপকথন করতেন, তখন একসঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করত পরস্পরবিরোধী দুই পদ্ধতি।

নাটকগঠনেও একমাত্র মস্তিষ্ক কাজ করত না, তাই বিভিন্ন বিভাগে জাগির হ'ত নানা অসঙ্গতি। যে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ ও নাট্যাচার্য্য স্বয়ং গিরিশচন্দ্র, সেখানকার নাট্যাভিনয়েও যে কত ত্রুটি-বিচ্যুতি নজরে পড়ত, আজও তা স্মরণে আছে। আধুনিক সাজপোষাকে পৌরাণিক পাত্র-পাত্রীকে দেখলেও কেউ অবাক মানত না। ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখতে গেলেও কত ত্রুটি দৃষ্টিকে আহত করত! লক্ষ্মণ সেনের যুগের হিন্দু ধর্ম্মাধিকারী পশুপতি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর নবাব সিরাজদ্দৌলা—মাঝখানে আছে কয়েক শত বৎসরের ব্যবধান। কিন্তু পশুপতি এবং সিরাজদ্দৌলার ভূমিকায় যথাক্রমে পিতা গিরিশচন্দ্র এবং পুত্র ধনীবাবু যে পোষাক পরতেন, তার মধ্যে পার্থক্য ছিল না বললেই চলে। আমি দুইজনেরই অভিনয় স্বচক্ষে দেখেছি। এখনকার যাঁদের সে সুযোগ নেই, তাঁরা ইচ্ছা করলে ছবিতে এই বিসদৃশ ব্যাপারটা দেখে আমার কথার সত্যতা পরীক্ষা করতে পারেন। "নূরজাহান" নাটকের নাম-ভূমিকায় স্বর্গীয় প্রকাশমণি বিলাতী জ্যাকেট প'রে মঞ্চের উপরে দেখা দিতেন, কিন্তু নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের বা নাট্যশিক্ষক-অর্দ্ধেন্দুশেখরের দৃষ্টিতে এই অদ্ভুত অসঙ্গতি ধরা পড়ে নি!

মোটকথা সাধারণতঃ অভিনয় ছাড়া আর কোনদিকে সেকালের নাট্য-পরিচালকদের দৃষ্টি বড় একটা আকৃষ্ট হ'ত না—দর্শকরাও প্রধানতঃ ভাবগভীর অভিনয় দেখে অভিভূত হবার জন্যেই প্রেক্ষাগারকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলত—যদিও তার মধ্যে পাওয়া যেত কেবল কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ব্যক্তিগত শক্তি বা প্রতিভার অস্তিত্বকে। সে যুগের দর্শকরাও তার বেশী আর-কিছুর প্রত্যাশা রাখত না, কারণ তাদেরও রসবুদ্ধি তখনও উচিতমত পরিপক্ক হয়ে নি।

তারপর দেখলুম গিরিশোত্তর যুগের বহুপ্রশংসিত যথেচ্ছাচার। পেশাদার রঙ্গালয়ে বাংলা অভিনয় তখন ক্রমে ক্রমে নেমে যাচ্ছিল অধঃপতনের অতলে। প্রথমশ্রেণীর নাট্যশিল্পীরা একে একে মহাপ্রস্থান করলেন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে। দু-একজন যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁরাও প্রায় পঙ্গু হয়েছেন ব্যাধি বা বার্দ্ধক্যের আক্রমণে। পিতৃপ্রদত্ত মূলধনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ধনীবাবু শ্রেষ্ঠ নট হয়েও নূতন নূতন সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারছেন না—যা দেখাচ্ছেন তা সিলিহুয়েট ছাড়া আর কিছুই নয়। শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররাও পরলোকগত—শিবরাত্রির সলতের মত টিম-টিম্ করছেন একমাত্র ক্ষীরোদপ্রসাদ, কিন্তু তবু তাঁরও শক্তিকে ক'রে ফেলেছে জীর্ণ ক্লিষ্ট ও শ্রান্ত।

যে অভিনয়ের জন্যে বাংলা রঙ্গালয় লাভ করত সার্ব্বজনীন অভিনন্দন, তাকে হারিয়ে সে আর যথার্থ রসিকের কাছে রসনিবেদন করতে পারত না—যদিও এই নাট্যমন্দির মাঝখানেই যাকে মাঝে আমরা হঠাৎ অভাবিত ভাবে পেয়েছি ওয়েস্লিসের সরস সৌন্দর্য্য—যেমন দুটি নাট্যাভিনয়ে তারক পালিত ও তারাসুন্দরীর অপূর্ব্ব রূপদক্ষতা। দুই ক্ষেত্রেই অভিনীত নাটক ছিল অতুলনীয় ইবসেন ও সেক্সপিয়ারের রচনা এবং সেই সুনাটকের দুর্ভিক্ষের দিনে তেমন উচ্চশ্রেণীর অভিনয় সম্ভবপর হয়েছিল হয়তো নাটকের গুণেই।

চরিত্রচিত্রহীন, ঘটনাবহুল ও রক্তাক্ত দৃশ্য থাকলেই তখন যে কোন রাম-শ্যামের লিখিত রাবিশ রচনাই সুনাটক রূপে নির্ব্বাচিত হয়ে অসাধারণ লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করত। একদিন কৌতূহলী হয়ে এই শ্রেণীর একখানি নাটকের অভিনয় দেখবার জন্যে উপস্থিত হলুম "মনোমোহন থিয়েটারে"—আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (পরে দৈনিক "ভারতে"র সম্পাদক) ও আর একজন বন্ধু। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই অতি নিম্নশ্রেণীর নট-নটীদের অসহনীয় যথেচ্ছাচারে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ ক'রে প্রেক্ষাগারের বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। প্রভাত ভেবেছিলেন অন্যান্য দর্শকরা আমার বিরুদ্ধ সমালোচনায় ক্ষেপে গিয়ে চাঁচামেচি ও গালাগালি সুরু করবে! কিন্তু তারা সে সব কিছুই করলে না, —যেন আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে নীরবে পাথরের মূর্ত্তির মত ব'সে রইল! কিংবা আমার অভিযোগ ও নিন্দাবাদ হয়েছিল সকলেরই মনের মত, সুতরাং পরম উপভোগ্য!

চিত্তোত্তেজক নাটক, সাজপোষাকের ঝাঁকজমক এবং পানী থিয়েটার সুলভ চোখ-চমকানো দৃশ্যপট আর রকম-বেরকম মজমাজিক,—এই সবই ছিল তখন গ্যালারির দেবতাদের প্রধান রসের খোরাক।

আর ছিল গীতিনাট্যের চাহিদা। সে সবকে আসল গীতিনাট্য না ব'লে গীতিবহুল খেলোছাবাই বলা উচিত এবং তার মধ্যে থাকত প্রচুর নাচের রসান। বলাবাহুল্য তারা আত্মপ্রকাশ করত বিবিধ মজমাজিকেরই মাধ্যমে।

এমনি একটি গীতিনাট্য ছিল ক্ষীরোদপ্রসাদের "কিন্নরী"। যেমন খেলো সংলাপ, তেমনি বস্তা-পচা বিষয়বস্তু—কিন্তু একাধিক বৎসর ধ'রে এই দেখবার জন্যে রাত্রির পর রাত্রি প্রেক্ষাগৃহে তিলধারণের ঠাঁই থাকত না।

এই সময় থেকেই রঙ্গালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অর্থাৎ এতদিন আমার স্থান ছিল যবনিকার বাইরে প্রেক্ষাগৃহে, কিন্তু এখন যবনিকার পিছনে মঞ্চলোকের অন্দর মহলে যাবার অধিকার লাভ করলুম।

নাট্যজগতের স্মৃতির সেই কাহিনী আরম্ভ হয়ে আসছে বারে।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায়

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

কোন প্রাচীন পণ্ডিত বলিয়াছেন—সংসারূপ বিষবৃক্ষের দুটি মধুর ফল আছে, একটি কাব্যামৃতের রসাস্বাদ, অপরটি সজ্জনের সঙ্গলাভ। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, 'কাব্য' কথাটি প্রাচীন ভারতে ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইত, পরবর্তী কালে যখন 'সাহিত্য' কথাটির প্রচলন হয়, তখন হইতে 'কাব্য' ও 'সাহিত্য' সমার্থক হইয়া দাঁড়ায়।

কাব্যকে যিনি অমৃতের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, তিনি যে সজ্জন বা রসিক ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রসিক জন বাস্তবিকই পৃথিবীতে দুর্লভ এবং সেইজন্যই তিনি দুরূহ সৌভাগ্যের অধিকারী। শ্রীমধুসূদনও তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যসম্পর্কে বলিয়াছেন—

'গৌড়জন যাহে,
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

কাব্যপাঠের সময় বা কোন নাটকের অভিনয়-দর্শনের কালে আমাদের মনে ক্রোধ, শোক, ভয় প্রভৃতি ভাবের সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু কাব্যের জগৎ অলৌকিক জগৎ বলিয়া আমরা সাহিত্য-লোক হইতে শুধু অনির্বচনীয় আনন্দেরই আস্বাদন করিয়া থাকি।

সাহিত্য মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের সেতু রচনা করে। আমরা যখন সাহিত্য-লোকের অধিবাসী হই, তখন দেশ ও কালের বন্ধনকে অতিক্রম করি। এইজন্য সেকালের কালিদাস ও তৎসৃষ্টি এ কালের মানুষকেও আনন্দ দেয়, জার্মাণ মনীষী গোটে ভারতীয় মহাকবি ও নাট্যকারের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন, আর এ দেশের পাঠক মিল্টনের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সেক্‌স্‌পীয়ারের উদ্দেশে বলিয়া থাকেন—

'Sweetest Shakespeare! Fancy's child!
Warbling his native wood-notes wild.'

প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের একটা লক্ষণ এই যে, উহার প্রতিটি শব্দ সার্থক ও অপরিবর্তনীয়। পরিবর্তন করিতে গেলেই উহার কাব্যগুণের অপকর্ষ ঘটে। সেকালের আলঙ্কারিক কুন্তক ও একালের অনেক পাশ্চাত্য সমালোচক সাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনার মূলে যে দৈবী প্রেরণা থাকে, এ কথা স্বীকার করিতেই হয়।

কিন্তু সাহিত্য দেশকালের অতীত হইলেও প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক যুগের সাহিত্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে। যুগস্রষ্টা কবিগণও দেশ ও যুগের প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারেন না। কালিদাস কেন সফোক্লিস বা ইউরিপাইডিস হইলেন না কিংবা সেক্‌স্‌পীয়ার কেন শকুন্তলার ন্যায় নাটক রচনা করিলেন না, সে প্রশ্ন লইয়া কোন সজ্জন পাঠকই হয়তো মাথা ঘামাইবেন না। একই জাতির চিন্তাধারা বিভিন্ন যুগে পরিবর্তিত হয়, এই জন্যই দেখি, উনিশ বা বিশ শতকের বাঙালীর সঙ্গে মধ্যযুগের বাঙালীর চিন্তার অনেক বিষয়ে ঐক্য নাই, আবার প্রত্যেক জাতির জীবন-দর্শনে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যাহাতে

সে অপরাপর জাতি হইতে স্বতন্ত্র। যুগে-যুগে বিভিন্ন জাতি যোগ হয় বিধাতার বিশেষ অভিপ্রায়কে সার্থক করে। ইংরেজ কবি টেনিসন তাই বলিয়াছেন, 'God fulfils Himself in many ways.'

এইজন্যই সাহিত্য সম্পর্কে একটা উদার ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করিতে হইলে আমাদের দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতির সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। দেশ-বিদেশে পর্যটনের দ্বারা যেমন আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয় ও বিভিন্ন জাতির প্রতি শ্রদ্ধা-বোধ জাগ্রত হয়, তেমনই স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে আমাদের মনের মোহ-মুক্তি ও সংস্কার-মুক্তি ঘটে। আবার দেশ-পরিক্রমার ফলে অন্য জাতির কোন্ গুণাবলী আমাদের গ্রহণ বা অনুকরণের যোগ্য তাহা যেমন আমরা বুঝিতে পারি, তেমনি নানা জাতির সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটিলে আমরা স্বদেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি। যে মধুসূদন বাংলার কাব্য সাহিত্যে নব যুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, নানা ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার নিবিড় পরিচয় ছিল, তাই তিনি নানা দেশের কাব্যোদ্যানে প্রবেশ করিয়া নানা ফুল হইতে মধু আহরণ করিয়াছিলেন ও এক অপূর্ব মধুচক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন।

আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা যে সাহিত্যের জগৎকে মায়ার জগৎ বলিয়াছেন, সে কথা অনেকাংশে সত্য। কিন্তু কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তিগণ মায়াবাদী নহেন, মায়া-বিলাসী। কবিরা এই মায়ার জগৎ সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে বলা হয় 'প্রজাপতি'। আমরা যাহাকে কবি-প্রতিভা বলি, তাহাকে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি। সেক্সপীয়র বলেন, কবিরা কল্পনার বা দিব্য দৃষ্টির বলে এমন বস্তু রচনা করেন যাহা পৃথিবীর কোথাও নাই। সেইজন্যই যে শক্তির বলে কবিদের পক্ষে এই বাঙ্‌নির্মিতি সম্ভবপর হয়, তাহাকে বলা হয় 'অপূর্বনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'। বিধাতার সৃষ্ট জগতের ন্যায় কবির রচিত জগৎও আমাদের বিস্ময় জাগায়। কালিদাস-সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি আছে তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে মহাকবি কালিদাস কর্ণাটরাজের সভায় উপস্থিত হইলে তিনি কবিকে পশ্চাতে রাখিয়া উপবেশন করিলেন। মহাকবি তখন বলিলেন—

'পুরো বা পশ্চাদ্বা কচিদপি বসামঃ ক্ষিতিপতে,
তবা কা নো হানির্বচনরচনৈঃ ক্রীতজগতাম্'।

'হে মহারাজ, আমরা তোমার সম্মুখেই বসি, আর পশ্চাতেই বসি, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই, কারণ, আমরা বচন-রচনার দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি'।

এখানে 'বচন-রচন' কথাটির দ্বারা ইংরেজি 'ষ্টাইল' ও 'ডিক্‌শন' উভয়কেই বুঝাইতেছে। ষ্টাইলের মধ্য দিয়া কবি বা লেখকের ব্যক্তিসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, (এই জন্যই বলা হইয়াছে The style is the man), আর 'ডিক্‌শনের' মধ্যদিয়া তাঁহার শব্দচয়ন-কৌশলের নিদর্শন মেলে। শ্রেষ্ঠ কবি কখনো শব্দচিত্র (word-picture) অঙ্কিত করেন, কখনও বা শব্দ-সঙ্গীতের (word music) সৃষ্টি করেন। কবি যে বাক্য রচনা করেন, উহা রসাত্মক, আবার যে প্রেরণার বলে তাঁহারা রসের সৃষ্টি করেন, সেই প্রেরণার বলেই তাঁহাদের বাক্য হয় অলঙ্কারে সমৃদ্ধ। 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং' প্রাচীন আলঙ্কারিকদের এই সংজ্ঞাটি রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য এই রসবাদীদের সঙ্গে ধ্বনিবাদীদেরও কোনমৌলিক বিরোধ নাই। ধ্বনিবাদীরা বলেন, শ্রেষ্ঠ কাব্য মাত্রেই বাচ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া একটা গূঢ় অর্থ (suggested meaning) প্রাধান্য লাভ করে, সেখানে more is meant than meets the ear, কিন্তু একথাও তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে ধ্বনিমাত্রেই রসে পর্যবসান লাভ করে।

যাঁহারা রস-স্রষ্টা, তাঁহারা অবশ্য দার্শনিক নহেন কিন্তু জীবন ও জগৎসম্পর্কে তাঁহাদের একটা বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গি আছে যাহা তাঁহাদের সৃষ্টি-কর্মের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। শিশুর খেলার মত সাহিত্যিকের সাহিত্য-সৃষ্টিও আনন্দের প্রকাশমাত্র, ইহার কোন উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য নাই,—এ কথা একালের কোন মনস্বী ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না। যিনি Art for art's sake মতবাদের (তথা-কথিত কলাকৈবল্য-বাদের) প্রচারক, তিনিও উদ্দেশ্যবিহীন, তাৎপর্য্যবিহীন সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া শুধু আপন মনের খেয়ালকে চরিতার্থ করিয়াছেন, এমন কথা বলা চলেনা। মনস্বী জি. কে. চেষ্টার্টন বলেন—শ্রেষ্ঠ সাহিত্যমাত্রেই জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। উৎকৃষ্ট সাহিত্যের নজীর স্বরূপ তিনি হোমারের রচিত ইলিয়াড ও ওডিসি ও ওল্ড টেষ্টামেণ্টের অন্তর্গত বুক অব জবের উল্লেখ করিয়াছেন। ইলিয়াডের মহাকবি মানুষের জীবনটাকে দেখিয়াছেন বিরামহীন সংগ্রামরূপে, ওডিসির মহাকবি বলিতে চাহিয়াছেন, জীবনকে অপর একটি দৃষ্টি-কোণ হইতেও দেখা যায়, মানুষের জীবন যেন নয়-নং দেশ পরিক্রমা, আর বুক অব জবের রচয়িতার দৃষ্টিতে মানব-জীবন একটা সীমাহীন, দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

ভারতের একজন আলঙ্কারিক পণ্ডিত বলিয়াছেন—কাব্যের আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করি, অথচ সাহিত্য আমাদিগকে কান্তাসম্মিত উপদেশ প্রদান করে। কবি কখনও গুরু, আচার্য্য বা উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করেন না কিন্তু তিনি আনন্দ-পরিবেশনের মধ্য দিয়া আমাদিগকে কল্যাণের পথের নির্দ্দেশ দেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, কবি বা সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মধ্য দিয়াই লোক-কল্যাণে সাধন করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য শুধু আমাদিগকে সৌন্দর্য্য দেখাইয়া আমাদের চোখ ও মন ভোলায় না, আমাদিগকে শ্রেয়ের পথেরও নির্দ্দেশ দেয়। আবার সাহিত্যিক শিল্পসৃষ্টিকে অতিমাত্রায় ক্ষুণ্ণ না করিয়াও প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। ইব্‌সেন, বার্ণার্ড শ, গল্‌স্‌ওয়ার্দি প্রভৃতি নাট্যকারগণ ইহার নিদর্শন। (গল্‌স্‌ওয়ার্দি শুধু নাট্যকার নন, কথাসাহিত্যিকও বটেন)। এইজন্য রামায়ণ ও মহাভারত শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য হইয়াও ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র, একালের বঙ্কিমচন্দ্র বা কাউণ্ট লিও টলষ্টয় উপদেষ্টা হইয়াও শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। আবার রবীন্দ্রনাথের 'গোরায়' যখন পাই তাঁহার জীবন-দর্শন অথচ ইহা যে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। তবে সম্ভবত, 'শেষ প্রশ্নে' শিল্পী শরৎচন্দ্র প্রচারক শরৎচন্দ্রের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছেন।

কোন প্রাচীন পণ্ডিত বলিয়াছেন, সংসারে নরত্ব দুর্লভ, বিদ্যা সুদুর্লভ, কবিত্ব দুর্লভ আর কবিত্ব-শক্তি সুদুর্লভ। সংসারে কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যাই অল্প আর এই কাব্যরসজ্ঞতার সঙ্গে মনীষার অধিকারন-সংযোগ কচিৎ দেখা যায়। এই সংযোগ যাঁহাদের মধ্যে ঘটে, তাঁহারাই যথার্থ সমালোচক হইবার অধিকারী। যথার্থ সমালোচনা শুধু দোষগুণের বিশ্লেষণ মাত্র নয়, ইহা এক প্রকার নূতন সৃষ্টি। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা রস, ধ্বনি, দোষ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার প্রভৃতির বিচারে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কাব্য-বিচারে একটা অখণ্ড সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় দেন নাই। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে একটা সামগ্রিক রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকে সাহিত্যস্রষ্টার বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গিমা (style), শব্দচয়ন (diction), উপমাপ্রয়োগ প্রভৃতির আলোকে তাঁহার ব্যক্তি-সত্তার (personality) আবিষ্কার করিয়াছেন। এই নব সমালোচনা কবি-কৃতির উপর নব-নব আলোকপাত করিয়াছে।

পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, সাহিত্য-চর্চ্চা ভিন্ন আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, পাত্রীবর্গ, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী ও

চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনই মনুষ্যত্ব-লাভের উপায়। দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনা পাঠে এই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বিকশিত হয়, আমাদের হৃদয় উদার ও প্রশস্ত হয়, আমাদের মনন-শক্তি জাগ্রত হয়। কিন্তু যিনি শুধু প্রাচীন বা শুধু আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত, তিনি হন একদেশদর্শী। অথচ সাহিত্যসিন্ধু অনন্ত-পার, 'অল্পং তথাবহুবশ্চ বিঘ্নাঃ'। একেই তো 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি', তাহার উপর আবার বর্ত্তমান যুগে আমাদের প্রায় সকলেরই জীবন নানা সমস্যায় কণ্টকিত। তাই গল্প-ভারতীর 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' বিভাগ রস পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ নিয়মিত আলোচনা করার ভার গ্রহণ করিয়াছে ও সাহিত্যের এই রসপিপাসায় সকলকে সাদর আহ্বান জানাইতেছে। আমি যাহা বলিলাম, তাহা সেই আলোচনারই মুখবন্ধ মাত্র।

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম অভ্যুদয়কালে শিক্ষিত বাঙ্গালী নিজের জাতিকে বড় হীন বলিয়া মনে করিতেন। ইউরোপীয়দের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করিয়া সর্ব্বদাই মাথা হেঁট করিয়া থাকিতেন। তখনও সাক্ষাৎভাবে তাঁহারা ইউরোপের কোনও জ্ঞানলাভ করেন নাই। ইংরাজী ও ইউরোপীয় সাহিত্য-সৃষ্টির সাহায্যেই সেকালে তাঁহাদের ইউরোপের মনুষ্যত্বের এবং ইউরোপীয় সমাজের যা-কিছু জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। ইউরোপের এই ছবির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী অন্তরে অন্তরে আত্মগ্লানি অনুভব করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম তিনখানি উপন্যাসে দেশের চিত্রপটেও যে ইউরোপের সাহিত্য-সৃষ্টির মতন উৎকৃষ্ট রসমূর্ত্তি গড়িয়া তোলা সম্ভব, ইহা দেখাইয়া বাঙ্গালীর অন্তরের এই আত্মগ্লানিটা নষ্ট করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনী সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই একটা অতি বড় কাজ করিয়াছিলেন। আর কোনও কিছু না করিলেও এই তিনখানি উপন্যাসের দ্বারা তিনি বাংলার নবযুগের ইতিহাসে একটা স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া থাকিতেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ,—সকলেরই যে যথাযোগ্য পথে আত্ম-চরিতার্থতা সাধনের অধিকার আছে, এই তিনখানি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী সমাজে এই সত্যটা পরোক্ষভাবে প্রচার করেন।

—বিপিনচন্দ্র পাল

এই প্রসঙ্গে পড়ুন এই সংখ্যায় প্রকাশিত—

'বাংলা উপন্যাসের সূচনা'

সময়টা ভাদ্র মাস। উনিশ'শো' ত্রিশ সাল।

মিজর উৎসবের আর দিন দশেক বাকি। এরই মধ্যে চাষা সহরে বিরাট চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেছে। বিখ্যাত ময়দান চোগানের একপাশে যেন গা ঝাড়া দিয়ে মেলা বসেছে। বিরাট মেলা।

মেহলা, ছিৎরারী, মনিমহেশ গা থেকে তাঁতে-তৈরী নক্সা-কাটা শাল আর খেস্ এসেছে। নাকউচু সমাজেও এ দুটির আদর যথেষ্ট। চৌরীখাস, চৌরাসী গাঁয়ের লোকেরা রূপোর গয়না বানাতে ওস্তাদ। এক একটি ঢালে চাউল হয়ে আছে অলংকারগুলি। ডড্‌মালা, শাংকলি শাত্‌রু, টোকে, কাঙ্কণ। ঠিকমতো সাজানো হয়নি এখনো। আরসা নিয়ে দুই ওস্তাদ হনুমাইর বিরোধ হয়েছিলো। এখন সোলমাল মিটে গেছে। পরস্পর বাঁশ আর দড়ি ধরে ওরা দোকান বানাবার সাহায্য করলো। লাল-নীল কাগজ কাটলো একজন, একজন আঠা লাগালো। ওরা এসেছে কিলার আর কালহেন্ গাঁ থেকে। দোকান বেঁধে ছেঁদে ঠিক ক'রে রেখে গেলো। এখন দোকান খুলবেনা। উৎসবের আগের দিন থেকে শুরু হবে ওদের পোটাওা আর পুরা বানানো। বেশ ভাল বানায়। স্বাদেও ভাল, আকারেও ভাল। মুড়ি মুড়ি পোটাওা (বিরাট কটি বা বিরাট তাওয়ার ওপর বানানো হয়) কড়াই কড়াই পুরা (মালপোয়া) ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিঃশেষ হয়।

আর তিনা গাঁ থেকে আসবে নাচের দল, গানের দল। আর দিন দুই তিন বাদেই তারা এসে জাঁকিয়ে বসবে। আর হবে মোষের লড়াই। পুরা মজা চষিআলাদের।

দুপুর শুরু হয়েছে সবে। রোদের তেমন তেজ নেই, ঝিকি মিকি আছে। আকাশের চেহারা ভাল নয়। চৌরীখাস গাঁয়ের ছলির (ভুট্টার। ক্ষেতগুলির পাশ দিয়ে বাঁধাতি যে আঁকাবাঁকা কাঁচা সড়কটা গেছে, একটা ঠেলাগাড়িকে সে পথে আসতে দেখা গেলো। ঠেলাগাড়ির চালক একটি বছর আঠারো বয়েসের যুবক। ঠেলার ওপর কতগুলি টিন কতগুলি কাঠের খুটি আর ঘরের ছাদ বানানোর স্লেট অনেকগুলি। ঠেলাগাড়ি গড়গড়িয়ে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ থেমে গেলো। একটা গড়ানে পাথরের চাইতে ধাক্কা লেগেছে। যুবকটি ঠেলা নামিয়ে জিরোতে লাগলো একটু। রাস্তাটা চড়াই শুরু হয়েছে আধমাইলটাক আগে থেকে, আর ঠেলাতে বোঝাও নেহাৎ কম নয়। খিল্ খিল্ ক'রে হাসতে হাসতে একটি পাহাড়ী মেয়ে এগিয়ে এলো। বয়সে চোদ্দ-পনেরোর বেশি নয়। কিন্তু যৌবন ওকে এরি মধ্যে রাণী করে দিয়েছে। যেমন রূপ, তেম্‌নি যৌবন, যে কেউ ওর দিকে কিছুক্ষণ না তাকিয়ে পারবেনা। পিঠে এক কিস্তা (তিন কোনা ঝুড়ি) বোঝাই ছলি। একটা ছলি (ভুট্টা) খেতে খেতে হাসির তরঙ্গ তুলে চলে এলো মেয়েটি, এক নজর ঠেলার ওপরের জিনিষগুলো দেখে নিয়ে বললো, "আরে ওলাবা, মেলেতে এই সব রদ্দিমাল নিয়ে যাচ্ছিস, তোদের চৌরাসী গাঁয়ের স্যাকরাগুলো মরে গেছে বুঝি ?"

ওলাবা মেয়েটির গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো। হেসে হেসে বললো, "আমরা ওসব ছোটো

আমোদে মাতিনা। পরিল গাঁয়ের অনেক বাড়ি ডুবে গেছে, আমরা সেখানে ঘর বানাতে যাচ্ছি।" মেয়েটি তার লাল টকটকে গাল ফুলিয়ে ঠোঁটটা একটু বেঁকিয়ে বললো, "রাখ রাখ, ক'দিন পর্দার চেলাগিরি ক'রেই এই,—তোদের সর্দারকে একদিন—"মেয়েটি কথা শেষ না করেই থেমে গেলো, দেখলো গুলাবা বিশ্রীভাবে ওর শরীরের দিকে চেয়ে আছে। ফোঁস ফোঁস ক'রে কয়েকটা জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে মেয়েটি বললো, "যা—যা বড় কাজে যা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে মেয়েদের সঙ্গে আর গল্প মারতে হবে না—"

গুলাবা চোখ না সরিয়ে আরো একটু ঘন ক'রেই—তাকালো, "ফুলমু শোন্! এবার মেলাতে তোকে একটা—"

ফুঃ—ক'রে মুখে একটা শব্দ ক'রে ফুলমু এক চকর ঘুরে নিলো। তারপর ছলিতে এক কামড় দিয়ে খেতে খেতে বললো, "যা আর দেরী করিস না, বাদল হবে।"

গুলাবা ক্ষুণ্ণ হয়ে ঠেলাগাড়িতে হাত লাগালো। ঠেলতে গিয়েই সেই পাথরের চাঁইতে ধাক্কা খেয়ে সামনে দিকে এগিয়ে এলো গাড়িটা। পাথরটার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলো, না হ'লে গাড়িটা পাশে সরিয়ে নিতো। মেয়েটির আবার সেই খিল খিল হাসি, "তুই কেমন জোয়ান রে গুলাবা, যা, এসব বড় কাজ ছেড়ে মা'র কোলে ব'সে থাকবি যা—।" গুলাবা এবার ক্ষেপে গেলো, গলা চড়িয়ে বললো, "গুরুর বিটি, মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই, খুব যে লম্বা লম্বা বুকনি ঝাড়ছিস! দেখ গে যা, তোর বাপুকে পঞ্চায়েত ডেকেছে"—রাগের ঠেলায় ঠেলা সরিয়ে নিতে আবারও ভুলে গেলো গুলাবা। যত জোরে ঠেলাগাড়ি ঠেললো ঠিক তত জোরেই ফিরে এলো ওর দিকে।

ফুলমু ডানে বাঁয়ে ঘাড় দুলিয়ে আবার হি-হি করে হেসে নিলো একটু, বললো, "ভাগৎ নেই একফোঁটা, রাগ আছে এক জালা"—গুলাবা মাথা ঝাঁকিয়ে চোখে বিজ্রূপের বান ছুড়লো, "না, ভাগৎ নেই। তাই আষাঢ়টায় একবোঝা মাল নিয়ে চৌরাসী গাঁ থেকে চৌরীখাস গাঁতে এসে পৌঁছোলাম—" ঠেলাগাড়িটাকে এক ঝট্‌কায় পথের পাশে টেনে নিয়ে ওপর দিকে তুলতে তুলতে বললো, "যা, ছলি খাওয়া বাদ দিয়ে মেহলা গাঁয়ে গিয়ে দেখ গে তোর বাপুকে নিয়ে কেমন রঙ্গ হচ্ছে। উঃ, পরের বউ নিয়ে ঘরকরার সখ! পেটের বাচ্চার দাম দেবেনা, শুধু বউর দাম দিলেই হবে, সখ কত···, অমন সখ" ···কথা শেষ হবার আগেই ফুলমু ছুটে এসে যথাশক্তি দিয়ে গুলাবার ডান গালে ঠাস্ ক'রে চড় বসিয়ে দিলো।

মেহলা গাঁয়ের চাষী গুরু ফুলমুর বাবা। মাসখানেক হলো ফুলমু আর তার মাকে তাড়িয়ে দিয়ে গুরু তার দোস্ত হনসুরাজের বউ নিয়ে ঘর বেঁধেছে। এ সব আকছার হচ্ছে এবং হয় পাহাড়ীদের মধ্যে। এ রেওয়াজ ও দেশে আছে। কারুর বউ নিয়ে পালিয়ে ওদের অন্য দেশে চলে যেতে হয়না, নাম-ধামও পাল্টাতে হয়না। দিব্যি সমাজের নাকের ওপরই বাস করে ওরা। যার বউ তার সঙ্গে টাকা পয়সার একটা রফা করে, তারপর সেই দাম ধরে দিয়ে তার বউ নিয়ে চলে আসে। তবে বউর পেটে যদি বাচ্চা থাকে, তবে সে আরো অনেক বেশি দামী। যে টাকার রফা হলো, তার দুগুণ দিতে হবে,—একটা তার বৌয়ের বাবদ আর একটা তার যে বাচ্চা বৌয়ের পেটে আছে তার বাবদ।

ওদিকে প্রয়াগা, হনসুরাজের বউ, গুরুর উতল প্রেমাবেগে বিহ্বল হয়ে বুদ্ধি দিলো গুরুকে,—"আর দেরী করা যায়না, তুমি চারবিশ টাকা দিয়ে নিয়ে চলো আমাকে তোমার ঘরে।"

"—কিন্তু হনসুরাজের বাচ্চার দাম যে বোসাড় হল নি প্রয়াগা—।"

"—তোমার এত ভয় কেন?" শুক্র কানের কাছে মুখ এনে অনেকক্ষণ ফিসফিস ক'রে কি যেন বললো প্রয়াগা। শুক্র হেসে ফেলে বললো, "সেকি! আর কেউ না জানালেও হন্‌সুরাজ তো জানে, ওই তো আমাকে তোমার শরীর খারাপের কথা আগে জানিয়ে ছিলো—"

প্রয়াগা ঠোঁটটিপে হেসে বললো,

"তা হোক্, ও আমি সামলে নেব। বলবো যে তোমার সাথে তামাসা করছিলাম···"

"পাগল!—" শুক্র বললো, "ক্ষেতের ফসল আর পেটের ছেলে— সময় যখন হবে তখন হবেই, ও কি ছাপানো যায়, জানাজানি হবেই। তখন পঞ্চায়েতীর কাছে গিয়ে মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে দাঁড়াতে হবে।"

"না গো না—" চাপা ভৎর্সনা ক'রে উঠলো প্রয়াগা, "সে আমি বুঝবো, লছমীর সাত মাসে বেটা হলোনা? সরণুর আটমাসে বেটি হলোনা? আমার না হয় ছ'মাসে হবে। আমি দাদির কাছে শুনেছি তার দু দুটো বাচ্চা ছ'মাসে হয়েছিলো।"

পঞ্চায়েতের সামনে মাটিতে মাথা প্রায় ঠেকিয়ে শুক্র রাগে ফুলছিলো: একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি! ছমাসের জায়গায় তিনমাস বাদেই বাচ্চা বিইয়ে দিলো। এমন কে বুদ্ধু আছে যে এমন নওকা হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবে। হন্‌সুরাজের কুতকুতে চোখের হাসি দেখেই বুঝেছে, তিনমাস ধরে ও এরই অপেক্ষায় ছিলো। পঞ্চায়েত রায় দিলো, হন্‌সুরাজের ওপর এমন অবিচার করেছো যখন, তখন তোমার জরিমানা নিয়ে মোট সাত বিশ টাকা দিতে হবে। নাও ঠেলা! অত টাকা এখন চাষী শুক্র পাবে কোথায়? দাদ (বলদ) আর বকরী সব বিকে দেবো তাহলে? তাহলে খাব কী? প্রয়াগা তাহলে থোড়াই থাকবে ওর কাছে। শুক্র সারা পৃথিবী অন্ধকার দেখলো।

ফুলমুর তার বাবার ওপর রাগ কম নয়, মনে মনে বাপুকে সে বেইমান বলে। এই তো সেদিন মিঠে মিঠে কথা বলে, একটা দাদ কেনার নাম করে মার সব গয়না গোটনা বেঁধে নিয়ে গেলো। তার তিনদিন পরে ঐ পাজি প্রয়াগাকে ঘরে এনে ওদের দিল তাড়িয়ে। মার ওপরও ফুলমুর অনেক রাগ, রূপ আছে এক কৌটা বুদ্ধি নেই। এতদিনের ঘর বাড়ি হট্ করে ছেড়ে আসে কেউ। কী সুন্দর ছবির মতো ওদের মেহলা গ্রামটা। চারপাশে সবুজের সমুদ্র। ওদের বাড়িখানাও বেশ ছিলো। নিজের হাতে লাগানো কতবড় কাঁকড়ির (খসা) ক্ষেতটা! ওদের বাড়ির সামনের সড়কটা সংকীর্ণ। সে আর কতটুকু। চার পা গেলেই সেই সরুপথ ছুঁয়েছে বড় সড়কে। বড় সড়কের দুপাশে শিমুল গাছের সারি। তাদের ঝিলিমিলি ছায়ার তলা দিয়ে ফুলমু চরাতে নিয়ে যেতো বকরী গুলোকে আর তার প্রিয় ভ্যাসুকে (মহিষ)।

উত্তর-পূর্ব দিকের পথ ধরে এগিয়ে যেতো ফুলমু, আলুর ক্ষেতের ধার দিয়ে, সোনালী গমক্ষেতের পাশ দিয়ে। ফসল মাড়াই করতে করতে, আলু খুঁড়ে তুলতে তুলতে বুড়ো চাষারা, জোয়ান চাষারা সবাই ওর দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকতো। জোয়ানরা শিষ দিতো, মাঝে মাঝে পুরুষ গানার দু একটা কলিও গাইতো, তাতে রাগ হতোনা ফুলমুর। যেন একটা হাল্কা মজা, হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিতো ও। কিন্তু বুড়োগুলোর চোখগুলো কী! বাবারে! যেন ওর চোলি (কামিজ), চাদর, (গলা থেকে পা পর্যন্ত-সামনে দিকের চাকা পোষাকটা) আর চাদান (পাজামা) জোর করে ওর শরীরের ভাঁজে ভাঁজে ওদের চাউনিগুলি কিলবিলিয়ে উঠছে। দুর্গান্ত ফুলমুর ভেতরের মেয়েটা একটু যেন অসোয়াস্তি বোধ

করতো। তারপর যেই কিন্নর গাছের ঝোপ দেখা দিতো, দেখা দিতো বিষুল গাছের সারি, ফুলমুর মনটা খুসিতে হাততালি দিয়ে উঠতো। মহানন্দে ভ্যাদা আর বকরীগুলিকে ছেড়ে দিয়ে ও একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে পড়তো। কোনো কোনো দিন ও আর একটু এগিয়ে, আর একটু চড়াই ভেঙে ছোটো পাহাড়টার মাথায় গিয়ে উঠতো। কিন্নর গাছ কি বিষুলগাছ কিম্বা গরণাগাছ কি খেড়াব্ গাছ—যা ছাগল —ভেড়া, গরু মহিষের প্রিয় খাদ্য, সে সব গাছ ও পাহাড়ের মাথায় বিশেষ নেই, কিন্তু আছে একটা সুন্দর শান্ত পাহাড়ী কুকর (হ্রদ)। সেই কুকরের আকর্ষণে যেতো ফুলমু। কালো জল টল টল করছে। এমন চোখ জুড়োনো জল ওখানে, ওর মধ্যে ওর ভারি নেমে যেতে ইচ্ছে করতো। একদিন টল টলে কুকরের জলে নেমে অনেকক্ষণ সাতার কেটে তারপর বাড়ি ফিরেছিলো ফুলমু। সেদিন বাবা ওকে চাটিয়েছিলো, মা অনেক গালমন্দ করেছিলো। তারপরও, ও, মাঝে মাঝেই ঐ পাহাড়টার মাথায় যেতো। জলে আর নামেনি কোনোদিন। চুপচাপ জলের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতো। অবশ্য, মার বকুনির ভয়ে কিম্বা বাবার চাঁটানোর ভয়ে ঐ চোখজুড়োনো—জলে যে ও আর নামেনি তা নয়, সেদিন ভিজে লেপটানো পোষাকে দীর্ঘ পথটা পার হয়ে আসতে আসতে ওর নারীসত্তা ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলো : ফুলমু, তুমি বড় হয়েছো।

বড় হওয়া ভাল না খারাপ, এ নিয়ে ছেলেমানুষ ফুলমু সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত মাথা ঘামিয়েছিলো বিছানায় শুয়ে শুয়ে, কিন্তু ঠিক উত্তরটা মেলেনি। তার ক'দিন আগে জিতিয়ার সঙ্গে কোস্তাকুস্তি করতে গিয়ে কী কাণ্ডটাই না হলো! বাঁই (কুয়ো) থেকে ঘড়া করে দুজনেই জল আনছিলো, ও আর পাশের বাড়ির জিতিয়া—। বাড়ির অর্দ্ধেক রাস্তা এসে ঘড়াটাকে হাত বদল ক'রে হাঁফ হাঁফ করে দুবার জোরে জোরে শ্বাস নিয়েছিলো জিতিয়া, ফুলমু তো হেসে কুটিপাটি। হাসি থামিয়ে বাঁ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো,—দে জিতিয়া, তোর ঘড়াটাও আমার হাতে দে, আজ থেকে দো চারটে রুটি আরো বেশি ক'রে খাস···। ঘড়া অবশ্য দেয়নি জিতিয়া, কিন্তু তারপরই বাড়ি এসে ঘড়া রেখে শক্তি নিয়ে ঝগড়া লেগে গেলো দুজনের মধ্যে। দুটো গধ্যা (আখ) বাজি রেখে দুজনের মধ্যে কোস্তাকুস্তি শুরু হয়ে গেলো। যে আগে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার ওপর চেপে বসবে তার জিৎ। ফুলমু জেদের বশে রাজি হয়েছিলো বটে, কিন্তু মনে মনে ভেবেছিলো ওর পরাজয় সুনিশ্চিত। জিতিয়া অর্থাৎ জিৎরাম, হাজার হলেও মরদ, আর বেশ তাগড়া ; তাছাড়া বয়েসেও ওর চেয়ে বড়। কিন্তু মিনিট পাঁচেকের আগেই যখন জিতিয়া মাটিতে শুয়ে পড়লো তখন ফুলমু একেবারে আহ্লাদে গদগদ। বুকের ওপর চেপে বসে দুহাত দিয়ে জিৎরামের দু কাঁধ চেপে ধরে ও হাঁফাতে হাঁফাতে বললো,—জিতিয়া, তুই মান্‌লে, তুই হেরে গেলি—।

জিৎরাম নিপাট ভালছেলের মতো মুখ করে বললো,—আমি হেরে গেলাম ফুলমু—। যেই ফুলমু জিতিয়ার দু কাঁধ থেকে দুহাত সরিয়েছে, অমনি জিতিয়া দু হাত বাড়িয়ে বুকে চেপে ধরেছে ফুলমুকে। ফুলমুতো অবাক !—কিরে ! কির লড়াই করতে চাস নাকি জিতিয়া ?—না রে ফুলমু, আমি পুরা হার মানছি।

: তবে ছাড়েনা কেন ? মুহূর্ত্ত দুই পরে ফুলমু টের পেলো—কোস্তাকুস্তির ঠেলায় ওর চোয়ির (কামিজের) পিঠটা একেবারে ছিঁড়ে গেছে, আর ওর অনাবৃত পিঠটায় কি ভয়ানক ভাবে হাত বোলাচ্ছে জিতিয়া। ওর রক্তস্রোতে কেমন যেন একটা শিরশিরানি শুরু হয়েছে।

—ছাড় জিতিয়া, ফুলমু চেঁচিয়ে উঠলো। জিতিয়া ছাড়লো না, ফুলমুকে আরো জোরে চেপে

ধরলো বুকের ওপর। এক ঝট্‌কায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, ফুল্‌মু। জিতিয়াও তুমি শয্যা ছেড়ে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালো।

—একটা লেড়কির কাছে তুই মরদ হ'য়ে হেরে গেলি, তোর সরম নেই? আবার হাসি লাগিয়েছিস?

—সময় সময় হারলে বেশি খুস্ লাগে—বুঝলি ফুল্‌মু, ফুল্‌মুর অনাবৃত পিঠের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে জবাব দিলো জিতিয়া।

জিতিয়ার চোখের দৃষ্টি নজর ক'রে ফুল্‌মুর লাল গাল দুটো আরো একটু লাল হলো, —তুই একটা আস্ত বেল (বলদ), লাল দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকলো ফুল্‌মু। তারপর নিজের বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ চুপে চুপে কেঁদেছিলো কেন তা ও নিজেই জানেনা।

: বড় হওয়া ভাল না খারাপ—এই সমস্যা নিয়ে যেদিন ও অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছিলো, সেদিন এই ঘটনাটা আবার ওর মনে পড়ে গিয়েছিলো, একটা নিশ্বাস ফেলে অনেকবার এপাশ ওপাশ করেছিলো ও, কোনো মীমাংসা হয়নি।

সকালে ফুল্‌মুর মা চন্দর জিগ্যেস করলো, "তোর শরীর খারাপ হয়েছে নাকি? কাল গোটা রাত এপাশ ওপাশ করছিলি কেন?"

ফুল্‌মু জবাব দিলো, "না, শরীর আমার ঠিক আছে।"

"তবে?"

ঘুম আসছিলো না—এ কথা বলতে এই প্রথম মুখে আটকালো ফুল্‌মুর, এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললো, "আম্মা, আমার বিছানায় ভীষণ মাঙন্ (ছারপোকা) হয়েছে"—

"তবে ঝট্‌পট্ বিছানা তুলে রোদে দিয়ে দে আজ খুব রোদ বেরিয়েছে—"

"দিচ্ছি একটু পরে—"মাকে তখনকার মত ফাঁকি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে কাঁকড়ির (শসা) ক্ষেতে গিয়ে ঢুকলো ফুল্‌মু। এই শসাক্ষেত ওর নিজের হাতে তৈরী। খুব ছোটো ক্ষেত নয়। বেশ বড় বিস্তীর্ণ ক্ষেত। সময় পেলেই শসা ক্ষেতের পেছনে খাটে ফুল্‌মু।

ওর সেই ক্ষেত, ওর সেই বাড়ি, ওর অতি প্রিয় মেহলা গাঁ, আদরের ভ্যাস, বকরী—সব ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে মা'র বুয়ার (পিসির) কাছে, এই চৌরীখাল গাঁওতে। ঘর নেই, দুয়ার নেই, নিজেদের কোনো ক্ষেত খামার কিছু নেই; থাকার মধ্যে আছ মা'র বুয়া ঐ হাঁপানী বুড়িটা আর মাথা গুঁজবার একটা ঠেকা দেয়া ঘর। আর আছে কুঁকড়ো-কুঁকড়ি কয়েক জোড়া আর কয়েক জোড়া বতক্। ঐ হাঁস-মুরগির ডিম বেচে বুড়ি তার রুটির সংস্থান ক'রে। আম্মা গালাগালি দিলে কি হবে, ঘরে একদণ্ড থাকে না ফুল্‌মু। সারাদিন এখানে ওখানে চৌ-চৌ করে। রাত্রিবেলা ভাঙাঘরের এককোনায় শুয়ে বুড়ির খকর খকর কাশী শোনে আর প্রাণভরে বাপুকে গালাগালি দেয়। তারপর কখন একসময় ঘুমিয়ে প'ড়ে।

ও ওর বাপকে গালাগালিই দিক্ আর শাপ-শাপান্তই করুক তা ব'লে চৌরাসী গাঁয়ের ওলাবা (খের মাঝখানে ওর বাপুকে যা খুশি তাই বলবে নাকি!

ওলাবার নাম্বর বাড়ি (দারোগার বাড়ি) মেহলা গ্রামে, সেজন্য ওরা দুজনেই দুজনকে চেনে।

এত জোরে চড় মারলো ফুল্‌মু ওলাবার করণা গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেলো।

"দাড়া ফুলমু, মজা দেখাচ্ছি—"ঠেলাগাড়ি ছেড়ে দিয়ে গুলাবা লাফিয়ে এসে ফুলমুকে জাপটে ধরলো। ঠিক এমনি করে জাপটে ধরেছিলো ঝিতিয়া। এক হ্যাচকায় নিজেকে সরিয়ে নিয়ে একটু দূরে দাড়িয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে নিশ্বাস ফেলতে লাগলো ফুলমু। কিন্তু গুলাবার মজা দেখানো তখন তো শুরু মাত্র, আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুলমুর হাত ধরে টান লাগিয়েছে সবে—পেছন থেকে গম্ভীর রাশি গলায় আওয়াজ এলো, "গুলাবা!"

যেন যাদু। চোখের মুখের চেহারা একেবারে শান্ত ক'রে চোখ নামিয়ে গুলাবা ঠেলাগাড়ির পাশে চলে এলো। পর্মার দিকে তাকাতে পারছেনা। মনে মনে ভাবতে লাগলো,—এত মাল নিয়ে আর এত বড় ঠেলা নিয়ে এত তাড়াতাড়ি তো সর্দারের এসে পৌঁছোনোর কথা নয়!

পর্মার চালাকের কতগুলো কানুন মানতে হয়। ও আজ কানুনের বাইরে কাজ করে ফেলেছে, জাপটে ধরেছে ফুলমুকে, সর্দারের শিকারী চোখ তা কি আর দেখেনি,—এখন এর জন্য কি শাস্তি নিতে হবে কে জানে!

"গুলাবসিং! কি হয়েছিলো?" পর্মার কথায় গুলাবা বুঝলো, সর্দার যখন পুরো নাম ডেকেছে, —এ যাত্রা আর রক্ষে নেই। ঘাবড়ে গিয়ে ও আরো বোকামী ক'রে বসলো। মুখ কাঁচু-মাচু ক'রে বললো,

"দেখো সর্দার, পথ দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম, শুধু শুধু ও লাফিয়ে এসে আমার গালে কেমন চড় মেরেছে দেখো"—পর্মার একেবারে সামনে এসে গুলাবা তার ডান গালটা ঘুরিয়ে দেখালো।

সর্দার পরমরাজের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিলো ফুলমু: এই পর্মা! এই পরমরাজ! চৌরীঘাস আর চৌরাসী গাঁয়ের সর্দার! সারা চাষার জোয়ানরা যার নামে পাগল। যার সঙ্গে লাঠিতে, ঘোড়-সোয়ারীতে, বন্দুকের চাঁদমারীতে কেউ এঁটে উঠতে পারেনা! ও ভেবেছিলো, এতগুলো জোয়ানের যে সর্দার তার চেহারা নিশ্চই ষণ্ডা-গুণ্ডার মতো হবে কিন্তু এ যে একেবারে অন্যরকম। সতেজ দীর্ঘছন্দ সুন্দর চেহারা। যদিও মেহলা গাঁয়ের সেরা রূপসী ফুলমুকে ও পাত্তাই দিচ্ছেনা, এতক্ষণের মধ্যে একবার একনজর তাকালোনা পর্যন্ত, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায়না। পর্মা যে ষণ্ডা-গুণ্ডা নয়, একজন পরম রূপবান স্বাস্থ্যবান যুবক—তাতেই ও খুশি।

গুলাবা যখন এগিয়ে গিয়ে গালে চড়ের দাগ দেখালো, তখন পর্মার মুখের কঠিন চেহারা আর চোখের আগুন দেখে দূরে দাঁড়ানো ফুলমুও ভয় পেয়ে গেলো।

পরমরাজ নিজের দুরন্ত ক্রোধটাকে প্রাণপণে সামলাবার চেষ্টা করছিলো,—একটা মেয়েকীর হাতে চড় খেয়ে, ইনিয়ে বিনিয়ে নালিশ জানাতে আসে, সে কিনা একটা জোয়ান মরদ, সে কিনা পরমরাজের চেলা। বুনো ক্রোধটার গলায় শেকল পরাতে সময় লাগলো একটু, তারপর সেই আগের গলা,

"গুলাব সিং, তুমি ঠেলা ছেড়ে যাও, নইলে তোমার যাওয়া হবে না। তুমি চৌরাসীতে গিয়ে মদনরাজকে পাঠিয়ে দাও দে। বলে দিও সোজা যেন পরিলে চলে যায় ·····।"

গুলাবা মাটির দিকে চোখ রেখে বললো, "মদনরাজের তো বোঝার—"

"তা হোক্, তুমি ফিরে যাও—"

দাঁড়িয়ে থাকবার আর সাহস নেই গুলাব সিংএর। পেছন ফিরে তৎক্ষণাৎ হাঁটা দিলো।

এতক্ষণ পর পরমরাজ তাকালো ফুলমুর দিকে। পর্মার কঠিন অলস্ত চোখে যেন বিস্ময়ের

ঘোর লাগলো। সন্ধানীদৃষ্টিতে ফুলমুর মাথা থেকে পা পর্যন্ত বার তিনেক দেখে নিয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কে ?"

"আমি মেহ্‌লা গ্রামের ফুলমু।" ফুলমু জবাব দিলো।

"চৌরীখাস-এ বেড়াতে এসেছো বুঝি ? এ গাঁয়ে তোমার কে আছে ?"

"না। বেড়াতে আসিনি। এ গ্রামেই থাকবো আমরা এখন থেকে। শনিচারি নানীর বাড়িতে আমি আর আমার মা আছি—"

"ও—" পর্মা বোধ হয় ওদের ব্যাপারটা কিছুটা আঁচ করলো, বললো, তা বেশ, কিন্তু গুলাবাকে তুমি চড় মেরেছো কেন ?"

"অন্যায় করেছিলো তাই মেরেছি—"

"কি অন্যায় করেছিলো ?"

"বল্‌বোনা—"

"হুঁ—" আর একবার ফুলমুর আপাদমস্তক তাকিয়ে নিলো পর্মা, বললো "তোমার শনিচারি নানীর কাছ থেকে জেনে নিও—এ গাঁয়ে বাস করতে হলে আমার অবাধ্য হয়ে বাস করা যায় না—"

"অবাধ্য হলে ?" ফুলমু খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে তার অর্ধেক খাওয়া ভুট্টাতে এক কামড় বসালো। ফুলমুর সটান নির্ভীক শরীরটার আড়ালে তার শিশুমনটাকে এবার দেখে ফেললো পর্মা। ওর কঠিন ভঙ্গি কোমল হলো একটু। একটুখানি হেসেও ফেললো। হাসিমুখে আবার জিজ্ঞেস করলো, "কি করেছিলো গুলাবা ?"

ডানে বাঁয়ে মাথা দুলিয়ে ফুলমু বললো, "গাজ্ঞা (ঠেলাগাড়ি) ঠেলতে পারছিলোনা একটা জোয়ান মরদ হ'য়ে, আমি হাসছিলাম,—আমার বাপুর কথা তুলে ঠাট্টা করলো আমার, তাই মার দিয়েছি—"

হঠাৎ পরমরাজের আবার রাগ চড়ে গেলো, কণ্ঠস্বর একপর্দা তুলে বললো, "তুমিও তো কম জোয়ান নও দেখছি, পারবে তুমি এই গাজ্ঞা ঠেলতে ?"

"খু-ব—" মুখ বাঁকিয়ে শাংবুলি শাতরু (কানের গয়না) দুলিয়ে জবাব দিলো ফুলমু।

"বেশি, সামনের ঐ ফুলেয়ার গাছের ঝোপ পর্যন্ত গাজ্ঞাটা নিয়ে যাও তো—" ভুরু কুঁচকে পর্মা বললো।

ফুলমু হাতের ভুট্টাটা ছুঁড়ে ফেলে মাজানটা (কোমর বন্ধনী) খুলে একটু ক'ষে বেঁধে নিলো তারপর গাজ্ঞাটা বেঁকিয়ে পথের একেবারে পাশে সরিয়ে নিয়ে এলো। পাথরের বাধাটা অনেক আগেই ওর চোখে পড়েছিলো। রাস্তাটা চড়াই। ফুলমু ঠেলাটা ঠেললো কিন্তু এক ইঞ্চি নড়লোনা। দ্বিতীয় বারের ধাক্কায় সামান্য একটুখানি নড়লো।

"কি চাষিয়ানী ! আর হাসবে ?" পর্মার গলায় শ্লেষ।

কথা শেষ হবার আগেই গড়গড়িয়ে ঠেলা উঠলো, তারপরই ঠেলাগাড়ি নিয়ে ছুট দিলো ফুলমু। ফুলেয়ারের-ঝোপ তার নিজের জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো, ফুলমু যেন চোখের নিমেষে উধাও হয়ে গেলো।

যেন ভেল্‌কি দেখিয়ে দিলো মেয়েটা। পর্মা অবাক হ'য়ে পথের দিকে তাকিয়েছিলো গাজ্ঞা নিয়ে, প্রথম ফুলমু কেমন তামাসা করছিলো, সে কথা মনে ক'রে নিজের মনে হাসলো একটু। তারপর বড় গাজ্ঞা নিয়ে রওনা দিলো ও। এ ঠেলাটা পাথর আর ঢেউটে ঠাস্ বোঝাই।

প্রায় পোয়া মাইলটাক পথ পার হ'য়ে, একটা ছোট ভাঁটিখানার পাশে ঠেলার দেখা মেলে পরমরাজ।

কিন্তু চম্পিয়ালী মেলো কোথায়! এদিকে সেদিকে তাকাচ্ছে পর্মা, ওপর থেকে ভেসে এলো হাসির তরঙ্গ তারপর কণ্ঠস্বর,—"এই যে সর্দার আমি এখানে—"

পর্মা চোখ তুলে দেখে ডালার-পাতার ঝাঁকড়া আম্বু (খোবানি) গাছের একেবারে মগডালে পা ঝুলিয়ে ব'সে আম্বু ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে ফুলমু।

আচ্ছা মেয়ে তো! এই বোঝা নিয়ে এতখানি চড়াই ভেঙে আবার গাছে গিয়ে উঠেছে!

ঝুপ ক'রে লাফ দিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়লো ফুলমু, তারপর হাতের ধুলো চাদরে ঝাড়তে ঝাড়তে পর্মার সামনে এগিয়ে এসে বললো, "কী চম্পিয়ালী! আর ঠাট্টা করবে?"

ফুলমুর সুন্দর মুখখানা একেবারে টুকটুকে রাঙা, কপালে মুক্তোর মতো ঝিন্‌ঝিনে কয়েক ফোঁটা ঘাম, জিরি (মাথার পোষাক) দু পাশ দিয়ে কানের ওপর এলোমেলো চূর্ণ কুন্তল এসে পড়েছে,—সব চোখে পড়লো পর্মার। সুন্দর হাসলো একটু, "চম্পিয়ালী। আর ঠাট্টা চল্‌বেনা তোমার সঙ্গে. সত্যিই তুমি শক্তি রাখো—"

আনন্দে ফুলমু একপাক ঘুরে নিলো, হাসি মুখে বললো, "আমার একটা নাম আছে, আমার নাম ফুলমু—"

আবার সুন্দর হাসলো পর্মা, "আচ্ছা ফুলমু, তোমার শক্তি দেখে আমি খুশি হয়েছি, কি বকশিস চাও বলো?"

চোখে মুখে চিন্তার ছায়া ফেলে ফুলমুকে ভাবতে দেখা গেলো. এক মুহূর্ত, তারপরই হেসে ফেললো, বললো. "সর্দার, আমি তোমার দলে যোগ দেব, আমাকে নেবে?"

"না।—" পর্মা বল্‌লো।

"কেন?"

"আমার দলে আমি মেয়েকে নেইনা—"

"কিন্তু তোমার গুলাবার চেয়ে তো আমি শক্তি বেশি রাখি—তবে আমাকে নেবেনা কেন?"

"নিয়ম নেই ব'লে নেবোনা।"

"ও—" ফুলমু অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলো. "তোমার এই ছোটো গাড্ডার মালের কি গতি হবে?"

"কি আবার হবে, নিয়ে যাব—" যেন মাছি তাড়ানো ভঙ্গিতে অতিরিক্ত মালের প্রসঙ্গটা তাড়িয়ে দিলো পর্মা।

ফুলমু তার জোড়াভুরু টান করলো, "তুমি একলা দুটো গাড্ডা নিয়ে যাবে?"

"না। দুটো গাড্ডা নেবনা। বড় গাড্ডার ছোটো গাড্ডার মালগুলো তুলে নেবো"—পর্মার সেই আগের ভঙ্গি।

ফুলমু অবাক হ'য়ে চোখ বড় করে পর্মার দিকে তাকিয়ে রইলো: এ কী মানুষ! না হুন্নবেন্নী কোনো দেওতা! পর্মা ফুলমুর চোখবড় করা অবাক চাউনি দেখলো, কিন্তু এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাইলো, বললো,"তুমি কি চাও বললে না ফুলমু?"

ফুলমুর যেন সম্বিত ফিরলো, পর্ণার মুখের ওপর থেকে তাড়াতাড়ি চোখদুটো নামিয়ে নিলো। মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেলো ওর। ওরই জন্ত পর্ণার তো এই ভোগান্তিটা হলো! দু গাড্ডা বোঝাই মাল ওকে একলা ঠেলে নিতে হবে।

পর্ণা ফুলমুর হঠাৎ বেজার-হওয়া মুখ দেখে ওর মনের ভাবটা বুঝলো বোধহয়, হেসে কেসে বললো, "মালের জন্ত ভেবোনা, এর চেয়েও অনেক বেশি বোঝা আমাদের বইতে হয়, বইতে হয়েছে—"

ছোটো ঠেলা টেনে এনে পর্ণা দুহাত দিয়ে গোছা গোছা ভারি ভারি স্লেট তুলতে লাগলো। ফুলমু পাথনা দোলানোর মতো হাত দুটো দুলিয়ে অর্ধ স্বগতোক্তি করলো,—যাই আমিও একটু হাত লাগাই···। ঠেলাগাড়ির সামনে আসতেই ধমক লাগালো পর্ণা, "ফুলমু, আর এক দণ্ড দেরী নয়, বাদল আসছে, শিগগির বাড়ি চলে যাও।"

"নুনা—" উচ্ছল উচ্ছলিত ছন্দের দেহভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো ফুলমু, সেটা পর্ণার কণ্ঠস্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেলো। একটা ঘাড়-তেড়া ভঙ্গী নিয়ে শক্ত কাঠ হ'য়ে ঠেলা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইলো ও।

"গেলে—" পরমরাজের দু' চোখ দিয়ে যেন আগুন বার হ'লো, মেয়ে না হ'লে টেনে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিতো এতক্ষণ। আর যে কেউ এমন ধমকি দিলে ফুলমু যে কী কাণ্ড ক'রে বসতো কে জানে। কিন্তু, ফুলমুকে যেন কেউ জাদু করেছে। রাগ তো হয়ই নি, ওর সেই ঘাড়-তেড়া ভঙ্গীটাও মিলিয়ে গেছে। চোখে এক আকাশ বিস্ময় নিয়ে ও একবার পর্ণার মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর একবার হাতের দিকে। একটু হাত ধরে আসছে না, একটু হাঁফ ধরছে না—সমানে দু হাত দিয়ে বোঝা বোঝা পাথর তুলছে, মনে হচ্ছে পাথর তো নয় যেন ফুল তুলছে···।

ফুলমু গিয়ে পাথর তুলে নেয় এমন সাহস ওর আর নেই, তবু ও দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। ভাবলো, পর্ণা আর দু একটা গাল দিক তারপর ফিরবে। কিন্তু, এক মুহূর্তের জন্ত পর্ণা ওর দিকে তাকাচ্ছেনা পর্যন্ত—তো গাল দেবে। সেই যে প্রথম যখন গুলাবাকে ধমকাচ্ছিলো, তখন যেমন ওকে পাত্তাই দেয়নি ঠিক সেই ভঙ্গিতে পাথর তুলে যাচ্ছে। মিনিট সাতেক এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা নিশ্বাস পড়লো ফুলমুর। বললো, "সর্দার, আমি চলে যাচ্ছি—"

"যাও—" চোখ না ফিরিয়ে গম্ভীর গলায় পর্ণা বললো। ফুলমু ফিরলো। চার পা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লো ফুলমু। পিঠে ঝোলানো কিল্টে থেকে হাত গলিয়ে বেছে বেছে পাকা দেখে চারটে আড়ু বার করলো আর কচি কচি দুটো ছলি। ছলি দুটো হাতে নিয়ে একটু ভাবলো,—উহুঁ! মিজুর উৎসবের আগে ছলি হয়তো খাবেনা সর্দার—আবার ছলিদুটো রেখে দিলো কিল্টায়। পাকা আড়ু চারটে হাতের মুঠিতে নিয়ে পর্ণার সামনে চলে এলো। পর্ণা তাকালো না। ফুলমু দেখলো, পর্ণার ভুরুদুটো কুঁচকে জোড়া লেগে গেলো। আর চোয়াল ও চিবুকের মাংসপেশী কাঁপলো একটু। "সর্দার, তোমার জন্ত এ আড়ু চারটে আনলাম, খাবে?"

এমন চাপা-কান্না গলায় বললো ফুলমু, পর্ণা চমকে চোখ তুলে তাকালো। রাঙা হাতের মুঠিতে চারটে আড়ু নিয়ে অভিমানক্ষুব্ধ চোখে তাকিয়ে আছে ফুলমু ওর দিকে। পর্ণা ফুলমুর চোখের দিকে একটু তাকিয়ে রইলো তারপর হেসে বললো, "দাও।" পর্ণা হাত বাড়াতেই ফুলমু সেই আগের ফুলমু। ডানে বাঁয়ে ঘাড় দুলিয়ে হেসে হেসে আড়ু চারটে পর্ণার হাতে তুলে দিলো, বললো, "খুব মিষ্টি, খেয়ে ভাখো—"

শর্মা ফুলমুর মুখের দিকে চোখের দিকে আবার একটু তাকালো, "কৈ তুমি কি বখশিশ চাও, বললে না তো ?" শর্মা জিগ্যেস করলো।

ফুলমু শর্মার মুখের চেহারা সহজ দেখে, ফুলদুটি সটান দেখে আর হেসে হেসে কথা বলছে দেখে একটা মস্ত আরামের নিশ্বাস ফেললো। বললো, "আমার সব আছে সর্দার, আমার কিছু চাইনে—"

শর্মা অবাক হ'য়ে দেখলো, ফুলমুকে হঠাৎ কী অদ্ভুত উদ্দীপ্ত দেখাচ্ছে।

শর্মার কণ্ঠস্বরে এতক্ষণে সত্যিকার খুশির ছোঁয়া লাগলো. বললো, "ফুলমু! তোমার কথা শুনে আমার আনন্দ হলো।—আমার সব আছে, কিছু চাইনে—এ কথা এই প্রথম আমি শুনলাম তোমার মুখে। আচ্ছা, এবার বাড়ি যাও—আর দেরী করোনা—"

শর্মা দেখলো, ফুলমুর শরীরে মৃদু ঢেউ উঠলো, তারপরে—যেন উজ্জ্বল একটি স্রোত রেখা ছুটে চলে গেলো ওর সামনে দিয়ে। হাসলো পরমরাজ। হাতে ধরা ফল থেকে একটা তুলে নিয়ে কামড় দিলো। উৎরাই পথে হুড়হুড়িয়ে নেমে এলো ফুলমু। একেবারে বাড়ির দরজার কাছে এসে থামলো। ঘরে না ঢুকে ধপ্ ক'রে দরজায় ঠেস দিয়ে বসে পড়লো। একটু ক্লান্ত বোধ করছে ও। ঘরের ভেতরে শনিচারি নানীর কাশি, মা'র গলার আওয়াজ আর চাকীর একটানা শব্দ মিলে একটা মিশ্র রসের সৃষ্টি হয়েছে। ফুলমু কান পাতলো। ওকে উদ্দেশ্য ক'রে আম্মা গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে।—দিক্‌সে। আজ আর কিছু ভাল লাগছেনা ওর। কেমন যেন একটা শিথিল অবসাদ। পরতের আমেজি বাতাস ওর মনটাকে কিছুক্ষণের জন্য আনমনা ক'রে রাখলো। তারপর উঠলো ফুলমু। পিঠ থেকে কিন্টার (তিন কোনা ঝুড়ি) বাঁধন ঢিলে করতে করতে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মেয়েকে দেখেই চন্দ্রু গলা সপ্তমে তুলে গালাগালি দিতে লাগলো, রাগের ঠেলায় চাকী (জাঁতা) ঘুরতে লাগলো আরো অনেক দ্রুত।

"—এই নে—" আম্মার পায়ের কাছে কিন্টা উপুড় ক'রে ছলি আর আড়ুগুলো ঢেলে দিলো ফুলমু।

কচি কচি নরম ছলি আর পাকা আড়ুগুলি দেখে চন্দ্রুর মেজাজের তাপমাত্রা একেবারে নেমে গেলো। কিন্তু শনিচারি কাসতে কাসতেই চেঁচিয়ে উঠলো, "ওমা, কী অলক্ষুণে কাণ্ড! মিজর পরবের আগেই ছলি ঘরে তুললি ?"

চন্দ্রু পর্যন্ত একথা ভুলে বসেছিলো। মিজর পরবের দিন বরুণদেবকে পুজো দেয় ছলির (ভুট্টার) ফুল দিয়ে। সমস্ত চষিয়াদ, চষিয়াসীরা ভুট্টার ফুল নিয়ে সেই নির্দিষ্ট মিজর পরবের দিনে মিছিলে যোগ দেয়। তারপর ইরাবতী নদীর তীরে এসে এই ফুল দিয়ে পুজো দেয় বরুণদেবকে। এই মিজর পরবের আগে ওরা ভুট্টা খায়না। ভাদ্র মাসের ফসলের ওপর এই উৎসব হয়। এই শুভ-ক্ষণটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে থাকে চাষবাসীরা।

বোকা সোকা চন্দ্রু ঝিতে কামড় দিয়ে অপরাধ স্খালন করলো। ফুলমু হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে পেছনদিক থেকে শনিচারি নানীর গলা জড়িয়ে ধরলো, "নানী, আমি তো ছোটি লেড়কী, আমার খেলে কোনো দোষ নেই, কি বল ?"

"ফুলমু! ছাড়্, গলা ছাড়্,—" ধক্ ধক্ করে জোরে জোরে কেসে চীৎকার করে উঠলো শনিচারি, "হুঁ! তুমি এখন ছোটো আছো। চৌরীখাস গাঁয়ের জোয়ানগুলোর মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিচ্ছো... "

"সত্যি নানী ? বাঃ কী মজা—" চাক্কর ঘুরিয়ে ওকপাক ঘুরে ভেতরের দরজা দিয়ে অদৃশ্য

ঘরে গেলো ফুলমু। একটু পরেই একটা ভাঙা লোহার কড়াইতে কাঠ কয়লার আগুন ক'রে ফুঁ দিতে দিতে ঘরে ঢুকলো। শনিচারি বিছানায় বসে একটা পেতলের বাটিতে কলুতেল (সরষের তেল) নিয়ে বুকে মালিশ করছিলো। আগুনের কড়াইটা শনিচারির বিছানার পাশে ঠক্ করে নামিয়ে রেখে, কলু তেলের বাটিটা তার ওপর চাপিয়ে দিলো ফুলমু। নানীর কাঁধ ধরে তাকে শুইয়ে দিয়ে ঝপ করে তার বুক ঘেঁসে বসে পড়লো, "নানী, একে কি সপন্ (মালিস) বলে? সপন্ কাকে বলে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি—"

আগুন আগুন তেল নিয়ে ফুলমু শনিচারী নানীর বুকে ডলে ডলে মালিশ করতে লাগলো।

"আঃ! জিতা রহো বেটি—" দীর্ঘ আরামের নিশ্বাস ফেলে চোখ বুজলো শনিচারী। হঠাৎ ফুলমুর এ ইচ্ছে দেখে শনিচারি মনে মনে অবাক হলো।

ফুলমু বললো, "নানী, তুমি তো সুন্দরী ছিলে খুব, ক'টা জোয়ানের মুণ্ডু ঘুরিয়েছিলে বলোনা?"

বুড়ি ফোক্‌লা দাঁত বার করে হাসলো, ওর তোবড়ানো গালে, বলীপড়া কপালে মুহূর্তের জন্য একটা লাল রঙের ছোপ লাগলো,"তবে, শোন্ বলি ফুলমু, যখন আমার যৌবন ছিলো, সারা চৌরাশী গাঁয়ের জোয়ানরা সাঁঝের বেলা আমার ঘরদুয়ারে এসে ভিড় করতো। কত কাজ আমার করে দিতো তারা,—দাবড়ি ফাড়তো, জল তুলতো, কুকুরার ঘর সাফ করতো। বাজার থেকে হাল এনে দিতো। আর পুব দিকের ঐ যে বুদেয়ারের কাঁটাঝোপে ভরা পতিত জমিটা, ওটা ছিলো আলুর ক্ষেত। ওরাই ক্ষেত করেছিলো। আলু লাগাতো, জমি সাফ করতো, জল দিতো, আলু তুলতো···। চৌকরি ভ'রে আলু তুলে এনে দিতো আমাকে,—সে একদিন গেছেরে ফুলমু—" অতীতের চৌকরিভরা আলু স্মরণ ক'রে বুড়ির জিভ রসরাসিক্ত হয়ে উঠলো। এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে শনিচারি বললো, "তোর নানু তো চৌরীখাস গাঁয়ের মোড়ল ছিলো? সে ভাবতো তার খাতিরে জোয়ানগুলো এসে কাজ ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি জানতাম, তারা খাতির করছে আমার যৌবনকে—"

ফুলমু খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো, "তোমার খুব রূপের জেল্লাক ছিলো, না নানী?"

"তা ছিলো। রূপ থাকলে, রূপের ছটা থাকলে জেল্লাক থাকবেনা? তোরই কি রূপের গোমর কম নাকি?" শনিচারী বললো।

ফুলমু কৌতুক গলায় বললো, "কৈ নানী, চৌরীখাস গাঁয়ের জোয়ানগুলো আমাদের ঘর-দুয়ারে এখন ভিড় করে কৈ?"

শনিচারী চোখ খুললো। একটা চাপা উত্তেজনা তার কণ্ঠস্বরে, "তুই যে বাঘিনী, তোর কাছে ঘেঁষবে কে? না হলে আজ আমাদের দুঃখ ছিলো? এতদিনে আলুর ক্ষেতি জমি ঠিক হ'য়ে কবে আলু লাগানো হয়ে যেতো, আর আমার এই ভাঙা ঘর দুয়ার—"

কথার মাঝখানে হেসে গড়িয়ে পড়লো ফুলমু, বললো, "নানী, বাঘিনী হওয়া ভাল নয়, মনাল হওয়া খুব ভাল-না?" মনাল, সুন্দর পাখ্‌আলা পাহাড়ি পাখি, ওর পালক পাহাড়িরা টুপিতে লাগায়। খুব সহজে সোজমানে মনাল পাখি।

শনিচারী সেইগলাতেই বললো, "হাঁ, মনাল হওয়া খুব ভাল। বাঘিনী হয়ে ক্ষতি ছাড়া লাভ কী?"

ফুলমু হেসে হেসে বললো, "আচ্ছা নানী, মনাল হ'লে চৌরাশী গাঁয়ের পরমরাজ আদুরে আমাদের ঘরে?"

"তুই বলিস কি বেটি! এ কথা আর জোবোঝিন মুখে আনিস্ না। সংসারবাজের বেটে পরমরাজ,—ও তো দেওতা, ও মানুষ নয়। ওর দাদু তিলকরাজের কাহানীও সকলে জানে। বহৎ নামী আদমি ছিলো, সেরা জোয়ান ছিলো।"

ফুলমু আবদারে গলায় বললো, "নানী, তুমি ওদের কাহিনী বলো, আমি শুনবো।"

শনিচারি আবার চোখ বুজলো। বললো, "তিলকরাজ হলো গাংসির লোক। খাঁটি আর্যর বংশধর এই তিলকরাজ। যখন বিদেশীরা এসে আর্যদের দেশ-গাঁ আক্রমণ করলো, জয় করলো, তখন তিলকরাজের পূর্বপুরুষরা খুব কষ্ট করে পাহাড়ের গুহায় বাস করতো। জমির লোভে, জাংগীরের লোভে ওরা কেউ বিদেশীদের কাছে মাথা নোয়নি, ইজ্জত বেচেনি। গাংসির তিলকরাজকে এক ডাকে সবাই চেনে। খুব শক্তিমান লোক। গাংসির যে এলাকায় তিলকরাজ ছিলো, সেখানে একবার শেরের খুব উপদ্রব হয়েছিল। শুধু লোহার একটা টাংগি দিয়ে দুটো মস্ত মস্ত শের মেরেছিলো তিলকরাজ। সরকার একটা সেরা বন্দুক ইনাম দিয়েছিলো। চৌরাশী গাঁয়ের জমিদারের বেটা, তিলকরাজের ছোট মেয়েকির ইজ্জত নিয়ে পালিয়ে এসেছিলো, তিলকরাজের বেটা সংসারবাজ জীবণ হাতে তার বদলা নিলো। চৌরাশীর জমিদার বাড়ির সবাইকে কচুকাটা ক'রে তাদের ঘর দুয়ার সব অধিকার ক'রে বসলো। সংসারের বেটা পরমরাজ শক্তিতে বাপ-ঠাকুর্দাকে ছাড়িয়ে গেলো। তবে, মনটা হলো অন্যরকম। নিজের বিরাট বাড়ি ছেড়ে দিয়ে, ভেতরে আরো জঙ্গলের দিকে ছোটো বাড়ি বানিয়ে তাতে বাস করতে লাগলো। বড় বাড়িতে হাসপাতাল গড়ে দিলো। মস্ত বড় দল পরমরাজের। আশে পাশের তিন চারটে গাঁয়ের জোয়ানরা প্রায় সকলেই ওর চ্যালা। নিজে বিয়ে থা না করে শুধু পরের উপকার ক'রে বেড়ায়। জোয়ানগুলো অরাখ (মদ) খেয়ে সাঁঝের বেলা শুধু হৈ-হুল্লোড় করতো আর পরের বউ-ঝি নিয়ে মাতামাতি করতো। সে সব বন্ধ ক'রে দিয়েছে পরমরাজ। সাঁঝ-বেলায় জোয়ানগুলো পর্যার ভেরায় জড়ো হয়, আর ব্যায়াম ক'রে ক'রে তাগৎ বাড়ায়।" শনিচারী চুপ করলো।

কড়াই এর আগুন নিভে গেছে। ফুলমু তেলের বাটিটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো। আড়-মোড়া ভেঙে আম্মার চাকীর কাছে চলে এলো।

"আম্মা, আমাকে দে, আমি গম পিষে দিচ্ছি—" চন্দ্রুকে সরিয়ে দিয়ে মহাউৎসাহে চাকী (জাঁতা) ঘোরাতে লাগলো।

মেয়েকে ঘরকন্নার কাজে মন দিতে দেখে চন্দ্রু খুশি হলো। একটা আদু হাতে দিয়ে খেতে খেতে বললো, "চাচুর, চাল্লান সাফ্ সুফ্ করে নে ফুলমু, মিজর মেলা তো এসে গেলো।"

মিজর উৎসব এসে পড়লো।

সকাল থেকেই লোকের ভিড়। বিখ্যাত সবুজ ময়দান 'চোগান'এ লোকে লোকারণ্য। চোগানের চারপাশ ঘিরে হরেক রকম দোকানের সারি। সাজাবার নৈপুণ্যে, ছোট-বড়-মাঝারি সব দোকানগুলিই দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি দোকানকে কেন্দ্র ক'রে প্রচুর লোকের জটলা। ভিড়, ভিড়, কেবল ভিড়। হট্টগোল। জনতা। বং বেরঙের পোষাকপরা চষিয়াল, চষিয়ালী। এ ওকে ধাক্কা দিচ্ছে, ও একে ঠেলে দিচ্ছে।

দোকানগুলো থেকে অল্প কেটু দূরে, গানের আসর জম-জমাট। কতগুলো লোক বাস্তবয়ে দমাদম বা মারছে। বিচিত্র পোষাকপরা, আর নাকে-কানে-গলায় ভারি গয়না মোড়া একজন চম্বিয়ালী একলা গান গাইছিলো। তার গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রোতারা সব হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়লো। ফুলমু এসে দাঁড়ালো সেখানে। সকলের অনুরোধে চম্বিয়ালী আবার ফিরে গানটা গাইলো :

হং দি ম্যায় হত্‌ড়ি বনাবীয়া
দিন্দা না বজার
ফুল্লু দি ম্যায় তত্‌ড়ি বনাবীয়া
নেনা না বসার
আহে সাকী, বিন্দ্‌লি সেই সে সজ্‌না—
মথে না শৃঙ্গার হো।

ওটে আমার বিপণি, দাঁতে আমার বাজার। কানের পাশে দোদুল্যমান ফুলল দিয়ে আমি গুজনের বাখ্‌রী বানাবো, নয়ন দিয়ে বেসাতি করবো। আমার কপালের কুম্‌কুম্, আমার চোখের কাজল, এ সব আমার শৃঙ্গারের সম্পদ।

গান শুনে ফুলমুও অনেকক্ষণ ধরে হাসলো এবং না তাকিয়ে বুঝলো সব ক'টা পুরুষ আমুদী গান থেকে মন সরিয়ে ওর দিকে মন দিয়েছে। চন্দ্রু একটা পাতার দোনায় (বোঙ্গায়) পুরী আর পোটাণ্ডা নিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে মেয়ের কাছে এগিয়ে এলো, "সেই কখন থেকে তোকে চুঁড়ছি, নে খেয়ে নে—"

ফুলমু বললো, "আম্মা,আমার আজ আর খেতে ইচ্ছে নেই, তুই খা—"

"সে কী রে ! কাল্‌হেলের ওস্তাদ হালুয়াইর পুরী-পোটাণ্ডা,—খাবিনা কি রে ?"

"না আম্মা, আমার পেটে ব্যথা হচ্ছে, তুই খেয়ে নে—"

চন্দ্রু আর কিছু না বলে পুরী, পোটাণ্ডা খেতে লাগলো। ফুলমুর চোখ ভিড়ের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে একজন মানুষকে, সে পর্বা। —তাহলে কি পর্বা মিঞার উৎসবে যোগ দেবেনা, বেলা তো এক প্রহর হয়ে গেলো—। ওর ব্যাকুল চোখ, খুঁজে খুঁজে গুলাবাকে আবিষ্কার করলো। একজন বোগ্‌রি স্লেটের (পাথরের) দোকান দিয়ে বসেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে গুলাবা দরদস্তুর করছে। এই লাহিজাতের বোগ্‌রিরাই পাহাড় থেকে স্লেট কেটে এনে বাজারে বিক্রী করে। ফুলমু দু'হাত দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে গুলাবার কাছে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগলো। পেছন থেকে পরিচিত গলার আওয়াজ শুনে থম্‌কে দাঁড়ালো ফুলমু। ওর বাপু শুক্র ডাকছে। ও নড়লোনা। শুক্র এগিয়ে এলো। হেসে হেসে কোর্তার পকেট থেকে একটা খুব বাহারের জলি (মাথার রোমাল) বার করলো, "ফুলমু, তোর জন্য কিনেছি এটা, কেমন পছন্দ হয় ?"

এক মুহূর্ত চুপ, তারপর হাত বাড়িয়ে বাপুর হাত থেকে জলিটা নিলো ফুলমু। জলির চারপাশ ঘেরা জরির ফুলঝুরিগুলো ঝুনঝুনিয়ে মিষ্টি শব্দ তুললো। হাতের মুঠোয় জলিটাকে দলা-মোচড়া পাকিয়ে, এক ভিড় মানুষের মাথার ওপর দিয়ে ইতস্তত: দৃষ্টি ঘুরিয়ে, কোমাকুনি খালি চৌকো জায়গাটা, যেটা মোটা দড়ি দিয়ে ঘেরা ছিলো, প্রাণপণ শক্তিতে জলিটাকে ছুঁড়ে দিলো সেই চৌকো ঘেরানো জায়গায়। নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত ঘষলো শুক্র, কিন্তু মেয়েকে চ্যাটানো

ফুটন্ত ফুল। ওরা আস্তে আস্তে ময়দান পার হ'য়ে চণ্ডীকা মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালো। এখান থেকে শুরু হবে শোভাযাত্রা। চাষাবাসীরা হাত জোড় করে সমবেত কণ্ঠে চণ্ডীমাতার কাছে প্রার্থনা জানালো,আমাদের সারা বছরের দোষ, ত্রুটি, অপরাধ, স্খলন—সব তুমি মাফ ক'রে দিও মাতাজী। আমাদের ওপর যদি কোনো অপদেবতার ছায়া প'ড়ে, নজর পড়ে, তা তুমি হটিয়ে দিও, নষ্ট করে দিও, আমাদের সময় মতো জল দিও আর ফসল দিও,—মাতাজী, এই আমাদের প্রার্থনা।

প্রার্থনা শেষ করে, ধীরে ধীরে মিছিল রওনা দিলো ইরাবতী নদীর দিকে। সখা মিছিলের একেবারে পুরোভাগে মিঞার পতাকা নিয়ে দুজন নওজোয়ান ব্যাণ্ডের তালে তালে, পা ফেলে পা ফেলে বুক উঁচিয়ে এগিয়ে চলেছে। তারপর বিরাট বরুণদেবের মূর্তি বসানো ম্যাচাংটা নিয়ে লোকের সারি। তারপর, একহাতে মেরী (নারকেল) আর আরেক হাতে ছলির ফুল নিয়ে অগণিত চষিয়াল চষিয়াণী। এদের একটু পেছনে, সুসজ্জিত বারোটা ঘোড়ার পিঠে জাঁকজমক পোষাক পরা ষ্টেটের বারোজন রাজ কর্মচারী। তাদের পেছনে, আরো কয়েকটি ঘোড়ার ওপর কয়েকটি শ্বেতাঙ্গকে দেখা গেলো। ওরা মিজরের মেলা দেখতে এসেছে। কাছাড় থেকে এসেছে ওরা। চারজন সাহেবের মধ্যে একজন কাছাড়ের পালামপুরের বান্দ্‌লা চা-বাগিচার ম্যানেজার লালসাহেব, আর তিনজন তার অতিথি। বান্দ্‌লা বাগিচার ম্যানেজার লালসাহেবের প্রতিপত্তি খুব। অবশ্য, স্বাদে অথবা গন্ধে দার্জিলিং কি আসামের চায়ের কাছে বান্দ্‌লা বাগিচার চা দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু, হিমাচলী অঞ্চলে বান্দ্‌লা চা-এর খুব পসার। বান্দ্‌লা বাগিচা থেকে বছরে প্রায় দু লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়।

মিছিলটা ব্যাণ্ডের বাজনার সঙ্গে নগর পরিক্রমা শেষ ক'রে ইরাবতী নদীর দিকে চলেছে। গোধূলির সোনালী আলো মিলিয়ে পাণ্ডুর ছায়া ঘনিয়েছে। নদীর তীরে বরুণদেবের বেদীর কাছে এসে মিছিলের লাইনটা ভাংলো। বরুণদেবের বেদীর ওপর ব'সে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে মন্ত্র পড়তে লাগলেন পণ্ডিতরা। সমস্ত চষিয়াল-চষিয়াণীরা বেদীর ওপর ছলির ফুল, মেরী আর পয়সা বরুণদেবকে নিবেদন ক'রে মাথা কুটে কুটে তাদের প্রণাম জানালো। এত ভিড়, প্রণাম করতে গিয়ে এক একজন যেন চেপ্টা হয়ে যাচ্ছে। ফুলমু প্রণাম করে সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই কে যেন ওর কোমর ধরে হেচ্‌কা টানে ওকে ভিড়ের বাইরে বার করে আনলো। চোখ তুলতেই ফুলমু দেখে, ও একটা টক্‌টকে লালমুখো সাহেবের বুকের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। সাহেবের শক্ত হাতটা ভয়ানক জোরে বেঁধে ফেলেছে ওকে, আর তার আঙুলগুলো যেন কিলবিলিয়ে উঠছে ওর শরীরে। ওর কানের কাছে লালমুখোটা মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললো,—তোমাকে অনেক টাকা দিব। দশ টাকা দিব। চলো আমরা ও দিকটা যাই। জোরে আকর্ষণ করতে লাগলো ওকে।

ফুলমু চেঁচিয়ে উঠলো, কিন্তু কণ্ঠে কোনো স্বর ফুটলো না। সন্ধ্যার কালিমায় নদীর তীর ঢাকা প'ড়ে গেছে। মানুষজনের মুখও একেবারে অস্পষ্ট। ফুলমু হাত নেড়ে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলো কিন্তু হাতটাও নাড়তে পারছে না, দুটো হাতই লালমুখোর বাহুর তলায় চাপা, কী নিদারুণ অবস্থা ফুলমুর। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেলো। সমস্ত মেরুদণ্ড বেয়ে শির শির করে কী যেন উঠতে লাগলো আর নামতে লাগলো।

চণ্ডীমাতার নাম স্মরণ ক'রে মুখ নামিয়ে ওর দাঁতের যত শক্তি আছে, তত শক্তি দিয়ে

লালমুখোর ডান হাতের পাতাটা কামড়ে ধরলো। নিশানা ব্যর্থ হলো না। সাহেবের শাদা ধব্‌ধবে চামড়া ভেদ করে ফুলমুর সবকটি দাঁত বসে গেলো।

—ওঃ, মাই গড্—যন্ত্রণায় তীব্র আর্তনাদ করে সাহেব বাহু বন্ধন শিথিল ক'রে দিলো। ফুলমু লাফিয়ে সরে গেলো সেখান থেকে। ডান হাতের পাতা দিয়ে রক্ত ঝরিয়ে রক্ত ঝরছে। সাহেব কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো তখন আর বা-চা করলো না। রুমাল দিয়ে ডান হাত চেপে ধরে তাড়াতাড়ি সরে পড়লো সেখান থেকে।

সাহেবের আর্তনাদ ওম্ সাধু বাবার কানে গিয়েছিলো, আর কানে গিয়েছিলো পর্যার।

ওম্ সাধুবাবার সাক্ষাৎ পাওয়া, হিমাচলীরা মস্ত একটা সৌভাগ্য বলে মনে ক'রে। ওম্ সাধুবাবার অত্যাশ্চর্য অলৌকিক ক্ষমতার কথা হিমাচলীদের মুখে মুখে। যে কোনো কঠিন ব্যাধি শুধু ওম্ সাধুর স্পর্শেই নিরাময় হয়—এ ঘটনা বহু হিমাচলীর প্রত্যক্ষ দেখা। ওম্ সাধুর সম্বন্ধে কিম্বদন্তী—হিমাচলের কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে তা সব ওঁর নখদর্পণে। এবং যখনই যেখানে আপদ বিপদ, তখনই সেখানে তিনি। উনি মন্ত্রে পরিক্রমা করেন, বাসে নয়, ট্রেনে নয়, গরুরথে নয়। কিছুকাল আগে, চাম্বার ছুটি মোড়লকে কি কাজে যেন পাঠানকোট যেতে হয়েছিলো। ওরা গিয়েছিলো বাসে। সেই বাসের পথ ধরে যেতে দেখলো সাধুবাবাকে। ওরা নেমে প্রণাম-টুনাম ক'রে আবার গিয়ে গাড়িতে চড়লো। কিন্তু, কী আশ্চর্য ব্যাপার—প্রত্যেকটা ষ্টেশনে, চাম্বা থেকে পরিল, পরিল থেকে ছাচা, ছাচা থেকে বাঁশীক্ষেত, তারপর—ধুনধিয়ারা, নৈনিখাদ, কুহুহট্টি, ডাকিহা, ছুনিয়া তারপর গিয়ে পাঠানকোট, বাস যখনই থেমেছে, ঐ মোড়ল দুজন বাসের সামনে দেখছে ওম সাধুবাবাকে……।

…সাধুবাবার সম্বন্ধে এমনি বহু লোকাতীত ঘটনা হিমাচলের চার পাশে ছড়ানো। ওম্-সাধুর ওপর হিমাচলের সরল গ্রামবাসীদের বিশ্বাস শুধু অন্ধ নয়, ওদের বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে একটা বিচিত্র আবেশ আর ভক্তি।

ফুলমু লাফ দিয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে, ওম্ সাধুর ভারি ভয়াট কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো, "সাব্বাস বেটি, এই তো চাই। দুশমনের কাছে কখনো হার মান্‌বিনা মায়ি, পরমাত্মা তোকে আশীর্বাদ করবেন। কসরত (ব্যায়াম) কর মায়ি, কদ্‌রত কর, শক্তি বাড়িয়ে নে—" ওম্ ওম্ ধ্বনি ক'রে সাধুবাবা কোথায় মিলিয়ে গেলেন।

এতক্ষণ ফুলমু চুপ করেই ছিলো। সাধুবাবার কণ্ঠস্বর যেই মিলিয়ে গেলো, অমনি দুচোখের কোথায় টলটলে জল জমলো, তারপরচোখের দীঘি ছাপিয়ে, গাল বেয়ে টুপ টাপ করে পড়লো মাটিতে। একেবারে ওর পেছনে এসে কে যেন দাঁড়ালো। ফুলমু তাড়াতাড়ি হাত তুলে চোখের জল নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলবার আগেই, পেছনে দাঁড়ানো লোকটি গলা নামিয়ে বললো, "ফুলমু! আঁখোমে পানি এলেই কিন্তু তুমি হেরে গেলে—" বিস্ময়ে, আনন্দে চোখের জল তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে ঘুরে দাঁড়ালো ফুলমু।

"সর্দার! তুমি! তোমাকে কত খোঁজাখুঁজি করলাম তোমাকে,—তারপর এই একুণি মনে মনে তোমাকে আমি কত ডাকছিলাম—"

"কেন, মনে মনে ডাকছিলে কেন?" পর্যার গলায় তরল সুর। ফুলমু একমুহূর্ত ইতস্ততঃ ক'রে তারপর ভার ভার গলায় বললো, "একটা লালমুখো সাহেব আমাকে চেপে ধরেছিলো, ছাড়া পাচ্ছিলাম না কিছুতেই—, সে সময় তুমি থাকলে বদমাসটাকে শেষ ক'রে ফেলতে নিশ্চই।"

পর্ণা একটু হাসলো, বললো, "বদমাস্‌টাকে শেষ যে আমি করতাম সেটা ঠিকই, কিন্তু ফুলমু, আজ থেকে শুনে নাও একটা কথা,—নিজেকে নিজে না রক্ষে করলে, আর কেউ রক্ষে করতে পারেনা—"

ফুলমু "ও" ব'লে ছোটো একটা নিঃশ্বাস ফেল্‌লো। পরমরাজ বললো, "চলো ফুলমু, আমরা যাই—, বিছিল অনেক দূর এগিয়ে গেছে।"

ওরা দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে চলার পর পর্ণা জিগ্যেস করলো, "চোপ্পান ময়দানে আমাকে খোঁজাখুঁজি করছিলে কেন?"

"এ্যাঁ—" বলে ফুলমু ভাবতে লাগলো, চোপ্পানে কেন খোঁজাখুঁজি করছিলো পর্ণাকে। অনেক খুঁজেছিলো পর্ণাকে, সেটা তো বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে, কিন্তু কেন খুঁজেছিলো তা তো কৈ মনে পড়ছে না…।

"কৈ বল্‌লেনা?" পর্ণা আবার জিগ্যেস করলো।

ফুলমু হেসে ফেললো, "খুঁজছিলাম মানে—, ইয়ে—, ঐযে তখন ভ্যাসের লড়াইতে তুমি জিতলেনা—"

পর্ণা বাধা দিলো, "আমি জিতিনি, আমার ভ্যাস্ জিতেছে—"

"ঐ একই হলো—"ফুলমু হি হি ক'রে হাসলো একটু।

"তাতে কী হয়েছে!" পর্ণা বললো।

"তাই, আমি তোমাকে খুঁজছিলাম—" ফুলমু দেখলো ওর কথায় যেনক্রমশঃই গিঁট পাকিয়ে যাচ্ছে, ও কোনোমতে এ প্রসঙ্গটা শেষ করলো, "তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে বলতাম,—সর্দার! তোমার ভ্যাস্‌টারও কত শক্তি!"

ফুলমুর এলোমেলো মজার উত্তরে পরমরাজ হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। পরমরাজের হাসি শুনে ফুলমুর সাহস বাড়লো। বললো,"সর্দার। আমার তখন খুব মন চাইছিলো—" কথা শেষ না ক'রে ঐ কম আলোতেই পর্ণার মুখের দিকে অপাঙ্গে একবার চাইলো ফুলমু।

"কী চাইছিলো তোমার মন?" পর্ণার ঘরোয়া গলা।

"আমার মন চাইছিলো, ঐ সব চম্বিরালীদের মতো আমিও তোমার কপালে তিলক এঁকে দি—"

"হুঁ…!"

পর্ণার কণ্ঠস্বর হঠাৎ এমন বদলে গেলো কেন!

ফুলমুর ভেতরে আবেগময় একটা সুর বাজছিলো, ঐ ছোট্ট হুঁ অক্ষরটা সুরের তার ছিঁড়ে দিয়ে যেন বর্শার ফলার মতো ওর বুকের ভেতর বিঁধে গেলো।

অনেকটা পথ পাশাপাশি এগিয়ে গেলো, কিন্তু সর্দার কোনো জবাব দিচ্ছে না কেন? একেবারে চুপ মেরে গেলো কেন সর্দার?

চাঁদ উঠেছে। আকাশে মেঘ নেই আজ। চাঁদের আলোধোয়া চড়াই পথে, নদীর জলরেখা পেছনে রেখে ওরা আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগলো।

"ফুলমু!" গম্ভীর ভরাট গলা পর্ণার।

চমকে চোখ তুলে তাকালো ফুলমু। মনে মনে ভাবলো, এমন বুড়োর মতো গম্ভীর স্বর পর্ণার গলা দিয়ে কেমন ক'রে বার হলো!

পর্মা বললো, "...কোনোদিন তুমি আমাকে আর খোঁজাখুজি করবেনা।"

অপরিণত-বেহিসাবী-মনের ফুলমু প্রশ্ন ক'রে বসলো, "কেন?"

বিরক্ত গম্ভীর গলায় পর্মা জবাব দিলো, "তাতে তোমার অমঙ্গল হবে—"

ফুলমু বললো, "অমঙ্গলকে আমি ডরাই না—"

"চুপ!" কঠিন গলায় ধমকে উঠলো পর্মা। পর্মার চোখের দিকে তাকালো ফুলমু, যেন দুটো অগ্নিগোলকের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। বুঝলো ফুলমু, এখন কোনো প্রতিবাদ নিরর্থক।

বাইরে, দু চার বিন্দু মমতা ঝরিয়ে, দু চারটে ভালকথা ওর সঙ্গে যাই বলুক পর্মা, পর্মার ভিতরের নিমন্ত্রণ কখনো পাবেনা ফুলমু। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে উদ্যত কান্নাকে প্রাণপণে রোধ করবার চেষ্টা করতে লাগলো ফুলমু, কিন্তু চেষ্টা করেও চোখের ক্ষীণ জলধারাকে আটকাতে পারলোনা। ওর সুডৌল গাল বেয়ে ঝরে পড়লো।

আরো অনেকটা সময় পার হলো। ওপরে চাঁদ। আর নিচে তার আলো গায়ে মেখে আশ্চর্য দুটি যুবক যুবতী পাশাপাশি মৌন হয়ে চলেছে।

দূরে চোগান ময়দান দেখা গেলো। তার উদার সবুজ বুকের ওপর দিয়ে, বিরাট মিছিল বাহিনী কল্ কল্ ক'রে অকারণ কথার বন্যায় ভাসতে ভাসতে, হাসির ঢেউয়ে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে।

"ফুলমু!" এবার পর্মার গলা একেবারে সহজ, একেবারে পরিষ্কার। বিষাদম্লান চোখদুটি পর্মার চোখের ওপর তুলে ধরলো ফুলমু। এক মুহূর্ত থামলো পর্মা, তারপর বললো, "তুমি আমাকে বেশি খোঁজাখুঁজি করলে, আমার কাজের ক্ষতি হবে—"

"তোমার কাজের ক্ষতি হবে?" ফুলমুর ম্লানচোখে অবাকজিজ্ঞাসা ফুটলো।

"হাঁ। আমি একটা মস্ত বড় কাজের স্বপ্ন দেখছি, সেটা সফল হবেনা—"

ফুলমু চোখ নামিয়ে মিছিলের দিকে তাকালো, তারপর যেন নিজেকে শুনিয়ে বিড় বিড় করে উচ্চারণ করলো, "মস্ত বড় কাজ...!"

"হ্যাঁ, মস্ত বড় কাজ, একটা কথা শোনো—" পর্মার গলায় আন্তরিকতার সুর, "রূপের রোশনাই তো চিরকাল থাকেনা, ও আর ক'দিন,—কিন্তু, কসরৎ (শক্তির চর্চা) কর, ভাল কাজ কর, বড় কাজ কর—তোমার কাজের রোশনাই চিরকাল থাকবে।"

ফুলমু, "কি সে কাজ?" জিগ্যেস করেই দেখলো, পর্মা ওর পাশে নেই, আর ও বিরাট মিছিল বাহিনীর পেছনে দাঁড়ানো।

আবার নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড় শুরু হয়েছে। সারারাত এমনি মাতামাতি চলবে। রাত আরো লম্বা হলে, তার পরমায়ু আরো অনেক বেড়ে গেলে, আরো যেন ভাল হয়।

ভাদ্রমাসের ফসলের ওপর এই মিলন উৎসবের জন্য ওরা সাগ্রহে একটি একটি ক'রে দিন গুণতে থাকে।

আজ ওরা বেপরোয়া স্ফূর্তি ক'রে, ছেদহীন অরাধ (মদ) পান করে, মাত্রা ছাড়িয়ে নাচে-কোঁদে, গান গায়, গড়াগড়ি ক'রে, তারপর মাহেন্দ্রক্ষণে আবার শান্ত সংযত হয়ে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে বরুণদেবের বন্দনা ক'রে যে যার বাড়ি ফেরে।

এই সারাটা রাত্রির মধ্যে পর্মার দেখা আর পায়নি ফুলমু। শুধু দূরাগত ধ্বনির মতো

পর্ণার কণ্ঠস্বর ওর কানে ভেসে এসেছে। একবার, ইরাবতীর দুরন্তপনা এখনো কমেনি, সে কথা কাকে যেন জানাচ্ছিলো পর্ণা, আর একবার, একটা ছোটো বাচ্চা তার হাল্‌কি বহীনকে (ছোড়দিকে) না পেয়ে, হাল্‌কি বহীনকে ডেকে গলা ফাটাচ্ছিলো,—তাকে কি সব ব'লে ব'লে যেন পর্ণা শান্ত করলো।

…তারপর হয়তো বাচ্চাটাকে কোলে তুলে শান্ত করলো পর্ণা, তারপর হয়তো সেই হাল্‌কি বহীনকে খুঁজে খুঁজে বার ক'রে বাচ্চাটাকে তার দিদির কাছে দিলো।

তারপর? তারপর, কোথায় গেলো পর্ণা?

সারা বছরের প্রতীক্ষিত চাষাবাসীদের কৃষি-উৎসব শেষ হলো। সূর্য-অস্তাচলে বাজনা বাদ্যের সঙ্গে বরুণদেবতাকে শেষ প্রার্থনা-গান শুনিয়ে চষিয়াল চষিয়ালীরা বাড়ির পথ ধরলো।

এই মিশ্র উৎসব চাষা বাসীদের নিজস্ব উৎসব, হিমাচলে আর কোথাও এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়না। ওদের এটাই সবচেয়ে বড় উৎসব। অবশ্য, ফসল বপনের আগে ও ফসল তোলার সময় আরো কয়েকবার ওরা বিচিত্র প্রথায় নাচগান ক'রে। তবে সেগুলি সাদাসিধে, ঘরোয়া, এমন রাজকীয় নয়।

বাড়ি এসে ফুলমু বিছানায় শুয়ে পড়লো। শরীর ক্লান্ত, মনও, ঠিক ক্লান্ত নয়, অস্থির। উৎসবের আগে, যে ফুলমু সেজেগুজে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গান গাইতে গাইতে রওনা দিয়েছিলো, সেই কিশোরী ফুলমু যেন চোগান ময়দানেই রয়ে গেছে; উৎসব অন্তে ফিরে যে এসেছে সে অনেক বড়, অন্য আরেক ফুলমু।

সকালবেলা পাহাড়ীরা কেউ বিছানা আশ্রয় করেনা।

দূর—পাহাড়ের ওপর দিয়ে সূর্যের রক্তাভা ছোট্ট জানালা ভেদ ক'রে ফুলমুর গালে কপালে এসে পড়েছে। সে দিকে তাকিয়ে ঘন্ ঘনিয়ে উঠলো শনিচারী, "ফুলমু, সকালবেলা শুয়ে পড়লি যে, দেবতা রাগ করবে, অগদেবতার দৃষ্টি পড়বে। তারপর গা গতর আর নাড়তে পারবিনা।"

ফুলমু ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো, "সত্যি গা গতর আর নাড়তে পারবোনা নানী?"

"তোর মাকে বরং শুধিয়ে নে। অগদেবতার একবার নজর পড়লে আর রক্ষে নেই, কেবল শরীর ফুলতে থাকে। কখনো পা ফোলে, কখনো হাত ফোলে, কখনো হাঁটু ফোলে, কখনো কোমর ফোলে,—শরীরটা সে এক আচ্ছা আপদ হ'য়ে দাঁড়ায় তখন।"

চন্দ্রু হাঁস বুরগিগুলোকে ছেড়ে দিয়ে হাতে দুটো বুরগির ডিম নিয়ে ঘরে ঢুকলো। দেখেই কালো হ'য়ে গেলো শনিচারির মুখ, বললো, "মাত্র এই দুটো কাঁকড়ির আণ্ডা, কতক একটাও আণ্ডা দেয়নি?"

"না—"হেসে জবাব দিয়ে, একটা হাঁড়িতে ডিম দুটো রেখে চন্দ্রু শনিচারির গা ঘেঁসে বসলো, "শোন্ বুয়া, একটা খুব ভাল খবর আছে। আমাদের দুঃখকষ্ট আর দুচারদিন, তারপর আর থাকবেনা—"

শনিচারি, ফুলমু, দুজনেই চন্দ্রুর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালো। দেখলো চন্দ্রুর চোখ দুটো বিচিত্র একটা সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

"বল্ চন্দ্রু, খবরটা জল্‌দি বল্—"শনিচারির গলা ভয়ানক গদ গদ শোনালো।

"মণিমহেশ গাঁয়ের সেরা জোয়ান নয়নরাজ ফুলমুকে সাদী করতে চেয়েছে—"

"বলিস কি চন্দ্রু, আমাদের নায়ু বিয়ে করবে ফুলমুকে। ও তো মস্ত একজন জোতদার—" শনিচারি কোকলা দাঁত বার ক'রে খুশির হাসি হাসতে লাগলো।

"তুই ওদের চিনিস নাকি নানী ?" চন্দ্রু জিগ্যেস করলো।

"ওমা। আমাদের গাঁয়ের প্রিতমরাজ তো নয়নরাজের নিজের মামু। ঐ যে সেদিন আমরা মালাবি কাঠ কুড়োচ্ছিলাম, একজন বুড়ো আদমি খচ্চরের পিঠে সওদা নিয়ে বাজার থেকে ফিরছিলো না, তোকে দেখিয়ে আমাকে শুধোলো এই কি ফুলমুর মা নাকি,—সেই হলো প্রিতমরাজ। ওরও ক্ষেতি জমি অনেক, মেস্ (বলদ) বকরী (ছাগল) অনেক। ওর জামাই, নয়নরাজের বাবা মুলুকরাজ যখন জিন্দা ছিলো, তখন তার ঝোলঝোলাও ছিলো খুব—।"

শনিচারি আর চন্দ্রু দুজনেই গলামিলিয়ে সুখের হাসি হাসতে লাগলো। চন্দ্রু বললো, "তাহলে ফুলমুকে ওরা সকলেই আগে দেখেছে বোধহয়, আমি ভাবলাম, মেলাতে ফুলমুকে দেখেই বুঝি ম'জে গেছে নয়নরাজ। আমাকে নয়নরাজ ডেকে বললো, শিগ্‌গির কন্যাপণ নিয়ে ওদের বাড়ি থেকে লোক আসবে বিয়ের কথা পাকা করতে। ফুলমুকে দু-প্রস্থ পোষাক দেবে, গয়নাও একপ্রস্থ দেবে সব—ডড়মালা, শাংকেলি শাতড়, কাম্‌চু—সবই দেবে। আমাদের একশ' রোপায়া দেবে, দুটো বকরী দেবে, আরেকটা মস্ত কথা বলেছে, আমাদের পতিত জমিটা ও লোক দিয়ে তোয়ের ক'রে আলুর ক্ষেতিজমি বানিয়ে দেবে।"

উল্লাসের ঠেলায় এমন হাসতে লাগলো শনিচারি যে কাশি শুরু হয়ে গেলো, হাপানীর টান উঠে গেলো। হাসি কাশি একটু কমলে, শনিচারি দুহাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকালো, "জয় বাবা দৈত্‌নাগের জয়, জয় বাবা বৈসর্‌নাগের জয়, জয় বাবা কৈলাস্‌ বজীরের জয়। আবার আমার আলুর ক্ষেতি হবে।"

চন্দ্রু হাসিমুখে চুলোয় আগুন দিতে চলে গেলো। যাকে নিয়ে এত কিছু, তার মুখের চেহারা এমন যেন সে ফুলমু নয়, কাজেই ও নিয়ে তার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। শনিচারি প্রণাম শেষ ক'রে ফুলমুর দিকে স্নেহকোমল চোখে তাকালো, দেখ্‌লো, ফুলমু নিবিষ্টমনে একটুকরো কাঠকয়লা দিয়ে নানা আকারের নানারকম চিড়িয়া এঁকে যাচ্ছে।

"ও কী হচ্ছে রে ফুলমু, যা, স্নান ক'রে সাফ্‌সুফ্‌ হ'য়ে নিবি যা। কাল মেলায় কম ধকল তো যায়নি, জল্দি নেয়ে ধুয়ে চাদুর চাদ্দান পাল্টে নে—বলা যায় না কখন হয়তো নাহু এসে হাজির হ'য়ে যাবে। কোনো লেড়কিকে মনে ধরলে মরদরা আর দেরী সইতে পারে না। তোর নাহু যা কাণ্ড ক'রে আমাকে সাথী করেছিলো, সে গল্প—"

অন্য কোনো দিন হ'লে, নাহুর-বিয়ের কাণ্ড শোনার জন্য ফুলমু লাফিয়ে উঠ্‌তো, আজকে থামিয়ে দিলো, এতক্ষণে ফুলমু যেন তার নিজের মুখোমুখি হয়েছে, চিড়িয়া আঁকা বন্ধ ক'রে গম্ভীর গলায় বললো, "নানী, আমি বিয়ে করবো না, বড় কাজ করবো—।"

বুড়ি হাস্‌লো, "আরে বেটি, বিয়ে করাটাই তো সব চেয়ে বড় কাজ।"

"না, ওর চেয়েও বড় কাজ করবো, যে কাজের রোশ্‌নাই চিরকাল থাকবে সেই কাজ করবো। তুমি দুঃখ করোনা নানী, আমি নিজের হাতে তোমাকে সুন্দর আলুর-ক্ষেত বানিয়ে দেব আর সেই ক্ষেতির আলু বিক্রী ক'রে তোমাকে বকরী কিনে দেব অনেক।"

"মেয়েটা বলে কী! গলার স্বরটাও তো হাসিতামাসার মত নয়। শনিচারির নিভুনলা আবার ধনধনিয়ে উঠলো, "বুঝ লি ফুলমু, অমন অধর্মের কথা মুখে আন্‌বিনা। বিয়ে না করলে সৃষ্টি রক্ষে হয় না। আমাদের পৃথিবীকেও সৃষ্টি রক্ষের জন্য সাদী করতে হয়েছিলো।"

এবার ফুলমু গাম্ভীর্য ডুবিয়ে খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠলো, "নানী, পৃথিবী কাকে সাদী করলো? পৃথিবীর মরদ কে?"

"পৃথিবীর মরদ হলো গিয়ে আমাদের সূর্যদেব—" শনিচারি আবেগ দিয়ে বলে চললো, "বেটি শোন্, কোনো কাজ একলা হয় না। মরদের মেয়ে চাই. মেয়ের মরদ চাই। দেবতাদের বেলাতেও তাই, মানুষের বেলাতেও তাই আর পৃথিবীর বেলাতেও তাই। আমার দাদীর কাছে শুনেছি, পৃথিবী যখন বিয়ে করতে রাজি হয়নি সূর্যদেবকে, তখন পৃথিবীর কী দুরবস্থা—পৃথিবীর বুকে তখন কিছু ছিলোনা। কেবল ঠাণ্ডাজল আর কালো আঁধার বুকে নিয়ে পড়েছিলো পৃথিবীটা। সূর্যদেব তার দূত পাঠিয়ে পাঠিয়ে হয়রান, কিছুতেই রাজি হয়না পৃথিবী। এদিকে সূর্য ভয়ানক ভালবেসে ফেলেছে পৃথিবীকে। বড় লাজুক, বড় মিষ্টি আর বড় ধৈর্যশীলা মেয়ে ঐ পৃথিবী,—এ'কে ওর চাই। অশেষ-ক্ষমতাবান সূর্যদেব কতকাল আর অপেক্ষা করবেন। স্থির ক'রে ফেললেন, জোর ক'রে পৃথিবীকে বিয়ে করবেন, আর দেরী করা চলেনা। মস্ত আলোর রথে সাতটা তেজী ঘোড়া টগ্‌বগিয়ে ছুটিয়ে চলে এলেন পৃথিবীর কাছে। জোর ক'রে ঘোমটা সরিয়ে আলিংগন করলো পৃথিবীকে। লাজুক পৃথিবী মুখফুটে সাদীর কথা বলতে পারছিলো না, কিন্তু এটাই সে চাইছিলো। আনন্দে-লজ্জায় সূর্যর বুকে মুখ লুকোলো। স্বর্গ থেকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলো। সূর্যদেবের সঙ্গে মিলনের পর বারিষ (বৃষ্টি) হলো, আলো হলো তারপর থেকেই না পৃথিবীর কোল ভ'রে গেলো।"

গল্প শেষ ক'রে শনিচারি ফুলমুর দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগলো।

এমন অকাট্য যুক্তির পর নানীকে এখন আর কিছু বলা চলে না। আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালো ফুলমু। বেচারি আম্মাকেও কিছুই বলা চলবে না, একশ টাকার স্বপ্ন দেখতে শুরু ক'রে দিয়েছে। তার ওপর আরো আছে—আলুর ক্ষেতের সম্ভাবনা।

কী করবে ফুলমু তাহলে? সেই পেল্লাই জোয়ানটার বউ হবে। নাসুর চেহারা মনে হতেই ওর হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো।

মুখটুক না ধুয়ে, স্নানটান না ক'রে ফুলমু চলে এলো বাড়ির পেছনে পতিত জমিটার কাছে।

জমিটাকে চোখ দিয়ে জরীপ করতে করতে ওর মন বললো,—ওরে বাবা, এত বড় জমির কাঁটা ঝোঁপ পরিষ্কার ক'রে আলুর ক্ষেত বানানো, আলু লাগানো ওর সাধ্যে কুলোবেনা। তাছাড়া, নানী সেদিন বলছিলো এ জমির কোন ধারে মস্ত পাইথন বাসা করেছে। কোন্ চাষীকে যেন শেষ করেছে। তারপর গাঁয়ের কয়েকজন মিলে পাইথনের গর্ত খুঁজেছিলো, পায়নি। কিন্তু কে নাকি গরগরানি শুনেছিলো।

ফুলমু নিথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ওর চোখের সামনে যেন একটা বাটখারা দুলতে লাগলো। একপাশে পাহাড়ী পাইথন আর কাঁটা ঝুলেরারের ঝোপে ভরা পতিত জমি আর আরেক পাশে পেল্লাই বিরাট চেহারার জোতদার নাসুরাম। ফুলমু সভয়ে হাত মুঠি করে চোখ বুজলো।

পতিত জমিটা যেখানে শেষ হয়েছে, তারপরেই একটু উঁচুতে পায়ে চলা একটা খুব সরুপথ এঁকেবেঁকে ক্রমশ বিলীন হ'য়ে গেছে। সেই পথে একটি পাহাড়ী মেয়ে জ্বালানী কাঠকুটোর ঝাঁকা মাথায় নিয়ে দুটি গলায় কতগুলি বকরীকে হেট্ হেট্ করে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ফুলমু চোখ খুলে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। তার একটু পেছনেই একজন চষিয়াল ও একজন চষিয়ালী, হাত ধরাধরি

ক'রে, গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি করতে করতে উচ্চ হাসির লহর তুলে চলেছে। অতদূর থেকেও ওর হাসি কানে এলো ফুলমুর।

: সকলেই তো বেশ আনন্দে আছে—মনে মনে ভাবলো ফুলমু,—তবে আমার কী হয়েছে? কিছু ভাল লাগে না কেন?

চন্দ্রুর উঁচু গলার ডাক এবার কানে গেলো ফুলমুর। ও তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে চললো।

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রু তো অবাক, "কীরে হয়েছে কী তোর? এখনো নাওয়া করিসনি, তোর মুখের চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন?"

ফুলমু এ প্রসঙ্গ তাড়াতাড়ি থামাতে চাইলো, বললো, "কাল চোখর রাত ওইনি ঘুমুইনি, চেহারা এমন দেখাবে না তো কেমন দেখাবে—" দাক্‌সুক্‌ হ'তে চলে গেলো ফুলমু।

চৌরাসী গাঁয়ের একদিকে অনেকখানি জমি নিয়ে কেবল ঘন বাঁশের (বাঁশের) ঝোপ। ঐ ঝোপের মাঝখান দিয়ে একটা সরু পথ কিছুটা সোজাসুজি গিয়ে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে একটা ভাঙা মন্দিরের পাশ দিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। মন্দিরের মাথা নেই। চারপাশের পাথরের দেয়াল ভাঙা আর এড়ো খেবড়ো। মন্দিরটার বাইর ভেতর সবই জঙ্গলে ভ'রে গেছে। নানারকম গাছে জায়গাটা খুব ঘন সবুজ দেখায়। এই জঙ্গল চিরে সরু পথটা ঘুরে ফিরে এঁকেবেঁকে অনেকখানি গিয়ে তবে এসে পৌঁচেছে পরমরাজের আস্তানায়। চারটে কামরা নিয়ে পরমরাজের আস্তানা। মজবুত পাথরের গাঁথনি। দুটো কামরা খুব বড়, আর দুটো ছোটো। একটা বড় কামরায় কসরৎ (ব্যায়াম) শেখায় পর্মা, অনেক জোয়ান পর্মার চ্যালা, আর একটাতে কাজের কথা হয়, আর বাইরের কোনো লোকজন পর্মার সঙ্গে দেখা করতে এলে সেখানে বসে। ছোটো দুটোর একটা পর্মার শোবার ঘর, আর একটাতে রান্না ও খাওয়া হয়। এর অল্প একটু দূরে একখানি পড়োবাড়ি তার আড়াইখানি দেয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার গা ঘেঁসে বিরুল আর খেড়াক গাছের সারি তারপরই লম্বা ছাদের পরপর কতগুলি ঘর। এগুলোতে পরমরাজের ভেঁড়িয়া, ভাঁস-গাউ, বকরী-বতুক (হাঁস), কুঁকড়ো-কুঁকড়ি থাকে, আর সব চেয়ে পেছনের যে খুপরীটা তাতে থাকে একটা চামরী গাই। তারপরে মুখথুবড়ানো একটা হুমড়ি খাওয়া পাহাড়, তারপরে আরো পাহাড়, পাহাড়ের সারি।

বিকেল শেষ হ'তে চললো। আজকের আকাশে মেঘ নেই। পরপর ক'দিন, বিকেল হলেই আকাশ মেঘে ঢাকে, আর তার পরেই বৃষ্টি। অনেক কাজের ক্ষতি হয়েছে পর্মার। ভেতরে ভেতরে যেন বিধাতার ওপরেই বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো। অনেকদিন পর আজ মেঘমুক্ত আকাশ দেখে ভারি খুশি হয়েছে পর্মা। আজকের বিকাল উদাস বিকাল নয়, রাঙা বিকাল।

কসরৎ শেষ করে জোয়ানরা সবাই ঘরে ফিরে গেছে। রয়ে গেছে গুলাবা আর মদনরাজ। পর্মা ওদের কি যেন নির্দেশ দেবে তাই ওরা বসে আছে। পর্মা গিয়ে পাশের কাজের ঘরে ঢুকেছে। দুই দোস্তের মধ্যে মামুলি কথাবার্তা হচ্ছিলো, হঠাৎ মদনরাজ বললো, "তোদের সেই ফুলমু আমার ভাবী হচ্ছে—" ঠিক সেই সময় পর্মা ঘরে ঢুকছিলো, ফুলমুর নামটা কানে যেতেই ফিরে গেলো। অনেকটা সময় পার ক'রে পর্মা তারপর যখন ঘরে ঢুকলো তখন ওদের আলোচনা অন্যপথে বাঁক নিয়েছে।

ওদের যা নির্দেশ দেয়ার দেয়া হ'য়ে গেলো, ওরা বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

চার কদম যেতেই পেছন থেকে ওরা পর্ণার গলা শুনলো, "শুনাবা যেওনা, আরেকটা কথা শুনে যাও—"

মদনরাজ চলে গেলো। শুনাবা ফিরলো।

ঘরের ভেতর শুনাবা আসতেই চেতনা ফিরলো পর্ণার,—তাইতো শুনাবাকে ডাকলাম কেন? শুনাবাকে বসতে বললো, আর দুপুরবেলা, লাঠি সড়কি বানানো নিয়ে যে আলোচনা করেছিলো সেই পুরাণো আলোচনাটাই তুললো।

একটু অবাকই হলো শুনাবা, সর্দারের পুরণো আলোচনার জন্য ততটা নয়, যতটা সর্দারের কণ্ঠস্বরে। পর্ণার এমন কণ্ঠস্বরের সঙ্গে শুনাবা পরিচিত নয়। আর মাঝেমাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে সর্দার। মিনিট দশেক পরে পর্ণা বললো, "মদনরাজ ফুলমুর কথা কী বলছিলো তখন?"

শুনাবা ভেতরে ভেতরে হাসলো একটু। বললো, "ফুলমু মদনরাজের ভাবী হচ্ছে—তাই জানালো।"

পর্ণা ছদ্ম নিস্পৃহ গলায় বললো, "মদনের কোন্ দাদা? ওর তো কোনো দাদা নেই—"

শুনাবা বললো, "নয়নরাজ হলো মদনের ফুফুর (পিসেমশাই) ছেলে, তার সঙ্গেই ফুলমুর বিয়ে হচ্ছে—"

"আমাদের মণিমহেশের নায়ু?"

"হ্যাঁ সেই। শুনলাম নায়ু নাকি অনেক কড়াপণ দিচ্ছে। আর শনিচারির আদুর ক্ষেতটা আবার তোরের ক'রে দেবে বলেছে।"

শুনাবার কথা শুনে পর্ণা বারে বারে খুব আনন্দ প্রকাশ করলো।—নয়নরাজও নামকরা লোক, নামকরা জোতদার, আর ফুলমুও নামকরা রূপসী,—খুব ভাল জোড় হবে দুজনের। আর বুড়ি শনিচারী আর ফুলমুর আম্মারও মস্ত সহায় হবে, হিল্লে হবে।

শুনাবা চলে গেলো। ও চুপ ক'রে বসে রইলো সেখানে। কোনো কিছু ভাবছেনা। কিন্তু একটা মৃদু উত্তেজনা যেন ওর ভেতরটাকেএকটু একটু ক'রে কাঁপাচ্ছে, জানালা দিয়ে আড়াইখানা ভাঙা ঘরের আলা পড়োবাড়িটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে তার ভেতর মনটাকে ডোবাতে চাইলো।

: আচ্ছা কারা ছিলো ওখানে? চেষ্টা করলে কি আর জানা যায়না। ও যেমন মাঝে মাঝে ঐ ধ্বসে যাওয়া পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে থাকে, পাহাড়ের সারির দিকে তাকিয়ে থাকে, ঐ পড়োবাড়ির মালিক বা মালিকরাও হয়তো তাকিয়ে থাকতো···। কিন্তু ফুলমু এখন কী করছে? সব কিছু ছুটিয়ে ফুলমুর সাবলীল ছন্দোময় অপরূপ চেহারাটা পর্ণার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

শরীর থেকে কোনো কিছু ঝেড়ে ফেলে দেয়ার মত ভঙ্গি ক'রে উঠে দাঁড়ালো পর্ণা, যেন সেইভাবে চিন্তাটাকেও ঝেড়ে ফেলে দিলো: নায়ুর সঙ্গে ফুলমুর বিয়ে হচ্ছে—এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারেনা। ফুলমু তার চুম্বকী সৌন্দর্য নিয়ে নিজেকে কতদিন আর অটুট রাখতে পারবে! তার চেয়ে এই ভাল। এই খুব ভাল।

পর্ণা কাজের ঘরে ঢুকলো। কিন্তু কোনো কাজে হাত না দিয়ে তখুনি আবার চলে আসলো শোবার ঘরে।—আজ আর কোনো কাজ নয়। অনেক খাটাখাটুনি করেছে আজ সকাল থেকে। শুয়ে পড়লো পর্ণা।

চোখ বুজে ওর বৃহৎ কাজের কথা ভাবতে লাগলো। ওর সেই স্বপ্ন সফল হবে কী কোনোদিন! পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন ও যেন সেই শিশুকাল থেকে দেখ্‌ছে। একটা দুর্গ তৈরীর নক্‌শা ও মনে মনে অনেক দিন ধরে করছে। ছক-কাটা ওর আর শেষ হয় না। দুর্গের ছক্ কাটছে আর ছক নষ্ট করছে। অনেকদিন ধরে মনে মনে একটা তীব্র ইচ্ছা পোষণ ক'রে আস্‌ছে,—কাঙড়ার অজেয় দুর্গটা ওকে একবার ভাল করে দেখে আস্‌তে হবে। দুর্গ এখন ভেঙে চুরে গেছে, কিন্তু তার থেকেই ও হাল হদিস পেয়ে যাবে সমস্ত।

পর্মা শুয়ে শুয়ে শুধুনি ঠিক ক'রে ফেল্‌লো,—ওকে যেতেই হবে কাঙড়ায়। এবং এ মাসের মধ্যেই যেতে হবে। কাঙড়া দুর্গের একটা কাল্পনিক রূপ দিয়ে সেটাকে ভাবতে লাগলো পর্মা।

অনেক পরে পর্মার খেয়াল হলো, ও কাঙড়া দুর্গের কথা ভাবছে না, ও ফুল্‌মুর কথা ভাবছে।.....

সেদিন মিঞ্জরের উৎসবের দিন, ফুল্‌মুর সঙ্গে কথা বলছিল যখন, ফুল্‌মু তার সরল দুটি চোখে দুর্বোধ্য বিস্ময় নিয়ে ওর দিকে চেয়েছিলো। সেই দুর্বোধ্য বিস্ময় মাখানো সরল দুটি চোখ, আর কী থাক্‌বে ফুল্‌মুর! সেই আশ্চর্য সুন্দর অনাঘ্রাত ফুলের মতো ফুল্‌মু বউ হবে নাত্থুর। ..... আচ্ছা, ওর বড় স্বপ্নটা হয়তো স্বপ্নই থেকে যাবে চিরকাল—কিন্তু আর একটা মিষ্টি ছোট্ট স্বপ্ন যা ক'দিন ধরে আজকাল রোজই দেখ্‌ছে—সেটার সফলতা তো ওর মুঠির মধ্যে। ফুল্‌মুকে বুকে টেনে নিয়ে বলবে,—ফুল্‌মু তুমি আমার কপালে তিলক কাট্‌তে চেয়েছিলে, তার বদলে—। না, না, না। এসব কি ভাবছে পর্মা।

এসব পরমরাজের ভাবতে নেই, ভাবতে নেই। বড় স্বপ্নকে সফল করতে হলে ছোট্ট মিষ্টি স্বপ্নটাকে ভুলতে হবে। [ক্রমশঃ]

ক্লাসের সবচেয়ে হাঁদা মেয়েটি শিক্ষকমশায়ের কাছে একেবারেই hopeless.

সে শুধু চুপ করে বসে বসে কি যেন ভাবে।

ঘুরে সুইডেনের যে পর্বতশ্রেণী ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম দিকে, তারই দিকে চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে।

শিক্ষক মশায় বললেন—তোমার দ্বারা কিছু হবে না,—জগতে উন্নতিও করতে পারবে না তুমি।

কুড়ি বছর পরের কথা। শিক্ষক মশায় তখন বৃদ্ধ হয়েছেন। দেশে হৈ হৈ পড়ে গেছে। আমেরিকা থেকে অনেকদিন পরে পৃথিবী বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী জন্মভূমি সুইডেনে ফিরে আস্‌ছেন।

শিক্ষক মশায় দেখতে গেলেন তাকে। অভিনেত্রী খবর পেয়ে শিক্ষকের কাছে বিনীত নমস্কার জানালেন। ও পরিচয় দিলেন।

শিক্ষক মশায় এবার চিন্তে পারলেন তাকে। সে এখন গ্রেটা গার্বো,—বিশ্ব বিজয়িনী।

॥ সমবেদনা ॥

বাড়ীতে একটা হৈ রৈ কাণ্ড বেধে গেল।

পড়ার ঘর থেকে লাফাতে লাফাতে অন্দরে এসে ঢুকল তাপু। সবিতা স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাণ্ড শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। অন্নপূর্ণাদেবী বেরিয়ে এলেন ঠাকুর ঘর থেকে। এইমাত্র পুজোয় বসেছিলেন। চিত্ত স্থির রাখতে পারলেন না। এসেই গালে হাত দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন কতক্ষণ।

প্রথমে হা হুতাশ, পরে সম্মিলিত গলায় আস্ফালন। পাশের জোড়লার গিন্নী কৌতূহল চরিতার্থ করতে জানালা খুললেন। ব্যাপারটা শুনেই পুরোনো একটা ক্ষতে তাঁর যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। সাড়ম্বরে শোনাতে লাগলেন তাঁর অতীত দুঃখের কাহিনী।

যাকে নিয়ে এত হৈ চৈ, সে কিন্তু তখন সমস্ত আলোচনার ঊর্ধ্বে বসে একটি বিশেষ কর্ম-সম্পাদনে ব্যস্ত ছিল। লোকচক্ষুর আড়ালে সিঁড়ির তলায় বসে আস্ত একটা ইলিশের ডিম তারিয়ে তারিয়ে খাবার ভেতর যে কি সুখ তা যে না পেয়েছে সে বুঝবে না।

ভৈলা হাসী সেই অঘটন ঘটন পটিয়সীকে এদিক ওদিক বহুক্ষণ ধরে খুঁজল; শেষে কল্পনা ভাণ্ডার লোহার চাবুড়িখানা যথাস্থানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার হাত লাগাল অসমাপ্ত কাজকর্মে।

এ ঘটনা এই আজ প্রথম নয়। এ বাড়ী ও বাড়ী করে করেক বাড়ীতেই ঘটে গেছে একাধিকবার। সবার সমবেত চেষ্টাতেও দুর্ভক্তকে ধরে মনের ঝাল মিটিয়ে সাজা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

অঘটনের প্রথম ক'দিন হুঁসিয়ার হয়ে থাকে সবাই। কিন্তু থাকলে কি হয়, যার জন্যে জেগে থাকা সে আরও সজাগ। ধারে কাছেও ভিড়বে না।

তারপর যখন রাগ পড়ে আসবে; অস্পষ্ট হয়ে আসবে দুঃখের স্মৃতিগুলো, তখন একদিন হঠাৎ আবির্ভাব। তারপর যথারীতি শুরু করে যাবে আনাগোনা। সামান্য অসাবধানতার সুযোগটুকু পুরোপুরি গ্রহণ করে মনের ভেতর আগুন জেলে দিয়ে আবার সে সরে পড়বে নিঃশব্দে।

বাড়ীতে একমাত্র শুভঙ্করই সকলকে অবাক করে দিয়ে শত্রুর স্বপক্ষে কথা বলে।

খেতে দেবার সময় বিশেষ কোন তোয়াজ হঠাৎ উধাও হয়ে গেলে সবাই যখন চায়, হায় করে ওঠে, তখন পরম দার্শনিকের মনোভাব গ্রহণ করে শুভঙ্কর।

ও বলে, বেড়ালের খাওয়াটা অন্যায় নয়, তোমাদের অসাবধানতাটাই অন্যায়। কে না জানে বেড়াল দুধ মাছ খেতে ভালবাসে। খিদে থাকলেই জীবের অস্থিরতা বাড়ে।

সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত কমলাকান্তের দপ্তরের 'বিড়াল' প্রবন্ধটি শুভঙ্কর মন দিয়ে পড়ে থাকবে।

সদাগরী অফিসের কেরানী শুভঙ্কর। অফিসের কাজকর্ম এত বেশী জমে ওঠে যে ছুটির দিনেও বাড়ীতে বসে হিসেব মেলাতে হয়। তা'ছাড়া প্রতিদিনের বাজার হাট, সন্ধ্যেবেলা একটি টিউশনির ধার সেরে সবিতার সঙ্গে কথা বলার বড় একটা সময় পায় না সে।

এদিকে সবিতার ননদিনী তাপু পাড়াবিহারিণী। তার স্কুলের বান্ধবীরা এ পাড়ায় গিস্ গিস্ করছে। প্রতি ঘরে পড়ার নামে আধঘণ্টা করে গপ্‌প মেরে ফিরে এসে কতটুকুই বা সময় হাতে থাকে তার।

এর ভেতর থেকেও যেটুকু সময় সে বাঁচায় তার সবটুকুই ব্যয় হয় রান্নাঘরের খোঁজ খবর নিতে। বৌদির সঙ্গে তার এইটুকু সময়ের আলাপ। তাপু চিরদিনই ভোজনবিলাসিনী; তাই বেড়ালটার ওপর ক্রোধ এ বাড়ীর ভেতর তারই সবচেয়ে বেশী।

অভয়া দেবী বিধবা মানুষ। আচারঅনুষ্ঠানের গণ্ডীর ভেতরেই তাঁর দিন কাটে। ইদানিং কাশীতে গিয়ে এক পরম পুরুষের কাছে তিনি দীক্ষা নিয়ে এসেছেন। তাই জপের মালা ঘোরাতে আজকাল তাঁর একটু বেশী সময়ই লাগে। দীক্ষা দিয়েছেন তাঁর গুরু কিন্তু তাঁকে শিক্ষা দিচ্ছে এই হাড় জ্বালানো বেড়ালটা।

বিধবা মায়ের শরীর রক্ষার জন্যে রক্ত জল করা পয়সায় শুভঙ্কর যে দুধটুকু এনে দেয়, বেশীর ভাগ দিন সেটুকু অভয়া দেবীর ভাগ্যে জোটে না। ঢাকা সরিয়ে নিঃশব্দে কখন যে বেড়ালটা তা পান করে সরে পড়ে তার টেরও পাওয়া যায় না।

ঘরে আর একটিমাত্র প্রাণী সবিতা। সারাদিন থাকে সে রান্নাঘরের কাজে। সকালে একটা তোলা কি কাজ করে দিয়ে যায়। খানিকটা সময় তার সঙ্গে কাটে বকর বকর করে। কথা কাটাকাটি হলে কি হয়, সবিতার কথা বলার ঐ একমাত্র জায়গা। দিনের মধ্যে ঐ সময়টুকু সে প্রাণ খুলে দু'চারটে কথা বলার সুযোগ পায়। হোক না তা গালমন্দ।

দুপুরটা সবিতার কাছে বড় অস্বস্তিকর বলে মনে হয়। তাপু থাকে ইস্কুলে। শাশুড়ী ধর্মগ্রন্থ পড়তে পড়তে চোখ বোজেন। সারাবাড়ী তার কাছে কেমন নিঃশব্দ আর শূন্য বলে মনে হয়। দশ বছর বিবাহিত জীবনে তার কাছে বাড়ীর সকলেই কিছু একটা প্রত্যাশা করেছে, কিন্তু সে তাদের সে আশা সফল করতে পারেনি। সেজন্য সে নিজেও কম দুঃখ পায়নি। ব্রত তাক্, দানধ্যান, পুজো-আচ্চা সব কিছু করেছে সে। এতে অর্থহানি হয়েছে, কিন্তু মনের যন্ত্রণা দূর হয়নি।

গান গাইতে জানেনা সবিতা; কিন্তু এই বিমর্ষ দুপুরে একটি শিশুকে কোলে নিয়ে কয়েকছত্র ঘুম পাড়ানি গান সে নিশ্চয়ই সুর করে গাইতে পারত।

সূচীকর্ম সে কিছু কিছু শিখেছিল; কিন্তু কচি দেহের মাপের একটি কাঁথার ওপর যদি দু'একটা নক্সা সে না তুলতে পারল তাহলে কাজ কি অমন সূচীকর্মে।

সবিতা আজকাল বড় বেশী বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে দুপুরগুলো যেন তার আর কাটতেই চায়না।

সেদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। সবিতার দাদা আসবেন বোনের বাড়ী নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। থাকেন নাসিকে। সম্প্রতি বোনের ডাকে বহুদিন পরে কলকাতা আসছেন। স্টেশনে গেছে শুভঙ্কর।

সবিতা কি করবে ভেবে পাচ্ছেনা। সারা সকাল বসে বসে মনের মত খাবার আয়োজন করেছে। নানা রকমের মাছ আনিয়ে হরেক রকম পদ রচনা করেছে সে। দাদা মাংস খাননা, তাই ওটা সবিতাকে বাদ দিতে হয়েছে। কিন্তু সেজন্য আয়োজনের ঘাটতি পড়েনি কোথাও।

শেষে একটু পায়েস রান্না করেছে। এইটিই তার অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের শেষ রচনা। কাজু বাদাম,

পেস্তা, কিসমিস দুধের সঙ্গে মিশে তৈরী হয়েছে এক ঘনীভূত অমৃত। সবিতা জানে, এই জিনিষটি চিরদিনই তার দাদার অতি প্রিয়বস্তু।

সবেমাত্র পায়েস রান্না শেষ করে উঠেছে সবিতা, বাইরে কড়া নড়ে উঠল। হাতটা ধুতেও সময় পেলনা সে। পড়ি কি মরি করে ছুটল দরজা খুলতে।

দাদা এসেছেন অনেকরকম জিনিষপত্র নিয়ে। অবস্থাপন্ন। বোনের বাড়ী এতকাল পরে আসার জন্যে আত্মীয়তার ত্রুটি রাখেননি কোথাও। ট্যাক্সি ভরে জিনিষপত্র এনেছেন। কাপড়চোপড় থেকে ফলমিষ্টি সবকিছু। সবিতা আর তাপু সব গুছিয়ে তুলতে লাগল। ধর ফেলার যেন সময় নেই।

এরপর দাদার জন্যে স্নানের ব্যবস্থা করে দিয়ে সবিতা চলে এলো রান্না ঘরে। এখন থালায় খাবার সাজিয়ে রাখতে হবে। অনেকগুলি পদ একে একে সাজাতে হবে তাকে।

একি, সবিতার বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। দাদা আসার সময় ও সেই যে রান্নাঘর থেকে দৌড়ে গিয়েছিল আর পেকল তুলতে মনে নেই তার। ভয়ে ভয়ে ঢুকল সবিতা। সব ঠিক আছে। কিন্তু পায়েসটা! রান্নাঘরের কোণে যে পাত্রে পায়েস রাখা ছিল, সেটি ঠিক আছে, কিন্তু তাতে পায়েসের চিহ্ন মাত্র নেই। নিঃশেষে চেঁছেপুছে বেড়ালটা কখন খাওয়া-খাওয়া সেরে সরে পড়েছে।

সবিতা বসে পড়ল। বসে পড়া ছাড়া আর উপায় বা কি। মাথাটা তার ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল।

দাদা খাওয়াদাওয়া শেষ করে আর থাকলেন না। বিশ্রামের পর বেলের বাড়ীতে চলে গেলেন। সবিতারও আর নতুন করে দাদাকে পায়েস খাওয়ানো হলনা। সে দুঃখ তোলার নয়।

বাড়ীর সকলেই ক্ষুব্ধ হল। শেষে অনেক কষ্টে বেড়ালটাকে ধরে থলের ভেতর কৌশলে পুরে কৈলা দাসীকে দিয়ে কাছেপিঠে আদিগঙ্গা পার করে দিয়ে আসা হল।

নিশ্চিন্ত হল পাড়াটা। উপদ্রুত এলাকা এখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কিছুদিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে একটি আনন্দের খবর সারা বাড়ী চঞ্চল করে তুলেছে। এতকাল পরে মা হতে চলেছে সবিতা। তাপু আজকাল পাড়া বেড়ানোর সময় অনেক সংক্ষেপ করে ফেলেছে। সে প্রায় বৌদির কাছে বসে গল্পগুজব করে।

অভয়াদেবী যখন তখন সবিতার কাছে এসে তালবন্ধ খবর নিচ্ছেন। জপ করতে করতে যখন তখন নাম ভুল হয়ে যাচ্ছে তাঁর।

গোপাল কিংবা গৌরী আসছে তাঁর ঘর আলো করতে। সেই ছবি বারবার দেখছেন তিনি।

গুরুকর অফিসের হিসেব আর ঘরে আনেনা। ছুটির দিনগুলো আজকাল সে কাটায় ঘরের মানুষের সঙ্গে হাসিঠাট্টার ভেতর দিয়ে।

সবিতা দুপুর বেলা বসে বসে কাঁথা তৈরী করে আর গুন গুন করে গানের সুর ভাঁজে।

এই আনন্দের দিনে একটি চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গেল। তাপুই বয়ে নিয়ে এল খবরটা। দু'বাড়ীর মাঝে একটা অপ্রশস্ত ড্রেন। সেই ড্রেনের ওপর বসান ছিল অনেক দিনের পুরোনো পরিত্যক্ত একটা ট্রাম। তার ভেতর মিউ মিউ শব্দে আর্তনাদ করছে কয়েকটা বেড়ালছানা। ও বাড়ীর পাঁচিলের ওপর থেকে তাপুর চোখে চোখ পড়ল যার, সে তাপুর বহুদিনের বহু দুঃখের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত।

তাপুকে দেখে সে আর ভয় পেলনা। পাঁচিলের ওপর থেকে লাফ দিয়ে নেবে এসে গিয়ে ঢুকল গিয়ে ঘরের মধ্যে। দুধ দিয়ে শান্ত করতে লাগল বাচ্চাগুলোকে।

সেদিন শনিবার। পাশের বাড়ী থেকে সবিতার জন্যে একটু পায়েস দিয়ে গিয়েছিল। সবিতা একা সেটুকু না খেয়ে খানিকটা গোপনে তুলে রেখেছিল শুভঙ্করের জন্যে। আজ সকাল সকাল ওর আফিস থেকে ফেরার কথা আছে। এলেই খেতে দেবে পায়েসটুকু। ঢাকা দিয়ে শোবার ঘরে খাটের তলায় রেখেছিল পাত্রটা। তারপর দুপুরে কাঁথা সেলাই করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার সামান্য একটা শব্দে। চোখ চেয়ে দেখল, সেই বেড়ালটা আধখানা শরীর খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে পায়েসটুকু চেটে চেটে খাচ্ছে।

সবিতা মারবার জন্যে হাতটা তুলল। কিন্তু একি হল তার, মারতে গিয়ে মারতে পারলনা। শব্দ না করে সে চুপচাপ পড়ে রইল বিছানার ওপর। শব্দ হলেই পায়েসটুকু শেষ না করে বেড়ালটা পালিয়ে যাবে।

আহা, থাক না, একটু পায়েস বই সোনাদানা তো না। সবে বাচ্চা হয়ে কি হাল হয়েছে বেচারার। হাড় ক'খানা জির্ জির্ করছে। রাগের চেয়ে বেড়ালটাকে দেখে সবিতার দুঃখই হল বেশী।

ঠিক সেই সময় ঘরে এসে ঢুকল শুভঙ্কর। খাটের তলা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল বেড়ালটা। ব্যাপার শুনে শুভঙ্করের রক্ত উঠল মাথায়। আজ ওকে মেরেই ফেলবে সে। একদিন যাকে সে পরোক্ষে সমর্থন করেছে, আজ তার জন্য কোন মায়া নেই তার। কয়লাভাঙা হাতুড়িটা নিয়ে ঐ ভ্রামটার দিকে বেরিয়ে যাচ্ছিল শুভঙ্কর। অভয়াদেবী সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কি করছিস খোকা, থাক্ থাক্, মা ষষ্ঠীর বাহন। মারতে নেই।

তাপু ইতিমধ্যে একটি রাঙাপুই বেড়ালবাচ্চাকে আদর করতে করতে সামনে এসে হাজির।

দেখ দাদা, কি সুন্দর চোখ আর গায়ের রঙ হয়েছে।

সবিতা এসে কোন কথা না বলে শুভঙ্করের হাত থেকে হাতুড়িটা নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিয়ে আবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে রইল শুভঙ্কর। আজ কি হল এদের সবার। জীবনে এত হিসেব মিলিয়েছে সে, কিন্তু এই সামান্য হিসেবটা সে আর কোনরকমেই মেলাতে পারলনা। শুভঙ্করের এতদিনের আর্থী এই প্রথম ভুল হল।

শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি

চার্লস্ ডিকেন্স তাঁর উপন্যাসের প্লট খুঁজতে একবার এসেক্স প্রদেশে গিয়েছিলেন।

হঠাৎ সেখানে তাঁর চোখে পড়ল রাস্তার ধারে একজন মোটা টেকো লোক এমন ভাবে যাচ্ছে যে তাকে দেখে সকলে হেসেই অস্থির।

ডিকেন্স লক্ষ্য করলেন। লোকটি কিন্তু হাসছে না। এমন কি বুঝতেও পারছে না, যে লোকে যে তাকে হাসছে।

ব্যাপার মন্দ নয় ত।

ডিকেন্স খুব ভাল করেই লোকটিকে লক্ষ্য করলেন, তারপর ফিরে এসে স্থরী করলেন মিঃ পিক্‌উইককে।

চলতি দুনিয়া

প্রসূতির মোহে পড়ে' ও কয়েকটা শারীরিক সুবিধা বজায় রাখতে আধুনিক সন্তানবতীদের কেউ কেউ সন্তানকে শুধু দান করা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। অবশ্য অনেক তরুণীর ধারণা এতে তাঁদের গঠন-সৌন্দর্য্যের হানি হয়। এর বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তি যে একেবারেই নেই, তা' বলা চলেনা। ভবিষ্যৎ সন্তান-জীবন যে প্রাথমিক মাতৃ-দুগ্ধ অভাবে পঙ্গু ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, একথা আজকাল বড় বড় বৈজ্ঞানিক স্বীকার করেছেন। মাতৃ-দুগ্ধের চেয়ে শিশুর পক্ষে আর কোন খাদ্যই উপযুক্ত নয়—"Breast feeding if properly established gives the baby a flying start in life, since breast food is the food designed for it by nature, and there is a considerably reduced risk of infection." তা' ছাড়া শরীরতত্ত্ববিদ্‌দের মতে—"In the mother, breast feeding also has the effect of reducing the womb quickly to its normal size, thus preventing displacements." প্রাচীন ও মহৎ-সভ্যতার লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষে সন্তানকে স্তন্যদান মাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

—কেমিনা

• • •

হাতের লেখা দেখে লোকচরিত্র নিরূপণ করা যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এতদিন চলত, আজ তার কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। হাতের লেখা থেকে অনেক ফৌজদারী মামলার সুরাহা হয়েছে, অনেক অপরাধী নিঃসন্দেহকারে ধরা পড়েছে। যে খুনীমামলায় পুলিস আসামীকে ধরবার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছে, হঠাৎ ছোট্ট একটি চিরকুটে দু' একটি লাইন হাতের লেখার টান দেখে অনেক কিছু রহস্য আবিষ্কৃত হোল। দু'জন লোকের হাতের লেখা কখনও এক হতে পারে না; সামান্য তফাৎ থাকবেই, থাকবে। "Handwriting is a mirror of Character. No two people are exactly alike—and nor are two handwritings." স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের খুনো গোয়েন্দারা কোন হাতের লেখা দেখে তখনি বলে দিতে পারেন,—কোন্ ভদ্রলোক "a lover of beauty", কোন্ ভদ্রমহিলা "Sweet and kind", কোন্ তরুণী "ambitious" কোন্ কিশোরী "Nice and reliable", কোন্ যুবক "calm and confident."—ইত্যাদি। নানা দেশে হাতের লেখার মাধ্যমে এখন অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে, বিশেষতঃ নারীচরিত্রের রহস্য নিয়ে।

—উওম্যান্‌স্ ডে

• • •

মহাশূন্য জয় করবার আগ্রহে মানুষ যতই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নিচ্ছে, ততই অনন্ত আকাশের মহিমময় বৈচিত্র্যে তার মনে স্বভাবতঃ এই প্রশ্নই জাগ্‌ছে, ভগবানের রূপ কি? অনন্ত আকাশের কোটী কোটী জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, দূরতম ক্ষেত্রে ও নীহারিকার অপরূপ মহিমামণ্ডিত দৃশ্য,—এই কি ভগবানের রূপ? ভগবান তা'হলে দেখতে কেমন? "What does God look like?" মানুষ যখন "poised on the brink of conquering space" তখন মানুষের মনে কেন এ ধারণা এল? যে বিজ্ঞান এতদিন ভগবানের অস্তিত্বে সন্দিহান হয়েছে, আজ কোন্ সূত্রে সে আবিষ্কার করল—ভগবান্ আছে। মহাশূন্য জয় করতে গিয়ে সে বিস্ময়চকিত-নেত্রে দেখ্‌ল—"a new road, a new route, a new way,—a new star to follow, a new world to find", তার মাথা নত হয়ে গেল বিশ্বজগতের অচিন্তনীয় রহস্য দেখে,—

তাকে বলতে হোল,—হে অদৃশ্য ভগবান্,—তুমি আছ, তুমি আছ। তাই জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকও "continues in search of God."

—ডেলি মিরর্

• • • •

নারীর জীবনে রন্ধনও যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, সে কথা অনেক সমাজবাদী নেতা স্বীকার করতে আরম্ভ করেছেন। সম্প্রতি ভারতে "All India Women's Food Council" স্থাপিত হয়েছে। শুধু তা' নয়, তার সঙ্গে আরও একটি বিরাট পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয়েছে,—সেটি হচ্ছে—"The establishment of a College of Catering" যার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে থাকবে—"best efforts in cooking". নিপুণ ও নির্দোষভাবে সুখাদ্য আহার্য প্রস্তুত করা প্রত্যেক গৃহিণীর শুধু আদর্শ নয়, পারিবারিক ধর্ম। এতদিন রন্ধনকার্যকে আধুনিক নারীরা উপেক্ষা করতেন, আজকাল সুবাতাস বইছে,—তাই নিজের হাতে রন্ধন ও পরিবেশনে নারীরাই এগিয়ে আসছেন।

—ফেমিনা

• • • •

প্রাণীজগতেও যে সময়ে সময়ে মনুষ্যসুলভ প্রতিভা ও শিল্পানুরাগ দেখতে পাওয়া যায়, তার সংবাদ আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি এক গরিলা কোন শিক্ষা বা নির্দেশ না পেয়েও একখানি ছবি এঁকেছে। ছবিটি অবশ্য কতকগুলি কালির আঁচড় ছাড়া আর কিছুই নয়, তবুও তার মধ্যে জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা ও শিল্পসমালোচকেরা এক নূতন আর্টের সন্ধান পেয়েছেন। এই গরিলাটির নাম "সোফি" (Sophie) এবং তার শিল্পকৌশল দেখে সকলে চমৎকৃত হয়েছেন।—কিন্তু সমালোচকের মতে—"Sophie's artistic creations might afford the animal psychologist an interesting insight into the emotional world of the anthropoid apes."

—ইলাসট্রেটেড উইকলি

• • • •

জার্মানীতে পূর্বে সংস্কৃতচর্চা বেশ ভালরকমেই আরম্ভ হয়েছিল আর অনেক কিছু অনুবাদ ও গবেষণা চলেছিল সেই সঙ্গে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর দিনে, যখন পরাজিত ও বিধ্বস্ত জার্মানী দুটী বিরাট শক্তির দুইদিকের চাপে অস্থির হয়ে উঠেছে, তখন সেইদেশে আবার নূতন করে সংস্কৃত ভাষাচর্চা একটু আশ্চর্যের বিষয় নয় কি? নিম্নলিখিত গবেষণামূলক সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তকগুলি দেখলে অনেকখানি ব্যাপারটা বোঝা যাবে,—যথা, "An attempt at a critical evaluation of Kathopanishad (কঠোপনিষদ্)," "Handbook of Sanskrit", "Tibetan-Sanskrit", "Influence of the Dravidian Languages on Sanskrit", "The Role of Siva in Mahabharata", "Sanskrit and regional languages of India", "The Maha-Vedantasutra", "Vinayavibhanga", "Logic of the Mahabhashya," "The position of women in Kautilya and Manu" "Arthasastra of Kautilya," "Works of Kalidas", "Mudra-Rakshas", "Kathasaritsagar", ইত্যাদি। সংস্কৃত অনুবাদ এত পুস্তকের হয়েছে, যে তাতে একটা লাইব্রেরী খোলা যায়।

—জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক

• • • •

মানুষ অনন্ত শূন্যের খবর রাখছে, সুদূরতম নক্ষত্র ও নীহারিকা নিয়ে গবেষণা করছে, চাঁদের অপর পৃষ্ঠের কটো তুলে তার নানা অনুসন্ধান চালাচ্ছে, কিন্তু এই পৃথিবীর খবর মানুষ কতটুকুই বা রাখবার চেষ্টা করছে। এতদিন পর্য্যন্ত মানুষ যেটুকু জ্ঞানলাভ করেছে, সেটুকু এতই প্রাথমিক যে, তাকে ঠিক

জান বলা চলে না। "Soviet geologists who recently completed some intensive studies of geo-physical phenomena have come to the conclusion that we are only just beginning to understand this planet." এ পর্যন্ত পৃথিবী সম্বন্ধে অনুসন্ধানের মহাবিজ্ঞানীগণ যতখানি জ্ঞান অর্জন করেছেন ও মোটা মোটা বই লিখেছেন, সে সব সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের মতে "Vague information" মাত্র। এখন ভূমিকম্পের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর গূঢ়তত্ত্ব জানবার প্রয়াস চলছে, "Soviet scientists found during their investigation that the easiest way to understand the anatomy of the earth was to analyse its pulse—the frequent earthquakes." —লিংক

• • • •

চীনের জাতীয় সম্পদ ও প্রাচীন দ্রব্যাদি চীন দেশ থেকে শুধু যে বিদেশীরাই অপহরণ করে নিয়ে গেছে তা' নয়, চীনের নামজাদা দেশপ্রেমিক, আমেরিকার আদুরে ছেলে চিয়াং কাইসেকও এ বিষয়ে অনেক কুকীর্তি অর্জন করেছেন। প্রাচীন চৌ বংশের বহু স্মৃতিচিহ্ন (খ্রীষ্টপূর্ব ২২১ সালের ও খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭১ সালের) তিনি শেষে বিদেশীর হাতে তুলে দিয়েছেন, "looted and taken to Taiwan by the Chiang Kai-shek clique". এখন সমগ্র চীন দেশে দিকে দিকে শুধু এই আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে—"Stop the U. S. pillage of China's cultural treasures". এ বিষয়ে নিজের দেশে আন্দোলন করেই চীনারা ক্ষান্ত হয়নি, তারা আমেরিকাকে লিখিতভাবে এক সাবধানবাণী পাঠিয়েছে (a stern warning to the U. S. Government), আর চিয়াং কাইসেকদের তীব্রভাবে জানিয়েছে—"খবরদার, আর দেশের প্রাচীন সম্পদ বিক্রী করো না, ("warns the Chiang Laishek clique that it is not permitted to sell secretly the nation's cultural treasures") এবং কড়া আদেশ জানিয়েছে—"restore them to the motherland." —চায়না

• • •

কৃষিকার্যের সুবিধার জন্যে অনেক কিছু কলকব্জার আবিষ্কার হচ্ছে ও তা প্রয়োগ করা হচ্ছে মাটিতে, কিন্তু আকাশের মুখ চেয়ে দিনের পর দিন থাকতে হলে কৃষিকার্যের খুবই ব্যাঘাত ঘটে। তাই নানা দেশে কৃত্রিম মেঘ ও বারিবর্ষণের বৈজ্ঞানিক উপায় নির্ণীত হচ্ছে ও পরীক্ষা চলছে। ভারত এ বিষয়ে পিছিয়ে থাকলেও তার প্রতিবেশী ভিয়েটনাম এবিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। কৃত্রিম বৃষ্টিধারা চাষবাসের খুবই সুবিধা হয়েছে ভিয়েটনামবাসীদের। "The meteorological service has successfully completed experiments for making artificial rain" —ভিয়েটনাম

• • • •

গভীর সমুদ্রতলে মানব সভ্যতার যে সকল প্রাচীন নিদর্শন এখনও অনাবিষ্কৃত রয়েছে তার সন্ধান এখন নানাদেশে চলছে। সম্প্রতি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের এক জাহাজ সমুদ্রতলে আবিষ্কৃত হয়েছে ("ancient wreck dating from the 1st century B. C. was found by divers in 100 ft. of water off French Riviera") অবশ্য সমুদ্রতলের নানা আবিষ্কারের জন্য অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মির প্রয়োজন এবং সেটা উপরের জাহাজ থেকেই উৎপাদন করা হয় "6000-watt flood lamps fed by ship's generator."

• —টাইম

॥ বাংলা উপন্যাসের সূচনা ॥

আজ থেকে অনেক দিন আগে, ১৯৭ সালে, একদিন গ্রীষ্মকালের সন্ধেবেলায় হঠাৎ মেঘ ক'রে এলো আকাশে, তারপরেই নামলো প্রবল বৃষ্টি ; আর তারই ভিতর এক অশ্বারোহী যুবক পথ হারিয়ে এলেন এমন এক জনহীন প্রান্তরে, যেখানে পাথরের তৈরি মস্ত একটি মন্দির সেই কালো ঝড়ের ভিতর একা দাঁড়িয়ে আছে। একের পর এক পাথরের সিঁড়ি পেরিয়ে যুবক মন্দিরে উঠে এলেন, অন্ধকারে হাৎড়ে দেখলেন দুয়ার ভিতর থেকে বন্ধ ; সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজে কোড়ো কাক হ'য়ে যাওয়ার চেয়ে ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নেয়াটা তাঁর অনেক বেশি পছন্দ হ'লো, কাজেই সবল করাঘাতে কাঠের দুয়ার ভেঙে তিনি ভিতরে ঢুকে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ ঝড়ের হাওয়ায় ভিতরের ক্ষীণ প্রদীপশিখা নিভে গেলো, আর শোনা গেলো অস্ফুট এক চীৎকার। যুবকটি নতুন প্রদীপ এনে আবার সেই ঘরে প্রবেশ ক'রে চকিত দীপালোকে দেখতে পেলেন রূপসী দুই রমণী ভিতরে ব'সে আছেন। বলাই বাহুল্য, তাঁদের একজন তিলোত্তমা, এবং আরেকজন বিমলা।

ভাবতে অবাক লাগে, সরকারিভাবে স্বীকৃত প্রথম বাংলা উপন্যাস এইভাবে শুরু হয়েছিলো ; এমন নয় যে, এই দ্বার খোলার ব্যাপারটি কোনো অচেতন প্রতীকের মতো কাজ করেছে, কোনো ফ্রাকতাসীয় সমাপতনই তা করে না ; কিন্তু তবু এরই ভিতর থেকে আমরা আবিষ্কার ক'রে নিতে পারি সংগোপন একটি সংযোগ, যা কোনো-কোনো অবসরের মুহূর্তে আমাদের উপভোগের ভিতর আরেকটি নতুন স্বাদের সঞ্চার ক'রে দিতে পারে। আসলে উপন্যাস নামক সাহিত্যের এই সর্বশেষ ও নতুন পদ্ধতিটি হাতে-পাওয়া মাত্র আমাদের দেশের সাহিত্য যেন তার কয়েকশো বছরের কৌমার্য নিয়ে হঠাৎ বিপুল ও বিচিত্রভাবে সগর্ভ হ'য়ে উঠলো। খুলে গেলো নতুন অনেক সম্ভাবনার দুয়ার, আর যাঁকে আমরা কাব্যের দেবী বলি তিনি যেন তারই ভিতর তাঁর রূপ ও লাবণ্যকে নতুন ক'রে, একেবারে অন্যভাবে, আমাদের সামনে উদ্ভাসিত ক'রে দিলেন।

তাছাড়া আর কীই বা বলা যায় ? কেননা 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হবার পর মাত্র একশো বছর কেটেছে, যে কালটুকু সাহিত্যের ইতিহাসে অতি নগণ্য ; পর-পর কয়েকশো বছর কেটে যায় যখন ভূমি বন্ধ্যা থাকে, কোনো কিছুই ফলে না, না-কোনো শস্য, যা স্বাদ ও সৌরভ ছাড়া পুষ্টিও দেয় আমাদের ; না কোনো সুগন্ধি ও সুদৃশ্য লতাবিতান, যা আর-কিছু না-হোক নয়নরঞ্জক হয় ; তার বদলে ক'লে ওঠে আগাছা, কাঁটাগাছ আর চোরকাঁটার কোপ, পদে-পদে ব্যাহত হয় আমাদের যাত্রা। সেখানে যদি একশো বছরের ভিতরেই দেখা যায় যে, শিল্প ও অনুসারী-তুল্য সমেত বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সাহিত্যিকও পুরোনো হ'য়ে গেলেন ব'লে কেবলমাত্র ছাত্র, গবেষক ও অধ্যাপকদের বিষয়বস্তু হ'য়ে পড়লেন, তখন দুটি কারণে ব্যাপারটি আমাদের অভিনিবেশ দাবি করে। এক হ'তে পারে যে, যাকে আমরা জনরুচি বলি, অধিকতর শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গেই তার মান ক'মে গেলো ব'লে বঙ্কিমচন্দ্র (এবং তাঁর শিল্পগুণ) আর আমাদের মনোরঞ্জক হ'তে পারলেন না, কেবল কতিপয় বুদ্ধিজীবীর কুক্ষিগত হ'য়ে থাকলেন ; আর নয়তো, এ-কথা বলতেই হয় যে, একালের মনোভাবের মধ্যেই এমন-কোনো বিরাট ও মৌলিক পরিবর্তন এসেছে, যার ফলে বঙ্কিমচন্দ্র আর সম্পূর্ণভাবে তৃপ্তিকর হ'তে পারেন না। দ্বিতীয় ধারণাটি যদি সত্যও হয়, তাহ'লেও বঙ্কিমচন্দ্রের মর্যাদা কোনো কারণেই কমে না, কেননা

প্রতিদিনের ব্যবহার্য জগতের বাইরে যে-নীহারিকামণ্ডল আছে, সেখান থেকে চিরকালই তিনি তাঁর নীতিময় ভাস্বরতা ছড়িয়ে দেবেন, এবং সেই পূর্বজের কাছে আমরা সকল যুগেই বিনীত ও শ্রদ্ধাশীল-ভাবে পাঠ নিতে যাবো। এই নিবন্ধের ভিতর লেখকের যা অভিপ্রেত তা হ'লো এই : সত্যিই কি সাধারণভাবেই, এবং যোগ্য-কারণেই, আমাদের মানসতার মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, যার ফলে আমরা আর বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুসারীদের কাছে তৃপ্তি পাই না—এই প্রশ্নের বিচার করা। যদি তা হ'য়ে থাকে, তাহ'লে সেই পরিবর্তন কী ক'রে হ'লো, তার স্বরূপ কী, এবং তা সত্যিই অভিপ্রেত কিনা—এই সব প্রাসঙ্গিক বিষয়ও এই নিবন্ধের অন্তর্ভূত হবে। কিন্তু এই মূল আলোচনায় নিয়োজিত হবার আগে সাধারণভাবে আমাদের জেনে নিতে হবে উপন্যাস কাকে বলে, কবেই বা জগতে প্রথম উপন্যাস লেখা হ'লো, এবং বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগটাই বা কী রকম ছিলো।

একজন ঔপন্যাসিক কোনো-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে সোজাসুজি ব'লে ছিলেন যে, গদ্যে লেখা লম্বা মাপের গল্পকেই উপন্যাস বলে। এই কথাটির ভিতরে আর একটি কথাও বলা আছে। লম্বা মাপের গল্প কেউ ইচ্ছে করলে পদ্যেও লিখতে পারেন, এবং তা যে আছে তার ভূরি-ভূরি উদাহরণ আমরা উপস্থাপিত করতে পারি। কথাসরিৎসাগর, যা 'বৃহৎ কথা' থেকে সংকলিত হয়েছে, পদ্যে লেখা; পদ্যে লেখা সহস্রাধিক এক আরব্য রজনী; পদ্যে লেখা আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলি; পদ্যে লেখা চসারের ক্যাণ্টারবারির আখ্যানমালা। অনায়াসে উদাহরণের তালিকা বাড়িয়ে যাওয়া চলে। সেই কারণে 'গদ্যে লেখা বড়ো গল্প'র বীজ কোথায় ছিলো, তার অনুসন্ধানে বেরোলে আমাদের সেই প্রাচীন জগতে গিয়ে উপস্থিত হ'তে হয়, যখন উপায়ের বৈচিত্র্য নানাকারণে অসম্ভব ছিলো ব'লে মূল অর্থেই সাহিত্যের ছিলো এক অখণ্ড চেহারা। তখন অন্য উপায় অবলম্বন করার বহু অসুবিধা থাকায় ছন্দোবদ্ধ কাব্যেই দর্শন, সমাজনীতি বিবিধ ক্রিয়াকর্ম ও নানা বিজ্ঞানের কথা যথেচ্ছভাবে ঢোকানো হ'তো, যাতে পর্বতপ্রতিম তথ্যকে ছন্দের সাহায্যে স্মৃতিতে গেঁথে রাখা যায়। আধুনিক কালে, মুদ্রাযন্ত্র সহজলভ্য হবার পর থেকে, ছন্দোবন্ধনের এই প্রকার প্রয়োজনীয়তা অপসৃত হয়েছে, স্মৃতিকে অনর্থক ভারাক্রান্ত করার দায় থেকে মুক্তি পেয়েছে ছন্দ, এবং প্রয়োজন পড়লেই মুদ্রিত গ্রন্থের পাতা ওল্টাবার ক্ষমতা থাকায় দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সমাজনীতি ইত্যাদি তথ্যনির্ভর রচনা সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলো, সাহিত্য তার ফলে হ'লো কেবলমাত্র রসসাহিত্য, এবং সেই কারণে শুধু যে পদ্যেরই জন্ম হ'লো তা-ই নয়, সুবিধে হবে ব'লে সাহিত্যের মধ্যেই শাখা-প্রশাখা গজালো এই রকম : কবিতা, নাটক, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ বা শিশুসাহিত্য ইত্যাদি। মুদ্রাযন্ত্র আয়ত্ত হবার পর আসলে এই জিনিসটিই সর্বাধিক স্পষ্ট হয়েছিলো যে, সাহিত্য মূলত একটি স্বনির্ভর শিল্প, স্বাবলম্বিতার ক্ষমতা তার আছে, এবং আত্মমূল্যেই তার যোগ্যমূল্য : সাহিত্য মোটেই সংগীতের সেই কথাসূত্র নয় যাকে বলে Libretto, নয় সে ধর্মপ্রচারের বাহন কিংবা ইতিহাসের আকর, বরং আনন্দবেদনার যোগ্য রূপায়ণেই তার যথার্থ মাহাত্ম্য—এই মনোভাবই জন্ম দিয়েছিলো সাহিত্যের অন্তর্ভূত এই নতুন শ্রেণীবিভাগের। এই বিভাগ যে আসলে আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের পক্ষেই প্রয়োজনীয়, এর দ্বারা যে কেবলমাত্র মানুষের পরিকল্পিত সুবিধাজনক একটি ব্যবস্থামাত্র সূচিত হচ্ছে, 'প্রতিভার আকর্ষ অভিঘাতে' যে 'সব জেরেখাই মুছে' যেতে পারে, রসভোগের উজ্জ্বলতম মুহূর্ত ছাড়া সে-কথা আমাদের মনেই হয় না। এদের ভিতরেও যে বিনিময় সম্ভব, সংমিশ্রণ সম্ভব, যোগাযোগ সম্ভব, যে-কোনো শক্তিশালী সাহিত্যিকই সে-কথা আমাদের মনে করিয়ে দিতে পারেন। স্বাপনার যে-উপায়ে সকল শিল্পের সমবায়ে নতুন আরেক শিল্পের জন্ম দিতে চাচ্ছিলেন—

সংগীত, নাটক, কবিতা, চিত্রশিল্প, স্থাপত্যকর্ম ও নৃত্যকলার মধ্যে মিশ্রণ ঘটিয়ে, যে-প্রচেষ্টার নিকটতম আত্মীয় রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি—সেইভাবে অবশ্য নয়, অথচ তবু প্রতিভাধরদের রচনা পাঠ করলে অনেকটা এই জাতীয় একটি অখণ্ড সত্তা আমরা অনুভব করতে পারি। একটি বর্ণমালা, কয়েকটি রং, কতিপয় আওয়াজ : শিল্পীদের হাতিয়ার হলো এইগুলি ; এই সমস্ত উপাদানের নিপুণও রক্তবাষ্পাকারে বানিয়ে তুলতে হয় একটি স্বয়ম্পূর্ণ পৃথিবী, প্রকৃতির অন্তহীন ও অবাধ বিশৃঙ্খল শক্তিসম্ভারকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় শিল্পের অসীম,সংবৃত, একত্রিত শক্তিপুঞ্জে, আনতে হয় তাপ, প্রাণ, স্পন্দন—কোথায় এইমাত্র একটু চাওয়া দিলো তার রেশ, কোথায় কোন বাগানে জ্ব'লে উঠলো লাল গোলাপের পাপড়ি—তার আভা। তা যদি না হয়, তাহ'লে সব চেষ্টাই মিলিয়ে যায় নিরভিজ্ঞান কুয়াশায়, কোনো দাগ কাটে না তা—না ইতিহাসে, না আমাদের মনে। যে-স্পর্শসহ বস্তু জীবনের বিরল মুহূর্তে একতাল গুঞ্জন হ'য়ে ওঠে, তার অনুরণনই যদি না থাকলো, তবে আর কী হ'লো? যেহেতু শিল্পী জানেন সেই সোনা করা জাদুর সন্ধান, যার ফলে ধাতু, ধুলো, হাওয়া ও পুতুলের উপর থেকে যবনিকা উঠে যায়, জীর্ণ ছিঁড়ে যাওয়া সোকা-পড়া শব্দগুলি তাপ বিকিরণ করে, কোথায় কারা ঝিনঝিন ক'রে কথা ব'লে ওঠে, গান, গানের সুর ব'য়ে যায় সময়ের নদীস্রোতের মতো ধানখেত, বন, মাঠ, শহরের পাশ দিয়ে। স্পষ্টই বোঝা যায়, এই জাদু ব্যাপারটি সম্ভব হয়, যদি শিল্পী পারেন সব বস্তু ও নির্বস্তুকের অন্তর্লীন ছন্দকে আবিষ্কার করতে। এবং এই ছন্দ জিনিসটি—('মিটার' বা ধ্বনিপাতের শৃঙ্খলা নয়, বিশ্ববিধানের অন্তর্ভূত ছন্দের কথা বলা হচ্ছে, যাকে ইংরেজিতে 'রিদ্‌ম' বলে) যেহেতু কবিদেরই সবচেয়ে বেশি আয়ত্তে, তাই পৃথিবীর আদি শিল্প কবিতা দ্বারাই রচিত—তাইনি পুরুতের অর্থহীন গুঞ্জন কি মানবগোষ্ঠীর সমবেত নৃত্য—এই সবই এই রিদম বা ছন্দ দ্বারা আক্রান্ত। এই জন্যই দেখি সংস্কৃত সাহিত্যে নাটককে বলা হয় দৃশ্যকাব্য, এবং গদ্যে রচিত গল্প হওয়া সত্ত্বেও 'কাদম্বরীও' কাব্য ব'লেই চিহ্নিত। এই জন্যই আলেমান ভাষায় 'ডিখটের' বা 'কবি' ছাড়া সাহিত্যিককে চিহ্নিত করার মতো আর কোনো শব্দ নেই।

এমন নয় যে প্রাচীন পৃথিবীতে আমরা গদ্য গল্পগ্রন্থের সন্ধান পাচ্ছি না। গ্রীকদেশের 'ডাফনে এবং ক্লোয়ে' নামক রাখালিয়া প্রেমকাহিনী, কি আপুলিয়াসের 'স্বর্ণময় গর্দভে'র রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্তের কথা যে-কোনো পাঠক মনে করতে পারবেন ; কাদম্বরী ও বাসবদত্তার কথাও নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে অনেকের জিহ্বাগ্রে এসে যাচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত বিশ্লেষণের দ্বারা এটাই তো প্রমাণিত যে কাদম্বরী নামক স্মরণীয় চিত্রশালার যোগসূত্র হচ্ছে কবিত্বগুণ, আর পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে নেকনজর থাকলেও 'স্বর্ণময় গর্দভে'র স্মরণীয়তম অংশ হচ্ছে কিউপিড এবং সাইকির প্রণয়কাহিনী, ও শেষ অধ্যায়ের চাঁদের বন্দনা—যা লোককথা থেকে সংকলিত। এবং তাকেই যদি মূল প্রস্থানভূমি ধরতে হয়, তাহ'লে আমরা বেদ-এর 'ব্রাহ্মণ' অংশের কথা উল্লেখ করতে পারি, উল্লেখ করতে পারি ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের ছোটো-ছোটো গল্পগুলি, যা উপমা হিসেবে একের পর এক সারি বেঁধে এসে হাজির হয়েছে। ভারতবর্ষে আমরা প্রাচীনতম যে গদ্যে রচিত গল্পসংকলন পাচ্ছি—ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ বাদ দিলে—তা হ'লো পালিভাষায় রচিত জাতকমঞ্জরী, যা খ্রীষ্টজন্মেরও শতাধিক বর্ষ আগে সংকলিত হয়েছিলো ; পরবর্তীকালে তা জন্ম দিয়েছিলো পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের, কাজেই তাকে একেবারে প্রত্যন্ত বলা চলে না। আবার, আরো এগিয়ে গেলে, আর একটি গদ্য ব্যাপার হাতে পাচ্ছি আমরা সংস্কৃতে, তা হ'লো 'হর্ষচরিত'। কিন্তু ইয়োরোপীয় জাগরণের কাল নামে যা চিহ্নিত, যার সন্ধিলগ্নে বোকাচ্চিয়ো তাঁর 'শতগল্প' সংগ্রথিত করেছিলেন, এবং যে-কালে কতিপয় সামাজিক গুরুত্ব, জনরব ও পরচর্চার কাহিনী ইতালীয় নভেল্লার আকারে পল্লবিত হয়েছিলো, যা পরে স্পেনদেশে

স্বভাবজোচ্ছ্বাসের দীর্ঘ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীতে রূপান্তরিত হ'য়ে হাসি, বিষাদ ও করুণার এক আশ্চর্য সামিশ্রণে শারভেন্টিসের হাতে 'ডন কুইকজোটে' পরিণত হয়েছিলো', এবং যারই অল্প শাখায় জন্মেছিলো রাবলের 'গারগাঁতুয়া ও পাঁতাগ্রুয়েলের' শিক্ষামূলক কাহিনী (আলেমানদেশের বিদ্যুজ্জনোমানের সঙ্গে তার সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে), আর ডানিয়েল ডিফোর 'রবিনসন ক্রুশো'—সবে তাদের এই গ্রীক, পালি, সংস্কৃত ও আরব্য রচনাগুলির একটি জাতের তফাৎ ধরা পড়ে। বোক্কাচ্চিয়ো যদিও তাঁর গল্প সংকলনে আপুলিয়ুস, পেট্রোনিয়াস ও আরব্যরজনীকে ব্যবহার করেছিলেন, তবু তাঁর দৃষ্টি ছিলো একান্তই স্বকালনির্ভর—যে-সকল কতিপয় গল্পপ্রিয় তরুণ-তরুণীকে একত্রিত করেছিলো, তা ঐতিহাসিক ঘটনা, এবং যে-অনাচার, কেলেঙ্কারি এবং কুকাণ্ডগুলিকে তিনি উন্মোচিত করতে চাচ্ছিলেন, তা ছিলো সে যুগেরই সামাজিক বৈশিষ্ট্য। নভেল্লাগুলিরও আদিষ্ট ছিলো অভিজাত সম্প্রদায় ও চার্চের অনাচারের ওষ্ঠনমোচন; ডন কুইকজোটের গল্পভঙ্গ যে পরে চিরকালীন হ'তে পেরেছিলো, তার কারণ হিসেবে একটি আশ্চর্য বিষাদকে আমরা লক্ষ করতে পারি, বত্তিচেল্লির 'ভেনাসের জন্ম' নামক চিত্রের মতোই তা একটি যুগান্তকারী বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সেই গ্রন্থেও ঐ নিদারুণ গল্পভঙ্গের কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়েছে সেকালের সমাজকে, এবং তার ঐহিক আকর্ষণও প্রতি অধ্যায়ে উদ্ভাসিত।

একটা লক্ষণ আমরা এইসবের মধ্য থেকে পেয়ে যাচ্ছি। উপন্যাসের জন্মলগ্নে যে-আবহাওয়া ইয়োরোপকে আক্রান্ত করেছিলো তার মূল চরিত্রই হ'লো একটি দ্বন্দ্ব—দুই মনোভাবের সংঘাত,—তা-ই পরে প্ররোচিত করেছিলো রিচার্ডসনকে পত্রাকারে উপন্যাস রচনায়, যাকে আদি উপন্যাস ব'লে সারা জগৎ মেনে নিয়েছে। এই দুই মনোভাবের সংঘাত পৃথিবীর যে-দেশেই প্রবল হয়েছিলো, সেখানেই গল্প হাতিয়ার হিসেবে এসে হাজির হয়েছে, এবং কাহিনীগুলো হয়েছে সেই সংঘাতকে অঙ্কন করার উপায়। প্রাচ্য ভূখণ্ডেও তাই; জাপান যখন দশম ও একাদশ শতকে 'গেঞ্জির উপাখ্যান' উপহার দিলে, তখন জাপানেও তেমনি এক সন্ধিক্ষণ এসেছিলো; চিনদেশে যে 'সোনালি শতদল' রচিত হ'লো ত্রয়োদশ শতাব্দীর কাছাকাছি, তারও মূল উপজীব্য হ'লো বৌদ্ধধর্ম ও কনফুসিয়াসের আদর্শের সংঘাত, আর এদেরই পূর্বসূরি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় 'জাতকমঞ্জরী'কে, যেখানে জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মবাদকে উন্মোচিত করা হয়েছে। কোনো একটি গ্রন্থের ভিতর যদি এই ব্যাপারটিকে স্পষ্ট ক'রে বুঝতে হয়, তাহ'লে 'সহস্রাধিক এক আরব্যরজনী'র নাম উল্লেখ করতে হয়। বহুশত বৎসরের মানুষের কল্পনা জন্ম দিয়েছে এই গ্রন্থটিকে; একমাত্র ও পূর্ণাঙ্গ যে-করাসি অনুবাদ ইয়োরোপীয় ভাষায় লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্য দিয়ে গ্রন্থটির একটি অন্তর্লীন বিবর্তনকে স্পষ্ট চিনে নিতে পারা যায়। আলাদিন, আলিবাবা, সিনবাদ বা ধীবর ও দৈত্যের রূপকথা, যা পরে প্রতীক হিসেবে বহুবার সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই সব গল্প এই সহস্রাধিক এক রজনী পোড়ার দিকে সংগ্রথিত। রাতের পর রাত কাটলো, আমরা রূপকথার জগৎ থেকে, যেখানে যাদুবিদ্যা, জিন, পরি, রূপসী রাজকুমারীরই প্রাধান্য, সেখান থেকে, ধীরে-ধীরে চ'লে এলাম ইতিহাসের তথ্যনির্ভর 'বাস্তব' জগতে, মুসলমান, খ্রীস্টীয় ও ইহুদি জাতির সংঘাতের মধ্যে, একেবারে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ নামক ইয়োরোপীয় দ্বন্দ্বের ভিতর। বিশ্বের সর্বত্রই এই সাধারণ লক্ষণটি চোখে পড়ে। ব্রাহ্মণ বা উপনিষদে যে-গল্পগুলি এসেছে, তারা নিজেদের মূল্যে আসেনি, এসেছে উপমা কিংবা রূপক হ'য়ে, যার ভিতর দিয়ে উন্মোচিত হবে কোনো তত্ত্ব বা বিদ্যা, 'জাতক' বুদ্ধদেবের জন্মান্তরই কেবল মানে নি, সেই সঙ্গে মেনেছে তাঁর পশুজন্মের ইতিবৃত্তগুলিকেও, এবং শ্রেষ্ঠীকুল, সাধারণসমাজের প্রতিনিধি অনেক থাকলেও সমস্ত বইটার ভিতর রূপকথার চরিত্র একেবারে অস্পষ্ট নয়; এখানেও গল্পগুলি এসেছে

অন্য কারণে, নিষেধের গায়ে না-দাঁড়িয়ে তারা সারি বেঁধে থাকে একটি তত্ত্বকথা প্রমাণ করার জন্য—এবং বোঝাচ্ছিলেন যে-কালে নীতিগ্রন্থের বাইরে আরেকটি গল্প দিয়ে—অর্থাৎ সেই নরনারীর নিষ্ঠুর ক্রিয়াকলাপ দিয়ে—গল্পগুলিকে একত্র করা হয়েছিলো, ভাতকমঞ্জরীতেও তেমনি দাঁড়িয়ে থাকেন অসংখ্য বোধিসত্ত্ব যাঁরা পরে একই বুদ্ধদেবের ভিতরে ডুবে গেলেন। শুধুমাত্র বিনোদের জন্য বোধহয় কামন্দকী, বাসবদত্তা ও আরবারজনী ছাড়া আর কিছুই রচিত হয়নি; এমনকি ফিরদৌসী যখন 'শাহনামা' রচনা করলেন, কাব্যাকারে যার ভিতর উপন্যাসের অজস্র উপকরণ লুকিয়ে আছে, তখনও সুলতানের তুষ্টিসাধন তাঁর লক্ষ্য এবং 'হর্ষচরিত'ও কি ওই জাতীয় কোনো গদ্য উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি?

শাহনামার কথা এই কারণেই বলতে হ'লো যে উপন্যাসের উৎস খুঁজতে গেলে শেষ পর্যন্ত আমাদের আদিকালের মহাকাব্যগুলিতেই পৌঁছোতে হয়। রামায়ণ কি মহাভারত, ইলিয়াড কি ওডিসি-বাইবেল, এমনকি গিলগামিশ পর্যন্ত সকলেই—একটি মূল লক্ষণের দ্বারা আক্রান্ত। এরা ছন্দোময় কবিতায় লেখা হ'লেও আসলে মানুষের কাহিনী সে-বিরাট সমগ্রতাকে পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করছে, উনবিংশ শতাব্দীতে—বিংশ শতাব্দীতেও—উপন্যাসের মূল ধ্যানের বস্তু তা-ই ছিলো ব'লে একটি জনপ্রিয় মতও আছে যে, উপন্যাস হ'লো প্রাচীন এপিক বা মহাকাব্যেরই বংশধর। এমনকি হয়তো তাদের নামান্তর। গল্পের ক্ষুধা মেটাবার জন্যই উপন্যাসের জন্ম, কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তিটুকু সেটেই তার স্রষ্টারা তৃপ্ত থাকতে পারেন নি। সাধ-মেটানো গল্প বলতে গিয়ে তাঁরা জীবনের অগাধ রহস্যের মুখোমুখি হয়েছেন, আর সেই সাক্ষাৎকারের বিস্ময়, বেদনা ও আনন্দ তাঁদের কাহিনীকে ইচ্ছাপূরণকারী দিবাস্বপ্নের ক্ষুদ্র সীমা ছাড়িয়ে সন্ধান ও উপলব্ধির আর-এক অতলতায় নিয়ে গেছে। উপন্যাস নামক সাহিত্যিক পদ্ধতি যে কালক্রমে সাহিত্যের অতিপ্রিয় শাখা হ'য়ে উঠলো, তার কারণ কি এই নয় যে, উপন্যাসের কাছে আমরা এমন একটা কিছু পেয়েছিলাম, যা মানুষের ভাষার যাদুকর আর-কোথাও কেউ দিতে পারেনি—না ধর্ম কি রাজনীতি, না দর্শন কি বিজ্ঞান। কী সেই জিনিস? উত্তরে বলা যায়, এই পৃথিবীর সমান্তর আর-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথিবী যেখানে মানুষের জীবনের এক দুর্জ্ঞেয় তরঙ্গভঙ্গের চিত্র অস্থির বিন্যাস, কোনো সূত্র দিয়ে যাকে সংক্ষিপ্ত করা অসম্ভব, কোনো সীমা টেনে যার শেষ কথা বলা যায় না। বিচিত্রগতি জীবন যেখানে নিজের আলোয় নিজেকে খুঁজছে, তার নিজের ভাষায় তাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে, বোঝা না-বোঝার সেই অস্থির ও নিরন্ত আকুলতা দিয়েছে ব'লেই জগতের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তাই শুধু তথ্য নয়, তত্ত্ব নয়, এমনকি নিছকই কল্পনাজাত এক খেয়ালি বিলাস নয়, তা সমস্ত মানুষের আত্মসন্ধানের অভিযান,—উল্লাস আর হতাশা, বিস্ময় আর উত্তেজনা যার মধ্যে একাকার ও মোহমান হ'য়ে আছে। শুধু যে জীবনেরই ছায়া সাহিত্যে পড়েছে তাই নয়, সাহিত্যের স্রোত জীবনকে নতুন চেতনার উপকূলে পৌঁছে দেবার তরঙ্গ তুলেছে। টলস্টয়ের বিখ্যাত মাংস, ডস্টয়েভস্কির আত্মা, ডিকেন্সের কৌতুক, আনাতোল ফ্রান্সের বিদ্রূপ, টোমাস মানের আপাতনির্লিপ্ত পাণ্ডিত্যিক নিরপেক্ষতা, কাফকার দুঃস্বপ্নকুলা রূপক, কি জয়স ও প্রুস্তের চেতনাপ্রবাহের অনেক ঢেউ—সবকিছুই তাই মানবজীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ও সমগ্রতাকে নির্ণয় করার চেষ্টা হিসেবে স্মরণীয়। তাঁদের কাহিনীর যে-কোনো দিনের বিবরণের ভিতর প্রবহমান নিরবধি কালের বিপুল স্রোতোধারা, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চরিত্রের ভিতরেও মানবসত্তারই সনাতন ও নামহীন বিস্ময়। ঐতিহাসিক যেখানে ব্যর্থ, বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ যেখানে হতাশ, দার্শনিকের সরল সমীকরণ যেখানে কোনো আলো ফেলতে পারেনা

জীবনের সেই মূল রহস্যের কাছাকাছি ক'রেই শুধু সাহিত্যিক আর হন না, সেখানে তিনি আলো ফ্যালেন, সন্ধান করেন, একেবারে খাঁটি অর্থে অন্বিষ্টভাবে খোঁজেন জাল ফেলে-ফেলে ; আর সেই চেষ্টারই ফলে কখনো স্রোতের ভিতর থেকে উঠে আসে রূপসী কোনো জলকন্যা, যার চুলে পেঁচিয়ে আছে শঙ্খ আর কড়ি, বুকে প্রবালের কণা আর মুক্তোর দীপ্তি, সারা গা বেয়ে জল ঝরছে, ঐ বুঝি রুপোলি ল্যাজের ঝাঁপের উপর চকচক ক'রে উঠলে রোদ, তার পরমুহূর্তে তা মিলিয়ে গেলো আবার, আর হয়তো তাকে পাওয়াই গেলো না।

রেনেসাঁস যাকে বলি, ইয়োরোপের ইতিহাসের দীর্ঘ কয়েকশো বছরকে তা যদি অধিকার ক'রে না নিতো, তাহ'লে উপন্যাসের এই বিপুল ও নিরন্ত প্রতিপত্তি কতখানি প্রসার লাভ করতো সন্দেহ আছে। জীবনের প্রতি, সমাজের প্রতি নতুন এক প্রশ্নের ভঙ্গি তা জাগিয়ে দিয়ে গেলো : বোঝার চেষ্টা, মানে খোঁজার ইচ্ছে এইসব তীব্র হ'লো ; চার্চের অনাচারই হোক কি অভিজাতদের স্বেচ্ছাচারিই হোক—গল্পের ভিতর দিয়ে তাদের এইভাবে সমালোচনা করার ইচ্ছে যদি না জাগতো, যাকে ঐকাহিকতা বলি, পার্থিবতা বলি, জগৎ সম্বন্ধে সচেতনতা বলি, তা যদি না-আসতো তবে উপন্যাসের জন্মলগ্ন কত দূর পিছিয়ে পড়তো তা দুরকল্পনার বিষয়। কিন্তু একটা জিনিসতো ঠিক যে, গল্পে গল্পের আকারে কিছু বলবার চেষ্টা সাহিত্যের প্রায় আদিকাল থেকেই ছিলো, এবং এই নিবন্ধের সূচনায় তাদের কিছু-কিছু উল্লেখও করা হয়েছে। অথচ রেনেসাঁসের সময়েই তা ইয়োরোপের সর্বত্র ধীরে-ধীরে প্রায় একই কালে, সুবিস্তারী প্রভাব বিস্তার করলে। ভিকো, সারভেন্টিস বা রাবলে সত্ত্বেও আমরা রিচার্ডসনকেই মেনে নিয়েছি আদি উপন্যাসের লেখক ব'লে, কিন্তু এ-কথা তো ঠিক কোনো জিনিসই রাতারাতি, আলাদিনের ভাতুর মতো, হ'য়ে যায় না, তার জন্য চেষ্টা, সন্ধান ও উদ্যম বহুকাল থেকেই করতে হয়। রেনেসাঁস নামক প্রক্রিয়াটি যেমন লক্ষে-অলক্ষ্যে অনেককাল ধ'রে চলেছিলো, তেমনি উপন্যাসের জন্মের আগেও অনেকদিন ধ'রে ইয়োরোপের সর্বত্র জমি চাষ করা হ'লো, বীজ ছিটোনো হ'লো, সার দেয়া হ'লো, এবং পরে ধীরে-ধীরে একদিন সম্ভব ক'রে তোলা হ'লো রিচার্ডসনকে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে ফীল্ডিং ও লরেন্স স্টার্ন। কনস্টান্টিনোপলের পতন যেমন ইতিহাসের একটি সুবিধাজনক তারিখ, রিচার্ডসনের অভ্যুদয়ও তেমনি। না হ'লে শ্রীমতী মুরাসাকির উপাখ্যান বা চেং পেং পীই-এর বিরাট কাহিনী কেন উপন্যাসের আদি তারিখ হবার সম্মান পেলো না, সেই বিতর্কের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। বিতর্কটিকে সযত্নে পরিহার ক'রে বলতে হয় যে, প্রাচ্যের সমস্ত প্রভাব সত্ত্বেও—এবং তা ইয়োরোপে আরবদের মারফৎ গিয়েছিলো ব'লেই ইতিহাস বলে—জাপানি বা চীনে উপন্যাস দুটি উপন্যাসের সেই আদিকালে কোনো সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি—তার কারণ হ'লো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিলো না, এবং এই উপন্যাসগুলো যখন ইয়োরোপে অনূদিত হ'য়ে গিয়ে পৌঁছুলো, তার আগেই রিচার্ডসন তাঁর পত্রাকার উপন্যাসের দ্বারা সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ জয় ক'রে নিয়েছেন : ফ্রোটে মোহিত ও বিবশ, ক্রান্স পাল্লা দেবার জন্য Abbé Prevost এর 'ম্যানন লেসকৎ' হাজির ক'রে ফেলেছে, স্পেন তার স্বভাবজোচ্চোরদের কাহিনীকে আরো তোড়জোড় ক'রে বলতে শুরু ক'রে দিয়েছে। আর ইংল্যাণ্ড ? রিচার্ডসনের পরেই পর-পর ফীল্ডিং ও স্টার্নের দ্বারা অধিকৃত, বিধ্বস্ত ও স্তম্ভিত।

আর দূরে, নতুন মহাদেশে, ধীরে-ধীরে তার হাওয়া লেগে নতুনভাবে উপন্যাসের সূচনা হ'তে চলেছে, যার ফলে প্রায় সত্তর বছর পরেই সম্ভব হলেন হেরমান মেলভিল,—পরে যাঁর সহযোগী হলেন ডস্টয়েভস্কি। এই সব ঘটনা পর-পর এত দ্রুত ঘ'টে গেলো যে, আমাদের স্তম্ভিত ও বিস্মিত হ'তে হয়। বাংলাদেশেও তখন পাশ্চাত্যের হাওয়া পৌঁচেছে, 'নববাবু বিলাস,' ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'আলালের ঘরের দুলাল' আর 'হুতোমের নক্‌শা' স্বল্পদিনের ব্যবধানেই পর-পর প্রকাশিত হচ্ছে এবং আমেরিকা ও রাশিয়া যখন জগৎকে উপন্যাসের ভিতর নতুন জীবনীশক্তির সঞ্চার ক'রে দিলো, তখন জগৎসিংহ ঘোড়ায় চ'ড়ে, বিজন নন্দিরে গিয়ে প্রবল করাঘাতে দ্বার ভেঙে দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে সম্ভব হলেন, তা ইয়োরোপীয় উপন্যাসেরই জন্মের সমান্তর এক ঘটনা।

সুধীন্দ্র মিত্র

নার্স মণিকা ও খুকুমণি

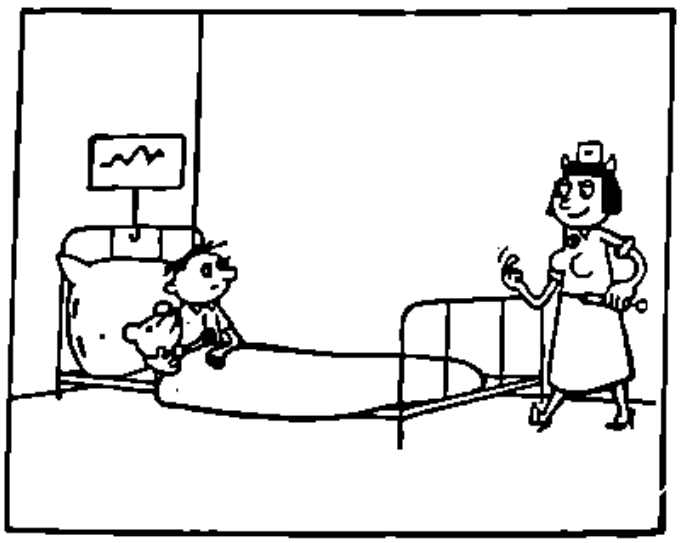

খুকুমণির অসুখ, সে তার পুতুলকে নিয়ে শুয়ে আছে। নার্স আসছে ইন্‌জেকসন দিতে।

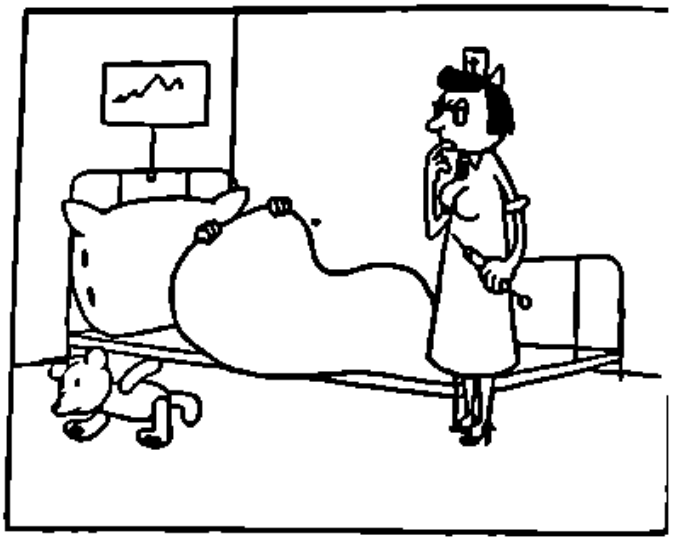

নার্স মণিকাকে দেখেই ভয়ে খুকুমণি পুতুল ছুড়ে ফেলে দিয়ে লেপ ঢাকা দিলে।

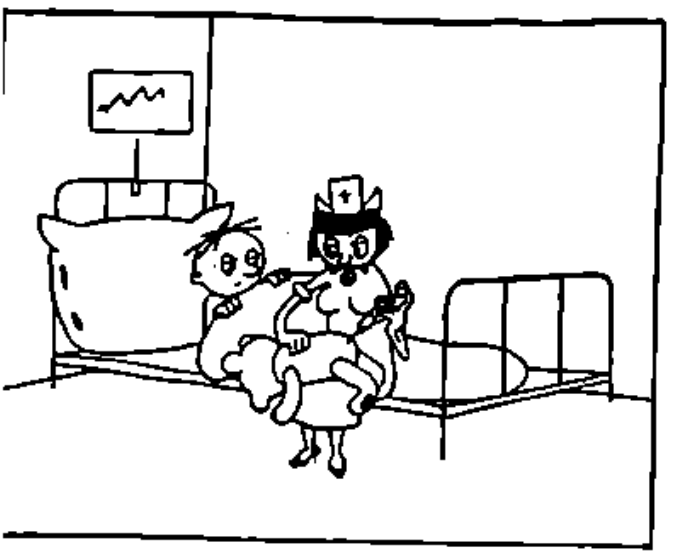

নার্স পুতুলটা তুলে নিয়ে নিলে ফুটিয়ে ইন্‌জেকসন। খুকুমণি লেপের ফাঁক দিয়ে মিটিমিটি দেখলে সব। কৈ, পুতুল ত কাঁদলে না, চেঁচালেও না।

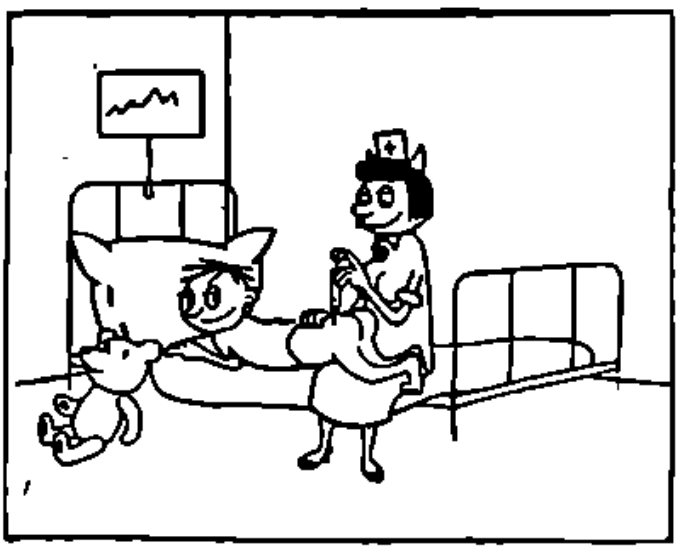

এবার নার্স এগিয়ে এলো খুকুমণির কাছে। খুকুমণি আর ভয় পেলো না। ইন্‌জেকসন দিয়ে নিশ্চিন্ত হোল মণিকা।

—বিখ্যাত জার্মান কার্টুনিস্ট এরিক্‌স্কিট্

খেলাধূলা

খেলাধূলা সম্পর্কে বহু সংবাদ জমে রয়েছে। তার মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা ও ইঙ্গ-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট খেলা আমাদের দেশের ক্রীড়ারসিকদের এবারও অপরিসীম উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতায় গত দুবারের ফাইন্যালে পরাজিত অষ্ট্রেলিয়ার রড্‌লেভার এবার বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। ভারতের রামানাথন কৃষ্ণান লেভারের কাছে সেমি-ফাইন্যালে পরাজিত হন। এই নিয়ে কৃষ্ণান দু'দুবার সেমি-ফাইন্যাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেন। কৃষ্ণান আগের কয়েকটি রাউণ্ড খুব ভাল খেললেও সেমি ফাইন্যালে তাঁর দুর্জয় প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে একবারে দাঁড়াতে পারেননি। ভারতের অন্য যে দুজন তরুণ খেলোয়াড় উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় যোগ দেন—প্রেমজিৎ লাল ও জয়দীপ—তাঁদের কথা এবারে বিশেষ কিছু উল্লেখ করার নেই।

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের টেনিস ফাইন্যাল খেলায় ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবেন।

• • • • • •

ইষ্টবেঙ্গলের লীগ বিজয়

দীর্ঘ আট বৎসর পরে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব আবার কোলকাতার প্রথম ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। এবারের লীগ বিজয় সম্পর্কে ইষ্টবেঙ্গল দলের প্রকৃতই গর্ব করার কারণ রয়েছে। প্রায় একযুগ ধরে দল গঠনে বাংলা দেশের খেলোয়াড়দের ওপর নির্ভর না করে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আমদানী করা খেলোয়াড়দের ওপর পরিচালক মণ্ডলী এতবেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়েন যে শেষ দিকে দলের মনোবল পর্যন্ত ভেঙে পড়তে সুরু করে। যাহোক ক্লাবের কর্তাব্যক্তিরা (গত বছর কিছু রদবদল হয়) কিছুটা ঝুঁকি গ্রহণ করেই বিশিষ্ট স্থানীয় খেলোয়াড়দের বিশেষ করে প্রাক্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে দল গঠন করার প্রয়াস পান। ফল তাঁরা আশাতীত ভাবেই পেয়েছেন। দলের সাফল্যের জন্য যাঁদের নাম বিশেষভাবে করা উচিত তাঁরা হলেন সর্বশ্রী বলরাম (অধিনায়ক), অরুণ ঘোষ, শ্রীকান্ত ব্যানার্জি, রামবাহাদুর, সুকুমার সমাজপতি, সুনীল নন্দী ও নীলেশ সরকার।

লীগে এবার বি. এন. আর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে কোলকাতার ফুটবলে নিজেদের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। এঁদের দল গঠনে সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় খেলোয়াড়দের প্রাধান্য না থাকলেও নেহাত কম ছিল না। বি. এন. আর এবার লীগের দুপর্বের খেলাতেই গত বছরের লীগ, শীল্ড ও ডুরাণ্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলকে পরাজিত করে। প্রকৃতপক্ষে বি. এন. আর দলের কাছে পরাজয়ের ফলেই মোহনবাগানের লীগ বিজয়ের আশা নির্মূল হয়ে যায়।

•

আই. এফ. এ. শীল্ডের খেলা

শীল্ডের খেলা সুরু হচ্ছে ২০শে আগষ্ট থেকে। স্থানীয় প্রধান প্রধান দল ছাড়া ভারতীয় বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী, দিল্লী একাদশ বোম্বাইয়ের মফতলাল গ্রুপ মিলস্, মহীশূর একাদশ প্রভৃতি খ্যাতনামা দল ভারতের প্রাচীনতম প্রতিযোগিতা ও ফুটবল জগতে 'ব্লুরিব্যাণ্ড' নামে যার পরিচয় তাতে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

• • • • • •

লীগ বিজয়, রানার্স আপ ও শীল্ড খেলার প্রসঙ্গ আলোচনা করা হলেও আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যুক্তির দিক থেকে সমর্থন পাওয়া উচিত। যে দুর্নীতির প্রকোপে আমরা সবসময় শঙ্কিত হয়ে রয়েছি তার এবার একটা নগ্ন প্রকাশ খেলার মাঠে দেখা গেছে। গত তিন বছর লীগে ওঠানামা বন্ধ থাকায় ওপর দিকের যেমন প্রতিযোগিতা হত, নীচের দিকের দলগুলি একরকম নিশ্চিন্ত মনেই লীগের খেলা শেষ করতেন। কিন্তু এবার প্রায় প্রথম থেকেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলগুলি নীচের ডিভিসনে অবতরণের আশঙ্কায় পয়েন্ট সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে। ফল যা হবার তাই হয়েছে। নামকরা সব দলেরা কোলকাতার ফুটবল খেলার মানকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে পয়েন্ট নষ্ট করেছেন। রীতিমত 'সিণ্ডিকেট' প্রথায় পয়েন্ট সংগ্রহ করার অভিযান চলল। শেষ পর্যন্ত ইনটারন্যাশন্যাল দলই বেকায়দায় পড়ে গিয়ে আগামী বৎসর দ্বিতীয় ডিভিসন লীগে খেলতে বাধ্য হবেন। তবে জোর গুজব যে আগামী বৎসরের প্রথম ডিভিসনে ১৩টি দলের পরিবর্তে ২০টি দল করে দুভাগে খেলানোর ব্যবস্থা হবে। বারান্তরে এ প্রসঙ্গ আলোচনা করব।

• • • • •

মারদেকার ব্যর্থতা

লীগের খেলা শেষ হবার আগেই নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন কোলকাতায় এক ট্রেনিং ক্যাম্প সৃষ্টি করে একটি দল নির্বাচন করেন এবং পূর্ব এশিয়ার দেশের স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য পাঠান। ভারতীয় ফুটবল রোম অলিম্পিকে যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল, মারদেকা ফুটবলের তিনটি খেলার মধ্যে দুটিতে পরাজিত হয়ে নিঃসন্দেহে তা খানিকটা হারিয়েছেন। বিশেষ করে জাপান ভারতকে ৩—১ গোলে পরাজিত করায় এখানে সকলেই অল্পবিস্তর বিস্মিত হয়েছেন।

• • • • •

আগামী সংখ্যায় আমরা ইঙ্গ-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ক্রিকেট, এম. সি, সি. দলের আসন্ন ভারত ভ্রমণ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ক্রীড়ামোদী

শিশিরকুমার
স্মরণে

॥ শিশির স্মরণে ॥

শিশিরের সঙ্গে পরিচয়—কেবল পরিচয় নয়—ঘনিষ্ঠ মিত্রতা আমার জীবনের অন্যতম সৌভাগ্যের কথা বলে মনে করি। ১৯০৭ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনিস্টিটিউশন (পরে ডাফ কলেজের সঙ্গে মিলে গিয়ে স্কটিশ চার্চেস্ কলেজ এবং শেষে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ নামে পরিচিত) বিখ্যাত বিদ্যারত্নে ইণ্টারমিডিয়েট পড়ার জন্য ভর্ত্তি হই। তার এক বৎসর পরে শিশিরের সঙ্গে প্রথম পরিচয়—শিশির তখন আমার এক ক্লাস উপরে পড়ত। পরিচয় হয় কলেজে ইংরেজী নাটক অভিনয় নিয়ে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ছাত্রাবস্থায় ইংরেজীর পঠনপাঠন বেশ জোরের সঙ্গেই চলত, সেজন্য কলেজের ছেলেরা প্রায় সর্ব্বত্রই ইংরেজী নাটকের অভিনয় করত—বিশেষতঃ সেক্সপীয়ারের নাটক—তাছাড়া বাংলা নাটকও বাদ যেত না—গিরিশ—অমৃতলাল—ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল—এদের কৃপায় তখন বাংলা নাটকের অভাব ছিল না। আমি যখন ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসে পড়ি সেবার কলেজের ছেলেরা বাংলা নাটক "প্রতাপাদিত্যে"র অভিনয় করে। পরের বৎসর সেক্সপীয়ারের "জুলিয়াস সীজার" অভিনীত হয়। দুই একদিন কলেজের পরে বিকালে এই নাটকের মহড়া দেখতে যাই আর তখনি এবিষয়ে একটা আকর্ষণ মনে অনুভব করি। তার প্রধান কারণ ছিল—আমাদের কতকগুলি সহপাঠী এই অভিনয়ে নেমেছিলেন। আর সেই সূত্রে দুই এক ক্লাস উপরে যারা পড়তেন যেমন শিশিরকুমার ভাদুড়ি, এদেরও সঙ্গে পরিচয় ঘটে যায়। শিশির এই নাটকে "ব্রুটাসের" ভূমিকা নিয়েছিল। সহপাঠীদের মধ্যে আনন্দকৃষ্ণ সিংহ Cascaর ভূমিকা আর শচীন্দ্রনাথ বসু Cassius আর যতীন্দ্র গাঙ্গুলী ভূমিকা নেন Portiaর। এঁরা সকলেই এখন পরলোকে। তখন ইতিহাসে অনুরাগ ছিল। গ্রীস আর রোমের ইতিহাস আর এই দুই প্রাচীন দেশের জীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে পাঠ করতে ভাল লাগত। সেইজন্য এই নাটকের একটা প্রভাব আমার মনে বিশেষ করে এসে পড়ে। যাতে প্রাচীন রোমান যুগের এই নাটক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে অভিনীত হয় সেইজন্য পোষাক পরিচ্ছদ আর সাজগোজ বিষয়ে আমরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়ি। সে যুগে কলিকাতায় একটা ইংরেজ থিয়েটারের দল ছিল। চৌরঙ্গীর Grand Hotelএর নীচের তলায় ছিল তাদের আড্ডা—Bandman Opera Company. আমাদেরই দলের একজন ভার নিলেন যে এই ইংরেজ থিয়েটারের দল থেকে জুলিয়াস সিজারের জন্য আবশ্যকীয় পোষাক পরিচ্ছদ ভাড়া করে এনে দিবে। এই পোষাকের ভাড়া যতদূর মনে আছে ১২৫৲ টাকা লাগবে বলেছিল। কিছুটা টাকা বায়না হিসাবে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে তারপরে সে বা টাকা দেয়। একটু সন্দেহ হয়, সেজন্য শিশির এবং জনকয়েক ওই থিয়েটারওয়ালাদের কাছে খবর নিতে যান। সেখানে গিয়ে যা জানা গেল তাতে সকলেরই চক্ষু চড়ক গাছ। থিয়েটারওয়ালা বলে যে তারা তাদের পোষাক ভাড়া দেয় না আর কেউ তাদের বায়নার টাকা দেয়নি। এই মতলবী ছেলেটিকে তারপর আর কিছুদিন ধরে পাওয়া গেল না। আমরা ত এদিকে আধমরা হয়ে পড়লুম—আমাদের বদনাম ও কলেজের অপমান—কারণ নিমন্ত্রণের চিঠি অন্যান্য কলেজেও চলে গিয়েছিল। দুচারজন বড় বড় দেশী বিদেশী হোমড়া-চোমড়াদের কাছেও পৌঁছেছিল।

সেটা টেলিফোনের যুগ ছিল না যে ফোন করে সব বারণ করে দেবো। সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার মতন যুক্তি আরম্ভ করলুম। তখন আনন্দ সিংহ, নীহার মিত্র ও আমি তিনজনে পরামর্শ করে এগিয়ে এলুম, আমরাই হাতে করে রোমান যুগের পোষাক তৈরী করে দেব। চাই কতকগুলি সোলার টুপী, কিছু পিচবোর্ড, কিছু সোনালী ও রঙীন কাগজ, খানিকটা তুলো, গোটাকতক টিলে পাঞ্জাবী ও কতগুলি সাদা রেশমের চাদর, আর তা ছাড়া পরনের জন্য প্রত্যেক অভিনেতার রকমারী চপ্পল জুতো। সোলার টুপীর ধারগুলি কেটে তার মাথায় পিচবোর্ডের মৌড় লাগিয়ে, দু কানে পিচবোর্ডের কান-ঢাকা তৈরী করে রোমান Helmet বা শিরস্ত্রাণের আসল তৈরী হ'ল তেমি পিচবোর্ড কেটে কেটে রোমান বর্ম দেহের সাজোয়া আর পায়ের পদত্রাণ—আর তা ছাড়া ঢাল তৈরী হ'ল। সোনালী, রূপালী আর রঙীন কাগজ পিচবোর্ডের ওপর মেরে নানারকমের রোমান যুগের কাগজে কাটার ছবি আর ল্যাটিন ভাষায় বচন সেঁটে প্রাচীন রোমান যুগের চেহারা আনা গেল। তুলো দিয়ে শিরস্ত্রাণের মাথার crest বা চূড়া বানান গেল। সাদা silkএর চাদরে রোমান অঙ্গবস্ত্র বা Toga তৈরী হল। খালি মেয়েদের পোষাকের জন্য (সুখের বিষয় দুটি মাত্র স্ত্রী পাত্রী এই নাটকে ছিল) বাংলা থিয়েটারের পোষাকের দোকান থেকে কলকলে দুটি গাউনের মত এনে বুঁকে পিঠে বেধে কোনও রকমে নকলি রোমান মেয়েদের পোষাক বানান গেল। এই দুইদিন সকালে ৮টা থেকে ১২টা এবং বিকালে ২টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত কাঁচি চালিয়ে আর আঠা মাখিয়ে মাখিয়ে আঙুল যেন ক্ষয়ে গেল। শেষটা যা দাঁড়ালো সেটা "ন ভূতঃ ন ভবিষ্যতি"। একরকম সম্পূর্ণ নূতন ধরণের পোষাক তৈরী হয়ে গেল। অভিনেতারা স্ফূর্তির সহিত অভিনয় করলেন, সাহেব অধ্যাপকরা আর অন্য গুরুস্থানীয় ব্যক্তিরা খুবই তারিফ করলেন। শিশিরের অভিনয় খুব জমে উঠেছিল—আর আমরা ত নিজেদের হাতের কাজে একেবারেই মুগ্ধ।

এইভাবে কলেজে শিশিরের প্রথম জয় অঙ্কুরিত হলো—অভিনেতারূপে ইংরেজী ভাষায়। আমাদের মনে প্রচুর আত্মপ্রসাদও হল। আমরা ছিলুম শিশিরের এই অভিনয় নেপথ্যে যারা কাজ করে সেই "ব্যাকরী।" এইসূত্রে শিশিরের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা জমে উঠল তা সারাজীবন বজায় ছিল আর উত্তরোত্তর তা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। কবে যে আমরা আপনি থেকে "তুই"—এর পর্য্যায়ে এসে পড়লুম তার জ্ঞান আমাদের ছিল না। মনে হয় গোড়া থেকে—তেম্‌নি আরও কতকগুলি বন্ধুর মধ্যে তুই-তোকারী যেন প্রথম থেকেই ছিল।

শিশিরের সঙ্গে আমার মিত্রতা সম্পর্কে এই মুখপাতের কথাটুকু জানাচ্ছি। পরে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে নানা কাজে, কলেজের নানা ব্যাপারে আর পড়াশুনার ব্যাপারে খুবই দেখাশোনা হত, অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা হত। শিশির আর আমি উভয়েই ছিলুম ইংরেজীর ছাত্র এবং দুজনেই ইংরেজীতেই এম্, এ পাশ করি। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ের মাধ্যমেও আমাদের সৌহার্দ্য আরও দৃঢ় হয়। শিশির যখন অধ্যাপকের কাজ ছেড়ে দিয়ে অভিনেতার বৃত্তি গ্রহণ করলে তখনও তার সঙ্গে সেই ঘনিষ্ঠতা বজায় থাকে আর দুই একখানি বড় বড় নাটকে যা'তে সে খুব নাম করে তার অন্তর্গত পাত্রপাত্রীদের পোষাকপরিচ্ছদ আর সাজগোজ বিষয়ে শিশির আমার সঙ্গে পরামর্শ করতো। এসব কথা বাংলা দেশে নাটকের প্রযোজনার ইতিহাসের কথা। পরে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

॥ রঙ্গমঞ্চ ও শিশিরকুমার ॥

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগকে তদানীন্তন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা দেশে প্রথম যে নাট্যআন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়, তার স্ফুরণ ও সম্প্রসারণ ঘটে মূলতঃ সামন্ততান্ত্রিক ভাববিপ্লবের নাগরদোলায়। সুষুপ্তির পর একে বলা যায় জাতীয়তার ক্ষেত্রে মোহভঙ্গের কাল। যদিও মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইতিমধ্যেই এই ভাববাদী আধ্যাত্মিক মুক্তির পরিপূরক শক্তি হিসেবে কাব্য ও নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরমন্বিধান করে নিখুঁত ভাববাদীর চোখে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করেছেন। Personality cult কে কেন্দ্র করে এই ভাববিপ্লব তখনও জাতির সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে না। জাতীয়তাবাদ মূল লক্ষ্য হলেও এই ভাববাদ তখন দেশে নতুন করে আধ্যাত্মিক মুক্তির সন্ধান দিয়েছে মাত্র। এই মুক্তি-মন্ত্রের প্রথম উদ্গাতা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

জাতির এই আধ্যাত্মিক মুক্তির দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রই শ্রীমদ্ভাগবত গীতার শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের সার্থক ভাষ্যকার।

অধ্যাত্মজগতে চিন্তার এই ভাববিপ্লব বৃহত্তর ভারতের সামাজিক জীবনে সে রকম কার্যকরী না হলেও বাংলাদেশে সেই ভাব্যের প্রতিফল সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও অধ্যাত্মজগতে বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীগণের মধ্যে প্রতিভাত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৌড়ীয় শুদ্ধাভক্তি বা বৈষ্ণবভাববাদী আদর্শের উত্তরাধিকারী নটগুরু গিরিশ ঘোষের পর নাট্যের ক্ষেত্রে সেই বঙ্কিমীভাবের প্রতিফল দেখা যায় নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারের মধ্যে সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবার আর্ত্তির মধ্যে গৈরিশী যুগের যবনিকাপাত ঘটলেও স্বাজাত্যাভিমানী আলমগীর মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন তার অনধিক এযুগের মধ্যেই।

গিরিশ ঘোষ ও শিশিরকুমার—দু জনই রঙ্গমঞ্চে দুই যুগোত্তর প্রতিভা। কিন্তু তবু এই দুই প্রতিভার মধ্যে মূলগত ঐক্য থাকলেও গুণগত পার্থক্য বহুলাংশে বিদ্যমান। একজনের ভাব, অন্যজনের ভাবনা; একজনের প্রেরণা অন্যজনের চেতনা। নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে আবেগস্তরের সৃষ্টি করাই ছিল গিরিশ প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। আর শিশিরকুমারের বিশিষ্টতা ছিল নাট্যের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ অবিগত হয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে সেই চরিত্রের বুদ্ধিদীপ্ত বিকাশ। কি ক্লাসিক্, কি ঐতিহাসিক, কি সামাজিক, শিশির-কুমারের প্রত্যেকটি প্রযোজনার ক্ষেত্রেই তাই ঐশী শক্তির জায়গায় মানুষী শক্তির বলিষ্ঠ প্রকাশ সুস্পষ্ট।

সমুদ্রের নাচন অনেকেই দেখেছেন কিন্তু সমুদ্র হয়ে যিনি না নেচেছেন তিনি তাঁর সেই শিব তাণ্ডবের রসমাধুর্য্য সম্যক অনুধাবন করতে পারবেন না। আলমগীর, রাম, রঘুবীর, চাণক্য, নাদিরশা, জীবানন্দ, মাইকেল প্রমুখ বিভিন্ন চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন রূপায়নে সেই সত্যই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

নাট্যাভিনয় ভিন্ন অন্যান্য শিল্পসৃষ্টির মূলে স্বল্পাধিক কতকগুলি রূপায়ন পদ্ধতি আছে। কিন্তু অভিনয় শিল্পের রসবিচারে সে রকম কোন নির্দ্দিষ্ট নিরিখ-এর মাধ্যম নেই। ফলে অভিনয়শিল্পের উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার শ্রোতার অন্তর্লীন মানসলোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বরগ্রাম ছুঁয়ে ছুঁয়ে কখনও বা সপদ্মপুষ্পচন্দনের এক নিরবয়ব বিলসিত রূপরেখার লীলাবিলাসে, কখনও বা উৎকট কোন বিকেন্দ্রিক চিত্তবিক্ষেপের ক্লান্তিকর অনুভবে ধরা পড়ে। শিশিরকুমারের তিরোধানের পর অভিনয় শিল্পের সেই

বিচিত্র স্বয়ংগ্রাহ্য প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেও পরোক্ষভাবে যে তার সন্ধান কথঞ্চিৎভাবে মিলিছে হয়েছে, এ কথা বলা যায়। 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়'—সত্য। কিন্তু অভিনয় শিল্পে যে ঐতিহ্য শিশিরকুমারের মহত্তম অবদান, সে কথা স্মরণ করলে সেই সত্য-ও মিথ্যা প্রতীয়মান হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ঐতিহাসিক ধারা অনুসরণ করে দেখলে স্পষ্টতঃই দেখা যায় শিশিরকুমারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উনবিংশ শতকের শেষ ট্র্যাজিডি নায়ক রঙ্গমঞ্চের যবনিকার অন্তরালে চিরদিনের মত অবলুপ্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু এই অবলুপ্তির প্রাকমুহূর্তে বাংলার রঙ্গমঞ্চের বেদীমূলে যে অনির্বাণ দীপশিখা জেলে দিয়ে গেলেন, জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের এই দুঃসময়ের মাঝখানে দাঁড়িয়েও তাঁর উত্তরাধিকারীরা নাট্যশিল্পের প্রাণবস্তু খুঁজে নিতে সংশয়ান্বিত হবেন না।

যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এক কথা না হলেও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করে, রবীন্দ্রনাথ বৃটিশ সরকারের প্রতিভূস্থানীয় লর্ড চেমসফোর্ড-কে লিখেছিলেন, ……The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous contest of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who, for their so called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings……আর অবক্ষয়িত রঙ্গমঞ্চের ট্র্যাজিডি নায়ক শিশিরকুমার রাজসম্মান গ্রহণে অসম্মতি জানিয়ে অভিমানচ্ছলে লিখলেন,……I have a personal reason, besides the one of principle, for not wishing to be conferred the honour. By its acceptance I shall misled the lovers of the theatre into believing that the government are aware of the importance of drama in the life of the nation. বিশেষ করে আমরা যারা রঙ্গমঞ্চের ব্যবসায়িক বেদীর পাদপীঠতলে বিশিষ্ট অপেশাদার নাট্যসংস্থার কর্মী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে জাতীয় মানসলগ্ন অক্ষুণ্ণ রাখবার দায়ে প্রতিনিয়ত সরকারী প্রমোদকরের প্রমাদে বিভ্রান্ত হচ্ছি, তারা শিশিরকুমারের এই বেদনাহত অভিমানের মর্মান্তিক কারণ স্বতঃই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

শিশিরকুমারের মৃত্যুর সঙ্গে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হলেও অভিনয় শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে তাঁর অপরিসীম দান বিশ্বের দরবারে সমগ্র জাতির সম্ভ্রম এনে দিয়েছে। সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন রবীন্দ্রনাথ অভিনয়শিল্পের ক্ষেত্রে তেমনি শিশিরকুমার এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

রঙ্গমঞ্চই যদি জাতির আত্মপরিচিতির একটি প্রকৃষ্ট মাধ্যম বলে স্বীকৃত হ'য়ে থাকে তবে শিশিরকুমারের জীবিতকালে তাঁর প্রতিভার প্রতি বিন্দুমাত্র অসম্মান প্রদর্শনে সমগ্র জাতির অবমাননা হয়েছে এবং তাতে করে আমরাই আমাদের প্রতি নিকৃষ্ট অসম্মানের পরিচয় দিয়েছি।

সাংঘাতিক বৃহত্তর জীবনে সেই প্রেতরূপী অবক্ষয়ের কালোছায়া আজও আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর আড় হয়ে পড়ে আছে। এবং এই কারণেই সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও অন্বেষণের শত তাগিদ সত্ত্বেও আমরা ঠিক দৃষ্টিকোণ খুঁজে পাচ্ছি না।

নিজের পীঠ যে নিজে চাপড়ায় সে হয় বাতুল, নয় কানা। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই শুক্লবাদী দেশে অবস্থাভেদে জানাজন শলাকার নিদান তত্ত্বগত সমাচার বিধায় আমরা রোজই একবার করে আবৃত্তি করি। কেন করি? এ প্রশ্নের উত্তরও আমাদের মুখে সমীচীন বোধ হয় না। কেন না যখন মন্ত্রোচ্চারণ করি, আমরা তখনও কানা। আমাদের দিনরাত্রি নেই।

কিন্তু এই প্রবচন অন্ধের অন্তাপের রক্ষাকবচ হলেও চক্ষুষ্মান্ মানুষের হতে পারে না। কেন না নতুন মূল্যায়নের নামে ফাটকা পদ্ধতিতে কাণ্ডজ্ঞানের এই অপচয় বিশেষ চোখে আমাদের প্রাণবন্তার সোনার দাম চিরকালই কমিয়ে রাখবে। সুতরাং সময় বিগত হলেও অবহিত হবার কারণ আছে। তাই সজ্ঞানে অজ্ঞান থাকার কূটবুদ্ধি পরিহার করে কর্মপথে অগ্রসর হতে হবে। অজ্ঞানীকে জ্ঞানবান হতে হবে। জ্ঞানীকে হতে হবে প্রবুদ্ধ। বৃহত্তর সামাজিক জীবনের পটভূমিতে সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে নিরন্তর যে নতুন নতুন অবস্থার উদ্ভব হচ্ছে, নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করছে, বিশি মতে ভাববিপ্লববাদের ছারকরসে সেই বাস্তব সত্যগুলোকে জারিয়ে সাধকের পরিশুদ্ধি নিয়ে নিষ্ঠি শিল্পের আঙ্গিকসঙ্গত রূপরেখাগুলোকে টানতে হবে সতর্ক তুলিলিখনে। মনোবস্তুর সঙ্গে প্রাণবস্তুর এই সংঘর্ষ সাধন না করতে পারলে আর যার হোক, অন্ততঃ আমার প্রতিমার চক্ষুদান করা এই পটুয়া-হাতে সম্ভব হবে না। আজ শিল্পীর চোখে যদি এই প্রেম অপ্রেমের অনুভবী সত্য, যে সত্য কতকটা বাস্তব ও কতকটা ভাবাশ্রয়ী, স্বপ্নসম্ভবা, যদি না জ্ঞানবিজ্ঞানের সংক্রান্তিরেখায় নিরূপিত না হয়, তা হলে শিল্পের ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিকোণ পাওয়া যাবে না। অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন, অভিনয় শিল্পের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। শিশিরকুমারের প্রতিভার মর্মদাহী ট্র্যাজিডির দিকে তাকিয়ে সেই কথাই মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরঙ্গম মঞ্চে 'নবান্ন' নাটক অভিনয়কালে এক রজনীর কথা মনে পড়ে আমার। মেদিনীপুরের সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার ভূমিকায় বন্ধুবর শম্ভু মিত্র তাঁর শিশির সুলভ স্বরবিন্যাসে—'জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল, সমুদ্দুর উঠে এয়েছে প্রধান'—বলে অনতিপূর্বেই মঞ্চে ও প্রেক্ষাগৃহে সমুদ্র এনে ফেলেছেন। আমি বিহ্বল হয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাচ্ছি মঞ্চের বাঁ দিক দিয়ে। এমন সময় উইংস্-এর পথ আগলে দেখি মঞ্চের আলমগীর তরুণ ভ্রাতা বিশ্বনাথের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্রাকার রচনা করে। প্রথমে বিরক্ত বোধকরি চিনতে না পেরে। নিষ্ক্রমণের পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকে, এ আবার কেমন নাট্যরসিক। নাট্যাচার্যের মুখের দিকে তাকাবার পূর্বেই একটি দুষ্ট মন্তব্য অন্তর্নিষ্ট হয়ে ঠোঁট ছিটকে বেরিয়ে যায় আমার, সরে দাঁড়াতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেখি, 'এই বিশে'—কথাটি উচ্চারণ করে লম্বদভ্রাতাকে টেনে নিয়ে একপাশে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়েছেন শিশিরকুমার। ঘটনাটা ঘটে প্রায় যুগপৎ। আমি সবিশেষ কুণ্ঠিত হয়ে পড়ি। করজোড়ে ক্ষমাভিক্ষার পূর্বেই মোটা একটা কালো চুরুট সমেত আলমগীরের ডান হাতখানা আমার কাঁধের ওপর নেমে আসে। নবান্ন-নাটকে প্রধান সমাদ্দারের ভূমিকায় ত্রিকালজ্ঞ বৃদ্ধের সেই রূপশয্যায় আমার বয়সের কোন গাছপাথর ছিল না। সুতরাং বিভ্রম ঘটে আলমগীরের। আমি কিন্তু ইতিমধ্যে ততোধিক ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু শিশিরকুমারের সেদিকে দৃষ্টি থাকবার কথা নয়। প্রবীণের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে বিশ্বনাথকে লক্ষ্য করে বলেন, জানিস বিশে, সেই যে আমাদের, সেই বোপা। মনে পড়ছে না তোর?.....অস্থির হয়ে পড়েন শিশিরকুমার। 'নবান্ন' নাটকে প্রধান সমাদ্দারের দিকে তাকিয়ে কোন রজকের স্মরণ করছিলেন শিশিরকুমার তা তিনিই জানেন। কিন্তু তাঁর স্মৃতিকের সেই বিভ্রান্তির মধ্যে আমি এক সত্য প্রত্যক্ষ করলাম। দেখলাম, রামচন্দ্র ওরফে চণ্ডালরূপী এক রজকের ভূমিকায় পরোক্ষভাবে মঞ্চ হতে চাইছেন। একথা আমি নিজে একজন মঞ্চশিল্পী হয়ে জোর দিয়ে বলতে পারি। কারণ পুরু চশমার লেন্সের আড়ালে তাঁর দুই চোখের দৃষ্টি আর মুখের পেশীগুলি তখন সমাজের অবগুন কোন এক দুর্মুখ রজক-এর অঙ্গাকারে কঠিন হয়ে উঠেছে। আমার চোখে আলমগীর সেদিন কিন্তু সংশয়াতীতভাবে উত্তরণ করেছিলো এক রজক চরিত্রে। আর্যপুত্র রামচন্দ্রের পক্ষে ওরফে হতে তখন আর কোন বাধা নেই।

সময়ের তিনি দেখেছিলেন। সময় ও পরিবেশ অনুকূল হলে হয়তো আলমগীরকেই একদিন সেই রজক-এর ভূমিকায় প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য হতো।

বিজন ভট্টাচার্য

॥ বিদেশীর চোখে শিশিরকুমার ॥

১৭৯৫ সাল।

কলকাতায় প্রথম বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার খবর কাগজে বেরুল। প্রতিষ্ঠাতা একজন বিদেশী, নাম হেরাসিম লেবেডেফ্। সেদিনের কলকাতার ইউরোপীয়দের চিত্তবিনোদনই ছিল রঙ্গালয়টি প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য। লেবেডেফ্ নিজেই সেকথা বলে গেছেন। অপরিচিত বিদেশী দর্শকের সমাগমও সেখানে হয়েছিল। অপরিচিত এক ভাষায় অভিনীত নাটকের রসোপলব্ধির চেয়ে কিছু নতুনত্বের সন্ধানে তাঁরা এসে হাজির হয়েছিলেন। সুদূর প্রবাসে তাঁদের জীবন সেদিন নীরস বৈচিত্র্যহীন। নানাকারণে অবশ্য মাত্র দুরাত্রি অভিনয়ের পর এই প্রথম বাংলা নাট্যশালার ওপর চিরদিনের মত যবনিকা নেমে এল। বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এরপর বাংলা রঙ্গালয় গড়ে তোলার কথা কারো মনে হলো না।

অষ্টাদশ শতক পার হয়ে এল ঊনবিংশ শতাব্দী। ইংরেজের অনুকরণে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নবীনচন্দ্র বোস, পাথুরিয়াঘাটার রাজারা, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি শিক্ষিত ও অভিজাত বাঙালীরা অনেকেই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করলেন। এমন কি অনেক বিদ্যালয় গৃহেও ছোট ছোট রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠল। বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত এসব রঙ্গালয়ে বিগত শতকের সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ইংরেজদের নাটকাভিনয় দেখতে আসার খবর আজো প্রাচীন সংবাদপত্রে দেখতে পাই। তবে, তাঁরা সকলেই ধনী ও সম্ভ্রান্ত বাঙালীগৃহে নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আসতেন। ১৮৭২ সালে প্রথম সেক্সপীয়ার বাংলা নাট্যশালার দ্বারোদ্ঘাটন হলো। তারপর একে একে আরো কয়েকটি সাধারণ রঙ্গালয়ের অভ্যুদয় ঘটলো। কখনো সখনো এক আধজন বিদেশী দর্শকের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত এদের প্রেক্ষাগৃহে। কিন্তু তাঁরাও বেশীর ভাগই নিমন্ত্রিত অতিথি। বাংলা নাটকাভিনয়ের প্রতি সত্যই আকৃষ্ট হয়ে আপন ইচ্ছায় তাঁদের যাতায়াত সুরু হয় বর্তমান শতকে এবং প্রধানতঃ তা শিশিরকুমারের রঙ্গালয়ে বললে অত্যুক্তি হবে না নিশ্চয়। সেক্সপীয়ার মঞ্চে যোগদানের পর রাতারাতি তাঁর অসামান্য প্রতিভার কথা দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। দেশের রসজ্ঞজনের দৃষ্টি অনায়াসে আকর্ষণ করলেন। এলেন রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অবনীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু এবং আরো অনেকে। খুশী হলেন তাঁরা সকলেই শিশিরকুমারের অসামান্য প্রতিভা দেখে। অকুণ্ঠচিত্তে তাঁকে প্রশংসা জানালেন। বিদগ্ধ ও নাট্যরসিক বিদেশীদের কানেও তাঁর প্রতিভার কথা পৌঁছতে দেরী হলো না। পৃথিবীর নানা দিক ও দেশ থেকে প্রবিত্তবর্গা শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যসমালোচক প্রভৃতির সমাবেশ ঘটলো তাঁর রঙ্গালয়ে। রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মানী, চীন প্রভৃতি সকল দেশের মানুষই এসে হাজির হলেন। শিশিরকুমারের অনন্যসাধারণ অভিনয় তাঁদের সকলকেই মুগ্ধ করলো, বিস্মিত করলো। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেলেন তাঁরা সকলেই। শুধু তাই নয়, এমনি এক বিদেশীর অকস্মাৎ অভিনয় দেখতে আসায় শিশিরকুমারের নিউইয়র্কে অভিনয় করতে যাওয়ার যোগাযোগ ঘটে। ১৯২৮ সাল সেটা। সীতার অনিন্দ্যসুন্দর অভিনয়ে রাতের পর রাত রঙ্গালয়ে ভীড় ভেঙে পড়েছে। দূরদূরান্তের কত দর্শক প্রবেশপত্র না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। এমনি এক সন্ধ্যায় একজন বিদেশী দর্শকের আবির্ভাব। রঙ্গালয় কোর্সের পদস্থ

কর্মচারী, নাম ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ই, বি, এলিয়ট্। সকল দিক দিয়ে সুপরিচালিত ও সাফল্যমণ্ডিত সে রাত্রের অভিনয় তাঁকে বিমোহিত করলো এমনই যে, দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ না হতেই শিশিরকুমারের সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়ে মঞ্চে প্রবেশ করলেন। দেখা হলো। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ শিল্পীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন এলিয়ট্। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—"I realise I am in the presence of a very great artist"। মহামুহূর্তের মত কথা ক'টি বলে গেলেন। কার্যোপলক্ষে ফিরে যাওয়ার আগে ওখানকার কোন অভিনয় যে বাদ দেননি তা বলা নিষ্প্রয়োজন। কোন কোন নাটক একাধিকবার গুরুত্ব হয়ে দেখছেন তাও দেখা গেল। ফিরে গেলেন এদেশ থেকে। কিন্তু কয়েকমাস পর আবার এলেন, এবং আবার অপরিসীম একনিষ্ঠতা ও আগ্রহ নিয়ে শিশিরকুমারের বহু অভিনয় দেখলেন। ভবঘুরে মানুষ, আবার উধাও হলেন। বেশ কিছুদিন কোন সংবাদও পাওয়া গেল না। তবে শিশির-কুমারের মঞ্চাভিনয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও আগ্রহের কারণ বোঝা গেল। নিউইয়র্কে নিয়ে যেতে চান তাঁকে। ও দেশের রসজ্ঞজনদের সঙ্গে তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় করিয়ে দেবেন। ১৯২৯-এর এপ্রিল মাসে নিউইয়র্ক মঞ্চে অভিনয় করার আমন্ত্রণ পেলেন শিশিরকুমার। এলিয়ট্ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে পৌঁছোলেন। সুদূর মার্কিন মুলুকে প্রথম এদেশীয় এক শিল্পীসম্প্রদায়ের অভিনয়ার্থে যাওয়ার সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলো। শিশিরকুমার তাঁর দলবল নিয়ে ১৯৩০ সালে নিউইয়র্ক যাত্রা করলেন।

এদেশের শিল্পী ওদেশে পৌঁছে কীভাবে সম্বর্ধিত হলেন তা পত্রিকার পাতা ওলটালে দেখতে পাই। তারা বলে—

> "As they lay outside the harbour at night, watching the myriad lights of the twinkling sky-scraper skyline, a page boy came down the deck with a message to say that S. K. Bhaduri had been granted a Mayor's reception on his arrival at the point of landing. With the coming of the day-break, any doubts the party had as to the meaning of this were soon dispelled. The Mayor's reception committee, headed by the Grand Duchess Marie of Russia and Princess Rospigliosi came aboard and shortly afterwards the whole company, in dhoties and Saris just as they had left Calcutta, were being driven down Broadway at breakneck speed in six Rolls Royce motor cars preceded by motor cycle police with screaming Sirens.
>
> "During the whirlwind weeks that followed, rehearsals were interposed by visits to the Broadway theatres. Wherever the company went special police were on duty to hold back the crowds of excited people, anxious to catch a glimpse of the celebrated Bengalis."

নানা অভাবনীয় ও অবাঞ্ছিত কারণে অর্থের দিক দিয়ে না হলেও, অভিনয়ের দিক থেকে শিশিরকুমারের নিউইয়র্ক সফর ব্যর্থ হয়নি। যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। সেদিনের নিউইয়র্কের নানা পত্রিকা আজো তার সাক্ষ্য বহন করে রয়েছে। যেমন, বিখ্যাত The New York Sun পত্রিকা বলে—

> "The Hindu players made a very good impression. Their acting compares

favourably with the acting of any foreign troupe I can think of, excepting, of course, the Moscow Art Theatre players, who, to me atleast, are the best actors in the world. The Hindu players are so graceful in their movements that their many gestures are never awkward. They speak their lines clearly and distinctly, even if one does not know what they are saying. And the star Mr. Bhaduri, who plays **Rama**, is an emotional actor of considerable power··· There is a certain nobility inherent in this play, and this nobility even pervaded the acting. Doubtless this was because the love theme is on such a high plane. One had the feeling that the love of **Rama** and **Sita** would persist through all eternity."

আর একটি কাগজ **The New York American** লিখলে,

"Novelty came to the current theatrical season at the Vanderbilt theatre last night in perhaps the most ancient play that has ever been shown on Broadway.....This company of Hindu actors, speaking in language so distinctly foreign to American ears, succeeded in vitalising this story to such an extent that scarcely a person left before the final curtain. After all, beauty and anguish know no tongue. There is a universal language, and art their sole medium of expression. The beauty of the poetry, the anguish of the King **Rama** and his Queen were too real to escape transmission over the footlights on the wings of an artistry rare to this country.·····

"Sisir Kumar Bhaduri is an actor of the finest rank. Last night play kept him in two contrasting moods—lyric and emotion. He seemed to excel in the latter, investing some of his scenes with a poignancy that strongly moved his audience. The supporting cast was almost equally strong, the women particularly."

অপরিচিত এক ভাষায় অভিনীত হলেও, নাটকের বিষয়বস্তু বুঝতে বা তার রসগ্রহণ করতে এতটুকু অসুবিধে হয়নি। **The Evening World**-এর মন্তব্য থেকে তা প্রতীয়মান হয়। তাদের সমালোচক লিখলেন,

"Of course there were few in the audience who understood the language of the visitors. But that mattered little. So superb was their pantomime, so illustrative was a shrug of the shoulders, a flash of the eye, and a lifting of the hands or arms, that one could follow the story with little trouble·····

"It was a treat to watch Sisir Kumar Bhaduri as **Rama**. His voice was bell-like, his pantomime, which told the story as clearly to the audience which understood not a single word, was so perfect that the words anyway, would have been unnecessary. Excellent too, was Sreemati Prova as **Sita**, the queen. All the others in the cast were interesting.·····

"It may not harm many who take the stage as their profession to drop into the Vanderbilt to see how strangers in a strange land, speaking a strange

language to their patrons, can through their pantomime, interpret a story so that, as pointed out, the verbal picture is unnecessary.

"You'll enjoy Sita as something unique."

আগের বছর প্রাচ্যের আরো দু'টি দেশ থেকে নামকরা নৃত্যশিল্পীরা ওখানে অভিনয় করে আসেন। কিন্তু, The Daily News New York-এর মতে শিশিরকুমার ও তাঁর সম্প্রদায়ের অভিনয় তাঁদের চেয়ে অনেক উঁচুদরের। অনুকরণীয় ভাষায় লেখা তাদের সমালোচনাটি উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বোধহয়। তারা বললে—

"The players reveal themselves as handsome and graceful in their bright robes and spangles, and their language as a mellifluous one. Spoken as it was last night, it often has the quality of a Song—a melody of more variety and depth than, for instance, the sing song of China's Me-Lan-fang.

"As actors Bhaduri and his company are more easily understood than were the Chinese and Japanese last season. Their gestures and vocal inflections are readily divined and the performances are generally emotional."

আরো একটি কাগজ, The Evening Graphic, শুধু অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করল না। প্রসঙ্গতঃ বাংলা ভাষা এবং এদেশের সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে কতখানি আকৃষ্ট হয়েছে তাও জানালে। শুধু তাই নয়, সীতার অপূর্ব অভিনয় তারত সম্বন্ধে কুতূহলী করে তুলেছে বললে। তারা লেখে,—

"The star of this company is undoubtedly an actor of great ability and his supporting company seem to take their work very seriously, portraying each role, large or small, with great emphasis, conviction and many gestures. Then too there is something quite musical and pleasant about the sound of the language. The native songs and dances were particularly interesting.

"Sita further arouses one's curiosity about India and at least presents a picture of what goes on in Sisir Bhaduri's Theatre in Calcutta."

সত্যমিথ্যায় মিশ্রিত নানা গুজব আগে শিশিরকুমারের নিউইয়র্ক সফরের আসল সংবাদ রহস্যবিজড়িত করে রেখেছে। তাই সেদিনের কয়েকটি পত্রিকা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

১৯৩১ সালে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভাইসরয়, লর্ড আরউইন, শিশিরকুমারের অভিনয় দেখতে চাইলেন। অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধির কাছ থেকে 'কমাণ্ড পারফরমেন্স'-এর নির্দেশ এলো। এখানকার কোন নৃত্যশিল্পীর এ সম্মানলাভ এই প্রথম। ২০শে মার্চ লাটসপত্নী এবং অন্যান্য রাজা-রাজড়া ও রাজধানীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে সীতা অভিনীত হলো। সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে সেরাতে রামের ভূমিকায় শিশিরকুমার ও সীতার ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভার চিত্তাকর্ষক অভিনয় বড়দাট থেকে শুরু করে সকলকে আকর্ষ করলো, অভিভূত করলো। হর্ষোৎফুল্ল দর্শকদের ঘন ঘন করতালধ্বনি প্রেক্ষাগৃহের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে শোনা গেল। অভিনয় শেষে শিশিরকুমারকে ডেকে করমর্দন করলেন

ঘড়ণাট। আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানালেন। অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গেও করমর্দন করলেন। শুধু তাই নয়, পরের দিন তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারীর কাছ থেকে এক পত্র এলো। তাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে শিশিরকুমারকে নাটমন্দিরের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান হয়েছিল। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিই—

D. O. No. 1982

The Viceroy's House
New Delhi,
The 21st March, 1931.

Military Secretary,
To the Viceroy.

Dear Mr. Bhaduri,

I am desired by their Excellencies to tell you how much they enjoyed your performance last night. It was a consummate piece of acting and the greatest praise is due not only to you yourself who took the principal part, but also to all the rest of your cast.

The fact that we were able to follow the play although we could not understand a word of the language, in itself says much for the acting. Their Excellencies were quite thrilled with it and desire me to offer you their warm congratulations.

Yours faithfully,
Sd/Lt. Col. C. O. Harvey
M. S. V.

সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হলেও সীতা কোনদিন দর্শকদের কাছে পুরণো হয়নি। রাতের পর রাত ভীড় জেমে পড়ত, টিকিটারণের জায়গা থাকত না। উচ্চাঙ্গের নাটকাভিনয় দেখার সুযোগ অল্পই আসে। তাই বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সকলেই আসতেন। কলকাতার বিদেশীরাও। হাইকোর্টের বিচারপতি, নামজাদা ব্যারিষ্টার, পদস্থ রাজকর্মচারী প্রভৃতি সকলেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যেত প্রেক্ষাগৃহে। একাধিক রাত্রি এর অভিনয়ে প্রধান বিচারপতি সার্ উইলিয়ামসকে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছিল। সকল দিক দিয়ে সুষ্ঠু ও সার্থকমণ্ডিত অভিনয় তাঁকে এমনই মুগ্ধ করে যে, শিশিরকুমার ও তাঁর সম্প্রদায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সুদীর্ঘ একখানি পত্রও তিনি লিখেছিলেন বিষয় সমাজে সুপরিচিত শিশিরকুমারের এক সহপাঠীকে। সার্ উইলিয়ামসেরও তিনি অন্যতম।

শুধু কলকাতার ইংরেজরা নন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানাদেশের নানা গুণীজনদের সমাবেশ ঘটত তাঁর রঙ্গালয়ে। যেমন, বর্তমান শতকের পঞ্চম দশকে এলেন পুডভ্‌কিন্ ও চেরকাশভ্। ভারত ভ্রমণরত 'রাশিয়ান কালচারাল মিশন'-এর বিশিষ্ট সভ্যদ্বয়। কলকাতায় স্বল্পকালস্থায়ী অবস্থান, বিভিন্ন জরুরী কার্যের তালিকাও কম সুদীর্ঘ নয়। তবু এদেশের শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পীকে পাদপ্রদীপের সামনে দেখতে

তাঁরা ভুললেন না। শিশিরকুমারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে স্থানীয় প্রধান তাঁদের আসার ব্যবস্থা করলেন। নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় শ্রীরঙ্গমের প্রেক্ষাগৃহে তাঁরা এসে হাজির হলেন। সঙ্গে মহিলা দোভাষী। অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের চিরনূতন নাটক ষোড়শী মঞ্চস্থ হয়েছিল সে রাত্রে। নাটকের ভাষা অতিথিদের দুর্বোধ্য। কিন্তু অভিনয় আরম্ভের অল্পক্ষণের মধ্যেই ভাষার ব্যবধান ঘুচে গেল। বিদেশীদের অন্তর্লোক স্পর্শ করলেন অভিনয়ের শিল্পী। দোভাষীর কাজ ফুরালো। নানান্ জরুরী কাজ সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত না দেখে পুডভ্‌কিনদের পক্ষে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করা অসম্ভব হলো। টেলিফোনযোগে পূর্বনির্দিষ্ট এক নৈশভোজের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। সে রাত্রের নিখুঁত সুন্দর অভিনয় তাঁদের এমনই মুগ্ধ করলো। বেদনা-করুণ শেষদৃশ্যটি শেষ হয়ে সামনের পর্দা নেমে এলো। শিশিরকুমারের সঙ্গে পরিচয় লাভ করার জন্যে তাঁকে অভিনন্দিত করবার জন্যে অতিথিরা ব্যগ্র হলেন। দুদেশের দুজন লোকের দিকপালদের মিলন ঘটলো সাজঘরে। আন্তরিকভাবে শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁরা করমর্দন করলেন। ইংরেজী জানতেন পুডভ্‌কিন্, বললেন, "You are a great artiste"। দীর্ঘকাল অভিনয়ে ঈষৎ ক্লান্ত শিল্পীর ঠোঁটের কোণে শুধু একটু হাসির রেখা। চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙে পুডভ্‌কিন্‌ই আবার বললেন, "Do you know why you are great?" শিল্পীকে তাঁরই সম্বন্ধে অভাবনীয় এক প্রশ্ন এ। বলাবাহুল্য একেবারেই তিনি প্রস্তুত ছিলেন না এর জন্যে। উত্তরও তাঁর জানা নয়। তাই পুডভ্‌কিন্‌ই আপন প্রশ্নের জবাব দিলেন। বললেন—মঞ্চে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকদের আপনি আকৃষ্ট করেন। তারপর ধীরে ধীরে অভিনীত চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলার কালে প্রথম আকর্ষণের ধাক্কা সামলিয়ে তারা একটু বিশ্রামের সুযোগ পায়। কিন্তু তা অল্পক্ষণের জন্যে। নাটক যতই এগোয়, আপনার প্রতিটি হাবভাব ইঙ্গিত এবং বাচনভঙ্গী তাদের বারবার আঘাত হানতে থাকে। এমনই যে, ধীরে ধীরে তাদের সকল নিজস্বতা, সকল স্বাতন্ত্র্য তারা হারিয়ে ফেলে। এক সম্মোহিনী শক্তি যেন তাদের আচ্ছন্ন করে। আপনিও শ্রেষ্ঠ এক যাদুকরের মত তখন যে কোন চরিত্র তাদের চোখের সামনে ধরেন, তাকেই তারা সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়। একটি মাত্র অভিনয় দেখে স্বল্পভাষায় অনন্যসাধারণ এক শিল্পীর অভিনয় সম্বন্ধে এমন নিখুঁত সমালোচনা একমাত্র পুডভ্‌কিনের মত প্রথম শ্রেণীর সমালোচকের পক্ষেই সম্ভব। সবশেষে আরো একটি কথা বলেছিলেন। শিশিরকুমারের অভিনয় সুদৃঢ় বাস্তবতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এরপর চেম্বারলেন্ এগিয়ে এলেন। বিশেষ কিছু আর বলার ছিল না তাঁর। শুধু একটি বিষয় যা তাঁকে সত্যই স্তম্ভিত করে, ব্যথা দেয় তার উল্লেখ করলেন। বললেন—আশ্চর্য, আপনার মত একজন শিল্পী এই নাট্যশালায় এই পরিবেশে অভিনয় করছেন। অতিথিদের অভিনন্দনের উত্তরে শিশিরকুমার তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন। পুডভ্‌কিনের শেষ কথাটির উত্তরে বললেন—চিরন্তন কাল থেকে এই হলো এদেশে নাটকাভিনয়ের রীতি। এ তাঁর নিজস্বদান মনে করলে ভুল করবেন তাঁরা। উপস্থিত বন্ধুবান্ধবরা নিরহংকারী শিশিরকুমারের পরিচয় পেলেন। এর আগেও বহুবার পেয়েছেন। চেম্বারলেনের মন্তব্যের উত্তরে যা বললেন কোনদিন তাঁর দেশবাসীরা, বিশেষ করে তাঁর দর্শকরা তা বিস্মৃত হবেন না। বললেন—দেশের লোক আমায় ভালবাসে। তাদের সেই ভালবাসা এবং সহানুভূতিই আমার রঙ্গমঞ্চকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আপনি হয়ত জানেন না তারা কত গরীব। মঞ্চের এই চেহারায় তাদের সেই দারিদ্রের ছবিই ফুটে উঠেছে। এও বললেন যে, প্রয়োজনে তাঁদের দেশে মঞ্চ সরকারী সাহায্য পায়। কিন্তু এখানে তা নেই, নিজের পায়ে তাকে দাঁড়াতে হবে। বিদায়কাল উপস্থিত হলো। শুভেচ্ছা

জানিয়ে করমর্দন করে পুডভ্‌কিন বললেন—আশাকরি আবার দেখা হবে। সঙ্গে সঙ্গে চেরকাশভ বলে উঠলেন—মস্কোয় বা লেনিনগ্রাডে। শুধু স্বাভাবিক সৌজন্যবশতঃই এই শেষের কথাগুলি বলা হয়নি। কারণ তাঁরা ফিরে যাওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই এম্‌বেসির মারফৎ ওদেশে যাওয়ার নিমন্ত্রণ এসেছিল শিশিরকুমারের কাছে। নানা কারণে অবশ্য সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গতঃ আরো একটি কথা জানাই। দেশে ফিরে বিখ্যাত 'প্রাভ্‌দা' কাগজে শিশিরকুমার ও তাঁর মস্কোভিনয় সম্বন্ধে তাঁরা লিখেছিলেন। শুধু তাই নয়, চেরকাশভ্‌ তাঁর ভারতভ্রমণ সম্বন্ধে লেখা বই-এ বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই শিশিরকুমারের কথা উল্লেখ করেছেন।

একদিন এক জার্মান দর্শকও ওই ঘোড়শী দেখতে এসেছিলেন। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। এক বর্ণও বাংলা বোঝেন না। কিন্তু তাতে কিছু এলো গেল না। রসগ্রহণে কোন ত্রুটি ঘটল না। নাটক শেষ হলে তিনিও শিশিরকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, অভিনন্দন জানান। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন প্রযোজনার। নাটকের বক্তব্যটুকুও যে বুঝেছেন তার পরিচয় দিলেন। বললেন—বাংলা জানিনে বলে দুঃখিত। তবে, মনে হ'ল জমিতে প্রজার অধিকারের কথাই নাট্যকার বলতে চেয়েছেন। ঈষৎ হেসে এও বললেন যে, গণতন্ত্রবাদের আভাস পেলাম নাটকটিতে।

প্রসঙ্গতঃ এক জার্মান মহিলার কথা বলি। নাম Sonja Faukhanel। লোক পরম্পরায় শিশিরকুমারের কথা শুনে শ্রীরঙ্গমে এসে হাজির হন। চাণক্যের ভূমিকায় শিশিরকুমারকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন জার্মান মহিলা। বলাবাহুল্য, তারপর প্রায় প্রতি রাত্রেই শ্রীরঙ্গমের প্রেক্ষাগৃহে তাঁকে দেখা যেত। বারবার এক একটি নাটক দেখতেন। তবু যেন মন ভরতো না। আবার আসতেন, আবার সেই একই নাটক দেখতেন প্রথম দেখার আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে। শিল্পীর অলৌকসামান্য প্রতিভা তাঁকে কতখানি আকৃষ্ট করেছিল তা তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি। তিনি লিখেছেন—

> "I remember still how I, always interested to learn more about india had at last discovered Sri Rangam and watched for the first time Sri Sisir Kumar Bhaduri as Chanakya in 'Chandra Gupta'. I hardly knew any Bengali then and needed an interpreter. But already at that time I was fascinated by the acting and, forgetting every thing else, came again and again to see every play, some of them more than once. Never had I heard Bengali spoken as beautifully as here. And besides growing an interest in the language I began to learn more about the historical and cultural background of India. Sri Rangam almost became a part of my life."

নিঃশব্দে একদিন শ্রীরঙ্গমের যবনিকা চিরদিনের মত নেমে এলো। এখানকার অগণিত দর্শকের মত বিদেশাগত মহিলাটিও মর্মাহত হলেন, ব্যথা পেলেন। এ তাঁর কল্পনারও অতীত ছিল। তাই বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই মন্তব্য করলেন, "Such a thing would have been unthinkable in Germany." প্রসঙ্গতঃ একটা খবর দিই। অপরিসীম শ্রদ্ধাশীলা ও গুণমুগ্ধা মহিলাটির শিশিরকুমারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। শুধু তাই নয়, শিশিরকুমারের সঙ্গে মাইকেল মধুসূদন-এ হেনরিয়েটার

ভূমিকায় তাঁর মঞ্চে নামার কথাও হয়েছিল। কিন্তু নানা অভাবনীয় কারণে শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠে নি।

১৯৪৪ সালে বিশ্ববিশ্রুত শিল্পীদম্পতী স্যার লুই ক্যাপন ও ডেম্ সিবিল থর্নডাইক ওই মাইকেল মধুসূদনে শিশিরকুমারের অপূর্ব অভিনয় দেখে বিস্মিত হন, মুগ্ধ হন। অভিনয় শেষে সেরাত্রে মঞ্চে উঠে শিল্পীকে অন্তরের অভিনন্দন জানাবার কালে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাঁরা যা বলেন, অল্প কথায় তা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বললেই হবে যে, একমাত্র আদোলোভ মঞ্চেই এ ধরণের 'ক্লি এ্যাক্টিং' তাঁরা দেখেছেন বলেন, তাঁদের মতে মস্কো আর্ট-থিয়েটারের শিল্পীদের মত আপন ভাষায় অভিনয় করেও শিশিরকুমারের মত অসাধারণ এক অভিনেতার পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দাঁড়াবার পুরই সহজ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে কোন দেশই শিশিরকুমারের মত এক নটের জন্মে গৌরব বোধ করবে, তাও বলেছিলেন।

দর্শকরা তাঁর একটিমাত্র পরিচয় পেয়েছিলেন। শ্রেষ্ঠ এক মঞ্চাভিনেতা ও প্রযোজকর্তার পরিচয়। কিন্তু বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। তাই তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর প্রখ্যাত আমেরিকান নাট্যকার পল্ এলিয়ট গ্রীণ, তাঁকে "inspiring personality" বলে বর্ণনা করেন। এও বলেন যে, "he symbolizes the hope of future India"। 'হেরাল্ড ট্রিবিউন' কাগজের বিদেশী সংবাদদাতাও এক সাক্ষাতের পর মন্তব্য করেন যে, "in himself Sisir Kumar Bhaduri is a giant enough, a personality at once attractive and forceful"। নামজাদা মার্কিন নাট্যসমালোচক ডাঃ রোজামণ্ড গিল্ডারও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রখর ব্যক্তিত্বে অভিভূত হন। 'জীবনরঙ্গ' দেখতে এসে শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। স্বদেশে ফিরেও সে পরিচয় হারিয়ে যায়নি। নিয়মিত 'থিয়েটার আর্ট' পত্রিকা তাঁকে পাঠাতেন। তাঁর বইও উপহার পাঠিয়েছিলেন শিশিরকুমারকে।

কতবড় এক মনীষী এই বাংলাদেশে জন্মে তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে বিশ্বের নানা দেশের গুণীজনদের এদেশের নাট্যশালার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন, তাঁদের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও আন্তরিক প্রশংসা লাভ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলা হলো। স্বল্পপরিসরে অনেককিছুই যে না-বলা রয়ে গেল তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

শিশিরকুমারের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী সভায় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিকই মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেন, শিশিরকুমার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক।

অমল মিত্র

॥ শিশিরকুমার ॥

১৯২০-২১ সাল···কোর্টে ওকালতি করি এবং বন্ধুবর মণিলালের (গঙ্গোপাধ্যায়) সঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা করি, তখন প্রথম শুনি মেট্রোপলিটান কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাম। শুনি, কলেজে তিনি ইংরেজী কাব্য-নাটক এমন ভাবে পড়ান যে ছাত্রেরা কাব্য-নাটকের রস সম্যক উপলব্ধি করে—আরো শুনি, তিনি চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করেন এবং ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে 'চাণক্যে'র ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেছেন। তার আগুতোষ, যিনি কখনো নাট্যাভিনয় দেখেন না, তিনিও বলে আগাগোড়া সে অভিনয় দেখে বিমুগ্ধ হয়েছেন—তখন শিশির কুমারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার বাসনা মনে জাগ্রত হয়; কিন্তু পরিচয়ের সুযোগ ছিল না।

সে সুযোগ ঘটলো ১৯২১ সালে পূজার সময়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তখন জোড়াসাঁকো থানার সাব-ইন্‌স্পেক্টর (পরে কলিকাতার পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের পদ অলঙ্কৃত করেন)। তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং তাঁর নাট্যকুশলতা প্রবল ছিল। তিনি হঠাৎ কোর্টে আমাকে বললেন—তাঁর রঙমহল ওল্ড ক্লাব•(১) করবে গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের অভিনয়—শিশিরকুমার নামবেন ভীম এবং ব্রাহ্মণের ভূমিকায়। তিনিই অভিনয় শিক্ষা দিয়েছেন। প্রভাতকুমার আরো আমাকে বললেন, তিন টাকার একটা টিকিট কিনতে হবে। শিশিরকুমারের অভিনয় দেখবার লোভে কিনলুম তিন টাকার একখানি টিকিট এবং যথাসময়ে গেলুম ওল্ড ক্লাবের সে অভিনয় দেখতে।

মনে খুব বড় একটা আশা নিয়ে যাইনি। ভেবেছিলুম, সাধারণ রঙ্গালয়ের নটনটীদের নকল করে এ্যামেচারের দল যেমন অভিনয় করে, হয়তো তার চেয়ে একটু সরেস কিছু দেখবো। কিন্তু তা নয়—যা দেখলুম, তা একেবারে অপূর্ব—আমার কল্পনাতীত!

নাটকখানিতে শিশিরকুমার শুধু অভিনয় করেননি, প্রযোজনা হয়েছিল তাঁরই নির্দেশে। সে প্রযোজনায় ছিল জোড়াসাঁকোর বাড়ীর অভিনয়-প্রযোজনার প্রাচ্য আদর্শরীতি।

রঙমহলে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়ে রাজা-রাজড়ারা পরতেন জরির বর্ডার দেয়া মখমলের ব্রীচেস, গায়ে জরিচুমকির কাজ করা কোট, মাথায় কার্তিক ঠাকুরের পালকদেওয়া টুপি, কিন্তু শিশিরকুমারের প্রযোজনায় ওল্ড ক্লাবের যুধিষ্ঠির প্রভৃতির পরণে দেখলুম বেনারসী-জোড়—মাথায় তাজ। কারো তাজে একটা পালক—কারো তাজ পালকবিহীন। পট উঠতে এই পোষাক দেখে মনে বিপুল সম্ভাবনা

•(১) ওল্ড ক্লাব—প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সংস্থাপিত—শিক্ষিত কলারসিক তরুণদলের সাংস্কৃতিক আসর। ক্লাবটি ছিল ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট এবং বহুবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে—ওয়েলিংটনের উত্তর পূর্বদিকে যে বাজার, সেই বাজারের বাড়ীর দোতলায় বড় ঘরে অবস্থিত। এ আসরে গান-বাজনার চর্চা হতো, সাহিত্যের আসর বসতো এবং বছরে দু-একবার নাট্যাভিনয় হতো। ১৯১৫ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত এ ক্লাবের কার্য-নির্বাহক সমিতির আমি একজন সদস্য ছিলুম। ক্লাবে প্রতি বৎসর খুব সমারোহে সরস্বতী পূজা হতো—মাসে মাসে ওস্তাদ বাজিয়ে গাইয়ে আনিয়ে যে আসর বসতো তেমন আসর সে যুগে ছিল প্রায় দুর্লভ। শিশিরকুমার এ ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন ১৯১৭ সালের পরে এবং অভিনয়ের দিক দিয়ে ক্লাবের নাম তাঁর শিক্ষার গুণে অচিরকালমধ্যে আরো-অতীত-যুগের ভারত সঙ্গীত সমাজের মতো প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এখনো এ ক্লাবের অস্তিত্ব আছে।

দেখেছিল। তারপর অভিনয় যা দেখলুম, অত্যন্ত শান্ত, সংযত এবং স্বাভাবিক। বীরত্বের ব্যঞ্জনায় গগন-বিদারী উচ্চনাদ নেই, করুণরসের অভিনয়ে কোঁপানি বা হাহাকার নেই; নাকিসুরও নেই! সে অভিনয়ের স্মৃতি মন থেকে আজো মিলিয়ে যায়নি।

বাঙলা থিয়েটারে এবং যাত্রায় বেশ 'ষণ্ডা' চেহারার মানুষকে নামানো হতো ভীমের ভূমিকায়, ভীম সেজে নট সর্বদা বেশ কটমট করে তাকাতো—গদা-আস্ফালন করতো এবং তার গালে থাকতো গালপাট্টা—কিন্তু শিশিরকুমারের ভীম: শিশিরকুমারের বয়স তখন কত? বত্রিশ তেত্রিশ হবে—সুগঠিত সুকুমার দেহ, সুপুরুষ, গালে তিনি গালপাট্টা লাগাননি—গদা আস্ফালনও করেননি—তাঁর অভিনয়ে বাপাদাপি ছিল না—পাণ্ডব চরিত্রানুরূপ ধৈর্য এবং সংযম; বীরত্ব, সাহস এবং নির্ভীকতার আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য করে চমৎকৃত হয়েছিলুম।

কীচককে নিধন করার দৃশ্যেও পাণ্ডবের গরিমাভঙ্গী যেমন প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি প্রকাশ পেয়েছিল দুষ্ট দানবকে দলন করার বীর্যশৌর্য।

সেই রাত্রেই ষ্টেজে গিয়ে শিশিরকুমারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করি। ভেবেছিলুম, এমন যাঁর প্রতিভা, হয়তো দেখবো মানুষটি অহঙ্কারী। কিন্তু তা নয়—প্রথম পরিচয়েই দেখলুম তিনি আশ্চর্য অমায়িক, নিরহঙ্কার এবং শিষ্ট। কালচারের প্রধান যে গুণ বিনয়-নম্রতা—তিনি সেই বিনয়-নম্রতার প্রতিমূর্তি। সেই রাত্রেই নাটক, নাট্যশালা এবং অভিনয় প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে হয়েছিল আমার আলোচনা। এমন একটা গুজব রটেছিল, তিনি ম্যাডান কোম্পানির বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানিতে নট-নাট্যাচার্য রূপে যোগ দেবেন—প্রোফেসরি ত্যাগ করে। সে কথা তোলাতে তিনি বললেন, বাঙলা রঙ্গমঞ্চ মরতে বসেছে, তাকে নূতন প্রাণ দিয়ে, নূতন রূপ দিয়ে গড়ে তুলবেন, এই তাঁর বাসনা।

এর পর ১৯২১ সালে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম অবতীর্ণ হলেন—বেঙ্গলী থিয়েট্রিকাল কোম্পানিতে—ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাটকে আলমগীরের ভূমিকায়।

ষ্টার-মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটার ক'জন নটনটীকে অচল বলে বাতিল করেছিল—তাঁদের নিয়েই ম্যাডান বেঙ্গলী থিয়েট্রিকাল কোম্পানি চালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থমনোরথ হয়—উর্দু নাটকের বাঙলা তর্জমা এদের দিয়ে অভিনয় করাবার প্রয়াস ব্যর্থ হবারই কথা। সেজন্য কোম্পানি ক্ষীরোদপ্রসাদকে নাট্যকারের পদে নিয়োগ করলো এবং শিশিরকুমারকে নিয়ে এলো নট-নাট্যাচার্যরূপে মাসিক এক হাজার টাকা বেতন দিয়ে। শিশিরকুমারের শিক্ষার গুণে ঐ সব নটনটী তাঁদের ভূমিকাগুলি এমন জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুললেন যে নাট্যমঞ্চে সে এক পরম বিস্ময়ের সৃষ্টি হলো। তাঁদের মামুলি বাচনভঙ্গী, চলাফেরার বদলে সর্ববিষয়ে প্রাণের স্বাভাবিক হিল্লোল পরিলক্ষিত হলো।

এই সময়েই শিশিরকুমারের সঙ্গে মণিলাল, সত্যেন্দ্র দত্ত (কবি) এবং আমার হলো নিবিড় সখ্য এবং অন্তরঙ্গতা। আমার গৃহে তিনি আসতেন, আমাদের 'ভারতী'র আসরে তিনি আসতেন এবং আমরাও তাঁর তখনকার গৃহে (চালতাবাগানে যোষ লেন) হামেশা° যাতায়াত করতুম—নাটক এবং অভিনয় শুধু নয়, সাহিত্য সম্বন্ধেও আমাদের আলোচনা হতো।

শিশিরকুমারের আলমগীরের অভিনয় দেখতে এলেন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ। দেখে তাঁরা বললেন—এমন একজন মানুষ এলেন যিনি বাঙলা রঙ্গমঞ্চকে আবার খাড়া করে তুলতে পারবেন। সুধী-সমাজে ধন্য-ধন্য রব উঠলো।

কিন্তু বিঘ্ন ঘটলো—উচ্চ চীৎকারকে সম্বল করে যেসব নট রঙ্গমঞ্চে নামছিলেন, তাঁদের গলা আতঙ্ক। শিশির কুমারের অভিনয়ের ধারা এবং প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখে তাঁরা বুঝলেন তাঁদের আসন টলছে! তখন তাঁদের দিক থেকে রব উঠলো—শিশিরকুমারের voice অর্থাৎ গলা'র জোর নেই। একথা চাউর হতে আমরা বললুম—মালিক যখন ব্যবসার দিক আগে দেখবে, তখন ঐ গলার জোরের অজুহাতে থিয়েটারের দ্বারা রুদ্ধ—অর্থাৎ গ্যালারির দর্শক, তারা হয়তো বিভ্রান্ত হবে—অতএব গলার জোর দেখাবার কি উপায় হবে? শিশিরকুমার বললেন, 'রঘুবীর' অভিনয় করবো, তাতে গলা যা বার করবো, সকলের তাক্ লেগে যাবে।

'রঘুবীর' নাটকের অভিনয় তিনি করলেন। শুধু গলার জোরে নয়—অভিনয়ও যা হলো, তা এক কথায় অপরূপ। রঘুবীর ভীরু প্রকৃতি—অন্যায় অত্যাচার দেখে যেদিন তার মন হলো সচেতন—সেদিন সে উঠলো যেন নবজন্মে জেগে। অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে সে শাণিত ছোরা হাতে মাং-মুক্তিতে জাগলো—নাটকে অত্যাচার সম্বন্ধে আভাসে বিদেশী শাসকের অত্যাচার-পীড়নের ইঙ্গিত ছিল—ছোরা লুফতে লুফতে যে-ভাবে শিশিরকুমার এদৃশ্যে মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, সে দৃশ্যে দর্শকরা উপলব্ধি করতেন এ শুধু রঘুবীর জাগরণ নয়—আমাদেরো এমনি ভাবে জাগতে হবে। রঘুবীরের এ অভিনয় বাঙলার মঞ্চে অবিস্মরণীয় কীর্তি!

রঘুবীর নাটকের অভিনয় তিনি করলেন এবং সে নাটকে ভীরু রঘুবীরের ভূমিকায় গলা যা বার করলেন, তাতে অভিযোগ টিঁকতে পারলো না।(২)

কিন্তু মালিকের সঙ্গেও মতান্তর হতে লাগলো। আলমগীর নাটকে রূপনগরের ভুঁইয়া রাজার বাড়ীর দৃশ্য-রচনায় শিশিরকুমার নির্দেশ দিলেন—গরীব রাজা চাষবাস করেন, তাঁর পুরী হবে ভাঙাচোরা পাথরের স্তূপ—তাতে কোনো জৌলুষ বা ঝাঁকজমক থাকবে না,—কিন্তু কোম্পানির পাশা মালিক বললেন, না, তা হবে না। শিশিরকুমারের নির্দেশ ঠেলে তাঁরা দিলেন তাঁদের পেন্টার হুসেনকে নির্দেশ, সব সোনে লাগাও! জমকালো প্রাসাদের দৃশ্য তৈরী হলো। এ ছাড়া অভিনয় এবং প্রযোজনার দিকেও তারা হস্তক্ষেপ করতে লাগলেন। শিশিরকুমার আমাদের বললেন, পাশা ব্যবসায়ীর কাছে চাকরি করে নাট্যালয়ের কিছু করতে পারবো না—নিজের free will যদি না খাটে, কেন তবে কলেজ ছেড়ে নাট্যমঞ্চে আসা? ঠিক রোজগার করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি চাই বাঙলা থিয়েটারকে তার পূর্ব গৌরবের আসনে বসাতে, নূতনরূপে তাকে গড়ে তুলতে। কাজেই নিজের রাজত্ব চাই।

একদিকে তাঁর মনে এই অস্বস্তি—অন্যদিকে পাশী মালিকের তাগিদ নতুন বই চাই। তখন শিশিরকুমার, মণিলাল এবং আমি—তিনজনে রবীন্দ্রনাথের কাছে "বিসর্জন" নাটক অভিনয়ের অনুমতি সংগ্রহ করলুম, ভূমিকালিপি নির্দিষ্ট হলো—গোবিন্দমাণিক্য—ইবি রায়, রঘুপতি—শিশিরকুমার; জয়সিংহ—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়; গুণবতী—কুসুমকুমারী; সেকালিকা (পুতুল)—অপর্ণা। তিন হপ্তা রিহার্সাল চললো—তারপর রিহার্সাল বন্ধ—শিশিরকুমার ম্যাডান কোম্পানির থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে বেরিয়ে এলেন—১৯২৪ সালে। বেরিয়ে এসে শুরু ফাইনান্সিয়ারের সন্ধান—নিজেদের স্বতন্ত্র থিয়েটার খোলবার চেষ্টা।

চুপ করে বসে থাকতে পারেন না—তখন কজন বন্ধুর উদ্যোগে তিনি বিশ্ব তোলার কাজে নামলেন। হরদয়াল রোডে তাঁরমহল কোম্পানী খুলেছেন বিনয় ঘোষ (প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার বি, সি, ঘোষের

কনিষ্ঠ সহোদর—'কাকু' ঘোষ নামে পরিচিত)। বন্ধু নরেশ ঘোষের আর্থিক আনুকূল্যে ঐ তাজমহল কোম্পানির বাগানে শরৎচন্দ্রের "আঁধারে আলো" গল্পটির চিত্র-রূপায়ণের ব্যবস্থা হলো।** চিত্রনাট্য লিখলেন আর একজন বন্ধু সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, হাইকোর্টে ওকালতি সুরু করেছেন। ছবি তোলা হলো—(১৯২২)—শিশিরকুমার নায়লেন নায়ক সত্যেন্দ্রর ভূমিকায় এবং এ ছবির পরিচালনা তিনি করলেন। ফিল্মে তাঁর সেই প্রথম অবতরণ নয়—ম্যাডান কোম্পানির কাজ করবার সময় ম্যাডানের ছবি "মোহিনী"তে তিনি নায়েন রাজার ভূমিকায়—সে ছবিতে রাণীর ভূমিকায় নেমেছিলেন মিস্ পেসেন্স কুপার এবং মোহিনীর ভূমিকায় এক ইতালীয়ান মহিলা মিস আলবার্টিনা।

কিন্তু সিনেমা তাঁর ভালো লাগলো না—তিনি বললেন, সিনেমার অভিনয়—অভিনয় নয়—ফাঁকি, অভিনয়কে ব্যঙ্গ করা! তিনি ছবির লাইন ত্যাগ করলেন।

তারপর ষ্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটার তাঁকে নেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাঁর দৃঢ় পণ—চাকরি নয়—নিজে করবেন নাট্যাভিনয়ের সর্বাধ্যক্ষতা। নিজস্ব থিয়েটার খুলবেন, এই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান।

মনে আছে—তিনি এসময়ে কখনো 'ভারতী' অফিসে, কখনো আমার গৃহে, কখনো বা মণিলালের গৃহে এসে খেদ প্রকাশ করতেন। অনেকে বললেন—প্রোফেসরি করতে যাও! তিনি বলতেন, না, ষ্টেজই হবে আমার কর্মক্ষেত্র। আমার বিশ্বাস, আমি নবরূপে গড়ে তুলতে পারবো বাঙলার নাট্যমঞ্চকে।

তাঁর মনের এ আকুলতায় বিধাতা সদয় হলেন। ১৯২৩ সালে শীতকালে ইংরেজ সরকারের উদ্যোগে কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে এক বিরাট এগজিবিশন্ খোলা হলো—এগজিবিশনের অধ্যক্ষতাভার পেলেন কমিশনার কে, সি, দে (কিরণচন্দ্র দে) আই-সি-এস। তিনি শিশিরকুমারকে বললেন—এগজিবিশনে থিয়েটার হবে ষ্টেজ বাঁধিয়ে। তুমি তোমার দল নিয়ে এসে ক'দিন সন্ধ্যায় অভিনয় করো। —অবৈতনিক ব্যাপার নয়—টাকার ব্যবস্থা ছিল। শিশিরকুমার তখনি উঠে পড়ে লাগলেন—নিজের ভাই, শিল্প-সাকরেদ এবং তাঁর অনুরাগী ক'জন নটনটীকে নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। এ ব্যাপারে তিনি সর্বাধ্যক্ষ—কারো interference ছিল না; কাজেই প্রয়োগ-নৈপুণ্যে এবং অভিনয়ের চমৎকারিত্বে 'সীতা' সকলকে বিমুগ্ধ করলো। দৃশ্যসজ্জা স্বভাবসম্মত—রূপসজ্জাও নিখুঁৎ—রাম এবং ভরতের দেহবর্ণে নবদুর্বাদলের আভা—লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নর দেহে গৌর-আভা—বেশভূষা প্রাচীন যুগের ভারতীয় আদর্শে তৈরী, মাথার মুকুট প্রভৃতি সব প্রাচ্যকলাসম্মত—যেখে অতিসাধারণ দর্শকও ধন্য-ধন্য রব তুলেছিল।

সীতার এই অসাধারণ সাফল্যে শিশিরকুমার উৎসাহিত হলেন—এবং তখন অ্যালফ্রেড থিয়েটার কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের দক্ষিণে—Y. M. C. A.র সামনে স্থাপিত ছিল—এটি ছিল ম্যাডান কোম্পানির হাতে, স্থির হলো ঐ অ্যালফ্রেড থিয়েটার লীজ নিয়ে ঐ মঞ্চে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নিয়ে শিশিরকুমার নিজস্ব রঙ্গালয় চালাবেন। রিহার্শাল চালাতে লাগলেন—এ খবর চারিদিকে রাষ্ট্র হলো এবং থিয়েটারের দ্বার উদ্ঘাটনের তারিখ নির্দিষ্ট হলো ১৯২৪ সালের ষোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায়। অভিনয়ের পূর্বে 'সীতা' নাটকের অভিনয়-স্বত্ব ক্রয় করা চাই—দ্বিজেন্দ্রলালের একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার হলেন নাটকের স্বত্বাধিকারী—তিনি শিশিরকুমারকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁর উপর দিলীপকুমারের অগাধ বিশ্বাস। তিনি তখন ভারতের বাহিরে। তিনি এলেই অভিনয়-স্বত্ব পাওয়া যাবে এ সম্বন্ধে শিশিরকুমার সম্পূর্ণ নিঃসংশয়।

** কেউ কেউ লিখেছেন, শিশিরকুমার লিখেছিলেন চিত্র-নাট্য, কিন্তু সে কথা ঠিক নয়। কারণ—"আঁধারে আলো"র চিত্রনাট্যখানি আমার কাছে আজো সংরক্ষিত আছে।

কিন্তু বিঘ্ন ঘটলো। তিনি এ্যালফ্রেডে নিজস্ব সম্প্রদায় নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটক খুলে অভিনয় সুরু করলেন—সীতার সুখ্যাতিতে সহর মুখরিত—তখন ক'মাস পূর্বে আর্ট থিয়েটার্স জন্মে উঠছে, আর্ট থিয়েটার্সের ভয় হলো—'সীতা' নিয়ে শিশিরকুমারের রঙ্গালয়ে আবির্ভাব ঘটলে তাঁরা হবেন বিপন্ন, তাই তাঁরা ওৎ পেতে রইলেন—যাতে শিশিরকুমার না পান, 'সীতা'র অভিনয়-স্বত্ব ; এবং দিলীপকুমার ট্রেন থেকে হাওড়া ষ্টেশনে নামামাত্র আর্টস্ থিয়েটারের কর্তাব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর বাড়ীতে এলেন ···বললেন—'সীতা'-অভিনয়ের তাঁরা উদ্যোগ করেছেন—দিলীপকুমারকে অভিনয়-স্বত্বের মূল্য দিয়ে দলিল পর্য্যন্ত লিখিয়ে নিলেন। শিশিরকুমারের 'সীতা' অভিনয়ের সকল সম্ভাবনা হলো তিরোহিত।

তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন! মণিলাল দিলেন ভরসা—দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' না পাই, ক্ষতি কি। আমরা নতুন 'সীতা' নাটক লিখিয়ে অভিনয় করবো! কিন্তু ষোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় থিয়েটারের দ্বার উদ্ঘাটন হবে—তার উপায়? মণিলাল দিলেন ভরসা—ষোলের দিন আমরা গানে-গানে 'বসন্তলীলা' রচনা করে থিয়েটার খুলবো। এবং তাই হলো। যোগেশ চৌধুরী এসে যোগ দিয়েছিলেন—তাঁকে দিয়ে 'সীতা' নাটক লেখানোর ব্যবস্থা এবং ষোলের দিন এ্যালফ্রেডে 'বসন্তলীলা' গীতিনাটিকার অভিনয় হলো। বসন্তলীলা প্রোগ্রামে শিশিরকুমার লিখলেন—আমার বন্ধু শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এই বসন্তলীলার বিচিত্র মালাটি সুনিপুণভাবে গেঁথে দিয়ে আমার প্রতি তাঁর যে আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ করেছেন, তাতে আমার জীবনের এই বাসন্তী-পূর্ণিমা চিরদিনের জন্য উজ্জ্বল হয়ে রইলো।

এই বসন্তলীলা নিয়ে শিশিরকুমারের নিজস্ব রঙ্গালয়ের অভিযাত্রা সুরু হলো, বাঙলা ১৩৩০ সালের ৮ই চৈত্র (মার্চ ১৯২৪)। বরাবর তিনি ষোলপূর্ণিমায়—এ-রাত্রিটিকে স্মরণ করে তাঁর রঙ্গালয়ে বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে উৎসব-অনুষ্ঠান করতেন।

এ্যালফ্রেডে 'বসন্তলীলা' বেশ জমলো, তাছাড়া 'আলমগীর' 'রঘুবীর' অভিনয় করেও তিনি প্রচুর খ্যাতি এবং অর্থ পেতে লাগলেন।

এই সময়ে মনোমোহন থিয়েটারের মালিক মনোমোহন পাণ্ডে তাঁর কোম্পানি তুলে দেন—বাড়ী খালি হলো, পাণ্ডে মশায় তখন দার্জিলিংয়ে—শিশিরকুমার দার্জিলিংয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে 'মনোমোহন থিয়েটার' লীজ নিলেন এবং এই মঞ্চে 'নাট্যমন্দির' প্রতিষ্ঠা করে ১৯২৪ সালের ৬ই অগষ্ট তারিখে যোগেশ চৌধুরীর লেখা 'সীতা' নাটক নিয়ে তাঁর অভিযান সুরু হলো।

শিশিরকুমারের 'সীতা'র অভিনয়—বাঙলার রঙ্গমঞ্চকে নূতন রূপে যেন নূতন করে সৃষ্টি করলো! অভিনয়ে, প্রয়োগ-নৈপুণ্যে শিশিরকুমার যে বৈশিষ্ট্যের অবতারণা করলেন, তা একেবারে স্বপ্নাতীত, কল্পনাতীত। দৃশ্যসজ্জায়, রূপসজ্জায় অভিনবত্ব, অভিনয়ের অন্তরালে নেপথ্যে বিষয়ানুরূপ আবহসঙ্গীতের অবতারণা—এবং প্রত্যেকটি চরিত্রের স্বাভাবিক সংযত ভঙ্গী—এর পূর্ব্বে বাঙলার রঙ্গমঞ্চে ছিল সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। রামের ভূমিকায় তিনি দেখালেন—সীতার সঙ্গে রামের কি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সীতার বিরহে রামের অন্তর্গূঢ় বেদনার আভাস—তাঁর অভিনয়কে আগাগোড়া করুণ রসে অভিষিক্ত রেখেছিল। তৃণতল্পার সেই অভিশাপ-বাণী—তোমার মনের দুঃখ কেহ বুঝিবে না।—এ বাণীর বেদনা তাঁর অভিনয়ে রূপলাভ করে আগাগোড়া দর্শকচিত্তকে উদ্বেল রেখেছিল। তাঁর শিক্ষায় বাল্মীকির ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সীতার ভূমিকায় প্রভা, কুশ ও লবের ভূমিকায় রবি রায়, জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, শম্বুকের ভূমিকায় প্রফুল্ল রায়, তৃণতল্পার ভূমিকায় নীরদাসুন্দরী—এঁরা যেন নূতন জন্ম নিয়ে নূতন মূর্ত্তিতে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

'সীতা'র অভিনয় দেখে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন—তারতে জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের সামর্থ্য যদি কারো থাকে তো তা আছে একমাত্র শিশিরকুমারের। এছাড়া গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি যাঁরা তখন 'বাঙলা থিয়েটার' দেখতে আসতেন না, তাঁরাও এসেছিলেন সপরিবারে 'সীতা' দেখতে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'সীতা' দেখে শিশিরকুমারকে আশীর্বাদ জানিয়ে যে দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন, সে পত্র তখনকার নামকরা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

মনোমোহন মঞ্চে শিশিরকুমার এমন ব্যবস্থা করলেন—মহিলারা যাতে নীচে পুরুষ দর্শকদের সঙ্গে বসতে পারেন। তখনো পর্যন্ত মহিলাদের আসন ছিল প্রায় খাঁচার মতো—নীচে পুরুষদের আসনে মহিলাদের বসবার ব্যবস্থা ছিল না,—তিনিই প্রথম এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। যে সব দর্শক তাঁদের বাড়ীর মহিলাদের জন্য 'জেনানা পর্দা' চান, তাঁদের মহিলাদের জন্য দোতলায় আলাদা স্বতন্ত্র আসনেরও ব্যবস্থা ছিল। নীচেকার আসনে কোনো 'বক্সের' দর্শক যাতে শিষ দিতে বা অশোভন মন্তব্য প্রকাশ বা আচরণ করতে না পারে, সেদিকেও তাঁর ছিল কড়া নির্দেশ 'গার্ড'দের উপর—সুদক্ষ কর্মচারী এদিকে আগাগোড়া supervision করতেন।

তাঁর এ ব্যবস্থার সাফল্য দেখে পরে অন্য রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন—সেজন্য কোনোদিন শান্তিভঙ্গ ঘটেনি!

আর একটি ব্যবস্থা হলো—টিকিটের গায়ে বাঙলায় 'প্রবেশপত্র' ছেপে দেওয়া; আসনের মূল্য এবং সংখ্যাও দেওয়া হতে লাগলো।

১৯২৯ সালের অগষ্ট মাস থেকে নাট্যমন্দিরে 'সীতা'র অভিনয় চলেছিল একাদিক্রমে প্রায় ছেচল্লিশ পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে।...তখন অভিনয়ের জুবিলি উৎসব ছিল না—কোনোমতে একশো রজনী অভিনয় চালিয়ে হাঁকডাক করে সভা আহ্বানের রেওয়াজ ছিল না—তবু "সীতা" চলেছিল শুধু তার নিজের মহিমা-গৌরবে। তার পর ১৯২৮ সালে খোলা হলো দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী'—এ নাটকে শিশিরকুমার গৌতম এবং ইন্দ্র—এই দুটি পরস্পরবিরোধী ভূমিকায় অভিনয় করে তাঁর অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তারপর তিনি অভিনয় করেন 'জনা'। তিনি সেজেছিলেন প্রবীরের ভূমিকায়, সে অভিনয়ে আমরা প্রবীরের আসল রূপ দেখেছিলুম এবং তাঁর শিক্ষায় তারাসুন্দরী 'জনার' ভূমিকায় যে অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন—তাতে পুত্রগর্বে জননীর গৌরব এবং পুত্রবধের প্রতিশোধ স্পৃহার যে সংগত মনোভাব তাও বাঙলার রঙ্গমঞ্চে সম্পূর্ণ অভিনব। তারপর আরো দু'চারখানি নাটকের অভিনয় হবার পর মনোমোহন রঙ্গগৃহ গেল ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেন্টের দখলে। এ বাড়ী ছেড়ে শিশিরকুমার নিলেন ম্যাডান কোম্পানির কাছ থেকে তাদের কর্ণওয়ালিস থিয়েটারের লীজ তিন বছরের জন্য। কর্ণওয়ালিস মঞ্চে নাট্যমন্দিরের অভিনয় সুরু হলো ১৯২৯ সালের ২৩শে জুন তারিখে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক নিয়ে। তিনি নামলেন রঘুপতির ভূমিকায় এবং তাঁর অপূর্ব শিক্ষায় জয়সিংহের ভূমিকায় রবি রায়, গোবিন্দমাণিক্যের ভূমিকায় মনোরঞ্জন, রাণী গুণবতীর ভূমিকায় চারুশীলা, অপর্ণার ভূমিকায় পুতুল—এদের অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ—এঁরাও মুগ্ধ হয়ে শিশিরকুমারের অভিনয় শিক্ষাদান এবং প্রয়োগকৌশলের বহু প্রশংসা করেছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ' নাটকে শিশিরকুমারের কর্ণ—তাঁর শিক্ষায় পদ্মার ভূমিকায় কুকভামিনী, দ্রৌপদীর ভূমিকায় চারুশীলা যে অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, তা অবিস্মরণীয়। শিশিরকুমারের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখি কর্ণওয়ালিসে—'বিধিলিপি' নাটকে তাঁর নাদিরশাহ—it was a marvellous

creation on the stage. 'আলমগীরে'র ভূমিকায় এতটুকু ছাপ পড়েনি নাদিরশা'র—বিদেশী সুঠবাজ নাদিরের ক্রূরতা, কুটিলতা এবং বেদনাকরুণ পরিবর্তন—ক্ষণে ক্ষণে আবেগ-চাঞ্চল্য—এসব এমন অপরূপ সংযত-ভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন যে তা ভোলবার নয়! 'শেষ রক্ষা'য় তাঁর 'চন্দ্র' হয়েছিল অপূর্ব এবং ষোড়শীতে তাঁর ভাবানন্দ—এমন অনবদ্য অভিনয়—যদিও আমি সেই গিরিশচন্দ্র আমল থেকে কোনো নাটকের কোনো অভিনয় দেখতে বাকি রাখিনি—তবু। আমার মনে হয় এমন অভিনয় বাঙলা রঙ্গমঞ্চে পূর্বে কখনো দেখিনি। তাঁর অতিবড় শত্রুও স্বীকার করেছিল—He revealed talents of a master artist.

তারপর ১৯২৯ সালে এ মঞ্চের লীজ শেষ হবে—নূতন করে লীজ পাওয়া যাবে না—সেখানেই তিনি খুললেন শঙ্খধ্বনি এবং রঙ্গমঞ্চ ছাড়বার পূর্বে তিনি করলেন 'তপতী' অভিনয়। তিনি সাজলেন রাজা বিক্রমদেবের ভূমিকায়। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং প্রযোগ নৈপুণ্য দেখে চমৎকৃত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—তুমি নতুন থিয়েটার নাও—তোমার জন্য আমি নতুন নাটক লিখে দেবো।

কিন্তু কবির এ সাধ পূর্ণ হয়নি, তার কারণ ভাগ্যবিপর্যয়ে শিশিরকুমার নতুন রঙ্গালয় স্থাপন করতে পারেন নি।

তখন আর্ট থিয়েটারের পক্ষ থেকে অপরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে সাদর সম্ভাষণে আর্ট থিয়েটারে নিয়ে এলেন। এখানে তিনি প্রথমে নামলেন 'চিরকুমার সভা'য় চন্দ্রর ভূমিকায়। চন্দ্রবাবুকে তিনি প্রথম জীবন্তরূপে ফুটিয়ে তুললেন—চিন্তাশীল দার্শনিক, ছোট বড় নানাবিষয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং ভয়ানক আত্মভোলা মানুষ অর্থাৎ রীতিমত cultured. সেক্‌সপীয়রে তাঁকে দেখতে হয়েছিল—দার্শনিক ব্রুতেস্র শীল টাইপের মতো। চন্দ্রবাবুর সে অভিনয় দেখে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর অবনীন্দ্রনাথ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে শিশিরকুমারকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তারপর আর্ট থিয়েটারে তিনি 'মন্ত্রশক্তি'তে দুর্গাদাস ভূমিকায় এবং আরো ক'খানি নাটকে অভিনয় করেন। এবং এখানে অভিনয় করবার সময়ে আমেরিকা থেকে তাঁর আমন্ত্রণ এলো সদলে সেখানে গিয়ে তাঁর অভিনয় দেখাবার জন্য!

দল নিয়ে যাওয়ার দিকে বাধা ঘটলে—ক'জন কৃতী নটনটী যাঁরা তাঁর শিক্ষায় তখন রঙ্গজগতে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন—তাঁরা যেতে রাজী হলেন না! তিনি পেলেন শুধু যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তারাকুমার ভাদুড়ী, সৈলেন্দ্র চৌধুরী, অমলেন্দু লাহিড়ী, কঙ্কাবতী ও প্রভাকে—দল পূর্ণ করতে নিতে হলো ক'জন 'এ্যামেচার'কে—তাদের নিয়েই ১৩৩৭ সালের ভাদ্র মাসে তিনি আমেরিকা যাত্রা করলেন।

তাঁর যাত্রা করবার প্রাক্কালে ২১শে ভাদ্র তারিখে (১৩৩৭) আর্ট থিয়েটারে অভিনয়ের পূর্বে তাঁর জয় কামনা করে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানানো হয়। মুদ্রিত সম্ভাষণে অপরেশচন্দ্র লিখেছিলেন—তোমার প্রতিভা অপরূপ মহিমায় নব নব সৃষ্টির সুষমাবৈচিত্র্যে শোভাসৌন্দর্যে বঙ্গীয় নাট্যশালাকে রূপোজ্জ্বল করিয়াছে—সমৃদ্ধ করিয়াছে, গৌরবান্বিত করিয়াছে···তোমার প্রতিভায় বঙ্গীয় রঙ্গপীঠ আজ ভারতীয় সুর-বৈশিষ্ট্যে মহিমাময়, কলা-লক্ষ্মীর প্রসাদ কিরণে অপরূপ - অভিনয় শিক্ষাদানে তোমার একাগ্র নিষ্ঠা—প্রযোগ-বিজ্ঞানে তোমার জ্ঞানকুশল কৃতিত্ব···রঙ্গপীঠে দেশকালপাত্র তোমার সুনিপুণ কলাচাতুর্যে প্রাণ পরিগ্রহ করিয়াছে···তুমি নটবীর, নাট্যাচার্য্য ইত্যাদি।

এই অনুষ্ঠানে আমি একটি গান লিখেছিলুম—অনুষ্ঠানের সূচনায় সে গানটি গাওয়ানো হয় পঙ্কজ মল্লিককে দিয়ে। সে-গানের কটি ছত্র :—

বাঙলার নাট্য অরে তুমি করিলে মহিমা-উজ্জ্বল—
আরতির দীপশিখার পরশে নাশিলে তিমির বজ্জল!
অমৃতমন্ত্রে দিলে প্রাণ রূপ আশা
বিমল হাসিভাতি, নব সুর-ভাষা
অতীত ভারত-জীবনপ্রবাহে করিলে সুর উজ্জ্বল।　ইত্যাদি।

আমেরিকায় নিউইয়র্কে তিনি পৌঁছুলেন ২৪শে অক্টোবর। সিটি হলে সেখানকার ডেপুটি মেয়র তাঁকে বিপুল সমারোহে অভ্যর্থনা করলেন। সেখানে তাঁর অভিনয় এবং প্রভার অভিনয়—দুজনের অভিনয়ের খুব সুখ্যাতি হয়েছিল।

তারপর দুশ্চিন্তা মর্মর মনে দিন যাপন—স্টেজ নেই, অর্থ নেই। উপায় নেই, আশা নেই! ভবিষ্যৎ অন্ধকার!

এই সময়ে আর্ট থিয়েটার হলো বন্ধ—হাতের মুঠো খালি—আর্ট থিয়েটার গেল লিকুইডেশনে। হাইকোর্ট থেকে রিসিভার নিযুক্ত হলেন কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনি ছিলেন শিশিরকুমারের সহপাঠী এবং ইনষ্টিটিউটে তিনিও শিশিরকুমারের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। কান্তিবাবুর সাহায্য নিয়ে জীজ পেলেন শিশিরকুমার (১৯০৪)। অনেক বন্ধু অর্থ সাহায্য করলেন ঋণস্বরূপ এবং এখানে শিশিরকুমার করলেন নব নাট্যমন্দির। নব নাট্যমন্দির খোলা হলো রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক নিয়ে (২৮ জুলাই, ১৯০৪)। 'বিসর্জনে'র পর দু-একখানি অন্য নাটকের অভিনয়—কিন্তু তেমন জমলো না। না-জমার কারণ—থিয়েটার বাড়ীর অবস্থা জীর্ণ—অর্থাভাবের জন্য সাজসজ্জা এবং দৃশ্যপটাদি মনের মতো করা হলো না। তারপর ১৯০৪ সালে ডিসেম্বর মাসে শিশিরকুমার করলেন শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'দত্তা'র নাট্যরূপ—বিজয়া। এ অভিনয়ে তিনি নামলেন রাসবিহারীর ভূমিকায়। বিজয়ার ভূমিকায় কঙ্কাবতী, নরেন্দ্রনাথের ভূমিকায় বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, বিলাসের ভূমিকায় শৈলেন্দ্র চৌধুরী, ধনালের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। রাসবিহারীর ভিনেনির যে-ছবি শিশিরকুমার ফুটিয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণ অভিনব। অপর ভূমিকাগুলি তাঁর শিক্ষার গুণে হয়েছিল অনবদ্য—কঙ্কাবতীর বিজয়া এবং শৈলেন্দ্র চৌধুরীর বিলাস—দর্শকদের মনে বেশ রেখাপাত করেছিল।

আজ মনে পড়ছে ১৯২১ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত যে-বিভিন্ন নাটকে তিনি যে সব বিভিন্ন বিচিত্র চরিত্রে অভিনয় করে গেছেন—সেই কথা, আর মনে পড়ছে, শিক্ষাদানকার্যে তাঁর একাগ্র নিষ্ঠা আর অপরিসীম ধৈর্যের কথা।

তাঁর রাম, আলমগীর, ইন্দ্র, গৌতম, নাদিরশাহ, প্রবীর, বিদূষক, জীবানন্দ, রাসবিহারী, নীলধর, যোগেশ, রমেশ, চাণক্য, কর্ণ, মাইকেল, চন্দ্র, মধুসূদন,—প্রতিটি চরিত্র স্বকীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে তিনি প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন—কোনো চরিত্রে অন্য চরিত্রের ছায়ামাত্র পড়েনি। আর শিক্ষাদান দেখেছি, শিক্ষা দেবার সময় শিল্পী কিছুতে পেরে উঠছে না—আমরা বিরক্ত হচ্ছি—কিন্তু যে যত পারছে না—শিশিরকুমার তত নরম হচ্ছেন, মিষ্টমধুর ভাষায় তাকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। এক একটি শিল্পীকে কিভাবে না তিনি অভিনয়ে নিপুণ করে তুলেছেন! আর প্রয়োগ কৌশল—তিনি আগাগোড়া তার নির্দেশ দিতেন। কি বিপুল আশা নিয়ে তিনি শিক্ষাক্ষেত্র ছেড়ে মঞ্চে এসেছিলেন! কিন্তু সে আশা মিটলো না···শুধু অর্থের অভাবে। দেশবন্ধু বলেছিলেন,—ভারতে জাতীয় নাট্যশালা গঠনের সামর্থ্য যদি কারো

থাকে তো তা আছে শুধু শিশিরকুমারের। একথা তিনি যখন বলেছিলেন—তখন আমাদের দেশ পরাধীন। তাদের দেশ হলো স্বাধীন—আমাদের নিজেদের রাষ্ট্র সংগঠিত হলো। আশা ছিল আমাদের রাষ্ট্র শিশিরকুমারের হাতে জাতীয় নাট্যশালা গঠনের ভার দেবে—কিন্তু রাষ্ট্র কি করলো? শুধু মামুলি উপাধিদানে তাঁকে আপ্যায়িত করলো! শিশিরকুমার সে উপাধি সহাস্যে প্রত্যাখ্যান করলেন! কেন? রাগে নয়—দারুণ অভিমানে। এ হলো শিল্পীর অভিমান! রাষ্ট্র তা বুঝলো না—তার কারণ, রাষ্ট্র চলে বৈতনিক কর্মচারীদের রিপোর্টে—রাষ্ট্রে গুণীর গুণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন!

শিশিরকুমারের কর্মজীবনের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, তাঁরা বুঝবেন, তাঁর জীবন একটা মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি! মাইকেলের বুকটা হলে হেমচন্দ্র সখেদে বলেছিলেন—

হায় মা ভারতি, চিরদিন
তোর এই কুখ্যাতি ভবে—
যে জন সেবিবে ও পদযুগল
সেই সে দরিদ্র হবে।

অবশ্য 'ভারতী'র সেবা এখন যারা Commercial দিক দিয়ে করতে পারছেন, তাঁদের সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের এ খেদোক্তি খাটে না—কিন্তু এতখানি Commercial বুদ্ধি সত্যকার কজন শিল্পীর থাকে?

মাইকেলের জীবন যেমন ট্র্যাজেডি, শিশিরকুমারের জীবনও ঠিক তেমনি। বাঙলার—শুধু বাঙলার কেন, ভারতের ইতিহাসে এ ট্র্যাজেডির কালো ছায়া কখনো মিলোবে না।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সেক্সপীয়ারের "ওথেলো" নাটকে ওথেলোর ভূমিকায় সার্ হেনরি আরভিং-এর নামবার কথা ছিল। কিন্তু কোন কারণে শেষে দর্শকগণকে জানানো হোল—"যে নূতন অভিনেতাটি ওথেলোর পার্ট করবেন, তাঁর সম্বন্ধে দর্শকেরা যেন কোন তুলনামূলক সমালোচনা করে অভিনয় নষ্ট না করেন।"

অভিনয়কালে দেখা গেল, নূতন অভিনেতাটি অতি অপূর্ব অভিনয় করছেন। দর্শকেরা স্তম্ভিত, বিমোহিত। শেষে কয়েকজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত দর্শক অভিনয়ান্তে প্রেক্ষাগৃহে বসেই চিৎকার করে উঠলেন—"সার্ হেনরি আরভিও এর চেয়ে ভাল অভিনয় করতে পারতেন না।"

নূতন অভিনেতা সন্তর্পণে পাদপ্রদীপের সামনে এসে বিনীতভাবে জানালেন,—আমার সর্বাপেক্ষা আনন্দ, আমার পুরাতন বন্ধুরাও আজ আমাকে চিনতে পারেন নি;—কারণ, আমি স্বয়ং হেনরি আরভিং,—শুধু আজ নিজেকে একবার যাচাই করতে চেয়েছিলাম।"

শ্রাবণ—১৩৬৮

সম্পাদক

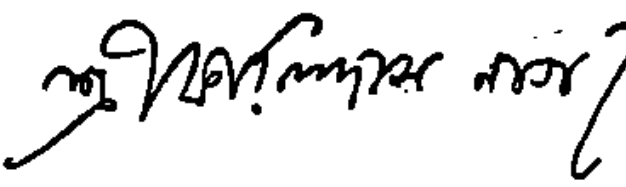

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ,
কলিকাতা—৬

মূল্য—এক টাকা

সহঃ সম্পাদক——শ্রীকল্যাণ রায়

সুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতাস্থিত, ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড,
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

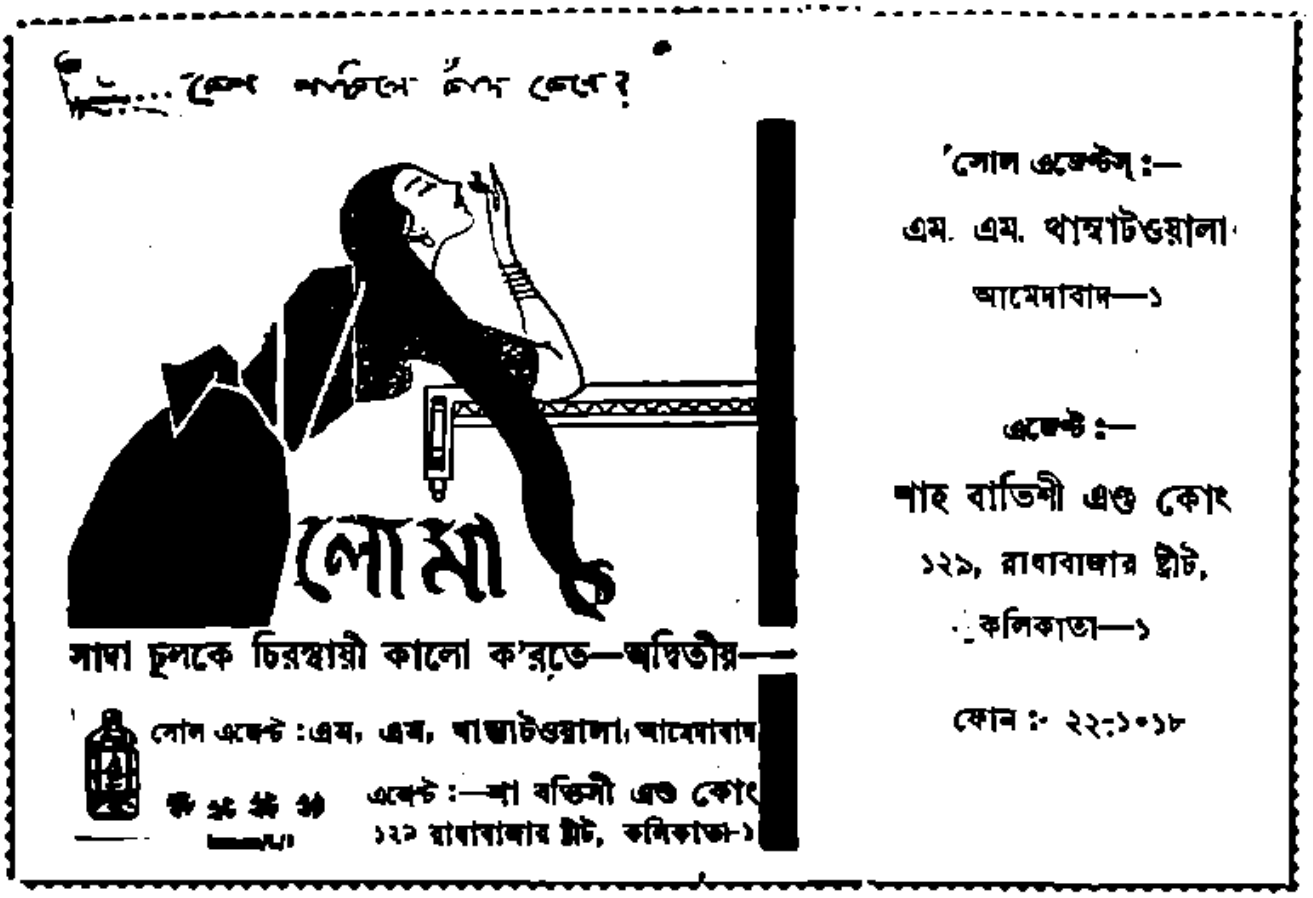

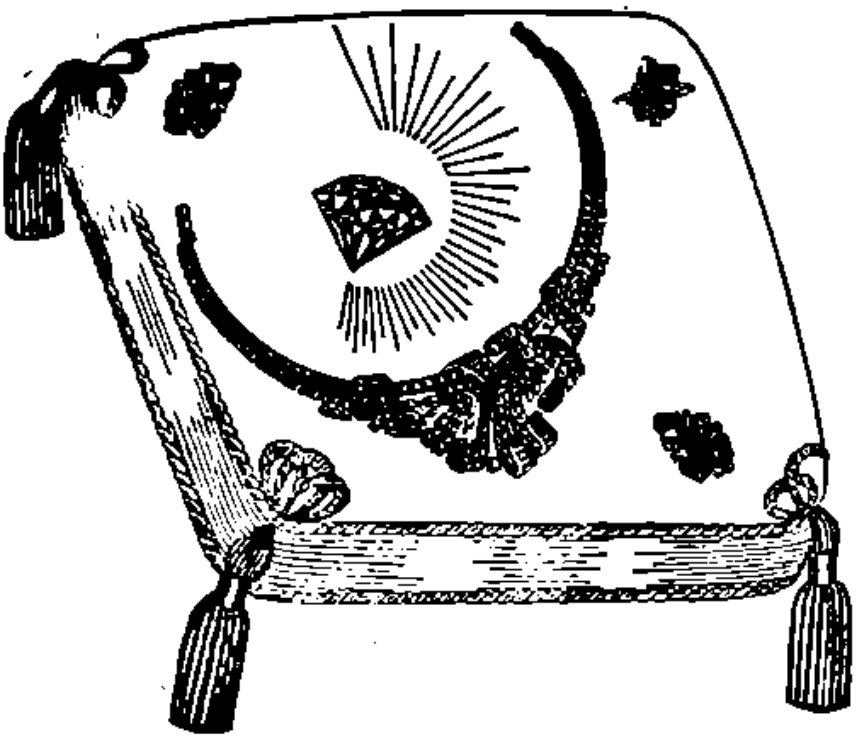

আধুনিকতম রুচির সর্ব্বপ্রকার স্বর্ণ-অলঙ্কার, মণি, মুক্তা, হীরা,
জহরত প্রভৃতির অপূর্ব্ব সম্ভার।
বিবাহ ও উৎসব অনুষ্ঠানে প্রিয়জনকে উপহার দিবার
নানাপ্রকার অভিনব ও চিত্তাকর্ষক অলঙ্কার।

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস্

স্থাপিত ১৮৮২

১-এ, বেন্টিক ষ্ট্রীট (মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস্), কলিকাতা।

ফোন : ২২-২২৭০

ব্রাঞ্চ :—৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন : ৪৭-১২৫৮

এই সংখ্যায়

॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী ॥

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন রায় ২১৯

আচার্যদেব—রমেশ চন্দ্র সেন ২২৩

প্রফুল্লচন্দ্র—শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী ২২৬

যুগ-প্রবর্তক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস ২২৯

মৃত সঞ্জীবনী সুরা

আয়ুর্ব্বেদোক্ত অমৃত তুল্য মহৌষধ।

গুণে, গন্ধে ও বর্ণে যথাযথ ও শাস্ত্রানুরূপ।

মৃতকল্প ব্যক্তিকেও সঞ্জীবিত করে। বল, বীর্য্য, মেধা, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া নূতন জীবন দান করে। সর্ব্বপ্রকার দৌর্ব্বল্যে, কঠিন রোগভোগের পর, প্রসবান্তে ও স্মৃতিশক্তিহীনতায় অমৃতের মত কাজ করে ও স্নায়ুমণ্ডলকে সবল ও সতেজ করিয়া স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জীবন দান করে।

মূল্য—৪৲ টাকা পাইট ও ৭৷৹ টাকা কোয়ার্ট

অপ্রত্যক্ষ মফস্বল খরিদ্দার

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা প্রাইভেট লিঃ

কারখানা : ঢাকা (পূর্ব্ব পাকিস্তান) ও চন্দ্রমনপর (ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন)

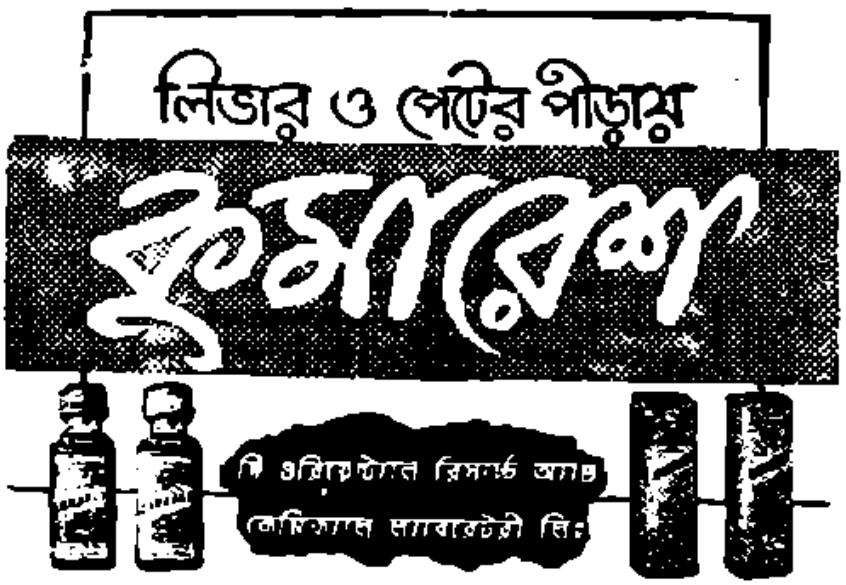

গল্প-ভারতী

সপ্তদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ—১৩৬৮

সম্পাদকীয়

নিরানন্দ বাংলার প্রফুল্লচন্দ্র (১৮৬১-১৯৪৪)

যশোর-খুলনা প্রফুল্ল রায়ের পিতৃভূমি ও অমর কবি মধুসূদনের সাগরদাঁড়ি ও কপোতাক্ষীও স্মরণীয়। সবই আজ বাংলা নয়, পূর্ব পাকিস্তান। তবু আশা আছে বাংলা ভাষা যতদিন থাকবে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের বাঙালীরা উক্ত দুই মনীষীদের স্মরণ করে তাঁদের উপযুক্ত কিছু গড়ে তুলবে, যেমন পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী রাজনৈতিক বিভেদ উপেক্ষা করে মনীষী Goethe-এর জন্ম-দ্বি-শতাব্দী উৎসব বিপুল উৎসাহে সম্পাদিত করেছিল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন হিন্দু মুসলমান সব বাঙালীর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য। তাঁর প্রিয় গ্রাম রাড়ুলীকে শেষবার দেখতে যখন তিনি যান, তার পথঘাট ছবির মত তাঁকে আনন্দ দিয়েছিল, সে কথা গ্রামবাসী-লেখক এক পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর সমকালীন বন্ধু ডাক্তার নীলরতন সরকারের (১৮৬১-১৯৪৩) মতন প্রফুল্লচন্দ্রও গ্রাম ছেড়ে এই কলকাতায় আসেন, Metropolitan কলেজে পড়েন ও কঠিন জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে জয়ী হন। তাঁদের ছাত্রজীবনের কাহিনী শোনান ও দেখান উচিত একটি শিক্ষা-প্রদর্শনী স্থাপন করে। কিন্তু হায় শতাব্দী উৎসবের বাক্যচ্ছটা ও গীত-নৃত্যের দাপটে, তাঁদের স্থায়ী দান চাপা পড়ে গেল! তবু মনে করাতে চাই যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, সেই একই বছরে (১৮৬১) জন্মেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার, কবি-সাহিত্যিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) ও বাঙালী বীর কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস (১৮৬১-১৯০৫) (যাঁর কথা Brazil-এ গিয়ে আমি শুনেছি) এমন অমর বাঙালী জীবনী সংগ্রহ করে কোনও প্রকাশক এগিয়ে এসে কি ছাপবেন? Dictionary of National Biography ছেপে ইংরেজ প্রকাশক তাঁদের দেশপ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা এতকাল ইংরেজের ও তার ভাষার গোলামী করেও সে শিক্ষা পাইনি। 'জাতীয় জীবনী কোষ' এখুনি ছাপা সুরু করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গ

গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পেলে, এই সব প্রসিদ্ধ বাঙালীদের কথা শতাব্দী উৎসবে (১৮৬১-১৯৬১) ছাপা সুরু করা যেতে পারে।

Gilchrist বৃত্তি সম্মানিত ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৮২-৮৮ ছয় বৎসর বিদেশে নানা পরীক্ষা ও গবেষণায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকরীর উমেদার যখন হলেন তখন মনীষী ডাক্তার যাঁকে D. sc. (Edinburgh) মাত্র ২৫০৲ বেতনে "সহকারী" অধ্যাপক পদ দিয়ে শাদা কর্তারা অপমান করেন কেন? এ প্রশ্ন তুলেছিলাম প্রফুল্ল-জয়ন্তী উৎসবে। কিন্তু দেশবাসীরাও ভুলে গেছেন যে পরিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বসু ছাড়া সেকালের প্রায় অন্য সব ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের ইংরেজরা সন্দেহের চক্ষে দেখতো। (বোমা বিস্ফোরণের আগেই) ; প্রফুল্লচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় Chemistry নিয়ে গভীর অধ্যয়নের মধ্যেও 'দাগী' ছাত্র হয়ে ওঠেন এই দুইখানি ইংরেজী বই ছেপে : Essay on India (1885-86) এবং India Before and After the Mutiny ; "জাতীয় সংগ্রামের আগে ও পরে" ভারতের অবস্থা সবিস্তার আলোচনা করে Scotch ও British পত্রিকা ও M. P. মহলে তিনি publicity পেলেও Secretary of State খুশী হননি ; Dr. P. C. Roy'কে তিনি সেটা জানিয়ে দেন ও তার জের চলে মাত্র ২৫০৲ টাকার চাকরী দিয়ে! বীর Savarkar রচিত History of Indian War of Independnce—সাথে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিস্তৃতপ্রায় বই আমি বিলাতে পড়ি। অথচ তার শতাব্দী উৎসবকালে "পাণ্ডা"দের নিকট বহু অনুরোধ সত্ত্বেও কলিকাতার National Library অথবা অন্য কোনও স্থান থেকে আচার্য P. C. Roy Centenary কমিটি আমার জন্য বই সংগ্রহ করে দিতে পারেননি। হয়ত শ্রদ্ধাস্পদ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ উক্ত রচনাগুলির সন্ধান দেবেন। পাওয়া গেলে তাদের পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১৮৯২ সালে (কলিকাতা কংগ্রেসের পরেই) রবীন্দ্রনাথ যেমন দ্বিতীয়বার বিলাত ভ্রমণ সেরে 'সাধনা' পত্রিকা সুরু করেন, তেমনি প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালীর আর্থিক উন্নতির সূত্রধাররূপে Bengal Chemical কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন তার মাত্র ৮০০৲ পুঁজি নিয়ে। আজ সেটি বিরাট প্রতিষ্ঠান এবং আশা করি তাঁরা প্রতিষ্ঠাতার উপযুক্ত কিছু করবেন। বিজ্ঞানতপস্বী দেশ-প্রেমিক প্রফুল্লচন্দ্রের উপযুক্ত "স্মারক" এখনো এদেশে স্থাপিত হয় নাই।

১৯০২ সালে History of Hindu Chemistry ১ খণ্ড প্রকাশ করেন তিনি। বৃটিশ ও ইউরোপীয় গবেষণা কেন্দ্রগুলি দেখে প্রভূত তথ্য নিয়ে, ১৯০৪ সালে Curzon Partition অর্থাৎ "স্বদেশী সমাজ" রচনার দিনে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ দেন এবং ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে আমরা "স্বদেশী সাবান থেকে গামছা কাপড় ইত্যাদি দেখে মুগ্ধ হই। ডাঃ নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩) ও তাঁর সহকর্মী বন্ধু ও চিকিৎসক হয়ে চিরদিন প্রফুল্লচন্দ্রের প্রাণ রক্ষা করেন। তাই আচার্য ব্রজেন্দ্র নীলের সহযোগে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর Hindu Chemistry দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করে জগদ্বিখ্যাত হন (১৯০৯) তখন থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯৪৪) তাঁকে আমরা পূজা করে এসেছি। কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক ছাত্রদের মধ্যে আচার্য জীবনী রচনার প্রয়াস দেখা যায় নাই। ১৯১১-১৯২১ সালে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থবার ইউরোপ ঘুরে কত মূল্যবান তথ্য দেশে এনেছিলেন তাও আজ বিস্তৃতপ্রায়। ১৯২২-২৩ সালে তিনি Indian Chemical Association-এর প্রথম সভাপতি হন। আবার "সঙ্কট-ত্রাণ সমিতি" গঠন করে, যশোর-খুলনার দুর্ভিক্ষ ও উত্তরবঙ্গ বন্যার্তদের সেবায় তাঁর ছাত্র মেঘনাদ সাহার মত যুবক-নেতাদের দাঁড় করিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র সারা দেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৯২৬ সালে পঞ্চমবার বিলাত যাত্রা শেষ করে মহাত্মা গান্ধীর সহকর্মী

বন্ধুরূপে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত খদ্দর ও চরকা প্রচার করে যান। তাই ১৮৮৪-৮৬ থেকে সুরু করে ১৯৪৪ পর্যন্ত ইংরেজী ও বাঙলায় কত বিচিত্র রচনা তিনি করেছেন, তাঁর ৭০ বার্ষিকী থেকে আজ পর্যন্ত, তার সঠিক সন্ধান ও গ্রন্থপঞ্জী করা হয়নি। বাংলার এই সুমহান ও দরদী বাঙালী প্রফুল্লচন্দ্রকে আমাদের সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানাই। 'বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাঁর অপব্যবহার' ১৯১০ সালে লিখে তিনি আমাদের জাগাতে চেষ্টা করেছিলেন—বাঙালী জাগছে কি? আজ শতাব্দী উৎসবের দিনেও সে প্রশ্নের জবাব পাই না কেন? 'জাতীয় মুক্তির পথে' কি কি অন্তরায়? সে বিষয়ে ভাবতে লিখিয়েছেন দেশপ্রেমিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

পণ্ডিত কেরীর দ্বিতীয় শতাব্দী—(১৭৬১—১৯৬১)

Bicentenary দু'বার পালন করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে: Sir William Jones (১৭৪৬—১৭৯৪) যিনি শকুন্তলা অনুবাদ করে জগদ্বিখ্যাত হন; তাঁর উৎসব আমি করি আন্তর্জাতিক ভাবে কলিকাতা Asiatic Societyতে এবং একখানি সচিত্র স্মারক গ্রন্থও প্রকাশ করি (Jones Bicentenary Vol. দ্রষ্টব্য—১, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।

এ বছর তাপিদ এল শ্রীরামপুর কলেজ থেকে; কারণ Rev. Carey (১৭৬১—১৮৩৪) তাঁদের প্রতিষ্ঠাতা এবং আমি ভাষণ দিয়েছিলাম তাঁর মৃত্যু শতবার্ষিকীতে (১৯৩৪)। এবছর তাঁর জন্মোৎসব ভারতে ও বিলাতে পালিত হয়েছে। বহুবাজারে Carey Chapel এ গিয়ে তাঁকে আমি স্মরণ করি ও বাঙালী খৃষ্টান নরনারীগণ কেরী-রচিত বাঙলা ধর্ম-সঙ্গীত গেয়ে তাঁকে অর্ঘ্য দেন। শ্রীরামপুর কলেজের Principal Stewart ও তাঁর বিদুষী স্ত্রী আমাকে ঘিরে প্রবন্ধ লেখান স্মারকগ্রন্থে; তাতে "বাঙলা ভাষায় কেরীর দান" বিষয়ে একটি নিবন্ধ লিখে দিয়েছি।

Sir William Jones এর সঙ্গে ১৭৮৩ সালে বাংলায় আসেন Dr. John Thomas; সেই বন্ধু টমাসের দ্বিতীয় ভারতযাত্রার সাথী হলেন সপরিবারে কেরী সাহেব এবং তাঁহাতেই বাংলা শেখা সুরু করেন। নভেম্বর ১৭৯০ (রাণী রাসমণি ও দ্বারকানাথ ঠাকুর তখন জন্মাননি) হুগলী নদী বেয়ে কলিকাতায় নামতে কেরী চেষ্টা করেন কিন্তু E. I. কোম্পানী কর্তৃক বিতাড়িত হন! তাঁরা ভারতের টাকা লুটতে চান, ধর্ম প্রচার—খৃষ্টীয় মিশন ইত্যাদি চান না! অগত্যা ১৭৯৯ পর্যন্ত সপরিবারে কেরী সাহেব মালদহে নীলকর-রূপে গোপনে কাটান ও বাংলা ভাষা শিখে বাংলা ব্যাকরণ ও লিখিত ও কথ্য অভিধান প্রভৃতি রচনা সুরু করেন (তাঁর আগে Halhead সাহেব বাংলা ব্যাকরণ লেখেন ও Wilkins সাহেব পঞ্চানন কর্মকারকে দিয়ে বাংলা টাইপ কাটিয়ে বাংলা বই ছাপা সুরু করেন)। আজও সেসব দুষ্প্রাপ্য বই দেখা যায়। কিন্তু একজন বিদ্বান ফরাসী-বন্দী, চন্দননগর থেকে যে বিরাট বাংলা অভিধান লেখেন, আজও সেটি ছাপা হয়নি।

এই যুগে রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩) হুগলী জেলার রাধানগরে জন্মে ১৮১৪ পর্যন্ত সারা বাঙলা ও ভুটান হয়ে তিব্বত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। রামমোহন ১৮১৫—১৮৩৩ বহু বাংলা ইংরেজী আরবী ও ফার্সী পত্রিকা পুস্তিকা ও গ্রন্থ রচনা করেছেন; কিন্তু মুর্শিদাবাদে ছাপা ফার্সী (আরবী ভূমিকাসহ) "তুহফৎ" পুস্তিকা ছাড়া বাংলায় রামমোহন রচনা, কিছুই এপর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কলেকটার

Digby সাহেবের সঙ্গে কাজ করার সময়, দেওয়ান রামমোহন, তন্ত্র ও উপনিষদাদির চর্চা করতেন (রঙপুর থাকা কালে) এবং হয়ত সরল বাংলায় ভজন-সঙ্গীত ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক গানও রচনা তিনি করতেন যেগুলি পরে "ব্রহ্ম-সঙ্গীত" নামে মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' খানি ইংরেজী ও বাঙলায় একাধিকবার মুদ্রিত হয়ে অবাঙালী তথা বিদেশীদের বাঙলা শিক্ষায় প্রভূত সাহায্য করেছে। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি– সমাজ ও ধর্মসংস্কার বিষয়ে প্রথম সুচিন্তিত ও যুক্তিমূলক বাংলা গদ্য-সাহিত্য রচনা। তখনো ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয় দত্ত জন্ম (১৮২০) গ্রহণ করেন নাই; তবে কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বালকরূপে পড়াশোনা করছেন। ১৮৩৩ সালে বিদেশে (Bristol সহরে) রামমোহন যখন মারা যান, তখন মধুসূদন ও রাজেন্দ্রলাল, ভূদেব ও রাজনারায়ণ (সেকাল ও একাল দ্রষ্টব্য) বালক মাত্র। হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে গদাধর চট্টোপাধ্যায় বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মান (১৮৩৬) ও ক্রমশ: তাঁর অপূর্ব "কথামৃত" পরিবেশন করেন। হুগলী কলেজের মেধাবী ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র জন্মান (১৮৩৮) এবং বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর এনেছিলেন তাঁর 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠা (১৮৭২) করে।

ইতিমধ্যে কেরী সাহেব ও তাঁর আগেই Rev. Ward পরলোক গমন করেন কিন্তু তাদের অক্ষয় কীর্তি রেখে যান বাংলা ভাষার "ব্যাকরণ" ও বিরাট "অভিধান" (তাঁর একখণ্ড হাতেলেখা অপ্রকাশিত পুঁথি সেদিন দেখে এলাম শ্রীরামপুর কলেজে) এ সব বিষয়ে সুদীর্ঘ ইংরেজী প্রবন্ধ (Carey's Contribution to Bengali Letarature) দ্বিশতবার্ষিক অর্ঘ্য হিসাবে আমি SeramporeCollegeপুস্তকে উপহার দিয়েছি। রামমোহনের চির-আকাঙ্ক্ষিত, সতীদাহ নিবারণ Bill 'কেরী সাহেব'—নির্জ্ঞার কাজ ফেলে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন (১৮২৯), তার ৩০ বছর আগেকার মদনাবতী (বালদা) যুগে, কথ্য-ভাষায় গ্রামের পুরুষ ও নারীদের "কথোপকথন" (১৭৯৯) কেরী সাহেব প্রকাশ করে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন। শ্রীরামপুরেই কেরী সপরিবারে চিরবিশ্রাম করছেন। তাঁদের সমাধি ক্ষেত্রে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনে (Institute of Culture) তাঁর স্মারক সভায় ভাষণ দিয়েছি।

পণ্ডিত-কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার শতবার্ষিকী

আমাদের মত দু'চার জন যারা অল্প অবস্থায় ৺বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে তাঁর শেষ জীবনে দেখেছি তারা আবেদন জানাই সবাইকে মিলিত হতে ২৬ সেপ্টেম্বর তাঁর শতাব্দী উৎসবে। ঐদিন বিকালে রাজভাষা হলে বিজয়চন্দ্র স্মারক-সভা হবে ও তাঁর রচনাবলীর (গদ্যে ও পদ্যে) সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন চলছে।

বাঙালী শিক্ষকরূপে বিজয়চন্দ্র বালুরঘাট শোনপুর ও সম্বলপুর প্রভৃতি স্থানে কাজ করে উৎকল-বঙ্গ মৈত্রীর ভিত্তি স্থাপন করেন। ব্যবহারজীবী বিজয়চন্দ্র ওড়িয়া নেটিভ এস্টেটে বহু সুপরামর্শ দিয়েও দেশোন্নতি বিধান করেন। সেজন্য বহু ওড়িয়া নরনারী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু রচনার মধ্যে দেখি 'Typical Selections from Oriya Literature'। এই বিরাট গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন মনীষী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাস্তবর রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আজ শতবার্ষিকী কমিটির সভাপতি।

অন্তপ্রায় কবি সত্যেন দত্তের মত বিচিত্র ছন্দে মজুমদার-কবিও বহু কবিতা লিখে গেছেন এবং পালি "থেরী গাথা"র সার্থক অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। তাঁর "বিজ্ঞান ও বিকল্প" প্রভৃতি রম্য রচনা এবং ভাষা-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ে বহু প্রবন্ধ—১৮৯১ এর "সাহিত্য" (সুরেশ সমাজপতির) এবং নব্য-ভারত, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহু পত্রিকায় ছাপা হয়। ভারতবর্ষ-প্রতিষ্ঠাতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আজীবন একনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন বিজয়চন্দ্র, সেজন্যও তাঁকে আমরা স্মরণ করি।

'বঙ্গবাণী' প্রকাশের সময় তাঁর আগ্রহাতিশয্য ইচ্ছা করেন যে বিজয়বাবু ও দীনেশচন্দ্র সেন যুগ্ম-সম্পাদকরূপে কাজ করুন। সেই সেকালের অচেনা তরুণ লেখকদের মধ্যে আমার অনুজ গোকুলচন্দ্র নাগ 'রাজকন্যা' ও 'সোনার ফুল' গল্পগুলি বঙ্গবাণীতেই ছাপিয়ে উৎসাহ পান; গোকুলের "পথিক" উপন্যাস তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'কল্লোল' পত্রিকার শ্রেষ্ঠ রচনা। এমনি ছোট বড় সবাইকে বিজয়বাবু কাছে টানতেন ও তাঁর একমাত্র কন্যা বিদুষী সুনীতি দেবী (সরকার) সবাইকে Four Arts Clubএ স্নিগ্ধ আতিথ্যে আপ্যায়িত করতেন এবং "ঝড়ের দোলা" প্রকাশে সাহায্য করেন।

দৃষ্টি-লোপ হবার পরও এতটা মনের জোর বিজয়বাবুর দেখেছি যে বিস্ময়ে ও ভক্তিতে তাঁর চরণে মাথা নত করেছি। সস্নেহে তিনি আমার গবেষণার নানা ক্ষেত্রে উপদেশ দিয়েছেন, যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগের বহু জিজ্ঞাসুদেরও দিতেন। অধ্যক্ষ নির্মলকুমার বসু এ বিষয়ে সবিস্তারে লিখবেন এ আশা রাখি; কারণ বিজয়বাবুর মত তিনিও মানুষের সন্ধানে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায়, পদযাত্রা করে ও গো-যানে সর্বত্র ঘুরেছেন।

মানবদরদী মনীষী বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় রবীন্দ্রনাথের এবং তাঁর বন্ধু ডাক্তার নীলরতন সরকারের সঙ্গে একই বছরে জন্মেছিলেন। তাঁর প্রতি আমাদের কিছু কর্তব্য আছে সে কথাই স্মরণ করাতে প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ ছাপলাম। শতাব্দী উৎসবের পর বারান্তরে সবিস্তার বিবরণী দেবার ইচ্ছা রইল। তাঁর বহু পুস্তক আজ দুষ্প্রাপ্য; তাঁর প্রবন্ধ সংগ্রহ করলেও ভাল বই হয়। কিন্তু হায়, তেমন প্রকাশক এদেশে এখনো দেখা যায় না—সেটা দেশেরই দুর্ভাগ্য। রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবিষয়েও আছে। আশা করি পশ্চিমবঙ্গ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিগণ এদিকে দৃষ্টি দেবেন। শতাব্দী উৎসবে (২৬শে সেপ্টেম্বর) সবাইকে সাদর নিমন্ত্রণ জানাই ও অনুরোধ করি ৺বিজয় মজুমদারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ (পদ্য ও গদ্য), প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র বিষয়ে 'গল্প-ভারতী'র ঠিকানায় তাঁরা আমাদের খবর দেবেন। বিস্মৃতপ্রায় বাংলা ভাষার লেখক ও লেখিকাদের আমরা বাঙালী সমাজে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়েরও এ বিষয়ে দায়িত্ব আছে, সেটি আজ স্মরণ করাই কারণ অন্ধ হয়েও দীর্ঘকাল তিনি স্নাতকোত্তর বিভাগে (Post Graduate) এবং 'বঙ্গবাণী'তে তাঁর অকুণ্ঠ সাহচর্য দিয়ে গেছেন।

শচীন্দ্রনাথ সরকার

কথাপ্রসঙ্গে

এক—দুই—তিন

ভারত সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিরাট বিবৃতি-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রধান মন্ত্রীর স্বাক্ষর লাভে ধন্য হইয়াছে। কিন্তু তাহা লোকসভায় ভোটের আধিক্যে গৃহীত হইতে না হইতে জানা গিয়াছে ইংরেজ সরকার তথায় ব্যাঙ্কের সুদের হার বর্ধিত করায়—কেবল দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানার জন্যই অতিরিক্ত ৪৮ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। তিন দিন পূর্বেও সরকার একথা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তীর প্রশ্নে ইস্পাত, খনি ও জ্বালানী মন্ত্রী সর্দার শরণ সিংহ উহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, ভারতকে মোট টাকা ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দিতে হইবে অর্থাৎ ততদিনে হতে ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কের সুদ কমিবে এবং ৪৮ লক্ষ টাকাও কিছু কমিবে। দেখা যাইতেছে, এই টাকা পরিশোধের চুক্তি ছিল বৈদেশিক মুদ্রায়। কতক্ষেত্রে যে এইরূপ হইয়াছে, হইবে বা হইতে পারে তাহা অবশ্য কেহ বলিতে পারে না।

গল্প আছে, কোন অতি-লোভী ব্রাহ্মণ প্রথমে যে চিঁড়া ও দধি লইয়াছিল তাহা নিঃশেষ করিবার পূর্বেই আরও চাহিলে পরিবেশনকারী বিরক্তি সহকারে বলিয়াছিল—"যা খেয়েছ আগে তাই শেষ কর।" ভারত সরকারের কিন্তু ঐ অতিলোভীর অবস্থা। তাঁহারা অর্থ ও সামর্থ বিচার করুন বা না করুন, শিল্প প্রতিষ্ঠার ফলাফল দেখুন আর না দেখুন বিদেশে ঋণ পাওয়া যায় বলিয়া পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা বাড়াইয়া চলিয়াছেন।

শাসক আর গোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন করিয়া রাশিয়া যখন আত্মপ্রতিষ্ঠ হয় তখন সে দেশের যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোকদিগকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। সেই দৃষ্টান্তে স্বাধীন হইলে ভারত কি করিবে তাহা বিবেচনা করিয়া কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র পরিকল্পনা সমিতি গঠন করেন। তখন ভারতবর্ষ পরাধীন এবং বৈদেশিক ঋণে সমৃদ্ধ হইবার কথা তাঁহার কল্পনায়ও ছিল না। তাহার পরে অবস্থার পরিবর্তন হইয়া গেল। প্রধানতঃ সুভাষচন্দ্রের সামরিক কার্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জয়ী হইয়াও ইংরেজ দুর্বল হইয়া গেল। সেইজন্য সে আপনার স্বার্থ বুঝিয়া ভারতকে খণ্ডিত ও দুর্বল করিয়া সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা বিভক্ত করিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়া গেল। সেই সময়ে এক সভায় যখন জেনারেল অচিনলেককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ইংরেজ কেন ভারত ত্যাগ করিল? তখন তিনি কৈফিয়তে বলিয়াছিলেন, ভারতের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে বিদ্রোহ হইবার সম্ভাবনা; বিদ্রোহ হইলে সুদূর ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য কোন ইংরেজ জননী সন্তানকে যাইতে দিবেন না; কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই ইংল্যাণ্ডের প্রতি পরিবারের নিহতদিগের জন্য ক্রন্দনরোল উঠিয়াছে। নেতাজী দেশে ফিরেন নাই। কিন্তু তিনি দেশ বিভক্ত করিয়া ক্ষমতা লাভে আপত্তি জানাইয়াছিলেন। এমনকি যাঁহাকে জওহরলাল নেহরু প্রমুখ একটি দল ভণ্ড বলিয়া প্রচার করিতেন তিনিও দেশবিভাগের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু সেই অবসরে জওহরলাল প্রমুখ দল ক্ষমতার লোভে ধৈর্যহারা হইয়া দেশবিভাগে সম্মতি দিলেন। ক্ষমতা যাঁহাদিগের

হস্তগত হইল তাঁহাদিগকে বর্জন করার মত দৃঢ়তা গান্ধীজীও দেখাইতে পারিলেন না; পরন্তু তাঁহাদিগের উপদেষ্টা হইয়া যে টাকা দিয়া পাকিস্তান কায়েম করিবার সুযোগ দিলেন তাহা ভারত আজও পায় নাই—কখনও পাইবে বলিয়া মনে হয় না।

ক্ষমতা প্রাপ্তির পূর্বে জওহরলাল অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; সে সকলের মধ্যে একটি এই যে, কালোবাজারীদের প্রাপ্যমত দান করা হইবে। কার্যকালে কিন্তু তাহারাই সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য-নীতি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত এবং পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ক্ষমতা হস্তগত হইবার পরেই ঐ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা তাঁহাদিগের মনে পড়িল তাহাদের তাঁহারা দেখিলেন, বিদেশে চাহিলে ঋণ পাওয়া যায়; আপনার রাষ্ট্রকে "অনুন্নত" বলিলে দয়ার দান পাওয়া যায়। তাঁহারা এই সাহায্য গ্রহণও রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভ্রম হানিকর মনে করিলেন না এবং পৃথিবীর দেশে দেশে ঋণ চাহিয়া ফিরিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত হইতে লাগিল। তাহার সর্ব প্রথম দৌর্বল্য বা ত্রুটি—জনগণের সহিত সংযোগের অভাব। জনগণের সহযোগ না পাইলে যে কোন বিরাট কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে না তাহা জানিয়াও ভারত সরকারের পরিচালকরা জনগণের সহযোগ লাভের যাহা একমাত্র উপায় তাহাই গ্রহণে বিরত রহিলেন। সংবিধানে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও তাঁহারা সেইদিকে কোন ব্যবস্থাই করিলেন না। কেহ কেহ মনে করেন, দেশের লোক শিক্ষিত হইলে অধিকতর সচেতন হইবে এবং সরকারের কাজের ফলাফল বিচার করিয়া তাহা সমর্থন করিবে বা তাহার বিরোধিতা করিবে বুঝিয়াই ভারত সরকার জনসাধারণকে অজ্ঞতামুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিলেন না—আজও করেন নাই। দশ বৎসর পরে কৈফিয়ৎ হিসাবে প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, সংবিধানে প্রতিশ্রুতি দানের সময় তিনি ঐ কার্যের বিরাটত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, কেবল ভাবাবেগে উহা সংবিধানে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কৈফিয়ৎ বিচারসহ ও গ্রহণযোগ্য কি না তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। জাপানের সম্রাট যে মুহূর্তে দেশের সকল স্তরে বিদ্যা বিস্তারের প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন সেই মুহূর্তেই তাহা করিয়াছিলেন। আর ভারতে অনুকরণপ্রিয় সরকার অন্যান্য দেশের এই কল্যাণকর কাজই অনুকরণে বিরত হইলেন।

জনগণের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আয়ুকাল শেষ হইল। আর ফলাফল বিচার না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণ আরম্ভ হইল। অর্থ যখন সহজলভ্য, দেশের লোক যখন অজ্ঞ ও ক্ষমতা যখন একটি দলের হস্তগত ও সেই দলের সমর্থকদিগের মধ্যে কেন্দ্রীভূত তখন কাজ চলিতে কোন বাধা হইল না।

ঋণের টাকা যে সময়ে সময়ে যথাকালে দিতে পারা গেল না তাহাতেও ভারত সরকারের উৎসাহের স্রোত মন্দীভূত হইল না—বরং তাহা বাড়িয়াই চলিল। কেবল দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষ হইবার পূর্বে প্রধান মন্ত্রী একবার বলিলেন, তিনি আশা করেন ভারতকে আর বিদেশে বড় ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে না। তখন অর্থসচিবও তাহার প্রতিবাদ করিলেন না। কিন্তু কার্যকালে তিনি বলিলেন, দ্বিতীয় পরিকল্পনার আয়ু শেষের সঙ্গে সঙ্গে যে তৃতীয় পরিকল্পনা আরম্ভ করা হইবে তাহার জন্য সর্বতোভাবে বিদেশের উপর নির্ভর করিয়াও নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না—দেশের লোককেও সেজন্য কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু গত বিশ বৎসরে দেশের লোক কি লাভ করিয়াছে তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়াও প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইল না। যেন তাহাদিগকে অশিক্ষিত রাখিয়া তাহাদিগের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করা হইল।

সম্প্রতি এক সরকারী বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে যে, গত বৎসরে ভারতের জাতীয় আয় কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃদ্ধির যে পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রকৃত কি না সে সম্বন্ধেও সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। জাতীয় আয় ও ব্যক্তিগত আয় এক নহে। সেই জন্যই কি সাধারণ লোক এই বৃদ্ধি অনুভব করিতে পারে নাই? বর্ধিত অর্থ কি জনকয়েক ভাগ্যবান ধনিকের সঞ্চয় বৃদ্ধি করিয়াছে? এমনও হইতে পারে যে, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে ইহা অনুভব করিবার সুযোগ পাওয়া যায় নাই; কারণ, এই বৃদ্ধি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির তুলনায় তুচ্ছ।

পর পর দুইটি পরিকল্পনার ব্যয়, কৃতকার্য, ব্যয়ের তুলনায় প্রত্যাশিত আয় বা সুবিধা হিসাব করিয়া দেখা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তাহাই করা হয় নাই। বন্যার মতন পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা রূপায়িত করা হইতেছে। জল নিয়ন্ত্রণের কাজে বালুকা পাথর জমির সর্বনাশের বিষয় বিবেচিত হয় নাই। সেচের প্রয়োজনে আবশ্যক জল পাওয়া যায় নাই, উৎপন্ন বিদ্যুতের মূল্য আশানুরূপ অল্প হয় নাই; কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বর্ধিত হয় নাই; এখন আবার গভীর নলকূপ বসাইয়া সেচের ব্যবস্থা করিবার কথা বলা হইতেছে। কিন্তু তাহাতে যে ভূগর্ভস্থ জল নামিয়া যাইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা হইয়াছে কি? এইরূপে নানাদিকেই অব্যবস্থার কারণ দেখা যাইতেছে। লোকসভায় তৃতীয় পরিকল্পনা যখন আলোচিত হয় তখনও কোন কোন সদস্য পরিকল্পনার ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রীও স্বীকার করিয়াছেন, জাতির কোন বিরাট পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন—জনসাধারণের উৎসাহ। সেই উৎসাহই অসাধ্যসাধন করিতে পারে। দুঃখের বিষয় সেই উৎসাহই আকৃষ্ট ও সুপ্রযুক্ত করিবার আগ্রহ প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতি দেখান নাই। ইহাতে পরিকল্পনা জাতির না হইয়া শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত মুষ্টিমেয় লোকের হইয়াছে। জনসাধারণকে কেবল ত্যাগ ও কষ্টভোগ করিতে হইতেছে। গল্প আছে, মরুভূমির রাজা স্বয়ং বৈষ্ণব হইয়া যখন নির্দেশ দিয়াছিলেন প্রত্যেক প্রজাকে মালা জপ করিতে হইবে অন্যথায় দণ্ডিত হইতে হইবে—তখন একজন প্রমিক যখন দিনান্তে শয্যায় শয়ন করিয়া, স্মরণ করে যে, সে সেদিন মালা জপে নাই তখন, দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, স্ত্রীকে বলিয়াছিল, "মালাটা দাওত, গোপাল সিংহের বেগার খাটি"। পরিকল্পনার জন্য দেশের জনসাধারণের ত্যাগ ও কষ্ট সেইরূপ বেগার খাটা হইল।

শ্রী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

"মানুষ আপনার চেষ্টাকে সংযত করিতে শিখিলেই তবে চলিতে পারে, ভাবনাকে বাঁধিতে পারিলে তবেই ভাবিতে পারে। সেই কারুকরই সুনিপুণ যে লোক কর্মের সীমাকে অর্থাৎ নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছে এবং মানিয়াছে। সেই লোকই জীবনকে সুন্দর করিতে পারিয়াছে যে তাহাকে সংযত করিয়াছে।"

—রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

ভাষা ও সাহিত্য

শারীর বস্তুর সঙ্গে প্রাণীর যে সম্পর্ক ভাষার সঙ্গে সাহিত্যেরও তেমনি সম্পর্ক। সব প্রাণীর প্রকাশ সমান নয়। ওষধি-তৃণে, বনস্পতিতে, জীবাণুতে, পতঙ্গে, পাখিতে, ইঁদুরে, সাপে, বাঘে, গোরুতে, হাতিতে, বাঁদরে, মানুষে প্রাণের প্রকাশ বিভিন্ন। ভাষায় সাহিত্যের প্রকাশও তেমনি ভিন্নরূপ। কোন প্রাণীর জীবন কয়েক ঘণ্টার, কোন প্রাণীর জীবন কয়েক দশাব্দের। তেমনি কোন ভাষার "সাহিত্য" (—এখানে সাহিত্য কথাটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে, ভাষায় যে প্রকাশ নিতান্ত উপস্থিত কালের প্রয়োজনে নয় এবং শুধু উপস্থিত ব্যক্তির জন্যই নয়, কাল ও ব্যক্তি ব্যবহারে যে ভাষাপ্রকাশ ক্ষণিকতা অতিক্রম করেছে—তা লিপিবদ্ধ বা ছাপা হোক চাই নাই হোক—তাকেই ব্যাপকতম সংজ্ঞায় "সাহিত্য" বলেছি—) চল্‌তি হাওয়ায় উড়োপথের যাত্রী আবার কোন ভাষার সাহিত্য কালজয়ী বাঁধানো রাস্তায় "দীর্ঘ পথের পথী"। জীবজগতের বিবর্তনের চক্রপথে ঘুরে ফিরে যেমন কোন কোন প্রাণীর আয়ু ঐতিহাসিকতা অতিক্রম করে দীর্ঘত্ব পেয়েছে তেমনি কোন কোন ভাষার প্রকাশশক্তি স্থায়িত্ব (অর্থাৎ সাহিত্যরূপ) লাভ করেছে। এখন চেষ্টা করলেও প্রজাপতি উটপাখির দীর্ঘায়ু পেতে পারে না। উপমা-তুলনা হলেও এই তাৎপর্যটি স্মরণে রাখলে আধুনিক ভাষাকৃষি বিভাগের অধিনায়কদের উপকার হবে বলে মনে করি।

সেই সঙ্গে এই কথাও স্মরণ করিয়ে দিই যে উপমা তুলনার উপযোগিতা যতই হোক কখনো তা যুক্তিপ্রমাণের উপরে যেতে পারে না, যদিও অনেক সময় যে সত্য যুক্তি প্রমাণের নাগালের বাইরে সে সত্যকে উপমা-তুলনা দিয়েই স্পর্শ করা সম্ভব। প্রজাপতি ও উটপাখি এক উদ্ভ্রুক্ষ জাতের প্রাণী হলেও সমান দরের নয়। প্রজাপতির প্রয়োজনক্ষেত্রে উটপাখির কোন অধিকার নেই, উটপাখির প্রয়োজন ক্ষেত্রে প্রজাপতির তো নেইই। তেমনি যে ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি প্রচুর হয়নি অথবা একবারেই হয়নি তার গৌরব তার প্রয়োজনক্ষেত্রে—অর্থাৎ সেই ভাষা যারা প্রতিদিনের ঘরসংসারের কাজে ব্যবহার করে—তাদের কাছে সব ভাষার বাড়া। এমন ভাষার উপর অন্য ভাষা চাপিয়ে দিতে গেলে প্রজাপতি মরবে আর যাদের প্রজাপতি তারা উটপাখি পুষতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হবে। ছোটো ভাষাকে বড়ো ভাষা[১] দিয়ে মারার বা মাৎ করার এই বিপদ।

আবার সাহিত্যের দিক দিয়ে "ছোট" (অর্থাৎ খর্বশক্তি, খর্বসাহিত্য) ভাষাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড়ো

১ এখানে ভাষার ছোটো বড়ো বিশেষণ শুধু ভাষাব্যবহারীর সংখ্যা ধরেই ব্যবহার করছি।

(অর্থাৎ উন্নতশক্তি উন্নত সাহিত্য) ভাষা বলে খাড়া করবার চেষ্টার অন্যরকম বিপদ। সে বিপদ এই ছোটো ভাষারই।

মাটির কলসী পিতলের কলসীর সঙ্গে টক্কর দিতে গেলে ভাঙবেই (যদি না সংঘর্ষের আগেই পিতলের কলসীকে বেচে, বাঁধা দিয়ে কিংবা চুরি করিয়ে সরিয়ে ফেলানো না যায়)।

মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল—এটা নিছক অনুমান হলেও এর বিরুদ্ধে অন্য কোন অনুমান দাঁড় করানো যায় না। এক আদম-ইব থেকেই যে মানুষের উৎপত্তি হয়েছিল বিজ্ঞানে সে কথা মানা হয় না। পৃথিবীর একাধিক স্থানে মানবেতরজীব মানবত্ব পেয়েছিল, এই কথা বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তি-সঙ্গত। এক মূল ভাষা থেকে সকল ভাষার উৎপত্তি একথা এখন ছিল ধর্মকল্পনা, এখন শিশুকল্পনা। পৃথিবীতে নানা জাতের মানুষ, নানা জাতের ভাষা। তারা কেউ কেউ জ্ঞানে কর্মে উন্নতিলাভ করেছে, তাদের ভাষাও উন্নত হয়েছে। সে উন্নতির পরিমাণ এক নয়, তবে মান এক। মানুষের উন্নতির মান তার জীবনযাত্রার স্বচ্ছলতা, ইচ্ছামত চেষ্টা করবার স্বাধীনতা, শিল্প ও সাহিত্যে আনন্দসৃষ্টির প্রাচুর্য, চিন্তাশক্তির ও বিজ্ঞানবুদ্ধির সূক্ষ্মতার ও প্রাখর্যের ক্রমবৃদ্ধি। মানুষের এই যে উন্নতি এটা সর্বাঙ্গীনভাবে লব্ধ হয়েছে যেখানে যেখানে ভাষা উন্নত—অর্থাৎ যে ভাষায় আনন্দের উপাদান প্রচুরভাবে সৃষ্টি হয়েছে, চিন্তার খাদ্য পর্যাপ্তভাবে সমাহৃত হয়েছে। মানবজাতির উন্নতির মূলে রয়েছে তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও সেই বুদ্ধিকে কাজে খাটানোর মত উদ্যম। বুদ্ধি না হলে উদ্যম কিছু নয়, ভাষার উন্নতির মূলেও সেই বুদ্ধি। যে ভাষায় যতদিন ধরে যত লোক মাথা খেলিয়েছে—তার চিন্তার রূপ দিয়েছে, তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিখেছে, তার আনন্দ অনুভূতিকে তার দুঃখ অনুভূতিকে সকলের জন্যে লিপিবদ্ধ করেছে—সে ভাষা ততই শক্তিশালী হয়েছে। যে ভাষায় যত বেশি লোক যত বেশি দিন ধরে মাথা খেলিয়েছে সে ভাষা ততই বড় হয়েছে, ততই বেশি করে সমর্থ হয়েছে। বুদ্ধি দিয়ে যদি ভাষাকে চালানো না হয় তবে দিস্তা দিস্তা কাগজে কবিতা লিখে, টন টন কাগজে অনুবাদ ছাপিয়ে ভাষাকে বড় করা যাবে না। এখানে পাশ্চাত্য দেশের ছেলেদের শীতকালের বরফ-বলের খেলা তুলনা করতে পারি। অল্প তুষার নিয়ে একটা বলের মত করে তুষারক্ষেত্রের উপর গড়ানো হয়। তুষার লেগে লেগে সেই বল ক্রমশ বড় হয়, বিরাট বড় হয়। ভাষার শ্রীবৃদ্ধিও সেইভাবে হয়।

মেধা, মনীষা, প্রতিভা—না থাকলে কোন লেখকের লিখতে বাধা হয় না। এমন কি যে পরিমাণে কম থাকে সে পরিমাণে লেখকের উৎসাহ বৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু সে লেখায় ভাষার জোর বাড়ে না। বরং কমে যায়। যেমন হৃদ্রোগীর বেশি খাওয়া তাকে দুর্বলই করে দেয়।

শ্রী সুকুমার সেন

॥ ওসামু দাজাই ও 'অস্তগামী সূর্যের মানুষ' ॥

পাশ্চাত্য সাহিত্য বাতীত অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের ঔদাসীন্য মর্মান্তিক। ও দেশের হাল আমলের মেহাৎ শিক্ষা-নবীশ তরুণ লেখকের নামও আমাদের বহু লোকের নখ-দর্পণে, কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্র বা এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাহিত্য বিষয়ে আমাদের জ্ঞান শোচনীয় রকম সীমাবদ্ধ। আধুনিক জাপানের শিল্পসমৃদ্ধি, বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তার সাহিত্য বিষয়ে আমাদের বিশেষ আগ্রহ নেই। জাপানী সাহিত্য বিষয়ে আমাদের উৎসাহ ভাসা-ভাসা জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত—আমাদের মতো জাপানী সাহিত্যও পাশ্চাত্য প্রভাবিত। জাপান বিষয়ে বহু ভ্রমণ কাহিনী বাঙলায় প্রকাশিত হলেও এ-যাবৎ কোনো জাপানী উপন্যাস আমাদের ভাষায় অনূদিত হয়নি। ডনাল্ড কীনের সৌজন্যে শুধু পশ্চিমের পাঠকেরা নন, আমরাও জাপানী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হলাম। জানি না আমাদের দেশে কোনোদিন আর্থার ওয়েলি বা ডনাল্ড কীন জন্মাবেন কিনা। তা না হলে আমাদের নির্ভর করে থাকতে হবে পাশ্চাত্য সাহিত্যসাধকদের ওপর—কবে তারা নতুন দীপের সন্ধান দেবেন, নতুন আলো নিয়ে আসবেন।

ওসামু দাজাই ডনাল্ড কীনের আশ্চর্য আবিষ্কার। কয়েক বছর আগে প্রকাশিত "জাপানী সাহিত্য (১৯৫৫)" সম্পর্কে তাঁর ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ওসামু দাজাই-এর নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই। কিন্তু গত দু-বছরের মধ্যে তাঁকে দাজাই-এর দুটি গ্রন্থের অনুবাদক রূপে দেখতে পাই। তাছাড়া দাজাই-এর গল্প "ভিদনের বৌ"-এর সঙ্গে পাশ্চাত্য পাঠককে পরিচয় করানোর কৃতিত্ব তাঁরই।

ওসামু দাজাই-এর উপন্যাস দুটির নাম হলো "অস্তগামী সূর্য (১৯৪৭)" এবং "আর মানবিক নেই (গ্রন্থটি "বাতিল" নামেও পরিচিত, প্রকাশকাল ১৯৪৮)।" দুটি উপন্যাসের বিষয়ই যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপানের জীবনযাপনের সমস্যা। "জীবনযাপনের সমস্যা" এখানে শুধু আর্থনৈতিক অর্থে ব্যবহৃত নয়, বিপর্যস্ত মূল্যবোধ এবং মানবতার মধ্যে আজ যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে তা-ই এখানে প্রধানত উপজীব্য। অভিজাততন্ত্রের অবক্ষয়ের চিত্রণও এখানে পাওয়া যায়—আমাদের সাহিত্যের তারাশঙ্কর প্রমুখের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এইখানে যে, প্রথমোক্ত লেখকেরা যেখানে ক্ষয়িষ্ণু অভিজাততন্ত্রের বিষয়ে মুগ্ধ এবং বিবশ, সেখানে দ্বিতীয়জন একেবারে নির্মম, নিষ্করুণ এবং অবিচলিত। তাঁর এই নির্মমতার পেছনে কোনো সাম্যবাদী প্রেরণা নেই। প্রথম জীবনে তিনি বামপন্থী আন্দোলনে আকৃষ্ট হলেও বেশিদিন যুক্ত থাকেননি।

পৃথিবীর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মতো দাজাই-এর দুটি উপন্যাসকেই আত্মজৈবনিক বলা চলে। তাঁর স্বভাবসুলভ নৈরাশ্য এবং বোহেমীয় জীবনের প্রভাব তাঁর চরিত্রগুলিতে সংক্রমিত। দাজাই-এর পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সমসাময়িক জীবন সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা তাঁর চরিত্রাবলীর মধ্যেও লক্ষ্য করি। তাঁর জীবন-কাহিনীও বিচিত্র। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে উত্তর জাপানের এক সম্ভ্রান্ত এবং সামন্ততান্ত্রিক পরিবারে তাঁর জন্ম। শৈশব থেকেই অসাধারণ তীক্ষ্ণতার পরিচয় দিলেও তাঁর উৎকেন্দ্রিকতার লক্ষণগুলিও এই সময় থেকে প্রকাশিত হয়। পড়াশোনায় মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও মনোযোগী ছিলেন না। কুড়ি পেরোবার

আগেই তিনি দু-দুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ছাত্র-জীবনে তাঁর খামখেয়ালিপনার আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন। তাঁর পাঠ্য-নির্বাচনের ব্যাপারটিও অদ্ভুত। ভর্তি হবার সময় তিনি ফরাসী ভাষার বিন্দু-বিসর্গ জানতেন না, তৎকালীন জাপানী যুবকদের ফরাসী সাহিত্য-প্রীতির প্রতি ঝোঁকই বোধহয় এরকম সিদ্ধান্তের একমাত্র কারণ। যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার ব্যাপারে তিনি বেশিদূর অগ্রসর হননি। কেননা ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্লাসেও উপস্থিত থাকেননি—সেই সময়টা কাটিয়েছেন সাহিত্যকর্ম এবং বামপন্থী আন্দোলনে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কোনো ডিগ্রি না নিয়েই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিলেন।

১৯৩৫ খৃঃ নানা কারণে তাঁর জীবনের স্মরণীয় বছর। এই সময়ে তাঁর ছোটগল্প বিদগ্ধজনের স্বীকৃতি লাভ করতে সুরু করে। দাজাই কিন্তু প্রচলিত অর্থে উচ্চাভিলাষী ছিলেন না। তাঁর নায়ক নাওজি বা উয়েহারার মতো তিনিও যাঁরা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। দাজাই সে-কথা আবার প্রমাণ করলেন ১৯৩৫ খৃঃ আত্মহত্যার চেষ্টা করে—একটি খামের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন "অবশিষ্ট বৎসর" নামক গল্পগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, মৃত্যুর পর প্রকাশের জন্য। কিন্তু এবারেও তিনি সফল হলেন না। এদিকে মরফিয়ার নেশা রীতিমত সুরু করেছেন এবং এই ভয়ঙ্কর নেশার জন্য প্রায় বছর দুই হাসপাতাল এবং বাড়িতে চিকিৎসা করতে হয়। ১৯৩৬ খৃঃ তিনি আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তবে এবার তিনি একা নন, সঙ্গে ছিলেন গত দু-বছরের রক্ষিতা। আশ্চর্য! পরের বছর তিনি বিয়ে করলেন এবং সে স্ত্রী এখনো জীবিতা।

দাজাই তাঁর উৎকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার জন্য ইতিমধ্যেই বেশ কুখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। জীবনে কোনো শৃঙ্খলা, এমন কি মমতা পর্যন্ত নেই—এহেন লেখকের জীবন যে বিশেষ আলোচ্য হবে তাতে বিস্ময়ের কি আছে। ইতিমধ্যে দাজাই যৌনেও যোগ দিয়েছিলেন; কিন্তু বুকের অসুখের জন্য সেখান থেকে ছাটাই হন। তিনি রাজরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে তিনি দাবি করতেন নেশা সুরু করে এ রোগ সারিয়েছেন।

১৯৪৭ খৃঃ দাজাই-এর "ভিলনের বউ" গল্প প্রকাশিত হলে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শুধু বিচার করলে গল্পটি এমন কিছু নয়। বারমুখো স্বামী মদের দোকানের মালিকের টাকা ছিনিয়ে নিয়ে বাড়ি চলে আসে। তারই খোঁজে মালিক এবং তার বৌ ছুটে এলো। এদিকে বাড়িতে রুগ্ন ছেলে এবং অর্ধভুক্ত স্ত্রী। বেগতিক দেখে স্বামী পালিয়ে গেলো। যাই হোক, মালিকদের অনেক অনুনয়-বিনয় করে সে ঋণ-পরিশোধের সময় নিলো এবং পরদিন একরকম জোর করেই ঐ বাড়িখানাতেই পরিচারিকা হিসেবে কাজ সুরু করলো। এদিকে তার নির্লজ্জ স্বামী কিন্তু মদের দোকানে যাওয়া-আসা বন্ধ করেনি। তাকে ঘেঁষিয়ে ভিলনের বৌ অত্যন্ত খারাপরকমের সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতার তান সুরু করলো। এতোদিনে সে তার স্বামী সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য জেনে ফেলেছে—শুনেছে তার স্বামীর সঙ্গে হোটেলকর্ত্রীর মৃদু-রোমান্সের কথা। কিন্তু তাকে এই পরিবেশে দেখে ভিলন বিব্রত এবং বিচলিত হলো। গল্পের পরিসমাপ্তি অপহৃত অর্থ মালিককে প্রত্যর্পণে। স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে নিতে সে জানালো টাকাটা সে চুরি করেছিল বহুদিনের একটি বাসনা পূর্ণ করবার জন্য। সে চেয়েছিল নববর্ষে ছেলে-বৌকে উপহার দিতে।

আগেই বলেছি গল্পটির কাঠামো বর্ণনা করে এর গভীরতা বোঝানো অসাধ্য। পূর্ণ গল্পটির পট-

ভূমিতে নিস্পৃহ ছিলেন, তার অবিচলিত নিরুত্তাপ স্ত্রী, বিধাগ্রস্তা হোটেল কর্ত্রী, আত্মসচেতন হোটেল মালিক প্রত্যেকেই সমকালীন জীবনের শূন্যতাবোধে অল্পবিস্তর আচ্ছন্ন। কিন্তু এই গল্পটিতে দাজাই যে শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধে একেবারে আস্থা হারাননি তার প্রমাণ ছিলেন চুরি করা টাকা ফেরৎ দিয়ে যৌ-এর কাছে ফিরে যায়। শুধু তাই নয়, আমরা জানতে পারি ছিলেন আত্মসুখের জন্য চুরি করেনি; আর হোটেল-কর্ত্রীও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার সময় তার সম্পর্কে দুর্বলতা গোপন করেনি।

কিন্তু একই বছরে প্রকাশিত "অস্তগামী সূর্যে" লেখক আরো করুণ এবং নির্মম। উপন্যাসটির নায়িকা কাজুকো নিজেদের সম্বন্ধে বলছে, "যুগসন্ধির নীতিবোধের বলি।" কিন্তু নাওজি বা উয়েহারা কেউই নীতিবোধের সমস্যা নিয়ে বিশেষ বিব্রত নয়। নাওজি তো স্পষ্টই ঘোষণা করেছে জগৎকে যখন খুশিমত পরিবর্তিত করার ক্ষমতা তার নেই, এখন জীবনকে সেব করে দেবার অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে। যাকে আমরা বলি জীবন-সংগ্রাম, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার পরিণতি "হাঁক দিয়ে নয়, ক্যাৎরানিতেই।" যে পারিপার্শ্বিককে বদলাবার ক্ষমতা আমার নেই অথচ যে জীবন-যাত্রাকে মেনে নেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব তার একমাত্র প্রতিবাদ এবং পরিত্রাণ স্বেচ্ছামৃত্যু। আত্মহত্যা কেন পাপ? পশুর মতো বেঁচে থাকা কি পাপ নয়?

নাওজির দিনপঞ্জীতে এই ক্ষোভ এবং ঘৃণা আরো তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। "সব মানুষই সমান"—নাওজির মতে এই উক্তি কোনো দার্শনিক বা শিল্পীর নয়। কোনো সস্তার তাড়িখানায় জনৈক কুৎসিত মদ্যপায়ী কোনো রূপবানকে দেখে এই মন্তব্য করেছিল। বস্তুত এতো বড়ো অতেদময় ঘোষণার মূলে কোনো মহত্ত্ব নেই, আছে শুধু ঈর্ষা আর ঘৃণা। যে-বিশ্বাসে মানুষের স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি নেই, তাতে মানবতারই অপমান। কাজুকোরও অপরিহার্য বর্তমান ছাড়া জীবন সম্পর্কে কোনো প্রত্যাশা নেই। তার একমাত্র বাসনা তার এবং উয়েহারার অবৈধ সন্তানকে তার স্ত্রী একবার কোলে তুলে নেন আর সে বলে, উয়েহারা কোনো নারীর সঙ্গে গোপন মিলনের ফলে একে পেয়েছে।

তবু নাওজি প্রমুখকে পুরোপুরি জীবনবিদ্বেষী মনে করা ভুল হবে। মরবার আগে সে সুগার প্রতি তার নিবিড় ভালোবাসার কথা জানিয়ে গেছে। একমাত্র এই ভালোবাসাই তার রুক্ষ জীবনে আশ্রয় দিতে পারতো, কিন্তু তাকে তো পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ ব্যর্থতাকে নিয়ে অলস দর্শনারনে তাঁর প্রবল আপত্তি। আর পাঁচজনের মতো সব হারিয়ে বাঁচতে সে রাজী নয়। মরবার সময় সে বলে গেছে, "রাজার হোক, আমি অভিজাত।"

ক্ষয়িষ্ণু অভিজাততন্ত্রের এরকম নিপুণ ও নির্মম চিত্রণে স্বভাবতই বিপুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই মুমূর্ষু আভিজাত্যকে বোঝাবার জন্য এরপর থেকে "অস্তগামী সূর্যের মানুষ" কথাটি এমন প্রচলিত হয়ে যায় যে এখন অভিধানেও স্থান পেয়েছে।

দাজাই-এর দ্বিতীয় উপন্যাস "বাতিস" ১৯৪৮ খৃঃ প্রকাশিত হয়। এছাড়া "বিদায়" নামে একটি উপন্যাসও লেখা শুরু করেন। কিন্তু অনিদ্রা এবং ক্ষয়রোগ তাঁকে এই সময়ে বিশেষ ভাবে আক্রমণ করে। অবশেষে এই বছর তাঁর এতোদিনের স্বেচ্ছামৃত্যুর অভিলাষ পূর্ণ হয়। ১৯শে জুন দাজাই-এর উনচল্লিশতম জন্মদিনে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় টোকিও শহরের তামগাওয়া জলাশয় থেকে।

দাজাই-এর দ্বিতীয় উপন্যাস "আর মানবিক নেই" কে অনেকে "অস্তগামী সূর্যের" চেয়ে মূল্যবান রচনা মনে করেন। এখানেও বিষয় সেই এক: ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ এবং সামাজিক জীবন।

ডনাল্ড কীন দাজাই সম্পর্কে বলেছেন, "আধুনিক জাপানী জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার।" তিনি তাঁর মূল্যবান ভূমিকায় জাপানী সাহিত্য বিশেষভাবে দাজাই-এর ওপর পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব কত গভীর সে বিষয় আলোচনা করেছেন। আমাদের কাছে এ জাতীয় আলোচনা আপাতত অবান্তর। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি তিনি কতখানি আত্মস্থ করেছেন সে-বিচার জাপানী সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা করবেন। এখানে যুদ্ধোত্তর জাপানের যে বিপর্যস্ত জীবনের পরিচয় পেলাম, তাতে আমরা একই সঙ্গে অভিভূত এবং আতঙ্কিত। দাজাই-এর নায়িকা বাইবেলের সুসমাচার উদ্ধৃত করেছে আপন জীবনের প্রেরণা স্বরূপ: "সর্পের মতো ক্রূর, কপোতের ন্যায় অমায়িক।" এই রুক্ষ মরুতে সে খুঁজছে "emotional security in a chaotically empty world." কিন্তু এর অসারতা সম্পর্কে সে নিজেই কি সচেতন নয়?—তা না হলে কেন প্রেমিককে "মাই কমেডিয়ান" সম্বোধন করবে।

নৈরাশ্যবাদ আধুনিক বাংলা সাহিত্যেরও অন্যতম লক্ষণ, কিন্তু আমাদের প্রায় সব লেখকেরাই চরম হতাশার মধ্যেও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা রাখেন। কিন্তু দাজাই-এর মতো প্রচণ্ডভাবে অবিশ্বাসী কেউ নন। জাইগও সপরিবারে আত্মহত্যা করেছিলেন। তবু তাঁর মৃত্যুতেও জীবন সম্পর্কে আশা নিঃশেষিত হয়নি:

"Never shines the prospect fairer
Than in parting's glory seen;
In the shadow of surrender
Dearer has life never been!" (The World of Yesterday)

এমন কি দাজাই-এর সমসাময়িক অন্যান্য জাপানী লেখক, যেমন, "ভাসমান মেঘের হায়াশি ফুমিকো (১৯০৪-১৯৫১)-ও তুলনায় প্রশান্ত।

বিশ্বসাহিত্যে জাপানের একমাত্র অবদান দাজাই এমন মনে করা ভুল হবে। ডনাল্ড কীনের মতো এখন অনেকেই "গেঞ্জির উপাখ্যান"-কে পৃথিবীর প্রাচীন উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম বলে মনে করেন। আড়াই হাজার পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি ডনাল্ড কীনের মতে পৃথিবীর প্রাচীনতম উপন্যাস এবং সকল যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই মত গ্রহণীয় হলে মানতে হয় পৃথিবীর প্রথম ঔপন্যাসিক একজন মহিলা। উক্ত গ্রন্থের লেখিকা শ্রীমতী মুরাসাকির জীবৎকাল ৯৭৫ থেকে ১০২৫ খৃঃ। আর্থার ওয়েলি ১৯৩৫ খৃঃ একখণ্ডে "গেঞ্জির উপাখ্যান" ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

রশোমন, যুকিওচারিতর প্রভাবে আমাদের দেশে জাপানী চলচ্চিত্রের বহু অনুরাগী দর্শক তৈরী হয়েছে। দাজাই-এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাদের সাহিত্য সমৃদ্ধির সঙ্গে যোগ ঘনিষ্ঠ হলো। আশা করা যায় আমাদের দেশের অনুবাদক এবং লেখকেরা তৎপর হয়ে সে পরিচয় নিবিড় করে তুলবেন।

সুবীর রায়চৌধুরী

॥ এ যুগের নাটক ঃ পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ॥

আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য, উপন্যাস ও ছোট গল্পের ন্যায় যথার্থ নাটক—রচনারও প্রেরণামূলে ছিল প্রতীচীর দীক্ষা। বাংলায় মহাকাব্যের যুগ অথবা মহাকাব্য রচনার প্রয়াসের যুগ বহুকাল গত হইয়াছে কিন্তু ছোট গল্প ও উপন্যাস বিস্ময়কর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বাংলায় বহু নাট্যকারের প্রাদুর্ভাব হওয়া সত্ত্বেও নাট্য-সাহিত্য এখনো অসাধারণ সমৃদ্ধি লাভ করে নাই। উপন্যাস ও ছোট গল্প রচনায় বাঙালী নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু বাংলার নাট্যসাহিত্য আজও বিশ্ব-সাহিত্যে তেমন প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে পারে নাই। ইহার একটি কারণ বোধ হয় এই যে, বাঙালী স্বভাবত 'বহুভাষী', সে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বহু চরিত্রের মধ্য দিয়া বিচিত্ররূপে লীলা করিতে পারে না। সেক্‌স্‌পীয়রকে লক্ষ্য করিয়া জন্ কিট্‌স্ যে কথা লিখিয়াছেন—'What shocks the virtuous philosopher delights the chamaleon poet. A poet is the most unpoetical of anything in existence, because he has no identity, no character,' বাংলার কোন নাট্যকার সম্পর্কে সে কথা বলা যায় কিনা, তাহা আমরা জানিনা।

অবশ্য আমরা এ কথা বলি নাই যে, বাংলার নাট্য সাহিত্যে প্রতিভাবান লেখকের আবির্ভাব ঘটে নাই। আমরা শুধু উপন্যাস ও ছোট গল্পের সঙ্গেই নাট্যসাহিত্যের তুলনা করিতেছিলাম। আশা করি, আমাদের কথাগুলি কাহারও মনে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিবে না। আমরা বাংলার খাঁটি নাট্য সাহিত্যের প্রথম যুগে পাই মধুসূদন ও দীনবন্ধুকে, দ্বিতীয় যুগে পাই মনোমোহন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে, তৃতীয় যুগে পাই গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদকে। ইঁহারা সকলেই নাট্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার নাট্যসাহিত্যেও যুগপ্রবর্তক। তিনি একদিকে বাংলায় সাঙ্কেতিক নাট্যের প্রবর্তন করিয়াছেন, অপর দিকে সেক্‌স্‌পীয়রের মত বিশ্লেষণমুক্ত বিশুদ্ধ হাস্যরসাত্মক নাটক এবং নৃত্যনাট্য প্রভৃতি রচনা করিয়া বাংলার নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের রচনায়ই কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের কথা ছাড়িয়া দিলে বলিতে হয়, গতিশীল সমাজে যেমন নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়, তেমনই নাটকের বিষয়বস্তু ও টেকনিক বা 'আঙ্গিকের'ও পরিবর্তন ঘটে। এই সব নব-নব সমস্যা লইয়াই বাংলায় নূতন নাট্য-আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। এ যুগে চলচ্চিত্রের ক্রমবর্দ্ধমান 'চাহিদা'র ফলে নাটক প্রায় বিলুপ্তির পথেই চলিয়াছিল, কিন্তু চলচ্চিত্র তো কখনও নাট্যামোদিগণের নাট্যরস-পিপাসা চরিতার্থ করিতে পারে না। যে গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রাণ, অধিকাংশ চলচ্চিত্রেই তাহার একান্ত অভাব, কারণ, চলচ্চিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের কর্ম-ক্লান্ত জীবনে অবসর বিনোদনের উপায়। ইহাতে রুচির আভিজাত্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না, কেননা, আমরা যে যুগে বাস করি, উহা শূদ্রযুগ। অবশ্য সেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের নাটকও চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এদিকে, এ যুগের বহু নাটকের বিষয়বস্তু, 'আঙ্গিক' প্রভৃতির ওপরও চলচ্চিত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে যে গণনাট্য-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাও বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই।

এককালে 'নবান্ন' প্রভৃতি নাটক আমাদের দেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। এই সব নাটকে দর্শকদের মনে বিভ্রম সৃষ্টির কোন চেষ্টা ছিলনা, কোনরূপ ব্যয়বাহুল্য ছিলনা। আমাদের দেশে আধুনিক কালেও 'নীলদর্পণ' অভিনয়ে সার্থকতা লাভ করে, যদিও নাটকখানি উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজিডি নয় এবং ইহার মধ্যে যে কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি আছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। আমাদের মনে হয়, মীর মশার্রফ হোসেনের 'জমিদার-দর্পণ'ও এ যুগে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইতে পারে। সমস্যামূলক গণনাটা সৃষ্টিতে শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দানের কথা উল্লেখযোগ্য।

প্রচারধর্মী নাটকেও যে প্রতিভাবান লেখক বিশুদ্ধ নাট্যরসের সৃষ্টি করিতে পারেন, এ যুগে তাহার পরিচয় দিয়াছেন ইবসেন, জর্জ বার্ণার্ড শ, গল্‌স্‌ওয়ার্দি প্রভৃতি লেখকগণ। বার্ণার্ড শর Quintessence of Ibsenism গ্রন্থখানি পাঠ করিলে জানা যায়, এককালে ইবসেনের A Doll's House, Ghost প্রভৃতি নাটকগুলি পাশ্চাত্য দেশে নিন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ ইবসেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়া সকল দেশেই অভিনন্দিত হইয়াছেন। ইবসেনের এই শ্রেণীর নাটকগুলিকে শ বলিয়াছেন 'Anti Idealistic Plays.' বার্ণার্ড শর নাটকে আমরা দেখিতে পাই বুদ্ধির বিদ্রূপনীতি, জীবন ও জগতের নানা সমস্যার প্রতি তির্যক্ দৃষ্টিপাত, বার্ণার্ড শর তীক্ষ্ণ বাঙ্গ সমাজের নানা স্তরের লোকের উপর শাণিত অস্ত্রের মতই আপতিত হয়। নিজের প্রতিভা সম্পর্কে শ ছিলেন অতি মাত্রায় সচেতন, তাঁহার 'A Doctor's Dilemma' নাটকের নায়ক বলিয়াছেন 'I am a disciple of Bernard Shaw, I am not anything.' আবার গল্‌স্‌ওয়ার্দির Justice নাটকে পাই এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি। ন্যায়বিচারের নামে মানুষ কখন কখন মানুষের উপর কত বড় অবিচার করে, তাহারই এক মর্মন্তুদ চিত্র লেখক এই নাটকে অঙ্কিত করিয়াছেন।

ইংরেজি সাহিত্যের আর একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ One Act Play বা একাঙ্কিকা। আধুনিক বাংলা নাটকে যেমন পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি, তেমনই একাঙ্কিকার প্রভাবও লক্ষ্য করিয়া থাকি। একালে যে সকল বাংলা নাটক জনপ্রিয় হইয়াছে, উহাদের মধ্যে 'অঙ্গার' অন্যতম। যাঁহারা Hewers of Coal নামক একাঙ্কিকা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত নাটকের বিষয়বস্তু ও চরিত্রসৃষ্টির সাদৃশ্য উপলব্ধি করিবেন।

আধুনিক নাটক 'পুতুল খেলা' অনেকাংশে ইবসেনের Doll's House এরই অনুসরণ। দাম্পত্য জীবনে ব্যক্তিত্বের সংঘাত আজ আমাদের দেশেও একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সমস্যার সমাধান কোথায়, তাহার নির্দেশ দিবেন কে?

এ যুগে অবশ্য সেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের মত নাটক রচিত হওয়া সম্ভবপর নহে, কেননা, সেক্‌স্‌পীয়র ছিলেন কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী। 'Others abide by our question, thou art free,'—সেক্‌স্‌পীয়র সম্পর্কে এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এ যুগের নাট্যকারেরা যদি আমাদের দেশের যথার্থ সমস্যাগুলিকে নাটকের মধ্যে উপস্থাপিত করেন এবং উহাদের সমাধানের ইঙ্গিত দেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের ব্রত সার্থক হইবে। এ যুগে এমন নাটকও রচিত হইতেছে যাহাদের সাহিত্যিক মূল্য অল্প, কিন্তু অভিনয়ের নৈপুণ্যে এবং দর্শকদের মনে বিভ্রম সৃষ্টির ফলে ঐগুলি রঙ্গমঞ্চে সাফল্য অর্জন করে। আবার, অনেক সময় নাট্যকার এমন একটি ব্যাপারকে প্রাধান্য দেন যাহার সঙ্গে জাতির জীবনধারার কোন যোগ নাই। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সেতু' নাটকের উল্লেখ করিতে পারি, কিন্তু 'ক্ষুধা' নাটকের যে সমস্যা, উহা জাতির জীবনের সঙ্গে জড়িত। যে নাটক দর্শকের মনকে চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ করিয়া পরিশেষে নৈরাশ্যের গভীর অন্ধকারে নিক্ষেপ করে, সে নাটক শুধু সাময়িক উত্তেজনারই সৃষ্টি করে মাত্র। যেমন একালে

রচিত 'নতুন ইহুদী'। মোট কথা, এ যুগের নাট্যকারগণের অন্তরে যদি গভীর সহানুভূতি থাকে, তাঁহারা যদি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নাট্যধারার সঙ্গে পরিচিত হন ও স্বদেশের কল্যাণকামী হন, তবেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

যে নাটকে গভীর জীবনদর্শন আছে, তাহা যে এ যুগের দর্শকদের মনকে আলোড়িত করিতে পারে না, এ কথা সত্য নহে। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ তারাশঙ্করের 'আরোগ্য-নিকেতনে'র নাম উল্লেখ করিতে পারি। বিদেশী নাটকের অনুবাদও একালে এক শ্রেণীর দর্শককে আকৃষ্ট করে, কিন্তু যে সময়ে গিরিশচন্দ্র 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদ করিয়া উহার অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সে সময়ে উহা দর্শকদের আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। অথচ 'ম্যাকবেথের' অনুবাদে গিরিশচন্দ্র যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার তুলনা এ যুগেও মিলে না। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' সাঙ্কেতিক নাট্য হইলেও এ যুগের দর্শক ইহার মধ্যে যেন বাস্তব জীবন হইতে মুক্তির আনন্দের আস্বাদ পায়। বাস্তবিক 'রক্তকরবী' ও 'মুক্তধারা'ও রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের একটি বিশেষ দিক আমাদের কাছে পরিস্ফুট। তাই এ যুগে রক্তকরবীও অভিনয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

সাহিত্যিক দিক হইতে বিচার করিলে মন্মথ রায়ের 'কারাগার', 'চাঁদ সদাগর' প্রভৃতি নাটক ও কয়েকটি একাঙ্কিকা বাংলার মূল্যবান সম্পদ। এইসব নাটকও অভিনয়ে সাফল্য অর্জন করিতে পারে।

এ যুগের নাট্যামোদিগণ নীহাররঞ্জন গুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নাট্যকারদের রচনার সঙ্গে পরিচিত। আজ যে দেশে নব নাট্য-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, আমরা উহাকে অভিনন্দন জানাই। নাট্যকারেরা যে অনেক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন, ইহাও দোষের কথা নয়। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফলেই তো উনিশ শতকের সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যকে এমন ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমরা শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে দর্শকদিগকে ক্ষণিক আনন্দ পরিবেশন করা, তাহাদের মনে ক্ষণস্থায়ী চাঞ্চল্য বা উত্তেজনার সৃষ্টি করা, তরুণ মনের ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করা অথবা যে সমস্যা আমাদের দেশের নয়, নাটকের মধ্যে সেই সমস্যার অবতারণা করা যেন এ যুগের নাট্যকারদের লক্ষ্য না হয়। বাঙালীর নানা সমস্যা-কণ্টকিত জীবনকে তাঁহারা যেন আশার আলোকে উদ্ভাসিত করেন, আনন্দ-পরিবেশনের মধ্য দিয়া তাঁহারা যেন দেশবাসীকে কল্যাণের পথের নির্দ্দেশ দেন। তবেই তাঁহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে এবং জাতির কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইতে পারিবেন।

শ্রী ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

•

. গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "The best art is to conceal art অর্থাৎ, কলা-কৌশল গোপন করাই শ্রেষ্ঠ কলা-বিদ্যা"।

তিনি বলিতেন, যত প্রকার রচনা আছে তাহাদের মধ্যে নাটক রচনা সর্বাপেক্ষা কঠিন ও শ্রেষ্ঠ।

॥ লম্পট ও কাউআর্ড ॥

বরদার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ থেকে প্রায় বছর কুড়ি আগে সেই যে বরদা হঠাৎ কোথায় চলে গিয়েছিল কাউকে কিছু না বলে, তারপর আর কোনো খবরই পাইনি ওর। পরে শুনেছিলাম, ও নাকি যুদ্ধে গিয়ে সিঙ্গাপুরে জাপানীদের হাতে বন্দী হয়েছে।

যুদ্ধ যখন শেষ হল তখনও যখন ওর কোনো খবর পাওয়া গেল না তখন ভেবেছিলাম হয়ত আর ও বেঁচে নেই। অবশেষে একদিন শোনা গেল, সত্যি ওর মৃত্যু হয়েছে বন্দী অবস্থায় খেতে না পেয়ে।

তখনকার দিনে ওভাবে বন্দীদের মৃত্যু খবর প্রায়ই শোনা যেত। তাই ওর জন্যে দুঃখ হলেও আশ্চর্য হইনি কিছুই। বরদার মত অমন একটা প্রাণবন্ত লোক যে সেবকালে খেতে না পেয়ে মরে যেতে পারে এমন কথা আগে কখনো ভাবাও যেত না।

কিন্তু যুদ্ধের সময় সব রকম অসম্ভবই সম্ভব হয়। তাই এখবরে আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না। ওর মৃত্যুর জন্য সবাই যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম যখন খবর এল যে বরদা না খেতে পেয়ে মরে নি। মরেছে জলে ডুবে আত্মহত্যা করে।

বরদার মত লোকের পক্ষে নিজের প্রাণ নিজের ইচ্ছায় ওভাবে ধ্বংস করা নিতান্তই অবিশ্বাস্য। আমি এ কথা বিশ্বাস করিনি। যারা ওকে একটিবারও দেখেছে তারাও করেনি। ছেলেবেলা থেকে যারা ওকে জানে তারাও না।

কিন্তু যে মেয়েটি মাত্র দুটি বছর ওর সঙ্গে ঘর করছে সে দেখলাম অনায়াসে একথা মেনে নিল।

এই মানীকে বিয়ে করবার দুবছর পরেই বরদা হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধে গিয়েও টাকা-পয়সা কিছুই পাঠায়নি। চিঠিপত্র কিংবা খবরও কিছু দেয়নি।

মানী ম্যাট্রিক পাশ করা মেয়ে। যুদ্ধের সময় অতি সহজেই একটা চাকরি যোগাড় করে নিয়েছিল। বরদার হু;)-খবর যখন প্রথম আসে তখন ও হুড-ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। তখনও মানী সিঁথিতে সিঁদুর দিত। হাতে পরত সোনার তারে বাঁধান লোহা।

কিন্তু বরদার এই আত্মহত্যার খবরের পর দেখলাম মানী সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলেছে। হাতের লোহা খুলে ফেলেছে। কিন্তু রঙিন শাড়ি ছাড়েনি।

ওর এই পোশাক দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম।

বললাম, তুমিও শেষে বিশ্বাস করলে এ কাজ ও করতে পারে?

নিতান্ত সহজ ভাবে হেসে মানী বলল, হ্যাঁ। ওর পক্ষে এইটেই তো স্বাভাবিক।

হয়ত দুবছরের মধ্যেই মানী বরদার প্রকৃতির এমন একটা দিক দেখেছে যেটা আমার অজানা। মানী বুদ্ধিমতী মেয়ে। ও যখন বিশ্বাস করেছে আমার আর বলবার কি থাকতে পারে?

কিন্তু আমিও তো বরদার জীবনের দশটি বছরের খবর রাখি যেটা মানীর অজানা। যৌবনের ঐ দশটি বছরের মধ্যে যত রকমের বিপর্যয় বরদার জীবনে ঘটেছে—দৈহিক, মানসিক এবং আর্থিক—তার কতটুকু খবর মানী জানে?

বরদাকে আমি যেমন দেখেছি প্রাচুর্যের মধ্যে, তেমনি দেখেছি দৈন্য ও অভাবের মধ্যে। ওকে আমি তরা যাদ্বো দেখেছি ; আবার দেখেছি গোপন অসুখের যন্ত্রণায়। কিন্তু নিজের প্রাণশক্তির অভাব কখনও ওর মধ্যে আমি দেখিনি। নিতান্ত দুরবস্থার মধ্যেও না।

তখন আমি ডাক্তারি পড়ি। মেসে থাকি। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটি মাত্র তক্তাপোশ আর তার পাশে কেরোসিন কাঠের একটা টেবিল।

এক ঘরে আমরা তিনটি ছাত্র থাকতাম। তাদেরও আসবাব ছিল ঐ রকম। কেউ ঘরে এলে ঐ তক্তাপোশের ওপরই বসত। ওখানে বসেই চা খেত। গল্প করত।

বরদা তখন এক বিল্ডিং কনট্রাক্টরের অ্যাসিস্ট্যান্ট। খাকি হাফপ্যান্ট পরে আর সোলার টুপি মাথায় দিয়ে কুলী মজুরদের কাজ তদারক করে বেড়াত। এখানে ওখানে যাতায়াত করত সাইকেলে চড়ে। মাইনে পেত পঁচাত্তর টাকা। কিন্তু ওর চোটপাট দেখে মনে হত, বরদাই বুঝি কোম্পানীর মালিক কিংবা আধীদার।

আমার মেসের কাছেই সেবার ওরা একটা নতুন বাড়ি তৈরীর কনট্রাক্ট পেল। কলেজে যাবার পথে এই বাড়িটা পড়ত। দেখতাম বরদা খাকি হাফপ্যান্ট পরে টুপি মাথায় একটা টুলে বসে আছে। রাজমিস্ত্রি আর কুলী-কামিনদের কাজ দেখছে।

বরদার তখন খুব মেজাজ। কারণ সবাই কাজ করছে তার হিসেব মত। কুলিকামিনরা খোয়া ভেঙে সুরকি তৈরী করছে। মজুররা দিচ্ছে যোগান। আর মিস্ত্রিরা ইঁটের পর ইঁট গাঁথছে।

বরদা তখন টুলে বসে সকলের সঙ্গে হাসি তামাসা মস্করা করছে। মিস্ত্রিদের কাছ থেকে বৈনি নিয়ে বাঁ হাতের তেটোয় রেখে ডান হাতের চারটি আঙুল দিয়ে ঐ বৈনি তুলে নিয়ে নিজের ঠোঁট ফাঁক করে নীচেকার মাড়ির পাশে গুঁজে দিচ্ছে। এই সময়ে যে ওকে দেখেছে তারই মনে হয়েছে বরদা যেন ওদের কোন ইয়ার-বন্ধু লোক।

কিন্তু মিস্ত্রি বা কুলীকামিনদের কাজের একটু গলতি হলেই বরদার ভিন্ন একটি রূপ দেখা যেত। বরদা তখন যেন দুর্ধর্ষ এক জমিদার! কিংবা বর্তমান যুগের অভিশপ্ত চলনের বিদ্রোহী এক যক্ষ।

কথ্য রাষ্ট্রভাষার যে অশ্লীল গালাগালি বরদা তখন ওদের দিত তার সমতুল্য ভাষা আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় নেই। বোধকরি ইংরেজিতেও নেই। অন্য কোনো ভাষাতেও বোধহয় নেই।

আমি ভেবে পেতাম না এমন চোস্ত বস্তি-ভাষা বরদা কোথা থেকে শিখল। মনে হত যেন এটাই ওর মাতৃভাষা—ছেলেবেলা থেকে যা ওর মনে এবং মুখে রপ্ত হয়ে গেছে।

আজকালকার দিন হলে বরদার এই গালাগাল এবং কটূক্তি কোনো শ্রমিক সমাজই সহ্য করত না। ক্ষেপে উঠে হয়ত ওকে খুন করেই ফেলত।

কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই সময় ওর সেই মিস্ত্রি কুলী-মজুর এবং কামিনরা সবাই এই অশ্লীল গালিগালাজ বিনা প্রতিবাদে হজম করত। নিজেদের কাজের ভুলের জন্য বারবার ওর কাছে ক্ষমা চাইত। বলত, এইবারটি যাক ফকন হুজুর। ভবিষ্যতে আর কখনও এমনটি হবে না।

কিন্তু আমার এটা ভাল লাগত না। কোনো শিক্ষিত ভদ্রসন্তান যে নিজের শিক্ষা-দীক্ষা সব ভুলে গিয়ে উত্তেজনার মুহূর্তে এমন অশ্রাব্য কটূক্তি কিংবা অশ্লীল গালাগাল কোনো পুরুষ বা স্ত্রীকে করতে পারে এ আমার ধারণারও অতীত ছিল।

তাই একবার বরদাকে আমি বলেছিলাম এমনি মুখখারাপ করে গালাগাল দেওয়া কিন্তু খুবই অন্যায়।

আমার এই মন্তব্য শুনে বরদা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, যে লোক যে-ভাষা বোঝে তার সঙ্গে সেই ভাষাতেই কথা বলতে হয়। নইলে কোনো কাজ হয় না।

এই সব কুলী মজুরদের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হলে ওদের ভাষাতেই ওদের বোঝাতে হবে। গালমন্দ দিতে হবে। গালমন্দ এবং চড়চাপড় ছাড়া ওরা নাকি কিছুই বোঝে না।

শেষে ঠাট্টা করে বরদা আমায় বলেছিল—বুঝেছ ডাক্তার? তোমাদের মত রবিঠাকুরী ভাষায় ওদের যদি শাসন করি তাহলে দুদিনেই এই কোম্পানী লাটে উঠবে। লালবাতি জ্বালাতে হবে।

বরদার এই শ্লেষ বা ঠাট্টা আমার মোটেই তখন ভাল লাগেনি। ওর ঐ হাসিটি যেন আরও খারাপ লেগেছিল।

অথচ এ নিয়ে তর্ক করবারও কোনো প্রবৃত্তি হয়নি তখন। মনে হয়েছিল ওর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। কারণ, আমার কথা কিছুতেই বরদা বুঝবে না।

সারাদিনের কাজকর্ম শেষ হলে বাড়ি গিয়ে স্নান সেরে বরদা সেই সময় আমার মেসে আসত। সন্ধ্যার পর আলো জেলে আমরা তখন হয়ত ডাক্তারী বই খুলে পড়া শুরু করেছি।

ঘরে হঠাৎ বিলিতি গন্ধদ্রব্যের মাদক গন্ধ পেলেই আমরা বই থেকে চোখ তুলে দরজার দিকে চোখ ফেরাতাম। দেখতাম বরদা এসেছে।

তখন পরনে তার মিহি তাঁতের কোঁচানো ধুতি। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী। গিলে করা চুড়িদার হাতা। হাতে বেলফুলের মালা।

আমার তক্তাপোশের ওপর ধপ্ করে বসে আমার পিঠে একটি চাপড় মেরে হেসে বরদা বলত,—এই যে ডাক্তার! তোমার ঐ বইপত্তর রেখে চটপট উঠে এস তো! নীচে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে এসেছি, নাও ওঠ! চল আমার সঙ্গে। শুধু সার্টটা চড়িয়ে নাও গায়ে। ধুতি না বদলালেও চলবে।

আমার দুটি রুমমেট অবাক হয়ে বরদাকে দেখত। হয়ত আমার ওপর খানিকটা ঈর্ষাও ওদের হত মনে মনে।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, বরদার সঙ্গটা ঠিক সহজভাবে উপভোগ করতে আমি পারতাম না। ওর সঙ্গটাই ছিল আতঙ্কের। কেমন যেন ভয় ভয় করত আমার। অথচ সেই সঙ্গে ছিল তীব্র এক আকর্ষণের অনুভূতি। ওর পোশাকে, বেপরোয়া কথার ভঙ্গীতে, দুর্মূল্য বিলিতি সেন্টের অপূর্ব সৌরভে এমন একটা টান ছিল যে ওকে এড়াতে আমি পারতাম না। জোর করে বলতে পারতাম না, আজ আমি বেরোতে পারব না। কাজটা যে ঠিক হচ্ছে না মনে মনে তা বুঝেও সার্ট গায়ে দিয়ে ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়তাম।

তখনকার দিনে ট্যাক্সি চড়া আজকালকার মত এত সুলভ ছিল না। হাতে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত পয়সা না থাকলে শুধুই বেড়াবার জন্য ট্যাক্সি কেউ চড়ত না। আমি তখনও ছাত্র। কাজেই ওই ধরণের বিলাসিতায় আমার অভ্যাস ছিল না মোটেই। বরং ওটা নেহাৎই অপব্যয় বলে মনে হত আমার কাছে। কিন্তু সেই কথাটা স্পষ্ট করে বরদার মুখের ওপর বলতেও আমি পারতাম না। কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হত আমার। মনে হত ও হয়ত ঠাট্টা করবে কিংবা হয়ত আঘাত পাবে মনে। স্ফূর্তিটা মাটি হবে। তাই চুপ করেই থাকতাম।

সেকালে কলকাতা শহরে চীনে পাড়া ছিল কুখ্যাত। বউবাজার থেকে ফিয়ার্স লেন দিয়ে ঢুকলেই যে গলীতে পৌঁছনো যেত সেটাই ছিল চীনে পাড়া। অনেক রকম রোমহর্ষক গল্প আমরা তখন শুনেছি ঐ চীনে পাড়া সম্বন্ধে।

ওখানে নাকি খুন খারাপি সবাই লেগে থাকত। আর থাকত হরেকরকম নেশার আড্ডা। চণ্ডু, চরস, কোকেন, আফিং, মদ ইত্যাদির যে-আইনী গুদ্ধ সব আড্ডাখানা নাকি অলিতে গলিতে থাকত।

সবচেয়ে আশ্চর্য এবং অবিশ্বাস্য যে নেশার গল্প আমরা শুনতাম সে হল কেউটে সাপের ছোবল খাওয়া।

প্রচলিত সব রকমের নেশা করে অর্থাৎ মদ, গাঁজা, ভাঙ, চণ্ডু, চরস, আফিং, কোকেন ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস ব্যবহার করে যার নেশা হত না সে নাকি কেউটে সাপের ছোবল খেত। এমন লোকও নাকি ছিল যে রোজ পর পর তিনটি ছোবল খেত। নইলে তার নেশা ঠিক জমত না।

ট্যাক্সি করে সেদিন বরদা আমাকে এই চীনে পাড়াতে নিয়ে এল। সেই প্রথম আমি ও পাড়াতে ঢুকলাম। মনে যথেষ্ট ভয় ছিল। আপত্তিও করেছিলাম অনেক। বলেছিলাম, হোটেলেই যদি খেতে হয় তাহলে চৌরঙ্গীতে যাওয়াই ভাল। কিন্তু বরদা তা শুনল না। চৌবাচ্চার দিয়ে কিডার্স লেনে ঢুকে একটা চীনে হোটেলের সামনে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

আমরা ছোট্ট একটা চীনে হোটেলে ঢুকলাম। তখন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল চীনেরা যা খায় বাঙালীর পক্ষে তা অখাদ্য। আরশোলা, ইঁদুর, ব্যাঙ, মাকড়সার ডিম এসব নাকি ওদের খুব উপাদেয় খাদ্য। কাজেই আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ঘৃণায় বিমুখ হয়েছিল। মনে মনে স্থির সংকল্প করেছিলাম যে একটা লেমনেড কিংবা আইসক্রীম সোডা ছাড়া আর কিছুই আমি এখানে খাব না।

কিন্তু আমার সব সংকল্প ভেঙে গেল যখন দেখলাম প্লেটে চিংড়ি মাছ এবং মুরগীর মাংস টুকরো করে ভেজে দিয়েছে। পরে এই শহরে চাওমিন, ন্যানকিন, ক্যাথে, নিউ ক্যাথে, পাইপিং, ওয়ানডর্ফ, গ্রেট ইষ্টার্ণ ইত্যাদিতে অনেক চীনে খাবার খেয়েছি। কিন্তু সেদিন বরদার সঙ্গে ছোট্ট ঐ চীনে হোটেলে যে খাবার আমি খেয়েছিলাম তার স্বাদ এখনও যেন জিভে লেগে আছে। সত্যি কথা বলতে কি, অমন সুস্বাদু খাবার জীবনে কখনও আমি আর খাইনি।

সেদিন দেখেছিলাম বরদা একদিনে যা খরচা করতে পারে তিন মাসেও আমি তা পারি না। যার মাইনে মাত্র পঁচাত্তর টাকা সে এত খরচা করে কি করে?

খাবার জন্য সেদিন বরদার যা খরচ হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী হয়েছিল পানীয়তে। ঐ পানীয় ছিল শুধু ওর নিজের জন্যে। আমি তার একটি বিন্দুও স্পর্শ করিনি। কারণ আমার সাহসে কুলোয়নি। সত্যি আমার ভয় হয়েছিল। মনে হয়েছিল ওর পাল্লায় পড়ে ও জিনিস খেলে আমার নিজের বলতে কিছুই বোধহয় আর বাকি থাকবে না। আমি যাব তলিয়ে।

সেদিন ঐ হোটেল থেকে আমি মেসে ফিরেছিলাম একা। বরদাই আমাকে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু নিজে সঙ্গে আসেনি। ভাড়াটা অবশ্য ট্যাক্সিওলার হাতে আগাম দিয়েছিল। বলেছিল আমায় ঠিকমত মেসে পৌঁছে দিতে।

তারপর যখন বরদার সঙ্গে দেখা হল তখন সে অসুস্থ। একটা রিক্সা করে আমার মেসে এসে নীচে বসেছিল। রিক্সাওয়ালা এসে আমায় খবর দিল। বলল, বরদা আমাকে ডাকছে।

তখন ভোরবেলা। আটটা কিংবা সাড়ে আটটা। ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে সবে তখন বই খুলে বসেছি। এমনি সময়ে রিক্সাওয়ালা এসে এই খবর দিল।

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে দেখলাম, বরদার অবস্থা সত্যিই খুব সঙ্গীন। উসকো খুসকো চুল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখ দুটি গর্তে। পরণে একটি শুধু লুঙ্গি।

বরদা আমাকে দেখেই দু'হাত বাড়িয়ে আমার ডান হাতটি ধরে মিনতি করে বলল, ডাক্তার! এইবারটি আমায় বাঁচাও! আমি আর পারছি না।

দেখলাম বরদার হাতে পয়সা কড়ি কিছু নেই। শুধু এই রিক্সা ভাড়াটাই ওর সম্বল। কাজেই ওকে আমাদের হাসপাতালের আউটডোরে নিয়ে গেলাম।

অসুখ সারতে সেবার বরদাকে তিনটি মাস ধরে আমাদের হাসপাতালে আসা যাওয়া করতে হয়েছিল। আর হয়েছিল আমার কাছে আসতে টাকা ধার করবার জন্য। কিন্তু দু' পাঁচ টাকার বেশী ধার দেওয়া আমার পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না মোটেই।

কারণ বাড়ি থেকে আমার জন্য মাসে মাসে যে টাকা আসত তার হিসেব আগে থেকেই আমাকে দাখিল করতে হত বাবার কাছে। সিনেমা, থিয়েটার এবং সিগারেটের খরচটা কায়দা করে অন্য খাতে দেখাতে হত। তার ওপর বরদার জন্য এই খাতটা আমি ম্যানেজ করব কি করে?

কাজেই একদিন ওকে আমি বলেছিলাম, হাতে যখন টাকা ছিল তখন যদি একটু বুঝে সুঝে চলতে তাহলে এত বেশী অর্থ কষ্ট তোমার কখনও হত না।

শুনে বরদা হো: হো: করে হেসে উঠেছিল, যেমন সে সর্বদাই হাসত।

বলেছিল, হিসাব না করে টাকা খরচ করবার যে কি সুখ সে তুমি এখন বুঝবে না ডাক্তার! পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সবাই বাঁচে প্রকৃতির নিয়ম মেনে। কিন্তু মানুষ বাঁচে নিজের বুদ্ধির জোরে ঐ নিয়ম ভেঙে। তোমার কাছে নীতি-কথা শুনতে আমি আসিনি। এসেছি কয়েকটা টাকার জন্য। যদি না দিতে চাও স্পষ্ট করে বলে যাও।

এই বলে বরদা হেসেছিল। আমার মোটেই ভাল লাগেনি ওর ঐ হাসি। মনে হয়েছিল ঐ হাসির মধ্যে প্রচ্ছন্ন যেন একটি বিদ্রূপ ছিল। আর সে বিদ্রূপ আমারই প্রতি লক্ষ্য করা।

যাই হোক বরদাকে কোনো টাকা সেদিন আমি দিতে পারি নি। তার পরেও কয়েকবার ও এসেছিল কিন্তু তবু আমি দিই নি। কারণ দেওয়া সম্ভব ছিল না মোটেই।

ইতিমধ্যে একদিন আমার হাতঘড়িটা হারিয়ে গেল। এ ঘড়িটা ছিল আমার বাবার। তাঁর সার্জারিতে অদ্ভুত নৈপুণ্যের জন্য আমাদের গাঁয়ের রাজা-বাহাদুর অ্যাংলো সুইচ কোম্পানী থেকে এই ঘড়িটা কিনে বাবাকে উপহার দিয়েছিলেন। ঘড়িটার প্যাটার্ণ ছিল হাফ হানটিং। একটা স্প্রিং টিপলেই ঢাকনাটা খুলে যেত। পেছনের ঢাকনাটা খুলতে হত ছুরি দিয়ে। ঐ ঢাকনা খুললে আর একটা ঢাকনা পাওয়া যেত। সেই ঢাকনায় বাবার নাম এবং কেন রাজাবাহাদুর ওটা বাবাকে দিয়েছিলেন তা খোদাই করে লেখা ছিল।

মেডিক্যাল ছাত্রের ঘড়ি নইলে চলে না। তাই বাবা এই ঘড়িটা আমাকে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সাবধানে রাখিস!

আমিও সাবধানেই রেখেছিলাম। তবু একদিন ওটা হারিয়ে গেল। কেমন করে যে হারাল তা আমি কিছুতেই আর ভেবে পেলাম না তখন।

রোজ কলেজে যখন বেরোতাম, ঘড়িটা হাতে দিয়ে বেরোতাম। ফিরে এসে ওটা খুলে বালিসের তলায় রাখতাম। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে আবার ওটা হাতে পরতাম। শোবার সময় ওটা বালিসের তলায় রেখে তবে শুতাম।

তবু ওটা যে একদিন হারিয়ে গেল কি করে তার হদিস্ আমি পেলাম না। অনেক ভেবেও তার কোনো কূলকিনারাই করতে পারলাম না আমি।

সেবার ছুটির সময় যখন বাড়ি গেলাম তখন মিথ্যে করে মা-বাবাকে বলতে হল যে ওটা দোকানে দিয়েছি সারাবার জন্ত।

সেবার ছুটির পর যখন মেসে ফিরলাম তখন শুনলাম বরদা নাকি অনেকবার এসে আমার খোঁজ নিয়ে গেছে। কবে ফিরব জানতে চেয়েছে।

মাসখানেক পরে একদিন বরদা এল। দেখলাম এ ক'মাসে ওর শরীরের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চেহারাতে বেশ যেন একটু জৌলুস এসেছে।

বললাম, ব্যাপার কি বরদা?

হেসে বরদা বলল, ভাই, বিয়ে করেছি। তোমাকে আজই একবার আমার বাড়িতে যেতে হবে। বিয়ের সময় এবং তার আগে অনেকবার তোমার খোঁজ করেছি কিন্তু তোমাকে পাইনি। শুনলাম তুমি বাড়ি গিয়েছ। আজ তাই না গেলে চলবে না। এক্ষুনি চল আমার সঙ্গে।

তখন সবে মাত্র আমি কলেজ থেকে ফিরেছি। হাতমুখ ধোওয়া হয়নি। চাও খাওয়া হয় নি। তাছাড়া রাতে অনেক পড়তে হবে। একবার ওর পাল্লায় পড়লে কখন যে ছাড়া পাব তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। তাই আমি নানারকম ওজর-আপত্তি তুলে ওকে সেদিনকার মত ভাগিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

বরদা কিন্তু নাছোড়বান্দা। আমার কোনো আপত্তিই ও শুনল না।

কাজেই ওর সঙ্গে সেদিন আমাকে যেতে হল ওর নতুন বাড়িতে। দু'খানা ছোট ঘর নিয়ে ওর সংসার। বাগবাজারের একটা গলির একতলাতে।

ওর বৌ-এর সঙ্গেও আলাপ হল। আমার চেয়ে বছর পাঁচ ছয় বয়সে ছোট হবে। তাই প্রথম আলাপেই আমাকে দাদা বলে টিপ করে একটি প্রণাম করল। বলল, দাদা! কলকাতায় আমার চেনা লোক কেউ নেই। আপনি কিন্তু রোজ একবার আসবেন।

আমার কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেল এই মেয়েটির প্রতি। বরদার সঙ্গে ওর বয়েসের তফাৎ অনেক। ১৪।১৫ বৎসরের কম নয় নিশ্চয়ই। কিছু বেশী হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। বরদার বয়েস তখন ৩২।৩৩, আর এই মেয়েটিকে দেখে মনে হল, ওর বয়েস কখনও ১৬।১৭র বেশী হতে পারে না। অর্থাৎ ওর ডবল বয়েস তখন বরদার।

শুনলাম ওর নাম মিনতি। বাবা মা ডাকতেন মিনু বলে। অল্প বয়সেই ওর বাবা মা মারা যান। বেচারা মানুষ হয়েছে ওর দাদাদের কাছে।

মিনুর বড় দাদা রেলে কাজ করে। অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট স্টেশন মাস্টার। আর ছোট দাদা ওভারসিয়ার। দুজনেই কলকাতা থেকে অনেক দূরে থাকে।

মিনু আমার জন্ত এক প্লেট চিঁড়ে ভাজা এবং চা তৈরী করে নিয়ে এল।

বলল, রোজ কলেজ থেকে ফেরবার সময় এখানে এসে চা খেয়ে যাবেন।

মিনুর এ অনুরোধ রাখা আমার পক্ষে তখন কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তবু কেন জানি না সে সত্য কথাটা তখন ওর মুখের ওপর বলতে পারলাম না।

আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, নিশ্চয়! তোমার মত অমন লক্ষ্মী একটি বোন যখন পেয়েছি তখন নিশ্চয়ই কলেজ ফেরত রোজ একবার আসব। তোমার হাতের চা এবং জলখাবার খেয়ে যাব।

ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন রাস্তায় এসে পড়লাম বরদা তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার মেস পর্যন্ত এল। আমি তখন থাকতাম শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ের কাছে আমাদের কলেজের একটা মেসে।

আমার মেস পর্যন্ত বরদা আমাকে পৌঁছে দিল। পথে অনর্গল বক বক করে ওর বৌ-এর সুখ্যাতি করল। বিয়ে করবার পরেই যে ওর ভাগ্য হঠাৎ খুলে গেছে তাই আমাকে বার বার বোঝাল।

বলল, তুমি তো জান ঐ বাড়ি তৈরীর কনট্রাক্টরের কাছে আমি মাইনে পেতাম মাত্র পঁচাত্তর টাকা। এখন এই বিয়ে করবার পরেই আমি ও কাজ ছেড়ে দিয়েছি। নতুন একটা বাল্‌ডি ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার হয়েছি। ওরা মাইনে দিচ্ছে দেড়শ টাকা। বল দেখি কি করে এটা সম্ভব হল?

এ কথার কি জবাব আমি দেব? বুঝলাম বরদা বিয়ে করে মিনুর প্রেমে এখন ডগমগ। কাজেই হেসে বললাম, নিশ্চয়ই এ সৌভাগ্য তোমার স্ত্রীর ভাগ্যে।

হোঃ হোঃ করে হেসে বরদা বলল, ঠিক ধরেছ ভাই। দেখছি বউটা আমার সত্যিই খুব লক্ষ্মন্ত। ওর জন্যেই আমার এই উন্নতি।

বিনা দ্বিধায় সায় দিয়ে বললাম, মিনু মেয়েটা সত্যি খুব লক্ষ্মী। দেখো এবার থেকে তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে।

ততক্ষণে মেসের কাছে আমরা এসে পড়েছি। ঢোকবার মুখে বরদা পকেট থেকে কি একটা জিনিস বার করে আমার ডান হাতে দিয়ে দুহাত দিয়ে আমার ঐ হাতটি মুঠো করে ধরে বলল—ডাক্তার! আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো।

এই বলে আমার হাতটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হঠাৎ বরদা পিছন ফিরে হন্ হন্ করে চলে গেল। আমি ওর কাণ্ড দেখে হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে গেলাম। ডান হাতটি তখনও আমার মুঠো করা। বরদার ঐ যাওয়ার দিকে আমি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলাম। গলিটা পার হয়ে ডাইনে বেঁকে বরদা যখন অদৃশ্য হয়ে গেল তখন যেন আবার আমি সংবিৎ ফিরে পেলাম। নিজের ডান হাতের মুঠো খুলে দেখলাম আমার হারিয়ে যাওয়া সেই ঘড়িটি।

মিনু বলেছিল রোজ কলেজ ফেরত একবার ওর কাছে যেতে। ওখানেই চা খেতে। সে কথা আমি রাখতে পারিনি। তবু সপ্তাহে অন্ততঃ একটি দিন আমি ওর কাছে যেতাম। কোনো দিন হয়ত বরদা বাড়ি থাকতো। কোনও দিন থাকত না।

মিনু চা এবং খাবার তৈরী করে আমাকে খাওয়াত। বসে বসে গল্প করত। বলত, সারাদিন আমি একা থাকি। আপনি এলে মনে হয় যেন আমার বাপের বাড়ির কেউ এসেছে। তাই এত ভাল লাগে আপনি এলে। কিন্তু এত কাছে থেকেও তো আপনি রোজ একবারও আসেন না। আপনার নিজের বোন হলে কি পারতেন, এমন করতে?

মিনুর যা বয়েস এবং ও যেমন লেখাপড়া কম জানা সরল প্রকৃতির মেয়ে তাতে ওর এই অনুযোগের কোনো উত্তর আমি তখন দিই নি। দিলেও ও বুঝতে কখনও পারত না। আমার নিজেরও যেন ভাল

লাগত ওর ঐ অভিমানভরা অনুযোগ শুনতে। তাই সত্যি কথাটা স্পষ্ট করে বলে ওর মনে আঘাত দিতে আমি পারিনি। বলতে পারিনি যে নিজের বোন হলে ওর সঙ্গে মাসে একটি বারও হয়ত দেখা হত কিনা সন্দেহ।

বরদার তখন অনেক কাজ। নতুন বাল্‌তি ফ্যাক্টরির সে ম্যানেজার। সারাদিন ঐ কাজ নিয়েই সে ব্যস্ত থাকত। ফ্যাক্টরিতে বালতিই শুধু তৈরী হত না। গ্যালভ্যানাইজড শিট দিয়ে ঘরে ঘরে নিত্য যে সব জিনিষের প্রয়োজন হয় তা সবই ওর ফ্যাক্টরিতে তৈরী হত। বড় ছোট নানা রকমের জলের গ্লাস, কুকার, মগ, দুধের পাত্র, বাল্‌তি ইত্যাদির চাহিদা এত বেশী তখন বেড়ে গেল যে সারাদিন খেটেও বরদা তা মেটাতে পারত না।

ভোর বেলা সাড়ে পাঁচটায় বরদা ঘুম থেকে উঠত। তারপর হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে যেত বাজারে। ও যখন বাজার থেকে ফিরত দেখত মিনু উনুনে ভাত চড়িয়ে দিয়েছে। বাজার থেকে ফিরলেই মিনু বরদার জন্য আর এক কাপ চা তৈরী করে দিত। তারপর বরদা স্নান খাওয়া সেরে বেরিয়ে যেত সাড়ে আটটার মধ্যে। আর বাড়ি ফিরত সন্ধ্যের পর। কোনো দিন হয়ত ফিরত ছয়টায়। কোনো দিন রাত ন'টায় কিংবা দশটা, এগারোটায়।

একদিন সন্ধ্যার সময় বরদা আমার মেসে এল। বলল, মিনুর শরীর নাকি খুব খারাপ। কিছু খেতে পারে না। যা খায় সবই উঠে আসে। চেহারা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। অতএব এখুনি তোমাকে একবার যেতে হবে।

প্রতি সপ্তাহেই একদিন অন্ততঃ আমি ওদের বাড়ি যেতাম। কিন্তু পঞ্চাশুনার চাপে দিন পনেরো আমি আর যেতে পারি নি।

সেদিন বরদার সঙ্গে গিয়ে মীনুকে দেখে বুঝলাম যে ও তখন অন্তঃসত্ত্বা।

বরদাকে বললাম, এখন ওকে কিছুদিন ওর দাদা বৌদির কাছে রেখে এস। ও নিজে ছেলেমানুষ, তুমিও সারাদিন বাড়ি থাক না। এ অবস্থায় সারাদিন একা থাকলে ওর পক্ষে খুবই খারাপ হবে।

দেখলাম মিনু মোটেই রাজী নয় বরদাকে ছেড়ে থাকতে। আর বরদাও যে ওর কোনো আত্মীয়কে নিজের কাছে এনে রাখতে পারবে তা মনে হল না।

মিনু বলল, দাদা! আপনি যখন আছেন তখন আমার আর ভয় কি? দরকারের সময় আপনাদের হাসপাতালে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন না?

তখনকার দিনে হাসপাতালে সাধারণতঃ কেউ যেতে চাইত না। প্রসূতিদের জন্যও আজকালকের মত প্রসবের আগে অ্যান্টিনেটাল চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই তখন সব চেয়ে বেশী যে কারণে প্রসূতিদের মৃত্যু হত সে হল প্রসবজনিত জ্বর এবং সূতিকা। তা ছাড়া হত একলেম্পসিয়া বা গর্ভজনিত বিষক্রিয়া (প্রেগন্যান্সি টকসিমিয়া)।

আজকাল সালফাড্রাগ এবং পেনিসিলিন ইত্যাদি অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কারের ফলে রক্ত শূন্যতার চিকিৎসা এবং গর্ভপাতের পর থেকেই মাতার (অ্যান্টিনেটাল) চিকিৎসার প্রবর্তনের ফলে প্রসূতির মৃত্যু বড় একটা হয় না প্রথম থেকেই ধরা নিলে। কিন্তু তখনকার দিন ছিল অন্য।

কাজেই মিনু আমার ওপর অত ভরসা রাখলেও আমার মনে যথেষ্ট ভয় ছিল। আতঙ্ক ছিল। অত বড় দায়িত্ব নেবার মত কোনো যোগ্যতাও আমার ছিল না তখন।

আমি ওদের অনেক বোঝালাম কিন্তু ওরা কেউ আমার কথা শুনল না। বরদা তো তার স্বভাবমত হেসেই আমার কথা উড়িয়ে দিল।

বলল, মফঃস্বল থেকে কলকাতা সহরে আসে লোকে প্রসবকালে বিপদ হলে; আর তুমি বলছ ওকে কলকাতা থেকে বাইরে যেতে? এটা তোমার কি রকম যুক্তি হল ডাক্তার?

সেদিন ওর ঐ বক্রোক্তির কোনো জবাবই আমি দিতে পারিনি। দিতে অবিশ্যি পারতাম ঠিকই কিন্তু ইচ্ছে করেই দিই নি। কারণ আমি জানতাম, আমি যাই কেন বলি বরদা তা হেসেই উড়িয়ে দেবে। কিন্তু মিনু মনে মনে ভয় পাবে। ওর এই অবস্থায় অনর্থক ওর মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে আমি চাই নি।

তাই বরদার খোঁচাটা হজম করে বললাম, তুমি তো সারাদিন বাইরে বাইরে থাক। কিন্তু মিনু থাকে একলা। এই অবস্থায় সেটা কি ভাল? তাই বলছি আর সবাই এ সময়ে যা করে তুমিও তা করনা কেন? ওকে ওর ধাত্রী বৌদির কাছেই পাঠিয়ে দাও। তোমারও ঝঞ্ঝাট কমবে। মিনুও একটু আরাম পাবে। তারপর বাচ্চা নিয়ে এখানে এসে আবার তোমার সংসার দেখতে পারবে। কিন্তু আমার কথা ওরা কেউই শুনল না। বরদা রাজী হল না, মিনুকে ওর ধাত্রী বৌদির সাহায্য নিতে হবে বলে। আর মিনু রাজী হল না বরদাকে একলা ফেলে গেলে বরদার খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির খুব অসুবিধা হবে বলে।

ফলে যা হবার তা হল। মিনুদের বাড়ির দোতলায় যে ভদ্রমহিলা থাকতেন তিনিই মিনুর ভার নিলেন। একদিন মিনুকে নিয়ে গেলেন কালীঘাটে। তারপর দেখলাম মিনু হাতে এবং পায়ের আঙুলে লোহার ছুটি আংটি পরেছে। আর বাহুতে পরেছে একটি মাদুলী।

আগেই বলেছি যে তখনকার দিনে প্রসূতিদের অ্যান্টিনেটাল অর্থাৎ প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত চিকিৎসার কোনো সুব্যবস্থা কোনো হাসপাতালেই ছিল না। আমাদের হাসপাতালেও ছিল না।

তবু আমি জবরদস্তি করে মিনুকে কয়েকবার আমাদের আউটডোরে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ডাক্তারী ছাত্ররা যেভাবে ওকে পরীক্ষা করত মিনু সেটা বরদাস্ত করতে পারত না কিছুতেই। ওরা নাকি ভারি অসভ্য। কাজেই হাসপাতালে যাওয়া মিনু বন্ধ করে দিল। আমিও পড়াশুনার চাপে আটকে গেলাম। ওর কোনো খবরও নিতে পারলাম না অনেকদিন।

একদিন দুপুর রাত্রে বরদা আমার মেসে এল। দশ মিনিট ধরে গেটের কড়া নেড়ে যেন সুদ্ধ সবাইকে জাগিয়ে বরদা আমার হেতলার ঘরে উঠে এল।

শুনলাম দুদিন আগে মিনুর একটি ছেলে হয়েছে পাড়ারই একটি ধাই প্রসব করিয়েছে। এতদিন মিনু বেশ ভালই ছিল কিন্তু আজ বিকেল থেকে ওর পেটে ব্যথা হচ্ছে। জ্বর হয়েছে।

সেই জ্বর আজ রাত বারোটায় ১০৫° উঠে গেছে। আর মিনু কেমন যেন ভুল বকছে। অতএব এখুনি আমাকে একবার যেতে হবে।

আমি তখনও ডাক্তার হইনি। মাত্র কোর্থ ইয়ারে পড়ি। এরকম কঠিন রোগের দায়িত্ব নেব কি করে?

তাই বরদাকে বললাম, তুমি এক্ষুণি একটা ট্যাক্সি করে ওকে হাসপাতালে নিয়ে এস। যাবার সময় আমাকে তুলে নিয়ে যেও।

বরদা বলল, আমার হাতে কিন্তু মাত্র পঁচিশটি টাকা আছে। তুমি যদি এখন বল যে ২৫০৲, ৩০০৲ হলে আমার স্ত্রীকে তুমি বাঁচিয়ে দিতে পারবে তাহলে তাই আমি তা দিতে পারব না। অত টাকা আমার

নেই। আর তা যোগাড়ও আমি করতে পারব না। কাজেই হাসপাতালে একটা ফ্রি বেডের ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে।

তখনকার দিনে প্রসবের পর মা'র এমনি ১০৫° জ্বর হওয়া মানেই ছিল সাংঘাতিক এক ব্যাপার। এই মৃত্যু-জ্বরে কেউ বড় একটা বাঁচত না তখন। মিনুরও শেষটায় এই জ্বর হয়েছে শুনে ভয়ে আতঙ্কে আমার সর্ব শরীর তখন কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।

ঠিক সেই সময় মিনুর চিকিৎসার জন্য বরদার মুখে টাকা পয়সা খরচের এই হিসাবটা শুনে মোটেই আমার ভাল লাগল না। তাই একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, আচ্ছা সে সব পরে হবে এখন। তুমি এক্ষুনি ট্যাক্সি করে আগে ওকে নিয়ে এস। হাসপাতালে গিয়ে ওকে ভর্তি করা যাক। তারপর ওসব হিসেব কোরো।

আমার বিরক্তি দেখে বরদা একটু হাসল। বলল, ডাক্তার! এই পৃথিবীতে টাকাটা মোটেই তুচ্ছ জিনিষ নয়। আমার জন্য পরে তোমার কোনো অসুবিধে যাতে না হয় তাই আগে থাকতেই আমার অবস্থার কথা সব তোমাকে খুলে বললাম। এই কথাটা মনে রেখে যা করা সম্ভব তুমি কোরো।

এই বলে বরদা ট্যাকসি খুঁজতে চলে গেল। আমিও জামা কাপড় পরে হাসপাতালে যাবার জন্য তৈরী হয়ে নিলাম।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই বরদার ট্যাকসি আমার মেসের নীচে এসে হর্ণ দিতে শুরু করল। আমি তৈরী হয়েই ছিলাম। তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম।

ট্যাকসির ভেতর অন্ধকারে বসে মিনুর অবস্থাটা তখনও ঠিক আমি বুঝতে পারি নি। যখন বুঝলাম তখন ট্যাকসি আমাদের হাসপাতালে পৌঁছে গেছে এবং ষ্ট্রেচারে করে মিনুকে তুলে ও. টি তে (অপারেশন থিয়েটার) নিয়ে টেবিলে শোয়ানো হয়েছে।

ও. টির কড়া আলোয় ঐ টেবিলের ওপর মিনুকে দেখে আমার সেদিন কেমন যেন একটা ভয় হল। মনে হল, এ মিনু যেন অন্য কোনো এক জগতের লোক, যাকে আমি চিনি না। কোনো দিন দেখিনি। মিনুও যেন আমাকে জানে না। চেনে না।

চোখ দুটি ওর ঘোলাটে। আমার দিকে এমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল যে ওর ঐ চাউনি আমি সইতে পারলাম না। মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে চেয়ে রইলাম।

সারা দেহে তখনও ওর যৌবনের জোয়ার। নিরাভরণ সুপুষ্ট ওর বাহুদুটি তখনও অনাবৃত। সাদা চাদরে ঢাকা ওর দেহ থেকে ঐ বাহুদুটি বার করে মিনু ওর দু হাত দিয়ে দেহের ঐ চাদরটি যেন বার বার সরিয়ে দিতে চাইল। মনে হল, ও ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই। যেন এক নেশার ঘোরে রয়েছে।

তখনকার দিনে এ-নেশা কাটাবার কোনো ওষুধই তখন ছিল না চিকিৎসকের হাতে। তাই মিনুর এ অবস্থা দেখে ভয়ে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। গলা শুকিয়ে গেল।

বরদার কথা মত ফ্রি বেডেই মিনুকে রাখা হল। হাসপাতালের ডাক্তাররা এবং আমাদের কলেজের ধাত্রী বিদ্যার অধ্যাপক অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তিনদিনের মধ্যেই মিনুর মৃত্যু হল।

অধ্যাপক একদিন আমাকে বললেন, এই মেয়েটিকেই না তুমি কিছুদিন আগে একবার আউটডোরে নিয়ে এসেছিলে?

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

অধ্যাপক বললেন, তাহলে ডেলিভারির সময় হাসপাতালে নিয়ে এল না কেন?

কাজেই সব কথা খুলে বলতে হল। বলতে হল যে ডাক্তারী ছাত্রদের পরীক্ষা রোগীর পক্ষে হয়নি। তাই ওরা ধাই দিয়ে প্রসব করিয়েছে।

অধ্যাপক বললেন, ডেলিভারী বাড়িতে হওয়া অবশ্যই বেশী নিরাপদ। তবে যে প্রসব করাবে তার সেপসিস এবং অ্যাসেপসিস সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা চাই। আমাদের দেশের ধাইরা এখনও তা জানে না। সে রকম শিক্ষা ওরা এখনও পায়নি। তাই এই মেয়েটি মারা গেল।

একথা আমি আগেই বুঝেছিলাম যেদিন মিনুকে হাসপাতালে ভর্তি করি। কিন্তু দেখলাম বরদা তা বুঝল না। এই রকম একটা পরিস্থিতির জন্ত বরদা যেন আগে থাকতেই তৈরী হয়েছিল।

তাই এ অবস্থায় অন্ত সব স্বামীদের যেমন হঠাৎ একটা শ্মশান বৈরাগ্য তখন হত, বরদার মধ্যে সে সব কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

মিনুর ইহলোক এবং পরলৌকিক সব কাজ শেষ করে বরদা একদিন এসে বলল, জান ডাক্তার এ সবই গ্রহের ফের। ঠাকুরী কুষ্ঠির ব্যাপার। খুব বড় একজন জ্যোতিষী দিয়ে আমার ভাগ্য গণনা করিয়েছিলাম। আমার হাত দেখে এবং জন্মের সন তারিখ সব মিলিয়ে আমার যে ঠাকুরী তিনি তৈরী করেছিলেন তাতে পরিষ্কার লেখা আছে, সন্তান প্রসবের সময়ই আমার স্ত্রী বিয়োগ হবে। আমি নির্বংশ হব।

অন্তঃসত্ত্বা হবার পর থেকে মিনুর স্বাস্থ্য যেরকম ভাল ছিল, দশটি মাস ধরে সারা দেহে যৌবনের বিপুল জোয়ার নিয়ে নতুন মাতৃত্বের দাবি যেভাবে মিনু মিটিয়েছে তাতে প্রসবকালে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা নিলে যে ওর মৃত্যু অমন অকালে কখনও ঘটত না সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সংশয় ছিল না। কিন্তু বরদার এই শোকের মুখে সেকথা বলতে আমি পারলাম না। আমার সব যুক্তি হারিয়ে গেল যখন সাতদিন পরে বরদা এসে খবর দিল যে ওর মাতৃহারা ঐ ছেলেটিও হঠাৎ জ্বর হয়ে সত্ত রাত্রে মারা গেছে।

তারপর অনেকদিন বরদার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। ডাক্তারী কলেজ ছেড়ে আমি তখন কলকাতায় তখন এসে বাসা নিয়েছি। স্ত্রী পুত্র সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়েছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল বরদার সঙ্গে বৌবাজার এবং কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। ওর সঙ্গে তখন ২৩।২৪ বৎসর বয়েসের একটি মেয়ে।

বৌবাজারের মোড়ে 'রূপম' সিনেমা থেকে ওরা দুজনে সবে যখন বেরোচ্ছে এমনি সময় আমার সঙ্গে বরদার দেখা হয়ে গেল, ৭।৮ বৎসর পরে।

আমাকে দেখে বরদা প্রথমে হঠাৎ যেন একটু হকচকিয়ে গেল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সেই অপ্রস্তুত ভাব কাটিয়ে একগাল হেসে আমাকে অভ্যর্থনা করল। হাত বাড়িয়ে আমার ডান হাতে বেশ জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আরে ডাক্তার যে এখানে?

বললাম, এই কাছেই তো থাকি। ট্রামের জন্ত দাঁড়িয়ে আছি। তারপর তোমার কি খবর?

তেমনি হেসে বরদা বলল, এই মহিলাটিকে তুমি বোধ হয় আগে কখনও দেখনি। ইনি আমার

স্ত্রী। ম্যাট্রিক পাশ। আবার মাঝে মাঝে কবিতাও লেখেন তোমাদের মত। নামটিও ভারী মজার। মানী।

সিনেমা থেকে হাসতে হাসতে মানী বরদার সঙ্গে বেরিয়েছিল। হয়ত কোনো মিলনান্ত হাসির ছবি ছিল সেদিন। ছবির সেই হাসির রেশ তখনও সারা মুখে ওর লেগে ছিল। খুশির ঢেউ সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সে ঢেউ স্তব্ধ হয়ে গেল যখন বরদা আমাকে দেখে সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে এমনি আলাপ জুড়ে দিল।

দেখলাম মানী একটু সরে দাঁড়িয়েছে, দুই বাহুতে তার হাত দুটি রেখে। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে। মনে হল, বরদার এই রকম আচরণে ও ঠিক খুশি হয়নি। আমাকেও ঠিক পছন্দ করেনি মনে মনে। বিশেষ করে বরদার শেষ দিকটার কথা শুনে ওর চোখ মুখ যেন কঠিন হয়ে উঠল।

বরদার কিন্তু সেদিকে কোন হুঁশ নেই। আমার হাত ছেড়ে তেমনি হেসে পেছনে ফিরে মানীকে ডেকে বলল, এই দেখ আমার সেই ডক্টার বন্ধু। সাত আট বছর আগে যাকে ছাড়া একটি দিনও আমার চলত না। খুব ভাল লোক। আমার মত স্বভাব চরিত্রও ওর খারাপ নয়। তাছাড়া ও তোমারই মত রবি ঠাকুরের কবিতার ভক্ত। অতএব একদিন ওকে চা খাবার নেমন্তন্ন কর। আর যত খুশি কবিতা ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা কর।

এইবার মানীর মুখের সেই কালো মেঘ যেন কেটে গেল। সলজ্জ হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বাহু থেকে হাত দুটি তুলে আমাকে ছোট্ট একটি নমস্কার করল।

আমিও প্রতি নমস্কার করে বললাম, এই হতভাগাটা আপনার মত এমন বিদুষী একটি মেয়ে পেল কি করে? দেখছি আপনার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে।

এ কথার জবাব দিল বরদা। মানী মুখ টিপে একটু হাসল। বরদা বলল, তা তাই ঠিকই ধরেছ তুমি। প্রেম করে আমাকে বিয়ে করে বেচারা এখন পস্তাচ্ছে। আমি মূর্খা মানুষ। খেটে খাই। কুলী মজুর চড়াই। বল দেখি কবিতা, সাহিত্য, আর রবি ঠাকুরের গান এসব কি আমার পোষায়? নাকি ওসব কোনদিন আমি কিছু জানি?

তখনকার দিনে হিন্দু সমাজের ২৪।২৫ বৎসর বয়েসের কোনো মেয়ের পক্ষে প্রেম করে বরদার মত প্রায় ৪০ বৎসর বয়সের বিপত্নীক কোনো পুরুষের সঙ্গে হিন্দু মতে বিবাহ করা আজকালকার মত এত সহজ ছিল না। স্বাভাবিকও ছিল না।

তা ছাড়া বাঙালী সমাজে শিক্ষিত বলতে আমরা যা বুঝি বরদা সে রকম শিক্ষিত কোনো পাত্র ছিল না। বরদা শিক্ষালাভ করেছিল জীবন যুদ্ধে। কলেজের শিক্ষা সে পায়নি। কারণ ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে পাশ করতে না পেরে পড়াশুনা ও ছেড়ে দিয়েছিল। চৌকস এবং মার্জিত রুচির ছেলেও বরদা ছিল না। আর ছিল না তার কোনো ধন সম্পত্তি।

কাজেই বরদার মধ্যে কী দেখে যে মানীর মত অমন শিক্ষিতা একটি আধুনিকা মেয়ে হঠাৎ প্রেমে পড়ে ওকে একেবারে বিয়ে করে ফেলল তা আমি ভেবে পেলাম না।

যাই হোক ওরা দুজনেই অনেক করে বলল যেন ওদের বাড়ি আমি একবার যাই এবং সম্ভব হলে কালই সন্ধ্যের সময়।

শুনলাম ওরা ওএলিংটন পার্কের কাছেই ক্রিক রো-এ একটা বাসায় থাকে। বৌবাজারে আমার বাসা থেকে মাত্র ১০।১৫ মিনিটের পথ।

কাজেই বললাম, নিশ্চয়ই যাব। কালই যাব।

কিন্তু ওদের বাড়ি যেতে আমার বেশ কয়েকদিন দেরী হয়ে গেল। যেদিন গেলাম সেদিন তখনও বরদা বাড়ি ফেরেনি।

দেখলাম দু'খানা ঘরের একটা ফ্ল্যাট নিয়ে ওরা থাকে একতলায়। একখানা রান্না এবং খাবার ঘর। আর একখানা শোবার। আমাকে শোবার ঘরেই মানী নিয়ে এল।

ঘরখানা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জানালায় খদ্দরের রঙীন পর্দা। তক্তাপোশের ওপর ওদের বিছানা খদ্দরের ছাপা বেড কভারে ঢাকা। তখনকার দিনে তাই ছিল আধুনিক। মনে হল যেন এটা বরদার বাসা নয়। মানীর বাড়ি।

আমাকে মানী খুবই খাতির যত্ন করল। আমি ওকে আপনি করে বলতে শুরু করেছিলাম বলে বেশ একটু অনুযোগও দিল। বলল বয়েসে আমি ওর দাদার চেয়েও বড়। কাজেই ওকে যদি তুমি না বলি তাহলে আমার সঙ্গে ও আর কথা বলবে না।

আমার হঠাৎ মিনুর কথা মনে পড়ে গেল। মিনুও ঠিক এমনি করেই বলেছিল।

অথচ মিনুর সঙ্গে মানীর কোথাও কোনো মিল নেই। মিনুর বয়েস যেমন আরও অনেক কম ছিল তেমনি ও ছিল সরল প্রকৃতির মেয়ে। লেখাপড়াও বিশেষ কিছু সে শেখনি। তার দেহ সৌষ্ঠব যদিও মানীর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর ও পুষ্ট ছিল তবু সে তা মানীর মত মেজে ঘষে পোশাকের আঁটসাঁট বাহুনি দিয়ে পুরুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে জানত না।

মানী যদিও আমাকে মিনুরই মত তুমি বলে বলতে বলল তবু আমার মনে হল মিনুর মধ্যে যেন অনেক বেশী আন্তরিকতা ছিল। ভালবাসা ছিল। ওর কথা অতি সহজেই আমার মর্মে এসে পৌঁছেছিল।

কাজেই মিনুকে যেমন আমি নিজের ছোট বোনটির মত অনায়াসে ভাবতে পেরেছিলাম মানীর বেলায় তা পারলাম না। কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকল।

মনে হল ওর এই অনুরোধ শুধুই যেন একটা কথার কথা মাত্র। মনের কথা নয়।

প্রথমে একটু অসুবিধা এবং আড়ষ্টতা বোধ করলেও আমি অবশেষে ওকে তুমি বলেই ডাকতে শুরু করলাম। ক্রমশঃ এটা সহজ হয়ে এল। কিন্তু প্রথম আলাপেই মিনুর সঙ্গে আমার যে একটা স্নেহের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল মানীর বেলায় তা আর হল না। হয়ত বা অকারণেই বার বার মনে হতে লাগল যে এটা নেহাৎই মানীর অভ্যেস, অন্তরের সঙ্গে তার কোনো যোগই নেই।

দেখলাম মানী খুবই সপ্রতিভ এবং চালাক চতুর মেয়ে। সকাল বেলা একটা মেয়ে স্কুলে পড়ায়। ৭টা থেকে ১২টা পর্যন্ত। তারপর বিকেল বেলায় দুটো গানের টিউশানি করে। একঘণ্টা করে। কাজেই সংসার খরচের জন্য বরদার ওপর ওকে নির্ভর করতে হয় না মোটেই।

মানীর বাড়িতে বসে সেদিন এ সবই আমি শুনলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। ওর কথা শুনতে শুনতে রাত নটা বেজে গেল। তবুও যখন বরদা বাড়ি ফিরে না তখন আমি উঠলাম।

বাড়ি ফেরবার পথে সেদিন বার বার আমার মনে হয়েছিল, ওরা ভুল করেছে। বরদার মোটেই উচিত হয়নি মানীর মত এমন একটি শিক্ষিতা সুপটু ও মার্জিত রুচির মেয়েকে বিয়ে করা। আর মানীও নিশ্চয় ভুল বুঝে হঠাৎ বরদাকে বিয়ে করে ফেলেছে কোনো এক ঝোঁকের মাথায়। কাজেই এ বিয়ে ওদের টিকবে না।

একদিন ভোরবেলা সবে ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে খবরের কাগজটা খুলে বসেছি, এমনি সময় মানী আমার বাসায় এল।

শুনলাম বরদাকে ৪।৫ দিন হল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একদিন দুপুরে খেয়ে দেয়ে বরদা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তারপর আর ফেরেনি। আপিসেও যায় নি। ওর জিনিসপত্রও সব ঘরে ফেলে গেছে। হাসপাতাল অথবা থানার খবর নিয়েও বরদার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাই মানী জানতে এসেছে আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে কিনা এ ক'দিনের মধ্যে।

বরদার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি অনেকদিন। ইদানীং আমার সঙ্গে বড় একটা দেখা সাক্ষাৎও হত না। মনে হত যেন ইচ্ছে করেই আমাকে বরদা এড়িয়ে চলত।

কাজেই কেন বরদা বাড়ি ফেরেনি অথবা কোথায়ও যেতে পারে তার কোনো হদিসই আমি দিতে পারলাম না মানীকে।

মানীর হাবভাব এবং আচরণও আমার কাছে কেমন যেন একটু অদ্ভুত লাগল। মনে হল না যে ও খুব বেশী বিচলিত বা উদ্বিগ্ন হয়েছে। বরং মনে হল ও যেন এই রকম একটা কিছু বিপর্যয়ের জন্যে তৈরী হয়েই ছিল।

বরদার কোনো খবরই আমি জানি না শুনে ঘৃণা ও ব্যঙ্গভরে ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হেসে মানী বলল, আমি জানতাম ও এমনি করেই শেষে পালাবে। আসলে ও একটা লম্পট এবং কাউআর্ড।

আনন্দকিশোর মুন্সী

লেডি ম্যাকবেথের পার্ট নিয়ে মিস্ এলেন টেরী সেকস্‌পীয়ারের ম্যাকবেথ নাটকে নেমেছেন। অভিনয় বেশ জমে উঠেছে, বিশেষতঃ যে দৃশ্যে রাজা ডানক্যানকে হত্যা করা হবে।

মিস্ এলেনের এক গ্রাম্য বুড়ো অভিনয় দেখতে এসেছেন। এলেন টেরী যে আজ লেডি ম্যাকবেথ এটা তাঁকে সহজে বোঝান যাচ্ছে না।

তিনি কেবলই বলছেন, "আরে ও তো আমাদের সেই 'এলেন',—ও আবার রাণী হোল কি করে?"

নাটকের দৃশ্যে লেডি ম্যাকবেথ তখন ম্যাকবেথকে বলছেন,—"রাজা ডানক্যান আমার বাপের মত দেখতে, তাই আমি নিজে তাঁকে খুন করতে পারলাম না।"

হঠাৎ গ্রাম্য বুড়োটি দর্শকের আসনে দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বললেন,—হ্যাঁরে এলেন, তুই তোর বাবাকেও ভুলে গেছিস্,—তার কি ও রকম লম্বা দাড়ি ছিল?

বাংলা রঙ্গালয়ের নব-রূপায়ণ

রোমন্থনের যুগে

মনে হচ্ছে সেটা ১৯১১ খৃষ্টাব্দ।

সাহিত্যিক বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গে থিয়েটারওয়ালাদের বেশ ঘরোয়া সম্পর্ক,—যাকে বলে গলায় গলায় ভাব। কারণও ছিল। প্রথমতঃ থিয়েটারে তখন তাঁর কয়েকটি ছোট-বড় পালা অভিনীত হয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি পুলিস কোর্টের উকীল এবং থিয়েটারের কর্তাদের প্রায়ই ফৌজদারী কোর্টে ছোটখাটো মামলা মামলাতে গিয়ে সৌরীনের সাহায্য নিতে হয়।

সৌরীনের সঙ্গে একদিন মিনার্ভা থিয়েটারে গেলুম। সেদিন কোন্ পালার অভিনয় চলছিল ঠিক নাম আমার মনে নেই।

'বক্সে' ব'সে অভিনয় দেখছি, এমন সময় পিছন থেকে সুগম্ভীর কণ্ঠের সম্ভাষণ শুনলুম—"এই যে সৌরীনবাবু।"

ফিরে দেখি স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি তখন মিনার্ভার অধ্যক্ষ বা ম্যানেজার।

অপরেশবাবুও আমাদের পাশে এসে আসন গ্রহণ করলেন। সৌরীন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "আপনি কি আর কোন পার্ট নেন নি?"

তিনি বললেন, "না। পার্ট করবার ক্ষমতাও নেই। আজ ক'দিন থেকে ঘাড়ে একটা ফিক্-ব্যথা হয়েছে, বড় কষ্ট পাচ্ছি।"

সেইই অসুখের আরম্ভ। তিনি যাকে অস্থায়ী ফিক্ ব্যথা ভেবে হাল্কা ভাবে নিয়েছিলেন, পরে তা এমন গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় যে, বাকি জীবনটা তার নিষ্ঠুর কবল থেকে আর নিস্তার পান নি। তাঁর ঘাড় একেবারে আড়ষ্ট হয়ে যায়, তিনি উপর দিকে মুখ তুলতে বা ডাইনে বাঁয়ে ফেরাতে পারতেন না। তাঁর মত বিখ্যাত ও জনপ্রিয় নটের পক্ষে এটা হয়েছিল নিয়তির নির্মম অভিশাপের মত, কারণ নটের ভাবাভিব্যক্তি ফুটে উঠে প্রধানত সাবলীল দেহপটের উপরেই। কিন্তু তাঁর পক্ষে যার-পর-নাই প্রশংসার কথা এই যে, এমন ভয়াবহ দুর্ভাগ্য ও অক্ষমতার সঙ্গে যুঝতে যুঝতেও একাধিক ভূমিকাতে তিনি তাঁর জীবনের সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিনয়চাতুর্য্য দেখিয়ে গিয়েছিলেন—যেমন, 'ওথেলো' ও 'চিরকুমার সভা' পালায় 'ইয়াগো' ও 'রসিক'। তাঁর অভিনয়ে 'রসিকে'র যে জীবন্ত ছবি দেখেছিলুম, শিশিরকুমার পর্য্যন্ত তার ঔজ্জ্বল্য ম্লান ক'রে দিতে পারেন নি।

সেদিন বক্সে ব'সে অপরেশবাবুর সঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয়ের আলো-ছায়া নিয়েও কিছু কিছু আলোচনা

হয়েছিল। শেষের দিকে তিনি বললেন, "সাহিত্যিকরা রঙ্গালয়ে নিয়মিতভাবে এসে আমরা যথেষ্ট আনন্দিত হই। সাহিত্যিকরা আসা-যাওয়া করুন, থিয়েটার নিয়ে চিন্তা করুন, তবেই তো রঙ্গালয়ের উন্নতি হবে—কেবল বিরুদ্ধ সমালোচনায় কোন লাভ হয় না।"

এর কয়েক বৎসর পরে বাংলা নাট্যশালার সঙ্গে সত্যসত্যই সাহিত্যিক ও শিল্পীরা নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং সেকথা বলব যথাসময়েই।

অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'ল বটে, কিন্তু মিনার্ভা থিয়েটারে আর তাঁর দেখা পাই নি। কারণ এর অল্পদিন পরেই তিনি মিনার্ভার অধ্যক্ষতার পদ ত্যাগ ক'রেছিলেন।

উনিশশো সতেরো থেকে উনিশশো উনিশ পৃষ্ঠায় পর্য্যন্ত তিন বৎসরের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর নাটক নিয়ে অভিনয়চর্য্যা চালানো হয়েছিল, এখানে তার কথা কিছু বললে ক্ষতি হবে না।

তখন প্রাচীন নাট্যকারদের মধ্যে জীবিত ছিলেন একমাত্র ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। তিনি রচনা করলেন "বঙ্গে রাঠোর" নামে পঞ্চাঙ্কে পালা। কিন্তু তখন তাঁর কলমের রস অনেকটা পাৎলা হয়ে এসেছিল, নামজাদা নট-নটীদের নিয়েও পালাটি উচিতমত দর্শক আকর্ষণ করতে পারে নি। অথচ অল্পদিন পরেই "কিন্নরী" নামে তাঁরই একখানা অমরচিত বাজে নাটিকা শতাধিক রাত্রি ধ'রে মিনার্ভার প্রেক্ষাগৃহকে পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছিল। লেখা বা অভিনয় কিছুই 'আলা-দরি' হয় নি এবং ও-দুটো ব্যাপার এক্ষেত্রে কেউ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে নি, কারণ দর্শকদের টেনে আনত তথাকথিত 'সিন-সিনারি', সখীদের পোষাক এবং নৃত্যগীত।

সাহিত্যিকরা গোড়া থেকেই রঙ্গালয়ের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন, নাট্যকার রূপে দেখা দেবার জন্যে আগ্রহপ্রকাশ করেছেন, কিন্তু গিরিশ-যুগে একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছাড়া আর কেউ বাজার দখল করতে পারেন নি। কারণ বোধ করি মৌলিকতার ও মঞ্চ-পরিস্থিতি সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব।

যে সময়ের কথা বলছি তখনও একাধিক সাহিত্যিক নাট্যজগতে দেখা দিয়েছিলেন। প্রখ্যাত কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী রচনা করেছিলেন দুখানি নাটক—"চিতোরোদ্ধার" (১৯১৮) ও "জয়-পরাজয়" (ঐ), কিন্তু তেমন সুবিধা ক'রে উঠতে পারেন নি।

মহিলা-লেখিকারা রঙ্গালয়ের মুখ চেয়ে নাটকরচনার জন্যে কোনদিনই আগ্রহপ্রকাশ করেন নি, কিন্তু ১৩১১ সালে দেশবন্ধুর ভগিনী অমলা দেবী "ভিখারিণী" নাটক রচনা ক'রে এ নিয়মভঙ্গ করেছিলেন। তারপর ১৯১৭ সালে মিনার্ভার জন্যে "সিতিমা" নামে নাটক লিখে সকলকে বিস্মিত ক'রেছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি কামিনী রায়। বিস্মিত করেছিলেন বললুম এইজন্য যে, তখনকার রঙ্গালয়ের দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতি যে তাঁর মত মহিলা-কবির মনে নাটক রচনার উৎসাহ উদ্রেক করবে এটা ছিল আমাদের ধারণার বাইরে। কিন্তু দুঃখের বিষয় "সিতিমা"র পরমায়ু দীর্ঘ হয় নি।

যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্প নিয়ে আজ মঞ্চ ও চিত্র জগতে কাড়াকাড়ি হুড়োহুড়ি চলছে, তার প্রথম আরম্ভ এই সময়েই। ১৯১৮ সালে নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ষ্টারের জন্য "বিরাজ বৌ"-এর নাট্যরূপ প্রস্তুত করেন। কিন্তু অমৃতলাল বসু, তারক পালিত ও ক্ষেত্র মিত্র প্রভৃতির মত প্রখ্যাত নট নিয়েও তার অভিনয় লোকপ্রিয় হয় নি। আমিও সে অভিনয় দেখেছিলুম। তৃপ্তি পাই নি।

এই সময়ে মনোমোহন থিয়েটার উপর-উপরি কয়েকটি তথাকথিত ঐতিহাসিক পালা মঞ্চস্থ ক'রে নাট্যজগতে রীতিমত ঘুমপাড়ানী লাগিয়ে দিয়েছিলেন। অর্ব্বাচীন লেখকদের দ্বারা লিখিত ঐ পালাগুলির

মধ্যে ছিল না চরিত্র-চিত্রণের বা ঐতিহাসিক সত্যরক্ষার কোন চেষ্টাই, তারা দেখাতে চাইত প্রধানত চিত্তউত্তেজক ঘটনার পর ঘটনার প্রবাহ আর শোনাতে চাইত এমন সব গরম গরম বক্তাপচা সস্তা বচন যা গ্যালারীর পৃষ্ঠপোষকদের নিদ্রা চট্ ক'রে ভেঙে দিতে পারে। এই সব পালার বাগবিন্যাস লেখকদের মনে অসম্ভব উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেছিল দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির লোকপ্রিয়তা এবং দ্বিজেন্দ্রলালের দৌলতেই তাঁরা হাতের কাছেই পেয়েছিলেন মেলোড্রামার উপযোগী রেডি-মেড মালমশলা।

সে সময়কার প্রেক্ষাগারের কিঞ্চিৎ বর্ণনা এখানে না দিলে চলবে না, কারণ একালের প্রেক্ষাগারের অবস্থাও উচিতমত সন্তোষজনক না হ'লেও সেকালের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত।

পল্লীগ্রাম থেকে যে সব পাহুতলার বা মেঠো দর্শক থিয়েটার দেখতে, চীৎকার করতে ও হাততালি দিতে সহরে আসত দলে দলে, তাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম ; কিন্তু যে সব তরুণ সহরে দর্শক তখন বিডন ষ্ট্রীটের তিন-তিনটি থিয়েটারে এসে ডামাডোল বাধিয়ে দিত, তাদের দলভুক্ত হবার যোগ্য লোক যে একেলে কলকাতায় নেই, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না ; কিন্তু কর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবস্থার জন্যে রঙ্গালয়ের হালচাল এখন অনেকটা বদলে গেছে, তাই তাঁরা আজ উপদ্রব করবার ঠাঁই খুঁজে নিয়েছেন স্থানান্তরে গিয়ে।

সেকালে প্রায়ই দেখা যেত একদল ধনীর ঘরের দুলাল প্রকাশ্যে গণিকালয়ের নিম্নে দোতলার বক্স দখল ক'রে বসেছে—প্রত্যেকেরই চোখ লাল পানির মহিমায় চুলুচুলু এবং মুখে হাবলার মত হাসিমাখানো ভাব। তাদের মাথার মাঝখানে টেরি-কাটা খুটিদার কেশের বাহার আর মাথার দুইপাশ ও পিছনদিক যেন ক্ষুর দিয়ে চাঁচা এবং চুড়ীদার পাজামা পরা হাতের উপরে কয়েক পাক জড়ানো বেলফুলের মালা। পল্লীবিশেষ থেকে সংগৃহীত সঙ্গিনীরাও অনেক সময় আসত সৌখীন পুরুষের সাজে—মাথায় খোট্টাই টুপী প'রে ও চোখে চশমা লাগিয়ে।

ঐ বখাটে ছোকরাবাবুদের আর একটা দল এসে অধিকার করত প্রেক্ষাগারের প্রথম সারের চেয়ারগুলো এবং নটীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে অভিনয়ের সময়ে তারা অধিকাংশ দর্শকের বিরক্তি ও প্রতিবাদকে কিছুমাত্র আমল না দিয়ে ভিতর থেকে বাহিরে ও বাহির থেকে ভিতরে আনাগোনা করত ক্রমাগত।

এই দুই দলের উচ্চকণ্ঠের রসভাষণে অনেক সময়েই ভেঙে কিম্বা থেমে যেত মঞ্চাভিনেতাদের কথাবার্তা এবং নাচ-গানের সময়ে তারা তারস্বরে যে-সব টীকাটিপ্পনী কেটে অভদ্র রসিকতা করত, তা শুনে ভদ্র সুরসিকদের অভিনয় উপভোগ করবার উৎসাহ রীতিমত ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারত না।

রঙ্গালয়ের কর্তাব্যক্তিগণ এরকম দুঃসহ অনাচারের পক্ষপাতী ছিলেন এমন কথা বলতে ইচ্ছা হয় না ; তবে এ-সব দুর্নীতি দমন করবার জন্যে তাঁদের যে উচিতমত আগ্রহ ছিল না, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ থাকতে পারে না। কারণটাও বিশেষ অস্পষ্ট নয় ; সেটা অর্থনৈতিক। লোকগুলো নিম্নশ্রেণীর হ'লেও 'পাস' নিয়ে থিয়েটারে আসে না এবং টিকিটের পরিবর্তে তাদের কাছ থেকে যে টাকা পাওয়া যায় তা মেকী নয়—বাজালে সুরে বাজে!

কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা থাকলে এ-সব উৎপাত যে সহজেই বন্ধ করা চলত, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত বিডন ষ্ট্রীটের থিয়েটার-পাড়া ছেড়ে হাতীবাগানের অমৃতলাল বসু প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে গেলে। সেখানকার পরিস্থিতি ছিল যথেষ্ট উন্নত ও প্রশান্ত। নাট্যমন্দিরের উপযোগী।

নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দুটো দৃষ্টান্ত দিই।

একদিন সস্ত্রীক মিনার্ভা থিয়েটার দেখতে গিয়েছি। অভিনয় চলছে। আমরা আসীন প্রথম

সারের আসনে। হঠাৎ হৈ হৈ ক'রে দুজন যুবক প্রেক্ষাগারে ঢুকে পড়ল। তাদের চলন-বলন স্পষ্ট জাহির ক'রে দিচ্ছিল যে তারা বেসামাল মাতাল। তাদের মধ্যে একজন টলতে টলতে এসে দাঁড়াল আমার স্ত্রীর আসনের সামনে এবং চীৎকার ক'রে যা তা অশ্লীল কথা অনর্গল বলতে লাগল। আমার স্ত্রী তো ভয়ে আড়ষ্ট এবং আমিও রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলুম—কিন্তু আমি কিছু করবার বা বলবার আগেই কোথা থেকে বেগে দৌড়ে এলেন মিনার্ভার তখনকার অধ্যক্ষ স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায়—তিনি ছিলেন খুব কড়া-মেজাজের লোক। তিনি এসেই অসভ্যটাকে হস্তমর্দন উত্তম-মধ্যম দিতে দিতে বাইরে টেনে নিয়ে গেলেন। যুবকটি ছিল বউবাজারের এক ধনী ও নামজাদা মিষ্টান্ন বিক্রেতার বংশধর এবং 'মিনার্ভা'র নিয়মিত পৃষ্ঠপোষক—তবু সে সতীশবাবুর কাছে থেকে রেহাই পেলো না।

দ্বিতীয় ঘটনাক্ষেত্রও ঐ 'মিনার্ভা'র। সৌরীন্দ্রমোহন ও আমার স্ত্রী গেছেন অভিনয় দেখতে। তাঁরা বসেছিলেন একখানা বক্সে। মাঝে বিরামের সময়ে আমরা (প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন ও আমি) চা-পান করতে গেলুম পাশের মিনার্ভা রেস্তোরাঁয়। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আমরা গল্প করছি, এমন সময়ে সৌখীন ও বৈঠকী ভাস্কাভিনেতা শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু হন্তদন্তের মত এসে খবর দিলেন, "সৌরীন, রেবেন্দ্র, তাড়াতাড়ি থিয়েটারে যাও নইলে তোমাদের বউ লুট হয়ে যাবে!"

—"ব্যাপার কি?"

—"দেখ গে, একদল মাতাল কি কাণ্ড করছে!"

চোখের পলক ফেলবার আগেই দেখি সৌরীন একেবারে অদৃশ্য! আমরাও দ্রুতপদে যখন ঘটনা-স্থলে গেলুম, তখন সৌরীনের হাতে ঘুসি ও চড় খেয়ে এক যুবককে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলতে শুনলুম, "আমাকে মারলেন, কিন্তু আমি কোন দোষ করি নি!"

ওদিকে তাকিয়ে দেখলুম আমাদের স্ত্রীরা সঙ্কুচিতভাবে বক্সে ব'সে আছেন এবং ঠিক তাঁদের পাশের বক্সেই আড্ডা জমিয়েছে প্রকাণ্ড তাবে গণিকা ও মদের বোতল নিয়ে একাধিক যুবক। সৌরীন যাকে গ্রেপ্তার করেছেন সেও এই দলেরই একজন এবং পরে পরিচয় পেয়ে জানা গেল তার বড় ভাই এক সুপরিচিত ও লোকপ্রিয় ব্যক্তি। বলা বাহুল্য এই গোলমালের পর তারা সদলবলে রঙ্গালয় থেকে বিতাড়িত হ'ল।

তারপর একদিন হ'ল হুলস্থুল ব্যাপার। দুজন যুবক মিনার্ভা থিয়েটারের এক নর্তকীর প্রেমে পড়েছিল এবং বলা বাহুল্য, তারা পরস্পরকে দেখত প্রতিদ্বন্দ্বীর মত। একরাত্রে মঞ্চের উপরে সেই নর্তকী নৃত্য করছে এবং প্রেক্ষাগারে উপস্থিত দুই যুবকই! হঠাৎ তাদের একজন ছোড়া বার করে আর একজনের উপরে লাফিয়ে পড়ল এবং তারপরেই হত্যাকাণ্ড। বাংলা রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহে এমন বীভৎস রক্তাক্ত দৃশ্য আর কখনো দেখা যায়নি।

আমাদের "ভারতী" পত্রিকার কার্যালয়ে সাহিত্য-বৈঠকের খুব পসার। নানা শ্রেণীর প্রসিদ্ধ সাহিত্য সেবকরা সেখানে প্রতিদিন সমবেত হয়ে সাহিত্য ও ললিতকলার বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনায় নিযুক্ত হ'তেন। মনে হচ্ছে ১৯১৯ সালের কোন একদিন কে সেখানে একটি ভদ্রলোককে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন, নাম তাঁর শ্রীযোগেন্দ্র মিত্র। ভদ্রলোকের প্রবল আগ্রহ, তিনি অধঃপতিত বাংলা রঙ্গালয়ের সংস্কারসাধন করবেন। তাঁর মুখে ভালো কথা শুনে আমরাও যে তাঁর উৎসাহ বর্দ্ধন করেছিলুম সে কথা আর না বললেও চলে। তবে বিশেষ আশান্বিত হইনি। কারণ প্রায়ই দেখা গিয়েছে, যে-সব লোক নাট্যকলার

অ আ-ক খ জানেনা, তারাও অর্ধপণ্ডিত রঙ্গালয়ের উন্নতির জন্যে বিস্তর বাক্য বমুক ছুঁড়ে বাজার সরগরম ক'রে তোলে।

এখন যেখানে বিডন ষ্ট্রীটের ডাকঘর, তখন সেখানে টিম্ টিম্ ক'রে জলত প্রেসিডেন্সি থিয়েটারের পাদপ্রদীপের আলো এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাও গেল নিবে। তারপরেই বিজ্ঞাপনে দেখলুম কিংবা লোক মুখে শুনলুম, সেই মঞ্চেই খোলা হবে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় "রয়েল রিফর্মড থিয়েটার!" এই গালভরা জমকালো নামকরণের মধ্যে যেন সুরুচির অভাব অনুভব করলুম। তারপরই শোনা গেল নতুন পালার চমকদার নাম—"ঘতকরাজা!" কিন্তু ঐ পর্যন্ত! পর্বতের হ'ল মূষিকপ্রসব। ফল—পতন এবং পতন। ভালো ভালো কথা বলতে অনেকেই পোক্ত, কিন্তু কথামত কাজ করা বড়ই শক্ত ব্যাপার।

সেই অন্ধকার দিনেও সরস সবুজ ফসল পেয়েছিলুম দুই-ই বার। উঁচু ঘরের নাটক লাভ করেছিলুম অনুবাদের মাধ্যমে—সেক্সপিয়ারের "ওথেলো" এবং ইবসেনের "ওয়ারিয়ার্স্ অফ হেলিগোল্যাণ্ড" বা "রাণীবন্ধন।" অনুবাদক ছিলেন যথাক্রমে দেবেন্দ্রনাথ বসু ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অভিনয় হয় তাঁর থিয়েটারে।

কেবল উঁচুদরের নাটক নয়, অভিনয়ও যে উচ্চাঙ্গের হয়েছিল সে কথা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি। "ওথেলো" মঞ্চস্থ করবার প্রচুর অর্থ ব্যয়ের ত্রুটি হয় নি—দৃশ্যপট, সাজ-পোষাক ও প্রসাধন সবই ছিল চমৎকার এবং অভিনব। ওথেলো ও ডেসডিমোনার ভূমিকায় তারক পালিত ও তারাসুন্দরী রীতিমত প্রথম শ্রেণীর শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। অপরেশচন্দ্রের "ইয়াগো"র কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি। প্রসাধককে আনা হয়েছিল সম্ভবতঃ ইংরেজী থিয়েটার থেকে, কারণ তাঁর কারুকার্য্যের ফলে তারাসুন্দরী ও অন্যান্য বাঙালী নটীদের চেহারা পর্য্যন্ত একেবারে বদলে গিয়েছিল। "রাণীবন্ধনে"র পট ও পোষাক প্রভৃতির জন্যে প্রভূত অর্থব্যয় করা হয়নি বটে, তারক পালিত (চন্দ্রাবত) ও তারাসুন্দরীর ('ধারা') নাট্য-কৃতিত্ব এ জীবনে ভুলতে পারব না। কিন্তু হায়, বাংলা থিয়েটারের তথাকথিত ভক্তরা হীরা ফেলে কাঁচ দেখে তোলে, তারা 'মনোমোহনে'র ধুমধাম দুমদাম ছেড়ে হাঁরের আসরে উঁকি মারতে চাইলে না। রুচি যেখানে বিকৃত, আর্ট সেখানে মৃত।

অবশ্য ধানীবাবু তখনও নাটকের পর নাটকে বিভিন্ন ভূমিকায় ঘন ঘন দেখা দিতে ছাড়েননি, কিন্তু সত্যকারেই বলেছি—অতীতের জাবর কেটে তাঁর দিন চলত। যশ ও শক্তির চরমে উঠে তিনি নাট্য জগতে একাধিপত্য স্থাপন করেছিলেন ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে তিনি গম্ভীর ও হাস্য রসের যে কোন ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন, তাঁর নব নব সৃষ্টি কৌশল দেখে দর্শকরা হ'ত বিস্মিত ও মোহিত। কিন্তু বাহির থেকে দেখে কেহই আন্দাজ করতে পারত না যে তিনি হচ্ছেন অনেকটা পুতলোবাজীর পুতুলের মত, আড়ালে অদৃশ্য বাজীকরের নির্দেশে নিজের কর্ত্তব্য পালন ক'রে যাচ্ছেন এবং এখানে নির্দ্দেশক ছিলেন তাঁর প্রতিভাধর পিতৃদেব স্বয়ং গিরিশচন্দ্রই। পিতৃদত্ত পাঠ তিনি তোতাপাখীর মত আবৃত্তি ক'রে যেতেন। এমনকি গিরিশচন্দ্র যখন অসুস্থ ও কলকাতায় অনুপস্থিত, তখনও ধানীবাবুকে অভিনয় দেখবার জন্যে পিতার কাছে ছুটতে হয়েছে সুদূর বেনারসে। ১৯১১ সালের পর থেকেই দেখা যায় ধানীবাবু নতুন কিছু সৃষ্টি করতে না পেরে ঘাঁটছেন খালি পুরানো কাসুন্দি। কারণ? শিক্ষাগুরু তখন পরলোকে। গিরিশচন্দ্রের "মীরকাশিম" নাট্যাভিনয়ে "সংহার! সংহার!" ব'লে চীৎকার ক'রে ধানীবাবু প্রশস্তি স্বরূপ শুনতে পেতেন ঘন ঘন করতালি ধ্বনি। সে কথা তিনি ভোলেননি। তাই বহুকাল পরেও মনোমোহন থিয়েটারের জন্যে

রচিত পালা "বঙ্গে বর্গী"র নাট্যকারকে তাঁহার পরিচয়ের মুখেও ঐ "সংহার! সংহার!" শব্দটি বসিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রেও হাততালির অভাব হয়নি। ধানীবাবু যে নাটকের চরিত্র না বুঝেও অভিনয় করতেন, এটা জানতে পারি তাঁর জীবনীকারের কাছ থেকে। গিরিশচন্দ্রের "অশোক" নাটকের নাম ভূমিকা পেয়ে ধানীবাবু নানা কারণে সেবারে আর কাশী গিয়া পিতার নিকট শিখিয়া আসিতে পারেন নাই।" তাই তিনি বলেছেন—"আমি এষ্টো করেছি বটে, কিন্তু বিশেষ বুঝে অভিনয় করি নাই। বাপীও কাশীতে অসুখ, নাটকখানিও দুর্বোধ্য আমি অত ভাল বুঝি নাই।" খুব সম্ভব সেই কারণেই মিনার্ভা থিয়েটারে পূর্ণ গৌরবের যুগেও অশোক ভূমিকায় ধানীবাবুর অভিনয়-স্মৃতি আমার মন থেকে মুছে গিয়েছে। অথচ তারও আগে কোহিনুর থিয়েটারে ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটকে অশোকের ভূমিকায় কোন দৃশ্যে ধানীবাবুর অভিনয়ের ছবি আমার মানসপটে আঁকা আছে উজ্জ্বল রেখায় এবং তারও প্রধান কারণ তখন তিনি ছিলেন গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাধীন।

বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় ভিন্ন ধরণের বিভিন্ন ধারণা—এ হচ্ছে নাট্যকলার একটা অলঙ্ঘনীয় বিধান। উপরন্তু দেখা যায়, চারজন শ্রেষ্ঠ নট যদি কোন নাটকে বিভিন্ন সময়ে একই ভূমিকায় অভিনয় করেন, তাহ'লেও তাঁদের ধারণা হবে বিভিন্ন। কিন্তু গিরিশোত্তর যুগে এ বিধান প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল।

একদিন মিনার্ভা থিয়েটারের সাজঘরে দুই স্বনামধন্য বিখ্যাত নট—মন্মথনাথ পাল ও কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী—কোন নূতন নাটকে আপন আপন ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করছিলেন এবং আমি সেখানে উপস্থিত নীরব শ্রোতার মত।

কুঞ্জলাল কিঞ্চিৎ চিন্তিত। বললেন, "নতুন পালা, নতুন পার্ট, অথচ দুদিন পরেই বই খুলবে, তৈরি হব কি ক'রে?"

হাঁদুবাবু, বললেন, "আরে, অত ভাবনা কেন? পার্টটা তো অমুক নাটকের অমুক পার্টের মত, তুমি তো আগেই করেছ! ঠিক সেই রকম ছক্ কেটে নাও!"

আমি চমৎকৃত।

পুরাতনের এই রোমন্থনের যুগেও, রূপসৃষ্টির ক্ষমতার দিক দিয়ে রীতিমত রিক্ত বাংলা নাট্যজগতে এমন একটি মানুষ দেখা দিয়েছিলেন, এখানে তাঁর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ না বললে চলবে না। তিনি হচ্ছেন স্বর্গীয় অমর সিংহ রায়—মিনার্ভা থিয়েটারের মকাধ্যক্ষ। তিনি ছিলেন একজন উচ্চ শ্রেণীর সৃজনক্ষম শিল্পী। স্বল্প আয়ু নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন, যথার্থ রূপে আত্মপ্রকাশ করবার আগেই তাঁকে চির বিদায় গ্রহণ ক'রে মঞ্চমায়া ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

সচরাচর দেখা যেত সেকালকার মঞ্চলোকের অধিকাংশ ব্যক্তিই নাট্য জগতের বাইরে এসে মেলামেশা করতে কেমন যেন সঙ্কুচিত হ'তেন—বিশেষত তাঁরা বিদ্বজ্জনদের আসরের ধার মাড়াবারও চেষ্টা করতেন না। তার আসল কারণ তাঁদের সে যোগ্যতাও ছিল না। কিন্তু অমরবাবুর শিল্পগত প্রাণ ছিল কবির মতন কল্পনা প্রবণ, তাই "ভারতী"র বৈঠকে গিয়ে প্রায়ই কবি ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসতেন। মঞ্চশিল্পে তাঁর কৃতিত্ব শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথকে পর্য্যন্ত আকৃষ্ট করেছিল এবং "মিসর কুমারী"র দৃশ্যপটের জন্যে অমরবাবু তাঁর দ্বারা প্রকাশ্যে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। অমরবাবু প্রতিভার প্রসাদে খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের প্রাচীন মিশর তার দৃশ্য ও সাজপোষাক নিয়ে আবার আমাদের বিস্মিত চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছিল। প্রায়ই দেখতুম পৌরাণিক নাটকের জন্যে সেকালের মঞ্চাধ্যক্ষরা যখন

দৃশ্য ও কুশীলবদের সাজপোষাক পরিকল্পনা করতেন, তখন স্থান-কাল-পাত্রের কোন ধারই ধারতেন না। এও বারবার দেখেছি পৌরাণিক নাটকের জন্যে যুগপট এঁকে তাকেই আবার ব্যবহার করা হয়েছে আধুনিক নাট্যাভিনয়ে। কিন্তু এ-সব দিকে অমরবাবুর দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সজাগ। সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে সেকালকার ভারতীয় রাজা ও অন্যান্য লোকজনদের জন্যে তিনিই প্রথম আবরা-জোবরা ফেলে যথাযথ পোষাক ব্যবস্থা করেন ("লক্ষ্মণ সেন" নাটকে)। "মিসর কুমারী" ও "কিন্নরী" প্রভৃতি নাটকের অসাধারণ সফলতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল তাঁরই হাতের কাজ। শিশির কুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে তাঁর মতন রূপশিল্পীর মিলন হ'লে আমরা নিশ্চয়ই মণিকাঞ্চন সংযোগের মত একটা কিছু দেখতে পেতুম। অমরবাবু যথার্থরূপে আত্মপ্রকাশ করবার আগেই পরকালের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁর অভাব আজও পূর্ণ হয়নি।

গিরিশোত্তর যুগের অন্ধকার নিয়ে যথেষ্ট বাক্যব্যয় করা গেল। তখনও আসন্নপ্রায় নবযুগ যে সেই তিমিরাবগুণ্ঠন তুলে পরিপূর্ণ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করবে, এ স্বপ্ন কারুর চোখেই জেগে ওঠে নি। শিশির কুমারের খ্যাতি তখনও ছাত্রমহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং তিনি নিজেও কল্পনা করতে পারেন নি যে সাধারণ রঙ্গালয়ের পক্ষ থেকে অদূর ভবিষ্যতেই লাভ করবেন সাদর আমন্ত্রণ। অথচ এই অন্ধকারের দিনেই আমরা অভাবিতরূপে পেয়েছিলুম এক বিস্ময়কর ও সমুজ্জ্বল আলোকদূতের সন্ধান। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিধির মধ্যে তা সম্ভবপর হয়নি। আসছে বারে সে কথা বলব।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

গিরিশবাবু বলিলেন,—"বাবাজি, নাটক লিখিতে যখন চেষ্টা করিতেছ, তখন এখন হইতে সতর্ক হও। নাটক লেখা কঠিন, সংসার ও লোক-চরিত্রের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টির আবশ্যক। তুমি আপনিই বলিলে, মাতার বিলাপ ও পিতার বিলাপ একইরূপ হইয়াছে, কিন্তু উভয়ের বিলাপ সম্পূর্ণ পৃথক হওয়া চাই। পুত্র শোকে মা যেরূপ ভাষায় কাঁদে, পিতা সেরূপ ভাষায় কাঁদে না। শোক উভয়েরই, কিন্তু প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গী স্বতন্ত্র। নাটক সংসারেরই অনুকরণ, ইহা নাট্যকারের সতত স্মরণ রাখা উচিত।"

॥ প্রত্যাখ্যান ॥

শেষপর্যন্ত নাচতেই হোল ছেড়ে।

ইদানিং কোমর মোটা হ'য়ে যাওয়াতে নাচ একরকম ছেড়েই দিয়েছিল বুলবুল। নেহাৎ নিজেদের ঘরোয়া উৎসবে আত্মীয় বন্ধুদের অনুরোধে যেটুকু, বাইরের আসরে আর নামত না। শরীর ভারী হয়ে যাচ্ছে দেখে বছর খানেক বহু চেষ্টা, নানান ওষুধ বিষুধ, ব্যায়াম, বই দেখে দেখে যোগ সাধনা, কোন কিছুই কাজে আসেনি, শেষপর্যন্ত মনে বহু দুঃখ নিয়েই নাচটা ছাড়তে হয়েছে তাকে। নাচে সে যেহ-মনে অফুরন্ত আনন্দ উপলব্ধি করত সেও গেছে। সেই কবে—জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই, (তা, ধরতে গেলে ত তাই, পাঁচ বছর একটা বয়স নাকি), সুরু, আজ উনিশেই সব সারা। ভাবতে গেলে মন বড় খারাপ হয়ে যায় বুলবুলের। তবু, এত জোরের জিনিস নয়, মনকে এই বলেই সান্ত্বনা দেয় সে।

সুতরাং মুকুলসেনের এই প্রস্তাব অপ্রত্যাশিত নয়। যদিও আজ বছর খানেক যে বাইরের আসরে নাচা বন্ধ করেছে তবু সবাই যেন ইচ্ছে করেই তা ভুলে থাকতে চায়। এই একবছরে সে কত জায়গায় কতজনকে কত ছুতোনাতায় আপত্তি জানাতে হয়েছে তার ঠিক নেই। আশ্চর্য, তারা কি তাকে দেখেও বুঝতে পারে না? অগত্যা অনেক বাজে কথা বলেই রেহাই পেতে হয়। রেহাই কিন্তু বুলবুল নিজের কাছ থেকে পায় না। এ যাবৎ এই মফঃস্বল শহরের প্রতিটি কাগজে প্রতিটি জলসায় নেচে সে অনাথা প্রপংসায় ধন্য হয়ে আছে। বাইরের প্রতিযোগিতা মূলক নাচেও সে সর্বপ্রথম হ'য়ে সোনার মেডেল নিয়ে এসেছে, মুখ উজ্জ্বল করে এসেছে এ সহরের। নিজে ধন্য হ'য়েছে সবাইকে ধন্য করেছে। এ সব কথা মনে হয়, ইচ্ছে হয়, এ শরীর নিয়েই সে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারে এখনও। রাজী হবে নাকি? শেষপর্যন্ত অবশ্য রাজী হয় না। লজ্জা হয়।

ইতিমধ্যে সারস্বত সম্মেলন হয়ে গেছে কয়েকটা ক্লাবে, জানাশোনা কয়েকটা প্রতিষ্ঠানে। ছোটখাট জলসা হয়ে থাকে এ সব সম্মেলনে। এমনও গেছে একই দিনে হয়ত সন্ধ্যেয় এ অনুষ্ঠানে নেচে, রাতে আবার পাড়ার জলসাতে নাচতে হয়েছে। বিরক্ত বোধ করেনি, ক্লান্ত বোধ করেনি। আনন্দে নেচে এসেছে সে।

অথচ এবার, মাত্র দুটো জায়গা থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছিল।

বড় আঘাত পেয়েছিল সত্য, তবু কিছুটা যেন স্বস্তিও। অনেক জবাবদিহির থেকে যেন শান্তি। সূক্ষ্ম একটা কাঁটা অবশ্য খচখচ করে, কাঁটা তুলতে গেলে আরো ব্যথা লাগে, সহর তাকে ভুলে যাচ্ছে, সর্বাগ্রে তার নাম এখন সবার মনে পড়ে না, ডাক্তার লাহিড়ীর ছোট মেয়ে স্বপ্না লাহিড়ী মাতিয়ে রেখেছে এ বছরটা, চমৎকার নাকি নাচে। তার থেকেও নাকি অনেক সুন্দর চেহারা।

চেলারা তার নেই ঠিকই। দাদামাটা। তবু নাচের কিগারটা ছিল। সেও তপবান প্রস্তুত নয়, নিজে ঘরে মেজে তৈরী করে নেওয়া। এবার তার থেকেও নিষ্কৃতি পেয়ে গেছে, আর কি, এখন ঘরে বসে সময় কাটানো। মেজদা যেখেতনে এক গানের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন, সপ্তাহে পাঁচদিন তাই শিখতে যায় বুলবুল। কিন্তু যেন জোর করে। সে উৎসাহ নেই, সে উদ্যম হারিয়েছে। বাড়ীর সবাই

প্রেরণা দেয় তার মধ্যে নাকি শিল্পী ঘুমিয়ে আছে, নাচের ঘুঙুর দিয়ে জাগাতে চাইলে সে চারিদিক কলমল করেই জেগে উঠবে। ওসব কথায় মন দিতে ইচ্ছে যায় না। আফসোস হয়। নাচগান বাদ দিয়ে শুধু লেখাপড়াটা নিয়ে থাকলেই হোত। বন্ধুরা সব কলেজে যায়, কেউ কেউ কলেজ পার হয়ে কলকাতার ইউনিভার্সিটিতেও ঢুকেছে. অনেকে শ্বশুর ঘর করছে, তারই কেবল……।

কিন্তু মুকুল সেনের ব্যাপারটা কি? বাইরের ঘর থেকে মেজদা ডাকছে জোরে জোরে। সাড়া দিয়েছে কিন্তু পা যেন সরছে না, গেলেই একটা কথা কাটাকাটি! তবু যেতেই হয়, বসতেই হয় মুখোমুখি। মেজদার সেই অবুঝের মত কথা—"এত করে বলছেন, তোর আপত্তি করা উচিত নয়।" মুকুল সেন হেসে বলল "গোড়া থেকে বলুন সন্ধ্যা, আচ্ছা আমিই বলছি "

তারপর বুলবুলের চোখের দিকে তাকিয়ে আবার হাসল"—সত্যি, অনেক আশা করে এসেছি একেবারে নিরাশ করবেন না। আমাদের কলেজের 'সোস্যাল'। অপিনি…"

আশ্চর্য মুকুল সেন কি ভুলে গেছে দু'বছর আগের ঘটনাটা? নইলে এত সহজ স্বাভাবিক ভাবে মুখোমুখী বসে কথা বলছে কি করে? বুলবুল কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মুকুল সেনের মাইনাস ফাইভের নীচে দুটো জলজলে চোখের দিকে তাকিয়ে বিব্রত বোধ হোল তার। চেষ্টা করে চোখে চোখ তুলে রাখল। কথাটা শেষ করতে দিতে চাইল। হঠাৎ সন্তোষ বাবু বলে উঠলেন"—কে কে আসছেন মুকুল তোমাদের সোস্যালে"।

—"এবার আর বাইরের কেউ নয়, এই আমরা, আমরাই।" বুলবুলের দিকে তাকিয়ে আগের কথা শেষ করল মুকুল "—আপনি দয়া করে যদি আমাদের ফাংসনে নাচেন—" তারপর হঠাৎ বলে উঠল "—সন্ধ্যা ত খুবই রাজী। শুধু আপনি যদি রাজী হন।"

সন্ধ্যা যে রাজী সে কথা কি বুলবুলের অজানা। কোথায় বোনের হয়ে দাদা জনোচিত দু'একটা ভারী কথা বলে আপত্তি করবে তা না, মেজদা সবসময়ে বিপক্ষ দলে যোগ দিয়ে দল ভারী করে। তারা যদি দু'বার অনুরোধ করে মেজদা চারবার বলবে তাদের অনুরোধ রাখতে। সুতরাং মেজদার মতামতটার কোন দাম দেয় না সে। বরং মাঝে মাঝে অসহ্য বোধ হলে ধমকেই মুখ বন্ধ করে দেয়।

যা হবার নয়, সে কথা স্পষ্টাস্পষ্টি বলতেই ভালবাসে বুলবুল। সৌজন্যসুলভ হাসি ফুটিয়ে বলল "—নাচ ত আমি ছেড়ে দিয়েছি। আজকাল আর নাচি না।"

অনুরোধে কোমল শোনাল মুকুল সেনের গলা "—সে শুনেছি। তবু…"

"আমায় মাপ করবেন।" বুলবুল উঠতে চাইল। যেন মরিয়া হয়েই একটা প্রমাণ পেশ করতে চাইল মুকুল সেন "—কেন, শ্যামলের বোনের বিয়ের বাসরে ত নেচেছিলেন সেদিন…"

মেজদাও স্বভাব অনুযায়ী ফোড়ন কাটল"—এত করে বলছে, রাজী হয়ে যা না।" আশান্বিত চোখে মিনতি করল মুকুল সেন "—সত্যি—"

আর এটুকুতেই মেজাজ হারিয়ে ফেলল বুলবুল। রাগে ফেটে পড়ল যেন। আসলে বহুদিনের পুঞ্জীভূত রাগ, একটু সামান্য ছুতোতেই বেরিয়ে পড়ল। মেজদার দিকে তাকিয়ে গলা তুলে বলল "—নাচব আমি আর মজাটা কি তোমাদের?" হঠাৎ খেয়াল হ'তে টপ করে ঘাড়ে নামিয়ে ফেলল গলা। মুকুল সেনের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল "—দেখুন, যা হবার নয় তা নিয়ে কথা কাটাকাটি করে ত লাভ নেই, আমায় মাপ করবেন।" উঠে দরজার দিকে পা বাড়াল। খুব সময়ে রাগটা চেপে যেতে পেরেছে ভাগ্যিস।

কেমন অসহায় কণ্ঠে বলে উঠল মুকুল সেন "—কিন্তু প্রোগ্রামে যে আপনার নাম ছাপা হয়ে গেছে।"

"সে কি? দেখি?" বুলবুল যেন হতভম্ব হ'য়ে তাকাল। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তার।

পকেট থেকে একটা কাগজ বের ক'রে টেবিলের উপর রাখল মুকুল সেন। মেজদা সাগ্রহে কাগজটা নিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরেছে। ভ্রু কুঁচকে বুলবুলও মেজদার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে চোখ বোলাতে লাগল। অস্ফুটে বলল "—কি অপরিসীম ধৃষ্টতা।" মেজদা খুব খুশী। তবু যেন কত মুস্কিলে পড়েছে এমনি মুখ ক'রে বলল "—অগত্যা, কি আর করবি।"

মুখ থমথমে হ'য়ে উঠেছে বুলবুলের। আবার এসে পূর্বের জায়গায় বসে মুকুল সেনের দিকে কাগজটা বাড়িয়ে ধরল। গম্ভীর গলায় বলল "—এ সবের মানে কি?" সেকেণ্ড খানেক চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল মুকুল। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল "—কৌশল। ইংরাজীতে যাকে বলে ট্যাক্‌টিক্স।"

ঠোঁট কামড়ে ধরেছে বুলবুল, শরীর ঘিরে যেন আগুন বেরোচ্ছে তার। কি করবে, একটা চড় কষিয়ে দেবে গালে? সেদিনের ইচ্ছেটা আজই পূরণ ক'রে ফেলবে? কিন্তু না, স্থান কাল পাত্র বিশেষে নিজেকে পরিচালিত করার ক্ষমতা তার আছে। মেজদা হেসে বলছেন "—কি রকম?" যেন গল্প জমাতে বসল মুকুল সেন "—একটা বাজির ব্যাপার সন্ধ্যা। অরুণ, বিনয়, শ্যামল ওরা বলছে কিছুতেই মিস্ চৌধুরীকে আনা যাবে না কাংসনে, তারা নাকি এর আগে দুবার চেষ্টা ক'রে দেখেছে, আমারও জেদ চেপে গেল কেমন। বললাম তোমরা ব্যবস্থা কর, মিস্ চৌধুরীর নাচ হবেই। তারপর আর কি, কথা কাটাকাটি হ'তে বেটাবেটি হ'য়ে গেল। মাথা ঘামিয়ে শেষপর্যন্ত কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছে। দয়া করে আমার মানটা রাখুন মিস্ চৌধুরী।"

রাগ, বিস্ময় এখন আর নেই। একটা কি যেন চিন্তায় আচ্ছন্ন হ'য়ে রইল খানিকক্ষণ বুলবুল! মুকুল সেনের চোখের ব্যগ্রতায় কথায় আগ্রহতায় কি যেন খুঁজে দেখল। এক সময় মেজদার দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে কাগজটা চাইল। এক সেকেণ্ড তাকিয়ে সহজসুরে প্রশ্ন করল "—শো ত দেখি সাড়ে ছটায় আরম্ভ হচ্ছে। আমার নাচ কখন, ছটায়?"

কৃতজ্ঞতায় যেন নুয়ে পড়ল মুকুল সেন। ব্যগ্র গলায় বলল "—আপনাকে কি ব'লে যে ধন্যবাদ দেব,…আপনার ইচ্ছে মতই আপনার নাচ দেওয়া হবে, আগে চাইলে আগে, পরে চাইলে পরে।' তারপর আধখোলা স্যাণ্ডেল পায়ে গলিয়ে উঠে দাঁড়াল "—আমি চলি সন্ধ্যা। চলি মিস্ চৌধুরী"।

সন্তোষবাবু হাঁ হাঁ ক'রে উঠলেন "—আরে, একটু চা খেয়ে যাও। বুলবুল যা না, চা নিয়ে আয়।"

মুকুল সেন বাধা দিল "—না, না, আজ নয়, আরেকদিন হবে। আজ ভীষণ ব্যস্ত।" তারপর বুলবুলের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল "—কাল তাহোলে আমরা ছটায় আসব আপনাকে নিতে। রেডি থাকবেন।"

বুলবুলও হেসে বলল "—কত টাকা বাজি আপনাদের?"

"ও কথা ব'লে আর লজ্জা দেবেন না।" বারান্দা পেরিয়ে রাস্তায় নামল মুকুল সেন।

এই অভ্যন্তর সহরটায় নাচিয়ে বলতে যেমন বুলবুল চৌধুরী, গাইয়ে বলতে তেমনি মুকুল সেন। স্থানীয় কলেজে বি, এস, সি পড়ছে। বলতে গেলে তাদের পরিবারটাই সঙ্গীত সাধক। বাপ, বড় ভাই, ছোট বোন, আর মুকুল সেন।

বহু অনুরাগী ভক্ত জুটেছে মুকুলের। মুকুলের গানে পাগল সবাই। সত্যি অপূর্ব গান গায় ছেলেটি।

এত চমৎকার গলা, এখানে আর কারো নেই। ওর বাবা ওস্তাদ বাহিনে। বড়রা শাস্ত্রিনিকেতন থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত, আর মুকুল আর বকুল আধুনিক গানে ঝুকেছে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই ওদের বাড়ীতে আসর বসে। বাইরে থেকে বড় বড় গাইয়ে বাজিয়েরা এসে ও বাড়ীতেই আশ্রয় নেয়। সুরলক্ষ্মী যেন বাঁধা পড়েছে ওদের বাড়ীতে। মুকুলের বোন বকুলের সাথে একসাথে একক্লাসে পড়েছিল বুলবুল। সে সময় দু-একবার ওদের বাড়ী গেছে। কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হোত ওদের সংসারটা। বাইরের ঘরটায় যত রাজ্যের বাদ্যযন্ত্র তবলা, বকুলের বাবা সীতেশ্বরবাবুকে ধ্যানী সন্ন্যাসীর মত বসে থাকতে দেখে সে ঘরে। এক কোণে ছোট তেপায়ার ওপর ধূপদান, ঘরটায় ঢুকলে মনটা যেন মন্দিরে ঢোকার মুহূর্ত বলে মনে হোত। একদিন হঠাৎ গিয়ে পড়েছিল বুলবুল। পর্দার আড়াল থেকে দেখেছে সেতার হাতে নিয়ে বসে আছেন সীতেশ্বরবাবু। বকুল, ওদের বড়দা প্রতুল মাথা নীচু ক'রে বসে আছে সামনে। সুর সাধনা হচ্ছে। বকুলের মা তাই বলেছিলেন তাকে। নিঃশব্দে ফিরে এসেছিল বুলবুল। এমন দৃশ্যটা সে আর দেখেনি। মুকুল সেনের সাথে ব্যক্তিগত আলাপ তার ছিল না। তবে একই অনুষ্ঠানে নাচিয়ে গাইয়েদের মধ্যে যতটুকু আলাপ, সেটুকু ছিল।

গতবারের আগেরবার স্থানীয় টাউন ক্লাবে একটা চ্যারিটি শো উপলক্ষে তার নাচের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। বাইরে থেকে ওরা বড় বড় বাজিয়ে গাইয়ে নিয়ে এসেছিল, স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে নাচে ছিল সে আর গানে মুকুল সেন। সারারাত্রি ধরে অনুষ্ঠান। শুরুই রাত দশটায়। অত রাতে মা আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন মেজদা বাড়ীতে নেই, একা তিনি বাইরের ছেলেদের সাথে পাঠাতে পারবেন না। অনুষ্ঠানের কর্মকর্তা ছিলেন মেজদার বন্ধু অমিয়দা। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন প্রথম দিকেই তার নাচ দিয়ে দেবেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পরই। অনেক ক'রে মাকে রাজী করিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সঙ্গে নেই ত কি হয়েছে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি নিবিঘ্নে রাত সাড়ে এগারটার মধ্যে পৌঁছে দিয়ে যাব। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

পীড়াপীড়িতে অগত্যা মা রাজী হয়েছিলেন। প্রথমে কিছু ছোটখাট বক্তৃতা। তারপর উদ্বোধন সঙ্গীত। সময় বুঝে বুলবুল তার ড্রেস ঠিক ক'রে প্রস্তুত হয়ে আছে।

তার নাচের শিক্ষক ও বাদকদারা এক কোণে বসে ঠিকঠাক হচ্ছে। এখন পরদা উঠলেই হয়।

কিন্তু কোথা থেকে যেন কি হ'য়ে গেল। হঠাৎ পাঁচটি ছেলে জোর করে মুকুল সেনকে স্টেজের মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে গেল। জোর ক'রে উঠতে গেল মুকুল, কি যেন হড়বড় ক'রে বলতে লাগল, রাগারাগি, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না বুলবুল। এদিকে রাত প্রায় এগারোটা। অস্থির হ'য়ে উঠেছিল সে। স্টেজের ভেতরে একটা হট্টগোল, গণ্ডগোল।

দর্শকদের মধ্যেও গণ্ডগোল সুরু হয়ে গেছে। মুকুল সেনের গানের পর তার নাচ গেলে ত রাত দেড়টা দুটো বেজে যাবে। ভেতরে ভেতরে রাগ হচ্ছিল তার প্রচণ্ড। অমিয়দাকেও দেখা যাচ্ছে না। এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল বুলবুল। কাকে বলবে সে তারটা আগে হ'য়ে যাওয়ার কথা। সবত মুকুল সেনকেই সাধা-সাধনা করতে ব্যস্ত। আশ্চর্য, কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না এরা। অমিয়দারই বা কেমন আক্কেল-জ্ঞান। মাকে বলে এসেছেন সাড়ে এগারোটার মধ্যে বাড়ী পৌঁছে দেবেন বুলবুলকে। এগারোটাত এখনই বাজে। ক্ষোভে রাগে চঞ্চল হ'য়ে উঠল বুলবুল। হঠাৎ অমিয়দার গলা শোনা গেল "কোথায়? কোথায় মুকুল?"

বুলবুল চেঁচিয়ে ডাকল 'অমিয়দা'।

অমিয়দা হাত নেড়ে বাস্ত গলায় বললেন "শুনছি", তারপর মুকুলের হাত ধরে কি যেন মিনতি করলেন, আবার একচোট বসলো। এমন সময় পর্দা উঠে গেল। মুকুল সেন হারমোনিয়মে সুর তুলল। একটা শেষ হতে না হোতেই আরেকটা, আরেকটা। পরপর চারটা গান ক'রে উঠল মুকুল সেন। শেষের গান দুটো আর ধৈর্য ধরে শুনতে পারেনি বুলবুল। ভেতরে ভেতরে অপমানে বিদ্ধ হচ্ছিল সে। মুকুল সেনই যখন সব, তাকে ভবে কথা দিয়ে ডেকে এনে এমন তুচ্ছ করা কেন? তাচ্ছিলাই ত, তা'ছাড়া কি? মুকুল সেনের গানেই পাগল সব। সময় কি বসে আছে; ইস্ কত রাত হ'য়ে গেল। অমিয়দার কি একটু দায়িত্ব বোধ নেই? এক সময় গ্রীনরুমে ঢুকে পোষাক ছেড়ে আটাচিতে ভরে নিল বুলবুল। একপলক চাইল এদিকে। সব যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। পেছনের দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো। একটা তুচ্ছ অন্তর্জ্বালায় জ্বলছিল সে।

বাইরে এসে কিন্তু কেমন ভয় ভয় করতে লাগল তার। যদিও টাউন হলটা ভেতর-বার আগাগোড়া আলো দিয়ে সাজিয়েছে আজ, তবু নিস্তব্ধ ফাঁকা, নির্জন রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে জমজম হ'য়ে এলো তার। এ কি পাগলামি করছে সে? একা কি ক'রে সে এই গভীর রাতে বাড়ী ফিরে যাবে? না, ওদেরই কাউকে বাড়ী পৌঁছে দিতে বলবে, নয়ত তার নাচের মাষ্টার মশাইকেই বলবে। কিছুতেই আজ আর নাচবে না সে। ভয়ে, রাগে, দুঃখে চোখ ফেটে জল আসতে চাইল বুলবুলের। স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে কিরবে কি কিরবে না ভাবছে এমন সময় হৈ চৈ। হঠাৎ মুকুল সেনের গলা "—এই যে এখানে মিস্ চৌধুরী। অমিয়দা, এখানে।"

দৌড়ে কাছে এসে বলল—কি ব্যাপার আপনার নাচ এখন, আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। ওদিকে খোঁজাখুজি, অমিয়দা ত পাগলের মত হয়ে উঠেছেন। চলুন চলুন।" তিন চারটে ছেলের সাথে অমিয়দার গলাও কাছে এসে পড়েছে। ঠাস ক'রে একটা চড় কষিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেটাকে প্রাণপণে রোধ করল বুলবুল। সমার উপর থেকে রাগটা সরে গিয়ে সম্পূর্ণ ক্রোধটা মুকুল সেনের উপর পড়ল। কিছু বোধ হয় উর্ধাও। সে মুহূর্তে মুকুল সেনের কথাগুলোকে যেন সঙ্গ দেবে জুতো ধানের মত মনে হয়েছিল। পরে অবশ্য চিন্তা করে বুলবুল নিজের রাগে নিজেই হেসেছে। সত্যি ত মুকুল সেনের কি দোষ? দলের ছেলেদের সাথে কি নিয়ে মতবিরোধ হওয়ায় ঝগড়াঝাটি ক'রে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ছেলেরা জোর ক'রে তাই আসরে বসিয়ে একটা সমাধানের চেষ্টা করেছিল, দোষ ত ওদেরও নয়। অমনি ভাবে জোর করে বসিয়ে না দিলে মুকুল সেনকে আর কিছুতেই ধ'রে রাখা যেত না, এটাও ঠিক। আর সে ত প্রত্যাখ্যানই করল, অত কথা কাটাকাটি, গান গাওয়ার পরে ত বেশ স্বাভাবিকই মনে হোল। তার অবশ্য তখন ওসব লক্ষ্য করার কথা নয়, পরে ভেবেছে। অমিয়দা অনেক অনুনয় বিনয় করলেন, অন্যান্য কর্মকর্তারা অনেক অনুরোধ করল; মুকুল সেন সব শুনে ওদের ধিক্কার দিলেন, "ছি, ছি, সত্যিই ত। কথা দিয়ে নিয়ে এসেছ, কেন এ ভুল করলে?" তারপর হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল "আমি মিনতি করছি"।

মাষ্টার মশাই মৃদু তিরস্কার করলেন, কিন্তু কিছুতেই নিজের জেদ ছাড়ল না বুলবুল। সকলের সব কথার উত্তরে শুধু বলল "আমায় বাড়ী পৌঁছে দিন। এক্ষুনি।" না নেচেই সে আসর থেকে ফিরে এসেছিল বুলবুল। কিন্তু তারপর থেকে মুকুল সেনের উপর তার যেন একটা ক্রোধ জন্মে গেল। অনেক কসি আঁটত কি করে মুকুল সেনকে ছোট ক'রে নিজে উপরে উঠতে পারে। জনপ্রিয়তার

সে যে তার অনেক নীচে, একথা বহুই ভাবছিল প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই যেন সে ছটফটিয়ে মরছিল। কিন্তু সবই তার শেষ হোল, নাচ ছাড়তে হোল। আস্তে আস্তে ও দব কিছু কিকির প্রতিযোগ সবই মাথা থেকে গেল। শুধু যে আসরে মুকুল সেন গাইত, সে আসরে সে আর গান শুনতে যেত না। অথবা অনেকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ঝাড়খান থেকে আগে উঠে পড়ত। রাগ দমন করতে পেরেছে কিন্তু সূক্ষ্ম ঈর্ষার কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করে এখনও।

মাঝে মাঝে মুকুল সেনকে প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া ক'রে অনেক রকম জল্পনা কল্পনাও করেছে এক সময়। যেন অনেক নীচু হ'য়ে মুকুল সেন হাত জোড় করে তার কাছে এসেছে। সম্রাজ্ঞীর মত একটা আঙুল হেলনে মুকুল সেনকে তুচ্ছ করে ফিরে এসেছিল। সহরে যেন তাকে নিয়েই মাতামাতি। মুকুল সেন ডুবে গেছে। সে যেন দয়া করে মুকুল সেনকে আবার উঠবার আদেশ করছে, মুকুল সেন চেষ্টা করছে, কিন্তু সে সুর হারিয়েছে, সে গলা নেই।

কিন্তু সে সবও এখন ছেলেমানুষী বলে মনে করে আপন মনেই হেসেছে বুলবুল। সত্যিই এ রকম নিছক ছেলেমানুষী কল্পনা বছর খানেক আগেও ভাবতে ভাল লাগত? সত্যি করে মুকুল সেনের ওপর তার কোন অভিযোগই থাকতে পারে না। ও রকম আগে পরে নিয়ে অনেক অনুষ্ঠানেই মতানৈক্য ঘটে থাকে, তা নিয়ে আবার কেউ মাথা ঘামায় নাকি? বোকার মত সে নিজেই ঈর্ষা আর ক্রোধের জ্বালায় জলে নিজের মনে অশান্তির সৃষ্টি করে মরেছে।

• • • • •

কিন্তু আর অনেকদিনের ভুলে যাওয়া একটা ছেলেমানুষী ইচ্ছেকেই যেন প্রয়োগ করতে ছটফটিয়ে উঠল বুলবুল। এ ইচ্ছেও হয়ত জাগত না, তার অমত সে পরিষ্কার ভাবেই ত জানিয়ে এসেছিল। মুকুল সেনের প্রোগ্রামে তার নাম ছাপানর ধৃষ্টতাকে ক্ষমা শুনিয়ে অপমানিত করার সুযোগও ঘটে গিয়েছিল, উপরন্তু আর পাঁচজনের কাছে শুধু বাজী হারার টাকাই নয়, তার কৌশলটাকেও ধূলিসাৎ করার উপযুক্ত সুযোগ হাতে এসেছিল। একদিনের ছেলেমানুষী চিন্তাটা যে এমন হুবহু বাস্তবে মিলে যাবে এ কি সে স্বপ্নেও ভেবেছিল আজকাল। শুধু এমন ছোট প্রত্যাখ্যান দিয়ে নয়, মুকুল সেনের চোখে মুখে যে ভাবের লক্ষণ সে লক্ষ্য করেছে তাতে আরো বড় প্রত্যাখ্যান করবার সুযোগ তার আসবে। আর তাই স্থির নিশ্চয় হ'য়ে বুলবুল সবাইকে বিস্মিত করেই স্বচ্ছন্দে রাজী হ'য়ে এসেছে।

কাচ মেজেল ঠাসা আলমারীটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুলবুল তার কৃতিত্বের নিদর্শনগুলো দেখছিল আর হাসছিল আপন কৃতিত্বে।

যেন প্রাণ মন দিয়ে নাচল বুলবুল। আজকের নাচের উপরই যেন তার মান-সম্ভ্রম জীবন-প্রাণ নির্ভর করছে। অপূর্ব হোল তার নাচ। পর্দা পড়তে না পড়তেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বন্যায় যেন ভেসে গেল সে। কিন্তু যার কাছ থেকে সে সবচেয়ে বেশি উচ্ছ্বাস আশা করেছিল আশে পাশে কোথাও তাকে চোখে পড়ল না। অদ্ভুত ত। আশ্চর্যই হোল বুলবুল। এমন সাধা সাধনা ক'রে নিয়ে এল এমন নির্লিপ্ত। এ ত বুলবুলের কল্পনার সাথে মিলছে না। কেমন যেন সম্পূর্ণ উৎসবটাই তার কাছে নিরানন্দ বলে মনে হোল এ মুহূর্তে। অফুরন্ত প্রশংসাও সাড়া জাগাচ্ছে না প্রাণে। বাড়ী ফেরার জন্য ব্যস্ত হোল সে।

দাদা বৌদির সাথেই ফিরতে চাইল কিন্তু ছেলেরা কিছুতেই ছাড়ল না। অনুষ্ঠানের শেষে

শিল্পীদের ব্যবস্থা ছিল বলে জোর করে ধরে রাখল তারা বুলবুলকে। কথা কাটাকাটি আর ভালও লাগছিল না, অগত্যা থাকতেই হোল।

বাড়ী ফেরার সময় আবার মুস্কিল। এ ওকে ঠেলছে পৌঁছে দেবার জন্যে। একটি ছেলে বিরক্ত স্বরে বলল "মুকুলদা বলেছিল পৌঁছে দেবে, কাজের সময় এখন সাড়া মিলছে না" বলতে বলতেই মুকুল সেন এসে হাজির। চেঁচিয়ে বলল "হয়েছে কি তোমাদের, এত চেঁচামেচি কিসের?" সেই ছেলেটি সমান চেঁচিয়ে বলল "শিল্পীদের বাড়ী ফেরার ব্যবস্থা কি করেছ? সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।"

ছেলেটির দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে শিল্পীদের দিকে হেসে বলল মুকুল "—আপনারা আসুন। বাইরে রিক্সা দাঁড়িয়ে।"

চারটে রিক্সাতে জনা আষ্টেক শিল্পীকে বসিয়ে হঠাৎ খেয়াল হোল আরেকটা রিক্সাও প্রয়োজন। বুলবুলের দিকে তাকিয়ে বলল "আপনি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি এক্ষুনি একটা রিক্সো ডেকে আনছি।" সাইকেলে চেপে উঠে বসতে বুলবুল বাধা দিল "না, না, রিক্সো নয়, হেঁটেই যাব। এটুকু পথ আর রিক্সোর দরকার নেই। আপনি বরং পৌঁছে দিয়ে আসুন।" তবু আপত্তি তুলল মুকুল সেন "—না, না, সে কি? আপনি একটু দাঁড়ান, আমি এক্ষুনি আসছি।" বুলবুল কিছু না বলে, হাঁটতে সুরু করে। হেসে মুকুলও সাইকেলটাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে রওনা হয়। কিছুটা পথ নিঃশব্দে চলে। হঠাৎ বুলবুল বলে উঠল "—আপনাকে ত ভেতরে দেখলাম না, কোথায় ছিলেন?"

"দর্শকদের মাঝে বসে নাচ দেখছিলাম।" বুলবুল হাসে "নাচ দেখছিলেন না, টাকা গুনছিলেন।"

"টাকাই" হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এমনি স্বরে বলল "ও", একটু হাসিও শুনল বুলবুল। রাস্তাটা অন্ধকার, কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। বুলবুল আবার বলল "কত টাকা বাজী জিতলেন?" কোন উত্তর নেই দেখে আবার বলল "কি হোল? উত্তর দিচ্ছেন না যে?"

নির্লিপ্ত স্বরে মুকুল সেন বলল "কুড়ি টাকা"। এবার বুলবুল আস্তে বলল "ও"। আজ এই অন্ধকার রাস্তায় পাশাপাশি চলতে চলতে যেন কথায় পেয়েছে তাকে। নইলে সে সংযত-বাক্ মেয়ে। মোহময়ী রাত্রি তাকে যেন প্রগল্‌ভা করে তুলেছে।

আবার বলল "আসরে আপনি গাইলেন না যে?'

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে মুকুল সেন হঠাৎ বড় কাছাকাছি এসে পড়ল বুলবুলের। ফাঁকা রাস্তায় হঠাৎ কেমন বুকটা ধক্ ধক্ করে উঠল। মুকুল সেন আস্তে কানে কানে বলার মত করে বলল "মিস্ চৌধুরী"। ভয়ে গলা কেঁপে গেছে বুলবুলের 'কেন'?

"আপনি জিজ্ঞেস করলেন না আপনার নাচ কেমন দেখলুম? আমার মতামতটা জানতে আপনার ইচ্ছে হচ্ছে না? বলুন, বলুন না।" আশ্চর্য মুহূর্ত, আশের ভয় ঘুচে গিয়ে নিজের কল্পনাটাকেই যেন দিব্যচক্ষে দেখছে বুলবুল, এটা ত তার পরিকল্পনার ভেতরেই ছিল, এ ত জানা। হেসে সহজস্বরে বলল, "কেমন দেখলেন নাচ।"

নিশ্চুপ মুকুল সেন। বুলবুল বুঝছে তার এমন নির্লিপ্ত, স্বাভাবিক স্বরে আহত হয়েছে লোকটা। ভেবেছিল, বুঝি তার আবেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠবে বুলবুল। অন্ধকারেই হাসল সে। বেচারা।

বাড়ী আর দূর নয়। থেমে থেমে বলল মুকুল সেন, "একটা কথা। শুনে রাখুন। আজকের আসরে আমার গানের পর ঠিক এতটা উৎফুল্ল চিত্তে বাড়ী ফিরতে পারতেন না। সে ব্যবস্থাই করা

হয়েছিল। আপনার স্মরণ আছে কিনা জানি না বছর দুয়েক আগে টাউন হলে একটা অনুষ্ঠানে আপনার উদ্ধত চেহারা অত লোকের অত অনুরোধ, সবকিছু তুচ্ছ করে, আমার গান আগে হয়েছে বলে আমায় তাচ্ছিল্য করা স্পর্দ্ধা বলে মনে হয়েছিল আমাদের। আর তাই আমরা প্ল্যান করে ঠিক করেছিলাম আপনাকে এ আসরে আনবই। কৌশলের আশ্রয় নিলাম। মিথ্যাও। কথা ছিল আমিও গাইব। আর সবাই যখন আমার গানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে, আপনার দিকে আমরা কৃপার চোখে চাইব। সেটাই আপনার উপযুক্ত শিক্ষা হবে। সেদিনের সেই স্পর্দ্ধিত আচরণের সমুচিত শাস্তি।"

নিঃশ্বাস রোধ করে শুনে যাচ্ছিল বুলবুল। তার মত এটা তবে ওদেরও পরিকল্পনা। ওদের বিরুদ্ধে সে যা মনে করে অন্তর্জ্বালায় জ্বলেছে মুকুল সেনও তবে তার বিরুদ্ধে সেই জন্যেই অন্তর্দ্বেষে বিকৃত হয়েছে এ দু বছর? আশ্চর্য্য। রাগ নয় দুঃখ নয়। কেমন অনুভূতিশূন্য হয়ে গল্প শোনার মন নিয়ে শুনছিল বুলবুল। মুখ ফসকে তাই সে বলতে পারল "তারপর?"

জোরে হেসে উঠল মুকুল সেন। "—তারপর ত দেখতেই পাচ্ছেন। যাক্ আপনার যাত্রা এসে গেছে। সব কিছু ভুলে গিয়ে পারেন ত ক্ষমা করবেন।"

কে কাকে প্রত্যাখ্যান করে। সমস্ত কিছু কল্পনার পেছনে তার মন কি বলছিল, কি চাইছিল। প্রত্যাখ্যান ত নয়, সে ত অভিমান।

"আমায় ক্ষমা কর বলে" আকুতিতে জেগে পড়ে নয়, "পারেন ত ক্ষমা করবেন" বলে যে কাউকে যা বলা চলে, তেমনি। গলা যেন আটকে এলো বুলবুলের। দু চোখ জ্বালা করে উঠল। প্রত্যাখ্যাত ত সে নিজেই হয়েছে। করুণা করে, দয়া করে বুলবুলের আজ মান বাঁচিয়েছে মুকুল সেন।

আটকানো জল আর বাধা মানল না। এক ছুটে গেট পেরিয়ে বারান্দায় উঠতে উঠতে আটকা গলায় বলল বুলবুল "ক্ষমা করলাম মুকুল বাবু, ক্ষমা করলাম আপনাকে।"

শ্রী বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

উড্রো উইলসন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হইলেন। তাঁর অনিদ্রারোগ হওয়াতে ডাক্তারের পরামর্শ চাইলেন।

ডাক্তার বললেন,—আপনাকে রাজনৈতিক চিন্তা, যুদ্ধের চিন্তা, দেশের চিন্তা সব ছাড়তে হবে। নইলে এ রোগে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

উড্রো উইলসন হেসে বললেন—তা'হলে দেখছি ডাক্তার, আমাকে মরতেই হবে। এবং দেশের চিন্তা করে যে মৃত্যু যত শীঘ্র এগিয়ে আসে ততই ভাল।

চলতি দুনিয়া

জাহাজে বা এরোপ্লেনে ভারত থেকে লণ্ডনে যাওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, কিন্তু আরও আরামে নানা দেশের মধ্য দিয়ে, নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে যাতায়াতের জন্য এক অতি সুন্দর বিলাস-মোটরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মোটর বাসখানি লণ্ডন থেকে দিল্লী যাতায়াত করবে ("From London to Delhi by luxury coach")। এই যাত্রা চলবে ২৪ দিন ধরে। এতে ছোট্ট রান্নাঘরও থাকবে ("The coach is equipped with a stainless steel kitchen where meals can be served en route.")। বাসখানি মরুপথেও চলবে ও তার জন্য শীতাতপনিয়ন্ত্রণও করা হয়েছে। ("The air-conditioning system is claimed to be the first of its kind")। যে সব ধনী যাত্রী এই বিলাস-মোটরযানের যাত্রী হবেন তাঁদের সর্বপ্রকার সুখসুবিধার দিকে যানকোম্পানীর বিশেষ মনোযোগ আছে।

—ব্রিটেন

• • •

'যৌন আকর্ষণ' (sex appeal) বলে যে কথাটা এতদিন খুব চালু ছিল আজকাল সেটা বাতিল হয়ে পড়েছে। ("Sex appeal is out of date")। পুরুষ চিরকাল পুরুষই থাকবে। নারী শুধু তিন-দিনের জন্য আকর্ষণ করতে পারে, ("No man notices a woman's beauty after three days") অবশ্য এই আকর্ষণটা সোজা নয়, মানুষ এর জন্যে পৃথিবীর শেষ প্রান্তেও যেতে পারে ("Man will go to the ends of the earth to get it")। আর নরনারীর ভালবাসা? সে ত যে কোন একটা সাময়িকের ব্যাপার ("for one evening only")। এর জন্যে অত তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা কি? এখন পৃথিবী জুড়ে এই sex appeal এর নানা বিশ্লেষণ চলছে। মোটকথা, এখন আর কেউ মনস্তত্ত্বের দোহাই দিচ্ছে না,—পুরুষ চিরদিন পুরুষ আর নারী চিরকালের নারী, অতি সোজাসুজি ব্যাপার—এর মধ্যে জটিল তত্ত্বের স্থান কোথায়? ও সব ছেঁদো কথায় কেউ আর ভুলছে না। —সানডে পিক্‌টোরিয়াল

• • •

অতি প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ও সেগুলিকে রক্ষা করবার আগ্রহ এখন সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় যেমনটি আছে, ঠিক তেমনটি থাকুক,—আকারে ও শিক্ষা-পদ্ধতিতে। তার একখানি ইঁটও যেন কেউ স্থানচ্যুত না করে। ঠিক এই কারণে অতি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখনও ঠিক তেমনি আছে। প্রেগ্ (১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে), ক্রাকো (১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দ), ভিয়েনা (১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দ), পেকুস্ (১৩৬৭ খ্রীষ্টাব্দ), হিডেলবার্গ (১৩৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) কলোন (১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দ), আবকার্ট (১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং সত ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের বহু বিশ্ববিদ্যালয় এখনও অটুট দেহে বর্তমান। নূতন যে গুলি, তার ভাঙাচোরা চলতে পারে, কিন্তু পুরাতনগুলির নয়। এইভাবে সারা ইউরোপে রক্ষণশীলতা জেগে উঠেছে। —পোল্যাণ্ড

• • •

চীন দেশের এক অভিনেত্রী, নাম হ্যান্ ফ্যান্,—এখন জগৎ-জোড়া নাম কিনেছেন। তাঁর অভিনয় চাতুর্য্য দেখে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির বিজ্ঞ সমালোচকেরা শুধু বিস্মিত হন নি, স্তম্ভিতও হয়েছেন। এত মর্ম্মস্পর্শী অভিনয় যে মানুষ করতে পারে এ ধারণা পূর্ব্বে তাঁদের ছিল না। তাঁর চেহারার বৈশিষ্ট্য হলিউড তোলপাড় করে তুলেছে আর কোন কোন জায়গায় সেটা রীতিমত মারাত্মক হয়ে উঠেছে। ("Her delicate, slant-eyed beauty has taken Hollywood by storm, is reported to have played havoc in certain quarters.") প্রাচ্য দেশবাসী যে পাশ্চাত্ত্য দেশে এভাবে অভিনয়কলার চরমোৎকর্ষ দেখাতে পারে, একথা আগে কেউ ভাবতেই পারতো না। চীনদেশে প্রাচীনকাল থেকেই অভিনয়ের শিল্পকলা ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করেছে। আজ আমরা যা দেখাই সেটা সেই প্রাচীন আদর্শ-ধারারই এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। —কেসিনা

• • •

স্বাস্থ্যরক্ষার মূলমন্ত্র কি, এই ব্যাপার নিয়ে নানা দেশে অনেক মনীষী গবেষণা করছেন। সকলেরই এখন ধারণা জন্মেছে যে ঔষধপত্র শুধু রোগ নিরাময় করবার উপায় মাত্র, কিন্তু রোগ প্রতিরোধের শক্তি আছে প্রকৃতির মধ্যে। আধুনিক জগতের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, ডাঃ পেপিয়ারকোস্‌কি বলেন—স্বাভাবিকভাবে ধাতুমিশ্রিত ঝরণার জলই সর্বরোগের শ্রেষ্ঠ নিরাময়কারী। ("I feel entitled to state that almost all chronic diseases can be cured with the help of mineral waters.") পূর্বে নানাদেশে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল এবং লোকে শুধু এই ধাতুমিশ্রিত ঝরণার জল পান করবার জন্যে বহু কষ্ট স্বীকার করেও দূর দেশে যাতায়াত করত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সর্বত্রই এই ঝরণাসমূহের অস্তিত্ব আছে, আর এখনও লোকে শুধু ঐ জল খেয়েই বহু ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি লাভ করে।

—পোল্যাণ্ড

• • •

ফটোগ্রাফিক শিল্প চিত্রাঙ্কনশিল্পকে আর অগ্রসর হতে দিচ্ছে না,—এই অভিযোগ আজকাল শোনা যাচ্ছে। আগেকার যুগের চিত্রশিল্পীরা যে বিপুল পরিশ্রমে সার্থক চিত্রসৃষ্টি করতেন, আজকাল আর তার আবশ্যক হয় না,—কেননা যখন ফটোগ্রাফের প্রচলন হয় নি তখন চিত্রাঙ্কনই শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যা হিসাবে গণ্য হোত। ফটোগ্রাফের খুব অপূর্ব পরিণতি লাভ করেছে ছায়াচিত্রের মাধ্যমে। বিশেষতঃ নারী সৌন্দর্য্য খুঁজতে লোকে আর মোনালিসা, জেনাস, বিয়েট্রিচের ছবি দেখতে যায় না। এখন যে কোন মাসিক বা সাময়িক পত্রিকার মলাটে অপরূপ ভঙ্গিমায় একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীর রূপ দেখতে পাওয়া যায়। কেন চিত্র-শিল্প আর সমাদর পাচ্ছে না, তার কারণ,—"Perhaps because the film has duplicated and made feminine beauty commonplace. The charming faces of actresses smile at us from every magazine cover." একটা নারীর ছবি চাই মাসিকের প্রচ্ছদপটে। "A portrait, nevertheless. Most often of a woman. Very often of a beautiful woman. And preferably of an actress."

—পোল্যাণ্ড

• • •

জগৎবিখ্যাত শিল্পী রেমব্রাণ্ডএর "Man on horseback" ছবিটি সম্প্রতি তিন লক্ষ পাউণ্ডে ব্রিটেন ক্রয় করেছে। এ ছবি ট্রাফালগার স্কোয়ারে ন্যাশনাল গ্যালারিতে রাখা হবে। এর পূর্বাধিকারিণী ছিলেন

দেওয়া আছে। রুবেনের "Adoration of the Magi" ছবিখানিও পৌনে তিন লক্ষ পাউণ্ডে কেনা হয়েছে, আর র‍্যাফেলের এ্যালবা ম্যাডোনা ছবিখানি তিন লক্ষ পাউণ্ডে। রেমব্রাণ্ড-এর ছবিখানি কেনবার পর কর্তৃপক্ষগণ আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন। তিন লক্ষ পাউণ্ড দামটা বলতে গেলে সস্তা বৈকি! "It is a fantastic bargain. It should have sold for at least £500000." প্রাচীন শিল্পের প্রতি ব্রিটেনের এই অনুরাগ অন্যান্য দেশের ঈর্ষার সৃষ্টি করেছে।　　—লিঙ্ক

• • •

সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর আবহাওয়ার যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে এটা প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকই স্বীকার করে থাকেন। ১৯৫৯ সালে সূর্যের অগ্নিশিখার যে প্রাবল্য ঘটে তার ফলে নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক বিপ্লব পৃথিবীতে দেখা দেয়—

মার্চ :—ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে আকস্মিক জলপ্লাবন। এই জলপ্লাবনে বহু সহর সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়।

সেপ্টেম্বর :—জাপানে ভয়াবহ ঝড়। এই ঝড়ের প্রাণহানি যে কত হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। ৩১ খানি জাহাজ এই ঝড়ে ডুবে যায়।

ডিসেম্বর :—আটলান্টিক সমুদ্রে ৮০ মাইল গতিসম্পন্ন প্রবল ঝড়। সমুদ্রের ঢেউ ৬৫ ফুট উঁচু হয়েছিল। প্রকাণ্ড জাহাজ Queen Elizabeth এ ঝড়ে বিপর্যস্ত ও ভয়াবহ হয়ে গিয়েছিল ও অনেকগুলি যাত্রী আহত হয়েছিলেন।

জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক ক্রাট্ বলেন, পৃথিবীর যত কিছু প্রাকৃতিক বিপ্লব, সবই সূর্যের জন্যে।

—সোভিয়েট ইউনিয়ন

• • •

দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি। স্বামী যদি স্ত্রীকে অকারণে সন্দেহ করেন বা স্ত্রী যদি স্বামীকে একনিষ্ঠ বলে না ভাবেন, তা' হলে যে সাংসারিক বিশৃঙ্খলতা ঘটে তা থেকে অব্যাহতি পাওয়া শক্ত। আর একটি কথা দম্পতির সর্বদা মনে রাখতে হবে,—পরস্পর যেন পরস্পরের প্রতি "loyal" থাকেন। সেটা অবশ্য প্রকাশ পাবে উভয়ের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। "This disloyalty is equally manifested by wives who discuss their husbands behind their backs; by husbands who mourn to other women how much they are misunderstood." অন্য সুসভ্য দেশের কথা যদি দিলেও এক ব্রিটেনে প্রতি বৎসর পঁচিশ হাজার দম্পতির জীবন ব্যর্থ হয়েছে। "In the British Isles over 25000 marriages end in needless heartbreak every year."

—উওম্যানস্ ওন্

• • •

আগ্রহ, চেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকলে কি অসাধ্যসাধন করা যায় জার্মানীতে তার পরিচয় পাওয়া গেছে কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে। সেখানে কৃষকেরাও বড় বড় বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠেছেন, "Farmers become scientists." কৃষিকার্য ছাড়াও তাঁরা বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধানে জীবনপাত করেছেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্রে যোগদান করেছেন। এইজন্যে জার্মানী যাতে আবার বিজ্ঞানচর্চায় অগ্রণী হতে পারে সেজন্য তাঁদের চেষ্টার অন্ত নেই। তাঁরা নিজেরাই এক একটা গবেষণাগার স্থাপন করেছেন আর অধ্যাপকদের বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা শোনবার পর তাঁরা গবেষণাগারে গিয়ে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন, "After listening to the lectures the newly acquired knowledge is being implemented by experiments in the laboratories."　　—নিউজ

অমৃত কথা ও কাহিনী

যীশু খ্রীষ্টের কথা—

"—একজন শিষ্য যীশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সদ্‌গুরু, অনন্ত জীবনের অধিকারী হবার জন্য আমি কি করব? যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমাকে সৎ বলছ কেন? একজন ব্যতীত সৎ আর কেউ নেই। তিনি ঈশ্বর। তাঁর আদেশ, নরহত্যা করো না। ব্যভিচার করো না। চুরি করো না। মিথ্যা সাক্ষী দিও না। প্রবঞ্চনা করো না। তোমার পিতামাতাকে সমাদর করো। সে ব্যক্তি বলিলেন, হে গুরু, বাল্যকাল হতে আমি এইসব করে আসছি। যীশু তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে ভালবাসিলেন এবং বলিলেন, এক বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে। যাও, তোমার যা কিছু আছে, বিক্রি কর, আর দরিদ্রের জন্য দান কর। তার ফলে স্বর্গে ধন পাবে। আর আমার পিছনে এস। এই কথা শুনিয়া তিনি বিষণ্ণ হইলেন এবং দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন। কারণ তাহার বিস্তর সম্পত্তি ছিল। যীশু তখন চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপন শিষ্যদের বলিলেন, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা শক্ত যাদের ধন আছে। ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের পক্ষে গলে যাওয়া সহজ।"

• • • • •

"—যীশু তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতে লাগিলেন, তোমরা আপন আপন শত্রুদের প্রেম দান করো। যারা তোমাদের অনিষ্ট করে তাদের মঙ্গল কামনা করো। যারা তোমাদের শাপ দেয় তাদের আশীর্বাদ করো। যারা তোমাদের নিন্দা করে তাদের জন্য প্রার্থনা করো। যে তোমার গালে চড় মারে, তার দিকে অন্য গাল পেতে দিও। যে তোমার চোগা তুলে নেয়, তাকে আঙরাখাটা নিতে বারণ করো না। যে কেউ তোমাকে যাচ্ঞা করে, তাকে তা দিও। যে তোমার জিনিষ তুলে নেবে, তার কাছ থেকে আর তা চেয়ে নিও না। যে ইচ্ছা পরের কাছ থেকে পেতে চাও তাদের সে ইচ্ছা পূরণ করো। তোমার পিতা যেমন দয়ালু তোমরা সেইরকম দয়ালু হও। অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? উভয়েই গর্তে পড়বে। শিষ্য গুরু হতে বড় নয়, কিন্তু যে কেউ পরিপক্ক হয় সে আপন গুরুর তুল্য হবে। তোমার ভ্রাতার চোখে যে কুটা আছে তাহাই কেন দেখছ; কিন্তু তোমার চোখে যে কড়িকাঠ আছে তা কেন ভেবে দেখছ না?"

• • • • •

"—তুমি যখন দান কর তখন তোমার সম্মুখে তুরী বাজিও না। যেমন কপটরা লোকের কাছে গৌরব পাবার জন্য সমাজগৃহে ও পথে করে থাকে। তুমি যখন দান কর, তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করছে তা জানতে দিও না। এইরূপে তোমার দান যেন গোপন থাকে। কিন্তু যিনি গোপনে থাকেন সেই পিতা সব দেখবেন ও তোমাকে ফল দেবেন। তোমরা যখন প্রার্থনা কর তখন কপটদের মত হয়ো না। কারণ তারা সমাজগৃহে ও পথের কোণে দাঁড়িয়ে লোক দেখান প্রার্থনা করে। তুমি যখন প্রার্থনা কর তখন তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ করো, আর দ্বার রুদ্ধ করে তোমার পিতা যিনি গোপনে বর্তমান তাঁর নিকটে প্রার্থনা করো। তার ফল তিনি নিশ্চয়ই দেবেন। তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর তাহলে পিতা তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা না কর তাহলে পিতা তোমাদের ক্ষমা করবেন না।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ধনরাজের বোনের বিয়েতে যেতেই হলো পর্মাকে।

ওকে একটু পায়ের ধুলো দেবার জন্য এমন কাকুতি মিনতি করতে লাগলো ওর চাচা ধনরাজ যে পর্মা না এসে পারলো না। চৌরীঘাস গাঁয়ে ধনরাজের বাড়ি। পা আর মন কিছুদিন থেকেই ওই দিকে ছুটে যেতে চাইছিলো, তাই বোধহয় এত বেশি আপত্তি তুলেছিলো পর্মা।

মাদল বাজিয়ে গান চলছিলো খুব। পর্মা বিয়ে বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছোতেই, গান বাজনা থামিয়ে সবাই এসে হাতজোড় করে নমস্কার জানালো। ধনরাজ ছুটে এলো। সামনের মাঝারি দারান্দায় ধবধবে চাদর পাতা, কয়েকজন লোক এপাশে ওপাশে ব'সে আছে, মাঝখানে একটা গ্যাসের আলো জ্বলছে, তার সামনে নিয়ে গিয়ে মহাসমাদরে ধনরাজ বসালো পর্মাকে। দারান্দার নিচে তিনকোণা প্রাঙ্গণের আধখানায় দরি (সতরঞ্চি) বিছানো, তার উপর নাচগানের মজলিস বসেছে। একপাশে বাদ্যযন্ত্রগুলি সাজানো,—ঢোল, নাগারা, শিঙা, সানাই। এরা সব বর আসার অপেক্ষায় ব'সে রয়েছে। জমাটি গান তখনি শুরু হবে।

মাদল বাজিয়ে আবার গান শুরু হয়ে গেলো। দারান্দার ওপর এপাশে ওপাশে বসা লোকগুলি পর্মাকে ঘিরে ব'সে সরস আলাপ জুড়ে দিলো। কিন্তু পর্মার গাম্ভীর্যে সে আলাপ এগোলোনা বেশি দূর। বৃত্ত ভেঙে আবার সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। পর্মা তাকিয়ে তাকিয়ে হবনের (যজ্ঞের) বেদী নির্মাণ দেখছিলো। তিনকোণা প্রাঙ্গণের খোলা জায়গাতে তৈরী হচ্ছে বেদী। দু'জন পণ্ডিত বয়ী থেকে শুকনো ধুলোর মতো মাটি ঢেলে, ক্ষিপ্র হাতে প্রায় একহাত উঁচু একটি চৌকোণা বেদী বানালো। সুন্দর মসৃণ বেদী তৈরী হলো, একটুও এবড়ো খেবড়ো নয়। তারপর ছোটো ছোটো দুটো ঠোঙা থেকে বার হলো খড়ি মাটির গুঁড়ো আর আবীর। সেই গুঁড়ো দুই পণ্ডিত ডান হাতের মুঠিতে নিয়ে, হাতের পাতা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হবনের বেদীর ওপর, বেদীর পাশে, ঘোরাতে লাগলো। মাঝে মাঝে হাতের পাতা সোজা হ'য়ে ঘোরে, মাঝে কোথাকুথি। হাতের মুঠির মাঝখানের দুটি আঙুলের মাঝা ফাঁক দিয়ে-ঝর ঝরিয়ে লালগুঁড়ো-সাদাগুঁড়ো প'ড়ে, দুটিতে মিলে মিশে অপূর্ব সুন্দর নকশা আঁকা শেষ ক'রে, বেদীর ওপর হবনের জন্য আনা হাল্কা কাঠগুলি সাজিয়ে রাখলো পণ্ডিত দু'জন। পাশের খোলা থেকে বড় একটি ঘইয়ের ঠোঙা বার হলো। ঘই ছিটিয়ে হবন হবে। এমন সময় বর এসেছে বর এসেছে সোরগোল উঠলো। একসঙ্গে বেজে উঠলো ঢোল্-নাগারা-শিঙা-সানাই। কনের বাবা ও চাচা প্রথমে

এগিয়ে গিয়ে বর ও বরযাত্রীদের আহ্বান জানালো, তারপর চক্কিয়ালীরা ঘিরে ধরলো ওদের। বর ও বরযাত্রীদের ঘিরে ওরা সমবেত গলায় গান জুড়ে দিলো :—

জম্বুড়ু আয়ে ঘুরে দে, নেহেরে মু কাহে জীয়া ওরে দে
জম্বুড়ু আয়ে উগে দে, নেহেরে মু কাহে জীয়া কুত্তে দে
এ খানা খিয়া সে খায়া
হোন্ গত্তিয়া দে পায়া মেরি নোরং
হায় বেবে নোরং
পড় ভাই তোতেয়া, মেরি নোরং হায় বেবে সো রং
লাড়ে দে ফুঠে লাড়ি খায়,
লাড়ি দে ফুঠে লাড়ে খায়,
বাঁচে দে সে জম্বুরে খায়।

দূর গাঁ থেকে এসেছে বরযাত্রীরা, এদের চেহারাগুলো বরাহ সদৃশ।
দূর গাঁ থেকে এসেছে বরযাত্রীরা, এদের মুখগুলো কুকুর সদৃশ।
যা খাবার ছিলো, তাতো খেলো, প্রায় শেষ করলো।
বাকী খাবারের পোঁটলাও বাঁধলো—
বরের এঁটো খেলো কন্যে—
কন্যের এঁটো খেলো বর—
আর খেলো ঐ সব বরযাত্রীরা।

শিঙা, সানাই ছাপিয়ে একটা পরিচিত খিল খিল হাসি হঠাৎ বেজে উঠতেই পর্মার অনুসন্ধানী চোখ চক্কিয়ালীদের ভিড়ের পাশে ফুলমুকে আবিষ্কার করলো। নিঃসঙ্কোচ অনাবিল হাসি। একটু যেন চমক খেলো পর্মা। কিশোরী ফুলমু এ ক'দিনেই যেন তন্বীতে পরিণত হয়েছে। তারপরই খেয়াল করলো, অসংখ্য ক্ষুধার্ত চোখ ফুলমুর শরীরে আটকে গেছে।

—না, এ মেয়েকে রক্ষে করবে কে নয়নরাজ ছাড়া,—মনে মনে পর্মা বললো আর সঙ্গে সঙ্গে দেখে ফেললো নয়নরাজকে। বর হলো মণিমহেশ গাঁয়ের। বরযাত্রী হয়ে এসেছে নারু। বর এবং বরযাত্রীরা ভেতরে ঢুকলো। পর্মার চোখে পড়লো, ভিড় ঠেলে ভেতরের দিকে প্রায় ছুটে চলেছে ফুলমু, আর নয়নরাজের গোল গোল নির্লজ্জ চোখের তৃষিত দৃষ্টি ওর পেছন পেছন ধাওয়া করেছে।

বিয়ের লগ্ন একটু দেরীতে। কনের বাবা বরযাত্রীদের ভেতরের বারান্দায় উঠিয়ে নিয়ে গেলো। সেখানে খাবার জায়গা হয়েছে। ধনরাজ এসে হাতজোড় ক'রে পর্মাকে খাওয়ার অনুরোধ করলো। পরবরাজ কিছুতেই খেতে রাজি হলো না। ঐ ভেতরেই তো আছে ফুলমু, ওর চোখের সামনে নয়নরাজের নির্লজ্জ দৃষ্টি ফুলমুকে ওভাবে লেহন করবে, কিছুতেই ও তা সহ্য করতে পারবে না। বলা যায় না, হয়তো চড় চাপড় লাগিয়ে বসতে পারে ও। তার চেয়ে ভেতরে না যাওয়াই ভাল।

ধনরাজ পত্তলি (পাতা) পেতে সামনের বারান্দাতেই জায়গা ক'রে দিতে চাইলো, তাতেও

অস্বীকার করলো পর্মা। শেষকালে ধনরাজের মিনতিতে খাবারের পোটলাটা নিয়ে যেতে রাজি হলো।

ধনরাজ ভেতরে চলে যেতেই, নিজের হৃদয়ের ভেতর পর্যন্ত যেন দেখতে পেলো পর্মা।

—ফুলমু তো নায়ুরই বউ হচ্ছে, তার দিকে সে যে ভাবে খুশি তাকাক, যা ইচ্ছে তা করুক সে ফুলমুকে নিয়ে—তাতে ওর কী! ভাবতে ভাবতে বিবেকের কশাঘাতে যেন অস্থির হ'য়ে পড়লো পর্মা। ফুলমুর দুর্নিবার আকর্ষণ ওর ওপরই বা কম প্রতিক্রিয়া করেছে কী! যেন একটা উন্মত্ত প্লাবন ওকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে—এর থেকে নিস্তার নেই যেন ওর। সেই প্লাবনে পর্মার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক,—জীবন, যৌবন সব যে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো।

পোটলা কাঁধে নিয়ে কখন যে পর্মা জনহীন পথ ধরে চলেছে তা যেন ওর খেয়াল নেই। যেন স্বপ্নের ঘোরে অনেকখানি উৎরাই পথ নেমে এলো। রাস্তা খারাপ। অনেকবার ঠোক্কর খেলো পর্মা। কিন্তু আচ্ছন্নের ঘোর কাটলো না। প্রায় আধঘণ্টা চলার পর, সোজা পথটা ছেড়ে দিয়ে পর্মা দক্ষিণ-পশ্চিমের সরু বাঁকা বাঁকা পথটা ধরলো। এ পথ কিছুটা বেশী চড়াই, কিন্তু অনেক সংক্ষিপ্ত। সেই সংক্ষিপ্ত পথে মিনিটখানেক চলার পরই ঝাঁকড়া বেলগাছ গাছটার পাশে পুরোনো রংচটা পানাগারটা চোখে পড়লো। হয়তো আনমনা পর্মার চোখে পানাগারটা এড়িয়ে যেতো, কিন্তু পানাগারের ভেতরে একটু বেশীরকম হৈ-হুল্লোড় হচ্ছিলো। মাদল বাজিয়ে কয়েকজন পাহাড়ী খুব উল্লাসের সঙ্গে গান গাইছে :—

মিঞা চলো ফতীয়ে, সিংগো লোকে, খরচী খাদো—
দুমারে দুমারো পরে মসুহ লে হাণ্ডু।
ফতী সিঁহা, সো কাম্মা, পড়ো লাগে লাড়ি দি থাকে—
তায়া থেকে না ফতীয়া সিং খসিয়ে জামাকে—

আদিবাসের গান শুনে নিজের মনে পর্মা একটু হাসলো। গান ও মাদলের সঙ্গে কে যেন প্রাণপণে একটা মাউথ-অর্গানও বাজাচ্ছে। পানাগার পেরিয়ে পর্মা চারপা যেতেই, মাদল, গান ও মাউথ-অর্গান ছাপিয়ে নারী কণ্ঠের তীব্র একটি ব্যাকুল প্রতিবাদের সুর পর্মার কানে পৌঁছোলো। সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এসে অপরিসর ও অপরিচ্ছন্ন পানাগারে দ্রুত ঢুকে গেলো ও। সামনের ঘরে নয়, তার পেছনের ঘরে, ঘন জটলা পাকিয়ে দশজন পাহাড়ী জোয়ান ফুলমুকে ঘিরে বসে আমোদে মেতেছে। দেশী মদের উগ্র গন্ধে ভেতরটা আচ্ছন্ন। আর তার সঙ্গে কেমন যেন একটা বোটকা গন্ধ। ইতিমধ্যে ঐ দশজন যে প্রচুর অরাখ, গিলে বসে আছে ইতিমধ্যে তা তাদের ভাব ভঙ্গিতেই সুস্পষ্ট। দু'জন জোয়ান দু'দিক থেকে ডান হাত দিয়ে ফুলমুর দু'হাত চেপে ধরে আর বাঁহাত কানে চাপা দিয়ে তারস্বরে চীৎকার করছে—দুমাঁরে দুমারো পরে মসুহ লে হাণ্ডু…। মাদল-বাজিয়ে, মাউথ-অর্গান বাজিয়ে ছাড়া আর বাকী ছ'জন হাতে তালি দিয়ে গান গাইছে আর গানের তালে তালে ফুলমুর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। অরাখের (মদের) কয়েকটা বোতল, কয়েকটি খালি হাঁড়ি গড়াগড়ি যাচ্ছে এপাশে ওপাশে। কটু অরাখের গন্ধকে ডুবিয়ে দিয়েছে ঘরের চারপাশে ঝোলানো শুকনো ভেড়ার মাংসের ঝ্যাপসা গন্ধ। একপাশে কালিঝুলি পড়া

একটা হারিকেন জ্বলছে। পর্মাকে শুধু চোখে দেখেই দশ জোয়ানের সমস্ত নেশা ছুটে গেলো। গান বাজনা থামিয়ে, ফুলমুর হাত ছেড়ে দিয়ে, সবাই ঝটিতে আড়ষ্ট-ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো।

"এ সব কী হচ্ছে?" পর্মার গম্ভীর গলা গম্‌গম্ ক'রে উঠলো পানাগারের ভেতর।

নেশাগ্রস্ত দশ জোয়ান নিরুত্তরে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো পরমরাজের মুখের দিকে। কয়েকটা মুহূর্ত নিথর, নিশ্চুপ।

তারপর, ওরই মধ্যে একজন জড়িয়ে জড়িয়ে কোনোমতে বললো, "এই আঁধার রাতে ফুলমুর একলা ঘর যেতে ডর লাগলো, তাই আমরা বললুম,—তুই খানিক বোস্, আমাদের গান বাজনা শেষ হলেই পৌঁছে দেব তোকে।"

ফুলমু উঠে দাঁড়িয়েছিলো আগেই। ভয়বিহ্বল ও করুণ দুই চোখের দৃষ্টি প্রণামিত করে তাকিয়েছিলো পরমরাজের মুখের দিকে।

পাহাড়ী জোয়ানের জড়ানো-জবানী শোনার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বেগে ছুটে এলো তার সামনে, শরীরে যতখানি শক্তি আছে ততখানি শক্তি দিয়ে তার গালে চড় বসিয়ে দিলো, "·· ফুলমুর ঘর ফিরতে ডর লাগছিলো না? সুর (শুয়োর) বদ্‌মাস্ কোথাকার—" চড় মেরেই ঘর থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলো ফুলমু।

"ফুলমু—!" পেছন থেকে পরমরাজের আহ্বান শুনে ফুলমু তার গতি আরো দ্রুত করলো, পর্মার করুণা, দয়া ভিক্ষা ও চায় না। কিছুতেই চায় না।

"ফুলমু!!" এবার ফুলমু হাঁটা ছেড়ে ছোটা শুরু করলো। "ফুলমু, শোনো কথা রাখো—" পর্মার গলায় এমন আবেদনের সুর কোনোদিন শোনেনি ফুলমু। শুদ্ধ বিস্ময়ে একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। পর্মা কাছে আসার পর কোনো কথা না বলে আবার হাঁটা শুরু করলো। পরমরাজও স্থির করেছিলো, ফুলমুর সঙ্গে কথাবার্তা না বলে নিরাপদে ওকে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দেবে শুধু। কিন্তু ওর ভেতরের অসহ্য কৌতূহলটা ওকে দিয়ে কথা বলিয়ে ছাড়লো, "ফুলমু, তোমাকে তো ধনরাজের বাড়ি দেখলাম, তুমি ওখানে এলে কী করে?"

"চলে এলাম, বিয়ে বাড়ি ভালো লাগলো না—"ফুলমুর নিস্পৃহ গলা।

"কিন্তু, অত তাড়াতাড়ি ওখানে এসে পৌঁছলে কী ক'রে!"

"আমি তো ছুটে ছুটে যাচ্ছিলাম—"

"কেন? বিয়ে বাড়ি থেকে ছুটে পালিয়ে এলে কেন?"

"এমনি—"

পর্মা হাসলো, এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে বললো, "ছোটাছুটি ক'রে বিয়েবাড়ি ছেড়ে এমনি কী আর কেউ পালিয়ে আসে? তোমার বিপদের কথা আমাকে খুলে বলতে পার। তোমার শনিচারী নানীর কাছে জিগ্যেস করে দেখো, বিপন্নদের রক্ষে করার কাজই আমি নিয়েছি—"

"কিন্তু, আমাকে তুমি রক্ষে করবে না, আমি জানি—। নামুর হাত থেকে আমাকে তুমি রক্ষে করতে পারবে?—"এতক্ষণ পরে ফুলমু পথের থেকে চোখ তুলে পর্মার চোখের দিকে তাকালো। ফুলমুর জিজ্ঞে চোখের দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্য পর্মার যেন সব গোলমাল হ'য়ে গেলো, শক্ত মুখ করে কঠিন গলায় বললো, "কী করেছে নামু?"

ফুলমু পর্মার কণ্ঠস্বরে অনেক ভরসা, অনেক আশ্বাস পেলো, হাসি হাসি মুখ করে বললো, "বিয়েবাড়ির একভিড় লোকের মধ্যে ঐ পাজী বদমাসটা আমার চোরি (কামিজ) ধরে টানাটানি লাগিয়েছিলো।"

এক মুহূর্তের জন্য পর্মার সাবধানী মনটা লাগামছাড়া হয়েছিলো, ফুলমুর শেষ কথা শুনেই সচেতন হলো, উত্তেজনা সামলাতে আরো কয়েক মুহূর্ত লাগলো পর্মার, তারপর চেষ্টা করে মুখে হাসি ফুটিয়ে সহজ গলায় বললো, "নাম্ তো তোমার হবু বর, তুমি তো নামুর ভাবী বউ—সকলেই জানে একথা, ওতে আর দোষটা কি হয়েছে—"

ফুলমু ছেলেমানুষের মত চেঁচিয়ে উঠলো, "সবাই যাক্ষে কথা জানলেই হলো, ঐ পেল্লাই পাহাড়ের বউ আমি হচ্ছি আর কী।" তারপরই পর্মার কাছে একেবারে সরে এসে গলা নামিয়ে বললো, 'সর্দার, তোমার ছোরাটা আমায় দেবে ?"

পরমরাজ হঠাৎ যেন চমকে উঠলো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ফুলমুর দিকে। ফুলমুর নির্ভীক চোখ আর সহজ স্বচ্ছন্দ মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ওর যেন লোভই হলো ওর ছোরাটা ফুলমুর হাতে তুলে দিতে। আবার মনে মনে নিজের মনটাকে ধমকালো, শাসন করলো। বললো, "আমি তো ছোরা রাখিনে—। ও সব দুষ্টুমী ইচ্ছে ছাড়। দেখলে তো—চার পা যেতেই, কেমন আটক করে রেখেছিলো ওরা। যেই নয়নরাজের বউ হবে, অমন দশ জোয়ান ছেড়ে একশ' জোয়ানেরও সাহসে কুলোবে না তোমার হাত ছেপে ধরে। নাম্ ছাড়া তোমাকে রক্ষে করবে কে ?"

এক মুহূর্ত না ভেবেই ফুলমু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, "কেন, আমাকে রক্ষে করবে—সর্দার পরমরাজ। আর, সর্দার পর্মা যদি নাই রক্ষে করতে পারে আমাকে, তাহলে আমি নিজেকে নিজেই রক্ষে করবো—"

পর্মা হাসলো, "সেই ভাল। এখন এসো এই পাথরটার ওপর বসে আমরা খেয়ে নি।"

"খেয়ে নেব !" ফুলমু অবাক হলো।

পথের পাশে চওড়া কালচে পাথরটার দিকে এগোতে এগোতে পর্মা বললো, "তোমার যে খাওয়া হয়নি, তাতো বুঝতেই পারছি—আমারও হয়নি। খিদে লেগেছে বেশ। খাবার যখন সঙ্গেই আছে তখন আর কষ্ট করা কেন।" কাঁধের ঝোলা নামিয়ে খাবার বার করতে লাগলো পর্মা। দু'রকম ডাল, মাংস আর ভাত। আর সামান্য একটু দই। এ খানা পাহাড়ীদের মধ্যে খুব বড়লোকী খানা। বিয়ের নেমন্তন্নে ভাত ওরা করবেই। রুটি ওদের রোজকার খাদ্য। নিমন্ত্রণের খাওয়া হলো ভাত, আর তার সঙ্গে সাধারণত একটা ডাল হয়। বেশ বিত্তবান ব'লে যাদের খ্যাতি তারা মাস (মাংস) করে।

মাস্ দেখে ফুলমুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হলো। পাতলির ওপর সব একে একে ঢাললো পর্মা। ধনরাজ বুদ্ধি ক'রে ঝোলার মধ্যে একটা পত্‌লি (পাতা) দিয়েছিলো ব'লে পর্মা খুশী হলো।

"এসো, এবার খাওয়া শুরু করি—" পর্মা পত্‌লিটা টেনে একটু বেশী এগিয়ে দিলো ফুলমুর দিকে।

ফুলমু জোরে জোরে মাথা নাড়লো, "বাঃ ! তুমি আমি এক সাথে খাব নাকি ?"

"তাতে কী হয়েছে ? আর দেরী করোনা, শুরু কর—"

"না, আমার ভয় লাগে—"

"ভয় লাগে! ফুলমু, এটা তুমি একটা মস্ত ঝুট বাত বললে—"

"তাহলে কী লাগে আমি জানিনা—" ফুলমু ধাঁধভাঙা বস্তার মত হেসে উঠলো খিল্‌খিল্ ক'রে।

পর্মা (মুহূর্ত দুই নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে রইলো ফুলমুর মুখের দিকে তারপর ছোটো ছোটো মোনায় (পাতার ঠোঙা) যে গুলিতে মাংস আর ডাল দিয়েছিলো, তার মধ্যে সব অর্দ্ধেক ভাগ ক'রে তুলতে লাগলো। হাত নেড়ে বাধা দিলো ফুলমু. "না, না। এক সাথেই খাব। এরপর আমার মন যখন খারাপ হবে, তখন যেই ভাববো,—আমি আর পরমরাজ একসাথে একদিন খেয়েছিলাম, অমনি আমার মন ভালো হ'য়ে যাবে।--"

হো-হো করে হেসে উঠলো পর্মা, "পরমরাজের সাথে একদিন খেয়েছিলে মনে করলেই তোমার মন ভাল হয়ে যাবে!"

"হুঁ—" ঘাড় নেড়ে জবাব দিয়ে ফুলমু মাংসের একটা টুকরো তুলে কামড় দিলো। পর্মা ঠোঁটে এসে যাওয়া একটা প্রশ্ন আবার ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে খাওয়ায় মন দিলো।

নীরবে খেতে খেতে পর্মা অনুভব করলো, ওর ভেতরটা কেমন এক ধরণের উত্তেজনায় একটু একটু ক'রে কাঁপছে। ও অবাক হলো খুব। কেন এই উত্তেজনা, সেটা নিয়ে একটু ভাবতেই ওর ভেতরের ইচ্ছেটা ধরা পড়লো ওর কাছে। ফুলমুর সুন্দর তনু দুই বাহুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে বক্ষলগ্ন করতে ইচ্ছে করছে পর্মার। ভয়ানক ইচ্ছে করছে ফুলমুকে বুকে টেনে নিতে। ফুলমু খাওয়া থামিয়ে দিলো. "সর্দার, তুমি যে কিছুই খাচ্ছো না?"

"এঁ্যা—? হ্যাঁ।" পর্মা খুব বেশী মন দিলো খাওয়ায়।

"সর্দার!"

"এঁ্যা—" ফুলমুর ডাক শুনে আবার একটু চমকালো পর্মা।

"তুমি আবার একটা উপকার করবে?"

"করবো। বল কী চাই?"

"শনিচারী নানীর পতিত জমিটা আবার আলুর ক্ষেতি জমি বানিয়ে দেবে?"

"দেবো। কিন্তু, নায়ু হয়তো তাতে চটতে পারে ফুলমু—"

"নায়ু চটলো তো আমার ব'য়ে গেলো। কিন্তু, তুমি সত্যি দেবে তো আমাদের ক্ষেতি জমি বানিয়ে?"

"দেব ফুলমু।"

"হুর্‌রা!" হাত ঝেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো ফুলমু। পর্মাও উঠে দাঁড়ালো। আবার পথ চলতে লাগলো দুজনে। পর্মা নিজের দুরন্ত ইচ্ছেটার গলায় কোনোমতে ফাঁস্ পরিয়ে ভাবতে ভাবতে চললো,—ঘরে ফিরে ভেতরের আমিটার সঙ্গে আজ ওর একটা বোঝাপড়া করতেই হবে। মনের হাবমাহ মিলিয়ে একটি সুন্দর স্বস্তির হাওয়া বইছে এখন, তাই পর্মা ভাবতে পারলো একথা।

এখন অন্ধকার নিস্তব্ধ রাত্রি। ফুলমুর চোখে ঘুম নেই। কাত হ'য়ে পাশের (খেজুর পাতার চাটাই) ওপর গাল চেপে চুপ ক'রে শুয়ে আছে। অথচ কয়েকদিন আগে শনিচারী নানী এই পাশ্‌টা যখন ওর শোবার জন্ত দিলো তখন ওর কী আনন্দ হয়েছে। শুধু মজ্‌রির (খড়ের চাটাই) ওপর শুয়ে ওর ভাল ঘুম হতোনা। মেহ্‌লা গাঁয়ে এর চেয়ে অনেক ভাল বিছানা ছিলো ফুলমুর। ওর

মজবিটা ছিল একেবারে আস্ত, ছেঁড়া নয়, তার ওপর ছিলো পাল্, আর তার ওপরে ছিলো লাল আর নীল রং মেলানো সুন্দর একটা দরি (সতরঞ্জি)। সেই ভাল নরম বিছানা ছেড়ে, এখানে এসে শুতো পুরোনো আর খাবলানো একটা মজ্‌রির ওপর। বেশীর ভাগ রাত্রেই ভাল নিটোল ঘুম ওর হতো না, ভাঙা ভাঙা ঘুম দিয়ে রাত্রি শেষ করতো ফুলমু। কিন্তু ক'দিন আগে শনিচারী নানীর ওর ওপর এত দয়া হলো কেন কে জানে, তার তোলা সখের পাল্‌টা ওকে দিয়েছে শুতে। সত্যি বলতে কী, তারপর থেকে এক এক ঘুমে ফুলমুর রাত কাবার। কিন্তু আজ ঘুম নেই। জেগে থেকে পর্মার কথা ভাবতে খুব ভাল লাগছে। ওর মনে খুব গর্ব হলো। পর্মার মতো অমন নাম করা একজন মস্ত সর্দার, সে কিনা ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে, খাইয়েছে আর সব চেয়ে বড় কথা হলো, কথা দিয়েছে—ওদের পতিত জমিটাকে আমুর ক্ষেতি জমি বানিয়ে দেবে। বিদ্‌ঘুটে অভাবের হাত থেকে তাহলে ওরা এবার রেহাই পাবে। আর, খাওয়া পরার কষ্ট না থাকলে, ঐ পেল্লাই পাহাড়ের বউ হওয়ার জন্য মা আর নানী কী আর ওর ওপর জবরদস্তি করবে? কক্ষোণো করবে না।

—বাপ্‌রে, নাহুর কথা ভাবলেই ওর বুকের ভেতর কাঁপন লাগে। বেলরম্, বদ্‌মাস্, বিয়ে বাড়ির একভিড় লোকের মধ্যে চোরি ধরে টেনে ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ছিলো। খেয়েছে তেম্‌নি এক প্রচণ্ড ঘুঁসি। ঠিক হয়েছে। কাম্‌ড়ে দিলে বেশ হতো।

—পরমরাজ, যার উচ্ছ্বসিত-স্তুতি চৌরীখাস আর চৌরাসী গাঁয়ের জোয়ানদের মুখে মুখে, সে আজ ওকে খাইয়েছে, সে আজ ওকে কথা দিয়েছে, সে আজ ওকে সঙ্গে ক'রে বাড়িতে এনে দিয়েছে—আবার পর্মার কথা ভাবতে লাগলো ফুলমু।

—কী সুন্দর শরীর পর্মার! কী সুন্দর! আজকে পাথরটার ওপর মুখোমুখি বসে যখন ওরা খাচ্ছিলো, একবার একটুখানির জন্য পর্মার শরীরটাকে ছুঁতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো ফুলমুর। ··আচ্ছা, যদি তখন পর্মা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতো,—কী মজাই না হতো! যাঃ, কী বাজে কথা ভাবছে ফুলমু। ও তো আর কোনোদিনও হবে না। পরমরাজ যে মস্তবড় একটা কাজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, সেকাজ করতে হ'লে নাকি মেয়ে ছোঁয়া বারণ। ছোঁয়া যে বারণ সে কথা আজ আরো ভাল ক'রে বুঝলো ফুলমু। না হ'লে আজকে ঐ অন্ধকার রাতে, আর ঐ নিরালা পথে, যার আশে পাশে কয়েকটা গাছ আর ঝিঁ ঝিঁ পোকা ছাড়া কিছু নেই—সেখানে কোনো জোয়ান ফুলমুকে একা পেয়ে ছাড়তো না, কিছুতেই না—এ কথা ফুলমু হলফ্ ক'রে বলতে পারে। দূরাগত একটা শিঙের ধ্বনি ওর চিন্তায় ছেদ ঘটালো। ধ্বনিটা ওর পরিচিত। এরপরই ওর মা চন্দ্রু পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। এখানে আসার কয়েকদিন পর থেকেই এ শিঙের শব্দ শুনে আসছে ও, আর তারপর ওর মা যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় পা-টিপে টিপে তাও টের পায়—কিন্তু তারপর চন্দ্রু যে ফিরে আসে কখন তা টের পায় না। সে সময় ও ঘুমিয়ে থাকে। ফুলমু জানে, এই শিঙের শব্দ শনিচারী নানীও শুনতে পায়, কেননা সে সময় কতদিন নানীকে পাশ ফিরতে দেখেছে ও, কিন্তু শনিচারী নানী এ নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না। শুধু, শনিচারী নানী কেন, গাঁয়ের কোনো মেয়ে পুরুষই এ নিয়ে মাথা ঘামায় না, ঘামাবে না—তা ওর এইটুকু বয়েসেই ও খুব ভাল ক'রে বুঝে বসে আছে। কিন্তু, ওর কেন খারাপ লাগে? ভয়ানক খারাপ লাগে। সেদিন ওর সই বুধিয়া ওর দুচারটে কথা শুনে কী হাসাহাসিটাই না করলো। বললো,—যা, সেরুয়া প'রে সন্ন্যাসিনী হ'য়ে হিমালয়ে চলে যা। জোড়ুলায় শাশুরাল আসে ওর মাকে নেয়ার

করতো, তখন ও কত ছোটো ছিল, তখন থেকেই দেখেছে কী পেয়ারটা না করতো গাদুরাজ ওর মাকে। তারপর কি একটা অসুখে মা'র চেহারা একদম খারাপ হ'য়ে গেলো, তারপর থেকে ওকে পেয়ার ক'রে গাদুরাজ—তাতে আর হয়েছে কী। এই নিয়ম। বুধিয়ার কথা শুনে ফুলমুর গাটা ঘিন ঘিন ক'রে উঠেছিলো। দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলো শুধু, "পেয়ার কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিসনে বুধিয়া, ওটা অনেক দামী কথা—"

ওর কথা শুনে গড়াগড়ি ক'রে হেসেছিলো বুধিয়া। তা হাসুক। কিন্তু, এসব ওর খারাপ লাগে। ওর গা ঘিন ঘিন ক'রে। এই যে ওর মা চন্দ্রু উঠে চলে গেলো, ওর ভেতরে একটা দুর্দান্ত ইচ্ছে লাফালাফি লাগিয়েছে, এক লাফে ছুটে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরতে,—যে শিখ দিচ্ছে তাকে আর ওর মা চন্দ্রুকে।

কিন্তু, এর আগে আগে যেমন বিশ্রী অস্থির মন নিয়ে মটকা মেরে পড়ে থাকতো, আজও তেমনি প'ড়ে থাকলো, এপাশ ওপাশ করলো তারপর ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে ফুলমুর ঘুম ভাংলো অনেক বেলাতে। আকাশে লালের ছোপ তার অনেক আগেই মিলিয়ে গেছে। রোজ ওর ঘুম ভাঙার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওদের ঘরের কোণাকুণি খেড়াক্ গাছের ওপর পাখা ঝাপ্টার ঘুমভাঙা নয়াচিড়গুলি। তারপর ফুলমুও ঘর ছেড়ে উঠোনে নামে আর নয়াচিড়গুলিও উড়ে যায় আকাশে। আজ খেড়াক্গাছ তার ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। উঠোনে দাঁড়িয়ে আড়ামোড়া ভাংলো ফুলমু। চোখে পড়লো চন্দ্রু কেমন একরকম রাগি চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। অন্যদিন হ'লে মা'র এমন চোখ দেখে রাগটা এক নিমেষে ওর মাথায় চড়ে উঠ্তো কিন্তু আজ হলো না। মুখ ঘুরিয়ে দৃষ্টি রাখলো দূরের ঢালু আঁকাবাঁকা পথটার ওপর। মিনিটখানেক বেশী নয়। তারপরই ঝিপ্রহাতে কাঁটা দিয়ে উঠোন পরিষ্কার করলো, ঘরের পাট সারলো, হাঁস-মুরগীদের ঘর খুলে দিয়ে ডিম বার ক'রে আনলো, তারপর পিঠে কিন্টা বেঁধে আর হাতে ঘড়া নিয়ে উত্তর দিকের একটা অপ্রশস্ত পথ দিয়ে হনহনিয়ে এগিয়ে গেলো ফুলমু। এ পথ ধরে কিছুটা গেলেই নদী মেলে। নদী কাছ ব'লে বাঁই (কুঁয়ো) থেকে আর জল আনেনা ফুলমু, নদী থেকেই আনে। ঘড়ায় জল ভরার আগে নদীর পাশের জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ-কুটো ও কিছু ফলমূলও সংগ্রহ করে আনে ফুলমু। ব্যাস্, তারপরই ওর ছুটি। আজ ও দেরীতে উঠেছে। কাল বিকেলেই চন্দ্রু জানিয়েছে, ঘরে একদম লাকড়ি (কাঠ) নেই। আজ খুব ভোর ভোর উঠে লাকড়ি এনে না দিলে খানা পাকানো যাবে না। কাজেই আজ ওর বিলম্বে ওঠার জন্য চন্দ্রু রাগ করতে পারে। ওর সে ত্রুটিটুকু সংশোধনের জন্য—হনহনিয়ে হাঁটছিলো ফুলমু। কিন্তু লাকড়ি আর ফল সংগ্রহ ক'রে নদীর পারে এসে, ফুলমু বাড়ির কথা একেবারে ভুলে গেলো। কয়েকজন উৎসাহী পাহাড়ী মেয়ে পুরুষ মিলে নদীর উজানে বাঁশের ঝাঁপ দিয়ে মাছ ধরছে। একটা ডুবার মধ্যে অনেকগুলি মাছ লাফাচ্ছে। ফুলমুর খুব ইচ্ছে হলো গোটাকয়েক মাছ ও নিয়ে যায়। কিন্তু ওরা কী আর এম্নি এম্নি মাছ দেবে? ফুলমু ইতিমধ্যে আলাদা কাঠ আর কতগুলি ফল সংগ্রহ করেছে। কিন্টা থেকে কতগুলি আলু আর মূলা বার ক'রে ওদের সামনে এগিয়ে ধরে বললো, "এগুলির বদলে আমাকে দুটো মাছ দেবে?"

সকলের মিলিত একটা স্বরগ্রাম শোনা গেলো। হাঁ—বললো ওরা, না,—না,—বললো ফুলমু

কিছু বুঝতে পারলো না। ওদের মধ্যে দলের যে পাণ্ডা সে দুহাত তুলে চীৎকার থামিয়ে দিলো, বললো, "ফলটল আমাদের কিছু দিতে হবে না, তুমি জলে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে একটু হল্লোড় ক'রে যাও, যাওয়ার সময় যে ক'টা খুশী মাছ নিয়ে যেও।"

ততক্ষণে ফুলমুর চোখে পড়ে গেছে ওদের জলের ভেতরের কাণ্ডকারখানা। যত না মাছ ধরছে ওরা, তার চেয়ে বেশী হাত ধরে, গা ধরে টানাটানি ক'রে খেলা করছে।

পাহাড়ীদের ছেলেমেয়েদের মেলামেশার ব্যাপারে কোনো সামাজিক বিধিনিষেধ নেই। ওরা মেয়েপুরুষ এক জায়গায় হলেই খুশীমত হৈ হল্লোড় করে। ফুলমুর এ খেলা দুইকটু লাগলো না বরং মজাই লাগলো। বাড়ির কথা ভুলে গিয়ে মনটাকে ভাসিয়ে দিলো এ খেলা দেখার পেছনে। কিন্তু, যত মজাই লাগুক, নিজে নেমে গিয়ে যোগ দিতে পারলো না। ওর অবচেতন মন ওকে ধরে রাখলো। পর্মার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর ও যেন ওর আগের জীবনটা সম্পূর্ণ পাল্টে এসেছে। শুরু করেছে অন্য আরেকটা নতুন জীবন। সেটাই আটকে রাখলো ওকে। মনে মনে স্থির জানে ফুলমু, ওকেও বড় কাজ করতে হবে। অবশ্য, এখনো ও জানেনা সে বড় কাজ কী, এবং তার কাজের ধারা কী। কিন্তু, ও জানবে, জেনে নেবে। আর, বড় কাজ করতে হলে পুরুষের যেমন মেয়েদের ছোঁয়া বারণ, বিয়ে করা বারণ; ও-ও তেমনি বিয়ে করবে না, পুরুষকে ছুঁতে দেবে না।

উদ্দাম হল্লোড় ক'রে নদী থেকে ছেলেমেয়েগুলো উঠলো। ওঠার আগে কয়েকজন জল ছিটিয়ে দিলো ফুলমুর গায়ে। ফুলমু হাসলো, রাগলো না। সেই যে দলের পাণ্ডা, যে দুহাত তুলে চীৎকার থামিয়েছিলো, সে ডুবা থেকে কতগুলি মাছ তুলে নিয়ে ফুলমুর দিকে এগিয়ে এলো, "ও বাই! নাও মাছিগুলা—"

ফুলমু দু'পা সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলো।

—ও কী। পাহাড়ী জোয়ানটা অমন ধারা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে কেন? ওর চোখ দুটোর ভেতর অমন হাতছানির ইশারা কেন?

মুহূর্ত দুই স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলো ফুলমু, তারপরই—"মাছ আমার চাইনে—" ব'লে বাড়ির পথে ছুট লাগালো। যেন একপাল নেকড়ে ওকে তাড়া করেছে।

—ফুলমু এখন বড় হয়েছে। ও পুরুষের মুখের হাসি বুঝতে পারে, চোখের ভাষা পড়তে পারে। ঐ জোয়ানটা একহাতে মাছ দেবে ওকে, আর সঙ্গে সঙ্গে আরেক হাতে সাপটে ধরবে ওকে। প্রাণপণে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরবে। অন্যরা কেউ তাতে বাধা দেবে না। মস্ত একটা মজা হঠাৎ যেন ওরা পথে কুড়িয়ে পেলো। সবাই মিলে হাততালি দেবে। পুরুষরা শিষ দেবে মেয়েরা গান শুরু করবে। এমন কি ফুলমু যদি জোয়ানের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছটপট ছাড়িয়েও নেয়, তাহলে অন্যরা, পুরুষরা তো বটেই, মেয়েরাও, ওকে জোর ক'রে ঠেলে দেবে ঐ জোয়ানটার বুকের ওপর। তারপর আবার হাততালি দিয়ে হৈ হৈ ক'রে আনন্দ করবে।

এ সমস্ত জানা হ'য়ে গেছে ফুলমুর। তাই ও ছুট দিলো। পেছনে মেয়ে পুরুষের মিলিত হাসি শুনলো, তারপরই শুরু হয়ে গেলো ওদের গান,

…ঘড়ী গাড়ি পরসি ভাঁটি বেরে মুর্‌লো
মোঁছারো বেগো উবী সোরগল্‌ চালো…

বাড়িটা চোখে পড়তেই ঘাঁশ হলো ফুলমুর। এত দেরী হলো নাকড়ি আনতে। চন্দ্রক ওকে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু, আশ্চর্য! ওর পায়ের শব্দ শুনে চন্দ্রক এমন গলায় ওকে ডাক দিলো! এমন কোমল মিষ্টি গলার আহ্বান ফুলমু তার জ্ঞান হওয়া অবধি শোনেনি। কী ব্যাপার! এক পা এক পা ক'রে ঘরে ঢুকলো ফুলমু, আর ঢুকেই অবাক হলো।

নাহুর নানী হাসি হাসি মুখ নিয়ে ঘরের সামনে বসা, আর তার সামনে রং ঝলমলে একপ্রস্থ মেয়েদের পোষাক, চোয়ি (কামিজ), চান্নান (পাজামা), চাতুর (গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা ওপরের পোষাক),—জঙ্গি (মাথার পোষাক), ও মাঙ্গান (কোমর বন্ধনী), সব কিছুর রঙই মুগ্ধ করলো ফুলমুকে, তাছাড়া আরো আছে, মস্ত বড় একটা আস্ত ভেড়ার মাংস পাশে রাখা রয়েছে। মাংস খেতে খুব ভালবাসে ফুলমু, চোখ দুটো ওর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। নাহুর নানী স্নেহগলায় ডাকলো, "আয় বেটি, এদিকে আয়—"

কিন্টা আর ঘড়া নামিয়ে যেন যন্ত্রচালিতের মতো নাহুর নানী মোজলীর সামনে এসে বসলো ফুলমু।

মোজলী কোলের থেকে একটা লম্বাপানা পেটরা নামালো। পেটরার ঢাকনা খুলতেই নতুন গয়নাগুলি ঝিকমিকিয়ে উঠলো। ডঙমালা (গলার মালা), শাংকলি শাতক (কানের গয়না) ও কাঙহু (হাতের গয়না), সব তুলে তুলে দেখালো ফুলমুকে। সব ক'টি অলংকার সুন্দর। ফুলমুকে মনে মনে স্বীকার করতেই হলো। ঠোঁটের কোনে হাসি দেখা দিলো ফুলমুর। কিন্তু মোজলী যেই একটা কাঙহু পেটরা থেকে তুলে নিয়ে ফুলমুর হাতে পরাতে গেছে, অমনি ঝলমলে পোষাক, ঝকঝকে গয়না আর মস্ত ভেড়ার মাংসটা আড়াল করে, নাহুর পাহাড় চেহারাটা ফুলমুর চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠলো।

—এটা তো কন্যাপণ। কাঙহু হাতে পরার সঙ্গে সঙ্গে তো নাহুকে ওর বর ব'লে স্বীকার করে নিতে হবে। কী সর্বনাশ! ফুলমু এখন কী ক'রে! কন্যাপণ ফেরৎ দেয়া মানে নয়নরাজকে অপমান করা। ওরা সব দিক দিয়ে কত অসহায়। নয়নরাজকে অপমান করে ওরা কী আর সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে পারবে।

আর তা ছাড়া কেঁদে কেটে হাট বসালেও মা আর নানী কিছুতেই কন্যাপণ ফেরৎ দেবেনা, আর কিছুদিন পরে হলে, মানে পর্দা ওদের আসুর ক্ষেতি জমিটা বানিয়ে দেয়ার পরে হলে ও তবু জোর দিতে পারতো কিন্তু এখন ও ক'রে কী! কী বলবে ফুলমু, এখন ও কী করবে,—আতংকে ফুলমুর মুখ একেবারে পাংশু হয়ে গেলো। সমস্ত কিছুর থেই যেন সাময়িক ভাবে হারিয়ে ফেললো ও। সেই নয়নরাজ যাকে পাঁচমিনিট ও সহ্য করতে পারে নি, তার সব কিছু সব সময় সহ্য করতে হবে ওকে।

হঠাৎ গতরাত্রের একটা কথা ফুলমুর কানের কাছে ঘামাযার মত বেজে উঠলো:...সর্দার পরমরাজ যদি নাই রক্ষে করতে পারে আমাকে, তাহলে আমি নিজেকে নিজেই রক্ষে করবো..। তার উত্তরে পরমরাজ বলেছিলো,—সেই ভাল।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলল ফুলমু।

নাহুর নানীর হাতের ভেতর থেকে হাতখানা টেনে সরিয়ে নিলো। মোজলী অবাক হয়ে গেলো, চন্দ্রক, পরিচারী সকলে। মোজলী বললো, "কী হয়েছে বেটি, তোর শরীর খারাপ করছে?"

"না নানী—" ফুলমু উঠে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বললো, "নয়নরাজের বউ হবার লোভে এতদিন সাচ বাত বলিনি কিন্তু কাল রাতে সর্দার নয়নরাজকে চোখে দেখার পর ঠিক করে ফেলেছি,—নায়ুর বউ হয়ে মণিমহেশ গাঁয়ের অত বড় সর্দারকে আমি মেরে ফেলতে পারবো না—"

তিনজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, "কী বল্‌ছিস্ বেটি, তোর দেমাগ্ (মাথা) কী খারাপ হয়ে গেছে?"

ফুলমু ওর মা ও শনিচারী নানীর দিকে তাকালো না। মোম্‌লীর দিকে তাকালো, চোখের দৃষ্টি সোজা, সহজ। বললো, "আমি সাচ্ বাত বল্‌ছি নানী, বিশুর পরবের দিন ওম্ সাধুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো। সাধু বাবা আমার হাত দেখে বলেছে,—বেটি তুই কখনো সাদী করিস না, তোর হাতে খসম্‌খানার (যে স্বামী খায়) একটা স্পষ্ট রেখা আছে। তোকে যে সাদী করবে, এক মাহিনার কী দো মাহিনার ভেতর তার মরণ হবে।"

—বলে কী মেয়েটা! নায়ুর নানী নাতির অমঙ্গলের আশংকা করে বারে বারে শিউরে উঠলো।

চন্দ্রু, শনিচারী কল্‌বলিয়ে অনর্গল কী সব যেন বলতে লাগলো, তার একবর্ণও কানে গেলোনা ফুলমুর। ও তখন মনে মনে ওম্‌সাধুকে স্মরণ করে প্রার্থনা জানাচ্ছে: সাধু বাবা, আমার অপরাধ নিয়োনা, তুমি নিজে কতজনকে তো ত্রাণ করেছো, আজ আমি তোমার নাম নিয়ে ত্রাণ পেলাম।

ফুলমু নিঃসন্দেহে জানে, ওম্‌সাধু বাবার নাম নিয়ে যখন ও একথা বলেছে তখন ওর সাদীর কথা আর কোনোদিন উঠবে না, আর কেউ কন্যাপণ নিয়ে ওদের ঘরে কখনো আর আসবে না। চন্দ্রু, শনিচারী এ সংবাদ গোপন করলেও নায়ুর নানী যে সকলের কাছে এ সমাচার পৌঁছে দেবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই নিশ্চিন্ত ফুলমু। এখন ওদের আলুর ক্ষেতিজমিটা হলেই—ফুলমুর ভাবনায় বাধা পড়লো, নায়ুর নানী পেটরা বন্ধ করে উঠে এসে হাত রাখলো ওর পিঠের ওপর, বল্‌লো, "বেটি, কৈলস বর্ফীর তোর ভাল করুক, একথা আর কেউ বল্‌তো না—"

এতক্ষণে, ফুলমু যেন নিজের চেতনার সঙ্গে মুখোমুখি হলো। ওর চোখ কান ঠিকমতো কাজ করছিলো না এতক্ষণ। সেই পেল্লাই পাহাড়ের হাত থেকে এত সহজে মুক্তি পাবে, এটা যেন ও কখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। আনন্দ উত্তেজনাটাকে প্রাণপণে চাপতে হলো, প্রকাশ হয়ে পড়লে নায়ুর নানী আবার অন্য কিছু ভেবে বস্‌তে পারে। মোম্‌লীর পায়ে হাত দিয়ে শান্তভাবে প্রণাম করলো ফুলমু, তারপর চাতুর চালানগুলি পাট পাট করে গুছিয়ে তুলে দিলো তার হাতে। উঠোনে একটা পাহাড়ী বাচ্চা বসেছিলো, ফুলমু অনুমানে বুঝলো, ভেড়ার দাম্‌টাকে ওই বয়ে এনেছে। ফুলমু ডাক দিলো তাকে। নায়ুর নানী সাদাসিধে গোবেচারা গোছের। ভেড়াটাকে ওঠাতে বাধা দিলো, "না বেটি ওটা থাক। তোকে দিলাম ওটা—"

কিন্তু ফুলমু মানলো না। বাচ্চার ঘাড়ে জোর করে তুলে দিলো ভেড়াটাকে। কী জানি বাবা শেষকালে কী হতে কী হয়! নায়ুর ভেঁড়ার দাম্ খেয়ে হজম করা কী চাট্টিখানি কথা নাকি। শেষকালে ওর জোরে আবার যদি টানাটানি লাগিয়ে দেয় ফুলমুকে।

নাহুর নানী ও সেই ছোড়াটা চলে গেলো। তাদের পশ্চীর ওদের বাড়ির সামনের রাস্তায় ধাকে যেমনি সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রক উন্মাদিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো, "নভাগ (কাটা কপাল), পাপারাপিটা (প্রিয়জনকে যে আঘাত করে),—নাহু মরতো তো মরতো, তাতে তোর কী হতোরে হারামজাদী? চাষার কী জোয়ানের অভাব আছে? কেন তুই ও কথা বল্‌লি? কেন তুই গোয়াক গয়না ফেরৎ দিলি? কেন মাস্টাকে দিয়ে দিলি? বল্ হারামজাদী বল্…" অনর্গল গালাগালির সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রক ফুলমুকে কিলিয়ে যেতে লাগলো। ফুলমু দেয়ালে পিঠ দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একটু নড়লোনা চড়লোনা, একফোঁটা বাধা দিলো না। শনিচারী এসে টেনে নিলো চন্দ্রককে; "লাগিয়েছিস কী? শেষকালে মেরে ফেল্‌বি নাকি মেয়েটাকে?"

"মরুক, মরুক, ও নভাগ (কাটা কপালে) মরুক—" মুখ ভেংচে কথা কটা ব'লে হাঁপাতে হাঁপাতে বস্ ক'রে ঘরের এক কোণে ব'সে পড়লো চন্দ্রক।

বাইরে কয়েকজনের মিলিত কণ্ঠস্বর শুনে, দরজার কাছে গিয়ে মুখ বার করলো শনিচারী, "তোমরা কারা?"

"বাই, আমরা তোমার জমিতে কোদাল পাড়তে যাচ্ছি, তাই বলে গেলাম—" বারোজন জোয়ান জবাব দিলো।

শনিচারী ভয়ানক আশ্চর্য হলো। দু'হাত কোমরে দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আমার জমিতে কোদাল পাড়বে কেন তোমরা? তোমরা কী—নাহুর লোক নাকি?"

"না, আমরা সর্দার লোক"। সর্দার পর্দা হুকুম দিয়েছে, দু রোজের মধ্যে তোমাদের জমি তোরের ক'রে আলু লাগিয়ে দিতে।"

"সর্দার পর্দা এই হুকুম দিয়েছে, আমাদের চৌরালী গাঁয়ের পরমরাজ?"

"হ্যাঁ গো বাই-হ্যাঁ—" কোদাল কাঁধে বারোজন জোয়ান এগিয়ে গেলো শনিচারীর পতিত জমিটার দিকে।

শনিচারী সেইভাবে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে তোবড়ানো গাল কাঁপিয়ে হাসতে লাগলো। চন্দ্রক কখন এসে শনিচারীর পাশে দাঁড়িয়েছে।

"বুয়া, একী কাণ্ড?" চন্দ্রকর কণ্ঠস্বরের উন্মাদ লুকানো রইলো না।

প্রায় নাচতে নাচতে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো বুড়ী শনিচারী, চন্দ্রক, চণ্ডীমায়ীকে কাল পুজো দিতে হবে রে—, আর আমাদের অভাব রইলো না—" বুড়ি শনিচারী ঘরময় নাচানাচি লাগিয়ে দিলো। এদিকে ফুলমুর মা'র হাতের কিল খেয়ে একফোঁটা চোখের জল পড়ছিলো না। কিন্তু, সর্দার পরমরাজ ফুলমুর কথায় এত দাম দিলো, একবেলা দেরী করলো না লোক পাঠাতে—এ সীমাহীন আনন্দ ফুলমু কেমন ক'রে সামলায়। চোখ ছাপিয়ে বরঝরিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ঘরের কোণ থেকে নিজের মাদুরটা টেনে নিয়ে বিছিয়ে, তার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো ফুলমু।

আলুর জমি তৈরী হচ্ছে শুনেই চন্দ্রক ও শনিচারীর মন-মেজাজ জল হয়ে গেছে। চন্দ্রক মনে মনে কিছুটা আত্মশোষ করেই ফেললো,—মেয়েটাকে ওভাবে কিলানো ঠিক হয়নি। দুপুরে, চন্দ্রক যখন খেতে ডাকলো ফুলমুকে, তখন এটা বলেই মেয়েছিলো যে ফুলমুকে খাবার আজ কিছুতেই

খাওয়াতে পারবে না। কিন্তু, অবাক হলো। এক ডাকেই মেয়ে উঠে এসে খানা খেতে বসলো। রোটি অবশ্য মাত্র একখানা খেলো, রোজ যেখানে ছ'খানা খায়—কিন্তু মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে আর একটুও পীড়াপীড়ি করতে সাহস পেলোনা চন্দ্রক। খানা খেয়েই নিয়ম মাফিক বেরিয়ে গেলো ফুলমু।

আজকের আকাশ পরিষ্কার। বাতাস একেবারে স্থির। এরই মধ্যে বাতাসে শীতের আভাস। হাঁটতে হাঁটতে ফুলমু ওর সেই পছন্দমতো জায়গায় উঠে এলো। কিছুদিন আগে পাহাড়ের মাথায় পাইন গাছ ঘেরা এই সুন্দর নির্জন জায়গাটা আবিষ্কার করেছে ফুলমু। যখন ও একেবারে একলা থাকতে চায়, তখন ও চলে আসে এইখানে। এই পাইন ঘেরা পাহাড়ের চূড়ায় একটা চেপ্টা গৈরিক পাথর আছে, তার ওপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকতে খুব ভাল লাগে ফুলমুর। পাইন গাছের জঙ্গল ঠেলে ফুলমু পাথরের ওপর বসলো। নিপলক চেয়ে রইলো দিগন্তের দিকে। ছোটো ছোটো ছুটো গাঢ় নীল রঙের পাখি পাইনের ডালে ব'সে পর পর অনেকগুলি ডাক দিলো। তাদের তীক্ষ্ণ আর্দ্রস্বর আকাশ বেয়ে উঠে দূর গাঢ় বনে ডুবে যেতে লাগলো। চোখ ফেরালো ফুলমু। তারপর ওর চোখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলো অদূরের পাহাড়ের সারিতে, শীর্ষদেশে, পাহাড়ের ঢালুতে গাঢ়পালা ঘেরা ছোটো অরণ্যে, তারপর আরো নিচে যেখানে ইরাবতী নদীটা শুভ্র রুপোলি একটা বলিষ্ঠ রেখার মতো এঁকেবেঁকে গিয়েছে। সব কিছু ঘিরে কেমন সুন্দর একটি মৌন নম্রতা। এই প্রশান্ত বিপুল উদার ব্যাপ্তির দিকে চেয়ে চেয়ে ফুলমুর কেমন যেন একটা ঘোর লেগে গেল। সন্ধ্যা নামলো তবু ওর খেয়াল নেই। অস্তগামী সূর্যের রং আরো যেন নেশা ধরালো ওকে। গৈরিক চেপ্টা পাথরটার চারপাশে সুন্দর নানা রঙের লাল-নীল-হলদে বেগুনী ছোটো ছোটো ফুলগুলি, আরো মন ভোলানো হ'য়ে যেন ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। নিচু হয়ে একটা ছুটো ক'রে ফুল তুলতে লাগলো ফুলমু। হঠাৎ পাখির কিচির মিচির শব্দ শুনলো। কয়েকটা মনাল পাখি দলছুট হ'য়ে এদিক ওদিক উড়ে গেলো, তারপরই শুক্‌নো পাতার ওপর চেউ তুলে একটি দীর্ঘাকৃতি মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো।

"নয়নরাজ···!" ফুলমুর গলা চিরে শব্দটা বেরিয়ে এলো।

"হাঁ। ফুলমু আমি—" নাঙ্গু ফুলমুর পা ঘেঁসে পাথরটার ওপর বসে পড়লো।

"তুমি ওস্ সাধু বাবার নাম নিয়ে কী সব ঝুটবাত বলেছো মানীকে?"

নয়নরাজের কথার উত্তরে ফুলমু অস্ফুটে ফিকিয়ে জবাব দিলো, "সাধুবাবার নাম নিয়ে কেউ ঝুটবাত বলতে পারে? সে কোড়ি (কুষ্ঠ রুগী) বনে যাবে না? তোমার বিশ্বাস না হয় জ্যোষী (জ্যোতিষী) দিয়ে আমার হাত দেখিয়ে নিতে পার।"

নাঙ্গু ভুরু কুঁচকে গম্ভীর মুখ ক'রে বললো, "হুঁ···!" তারপর একমুহূর্ত বিরতি দিয়ে ফুলমুর হাত ধরে সজোরে আকর্ষণ ক'রে বললো, "অমন ক'রে কথা বলছো কেন তুমি? কী হয়েছে কী তোমার?"

"পেটে ভয়ানক দরদ হচ্ছে—" এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিয়ে কান্না গলায় জবাব দিলো ফুলমু। মনে মনে পর্ণাকে স্মরণ করে বললো,—তুমি তো বলেছিলে, নিজেকে নিজে রক্ষে না করলে আর কেউ রক্ষে করতে পারে না, কিন্তু এই একেবারে নিরালা জায়গায় নাঙ্গুর হাত থেকে নিজেকে কেমন ক'রে রক্ষে করি আমি? নাঙ্গু কী আর আজ আমাকে ছেড়ে দেবে···।"

মুখের চেহারা কালো মেঘের মত থমথমে ক'রে নয়নরাজ বললো, "সাদী আমি করবো না

তোমাকে, কিন্তু তোমাকে আমার চাই—। কালকেই আমি আমার গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছি। ওসব পেট ব্যথা টেথা মানি না, যাও ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকোগে এখন ; আজ রাত্রেই তোমাকে আমার চাই—।" চোখের মণিতে হিংস্র একটা শ্বাপদ ইচ্ছে বক্ বক্ ক'রে যেন জেগে উঠলো নাদুর।

"আচ্ছা—" করুণ গলায় বাধ্য মেয়ের মত জবাব দিলো ফুলমু। মনে মনে ভাবলো, এখন তো ওর হাত থেকে রক্ষে পাই, তারপর দেখা যাবে।

"চলো, তোমাকে ঘরে পৌঁছে দি—" নাদু উঠে দাঁড়ালো। দুহাত দিয়ে তলপেট চেপে ধরে ফুলমু গঙ্গিয়ে বললো, "নয়নরাজ, তুমি এখন যাও, পেট ব্যথা একটু নরম পড়লেই আমি ঘর যাবো।"

আর কিছু না ব'লে নয়নরাজ কুটিল চোখ ক'রে ওখান থেকে চলে গেলো।

"বাব্বা!" গলায় হাত বোলাতে লাগলো ফুলমু। ওর গলার কাছে জট পাকানো দীর্ঘনিশ্বাসটা এতক্ষণে মুক্তি পেলো যেন।

সমস্তটা পথ ফুলমু একটা ভয়জড়ানো আচ্ছন্নতার ভেতর দিয়ে পার হয়ে এলো। কী করবে ও! কেমন ক'রে আজ রাত্রে ও রক্ষে পাবে। ওদের ঘরটা ক্রমশঃ যত স্পষ্ট হচ্ছে ওর চোখে, ওর ভেতরের ভয়টা তত বড় আকার নিচ্ছে।

একটা পরিচিত গানের কলি শুনে মুখ ঘোরালো ফুলমু। একটা খচ্চরের পিঠে একবোঝা কাঠ চাপিয়ে একটা পাহাড়ী বাচ্চা দুলে দুলে গান গাইতে গাইতে আসছে :—

মুওরু চমরু ভৌরা মেঘা হো
রাণী চন্দ্রিয়ালীরে দেশা হো।
কিয়া মুওকা কিয়া চমকা হো
মুরগ ভারারা ঘনতারে হো
হিকাছু দি আই কালী বাদলি হো
নেহনা দা বর্ষেয়া মেঘা হো।

কবি কল্পনায় বাদলকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, এসো বাদল, তুমি রাণী চন্দ্রিয়ালীর দেশে এসো। বাদল বললো, আমি কী ক'রে আসবো বলো? আকাশ তো তারায় ভরা। কবি বলছেন, এ সময়—(চৈত্রমাসে রাণী চন্দ্রিয়ালী প্রজাদের মঙ্গলকামনায় জীবন উৎসর্গ করেন। কবি সে সময়ের কথা বলছেন) —রাণী চন্দ্রিয়ালীর কথা বড় বেশী ক'রে মনে পড়ে। মন বড় উদাস হয়, কাতর হয়। আমাদের চোখের অজস্র ধারাই যেন বাদল হয়ে দেখা দেয়। ফুলমু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গানটা শুনলো। খচ্চর তার মালিক ও একবোঝা কাঠ পিঠে নিয়ে ফুলমুর চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। গানের রেশও মিলিয়ে গেল। তবু দাঁড়িয়ে রইলো ফুলমু। রাণী চন্দ্রিয়ালীর গানটা প্রচণ্ড বেগে দোলা দিয়ে গেলো ওর মনকে।

চারবছর আগে, ফুলমু ওর নিজের নানীর সঙ্গে সুইমাতা পরবে যোগ দিয়েছিলো। সুইমাতা পরব অনুষ্ঠিত হয় চৈত্রমাসে। রাণী চন্দ্রিয়ালী, চৈত্রমাসে চাষার প্রজাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন যেখানে উৎসর্গ করেছিলেন, সেই জায়গায় হয় সুইমাতা পরব। ফুলমু তখন অনেক ছোটো। রাণী চন্দ্রিয়ালীর কাহিনীও তখনো শোনেনি। পরবের শেষে বাড়ি ফিরে এসে নানীর কাছে শুনেছিলো সেই আশ্চর্য ত্যাগের কাহিনী। প্রায় পাঁচ শ' বছর আগে, চাষাসহরের যখন প্রথম পত্তন হয়, তখন

সারা চাষা সহরে এক ফোঁটা পানীয় জল ছিলোনা। রাজা শিলভার্মা বহুলোক পাঠিয়ে নানাদেশ ঢুঁড়ে একজন ওস্তাদ লোক নিয়ে এলো। সে এসে চারিদিক দেখ্‌লো, মাপ্‌লো, তারপর সেলাম ঠুকে বললো,—মহারাজ, জল আমি এনে দিতে পারি চাষা সহরে, ঐ যে অনেকদূরে আমধাই পাহাড় দেখা যাচ্ছে—ওর পাশের দুরন্ত জলটাকে শিকলি পরিয়ে, টেনে হিঁচড়ে বাঁকিয়ে চুরিয়ে নিয়ে আস্‌তে হবে এখানে। কিন্তু, তার জন্য জনবল আর ধনবল, দুইই অনেক চাই। রাজা শিলভার্মা ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবৎসল রাজা। উনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—ওস্তাদ, তুমি কাজে নামো, যা চাও তুমি তাই পাবে। চাষার সমস্ত মিস্ত্রীমজুরকে ডাকিয়ে আনিয়ে ওস্তাদের কাজে লাগিয়ে দিলেন, রাজভাণ্ডার উজাড় ক'রে ধন দিলেন, এতটুকু দ্বিধা করলেন না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেলো, বছর ঘুরলো, প্রজাদের জলের কষ্ট দূর হবার আশায় সমস্ত অসুবিধে রাজ্যের অভাব অনটন, সব হাসিমুখে সহ্য করলেন রাজা শিলভার্মা। তারপর, এলো সেই দিন,—যেদিন ওস্তাদ জানালো, জল আসবে আজ চাষা সহরে। আর কোনোদিন জলের কষ্ট পাবেনা চাষাবাসীরা। তখন চৈত্রমাস। জলের বুকফাটা কষ্টে সমস্ত চষিয়াল চষিয়ালীরা কাটা বকরীর মতো দাপাচ্ছে। জল আসার সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই, ওদের হাড়ি-কাটা তিয়াস যেন তখনকার মতো দূর হ'য়ে গেলো। চৈত্রের খর দুপুর, শুক্‌নো খড়ো বাতাস কিছু মানলোনা। কাতারে কাতারে চাষার মেয়েপুরুষ, ছেলেবুড়ো সবাই এসে জম্‌লো সেখানে, যেখানে জল এসে জমা হবে। বিকেল পর্যন্ত কেবল লোকই এলো। কেউ যেন আর বাদ রইলো না চাষায়।

দয়ালু রাজা এবং দয়াবতী রাণীও এলেন। যত রাজার দয়া, তার চেয়েও যেন বেশী দয়াময়ী রাণীর। রাজা-রাণী এসে দেখেন, সমস্ত আকাশ ধুলোর ভয়ে গিয়েছে। আর মানুষগুলির শরীরে তার চেয়েও বেশী। হাজারে হাজারে লোক বাতাসের দামাল ঝটকা আর ধুলোর ঘূর্ণি সহ্য ক'রে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে সেই জল আসার জায়গাটাতে চোখে অদ্ভুত উদগ্র প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে।

সময় পেরিয়ে গেলো। বেলা চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু, কৈ? জল কৈ? পল, অনুপল, সেকেণ্ড মিনিট ঘণ্টা। একে একে অনেকগুলি ঘণ্টা পার হলো।

আকাশ, বাতাস কোনোটাই স্বাভাবিক নয়। রাজা তাঁর প্রজাদের আদেশ দিলেন ঘরে ফিরে যেতে। ধূলিবর্ণ লোকগুলো একে একে উঠে দাঁড়ালো। মুখ তুলে নিরীহ বোবা পশুর মতো সেই গর্তের চারিপাশে বারে বারে তাকালো, তারপর ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো রাজা-রাণীর চোখের দিকে। অসহ্য যন্ত্রণায় রাজা শিলভার্মা আর রাণীর বুকের ভেতরটা টন্ টন্ ক'রে উঠলো। ওস্তাদকে ডেকে রাজা-রাণী কৈফিয়ৎ চাইবেন কী, দুহাত দিয়ে বুক চেপে ধ'রে ওঁরা সেখান থেকে সরে গেলেন তাড়াতাড়ি।

সেই রাত্রে রাজা ও রাণী দুজনেই স্বপ্ন দেখলেন। সেই নির্দিষ্ট জায়গায় ওঁদের একজনের প্রাণ দিতে হবে। হয় রাজা শিলভার্মার, নয় রাণীর, কিম্বা ওদের শিশুপুত্রের। দুজনেই ধড়মড়িয়ে একই সময় পালঙ্কের ওপর উঠে বসেছেন।—কী? ব্যাপার কী? দুজনেই দুজনকে স্বপ্ন বিবরণ বললেন। তার একটু পরেই রাজা দৃঢ়স্বরে বললেন রাণীকে—রাণী, আমি মনস্থির ক'রে ফেলেছি, হাজার হাজার প্রাণ বাঁচানোর জন্য, আমিই ওখানে প্রাণ দেব। তুমি দুঃখ করোনা রাণী, তোমার কুমার রইলো, আর চাষার সমস্ত প্রজারা রইলো। রাণী আস্তে আস্তে জবাব দিলেন,—কাল সকালে আমরা এ বিষয়ে পরামর্শ করবো রাজা, এখন তুমি ঘুমাও।

সকালে রাজার ঘুম ভাঙে অনেক দেরীতে। অজস্র লোকের মিলিত উল্লাসধ্বনি আর শিঙার শব্দে শিলভার্মার ঘুম ভেঙে গেলো।

…জল, জল। জল এসেছে। ওগো, তোমরা সবাই দেখো এসে, কী সুন্দর স্ফটিকস্বচ্ছজল যেন নেচে নেচে চাষার আসছে। লাফিয়ে পালং ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শিলভার্মা। জল তাহলে এলো! নিজের প্রাণটা বলিদান করার দরকার নেই তাহলে! রাণী! রাণী! কোথায় তুমি? জল এসেছে, প্রাণ এসেছে চাষা সহরে! কক্ষের বাইরে ছুটে বেরিয়ে আসতেই রাজার গতি রুদ্ধ হলো। তিনটে লোক দরজার পাশে গড়াগড়ি ক'রে কাঁদছে। ধক্ ক'রে উঠলো শিলভার্মার বুকের মধ্যে। কে তোমরা? কী চাও? রাজার কণ্ঠস্বর কানে যেতেই তিনটে লোক মাথা তুলে নিজেদের শরীরগুলোকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে রাজার পায়ের ওপর উপুড় হ'য়ে পড়লো।—মহারাজ, রাণীমার হুকুম অমান্য করতে পারিনি, আমরা আমাদের রাণীমাকে নিজের হাতে জীবন্ত সমাধি দিয়ে এলাম।

মহারাজ কানে হাত দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে চেতনা হারিয়ে পড়ে গেলেন সেখানে।

কাহিনী শেষ ক'রে ফুলমুর নানী চোখে হাত চাপা দিয়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলো। ফুলমু কাঁদেনি। কেমন একরকম পাথর হ'য়ে বসেছিলো, ঠেলে বেরিয়ে আসা কান্নাকে দাঁতে দাঁত চেপে ঠেকাচ্ছিলো কেন কে জানে। ঐটুকু বয়েসেই রাণী চম্বিয়ালীকে স্মরণ ক'রে মনে মনে ও বার বার প্রণাম জানিয়েছিলো।

রাণী চম্বিয়ালী চৈত্রমাসের যে দিনে এবং যেখানে নিজের প্রাণ বলিদান করেছিলেন, সেইখানে সেইদিনে সুই-মাতা পরব ব'সে চৈত্রমাসে।

ফুলমু তার নানীর সঙ্গে সুই-মাতা পরবে যেদিন গিয়েছিলো, সেইদিন শুনেছিলো এই গানটা। আজ গানটা শোনামাত্রই রাণী চম্বিয়ালীর আত্ম-বলিদানের কাহিনী আগাগোড়া মনে প'ড়ে গেলো। পথের ওপরই দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর হাত জোড় ক'রে রাণীকে প্রণাম জানালো ফুলমু।

ঘরে ঢুকে ফুলমু অবাক হলো। বড় চেহারার সেই ভয়টা, কাঁপা কাঁপা চমকটা ওর ভেতরে আর একফোঁটাও নেই। এমনকি নাম্বুকে ওদের ঘরের মধ্যে বসা দেখেও না। নাম্বু উঠে দাঁড়ালো। ওর পেটের দরদের কথা আর জিগ্যেসই করলো না। ওর গা ঘেঁসে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় গলা নামিয়ে ব'লে গেলো, "আজ আর খানাপিনা কিছু করোনা, চুপ করে শুয়ে থাকো। আর একটু পরেই আমি আসছি—" বাঁ চোখের কোণটা কুঁচকে, বিশ্রী একটা ইশারা ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো নাম্বু।

মুহূর্তের জন্য অনমনা হয়েছিলো ফুলমু। মনস্থ হলো চন্দ্রু আর শনিচারীর মিলিত গলায়, "বেটি, আর দেরী করিস না, কিছু খেয়ে জল্দি সাফ্ সুফ হ'য়ে নে—।" চন্দ্রুর গলা থামলো, শনিচারীর তখনো থামেনি, "মণিমহেশের জোতদার নয়নরাজার তার আছে। ওকে বেঁধে রাখতে পারিস যদি তাহলে দু দিনেই গাউ, বকরী সব হ'য়ে যাবে আমাদের—" বুড়ি টেনে টেনে সমানে হাসতেই লাগলো।

ফুলমু চোখ বড় বড় ক'রে তাকিয়ে রইলো।

: নানী, আম্মা এসব কী বলছে। "একে কী যেন বলে। খুব খারাপ ব'লে। নামটা উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারছেনা ফুলমু। আম্মার রুচি ভাল নয়—তা ও জানে, শনিচারী নানীর বিকৃত রুচির গল্পও ইতিমধ্যে বহু শুনে ফেলেছে। কিন্তু, তাই ব'লে নানী আর আম্মা হ'য়ে ওকে এই কথা বলবে নাকি!

"যা বেটি, ফটাফট্ (তাড়াতাড়ি) কর—" চন্দ্রুর কথায় নিজেকে ঝাঁকি দিয়ে সচেতন ক'রে নিলো ফুলমু।

"হ্যাঁ, এই যে যাই আম্মা—" ফুলমু দু পা এগোতেই নানী আর ওর মা'র হাতের মুঠি দুটো নজরে পড়লো। দুজনের মুঠিতেই কয়েকখানা ক'রে একটাকার নোট রয়েছে।

: কত টাকা? ক'টা টাকা দিয়ে আম্মা আর নানীর মনকে কিনে নিলো নয়নরাজ? পাঁচ? দশ? বিশ? ওর সহেলী বুধিয়া একদিন একমুঠো দাখ (কিসমিস) মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বলেছিলো, "বুঝলি ফুলমু, শুধু চীজ দিয়ে, মানে রোপায়া দিয়ে সব কেনা যায়, আর সবাইকে কেনা যায়—।"

ফুলমু বললো, "সব কেনা যেতে পারে কিন্তু সবাইকে কেনা যায় না—"

বুধিয়া তার আঁটো বুকটা চিতিয়ে—চোরি থেকে আবার একমুঠো দাখ্ বার ক'রে ওদের দুজনের চারপাশে ছড়িয়ে দিলো। সামনের গাছ থেকে নেমে এলো এক ঝাঁক তিতর (তিতির), খুঁটে খুঁটে খেতে লাগলো। বুধিয়া চোখ টিপে হেসে বললো, "দেখ্লি তো? বুঝ্লি কিছু?"

ফুলমু অবশ্য সহেলীর কথার সার মর্মটা বুঝলো, কিন্তু ও অবাক হচ্ছিলো এইজন্য, ওদের সকলেরই অতি প্রিয় খাদ্য এই কিস্মিস, কিন্তু দাম বেশী ব'লে ওদের মতো গরীব ঘুঘরুরা কেউ দাঁতে কাটতে পারেনা; আর বুধিয়া কিনা মুঠো মুঠো কিসমিস এপাশে ওপাশে ছড়াচ্ছে, বুধিয়ার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ও জিগ্যেস করলো, "এতো কিসমিস কোথায় পেলিরে বুধিয়া? আমরা মুখে তুলতে পারিনা আর তুই চিড়িয়াদের বিলোচ্ছিস—"

বুধিয়া ঝঙ্কার দিয়ে বললো, "দেবে আবার কে? দিয়েছে গাম্বুরাজ—", হাত ভ'রে আবার দাখ্ বার ক'রে ফুলমুর সামনে এগিয়ে ধরলো "নে, খা—"

মাথা নেড়ে অস্বীকার ক'রে ফুলমু বললো, "না, নেবনা, বললাম তো, সবাইকে কেনা যায়না—।"

বুধিয়া চট্লোনা, শরীর দুলিয়ে ঢেউ খেলিয়ে খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো, "ঐ গাখো, মেয়ের বুদ্ধিখানা গাখো। তোর ভারি কাঁচা বুদ্ধি ফুলমু। তোকে নিয়ে চন্দ্রকচাচীর ভারি ভোগান্তি আছে দেখতে পাচ্ছি।" হাতের দাখ্ গুলো মুখে দিয়ে প্রসন্নমুখে চিবোতে লাগ্লো বুধিয়া। চিবোনো শেষ ক'রে বললো, "যতদিন আমাদের চেকনাই আছে, ততদিন আমরা নেবনা কেন? নানীদের মত বয়েস হ'লে আমার জন্য পেটুয়া ক'রে কেউ ডডমালা আন্বে না, বুড়ি ভ'রে কেউ মেওয়াফল আন্বে?"

বুধিয়ার নতুন ডডমালাটা চাদুরের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিলো। কথা শেষ ক'রে গলার হারটা টেনে বার করে দেখলো বুধিয়া, তারপরে ভুরু বেঁকিয়ে ঠেরিয়ে ঠেরিয়ে হাসলো। নতুন হারের জেল্লা দেখেও ফুলমুর মুখে জেল্লা এলোনা, মুখ গোঁজ ক'রে বললো, "বুধিয়া, তোর সুরৎ আছে কিন্তু রুচি নেই—"

বুধিয়ার আবার সেই আগের মত গা চলিয়ে খিল খিল হাসি। হাসতে হাসতে বললো, "বাস ফুলমু। মেয়েদের শুধু সুরৎ থাক্লেই হলো। এই দুনিয়ায় আর কিচ্ছু লাগেনা।"

"কিন্তু ধর্ম? সুরৎ তো আর চিরদিন থাকবে না তোর, তখন?"

"তখন, ধর্ম করবো। বুড্যা না হ'লে যম আদার ক'রে কেরে? আমি তখন কৈলসবজীরের মাথায় রূপোর ছাতা বানিয়ে দিয়ে বলবো,—বাপু, আমার এতদিনের সমস্ত দোষ ত্রুটি তুমি মাফী ক'রে দিও। দেখবি, তখন আমাকে সবাই মহাপুণ্যবতী বল্বে। কিন্তু এখন নয়। এখন শুধু দুহাতে টাকা লুটবার বয়েস—"

ফুলমু ঘর ছেড়ে উঠোনে এসে দাঁড়ালো। মুখ দিয়ে বিড় বিড় ক'রে অস্পষ্ট উচ্চারণ করলো,—

এখন শুধু টাকা লুটবার বয়েস···। শনিচারী নানী কী বললো,—মধিমহেশ গাঁয়ের নয়নরাজের অনেক ভার আছে, তাকে ও বেঁধে রাখতে পারে যদি তাহলে ওদের কোনো অভাব থাকবেনা। গাউ-বকরী হবে, ওর ভড়মালা, কাড়ন হবে, রেশমী চাদুর চাদান হবে, আর কী হবে? চাই কি, ও যদি নাথুর কাছে কৈলাসবজীরের জন্ত একটা রূপোর ছাতা চায় সেটাও হবে। তাও নয়নরাজ এখুনি বানিয়ে দেবে, ফুলমু এখুনি সেটা হলপ ক'রেই বলতে পারে। তাহলে ক্ষতি কী? শনিচারী নানীর মত বুড়ি হ'লে ওর কাছে তো আর কেউ আসবেনা। এই তো সময়, এখনই তো সময়। এই তো সেদিন নিরালা দুপুরে, ঐ পাজী গাদুরাজটা ওর সামনে এসে একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিলো, বুধিয়া কেপে যাবে বলে সেকথা ও জানায়নি বুধিয়াকে। বুধিয়া একদিন বলেছিলো:,—যা কর কর, সয়েলীর আদমীর দিকে খবরদার নজর দেবেনা,—ওটা মস্ত বেইমানী। পাজীটা ওর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে, মিষ্টি মিষ্টি হেসে কোর্তার জেব থেকে একটা পাকা-পুষ্ট আমরুদ্ (পেয়ারা) বার ক'রে বললো,—শুক্রন বিটি, এই নাও আমরুদ খাও, চলো, আমরা ঐ ক্ষেতের ধারে যাই—তোমার চাদুর ভ'রে অনেক মেওয়া দেব। না, চাইনে ব'লে হনহনিয়ে চলে এসেছিল ফুলমু।

উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো ফুলমু,—ওর স্বপ্ন দিয়ে নয়নরাজকে ও তাহলে বেঁধেই রাখবে। কিন্তু, একটা গলাপাকানো কান্না ঠেলে ওর গলা পর্যন্ত উঠে আসছে কেন? ওর বুকের পাঁজরা গুলো টন্‌টন্ করছে কেন? চোখে জল কেন? আর হৃৎপিণ্ডটা অনবরত আর্তনাদ করছে কেন,—এটা ভাল নয়, খারাপ, খারাপ, খারাপ।

সাফ্‌সুফ্ হবার জন্ত আবার তাগাদা দিলো চন্দ্রু। ফুলমু নিজের মনের চেহারাটাকে এতক্ষণে স্পষ্ট দেখে ফেলেছে। বললো, "আম্মা, নদীতে গিয়ে ভাল করে নাহা ক'রে আসি, বড় গন্ধা হয়ে গেছে শরীর।"

"না না-" প্রতিবাদ করে উঠলো চন্দ্রু, "এই সাঁঝবেলায় নদীতে যেয়ে কাজ নেই, ঘরে যা জল আছে তাই দিয়ে নাহা করে নাও।"

"আম্মা, আজ তো পুর্ণিমা (পূর্ণিমা)। পথে ঘাটে কোথাও তো কোনো আঁধেরা নেই। সোজাপথে যাব, আর টপ করে নাহা করে আসবো। আর নদীর ধারে মেলা গাটিয়া আর টেসু ফুল ফুটে আছে, আসবার সময় নিয়ে আসব তোয়ালিয়া ভরে তুই গহনা বানিয়ে দিস—আজ আমার পরতে মন চাচ্ছে।"

মেয়ের মুখে এ ধরণের কথা শুনে খুব বেশী রকম প্রীত হলো চন্দ্রু, বললো, "আচ্ছা, তাহলে দেরী করিস না, ফটপট চলে যা।"

তোয়ালিয়া কাঁধে ফেলে ফুলমু ক্ষিপ্রপায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

হনহনিয়ে হাঁটছিলো ফুলমু। সোজা সড়ক দিয়ে নদীর দিকে নয়, ঠিক তার বিপরীতদিকে চৌরাসী গাঁয়ের পথ ধরে হাঁটছিলো, ঝিন্‌ঝিনে জ্যোৎস্নায় চলতে কোনো কষ্ট নেই। আর একটু কম আলো হলে বরং ভাল লাগতো ফুলমুর, একলার ছলির (ছুরী) ক্ষেত ভাইনে রেখে আঁকা বাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চললো। ছুটে ছুটে চলছিলো। চড়াই শুরু হলো এরপর। ফুলমু একটু ছোটে আর পেছনে ফিরে তাকায়। যেন নাথুর পেশীবহুল পুরুষ হাত দুটো ওর পেছন পেছন ছুটে আসছে, ওর শরীরটাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরছে। ছুটতে ছুটতে হাঁফ ধরে গেছে ফুলমুর, একটু দাঁড়ালো।

একদিন বেলাবেলি এসে পর্ণার আস্তানা ও দেখে গেছে। ভেতরে ঢুকতে সাহস পায় নি।—অমন বন বাদাড়ের মধ্যে ঘর তুলে বাস করছে কেন—কে জানে। গুলাবার কাছ থেকে পর্ণার বাড়ির নিশানাটা জেনে নিয়েছিলো। তাছাড়া আরো একটু প্রয়োজন ছিলো। গুলাবা ঠিক স্পষ্ট না বললেও আভাস দিয়েছিলো—ওখানে পর্ণার বাড়ির কাছেই একটা লোহারের (কামারের) দোকান আছে—সেখানে ছোরা মিলতেও মিলতে পারে। কিন্তু মেলেনি। বৃদ্ধ লোহারটা মাথা নেড়ে বললো—ও শুধু কড়াই, কাড়ছি (হাতা) বানায়, আর কিছু নয়—তারপর শুধু খক্ খক্ করে কাশতেই থাকলো, আর কোনো একটা কথাও বলতে পারেনি ফুলমু। সেদিন বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েই ছ'মাইল পথ ভেঙে ও বাড়ি ফিরেছিলো। এখন ছুটতে ছুটতে ভাবছিলো—ভাগ্যিস, সেদিন সর্দারের বাড়িটা ও চেনা করে গেছে, না হলে এই রাত্তিরে আজ ও কী করতো।

হঠাৎ বেলগাড়ির (বলদের গাড়ি) চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ শুনতে পেলো। আর তার পেছনে কতগুলো পায়ের শব্দ আর বিচিত্র গুঞ্জন। ঝট্ করে পাশের গাছগুলোর ঝট্লার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো ও। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ আর বিচিত্র গুঞ্জন ক্রমশঃ স্পষ্ট হলো, তারপর আবার আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলো। বেলগাড়ি বোকাই গাছের ডালপালা। পেছনে মাথায় কেট্টি বেঁধে পাঁচজন পাহাড়ী কিষাণ। আজ হাটবার ছিলো। বেরকম ফুর্তীলসায় ওরা কথা বলতে বলতে চলেছে, ফুলমু বুঝলো আজ ওদের বেচাকেনা বেশ মনমতো হয়েছে। নিশ্চই ওই ডালপালার আড়ালে—ওদের কেনা মাস (মাংস) রয়েছে অনেকখানি করে। আজ ওরা রোটি খাবে না, চাল পাকাবে নিশ্চই।

ফুলমু গাছ গাছালির আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের আলোয় কিন্‌কি মিলিয়ে গেলো, যেন নিবিড় কালো একরাশ কেশ দিয়ে পূর্ণিমা তার আলোয় ভরা মুখখানি ঢেকে ফেললো। ফুলমু বিবর্ণ পাংশুমুখে এদিক-সেদিক তাকাতে লাগলো। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। একটু পরে সেই জমাট অন্ধকারটা কেটে গেলো বটে কিন্তু শুরু হলো এলোমেলো বাতাস আর বৃষ্টি। প্রথমে টুপ্‌টাপ্। তারপর ঝম্ ঝম্। তোয়ালিয়াটা মাথায় দিয়ে প্রাণপণে ছুটে চললো ফুলমু। বাতাসে কেমন একটা একটানা গোঙানি। আর মাঝে মাঝে আলো আর ঝাপসা অন্ধকার। মনে হচ্ছে পথের দিশা বুঝি হারিয়ে ফেললো ও। বাতাসের ঠাণ্ডা ঝাপ্‌টায় আর নানারকম কল্পিত ভয়ে থেকে থেকেই ওর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছে। তবু ওর ছোটার বিরাম নেই। পর্ণার কথা ভাবছিলো। রাত্রিবেলা ওকে দেখে যদি খুব রাগমন্দ করে! যদি তাড়িয়ে দেয়!

পরমরাজ তখন একটা কাঠের টুলে বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে কাঙড়ার অজেয়-দুর্গের কথা ভাবছিলো। দুর্গ, একটা বানাতেই হবে। তবে সেটা লোক চক্ষুর আড়ালে কেমন করে হতে পারে। তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলো। পাহাড়ের ওধারে ওধারেই ও দুর্গ বানাবে কয়েকটা। বেশ কয়েক বছর ধরেই ও নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র আর শুকনো রসদ সংগ্রহ করে যাচ্ছে। ভালভাবে ঘাঁটিঘাঁটি না বেঁধে ব্রিটিশ সিংহের সঙ্গে লড়াইয়ে নামা যাবে না। অনেকদিন থেকেই কাঙড়া দুর্গটা দেখবার ইচ্ছে ওর মনে হয়েছে। আজ সকালে ওর চ্যালাদের দশ বারো দিনের কাজের তালিকা ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। আগামীকাল ও পাঠানকোট হয়ে কাঙড়া রওনা দেবে।

পরমরাজ ঝুঁকে আংটার আগুনটা উস্‌কে দিলো, কোনো কোনো দিন ওর নিজের হাতে মাংস পোড়াতে সখ যায়। ওর সামনে রাখা আছে গনগনে আগুন ভরা একটা মস্তবড় আংটা। আর তারই ওপরে লম্বালম্বি ঝোলানো রয়েছে একটা আস্ত ভেড়ার মাদ্।

মাঝে মাঝে ভাবনা থামিয়ে কুলুদানো বাংলা এক একবার দেখে নিচ্ছে।

পেছনদিকে হাতদুটো মুড়ে একটু আড়মোড়া ভেঙে নিলো পর্মা : না আর দেরী নয়। কালই যাব। যেতোতো অনেক আগেই। কিন্তু, সেই মস্ত ফকীর মানুষটির জন্ম ও যেন মনে মনে কী একটা আশা নিয়ে অপেক্ষা করছিলো। ন' বছর হয়ে গেলো, তার আশ্চর্য কণ্ঠস্বর আর তো শোনা যেলোনা। মনে আছে পর্মার, সব মনে আছে।

ন' বছর আগে, উনিশ'শো একুশ সালের গোড়ার দিকে, ভারতের পশ্চিম দিক থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন সেই মস্ত ফকীর মানুষটী। পথে বেরিয়ে এসে আহ্বান করেছিলেন সবাইকে। কোনো দুর্গ থেকে নয়। হাতে কোনো হাতিয়ার নেই, জমানো শুকনো রসদ নেই। পরণে আঁটোসাঁটো একটা পোষাক নেই পর্যন্ত। ক্ষীণদেহ নিয়ে, আধা ন্যাংটা পোষাক পরে সেই আশ্চর্য মানুষ আশ্চর্য গলায় ডাক দিলো—তোমরা সবাই এসো। আমরা এক হই। আমরা মিলিত গলায় বলি এসো,—আজ থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে আমরা মানবো না, আমাদের দেশের বুকের পাঁজর গুঁড়িয়ে দিয়ে তোমাদের বিজয় রথ এগিয়ে চলেছে, এতদিন রথের চাকায় আমরাই তেল জুগিয়েছি; আজ থেকে আর জোগাবো না।

এসো ভাই, তোমরা সবাই এসো। সেই ন্যাংটা ফকীরের ডাক শুনে, পিলপিলিয়ে হাজার হাজার লোক বেরিয়ে এলো। পরমরাজ তখনও যুবক হয়নি। ওর বাপু সংসাররাজ রোজ রোজ এই আশ্চর্য ফকীরের কাহিনী শোনাতো। সবাই যখন গলা মিলিয়ে বললো,—আমরা মানবোনা। তখন অতবড় সাম্রাজ্য-শক্তি সত্যি সত্যি কেঁপে উঠেছিলো থরথরিয়ে। অনর্গল গুলি চালিয়ে অসংখ্য প্রাণ নিলো, আর অসংখ্য লোকদের জেলের ভিতর লোহার খাঁচায় আটকে রাখলো।

তারপর ন'বছর ধরে সেই আশ্চর্য কণ্ঠের আহ্বান শোনার জন্ম অপেক্ষা ক'রে আছে পরমরাজ।

মাঝে মাঝে আফসোস করে পর্মা,—ও কেন তখন ছোটো ছিলো, কেন যুবক বয়েস হয়েছিলো না তখন। ও তাহলে চলে যেতো সটান বাপুজীর কাছে, বলতো, বাপুজী, হুকুম কর—আমরা সেনা বানাবো, সৈন্য বনবো, হাতিয়ার সংগ্রহ করবো—সব করবো। তুমি শুধু আমাদের মাথার ওপরে থাকো। ঐ ব্রিটিশ-সিংহ আগুনের গোলা ছাড়া হটবেনা। ··

হঠাৎ পর্মার ভাগড়া কুকুরটা লাফিয়ে উঠলো।

"এ্যাই ছান্নু, চুপ—" পর্মা ধমক দিয়ে উঠলো। মাঝে মাঝে দূরের জঙ্গলে দু একটা নেকড় বাঘ কি বনশুয়র পেলে ছান্নু এমনি লাফালাফি ক'রে। কিন্তু প্রভুর ধমক মানলোনা ছান্নু। দরজার সামনে এসে গরগর করতে লাগলো আর জোরে জোরে ঠেলতে লাগলো মাথা দিয়ে।

"হলো কী তোর?" বিরক্তগলায় ধমক দিয়ে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো পরমরাজ। বড় বড় পা ফেলে দরজা পর্যন্ত হেঁটে এসে হড়াৎ ক'রে হুড়কো খুলে হাট ক'রে খুলে দিলো কপাট। ছান্নু এক লাফে ডিঙিয়ে গিয়ে, একেবারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে তার সামনের দুটো নখর থাবা দিয়ে দুটো কাঁধ সজোরে চেপে ধরলো। হয়তো এতটা করতোনা ছান্নু যদি ফুলমুর মুখ দেখতে পেতো। তোয়ালিয়াটা ফুলমুর মাথা-মুখই শুধু ঢেকেছিলোনা, ভিজে লেপ্টে গিয়ে একটা অদ্ভুত আকার নিয়েছিলো। শুধু একমুহূর্ত বোধহয় বিলম্ব হয়েছিলো পর্মার, তারপরই প্রভুর হাতের ধাক্কা খেয়ে দূরে ছিটকে পড়ে গেলো ছান্নু। তখনও ফুলমুর গলার ভয়ার্ত আর্তনাদ মিলিয়ে যায়নি।

বাতাসের গোঙানি তখনো কমেনি। হু হু হাওয়া আর আকাশের বুক চিরে আলোর রেখা ঝল্‌কে উঠ্‌লো, অন্য যে কেউ হ'লে ছুট দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়তো। কিন্তু ফুলমু, তোয়ালিয়াটা মাথা থেকে সরিয়ে পর্মার দিকে তাকিয়ে শক্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"একী, ফুলমু—তুমি! শিগ্‌গির ঘরে এসো—" পর্মার আহ্বানেও ফুলমুর তয় ঘুচলোনা। সেই আগের মত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

পর্মা হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে কপাটে খিল তুলে দিলো।

"কী ব্যাপার ফুলমু? এই রাতে, এমন ঝড়ে-বাদ্‌লার মধ্যে তুমি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছো কেন?"

ফুলমু চুপ।

"আমার ডেরা চিনলে কী ক'রে তুমি?"

ফুলমু নিরুত্তর।

"জবাব দিচ্ছোনা কেন?" পর্মার গলা ক্রমশঃ রাগী হ'য়ে উঠ্‌ছে। ফুলমু মাটির দিক থেকে চোখ তুলে তাড়াতাড়ি পর্মার দিকে তাকালো। কিন্তু বোবা চোখ, কোন ভাষা নেই। ঠোঁটদুটো একটু একটু করে কেঁপে উঠ্‌লো, কিন্তু কোনো স্বর বার হলোনা। ও বুঝতে পারছে পর্মার চারিপাশ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কাছে যাবার চেষ্টা করলেই কাঁটার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হ'তে হবে।

পর্মা ফুলমুর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলো, বৃষ্টি-ধোয়া ফুলমুর মুখ যেন একটি ফুল। এমনি সুস্থ, এমনি শুভ্র।

গলার ঝাঁঝ কমিয়ে পর্মা বললো, "তুমি যে এখন বড় হয়েছো তা বুঝতে পারোনা?"

"পারি—" ফুলমু কোমরের দুপাশে দু হাত দিয়ে ভিজে চাদরটাকে টেনে টেনে সটান করতে লাগলো। চাদর, চোলি এমনভাবে লেপ্টে গেছে বুকের সঙ্গে, সেদিন ওর সই বুধিয়া দাখ্‌ (কিস্‌মিস) খেতে খেতে, শরীর দুলিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে হঠাৎ বুক চিতিয়ে কিরকম একটা ভঙ্গি ক'রে দাঁড়িয়েছিলো, সেই ভঙ্গি সেই চঙ্‌চাও ভয়ানক খারাপ ঠেকেছিলো ফুলমুর চোখে, ঠিক যেন সেইরকম নির্লাজ ভঙ্গি এখন ওর বুকে হ'য়ে গেছে।

এতক্ষণে ওর সপসপে ভিজে পোষাকের দিকে চোখ পড়লো পর্মার। সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম, "আর এক মিনিট দেরী নয়। আমার সঙ্গে এঘরে চলে এসো। আমার কোর্ত্তা—পায়জামাই পরতে হবে এখন উপায় নেই।"

মৃদুগলায় আপত্তি তুললো ফুলমু, বারে বারে বললো,—ঐ আংটার সাম্‌নে একটু বসলেই ওর পোষাক সব শুকিয়ে যাবে কিন্তু পর্মার আর একটা ধমক খেয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেলো।

পরমরাজ ওর আগেকার ছোটো পোষাক বার ক'রে দেবে ভেবেছিলো, কিন্তু তাতে দেরী হবে। মেয়েটা শীতে থির থির করে কাঁপছে, আর দেরী করা ঠিক্ হবে না। এখনকার পোষাকই একপ্রস্থ দিলো। আর গরম একটা চাদর ফুলমুর হাতে দিয়ে আগের ঘরে চলে এলো। আগুনের পাশে আর একটা টুল রাখলো ফুলমুর জন্য। টুলে ব'সে আংটার আগুনটা নেড়ে নেড়ে গনগনিয়ে দিলো। হাত-পা বার ক'রে আগুনে সেঁকতে লাগলো।—ওর কেন হঠাৎ এমন শীতে ধরলো কে জানে! ভেতরে ভেতরে ভয়ানক কাঁপছে পর্মা। বৃষ্টির ঝাপট আর এলোমেলো বাতাসের হাত থেকে

আত্মরক্ষার জন্ত সমস্ত দরজা জানালাই তো বন্ধ ওর। তবে অকারণ কেন এতও শীত বোধ? পর্ণা বিস্মিত হলো। পেছনদিকে পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, "ফুলমু, এই টুলটায় এসে বসো।"

ফুলমু শীতে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। এতক্ষণ ওর উত্তেজনার তলায় শীতটা যেন কিছুটা চাপা পড়ে গিয়েছিলো। ছুটে এসে টুলটায় ওপর ধপ ক'রে ব'সে পড়লো ফুলমু। শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে আগুনের তাত নিতে লাগলো।

পর্ণা ফুলমুর আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে সহজ গলায় বললো, "বাঃ ফুলমু! তোমাকে তো মরদের পোষাকে খুব মানিয়েছে—"

ফুলমুর আপেল-রঙা গাল দুটো আরো টকটকে লাল হলো। আগুনের দিকে চোখ রেখে ভাবতে লাগলো: সত্যি সত্যি মরদ হতাম যদি তাহলে কী আমার কপালে আজ এই দুর্ভোগ হতো! এর আগে একটা কথা নিয়ে অনেক রাত্রে শুয়ে শুয়ে মনে মনে ও চিন্তা করেছে, সে কথাটা এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেলো ফুলমুর।—এই পৃথিবীতে ওর যেন কেউ নেই। ওর বাপু শুরু যেমন থেকেও ওর কাছে একেবারে নেই হ'য়ে গেছে, ওর আম্মা চন্দ্রকও যেন তাই। ওর তো মনে পড়ে না, চন্দ্রক ওকে কোনোদিন আদর করেছে বলে, যত্ন করেছে বলে। অথচ ওর সহেলী বুধিয়ার আম্মা বুধিয়াকে কত ভালবাসে। নিজে কম খেয়ে, বুধিয়াকে খানা বেশী ক'রে খাওয়ায়, মাথায় গন্ধ তেল দিয়ে যত্ন ক'রে চুল বেঁধে দেয়—উকুন মেরে দেয়, রেশম দিয়ে গা-দস্তর সাফ ক'রে দেয়। কিন্তু, ওর আম্মার ওসব বালাই নেই, লাকড়ি আনতে, পানি আনতে মেয়ী হলেই ওকে দুমাদুম পিটিয়ে দেয়। সত্যি, ওই বোধ হয় এই পৃথিবীতে সব চেয়ে দুঃখী। ভগবান যখন ওকে দুঃখী মেয়ে করেই পাঠালো তখন ওকে এতটা চেকনাই দিলো কেন? কুরূপা ক'রে পাঠালে কী ক্ষতি হতো। পাহাড়ী জোয়ানগুলো ওর দিকে সর্বদা লেলিয়ে থাকতো না তাহলে! নাহু তো নয়ই। আর ভগবান ওকে সুরৎ যদি দিলো তো মরদ ক'রে পাঠালোনা কেন? তাহলে তো কোনো ভাবনাই ছিলো না ওর, দিব্যি চালা হ'য়ে যেতো পরমরাজের। মজাসে পর্ণার হাতে হাত দিয়ে পাঞ্জা কষতো, ঘুঁসোঘুসি লড়তো—আরো কত কি।

পরমরাজ ইচ্ছে করেই এতক্ষণ সুস্থ হবার সময় দিচ্ছিলো। কাকে, ফুলমুকে না নিজেকে ও তা নিজেও ঠিক জানেনা। "ফুলমু—!" বীর গম্ভীর গলায় পর্ণা বললো, "আমার কাছে কেন এসেছো? কী প্রয়োজন তোমার?"

ফুলমু হঠাৎ চমকে উঠলো।—ওর মনের কথা টের পেয়ে গেলো না তো সর্দার। আগুনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে পরমরাজের দিকে তাকালো। ভয়ানক ভয় ভয় ভাবটা কমে গিয়েছিলো ওর। কিন্তু পর্ণার চোখ মুখের ভ্রূকুটি-কঠিন চেহারাটা চোখে পড়তেই আবার ভেতরে ভেতরে কাঁপতে লাগলো। ও জানে চোখের জল ফেলা মানেই—হেরে যাওয়া,—সে অনেক লজ্জা। ও সে লজ্জা পেতে কিছুতেই চায় না। কিন্তু জল যে এসে যাচ্ছে ওর দুচোখে ভ'রে,—ও এখন ক'রে কী! চোখ নামিয়ে প্রাণপণে চোখের জল সামলাতে লাগলো ফুলমু।

পর্ণা মুহূর্ত দুই চুপ ক'রে থেকে অন্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করলো, "আসুর ক্ষেতি খানাতে আজ আমার সোক গিয়েছিলো?"

—ওমা, সে কথা তো বিলকুল ভুলে ব'সে আছে ফুলমু। পর্ণার চোখের দিকে তাকিয়ে খিক্‌খিকিয়ে হেসে উঠলো ও, "হ্যাঁ। বারোজন গিয়েছিলো—"

পর্ণা ফুলমুর ভিজে চোখের দিকে তাকালো। যেন পাতার কালরে ফোঁটা ফোঁটা হিম লেগেছে। ফুলমুর আদুল মনটাকে গোছাবার জন্ত আর একটু সময় দেওয়া দরকার। বললো, "কতখানি জমি তোমের হ'য়েছে আজ ?"

"সব।"

"সবটা ? বেশ। তুমি খুশী হয়েছো ফুলমু ?"

"হাঁ—" ফুলমু ঘাড় হেলিয়ে জবাব দিলো।

"আর কী চাই বলো ?" আংটার আগুনটা নাড়া দিয়ে পরমরাজ বললো।

"আর কিছু চাইনে—"ফুলমুর ঠোঁটের কোণে এতক্ষণে হাসি দেখা দিলো।

"কিছু চাইনে যদি, তবে এত রাতে কেন এসেছ আমার কাছে ?" পর্ণার সঙ্কীর্ণ গলা ঘরের মধ্যে সম সম ক'রে উঠলো।

: সত্যিই তো অমন বুদ্ধুর মতো কথা ফুলমু বললো কী করে ! সব চেয়ে বড় জিনিষ ওর চাই আজ—আশ্রয়। কিন্তু, কী ভাবে বলবে, কতটুকু বলবে, আর কোথা থেকে বলবে,—ঠিক করতে না পেরে হট্ ক'রে ফুলমু বলে ফেললো, "একটা ছোরা নেবার জন্ত এসেছি—"

"হুঁ···!" পর্ণা সন্ধানী দৃষ্টি মেললো ফুলমুর মুখের ওপর "তুমি কী আর একদিন চৌরাশী গাঁয়ে এসেছিলে ?"

ফুলমু চুপ ক'রে ভাবতে লাগলো,—আর একদিন এসেছিলো সেকথা প্রকাশ করবে কিনা।

পর্ণা আবার জিজ্ঞেস করলো, "আমাদের লোহার (কামার) কৈলুরাজের কাছে তুমিই সেদিন ছোরা চেয়েছিলে না ?"

ফুলমু বুঝলো, বুড়া লোহারটা সর্দারকে সব বলে দিয়েছে, কাজেই চুপ ক'রে থেকে ওর কোনো লাভ নেই, বরং বলাই ভাল। বললো, "হাঁ। আমি—"

"হুঁ···" বিলম্বিত লয়ে আবার ঐ ছোট্ট শব্দটা ক'রে পর্ণা চুপ মেরে গেলো। মনে মনে কিছু একটা যেন খাড়া করবার চেষ্টা করছে।—সেদিন চৌরাশী গাঁয়ে ফুলমু এসেছিলো ছোরা নিতে সেটা ঠিকই কিন্তু আজ তা নয়।

কী প্রয়োজন ফুলমুর, বলতে কেনই বা এত দ্বিধা করছে পর্ণা কিছুতেই এতটুকু আঁচ করতে পারছে না। এদিকে রাত বেড়ে যাচ্ছে। পরমরাজ উঠলো। খাপে ঢাকা নিজের ছোরাটা নিয়ে ফিরে এলো, "এই নাও ফুলমু, আমার নিজেরটাই দিয়ে দিলাম তোমাকে। কিন্তু, খুব হুঁসিয়ার, ভয়ানক ধারালো এটা—।"

ফুলমু হাত বাড়িয়ে ছোরাটা নিয়ে সেই আগের ভঙ্গিতেই ব'সে রইলো। পর্ণা বললো, "চলো ফুলমু, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি, বৃষ্টি একেবারে ধরে গেছে, এখন রওনা হওয়াই ভাল।"

ফুলমু কেঁপে উঠলো। কাঁপা গলায় মিনতি জানালো. "সর্দার, আজকের রাতটার মতো আমাকে শুধু আশ্রয় দাও—, কাল খুব ভোরেই আমি চলে যাব।"

পরমরাজ দাঁড়িয়েছিলো। নিজের টুলটা ফুলমুর একেবারে কাছে টেনে নিয়ে বসে পড়লো, বললো, "কী হয়েছে ফুলমু ? আমাকে সব কথা কেন খুলে বলছো না ?" পর্ণার গলা একেবারে সহজ, কাঠিন্যের ছিঁটেফোঁটা নেই।

ফুলমু তবু একটু ইতস্তত করলো। নাম্বুর কথা বলবে কি বলবে না। পর্দাকে না বললে, আর কাকে বলবে। আর সব কথা না জানালে সর্দার ওকে আশ্রয়ই বা দেবে কেন?

ফুলমু জোরে একটা নিশ্বাস নিয়ে বলার জন্ত প্রস্তুত হলো। ঘরের বাতাসটা ভারি মনে হলো ফুলমুর। খুব বেশী ভারি। এতক্ষণ ঘরের কোনো কিছুই ওর নজরে পড়েনি। সামনের দেয়ালে ঝাপসা হ'য়ে ওর পরিচিত একটা ছায়া পড়েছে। ছায়াটা অনুসরণ ক'রে ওপর দিকে তাকালো, ঝোলানো ভেড়ার মাংসটা চোখে পড়লো ওর। যতটুকু সময় দিয়ে কোনো জিনিষ মানুষ দেখে, তার চেয়ে অনেক বেশী সময় ওর চোখ আটক রইলো সেখানে। লণ্ঠনের কমজোর আলোয় দেয়ালের ছায়াটাকে ঠিক যেন ছবি ব'লে মনে হচ্ছে। আবার সেই ছবির ওপর চোখ রাখলো একটু, তারপর চোখ নামালো ফুলমু। তারপর আংটার দিকে চোখ রেখে বলতে লাগলো। বাদ দিলো না কিছুই। একটু একটু ক'রে সবখানি বললো। সেই যে ভারি লজ্জার জিনিষটা, কখন যে ওর কালো দুটো টানা টানা চোখ ভ'রে জমা হয়েছে—আর কখন যে চোখ ছাপিয়ে গাল ভাসিয়ে টুপ্ টাপ্ করে ঝরে পড়ছে তা ও টের পায়নি।

পর্দা ফুলমুর দিকে একদৃষ্টিতে চুপ করে চেয়ে ছিলো, একমুহূর্তের জন্তও চোখ সরায়নি। কিছুক্ষণ আগেকার দুরন্ত শীতবোধটা একেবারে কমে গিয়েছিলো। আবার শুরু হয়েছে। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ডভাবে কাঁপছে পরমরাজ। কথা শেষ ক'রে ফুলমু মুখ ঘুরিয়ে চাদর দিয়ে চোখ-মুখ মুছতে লাগলো।

পর্দা মেজেতে পা দুটো সজোরে চেপে ধরে কাঁপুনিটা থামাতে চেষ্টা করলো। ওর মনের তলাতেও মৃদু এক অস্থিরতা কাঁপছে। "ফুলমু! কাঁদছো কেন। এখন তো তুমি আমার ডেরায় আমার সামনে ব'সে আছো—" পর্দার কণ্ঠস্বর এখন একেবারে অন্তরকম।

ফুলমু এক নিমেষে সহজ হ'য়ে গেলো। চোখের জলের লজ্জাটা তাড়াতাড়ি ঢাকার জন্ত বললো, "না, না, কাঁদিনি তো—, [illegible] আমার কাঁধে খুব দরদ দিয়েছে, তাই বোধ হয় আঁখোমে পানি এসেছিলো একটু—"

"মিথ্যে বদনামী করোনা আমার ছাদুকে, কৈ তোমার কাঁধে কী হয়েছে দেখি—" বলেই দুহাত বাড়িয়ে ফুলমুকে টেনে নিলো পর্দা। একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলো। কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললো, "ওস্ সাধু-বাবার নাম নিয়ে তুমি এতবড় কথাটা বললে ফুলমু—"

ফুলমু তখন পর্দার বুকে মিশে যেন একাকার হ'য়ে গেছে: স্বপ্ন দেখছে না তো! পর্দা, সর্দার পরমরাজ, যে কোনো দিন কোনো মেয়েকে ছোঁয়না—সে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে, কোন্ মন্ত্রবলে সম্ভব হলো এটা!

পর্দার কথায় ও যেন জড়িয়ে জড়িয়ে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জবাব দিলো, "সাধুবাবার নাম না নিলে, ওরা তো আমাকে ছাড়তো না। নাম্বুর বহু হতেই হতো। নয়নরাজের বহু হ'তে আমার একদম দিল্ চায়না—"

"তবে কার বহু হতে দিল চায় ফুলমু?" পর্দার আলিঙ্গন আরো নিবিড় হলো।

একটু চুপ। তারপর ফুলমু যেন অনেকদূর থেকে জবাব দিলো, "সে আমি বলবো না। সে-কথা শুধু বাবা কৈলঙ্গরক্ষীর জানে।" এতক্ষণ পরমরাজ যেন বিকারের ঘোরে ছিলো। যা কিছু বললো করলো, কোনোটাই যেন সুস্থ চেতনায় নয়।

ও যে আগামী কালই চৌরাসী গাঁ থেকে যাচ্ছিলো, সচেতন অবস্থায় বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারতো,—ও কিছুকালের জন্য চৌরাসী গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছিলো। সতকাল রাত্রে, কালো পাথরটার ওপর, ফুলমুর সঙ্গে মুখোমুখি ব'সে যখন খাচ্ছিলো, তখন ওর মনের চেহারাটা স্পষ্ট ধরা পড়েছে ওর কাছে। অবশ্য ওর চেতনমন সেটা আদৌ স্বীকার করতে চায় না যে, ওর আত্মপ্রত্যয়ে ফাটল ধরেছে। কিন্তু, এত দ্রুত কাওড়া যাওয়ার পরিকল্পনা শুধু সেই জন্যই।

ফুলমু আসারপর ওর রাগ হয়েছে, বিরক্তি এসেছে, কিন্তু এতটুকু দুর্বল মনে হয়নি নিজেকে—অন্ততঃ ও নিজে তাই মনে ক'রে। কিন্তু, কী অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেলো। নয়নরাজের নাম শুনলেই ওর সমস্ত শরীরে আসুরিক বল যেন কিলবিলিয়ে ওঠে। ওর পেশীগুলি যেন আর নিজের আয়ত্তে থাকে না। যেন নয়নরাজকে সামনে পেলে বিনা দ্বিধায় সেই মুহূর্তে ও খুন করতে পারে। ঠিক সেইরকম একটা উত্তেজনা, ওর এতদিনের সাধনা এভাবে নষ্ট ক'রে দিলো, ফুলমুকে বুকে টেনে নিলো, আদর করলো, আলিঙ্গনে পিষ্ট করলো। বিকারের ঘোর কাটলেও, বিকারের রোগী যেমন কিছুক্ষণ মুহ্যমান অবস্থায় থাকে, পর্ণাও তেমনি ফুলমুকে আঁকড়ে রইলো বুকে। মিনিট দুই পরে যেন মনের সবখানি শক্তি দিয়ে সবেগে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলো। প্রায় ধাক্কা দিয়ে ফুলমুকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো পর্ণা।

পরমরাজের শক্তহাতের ধাক্কায় ফুলমু বেশ আঘাতই পেলো। কিন্তু ও তো এতক্ষণ বাস্তবে ছিলোনা, স্বপ্নরাজ্যে ছিলো, অবগাহন করছিলো নেশার সমুদ্রে, বিচরণ করছিলো স্বর্গের মায়াকাননে। হঠাৎ যেন সুন্দর লোভনীয় স্বপ্নটা ভেঙে গেলো, আর ও প'ড়ে গেলো মাটিতে। তাই ব্যথা ভুলে অবাক চোখে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো পরমরাজের মুখের দিকে।

পরমরাজ এখন সম্পূর্ণ সচেতন। সর্দারের সেই কঠিন মুখোশটা এঁটে নিয়েছে। সেই পরিচিত জলদ গলায় একটু থেমে থেমে বললো, "ফুলমু! তোমাকে আমি আশ্রয় দিলাম। আশ্রয় যে দিলাম, সে তো বুঝতেই পারলে। আজ থেকে তুমি আমার একজন চ্যালা বনলে। তোমার আগের জীবন। আগের নাম বিলকুল ভুলে যাও তুমি। তোমাকে মরদের ছদ্মবেশ নিয়ে থাকতে হবে। আজ থেকে তোমার নাম হলো—দিলরাজ। আমার কাছেই তুমি থাকবে, কিন্তু তুমি যে মেয়েমানুষ, সে কথা একদম ভুলতে হবে তোমাকে। কেমন, এতে রাজি—? না হ'লে লক্ষ্মীমেয়ের মতো ঘরে ফিরে যাও, আমি নিজে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি—"

ফুলমু সব কথা তলিয়ে বুঝবার চেষ্টাই যেন করছে না। ওর মনটা বড় যেন গোলমাল লাগিয়েছে ওর সঙ্গে। প্রশ্নও করছে, আবার উত্তরও দিচ্ছে, কিন্তু মীমাংসা করছে না।

: আচ্ছা, পর্ণা যে এতক্ষণ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলো, আদর করলো, গালে গাল ঘষলো, ঘাড়ে হাত বোলালো, সে কী ওকে ফুলমু মনে ক'রে, না চ্যালা মনে ক'রে?

একবার মনটা বলছে—দূর বোকা মেয়ে, এ ও বুঝতে পারলিনে, ফুলমু মনে ক'রেই তোকে অত আদর করলো; সোহাগ করলো।

তারপরই আবার মনটা মুখ বাঁকাচ্ছে,—যা ভাগ, অত আহ্লাদে আর কাজ নেই। মনে মনে তোকে পরমরাজ আগে চ্যালা ভেবে নিয়েছে—তারপর বুকে জড়িয়ে ধরেছে। ওতো আদর করা নয়, সোহাগ করা নয়; ও হলো অভয় দেওয়া, আশ্রয় দেওয়া। উৎকণ্ঠা দূর করা, আশঙ্কা দূর করা…।

তাহলে কোনটা ঠিক ? ফুলমু না চ্যালা ?

…বাঙ্কে টুকুনি ছাড়ো দেখিনি, আমি অত ছোটো নয়। অমন ধরণের আদর…

পর্দার গম্ভীর গলা আবার শুনতে পেলো ফুলমু, "তুমি আমার চ্যালা বনতে রাজি নও তাহলে—?"

ফুলমুর গোলমেলে মনটা প্রশ্ন উত্তর থামিয়ে কুঁকড়ে যেন এতটুকু হ'য়ে গেলো। তাড়াতাড়ি খোঁক দিয়ে বলুলো, "সর্দার, তুমি যা আদেশ করবে আমাকে, আমি তাই করবো, শুধু তোমার আশ্রয় থেকে আমাকে কোনোদিন তাড়িয়ে দিয়ো না—"

"ঠিক আছে। আজ থেকে তুমি দিলরাজ—"

"হ্যাঁ। সর্দার ভাই—" ফুলমু নিশ্চিন্ত নিভিক চোখে পর্দার দিকে তাকালো।

খুশী হলো পরমরাজ। ছান্নুকে ডাকলো, চেনা করিয়ে দিলো ফুলমুকে। ছান্নু ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ফুলমুর পা-পা শুঁকে, প্রভুর পা ঘেঁসে বসে মৃদু গম্ গম্ আওয়াজ তুললো, অর্থাৎ কিনা আমার চেনা পরিচয় হয়ে গেলো, আর আমার ভুল হবে না।

"দিলরাজ—!" এত দ্রুত এই আহ্বান শোনার জন্য যেন প্রস্তুত ছিলো না ফুলমু। বদলে খোদ্ বদলাতে গেলে একটু সময়ের তো দরকার।

সচমকের সঙ্গে সাড়া দিলো ফুলমু, "সর্দার, হুকুম কর—"

"সাবাস দিলরাজ", পর্দা উঠে দাঁড়িয়ে ফুলমুর মাথায় আলতো একটু চাপড় দিয়ে বললো, "মাস্টা তোমের হয়ে গেছে, ওটা নামিয়ে নিয়ে চলো আমরা বসুই কামরায় যাই। আজ ভাত পাকিয়েছি, আচ্ছা হয়নি দিলরাজ ?"

পর্দার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে ফুলমু চোখ তুলে আবার ঝোলানো মাসটার দিকে তাকালো। ফুলমুর আজ সকাল থেকে মাংসে ভাত খাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়েছিলো, অন্ততঃ পক্ষে মাছ ভাত পেলেও মনটা ওর খুশী হয়। আজ মিলেছিলো দুটোই। (ক্রমশঃ)

সপ্তম এডওয়ার্ড খুব সিগারেট খেতে ভালবাসতেন। একদিন তিনি একাকী প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়েছেন,—হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখেন সিগারেট কেসটি ফেলে এসেছেন।

সঙ্গে কয়েক পাউণ্ড মাত্র। সেগুলি সব সভরেণ। এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে হলে এক সভরেণ দিতে হবে। কিন্তু দোকানদার কি ভাববে!

ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে গেলেন এক সিগারেটের দোকানে। তাঁকে দেখামাত্র দোকানের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে গেল। আর দোকানের মালিক নিজেকে ধন্য মনে করে তাঁকে সিগারেটের টিন এগিয়ে দিলেন।

তিনি মহাস্তবদনে সেটা গ্রহণ করে বললেন—"এর দাম ?"

—আপনার শ্রীচরণে উপহার দিলাম। সিগারেট টিনটি নামিয়ে রেখে, কোন কথা না বলে সপ্তম এডওয়ার্ড ধীরে ধীরে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিশ্ব-বার্তা

ফ্রান্সে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী

ফ্রান্সে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বহুবিধ উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল, হচ্ছে এবং এখনও বেশ কিছুদিন ধরে চলতে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে ফ্রান্সে যে বিপুল সাড়া পড়ে গেছে তার পেছনে কারণও যথেষ্ট আছে। কৈশোর কাল থেকেই ফরাসী দেশ ও তার চিন্তাধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে এবং ক্রমে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাও হয়। ভিক্টর হুগো, ভিক্টর কাজিন, শিয়েবে লোতি প্রমুখ ফরাসী মনীষীবৃন্দের রচনা কবিগুরুর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়ে বাংলায় অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে সমসাময়িক ফরাসী চিন্তানায়কদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে কবিগুরু স্বয়ং বর্তমান 'গল্প-ভারতী'র সম্পাদক ডঃ কালিদাস নাগকে ফ্রান্সে প্রেরণ করেন। শান্তিনিকেতনের প্রথম বিদেশী অধ্যাপক হলেন বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভি। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্যারিসের পতন হলে কবিগুরু অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট যে তারবার্তা প্রেরণ করেন তাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ থেকেই বোঝা যায় ফ্রান্সের জন্য তাঁর দরদ কত বেশী ছিল।

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ফ্রান্সে নানা আয়োজন চলতে থাকে। প্যারিসে একটি জাতীয় সমিতি গঠিত হয়। ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী M. Andre Malraux ঐ সমিতির সভায় সভাপতিত্ব করেন। সমিতি কর্তৃক যে সকল অনুষ্ঠান পরিকল্পনা গৃহীত হয় তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১১ই এপ্রিল তারিখে Musee Guimet-এ Mlle Christine Bossenec-এর চলচ্চিত্র সহযোগে কবিগুরুর শেষ জীবনের চিন্তাধারা বিষয়ে ভাষণ এবং ৯ই জুন তারিখে কবিগুরুর প্রতি সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা প্রদর্শন। শেষোক্ত অনুষ্ঠানে হাজার হাজার ফরাসী নরনারী যোগদান করেছিলেন; যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ফ্রান্সের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রিবর্গ এবং ভারতের রাষ্ট্রদূত।

এছাড়াও ১০ই জুন তারিখে ফরাসী বেতার ও টেলিভিসন যারফৎ এক চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছিল।

উৎসব-সপ্তাহে ফরাসী পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আগামী অক্টোবরে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আরো কয়েকটি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

জার্মান ভাষার অভিধান—১২২ বৎসর ব্যাপী একটি প্রচেষ্টা

জার্মানীর বিখ্যাত লোককথা সংগ্রহকারী গ্রীম্ ভ্রাতৃদ্বয় যে অভিধান রচনার কাজ একদা সুরু করেছিলেন ১২২ বৎসর পরে তা সম্পূর্ণ হয়েছে। জার্মান ভাষার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

দুই ভাই—জ্যাকব গ্রীম্ (১৭৮৫—১৮৬৩) ও উইলহেল্ম্ গ্রীম্ (১৭৮৬—১৮৫৯) বিশ্বসাহিত্যের আসরে চিরকাল বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবেন তাঁদের রূপকথা সংগ্রহের জন্য। তাঁরা এই পর্যন্ত-

প্রমাণ অভিধান Deutsches Woerterbuch রচনার কাজ সুরু করেছিলেন অবশ্য উৎসাহে কিন্তু দুজনে সারাজীবন পরিশ্রম করেও এটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লিপ্‌জিগে এই বিরাট কর্মোদ্যোগের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হয়েছিল। উইলহেল্‌ম্ যখন মারা গেলেন তখন অভিধান রচনার কাজ 'D' অক্ষর অবধি এসে পৌঁচেছে। তার চার বছর পরে জ্যাকব মারা গেলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের প্রুশিয়ান আকাদেমী অব সায়েন্সেস এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কাজ চলতে থাকে কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে ছেদ পড়ে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে আবার অভিধান রচনার কাজ সুরু হয়।

পারস্পরিক প্রীতির যে অপূর্ব নিদর্শন গ্রীম্ ভ্রাতৃদ্বয় রেখে গেছেন তা অনন্যসাধারণ। তাঁরা একসঙ্গে বই লিখতেন, একসঙ্গে পড়াশোনা করতেন, থাকতেনও একই সঙ্গে। তাঁদের দেশপ্রীতি ছিল গভীর আর তা প্রকাশ পেয়েছিল মাতৃভাষা চর্চার মধ্যে। চিরায়ত সাহিত্যের মধ্যে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে যে সব অপ্রচলিত শব্দ ছিল তাঁরা তা সংগ্রহ করেছেন, সেই সব শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করেছেন, অন্য ভাষার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ও বিবর্তন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা—আজকের উৎকট ভাষাসমস্যার দিনে ভারতের বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় করে বাংলা ভাষার একটি অভিধান রচনার কাজে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব কিনা সেকথা বিবেচনার সময় উপস্থিত।

শ্রী বিশ্বপথিক

ছোট ছেলেটি রাস্তা পার হতে ভয় পাচ্ছে, অথচ গরীব আর অপরিচ্ছন্ন বলে কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না।

ছেলেটি অসহায় অবস্থায় একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। বয়স তার পাঁচ বছরের বেশী নয়। হাতে তার একটা কম দামের পাঁউরুটি।

একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন তার কাছে, বললেন, তুমি রাস্তা পার হতে চাও খোকা?

—হ্যাঁ। আমি আমার মায়ের জন্য রুটি কিনে নিয়ে যাচ্ছি। তার অসুখ।

—এস আমার সঙ্গে। ভদ্রলোক তাকে নিয়ে ধীরে ধীরে রাস্তা পার হলেন।

হঠাৎ তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে রাস্তার ওপারে দেখা। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, একি! আমেরিকার প্রেসিডেন্ট!

ভদ্রলোকটি হেসে উত্তর দিলেন, এখন আমি শুধু একজন ভদ্রলোক—আব্রাহাম লিংকন।

এই প্রথম

॥ লেখনী-লীলা ॥

[নতুন বছরের সুরুতেই 'গল্প-ভারতী'তে একটি অভিনব বিভাগ খোলা হল। যাদের লেখা কখনও কোথাও প্রকাশিত হয়নি অথচ যাদের মধ্যে শক্তি ও সম্ভাবনা রয়েছে—এমন সব লেখক-লেখিকাদের রচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে তাদের উৎসাহ দান করা এবং এইভাবে একটি নতুন লেখকগোষ্ঠী তৈরী করাই এই বিভাগের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা সকলকে সাদরে আহ্বান জানাচ্ছি।]

একটুকরো উড়ো কাগজ পরেশের কোলে এসে পড়ল।

সাদা কাগজ তো নয়—ছবি—এক চিলতে কাগজের ওপর রঙ রেখার শান্ত সমারোহ: পাখী করে নতুন বৌ চলেছে অজানা ঘরে, ঠিক যেমন করে পদ্ম একদিন এসেছিল এ বাড়ীতে।

—চমৎকার হয়েছে, কে আঁকল, কে এমন শিল্পী আছে গো? পরেশ চোখ তুলল।

পদ্ম উদাসীন ভাবে বলল, ওই তো পাশের বাড়ীর মেয়েটির আঁকা, আমি হাতে নিয়ে দেখছিলুম, কি রকম হাত ওর—

—ও, তাই নাকি, ও বাড়ীর মেয়ে ছবি আঁকে, এমন সুন্দর হাত!

কপট ঈর্ষার ভাণ করে পদ্ম চোখ পাকাল, তাহলে ও বাড়ীর দিকেই আজ থেকে বেশী টান দেখছি।

—ছি ছি, কি যা তা বলছ তুমি, আমি ঐ জন্যে ওদিকের জানলার দিকে চোখ পর্যন্ত তুলিনি, পরেশ মুখ নীচু করল।

—জানি জানি, ঐ আশাতেই তো বেঁচে আছি। স্বামীর কাছে এগিয়ে এল পদ্ম, বলল, দাও ছবিখানা, ফেরত দিতে হবে তো।

আড়ালে একচোট হেসে নিল সে, খুব ঠকিয়েছে পরেশকে। তার জীবনের এই একটিমাত্র সাধনা, থাক, গোপন থাক সকলের কাছেই, একটা আবরণ টানা থাকুক সংসারের দিক থেকে, এমনকি তার প্রিয়তম মানুষটির কাছে এই একটি মাত্র আড়াল অব্যক্ত শক্তি সঞ্চার করুক তার সাধনায়। মানুষ চিরকালই তার সাধনসম্পদ গোপন করে এসেছে, সেই গোপনতাই তার শক্তির উৎস।

পদ্ম ভাবতে বসে, কত ছোটবেলা থেকে সে ছবি আঁকা শিখত, ছুটির ক্লাসে কত মেয়ের খাতায় ছবি এঁকেছে, পরীক্ষার্থিনীদের অবাক করে দিয়েছে।

সেই সব কৈশোরের দিন আজ স্মরণে আসে, এই মধুর ছলনার মুহূর্তে বড্ড বেশী করে মনে পড়ে। এমন দিন গেছে যখন সে ছবির পর ছবি এঁকে চলেছে আপন মনে, মা তাকে ঘোর করে শুইয়ে দিয়েছে রঙের বাটিগুলোর মাঝখানে। কত রকম রঙ সে আবিষ্কার করত, শিউলির বোঁটা থেকে, বকুল থেকে, চোঁয়া মুড়ি

থেকে। কত রকম রঙ সে চারিদিকে দেখত—পাউচটির ওপরটা, বেলা শেষের মেঘ, একটা টিয়াপাখী। বাসি ওয়াড় কিংবা স্নানলাধরা জলের ট্যাঙ্ক, স্বতন্ত্র এক এক ধরণের রঙের আবেদন নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হোত। আর সে আঁকবার অনেক উপাদান—অজস্র মাধ্যম—খুঁজে পেত, শাসির কাঁচ কিংবা আয়না বা একটা ধরজার পাল্লা—সব যেন তাকে আমন্ত্রণ জানাত চিত্রিত হবে বলে।

কিন্তু না, এখানে সে সুযোগ অনুপস্থিত। এটা শ্বশুরবাড়ী। আর নিজেকে সে প্রকাশ করতেও অনিচ্ছুক, বুঝি বা তার মনে কিছু আত্মকুণ্ঠার অভাব অনুভূত।

আর তাই সে মধুর এক লুকোচুরি খেলল পরেশের সঙ্গে।

তার গোপন তপস্যা চলেছে, চলবে, রঙ আর তুলি নিয়ে তার এই টানটোনের খেলা সারা জীবন ধরে চলবে, সূর্যের আলো যেমন উঁকি মেরে পদ্মকোরকের লুকোনো ঐশ্বর্য দেখে ফেলে তেমনি করে পরেশও একদিন তার মানসসম্পদ দেখবে, উদ্ঘাটন করবে, এ আশা তার আছে।

* * *

সুপ্ত বাড়ীটা স্তব্ধ। কেবল ঘোড়ো হাওয়ায় খোলা দরজার শব্দ হচ্ছে, কে যেন আসছে যাচ্ছে, অকারণ অবারণ তার এই আসা আর যাওয়া।

পদ্ম জানে সব মিথ্যে, যে গেছে সে আর ফিরবে না। পরেশ আর ফিরবে না। দুদিনের অসুখে চিরবিচ্ছেদ ঘটে গেছে—ইহজীবনের মত সব শেষ।

—বউমা, বউমা, ঠুক ঠুক করে লাঠির আওয়াজ উঠল, অশক্ত অসমর্থ শ্বশুর মশাই আসছেন, শেষ বয়সে শোকে একেবারে ভেঙে পড়েছেন।

—কিছু বলছেন বাবা ?

—হ্যাঁ। বলেই চুপ করে গেলেন প্রসন্নকুমার।

—আমি বুঝেছি বাবা, এই চুড়ি ক'গাছা আপনি নিন, আর তো আমার কাছে কিছু নেই, আর—একটু থেমে বলল, গহনারও তো কোনো প্রয়োজন নেই।

বৃদ্ধের চোখে জল। কী অসীম অসহায়তা সম্মুখে, কি করে চলবে আগামী দিনের সংসার, সব যে অনিশ্চিত হয়ে উঠল!

লাঠির ঠুক ঠুক শব্দ আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। ভবিতব্যের একটা অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট সঙ্কেত যেন বেজে উঠছে। এরপর কি করে দিন চলবে, কিছুই যে ভেবে পাচ্ছেনা পদ্ম।

হঠাৎ সে চমকে উঠল, পেছনে রমলার ছায়া, পাশের বাড়ীর মেয়ে।

চুপ করে সে বসে পড়ল পদ্মর পাশে, বলল—বড় আশ্চর্য সংবাদ সে বলল, তার ঐ ছবিটা—পাখী চলে যে—চিত্রকলা প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে অ্যামেচার মহিলা শিল্পীদের গ্রুপে। এক ভদ্রলোক তিনশো একান্ন টাকা দাম দিয়েছেন ছবিটার জন্যে, আরো অনেকে এই উদীয়মানা শিল্পীর ছবি কিনতে চাইছেন, কাজেই—

রমলা থামল।

—ও ছবি আমি বিক্রী করব না ভাই, পদ্ম দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

—এতবড় একটা চান্স—রমলা হতবাক্ হয়ে গেল। সংসারের নির্মম প্রয়োজনের কাছেও যে মাথা হীকার করে না সে কেমন শিল্পী!

আস্তে আস্তে পদ্মর আঁচল থেকে চাবির গোছা খুলে নিল রমলা, বলল, বুঝেছি বৌদি, ও ছবির কথা আর তুলব না, আমি তোমার জন্য ছবিগুলি কিন্তু আজ চুরি করব ট্রাঙ্ক থেকে, তুমি কিছু বলতে পারবে না।

অবাক কাণ্ড, রমলা পাশের ঘরে গিয়ে ফিরে আসছে, হাতে তার তুলি আর রঙের বাটি।

সেইগুলি সে নামিয়ে দিল পদ্মর সামনে। আবার সব স্মৃতি ফিরে এল, সংগ্রামের শক্তি ফিরে এল আর চোখের জল বাধা মানল না।

পদ্মর চোখে আজ পদ্মার উত্তরোল সংকেত।

• • •

কয়েকটা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল, দিন নয় মাস, মাস নয় বছর।

আবার সুস্থ ঘর পূর্ণ হয়ে উঠেছে, দেয়ালে দেয়ালে নানান্ ছবি, রঙ আর রেখার সমারোহে যেন বসন্ত উৎসব লেগেছে, নিজের সৃষ্টির মধ্যেই পদ্ম ডুবে রয়েছে।

সেদিনও রমলা এল, পা টিপে টিপে, চুপি চুপি। পেছন থেকে খুব করে একখানা বই ফেলে দিল পদ্মর কোলে।

চমকে উঠল সে। আর একদিন এমনি করেই একটি ছবি সে পরেশের কাছে ফেলে দিয়েছিল।

—এই ছাখো বউদি, তোমার সেই ছবি 'পাল্কী চলে রে'—এর রঙীন প্রিন্ট ছেপেছে বাংলার বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'যুগন্ধর'।

পদ্ম উদাসীন দৃষ্টিতে বসে রইল।

—কি ভাবছ বউদি?

—জানি না।

—আমি জানি।

—কি জান?

—ভাবছ, রমলা বলল, যা একান্তই আমার তা কেমন করে সারা দেশের হয়ে গেল, তাই ছঃ বউদি তোমার সৃষ্টির মধ্যে যদি থাকে প্রাণ—প্রাণের উত্তাপ—তবে তা অপরের অন্তরে সাড়া তুলবেই তুলবে।

বারান্দায় ঠুক্ ঠুক্ লাঠির শব্দ নিকটতর হচ্ছে।

ওরা দুজনেই চুপ করে গেল।

দরজায় বৃদ্ধের আবির্ভাব।

—বৌমা, একটি আনন্দিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, এই নাও তোমার চুড়িগাছা, তোমার তপস্যায় লক্ষ্মী ফিরে এসেছেন মা, এগুলি তুমি তুলে রাখ যত্ন করে।

—আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন বাবা—পদ্ম উঠে গিয়ে বৃদ্ধ শ্বশুরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

শ্রীমনোরঞ্জন জানা

খেলাধূলা

ইংলণ্ড-বনাম অস্ট্রেলিয়ার ৫ম টেস্ট

ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম ও শেষ টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। টেস্ট পর্যায়ে অস্ট্রেলিয়া ২—১ খেলায় বিজয়ী হয়ে 'এ্যাসেজ' দখলে রেখেছে ও 'রাবার' লাভ করেছে।

পঞ্চম ও শেষ টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের খ্যাতনামা চারজন ব্যাটস্‌ম্যান সুব্বারাও (১৩৭), ব্যারিংটন (৮০), মারে (৪০) ও এ্যালেনের (৩২ নট আউট) নৈপুণ্যের জন্যেই অস্ট্রেলিয়া জয়লাভে বঞ্চিত হয়েছে।

জীবনের শেষ টেস্ট খেলায় সুব্বারাও-এর শতাধিক রান প্রশংসার দাবী রাখে। সুব্বারাও এবার ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন।

এবারের ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া দলের টেস্ট খেলার পর্যালোচনাকালে 'রয়টার' অস্ট্রেলিয়ান টীমকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন। দ্রুত রান সংগ্রহকারী বর্ধ্যান ও'নীল ও অধিনায়ক রিচি বেনো সর্বাধিক প্রশংসা অর্জন করেছেন।

এই সফরে অস্ট্রেলিয়া দল এক প্রতিভাশালী ব্যাটস্‌ম্যানের দেখা পেয়েছেন, তিনি হচ্ছেন ভিক্টোরিয়ার ২৩ বৎসর বয়স্ক ব্যাটসম্যান্ বিল লরী। বিল লরী খুব ধীরস্থির ভাবে খেলেন, তাঁর ব্যাটিং 'অ্যাভারেজ' (৫২·৪০) দুই দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যাটিং অ্যাভারেজের শীর্ষস্থানে। অবশ্য ইংলণ্ড দলও অনুরূপ এক প্রতিভা আবিষ্কার করেছেন। তিনি হচ্ছেন উইকেট কিপার জন মারে। অবশ্য সত্যিকে ইতালের যোগ্য উত্তরাধিকারী জন মারের ব্যাটিং তেমন উন্নত নয়

অস্ট্রেলিয়া দলের খেলা আগাগোড়াই সুপরিকল্পিত ছিল। অপরপক্ষে ইংলণ্ড দল আত্মরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করেছিল। তাদের দলে মামুলি ধরণের বোলারদের প্রাধান্য দেখা গেছে। অস্ট্রেলিয়ার 'রাবার' লাভ ক্রীড়াধারার সঙ্গতিসূচক ফলাফল ও অধিনায়ক রিচি বেনোর কৃতিত্বের পরিচায়ক।

এম. সি. সি. দলের আসন্ন ভারত ভ্রমণ

আগামী ২৮শে অক্টোবর থেকে এম. সি. সি. দলের প্রায় তিন মাসব্যাপী ভারত সফর সুরু হবে।

এবারকার ভারত সফরকারী এম. সি. সি. দলে যে সব খেলোয়াড় আছেন তাঁদের মধ্যে সাতজন খেলোয়াড় এই বৎসর ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা হচ্ছেন: ডেক্সটার, স্মিথ, এ্যালেন, ব্যারিংটন, টনি লক, পুলার ও জন মারে।

ভারত সফরে এম. সি. সি. দল ২৮শে অক্টোবর প্রথম খেলায় অংশ নেবেন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিরুদ্ধে। ভারত ও এম. সি. সি. দল মোট পাঁচটি টেস্ট খেলায় অবতীর্ণ হবেন এবং খেলাগুলি হবে বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী, কলিকাতা ও মাদ্রাজে। টেস্ট খেলাগুলির আরম্ভের তারিখ যথাক্রমে ১১ই নভেম্বর, ১লা, ১৩ই, ও ৩০শে ডিসেম্বর এবং ১০ই জানুয়ারী। এম. সি. সি. দলে নির্বাচিত খেলোয়াড়গণ:—

টেড ডেক্সটার (অধিনায়ক ; চৌকস খেলোয়াড়), মাইক স্মিথ (সহ অধিনায়ক ; ব্যাটস্‌ম্যান), ডেভিড এ্যালেন (স্পিন বোলার), এ ব্রাউন (ফাস্ট বোলার), টনি লক (স্পিন বোলার), ডেভিড স্মিথ (ফাস্ট বোলার), ডেভিড হোয়াইট (ফাস্ট বোলার) বব. বারবার (বোলার ও ব্যাটস্‌ম্যান), ব্যারী নাইট (বোলার ও ব্যাটস্‌ম্যান), কেন ব্যারিংটন (ব্যাটস্‌ম্যান), পিটার পারফিট (ব্যাটস্‌ম্যান), জিওফ পুলার (ব্যাটস্‌ম্যান), পিটার রিচার্ডসন (ব্যাটস্‌ম্যান), এরিক রাসেল (ব্যাটস্‌ম্যান), জিওফ মিলম্যান (উইকেট কিপার) এবং জন মারে (উইকেট কিপার)।

আই. এফ. এ. শীল্ড

শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলা গত ১৩শে আগষ্ট বুধবার সুরু হয়েছে। শীল্ডের উদ্বোধনসূচক খেলায় যোগদানকারী হাওড়া জেলা একাদশ বিজিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবকে ২—০ গোলে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউণ্ডে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

শীল্ডের অপরাপর খেলায় জর্জ টেলিগ্রাফ, ইণ্টারন্যাশনাল ও পুলিস দল যথাক্রমে ২৪ পরগণা জেলা দল (৩—০), কাননীপুর (৪—১) এবং হুগলী জেলা এসোসিয়েশনকে (২—০) পরাজিত ক'রে দ্বিতীয় রাউণ্ডে উন্নীত হয়েছে। এরিয়ান্স ৪—০ গোলে বেলিয়াটোলাকে পরাজিত ক'রে দ্বিতীয় রাউণ্ডে খেলবার সুযোগ পেয়েছে।

দুটি বিশ্ব-রেকর্ড (মহিলা বিভাগ)

গত ২৬শে আগষ্ট ব্লাকপুলে অনুষ্ঠিত ইউরোপ বনাম আমেরিকার এথলেটিকস্ প্রতিযোগিতাতে ক্যালিফোর্ণিয়ার ১১ বৎসর বয়স্কা বালিকা ডোনা ডি ভারোনা ৪৪০ গজ ব্যক্তিগত মেডলে রিলেতে ৫মিঃ ৩১'৯ সেকেণ্ডে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন।

আমেরিকার অপর তরুণী ১১ বৎসর বয়স্কা কলিন্স ২২০ গজ বাটারফ্লাই সাঁতারে ২মিঃ ৩৩'৬ সেকেণ্ডে বিশ্ব রেকর্ড করেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আমেরিকান সুইমিং চাম্পিয়ানশিপের বিভিন্ন বিভাগে যথা ১০০ ও ২০০ মিটার বুক সাঁতার, ২০০ মিটার বাটারফ্লাই ও ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলে সন্তরণে আমেরিকার সাঁতারুগণ বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

স্কুলের ছাত্রীর কৃতিত্ব

সিঙ্গাপুরের দশ বছরের মেয়ে বিজয়া দর্শনা গত কয়েক মাসে রাজ্যে যে ৩টি ওয়াকিং রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সবকটিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

১৫ মাইল ওয়াকিং রেসে ৩০ জন প্রতিযোগীকে হারিয়ে দিয়ে সে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং সিঙ্গাপুর সিনিয়র এসোসিয়েশনের ১১ মাইল ওয়াকিং রেসে ৫০০ বয়স্ক পুরুষ ও ৮০ জন মহিলাকে অতিক্রম করে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই পথ অতিক্রম করতে বিজয়ার সময় লাগে ২ ঘঃ ২৫ মিঃ ১৬ সেকেণ্ড।

—শ্রীনিরীক্ষক

বিশ্ব
ব্যঙ্গ
চিত্র

রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সত্তর বছর বয়সের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবির অভিনন্দন

আমরা দুজন সহযাত্রী।

কালের তরীতে আমরা প্রায় এক ঘাটে এসে পৌঁচেছি। কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।

আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন,—কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে ছাত্র নিজেকেই পেয়েছে।

বস্তু জগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাশ্রিত অনভিব্যক্ত সৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন, এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়। উপনিষদে কথিত আছে যিনি এক, তিনি বললেন—আমি বহু হবো। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্চারিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভব হতো না। আচার্য নিজের জয়কীর্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়—প্রেম দিয়ে। আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।

২২শে আগষ্ট
১৯৩২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ॥

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শতবার্ষিকী উৎসব চলেছে দেশে। সাধারণ এবং অসাধারণ সবাই তাঁর জয়কীর্তনে আজ উৎসাহী। কারণ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপনা এবং গবেষণায় ভারতবর্ষে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ, বৈজ্ঞানিক শিল্পপ্রতিষ্ঠাপনেও তিনি ছিলেন অগ্রণী, হিন্দুরসায়নের ইতিহাস প্রণয়ন করে তিনি ভারতের জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি, ভারতীয় রাসায়নিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে এবং ভারতীয় রাসায়নিক সমিতি গঠন করে তিনি সুনির্দিষ্ট করেছেন বিজ্ঞান জগতে ভারতের প্রতিষ্ঠা, এবং সর্বোপরি দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করে তিনি সাধারণের হৃদয় করেছেন জয়। সুতরাং আজ আমরা সবাই মিলে করছি তাঁর নামের জয়ধ্বনি এবং গৌরব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে যদি ঊর্ধ্বলোক হতে তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেমে আসেন, তবে স্বাধীন ভারতে আমাদের চালচলন, আহার বিহার, আচার ব্যবহার, এবং কীর্তিকলাপ পরিদর্শন করে কি তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে আমাদের নিয়ে গৌরব করতে পারবেন? উত্তরে বলতে হয় একটি বড় রকমের 'না'। কেননা, একথা অস্বীকার করবার তো নাই যে তাঁর জীবনযাত্রার এবং বর্তমানে আমাদের জীবনযাত্রার আদর্শের মধ্যে রেখা দিয়েছে এক বিরাট ব্যবধান। এ ব্যবধান একপ্রকার আত্যন্তিক বা সামগ্রিক বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রফুল্লচন্দ্রের চালচলন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। প্রথম বয়সে তাঁর পরিধানে ছিল খাটো মোটা দেশী ধুতি ও টুইল সার্ট। কলেজে অধ্যাপনার পোষাক ছিল চেককাটা দেশী ছিটের কোট ও পাতলুন, তাও আবার স্থানে স্থানে এসিড পড়ে গেছে ছিদ্র হয়ে। শেষ বয়সে অসহযোগ আন্দোলনের গোড়া হতে খদ্দর ছিল তাঁর একমাত্র অঙ্গভূষণ এবং শয্যার কাপড়। এর তুলনায় বর্তমানে যে কোন কারখানার কারিকর বা ডাকঘরের পিওনের পোষাকও বেশি আধুনিক ও উচ্চশ্রেণীর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, কাউনটেইন পেন, হাতঘড়ি, এবং ভাল জামাজুতো এখন সাধারণ চাকরে বা কর্মীলোকের পোষাক পরিচ্ছদের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত। আহার বিহারের বেলাতেও প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন অসাধারণ মিতব্যয়ী। অজীর্ণ ও অনিদ্রার দরুণ তিনি ছিলেন চিররুগ্ন। কাজেই তাঁর আহার ছিল নিতান্তই পরিমিত, জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য ন্যূনতম সীমায় নির্দিষ্ট। অতএব বলা যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন সরল জীবনযাপন ও উচ্চ চিন্তার এক জীবন্ত প্রতীক। ছাত্রদের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল খইচিড়ে, মুড়িমুচকি, দইদুধ, কলাগুড় ইত্যাদি সারবান অথচ সস্তা জলখাবার ব্যবহার করবার। আধুনিক যুগের লুচি, হালুয়া ও মিষ্টির ব্যবহার যে শুধু ব্যয়সাপেক্ষ নয়, অধিকন্তু ভেজাল ঘি দিয়ে তৈরী হয় বলে এবং সাধারণতঃ ভাইটামিন বিবর্জিত বলে স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনিষ্টকর, একথা বলতে তিনি কখনো ত্রুটি করেন নি। এ সব সস্তা ও পুষ্টিকর খাদ্য ফেলে এখন যে বিলাতী কায়দায় দামী বিস্কুট এবং ছাপাচ্চা লুচি, হালুয়া, মিষ্টি, চপ, কটলেট ইত্যাদির রেওয়াজ হয়েছে, এতেই পুড়েছে বাঙ্গালীর কপাল—এ ছিল তাঁর আপশোষ। মুড়িকে তিনি বলতেন স্বদেশী বিস্কুট। গ্রামের স্কুলের ছাত্রদের বিদায়কালে তিনি বলতেন: "তোমরা যখন কলেজে যাবে একটি একটি ক্ষুদ্র নবাব হবে। খাসা টেরী, তাম্বুলরাগে রক্ত অধর, কি নধর দেহখানি। মা বাপ কত কষ্ট করে খরচ পাঠান, আর তোমরা সহরে সিনেমায় ও থিয়েটারে গিয়া—আর এখন পাড়ায় পাড়ায় রেস্তোরা হইতেছে, সেখানে

খাইয়া চপ কাটলেট—অনেক সময় অর্ধপচা মাংস প্রভৃতি খাইয়া, সেই অর্থের কি সদ্ব্যবহার কর? গ্রীষ্মকালে আড্ডা, তাস, দিনের বেলায় ঘুম। দৈহিক পরিশ্রমে পাপ, হীনতা বোধ কর। যারা দু'পাতা পড়েছে তাদের রোজগারের ক্ষমতা নাই···।" চা এবং সিগারেটের নাম শুনলে তিনি উঠতেন ক্ষেপে, বলতেন চা-পান না বিষপান। "চা-পান ও দেশের সর্বনাশ" শীর্ষক তাঁর লেখা দুই প্রবন্ধ বেরিয়েছিল ১৩৩৮ সালের মাসিক বসুমতীতে, ভাদ্র ও কার্তিক সংখ্যায়। কাজেই বলতে হয় প্রফুল্লচন্দ্রের সরল জীবনযাত্রার তুলনায় বর্তমানে আমাদের জীবনযাত্রা হয়ে উঠেছে অতিমাত্রায় জটিল।

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন কর্মযোগী। তিনি জ্ঞানকে প্রয়োগবিধিতে রূপায়িত করেছেন কর্মে। যেমন কেমিকাল এণ্ড ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার উদাহরণ। কর্মেই ছিল তাঁর উপাসনা, বিশেষ করে দেবার কর্মে। বাঙালী, সাধারণতঃ শিক্ষিত বাঙালী যুবকেরা হাতে কলমে কাজ করতে নারাজ, হাতের কাজে তাদের সম্মানের লাঘব ঘটে; এতেই ঘটেছে তাদের সর্বনাশ এবং বেকার সমস্যার সৃষ্টি,—এ ছিল তাঁর অভিযোগ। স্কুল কলেজের ছাত্র হাতে করে মাছ আনতে, চুপড়ী হাতে বাজার করতে কিংবা কাপড় জামা কাচতে লজ্জাবোধ করে—এ মিথ্যা সম্মানবোধের বিরুদ্ধে তাঁর তিরস্কার ছিল তীব্র। বৃদ্ধ বয়সেও নিজে তিনি নিজের কাপড় কেচেছেন, এবং নিজের জুতো নিজে পালিশ করেছেন, এ আমরা প্রায়ই দেখতাম। এ-ক্ষেত্রেও তাঁর মনোবৃত্তির সঙ্গে আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর মনোবৃত্তির প্রভেদ যেখা যায় আকাশ।

কোন জিনিষের অপচয় ছিল তাঁর নিকট অমার্জনীয় অপরাধ। আমাদের এ গরীব দেশে জিনিষের অপচয় হচ্ছে দরিদ্রের ও নিরন্নের অন্নহরণের সামিল—এ ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন, নানা বারোয়ারি পূজাপার্বণ ইত্যাদি উপলক্ষে বাংলাদেশে যে অযথা আড়ম্বর, অপচয় ও খাদ্যদ্রব্যাদির অপচয় দেখা যায়, এর বিরুদ্ধে তাঁর বহু ভাষণে এবং প্রবন্ধে তিনি ব্যঙ্গোক্তি এবং প্রতিবাদ করেছেন কঠোর। স্কুল-কলেজে ছাত্র কিংবা শিক্ষকেরা যে অনেক সময় অতর্কিতভাবে ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা বন্ধ না করে বা বিজলী বাতি না নিভিয়ে চলে যায়, তা তিনি দেখতে পেলে রেগে যেতেন আগুন হয়ে। লেবরেটারী ঘরে কোন ছাত্র জলের কল খুলে বন্ধ করতে ভুলে গেছে, কিংবা ফিলটার কাগজ বাজে কাজে নষ্ট করছে এ তিনি যদি দেখতে পেতেন তবে সেদিন কারো নিস্তার থাকত না।

সময়ের দিক থেকেও তিনি ছিলেন সকল অপচয়ের ঘোরতর বিরোধী। নিজের প্রাত্যহিক জীবনে কার্যক্রম ছিল সব তাঁর সময় বাঁধা। এর কোন ব্যতিক্রম বড় ঘটত না। এ-বিষয়েও তাঁর আদর্শের সঙ্গে ঘটে আমাদের আদর্শের অমিল।

অধ্যাপনা ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের একটি প্রধান কর্তব্য। শিক্ষক হিসাবে তাঁর আদর্শের মিল ছিল প্রাচীন ভারতের ঋষি গুরুদের সঙ্গে। তাই তাঁকে সবাই বলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। কারণ, তিনি শুধু শিক্ষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন গুরু। শিক্ষক বলতে বোঝায় যাঁর কাছে পাঠ নেওয়া যায় পরীক্ষা পাসের জন্য; আর গুরু হচ্ছেন, আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, যিনি আমাদের মনের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে তাকে উদ্ভাসিত করেন জ্ঞানের আলোকে। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর জ্ঞানের আলোকে ও তাঁর চরিত্রের দীপ্তিতে আলিয়ে তুলেছেন বহু ছাত্র এবং বহু যুবকের মনে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা ও সেবার প্রেরণা। শিষ্যেরা ছিল তাঁর সঙ্গী, শুধু বিদ্যালয়ে নয়, আহারে বিহারে, পথে ঘাটে সর্বত্র। এর তুলনায় সচরাচর আমাদের শিক্ষক ছাত্রের সম্বন্ধ হচ্ছে—আমা কাঁচকলার সম্বন্ধের মত। ছাত্রেরা চলে শিক্ষকদের এড়িয়ে, এমন কি

অনেক সময় তাদের দাবী জানিয়ে, মাষ্টারেরাও ঘণ্টাখানিক পাঠ দিয়েই মনে করেন খালাস এবং নিশ্চিন্ত। এ ক্ষেত্রেও তাঁর আদর্শ হতে আমরা গেছি দূরে সরে।

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন সাধারণের লোক। তাঁর দ্বার ছিল তাই ছোট বড় সকলের নিকট অবারিত—শুধু ঘরের দ্বার নয়, তাঁর অন্তরের দ্বারও। বাহিরে ভিতরে তিনি একই সহানন্দ প্রফুল্লচন্দ্র স্বাধীনতায় দৃঢ়, প্রতিবাদে ব্যঙ্গরসিক, অথচ শিশুর মত ভোলা মন। সকল সময়ে, সকল ক্ষেত্রে, সকল অবস্থাতেই সে একই সরল,সরস, সাদাসিদে মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র। আমরা কিন্তু সংসারের পথে সচরাচর চলাফেরা করি নানা রকম মুখোস পরে। আমাদের ভিতরের মানুষটির সঙ্গে বাহিরের মানুষটির মিল বড় থাকে না। অনেক সময়ে যখন আমাদের বাহিরের মানুষটি মুখে বলে 'হাঁ', তখন হয়ত অন্তরের মানুষটি নীরবে উপহাস করে বলে 'না'। আধুনিক সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গই হচ্ছে এরূপ মিথ্যা আচরণের অভ্রান্ততা। মনের মধ্যে যাহাই থাকুনা কেন, "লোকে যাহা দাঁতের আগে মিষ্ট হাসি টানি"অভ্রান্তার বুলি আমাদের বলতেই হবে। ফলে, প্রফুল্লচন্দ্র ও আমাদের জীবনযাপনের রীতির মধ্যে গড়ে উঠেছে এক দুস্তর ব্যবধান—স্পষ্টবাদিতা ও কপটতার ব্যবধান।

তাই যা কিছু বুদ্ধি দিয়ে, নীতি দিয়ে বা যুক্তি দিয়ে মানা যায় না,—যত কিছু কুসংস্কার, নিষ্ঠুরতা, মানুষের প্রতি অবমাননা, বীভৎস আচার, অমানুষিক অত্যাচার ও বর্বরতা ধর্মের নামে সমাজে চলে যাচ্ছে, এ-সবারই বিরুদ্ধে তিনি সারাজীবন চালিয়েছেন তাঁর আপোষহীন, অক্ষুরন্ত অভিযান। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, অবশ্যকরণীয় বৈধব্য প্রথা ও তার কঠোরতা, পণপ্রথা, পর্দাপ্রথা ইত্যাদি যাবতীয় নীতি ও যুক্তি বিগর্হিত সামাজিক বিধি ব্যবস্থার অপনোদন ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগেও আমরা এখনো আমাদের বুদ্ধিকে মোহমুক্ত করতে সক্ষম হইনি,—ইহাই ছিল তাঁর আক্ষেপ।

আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকেরই জীবনে প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবিকা অর্জন যেন তেন প্রকারেণ। এ জীবিকা অর্জনের জন্য যেসব পথ আমরা অনেক সময় অবলম্বন করি, তা আইনসঙ্গত হলেও সব সময় ধর্ম-নীতিসঙ্গত হয় কিনা বলা কঠিন। সমগ্র জীবন জুড়েই চলেছে আমাদের এ জীবিকা অর্জনের জন্য দিনরাত ছুটোছুটি এবং বিরামবিহীন সংগ্রাম। বলা বাহুল্য যে প্রাণধারণের প্রয়োজনে জীবিকা অর্জন অপরিহার্য। কিন্তু এ প্রয়োজনের কোন নির্দিষ্ট সীমা আমরা রাখতে চাই না। আমাদের প্রয়োজনের গণ্ডি ক্রমশঃ আমরা বাড়িয়ে চলি। আমাদের স্বার্থের কোন সীমানা নাই। প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের আদর্শে আর আমাদের জীবনের আদর্শে ঘটে এখানে গুরুতর বিরোধ। আমাদের জীবনে সবার উপরে আমরা স্বার্থকে দিয়েছি আসন। স্বার্থবুদ্ধিই জোগায় আমাদের সকল চিন্তা এবং সকল কর্মের প্রেরণা। কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে দেখা যায় এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আপন স্বার্থকে তিনি সঙ্কুচিত করে রেখেছিলেন যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম গণ্ডির মধ্যে, এবং পরার্থকে দিয়েছিলেন আপন জীবনে প্রাধান্য। অন্যথা বলা যায়, তিনি আপন স্বার্থকে পরার্থে বিলীন করে চেয়েছিলেন তার অবাধ বিস্তার। তাই নিজের সকল চিন্তা এবং কর্মে ছিল ধর্মবুদ্ধির প্রেরণা। আপন ধর্ম হিসাবে ত্যাগ এবং সেবাকে করেছিলেন তিনি বরণ, সত্যের অনুসরণ এবং দেশের ও দশের সেবাই ছিল তাঁর সকল উদ্যোগের মূলে। যখনই দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে নরনারী প্রপীড়িত হয়েছে, প্রফুল্লচন্দ্রই

সর্বাগ্রে অগ্রসর হয়েছেন তাঁর করুণ হস্ত প্রসার করে তাহাদের সাহায্যকল্পে। খুলনা জেলার দুর্ভিক্ষ (১৯২১ ইং) এবং উত্তর বঙ্গের বন্যা (১৯২২ ও ১৯৩১ ইং) এর উদাহরণ।

বাঙ্গালীর শ্রমকাতরতা, হাতের কাজে শিক্ষিত বাঙ্গালীর অসম্মান বোধ, ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙ্গালীর অপটুতা—যার ফলে বাংলাদেশ হতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অজস্র অপরিমিত অর্থ যাচ্ছে বেরিয়ে এবং বাংলায় বেকার ও অন্নসমস্যা দেখা দিয়েছে ভয়াবহ আকারে—এ-সবার প্রতীকার করে বাঙ্গালীকে সজাগ করে তোলা ছিল তাঁর জীবনের একটি প্রধান প্রচেষ্টা। এ তাঁর দেশ সেবারই অন্যতম নিদর্শন। অনেক সমালোচকের চোখে ইহা দেখা দিয়েছে প্রাদেশিকতার দোষে বিকৃত এবং সঙ্কীর্ণ বলে। কিন্তু এরূপ অভিযোগের আসলে কোন ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। কারণ, প্রফুল্লচন্দ্রের ধারণা ছিল, প্রখর বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী যদি অর্থাভাবে বিপন্ন হয়, তবে সমগ্র ভারতের পক্ষে হয়ে উঠবে সে এক দারুণ আশঙ্কার কারণ। সুতরাং এ-প্রসঙ্গে তাঁর যত উক্তি যে কারো প্রতি ঈর্ষাপ্রসূত নয়, বরং বাঙ্গালীর, তথা ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য, একথা তিনি নিজেই বলেছেন অনেক ক্ষেত্রে। অর্থ সম্বন্ধে ছিল তাঁর গভীর বীতস্পৃহা, জীবনে যা কিছু অর্জন করেছেন তার বেশির ভাগই দান করেছিলেন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে, দীনদুঃখীর অভাবমোচনে গরীবছাত্রের শিক্ষার সাহায্যে, সমাজ সংস্কার ও সেবার কাজে। তাঁর নিজের ব্যয় ছিল অতি সামান্য। কিন্তু তিনি বাঙ্গালীকে চিরজীবন উৎসাহিত ও উদ্বোধিত করেছেন ব্যবসা বাণিজ্য অবলম্বন করে দেশের সম্পদ বাড়িয়ে তুলতে—ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের জন্য নয়, সমষ্টিগত দুঃখ দূরীকরণের জন্য। এখানেই প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শের সঙ্গে ঘটে আমাদের আদর্শের অমিল এবং বিরোধ,—ত্যাগের সঙ্গে ভোগের বিরোধ।

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন জ্ঞানী কর্মী, কর্মত্যাগী নয়। কর্মেই ছিল তাঁর আনন্দ এবং উপাসনা। এ কর্ম হচ্ছে পরহিতের জন্য কর্ম—অর্থাৎ সেবার কর্ম। তাঁর জীবনযজ্ঞের সকল সাধনার লক্ষ্য ছিল দেশের ও দশের কল্যাণ বা পরার্থ,—এর মধ্যেই আপন স্বার্থকে বিলীন করে তিনি করেছিলেন পরমার্থের সন্ধান।

চিরকুমার, বিজ্ঞানতপস্বী, আত্মত্যাগী প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের তাই মূলমন্ত্র ছিল সেবা এবং প্রেম। তিনি জেনেছিলেন এ ছাড়া মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের বা মুক্তির আর কোন পথ নাই,—এতেই মানব জীবনের চরম অভিব্যক্তি ও পরম উৎকর্ষ; এতেই মানুষের ক্রমবিকাশের পরিণতি ঘটবে আনন্দে ও অমৃতে। তাই তিনি বাঙ্গালীকে পুনঃপুনঃ তারস্বরে বলে গেছেন মানুষ হবার পথে চলতে, সত্যসন্ধী এবং সত্যাশ্রয়ী হতে, নিরলস কর্মী হতে দেশের ও দশের হিতে। আজ স্বাধীন ভারতে মানুষের অভাব,—তাই এত পরিকল্পনা, এত আয়োজন আড়ম্বর, এত কলকারখানার প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও দেশে দুঃখদৈন্য, অভাব অনটন, এবং হিংসাবিদ্বেষেরই প্রসার যাচ্ছে বেড়ে। সুতরাং প্রফুল্লচন্দ্রের শতবার্ষিকী উৎসবের দিনে তাঁকে শুধু স্মরণ করে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলে চলবে না, তাঁর জীবনের দৃষ্টান্তে নির্দেশিত ও তাঁর জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত পথে আমাদের চলতে হবে,—নিজের এবং সমগ্রজাতির কল্যাণের জন্য। তবেই তাঁর শতবার্ষিকী উৎসব সার্থক হতে পারে; তবেই আমরা তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে পরিচয় দিতে পারব। এখানেই ইতি করি, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে।

শ্রী প্রিয়দারঞ্জন রায়

॥ আচার্যদেব ॥

চল্লিশ বছর আগে কলকাতা এমন মরুভূমি ছিল না। তখন শহরের উত্তর থেকে মধ্য অতিক্রম করে দক্ষিণে এগিয়ে গেলে এখানে ওখানে এমন সব মরূদ্যানের সন্ধান পাওয়া যেত যার যে কোন একটির আশে পাশে কিছুদিন বাস করলে জীবনের সম্পূর্ণ রসদ সংগ্রহ করে নেওয়া সম্ভব হত। এমনি একটি মরূদ্যান ছিল সার্কুলার রোডের বিজ্ঞান কলেজ এবং তার প্রাণকেন্দ্রে ছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। এমন একটি তীর্থস্থান আজ সারা ভারতবর্ষে খুঁজে পাওয়া যাবে না, লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকলেও রাজ দরবারে ত নেই-ই। একদা সেই বিজ্ঞান কলেজে ছাত্র হবার সৌভাগ্য আমার জীবনে ঘটেছিল তারি দু চারটি টুকরো কথা এখানে নিবেদন করছি।

১৯২০ সালের গোড়ার দিক। স্কটিশচার্চ কলেজে পড়ি, ওয়ান হস্টেলে থাকি। হস্টেলের এসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি হয়েছি। বাৎসরিক মিলনোৎসবে একজন বিখ্যাত জননায়ককে আনতে হবে প্রধান অতিথি হিসেবে। আমরা কেমিস্ট্রি অনার্সের ছাত্র, আচার্যদেবের বই পড়ে আই এস সি পাশ করেছি, তাঁর হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি সদ্য পড়েছি এবং খুব ভাল লেগেছে। দেখা যাক, যদি তিনি দয়া করে পায়ের ধুলো দেন। গেলাম দুবন্ধুতে, আমি ও মনোরঞ্জন (বর্তমানে যশে প্রবাসী)। সায়েন্স কলেজের দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় তাঁকে পাওয়া গেল তাঁর অত্যন্ত খাটিয়ায়। শুয়ে আছেন, পাশে তিনচারজন ছাত্র মেঝেতে বসে আছেন, একজনের চোখে মোটা চশমা—তাঁর কাঁধে আচার্য তাঁর একটি পা চড়িয়ে দিয়েছেন, অনুগত ছাত্র পায়ে হাত বুলুচ্ছেন। পরে চিনেছিলাম তিনিই মেঘনাদ সাহা। আমরা অতি বিনীত ভাবে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করলাম। তিনি খুঁটে খুঁটে সব জিজ্ঞাসা করলেন—কোন রাস্তায় কতটা গেলে আমাদের হস্টেলে পৌঁছানো যাবে, এইসব। কথা দিলেন, আসবেন। উৎসবের দিনে আমাদের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে গেল, কিন্তু অতিথির দেখা নেই। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্টেজের বিচিত্রানুষ্ঠান দেখছি, পেছন থেকে কাঁধের উপর চাপ অনুভব করতে পেছন ফিরে দেখি প্রসন্নমুখে আচার্যদেব দাঁড়িয়ে। সভার মধ্যে নিয়ে যেতে চাইলাম, যেতে রাজী হলেন না। বললেন, চল্, দেখে আসি তোরা কোথায় থাকিস, কোথায় খাওয়া দাওয়া করিস্। তেতলা পর্যন্ত সব একক ঘরগুলি (Single seated room) দেখলেন, ছেলেদের আসবাব, বই, বিছানা, পড়ার টেবল দেখলেন, নিচে খাবার ঘর, কমনরুম সব দেখলেন। বসে খাবেন না, খাবার জিনিস মাটির প্লেটে সাজিয়ে ঢেকে বেঁধে গাড়ীতে দিয়ে এলাম। একখানি পাল্কী-গাড়ী, ঘোড়াটি সাদা। ও গাড়ী সেদিনে কলকাতায় অনেকেই চিনত। ঐটিতে করে তিনি প্রায় রোজই ময়দানে বেড়াতে যেতেন।

ফোর্থ ইয়ারে পড়বার সময় আমাদের মাষ্টার মশাই বললেন মাণিকতলা বেঙ্গল কেমিক্যাল দেখে আসার জন্য। গেলাম আচার্যদেবের কাছ থেকে পরিচয় পত্র নিয়ে আসার জন্য সায়েন্স কলেজে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় উত্তর দিকের ল্যাবোরেটারিতে ছিলেন, পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্র কুমার সেন। আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করতেই একখানা সাদা কাগজ ম্যানেজারকে লিখে দিলেন বড় বড় কাঁচা অক্ষরে। Here are Chemistry Hons. students of the Scottish Churches College. Show them the Chemical Plants and entertain them with

sarbat. নিচে বড় বড় অক্ষরে লেখা P. C Roy. তখন খুব গরম পড়ে গেছে ফ্যাক্টারি খানিকটা দেখিয়ে ম্যানেজার আমাদের সামনে এক গিলে ঘন ঘোল দিয়ে তৈরী সুগন্ধী সরবৎ উপস্থিত করলেন। সকলেই তখন তৃষ্ণার্ত্ত, খুবই তৃপ্ত হওয়া গেল। আমাদের মধ্যে একজন বেঁকের মাথায় বেশ কয়েকগ্লাস খেয়ে আর নড়তে পারলেন না; পাশেই একটা বেঞ্চে শুয়ে পড়লেন এবং বলে দিলেন ওঁর পক্ষে আর হেঁটে বেড়ানো তখনকার মত সম্ভব নয়, এই ব্যক্তিটি পরে শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। নাম শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

এর পরে আচার্যদেবকে দেখি আমাদের অনার্স পরীক্ষার সময়। সায়েন্স কলেজে প্রাকৃটিকাল পরীক্ষা দিতে গেছি। একদিন পরীক্ষার পর আমরা চজন ছাত্র (অভয় ও আমি) দোতলায় ওঁকে একা শুয়ে থাকতে দেখে সাহস করে কাছে গিয়ে পায়ের ধুলো নিতেই উঠে বসলেন ও কোথায় বাস, কেন এসেছি, জিজ্ঞেস করলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমরা পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী যাচ্ছি বললাম।

'এঁ্যা, তোরা সেই ১০টা থেকে সারাদিন পরীক্ষা দিচ্ছিস্, তাই তোদের মুখ শুকনো। কিছু খেয়ে নিয়েছিস্ ত?'

'না, এই পথে বেরিয়েই খেয়ে নেব'।

'হুঁ দেখছি' বলে দাঁড়ালেন। আমাদের দুজনের কাঁধে দুটি অর্ধচন্দ্র বসিয়ে ঠেলে নিয়ে চললেন পশ্চিম-দিকে তাঁর শোবার ঘরে। নিজের হাতে একটি বিপুলায়তন ডেসিকেটর নামালেন, তাতে ভরতি ছিল মুড়ির মোয়া। ছোট একটা খাবার আলমারি থেকে বেরোল এক রেকাবী সন্দেশ, কে যেন হয় ভালবেসে দিয়ে গেছে। দুটো প্লেটে কয়েকটি মোয়া ও সন্দেশ সাজিয়ে আমাদের সামনে রেখে বললেন 'নাও, খেয়ে নাও, ঐ কুঁজো গ্লাস আছে, জল গড়িয়ে খেয়ে নিও, আমার ওখানে লোক আসবে, যাই'। ঠিক যেন স্নেহময় পিতার আদর, আমি পিতৃহীন ছিলাম, চোখে জল এসেছিল।

১৯২১ সালে সায়েন্স কলেজে পড়তে গিয়ে প্রতিদিন তাঁকে দেখেছি, গায়ে একটি কতুয়া, পরণে খদ্দরের ধুতি লুঙ্গির মত করে পরা। কোনো বাহুল্য নেই, অতি সহজ সাধারণ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। কৃশ খর্বকায় মানুষটির উপাধির ঐশ্বর্য যতই বেড়ে যাচ্ছে, ততই যেন তিনি নিতান্ত অকিঞ্চনের মত জীবনযাপন করছেন। সর্বপ্রকার সংস্কার মুক্ত অথচ মানব ধর্মে পূর্ণ বিশ্বাসী এমন একটি আত্মপ্রতিষ্ঠ মানুষের এত কাছাকাছি আসা আমার জীবনে আর ঘটে নাই। উপাধি অনেকগুলি জুটে ছিল। স্যার পি. সি. রায়, এম এ, পি আর এস, পি এইচ ডি, ডি এস সি, সি আই ই, কে টি, কিন্তু নিজের ঘর নিজে ঝাঁট দেন, নিজের কাপড় জামা নিজের হাতে কাচেন, যে পোষাকে বাইরে যান তেমন পোশাকে আমরা ছাত্ররাও যেন বাইরে বেরোতে লজ্জা পাই। একদিন মনে আছে, একটা খাটো ধুতি পরেছেন। একদিকে হাঁটুর উপরে উঠে গেছে, কাছাটা ঠিকমত গোঁজা হয়নি, শার্টের উপরে একটা ঝোলা কালো কোট চড়িয়েছেন, আমি ল্যাবোরেটারিতে কাজ করছিলাম। ডেকে বললেন, 'ওরে কে আছিস ওখানে যাতো। বড়বাজারে অমুক নম্বরে একটা ফোন করে দিবি। আমি আজ ওদের মিটিংএ যেতে পারবো না, এক্ষুনি আমাকে বাঙ্গালোর যেতে হচ্ছে। ওখানে গভর্ণিং বডির একটা জরুরী সভা আছে।' কাঁধে একটা মলিন অগোছালো চাদর। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। নিচে গাড়ী দাঁড়িয়ে। ঐ পোশাকে চললেন বাঙ্গালোরের এক বিশেষ সভায়। অবাক হয়ে দেখলাম। প্রণাম জানালাম সমস্ত অন্তর দিয়ে।

একদিন সকাল বেলায় কাজ করতে গেছি আমাদের অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রির ঘরে। সেকালে

বড় বাড়ীর দোতলার উত্তর দিকের বড় ঘরটায় আমাদের ল্যাবোরেটারি ছিল। ব্যালেন্স রুম সেই দক্ষিণ দিকের ছোট ঘরটায়, যেখানে স্যার পি. সি. র আটিয়াটি একপাশে থাকত। ব্যালেন্স রুম থেকে বেরিয়েছি। হাতে বড় ডেসিকেটর, করিডর দিয়ে আমাদের ঘরের দিকে যাচ্ছি, উনি বেরিয়েছেন বাথরুম থেকে, হাতে একখানতি কাচা কাপড়, ওজনটা বোধ করি একটু বেশি হয়েছে, বয়ে নিয়ে যেতে ওঁর একটু কষ্টই হচ্ছে। একটু কাত হয়ে পড়েছেন। তাড়াতাড়ি ডেসিকেটরটা নামিয়ে রেখে ওঁর হাত থেকে বালতিটা নিতে গেছি, বালতিটা রেখে আমার দিকে তাকালেন। চোখে মৃদু তর্ৎসনা। বললেন, 'না, টানতে হবে না। কোথায় থাক? মেসে? নিজের জামাকাপড় নিজে কাচো? নিজের ঘর নিজে ঝাঁট দাও? নিজের কাজ নিজে করবে। অপরকে কখনো খাটাবে না'। বলে বালতিটি তুলে নিয়ে চলে গেলেন। এঁরা লোকশিক্ষক, এঁরা শিক্ষা দেন বলিষ্ঠ জীবনধারণের শিক্ষা। এমন শিক্ষা আজিকার দিনে দুর্লভ।

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবে। আজ তার উদ্বোধন। বড় বড় মাতগণ্য অতিথিরা আসবেন। সভার পরে হালকা জল খাবারের ব্যবস্থা। মেনু স্যার পি. সি. অনুমোদিত। একটা শালপাতার ঠোঙায় এক ঠোঙা টাটকা মুড়ি, দুটো করে সিঙ্গাড়া ও সন্দেশ এবং এক গ্লাস করে ঠাণ্ডা ঘোলের সরবত। চা নেই, টোস্ট কেক পুডিং নেই। এ কী ব্যাপার। কিন্তু নিরুপায়। পরের দিন সকালবেলায় দো-তলার কেমিস্ট্রির গ্যালারির সোজা নিচে হলের পাশে এক রাশ মুড়ি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

যখন বরিশাল কলেজে অধ্যাপনা করতাম, কী এক বিশেষ উপলক্ষে আচার্যদেব বরিশাল গিয়েছিলেন। এইটি মনে আছে যে আমাকে তার অভিনন্দন পত্রটি লিখতে হয়েছিল। তাঁকে যখন আমাদের তত্ত্বাবধান অধ্যক্ষ সতীশ চট্টোপাধ্যায় কলেজে নিয়ে এলেন, তিনি কেমিস্ট্রির ক্লাস দেখতে আমার ক্লাসে এসেছিলেন। প্রণাম করলাম, ছেলেদের কাছে পরিচয় দিলাম। ছেলেরা সম্ভ্রমভাবে দাঁড়িয়ে রইল, তিনি দু একটি কথা বললেন, চলে গেলেন। তারপর তাঁকে কাছাকাছি দেখার সুযোগ আর আমার ঘটেনি।

ঐ মহামানব আসে। সকল দেশে সকল কালেই মাঝে মাঝে মহামানবের আবির্ভাব হয়। এঁরাও মানুষ, কিন্তু এঁরা মহামানুষ, একক, বনস্পতি। এঁরা গুরু, শিক্ষক, পথিকৃৎ। এঁরা পথনির্দেশ করেন। আমরা পথ চলি। আমার অন্তরে আকাঙ্ক্ষা না থাকলে, আমার ভিতরে গরজ না থাকলে কি শুধুই ওঁদের কথায় পথ চলতে পারতাম, না ভাল লাগত? ভাল লেগেছিল ওঁদের জীবন, ওঁদের কথা, ওঁদের চালচলন, আচার ব্যবহার, ওঁদের ক্ষমা, ধৈর্য, বিদ্যাবত্তা, সংবেদনশীলতা, জ্ঞানানুশীলন। এক কথায় ওঁদের জীবন দর্শন। আচার্যদেবের বিস্তৃত বৃহৎ মহান্ জীবনের কতটুকুই বা জেনেছি, ওঁর জীবনের অপরিমেয় আলোকের কতটুকুই বা আমাদের মত সাধারণ ছাত্রের জীবনে প্রতিফলিত হতে পেরেছে? তবে যেটুকু পেয়েছি, আনন্দ পেয়েছি, ধন্য হয়েছি। আজ শতবার্ষিকীর পুণ্য দিনে আমার সমস্ত হৃদয় ওঁর চরণে লুটিয়ে পড়ুক।

রমেশ চন্দ্র সেন

॥ প্রফুল্লচন্দ্র ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের দোতলায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কক্ষটি ভারতবাসীর নিকট পুণ্য তীর্থ। এই কক্ষে আচার্যদেব বহু বৎসর বাস করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। এখানে বিশেষ কোনও আসবাবপত্র ছিল না। কেবলমাত্র শয়নের জন্য একখানি তক্তপোষ, বসিবার চেয়ার, বই রাখিবার জন্য একটি টেবিল ও বিশ্রামের জন্য একটি আরাম কেদারা। আজীবন ব্রহ্মচারী প্রফুল্লচন্দ্র যোগীর মত এখানে বাস করিতেন। এই তাঁহার শয়নকক্ষ, বিশ্রামকক্ষ, ভোজনকক্ষ এবং ধর্মবন্ধুদের সহিত আলাপ আলোচনার স্থান ছিল। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ, খ্যাতনামা সাংবাদিকগণ, ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, ভারতের নেতৃবৃন্দ, ছাত্র শিল্প সকলের সহিত তিনি সাধারণ বেশে এই ঘরে আলাপ করিতেন—দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনার স্থান ছিল এই ঘর। পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষালাভ করিয়াও প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন প্রাচ্য-সংস্কৃতির প্রতীক। আর্য ঋষিগণের ন্যায় সাধারণ পরিবেশের মধ্যে উচ্চাঙ্গের আলোচনাই ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

আধুনিক ভারতে রসায়নের জনক, রাসায়নিক গোষ্ঠীর সৃষ্টিকর্তা প্রফুল্লচন্দ্র এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণা করিয়া ডক্টর অফ্ সায়েন্স উপাধি লাভ করিয়া ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে দেশে ফিরিয়া আসেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত তিনি কোনও উপযুক্ত কার্যে নিযুক্ত হইতে পারেন নাই। তখন তিনি দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন "কেশওচ্ছ বাদ দিলে ল্যাবরেটরীর যে অবস্থা, পরীক্ষাগারের অভাবে রাসায়নিকের অবস্থাও তদনুরূপ—রাসায়নিক তখন অসহায় ও অক্ষম।" ১৮৮৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে সামান্য বেতনে শিক্ষকের পদ পাইয়া তিনি সোৎসাহে রাসায়নিক গবেষণায় ব্রতী হন। সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সমধিক প্রচলন নাই। নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে তিনি একটি রাসায়নিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করিয়াছেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তরুণ ছাত্রগণ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার নেতৃত্বে বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করিলেন। অধ্যাপক লিলভাল্ লেভি লিখিয়াছেন, "প্রফুল্লচন্দ্রের পরীক্ষাগার তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানীর শিক্ষাকেন্দ্র।" প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন "১৯০৯ সাল বাংলাদেশের রসায়নের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পুলিনবিহারী সরকার, রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, দেবনাথ সাহা, জিতেন্দ্র নাথ রক্ষিত, হেমেন্দ্রকুমার সেন, বিমান বিহারী দে প্রভৃতি মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্রেরা প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন। ভবিষ্যৎ জীবনে ইঁহারা উচ্চাঙ্গের গবেষণা করিয়া লব্ধ প্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী হইয়াছেন।"

"হিন্দু রসায়নের ইতিহাস" গ্রন্থখানি প্রফুল্লচন্দ্রের অমর কীর্তি। এই গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের রসায়ন চর্চার বিশদ বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ বৈজ্ঞানিক জগতে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্রকে লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির এক সভায় পরিচয় করাইয়া দিবার সময় উল্লেখ করা হয় মহান্ আর্য জাতির তিনি বিশিষ্ট প্রতিনিধি। আর্য জাতি এক সময়ে সভ্যতার শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং আমাদের দেশ তখন অজ্ঞানের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। এই জাতি বহু রাসায়নিক পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিল।"

১৯২৪ সালে আচার্যদেবের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। তিনি রসায়নের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের ক্লাসে বক্তৃতা দেন। তিনি বিশ্ববিশ্রুত রাসায়নিকগণের জীবনকাহিনী আলোচনা করিতেন। সেই সময়ে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতেছিল এবং নানাভাবে জাতীয় সংগঠনের কার্যে প্রফুল্লচন্দ্র আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। স্নেহাস্পদ ছাত্রগণকে তিনি দেশমাতৃকার সেবার জন্য উৎসাহ দান করিতেন। ভারতের বিবিধ সমস্যার উল্লেখ করিয়া তিনি সমাজের দৈন্য সম্বন্ধে যথা জাতিভেদ, ছুঁৎমার্গ, পণপ্রথার তীব্র সমালোচনা করিতেন। বাঙ্গালী ছাত্রগণের দুর্বলতা, বাঙ্গালীর ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিষ্ক্রিয়তা, বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার তাঁহার বক্তব্যের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল।

ছাত্রবৎসল প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান কলেজে একটি ক্ষুদ্র আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কয়েকজন ছাত্র সর্বদাই তাঁহার সান্নিধ্য পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিত। বিজ্ঞান চর্চায় সাধনা প্রয়োজন—একান্ত চিত্তে মনোনিবেশ না করিলে উচ্চাঙ্গের গবেষণা সম্ভবপর নহে ইহা তিনি ছাত্রগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেন। নিয়মিত সময়ে গবেষণাগারে উপস্থিত থাকিয়া জীবনের সায়াহ্নেও তিনি স্নেহাস্পদ ছাত্রগণকে উৎসাহিত করিতেন। গবেষণায় কৃতিত্ব দেখাইলে তিনি সস্নেহে ছাত্রগণকে আলিঙ্গন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেন। দেশের দুর্দিনে, দুর্ভিক্ষের সময়, জলপ্লাবনের সময়, মহামারীর সময় তিনি দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেও রসায়নাগারের ছাত্রগণকে বিস্মৃত হন নাই।

পরীক্ষাগারের খুঁটিনাটি ব্যবস্থা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করিতেন। ছাত্রগণের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখিলে তিনি তীব্র ভৎর্সনা করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। বিজ্ঞান কলেজের চিঠির কাগজে রাসায়নিক সঙ্কেত ছাত্রগণ লিখিয়াছে ইহা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন। পরীক্ষাগারে অযথা জল নষ্ট করিলে কিংবা বুনসেন প্রদীপ অযথা জ্বালাইয়া রাখিলে তিনি বিরক্ত হইয়া গালাগালি করিতেন। অপরিচ্ছন্নতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। ফিল্টার কাগজ মেজের উপর পড়িয়া থাকিলে তিনি স্বহস্তে তাহা যথাস্থানে ফেলিয়া দিয়া ছাত্রগণকে লজ্জা দিতেন। ছাত্রদিগকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন এবং অনেক সময়ে দিবাদেবে শ্রান্ত ক্লান্ত ছাত্রগণকে তিনি নিজের কক্ষে ডাকিয়া নিয়া খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করিতেন। ছাত্র ও শিক্ষকগণের মধ্যে এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমানে লোপ পাইয়াছে।

আচার্যদেবের প্রতিটি কার্য দেশানুরাগের পরিচায়ক। বিবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে ভারতীয়গণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার অদম্য উৎসাহ তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার অসংখ্য কীর্তির মধ্যে ভারতে Indian Chemical Society'র প্রতিষ্ঠা অন্যতম। বাংলার Asiatic Society'র পত্রিকায় মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৯৬ সালে Asiatic Society পত্রিকায় Mercurous Nitrite এর প্রস্তুত প্রণালী লিপিবদ্ধ করেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর Nature পত্রিকা নিম্নোক্ত সমালোচনা করিয়াছিল,—

"রসায়ন শাস্ত্রের গ্রন্থ হিসাবে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা কোনও গ্রন্থাগারে স্থান না পাইলেও এই পত্রিকায় প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশনের জন্য বৈদেশিক পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত। বিদেশের পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশনে অনেক অসুবিধা ছিল। দীর্ঘদিন পরে প্রবন্ধ মুদ্রিত হওয়ায় প্রবন্ধের গুরুত্বের লাঘব হইত। তাই প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার ছাত্রগণের সাহায্যে—ভারতীয় রাসায়নিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থা তাঁহার অমর কীর্তি। এই সংস্থার পত্রিকা ১৯২৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে

এই সংস্থার মাসিক পত্রিকা বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। এই সংস্থার বর্তমান সভ্য সংখ্যা প্রায় ৮০০ এবং বার্ষিক ২০০ প্রবন্ধ এই সংস্থার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি তাঁহার ভাষণে অনেকসময় এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন "আমরা অন্ধের ন্যায় একটি নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছি—ইংরাজী শিখিয়া ইংরাজী ভাষায় পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞান আহরণ করিব, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। একজন ইংরেজ, পারসিক, চীনা কিংবা রুশ অথবা জার্মানভাষার প্রথমে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া পরে জ্ঞানার্জন করিবে ইহা ধারণার অতীত।" তিনি এবিষয়ে কেবলমাত্র উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের কয়েকখানি পুস্তিকাও লিখিয়াছিলেন। তিনি বিজ্ঞানের পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় রাজশেখর বসু ও অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে পরিভাষা সঙ্কলনের সময় এই পুস্তিকা হইতে আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। অনেকের ধারণা ছিল বাংলাভাষায় বিজ্ঞান অধ্যাপনা অসম্ভব—২০।২৬ বৎসর পূর্বে মাতৃভাষায় যখন স্কুলের শিক্ষকগণকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতাম তখন আচার্যদেব আমাদের উৎসাহ দিতেন। ৪০।৫০ বৎসর পূর্বে প্রফুল্লচন্দ্র যে আশাপোষণ করিয়াছিলেন আজ তাহা ফলবতী হইতে আরম্ভ করিয়াছে—বিজ্ঞানের কৃতিত্ব বর্তমানে বাংলাভাষায় লিপিবদ্ধ হইতেছে এবং মাতৃভাষায় বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সুষ্ঠুভাবে আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতের শিক্ষা ও শিল্প ক্ষেত্রে আচার্যদেবের অবদান চিরস্মরণীয়। তাঁহার কীর্তি স্বর্ণাক্ষরে বাংলাদেশের ইতিহাসে, ভারতের ইতিহাসে লিখিত হইবে।

শ্রী দুঃখহরণ চক্রবর্তী

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তখন রসায়নের ছাত্র। ক্লাসে বা কলেজের ল্যাবরেটারীতে রসায়নের পরীক্ষা নিরীক্ষা মনের মত না হওয়ায় তিনি তাঁহার এক ধনী ছাত্রবন্ধুর গৃহে একটি ক্ষুদ্র পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করিবার সময় হাইড্রোজেন টিউবে অক্সিজেন গ্যাস ঢুকিয়া যায় ও এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। বাড়ীর লোকেরা ও পাড়ার সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখে সে এক ভয়ানক কাণ্ড। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের মুখে হাসি। তিনি সাময়িকভাবে সে বিস্ফোরণের আঘাত পাইলেও, এই ভাবিয়া উৎফুল্ল হইলেন যে, দুটো গ্যাসের এই প্রকার বিস্ফোরণ কি ভাবে ও কতখানি প্রচণ্ডতা সৃষ্টি করিতে পারে তাহা নির্ণীত হইল।

॥ যুগ প্রবর্তক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ॥

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'কুলির দেবতা করি মানুষের ঘোর দ্বন্দ্ব-মাঝে।"

সুতরাং মহাপুরুষের বন্দনায় ছন্দোবদ্ধ থাকাই প্রশস্ত। ইহার আর একটি সুবিধা এই যে ছন্দের ভিতর দিয়ে মহামানবের জীবনের মূল সুরটি অনিত ও পরিস্ফুট হওয়ায় পূজারীর পক্ষে তাঁর জীবন আলেখ্য উদ্‌ঘাটিত করা অধিকতর সহজ হয়ে পড়ে। এই কারণেই প্রথমে ছন্দে বন্দনা করে আচার্যদেবের পবিত্র জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হচ্ছে।

আচার্য বন্দনা

যারা সারা জীবনের চির তপস্যায়
কালের নিকষ কালো গায়
আপনি উজ্জ্বল দাগ রাখি' চলে যায়—
নবযুগে নবীন পথিকদল তাদের সে নিশানা নিরখি
পরম বিস্ময়ে আর অসীম শ্রদ্ধায়
হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দেয় উপহার
লভে পথ চলিবার শক্তি দুর্নিবার।
আজ সমগ্র ভারত যাঁর যাহার পূজায়
সে আচার্য রায়
অনিবার্য আয়ের আখরে আঁকর রাখিয়া গেছে
ভারতের আকাশে বাতাসে।
মেঘাঞ্জন এমনি যাবল দিনে'
একশত বর্ষ আগে শাপভ্রষ্ট দেবতার প্রায়
জন্ম নিল যেই শিশু শ্যামসিক্ত এই বাংলায়
মেদুর বর্ষার সরসতা প্রাণে তার রেখে গেল দাগ
শ্রাবণ জলদমন্ত্র কোন উর্দ্ধলোকে দিল ডাক।
ধনীর দুলাল—তবু ঐশ্বর্যের না হ'তে পার
অনুভব করে হৃদে অসহ্য অসীম ব্যথা হতভাগ্য দেশ মাতৃকার।
স্থির করি দেহের যৌবন নবীন যুগের তপীরথ
বাহিরিলা বহির্বিশ্বে—ব্রত হ'ল ইষ্ট সাধনায়।
তপস্যার বলে আনিয়া জ্ঞান মন্দাকিনী ধারা
দুর্বার প্লাবন তার বহাইয়া দিল এই পতিত বাংলায়।

নব জন্ম লভিল বাঙালী, বিগত হইল তার অজ্ঞতা জড়তা
ঘুচে মুছে গেল একেবারে চরিত্রের যুগান্ত সঞ্চিত আবিলতা।
বাঙালীর মনোলোক উদ্ভাসিত হল এক দিব্য মহিমায়।
সঞ্জীবনী জ্ঞানধারা নব নব কর্মক্ষেত্র করিল উর্বর
বাঙালী দাঁড়ালো উচ্চ শিরে শত শির প্রতিষ্ঠায় সাফল্য গৌরবে।
পুণ্য শততম জন্মদিনে এ প্রার্থনা যাচি তব পায়—
জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাঙালী বিজয়ী হোক, হোক ধন্য জগৎ সভায়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন একজন যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষ। রাজা রামমোহন রায়ের পরে (রবীন্দ্রনাথ বাদে) তাঁর মত জ্ঞান ও সত্যানুরাগী, তাঁর মত বহু ভাষাবিদ্, বহু শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন সংস্কার বর্জিত মানবিকতার পরমবিকাশ কেবলমাত্র বাংলাদেশে কেন সমগ্র ভারতেই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তারপর নিজে জ্ঞানবিজ্ঞানের এবং মানবিকতার অত্যুচ্চস্তরে আরূঢ় হয়ে সমস্ত দেশবাসীকে সেই স্তরে উন্নীত করার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আন্তরিকতার পরিচয় তিনি দিয়ে গেছেন, বাস্তবিক তার তুলনা মেলে না। কিন্তু সর্বোপরি যে বৈশিষ্ট্য রাজা রামমোহন থেকে আরম্ভ করে অপর মনীষীদের চাইতেও তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে, সে হচ্ছে তাঁর নব্য রাসায়নিক জ্ঞানের প্রয়োগে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধান, বেকার জনগণের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান, দারিদ্র্যপ্রপীড়িত রোগক্লিষ্ট দেশবাসীকে সুলভে ঔষধপথ্যাদি সরবরাহের আপ্রাণ প্রয়াস। দেশকে সত্যিকারের স্বাধীনতার পথে চালিত করতে হলে সর্বাগ্রে দরকার নিরন্তর লোকচিত্তকে কাজের ভিতর দিয়ে গড়ে পিটে তোলা, সংগঠনমূলক কাজের মাধ্যমে তাদের চারিত্রিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন এবং সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রথম জীবনেই এই সত্য সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। আর তাঁর এই জীবনস্বপ্নের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর মানস সন্তান বেঙ্গল কেমিক্যালের ভিতরে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কত বড় প্রতিভাধর মনীষী ছিলেন, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর কি অসামান্য অধিকার ছিল, সমগ্র দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য তাঁর ব্যগ্র মন কিরূপ ব্যাকুল ছিল তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের কথা এই যে, আমাদের বর্তমান শিক্ষিত যুবক যুবতীদেরও অনেকেই এই অমূল্য গ্রন্থের নাম পর্যন্ত শোনেন নি। এই বিরাট গ্রন্থ তিনি নামমাত্র মূল্যে দেশবাসীকে উপহার দিবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু নাটক নভেল ও হাল্কা ধর্মোচ্ছ্বাসপ্লাবিত দেশে জাতিগঠনমূলক এরূপ গ্রন্থের সমাদর কোথায়?

আমাদের শিক্ষা অধিকর্তারা যদি উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে এর অংশবিশেষ স্থান দিতেন, তা হলেও বাংলার তরুণ তরুণীরা আচার্যদেবের মহৎ আদর্শের কথঞ্চিৎ পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়ে ধন্য হত।

আচার্য রায়ের গভীর পাঠানুরাগ ও প্রগাঢ় জ্ঞান পিপাসার অন্ত ছিল না। শত কাজের মধ্যেও নিত্য নতুন বিষয় পাঠ করা তাঁর নিত্য কর্মের মধ্যে গণ্য ছিল। রেলে-স্টীমারে ভ্রমণকালেও তিনি অনেকগুলি করে পুস্তক সঙ্গে নিতেন এবং পরীক্ষা সমুখীন ছাত্রের মত গভীর মনঃসংযোগের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে সেগুলি অধ্যয়ন করতেন। কত বিভিন্ন বিষয়ের কত অসংখ্য বই তিনি পড়েছেন তার খবর মিলতে

পারে যদি কেউ ক্লেশ স্বীকার করে প্রেসিডেন্সী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, রামমোহন লাইব্রেরী ও বর্তমান জাতীয় গ্রন্থাগারে অনুসন্ধান করেন যে ১৯০০ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত কোন কোন বই তিনি নিয়েছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে কোনও ক্ষেত্রের মনীষীদের জীবনচরিত ছিল তাঁর নিত্য সহচর। সংস্কৃত ভাষায় অগাধ ব্যুৎপত্তি ছাড়া ফরাসী, জার্মানী ও লাটিন ভাষায় তাঁর রীতিমত অধিকার ছিল। রসায়নশাস্ত্রের সর্বাধুনিক গবেষণার সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য এবং হিন্দু রসায়নের ইতিহাস লেখবার জন্য তিনি জার্মান ও ফরাসী ভাষা সযত্নে শিখেছিলেন।

১৯০৫ সালে 'জার্মান প্রাইমার' নামক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে তাঁকে দেখাই। উনি খুশী হয়ে নিজহাতে তাঁর আলমারি খুলে বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী অধ্যাপক 'কথে'র রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস আমায় দেখান। আমি অবাক হয়ে দেখলাম সেই পুরাতন জার্মানের বার এক একটি বাক্যই এক পৃষ্ঠাব্যাপী, তার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় শব্দার্থ ও নোট রয়েছে। আচার্য রায়ের পড়া আমাদের পড়ার মত তাসা তাসা ছিল না। তিনি গভীর একাগ্রতার সঙ্গে পড়তেন; তাই পঠিত বিষয় তাঁর মনে চিরদিনের জন্য গেঁথে যেত। একদিন কথা প্রসঙ্গে মার্টিন লুথারের নিম্ন লিখিত দুই ছত্র আমায় শুনিয়েছিলেন—

Wer liebt nicht, Wein, Weib und Gesang,
Der bleibt ein Narr sein Lebenlang.
(যে ভালবাসে না মদ, নারী আর গান
এ জগতে মূর্খ নাই তাহার সমান।)

এটি বলেছিলেন যখন তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। কাজেই এত বেশী বয়সেও তাঁর স্মৃতিশক্তি কিরূপ প্রখর ছিল তা বেশ বুঝা যায়। কালিদাসের রঘুবংশ, শকুন্তলা প্রভৃতি থেকেও তাঁকে সমানে আবৃত্তি করতে দেখেছি। ইংরেজ কবি ও দার্শনিকদের লেখাও তাঁর নখদর্পণে ছিল। স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র ঘোষের লেখা, কবি কামিনী রায়ের কবিতা এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্য তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে শেক্সপিয়রের নাটকের উপর তিনি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন এবং "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়।

আচার্যদেবের আত্মজীবনী পাঠ করলে তিনি কতখানি বৈজ্ঞানিক ছিলেন আর কতখানিই বা সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক-অর্থনীতিবিদ ছিলেন তা বুঝে উঠা কঠিন। তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বলতেন—যে কোন বিষয় অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে উহা কখনও ভুল হয় না। তাঁর এই বাণী আমাদের আধুনিক ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আজকালকার ছাত্র ছাত্রীরা অতিশয় দরকারী এবং সংস্কৃতিমূলক বিষয়বস্তুও মুখস্থ করতে নিতান্ত নারাজ। অবশ্য বর্তমানে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বা গৃহ সর্বত্রই একান্ত ভাবে পাঠে মনোযোগের বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছে। তরুণ চিত্তে বিক্ষোভ ঘটাবার প্রধান কারণ হচ্ছে—রেডিও, সিনেমা এবং সহশিক্ষার আধিক্য। পেটারজান নামক জনৈক জার্মান দার্শনিক লিখেছেন—"রেডিও আমাদের যতখানি উপকার সাধন করেছে, অপকার করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী। তিনি জোরের সঙ্গেই বলেছেন—রেডিও আবিষ্কারের পর থেকে পৃথিবীর সর্বত্রই, সমাজের সর্বস্তরেই পরশ্রবণেচ্ছা বড় বেশী বেড়ে গেছে, সুগভীর মৌলিক চিন্তার মারাত্মক অভাব দেখা দিয়েছে।"

এত বড় পণ্ডিত, ইতিহাসলেখক এবং প্রথমশ্রেণীর গবেষক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে অতিক্রম করেছে মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র। জাতির আলস্য, ঔদাস্য, কর্মবিমুখতা তিনি আদৌ বরদাস্ত করতে পারতেন না। "বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার" নামক পুস্তকে জাতিগঠনের মহতী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বাঙালীকে তীব্র আঘাত হেনেছেন। কিন্তু জনগণকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নিপীড়িত দেখলে তাঁর কুসুম কোমল হৃদয় ধারণর নাই ব্যথিত হয়ে উঠত, তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় গবেষণাগারের প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিন্ন করে ঘরের অবতাররূপে আর্তত্রাণে ছুটে যেতেন চির রোগশীর্ণ দুর্বল শরীরের দিকেও দৃকপাত করতেন না। মেধাবী ছাত্রকে তাঁর নিজের কাছে রেখে তাদের আহার ও বাসের ব্যবস্থা করতেন। অনেক অসহায় দুঃস্থ বিধবাকে মাসিক ভাতা দিয়ে তিনি সাহায্য করতেন। তাঁর দেহাবসানেও যাতে এটি সচল থাকে তজ্জন্য তিনি উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ তাঁর বিশ্বস্ত দায়িত্বশীল কয়েকজনের তত্ত্বাবধানে রেখে গেছেন। এখনও অনেক দরিদ্র বিধবা ঐ তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে উপকৃত হচ্ছে।

আচার্যদেবের শততম জন্মবার্ষিকীর পবিত্র দিনে ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা তাঁর জ্ঞান ও কর্ম সমুজ্জ্বল নিষ্কলঙ্ক জীবন আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাঙালী সর্বোচ্চ সাফল্য লাভ করে ধন্য হউক।

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

শিক্ষাসঙ্কট

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমাদের শিক্ষা প্রণালীর কোথাও একটা মস্তবড় গলদ রহিয়া গিয়াছে। পাঠ্যাবস্থায় বাঙালী ছাত্র যাহা শিখে, সেই সময়ের মধ্যে তাহার যদি শুধু শিখা উচিত। 'সিলেবাসে' (Syllabusএ) নাই—পরীক্ষার কাজে লাগিবে না; অতএব পড়িব না—এই একটা ভয়ানক ব্যাধি। জ্ঞানার্জন হউক বা না হউক, শুধু পাশ করিতে পারিলেই হইল। আর মুখস্থ, কণ্ঠস্থ করিয়া পাশ করিবার বিস্তৃত আয়োজনে ব্যাপকভাবে বুদ্ধির বিকাশ হইবার অবসর হয় না। কার্যক্ষেত্রে পাশকরা বুদ্ধি প্রায়ই "অকেজো" হইয়া দাঁড়ায়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

ভাদ্র—১৩৬৮

সম্পাদক

শ্রী বিভূতিভূষণ দাস

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ
২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ,
কলিকাতা—৬

মূল্য—এক টাকা

সহঃ সম্পাদক——শ্রীকল্যাণ রায়

শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতাস্থিত, ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড,
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

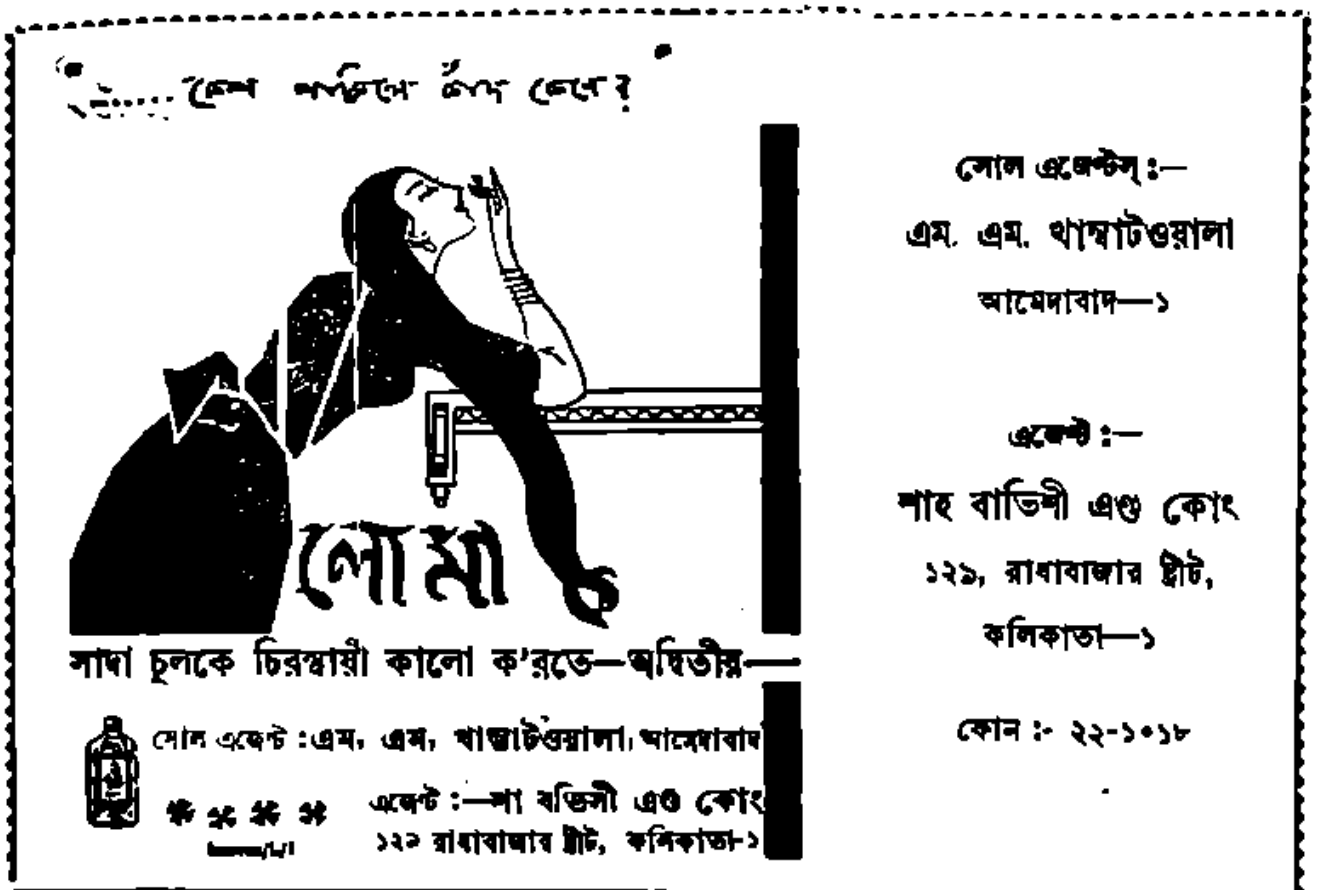

গল্প-ভারতী

সপ্তদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

ভাদ্র—১৩৬৮

সম্পাদকীয়

১০ বৎসরে কারাদণ্ড

আইনের মারপ্যাচ্ বোঝা শক্ত সে কথা ভারতবাসী আমরা অর্দ্ধশতাব্দী ধরে ইংরেজ শাসনে বুঝেছি। তাই ব্যারিষ্টার প্রমুখ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দিয়ে গেছেন পারিভাষিক slogan "Lawless Law!" তাঁর মত মনীষী (যিনি আদালতে শ্রীঅরবিন্দকেও কারাগার থেকে উদ্ধার করেন ১৯০৯) এখন না থাকলেও, ভারত থেকে আমরা লণ্ডনে পাঠাতে পারি International Law Commisoin-এর সদস্য ডাঃ রাধাবিনোদ পালকে, তিনি Frow Street হাজত থেকে যুদ্ধের নেতা Bertrand Russel-কে নির্দোষ প্রমাণ করে মুক্ত করতেন। ১৮৭২ সালে জন্মে ১৯১২ সালের মধ্যেই রাসেল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এত নাম করেন যে কর্তৃপক্ষ আতঙ্কিত হন যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি "সত্যাগ্রহ" করে বসেন (১৯১৫) Conscientious objector রূপে। তাঁর সঙ্গে বহু Quaker ও শান্তিধর্মী নরনারী তখন কারাবরণ করেন। কালজে সে কাহিনী পড়ে আমাদের গর্ব হ'ত ; ইংরেজ জাতিরা মরণ-যজ্ঞে নেমেও বেঁচে আছে।

আমার বন্ধু প্রশান্ত মহলানবীশ তখন কেম্ব্রিজের পাঠ শেষ করে, দেশে Presidency কলেজে অধ্যাপনা সুরু করলেন ; প্রায় প্রত্যহ তাঁর ঘরে বসে এসব নিয়ে আমাদের আলোচনা হত এবং দেখতাম Karl Pearson এর Grammar of Science এবং Principia Mathemetic প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের মধ্যে প্রশান্তচন্দ্র কিনেছেন রাসেলের Principles of Social Reconstruction ও Roads to Freedom। সেই দুখানি বই আমাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল ; এখনো তরুণদের সেগুলি পড়তে অনুরোধ করি। Whitehead-এর সহকর্মী Russel বিজ্ঞান এড়িয়ে দর্শনের পথের পথিক হলেন কেন ?

কারণ তিনি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ মনীষী হয়েও শুধু ইংরেজ নন ; সেটি বুঝলাম Swiss Lake Lugand হ্রদের ধারে তাঁর সঙ্গে বক্তা অভিধি রূপে Womens' International League for Peace and

Freedom (1922) নিমন্ত্রণে যোগ দিয়ে। সেখানে রমাঁ রলাঁ ও তাঁর ভগ্নী যেমন আমাদের সঙ্গে ছিলেন তেমনি Tolstoy শিষ্য Paul Birukov, মার্কিণ Rev. জে, এইচ, হোমস্ ও জার্মান Nobel Laureate Herman Hesse প্রভৃতি আমাদের সঙ্গে আসেন। আমি আমার Greater India (বৃহত্তর ভারত) সেখানেই প্রথম পাঠ করি ও ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—বিশেষতঃ জাপান ও চীনের সংযোগ কত গভীর আমি সেটি স্মরণ করাই। মহামতি বার্ট্রাণ্ড রাসেল তখন (১৯২২) সবেমাত্র চীন পরিভ্রমণ করে ফিরেছেন ও তাঁর Thoughts on China পাঠ করেন; আজও সে বই পড়লে আপনারা উপকৃত হবেন। ক্রমশঃ এশিয়ার ও বিশেষ ভাবে ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী একথা রাসেল প্রকাশ্যে বলে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হন ও বন্ধুবর দিলীপকুমার রায় তাঁর উপর মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন। মাদলেন্ রলাঁ ও আমি এক শান্ত অপরাহ্নে বোটে চাপিয়ে রাসেলকে Lugand হ্রদটি ঘুরিয়ে আনি। সে স্মৃতি আজীবন মনে থাকবে; কারণ আপাতরুক্ষতার মুখোস পরে খাঁটি মানবদরদী রাসেল সেদিন মনের কথা বলেছিলেন। সময় পেলে রমাঁ রলাঁর মত তাঁর কথাও বলব। কিন্তু রাসেলের বিচিত্র রচনাবলী এখানে পাই না; যদি 'গল্প-ভারতী' গ্রন্থাগারে কিছু সংগ্রহ করা হয়, পরে লিখব।

আজ আমরা ভারতের তরফ থেকে রাসেল ও তাঁর সহধর্মিণীর জয়ধ্বনি করি! কারণ বিবেকের দীপ্ত-প্রতীক হয়ে তাঁরা দুজনে "আণবিক যুদ্ধের" বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন ও এই বৃদ্ধ বয়সে কারাবরণ করে বিশ্বশান্তিকামীদের কৃতার্থ করেছেন। গান্ধারী যেমন ধৃতরাষ্ট্রের হাত ধরে অরণ্যে প্রবেশ ও নবশান্তিপর্বের সূচনা করেছিলেন, আচার্য রাসেল ও তাঁর যোগ্য সহধর্মিণীও তাই করেছেন। তারা সুস্থ শরীরে বাড়ী ফিরে আসুন ও আমাদের প্রেরণা ও শক্তি দিন। তাঁকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করেছিলাম ১৯৫৪ সালে যখন জাপানী বন্ধুরা Hiroshima শান্তি সম্মেলনে আমাকে সভাপতি করেন। সেই বিরাট ধ্বংসস্তূপ ও হিরোসিমার সমীপে Nagasaki বন্দরের লক্ষ লক্ষ মৃত ও ভস্মীভূত নরনারীদের চরম বেদনার কথা ভেবে Rolland ও Bertrand Russel-দের আদি স্মরণ করেছিলাম। তাঁরা মৃত্যুঞ্জয় সত্যেরই পূজারী—সত্যমেব জয়তে!

প্রাণাচার্য নীলরতনের জন্ম-শতাব্দী

১৯৬১ সালেই সুরু হয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের-জন্ম-শতাব্দী উৎসব এবং বৎসর শেষ হবে তাঁদের আজীবন সুহৃদ ডাক্তার নীলরতনের জন্মোৎসব দিয়ে (১ অক্টোবর), তার পরদিনই মহাত্মা গান্ধির আবির্ভাব দিবস। তার মধ্যে কেউ যেন না ভোলেন যে গান্ধিজী নিজে পক্ষাঘাত পীড়িত নীলরতনকে দেখতে এসেছিলেন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শয্যা-পার্শ্বে বলেছিলেন "ডাক্তার! তোমাকে উঠতে হবে, না হলে আমাদের বাঁচাবে কে?" মনীষী ডাক্তার বিধানচন্দ্র সেকথা জানেন ও তাঁর অধ্যাপক নীলরতনের মত ৮০ বছরেও নাড়ী টিপে জনে জনে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা দুই জনে মিলে—শুধু ধনী নয়, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র রোগী-রোগিণীদের চিকিৎসার কত বিরাট আয়োজন করেছেন হয়ত সাধারণে তা জানে না। কলিকাতা Medical College-এ (১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার শতাব্দী পূর্তি ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত) যত রোগীদের সেবা হয়েছে ও ছাত্রদের শিক্ষা যেটুকু দেওয়া হয়েছে তার দশগুণ অধিক শিক্ষা ও আর্তসেবার ব্যবস্থা করেছেন প্রাণাচার্য নীলরতন ও তাঁর উপযুক্ত শিষ্য বিধানচন্দ্র। তাঁর অর্ঘ্যনিবেদনে পাই :—"আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানে (Medicine) পরিক্ষার্থী-

রূপে প্রথম ডাঃ নীলরতনকে কাছ থেকে দেখি···আমাদের জ্ঞানের পরিধি তখন অতি সামান্য, তবু নিজগুণে, তিনি আমাদের (ছাত্রদের) এতটুকু অবজ্ঞা করেননি···পরে তাঁর সান্নিধ্যে এসে মুগ্ধ হই যে সর্বজীবে শ্রদ্ধাই ছিল যেন তাঁর ধর্ম তাই তিনি ব্যবহারিক জীবনে ও চিকিৎসকরূপে এত উচ্চ আদর্শ আমাদের দেখিয়ে গেছেন···তাঁর গভীর সহানুভূতি ও সরস কথাবার্তা শুধু আমাদের নয়—মরণোন্মুখ রোগীদের মধ্যেও যেন প্রাণ সঞ্চার করত, আর দেখি তাঁর অদম্য জ্ঞানপিপাসা। সারাদিন কঠিন শ্রমের পর তাঁর বিছানায় শুয়ে পুস্তকের স্তূপের মধ্যে যেন ডাঃ সরকার ডুবে গিয়ে নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতেন।" আর্তসেবায় আত্মনিয়োগই ছিল যেন তাঁর জীবনের মূল ভিত্তি। তার সঙ্গে জাতীয় জীবনের কত বিচিত্র ক্ষেত্রে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। চিকিৎসার দারুন পরিশ্রমের মধ্যেও 'হাস্যমুখে অদৃষ্টের পরিহাস' করেছেন, স্বদেশী প্রচারে ব্যবসায়ে নেমে "অব্যবসায়ীদে"র দোষে শেষ জীবনে শুধু অর্থকষ্ট যে সহ্য করেছেন তাই নয় তিনি সর্বস্বান্ত হয়েই জগৎ থেকে বিদায় নেন; আজ সেকথা ভাবলে অসহায় ভাবে আমরা শুধু হা-হুতাশ না করে তাঁর মত সর্বত্যাগী চিকিৎসককে—তাঁর সহপাঠী সহকর্মী স্বামী বিবেকানন্দের মত "দরিদ্র নারায়ণের" সেবক প্রাণাচার্য নীলরতনকে জাতির প্রাণমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা চাই। তাঁর নামে বিরাট হাসপাতাল ও কলেজ গড়ে উঠেছে; সেখানকার ছাত্র ও ছাত্রীদের অনুরোধ করি, সমবেত চেষ্টায় তারা যেন এমন ছাত্রবৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন যাতে চিকিৎসা শিক্ষায় হতাশ হয়ে ছেলেমেয়েরা ফিরে না আসে, যেমন মেধাবী-ছাত্র বালক নীলরতন অর্থাভাবে ক্যাম্বেল হাসপাতালে কাজ করতে বাধ্য হন। সেই V. L. M. S. পরীক্ষা শেষ করে অল্পবয়স গ্রামের ছাত্র নীলরতন ক্রমে Medical Collegeএর সর্বোচ্চ ডিগ্রী M. B. ও M. D. এক বছরের মধ্যেই অর্জন করেন আর কত রকম বৃত্তি মেডেল পান তার হিসাব আজও করা হয়নি। তিনি পরে চিকিৎসা-জগতের নায়ক হয়েই আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে বহু কল্যাণ সাধন করেন এবং শুধু Medical বিভাগে নয় Post-graduate বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতি হয়ে বহুকাল দেশসেবা করে গেছেন। তাঁরা তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দেবেন। আমরা আজ তাঁর শুভ জন্মশতাব্দীর প্রাক্কালে প্রাণাচার্য নীলরতনের জয়ধ্বনি করি। কারণ বিদেশী চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়েও স্বদেশী চিকিৎসা পদ্ধতির বিশেষত প্রাচীন আয়ুর্বেদের উন্নতি কামনা তিনি করে গেছেন ও বাংলা ভাষায় সারগর্ভ ভাষণ ও প্রবন্ধাদি আমাদের দিয়ে গেছেন। বিস্মৃতির গ্রাস থেকে সেগুলি রক্ষা করে ডাঃ নীলরতন ও তাঁর যুগের ইতিবৃত্ত রচনার চেষ্টা সুরু হোক এই আমাদের প্রার্থনা। রবীন্দ্র তিরোধানের পর তাঁর দুই বন্ধু প্রফুল্ল রায় ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ডাঃ সরকারও দেহত্যাগ করেন ১৯৪৩ সালে।

আদি-গঙ্গা থেকে টাইবার ও টেম্‌স্!

শিল্পধারা পাতাল-গঙ্গা ভোগবতীর মত দেখে-দেখারের অলক্ষ্যে প্রবাহিত হয়; বহুযুগ পরে আমরা তার নিদর্শন দেখে বিস্মিত হই। তাই 'গল্প-ভারতী' পত্রিকায় বাঙালী চিত্রশিল্পী শশী দেবের কথা এতকাল পরে অরুন্ধতীকুমার গাঙ্গুলী লিখে আমাদের উৎসাহিত করেন। তিনি রবি বর্মার পাশ্চাত্য রীতিতে আঁকা স্বদেশী কাহিনীভরা ছবির জন্য রবি বর্মা শতবার্ষিকী প্রবন্ধ লেখেন। রবি বর্মা সুদূর কেরল থেকে বাঙলায় আসেন (১৯০৫) স্বদেশী যুগে যখন অবনীন্দ্রনাথ "ভারত মাতা", "বুদ্ধ ও সুজাতা" প্রভৃতি ছবি এঁকে নূতন যুগের সূচনা করেন এবং প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় বাঙালী শিল্পী নন্দলাল, অসিতকুমার প্রভৃতির ছবি সর্বত্র সমাদৃত হয়।

কিন্তু তর্ক তুলেছিলেন তাদের মাষ্টার E. B. Havell (বিশ্বভারতী সংগ্রহে দ্রষ্টব্য) যে নব আন্দোলন চলবে কোন পথে? East or West? হাভেল সাহেব হলেও রায় দেন যে Oriental ধারাকে প্রাধান্য দিতে হবে ও বিদেশী রীতি এবং Oil colour ছবিগুলি বর্জন করতে হবে। সেই তর্কে শুধু অবনীন্দ্রনাথ নয় রবীন্দ্রনাথও প্রবন্ধ লেখেন, অধুনা বিস্মৃত "ভাণ্ডার" পত্রিকায় পড়েছি।

কিন্তু তাঁর উপযুক্ত ভাইপো গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ব ও পশ্চিমকে মেলাতে চেষ্টা করে Cubism-এর প্রবর্তক এদেশে হন সে বিষয়ে আমার সুযোগ্য ছাত্র নীরদ চৌধুরী দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন (Calcutta Society of Oriental Art পত্রিকা দ্রষ্টব্য)।

রবি বর্মার মত আরো অনেক ভারতীয় শিল্পী বিলাতে চিত্র-বিদ্যা শিখে ফেরেন ও বোম্বাইকে কেন্দ্র করেন। বোম্বাই (পাশ্চাত্য) ও বাংলার (প্রাচ্য) শিল্পীদের বিরোধ আজও মেটেনি। ইতিমধ্যে শশী হেশ চিত্র-কলা ও অশ্বিনী বর্মন ভাস্কর্য শিক্ষার্থে বহুকাল বিলাতে কাটান যেমন বোম্বাই থেকে পাশী মারাঠী ও গুজরাটী শিল্পীরাও বিদেশীরীতি শেখেন।

ইতালীতে ভাস্কর্যের পুনরুত্থান হয় Bernini, Canova প্রভৃতির প্রেরণায় আর মাইকেল এঞ্জেলো যুগপৎ ভাস্কর ও চিত্রকর। এসব দেখে ও শিখে জয়পুর শিল্পবিদ্যালয়ে যেখান ভাস্কর হিরণ্ময় রায় চৌধুরী (রাজা প্রফুল্ল ঠাকুরের আত্মীয়)। আবার আমি দেখি রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথের মর্মর মূর্তি জাতীয় গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত। তৎপুত্র দেবেন্দ্রনাথও যুবা বয়সে তাঁর ছবি (Portrait) বিলাতী রঙে আঁকিয়েছিলেন, তার নকল উদ্ধার করে British Indian Association (প্রথম সেক্রেটারী দেবেন্দ্রনাথ বলে) সেদিন নূতন করে আঁকিয়ে টাঙান। শশী হেশ দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য।

শশী হেশের পরে বিলাত যান মৈমনসিংহের অশ্বিনী বর্মন এবং বহুকাল ভাস্কর্য বিদ্যা আয়ত্ত করে লণ্ডনের Studioতে কাজ করে বিদেশেই দেহত্যাগ করেন। তাঁর পুত্র অধ্যাপক দেবজ্যোতি বর্মন যুগবাণী সম্পাদক রূপে খ্যাতিলাভ করেছেন এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে বহুদিন Modern Review-এর সহ-সম্পাদক রূপেও কাজ করেন; সেই Reviewতেই দেখলাম ১৯১২-১৪ সালে (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ Nobel প্রাইজ পাওয়ার সময়ে) অশ্বিনী বর্মনের শিল্পকাহিনী ও তাঁর লণ্ডন Studioর ফোটো।

এমনি দেশে ও বিদেশে বহু পত্রিকা থেকে ভারতীয় শিল্পীদের শিল্পকৃতির বিবরণী সংগ্রহ করে ছাপা উচিত। অবনীন্দ্রের বহু চিত্র London Studio ছেপেছিল (কারণ ব্লক U. Ray সবে আরম্ভ করেছেন) তেমনি নন্দলালের বিখ্যাত "সতী" চিত্র জাপানী Kokka পত্রিকায় Okakura অথবা Taikan ছেপে প্রসিদ্ধি দেন।

ক্রমশ: চিত্রী-ভাস্কর দেবীপ্রসাদ ও প্রদ্যোৎ দাসগুপ্ত যখন বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেন তখন এদেশের কর্তারাও কৃপাদৃষ্টি দিলেন। কিন্তু সবাইকে অবাক করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যেন হঠাৎ বিশ্ব-চিত্রী হয়ে পূর্ব-পশ্চিমের সমবেত সমর্থনা পেলেন ও পূর্ব-পশ্চিমের বিরোধ ঘুচিয়ে নব সহকর্মীতার সূত্রপাত করলেন। তাঁর চিত্রকলা যেন বাঙলার আদিগঙ্গার স্রোত মেলাল টাইবার (Roman) ও বৃটিশ Thames নদীর স্রোতে! Realism ও Cubism ছাড়িয়ে Surrealism ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিলিক দিল যেন যুগন্ধর রবীন্দ্রনাথের কলমে। ১৯২৪ সালে তাঁর সঙ্গে চীন ও জাপান ভ্রমণ কালেই দেখেছি ও বুঝেছি তিনি অরূপ কাব্যলোক থেকে রূপ-সাগরে ডুব দেবেন ও অনেক অজানা রতন উপহার দেবেন। সে সব কথা প্যারিস, বার্লিন বোষ্টন ও মস্কোর শিল্পীমহল রবীন্দ্র-চিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছেন (১৯৩০-৪০), আমরা শুনি, বাখিনি!

শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্ব-বার্তা

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কারাবরণ

বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ বার্ট্রাণ্ড রাসেল সম্প্রতি ইংলণ্ডে পারমাণবিক অস্ত্র-পরীক্ষা বন্ধের আন্দোলন পরিচালনা করার অপরাধে দু'মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর বার্ধক্যজনিত ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে দণ্ডের মেয়াদ স্থিরীকৃত হয়েছে এক সপ্তাহ।

কিছুকাল যাবত এই বর্ষীয়ান দার্শনিক প্রকৃত বিশ্বশান্তির কথা চিন্তা করে পারমাণবিক অস্ত্র বর্জন তথা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্রীকরণের জন্য বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর কাছে বহুবার আবেদন ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু শক্তিমদমত্ত রাষ্ট্রনায়কগণ তাঁর সৎ আবেদনে কর্ণপাত না করায় মানবদরদী এই জ্ঞানতপস্বী প্রত্যক্ষ আন্দোলনে অবতীর্ণ হন এবং অশেষ শারীরিক কষ্ট সহ্য করে সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিশ্বের বিদ্বৎ সমাজের কাছে রাসেলের নতুন করে পরিচয় দেবার কিছু নেই। দর্শনে ও গণিতে তাঁর অবদানের কথা সর্বজনবিদিত। সাহিত্যেও তাঁর অবদান অল্প নয় এবং তাঁর সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাঁর রচিত বহু পুস্তক সর্বজন সমাদৃত। এই বিংশ শতাব্দীতে যে কয়েকজন মনীষীর বাণী, শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ নীতি, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে সারগর্ভ, মৌলিক এবং মননশীল নিবন্ধরাজি বিশ্বের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে, জীবন জিজ্ঞাসায় উদ্দীপ্ত করেছে, রাষ্ট্র-সমাজ-নীতি বিষয়ে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে—রাসেল তাঁদেরই অন্যতম পুরোধা।

জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনার জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক কলিঙ্গ পুরস্কার গ্রহণ কালে রাসেল যে মূল্যবান ভাষণ দান করেছিলেন তার মর্মবাণীও ইতিপূর্বে 'গল্প-ভারতী'র 'বিজ্ঞান-কথা'য় প্রকাশিত হয়েছে।

মানব ইতিহাসে এই ট্র্যাজেডী বার বার ঘটেছে। যুগস্রষ্টা মানুষ যখনই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়েছে তখনই তার ভাগ্যে জুটেছে অশেষ নির্যাতন—এমনকি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত। মানব সভ্যতার এ এক নির্মম পরিহাস। ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠার জন্য সক্রেটিস বিষপান করেছেন, গ্যালিলিও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন, লিঙ্কন আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দান করেছেন, আজ এই সকল সত্যসাধকদের সঙ্গে সমপংক্তিতে রাসেলের আসন নির্দিষ্ট হয়ে গেল। আজ যখন মানুষ গ্রহান্তর যাত্রার উদ্যোগপর্বের সাফল্যে বিজয়োল্লসিত তখন এই পৃথিবীর বুকে বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানবৃদ্ধ দার্শনিক সর্বমানবের কল্যাণে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করলেন। এই ঘটনার দ্বারা ইতিহাসের এ কোন্ অন্ধকার যুগ সূচিত হচ্ছে? মানবতার দিক থেকে, আমরা বলতে বাধ্য, মানুষের সোচ্চারিত বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক অভিযানের সাফল্য অপেক্ষাও এই প্রতিবাদজ্ঞাপন অনেক বেশী সার্থক ও গরীয়ান।

• • • •

অর্ধ শতাব্দীর ওপর লর্ড রাসেল বর্তমান জগতের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করছেন ও এযুগের যথার্থ সঙ্কট সম্বন্ধে বিশ্বের জনসাধারণ তথা রাষ্ট্রনায়কগণকে সচেতন ও সতর্ক করে আসছেন। এ সম্বন্ধে 'গল্প-ভারতী'তে তাঁর যে সব প্রবন্ধ ও ভাষণের সারমর্ম প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে নীচের উদ্ধৃত অংশ তাঁর শান্তি আন্দোলন ও কারাবরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে পঠনযোগ্য :

আণবিক যুদ্ধ অবর্ণনীয় পৈশাচিক রূপ ধারণ করিবে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধ একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে না। উহা বিশ্বব্যাপী ছড়াইয়া পড়িবে। আণবিক যুগের যে কোন যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত আণবিক যুদ্ধে পরিণত হইতে বাধ্য। কাজেই সীমাবদ্ধ যুদ্ধের নিয়মকানুন আবিষ্কার করিয়া আণবিক যুদ্ধের ফলাফল এড়াইবার চেষ্টা দুরাশা মাত্র। আণবিক বোমাসমূহ নিষিদ্ধ করিলেই নিরাপদে থাকা যাইবে না। যুদ্ধমান জাতিসমূহ নিষিদ্ধ অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য সর্বদাই উন্মুখ থাকিবে। একমাত্র যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করিতে পারিলে তবেই বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। • • • লর্ড রাসেল আণবিক অস্ত্রের দম্ভে মত্ত হিংস্র ও ক্ষিপ্ত জাতিগুলিকে পাগলা কুকুরের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

• • • •

রবীন্দ্রনাথের কথায় :

....'ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি—
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি॥
শুনি তাই আজি
মানুষ-অন্তর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর ধৈর্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, ব'লে যাব—এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবরস্থলে রাখি শুধু রক্তে ভস্মরাশি
যজ্ঞশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে মানবের মূঢ় অপব্যয়
এঁকিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়॥

• • • •

আজ এই যে যুদ্ধের আগুন জ্বলেছে, এর ভিতরে সমস্ত মানুষের প্রার্থনাই কেঁদে উঠেছে—বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব—বিশ্বপাপ মার্জনা করো। আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে সে যেন ব্যর্থ না হয়, রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখনি পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হয়ে ওঠে, তখনি তো তাঁর মার্জনার দিন আসে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে দহনযজ্ঞ হচ্ছে, তার রুদ্র আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হোক—বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে আজ এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠুক।

* * *

* * * নিজের জীবনকে শুচি করো, তপস্যা করো, দুঃখকে গ্রহণ করো। তোমাকে যে নিজের পাপের সঙ্গে গভীর যুদ্ধ করতে হবে, নিজের রক্তপাত করতে হবে, দুঃখে দগ্ধ হয়ে ক্ষয়তো মরতে হবে। কারণ, তোমার নিজের জীবনকে যদি পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ না কর তবে পৃথিবীর জীবনের ধারা নির্মল থাকবে কেমন করে; প্রাণবান হয়ে উঠবে কেমন করে। ওরে তপস্বী, তপস্যায় প্রবৃত্ত হতে হবে, সমস্ত জীবনকে আহুতি দিতে হবে, তবেই যদ্ভদ্রং তৎ—যা ভদ্র তাই আসবে। ওরে তপস্বী, দুঃসহ দুর্ভর দুঃখভারে তোমার হৃদয় একেবারে নত হয়ে যাক, তাঁর চরণে গিয়ে পৌঁছোক। নমস্তেঽস্তু। বলো, পিতা তুমি যে আছ সে কথা এমনি আঘাতের মধ্য দিয়ে প্রচার করো। তোমার প্রেম নিষ্ঠুর; সেই নিষ্ঠুর প্রেম তোমার জাগ্রত হয়ে সব অপরাধ হনন করুক। পিতা নো বোধি—আজই তো সেই উদ্‌বোধনের দিন। আজ পৃথিবীর প্রলয়বাহের রুদ্র আলোকে, পিতা, তুমি দাঁড়িয়ে আছ। প্রলয় হাহাকারের ঊর্ধ্বে স্তূপাকার পাপকে ভস্ম করে সেই দহনদীপ্তিতে তুমি প্রকাশ পাচ্ছ, তুমি জেগে রয়েছ। তুমি আজ ঘুমতে দেবে না; তুমি আঘাত করছ প্রত্যেকের জীবনে কঠিন আঘাত। যেখানে প্রেম আছে জাগুক, যেখানে কল্যাণের বোধ আছে জাগুক; সকলে আজ তোমার বোধে উদ্‌বোধিত হয়ে উঠুক। এই এক প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা তুমি সকল আঘাতকে নিরস্ত করো। সমস্ত বিশ্বের পাপ হৃদয়ে হৃদয়ে ঘরে ঘরে দেশে দেশে পুঞ্জীভূত; তুমি আজ সেই পাপ মার্জনা করো, অগ্নি-বৃষ্টির দ্বারা মার্জনা করো।

এই প্রার্থনা, সমস্ত মানবচিত্তের এই প্রার্থনা আজ আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে জাগ্রত হোক। বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপ মার্জনা করো। এই প্রার্থনাকে সত্য করতে হবে, শুচি হতে হবে, সমস্ত হৃদয়কে মার্জনা করতে হবে। আজ সেই তপস্যার আসনে, পূজার আসনে উপবিষ্ট হও। যে-পিতা সমস্ত মানবসন্তানের দুঃখ গ্রহণ করছেন, যাঁর বেদনার অন্ত নেই, প্রেমের অন্ত নেই, যাঁর প্রেমের বেদনা উদ্‌বেল হয়ে উঠেছে, তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে সেই তাঁর প্রেমের বেদনাকে আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করি।

৯ই ভাদ্র ১৩২১ রবীন্দ্রনাথ

॥ সাহিত্যে পুরাতন ও নতুন ॥

যুগ যেমন বদলায়, তেমনি বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার আন্তর প্রেরণাও বদলায়। নতুন যুগ মানুষের চেতনায় নতুন চিন্তা, নতুন ভাবাদর্শ, নতুন প্রত্যয়, নতুন শ্রেয়সের ধ্যান নিয়ে আসে; সেই ধ্যানকেই মানুষ তার কর্মে ও আদর্শে রূপায়িত করতে চায়। সেজন্য, যুগে যুগে মানুষের চিন্তায় কর্মে আদর্শে এমন বৈচিত্র্য, এমন বিভিন্নতা, এমন অভিনবত্ব। এই বিভিন্নতা ও অভিনবত্ব শুধু যে চিন্তায় কর্মেই অভিব্যক্ত হয় তা নয়, তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় রূপসৃষ্টির রীতিনীতিতে, এমনকি সামাজিক আচার ব্যবহারেও। সেই ব্যবধান সময় সময় এত প্রকট হয়ে দেখা দেয় যে একই শতাব্দীর অন্তর্গত দুই পুরুষের ধ্যানচিন্তার পরিচয় গ্রহণ করলে তাদের একই সামাজিক ভূমির সন্তান বলে গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মনে হয়, তাদের মধ্যে শুধু কালের নয়, ভৌগোলিক সীমার দুস্তর ব্যবধান।

এই অনুভব আমাদের ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর অর্থাৎ বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের সহিত মধ্য বিংশ শতাব্দীর অর্থাৎ হাল আমলের সাহিত্যের তুলনামূলক বিচারে সত্য হয়ে উঠে। যদি আমরা আধুনিক কালে রচিত ও সমাদৃত কোনো উপন্যাস পাঠ করে পরে বঙ্কিমচন্দ্রের অথবা রবীন্দ্রনাথের অথবা শরৎচন্দ্রের কোনো উপন্যাস পাঠে অগ্রসর হই তাহলে নিমিষে তাদের আকাশপ্রমাণ ব্যবধান চিত্তকে অভিভূত করে। অন্যান্য অনেক ব্যবধান বৈশিষ্ট্যের কথা যদি দিলেও যে কথাটা অকাট্য সত্যতায় প্রকট তা হলো জীবনবোধের যা মানুষকে উপলব্ধি করার দৃষ্টিকোণের পার্থক্য। বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি দিলে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বলতে গেলে আধুনিক কালের বহু লেখকের সমকালীন, একই শতাব্দীর ও সমাজ-ভূমির ফসল। অথচ, তাঁরা কত দূরবস্থিত; তদ্বিস্তারণ এক রাত্রি যেন দুই যুগকে পরস্পর থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

পূর্বোল্লেখিত সাহিত্যরথী রূপকারদের যা ঐশ্বর্যের দিক এবং যা আজও তাঁদের কীর্তিকে মহিমান্বিত করে রেখেছে তা হলো নিবিষ্ট মূল্যবোধে তাঁদের নিঃসঙ্গ আশ্রয়। এই আশ্রয় তাঁরা কখনও পরিত্যাগ করেন নি। একালে আমরা অনেকেই যদিচ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ব মেনে নিতে কুণ্ঠিত হবো (তিনি নিছক রূপসৃষ্টির আনন্দে আত্মাশ্রিত ছিলেন না), তাঁর অভিমত ছিল, সাহিত্যকে অবলম্বন করে ধর্মে উপনীত হওয়া সাহিত্যিকের লক্ষ্য হওয়া উচিত, তথাপি তাঁর সাহিত্যে মানুষ যে অসামান্য মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত তা অনস্বীকার্য। তাঁর সাহিত্য বেগবান, প্রাণবান; সেই সাহিত্য সমকালীন আপন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। কোন ক্ষুদ্রতা তাকে সেই মহত্তের পথ থেকে সরিয়ে দেয় নি। আর, রবীন্দ্রসাহিত্য তো মানবিক ঐশ্বর্যের এক অখণ্ড গভীর সমুদ্র, তা যেমন বিরাট বিপুল তেমনি আকাশচারী। এক্ষেত্রে দেখতে পাই, একটা নির্দিষ্ট বিশিষ্ট জীবনদর্শন কবির জীবন পরিক্রমার পথ আলোকিত করে রেখেছে। সে আলোক এত উজ্জ্বল যে তাতে দেশকালের সীমা উত্তীর্ণ, অবলুপ্ত। সব দেশের সব মানুষ তাঁর চিত্তে তাদের আসন পেয়েছে এবং তাদের সর্বমানবিক কল্যাণ এবং ঐশ্বর্যই রবীন্দ্রসাহিত্যকে মানুষের অকুতোভয় অভিযানের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ আয়ুধে পরিণত করেছে। সেই সাহিত্য সব মানুষকেই বড় করে।

এমন কি, শরৎচন্দ্রও কতকগুলো মহান আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর মনও শ্রেয়সের ধ্যানে অনুক্ষণ ব্যস্ত ছিল। বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট যে আমাদের

সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে যেগুলো মধুর এবং যুগযুগান্তরের অভিজ্ঞতায় স্বীকৃত, যেগুলো পারস্পরিক সহায় সম্প্রীতি ও কল্যাণের অনুকূল, সে সব সম্পর্কের উপর তাঁর ছিল প্রগাঢ় নির্ভরশীলতা। সে সব আদর্শ আমাদের সামাজিক ও নৈতিক আচরণে স্বীকৃত হোক, এটা তাঁর বরাবরের কামনা। তাই, শরৎ-উপন্যাস বা গল্পের পরিসমাপ্তিতে বহু কড়চতা-বিচ্ছেদ অতিক্রান্ত হয়ে সেইসব মূল্যের স্বীকৃতি ও সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়। এটা সম্ভব হয়েছিল এজন্যে যে, তিনি ছিলেন মানুষের প্রতি বিশ্বাসে অবিচল; সে বিশ্বাসের অস্তিত্ব না থাকলে রূপান্তরে বা সংশোধনে কোনো গরজ থাকে না। শরৎচন্দ্র কিন্তু তাঁর বিশ্বাসকে খাটো করেন নি; তাই একান্ত অত্যাচারী আদর্শহীন অবিশ্বাসও প্রত্যেকের রূপান্তরের ভিতর দিয়ে পরিবর্তিতচিত্তায় ও পরোপকারে সত্য হয়ে উঠেন, মনুষ্যত্বের প্রকাশে উজ্জ্বল হয়ে উঠেন। সে সব কারণে এইসব গ্রন্থপাঠে আমাদের হৃদয় ভরে, চিত্ত সরস হয়, জীবনের প্রতি মমতায় আমরা ঋদ্ধ হই।

কিন্তু, আধুনিক কালের সাহিত্য পাঠে আমরা এই প্রত্যয়ে আশ্রিত থাকতে পারি না, এই মহৎ অনুভব আমাদের চিত্তে কোনো তরঙ্গও তোলে না। তার প্রধান কারণ, এখনকার সাহিত্যে মানুষের বোধ চিরতর, জীবনের স্বীকৃতি অক্ষরূপ। আধুনিক কালের খুব কম সাহিত্যস্রষ্টাই মানুষের প্রতি বিশ্বাসে অবিচল, বা সুস্থ মূল্যের চেতনায় ঐশ্বর্যশীল। বহু বিশ্বব্যাপক ঘটনার অভিঘাতে জীবন বিপর্যস্তপ্রায়, মানুষের মূল্যও অস্বীকৃত। শুধু তাই বা কেন, আজকের মানুষ তার অনুভবে কর্মে চিন্তায় বা ধ্যানে অনেক ক্ষুদ্র, অনেক খাটো। তার জৈব অস্তিত্ব পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত; তৃণখণ্ডের ন্যায় সে ভাসমান, তার জীবনে কোনো মূল্যের কোন স্বীকৃতি নেই, কোন প্রয়োজনই নেই। এইসব মানুষই আধুনিক সাহিত্যের পাতায় ভীড় করে আসে এবং সঙ্গে নিয়ে আসে তাদের জীবনের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত ক্লেদ। সেজন্য প্রায় সর্বদা এদের সঙ্গে হৃদয়-সম্পর্ক স্থাপনে মন বিদ্রোহ করে, তাদের পরিচয়ে মন লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়।

জানি, কথা উঠবে এই মানুষই একালের সমাজজীবনের সত্য মানুষ; সুতরাং, বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য এই মানুষকে আশ্রয় না-দিয়ে পারে না। এই কথাটা সত্য হলেও গ্রহণীয় নয়। কারণ মানুষ তো শুধু ইতিহাসের পুতুল নয়, সে ইতিহাসের স্রষ্টাও। অতএব, যে মানুষ ঘটনাচক্রের আবর্তে মূল্যের আশ্রয় হারিয়ে আজ উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ, তাকে জীবনের একান্ত প্রয়োজনেই পুনরায় মূল্যের, সুস্থ জীবনবোধের এবং শ্রেষ্ঠীশীল আদর্শের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, অসুস্থ পঙ্কিলতার বিরুদ্ধে জয়ী হতে হবে। অর্থাৎ মানবিক মহিমায় পুনরায় সত্য হয়ে উঠতে হবে।

মানুষের এই একান্ত কাম্য রূপান্তর সম্পর্কে সাহিত্যের দায়িত্বও কম নয়। সাহিত্য তো শুধুমাত্র আনন্দ বিনোদনের সামগ্রী নয়, মানুষের জীবন জিজ্ঞাসার অন্যতম আয়ুধ। সাহিত্য যুগে যুগে মানুষকে নির্দিষ্ট ভাবনায় ভাবিত, নির্দিষ্ট কর্মে অনুপ্রাণিত এবং বিশিষ্ট আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে এসেছে এবং আজও করে; মানুষের আনুকূলিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সাহিত্য মানুষের চিত্তে রূপান্তর নিয়ে আসে। কিন্তু, ঘোর বিপর্যয় এবং অবক্ষয়ের মুখে দাঁড়িয়েও আধুনিক কালের সাহিত্যিক সাহিত্যের এই দায়িত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও অবহিত বলে মনে হয় না। কারণ, শ্রেয়সের ধ্যান এবং সুস্থ মূল্যচেতনার অভাব এযুগের সাহিত্যের সর্বাধিক উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য। মানুষের জীবন কি ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তার পরিণতি কি, সেই পরিণতি সামগ্রিক কল্যাণের অনুকূল কিনা, অথবা অন্য কোন শ্রেয়সের ধ্যান মানুষের পক্ষে অপরিহার্য কি না, এসব চিন্তার ধার আধুনের অধিকাংশে সাহিত্যিক চিন্তিত নয়। ফলে, মানুষের পরিচয়ে

এই সাহিত্য যেমন ক্ষুদ্র, তেমনি তার পাঠও অনেক সময় ক্লান্তিকর। মন কোন আশ্রয়ই তাতে খুঁজে পায় না, বা কোন বলিষ্ঠ প্রত্যয়।

অথচ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আধুনিক সাহিত্য গঠনাশৈলীর বিচারে, শিল্পরীতির গঠনে, পূর্বকালের সাহিত্য অপেক্ষা অনেক বেশী নিপুণ, বিশ্লেষণে অনেক বেশী প্রখর ও তথ্যসন্ধানী। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, শুধু মানবিক বোধের অভাবে, মূল্যবোধের অনুপস্থিতে তা কোনমতেই হৃদয়ে স্থায়ী আসন পাততে আসে না; আর, সে অভাবেই তা প্রাণবান বেগবান হতে পারে না। আবেদনে তা কেমন যেন অবসন্ন, পাণ্ডুর। মানুষকে যদি তার মনহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, বা তাকে যদি তার জীবন-সংগ্রামের সমগ্রতায় সাহিত্যে পুনরাবিষ্কার করতে হয় তো আধুনিক সাহিত্যকে দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতেই হবে, পুনরায় কল্যাণধর্মী মূল্যে ও জীবনবোধে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, নতুবা জীবন-রূপায়ণে তা নিষ্ফল হতে বাধ্য।

আধুনিক কালে জীবিত থেকে আধুনিক সাহিত্যের নিকট জীবনের উচ্চতর মহত্তর বোধ কি আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না? সাহিত্যের মাধ্যমে মানবিক মহিমার উত্তরণ কি আমাদের কাম্য নয়?

ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার

মস্কো সহরের উপকণ্ঠে এক নির্জন বাগানবাড়িতে একদিন এক তরুণী সুন্দরীকে একটা বড় রাজহাঁসের পিছনে ছুটোছুটি করতে দেখা গেল।

বাগানের মালি ত অবাক্। অবশ্য তরুণী তার হাতে কয়েকটা টাকা গুঁজে দিয়েছিল আগেই।

রাজহাঁস যে দিকে ছোটে, তরুণীও তার পিছনে পিছনে সেই দিকে যায়, আর লক্ষ্য করে তার গতিভঙ্গি, তার পাখা ঝাপটানোর কৌশল।

অনেকক্ষণ পরে রাজহংসটিকে ছেড়ে তরুণী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বসল এক গাছের তলায় আর রেখাচিত্রে আঁকতে লাগল সে হাঁসটির পা ফেলার কতকগুলি ছবি।

একমাস পরের কথা। মস্কো অপেরা থিয়েটারে ব্যালে নাচ হবে। লোকে লোকারণ্য। সেই বাগানের তরুণী স্টেজে নাচল, তার নাচ দেখে দর্শকেরা ত বিস্ময়ে, আনন্দে, গৌরবে অস্থির হয়ে উঠল।

নাচটি হোল Swan dance, আর সেই তরুণী জগৎ-বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী অ্যানা পাভ্‌লোভা।

॥ একটি গ্রামীণ চিত্র ॥

১

আজ থেকে ছিয়াশি বৎসর পূর্বে (১৮৭৪ সন) রেভারেণ্ড লালবিহারী দে গোবিন্দ সামন্ত নাম দিয়ে দুই ভল্যুমে একখানি ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে সেই বই 'বেঙ্গল পেজাণ্ট লাইফ' (Bengal Peasant Life) এই নামে এক ভল্যুমে প্রকাশিত হয়। বইখানি বাংলাদেশে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পর পর বইখানির অনেকগুলি সংস্করণ হয়। বইখানি ইংলণ্ডেও সমাদৃত হয়।

আজ আর এ বই বিশেষ কেউ পড়ে না, কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামজীবনের একটি নিখুঁত চিত্র হিসাবে এ বইয়ের মূল্য আজও ফুরিয়ে যায় নি। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে বর্ধমান জিলার কাঞ্চনপুর নামক একটি খুব সম্ভবতঃ কল্পিত নামের গ্রামকে চিত্রপটরূপে খাড়া করে তারই পৃষ্ঠপটে গোবিন্দ সামন্ত নামক একজন 'আগুরি' অর্থাৎ উগ্র-ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকের জীবনালেখ্য চিত্রিত করেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গোবিন্দের জীবনের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই কাহিনীতে বিবৃত হয়েছে। বাংলার কৃষক জীবনের সর্ববিধ খুঁটিনাটির এমন নিখুঁত বর্ণনা এমন দরদ আর সহানুভূতির সঙ্গে আর কোন বইতে উপস্থাপিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষক পরাণ মণ্ডলের ইতিকথা বিবৃত করতে গিয়ে মুখ্যতঃ জমিদার কর্তৃক উপদ্রুত ও শোষিত রায়তের অভাব-অভিযোগটাই বড় করে তুলে ধরেছেন পাঠকের চোখের সামনে। এ বইতে রায়তের সনাতন অভাব-অভিযোগের বর্ণনা তো আছেই; সেই সঙ্গে আছে হিন্দু কৃষকের জীবনযাত্রার অন্যান্য নানা দিকেরও অতি নির্ভরযোগ্য বিবরণ। গোবিন্দের সংসারের একটি পারিবারিক ছবি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে লেখক একই কালে রাঢ় বঙ্গের হিন্দু কৃষক-জীবনের একটি সামগ্রিক ছবিও তৎসহ ফুটিয়ে তুলেছেন। এতে গ্রামজীবনের কোন উপকরণের অভাব নেই। জন্মের লগ্ন থেকে সুরু করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া পর্যন্ত একজন কৃষকের জীবনে সম্ভাব্য যা যা ঘটতে পারে এবং সচরাচর যা ঘটে থাকে, তার সব কিছুরই বর্ণনা এই অখণ্ড গ্রাম-কাহিনীটিতে মিলবে।

বইটি রচিত হওয়ার পর অনেককাল কেটে গেছে। আজ হয় তো বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোর নানা দিক দিয়ে নানা পরিবর্তন হয়েছে; অর্থনৈতিক অবস্থা-ব্যবস্থার রকমফেরের ফলে বাংলার সনাতন পল্লীর চেহারাটাও বোধ করি আর চেনবার উপায় নেই; কিন্তু কৃষকের অত্যন্ত জীবনযাত্রায় খুব বেশী যে পরিবর্তন হয়েছে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। সত্য বটে জমিদারী ব্যবস্থার রদ-বদল হয়েছে, তাতে গ্রাম-সমাজের মূল জীবন-প্রণালীর খুব বেশী পরিবর্তন হয় নি। তফাতের মধ্যে দাঁড়িয়েছে শুধু এই যে সরকার এখন জমিদারের স্থলাভিষিক্ত হয়ে রায়তের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের কড়াকড় ব্যবস্থায় কিছু ঢিল দিয়েছেন, এতে কৃষকের চাষবাসের কাজে হয়তো সুবিধা হয়েছে, কিন্তু কৃষকের সনাতন জীবনধারার বিশেষ বদল হয় নি। সেই আদ্যিকালের আমলের পদ্ধতিতেই কম বেশী এখন পর্যন্ত গ্রামের চাষ-বাস চলছে। কৃষকের আচার আচরণ, সংস্কার-বিশ্বাস, রুচি-প্রবণতা সবই এখন পর্যন্ত সনাতন খাতে বহমান। শহরে আমরা নিত্য-নূতন পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়ে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু গ্রাম-

জীবনের মূল কাঠামোটি আজও অবিকৃত আছে বলা যায়। অন্ততঃ বাইরে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হলেও গ্রামের আভ্যন্তর জীবন অর্থাৎ মানস-জীবন যে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ আছে, এ কথা বোধ করি প্রতিবাদের শঙ্কা না করেই বলা যায়।

কৃষি আজও পল্লী-জীবনের ভিত্তি। বাংলার গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থার বিশেষ ছাঁচটির তেমন কোন রদবদল হয় নি বলতে গেলে। 'বেঙ্গল পেজান্ট লাইফ' বইতে চাষ-বাসের পদ্ধতি প্রকরণের যে ছবিটি তুলে ধরা হয়েছে, সেই পদ্ধতি প্রকরণ অদ্যাবধি কৃষকের কৃষিকার্যের মূল অবলম্বন। সেই সকালে কৃষক ঘর দোর নিকিয়ে, গোয়ালঘর সাফ করে, গরুদের জাবনা দিয়ে, গরুর দুধ দুইয়ে, খড় বিচালি কেটে খড় পালুইয়ে গাদা করে, ঝোলা গুড়ের একপ্রকার রকমফের, কাটা তামাক পাতায় মাখিয়ে তামাক তৈরি করে ঘড়ি পাকিয়ে এবং কৃষকের পক্ষে অত্যাবশ্যক এ জাতীয় অন্যান্য গৃহকর্ম সেরে তারপর লাঙল কাঁধে মাঠে যায়। সারা সকাল মাঠে কাজ করে। দুপুরে বাড়ীর কেউ ভাত নিয়ে মাঠে যায়। মাঠের ধারের বিলে স্নানপর্ব সেরে মাঠেই ভাত খাওয়া সারা হয়। তারপর তামাকু সেবন সহযোগে কিছুক্ষণের বিশ্রাম, তারপর পুনরায় ক্ষেতের কাজে লেগে পড়া। এই ভাবে বেলা পড়ে না আসা পর্যন্ত একটানা কৃষি কাজ চলে—মধ্যে অবশ্য ধূমপিপাসা নিবৃত্তির জন্য সাময়িক বিরতি ও হুঁকা-কল্কির সদ্ব্যবহার। সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা ও পূর্ণ বিশ্রাম। সংসারের টুকিটাকি, চাষ বাসের এটা-সেটা, জিনিষ পত্রের দর, দাম, আবহাওয়ার অবস্থা, গ্রাম্য রাজনীতি, হাল্কা গালগল্প ইত্যাদি নানা টুকরো টুকরো বিষয়ে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আলাপন। বাংলার কৃষকের এই যে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ছাঁচ, ঐ একশত বছর আগে যেমন ছিল, এখনও প্রায় তেমনি আছে বলা যায়। 'বেঙ্গল পেজান্ট লাইফ' গ্রন্থে বাংলার কৃষকের এই সনাতন জীবনচিত্র অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ও অতি বিস্তারিতভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। গ্রামীণ কৃষক জীবনের কোন খুঁটিনাটিই লেখকের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি, এমনি সজাগ তাঁর দৃষ্টি এবং বাংলার পল্লীর সঙ্গে এমনি নিবিড় অন্তরঙ্গ তাঁর পরিচয়। গ্রাম জীবন সম্বন্ধে লেখকের এইরূপ ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেই বইটি এতদূর উপভোগ্য হয়ে উঠেছে এবং এ বই সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন অদ্যাবধি নিঃশেষ হয়ে যায় নি। এ বইয়ের বর্ণনা থেকে আজকের বাংলার কৃষক জীবনের ধাঁচ-ধরণটিও মোটামুটি আমরা অনুমান করে নিতে পারি। আজ যদি বাংলাদেশে পাশ্চাত্যের কোন কোন যন্ত্রবিদ্যাকুশল দেশের ধরণে যৌথ কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন থাকত, ট্র্যাকটর প্রভৃতির সহযোগে জমি চাষ হত, রাসায়নিক পদ্ধতিতে উন্নততর ফলন সম্ভাবনাযুক্ত কৃত্রিম সারের দ্বারা জমির উর্বরাশক্তি বাড়াবার চেষ্টা হত ব্যাপকভাবে, তাহলে বেঙ্গল পেজান্ট লাইফের পরিবেশিত গ্রাম-চিত্র কাল-বাহিত অর্থাৎ সেকেলে হয়ে যেত। কিন্তু এ বইয়ের ভাগ্যে সেই জীর্ণতা দোষ ঘটে নি। এর চিত্র-চরিত্র পরিবেশ এখনও সজীব রয়েছে বলা যায়। সুতরাং কতকটা বিস্তারিত ভাবেই এ বইয়ের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করব। তাতে আর যে দোষই ঘটুক, অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে অনাবশ্যক আলোচনার দোষ স্পর্শাবে না নিশ্চয়।

২

গোবিন্দমের সংসারে গোবিন্দ নবাগত। এই তো সেদিন তার জন্ম হল। প্রসবের প্রাক্-লগ্নে গাঁয়ের প্রৌঢ়া ধাই রূপার মাকে ডেকে আনা থেকে সুরু করে সূতিকা গৃহের বর্ণনা গোবিন্দের মা

সুন্দরীর অবস্থা বর্ণন, গোবিন্দের জন্ম বৃত্তান্ত, আটদিনের দিন 'আটকলুইয়ের' অনুষ্ঠান, একুশ দিনে অন্নপ্রাশন ও গোবিন্দের মায়ের সূতিকা গৃহ থেকে নিষ্ক্রমণ—বাংলার হিন্দু কৃষকের সংসারে একটি শিশুর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব ও পরবর্তী প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সংবাদ লেখক অতিশয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিবেশন করেছেন বইয়ের সূচনায়। গোবিন্দের পিতা বদন সামন্তেরা তিন ভাই। বদন বড়, মানিক সামন্ত ওরফে কালামানিক মেজ, গয়ারাম কনিষ্ঠ। বদন সংসারের কর্তা, বয়স ত্রিশ-বত্রিশের কোঠায়। মেজ কালামানিক ইহা দশাসই জোয়ান পুরুষ, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে একটু ভোতা। এরা দুভাইই মুখ্যত চাষবাসের কাজ করে। গরুর রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের মাঠে চরিয়ে আনার ভার কনিষ্ঠ গয়ারামের উপর ন্যস্ত। কালামানিক বিয়ে করে নি, গয়ারাম বিয়ে করেছে, তার স্ত্রীর নাম আদুরী। সুন্দরী ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মেয়েমানুষ, কিন্তু আদুরীর স্বভাব কিঞ্চিৎ চঞ্চল। কচি বৌ কিন্তু চলন-বলনটা ঠিক কচি বৌয়ের মত নম্র নয়। তার এই অশান্ত স্বভাবের জন্য স্বামী গয়ারামের কাছ থেকে তাকে মাঝে মাঝে গঞ্জনা সইতে হয়, এমন কি কখনও কখনও দু-একটা উত্তম-মধ্যম যে না মেলে এমন নয়। সংসারে এই দুই বধূ, তাদের মাথার উপরে তাদের শাশুড়ী অলদ। অলদই প্রকৃত পক্ষে সংসারের কর্ত্রী। সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটির প্রতি তার তীক্ষ্ণ নজর। সাংসারিক বুদ্ধিও খুব পাকা। মায়ের পরামর্শ ছাড়া বদন কোন কাজ করে না। গোবিন্দের এক দিদি আছে—নাম তার মালতী। মধুর স্বভাবের সপ্রতিভ ফুটফুটে একটি মেয়ে। বয়স সাত-আট। মাঠে বাপ-কাকাদের জন্যে সেই ভাত নিয়ে যায়। দুধ দুইবার সময় বাছুরদের নিয়ে দাপাদাপি করতে ওর খুব ভাল লাগে।

একজন বর্ধিষ্ণু গ্রাম্য কৃষকের বাড়ী ঘর যেমন হওয়া উচিত, বদনদের বাড়ী তার ব্যতিক্রম নয়। আশিনার পশ্চিমে পূর্বমুখে অবস্থিত মাটির দেওয়াল আর খড়ে ছাওয়া চালের 'বড় ঘরটি'তে বদন থাকে। তারই একদিকে ছোট একটি কুঠরিতে সংসারের ভাঁড়ার। সামনের বারান্দায় বসা চলে, অতিথি অভ্যাগত আগন্তুকদের এনে বসানোও চলে। ঘরে নানা আকারের অনেকগুলি হাঁড়ি-কলসী আর একটি কাঠের বাক্স ভিন্ন অন্য কোন আসবাবপত্র নেই বলতে গেলে। উঠানের দক্ষিণ দিকে ছোট আকারের একটি ঘর। ঘরটি নানা কাজে ব্যবহার হয়। চাষের সরঞ্জামাদি সচরাচর এই ঘরেই রক্ষিত থাকে, আপাতত: এটিকে সুন্দরীর আঁতুড়-ঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এরই এক কালি বারান্দায় গৃহের চৌকিশালা বা 'চৌকাল'। উঠানের পূর্বদিকে পাকশালা বা রান্নাঘর। তার উত্তর পার্শ্বে গোশালা বা গোহাল। গোশালায় বড় বড় কয়েকটি গামলা, সেগুলির অর্ধেকের বেশী মৃত্তিকায় প্রোথিত, এগুলিকে বলা হয় 'নাদ্দ' এতে করে গোরুদের খড় বিচালি ভূষি ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয়। গোহালের উত্তরে উঠান থেকে বেশ কিছুটা দূরে সংসারের আঁস্তাকুড়—ছাইপাঁশ ফেলবার জায়গা। পেছন দিকে ছোটখাট একটি পুকুর—কুয়ো বললেই ঠিক হয়। বাসন ধোয়া কাপড় কাচা ইত্যাদি তাতে চলে, পানীয় জল বাইরের বড় দীঘি থেকে ঘরে আনা হয়। কুয়োর ধারে একটি জাম গাছ ও কিছু ঝোপঝাড়। পাশে একটা খেজুর গাছ, তার খেজুর টুপটাপ করে জলে ঝরে পড়ে—সে কথাটি উল্লেখ করতেও লেখক ভোলেন নি।

বাড়ীর উঠানের প্রায় মাঝখানে ধানের গোলা, বর্ধমান জিলায় বলা হয় 'মরাই'। তার একধারে খড়ের গাদা বা 'পালুই'। সারা বছরের জন্যে গোরু বাছুরের খড় বিচালি রক্ষিত থাকে।

বাড়ীতে গৃহস্থালীর ব্যাপারে অলদের একাধিপত্য। সেখানে আর কারও কথা চলে না। সংসার সম্বন্ধীয় নানা টুকিটাকি ব্যাপারে বদন মায়ের পরামর্শ ছাড়া এক পা চলে না। এতে বদনের বউ

সুন্দরীর কর্তৃত্ববাভিমান আহত হওয়ার কথা অন্ততঃ বিদেশী পাঠক তাই মনে করতে পারেন। সে গৃহের বড় বউ, ইউরোপের রীতি অনুযায়ী তার উপরই তো সব ভার ন্যস্ত থাকবার কথা। কিন্তু এদেশের হিন্দু সমাজের বিশেষ হিন্দু কৃষক সমাজের নীতি ভিন্ন। শাশুড়ী যতদিন জীবিত আছেন ততদিন বধূর অধিকার অতি সামান্য।

বদনের মোটমাট জমির পরিমাণ ছত্রিশ বিঘা অর্থাৎ বারো একরের সমান। চাষের জন্য তার একটিমাত্র লাঙ্গল, দুটি বলদ। এছাড়া আছে তিনটি দুধাল গাই ও কয়েকটি বাছুর। গোরুগুলি দুধ দেয় প্রচুর, তা দিয়ে সংসারের প্রয়োজন তো মেটেই, কিছু বিক্রি করাও চলে।

ষষ্ঠীদিনে অর্থাৎ জন্মের ষষ্ঠ দিবসে গোবিন্দের নামকরণ করা হল। এই দিনে ষষ্ঠীর পূজা দেওয়া হয়। রাত্রিতে বিধাতা পুরুষ এসে নবজাতকের কপালে ভাগ্য লিখে দিয়ে যান এইরূপ বিশ্বাস গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচলিত। সেইজন্য এইদিন আঁতুড়ঘরে দোয়াত কলম ইত্যাদি লিখবার সরঞ্জাম রেখে দেওয়া হয়। তা দিয়ে বিধাতা পুরুষ কপালে আঁচড় কাটেন এই রকম ধারণা। আটদিনের দিন 'আটকলুই' অনুষ্ঠান সে কথা পূর্বে বলেছি। ওই দিন আশপাশের ছেলে মেয়েদের বড়ই আনন্দ, আঁতুড়ের পাশে উঠোনে জমা হয়ে "আঁটকুড়ি বাঁটকুড়ি" ইত্যাদি ছড়া কাটতে থাকে আর দাই আর ঠানদিদের সঙ্গে নানা রঙ্গ রসিকতা করে। ছেলেমেয়েদের খই আর বাতাসা খেতে দেওয়া হয়। একুশ দিনের দিন অশৌচান্ত। আঁতুড়-গৃহ থেকে বেরিয়ে আসার দিন। সন্তান প্রসবের পর সুন্দরী এই প্রথম স্নান-পর্ব সারল, সেরে মা ষষ্ঠীর পূজো দিয়ে নিজগৃহে ফিরে এল। প্রথম কয়েক মাস শিশুকে খুব করে সরষের তেল মাখিয়ে রৌদ্রে শুইয়ে রাখা নিয়ম। এতে স্নেহেরও পুষ্টি হয় আবার উত্তর জীবনে ষোলতর এক গ্রীষ্ম প্রধান দেশের প্রচণ্ড তাপ সইবার ক্ষমতা অতি শৈশবেই দেহের ভিতর সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়। আমাদের দেশের গ্রাম-ঘরের সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের মেয়েরা অশিক্ষিত হলেও দীর্ঘকালের সংস্কারে বেশ ভালভাবেই জানে কেমন করে সন্তান মানুষ করতে হয়, তার দেহ মজবুত করে গড়ে তুলতে হয়। ইউরোপীয় ডাক্তাররা আমাদের মায়েদের সন্তান পালনের ধরণ দেখে আঁতকে উঠতে পারেন, কিন্তু জলবায়ুর পার্থক্য অনুযায়ী সন্তান পালনের পদ্ধতিতেও যে পার্থক্য অনিবার্য তা স্বীকার করে নেওয়া ভাল।

সন্তানের সাত মাস বয়ঃক্রম কালে অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা। ততদিনে আউশ ধান ঘরে তোলা হয়েছে। বদন জাতি গোত্র, আত্মীয় কুটুম্বের এই উপলক্ষে একটা ভোজ দিলে। ভোজের উপকরণ সামান্য—ভাত ডাল তরকারী মাছভাজা, মাছের অম্বল সর্বশেষে দই। আহার অন্তে এক খিলি করে পান।

গোবিন্দ একটু বড় হতে গ্রামের গ্রহাচার্য অর্থাৎ ঠাকুরকে ডাকা হল। জ্যোতিষী এসে গোবিন্দের কোষ্ঠী করে দিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে এ ছেলে বড় হয়ে ধনে জনে পরিপূর্ণ সংসারের কর্তা হবে এবং সর্ব প্রকারে বদনের কুলের মান রক্ষা করবে। গ্রহাচার্যদের ভবিষ্যদ্বাণী যে সব সময় সত্য হয় তা নয় তবে পরিবারের কর্তাকে খুশী করবার জন্যে, পরিবারের বয়স্কদের মন আশায় ভরে তোলবার জন্যে এই রকম বলাটাই রেওয়াজ। শুভ সংবাদের মিথ্যেটাও মনোরম মনে হয়। দারিদ্র্য-প্রপীড়িত কৃষকের জীবনে একফালি আশার ঘাস অনেকখানি, আর সে আশা আঁকড়ে ধরেই তারা বেঁচে থাকে।

এ কথা বলার কারণ আছে। গোবিন্দের ভবিষ্যৎ জীবন যে পুরাপুরি সুখের হয়েছিল এ বইতে তেমন বিবরণের উল্লেখ নেই। বড় হয়ে তাকে গ্রামের জমিদারের কোপে পড়তে হয় এবং তার ফলে

তাকে প্রাণ সংশয়াপন্ন হতে হয়। দৈবদুর্বিপাকও তার মাথার উপর বড় কম নেমে আসে নি। সে কাহিনী যথাস্থানে বলা হবে।

৩

'চলি চলি পা পা' করতে করতে বয়ঃক্রম যখন পাঁচ বছর পূর্ণ হল, তার হাতে খড়ির ব্যবস্থা হল। যখনের সংসারে লেখাপড়া শেখাবার হেওয়াজ নেই। তারা কৃষক, চাষবাস করেই তাদের সারাটা জীবন কাটে। কিন্তু গোবিন্দের বেলায় কিছু ব্যতিক্রম হল। যখন যুগের প্রয়োজন অনুভব করে দলজন ভদ্র সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের দেখাদেখি তার ছেলেকে পাঠশালায় দেওয়া মনস্থ করলে। এইজন্য তাকে কম বাধা পোহাতে হয় নি। যখনের মা অনন্ত কিছুতেই নাতিকে পাঠশালায় পড়তে দিতে রাজী নয়। গোবিন্দ চাষীর ছেলে, তার লেখাপড়ায় কাজ কী—এই হল অনন্তের যুক্তি। তাছাড়া ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পাঠালে নাকি চাষীর সংসারে অকল্যাণ হয়। শেষে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাকে রাজী করিয়ে যখন গোবিন্দকে রামরূপ সরকারের পাঠশালায় ভর্তি করিয়ে দিলে। গোবিন্দের বিদ্যাভ্যাসের জীবনের সূত্রপাত হল।

ইতোমধ্যে গোবিন্দের সংসারে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটল যেগুলির উল্লেখ না করলে বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ-সব ঘটনার ভিতর দিয়ে গ্রামবাসীর জীবনযাত্রার ধরণ, তার সংস্কার ও বিশ্বাস, তার আচরণের ভাল ও মন্দ ইত্যাদি নানা বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাবে। গোবিন্দ একদিন উঠোনে খেলা করতে করতে মুখ খিঁচিয়ে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে ধপাস্ করে মাটিতে পড়ে গেল। পড়েই অজ্ঞান। অজ্ঞান অবস্থায় মুখ দিয়ে তার বলকে বলকে ফেনা বেরোতে লাগল। অনন্ত তাড়াতাড়ি নাতির সাহায্যার্থে দৌড়ে এল এবং এসেই সিদ্ধান্ত করলে গোবিন্দকে পেঁচোয় পেয়েছে। পেঁচো কথাটা পঞ্চানন-এর অপভ্রংশ। সংহার-দেবতা শিবের পাঁচ-মাথা ওয়ালা একটি রূপকে বলা হয় পঞ্চানন। গ্রামঘরে বট কিংবা অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় কোন একটি পাথরের নুড়িকে তৈল সিন্দুরে চর্চিত করে পঞ্চানন দেবতা কল্পনা করে পুজো করার রীতি আছে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, পাঁচ-মাথা ওয়ালা ওই দেবতা কোপাবিষ্ট হয়ে কারও উপর ভর করলে তার ওই অবস্থা হয়। সাধারণতঃ শিশুদের উপরই ভর হয় বেশী। অলক্ষিতে গোবিন্দ নাকি পঞ্চাননের বিগ্রহের উপর পা দিয়ে ফেলেছিল, তাইতেই এই কাণ্ড। অনেক ঝাড়-ফুঁকের পর এবং পঞ্চানন দেবতাকে পুজো দিয়ে তুষ্ট করবার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দানের পর পেঁচো গোবিন্দকে ছেড়ে গেল, গোবিন্দ সুস্থ হয়ে উঠে বসল।

যখনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গয়ারামের স্ত্রী আদুরী একটু চঞ্চল স্বভাবের মেয়ে সে কথা আগেই বলেছি। গয়ারাম আদুরীকে খুব ভালবাসে আবার তাকে কিঞ্চিৎ সন্দেহের চোখেও দেখে। বোধহয় ভালবাসার প্রাবল্যের জন্যই বালিকা স্ত্রীর প্রতি গয়ারামের সন্দেহ-বাতিকটা একটু বেশী। গয়ারামের ধারণা, সে যখন গরু চরাতে মাঠে যায় সেই অবসরে আদুরী পরপুরুষের সঙ্গে তার অভাবার চেষ্টা করে, হেসে কথা বলে, রঙ্গরস করে। নিতান্তই অমূলক ধারণা, কিন্তু গয়ারামের রকমটাই ওই প্রকার। একদিন আদুরী এক যুবাবয়সী সুন্দরপানা বৈরাগী ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে গিয়ে নাকি ফিক্ করে হেসে ফেলেছিল, গয়ারামের সেটা চোখে পড়ে। আর যায় কোথায় খুব একচোট বচসার পর আদুরীকে কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম দিয়ে তবে গয়ারামের রাগ থামে। আদুরী অভিমানে আহার জল ত্যাগ করলে, স্বামীর সঙ্গে কথা বলে না,

মাটিতে আঁচল পেতে শুয়ে থাকে। যখন তখন কোঁস-ফোঁস করে কাঁদে। তারপরই এক কাণ্ড। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ এক সময় আদুরী ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল। আর সে কি তার হাত পা ছোঁড়াছুড়ি আর চীৎকার। কখনও হাসছে কখনও কাঁদছে। সবাই বলল এ আর কিছু নয়, আদুরীর উপর কোন প্রেতাত্মা ভর করেছে। এ সংবাদ দাবানলের মত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল, আর দেখতে দেখতে বদনের গৃহে লোকে লোকারণ্য। কেউ বলল, আদুরী নাকি সুরে কথা কইছে, সুতরাং নির্ঘাত ওকে পেত্নীতে পেয়েছে। কেউ বলছে পেত্নী নয়, শাঁকচুন্নী। কারও অভিমত, আদুরীর উপর ভর করা ভূত স্কন্ধকাটা না হয়েই যায় না। এইরকম পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে লাগল। (ভূতদের শ্রেণী-গোত্রের এক বিশদ বর্ণনা এই সূত্রে বইতে দেওয়া হয়েছে।) ওঝা ডাকা হল। ওঝা এসে অনেক ঝাড়ফুঁক করলে, ছড়া কাটল, মন্ত্র পড়ল, আদুরীকে কষে পিটুনি দিলে, মারের চোটে ভূত আদুরীর দেহ ছেড়ে পালাবার পথ পায় না। তারপর একসময় সত্যি আদুরী সুস্থ হয়ে বসল। সুস্থ হতেই তার সে কী লজ্জা। জিভ কেটে দুহাত ঘোমটা টেনে চারপাশের ভিড়ের মধ্য দিয়ে চোঁচা নিজের ঘরের অভিমুখে দৌড়। ভূত যে আদুরীকে ছেড়ে গেল গ্রামবাসীরা তার সদ্য সদ্য প্রমাণ পেল। ওঝার শাসানি পিটুনিতে অতিষ্ঠ হয়ে ভূত জানিয়েছিল সে যাবার সময় একটি শিল-নোড়ার শিল ঘরের মধ্যিখান থেকে বারান্দার প্রান্ত পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবে। যেই কথা সেই কাজ। আদুরী একটি পাঁচ সেরী শিল বারান্দার প্রান্তভাগ পর্যন্ত নিয়ে গেল, তার পরেই প্রকাণ্ড এক-চিৎকারের পর দাঁত-কপাটি লেগে অজ্ঞান। দেহে কোন সাড়-শব্দ নেই। শেষে সুপুরি কাটা ধাঁতি তার দু'পাটি দাঁতের মধ্যে চেপে ধরে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হল।

বলতে ভুলে গিয়েছি মালতীর ইতোমধ্যে বিয়ে হয়েছে। মালতী আর সেই ফুটফুটে সদা-চঞ্চল ছোট মেয়েটি নেই। বধূ হয়ে কাঞ্চনপুরেরই দুর্গানগর গ্রামে শ্বশুর-গৃহে স্বামীর ঘর করতে গেছে। মালতীর স্বামীর নাম মাধব। বেশ ভাল বর হয়েছে। তবে শাশুড়ি বড় ঝঞ্ঝাল। কথায় কথায় মালতীর বাপের বাড়ীর প্রসঙ্গ তুলে খোঁটা দেয়। মেজাজ যেমন তিরিক্ষি তেমনি নির্মম তার অন্তঃকরণ। মালতীর এই এক অশান্তি, নইলে তার শ্বশুর-বাড়ীর জীবন মোটামুটি ভালই কাটছে। ছোটভাই গোবিন্দকে কাছে না পেয়ে প্রথম প্রথম মালতীর খুব কষ্ট হত, আস্তে আস্তে সে ভাব কেটে গেল। মাঝে মাঝে সে পিতৃগৃহে বেড়াতে আসে। আদুরীকে যখন ভূতে পায় তখন মালতী পিতৃগৃহে ছিল।

বদনের সংসারে হঠাৎ এক সাংঘাতিক রকমের দুর্ঘটনা ঘটল। বর্ষার শেষে একদিন ক্ষেতে কাজ করবার সময় গয়ারামকে সাপে কাটল। রোজা এল, বদ্যি এল, অনেক ঝাড়ফুঁক হল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, দেখতে দেখতে বিষেজর্জর দেহ নীল হয়ে এল, গয়ারাম মারা গেল। আদুরীর শোক আর বাধা মানল না, সে উঠোনে আছাড় খেয়ে পড়ল। নিতান্ত কচি বয়সেই আদুরীর সাধ আহ্লাদ নিঃশেষ হয়ে গেল।

গয়ারামের মৃত্যুতে সংসারে প্রচণ্ড এক শোকের ছায়া পড়ল। সদ্যপুত্রহারা অনলের কাতর বিলাপ কান পেতে শোনা যায় না, আর আদুরীর শোক অবর্ণনীয়। আগের দিন হলে প্রচলিত প্রথা ও সংস্কার অনুযায়ী স্ত্রীকে সহমরণে যেতে হত—তা সে বালিকা বধূই হোক আর প্রৌঢ়া গৃহিণীই হোক। কিন্তু যখনকার কথা এই গল্পে বলা হয়েছে সেই সময় সহমরণের প্রথা অনেক শিথিল হয়ে-এসেছে, যদিও মাঝে মাঝে তখন যে সতীদাহ না হত এমন নয়। 'বেঙ্গল পেজাণ্ট লাইফ' বইতেই রেভারেণ্ড

লালবিহারী দে এরূপ এক সতীদাহের বর্ণনা করেছেন—সে এক মর্মান্তিক বিবরণ। আদুরীর ভাগ্যে অবশ্য এই পরিণতি ঘটল না, সে নিতান্ত হতভাগিনী বলে স্বামী সহগমনে বৈকুণ্ঠে যাওয়ার স্বর্ণ সুযোগ থেকে নির্মম ভাবে তাকে বঞ্চিত করা হল। তবে অন্য ভাবে তাকে পুণ্যার্জনের সুযোগ দেওয়া হল। একাদশী তিথিতে নিরম্বু উপবাস, অন্যান্য দিনে আলো-চালের ভাতে ভাত ইত্যাদি বিশুষ্ক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই শুরুই বিধবাকে ফলে ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা দেওয়া হতে থাকল। অত বকনা আদুরীর সইল না, তার মন উড়ু-উড়ু হতে আরম্ভ করল। তার চঞ্চল স্বভাবের কথা আগেই বলা হয়েছে।

অলঙ্গ গ্রামের দুই-চারিজন সমবয়সী স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিয়ে বর্ধমান জিলার বৈষ্ণব তীর্থগুলি দর্শন মানসে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়েছিল। সেই সময় আদুরীও তাদের সঙ্গ নেয়। তার তো আর পশ্চাৎবন্ধন কিছু নেই যে গৃহ তাকে আবদ্ধ করে রাখবে। তার স্বামী নেই, সন্তান নেই—সংসারে সে সম্পূর্ণ একা। কাজেই বয়সে অনেক কচি হলেও আদুরীর সহযাত্রায় অলঙ্গ বাধা ছিল না। অল্প বয়সে কপাল পুড়েছে, আহা বেচারা! তীর্থধর্ম করে যদি মেয়েটা মনে কিঞ্চিৎ শান্তি পায় তবে সে শাশুড়ী হয়ে তাতে বাদ সাধে কেন। অলঙ্গরা একে একে অম্বিকা কালনা, মালতীর শ্বশুর বাড়ী দুর্গানগর, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান পর্যটন করে বেড়াল। পথে এক জায়গায় প্রেমভক্ত বৈরাগীর সঙ্গে দেখা। প্রেমভক্ত বৈরাগীর সঙ্গে অলঙ্গদের পূর্ব-পরিচয় ছিল। আখড়াধারী যুবাবয়সী বৈষ্ণব, দেখতে সুপুরুষ। ভিক্ষায় বেরিয়ে একাধিকবার সে কাঞ্চনপুর গেছে এবং বদনের গৃহ থেকে ভিক্ষা নিয়েছে। প্রেমভক্ত বৈরাগী আদুরীর কানে কী মন্ত্র দিলে সে-ই জানে, আদুরী শাশুড়ীর কাছে বৈষ্ণব হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে। ছলের আশ্রয় নিয়ে বৈরাগী অলঙ্গের মনে এই ধারণা জন্মিয়ে দিলে যে, বৈষ্ণবী হওয়া ছাড়া আদুরীর সামনে আর অন্য পথ খোলা নেই, ওই পথেই ওর মুক্তি নিহিত। অলঙ্গ আর করে কী, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাকে ওই প্রস্তাবে সায় দিতে হল। যথা দিনে বৈরাগীর সঙ্গে আদুরীর কণ্ঠি বদল হল, আদুরী বৈরাগীর হাত ধরে আরও দূরের তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে গেল। অলঙ্গরা ঘরে ফিরে এল।

গয়ারামের মৃত্যুর কিছু দিনের মধ্যেই গোবিন্দের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল। চাষীর ছেলে যে সামান্য লেখাপড়া শিখেছে তাতেই যথেষ্ট, তাছাড়া, রামরূপ সরকার গোবিন্দকে জমিদারী হিসাবের অঙ্ক যেন বিদ্যিমতেই শিখিয়েছিল, তাতে আর কিছু হোক না হোক সম্পত্তি রক্ষণের জ্ঞান গোবিন্দের ভালই আয়ত্ত হয়েছে বলা চলে। সুতরাং অধিক পড়ায় কী প্রয়োজন। গয়ারাম, বদন আর কালাবাসিকের মাঠের কাজে যত সহায় ছিল, তার অভাবে কাজকর্মের খুবই ক্ষতি হচ্ছিল, এখন মাঠের কাজে গোবিন্দ গয়ারামের স্থলাভিষিক্ত হল। দেখতে দেখতে দিন কেটে যায় গোবিন্দের বয়স বাড়ে। লেখক এই অবসরে ধান্যতত্ত্ব, ফসল কাটা ও ফসল ঘরে তোলা, নবান্ন উৎসব, ইক্ষুচাষ, গ্রামের হাট, গ্রামের নানা জাতি ও বৃত্তিজীবী শ্রেণীর পরিচয়, আঞ্চলিক দেশাচার ও লোকাচার, গোবিন্দের বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনার মধ্য দিয়ে বাংলা দেশের তৎকালীন সমাজ জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি পাঠকের চোখের সামনে স্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। স্থানাভাবের কারণ এখানে সে সব বিবরণ দানের অবকাশ অতিশয় অল্প, আপাতত মূল কাহিনীতে বর্ণনা সীমাবদ্ধ রাখাটাই যুক্তিযুক্ত মনে করি।

গোবিন্দের বিবাহ যোগ্য বয়স (এখনকার হিসাবে নয়, আশি-নব্বই বৎসর আগেকার হিসাবে) হতে কাঞ্চনপুর গ্রামেরই পদ্ম পাল ওরফে পোদো পালের সুলক্ষণা কন্যা ধনমণির সঙ্গে গোবিন্দের বিবাহ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ধনমণি গোবিন্দের আবাল্যের সাথী, খেলাধুলা, আম কুড়ানো, মাঠে ঘাটে

কষ্টিও ধরে বেড়ানো সবই এতকাল একসঙ্গে হয়ে এসেছে। তারা মিশেছে মিশেছে আবার প্রয়োজনে ঝগড়াঝাঁটি করেছে। ঝগড়া-ঝাঁটির পর পুনরায় আপোষ হতেও বিলম্ব হয়নি। সেই দুজন হঠাৎ বিবাহের গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়বে, দু'দিন আগে পর্যন্ত দু'জনের একজন কেউই তা কল্পনা করতে পারেনি। লেখক হলফ করে বলেছেন গোবিন্দ আর ধনমণির ভিতর কোনরূপ পূর্ব-রাগের সঞ্চার হয়নি। (বিলেতী ধরণের কোর্ট-শিপের রেওয়াজ এদেশের গ্রাম-সমাজে একেবারেই নেই, বিশেষত গোবিন্দ আর ধনমণির মত দুটি অপ্রাপ্ত বয়স্কের বেলায় সে প্রশ্নই ওঠে না।) তবে একের অপরটিকে যে অপছন্দ হয়েছিল এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

নাতির বিয়ে দিয়ে অলঙ্গর এখন কাড়া হাত-পা। সংসারের কাজকর্মে মাথাপাতবারও আর প্রয়োজন হয় না, কেন না সুখদার উপর এখন সংসারের সমস্ত দায়িত্ব। অলঙ্গ বৃদ্ধা হয়েছে, জপ-তপ পূজা-আচ্চা নিয়েই তার দিন কাটে। যথাকালে গোবিন্দের একটি ছেলে হল। সবাই বলে অলঙ্গর মত এমন ভাগ্যবতী আর হয় না, নাতি অনেকেরই হয়, পুতির মুখ দেখবার সৌভাগ্য আর ক'জনের ঘটে। কিন্তু এত সুখ-সৌভাগ্যের মধ্যেও গয়ারামের অকাল-মৃত্যুর স্মৃতি অলঙ্গর মনে শেলের মত বিঁধে আছে। একটু ফাঁক পেলেই অলঙ্গ গয়ারামের কথা মনে করে আজও বিলাপ করে। পুনরায় তার মনে তীর্থ ভ্রমণের সাধ প্রবল হয়ে উঠল। এবার আর নবদ্বীপ নয়, বৈষ্ণবের সর্বতীর্থসার শ্রীক্ষেত্র পুরী। পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথের পায়ে চিত্তের সমস্ত জ্বালা নিবেদন করে ভারমুক্ত হতে চায় অলঙ্গ। এখনকার দিনের মত রেলে চেপে যাত্রা নয়, পায়ে হেঁটে যাত্রা। পথ দীর্ঘ, পথের বিঘ্ন বহু। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' উপন্যাসে শ্রী ও জয়ন্তী দুই সন্ন্যাসিনীতে মিলে যে পথে পুরুষোত্তম যাত্রা করেছিল এ সেই পথ। রথযাত্রা উপলক্ষে কাতারে কাতারে লোক এই পথে পুরী গমন করে, অলঙ্গরাও প্রস্তুত হতে লাগল। তারপর একদিন গ্রামের আরও কয়েকটি পুণ্যার্থিনী বৃদ্ধার সহিত অলঙ্গ পথে নেমে পড়ল।

অলঙ্গ পথের নানাবিধ কষ্ট সহ্য করে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছেছিল ঠিক, রথারূঢ় জগন্নাথদেবের দর্শনও তার ভাগ্যে ঘটল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। বাড়ী ফেরা আর তার হল না। গৃহ প্রত্যাবর্তনের পথে কাতাতেই কলেরা হয়ে তার মৃত্যু হল।

৪

এ পর্যন্ত বদন ও গোবিন্দের সংসারের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে দুঃখশোকের ছায়াপাত ঘটলেও গভীর বিপর্যয়ের কৃষ্ণছায়ার আভাস পাওয়া যায়নি। মোটামুটি মসৃণ ভাবেই এতাবৎ তাদের সংসার যাত্রা নির্বাহ হয়ে এসেছে। কিন্তু বিপত্তি দেখা দিল গ্রামের জমিদারের সঙ্গে বিবাদ বাধানোর ফলে। জমিদারের সঙ্গে সাধারণ কৃষক প্রজার লড়াই সমানে অসমানে লড়াই। এই লড়াইয়ে প্রজার কখনও জয় হত না। জমিদার যত অন্যায়ই করুক, তার মাত খুন মাপ হয়ে যেত অর্থবল আর লোকবলের জোরে। উৎপীড়িত প্রজা নালিশ করেও কোন ফল পেত না, কেন না প্রায় ক্ষেত্রে নালিশের সুবিচার হত না। কায়েমী স্বার্থবাদী বিচারক শ্রেণী বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শক্তিমানের পক্ষেই রায় দিয়ে এসেছেন। আমাদের দেশের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় ধর্মাধিকরণ ধর্মের অধিকরণ নয়, ধর্মের অধিকার হরণের একটি প্রশস্ত আলয় মাত্র। দুর্বলের পক্ষে প্রায়শঃই ন্যায় থাকে, কিন্তু যেহেতু দুর্বল সেই

কারণেই শক্তির মদমত্ততার কাছে তার 'ন্যায়' অসহায় আর বিড়ম্বিত। এই ক্ষেত্রেও সেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হল না, গ্রামের জমিদারের কোন একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার 'দুঃসাহস' দেখানোর ফলে গোবিন্দের উপর সর্বনাশের কালো মেঘ ঘনিয়ে এল, দেখতে না দেখতে গোবিন্দের সোনার সংসার তছনছ হয়ে গেল।

গ্রামের জমিদার জয়চাঁদ রায় চৌধুরী মধ্যশ্রেণীর একজন ভূম্যধিকারী হলেও তাঁর শক্তির আস্ফালন অতিশয় বৃহৎ। নিজেকে তিনি জমিদার শ্রেণীর মধ্যে একটা কেউ-কেটা বলে মনে করেন। জিলার সায়েবদের সঙ্গে তাঁর ভাব আছে, তাইতে তাঁর ওজন হয়েছে আরও বেশী। প্রজার সুখ-সুবিধার দিকে তাকাবার তাঁর অবকাশ নেই, ভোগ-বিলাসেই তাঁর দিন কাটে। প্রজার উপর 'মাথোট' 'আবওয়াব' ইত্যাদি অবৈধ কর অন্যায় ভাবে চাপিয়ে তিনি তাদের কাছ থেকে জুলুম করে টাকা আদায় করেন। কেউ দিতে অস্বীকার করলে তার আর রক্ষা নেই, ধনে প্রাণে মারা যাবার যোগাড় হয়। গলায় গামছা বেঁধে তাকে কাছারি বাড়ীতে নিয়ে এমন বেধম প্রহার দেওয়া হয় যে এই মারের চোটেই তার বিদ্রোহ নরম হয়ে আসে। এই সব নানা অত্যাচারের ফলে জমিদার জয়চাঁদ রায়চৌধুরী প্রজা সাধারণের নিকট ত্রাস স্বরূপ ছিলেন। এই শ্রেণীর জমিদারের নিপীড়নের ফলেই অতীতে বাংলার কৃষক-প্রজার জীবন দুর্বহ হয়েছে। গোবিন্দের দুর্ভাগ্য যে, এমন এক অসার দাপট-দেখানেওয়ালা প্রজাপীড়ক জমিদারের অধীনে তাদের বাস।

জমিদারের পুত্রের আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে গোমস্তার আদেশে জমিদারের পেয়াদা হনুমান সিং গোবিন্দের কাছে 'মাথোট' চাইতে এল। গোবিন্দ সরলবুদ্ধির মানুষ সে 'মাথোট' দিতে অস্বীকার করে। আর যায় কোথা, এই অস্বীকৃতির কথাটাই নানা বর্ণে রঞ্জিত আর অতিরঞ্জিত হয়ে যথাকালে জমিদারের কানে গিয়ে পৌছুল। একজন সামান্য চাষী প্রজার এতবড় আস্পর্ধা যে, জমিদারের হুকুম অমান্য করে! জমিদারের সহ্য হ'ল না, গোবিন্দকে কাছারী বাড়ীতে বেঁধে আনার হুকুম দিলেন। সেখানে গোবিন্দের যা লাঞ্ছনা হল তা অকথ্য। গোবিন্দ যত বলে তার হাতে 'মাথোট' দেওয়ার মত দু'চার আধলারও সঙ্গতি নেই, তত জমিদারের রাগ বেড়ে যায়। অবশেষে ক্রোধান্ধ জমিদার গোবিন্দকে জুতোপেটা করে তাড়িয়ে দিলেন। গোবিন্দ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার কালে শাসালেন, ওদের লাঞ্ছনার এই সুরু, আরও অনেক দুর্ভোগ তাদের কপালে আছে। গভীর মর্মপীড়ায় নিপীড়িত অপমানিত গোবিন্দ নিতান্ত ক্ষুণ্ণ আর অবসন্ন মনে গৃহে ফিরে এল। অন্যায় অত্যাচার যেখানে বাধাবন্ধহীন ও বিবেকবিহীন, সেস্থলে অন্যায়ের প্রতিকারও দুঃসাধ্য। একথা জেনেই বোধ করি গোবিন্দ সব লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করল আর অগতির গতি দীনের শরণ ভগবানের কাছে নীরব নালিশ জানিয়ে গোপনে অশ্রুপাত করল।

গোবিন্দের এই লাঞ্ছনার সংবাদে পাড়াপড়শিরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং কী করে এই অপমানের প্রতিশোধ লওয়া যায় তার উপায় চিন্তা করতে লাগল। বিশেষতঃ গোবিন্দের কাকা কালামানিক তো রেগে কাঁই। সে পারলে জমিদারের মাথাটা এখুনি এক কোপে দু ফাঁক করে দিয়ে আসে। তাকেও ধরে আনার জন্য লোক পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু কালামানিক গোঁয়ার-গোবিন্দ ইসা ছোয়ান মানুষ, সে তো জমিদারের কাছারীতে গেলই না,- উল্টো জমিদারের লোককে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। জমিদারের ক্রোধের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। কী করে কালামানিককে শায়েস্তা করা

যায় তার জন্য তখুনি জমিদার সাহোপাঙ্গদের নিয়ে বৈঠক বসালেন। অনেক লম্বা পরামর্শ কিসফাস গুজগাজ চলল, শেষে এক সময় জমিদারের সশুদ্ধ বদনমণ্ডল খলের শৃগাল-হাসিতে ভরে উঠল। যে কন্দী আঁটা হল তাতে যে বাছাধনেরা নিতান্ত জব্দ হবে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না।

এর কিছুদিনের মধ্যেই একদিন রাত্রিকালে গোবিন্দদের বাড়ীতে আগুন লাগল। সমগ্র পল্লী যখন গভীর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন তখন এই কাণ্ড ঘটল। কেমন করে কোথা দিয়ে আগুন লাগল তা কেউ বলতে পারল না, শুধু দেখা গেল এক লহমার মধ্যে গোবিন্দদের বসতবাটী পাকশাল চৌকশাল সব কিছু পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। আগুন নেভাবার চেষ্টা হয়নি তা নয়, কিন্তু তাতে অগ্নির শান্তি হয়নি, বরং বায়ুযোগে লেলিহান শিখা আরও গর্জে উঠেছে। সবাই বলল, অসাবধানে হঠাৎ আগুন লেগে গিয়েছে, কিন্তু কালামানিকের ধারণা অন্যরকম। তার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছে এর পিছনে জমিদারের কারসাজী আছে। সন্দেহ হবার কারণ, যখন আগুন লাগে তখন কালামানিক জেগে ছিল, আগুন লাগবার অব্যবহিত পরমুহূর্তে সে তিনটি ছায়ামূর্তিকে তাদের বাড়ীর খিড়কি-দরজার পাশ দিয়ে অপসৃত হতে দেখে, তাদের ভিতর জমিদারের তাড়া-করা গুণ্ডা তীরের মুখ সে স্পষ্ট দেখেছে। পরদিন কালামানিক এই মর্মে গ্রামের ফাঁড়িদারের (পুলিশ-কনস্টেবল) নিকট নালিশ করলে। ফাঁড়িদার তীরের বাড়ীতে অনুসন্ধান করে জানল গত দু'দিন ধরে তীর নাকি তার বাড়ী নেই, সে তার শ্বশুর-বাড়ীতে বেড়াতে গেছে। ব্যস, আর কথা কি, এমন অকাট্য যুক্তির উপর আর কোন যুক্তি চলে না। সুতরাং কালামানিকের নালিশ এইখানেই চাপা পড়ল। অন্যায়ের তো কোন প্রতিকার হলই না, বরং কালামানিক যে অন্যায়ের সূত্র ধরে ফেলেছে, তার কাছে সত্য চাপা নেই, এই চেতনা জমিদার পক্ষকে আরও ঘোরতর অন্যায়ে প্ররোচিত করল। পাপ ঢাকবার জন্যে অধিকতর পাপকার্যের আয়োজন চলতে লাগল।

কালামানিক একদিন দূর গ্রামান্তর থেকে স্বগ্রামে ফিরছিল। পথে সন্ধ্যা নামে। মাঠের ভিতর দিয়ে পথ। অন্য লোক হলে এই জনশূন্য অন্ধকার পথে একা চলবার সাহস করত না, কিন্তু কালামানিক সে ধাতের মানুষই নয়। সে কোন-কিছুর তোয়াক্কা না করে এই নির্জন মাঠের পথ ধরে হন হন করে এগিয়ে চলছিল। শত্রু ওৎ পেতেই ছিল, মাঠের মধ্যিখানে একটা ঝোপ মত জায়গায় পৌঁছুতে চারদিক থেকে গুণ্ডার দল তাকে ঘিরে ধরল। কালামানিকের দেহে যদিও হাতীর বল, তা হলেও এতগুলি দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকের সঙ্ঘবদ্ধ অতর্কিত আক্রমণের সামনে তার একার প্রতিরোধে কাজ হল না। গুণ্ডারা লাঠির ঘায়ে পিটিয়ে কালামানিককে মেরে তার দেহ মাটিতে পুঁতে ফেলল, তারপর একটা বৃহৎ কার্য সমাধা করবার উৎকট আনন্দে সোল্লাসে সেই সংবাদ জমিদারের কানে পৌঁছে দেবার জন্য ছুটল। পশুশক্তির অধম ষড়যন্ত্রের ফলে একটি সরল নির্বোধ অথচ ষোল-আনা সৎ মানুষের অস্তিত্ব ধরাধাম থেকে বিলুপ্ত হল।

মালতীর স্বামী মাধবের জীবনও সুখের হয় নি। নীলকর সাহেবদের ষড়যন্ত্রের ফলে তার ভাগ্যে গভীর বিপর্যয় অপেক্ষা করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত মাথে সাহেবের চক্রান্তে তার প্রাণ গেল। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁর গ্রন্থে নীলচাষের পদ্ধতি প্রকরণ সম্বন্ধে এক সুবিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনার ভিতর বাংলা দেশের সাধারণ কৃষকশ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম সহানুভূতি ও দরদ ফুটে উঠেছে। নীলচাষের আওতায় আসবার পর বাংলার কৃষি-ব্যবস্থা ও কৃষকের অবস্থার ঘোরতর অবনতি হয়। জনসাধারণের জীবনরক্ষাকারী খাদ্য শস্যের উৎপাদনে যে উদ্যম ব্যয়িত হবার কথা, সে উদ্যম নীলের মত একটি প্রাণধারণের

পক্ষে অবাধে পণ্যশস্যের উৎপাদনে ব্যস্ত হলে কৃষকের প্রাণ শক্তির তথা জাতীয় সম্পদের যে সাংঘাতিক অপচয় হয় সেই ক্ষতির ভয়াবহতা রেভারেণ্ড লং-এর বর্ণনায় সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। নীলকরদের অত্যাচার, তাদের লোভাতুরতা, জোর করে চাষীদের টাকা আগাম দিয়ে তারপর তাদের শর্তপূরণে অন্যায়ভাবে বাধ্য করা, ধানের জমিকে জবরদস্তির দ্বারা নীলের জমিতে পরিণত করা, নীলচাষের পদ্ধতি, নীল উৎপাদনের প্রণালী, সরলবিশ্বাসী চাষীদের ওজনে ফাঁকি দেওয়া, নীলচাষে রাজী না হলে চাষীর উপর নীলকরদের ভূলুমের বহর, জেলার শাসনভারপ্রাপ্ত সাহেবদের সঙ্গে নীলকর সাহেবদের মাখামাখি ও তজ্জন্য অন্যায়ের প্রতিকারহীনতা—এ সমস্তই অতি বিস্তারিত ভাবে বইটিতে আলোচিত হয়েছে। সরকারের ঔদাসীন্যকেও লেখক ছেড়ে কথা কন নি। বেচারা মাধবের জন্য কষ্ট হয়। সে নীলকর সাহেবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। গ্রামবাসীরা তার নেতৃত্বাধীনে অনেকটা সঙ্ঘবদ্ধও হয়েছিল। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারে নি। মারে সাহেব ও তার অনুচরদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের এক হাঙ্গামায় সে ভীষণ ভাবে আহত হয়। মারে সাহেবের লোকেরা তার আহত দেহ লুকিয়ে ফেলে, রাতারাতি নৌকাযোগে অন্য কুঠিতে চালান দেয়, তারপর একসময় দেহে প্রাণ থাকতেই তাকে গুম করে ফেলে। প্রবল পরাক্রান্তের সঙ্গে বিবাদের মূল্য মাধব তার জীবন দিয়ে পরিশোধ করল। এইরকম আরও কত বাংলাদেশের অসহায় কৃষক নীলকরদের লোভের বলি হয়েছে তার সীমা নেই।

তবে পুস্তকের উপসংহার ভাগে অনেক মন্দ সংবাদের সঙ্গে কিছু সুসংবাদও আছে। লেখক কাঞ্চনপুরের জমিদারের কৃষ্ণ যবনিকার পটে দুর্গানগরের জমিদারকে উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত করেছেন। এই সদানন্দ জমিদার নীলকরদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের বিবাদে গ্রামবাসীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রজারা তাঁকে পক্ষভুক্ত পেয়ে প্রকৃত মনোবল লাভ করে। তাঁর একার চেষ্টায় অবশ্য অন্যায়ের প্রতিকার হয় নি, তবে অন্যায় অর্ধপথে থমকে দাঁড়িয়েছে। বাংলার জমিদারেরা সকলেই অত্যাচারী ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অশেষ বদান্যতা ও প্রজাবৎসলতার পরিচয় দিয়ে গেছেন—লেখক শেষোক্ত জমিদার নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্র-চিত্রণের মধ্য দিয়া এই সত্যটিকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। সরকারের অব্যবস্থা তথা প্রজাপুঞ্জের স্বার্থসংরক্ষণ বিষয়ে ঔদাসীন্যের অতি কঠোর সমালোচনা* করলেও শেষ অবধি সরকারের অনুকূলেও লেখক দুই-চারিটি মন্তব্য করেছেন। দেশব্যাপী অসন্তোষ আর প্রজা-আন্দোলনের প্রাবল্যের মুখে সরকার শেষ অবধি ঘৃণিত 'পঞ্চম' ও 'সপ্তম' প্রথা রদ করতে বাধ্য হন। এই দুই প্রথা অত্যাচারী জমিদারদের হাতে প্রজাশোষণের এক মস্তবড় হাতিয়ার ছিল। কিন্তু ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের দশম আইনে ওই প্রজানিপীড়নমূলক ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ হয়। তারপর গত একশো বছরের মধ্যে কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষণোদ্দেশ্যে আরও অনেকগুলি আইন পাস হয়, এখন তো খোদ্ জমিদারী ব্যবস্থাই রদ হয়ে গেছে; তবে ১৮৫৯ সনের আইনেই যে কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নের সূত্রপাত হয় এই তথ্যটি চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য।

নারায়ণ চৌধুরী

'Bengal Peasant Life' (1926 Edition).

---

* The object which Government had in giving such extraordinary powers ('Panchem' and 'Haptam') to landholders was to enable them to realise their rents regularly, and transmit them punctually to the public exchequer; but, in consulting its own interest, the Government virtually, consigned the entire peasantry of Bengal to the tender mercies of a most cruel and rapacious aristocracy. Happily, a more enlightened and humane legislation has taken away from the code those iniquitous regulations but it is worthy of note that, for half a century, those horrible engines of oppression were allowed by a Government calling itself Christian, to grind to the dust many millions of probably the most peaceful people upon earth." Pp. 361-62

॥ ব্রহ্মকমল ॥

আজকের ভারতবর্ষের সঙ্গে সেদিনের ভারতবর্ষের ছিল আকাশ পাতাল তফাৎ। যুগের উত্থান পতন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যেই এই পরিবর্তন ঐতিহাসিক সত্যে সমুদ্ভাসিত। কালের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানে ধ্বংস ও মৃত্যুর মধ্যেও যে সত্তা সৃষ্টির অখণ্ড ধারায় প্রবাহিত, যার বিনাশ নেই, শেষ নেই; মৃত্তিকার রসাশ্রিত প্রীতি, আর মানবিক অন্তলীন স্মৃতির মধ্যে সেই অনন্ত প্রাণসত্তা চিরবিকাশোন্মুখ। তাই মহাকালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে প্রাণশক্তির যোগসূত্রের এই নিবিড় সান্নিধ্য জীবনে জীবনে চিরমিলনময়। বেদনার অশ্রুবাষ্পে পবিত্র, নিষ্কলুষ ও আনন্দমধুর এ প্রেমপ্রত্যয়। এই জীবনজয়ন্তীর ইতিহাসই যুগ সংযোজনার ও আজকের পুষ্পবন্তা ব্রহ্মকমল ফুলে সঞ্জীবিত, সঞ্চারিত ও সুরভিত।

তখন ছিল জগৎগুরু শঙ্করাচার্যের যুগ। অরাজকতা ও নানা প্রকার গ্লানিতে তখন নীতিভ্রষ্ট হয়েছে বৌদ্ধ ভারত। দারুণ ভোগস্পৃহার মধ্যে তার আধ্যাত্মিক অধোগতির রূপ ধ্যানমেত্রে অবলোকন করে তরুণ সন্ন্যাসী শঙ্কর বিচলিত হলেন। মানুষের জন্মমৃত্যু অন্তরন্থিত পরম সত্যটি সুচিন্তিত বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সকলকে আহ্বান করলেন তিনি সেই পরম অজ্ঞের জীবনাচার্যকে জ্ঞাতার্থে জীবন উৎসর্গ করবার জন্য। যে সত্য সতত নিয়ন্ত্রিত করছে জন্মের মাধুর্য ও মৃত্যুর বিভীষিকাকে, সেই সত্যই হোক মানুষের একমাত্র প্রেয় ও প্রার্থনীয়। বাকী সব ভুল মায়া; বিষবৎ বর্জনীয়। এ মায়া থেকে মানুষ তুমি মুক্ত হও। ব্যক্ত হও ব্যক্তিসত্তার গভীরত্বে। সৃষ্টির আদিকালের সতীবিচ্ছেদ কাতর রুদ্র শঙ্করের মত, সেদিনের সন্ন্যাসী শঙ্কর স্বীয় সাধনালব্ধ সত্যের মধ্যে মানুষের আত্মিক শুদ্ধি ও মুক্তির জন্য, শুদ্ধ বৈরাগ্যযোগে সমস্ত ভারতবর্ষে প্রবাহিত করলেন নূতন জাহ্নবী ধারা। সেই যোগশুদ্ধ যজ্ঞাহুতিতে সুষমান্বিত হোল পুষ্পবন্তা ব্রহ্মকমল ফুল! দুঃস্কর তপঃসিদ্ধিতে সে অনন্যা। প্রেমপুণ্যা স্মৃতিসঞ্চারিনী।

সেই সময় নীলগঙ্গার নির্জন তটপ্রান্তে বশিষ্ঠাশ্রমের অদূরে একটি পর্ণকুটীরে বাস করতো এক মালাকর দম্পতি। সন্তানসন্ততি না থাকায় উভয়ের মনে ছিল একটা গোপন দুঃখ। সে দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত করতো তারা ধর্ম-কর্ম আচরণের মধ্যে দিয়ে। রূপা মালিনীর পদ্মের মত রূপখ্যাতির সঙ্গে তার গুণের সুখ্যাতিও ছড়িয়ে ছিল সকলের মুখে মুখে। নীলগঙ্গার মেঘের মত তরঙ্গহিল্লোলে প্রতিবিম্বিত হোত তার মনোময়ী রূপমাধুরী। জলকলোচ্ছ্বাসে গুঞ্জরিত হোত তার পরার্থপরা গুণাবলী। শিবালিক পর্বতমালা অধ্যুষিত বন্যজন্তুগুলির কাছে তারা বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিল। সেই রূপা মালিনীর নিভৃত পর্ণকুটীরখানি ঠিক পুষ্প-মালাকের মতই সৌন্দর্যময় করে রেখেছিল মদন মালাকর তার অকুণ্ঠ শ্রমে ও রূপার প্রতি রূপাতীত প্রেমে। প্রতি সন্ধ্যা আশ্রমে ফুলের যোগান দিত মদন। ব্রহ্মর্ষি আশ্রমে যেদিন কোন বিশেষ হোমানুষ্ঠানের আয়োজন থাকতো সেদিন তার কাজের কোনও সীমা থাকতো না। শুধু ত ফুলই নয়, ব্রহ্মচারীদের যজ্ঞের বহু সমিধ তাকে আহরণ করে এনে দিতে হোত। শিবালিক পর্বতের অরণ্য কন্দরের সমস্ত রন্ধ্রে রন্ধ্রে তৃণগুল্ম লতা সচকিত হয়ে উঠতো মদনের সদর্প সকম্পনী আগমনে। যজ্ঞাহুতির পূর্ণতায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো তার সশ্রম আহৃত বনসম্পদ। মদনের, জীবন সার্থক হোত আশ্রমগুরুর মুখের পরিতৃপ্ত হাসি দেখে।

পুষ্পমাল্য রচনায় রূপা মালিনীর হাত ছিল সুনিপুণ। বালতী, রাধাচূড়া আর বনমল্লিকা পুষ্পের অনবদ্য মাল্য রচনা করে দেবদারীর মত রূপা নিত্য দিয়ে আসতো আশ্রম মন্দিরে। প্রাত্যহিক বিগ্রহ সেবায় রূপার হাতে গাঁথা মালা স্থান পেতো দেবকণ্ঠে। রূপা নারী, তার সেবায় সন্ন্যাসাশ্রমের বিগ্রহ সেবা বিঘ্নিত হবে, তখন এমন কোনও নিয়ম বা বিধি ছিল না। মানুষের জীবনযাত্রার স্বচ্ছন্দ গতিতে কোনও অসামঞ্জস্য ছিল না বলেই কোন বিকৃতিও ছিল না সেখানে। তাই সে যুগের জীবনাচরণে কোনও আড়ম্বর ছিল না। ছিল সহজ সরল অবাধ মৈত্রী-মধুর একটা স্বাচ্ছন্দ্য। তাই পাপপুণ্যের পার্থক্যও ছিল খুব যোজন বিস্তৃত।

এমনিতর দিনের প্রতিটি ক্ষণ মূলমালকে ধ্রুবসাধনায় নিযুক্ত থেকে সন্ধ্যার পর কুটিরে ফিরে আসতো যখন। রূপার সেবায় ও সান্নিধ্যে মধুর হয়ে উঠতো তার সমস্ত দিনের শ্রান্তি। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে সে ঘরের তাকের উপর থেকে প্রিয় বাঁশীখানি হাতে নিয়ে রূপার সঙ্গে বেরিয়ে এসে বসতো কুটিরাঙ্গনের গোলাপ বিতানের পাশে। চাঁদের আলোর মত গাছে ফুটে থাকতো অজস্র লাল আর গোলাপী গোলাপ ফুল। কয়েকটি গোলাপ কলি তুলে নিয়ে রূপার কবরীতে পরিয়ে দিয়ে সে বাঁশীতে সুর দিত। মূলমালকের পুষ্প-সহাবের ঘুম ভাঙিয়ে, মৃত্তিকাগহ্বরে অহিকুলকে সচকিত করে বাঁশি বেজে উঠতো মন-মাতানি সুরে। সে সুরে রূপার মন কেমন যেন উদাস হয়ে উঠতো। মনে হতো ওর কি যেন নেই, কে যেন নেই। মদন যেন অনেক দূরের অচেনা কেউ। ওর কাছের কি যেন বস্তু নেই। সে যেন বুঝি লুকিয়ে আছে আকাশের ঐ নক্ষত্র মালায়। ঘমকা বাতাসের মত সে ইচ্ছা একদিন হয়ত ছুটে এসে কাঁপিয়ে পড়বে ওর বুকে। চোখের জলে মুখ ভিজিয়ে রূপা জিজ্ঞেস করবে, "এতদিন তুই কোথায় ছিলি?" সত্যই তখন চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল রূপার মুখ। মদনের বাঁশী তখন করুণ মূর্ছনায় কাকে যেন ডাকছে, "আয়, আয়, ওরে আয়!"

এমনি করেই সুখে দুঃখে কেটে যাচ্ছিল রূপা আর মদনের জীবন। এমন সময় শ্রাবণের এক মেঘলা ভোরে ঘুম থেকে জেগে রূপা বললে মদনকে, "আমি কেদারনাথে যাবো; ভোর রাতে স্বপ্ন দেখলুম বাবা কেদারেশ্বরকে।"

মদন বললে, "কেদারনাথ? সে তো বরফের দেশ। বড় দুর্গম পথ। সেখানে স্ত্রীলোক তুমি যাবে কি করে?"

রূপা বললে, "তুমি ভাবিয়ে দেখো, আশ্রমের সন্ন্যাসী ঠাকুররা অনেকে হিমালয়ে যাচ্ছেন, আমি তাঁদের সঙ্গে যাবো। কোনও কষ্ট হবে না আমার—"

শঙ্করাচার্যের বিখ্যাত চতুর্ধামের উত্তরাখণ্ডের যোশীমঠ তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিমালয়ের দুর্গম গিরিগুহা কন্দর থেকে যোগী ও ঋষিরা আসছেন, যোশীমঠ দর্শন করতে। বশিষ্ঠাশ্রমের সন্ন্যাসীরাও সেই যাত্রার আয়োজন করছেন। শ্রাবণ মাস বড় পুণ্য মাস। মহাদেবের প্রিয় মাস। তাই এই শ্রাবণে হিমালয় যাত্রার আয়োজনে ঋষি-তপোবন চঞ্চল হয়ে ওঠে। স্বপ্নদ্রষ্টা রূপা, সন্ন্যাসীদের সেই জয়যাত্রার চিত্র মানস দৃষ্টিতে দেখছে। মদনকে চিন্তিত দেখে সে বললে, "এতে চিন্তার কি আছে গো? তীর্থে যাওয়া এতো পুণ্যের কাজ। তার উপর দেবতার দর্শন পেয়েছি।"

মদন বললে, "তীর্থে যাওয়া ও মহাপুণ্যকর্ম। কিন্তু আমি ছাড়া একা তুমি অত পথ যেতে সাহস পাবে?"

তাইতো ; এ কথাতে এতক্ষণ রূপা একবারও ভাবেনি। ওর বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল। ও বললে, "না গো, তুমি সঙ্গে না থাকলে একা আমি যেতে পারবো না।"

মদন বললে, "কিন্তু দুজনে একসঙ্গে গেলে আশ্রমে ফুল দেবে কে ?"

সেও ত ঠিক। দেবতা কি তাকে এমনি দিগন্তে ফেলবেন ? গভীর আশঙ্কায় রূপার চোখে জল এসে গেল। ও বললে, "কিন্তু একা তীর্থে গেলে কোন ফলই ত হবে না আমার। তারপর আমি শুনেছি শ্রাবণ মাসে কেদারেশ্বর মহাদেবের পূজায় ব্রহ্মকমল ফুলের অর্ঘ দিতে হয়। সে ফুল তুমি ছাড়া আমায় এনে দেবে কে ?"

মদন চমকে উঠল, "ব্রহ্মকমল ফুল ? সে ফুল কেমন ? কোথায় পাওয়া যায় ?"

রূপা বললে, "শুনেছি হিমালয়ে পাওয়া যায়। আমাকে বলেছেন আত্রেয়ী মা।"

মদন কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল নির্নিমেষে, উষার আলোয় রূপার রাঙা মুখের দিকে। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে বললে "তোমার কাছে যাবো কেদারনাথ না আমি, দুজনের মধ্যে কে বড় ? কে বেশী প্রিয় বলতো রূপা ?"

চকিত হয়ে জিভ কেটে রূপা দুহাতে মুখ ঢাকল। তারপর অতিকষ্টে বললে, "ছিঃ ছিঃ ওকথা বলতে নেই। তিনি হলেন দেবতা, আর তুমি আমার—" আর বলতে পারল না রূপা, রুদ্ধ আবেগে ওর কণ্ঠরোধ হলো। মদনের কোলে মুখ লুকিয়ে সে আত্মসংবরণ করল।

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে মদন বললে, "শোনো রূপা, আমি আগে যাই। তোমার ব্রহ্মকমল ফুল খুঁজে নিয়ে আসি। তারপর তোমায় কেদারনাথে নিয়ে যাবো। বেশী দূরের পথে আমি যাবনা। হিমালয়ের পথ কত যে কষ্টকর তাতো তুমি জানো না ? আর ব্রহ্মকমল ফুল কোন্ বনে ফোটে তাও তুমি জানো না। কাজেই আন্দাজে বন-জঙ্গলে কোথায় তুমি ঘুরবে ? তারচেয়ে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি আশ্রমের কাজ ঠিকমত কোরো। দেখো ঠাকুরদের যেন ফুলের জন্য কোন অসুবিধা না হয়।

রূপা তখন শান্ত হয়েছে। সে বললে, "আশ্রমের কাজ আমি ঠিকমতো করবো। তারজন্য তুমি মোটেই ভেবো না। কিন্তু আমার ভাবনা হচ্ছে ব্রহ্মকমল ফুল তোমায় চিনিয়ে দেবে কে ? হিমালয়ে ত কত ফুল আছে ?"

মদন বললে, "যিনি চেনাবার তিনিই চিনিয়ে দেবেন—"

রূপার চোখে ফুটে উঠল পরম নির্ভরতার ছায়া। প্রণয় মনে নিড়েনি হাতে নিয়ে মদন গিয়ে দাঁড়াল তার গোলাপ লতাকুঞ্জে।

মদন চলে গেছে। একা একা রূপার দিন যেন আর কাটে না। দিনের বেশীর ভাগ সময় সে আশ্রম ঘটে, আর পুষ্পবালকে কাজ করে অতিবাহিত করে। কিন্তু নিশুতি রাত্রি বেলাটা অসহ্য হয়ে ওঠে ওর। গৃহবিগ্রহ সেবা, নামজপ, সাংসারিক কাজকর্ম সেরেও অর্ধেক রাত্রি বাকি থাকে তার নিঃসঙ্গতাকে বহন করে। তখন শুধু মদনের চিন্তা, তার কুশল প্রশ্ন ও প্রত্যাবর্তনের জন্য ওর মন হয়ে ওঠে অস্থির। সেই নিদ্রাহীন রাত্রির অবসান ঘটে অশ্রুজলের অজস্রতায়। এমন এক অশ্রুব্যাকুল বর্ষণবিহ্বল দিনে রূপা নিজের মধ্যে খুঁজে পেল তার আসন্ন মাতৃত্বের সম্ভাবনা। বহু প্রার্থিত, বহু আকাঙ্ক্ষিত এ আনন্দ রূপা রাখে কোথায় ? ভাগ দেবে কাকে, মদন কোথায় ? কতদূরে ? কবে সে আসবে ? আরও তীব্রসাধন হয় রূপার ব্যাকুলতা। নীলগঙ্গার নীলাভ জলধারা গৈরিক প্লাবনে দুকূলপ্লাবী হয় ; তার তীরস্থ চরভূমির

বালুবেলায় পুষ্প সম্ভাবনায় সৌন্দর্যময়ী হয়ে ওঠে কাশবন। বাতাসের অঞ্জলিতে সে ভরে দেয় আপন চিত্তদল। মেঘমহলের সপ্তরঙ্গা রামধনু বাসর চিত্রময় হয়ে ওঠে তার নৌকীন আলপনায়; শিবালিক পর্বতমালার আরণ্যবীথি মঞ্জরিত হয়ে ওঠে নবতৃণোল্লাসে; রজনীর শেষ প্রহরে তার নয়নীয় দলগুলি ঘুরে পড়ে আকাশের হিমবর্ষণে। পার্বতী স্থলকমলের প্রস্ফুটনে আরক্তিম হয়ে ওঠে উষাকুনিধার রূপবৈভব। শারদাগমের সূচনায় প্রকৃতি প্রসন্না, শুচিস্মিতা। এমন দিনে নীলগঙ্গার তীরে তীরে মদনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো রূপা বনকপোতের মত অবাধ আনন্দে। আজও রূপা যায় গঙ্গার তীরে। কিন্তু সে আর বনহরিণীর মত ঘুরে বেড়ায় না আলোকলতার কুঞ্জে। শাল কিংবা পিয়াল তরুর নীচে কোমল তৃণাসনে সে বিষণ্ণ মনে বসে থাকে নিশ্চল প্রতিমার মত। নির্জন কোনও দ্বিপ্রহরে দূরে বেণুকুঞ্জে বাতাসের মর্মরানিতে সে সহসা সচকিত হয়ে ওঠে বংশীধ্বনি ভ্রমে। কুটীরের সেই অবহেলিত বাঁশীখানি বুঝি সুরময় হয়ে উঠেছে তার হাতে, ওই বুঝি সে আসছে; পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে নীলগঙ্গার তীরে। তার পদশব্দে ভীত হয়ে পালিয়ে গেল দুটা কাঠবিড়ালী বৃক্ষশাখান্তরালে। কিন্তু কই, সে আসেনা ত? দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় রূপার ক্লান্ত প্রতীক্ষা। অশ্রুসাচ্ছন্ন চোখে সে তাকিয়ে থাকে পথের দিকে মদনের প্রত্যাশায়। কিন্তু কোথায় মদন? কতদূরে সে?

এমনি ভাবেই বহু পরিক্রমার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয় দিবাশর্বরীর দৈনন্দিন অভিযান। জীব-জগতের আয়ুপুষ্প থেকে একে একে খসে পড়ে শুষ্ক দল। আবার অপর প্রান্তে সজীব বৃন্তে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে নতুন কুসুম কোরক। সৃষ্টিসংহারের এই লীলাবৈচিত্র্যের মধ্যে, অতঃপর চৈত্রের এক বাসন্তী সন্ধ্যায় রূপার কোলে এল একগুচ্ছ স্বর্ণচম্পার মত সুন্দর একটী শিশু। দীর্ঘদিন সঞ্জাত এক মনোবাসনা পূর্ণ হোলো রূপার। কিন্তু সে পূর্ণতার মাঝেও একটা প্রকাণ্ড অভাববাধা নিয়ে জেগে রইল মদনের স্মৃতি। ছেলেকে কোলে নিয়ে রূপার মন ধীরে ধীরে ভরে উঠতে লাগল। আশ্চর্য, সেই ছোট্ট একটা চাসিকান্নার মায়া-যাদু মাখা সম্পত্তির মধ্যে ধীরে ধীরে কোন্ অতলে যেন তলিয়ে যেতে লাগল মদন। রূপার চেতনার অজ্ঞাতে সে বিস্মৃতি পক্ষ বিস্তার করে চলে তার মনো-আকাশে। যে আকাশ এখন উদয়াস্ত রঙীন হয়ে থাকে তার ছেলের সুখ স্বপ্নজালে। তবে আশ্রমের পুষ্পমালা ও অন্যান্য ফুল যোগান দেবার জন্য তার অঙ্গনের গোলাপকুঞ্জে গেলেই ওর মনের মধ্যে কেমন যেন ব্যথা টনটন করে ওঠে। দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে ওঠে মদনের বিরহ যন্ত্রণা। তারই অন্তরে লতাবিতানে ঝরে পড়ে থাকে মুঠো-মুঠো গোলাপকলি। চূত পেলবের মধুপর্কে গুন গুন করে ঘুরে বেড়ায় মৌমাছি আর প্রজাপতি। বিরূপা রূপা বাঁটা হাতে ছুটে যায় তাদের দিকে দূর দূর করে। বারান্দায় হামা দিয়ে খেলা করে ছোট্ট শিশু। ধাবিত রঙীন প্রজাপতির দিকে চেয়ে সে প্রলাপ গুঞ্জন করে। সন্ত্রস্তা রূপা ছুটে এসে তাকে বুকে তুলে নেয়।

এমনি সময়ে নীলগঙ্গার অপর প্রান্তে, হিমালয়ের দুর্গম আরণ্যপথে, একা একা চলেছিল মদন। অনাহারে, পথশ্রমে, তার দেহ জীর্ণ কঙ্কালসার। মনে দারুণ দুর্ভাবনা। দীর্ঘ দিন ধরে সে হিমালয়ের পথে পথে খুঁজে বেড়াচ্ছে ব্রহ্মকমল ফুল। কিন্তু সে ফুলের সন্ধান সে আজও পেলনা। সমস্ত বনপ্রকৃতিভরে ফুটে রয়েছে অজস্র পুষ্পসম্ভার। কিন্তু এর মধ্যে সে ফুল নেই। কোথায় যে পাওয়া যায় তাও এ অঞ্চলের কেউ বলতে পারে না। কেউ কেউ বলে, "আরও উত্তরে যাও, সেখানে হয়ত থাকতে পারে"—কিন্তু মদন ত আর পারে না। রূপার স্বপ্ন কি তার সঙ্গে প্রতারণা করছে? আলেয়ার পিছনে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে?

রূপার কথা মনে হলেই ওর বুকের মধ্যে কেমন যেন করে ওঠে। মনে হয় সে যেন ওর কেউ নয়। ওর কেউ নেই, কিছু নেই; ঘরছাড়া ছন্নছাড়া ও এক পাগল পথিক। শ্রান্ত অবসন্ন মদন মন্দাকিনীর তীরে একটী পাথরের উপর বসে পড়ে। দুরন্ত হিমেল বাতাসে, দারুণ শীতে তার সর্বাঙ্গ ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। পিপাসায় কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ হয়েছে। হাতের কাছেই মন্দাকিনীর অমৃতধারা। কিন্তু তখন ওর এক পা চলার মতও আর শক্তি ছিল না। সেই ভরা মধ্যাহ্ন বেলায় ওর চোখের সামনে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসতে লাগল ঘোর অমারাত্রি। পুঞ্জিত একটী বনকরবীতরুর নীচে কঠিন পাষাণ শিলার উপরে মূর্ছিত হয়ে পড়ে রইল মদন।

সময়ের স্রোত বয়ে চলেছে প্রচণ্ড গতিতে। এক সময় যখন মদনের সম্বিত ফিরে এল, তখন সে দেখল পার্বত্য দিগন্ত ভরে ঝলমল করছে চাঁদের আলো। সে উঠে জলে নেমে অঞ্জলি ভরে পান করল মন্দাকিনীর হিমশীতল জল। শরীর একটু সুস্থ হলে ও ভাবল, ব্রহ্মকমল পুষ্পের সন্ধান করা এই বেশ। আর নয়। এবার ঘরে ফেরা। এই চাঁদের আলোয় ও যাত্রা করবে নিজের গ্রামের পথে। যেখানে আছে সেই ছায়ায় ঘেরা ভরা একখানি কুটীর; আর সেই কুটীরে আছে তার রূপা।

চাঁদের আলোয় এক পার্বত্যপথে মদন সুরু করল তার ঘরে ফেরার যাত্রা। এ পথ ক্রমশঃ চালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। কিন্তু অদ্ভুত ঠাণ্ডা এ পথে। রুক্ষতাও বিশেষ কিছু নেই। এই পথে কি এসেছিল মদন? একটু পরেই সুরু হোল তুষারঝঞ্ঝা। প্রান্তর, গিরিশিখর ভরে শুধু জমাট বেধে রয়েছে বরফ আর বরফ। হিমস্তূহীন বাতাস তীরের মত এসে বিঁধছে সর্বাঙ্গে। প্রচণ্ড শীতে কাঁপছে সমস্ত শরীর। হাত পা যেন অবশ হয়ে আসছে। আর চলতে পারল না মদন। ধীরে ধীরে তার পা দুটী তুষার গর্ভে লীন হয়ে যেতে লাগল। সেই হিমগহ্বর থেকে কে যেন তাকে সবলে আকর্ষণ করছে। মদনও প্রাণপণে যুদ্ধ করছে সেই মৃত্যু গহ্বরের সঙ্গে। কিন্তু একসময় শ্রান্ত সৈনিকের মত অবসন্ন হয়ে পড়ে গেল সে সেই তুষার স্তূপের মধ্যে। একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে বয়ে গেল তার দেহের উপর দিয়ে।

কয়েকজন দক্ষিণী সন্ন্যাসী বদ্রীনাথ দর্শনান্তে এসেছিলেন হিমকুণ্ডতীর্থে। অতি প্রত্যুষ বেলায় প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁদের মধ্যে একজন সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন "ব্রহ্মকমল, ব্রহ্মকমল, শিব, শিব, শিব"—

যাত্রীদের যাত্রা স্থগিত হোল। তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন, সেই গিরি প্রান্তর পুঞ্জীভূত তুষারস্তূপের মধ্যে ফুটে রয়েছে শ্বেতপদ্মের মত অপূর্ব সুন্দর, মধুসৌরভী রাশি রাশি ফুল। তার নয়নীয় বৃন্তের শ্যামলিমায় কোরকের স্বপ্নমায়া যেন জমাট বেঁধে রয়েছে। আর অদ্ভুত মমতামেদুর তার নির্যাস। কেমন যেন একটা স্মৃতি সৌরভময়। কি যেন মনে পড়িয়ে দেয়। কি যেন কথা বলে অস্পষ্টভাবে মনে মনে। আশ্চর্য আবেশবিহ্বল তার সুগন্ধ। সেই স্মৃতিবিভোর সুগন্ধে সমস্ত গিরিঅরণ্য যেন সচকিত হয়ে উঠেছে। অপর একজন সন্ন্যাসী বললেন, এই ফুলই নন্দনের ব্রহ্মকমল ফুল। তিনি শুনেছেন ব্রহ্মকমলের নির্যাস এই রকমই অনুভূতিমধুর জীবনময়। তার কেশরদল এই রকমই স্বর্গীয়তাত্ত। তবে সেই স্বর্গজাত মর্ত্যভূমে প্রস্ফুটিত হোল কার বরে! ইতিপূর্বে এই পুষ্প ত কোথাও দৃষ্ট হয় নি? তবে শতকল্প তাঁদের আগমন কালেও ত ছিল না এখানে এই ব্রহ্মকমল পুষ্পবিতান? একি আশ্চর্য, অদ্ভুত লীলা? এই কঠিন বরফস্তূপের মধ্যে রাতারাতি কোন্ যাদুমন্ত্রে, কে জোটালো এই নন্দনের অনিন্দ্য পুষ্পদল?

আরক্তিম সূর্যালোর পানে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে আবার বিস্ফারিত নয়নেত্রে সেই তুষার পুষ্পের পানে চেয়ে সতীরা জয়ধ্বনি দিলেন বজ্রীবিশাল মহারাজের। এমন সময় হঠাৎ একজন বললেন, "গতকাল হিমকুণ্ডের পথে যে যাত্রীটীকে দেখেছিলাম তাকে ত দেখা যাচ্ছে না? সেকি এখনও এসে পৌঁছায়নি?" সকলে উদ্বিগ্ন হলেন, তাইতো সে গেল কোথায়! এই বরফের মধ্যে পড়ে প্রাণ হারালো না তো? সন্ন্যাসীরা সেই যাত্রীর অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে একসময় দেখলেন, সে হুষ্কেনিনিত, হিমতুষীন তুষার স্তূপের মধ্যে স্পষ্ট আঁকা রয়েছে কার পদচিহ্ন। সে চিহ্ন চলে গেছে আরও দূরে তুষারপ্রপাতের মধ্যে। তাঁরা চতুর্দিকে আরও অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু কোথায় কোন যাত্রী নেই। এই মহাতুষারতীর্থে মনুষ্যের স্থায়ী অস্তিত্ব কোথায়? সতীরা এখানে আসেন প্রত্যাবর্তনের প্রণাম নিয়ে। সেই পদচিহ্নের দিকে তাকিয়ে মহা আতঙ্কায় তাঁরা ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর পরস্পর পরস্পরের দিকে বাধিত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার যাত্রা সুরু করলেন। পিছনে পড়ে রইল সেই আশ্চর্য ব্রহ্মকমল কুঞ্জ। সেই পুষ্পদলের আবেশবিহ্বল সুগন্ধ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের মনও ভারাক্রান্ত করে তুলতে লাগল। বহুদূর পথ অতিক্রম করেও তাঁদের মনে হতে লাগল কি যেন এক মহাসম্পদ তাঁরা ফেলে এসেছেন হিমকুণ্ডের ওই তুষারস্তূপের মধ্যে। তার নবস্ফুট পুষ্পগুচ্ছের পীতাভ কেশরে জমাট বেঁধে রইল যেন একটা অব্যক্ত বেদনার্দ্র স্মৃতি গন্ধ।

ঠিক সেইদিনই সতীর রাত্রিকালে রূপা এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল। উত্তুঙ্গ এক গিরিচূড়ায় একটি মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে মন। হাতে তার শঙ্খশুভ্র প্রস্ফুটিত পুষ্প। এমন সুন্দর ফুল রূপা কখনও দেখেনি। সেই ফুলরাজির দিকে তাকিয়ে মদন এক অদ্ভুত হাসি হাসছে। সতীর উত্তেজনায় ঘুম ভেঙে গেল রূপার। কিন্তু একি তার ছেলে এ সময় এমন করিয়ে কাঁদছে কেন? ভয় পেয়ে রূপা উঠে গিয়ে আলো জ্বালাতেই দেখল একটী বিষধর কালনাগিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গোলাপকুঞ্জের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। রূপার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী যেন দুলে উঠল। উন্মাদিনীর মত সে ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে দেখল কালনাগিনী তার ছেলেকে নাভিতে দংশন করেছে। জ্ঞানশূন্যা হয়ে সে বিষে নীল হয়ে যাওয়া ছেলেকে বুকে নিয়ে আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হোল। একজন সন্ন্যাসী তখন ধ্যানস্থ ছিলেন। রূপার আর্তনাদে তিনি ধ্যানাসন ছেড়ে এসে মৃতপ্রায় ছেলেটির শুশ্রূষায় মন দিলেন। অনেক চেষ্টা করলেন তিনি কিন্তু ছেলেটীকে আর বাঁচানো গেল না। সূর্যোদয়ের আগেই রূপার ছেলে মায়ের কোলে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ল। আশ্চর্য, রূপার সে স্বাভাবোক্তি অকস্মাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেল। ছেলে কোলে নিয়ে সে পাষাণের মত স্থির হয়ে বসে রইল। তারপর একসময় আশ্রম থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে নীল গঙ্গার তীর ধরে উত্তরাপথের দিকে কোথায় যেন চলে গেল। বশিষ্ঠাশ্রমের সন্ন্যাসীরা প্রাতঃসন্ধ্যায় পুষ্পডালি হাতে তাকে আর আশ্রমপ্রাঙ্গনে দেখতে পেলেন না। নীলগঙ্গার জলে হিল্লোলিত হয়ে উঠল না আর তার অপরূপ রূপমাধুরী। নীলগঙ্গার এ প্রান্তে মদন মালাকরের পুষ্পমালকে বেষ্টিত নিভৃত আনন্দ নীড়খানি আকস্মিক এক মত্ত বন্যায় ভেসে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। ওদিকে নীলগঙ্গার অপর প্রান্তে হিমালয়ের তুষারতীর্থে জন্ম নিল আর এক পুষ্পমালক। এখনও শ্রাবণ মাসে তুষরিতীর্থ কেদার নাথে মহাদেবের পূজার্চনা হয়ে থাকে হিমকুণ্ডের সেই তুষারজাত ব্রহ্মকমল ফুলে।

ঋণপ্রভা ভাদুড়ী

চলতি দুনিয়া

ইন্‌স্যুরেন্স কোম্পানীকে ফাঁকি দেবার কত যে ফন্দি-ফিকির আবিষ্কৃত হয়েছে ও প্রতিদিন নব নব উদ্ভাবনীকৌশলের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। সম্প্রতি বিলাতের কোন বড় ইন্‌স্যুরেন্স কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়ে টাকা আদায়ের এক অভিনব ঘটনার কথা জানা গেছে। রবার্ট স্পিয়ার্স খুব মোটা টাকার জীবনবীমা করেন। তিনি ছিলেন একজন নামজাদা এয়ারোপ্লেন চালক। কিন্তু তার মস্তিষ্কে এমন এক উদ্ভট ফন্দি এল যার ফলে তিনি তার এয়ারোপ্লেনের মধ্যে একটি ঘড়ি বোমা (time bomb) রেখে তাঁর এক বিশিষ্ট বন্ধুকে কোন কিছু না জানিয়ে তাকে সেটি চালিয়ে নিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। বাইরের লোক জানল রবার্ট স্পিয়ার্সই এয়ারোপ্লেনটি চালিয়ে নিয়ে গেলেন, কিন্তু আকাশে কিছুদূর উঠেই দারুণ বিস্ফোরণে এয়ারোপ্লেনটি ধ্বংস হোল ও সেই বন্ধুটি পুড়ে মারা গেল। ইনস্যুরেন্স কোম্পানী তখন রবার্ট স্পিয়ার্সের স্ত্রীকে জীবনবীমার সবটাকা ধরে দিলেন। কিন্তু মানুষের দুর্বলতা আছে ত; রবার্ট একদিন গোপনে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসে, কেমন করে ধরা পড়ে গেলেন পুলিশের হাতে: এই আশ্চর্য লোমহর্ষক ঘটনায় এখন সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। মানুষ যে অর্থের লোভে কি ভয়ানক কাণ্ড করতে পারে, কতটা অবনতি ও পাপের পথে নেমে যেতে পারে, এই ঘটনাই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। —ডেলি মিরর্

• • • • •

অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস এখনকার বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের মন থেকে ক্রমে বিলুপ্ত হচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যাতে পাশ্চাত্য জগৎ তোলপাড় হচ্ছে। ফ্রান্সের Lourdes নামক স্থানে এক কৃষক বালিকা একটি গুহার মধ্যে হঠাৎ এক ছায়ামূর্তি দেখতে পায়। সে মূর্তিটি যেন Virgin Mary-র অবিকল প্রতিচ্ছবি। বালিকা ছুটে গিয়ে সারা গ্রামের লোক ডেকে আনে ও সকলেই সে অন্ধকারে গুহার মধ্যে সেই দৃশ্যই দেখতে পায়। Her visions caused consternation in her village, the church and throughout France.।" এমন কি খবরটা Pope-এর কানেও পৌঁছায় ("right up to the Pope") তিনিও এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ করেন ও শেষে অত্যন্ত বিস্মিত হন। এরূপ ঘটনায় খ্রীষ্টীয় ধর্মজগতে একটা ব্যাপক সাড়া পড়ে গেছে। —উওম্যানস্ ডে

• • • •

খাদ্যতত্ত্ব নিয়ে যে সব বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন তাঁরা আজকাল নারিকেলের মধ্যে সর্বপ্রকার সুখাদ্যের সমন্বয় দেখতে পাচ্ছেন। নারিকেলের ভিতরে মানুষের পুষ্টিকর ভিটামিন, চর্বিজাতীয় জিনিষ ও হজমশক্তিবর্দ্ধক রসের সন্ধান পেয়েছেন। এই নিয়ে জগতে একটা সাড়া পড়ে গেছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে Hainan দ্বীপের নারিকেলই নাকি বহুপ্রকার ভিটামিন পুষ্ট ফল। সেখানকার অধিবাসীরা ঐ ফল খেতে খুব ভালবাসে,, আর তার ফলে তাদের স্বাস্থ্যও খুব ভাল থাকে, কোন রকম রোগে ভোগে না তারা। আর সে দ্বীপে এক একটা গাছে নারিকেলও কি কম হয়? কোন কোন গাছে ২০০ নারিকেলের চেয়েও বেশী পাওয়া যায় ("Some trees grow more than 200 coconuts") —চায়না

• • • • •

নর ও নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতর কে, এই প্রশ্ন আজকাল অনেক বৈজ্ঞানিক মনীষীকে চঞ্চল করে তুলেছে। একজন জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মতে "নারীই শ্রেষ্ঠ" (Women are the superior sex. First of all, they live longer and biologically that is the principal test. Secondly, they resist coronary diseases, the main threat to modern man"). এ ছাড়া নারীর শারীরিক কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্য ও অবস্থা বুঝে মানিয়ে চলার শক্তি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী। অনেকক্ষেত্রে অগ্নি কাণ্ড ("fires") এবং বিস্ফোরণ ("explosions") ঘটলে নারীরা যত ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে যেতে পারে, পুরুষেরা তত পারে না। তা' ছাড়া যৌন সম্পর্ক ঘটিত ("Sex-linked") ব্যাপারে নারীরা যতটা সাহস ও কৌশলের পরিচয় দিতে পারে, পুরুষেরা ততটা পারে না। অতি সহজেই নারীরা নিজেকে উত্তেজিত ও সংযত করতে পারে ("Sexual desire is turned on and off"). সবচেয়ে বড় কথা—"a woman's sexual pleasure may be a luxury while a man's is necessary"). এখন বৈজ্ঞানিক জগতে নানাভাবে নর-নারীর মনোবিশ্লেষণ চলছে। —কেমিনা

• • • •

আধুনিক সভ্যজগৎ থেকে দূরে সরে গিয়ে, বর্তমান নগর-জীবনের সমস্ত আরাম, সুযোগ, সুবিধা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখে ক্লারেন্স হার্লে ও তাঁর স্ত্রী এক অরণ্য সমাকুল পর্বতে, প্রকৃতির শোভাময় নিকেতনে আদিম মানুষের মতই বসবাস করতে আরম্ভ করেছেন। দক্ষিণ আমেরিকার সহস্র মাইল-ব্যাপী ভয়াবহ অরণ্যের কথা অনেকেই শুনেছেন; এই দম্পতি নির্জনে সেখানে বাস করবার সমস্ত জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে গেছেন। তাঁরা প্রকৃতির দৃশ্য দেখে এতদূর মুগ্ধ হয়ে গেছেন যে এই অরণ্য-আবাস ছাড়বার ইচ্ছা তাঁদের মোটেই নেই। প্রত্যেক ঋতু-সমাগমে কি বৈচিত্র্য সেখানে! বনবাসে থাকতে থাকতে তাঁরা মনে করেন যেন ঈশ্বরের কাছাকাছি তাঁরা পৌঁছে গেছেন। নাগরিক জীবনের পঙ্কিলতা তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, তাই তাঁরা আজ নির্জন অরণ্যের বাসিন্দা। —লাইফ

• • • •

প্রেমের জন্যে সাম্রাজ্য ত্যাগ করে' রাজা যখন নেমে আসেন সাধারণ স্তরে তখন সে প্রেমের মূল উৎস কোথায়, এ তত্ত্ব নিয়ে এখনও আন্দোলন চলছে। অবশ্য উপলক্ষটা সিংহাসনত্যাগী সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড। এতকাল পরে একথা নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা চলে ডিউক অব উইণ্ডসর্ (ভূতপূর্ব সম্রাট) বলেন,—আমার সামনে ছিল শুধু একটি প্রশ্ন, প্রেম বড় কি সম্রাটের সিংহাসন বড়? অষ্টম এডওয়ার্ড ভালবেসেছিলেন যাকে তিনি কোন রাজপরিবারের মেয়ে নন, তিনি এক বিবাহিতা নারী। কিন্তু প্রেম এতই প্রবল হোল যে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"I choose love. I certainly married because I choose the path of love." এখানে সিংহাসন তাঁর কাছে বড় নয়, বড় ভালবাসা। আজ বহুদিন পরে অষ্টম এডওয়ার্ড (ডিউক অব উইণ্ডসর্) সেই কথাই আবার জগৎকে জানিয়ে দিচ্ছেন। —উওম্যান্স্ ডে

• • • •

লণ্ডনের পুলিশ লণ্ডনের উপকণ্ঠে এমন একটি রাস্তা আবিষ্কার করেছেন যাকে সহজেই বলা চলে "The Street of Scandal". অর্থাৎ "কলঙ্কের গলি"। এই গলিতে কোন পুরুষ বা মেয়ে হঠাৎ ঢুকলে এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটবে, যাতে তার জীবনে কলঙ্ক হবেই হবে। এইসব কুকার্যের জন্য একদল মেয়ে ও একদল ছেলে জোট বেঁধে শিকার ধরবার ফন্দী আঁটে ও শিকার পেলেই তার জীবনে কলঙ্কের ছাপ দিয়ে দেয়। কোন পুরুষ মানুষের সে রাস্তায় বিপদ আরও বেশী, কেন না, সে "likely to be encountered by any lovely woman". আর মেয়েদের পক্ষে এই "Street of Scandal" বিপজ্জনক হলেও, সেখানে "She may yet find lasting happiness which no outsider can hinder or spoil" এই গলিটার উপর পুলিশের প্রখর দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও ছেলে মেয়েরা সেখানে লুকিয়ে যেতে ছাড়ে না।

—ডেলি মিরর্

॥ রাজুর মা ॥

রায়বাড়ির বহু পুরাতন লোক ওই রাজুর মা—কলতলায় বসে বাসন মেজে চলেছে, সামনে পড়ে আছে বিরাট বাসনের স্তূপ, হাজা-ধরা কঠিন হাত দুটো সোড়া কড়াইয়ের উপর দ্রুততালে ওঠানামা করছে আর সমানে মুখে বর্ষণ করে চলেছে বাড়ির প্রত্যেকের জন্য নানা ধরণের বিশেষণ। ওদিকে ঠাকুর তাড়া লাগাচ্ছে কড়া মেজে দেবার জন্যে, মেজো বউ বারান্দা থেকে গলা বাড়িয়ে খোকার বিস্কুক-বাটির তাগিদ দিচ্ছে, বড় বউ কুটনো কুটতে কুটতে দুবার বলেছে কাপড়গুলো বাথরুম থেকে কেচে নিয়ে সকালের রোদে ছাতে মেলে দিতে। সবারই কথার উত্তরে কথার মিষ্টি দিয়ে রাজুর মা বলে চলেছে মুখ বেঁকিয়ে, "তোমাদের রাবণের গুষ্টির জন্যে বিধেতা তো আমাকে দশটা হাত দেয় নি। একে একে এই দুখানা হাত সব সারবে। অত তাড়া দিলে কিছুই হবে না বলে দিচ্ছি। রাজুর মা তোমাদের কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা খাওয়া ঝি নয়। অত মুখ নেড়ো না বলে রাখছি।" যথারীতি আবার চলতে থাকে রাজুর মার বকবকানি।

সত্যিই রাজুর মাকে রায়বাড়ির মানুষগুলো বেশী ঘাটায় না। সবাই জানে, একবার যদি মুখে পানদোক্তা পুরে ও নিজের কুঠুরির মধ্যে ঢোকে, তা'হলে স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণুরও ক্ষমতা নেই সেদিন কোন কাজে ওকে হাত দেওয়ানোর। ও সেদিন উঠবে না, খাবে না, একভাবে পড়ে থেকে পরদিন আবার যথারীতি কাজে যোগ দেবে। সেদিন কাউকে সাধবার সুযোগ দেবে না রাজুর মা। এ হেন খেয়ালী মুখরা ঝিকে লক্ষ করে চলতেই হবে, কারণ সত্যিই রায়বাড়ির বৃহৎ সংসারের কাজ রাজুর মাই পারে সামলাতে। ওর ওই মুখের জন্যে গিন্নীরা জবাব দিতে গিয়ে দেখেছেন, ওর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যে এসেছে সেই নতুন লোক প্রথমত কাজ আর দ্বিতীয়ত মাইনের বহরে চমক খেয়ে পালিয়েছে।

বাড়ির যিনি কর্তা, তিনি অনেক কষ্টে সংসার সামিয়েছেন। ওঁর ধারণা, মিতব্যয়িতাই এর মূল কারণ। অতএব ছেলেদের বাবুয়ানিকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হলেও নিজের হাতে যে খরচগুলো থাকে সেগুলোকে যথাসম্ভব টেনে চলবার চেষ্টা করেন। সেই জন্যেই রাজুর মার পরিবর্তে যে লোক আসে তাকে বেশী দিয়ে ওই পোস্টের রেটটা বরাবরের জন্যে খারাপ করতে চান না। আর সত্যিই ওই টাকায় রাজুর মারই চলতে পারে, যার সাতকুলে কেউ নেই। সেই কবে পঞ্চাশ সালে দেশ থেকে এসে এই বাড়িতে ঢুকেছে, তখন ওর কাছে যেটা সব চেয়ে প্রয়োজনীয় ছিল তা দুটো অন্ন আর একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই।

একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে দুটি ভাতের জন্যে ও শুধু তার মেয়ের পরিচয়ে এসে উঠেছিল এই রায়বাড়ি। সেদিনের শহর কলকাতার রূপ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল চাষার ঘরের জোয়ান বউ। তার অনাহারক্লিষ্ট শরীরটাও শহরের চোখে যে লোভনীয় হতে পারে তা আগে বোঝে নি ও। বুঝলে ও হয়তো আসত না। যে গাঁ ওর একমাত্র সন্তানকে মাটিতে ঠাঁই দিয়েছিল, তারই কোলে জোর করে নিজের দেহটাকে পেতে পড়ে থাকত।

মনের যখন এই অবস্থা, ঠিক সেই সময় পেয়েছিল এই রায়বাড়ির সন্ধান। তখনকার রায়বাড়ির চেহারা ছিল অন্য রকম, আজকের সঙ্গে তার অনেক তফাত। গৃহিণীর ছেলেরা তখন কেউ স্কুলে, কেউ

কলেজে পড়ছে। কর্তা কোন রকমে সংসারটাকে ঠেলে তোলবার চেষ্টায় আছেন। সে সংসারে ছিল না খাবুয়ানি, ছিল না এ-ওর মন রেখে চলবার চেষ্টা। রাজুর মাই ছিল গিন্নীর ডান হাত। সে এই নিরুদ্বেগ আশ্রয়ে একা মন-প্রাণ ঢেলে খাটত, ভুলে রইল তার পেছনে ফেলে-আসা বিভীষিকাময় অতীতকে। আজকের রায়বাড়িতে অনেক ফালতু লোক কাজ করছে—রান্নার বামুন, ছেলেদের আলাদা চাকর। কিন্তু রাজুর মার আগের সামান্য বিশ্রামের সময়টুকুও আজকে বিলুপ্তির পথে যেতে বসেছে। সমানে খাটে, সমানে বকে, তবু সবাই জানে, ওকে ওর মেজাজে রাখলে কাজের পরোয়া করবে না; কিন্তু একবার বিগড়ালে রাজুর মাকে ওঠানো শক্ত।

এ নিয়মে চলে আসছে দীর্ঘ সতেরো বৎসর। চাষার ঘরের মুখরা মানুষ আজ প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়ে আরও খিটখিটে হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি রায়বাড়ির একটি অবহেলিত মানুষ তার নিজের অজান্তেই এই খেয়ালী লোকটাকে অনেকটা হাতে এনেছে। এ নিয়ে সবাই বিস্ময় বোধ করে। রায়বাড়ির সেজো বউ মাধবী আসার পর থেকে রাজুর মাকে একদিনও কেউ পান-দোক্তার পুটলি মুখে নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার অনশন বর্মঘট করে পড়ে থাকতে দেখে নি। তাই বলে কি রাজুর মার সঙ্গে কারও মনান্তর হয় নি? হয়েছে, কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝেছে ওর ফেলে রাখা কাজে মাধবী হাত দিয়েছে, সেই সময়ই এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে, অবাধে গলা ছেড়ে দিয়ে শাসন করেছে মাধবীকে আর খোঁটা দিয়েছে মায়েদের ঠেস দিয়ে—গিন্নীও বাদ পড়েন নি সেই তীক্ষ্ণ বাক্যবাণের হাত থেকে, কেন তাঁর এই পক্ষপাতিত্ব? এই কচি বউটা যদি সবই পারবে তবে তাকে রাখা কী জন্যে? সব লোকগুলোকে ছাড়িয়ে একে দিয়েই তো বেশ চলবে। অগত্যা সরে এসেছে মাধবী ওর মুখ বন্ধ রাখবার জন্যে, কিন্তু এর চেয়ে যে সহস্রগুণে ভাল ছিল মাধবীর পক্ষে দু'বেলা বাসন মাজা।

এ সব সূক্ষ্ম অনুভূতি বোঝবার ক্ষমতা রাজুর মার নেই, সে নিশ্চিন্ত। মাধবী কিন্তু আর দাঁড়াতে পারে না শাশুড়ী-জায়েদের সামনে, অপরাধীর মত ঘুরে বেড়ায় আড়ালে আড়ালে সারাদিন।

সত্যিই সে অপরাধী। রায় বাড়ির সেজো ছেলে অজিত তাকে পছন্দ করে নিয়ে এলেও, এ বাড়িতে তাকে ঠাঁই নিতে হয়েছে অনেকটা জোর করেই। অন্য রায়েদের সমান মর্যাদা তার এখনও হয় নি—হবে কি না কেউ জানেও না। অজিতও বুঝেছে, মাধবীকে সসম্মানে বসাতে গেলে তার একান্ত দরকার একটি চাকরির। আজ কদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে চাকরির জন্যে, বাড়ির ভিতর কী হচ্ছে না-হচ্ছে সে খোঁজ রাখবার তার অবসর নেই। মাধবীও তাকে জানতে দেয়না। সরীবের মেয়ে মাধবী অজিতের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে সংসারের সব লোকের মন-প্রাণ জুগিয়ে চলবার চেষ্টা করে। এ বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষকে সে চিনে নিয়েছে, পারেনি শুধু চিনতে ওই রাজুর মাকে। এক এক সময় মনে হয়, হয়তো বা রাজুর মার তার প্রতি অব্যক্ত স্নেহ আছে। কিন্তু সে ভুল ভেঙে যায়, যখন ওই মানুষটার ইচ্ছাকৃত অশান্তিতে মাধবীর দৈনন্দিন জীবনটাও ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই তো সেদিন আগের দিন রাত্রিতে ঠাকুরের জ্বর এসেছে শুনে শাশুড়ী মাধবীকে জানিয়ে রেখেছিলেন খুব ভোরে উঠে ডাল-ভাতটা চাপিয়ে দেবার জন্যে। অত ভোরে আর-কারও ঘুম ভাঙে না। তা ছাড়া বড় বউ বেতো মানুষ; মেজো বউয়ের কোলে কচি ছেলে। বাকী থাকে যখন মাধবী, তখন তাকে উঠতে হবে বইকি। উঠেও ছিল মাধবী ঠিক সময়ে যে সময় আর-একটি প্রাণী উঠে উনুনে আঁচ দেবার জন্যে, তার চেয়েও আগে উঠেছিল মাধবী। আর সেই কারণেই সদ্য-স্নান করা চেহারাটা রাজুর মার চোখে পড়তেই শুরু বিস্ফোটের সৃষ্টি।

প্রথমে আরম্ভ হয়েছিল মাধবীকে উপলক্ষ করেই বলা—"কী গো সেজো বউদি, রান্না করতে এলে, না, পুজো করতে এলে? নতুন হিমের সময় শেষ রাত্তিরে চান না করলে তোমার হাতে কেউ খাবে না বলেছে বুঝি! বলি, অসুখ হলে কে দেখবে? যা তোমার প্রতি সবার দরদ সে তো জানি। তখন মরবে এই বুড়ীটাই—ফেলতেও পারব না, সইতেও পারব না। যত জ্বালা তখন রাজুর মা।" মাধবী ধমকে উঠেছিল, বলেছিল, "চুপ কর তো তুমি—এই ভোরে শুধু-শুধু চেঁচিও না।" কে কার কথা শোনে! রাজুর মার গলা আরও দু পর্দা চড়ে গিয়ে বলার দিয়েছিল, "বলি, ভয় করব তোমার ওই বড়লোক জায়েদের, না, তোমাকে, শুনি? উচিত কথা বলব, তার আর চুপ করাকরি কী!" বোধ হয় শেষ রাত্রের আরামের ঘুম অনেকেরই ভেঙে গিয়েছিল। রাজুর মার ওই চুপ করা কথাটির মধ্যে ওদের দুজনের একটা গোপন ব্যাপার অনেকেই ধরে নিয়েছিল।

বড় ভাসুর রান্নাঘরের দুই আসামীকে শুনিয়ে বলেছিলেন, "ওরা যেন আজকে সংসারের কোন কাজে হাত না দেয়।" লজ্জায় অপমানে মাটিতে মিশিয়ে গিয়েছিল মাধবী। ওই রাজুর মার জন্যেই তো তাকে হতে হল অপদস্থ! কী দরকার ছিল ভালবাসা জানাবার!

এমনি ভাবে অবশ্য অশান্তির ছায়া ফেলে ফেলে রাজুর মার সঙ্গে আরও দিন কাটত মাধবীর, যদি না সেদিন বাসনের স্তূপের সামনে রাজুর মার উপস্থিতিতেই শাশুড়ীর প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে না হত। শাশুড়ীর সামনে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে খুঁজে চলেছে একটা মনের মত উত্তর। প্রকৃত সত্য কথা বলতে পারে না, তাতে গঞ্জনা বাড়বে বই কমবে না। তার সঙ্গে যখন বাপের বাড়ির সম্মান জড়িয়ে আছে, তখন মিথ্যার আশ্রয়ই শ্রেয়। কল করে বলে ফেলেছিল কথাটা উঠোনে-বসা মানুষটার তরে। এখনই হয়তো ওর পক্ষ নিয়ে অথবা অপ্রিয় কতকগুলো কথার সৃষ্টি করবে রাজুর মা। "কাল বিকেলে গা ধুতে গিয়ে বাথরুমে ফেলে এসেছিলাম মা, তার পরে আর খুঁজে পাচ্ছি না"—এই কথা কটির মাধ্যমে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিল মাধবী, কিন্তু পেল না। অভাবের ঘরের মেয়ের এই কৈফিয়তটা কারও বিশ্বাসযোগ্য ঠেকল না। আগের দিন মাধবীর ভাইয়ের আগমনের সঙ্গে হারটা নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটা অনেকেই মিলিয়ে নিয়েছিল।

সত্যিই ছোড়দাকে বি. এ. পরীক্ষা দিতেই হবে। তার ফী জমা দেবার শেষ দিন এসে গেছে। যদি হারটা দিয়ে সে ব্যবস্থা হয় তবে তার চেয়ে সুখী আর কে হতে পারে।

আজ কদিন হল একটা চাকরির খোঁজে অজিত কলকাতার বাইরে গেছে। মাধবীর সামনে পড়ে আছে অজিতের একখানা নিরাশায় ভরা চিঠি। সারাটা দিন কানে নানা কথা এসে উঠছে ওই একখানি হারের জন্যে। শাশুড়ী শুনিয়েছেন, "ওই বাথরুমে একমাত্র রাজুর মা কাপড় কাচতে যায়। ও ওই তোমার একগাছি হার ছোঁবেও না। ও আমার কতদিনের লোক। বড় বউমার তারী তারী গয়নাই কতবার চুরিয়ে পেয়ে ফেরত দিয়েছে।"

মাধবীর মনে হয়েছে, বলে ওঠে—তবে আমাকেই যুক্তি যাও না ওই হারের জন্যে। বলতে পারে নি। এই নিস্তব্ধ ঘরে চোখের কান্নাকে আর আটকে রাখতে পারেনি। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মনে হল দরজার কাছ থেকে একটা ছায়া সরে গেল। ভয় পেল মাধবী। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে বারান্দায় এল, যদি তার খোঁজে কেউ এসে থাকে। কিন্তু বাইরে এসে অবাক হয়ে গেল মাধবী। রাজুর মা দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে, চোখ দিয়ে তারও জল গড়াচ্ছে।

দুজনেরই জল গড়াচ্ছে দু কারণে। তারপর এক সময় রাজুর মা মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "তোমাকে দেখে মনে হয় আমার রাজুই আমার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক তার মতই তোমাকে মনে হয়।"

পরদিন যথারীতি রায়বাড়ির সকাল হল। কিন্তু সতেরো বছরের সেই খনখনে আওয়াজের অভাবে বাড়ি নিস্তব্ধ।

প্রথমে এদিক-ওদিক অল্পস্বল্প খোঁজাখুঁজি হল। তারপর সবাই মত পালটে বললে, "এতদিনের বিশ্বাসের ফল শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াল! যদি নিলিই তবে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করলি কেন? বুড়ো বয়েসে ভীমরতি ধরেছিল, নইলে ওই একতরির একটা হারের জন্যে এই কাজ করে!"

শুধু মাধবী নিভৃতে বসে চোখের জলের সঙ্গে মাখা পেতে নিয়েছিল রাজুর মার স্নেহের দান, যাকে কোনদিন ও সত্যের চৌয়ায় মিথ্যে হতে দিতে পারবে না।

শ্রীগোপা গঙ্গোপাধ্যায়

"একটি কবরক্ষেত্রের কথা"

জাপানের রাজধানী টোকিয়োর কাছাকাছি সেই কবরক্ষেত্র—হিগাশি ওজুমি···

এখানে সমস্তই স্তব্ধ, এখানে বিচ্ছেদের মৌন শোক, বিরহের অপার বেদনা·····

শোকার্ত মানুষ আসছে ফুল নিয়ে, কবরের ওপর রেখে অমর আত্মার চির শান্তি কামনা করে চলে যাচ্ছে·····

কবরক্ষেত্র সংলগ্ন মন্দিরে অমের গাম্ভীর্য, সেখানেও মানুষ নৈবেদ্য সাজিয়ে দিচ্ছে দেবতার উদ্দেশ্যে, বারংবার প্রার্থনা জানাচ্ছে ঈশ্বরের কাছে·····

যাদের উদ্দেশ্যে কবরের ওপর এই পুষ্প নিবেদন, মন্দিরের ঈশ্বরের কাছে অর্ঘ অর্পণ তারা কেউ মানুষ নয়, তারা হোল মানুষের অতিপ্রিয় কুকুর, বিড়াল, পাখী। জাপানীরা বিশ্বাস করে ওদেরও আত্মা অমর আর সে আত্মার শান্তির জন্যে চাই মানুষের প্রার্থনা।

॥ বোধন ॥

ভাদ্রের আজ শেষদিন। সংক্রান্তি। পূব বাংলার ঘরে ঘরে আজ 'অরন্ধন' পর্বের সুর লেগে গেছে। আজ আর কারও বাড়িতে উনোন জ্বলবে না। সবাই আজ 'ভাজা-পোড়া' (চিড়ে, মুড়ি, খই ইত্যাদি) খাবে। ভোর হবার সাথে সাথে ঘরে ঘরে কর্মব্যস্ততার লক্ষণ সুস্পষ্ট। গৃহ-লক্ষ্মীরা তাদের ঘর দোর নিকিয়ে, ঝেড়ে, মুছে তক্‌তকে ঝর্‌ঝরে করে তুলেছে। আজ হল বিশ্বকর্মা পূজা। তাই সেঁকরা ও কামারশালা আজ বন্ধ। এ অঞ্চলে কলকারখানা বিশেষ কিছু না থাকায় বিশ্বকর্মা পূজোর ঘুমটা খুব বেশী টের না পাওয়া গেলেও নারীগণ আজ ঢেকীতে পাড় দেবে না। গার্হস্থ্য জীবনে ঢেকীই হল বড় "যন্ত্র" তাই আজ তার বিশ্রাম। মেয়েরা ঢেকীর মাথায় সিঁদুর পুত্তলী এঁকে দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করছে—প্রকারান্তরে বিশ্বকর্মা ঠাকুরের লৌকিক রূপটিই পূজিত হচ্ছে।

কিন্তু উৎসবের আধিক্য দেখা যাচ্ছে পুরুষদের ভিতর। সকাল থেকেই তৈরী হচ্ছে তারা নৌকো বাইচ দিতে যাবার জন্য। যাদের বাইচের নৌকো আছে পুরুত ঠাকুর তাদের বাড়ি এসে 'বাচারী' (বাইচের নৌকো) নৌকোর উপর ফুল ছিটিয়ে মন্ত্র পড়ে নৌকোর গলুইয়ে পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা আর সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল বাইচ্যার দল। তারা যেন সব যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিক, নৌকোয় উঠে বৈঠার টান দিতে যেন তাদের আর তর সইছে না।

এগিয়ে চলেছে সব বাইচের নৌকো। দলে রয়েছে জোয়ান মরদের দল, প্রত্যেকের হাতেই বৈঠে, মাথায় লাল গামছা বাঁধা, তা'ছাড়া প্রত্যেক নৌকোতেই রয়েছে গান বাজনার ব্যবস্থা। বাজনা বলতে দামামা বা টিকারা, কাঁসী আর ঘুঙুর। আর গান? সে ত সকলের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর। প্রায় নৌকোতেই রয়েছে একজন করে সর্দার গাইয়ে। সে সুরু করে গান, সঙ্গে সঙ্গে তান ধরে তার দোহার-বৃন্দ, আর এরই তালে তালে নৌকো ছুটে চলে পবন গতিতে।

আজ থেকে সুরু হল এ অঞ্চলের নৌকো বাইচ; এর জের চলবে লক্ষ্মীপূজোর ভাসান পর্যন্ত। অবশ্য বছরের বড় এবং সেরা বাইচ হ'ল বিজয়া দশমীর দিন। আজ ত কেবল মাত্র প্রস্তাবনা।

তা সুরুতেই সেরা। নৌকোরই বা কত বাহার। এক একখানা নৌকো আশী-নব্বই হাত করে লম্বা—প্রাচীন ছিপ নৌকোর সগোত্র। নৌকোর গলুইতে পিতলের কারুকার্য করা। বড় বড় পিতলের চোখ, পিতলের ময়ূর এবং ধূপতি (ধূনুচি) আঁটা। পাশাপাশি সমসর্দারের নৌকো দেখলেই এক নৌকোর সর্দার গাইয়ে সে নৌকোর বাইচ্যাদের উৎসাহ দেবার জন্য বলে ওঠে :—

"হেই চলে চলে চলে নাও
হেইও—"

কখনও কখনও বলে ওঠে :—

"চল্ চল্ উড়াল দিয়া চল্—"

নৌকো একটা নির্দিষ্ট বাঁক দিয়ে আবার উল্টো পথ ধরলে সর্দার গাইয়ে পুনরায় গান ধরে :—

"সোনার বাঙ্গালী নাও, পিত্তলের ওড়া রে
ও রং-এর ঘোড়া ঘোড়ায় রে।"

চলে নৌকোয় নৌকোয় দৌড় প্রতিযোগিতা। কোন কোন অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীরা যাইছাদের উৎসাহ বর্ধনের জন্য পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করে। এই প্রতিযোগিতায় জয় লাভের জন্য অনেক সময় দু'দলের ভিতর ঢিল পাটকেল ছোড়া ছুড়িও ঘটেই, খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে সকলেরই ঘরে ফিরবার তাড়া লাগে। সর্দার গায়ক এইবার উত্তেজক গানের পরিবর্তে ধরে দুঃখহর শান্ত কোমল গান :—

"ওর মেলো রামের মা তোর গোপাল আইছে ঘরে
ধান দুর্বা বরণ কুলা মেলো ওই গলুয়ার কপালে (কপালে)।"

উলু-উলু-উলু।

যাইছের নৌকো ঘাটে এসে ভিড়ে। বাড়ির গিন্নীবান্নীরা কুলো, জলঘট, প্রদীপসহ এগিয়ে আসে নৌকো বরণ করতে। প্রথমে কুলো ছোঁয়ায় নৌকোর মাথায় তারপর পাটমাঝির (প্রধান মাঝির) কপালে।

কেটে যায় বর্ষা। পরিষ্কার আকাশ। কে বলবে ক'দিন আগে এই আকাশই সর্বদা ঢাকা থাকত মেঘে। সূর্যের সোনালী আলোয় হেসে উঠেছে ধরিত্রী। দিঘি পাড়ে শিউলী বিছিয়ে দিয়েছে তার শ্বেত শুভ্র বসনাঞ্চল সম শত-সহস্র পুষ্পরাজি। গাঙ পাড়ে কাশফুল আর বিলের বুকে শালুক ও পদ্মফুলের মেলা। নদীর জলে টান ধরেছে। গাঙচিলেরা আবার এতদিন পরে চক্রাকারে উড়তে সুরু করেছে ডেগাল ও জেলে ডিঙির উপর দিয়ে। কোপে ঝাড়ে কিচে আর বোয়েল ডাকাডাকি করে জানিয়ে দিচ্ছে, দেবী আসছেন, আর বেশী বাকী নেই।

দেখতে দেখতে চলে যায় মহালয়া। দেবী পক্ষ সুরু হয়। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশের তলে শান্ত নদীবক্ষে মনের আনন্দে বাণিজ্যে বেরিয়েছে সওদাগর ও ব্যাপারীর দল। জল আর জল। যেদিকে দু'চোখ যায় জল ছাড়া যেন আর কিছুই নজরে আসে না। শরতের হিমেল হাওয়ায় ঘুম পাড়িয়ে যেয়। একমনে নৌকো বেয়ে চলেছে কোন নেয়ে মাঝি। মনে খুশীর আমেজ লেগেছে। দুঃখ আছে, দারিদ্র আছে, অভাব-অভিযোগ, আধি-ব্যাধি এ ত নিত্য সাথী, কিন্তু বছরের এইকটি দিন—সে যেন এক অদ্ভুত বস্তু ; নন্দনের পরিবেশ কি এর চাইতেও মধুর ? দুঃখের বোঝায় এতদিন চাপা ছিল মনের যে আনন্দের স্রোত আজ যেন কিসের স্পর্শে খুলে যায় কোথায়ার সেই রুদ্ধ দুয়ার ; নিজের অজান্তেই ধরে বসে সে ভাটিয়ালী গান :—

"এ সহর দরিয়ার মাঝে
বাইয়া যাইওরে মাঝি আমার ভাঙ্গা নাও।
ঘরখানি ভাঙ্গা মন্দ ভাই,
তবে জোর ক্যানে বান্ধ,
ওরে আপনি মরিয়া যাইবা
তবে পরের লাগি ক্যানে কান্দ
বাইয়া যাইওরে মাঝি আমার ভাঙ্গা নাও।"

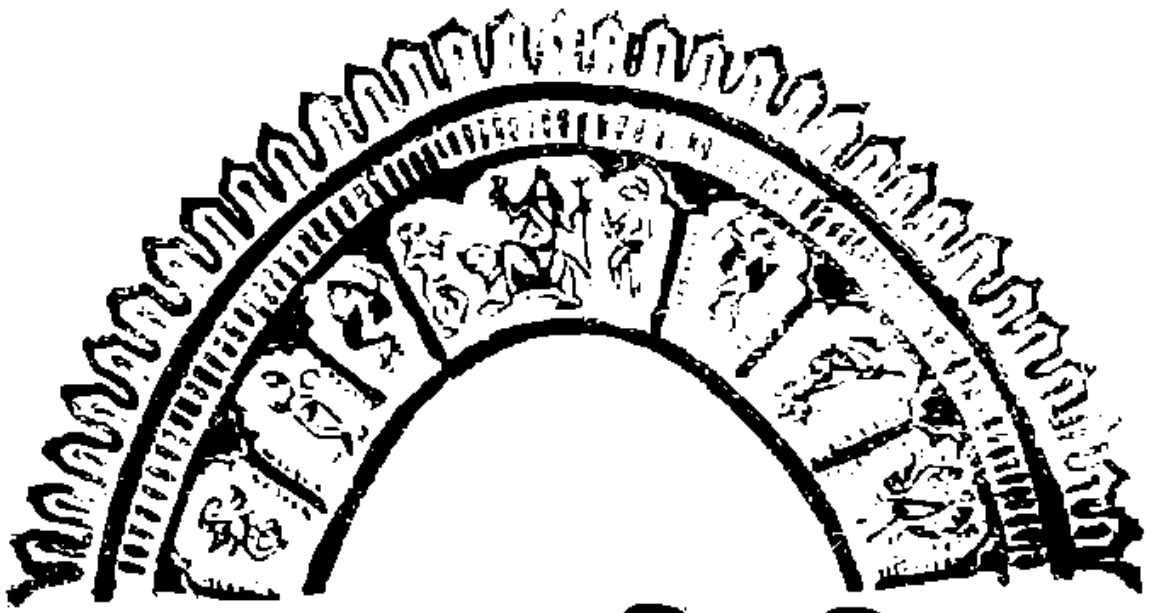

বাংলার চিত্রশিল্প

গান গাইতে গাইতে নেয়ে মাঝি কখন যে ঢুকে পড়েছে তার নিজের গাঁয়ে তা যেন খেয়ালই নেই। পাড় থেকে কে যেন ডেকে ওঠে, কোথাকার নৌকো? কোথায় যাবে? তাবে, হয়ত এই নৌকোয়ই ফিরে আসছে তার প্রবাসী আত্মীয়,—কারও ভাই, কারও ছেলে, কারও বা অন্য কেউ।

পক্ষীর রাত। পূবোমওপে বেজায় ভীড়, ছোকরাদের ভীড়ই বোধ হয় বেশী। কুমোরে রাত জেগে কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে সুরু করেছে প্রতিমা সাজাতে। রং অবশ্য দিনের মধ্যেই শেষ করেছে, এখন বাকী সাজ পরান। কাল ষষ্ঠী, কাজেই যে করেই হ'ক এই রাত্রের মধ্যেই কাজ শেষ করতে হবে।

ঢাকী অবশ্য এখনও এসে পৌছোয়নি। তবে সেজন্য চিন্তার কিছু নেই; ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকী আসবে ঢাক নিয়ে, সঙ্গে আসবে কাঁসীদার, ঢাকের বাজনার সঙ্গে কাঁসী না হলে তান ধরবে কে? অবস্থাপন্ন ঘর হলে এই সঙ্গে সানাইয়েরও বায়না হয়ে থাকে। তবে ঢাক কিন্তু চাইই। শক্তি পূজোয় ঢাকের বাজনা ছাড়া কি চলে?

তবে হাঁা, কর্তব্যজ্ঞান বলতে হয়ত পুরুত ঠাকুর মশাইকে বলুন, মহালয়ার পর থেকেই প্রতিদিন একবার করে এসে পূজোর অনুষ্ঠানে যাতে কোনরকম ত্রুটি না হয় সে বিষয়ে উপদেশ এবং পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। যজমানের মঙ্গল কামনাই ত' তাঁর ধর্ম!

দূরে সীমার ঘাটায় স্টীমারের ভোঁ শোনা যায়। অধীর আগ্রহে সকলেই প্রতীক্ষা করে প্রবাসী আত্মীয়ের। যাদের স্থির আছে আজকেই ফিরবার তাদের বাড়ি থেকে লোক গেছে তাদের নিয়ে আসবার জন্য। ছোটর দল আঙুলের কর গোনা বন্ধ করে এখন ভাবছে কখন সকাল হবে। সুরু হবে বোধনের বাজনা।

এক সময় সত্যি সত্যিই ভোর হয়। দূর গাঁয়ে শোনা যায় ঢাকের প্রভাতী বাজনা। আকাশ বাতাস মুখরিত করে ভেসে আসে উদাসী বাউলের কণ্ঠস্বর:—

"বাবা পাগলা ভোলা ত্রিপুরারী
গৌরী মা এলো বাপের বাড়ি।"

পোঁ-ও-পোঁ-ও-পোঁ-ও

বেজে ওঠে শঙ্খ।

উলুধ্বনি মঙ্গলাচারের সঙ্গে পুরোহিত ঠাকুর দেবীর বোধনের ঘট স্থাপনা করেন দিঘি পাড়ের পুরনো বেলগাছ তলায়।

—চিত্তরঞ্জন দেব

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে ধরণীর বুকে। নেপোলিয়নের ক্লান্ত সৈন্যদল চলেছে আলপ্‌স পর্বতের এক উপত্যকায়। সেখানে বরফ জমে জমে চলার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

কামানের গাড়ীগুলি আর চলতে পারে না, যে ক'জন সৈনিক তাদের টানা টেলছিল, তারা নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও নিরুপায়। শেষে এমন জায়গায় কামানের গাড়ী এসে পৌছল যেখানে আরও লোকের দরকার তাকে ঠেলতে।

কিন্তু সামনের সৈন্যেরা তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। নেপোলিয়ন অবস্থা বুঝলেন, তারপর হঠাৎ ঘোড়া থেকে নেমে নিজেই কামানটেলার কাজে লেগে গেলেন।

শ্রান্ত সৈনিকদের দেহে তখন নূতন শক্তি এলো।

॥ শশীকুমার হেশ ঃ একজন বিস্মৃত বাঙ্গালী চিত্রকর ॥

পলাশীর যুদ্ধের পর (১৭৫৭) বাংলাদেশে এক নূতন যুগের সূচনা হয়,—এই সময়ের পর ইংরাজ বণিক দেশের রাজত্বও ধারণ করিবার অধিকার পাইলেন। সরকারের বড় বড় কার্যে সাহেব নিযুক্ত হইল—এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্র শীঘ্র বিস্তৃত হইতে সুরু হইল। রাইটার্স বিল্‌ডিঙ্গে সামান্য ইংরাজ কেরাণীরাও গোপনে ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে সুরু করিল। কেবল ব্যবসার ক্ষেত্রে নহে; জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে,—শিক্ষকতা, ধর্মপ্রচার, নাট্যশিল্প এবং চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে—ইংরাজ কর্মচারীগণ অর্থ উপার্জ্জনের অনেক সুযোগ পেতে সুরু করেন। কেবল বৃটিশ শিল্পীরা নহে, য়ুরোপের অন্যান্য দেশের শিল্পীরা—এদেশে আসিয়া অর্থ উপার্জ্জনের অনেক সুবিধা পাইয়াছিলেন। এইরূপে য়ুরোপীয় শিল্পীদের হাতে চিত্রিত বড় বড় তৈলচিত্র, জলের রঙের ছবি, এচিং প্রভৃতি এ দেশের মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—এবং অনেক মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করিল। আলো ও ছায়ার নিপুণ ও নিখুঁত রীতিতে চিত্রিত বাস্তবিক (realistic) রীতির চিত্রকলা—এদেশের লোকের আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠেছিল। বিদেশের চিত্রকর যাঁরা এদেশে আসিয়াছিলেন—তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর না হইলেও, তাঁহাদের সাহেব ও বাঙ্গালী বহু পৃষ্ঠপোষক জুটিত এবং তাঁহারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। ইতিমধ্যে কলিকাতায় সরকারী চিত্রবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বিদ্যালয়ে অনেক প্রতিভাশালী ইংরাজ শিল্পী বাঙ্গালীদের য়ুরোপীয় বাস্তবিক রীতিতে চিত্রবিদ্যা শিখাইবার ভার লইলেন। অনেক বাঙ্গালী যুবক সরকারী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া—এই নূতন প্রণালীর চিত্ররীতি শিখিয়া লইল। কিন্তু দেখা গেল যে সরকারী বিদ্যালয়ে চিত্রশিল্পে খুব উচ্চস্তরের শিক্ষার সুযোগ ছিল না। সরকারী বিদ্যালয়ের ইংরাজ শিক্ষকগণ তাঁহাদের কৃতি ছাত্রদের য়ুরোপে যাইয়া চিত্রবিদ্যার উচ্চস্তর শিক্ষা লইবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। কিন্তু য়ুরোপে যাইয়া চিত্রশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া, খুব কম ছাত্রই বিদেশে যাইতে পারিত। বোধ হয় প্রথম বাঙ্গালী চিত্রকর যিনি রূপবিদ্যার উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম রোহিণী কান্ত নাগ। তিনি বিদেশে যাইয়া অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, কখনও বা অনাহারে, দুশ্চিন্তায়, অনিদ্রায়, ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া অকালে মারা যান। এই শোচনীয় ঘটনা স্মরণ করিয়া একজন বাঙ্গালী লেখক লিখিয়াছিলেন—"রোহিণীর এই শোচনীয় অকালমৃত্যুর জন্য কে দায়ী—তাহার আত্মীয়গণ না, দেশের ধনিগণ, না সে নিজে? কাহার ঘোরে তাহার মাতার এই শোক তাহা ঠিক বলা সহজ নহে। বোধ হয় সকলে সমান ভাগ করিয়া নিলে কাহারও আপত্তি থাকিবে না।"

রোহিণী নাগের পর য়ুরোপে চিত্রকলা শিখিতে যান—শশীকুমার হেশ। ময়মনসিংহ জেলার সাজিউড়া গ্রামে, এক অতি দরিদ্র পরিবারে শশীকুমার জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে তিনি চিত্র-অনুরাগী ছিলেন—এবং লিখন বিদ্যায় পারদর্শিতার হেতু তিনি বাঙ্গালা, ইংরাজী, পার্শী ও দেবনাগরী হরফ, ছাপার হরফের মত লিখিতে পারিতেন। দুই বৎসর তিনি গ্রামের এক ইস্কুলে পণ্ডিতের পদে চাকুরী করেন। এই সময়ে তাঁহার চিত্রানুরাগের প্রমাণ পাওয়া যাইত। একখানি ফটোগ্রাফ পাইলে—তিনি তাহা খড়িত করিয়া (এনলার্জ) আঁকিতে পারিতেন। ইহার পর তিনি জেলাবোর্ডের একটি বৃত্তি পাইয়া চিত্রবিদ্যা শিখিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া আর্টস্কুলে ভর্ত্তি হন। কিন্তু কোনও কারণে বোর্ডের বৃত্তি বন্ধ হইলে, তিনি অত্যন্ত

অর্থাভাবে পড়েন এবং বন্ধুদের নিকট অর্থ ধার করিয়া, খোলার ঘরে থাকিয়া আর্টস্কুলে শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন। তাঁহার উৎকট পরিশ্রমের ফলে—তিনি আর্টস্কুলের পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে সরকারী আর্টস্কুল বহুবাজার ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময়ে আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন জবিন্স্ (Jobbins) সাহেব, এবং চিত্রবিদ্যার শিক্ষক ছিলেন—গিলার্ডি সাহেব। শশীকুমারের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া অধ্যক্ষ ও শিক্ষক সাহেবরা তাঁহাকে উচ্চশিক্ষার জন্য ইতালীতে যাইবার পরামর্শ দেন। বিদেশে যাত্রা ও সেখানে থাকিবার খরচের সংগ্রহের জন্য তিনি নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখনকার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ মনমোহন ঘোষ এবং বুক্কাগাছার জমিদার সূর্যাকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর এবং সন্তোষের জমিদারপত্নী জাহ্নবী চৌধুরাণীর এবং তাঁহার পরিবারের কয়েক জনের বৃহৎ আকারের প্রতিমূর্ত্তি (portrait) অঙ্কিত করিয়া ছয় শত টাকা পারিশ্রমিক লাভ করেন।

ঐ টাকার উপর নির্ভর করিয়া তিনি ইতালী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন—এবং অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া অবিলম্বে বোম্বাই সহরে আসিয়া ইতালী যাইবার তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট খরিদ করিয়া বসেন। পরে ইতালীয় রাজদূতের পরিচয়পত্রাদি লইয়া তিনি বোম্বাই হইতে রওনা হন। রাজদূতের পরিচয়পত্রের বলে জাহাজের কাপ্তেন—শশীকুমারকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় থাকিতে দেন। তিনি ইংরাজী বা ইতালীয়ান কোনও ভাষাতেই অধিকারী ছিলেন না। জাহাজেই ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন, এবং এক মাস পরে জাহাজ ইতালীর বন্দরে উপস্থিত হইল,—তখন তিনি মোটামুটি ইংরাজী ভাষায় কথা বলিতে শিখিয়া লইয়াছেন। যখন তিনি রোম সহরে পৌঁছিলেন তখন তাঁহার কাছে মাত্র ১০৲ টাকা ছিল। কিন্তু রোমের রয়াল একাডেমির নিয়ম ছিল—যে, ইতালিয়ান ভাষা না জানিলে কোনও ছাত্রকে ভর্ত্তি করা হয় না। বহু চেষ্টায় তিনি শিক্ষামন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিন মাসের মধ্যে ঐ ভাষা শিখিয়া লইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া—একাডেমিতে ভর্ত্তি হইলেন এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া—এই বিদ্যালয়ে দুই বৎসর চিত্রবিদ্যায় শিক্ষা লাভ করেন।

ইতালীতে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া—তিনি ফ্রান্সের প্যারিস্ সহরে, এবং পরে জার্ম্মানীর মিউনিক্ সহরে কলাবিদ্যার অনুশীলন এবং অনেক চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া—১৩০৬ সালে লণ্ডনে উপস্থিত হন, ১৩০৭ সালে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

প্যারিসে থাকার সময় শশীকুমার মিস্ আতালিয়া ফ্লামো নাম্নী এক ফরাসী মহিলার সহিত পরিচিত হন। এবং ঘনিষ্ট পরিচয়ের পর—পরিণয়ের সূত্রে আবদ্ধ হইবার মনস্থ করেন। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তার ভগবীচন্দ্র বসুর বাড়ীতে অতিথি হন, এবং কুমারী ফ্লামোকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিয়া ২২নং সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকেন। ঐ বাড়ীর একটা ঘরে শশীকুমারের হাতে আঁকা বড় ছবি ছিল, ফ্রান্স থেকে তিনি সে গুলি নিয়ে এসেছিলেন। কিছুদিন পরে হেশ-দম্পতি সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে বাউতলা রোডে এক বাড়ীতে উঠে যান। এখানে তাঁহাদের এক ছেলের জন্ম হয় এবং মুমূর্ষ করিয়া তাহার নামকরণ হইয়াছিল।

কলিকাতা হইতে শশীকুমার পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে যাইয়া বড় বড় ধনী রাজা মহারাজাদের প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহারা বিবাহের কিছু পূর্ব্বে দিনকতক বরোদায় গিয়া বরোদার রাজার ও তাঁহার পরিবারের কয়েক খানা ছবি আঁকিয়াছিলেন।

শশীকুমার দেশে ফিরিবার পর, তাঁহার লিখিত কোনও প্রবন্ধে বলা হইয়াছিল—"(১) এদেশে তিনি কিরূপ প্রতিপত্তি লাভ করেন তাহা দেখিতে অনেকেই উৎসুক আছেন। (২) তিনি সবে ইউরোপে থাকিয়া

চিত্রবিদ্যার বিবিধ প্রণালী শিখিয়া আসিয়াছেন, কার্য্যকালে তাঁহার প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাইতে এখনো বিলম্ব আছে।"

কাহারও কাহারও মতে, দেশের লোকে তাঁহার প্রতিভার পরিচয়ের উপযুক্ত যে উচ্চাঙ্গের কলাকৃতির আশা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হয় নাই।

শশীকুমার প্রতিকৃতি চিত্রণেই বিশেষজ্ঞ হইয়াছিলেন—তেলের রঙে, এবং পেষ্টেলে চিত্রিত তাঁহার হাতের অনেক চিত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে—ডাঃ যতিন্দ্রনাথ মজুমদারের পেষ্টেল চিত্র (যাহা মোহন মেলার প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়) সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং তাঁহার শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

প্রতিকৃতি ছাড়াও, তিনি কিছু কিছু কাল্পনিক পৌরাণিক চিত্র লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু এই বিভাগে তিনি বিশেষ সফলতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। বহুকাল পূর্ব্বে "প্রবাসী"তে তাঁহার অঙ্কিত "কর্ণ-কুন্তী সংবাদ" চিত্রের পেন্‌সিল্ স্কেচের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার অঙ্কিত বিশিষ্ট দেশবাসীদের প্রতিকৃতির মধ্যে—নিম্নে উল্লিখিত প্রতিকৃতি বিশেষ পরিচিত :-শিবনাথ শাস্ত্রী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপাললাল ঠাকুর, সম্ভোষের কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

শশীকুমারের অঙ্কিত বাংলাদেশের ও বাংলার বাহিরে অবস্থিত চিত্রমালার সঠিক অঙ্কিত তালিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক এবং তাহার উৎকৃষ্ট প্রতিলিপি করিয়া ছাপিলে—তাঁহার কলাকৃতির সম্যক আলোচনা ও বিচার করিবার সুযোগ হইতে পারে।

তাঁহার শেষ জীবনের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক ভদ্রলোক জানাইয়াছিলেন যে শশীকুমার চিত্রাঙ্কন ত্যাগ করিয়া, আবার স্বগ্রামে ফিরিয়া যাইয়া গ্রাম্যজীবন যাপন করিতেছেন। সম্ভবতঃ তাঁহার প্রতিভার যথেষ্ট আদর ও পৃষ্ঠপোষকতা হয় নাই এবং তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ ঘটে নাই।

১৯০০ সালে, ২০ শে ফেব্রুয়ারীতে, বরোদা হইতে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে লিখিত শশীকুমারের একখানি পত্র শ্রীমতী অবন্তী দেবী সম্প্রতি শারদীয় যুগান্তরে প্রকাশ করিয়াছেন। এই পত্রের শেষ ভাগে তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমার কাজকর্ম্ম বেশ চলিতেছে। মার্চ্চমাসের শেষ ভাগে সবই শেষ হইবে বলিয়া আশা করি। আমি সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছি। শ্রীচরণের মঙ্গল জানিতে বাসনা করি। নিবেদন ইতি স্নেহাকাঙ্ক্ষী সেবক···শশীকুমার হেশ। প্রাক্তন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ শশীকুমারের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ণাঙ্গজীবনীর উপযুক্ত উপাদান এখনও সংগৃহীত হয় নাই। আধুনিক কালের কোনও যুবক শিল্পী-এই বিষয়ে গবেষণা করিলে শশী কুমারের চিত্রাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা এবং তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনের পরিচয় উদ্ধার করা যাইতে পারে। তাঁহার মত উদ্যমশীল, পরিশ্রমী, একনিষ্ঠ শিল্পীর জীবন হইতে অনেক কিছু শিক্ষণীয় তথ্য লাভ করা যায়। তাঁহার পূর্ণাঙ্গ জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করা আমাদের জাতীয় কর্ত্তব্য। *

অবনীন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়

---

* এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও অবন্তী দেবীর প্রবন্ধ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। এইজন্য তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

॥ কবি সুইনবার্ণ ও 'কলাকৈবল্যবাদ' ॥

'ফ্লর দ্যু মাল' সম্পর্কে যখন নীতি বাগীশেরা রায় দিয়ে ফেলেছেন, কাঁচি চালাতে বাকি রাখেনি ফ্রান্সের সেন্সার, সেই সময় শার্ল বোদলেয়ার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে একখানা চিঠি পেলেন একজন তরুণ ইংরেজ কবির কাছ থেকে। উদ্দীপ্ত ভাষায় অভিনন্দন জানানো হয়েছে 'ফ্লর দ্যু মাল' এর কবিকে। বোদলেয়ার অবশ্য বেশ কিছুদিনের ব্যবধানেই চিঠিখানার উত্তর দিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখলেন একজন ইংরেজ লেখক যে ফরাসী সৌন্দর্যবোধের এমন সহানুভূতি সম্পন্ন সমঝদার হতে পারেন এ তাঁর কল্পনার অতীত ছিলো। যাঁর কাছ থেকে বোদলেয়ার চিঠিখানা পেয়েছিলেন তিনি সুইনবার্ণ, প্রি-রাফায়েলাইট কবিসঙ্ঘের অন্যতম জ্যোতিষ্ক।

ফ্রান্সকে ভালোবাসতেন সুইনবার্ণ। প্রচলিতের বিরুদ্ধে নিজেরই বিদ্রোহের সুর যেন খুঁজে পেয়েছিলেন নতুন ফরাসী সাহিত্যিকদের লেখায়। তাই তিনি ছিলেন তাঁদের অনুরাগী পাঠক। ফরাসী সাহিত্যে এই সময়ে 'কলাকৈবল্যবাদ' বিশেষ প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিলো। সুইনবার্ণের মনে বেশ রেখাপাত করলো এই সাহিত্য-মত। তিনি বললেন, "যদি কোন পাঠক কোনো কবিতা থেকে সত্যি সত্যি আধ্যাত্মিক ঔষধ নিষ্কাশন করে নিতে পারে—যদি নীতির ব্যবস্থাপত্রের মতো সে গিলে খেতে পারে একটি সনেট—তাহলে যে কবি এই সব নীতি-বুদ্ধির জোগান দ্রব্য সরবরাহ করেন তিনি পরিষ্কার ভাবেই একজন বাজে শিল্পী।" বোদলেয়ার যখন বললেন নীতিগত বিষয়ের সঙ্গে কবিতার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই তখন তাঁর বিজ্ঞানের কাণ্ডজ্ঞানের প্রশংসা না করে পারলেন না সুইনবার্ণ।

১৮৬৬ সালে যখন সুইনবার্ণের 'দি পোয়েম্‌স অ্যাণ্ড ব্যালাড্‌স' প্রকাশিত হলো, যেন এক বিস্ফোরণ ঘটলো ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ডে! ব্রিটেনে এই কবিতা-গ্রন্থই সর্বপ্রথম দেখা গেলো সাহিত্যিক প্রতিক্রিয়ন। কলাকৈবল্যবাদের অন্যতম চিত্রী হুইসলারের ছবিতে এই রীতি দেখা দিয়েছিলো ছবি আঁকার একটি ভঙ্গি হিসেবে। দেখার জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একটি চিত্রিত পাত্রের দিকে তাকিয়ে যে আনন্দ হয় তাতে নীতির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সাহিত্যে এই ধারা নিয়ে আসা মনে হলো কষ্টসাধ্য কাজ। এই মহৎ অসুবিধার সামনে দাঁড়াতে হলো কবি হিসেবে সুইনবার্ণকে।

ফরাসী কবিদের কবিতার শক্ত কাঠামোর তিনি প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজের ভাষায় এবং নিজের কবিতায় সেই কাঠামো তৈরী করা ছিলো তাঁর ক্ষমতার বাইরে। ফরাসী কবিদের লেখা শব্দশ্রেণী যেন নদীস্রোতের মতো দ্রুত, প্রখর, আর অবিশ্রান্ত। এই ঝটিকাক্ষুব্ধ বেগবান শব্দস্রোতে ভেসে এসেছিলো অবক্ষয়ের সমস্ত ভাঙা ভালপালা, খড়কুটো। সুইনবার্ণ যেন কেবল মনের তীব্র ইচ্ছাশক্তির জোরেই বোদলেয়ারের তিক্ততা ও বিষাদের রূপান্তর ঘটালেন দুর্ধর্ষ আশায়। তাঁর কবিতা যে শেষ পর্যন্ত

হাস্যকর হওয়ার হাত থেকে রেহাই পেলো সে কেবল তাঁর কবিতার সাধ্যমতো অলংকরণের জন্য। তথাপি কলাকৈবল্যবাদের যে বিদ্রোহের দিক যা সমস্ত নীতির প্রাচীর ভেঙে চুরে দিতে চায়, সেই বিদ্রোহের সুর স্পষ্টই তাঁর কবিতায় ধরা পেলো। তাঁর 'Hymn to Proserpine' কবিতায় যখন কবি বলেন—

'Will thou-yet Take all, Galilean ?
but these thou shalt not take,
The laurel, the palms and the paean,
the breasts of the nymphs in the brake.'

তখন বুঝতে পারি সুইনবার্ণ তাঁর কম্পিত মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলেছেন খ্রীষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে। অভিনেত্রী অ্যাডা মেকেনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'Dolores' কবিতায় তিনি ঊর্ধ্বোত্ত প্রশস্তি করেছেন 'noble and rude and antique'—এর। 'Faustine' কবিতায় যে প্রেমের কথা তিনি লিখলেন, সেই প্রেম 'ক্রুয়া দ্যা মাল'-এর কবিকেও আকৃষ্ট করেছিলো। তাঁরও ছিলো পাপ সম্পর্কে এক রোমান্টিক বোধ। সুইনবার্ণের কবিতার মধ্য দিয়ে এই রোমান্টিক পাপবোধ সর্বপ্রথম ব্রিটেনে এলো বলে যুগপৎ প্রবল অনীহা আর অনুরাগ জাগিয়ে তুললো।

সুইনবার্ণের কবিতার প্রথম ধাক্কা সত্যি সত্যি মারাত্মক ভাবে এসে লাগলো ব্রিটেনে। জনসাধারণের নৈতিক জীবনের পক্ষে 'বিপজ্জনক' বলে সঙ্গে সঙ্গে আখ্যা পেলো কবিতাগুলি। যে যুগে পিয়ানোর পা অনাবৃত রাখাও বিবেচিত হত অশালীন বলে, সে যুগে পাপবোধের উপরে দাঁড়িয়ে কবিতা লেখা নিশ্চয়ই সাংঘাতিক ব্যাপার। নীতিবাগীশেরা তাই ভ্রুকুটি করলেও ব্রিটেনের তরুণ সম্প্রদায় কিন্তু সামাজিক বিপ্লবের অগ্রদূত হিসেবেই বরণ করে নিলো 'পোয়েমস্ অ্যাণ্ড ব্যালাড্স্'-এর আবির্ভাবকে।

অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে

তখন ইংরাজদের সঙ্গে জার্মানদের ভয়ানক যুদ্ধ চলছে। লয়েড্ জর্জ তখন ব্রিটীশ মন্ত্রী। তাঁর একজন বন্ধু এসে লয়েড্ জর্জকে ধরে বসল আমার ছেলেকে একটি চাকরী দিতেই হবে।

—কি চাকরী করবে তোমার ছেলে ?

—যা খুশি আপনার,—বন্ধুটি উত্তর দিলেন।

—এখন যেসব যা অবস্থা, তাতে একটি মাত্র কাজে লাগাতে পারি তোমার ছেলেকে

—কি কাজ ?—বন্ধু আশান্বিত হয়ে বললেন।

—যুদ্ধের সৈনিক।—উত্তর দিলেন লয়েড জর্জ।

রম্যাণি বীক্ষ্য

উৎকল পর্ব

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

ভিখারীটা চাপা পড়েনি। পড়ে গেলে গড়িয়েও সে আত্মরক্ষা করতে পারত। আত্মরক্ষাই তো তার একমাত্র কাজ। সারাজীবন ধরে এই চেষ্টাই সে করেছে। একটা বক্র কুৎসিত পা নিয়ে জন্মেই সে জেনেছিল, যুদ্ধ করবার জন্য সে জন্মেছে। জয়ের জন্য যুদ্ধ নয়, বেঁচে থাকবার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য। সরকার তাকে সাহায্য করবে না, সমাজ করবে না, করবে না তার আত্মীয় পরিজন। যতদিন বাপ মা আছে, ততদিনই তার বিশ্রাম। তারপর জীবনব্যাপী যুদ্ধ।

চাপা পড়লেই বা কী ক্ষতি ছিল, কার ক্ষতি! বরং লাভই হত ঐ ক্লান্ত সৈন্যটির। প্রাণের যে মায়ায় সে ঐ রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত দেহটা কোনক্রমে ধরে রেখেছে, মুহূর্তে সে মায়া ফুরিয়ে যেত। ঘরে সে বেঁচে যেত। তার জ্বালা জুড়োত। যাত্রীরা রক্ষা পেত তার হাত থেকে, মন্দিরের পথে হাত বাড়িয়ে বাধা দিত না, এতবড় মোটর বাসেরও পথ আর আটকাত না। একদিনে মরে যায় না এই হতভাগাগুলো!

অন্যমনস্ক ভাবে আমি আমার পাঞ্জাবীর পকেটে হাত দিয়েছিলুম, সমস্ত পয়সা নিয়েছিলুম মুঠো করে। কিন্তু ছুঁড়ে দিতে পারলুম না। বাসের ড্রাইভার তাকে অকথ্য ভাষায় ভৎর্সনা করছে, নিঃশব্দ দৃষ্টিতে সমস্ত যাত্রী তাকে সমর্থন করছে। একমুঠো পয়সা ছুঁড়ে আমি তাদের ভৎর্সনার প্রতিবাদ করতে পারলুম না। তোমারও বাঁচার অধিকার আছে, একথা বলার সাহস আমার নেই।

জনবহুল পথ অনেকটা অতিক্রম করে কোণারক মন্দিরের সামনের রাস্তায় বাস দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লুম। ওখানের বড় গাছের নিচে বাস আমাদের অপেক্ষা করবে।

রামানন্দ বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বেদনা বোধ হল। তিনি অপমানিত বোধ করেছেন কিনা জানি না, আঘাত যে পেয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। ভদ্রলোকের রঙ ময়লা। চেহারাটাও কিছু শুকনো। কিন্তু দাঁড় কাকের মতো নিশ্চয়ই নয়। হলেও তা মুখের উপরে কেউ বলে না। শুধু সৌজন্য বিরুদ্ধ নয়, বিবেক বিরুদ্ধও বটে। পুরুষের নিন্দে করে মেয়েরা এমন আনন্দ পায় কেন! এ যে অমানুষিক আনন্দ।

রামানন্দ বাবুকে আমি এগোতে দিলুম না, বললুম: একটু দাঁড়িয়ে যান।

মুখ ফিরিয়ে ভদ্রলোক বললেন: থাক থাক।

আমার ওপরে কেন রাগ করছেন?

একবার উত্তর দিলেন না। উত্তর নেই। আমার আচরণে আপত্তি করবার মতো তিনি কিছু পাননি। ওঁর ঘুম ভাঙবার পরে আমি কোন কথাই বলিনি।

খুড়া তার দাদা বৌদির সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। মনে হল, তার বৌদি তাকে বকছেন। বোধহয় সেই মন্তব্য আর হাসির জন্যই বকছেন। পুরো গল্পটা না শোনার ফলে ঐ মন্তব্যটা অভদ্রের মতো শুনিয়েছে। যাদের সঙ্গে পরিচয় নেই ঘনিষ্ঠ, তাদের সঙ্গে পরিহাস কেন! চলতি কথায় একে ছ্যাবলামি বলে। ভারিক্কি হবার বয়স হয়েছে খুড়ার।

রামানন্দ বাবুকে আমি বললুম : আপনার জন্যেই মেয়েটা বকুনি খাচ্ছে।

কেন ?

যে কথা আপনাকে বলেনি, তার উত্তর আপনি কেন দিতে গেলেন ?

আমাকে বলেনি !

গভীর বিস্ময়ে ভদ্রলোক অধৈর্য হলেন।

বললুম : আমরা দাঁড়কাকের গল্প করছিলুম—দাঁড়কাক আর আকাশ কুসুম। ওতা আমাকেই ওকথা বলেছিল।

সহসা ভদ্রলোকের বিশ্বাস হল না। বললেন : আপনার রঙ তো—

রঙের কথা কেন ভাবছেন! যখন 'বামন হয়ে চাঁদে হাত' বলি, তখন কি লম্বা লোককে সে কথা বলিনে !

রামানন্দবাবু খানিকটা প্রসন্ন হলেন, বললেন : তাহলে আমাকে কিছু বলেননি বলছেন !

সে কথা তো অনেকক্ষণ থেকেই বলছি।

ভুবনেশ্বর মন্দিরের শহর। একদা এখানে নাকি সাত হাজার মন্দির ছিল। আজও আছে শ পাঁচেক মন্দির। সবই তেমন পড়েনি, অনেক মন্দির আছে সগৌরবে দাঁড়িয়ে। অনুসন্ধান করলে এই মন্দিরের প্রাচুর্যের একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টের জন্মের তিনশো বছর আগে থেকেই এ অঞ্চলে বৌদ্ধ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জৈন প্রভাবও ছিল। পাঁচ ছ মাইল দূরে উদয় গিরি ও খণ্ড গিরি তার প্রমাণ বহন করছে। প্রমাণ আছে ধৌলিতে—অশোকের শিলালিপিতে। হঠাৎ একদিন এ অঞ্চলের লোক বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চাইল। অষ্টম শতাব্দীর একেবারে শেষে যযাতি হলেন দেশের রাজা। রাতারাতি তিনি দেশের চেহারা বদলে দিলেন। লিঙ্গরাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। পাঁচশো বছর ধরে এই মন্দিরকে ঘিরে নূতন নূতন মন্দির নির্মিত হল। এ শুধু প্রেরণা নয়, এ পাগলামি। প্রেমের মতো ধর্মের নামেও তো মানুষ পাগল হয়।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে আমি অভিভূত হয়ে গেলুম। এমন বিশাল মন্দির বুঝি আমি আগে কখনও দেখিনি। পুরীতে জগন্নাথের মন্দির দেখেছি অন্ধকারে। সে কথা এখন মনে পড়ল না। শ্রীরঙ্গমের গোপুরমের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির ও রামেশ্বরমের গোপুরের কথা। গোপুর তো মন্দির প্রবেশের দ্বার, মন্দির নয়। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের চেয়ে গোপুরের উচ্চতাই বেশি। কিন্তু লিঙ্গরাজের মন্দিরের উচ্চতা দেখেই বিস্মিত হলুম। শুধু উচ্চতা কেন, ছোট ছোট অসংখ্য মন্দিরে সমস্ত প্রাঙ্গন ছেয়ে আছে। গায়ে গায়ে মন্দির, কারুকার্যে কণ্টকিত মন্দির। কাছে যাবার আগে আমি দূর থেকে সেই মন্দিরের শোভা দেখলুম।

রামানন্দ বাবু আজ আমার কাছে ছিলেন। আমার আগ্রহ দেখে বললেন : এই মন্দিরগুলোর একটা নির্দিষ্ট গঠন রীতি আছে। উড়িষ্যার নিজস্ব রীতি। অনেকদিন আগে শ্রীনির্মলকুমার বসুর একখানা বই দেখেছিলুম কোনারকের উপর লেখা। তাতে প্রত্যেকটি অংশের মাপজোখ পর্যন্ত এঁকে দেখানো ছিল। এবারে এখানে আসবার সময় সে বইখানা কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারলুম না।

তাতে দুঃখ কী ! আমরা তো আর মন্দির গড়বনা, মন্দির দেখব। মাপজোখ না জানা থাকলেও মন্দিরের সৌন্দর্য বুঝতে আমাদের কষ্ট হবে না।

রামানন্দ বাবু আমাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করলেন : ঐ যে উঁচু শিখরটা দেখছেন, তার নাম হল বিমান। তারপর জগমোহন, নাটমন্দির, একেবারে এধারে ভোগ মন্দির। এই চারটি অংশ নিয়ে একটি মন্দির সম্পূর্ণ হয়েছে। এই বিমানটি যোলশর সোজা শো ফুটের ওপর হবে। ভিতরে এর সিঁড়ি নিশ্চয়ই আছে।

বললুম : এসব কথা বসে বসে শুনব। তাড়াতাড়ি মন্দির দেখে ছুটো খেয়েও নিতে হবে।

কোথায় যাবেন ?

বাজার তো চারি ধারে, এক আধটা হোটেল কি আর নেই !

রামানন্দ বাবু একথার উত্তর দিলেন না। নিঃশব্দে মন্দিরের কাছে এগিয়ে গেলেন।

যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা পুজো করবেন, বাহিরে তাঁরা ফুল বেলপাতা কিনেছেন। আমাদের মতো মন্দিরের দেওয়াল দেখতে না এসে সোজা ভিতরে চলে গেলেন। মন্দিরের চেয়ে তাঁদের কাছে মন্দিরের দেবতা বড়। পুরাকালে এই বিধিই ছিল। দেশ দেশান্তর থেকে যাত্রী আসত দেবদর্শনে। তাদের জন্য বিরাট প্রাঙ্গন তৈরি হত, বিপুল জলাশয়। স্নানাহ্নিক করে তারা এই প্রাঙ্গনে এসে জমা হত। দেবতা আছেন বাতায়নহীন অন্ধকার গর্ভগৃহে। দিনে রাতে সমান অন্ধকার। মিট মিট করে ঘিএর প্রদীপ জ্বলছে, ধূপে ও ধুনায় বাতাস আসাড় হয়ে গেছে, ফুল ও চন্দনের সুগন্ধে আকুল হয়ে আছে দশ দিক। ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠ করছেন, মন্ত্র পড়াচ্ছেন। গম্ভীর উদাত্তস্বরে গম গম করছে মন্দিরের অভ্যন্তর। যাত্রী জনতা একসঙ্গে এসে কোলাহল করবে না। আসবে একে একে, মাথা নত করে, ফুল চন্দন নৈবেদ্য হাতে, পূজা করবে, যা কিছু দেবার আছে দেবে, মন ভরে নেবে অমূল্য ঐশ্বর্যে, তারপর বেরিয়ে যাবে। এমনি করে সকল যাত্রী দেখবে দেবতাকে। আজ পৃথিবীর রূপ বদলেছে, রীতিও বদলেছে। আজ আমরা দেবতার বদলে দেখি মন্দিরের কারুকার্য। সমাজে যেমন জীবনের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে বাঁচার আয়োজন। ভোগের উপকরণ নিয়ে জীবনকে আমরা ভুলে আছি।

দুজন শিখ ভদ্রলোককে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম। তাঁরা অনেক অধ্যবসায়ে ও প্রচুর পরিশ্রমে মন্দিরের গা বেয়ে উপরে উঠছিলেন। প্রথমটায় আমি এই কষ্ট স্বীকারের কারণ বুঝিনি। পরে নিজের চোখেই সব দেখতে পেলুম। খানিকটা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে তাঁরা ক্যামেরা খুললেন। মন্দির গাত্রের ছবি নেবেন। নিচে দাঁড়িয়ে খুশি আমার আবেশে আচ্ছন্ন হল। মনে হল, স্বপ্ন দেখছি। এতো মন্দির নয়, এ কোন শিল্পীর স্বপ্ন। পাথরে সেই স্বপ্নের রূপ দিয়েছে। অনন্ত কাল স্বপ্ন দেখবে, কিছুতেই আর ঘুম ভাঙবে না।

এক পণ্ডিতের কথা আমার মনে পড়ল। এই মন্দিরের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে যাঁরা এই মন্দির দেখেছেন তাঁরাই জানেন যে শতপৃষ্ঠা লিখেও এই মন্দিরের সৌন্দর্যের বর্ণনা হয় না। কিন্তু যাঁরা দেখেনি, তাদের জন্য তিনি কিছু লেখেননি। ছবি দেখে এইসব মন্দির সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা হয় না। বিমানের যে অংশ দূর থেকে দেখা যায় ; কারুকার্যের বাহুল্য তাতে নেই। পিরামিডের মতো তার দেহ সমতল নয়। গম্বুজের গায়ের মতোও মসৃণ নয়। কতকটা ঢেউ খেলানো, ঢেউ উপর থেকে নিচে। আর তার উপর আঁকি, বুঁকি, ঘন বেড় দেওয়া। দূরে না গেলে মন্দিরের এ অংশ চোখে পড়ে না। নিচে দাঁড়িয়ে যতটুকু দেখা যায়, ততটুকুই অপূর্ব শিল্পমণ্ডিত। মন্দিরের ছবিতে তা পাওয়া যায় না, তার ছবি আলাদা নিতে হয়।

এই সব মন্দিরের স্থাপত্য রীতিতে আমার কোন অধিকার নেই। তবু আমি মনোযোগ দিয়ে দেখছিলুম। মন্দিরের গায়ে সমতল স্থানের যেন একান্তই অভাব। পাশাপাশি থাম উঠেছে। যে থাম গোল নয়, চারকোনাও নয়, মন্দিরের গা থেকে ধাপে ধাপে সামনে এসে পাশে নেমেছে। আবার এগিয়ে এসেছে। অর্থাৎ মন্দির চতুষ্কোন নয়। ষড়কোন আটকোন ও নয়, শত সহস্র কোনে কণ্টকিত। নিচু স্থানগুলোতে আলো পৌঁছচ্ছেনা, কিন্তু শিল্পীর দক্ষ হাত সর্বত্র পৌঁছেছে।

থামগুলিও সমতল নয়। নানা ঢঙের নানা আকারের কারিগরে পূর্ণ। মাঝখানের স্থান গুলিতে মূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। চারিদিকে লতাপাতার সূক্ষ্ম কাজ। মাঝখানে অপূর্ব ভঙ্গিতে নানা মূর্তি। দেবদেবীর সঙ্গে নায়িকা অলসকন্যার মূর্তি আছে। পৌরাণিক প্রাণী আছে, মিথুন মূর্তিও আছে। মূর্তির শেষ নেই। নিচের মূর্তিগুলির চেয়ে উপরের মূর্তিগুলি বুঝি আরও সুন্দর। নিচে থেকে ছবি নেবার অসুবিধার জন্য সর্দারজীরা উপরে উঠেছেন। তাঁদের একজন প্রৌঢ়। পড়ে গেলে যে প্রাণ বিপন্ন হবে, সে কথা এখন তাঁদের মনে নেই।

পাশে হঠাৎ খাতার গলা শুনলুম : এমন মনোযোগ দিয়ে কী দেখছেন ?

কোন প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলুম না। বোধহয় চমকে উঠেছিলুম। তাই লক্ষ্য করে খাতা হাসল। বললুম : যা দেখতে এসেছেন তাই দেখছি।

আপনি বুঝি অন্য কিছু করতে এসেছিলেন ?

আমি কিছু করব না বলে এসেছিলুম।

সে সংকল্প তাহলে রইল না।

মানুষের সংকল্প ভাঙে আর গড়ে, মানুষ বলেই তার দুর্বলতা।

আপনি কি কবিতা লেখেন ?

কেন বলুন তো !

আপনার কথা বার্তায় আমার তাই সন্দেহ হয়।

এই দুর্নাম আপনি প্রথম দিলেন।

একি দুর্নাম ?

যে খাতা লিখে যাই তা কবিতার খাতা নয়। সওদাগরি অফিসের খাতা, কিন্তে বাঁধা কাইল। ওর কোনখানে এক ছত্র কবিতা লিখলে চাকরি যাবে। যে কাজে চাকরি যায় সে তো প্রশংসার কাজ নয়। নিন্দার জিনিষ। আমরা তাকে দুর্নামই বলি।

বাড়িতে লুকিয়ে লিখলেও দুর্নাম ?

যতক্ষণ লুকনো থাকে ততক্ষণই ভাল। প্রকাশ হলেই বিপদের সুরু। যত নাম হবে, বিপদও বাড়বে তত। কর্তারা কোন দোষ না পেয়েও বলবে, ফাঁকি দিচ্ছে।

কেন বলবে ?

তারা যে দেখেনা, সে পারেনা বলে নয়। সময় পায়না বলে। দেখবার যে সময় খায়, সে নিশ্চয়ই ফাঁকি দেয়। এই হল কর্তাদের ধারণা।

আপনার যুক্তি ভাল।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখছিলুম না, ঘুরে ঘুরে দেখছিলুম। অশ্লীল নির্লজ্জ মূর্তি দেখে চকিতে

চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলুম। ঋতাও তাই করেছে। কারও সামনে এইসব মূর্তির দিকে তাকাতে লজ্জা করে। দেখেছি ভাবতেও অনেকের লজ্জা করবে। এখানে কেন অনেক তীর্থ অনেক মন্দিরের গায়ে এই অশ্লীলতার নমুনা আছে। কোনারকের মন্দিরেই তার চরম উৎকর্ষ বলে শুনেছি। অনেক আলোচনাও পড়েছি এই সব মূর্তি নিয়ে। এখানে তা ভাববার সময় পেলুম না। ঋতা বলল : আপনার সঙ্গী কোথায় ?

রামানন্দবাবুর কথা আমি ভুলে গিয়েছিলুম। ভদ্রলোক কথায় কথায় সরে পড়েছিলেন খেয়াল করিনি। বললুম : আপনার খোঁজে গিয়েছিলেন।

সেকি !

আপনি তাঁকে দাঁড়কাক বলেছেন বলে তিনি মর্মাহত হয়েছেন।

তাঁকে কেন বলব !

সে কথা তিনি বিশ্বাস করছেন না।

কেন ?

আমার চেয়ে নাকি তাঁর গায়ের রঙ কালো।

ঋতা খিল খিল করে হেসে উঠল : ভারি বিপদ তো ভদ্রলোককে নিয়ে।

না নিয়ে আরও বিপদ। মনের দুঃখে ভদ্রলোক হয় তো বাসে উঠেই বসে আছেন।

সত্যি !

কথাটা যে মিথ্যে, তা সেই মুহূর্তেই প্রমাণ হয়ে গেল। খানিকটা দূরে এক ব্রাহ্মণ বালকের সঙ্গে ভদ্রলোককে দেখতে পাওয়া গেল। ঋতা বলল : চলুন না, ভদ্রলোক কী করছেন দেখে আসি।

আপনার দাদা বৌদি কোথায় ?

শিবের মাথায় ফুল বেলপাতা দিচ্ছেন।

আপনি দেবেন না ?

আপনি ?

দুজনেই হাসলুম।

রামানন্দবাবু কাছে এসে পড়েছিলেন। বললেন : আপনারা হাসছেন যে ?

আমি বললুম : আপনাকে দেখতে পেয়ে। অনেকক্ষণ থেকে আমরা আপনাকে খুঁজছি।

ভদ্রলোকের চোখে আমি বিহ্বলতা দেখলুম, আমার কথা বিশ্বাস করতে বোধহয় তাঁর কষ্ট হচ্ছিল।

ঋতা বলল : কী করছেন আপনি ?

আমি।

আপনার কথাই তো জিজ্ঞেস করছি।

এর কাছে আমি পুরাণের গল্প শুনছিলুম। ছেলে মানুষ হলে কী হবে, জানে অনেক কথা। শুনবেন ?

ঋতার উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি বললেন : এই স্থানের নাম ছিল একাম্রকানন। অদ্ভুত সুন্দর স্থান। একদিন শিব পার্বতীকে বললেন যে কাশীর চেয়ে একাম্রকানন তাঁর বেশী প্রিয়। পার্বতীর ভারী কৌতূহল হল। তিনি গোপিনীবেশে এই স্থান দেখতে এলেন। তাঁর রূপ দেখে কৃত্তি আর বাস নামে দুই দৈত্য মোহিত হল। এগিয়ে এসে তাঁকে বিয়ে করতে চাইল। পার্বতী বললেন, বেশ, আগে আমাকে কাঁধে চড়াও। দৈত্যদের মহা পুলক। দুজনে মিলে তাঁকে কাঁধে তুলে নিল। আর যায় কোথায়। দেবীর

কারে তারা ছাড়ু হয়ে গেল। কিন্তু পার্বতীর গেল তৃষ্ণা। ততক্ষণে শিব উপস্থিত হয়েছেন। জলের জন্য তিনি যে সরোবর তৈরী করে ছিলেন, তারই নাম বিন্দুসাগর। শিব সমস্ত নদী ও সরোবরকে আহ্বান করে বললেন, এক এক বিন্দু করে জল দাও। সবাই দিল বিন্দু বিন্দু জল। বিন্দু সরোবরে তাই সমস্ত তীর্থের জল, বিন্দু সরোবরে স্নান করে সমস্ত তীর্থের পুণ্য।

এই সরোবর কোথায়?

বালক বলল: খুব কাছে। মন্দির থেকে বেরিয়ে উত্তরের পথ ধরতে হবে। বাজারের ভিতর দিয়ে সেই রাস্তা বিন্দু সরোবরে পৌঁছেছে। পূবপারে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির।

আমাদের সহযাত্রীরা একে একে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। এবারে তাঁরা বাসে গিয়ে উঠবেন। সঙ্গে যাবার আছে সবার, নেই আমাদের দুজনের। আমাদের কোন হোটেলে গিয়ে পাত পাড়তে হবে। তা নাহলে সারাদিন যাবে উপবাসে। বললুম: আমাকে ক্ষমা করবেন।

বলেই আমি মন্দিরের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়লুম। দেবতাকে না দেখে কি ফিরে যাওয়া যায়।

জানিনা আমার কী হল। বেদনার মতো একটা বিচিত্র অনুভূতি আমার সমস্ত চেতনাকে অভিভূত করে দিল। মনে হল, আমার বিষয় বুদ্ধি কোন পবিত্র ধারায় স্নান করে রূপান্তরিত হচ্ছে। অনেকক্ষণ আমি দেবতাকে দেখতে পাইনি। আরও অনেক মন্দিরে আমার এমনি অবস্থা হয়েছে। ভাল করে বোঝবার আগেই আবার চেতনার জগতে ফিরে এসেছি। দেখেছি দেবতাকে।

আজও দেখলুম, শিবের লিঙ্গরাজ নাম সার্থক হয়েছে। এত বড় শিল্পী আমি আগে কখনও দেখিনি। মাটি থেকে এক বিঘৎ উঁচু, কিন্তু ব্যাস হবে পাঁচ হাতের বেশী। কালো গ্রোরাইটের গৌরীপীঠে গ্রানাইট পাথরের লিঙ্গ। কিন্তু এ সবই বাহিরের রূপ। আমার অন্তরে আজ অন্য সুর বাজছে। নত হয়ে আমি দেবতাকে প্রণাম করলুম।

উঠে দাঁড়িয়ে আমি আরও আশ্চর্য হলুম। ভক্তার সঙ্গে রামানন্দবাবুও মন্দিরের ভিতরে এসেছেন। এক সঙ্গে প্রণাম করছেন দেবতাকে। আর সেই ব্রাহ্মণ বালক তাঁকে মন্ত্র পড়াচ্ছেন: ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং—

[ক্রমশঃ

পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে বিপুল রুশ-সৈন্যদলের বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ করতে গেল, নিশ্চিত হেরে যাবে এই ধারণা জগতের সকলের মনে জেগেছিল।

জাপান সম্রাট তাঁর সৈন্যদের ডেকে বললেন,—এই আসন্ন বিপদে আমি অন্তত এমন কয়েকজনি সৈনিক চাই, যারা শুধু প্রাণ দেবে না, তার সঙ্গে নেবে দশজন রুশ সৈন্যের প্রাণ।

একজন সৈন্য এগিয়ে এসে বলল,—হে দেবতার অংশ সম্রাট, দশজনের পরিবর্তে যদি একশ' জন হয়?

সম্রাট, হেসে বললেন,—এবার বোঝা গেছে। পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে আমাদের জয় নিশ্চিত।

॥ আড্ডা ॥

কয়েকদিন ধরে আকাশ কেমন মেঘলা করে কয়েক পশলা বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু সেদিন সকাল থেকে ঝিম ঝিম করে যে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল তার যেন ছেদ নেই বিরতি নেই। নিরন্ধ্র মেঘে আকাশে সীসের রঙ, ঝিম ঝিম বৃষ্টির সঙ্গে এলোমেলো হাওয়া, এমন দিনে সন্ধ্যের পর রাস্তায় বড় একটি কাউকে বেরোতে দেখা যায় না, তবুও সেদিন জেলা শহরটার রায় কোম্পানীর বই এর দোকানটাতে প্রাত্যহিক নৈশ আড্ডাটি নিয়মিত ভাবে সন্ধ্যের মুখে জমতে সুরু করেছে। দোকানের মালিক বিনয় রায়ের বাড়ীর সংলগ্ন এই দোকান, আড্ডাধারদের বেশীর ভাগই বিনয় রায়ের কলেজ জীবনের সহপাঠী বন্ধু। সত্য মুখার্জি স্থানীয় কলেজে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, বৈষ্ণব সাহিত্যের একজন বিশেষ সমঝদার ব্যক্তি বলে এই আড্ডায় তার খ্যাতি আছে। মেঘ মেদুর অম্বর আর ঘুঘুর তরি ঘরি খঞ্জিরার সঙ্গে সমতা রেখে সত্য মুখার্জি শ্রীরাধার বিরহের শ্লোক একটার পর একটা আবৃত্তি করছিল। শ্রোতাদের মধ্যে নরহরি ঘোষ, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের শিক্ষক জয়দেব থেকে ওরই পালটা শ্লোক শোনাবার জন্য সুযোগ খুঁজছিল। এমন সময় কলেজের একটী ছাত্র দোকানে ঢুকে কয়েকটী পাঠ্য পুস্তকের নোট বই চাইল।

'কার নোট বই চান বলুন।'

'সেনের বইটা দিন।

'সেনের নোট বইগুলো সব শেষ হয়ে গেছে। তবে এই সপ্তাহেই পৌঁছবে। আপনি ব্যানার্জির নোট বইটা নিতে পারেন।'

সত্য মুখার্জি আবৃত্তি আগেই বন্ধ করে ছিল, এখন সায় দিয়ে বলল, 'হাঁ, হাঁ ব্যানার্জির বইটা ভাল হয়েছে, ওটা তুমি নিতে পারো।'

সুদর্শন সামন্ত আদালতের পেস্কার একটিপ নস্যি নাকে নিয়ে রুমাল ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'আমার ভাইপোর টিউটর অধ্যাপক ঘোষ তো ব্যানার্জির নোট বইয়ের খুব তারিফ করেন।'

কিন্তু এত করেও কিছু হ'লনা। ছেলেটী বলল, 'তাহলে আমি পরের সপ্তাহেই আসবো, তবে এর মধ্যে যদি অন্য দোকানে পেয়ে যাই তাহলে সেখানেই কিনে নোব।' জলসিক্ত ছাতাটী মেলে ছেলেটি বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল।

সুরেশ্বর সান্যাল বলল, 'ওহে রায়, তোমার একটা বাখান দিতে চাই। ব্যানার্জির নোট বইটা তুমি বের করলে না কেন, বইটা হাতে তুলে দিলে খানিকটা ধাঁটাধাঁটি তো করতো। সেই সুযোগে আমরাও তো দু'একটা কথা বলে ওকে কায়দা করতে পারতাম।'

বিনয় বলল, 'বই না নিয়েছে তো কি হয়েছে। সামান্য একটা নোট বই তো। ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তবে এই কটা দিন বিক্রী বেশায় মন্দা যাচ্ছে।'

দাশু পাল বলল, "বৃষ্টির জন্য লোকই বেরোতে পারছে না, আর বই কিনবে কি।"

"তা হলেও আমরা তো রয়েছি। খোদেরকে যদি কেনাতে না পারলাম তবে হিতৈষী বন্ধু হলাম কেন।' বলল সামন্ত।

নীতিশ সমাদ্দার, নতুন উকিল খবরের কাগজটা বন্ধ করে বলল, "ওহে বিনয়, তোমার জামাইবাবু, মিঃ ঘোষাল এখনও নাবছেন না কেন? ঘড়িতে তো প্রায় আটটা বাজে। ছুটিতে যে কদিন এখানে আছেন সে ক'দিন আমরা তাঁকে নিয়মিত ভাবে আড্ডায় পেতে চাই।"

বিনয় বলল, 'খুব সম্ভব নিলাদ্রি এখন চা খাচ্ছে। আচ্ছা, আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।'

সামন্ত বলল, 'এই দারুন বর্ষায় দিদিভাইকে ছেড়ে ঘোষাল মহাশয়ের এই অভাগাদের আড্ডায় নামতে ইচ্ছে না হওয়াই স্বাভাবিক।'

ঘটাং করে একটা ছাতা বন্ধ হওয়ার শব্দ হোল, এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দোকানে এলেন। ছাতাটী বন্ধ করে একপাশে রেখে বললেন, 'জামাকাপড় সব ভিজে গেল। ইস্ যা আরম্ভ করেছে কবে যে থামবে তা জানি না। ভাল কথা, আমার বইটা কি তা হ'লে এসে গেছে?'

'বলেন কি, অর্ডার দিয়েছেন বই আসবে না। রাম ঐ বইটা দাওতো, 'সেভেন লাম্পস অব উইজডম্।'

দোকানের একমাত্র কর্মচারী রাম বইটা বের করে টেবিলের ওপর রাখল। ভদ্রলোক বইটা আগ্রহে হাতে তুলে নিলেন, পাতা উলটতে উলটতে বললেন, বইটা যে পাবো এমন আশা ছিল না, এখন দেখছি এ বিষয়ে আপনাদের আগ্রহও কম নয়। ঐ রহস্যময় পুরুষ লর্ডের অব এ্যাবেবিয়ার প্রকৃত জীবন সম্বন্ধে হয়তো এতে কিছু আভাষ পাওয়া যাবে।' বইটা তিনি পাতা উলটতে উলটতে দেখতে লাগলেন। 'হাঁ, বইটার দাম কত?'

'দেখুন তো বইটার পেছনের মলাটের ভেতর দিকে দাম লেখা রয়েছে।'

ভদ্রলোক মলাট উলটে দেখলেন, 'এঁ্যা এত দাম! এত দাম দিয়ে তো কিনতে পারবো না।'

'বলেন কি মশাই অর্ডারী জিনিষ, আপনি ছাড়া এটা নেবে কে?'

'কিন্তু বইটার যে এত দাম হ'বে তাতো ধারণা করতেই পারিনি।'

সত্য মুখার্জি চামড়ার সিগার কেস থেকে একটী সিগার বের করে ধরালো। বলল, 'দেখুন, ভাল বই বলে দামটা সাধারণতঃ বেশী হয়। বইটা এমন একটা লোকের লেখা যার জীবনের গতিবিধি সেদিন পর্যন্তও সম্পূর্ণ রহস্যময় ছিল। এমন যে একটা লোক তার লেখা একটা বই-এর চড়া দাম হবে না? বলেন কি মশায়?'

প্রৌঢ় বললেন, 'তা'তো বুঝতেই পারছি, আর টাকাও আমার কাছে আছে। তবে কিনা এই সঙ্গে একটা জরুরী জিনিষ কেনারও দরকার রয়েছে। এই যা গণ্ডগোল। কিন্তু এত দাম, বইটা বোধহয় কিনতে পারবো না।'

সামন্ত মশায় খানিকটা নস্য সশব্দে নাসাগত করলেন। রুমালে নাক ঝেড়ে বললেন, 'দেখুন বইটার যখন অর্ডার দিয়েছেন, বইটা আপনাকে নিতেই হবে। সে আপনার দরকারী জিনিষ কেনা হোক আর নাই হোক। দোকানদার তো খামখা লোকসান দিতে পারে না। ব্যবসা করতে বসে কারুর খামখেয়াল মত বই আনিয়ে ফেলে রেখে দোকানদার লোকসান দিতে পারে না।'

কথার ভাষা ও সুরটা রূঢ় হওয়ায় সাতজোড়া চোখই সামন্তর দিকে তাকাল। কিন্তু সুদর্শন সামন্ত বেপরোয়া ও নির্বিকার। বিনয় রায়, পরিবেশটা একটু মোলায়েম করার জন্য বলল, 'বেশত দরকারী জিনিষটা আজ কিনুন, বইটা না হয় দু'একদিন পরে নিয়ে যাবেন।'

ভদ্রলোকটি কিছু বললেন না, ক্ষুণ্ণ মনে চুপ করে বসে রইলেন। কিছু একটা বলে যে উঠে যাবেন, তারও উপায়নেই। ঝাঁকঝমক করে বহা সমারোহে বৃষ্টি নামল। বাইরে বৃষ্টি আর বাতাসের মাতামাতি আরম্ভ হল।

পেছনের দেওয়ালের ছুটো আলমারীর মাঝখানের ছোট দরজাটা অকস্মাৎ গেল খুলে। মুখে মুখটলারী দীর্ঘ পাইপ, চিলে নাইট গাউনের কোমর বন্ধনী আঁটতে আঁটতে চাচা ছোলা মুখ, দীর্ঘদেহ নিলাদ্রি ঘোষাল ঢুকল দোকান ঘরে। 'আসুন, আসুন,' 'আপনার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি,' 'দেখছেন মাঝখানের কেদারাটা আপনার জন্যই খালি রয়েছে,' ইত্যাদি কলরব উঠল তাকে ঘিরে। সাম্বত বলল, 'যাক, এই বর্ষাবাদলে শেষকালটা যে দিদিভাইকে ছেড়ে আড্ডায় আসতে পারলেন সেই জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

মিঃ ঘোষাল আসনে বসে মুখ খুললেন, 'আপনার দিদিভাই তো কেবল একদিকে আর অপরদিকে আপনারা সাতজন মিলে আমায় টানছেন। এই টাগ অব ওয়ারে আপনাদের জয় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ওটা কি বই হে রায়?'

'কর্ণেল লরেন্সের সেভেন প্যাশন্স অব উইজডম্।'

'আরে, দেখি দেখি বইটা।'

বইটা হাতে নিল ঘোষাল। বইটা নেড়ে চেড়ে দেখে সে পাতা উলটতে লাগল। ঘোষাল বলল, 'আশ্চর্য লোক এই লরেন্স। লরেন্স অব এ্যারেবিয়া এই নামেই লোকটা খ্যাত বা কুখ্যাত। গত মাসে মোটর দুর্ঘটনায় লরেন্স মারা যায়। ঐতিহাসিক গুপ্তচরদের মধ্যে লরেন্স নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ওর শেষ বই 'দি মিন্ট' খুব সম্ভব ওর মৃত্যুর কুড়ি বছর পরে অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হবে। এই হল প্রকাশকের সঙ্গে লিখিত সর্ত। এই বই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় দু'চার জন বিশিষ্ট লোক ছাড়া কেউই পড়েনি। উদ্দেশ্য, এই বই বর্তমান অবস্থায় প্রকাশিত হলে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য রাষ্ট্রের যে বর্তমান রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে তাতে ভাঙন ধরতে পারে। শোনা যায় বার্ণার্ড শ' পাণ্ডুলিপিটী পড়ে লরেন্সের এই আশঙ্কার সমর্থন করেছিলেন,' একটু থামল নিলাদ্রি ঘোষাল, পাইপ টানতে টানতে সে যেন আনমনা হয়ে গেল। তার চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠল স্বচ্ছ, তার মন যেন কোন অতীতের পুঞ্জ পুঞ্জ স্মৃতির মধ্য দিয়ে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে সে বলল, 'এই লরেন্সকে নিয়ে একসময় আমার মন গোলক ধাঁধায় পড়েছিল। আমি আজও সেই ঘটনার কোন সন্তোষজনক সমাধান পাইনি।'

'তাই না কি?'

'এই লরেন্স, এই লরেন্স অব এ্যারেবিয়া?'

'হ্যাঁ, এই লরেন্স।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী উদগ্রীব হয়ে নড়ে চড়ে বসলেন।

'বলেন কি মশায়, ব্যাপারটা কি ঘটেছিল বলবেন কি?'

'নিশ্চয়ই বলব, কিন্তু এই বৃষ্টিতে আর রাত আটটার পরে বাড়ীতে না ফিরে গল্প শুনতে মন লাগবে কি?'

'সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না মিঃ ঘোষাল, আপনি বলে যান আমরা শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি' বলল সাম্বত।

'যখন ঘটনাটা আমার সামনে ঘটল তখন আমার অদ্ভুত লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু খেয়াল হ'ল চলে যাবার অনেক পরে।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী এবার মুখ খুললেন, বললেন, 'সে কি করে হবে? লরেন্স কখনও বাংলা দেশে আসেনি।'

নিলাদ্রি ঘোষাল মুখ টিপে হাসল। পাইপ থেকে পোড়া তামাক ঝেড়ে ফেলে সে নতুন তামাক ভরে আগুন ধরাল। বার কয়েক টেনে আগুন ভাল করে ধরিয়ে নিয়ে সে বলল, 'আমি বাঙালী হতে পারি, কিন্তু আমি বাঙলা দেশের লোক নই। তাছাড়া আমার কর্মক্ষেত্র জামরুহ ও লাতিকোটাল এলাকা। আমি মিলিটারী এনজিনিয়ারিং সার্ভিসে কাজ করি।' আবার একটু থামল নিলাদ্রি ঘোষাল। 'তাহ'লে তো গল্পটা সোজা বললে আপনাদের ভাল লাগবে না। আনুষঙ্গিক ব্যাপারটা কিছু না কিছু বলা দরকার।'

সাধুর অধৈর্য প্রকাশ পেল, বলল, 'যতটা সংক্ষেপে পারেন, সাহেব, মূল ঘটনাটা শুনতে হবে।'

'জায়গাটার ভৌগলিক পরিচয় নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে। তিব্বতের কুঁটিধারা গ্রন্থি থেকে হিমালয়ের জটা পশ্চিম দিকে শৃঙ্খলের পর শৃঙ্খলে বেয়ে চলেছে। আবার ওদিকে পামিরকে ঘিরে হিন্দুকুশ তার জটা ছড়িয়ে দিয়েছে পূর্ব দিকে। এই দুইয়ের মিলনস্থান উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা। এরা রক্তে আর্য, জাতিতে পাখতুন, এদের সাধারণ ভাষা পোস্ত। এদের মধ্যে আবার অনেক খণ্ড খণ্ড উপজাতি আছে। তার মধ্যে আফ্রিদি, ওয়াজিরি আর মামুদরাই প্রধান। এদের গায়ের রঙ য়ুরোপীয়দের মত, বাচ্চা বয়সে এদের গালে কোটে আপেলের রঙ। অসম্ভব বলিষ্ঠ, কষ্ট সহিষ্ণু আর সাহসী এরা। জীবন নেওয়া আর দেওয়া এদের কাছে সমান তুচ্ছ। জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ ধ'ল রাইফেল আর কার্তুজ। একটা কার্তুজের জন্য এরা মানুষের প্রাণ নিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে প্রথম জিনিস যা তারা পায়, তা কোন খাদ্যদ্রব্য নয়, তা কার্তুজ। উদ্বেগ এর দ্বারা যা করে পারো উদরপূর্তি করো। দেশ তো নয়, চারিদিকে শুধু পাহাড়ের ঢেউ, তারই খাঁকে খাঁকে ছোট ছোট উপত্যকা, তাও পাথরের চাঙড় আর বড় বড় পাথরের টুকরোয় ভরা, এ যেন মাতা বসুন্ধরার রুক্ষ, শুষ্ক, অনাবৃত এক মূর্তি, দিগন্ত বিস্তৃত তাপদগ্ধ দেহ যেন সদা সর্বদা ধুঁকছে, ক্বচিৎ কোথাও আঙুর এর ঝোপ চোখে পড়ে, আর গ্রামের কোলে কোলে কয়েকটা করে আপেলের গাছ, দৈবাৎ কোথাও পাহাড়ের কোলে যবের চাষ দেখা যায়। চাষ বাস ক্ষেত খামারী ফলের বাগান সাধারণতঃ বড়লোকী ব্যাপার। পশুচারণও তাই, যিনিমান লোকের সম্পদের পরিমাপ হয় তার পালিত পশুর সংখ্যায়। বেশির ভাগ লোকই শিকার করে সেই মাংসে উদরপূর্তি করে, ওরই সঙ্গে যা সামান্য যব কি জোয়ার হয় তাতেই সংসার চালায়। এর সঙ্গে আর একটী জিনিষ আছে কোন পণ্যবহ চলার পথে পাহাড়ের খাঁজে ওৎ পেতে লুকিয়ে থেকে দস্যুবৃত্তি করা। জীবনের নিত্যসঙ্গী রাইফেল হাতে থাকলে এরা কোন জিনিষকে ভয় করে না, কোন কিছুতেই এরা পেছপাও নয়। আর অবার্থ এদের লক্ষ্যভেদ। পাহাড়ের কোলে কোলে এরা ঘর তুলে বটে কিন্তু বিপদে আপদে এরা গোত্রিগতভাবে পাহাড়ের বড় বড় গুহায় আশ্রয় নেয়। গুহার মধ্যে রাত্রে শোবার আগে এরা মেয়ে পুরুষ সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে পোষাক জামা গুহার ভেতরে মুখের কাছে রেখে বড় পাথর দিয়ে গুহার মুখ চাপা দেয়। দূর থেকে বিমানের শব্দ শুনলে এরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গুহার মধ্যে ঢুকে, ফলে ইংরেজরা উপর থেকে যেদিন গান করেও এদের কিছু করতে পারে না, আবার অপরদিকে কোন বিমানকে রাইফেলের আওতার মধ্যে পেলে পর পর গুলি চালিয়ে সেই বিমানকে ঘায়েল করে ভূপাতিত করতে শোনা গেছে। ইংরেজদের এরা দুশমন মনে করে, কারণ পেলে এরা কখনও তাদের ছাড়ে না। প্রায়ই দেখা যেত ইংরেজ সাম্রাজ্য পাহাড়ী

দিতে দিতে উধাও হয়ে গেছে। রাতে যেখানে ইংরেজ সান্ত্রীরা পাহারা দিত সেখানে ওরা রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এসে অতর্কিতে সান্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, সান্ত্রীর মুখ চাপা দিয়ে দু'তিন জন মিলে তাকে তুলে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। খোঁজ খোঁজ, কোথাও মিলল না, এরা তো বিমান যন্ত্র নিয়ে সব গ্রামগুলোর ওপর বোমা ফেলল, মেসিন গান চালিয়ে ফিরে এল। কদিন পরে ওয়াজিরিরা সান্ত্রীর মৃতদেহটা রাত্রির অন্ধকারে এদের এলাকায় ফেলে দিয়ে চলে গেল। ভারতীয়দের সাধারণতঃ ওরা কিছু বলত না, হয়ত কোন ভারতীয় সান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে, হঠাৎ সে দেখল, তার সামনে দেড়শ ভাইনে বাঁয়ে চার চারটে রাইফেলের নলা উঁচিয়ে আফ্রিদিরা এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের ভাষা না বুঝলেও অর্থ উপলব্ধি করতে দেরী হয় না 'একটি কথা না বলে যা কার্তুজ আছে দিয়ে যাও নইলে জানে খতম করে দোব' সান্ত্রী এই অবস্থায় সব কার্তুজ দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পথ পায় না। একবার আফ্রিদিরা বড় রকমের একটা ভুল করে বসে। একটা গুর্খা সান্ত্রীকে অন্ধকার রাতে তুলে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় গুর্খা রাইফেল্‌স্‌-এ দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হল। কদিন পরে ঐ গুর্খা সান্ত্রীটার মৃতদেহ তারা যথারীতি অন্ধকারে লুকিয়ে ফিরে দিয়ে গেল। এই ঘটনায় সমস্ত গুর্খারা গেল ক্ষেপে, ওরা এর প্রতিশোধ নেবে বলে কুকি ছুঁয়ে সূর্য সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করল। ওরা জানত, এই ব্যাপারে ইংরেজরা কখনও বোমাও ফেলবে না, বিমান থেকে মেসিনগানও করবে না। যা করবার ওদের নিজেদের করতে হবে। এই প্রতিজ্ঞা গুর্খারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। একদিন ভোরে দেখা গেল, দুটো আফ্রিদির মৃতদেহ অর্ধেক চামড়া ছাড়ানো অবস্থায় গাছে ঝুলছে।

এক কথায় এমন একটা এলাকা যেখানে মানুষের নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই। গ্রামের চৌহদ্দির ভেতরে তবুও কিছুটা নিরাপত্তা আছে কিন্তু সেই গণ্ডীর বাইরে পা বাড়ালে প্রাণটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বেরোতে হয়। একজনের মৃত্যুর জন্য তার মৃত্যুর প্রতিশোধ প্রতিজ্ঞা বংশ পরম্পরায় চলে আর যতক্ষণ না সেই প্রতিজ্ঞা রক্তের অক্ষরে পালিত হচ্ছে ততক্ষণ হিংসার নিবৃত্তি নেই।

এই সব খণ্ড উপজাতিদের মধ্যে প্রায়ই কলহ, যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতো, একটা উপজাতির বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিয়ে উত্তেজিত করে খণ্ড যুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়ার কাজে অনেক ইংরেজ গুপ্তচর নিয়োজিত থাকত। তাদের গায়ের রঙ বেশভূষা চলাফেরা ও কথাবার্তা থেকে তারা যে শিক্ষিত ইংরেজ উপজাতির লোক নয়, একথা বুঝবার কোন উপায় থাকত না, অনেক সময় দেখা যেত যে একজন উপজাতির লোক তার ঢিলে ঢোলা জামা পোষাক ও বোকা নিয়ে কাঁটা তার দেওয়া সীমানার কাছে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ইসারা করে ডাকছে। কাছে গেলাম, সে যে আফ্রিদি কি ওয়াজিরি নয় তা তাদের বেশভূষা থেকে ধরবার মোটেই উপায় নেই, চমক ভাঙল লোকটার মুখ থেকে স্পষ্ট একসেন্ট সহ শুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণ শুনে, কাঁটা তারের বেড়ার কাছে যেতে লোকটা মাথাটাকে সামান্য কাৎ করে আমাকে মাথা থেকে পা অবধি পরিমাপ করে নিল, বাঁ হাতের কব্জি অবধি তুলে ধরল আমার দিকে। দেখলাম লোকটার প্রসারিত হাতের চেটোয় স্পষ্ট ইংরাজী হরফে লেখা লোকটার গুপ্তচর বিভাগীয় আইডেনটিটি কার্ড। আমাদের ওপর নির্দেশ অনুযায়ী তখনই ঐ বিভাগে খবর পাঠাতে হতো, তারা লোকটার যা যা দরকার তা ব্যবস্থা করে দিত। এদের সংখ্যা বাড়লেই বুঝতাম,সিগন্যির কোথাও না কোথাও বোমা কি মেসিনগানের গুলীবর্ষণ সুরু হবে। আর হোতও তাই।

যখনকার কথা বলছি, তার প্রায় একমাস আগে আমি আমার ওভারসিয়ারকে সকালে রুটিন মাফিক কাজের কথা বলতে গিয়ে কোনে 'গুড মর্ণিং স্যর' করলাম। আমি আশ্চর্য হলাম ও মনে কষ্টও পেলাম তাঁর আচরণে যখন তিনি আমাকে পাল্টা 'গুড মর্ণিং স্যর' করলেন। বললাম, স্যর আমি

আপনার অবশ্য কর্মচারী আপনি আমায় স্যর বলে ঠাট্টা করছেন। ভদ্রলোক বিনীতভাবে বললেন, আমি আপনাকে ঠিকই বলেছি মিঃ ঘোষাল, আপনি আজ থেকে সাব-ডিভিজনাল অফিসার হয়েছেন। আমি সেই নির্দেশপত্র দেখেছি। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ হেডকোয়ার্টারে ফোন করে জানলাম, কথাটা ঠিকই। আমি আধঘণ্টার মধ্যেই সে নির্দেশ পেলাম। আমি যখন আমার কোয়ার্টারে ফিরলাম, তখন দেখলাম আগে পাশের পাহারারত হত সান্ত্রীরা আমাকে স্যালুট করছে। ছোট ছেলে নতুন খেলনা পেলে যেমন করে খেলায় মেতে ওঠে, আমিও সেই রকম নতুন ইউনিফর্ম পরে, ব্যাজ আর তারাগুলা লাগিয়ে ব্যাটন হাতে নিয়ে স্যালুট নেবার খেলায় মেতে উঠলাম। কারণে অকারণে ঘরে ঢুকছি আর বেরিয়ে আসছি, আর সান্ত্রীরা স্যালুট করছে।

এই অবান্তর ঘটনাটা আমি এখানে বললাম এইজন্য যে এতে একটা সময়ের ধারণা করা যাবে, কারণ সেই ঘটনাটা আমার এস ডি ও হবার একমাসের মধ্যেই ঘটেছিল।

আমার নতুন কোয়ার্টারের বাঁ দিকে প্রায় চারশ গজের মত একটা জায়গা খোলা পড়েছিল। সেখানে ইতস্তত: ছোট বড় পাথরের টুকরো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকত। একদিন ভোর বেলা বিছানায় বসে চা খাচ্ছি, আমার পরিচারক পাঞ্জাবী ছেলেটী এসে খবর দিল, 'হুজুর, বাইতরফ খুল্যা জায়গামে কুছ হোগা। বহুত সে আদমী এক কাঠ্‌ঠা হোকর কাম কর রহা হ্যায়।' আমি তখনই পেয়ালা হাতে করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখি অন্ততঃ জন কুড়ি বাইরের লোক ঐ জায়গায় এসেছে। কয়েকজন লোক পাথরের নুড়িগুলোকে তুলে বড় বড় ঝুড়িতে রাখছে। কতকগুলো লোক ট্রাকে করে ইঁট, চুন, বালি সুরকি এনে ট্রাক থেকে নামাচ্ছে। আর জন দুই লোক ফিতে নিয়ে মাপ জোপ করছে। ব্যাপারটা কি হতে পারে পাহারারত সান্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করায় সে কিছুই বলতে পারল না। যে সব লোকেরা মাপজোপ করছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করায় জানলাম যে তারা ডিপার্টমেন্টের হুকুম অনুযায়ী দুটো সিমেন্ট বাঁধানো মেঝে, একটা দৈর্ঘ ও প্রস্থে চল্লিশ ফিট ও কুড়ি ফিট আর অপরটা দশ ফিট ও দশ ফিট, আর এই দুটো মেঝেকে সংযুক্ত করে দশ ফিট চওড়া একশ ফিট লম্বা একটা পাকা রাস্তা তৈরী করতে এসেছে। কিন্তু কি জন্য এটা তৈরী হচ্ছে তা কেউ বলতে পারলো না। আমার দু' একজন সহকর্মীকে এই সম্বন্ধে ছাড়াভাবে প্রশ্ন করলাম, কারণ এ সব ব্যাপার বিশেষ ও বিশদভাবে জিজ্ঞাসা করার বিপদ আছে। কিন্তু তারা ও এ রহস্য ভেদ করতে পারলো না। বোঝা গেল জিনিষটা খুব ভেতর থেকে ও গোপনে তৈরী হচ্ছে। বাইরের কেউ জানে না। মিস্ত্রিদের যে দলের ওপর যে অংশ তৈরী করার ভার পড়েছে, সেই দলও জানে না যে এই অংশের পরবর্তী অংশে কি তৈরী হবে। দু'দিনের মধ্যে ঐ দল তাদের কাজ শেষ করল। এর পর ট্রাকে করে আরও অনেক জিনিষ পত্র এল।

একদিন ভোরে বিছানায় চা এর জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময় জোর খটাখট খটাখট শব্দ শুনলাম। মনে হ'ল যেন আশপাশে অনেকগুলো খুঁটী একসঙ্গে পোতা হচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম তাঁবু খাটানোর অনেকগুলো খুঁটী তৈরী মেঝে থেকে কিছু দূরে দূরে পোতা হচ্ছে। বড় মেঝেটার ওপর মোটামুটি একটা কাঠের কাঠামোও তৈরী হ'ল। সেইদিনই বেশ বড় আকারের খাকীরঙের তাঁবু উঠল সেই মেঝের ওপর। তাঁবুটার গড়ন দেখে আমার মনে হয়েছিল যে তাঁবুটা কয়েকটা ঘরে বিভক্ত। ছোট মেঝেটার ওপর গাঢ় কালো রঙের ক্যানভাসের তাঁবু পড়ল। ইলেকট্রিক মিস্ত্রীরা এসে আলো পাখা খাটিয়ে টেলিফোন বসিয়ে দিয়ে গেল। এর পর কয়েকটা মিলিটারী ট্রাক বোঝাই হয়ে এল বহুমূল্য

আসবাবপত্র আর প্রায় সবগুলিই ঢুকল বড় তাঁবুটাতে। আসবাবপত্রের ধরণ দেখে আমার মনে হ'ল, কিছুটা যাবে শোবার ঘরে, কিছুটা বসবার ঘরে আর হয়ত কিছুটা পড়াশুনার ঘরে লাগতে পারে। সব জায়গাটার সীমানায় হাত চারেক উঁচু করে খাকী রঙের ক্যানভাসের দেওয়াল তুলে দেওয়া হ'ল। এমন ভাবে সমস্তটা ঘেরা হোল যে, মাটীতে দাঁড়িয়ে আশপাশে কারুর পক্ষে ভেতরে কি হচ্ছে তা দেখা সম্ভব হবে না। কিন্তু আমার শোবার ঘরের জানালার পাল্লা খানিকটা খুলে বিছানায় বসে কম্পাউণ্ডের ভেতরের সমস্ত অংশটা ভাল ভাবেই দেখতে পেলাম। তখনও অনেক জিনিষ বাইরে পড়ে ছিল। তার মধ্যে কয়েকটা কাঁচের জার ও বোতলও দেখতে পেলাম। মনে হ'ল সেগুলোতে কোন তরল ও গুড়ো দ্রব্য রয়েছে। এই ঘের দেওয়া জায়গার চার কোণে চব্বিশঘণ্টার জন্য পালা বদল করে সশস্ত্র সান্ত্রী বসল।

ব্যাপার স্যাপার দেখে আমি কিছুটা হকচকিয়ে গেলাম। কি হবে কার জন্য এই ব্যবস্থা আমি তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবে দুটো জিনিষ আমার বোধগম্য হ'ল। প্রথমতঃ জিনিষটা স্থায়ী নয়, দ্বিতীয়তঃ যার জন্য এই ব্যবস্থা হচ্ছে তিনি একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত অতিথি। একটা জিনিষ মনে হওয়ায় আমি খুসী হলাম। আর কেউ পারুক বা না পারুক জানালার অংশ দিয়ে আমি অনেকখানি দেখতে পাবো আর এর রহস্য ভেদ করতে হয়ত সক্ষম হবো। আমি শুধু আমার পরিচারক সুরথসিংকে বলে রাখলাম, যে নতুন কিছু চোখে পড়লে সে যেন আমাকে জানায়।

পরের দিন একটু বেলায় ঘুম ভাঙল। বুঝলাম সুরথসিং চা নিয়ে কিছুক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করছে কিন্তু ঘুম ভাঙিয়ে তুলে দিতে সাহস করছে না। আমি পোষাকটায় সবে চুমুক দিয়েছি সুরথ সিং বলল, 'হুজুর এক নয়া সাহেব আয়া। একঠো বড়া গাড্ডীমে সামান উতরা।' আমি তখনই জানালার পাল্লা অল্প একটু খুলে দেখলাম, গোড়া গোড়া চেহারার প্রৌঢ় বয়স্ক একজন ইংরেজ ঘুরে ঘুরে তাঁবু দুটো দেখছে। লোকটার চেহারায় আর পোষাকে একটা এলোমেলো, খামখেয়ালী আর অগ্রাহ্য করা ভাব আছে। কেস, কোট, টাই এসবের বালাই তো নেইই, পোষাকের মধ্যে এক প্রস্থ সুতির সার্ট আর প্যান্ট তারও ইস্ত্রি করা তাঁজ অনেক আগেই খুয়ে গেছে। মাথার চুল অবিন্যস্ত ও রুক্ষ। একটা লাট খাওয়া ঘুড়ির মত ক্রমাগত সে চক্কর খেয়ে ঘুরছে। লোকটা লম্বায় মাঝারী আকার। গোঁফদাড়ী তিন চারদিন কামানোই হয়নি। দু'হাতে আস্তিন কনুই অবধি গুটনো। চলাফেরার মধ্যে একটা ক্ষিপ্রতাব আছে। আমার মনে হল লোকটা প্রত্যাশিত মহামান্য অতিথির প্রধান পরিচারক হতে পারে। তাই সুরথ সিংকে বললাম, লোকটা সম্ভবতঃ প্রধান খিদমদগার হবে। আগে থেকে এসে সব জিনিষের তত্ত্বাবধান করছে।

আফিস থেকে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ের কিছুটা আগে ফিরলাম। দেখলাম, একটা মিলিটারী ভ্যান থেকে ডিনার সেট পোর্সেলেন ক্রকারী আর খাবার জিনিষ নামছে। ভ্যান থেকে একটা লোকের সাহায্যে জিনিষগুলো ঐ ক্যাপাটে লোকটা ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। তার সার্টের বুকের বোতামগুলো খোলা থাকায় অনাবৃত পোড়াটে বুকের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। অলরাইটের কিছুটা লোকটার নির্দেশ মত বড় তাঁবুটার সামনে বাঁ থেকে ডানদিক পর্যন্ত কয়েকটা কাঠের খুঁটী পোতা হল। আর একটা লম্বা কিতে খুঁটিগুলোর মাথায় টাঙিয়ে দেওয়া হ'ল। আমি যেন আপনা থেকেই কৌতূহলী হয়ে পড়লাম আর ঐ ক্যাপাটে লোকটা কি করে না করে সেই দিকে নজর রাখলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, নিজের মধ্যে ঔৎসুক্য থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে অন্যের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সন্ধ্যের পর লোকটা কালো রঙের ছোট তাঁবুতে ঢুকল। তার হাতে ভাঁপাকার কাঠের ফ্রেমের মত

জিনিষ, অনেকটা ক্যামেরার ট্রাইপডের মত। ওরই মধ্যে যার তিন চার সে বড় ঔবুটিতে এসেছিল আর প্রত্যেকবারই তার হাতে কিছু না কিছু জিনিষ ছিল। একবার দেখলাম, সে কোন একটা জিনিষ খেতে খেতে চলেছে। কিন্তু সব সময়েই লোকটার মধ্যে একটা নির্বিষ্ট ভাব আমি লক্ষ্য করেছি। ও যেন পারি-পার্শ্বিক সব কিছু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও বিচ্ছিন্ন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত লোকটা কাজ করল। আমি বেশীক্ষণ জেগে থাকতে পারলাম না। ওর কাজ শেষ হবার আগেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন ভোর বেলায় উঠে দেখি অন্ততঃ শ দুই বড় সাইজের রোমাইড ফটোগ্রাফ খুটীতে লাগানো ক্লিপের সঙ্গে ক্লিপ আঁটা অবস্থায় ঝুলছে। এখন লোকটার সম্বন্ধে আমার ধারণা পরিবর্তন করতে হোল। লোকটা আর যাই হোক খিদমদগার নয়। তাহলে ব্যাপারটা কি? একজন ফটোগ্রাফার কি এখানে আস্তানা গেড়ে বসল। আর তার জন্য এত গোপনীয়তা, এত সতর্কতা। আমার কাছে সবটাই উদ্ভট ও হাস্যকর লাগল।

সেদিনও লোকটাকে সর্বক্ষণ কর্মব্যস্ত অবস্থায় দেখলাম। লোকটা এত ব্যস্ত যে কয়েকবার তাকে খাবার জিনিষ হাতে খেতে খেতে যেতে দেখলাম।

পরের দিন অফিসে কাজ করছি হঠাৎ অফিসের মধ্যেই মৃদুগুঞ্জন ও চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম।

'কি ব্যাপার হে?' দু' একজন সহকর্মীকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'জানো না?' বিস্মিত উত্তর এল। 'ভেয়ার একসেলেনসিজ, গভর্ণর জেনারল অব ইণ্ডিয়া, সি. ইন. সি. অব ইণ্ডিয়া, গভর্ণর, এন, ডবলিউ, এফ, পি, জি, ও, সি, নর্দান কম্যাণ্ড চারজনেই একঘণ্টার মধ্যেই উপস্থিত হচ্ছেন।'

'বল কি? এ যে অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, এবং একঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছবেন। হুকুম হয়েছে, যে আধঘণ্টার মধ্যে কড়া ইস্ত্রিকরা ইউনিফর্ম ক্রসবেল্ট ও ঝকঝকে জুতো পরে যে যার জায়গায় উপস্থিত হতে হবে। ওঠো হে ঘোষাল এখনই উঠে পড়া যাক। আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরতে হবে, নইলে বিপদ।'

'কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। বৃটিশ ভারতের দু'জন শ্রেষ্ঠতম রাজপ্রতিভূ, আর এন উবলিউ এফ পির দু'জন শ্রেষ্ঠতম রাজকর্মচারী একসঙ্গে উপস্থিত হচ্ছেন, ব্যাপারটা কি?'

'না, ঠিক এক সঙ্গে নয়। গভর্ণর ও জি ও সি আধঘণ্টা আগে পৌঁছবেন আর ওঁরা আধঘণ্টা পরে।'

আফিস থেকে বেরিয়ে মেজর ওকহ্যামের চোখে পড়ে গেলাম। স্যালুট দিতে হল। মেজর ওকহ্যাম বললেন 'ঘোষাল এখনও দেরী করছো। যাও শিগগির ঘোপড়ুরস্ত ইউনিফর্ম পরে এসো। শুনলাম ভেয়ার একসেলেনসিজ না কি তোমার পাড়ার দিকে যাচ্ছেন।'

'সে কি স্যর?'

'হ্যাঁ। তাই।'

আমি তো শুনে হতভম্ব। আমার পাড়ায় দিকে। সেখানে কি থাকতে পারে! চট্ করে মাথায় বুদ্ধিটা খেলে গেলো, যে এ সুযোগ কিছুতেই ছাড়া চলবে না। তখনই আমি মেজরকে বললাম, 'স্যর, এ সুযোগ তো বৈবাৎ আসে। আমাকে আমার কোয়ার্টারে থাকতে দিন। তখান থেকে ওঁদের ভাল করে দেখতে পাবো।'

মেজর সাহেব প্রসন্ন হলেন, 'আচ্ছা তাই হবে, তবে ফিটফাট ও কেতাদুরস্ত থেকো।'

'নিশ্চয়ই তাই।' তাম্বুটা বিয়ে কোন রকমে কেটে পড়লুম। কোয়ার্টারে ফিরে পোষাক বদলালাম। ঘরের বাইরে এসে দেখি, আমার কোয়ার্টারের ডানদিকে তাঁবু তোলা জায়গাটার চারপাশে শ' দুই সশস্ত্র গোর্খা পলটন প্রহরী এসে দাঁড়িয়েছে। রাস্তায় আসতে আসতে শুনলাম এরোড্রোম থেকে আমার পাশের তাঁবু পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তাটাই তখন রাইফেলস-এর পাহারায় আছে। আমি তো তাজ্জব বনে গেলাম। অবশ্য গোড়া থেকেই আমার মনে হয়েছিল যে হোমরা চোমরা খুব বড় দরের রাজ কর্মচারী ওখানে আসতে পারে। তা বলে, বড়লাট, জঙ্গীলাট ও ছোটলাটও যে ওখানে আসবে সে আমি কেন, কেউই ধারণা করতে পারত না।

ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, সেই ক্যাপা লোকটা পোষাক পরিবর্তন করেছে বটে কিন্তু সেও একটা খাঁকি সার্ট আর খাঁকি ফুলপ্যাণ্ট বই আর কিছু নয়। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে খান আষ্টেক বক ঝকে গাড়ী এসে আমার কোয়ার্টারের পাশে ঐ তাঁবু এলাকার গেটে এসে দাঁড়াল।

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হলাম, যখন দেখলাম দেয়ার একসেলেনসিজ হাসিমুখে ঐ ক্যাপা লোকটার সঙ্গে করমর্দন করছেন। চারজনই, ঐ লোকটার সঙ্গে কমপাউণ্ডের ভেতর ঢুকলেন। বাকী উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমার কৌতূহল আমার চাকরীর দায়িত্বজ্ঞান ও শৃঙ্খলা বোধকে ছাড়িয়ে গেল। আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে আমার পোষার ঘরে ঢুকে জানলা খুলে বসলাম। দেখলাম লোকটা মাঝখানে আর দু'পাশে গভর্ণর জেনারেল ও সি-ইন-সি আর দু'জন পেছনে পেছনে হেঁটে আসছেন বড় তাঁবুর দিকে। লোকটা হাত নেড়ে হেসে হেসে কি সব কথা বলছে। তাঁদের মুখেও হাসি। সকলেই বড় তাঁবুটায় ঢুকলেন। পাকা এক ঘণ্টা পর সকলে বেরিয়ে এলেন। সকলেই ঐ লোকটার সঙ্গে হেসে করমর্দন করে গাড়ীতে উঠলেন আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই গাড়ীগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল।

যাত্রীরা মার্চ করে চলে গেল। বিকেলের দিকে দেখলাম ব্রিগেডিয়ার রেমণ্ড জোনস দু'খানা মোটর ভ্যান সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। কিছু নথীপত্র ও গুপ্তাকার এলব্যাম সঙ্গে নিয়ে লোকটি ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে গাড়ীতে উঠে চলে গেলেন। যা কিছু জিনিষ পত্তর পড়ে ছিল তা মোটর ভ্যান দুটো কয়েক ফেরে নিয়ে গেল।

পরের দিন ভোর থেকে আবার তাঁবু তোলার খটাখট শব্দ আরম্ভ হ'ল। সেদিন অপরাহ্ণে অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি, আমার কোয়ার্টারের পাশের জায়গাটা সবই প্রায় পরিষ্কার হয়ে গেছে কেবল চিহ্ন স্বরূপ রয়ে গেছে দুটো সিমেণ্ট বাঁধানো মেঝে আর পিচের রাস্তা।

নিলাদ্রি ঘোষাল একটু দম নিয়ে পাইপের তামাক ঝেড়ে ফেলে তামাক ভরতে লাগল। পেছনের দরজা দিয়ে রামহরি ঢুকল কোকান ঘরে। তার হাতে ট্রে ভর্তি চায়ের পেয়ালা। সকলেই এক একটা পেয়ালা তুলে নিলেন। বিনয় রায়ের ইসারায় রামহরি খরিদ্দারটীর সামনে চায়ের পেয়ালা রাখল। ওদিকে বৃষ্টির ছাঁটও কমে এসেছে।

'তারপর?' পেয়ালায় চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল সামন্ত।

'তারপর, আর কি! ব্যাপারটা যে কি হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারছিলাম না! আমার মনে একটা ধাঁধার মত রয়ে গেল।'

মাসখানেক পরে অফিসে আমার এক সহকর্মী আমাকে চুপি চুপি ডেকে বলল, সেই মহাপ্রভুটিকে চিনতে পেরেছো?

'কোন মহাপ্রভু?'

'সেই যে তোমার কোয়ার্টারের পাশে তাঁবু খাটিয়ে তিন চারদিনের জন্য আস্তানা গেড়েছিল।'

'না, ঠিক ধরতে পারছি না তো।'

'ধরবে কি করে বলো। অত গোপন ব্যাপার। এখানের সিক্রেট এজেন্টস ডিপার্টমেন্টের বিল ক্লার্ক আমার অতি পরিচিত লোক। তার কাছে শুনলাম, অনেক টাকার বিল তৈরী হচ্ছে।'

'কার নামে?'

'কার আবার। ঐ মহাপ্রভুর। উনি কর্নেল লয়েল অব এারেবিয়া।'

নাম শুনে আমি প্রায় চমকে উঠলাম। আমার সহকর্মী বললেন, 'এ কথা শুধু তোমায় বললাম। দেখো ভাই এ কথা আর কেউ যেন ঘুণাক্ষরে না জানে।'

এখন সমস্ত ঘিনিষটার অর্থ আমার কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। সামরিক গুরুত্বের প্রয়োজন অনুযায়ী উপজাতি এলাকা সমেত আফগানিস্তানের বিশেষ বিশেষ জায়গার ফটো নেগেটিভ গুলো কালো তাঁবুটিতে ডেভেলপ করে ফিতেতে ক্লিপ এঁটে শুকিয়ে নিয়ে লোকটা এলবামে রেখেছিল। বড়লাট, ছোট লাট, জঙ্গীলাট ও জি-ও-সি ঐ গুলিকে দেখে এক ঘণ্টা ঐ লোকটার সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করেছিলেন। সেই জন্য ঐ সব এলবাম আর কাগজপত্র নিয়ে লোকটি ব্রিগেডিয়ার রেমণ্ড জোনস-এর গাড়ীতে উঠে সমর বন্দরে গিয়েছিল।

আমার আরও মনে পড়ল, ওর যে ভাবটাকে এলোমেলো, অগ্রাহ্যকরা ভাব বলে আমার মনে হয়েছিল, আসলে সেটা হ'ল ওর ব্যক্তিত্ব ও পুরুষকার। তা না হলে বড়লাট ও জঙ্গীলাটের সঙ্গে সমানে সমানে, একটি খাঁকি সার্ট আর প্যাণ্ট পরে ঐ ভাবে মেশা একজন সাধারণ সিক্রেট এজেন্টের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

নিলাদ্রি ঘোষাল গল্প শেষ করে পাইপে কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে অতীতের স্মৃতির রোমন্থন করতে লাগল। কয়েক মিনিটের একটা অখণ্ড স্তব্ধতা। কেবল বাইরের বৃষ্টির সামান্য ঝির ঝির শব্দ কানে আসছিল। হঠাৎ খরিদ্দারটি একটু নড়ে চড়ে বসল। 'তাহলে ক্যাশ মেমোটা কাটুন।'

'বইটা নিচ্ছেন, তা'হলে?' বলল বিনয় রায়।

'হ্যাঁ, এই টাকাটা রইলো। রাত অনেক হয়ে গেছে। এখন আর সেই জরুরী জিনিষটা পাওয়া যাবে না। কালকেই কিনে নোব।'

রামহরি তাড়াতাড়ি প্যাকিং কাগজে বইটা বেঁধে দিল। ক্যাশমেমো, খুচরো পয়সা ও বই নিয়ে ভদ্রলোক ছাতা খুলে রাস্তায় নামলেন। বাইরে তখনও টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

ভদ্রলোকটি রাস্তায় নামতেই সাত সাতটা হাত নিলাদ্রির দিকে প্রসারিত হ'ল। হকচকিয়ে গিয়ে নিলাদ্রি বলল, 'কি ব্যাপার হে, এতগুলো হাত আমার দিকে একসঙ্গে এগিয়ে আসছে কেন?'

'সে কথা তুমি পরে শুনো। এখন এসো তোমায় করমর্দন করি।'

তুলসী বসু

এন্টনীর জীবনে দুটো বড় আশ্রয় আছে। এক হল সমুদ্র আর অন্যটা হল তার পড়ার ঘর। পড়ার ঘর তো নয় একটা ছোটখাট লাইব্রেরী বললেও অত্যুক্তি হয় না। এন্টনীর বাবা গডউইনের বই পড়ার মতো বিত্তে ছিল না কিন্তু ছিল বই কেনার নেশা। সুতরাং ইংরাজী আর তামিলে নানা বিষয়ের ওপর লেখা নানা রকমের বই আলমারী ঠেসে তিনি কিনেছিলেন। কিনেছিলেন অবশ্য শুধু লোক দেখানর জন্যেই। প্রকাণ্ড প্রাসাদের ডিভান চেয়ার, সোফা-সেটী আর আলমারী—ওয়াল্পেপারের মতোই বইগুলি ছিল প্রাসাদ অলংকরণের একটি অঙ্গ। কাজেই ভাল ভাল বইয়ের সঙ্গে তিনি বাজে বইও রাখতেন যথেষ্ট।

অবশ্য এখন সেই প্রকাণ্ড প্রাসাদ আর নেই। বাজে বইয়েরও স্থান আর নেই। এন্টনী বাছাই করে বিশ্বের মনীষীদের লেখা বইগুলি আলমারী ভর্তি করে রেখেছে তার এই ঘরটিতে। মাকারি সাহেবের এই ঘরটিতে আগে কেউ আসত না। একে ঝাড়ামোছা পরিষ্কার করা সবই করত এন্টনী নিজে। মণিমেখলা আসার পর অবশ্য একটু একটু করে সে এই কাজগুলো নিজের হাতে নিয়ে নিচ্ছিল।

ঘরটির দেওয়ালে ঝোলান আছে বড় বড় কয়েকটি ছবি। টলষ্টয়, রোঁমা-রোঁলা, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের। কয়েকটা ছোট ছোট ছবিও সেখানে স্থান পেয়েছে। তাদের মধ্যে দুটি ছোট ছবি তার বসবার জায়গায় মাথার ওপরে টাঙান। একটা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক স্বর্গীয় ডাক্তার সরকারের। আর অন্যটি হল লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্সের অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কীর। এই দু'জন মনীষীই তার জীবনে অতি বড় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন।

পড়বার ঘরে ঢুকে সমস্ত কিছুর ওপর একটা প্রসন্ন দৃষ্টি বুলিয়ে নিল এন্টনী। এখানে এলে সে যেন নিজেকে খুঁজে পায়। বাইরে দুঃখ কি আনন্দের ঝড় বড় বড়ই বয়ে যাক না কেন তারা এই ঘরটির মধ্যে ঢুকতে পারে না। এই ঘরে ঢুকে অনেক কথাই মনে পড়ে এন্টনীর। আজ দিনটা তার জীবনে একটা বড় আনন্দের দিন। ছেলে হওয়ার খবর পেয়ে এন্টনী একটু আগে প্রায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। আবেগের ঘোলা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তার কল্পনাপ্রবণ মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করেছিল। কিন্তু না, তাহলে তার আজ চলবে না। তাকে স্থির হয়ে বিচার করতে হবে এই মুহূর্তে। তার নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বসতে হবে। যে নতুন পথে সে তার সন্তানকে নিয়ে যাবে তার মানসিক প্রস্তুতি এখন থেকে তার করা দরকার। সেই জন্যই এখন তার প্রয়োজন তার অতীতের ফেলে আসা জীবনটাকে নিয়ে পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ। জীবনের সমস্ত ভাল-মন্দের হিসাব আজ তাকে করতে হবে। মনের মধ্যে যে নগ্ন সত্যটি আছে তার স্বরূপ তাকে আজ দেখতে হবে। একথা ভাবার সঙ্গে

সঙ্গে এন্টনীর চোখ গিয়ে পড়ল একটা ছোট্ট সুন্দর মেহগনির ক্যাবিনেটের ওপর, তাঁর দরজার ভিতর দিয়ে সোনালী জলে লেখা একখানা চামড়ায় বাঁধান খাতা তার চোখে পড়ল। তার ফেলে আসা জীবনের কাহিনী, বছরের পর বছর লিপিবদ্ধ হয়ে আছে ঐ খাতাগুলোর মধ্যে। তার নিজের লেখা ডায়েরী। ডায়েরী লেখার অভ্যাস তার অনেক, অনেক দিন আগের। সেই যবে থেকে নিজেকে একলা নিঃসঙ্গ বলে ভাবতে শিখেছে সেদিন থেকে সে ডায়েরী রাখতে সুরু করেছে। সেটা হল তার মায়ের মৃত্যুর বছর, তখন তার বয়স কতই বা হবে? সাত আট বছরের বেশী নয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সবকটা ডায়েরী সে অতি যত্ন করে সঞ্চয় করে রেখেছে।

এন্টনী ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল মেহগনির ক্যাবিনেটটার দিকে। তারপর একটা টুল টেনে নিয়ে তার ওপর বসে সযত্নে এখান সেখান থেকে একটার পর একটা ডায়েরী বার করে নিয়ে পড়তে লাগল। ডায়েরীর পাতাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে পড়তে তার মনে হল সে যেন এই ডায়েরীর পাতার এন্টনী নয়। সে যেন অন্য কারুর জীবনকথা পড়ছে। তার জীবনে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে যে সব মানুষগুলি তাদের সঙ্গে এই এন্টনী একজন তৃতীয় ব্যক্তি। কি অদ্ভুত, কি আশ্চর্যময় এই জীবন! তার শৈশব কি কৈশোরে সে কোন দিন স্বপ্নও দেখেনি বোধ হয় যে সে ভবিষ্যত জীবনে হবে একজন সাধারণ জেলে। নৌকো নিয়ে গভীর সমুদ্রে গিয়ে মাছ মারবে, অথবা পায়ে পাথর বেঁধে সমুদ্রে ডুবে মুক্তো কি শাঁখ তুলবে। এসব কাজকে সে তখন ছোট লোকের কাজ বলেই জানত। ঘেন্না করত এই ধরণের কায়িক পরিশ্রমের কাজকে। আর আজ!!

কোথায় গেল তার লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিনের জীবন। আজ যেন সেদিনগুলোকে অনেক দূরে বলে মনে হয়।

উনিশ শ' আটচল্লিশ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিক। এন্টনী ফিরে আসছিল তুতুকুড়িতে দীর্ঘ দশ বছর পরে। দশ বছর আগে যখন সে তুতুকুড়ি ছাড়ে সেই দৃশ্যটা বার বার তার মনে পড়ছিল।

কলকাতা থেকে ইকনমিক্সে এম. এ.তে ফার্ষ্ট ক্লাশ নিয়ে পাশ করার খবরের সঙ্গে একটা চিঠি পেয়েছিল এন্টনী অধ্যাপক সরকারের। অধ্যাপক লিখেছিলেন বাংলাতে—তোর মতো এমন ভাল ছেলে যদি এখানেই লেখাপড়া খতম করে তবে নিজে সে তো উচ্ছন্নে যাবেই দেশকেও উচ্ছন্নে দেবে। আমি বলি কি এন্টুনী তুই লণ্ডনে গিয়ে ল্যাস্কী সাহেবের ছাত্র হ'। আমি ল্যাস্কীকে লিখে দিচ্ছি—তোর যাবার কথা। ওরে লেখার শেষ নেই রে। যদি তোর বাড়ী থেকে আপত্তি থাকে তো তুই গোঁয়ার হবি, নিছক গোঁয়ার। কারুর কথা শুনবিনি বুনো শুয়োরের মতো গোঁ ধরে বিলেত চলে যা। তোর বাপ যদি সোজাপথে টাকা না দেয় তবে ত্যাঁদড় হয়ে টাকা আদায় কর। প্যাসেজের টাকাটা তুই যেমন করে পারিস যোগাড় কর—পরের কথা আমি ভাবব।

মনে মনে হাসে এন্টনী। অধ্যাপক সরকার তাকে এন্টুনী ফিরিঙ্গী বলে ডাকতেন। কি ভালটাই যে বাসতেন। তার লম্বা সাড়ে ছ' ফুট জোয়ান চেহারাটাকে দু' হাতে বুকের মধ্যে সাপটে ধরতেন। বলতেন—হ্যাঁ তোর চেহারাটা ছোট লোকের মতো হলেও তুই মর্দ বটে। তোর গায়ের জোরে আর তাকতের চোটে অনেক তক্কর বাবুকে তুই খতম করতে পারবি।

তারপর তার বুকে পিঠে আদরের সঙ্গে দমাদম করে ঘুষি চালাতে চালাতে বলতেন—এই তো চাই।

এখন আর তন্দুর হয়ে নেতিয়ে চলা চলবে না। এখন আমাদের ছোট লোক হতে হবে, চাষা অসভ্য হতে হবে, জঙ্গী-জোয়ান ডাংপিটে হতে হবে। তা তুই এটুনী কিরিঙ্গী ছোট লোক তো বটেই, তুই জঙ্গী-জোয়ান ডাংপিটেও আছিস। তোর বাবাই দেশের কাজ হবে। ইংরেজ শাসনকে ঠেঙিয়ে দূর করতে হবে আমাদের দেশ থেকে।

অধ্যাপক তাকে পরিহাস করতেন ছোট লোক বলে—তার মিশকালো গায়ের রং-এর জন্য। ঐ ঐ রকম মুখের কথাই ছিল অধ্যাপক দরকারের। কিন্তু অন্তরটা ছিল একটা আদর্শবাদের খনি। আশুতোষ, স্নেহপ্রবণ, বিদগ্ধ অধ্যাপকের কথা মনে হতেই এটনীর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে এল। এদিকে ট্রেন মাদুরা ছাড়িয়ে বিরুধনগরের কাছাকাছি এসেছে। প্রচণ্ড গরমে অস্থির হয়ে ফার্স্টক্লাস কামরার মধ্যে পায়চারি করতে লাগল এটনী। জানুয়ারী মাস মনে করে সব গরম জামা কাপড় নিয়ে এসেছে সে। অবশ্য বাধ্য হয়েই আনতে হয়েছে। দোষ সে আসছে লণ্ডন থেকে। আসবার সময় এক বেলা খেয়েছে বোম্বেতে। আর এক বেলা মাদ্রাজে। এর মধ্যে সুতোর জামাকাপড় কেনবার সময়ও হয়নি, মনেও পড়েনি।

বেশীর ভাগ সময় কেবল মনকে অস্থির করেছে তার বাপের কথা। বাপের কেবল্‌টা পেয়েই সে প্লেনেতে পাড়ি মেরেছে। যে বাপ তাকে একবার ত্যাজ্য পুত্র করে ত্যাগ করেছিলেন তাঁরই কেবল্‌ পেয়ে তাকে ছুটে আসতে হয়েছে।

ট্রেনের মধ্যে পায়চারি করতে করতে এটনী খালি ভাবছিল তার পালিয়ে যাবার দিনটার কথা। সেদিন যদি তার বাবা তাকে সামনে পেতেন তবে হয়তো ঘাড়টা দু' হাতে মুচড়ে তাকে শেষ করে দিতেন। সেই বাবা আজ রোগ শয্যায়। কেবল্‌টার মধ্যে অন্য কোন কিছুর আভাস এটনী পায়নি, শুধু পেয়েছিল একজন অসহায় রোগজীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তির করুণ আবেদন—তোমার আসার জন্যই আমি বেঁচে আছি। তুমি এস।

তার বাবা তার লণ্ডনের ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন কার কাছ থেকে কে জানে?

অসহ্য গরমে এটনীর কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে পৃথিবীর কোথাও যে এত গরম থাকতে পারে এ ধারণা করা যায় না। এদিকে লোকে বাঁচে কি করে? এটনী বার বার বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল খাবড়াতে লাগল। গাড়ীর মধ্যেকার পাখা দুটো হু-হু করে চলছে। কিন্তু তাতে একবিন্দু ঠাণ্ডা হাওয়া নেই। গাড়ীটা চলছে দু' দিকে ধূ-ধূ মাঠের মাঝখান চিরে। কোথাও একটু সবুজের লেশ নেই। আকাশ ছোঁয়া ছাড়া মাঠের ওপর চকচকে সূর্যের আলো পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। ট্রেনটা চলেছেও যেন গরুর গাড়ী।

এটনী কামরার সব জানলাগুলো উঠিয়ে দিল। তারপর চুপচাপ শুয়ে পড়ল। কামরার মধ্যে দ্বিতীয় প্রাণী আর কেউ নেই। শুয়ে শুয়ে সে আবার চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল।

মনে পড়ল তার বিলেত যাবার কথা শুনে তার বাবার প্রকাণ্ড কালো মুখখানা কি রকম আরও কালো আরও থমথমে হয়ে উঠেছিল। গম্ভীর গলায় তিনি বলেছিলেন—এখন এ বাড়ী থেকে তুমি কোথাও যেতে পাবে না। আসছে মাসে তোমার বিয়ে স্থির করেছি আমি—জোসেফ পিরিসের মেয়ের সঙ্গে।

মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় আপত্তি জানিয়েছিল এটনী—বিয়ে এখন আমি করব না। আমি—

সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের কথা অর্ধেক পথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এক বিরাশী সিক্কা চড়ের আঘাতে। পাকা সাড়ে সাত ফুট লম্বা আর সেই অনুপাতে চওড়া চেহারা গডউইনের। তাঁর শরীরের ওজন তিন মন ছাড়িয়ে যেত। একটা দৈত্য বললেও কিছু বেশী বলা হয় না। তাঁর শালগুঁড়ির মতো হাতের এক একটা চেটোতে বজ্রের মতো শক্তি থাকত। নিজে প্রচণ্ড জোয়ান হওয়া সত্ত্বেও সেই হাতের চড়ের আঘাত সেদিন সহ্য করতে পারেনি এটনী। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিল মেঝের ওপরে। তার বাবার খাস বেয়ারা মারিয়া হাসন এসে তার দেহটা তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়েছিল তার নিজের বিছানায়।

সেই বিছানায় সেই ঘরে সে বন্দী ছিল সাত দিন। বাড়ীর একটা কুকুর বেড়াল পর্যন্ত সে ঘরে ঢুকতে পেত না। কেবল মারিয়া হাসন এসে তাকে দু'বেলা খাইয়ে যেত। খাবার রুচত না এটনীর মুখে। বুকের মধ্যে আগ্নেয়গিরির গলা-লাভার মতো হাপাহাপি করত একটা বিদ্রোহী ভাব। যেমন করে হোক এখান থেকে তাকে বার হতেই হবে। এই বিরাট বাড়ী, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বুইক্, প্যাকার্ড, এই অনায়াসলব্ধ অজস্র টাকা পয়সা, এই অবারিত বিলাসের উপকরণ, এই সুখগতি পরোহা সমাজ। এদের ভিতর থেকে তাকে বার হয়ে যেতেই হবে। যদি সে বার হতে না পারে তো সে এই ঘরের মধ্যে নিজেকেই নিজে গুলী করে মারবে।

এম. এ পরীক্ষা দেবার পর এই ক'মাস কুণ্ডুকুণ্ডিতে থেকে তার বুকে হাঁপ ধরে গিয়েছিল। এখানে ঐ জোসেফ পিরিসের মেয়েকে বিয়ে করে ভাল ছেলে হয়ে সারাজীবন কাটান! একথা ভাবতেই তার মনে পড়েছিল সহরের রাস্তার পাশে একটা অতি সাধারণ দৃশ্য। নর্দমার কাদার মধ্যে দুটো বাড়ী শুয়োর আর গোটা দশেক বাচ্চা কী ভাবে মুখ গুঁজে নির্বিকার চিত্তে পড়েছিল। সে দৃশ্যটা দেখে তখুনি তার মনে হয়েছিল এখানকার সমাজের সঙ্গে এই দৃশ্যটার একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। ওঃ এই জীবনকে মেনে নেওয়ার থেকে তার মৃত্যুও ভাল।

জোসেফ পিরিস তার নিজের মামা। তার মেয়ে মার্সিকে সে খুব ভাল ভাবেই জানে। মা বেঁচে থাকতে ছেলেবেলাতে সে হরদম মামার বাড়ী যেত। মার্সির সঙ্গে খেলা করেছে সে অনেক। তারপরে বড় হয়েও মার্সির সঙ্গে দেখা হয়েছে।

বন্ধঘরের মধ্যে হঠাৎ এটনীর মনে পড়েছিল সপ্তা দুই আগের কথা। সেদিন মার্সি এসেছিল তাদের বাড়ীতে বেড়াতে। তার ঘরে এসে ঢুকেছিল একবার। রূপ মার্সির হয়তো কিছু ছিল কিন্তু সব ঢাকা পড়ে গিয়েছিল তার শরীরের বীভৎস মেদ বাহুল্যে। জোসেফ মামা তার আদুরে মেয়েকে প্রচুর ঘি-দুধ খাওয়ান। কাজকর্ম-তো কিছু নেই শুধু বসে বসে খাওয়া। হোলিক্রস কনভেণ্টে পড়ছিল মার্সি। তা বয়স একটু বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শরীরে চর্বি জমবার আর বাবাটা কোথায়? সেই অদ্ভুত মোটা চেহারায় অদ্ভুত সাজ করেছিল মার্সি। চোখে লেপেছিল মোটা করে কাজল। গালে লেপেছিল ঘন করে রুজ। আর দুটো ঠোঁটে মেখেছিল পুরু করে লিপষ্টিক। পরণে তার ছিল একটা কটকটে হলদে দামী ব্যাঙ্গালোর সিল্কের সাড়ী, তার সঙ্গে চওড়া ঝকমকে জরির পাড় বসান লাল টকটকে ব্লাউজ। মাথায় ছিল তার বড় এক গোছা কনকাম্বর ফুলের গোড়ে।

মার্সি ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল এটনীর সামনে। এটনী তখন পড়ছিল রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাখানা। উপন্যাসের ঘটনার মধ্যে সে বুঁদ হয়ে ডুবেছিল। তার মুগ্ধ মন অবচেতনায় লুব্ধ হয়েছিল সুচরিতার সহজ, সরল, অনাড়ম্বর অথচ ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চরিত্রে। সুচরিতার সঙ্গে সে মিল খুঁজে

পাচ্ছিল তাদের সঙ্গে এম. এ ক্লাশে পড়া একটি মেয়ের। নাম তার চারুবালা দত্ত। কি তালই যে লাগে তাকে এষ্টনীর! হঠাৎ বই থেকে চোখ তুলে মাসিকে ঐ বেশে দেখে তার মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। তবুও সে ভাবটা গোপন করে সে মাসিকে বদলাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিল। ও'একটা আদুলী কথাও যে বলেনি এমন নয়। তার সাজের সম্বন্ধে ঈষৎ বিদ্রূপ করেই বলেছিল—কী, এবে একেবারে দিগ্বিজয়ী মূর্তি নিয়ে এসেছ, ব্যাপার কি মাসি?

উত্তরে মাসি ভুরু কুঁচকে চোখ বাঁকিয়ে, ঠোঁট উল্টে জবাব দিয়েছিল—এই সাজেতেই দিগ্বিজয়ী বলছ? এতো কিছুই নয়।

বিদ্রূপটা ধরতে পারার মতো বুদ্ধি মাসির ছিল না। ছিল শুধু নিজের রূপের সম্বন্ধে অন্ধ অহংকার। সে এমনিতে একটু কর্সা। তারই দেমাকে তার মাটীতে পা পড়ত না। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছিল তার বাবার টাকার অহংকারটা।

মাসি শরীরটাকে যতোদূর সম্ভব উঁচু করে তুলে ধরে চোখে মুখে একটা বিকৃত সত্তা ভাব নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল এষ্টনীর সামনে। জিজ্ঞাসা করেছিল—কলকাতায় কি আমার চেয়েও সুন্দরী মেয়ে আছে?

এষ্টনীর মনে পড়েছিল কলকাতার সরস্বতীর কথা। সেও ঠিক এইভাবেই তার মন তোলাতে চেয়েছিল। তাতে আর মাসিতে অনেক তফাৎ থাকলেও মূলে বোধহয় দুজনেই এক। জবাব দেয়নি এষ্টনী, মাসি তাকে চেপে ধরেছিল—এখানে আসা থেকে আমাদের বাড়ী যাওনি কেন জানতে এসেছি। তোমার কাছ থেকে আমি কৈফিয়ৎ চাই।

এষ্টনী মৃদু হেসে শান্ত গলায় বলেছিল—কৈফিয়ৎ চাইবার মালিক কি তুমি?

মাসি উদ্ধতগলায় বলেছিল—নই কেন শুনি? তারপর গলার স্বর নামিয়ে তাতে খানিকটা ভাব লাগিয়ে এষ্টনীর গা ঘেঁসে এসে বলেছিল—সারা জীবনই তো আমাকে তোমার জিম্মাদারী করতে হবে।

এষ্টনী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—তার মানে?

মাসি জবাব না দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ এনে বলেছিল—আড়া কচি খোকা। তার মানেটা আজও তুমি যদি না বোঝ তো তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা কর। বলেই দুম দুম করে পা ফেলে ঘর থেকে বার হয়ে গিয়েছিল মাসি। যেতে যেতে বলেছিল—এবার আমায় সেধে এ ঘরে আনতে হবে। না সাধলে আসব না।

মাসির কথাতেই সবটুকু পরিষ্কার হয়েছে এষ্টনীর। কোলেক মামার সঙ্গে তাহলে বাবার কথাবার্তা আগেই পাকা হয়ে গিয়েছিল, মাসি জানে সে কথা। আশ্চর্য! ঐ মেয়েটাকে বিয়ে করতে হবে ভাবতেই যেন গাটা ঘিন ঘিন করে উঠছে এষ্টনীর। তাছাড়া একি অপমান। আমার বিয়েতে আমার মতামতের মূল্য নেই। আমার বাবা হলেন আমার ব্যক্তিগত জীবনেরও কর্তা। এ হতেই পারে না। ভাবছিল এষ্টনী তার বন্ধ ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে। কি করা যায়? কি করে বেরিয়ে পড়া যায় এই ঘরের ভিতর থেকে?

কিন্তু ছাড়া সে পেয়েছিল। পেয়েছিল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে।

সেই ঘটনাগুলো মনে হতেই ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের মধ্যে এষ্টনীর রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। সেই পালিয়ে যাবার আগের মুহূর্তের কটি দিন। কি অসাধারণ উত্তেজনার ভরে ছিল সেই দিনগুলো। সেই আশ্চর্য এক মেয়ের বাজের মতো শক্ত মনের সঙ্গে তার ফুলের মতো নরম অঙ্গের অঙ্গীকার। আজও তা

যেন জীবন্ত হয়ে জলছে এন্টনীর দেহমন ঘিরে। হঠাৎ সে অনুভব করল এই দীর্ঘ দশ বছরেও সে আশা এতটুকু কমেনি। সঙ্গে সঙ্গে এন্টনী তার মনের সুপ্ত বাসনাটার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল।

কতোবার সকাল সন্ধ্যা-রাতে মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দিয়েছে সেই মুখটা। লণ্ডনের সেই ধোঁয়াটে কুয়াশায় ঢাকা শীতে জড়সড় অন্ধকার দিনগুলোতে তাঁর মনের মধ্যে মাঝে মাঝে জলে উঠে সেই চাঁদ সূর্য্য টানা ঘনপল্লব ছাইনী মেয়া, চওড়া, টানা দুটি চোখের আলো। ঈষৎ উঁচু চোয়াল আর হাল্কা লিপষ্টিকে রাঙান চাটাল পুরুষ্টু দুটো ঠোঁট। বারবার তাকে টেনেছে দুরন্ত আবেগে। সবার ওপর টেক্কা দিত তার সাদা মুক্তোর মালার মতো সাজান ঝকঝকে দাঁতের সারি। তেলের মতো একটি ক্রীমের প্রলেপ মাখত সে তার মুখে। তার তামাটে রংএর ওপর সেই তৈলাক্ত প্রলাবনে যেন লোভনীয় আসক্তি গলে গলে পড়ত তার সারা অঙ্গ থেকে। লাবণ্যের ভরা জোয়ার বইত তার দেহ ছুড়ে। তার চোখের আর ঠোঁটের হাসিতে সে অনায়াসে মাতাল করে দিতে পারত যে কোন পুরুষকে। চুড়ো করে বিবিবাহার খোঁপা বাঁধত—সে তার স্প্রিংকরা চুলে। সব মিলিয়ে এক এক সময় তাকে মনে হত যেন সে এ রাজ্যের জীব নয়। যেন সুদূর হাওয়াই, হনলুলু কী পলিনেশিয়ার রৌদ্রোজ্জ্বল কোন দ্বীপ থেকে এসেছে সে তার আদিমতম আসক্তি আর কমনীয় নারীত্বের ঐশ্বর্য নিয়ে।

এই নিদারুণ দুপুরে অসহ্য গরমের মধ্যে চলন্ত ট্রেনের কামরায় এন্টনী আবিষ্কার করল যে সে তার বাবার কেবল্‌টা পাবার পর থেকে অবচেতনে কেবল ভেবেছে সেই একটি নারীমূর্তির কথা। আরও আশ্চর্য, এই যে দীর্ঘ দিন বিলেতে বাস করে, ইউরোপের নানা জাতের নারীর সংসর্গে এসেও সে সেই অদ্ভুত রহস্যময়ীকে একটি দিনের জন্যেও ভুলতে পারেনি। কিন্তু একি মরীচিকার পেছনে ছুটছে সে এই দীর্ঘদিন ধরে। যাকে কোনদিন সে পাবে না তাকে এভাবে মনে করার যে কোন মানেই হয় না। ঘটাং করে একটা শব্দ হল আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা থেমে গেল। চমক ভেঙে এন্টনী দেখল গাড়ী ভুস্‌কুড়িতে পৌঁছেছে।

রোগ শয্যায় শুয়ে ছিলেন গডউইন কার্ণাণ্ডো। দোতলার বিশাল হলঘরের মতো ঘরটার এক দিকের দেওয়াল ঘেঁসে তাঁর মেহগনি কাঠের প্রকাণ্ড ভারী খাটখানা পাতা ছিল। তারই উপর শুয়েছিলেন গডউইন কার্ণাণ্ডো। ঘরটার দেওয়ালে ঝোলান ছিল বড় বড়, ভারী গিল্টি ফ্রেমের বহু বিলাতী ছবি। কোনটায় ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড কী আয়ারল্যাণ্ডের দৃশ্য। স্কচ পাইনের জংগল, পাহাড়। পাহাড়ে নদীর ধার ঘেঁসে ডাকতে ডাকতে চলছে একটা রেড-ডিয়ার। কোনটায় বা একদল শিকারী একপাল কুকুর নিয়ে চলেছে খ্যাকশিয়াল কি খরগোস মারতে। কিন্তু বেশীর ভাগ ছবি ছিল বিদেশী স্ত্রীলোকদের। নানাভাবে, নানা ভঙ্গীতে আঁকা ইউরোপীয় নারীদের নানারকম রূপ। তাদের মধ্যে আর্টের চেয়ে নগ্নতাটাই হল প্রধান। কোণে কোণে বড় উঁচু কাঠের টিপয়ের ওপর সাজান মার্বেলের নগ্ন নারী মূর্তি ভিনাসের প্রতিকৃতির অনুকরণ। কিন্তু আবার এদের সঙ্গেই ঘরে ঢোকবার দরজার মাথার ওপরকার দেয়ালে কাঠের পালিশ করা ফ্রেমের ওপর দাঁড় করান ছিল মাতা মেরীর কোলে শিশু যিশু। তাদের দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে হোলি ঘোষ্ট আর সেণ্ট এ্যাণ্টনী। সেণ্ট এ্যাণ্টনীর কাঁচান মাথায় চক্রের মতো ঘিরে আছে সরু চুলের বেড়। আর তাদের আশে পাশে ওপর দিয়ে লটকানো আছে ভাঙা ওয়াল এ্রেলের দল। ছিতর মাথায় একটা ছোট ইলেকট্রিক বাল্ব লাগান, সেটা আট প্রহর জলছে রুগ্ন আলোতে। এর সমস্তটাই কাঁচের ডুমে

ঢাকা। তার ঠিক নীচেই একটা প্রকাণ্ড সিল্ক ফ্রেমে বাঁধান যিশুর এক বিরাট ছবি। যিশু দু'হাত দিয়ে বুকটাকে চিরে দেখাচ্ছেন। হৃৎপিণ্ডটাতে কাঁটা তারের বেড় আর মাঝখানে একটি ক্রস চিহ্ন।

সেইদিকে এক নজরে তাকিয়েছিলেন গডউইন কার্পাথো। তার সেই বিশাল দৈত্যের মতো চেহারা কুঁকড়ে দুমড়ে ছোট্ট হয়ে গিয়েছিল। বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়েছিলেন গডউইন। এক বছর ক্রমাগত ভুগছেন তিনি গলার ক্যানসারে। ভারতবর্ষের এমন ডাক্তার নেই যে তিনি দেখান নি। ভারতবর্ষের বাইরেও বহুত চিকিৎসার জন্যে তিনি যেতেন। কিন্তু সময় পাওয়া গেল না। ঘা-টা বীভৎস ভাবে বেড়ে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় কাটা পাঁঠার মতো ধড়ফড় করতে লাগলেন গডউইন। তারপর এই দীর্ঘ ছ'মাস ধরে তিনি দেখছেন গলার কাছটা পচে খসে খসে পড়ছে। বিরাট একটা গর্ত হয়ে গেছে জায়গাটায়। বাইরের দিক থেকে দেখলে ভয়ঙ্কর লাগে। আস্তে আস্তে গলার স্বরতন্ত্র গলেছে। এখন গলায় ঘড় ঘড় আওয়াজ ছাড়া আর কিছু বার হয় না। একটা বিশ্রী পচা গন্ধে সারা ঘরটা ভরে আছে। কিছুই নেই গডউইনের সেই অত বড় শরীরটায়। শুধু আছে চোখ দুটো। যতো দিন যাচ্ছে, শরীরের অন্যান্য অংশ যত অকেজো হয়ে পড়ছে, চোখ দুটো তত বেশী যেন ধারাল হয়ে উঠছে। সেই চকচকে ধারাল দুটো চোখ গডউইন মেলে আছেন সামনের দরজার দিকে, যার মাথার ওপর রয়েছেন মাতা মেরীর কোলে যিশু। আর তার নীচে যিশুর কাঁটার বেড় দেওয়া হৃৎপিণ্ড।

হঠাৎ দরজার ভারী পর্দাটা দুলে উঠল। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল গডউইনের দৃষ্টি। এ সময়ে এ ঘরে কেউ ঢোকে না। সকালে মারিয়া বাসন একবার আসে এ ঘরে। খাবার জন্য কিছু পাতলা জিনিষ, জল আর সামান্য ওষুধ রেখে যায় খাটের পাশে শ্বেত পাথরের টেবিলটায়। গডউইনের ইচ্ছে হলে খান, না হলে ওগুলো পড়েই থাকে। মারিয়া বাসন আসে দিনে দু'বার। সকালে আর সন্ধ্যা বেলাতে। তবু আসে তো! না এলেও কিছুই বলার ছিল না। এই বীভৎস রোগ তার এই দুর্গন্ধ সহ্য করে গডউইনের কোন আত্মীয়-স্বজনই এ ঘরে আসবে না। জানেন গডউইন একথা বেশ ভাল করেই। তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা যে তাঁর বাইরের দরজাতে তাঁর মৃত্যুর প্রতীক্ষায় তাগাড়ের শকুনির মতো হানা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একথাও তিনি জানেন। আর তা জানেন বলেই তাঁর যন্ত্রণাটা বেড়ে যাচ্ছে দ্বিগুণ। মরার আগে এতটুকু শান্তি পাচ্ছেন না তিনি।

পর্দাটা দুলে একপাশে সরে গেল। গডউইন স্পষ্ট দেখতে পেলেন তাঁর একমাত্র সন্তান এটনী এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের দরজায়। এত দীর্ঘদিন পরেও এটনীর চেহারার বিশেষ বদল হয় নি। তাকে দেখেই গডউইনের চোখ দুটো বুজে গেছে। এটনী বাইরের আলো থেকে ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রথমে চট করে কিছু দেখতে পায়নি। এটনীর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকেছে মারিয়া বাসন। সেই-ই গিয়ে গডউইনের বিছানার দিকের আলোটা জেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাকল—আইয়া স্বামী, দেখুন কে এসেছেন।

বাসের চেহারা দেখে ততক্ষণে এটনীর দু'চোখ জলে ভরে গেছে। এই কি তার বাবা? সেই সাত ফুট লম্বা, দৈত্যের মতো চেহারা, জোয়ান। গলার কাছটা আপনা থেকে ভারী হয়ে উঠেছে কান্নায়। বুক ঠেলে কান্না গোঙা উঠে আসতে চায়। বাবা বলে নয়, এ অবস্থায় যে কোন ব্যক্তিকে দেখলেই এটনীর মনটা গলে যেত। এ যেন ঠিক হাওড়ের আঠাল কাদায় আটকে মরে থাকা একটা জানোয়ার কঙ্কাল।

অনেকক্ষণ পরে চোখ মেললেন গডউইন। তীক্ষ্ণ চকচকে দুটো চোখ যেন কোটরের ভিতর থেকে ঠেলে বার হয়ে আসতে চাইল। ইতিমধ্যে তাঁর চোখের জলও শুকিয়ে গিয়েছিল।

এটনী জানে না তার বাপের অসুখটা কি? সে ধপ করে তার বাপের পাশে বসে দু'হাতে ঘিরে তাঁর শরীরটাকে আঁকড়ে ধরতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র পচা গন্ধে তার সমস্ত মন যেন অস্থির হয়ে উঠল। ভেতর থেকে তাকে যেন কে ঠেলতে লাগল বাইরের দিকে। কিন্তু সে ভাবটাকে সে দমন করেই জিজ্ঞাসা করল তার বাবাকে—কি হয়েছে?

জবাব দিতে গিয়ে গডউইনের গলা থেকে ঘড় ঘড় করে খানিকটা বিকৃত আওয়াজ বার হয়ে গেল। গলার জড়ান ব্যাণ্ডেজটার খানিকটা খুলে ফেললেন তিনি। এটনী সেটা দেখে যেন চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো লাফিয়ে উঠল। ক্যানসার! কিন্তু তার পরক্ষণেই আবার সে তার বাপের বিছানার পাশে গিয়ে বসল। অদ্ভুত মমতার সঙ্গে হাত বুলোতে লাগল তাঁর গায়ে মাথায়। যেন একটা ছোট্ট শিশুকে গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা জানাচ্ছে এটনী।

ওদিকে গডউইনের হাতটাও বেরিয়ে এসেছে। সেটা ঘুরে বেড়াচ্ছে এটনীর পিঠের ওপর—পরশ দেহে। কিন্তু এটা তো মানুষের হাত নয়। যেন একটা প্রেতের অস্থি। থরথর করে কাঁপছে হাতটা। কী অসম্ভব লম্বা আর চওড়া হাতের হাড়টা, কুঁচকে যাওয়া শুকনো কালো চামড়ায় ঢাওয়া। এই হাতেরই একটা চড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল এটনী। মনে পড়ল সে কথা।

অর্ধেক রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল এটনীর। একটা অস্পষ্ট গোঙানীতে আর্তনাদ ভেসে আসছিল তার বাপের ঘর থেকে। এটনী ঘুমন্ত চোখেই দৌড়ে গেল সেদিকে। বাপের ঘরে গিয়ে দেখল অসহ্য যন্ত্রণায় বিছানাটা লোলপাড় করছেন গডউইন। একটা বর্ষায় বেঁধা সাপের মতো তাঁর শরীরটা একেবারে কুঁকড়ে গিয়ে পরক্ষণেই ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো ছটকে যাচ্ছে।

এটনী ঘরের বাইরে এসে ডাকাডাকি জুড়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্য! একটা লোকও এই এত বড় বাড়ীটার একটা ঘর থেকে বার হল না। এই বড় বাড়ীর মধ্যে ঘর আছে বিশটা। আর তাতে গডউইনের আশ্রিত হয়ে বাস করে খুব কম করে চোদ্দটা সংসার। সবই জানে এটনী। কিন্তু এখন কি করা যায়। সে দৌড়ে গিয়ে টেলিফোনের নম্বর খুঁজতে বসল। কিন্তু কোন্ ডাক্তারকে সে ডাকবে? সে তো এখানকার কাউকেই চেনে না। অসহায়ের মতো টেলিফোন রেখে সে আবার তার বাবার ঘরে ফিরে এল। কিছু করতে না পেরে সে শুধু হাত বুলোতে লাগল তার বাবার শরীরে।

ঘণ্টা দুই এইভাবে যাবার পর গডউইন কিছুটা শান্ত হলেন। তারপর হাতের ইঙ্গিতে এটনীকে কাছে ডাকলেন। কানের কাছে মুখ এনে বলতে লাগলেন—এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। কোন মানুষই সহ্য করতে পারে না। মনে করেছিলাম হাতের শির কেটে দিয়ে মরি, তাতে মৃত্যু তাড়াতাড়ি হত। কিন্তু চার্চ ফাদারের কাছে সেকথা কনফেস্ করতেই তিনি বাধা দিয়েছিলেন। বললেন—সারা জীবন যে পাপ আমি করেছি, এই ভাবেই নাকি তার প্রায়শ্চিত্ত হবে। সব পাপেরই ক্ষমা আছে কিন্তু আত্মহত্যা করলে নাকি ঈশ্বরের ক্ষমা পাওয়া যায় না। প্রথমে গডউইনের কথাগুলো বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল এটনীর। এখন কেবল ঘড়ঘড় নয় একটা চাপা হিস্ হিস্ আওয়াজ আসছিল তাঁর গলার ভিতর থেকে। শুনতে শুনতে একটু পরেই কথাগুলো বুঝে নিতে লাগল এটনী।

তোমার ওপর আমার অনেক অবিচার হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম পয়সা থাকলে দেখবার লোকের অভাব হবে না। আমি এই কুদ্র কুড়ির মধ্যে সবচেয়ে ধনী হয়েছিলাম, কিন্তু আমার লাভ হল কি? যাদের

মনে করেছিলাম আমার বৃদ্ধ বয়সে শান্তি দেবে, তারা এখন কোথায় পালিয়ে গেছে। টাকার লোভ দেখিয়েও তাদের কাছে আনতে পারিনি।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে সুরু করেছিলেন তিনি—তারা কিন্তু আছে। আশেপাশে আছে। ভাবছে বুড়ো শকুনটা মরবে কবে। আর আমি মরলেই আমার বিষয় সম্পত্তি, তারা শকুনির মত ছিঁড়ে খাবে। আমি এখন অসহ্য যন্ত্রণার দিন কাটাচ্ছি আমার এই সম্পত্তির বোঝা নিয়ে। রোগের ওপরে এভার আর সহ্য হচ্ছে না।

এইটুকু বলেই হাঁপিয়ে উঠলেন গডউইন। কিছুক্ষণ চুপ করলেন। একটু জল খেলেন অতি কষ্টে মুখ বিকৃত করে। তারপর বললেন—এটনী, তোমার কাছে জীবনে আমি কোন কিছু চাইনি। আজ আমি তোমার কাছে একটা জিনিষ চাইব। দেবে কি আমায়?

এটনী ধরা গলায় বলল—বলুন কি চান?

আমার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে আমাকে ভারমুক্ত কর! এর বদলে আমি তোমাকে দেব আমার জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। আমি সমস্ত লিখিয়ে রেখেছিলাম একজনকে দিয়ে।

বলতে বলতে আবার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়লেন গডউইন।

এটনী তার বাবার শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—কিছু ভাববেন না, আমি আপনার সম্পত্তির সব ভার নেব।

উত্তরে তার বাবা কিছুই বলেননি। শুধু যন্ত্রণার মধ্যে কাতরাতে কাতরাতে বালিশের তলা থেকে সিলকরা একটা প্যাকেট বের করে দিয়েছিলেন এটনীর হাতে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিলেন—আমার সব কথা এতে লেখা আছে। তবে এখন তুমি এটা দেখো না। যেদিন তোমার সমস্ত মন দিয়ে আমায় তুমি ক্ষমা করতে পারবে সেইদিনই এটা খুলে পড়বার অধিকার তোমার রইল। প্রতিজ্ঞা কর তার আগে খুলবে না।

প্রতিজ্ঞা করেছিল এটনী। সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা শান্ত ছেলের মতো বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনি ঘুমোলেন প্রায় পুরো দুটো দিন। এমন ঘুম তিনি ঘুমোননি গত কয়েকমাস ধরে। এতো ঘুম নয় যেন তাঁর রোগজীর্ণ শরীরে কোমল শীতল প্রলেপ।

এর পরেও দীর্ঘ ছমাস বেঁচে ছিলেন গডউইন কার্পাণ্ডো। প্রাণটা যেন শেষ অবধি আর বেরুতে চায় না। কি অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছেন দিনরাত। তবু এটনী আসার পরের দিন থেকে তাঁর মুখে এতটুকু বিকৃতি কেউ দেখেনি।

মারা যাবার দু'দিন আগে তিনি নিজেই তাঁর শিয়রে দুটো বাতি জ্বালিয়ে দিতে বলেছিলেন। চার্চের পুরুতকে ডেকে বলেছিলেন তাড়াতাড়ি 'একসট্রীম আংকশান' (প্রায়শ্চিত্ত) সেরে ফেলবার জন্যে। তিনি তাঁর শেষ কনফেসন্ দিয়ে দুনিয়ার সঙ্গে হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে ফেলতে চান। তার সঙ্গেই তিনি ডাকিয়েছিলেন তাঁর এ্যাডভোকেট ও বন্ধু রামচন্দ্রন আয়ারকে। অনুরোধ করেছিলেন তাঁর শেষ উইল তৈরী করতে।

একথা বাইরে রটনা হতে বেশী দেরী হয়নি। কথাটা রটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই গডউইনের ভাইং রুমে ভীড় লেগে গিয়েছিল ধর্মকদের। ফোনেক সিরিল আর তার ভাই এলবার্ট ঘন ঘন বাড়ীর মধ্যে যাওয়া-আসা করছিল। এরাই হল আত্মীয়তার দিক থেকে গডউইনের সবচেয়ে নিকট। তাঁর বাড়ীতে যারা

আশ্রিত হয়ে থাকত, তারা যে কে কোথা থেকে এসেছিল তাদের বেশীর ভাগেরই হিসাব কেউ রাখত না। গডউইন এমনিতে ভরণপোষণ করতেন অনেকেরই, আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিচারে।

ছুটির দিনের ভীড়ে ছিলেন অনেকেই। এই এলাকার চার পাঁচটা চার্চের পুরুত, কয়েকটি অর্ফ্যানেজের কর্মকর্তারা, তাছাড়া গডউইনের ব্যবসার সূত্রে যারা তাঁর কাছাকাছি এসেছিল তাদের অনেকেই। পাশ্বর্তী দরজার বারান্দায় সবাই প্রায় হাজির ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শোক দেখাচ্ছিলেন সুলতান কার্ভোজা। তিনি একবার গডউইনকে দেখতে যাবার ছল করে ভিতরে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গডউইন রাজী হননি।

রামচন্দ্রন আসার পরে থেকে গডউইন তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন। ঘরের মধ্যে রইলেন তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ম্যাথুসেল কোরেয়া আর পালিয়াম কোর্টার সেন্ট জোসেফ কলেজের অধ্যক্ষ বৃদ্ধ ফাদার ভিক্টোরিয়া। তাঁর চিকিৎসক ডাক্তার ম্যাথুসেল মোথাকে তিরুপেলভেলী থেকে খবর দিয়ে আনিয়েছিলেন গডউইন। তিনিও সেই ঘরে ছিলেন আর একজন সাক্ষী হিসাবে।

শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন গডউইন। উইল শেষ হল নিঃশব্দে। গডউনের হাতের টিপ ছাপ নিলেন রামচন্দ্রন আয়ার। কোনদিন লেখাপড়া শেখেননি গডউইন, তাই নিজের নাম সই তিনি করতে পারতেন না।

এদিকে বাইরের ঘরে নানান মুখে গডউনের নানাপ্রসঙ্গ সুরু হয়েছে। সেখানে আছা উই থেকে সুরু করে চোখের জল পর্যন্ত সবই এসে পড়েছে। তাদের মধ্যে চুপ করে বসেছিল এস্টনী। দীর্ঘ দু'মাস সে তার বাবার ঘর থেকে বাইরে আসার অবকাশ পায়নি। সেবা করে রোগীকে যতটুকু আরাম দেওয়া সম্ভব, সে তার ত্রুটি রাখেনি। গ্রাহ্য করেনি তারকের ক্যানসার রোগের সংক্রমণকে। এতটুকু বিতৃষ্ণা আসতে দেয়নি সেই দুর্গন্ধ ভরা ক্ষতের সেবাতে। নিজা সে তার বাবার যা ধুইয়েছে, পরিষ্কার করেছে রক্ত, পুঁজ দু'হাত দিয়ে। মায়ের মতো ঘর করে খাইয়েছে। কিসে তার বাবা এতটুকু আরামে থাকেন তার কোন ত্রুটি রাখেনি এস্টনী। এই দীর্ঘ দু'মাস সে ভেবেছে সে নিজেকেই শিক্ষা দিচ্ছে একটি ব্যাপারে। সেটা হল আর্তের, রুগ্নের সেবা।

বাইরের ঘরে যে ভীড় জমেছিল এস্টনী ছিল তাদের কাছে নিতান্তই অপরিচিত। তাই কারুর সঙ্গেই সে আলাপ পরিচয় করছিল না। কিন্তু সবাই যে তারই দিকে সশ্রিত দৃষ্টি মেলছিল বার বার এটা সে অনুভব করতে পারছিল।

সুলতান কার্ভোজাকে সে চিনতে পেরেছিল সুলতান বাড়ীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু সুলতান এস্টনীকে চিনতে পারেনি। সুলতান তখুনি মারিয়া দাসনকে ডেকে বলেছিলেন—আইয়াকে দেখতে এলাম। বল গিয়ে সুলতান কার্ভোজা আসতে চান ভিতরে।

মারিয়া দাসন ফিরে এসে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল।

সুলতান কার্ভোজা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ফিরে ভিতরে যেতে পারি এখন?

মারিয়া দাসন হাত কচলে মুখ নীচু করে জবাব দিয়েছিল—আজ্ঞে না।

কেন তোর আইয়া কী বললে?

জবাব দিতে আবার ইতস্ততঃ করেছিল মারিয়া দাসন। শেষে সুলতানের তাড়া খেয়ে বলেছিল—আইয়া বললেন তার কফিনের পিছনে আমার জন্যে তৈরী হতে। তার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।

সুসান একটু চমকে গিয়েছিল মারিয়া হাসনের কথা শুনে। তারপর সামলে নিয়ে মারিয়া হাসনকে একদিকে ডেকে নিয়ে নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। হ্যাঁরে শুনলাম নাকি ভিতরে উইল পাল্টান হচ্ছে সত্যি নাকি?

কথাগুলো যত আস্তেই বলার চেষ্টা করুক সুসান তাঁর ভাঙা ছেঁড়ে গলায় সেগুলো খুব আস্তে বার হয়নি। এটর্নীর কান এড়ায়নি কথাগুলো।

মারিয়া হাসন জবাব দিয়েছিল- কি জানি আইয়া, ওসব বুঝি না।

সুসান ঘরের প্রত্যেকের সঙ্গে ঘাড় নীচু করে গোপনে ফিসফিস করে কি সব কথা বলেছিলেন। তারপর এক সময় তাঁর প্রকাণ্ড চেষ্টা মাথাটা নাড়তে নাড়তে বার হয়ে গিয়েছিলেন। যাবার সময় সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিলেন—এই সময় কি ঐ সব বৈষয়িক ব্যাপার আলোচনা করার সময়! একটা ভাল ডাক্তার এনে যদি কেউ না দেখাতে পারে তো বন্ধু হিসেবে এক ঘরের লোক হিসেবে আমার সে কর্তব্য আছে। আমি তা করব। কে একজন মন্তব্য করেছিল—তাহা এতো বুদ্ধীরাজ বিসর্জন সব বিফলে গেল। শীকারটা বোধহয় ফস্কে গেল সুসীরের। তা ভাল ডাক্তার এতদিন দেখাবার ব্যবস্থাটা উনি করেননি কেন?

বাড়ী থেকে বার হবার মুখে সুসান মুখোমুখী হলেন জোসেফ পিরিসের। ভুরু নাচিয়ে তিনি শুধোলেন—উইলের কি হচ্ছে হে? সম্পত্তির ওয়ারিশান হল কে?

জোসেফ মুখ ভেতো করে জবাব দিল—কে আবার, যে আইনতঃ হতে পারে সেই বোধ হয়।

সুসান তাড়াতাড়ি বললেন—সে তো শুনি তাজ্য পুত্তুর হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

জোসেফ এটর্নীর দিকে চেয়ে বলল—সে এখানে রয়েছে গত ছ'মাস ধরে।

সুসানের ছোট ছোট ধূর্তামি ভরা চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসার জোগাড় করল। বললেন—এ্যাঁ, তাই নাকি? ছ' মাস সেই ছেলেটা এখানে রয়েছে? তা হলে কাস্টারকার মহাজন সমিতির কোন আশাই নেই, কি বল?

তারপর পকেট থেকে রোজারিটা বার করে সজোরে মাথা টপকাতে টপকাতে গিয়ে বসলেন তাঁর চাউল গাড়ীটার মধ্যে। এক নিমেষে গাড়ীটা তাঁকে নিয়ে উধাও হল।

সেদিকে চেয়ে জোসেফ মুখ ঘটকে একটা রসাল হাসি হাসল! তার ভাই এলবার্ট এসে জিজ্ঞাসা করল—কী ব্যাপার হাসছ কেন?

জোসেফ বললে—বনে হাতী মরছে ধূর্ত শেয়াল তাদে আছে তার মাংস খাবার।

এলবার্ট বললে—কে সুসান এসেছিল? তার সেই কাস্টারকার মহাজন সমিতির নামে যাতে বুড়োর সম্পত্তির সমস্তটা হাত করতে পারে তারই তদ্বিরে, নয়?

—হ্যাঁ।

আমায় খবর দিলে না কেন একবার দেখতাম জিজ্ঞাসা করে এ বাড়ীর দেনার কর্তটা ঠিক করে রেখেছে কিনা। আমাদের হাতে যদি সম্পত্তি আসে আমি আগেই বলে রাখছি আত্মীয়তার খাতির আমি রাখব না। যে ব্যাঙ্ক গডউইনের কাছ থেকে সুসান নিয়েছে তার পাইপয়সাটা পর্যন্ত আমি আদায় করে ছাড়ব।

জোসেফ আনমনা হয়ে বললে—সম্পত্তি আমাদের হাতে এলে তো!

এলবার্ট গলা নীচু করে বললে—নিশ্চিন্ত থেকো দাদা, এটর্নীকে তার বাপ এক পয়সাও দেবে না। তা সে যতই কেননা ভালবাসা দেখাক সেবা করে। মারিয়া হাসন নিজে বলেছে আমায় একথা।

জোসেফ বললে—ভেবেছিলাম তো তাই। কিন্তু এখন ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে বুড়ো উইল পাল্টেছে। তাই তো বার বার ভেতরে আনাগোনা করছি। কিন্তু বুড়োর হুকুমে সেই যে ঘরের দরজা বন্ধ করেছে সেতো আর খোলার নাম করছে না।

বলতে বলতে রামচন্দ্রন আয়ার আরও সবাই যারা ঘরের মধ্যে ছিলেন বার হয়ে এলেন। সবাই নিজের নিজের গাড়ীতে গিয়ে বসলেন। গডউইনের প্রকাণ্ড প্যাকার্ড গাড়ীটা তৈরী হয়ে এল রামচন্দ্রন আয়ার আর রেভারেণ্ড কাদারকে নিয়ে যাবার জন্যে। রামচন্দ্রন আয়ার মারিয়া হাসনকে বললেন—একবার এষ্টনীকে ডেকে দেতো।

শুনেই এষ্টনী নিজে বার হয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। রেভারেণ্ড কাদার তাকে আশীর্বাদ করে বললেন—এঁ্যা তুমিই এষ্টনী, তা বেশ বেশ যেও মাঝে মাঝে আমার ওখানে।

তারপর রামচন্দ্রন তার সঙ্গে ঘাড় নীচু করে আস্তে আস্তে অনেকক্ষণ ধরে কিসব আলোচনা করলেন। আলোচনা শেষ করে দু'জনে গিয়ে গাড়ীতে বসলেন। এষ্টনীর সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত লাগছিল। এই ভীড়, এই অর্থি-প্রার্থী, এই জোসেফ এলবার্ট, এই সুসান কার্ডোজা! যে লোকটা দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্যে চলে যাচ্ছে তার কথা এরা কেউ ভাবছে না। এরা ভাবছে এরা পৃথিবীতে চিরকাল বাঁচবে কাজেই এদের টাকার প্রয়োজন। আর তার বাবার যখন টাকা আছে তখন মরবার সময় তিনি কেন তাদের সেই টাকাগুলো বেঁটে দেবেন না। মনটা তার এমনিতেই খারাপ হয়ে ছিল। তার ওপরে এই ব্যাপারটা তার মধ্যে একটা বিশ্রী ঘৃণা এনে দিল তার নিজের লোকেদের ওপর। ভাবতেই খারাপ লাগছিল তার এই জোসেফ এলবার্ট এরা তার আপনার জন, তার মামা, তার বাবার মৃত্যু হলে এরাই এসে তাঁর শরীরটাকে ছোঁবে।

মারিয়া হাসন এসে খবর দিল পুরুত এসেছেন এক্সট্রীম আংকশান এর জন্যে। অভিষেক কাজ সুরু করলেন পুরোহিত। গডউইনের হাতে-পায়ে, চোখে মুখে, নাকে-কানে, স্বর্গীয় ঔষধ (অলিভ অয়েলের মতো একরকম তৈল) লেপন করলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন রোগীর সর্বরোগ নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করে। ঘর থেকে সবাই আবার চলে গেল পুরোহিতের আদেশে। তিনি গড্‌উইনের শেষ কন্‌ফেসন নিলেন। তারপর গডউইন ঈশ্বরের ক্ষমা যাচ্ঞা করে নিলেন (এব্‌সোলিউসন)। পৃথিবীতে এসে মাটীর জীব অনেক পাপ করেছ তুমি। সেই সমস্ত পাপ ধুয়ে আমি তোমাকে আমার রাজত্বে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত করছি। তুমি আমার ক্ষমা নাও নিয়ে পবিত্র হও। তারপর এসো সেই মহান অপেক্ষার ক্ষেত্রে। যেখান থেকে আমি তোমাকে টেনে নেবো আমার বুকে। আমেন।

এবসোলিউসন নেবার পর সবাই এসে আবার ঘরে ঢুকল। আজ শেষ দেখা করার দিন। গড্‌উইনের ইচ্ছায় তাঁর ঘরের চারটে দরজাই খুলে দেওয়া হয়েছে। নিঃশব্দে দলে দলে লোক আসতে লাগল ঘরে। এরা সাধারণ লোক, নৌকোর মাঝি মাল্লারা, মাছ মারা জেলের দল, দিনমজুরের দল। সবারই চোখে জল। এষ্টনী দেখল তার বাবার মুখের চেহারা হয়ে উঠেছে অনেক প্রশান্ত। তিনি যেন এবার পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোতে চাইছেন। শরীর থেকে তাঁর মন অনেক উর্ধে উঠে গেছে সম্ভবতঃ। তাঁর এই অবস্থাতে কেউই তাঁকে আর ডেকে বিরক্ত করল না।

ওদিকে নীচের তলায় আত্মিয়দের মধ্যেও কারুর ঘুম পড়ে গেছে। যারা আসছে তারাও কাঁদছে অল্প বিস্তর। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলছে—আহা, একটা দিকপালের পতন হল।

সবাই এখন ভুলে গেছে গডউইনের অতীতের কথা। এষ্টনী নিজেও বিস্মিত হয়ে ভাবছিল সেকথা। এখন যারাই দেখতে আসছে, সবাই তাঁকে দিচ্ছে করুণা, ক্ষমা, সমবেদনা। এইটাই কি ঈশ্বরের ক্ষমা? এইটাই কি এব্‌সোলিউসন? ভাবল এষ্টনী আপন মনে। (ক্রমশঃ)

বিশ্ব
ব্যঙ্গ
চিত্র

—ফুটবল রীলে—

(আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র)

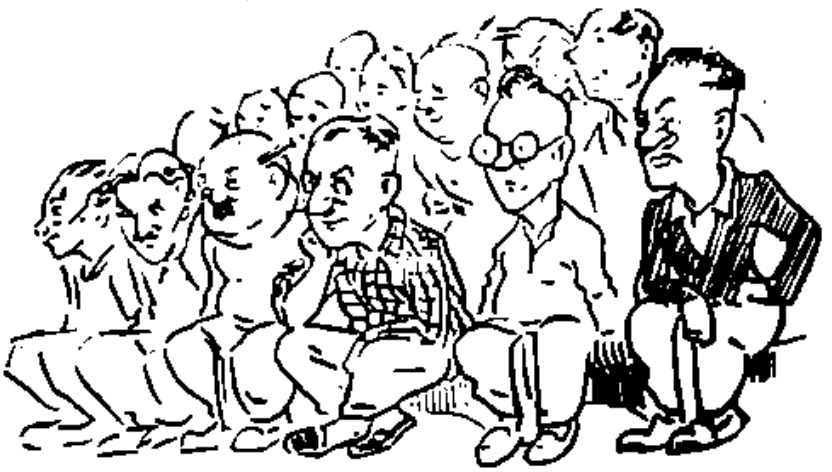

বেশ শুরু হোল

হ্যাঁ—চমৎকার খেলছে—

বাঃ বেড়ে জমেছে—

আঃ আঃ এই যে! এই যে!

চালাও—চালাও! মার্—মার্—

গোল। গো—ও—ল!!

.....কিক্

সুবিখ্যাত কার্টুনশিল্পী বিনয় বসু অঙ্কিত)

॥ একজন আর কয়েকজন ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভাগলপুরে কৈশোর-জীবন থেকে শরৎচন্দ্রের অধিনায়কত্বে যে গল্প-বলার সুরু, যৌবনে ভবানীপুরে 'তরুণী' নামে লেখা পত্রিকায় তার অনুশীলন, 'সাহিত্য', 'নারায়ণ' 'যমুনা'—তারপর 'প্রবাসী', ভারতবর্ষ এবং বিচিত্রার যুগ থেকে আধুনিক কালের 'আনন্দ-বাজার', 'যুগান্তর' এবং 'গল্পভারতী' পর্যন্ত উপেন্দ্রনাথের গল্পচর্যা। অনেক গল্প লিখেছেন এবং অনেক গল্প বলেছেন।

১৯১২ সালে প্রথম গল্পের বই 'সপ্তক' আর ১৯৫৯ সালে শেষ গল্পের বই 'বেহুঁড়ি।' ১৯৫৫ সালে 'শ্রেষ্ঠ গল্প'—বাঙলার গল্প সাহিত্যে অবিস্মরণীয় অবদান।

আত্মীয় শরৎচন্দ্রের মতবড় আশা উপেন্দ্রনাথের গল্পের অবিনশ্বরতা সম্পর্কে। সে-আশা আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ সমালোচকবৃন্দও স্বীকার করছেন। অধ্যাপক ভবতোষ ভট্টাচার্য, সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী, ডক্টর রথীন রায় এবং ডক্টর গুরুদাস ভট্টাচার্য এঁরা এ-কালীন মতবাদে আস্থা রেখেও বলেন, 'উন্মীলন পন্থাই তাঁর শিল্প পন্থা। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর আত্ম প্রকাশের সম্বন্ধে আমাদের কথা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মূল বলা যেতে পারে।' 'এরকম চমৎকার গল্প যিনি লিখতে পারেন বাঙলা কথা সাহিত্যে তাঁর স্থান প্রথম সারিতে হওয়া উচিত।' 'চরিত্র চিত্রণের জন্য গল্পকার উপেন্দ্রনাথ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।' 'তাঁর রচনা তাঁরই আলোক শিখা।' 'এবং একা উপেন্দ্রনাথের নয়, আজকাল ও সবকালের যথার্থ শিল্পী মাত্রেরই এই ধর্ম, এই রীতি।'

শিল্পী ধর্ম নিয়েই কবি উপেন্দ্রনাথের কথা-সাহিত্যের রাজপথে আগমন। ছোট গল্প থেকে জীবনের পরিধি আরো বিস্তৃত পথে এগিয়ে চলে।

শরৎচন্দ্র তাগিদ দেন, আরো বড় গল্প লেখো উপীন, উপন্যাসে হাত দাও। প্রয়োজনের তাগিদে তরুণ উপেন্দ্রনাথ ভাগলপুর কোর্টের উকীল। অগ্রজের সঙ্গে অনুজ একই কোর্টে প্র্যাকটিশ করেন। হাকিম সাহেব শোনেন, জুনিয়ার উকীল একজন সাহিত্যিক। হাকিমের এজলাস থেকে ছুটিরক্ষে উপেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ আসে—স্রষ্টার আসন লাভ করেন উপেন্দ্রনাথ সৃষ্টির সন্ধানে।

ভাগলপুরের সমাজজীবন—সেখানে সাহিত্য এবং গানের বৈঠক। উপেন্দ্রনাথ আসর জমিয়ে রেখেছেন গল্প এবং গানে। জীবন প্রতিষ্ঠিত, আর্থিক সচ্ছলতা এবং সুস্থ জীবন। তবু যেন কিসের অভাব। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে চিঠি লেখেন, জীবনের ব্যবহারিক কাজে মিশে গিয়ে বৃহত্তর সৃষ্টিকে খর্ব করো না। কাজের সঙ্গে কলমও চলুক।

আর তাগিদ দেন উপেন্দ্রনাথের জীবন-সঙ্গিনী শ্রীমতী বিভাবতী বন্দ্যোপাধ্যায়। উকীলের চোগা-চাপকান, হলদমুদ্রার স্ফীতি, গণ্ডীবদ্ধ নাগরিক জীবন—বিভাবতী দেবীকে তেতোষানি আকৃষ্ট করতে পারে না, তার চেয়ে বহুক স্বামীর লেখার পাণ্ডুলিপি তাঁকে আরো বেশি আনন্দ দেয়। 'শশিনাথ'

লেখা চলছিল। সে-লেখা কবে শেষ হবে? শেষ যদিও বা হোল তাহলে দীর্ঘ তিনবছর ধরে বাক্স বন্দী হয়েই যা থাকবে কেন?

ভাগলপুরের জমিদারি সংক্রান্ত মস্ত বড় কেসে সাহিত্যিক এবং দেশনেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এলেন মামলার ব্রীফ নিয়ে। তরুণ উকীল উপেন্দ্রনাথ তাঁর জুনিয়ার। ভাগলপুরে হৈ চৈ পড়ে গেল। দেশবন্ধু চিনলেন শরৎনাথের লেখককে। উপেন্দ্রনাথ চিনলেন দেশবন্ধুকে। মামলার আলাপ-আলোচনার বাইরে সাহিত্যের মজলিশ বসে—গানের আসর বসে।

দেশবন্ধু আহ্বান জানান, চলে আসুন উপেন বাবু। ওকালতি করে কি হবে? সাহিত্যের রাজপথ আপনার জন্যে অপেক্ষমান।

উপেন্দ্রনাথ তখন সে আহ্বানে সাড়া দিতে পারলেন না। কলকাতা করপোরেশনের লোভনীয় চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব জানালেন দেশবন্ধু: উপেন্দ্রনাথের তাও মনঃপূত নয়।

ভাগলপুরের সাহিত্য-মজলিশ, হাতের লেখা পত্রিকা 'তরণী'র সহযাত্রী বন্ধুরা এবং কবীন্দ্রপালের যমুনাকে যে আরম্ভ কাজ আরম্ভ করেছিলেন, তার জন্যে মন তাঁর উন্মুখ। সাহিত্যই জীবন, সাহিত্যই তাঁর কাছে সব কিছু। শুধু নিজেকে নিয়ে নয়, আরো অনেককে নিয়ে সাহিত্যের রাজপথে তাঁকে নামতে হবে। তাঁকে সৃষ্টি করতে হবে 'অভিজান', 'বিকৃপুর', 'অমূলতরু', 'রাজপথ', 'অমলা'—আরো কতো, আরো কতো। সম্মুখে জীবনের বহু প্রশস্ত পথ। বহু অভিজ্ঞতা, বহু বহু কথা ও কাহিনী প্রকাশের অপেক্ষায় অপেক্ষমান,—আরো কত তরুণ সহযাত্রীদের সঙ্গে নিতে হবে—যাদের মধ্যে প্রতিভার অঙ্কুর। তাদের বিকাশের পথ চাই। সে পথ গড়তে হবে। কবীন্দ্রপালের 'যমুনা' অবলুপ্ত। 'প্রবাসী, ভারতবর্ষ' খ্যাতনামাদের জন্যে। তিনি চান নতুন কাগজ, নতুন সাহিত্য-দীপ্তি। ভাগলপুরের ওকালতি জীবনে ব্রীফের পাহাড় কিংবা কলকাতা করপোরেশনের বড় চাকরিতে সে-আশা মিটবার কথা নয়।

১৯২৬ সালে এলো সেই আকাঙ্ক্ষার জীবনের সফলতার দিন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হবে বাঙলা-সাহিত্যের সেরা কাগজ 'বিচিত্রা'। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তার সুযোগ্য সম্পাদক।

উপেন্দ্রনাথ ছুটলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে। খবর পাঠালেন শরৎচন্দ্রকে—সাহিত্যের দুই দিকপালের পুণ্যস্পর্শে 'বিচিত্রা' সঞ্জীবিত হোক! শ্রেষ্ঠ শিল্পী নন্দলাল বসু এলেন অকুণ্ঠচিত্তে। আরো আরো কত কত জন। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জরাসন্ধ তখনকার দিনের অপরিচিত লেখক। আরো তরুণতর প্রতিভার অন্বেষণ চললো—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, আশীষ গুপ্ত—সেই দলের।

উপেন্দ্রনাথ গল্প লিখতে বলেন, উপন্যাস রচনার জন্যে তাগিদ দেন। নিজে লেখেন—আর বহুজনকে লেখান।

উপন্যাস লেখক উপেন্দ্রনাথের তখন পূর্ণ বিকাশ। 'অভিজানে'র 'সন্ধ্যা' উপেন্দ্র সরীর এক পরম বিস্ময়। সমাজ চেতনায় মুখর, জীবন-রসে নিভীক, তাঁর সুস্থ নায়ক নায়িকা মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সুনিপুণ দক্ষতা, কাহিনী সংযোজনায় অভিনবত্ব, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বিচিত্র জীবন-স্পন্দন, বাক্য বিন্যাসে সুচারুত্ব, কথোপকথনে নাটকীয় শব্দ সম্ভার, পরিহাসে সূক্ষ্ম, রসমাধুর্যে রসসমৃদ্ধ—উপেন্দ্রনাথের বহু বহু উপন্যাস তাঁকে প্রথম শ্রেণীর কাহিনীকার রূপে বাঙলা সাহিত্যে পরিচিত করেছে।

সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তনশীল। যুগে যুগে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। উপেন্দ্রনাথও তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু কাহিনীকারের প্রধান যে প্রদাধগুণ—সে-নীতিতে ছিলেন তিনি অভ্রান্ত।

গল্পের যুগ শেষ হয়ে আসছে। মনন-প্রধানতা আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-বিন্যাস। এ-নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক আমরা তাঁর সঙ্গে করেছি। উপেন্দ্রনাথ বলেন 'না, তা হচ্ছে বহির্ধর্ম, অন্তর ধর্ম গল্পের গল্পই।'

যে-কোনো কাহিনীকে যদি গল্পের মতন করে বলা যায়—তাই হবে সার্থক কথা-সাহিত্য। আধুনিক কালের কাছে তা তিনি প্রমাণ দিয়ে গেছেন।

তরুণ গল্প লেখক সন্তোষ দত্ত এলেন দক্ষিণ বাঙলার একটি গ্রামে উপেন্দ্রনাথকে নিয়ে যাবার জন্যে। গোকর্ণ গ্রাম। এককালে ছিল বর্ধিষ্ণু। এখনো সেখানে শিক্ষিতজনের অভাব নেই। দ্বিপ্রাহরিক আহারাদির পর চণ্ডীমণ্ডপে সাহিত্য সভা বসেছে। গ্রামের আশপাশ থেকে বহুজন সমুপস্থিত। প্রধান আকর্ষণ প্রবীণ উপেন্দ্রনাথ।

আসর জমকিয়ে বসে উপেন্দ্রনাথ আহ্বান জানালেন আধুনিক কালের কয়েকজন গল্প লেখককে। আশীষ গুপ্ত, অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন মাইতি, সন্তোষ দত্ত—আরো দু'একজন। বললেন, 'বলো, তোমাদের মননশীলতার কাহিনী।'

গল্প বলা হোল, কিন্তু গল্প জমে না।

উপেন্দ্রনাথ সুরু করলেন, চোরের গল্প, ছানিপড়া চোখ এক অন্ধের গল্প। সে গল্প বৈঠকী গল্প। কিন্তু শ্রোতাদের অনুরাগের অন্ত নেই। 'আর একটা গল্প, আর একটা গল্প!'

এ-যেন সেই কথামালার শিশুকাব্য গল্প—'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।'

'তারপর'?

'বাঘ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল।'

'তারপর'?

গল্প গল্পই। চোরের গল্পে চোরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ছানি পড়া চোখের প্রায়-অন্ধ তিনভাইয়ের গল্পে দৃষ্টি হীনের মনস্তত্ত্ব; কিন্তু সে সব ছাড়িয়েও গল্পের সাসপেন্সই হল প্রধান আকর্ষণ।

'তারপর'?

'তারপর' কি?

উপেন্দ্রনাথ বলেন, বিশুদ্ধ গল্পের রস। এই রসের আস্বাদনে গোকর্ণের সাহিত্য-বৈঠক পুরো তিনটি ঘণ্টা নিস্পন্দ। গ্রামের সাধারণ কৃষক, গৃহস্থ পুরনারী, দোকানদার, শ্রমিক থেকে আরম্ভ করে স্কুলের উচ্চ শিক্ষিত তরুণ হেডমাষ্টার, আরো অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি গল্পের সাগরে নিমজ্জিত। আমাদের মননশীল মনও সেই অগণিত শ্রোতাদের সঙ্গে একাত্ম। উপেন্দ্রনাথ সকৌতুকে হাসেন। হয়তো বলেন, 'কিহে ভায়া' তবে যে শুনি আমাদের কাল শেষ হয়ে গেছে!' (ক্রমশঃ)

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

পুস্তক সমালোচনা

উত্তর সাগরের তীরে ॥ বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় ॥

আটটাকা ॥ প্রকাশক: সরস্বতী গ্রন্থালয় ॥

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে কিছুদিন ধরে পালা বদলের যুগ চলেছে। উপন্যাসের সংজ্ঞা, ধর্ম, ও রূপ নিয়ে মননধর্মী বিস্তৃত আলোচনাও চলছে আবার উপন্যাস সৃষ্টির প্রচেষ্টাও চলছে অব্যাহত গতিতে। কালোত্তীর্ণ সমাজ, সমকালীন সঙ্কট, সামাজিক জীবনের বাস্তব রূপায়ণ বা শুধুমাত্র কল্পনা এর সবকিছুকেই অবলম্বন করে আধুনিক ঔপন্যাসিকরা উপন্যাস লিখে চলেছেন। একের সঙ্গে আরের বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের যোগসূত্রের মত প্রথম আদি থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত লিখিত উপন্যাসের মধ্যেই একটা মননধর্মী চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়। যদি সে উপন্যাস আর উপন্যাস নয়—অর্থাৎ উপন্যাসের ধর্ম সেই উপন্যাসে বজায় থাকে। দুঃখের বিষয় সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক উপন্যাসেই উপন্যাসের ধর্ম বা রূপ বজায় থাকছে না। ফলে সেই উপন্যাস সার্থক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত হচ্ছে কিনা এই নিয়ে আলোচনা চলছে চিন্তাশীল মহলে ও সাহিত্যানুরাগীদের আসরে। উপন্যাসের সংজ্ঞা ও রূপ নিয়ে এ ধরণীর আলোচনা একান্ত ও আশু প্রয়োজন—একথা মেনে নিলেও উপন্যাস সম্পর্কে আশু কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর হচ্ছে না। যদিও আশা করা যায় এ সম্পর্কে চিন্তাশীল মহল শীঘ্রই নূতন আলোকপাত করবেন। উপন্যাসের সংজ্ঞা ও রূপ ব্যতীত পটভূমিকা নিয়েও আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বিদেশী পটভূমিকায় উপন্যাস রচনা সাম্প্রতিক কালের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় রচিত "উত্তর সাগরের তীরে" বিদেশী পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস সৃষ্টির একটি সার্থক প্রয়াস।

আলোচ্য উপন্যাসটি শুধুমাত্র বিদেশী পটভূমিকায়ই লিখিত নয়—উপন্যাসের চরিত্রগুলিও বিদেশী চরিত্র—জ্যাক, কাথার ডেভিস, রোজ মেরী, অনীতা, বোধি, শুভদত্ত—প্রত্যেকটি চরিত্র লেখকের সুনিপুণ মুন্সীয়ানায় সুন্দর ভাবে রূপায়িত হয়েছে। লেখক বিদেশে থাকাকালীন নিজের আয়াসলব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে অতি গভীরভাবে ওদেশের মানুষের চরিত্রকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সুন্দর ভাবে সেই চরিত্রগুলিকে চিত্রায়িত করেছেন নিজের উপন্যাসে। উত্তর সাগরের তীরে উপন্যাসটি ইতিপূর্বে 'বনিকোশিকা' ও 'উত্তর সাগরের তীরে' এই দুই নামে ধারাবাহিক ভাবে গল্প-ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছে। তবে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় উপন্যাসটির অনেকটা পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। তাই গল্প-ভারতীর পাঠকরা তাঁদের পঠিত উপন্যাসের সঙ্গে এই উপন্যাসের সম্পূর্ণ মিল খুঁজে পাবেন না। তবে এই নবরূপায়ণ উপন্যাসের রসোত্তীর্ণতায় সাহায্য করেছে।

জ্যাক-অনীতা—দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্র না হলেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। লেখক সুন্দর ভাবে শেষ পরিচ্ছেদে অনীতার সাহায্যে দুটি চরিত্রের ধাতবধর্মী সংযোগের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বোধি—শুভদত্ত রোজ মেরী-মানসিং এই চারটি চরিত্রও লেখকের অনবদ্য সৃষ্টি। উপন্যাসের মধ্যে সংঘাত দ্বন্দ্ব সবই আছে আর আছে চরিত্রগুলির মানসিক চিন্তাধারার এক অপূর্ব বিশ্লেষণ।

উপন্যাসটি পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে একথা মনে হয় যে লেখক যেন খানিকটা বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন—চিন্তার বিস্তার থাকলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে সেটাও একান্ত প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণোপন্যাস লেখবার প্রচেষ্টা চলেছে কিছুদিন ধরে, বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়র 'উত্তর সাগরের তীরে' সে প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

কালিদাস নাগ

খেলাধূলা

আই. এফ. এ. শীল্ড প্রতিযোগিতা

লীগের খেলা শেষ হবার আগেই অন্যান্য কয়েক বৎসরের মতো এবারও শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। আগস্তুক দলগুলির মধ্যে পাঁচটি দল অধিকতর খ্যাতিসম্পন্ন। তাঁরা খেলা সুরু করেছেন তৃতীয় রাউণ্ড থেকে। স্থানীয় তিনটি বিশিষ্ট দল মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকেও এই রাউণ্ড থেকে খেলবার সুযোগ দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া স্থানীয় দলগুলির মধ্যে এরিয়ান্স, বি. এন. আর ও ইস্টার্ণ রেলের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমান ব্যবস্থানুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ শের মধ্যেই শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলা শেষ হবে। এবারে সর্বসমেত ৫৭টি দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে। আগন্তুক দলগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে নাম করা যায় ইণ্ডিয়ান নেভী, মহীশূর একাদশ, ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ও পাঞ্জাব একাদশ।

আই. এফ. এ. শীল্ড—অনেক দিনের অনেক স্মৃতি

বর্তমান প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে শীল্ডের অতীত ইতিহাসের দিকে একবার তাকান যাক।

এদেশে ফুটবল খেলার সবচেয়ে পুরাতন প্রতিষ্ঠান হল আই. এফ. এ. অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এসোসিয়েশনের উদ্ভব একটি মাত্র ট্রফি নিয়ে—ট্রেডস্ কাপ। ডালহৌসী ফুটবল ক্লাব থেকে উপহার হিসেবে এটি এসেছিল আর এই কাপ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল কয়েকটি স্থানীয় ক্লাব ও সৈনিকদের নিয়ে গঠিত টিম। এর পূর্বে ফুটবল ম্যাচ খেলার জন্য কোন সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছিল না। যাকে বলি 'ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ' সেই ধরণের খেলা চলত।

এইভাবে চলল বছর দশেক, তারপর ধীরে ধীরে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় দলগুলির মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার হল, ফলে গড়ে উঠল বর্তমান এসোসিয়েশন, সুরু হল ট্রেডস কাপ টুর্ণামেণ্ট। প্রথম বছরে ডালহৌসী দলই কাপ বিজয়ী হল, পরবর্তী তিন বছরে তিনটি সামরিক দল কাপটি জিতে নেয়।

ক্রমে দেশে ফুটবলের প্রতি লোকের আগ্রহ বাড়ল, এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ফুনিয়ার ডিভিসন-এর অভাব অনুভূত হল। তখনকার দিনে ভারতের সেরা সেরা টিম বলতে বোঝাত কলকাতার ডালহৌসী ক্লাব, ক্যালকাটা এফ. সি. আর শোভাবাজার। এই তিনটি ক্লাব একটি কনফারেন্সে যোগ দিল এবং তারই ফলস্বরূপ জন্ম নিল চ্যালেঞ্জ শীল্ড।

বড় বড় সমস্ত ইউরোপীয় ও ভারতীয় ক্লাবগুলি এবং ক্রীড়ামোদিগণ শীল্ড তৈরীর জন্যে মুক্ত হস্তে অর্থ দান করলেন। এই প্রসঙ্গে কুচবিহারের মহারাজা, পাতিয়ালার মহারাজা, মিঃ সাদারল্যাণ্ড ও স্যার এসকার-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ডালহৌসী এথলেটিক ক্লাবের মেসার্স ব্রাউন ও লিণ্ডসে, ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ওয়াটসন ও শোভাবাজার ক্লাবের সর্বাধিকারী যে অদম্য আগ্রহ এবং উদ্দীপনা দেখিয়েছেন সেই সময়ে তার তুলনা নেই। ভারতে আজ কলকাতার ফুটবল এসোসিয়েশন যে স্থান অধিকার করেছে তার জন্য ধন্যবাদ জানাতে হয় এইসব মানুষকে যাঁরা পথ কেটেছেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ···চ্যালেঞ্জ শীল্ড টুর্ণামেণ্ট সুরু হল। এই থেকে কলকাতার ফুটবল খেলার ইতিহাসের একটা নতুন পরিচ্ছেদ সুরু হল।

তখন প্রতিযোগী দলের সংখ্যা ছিল কম—প্রথম বছরে ১০টি ও দ্বিতীয় বছরে ১৫টি। তখন আর একটা বিষয় লক্ষণীয় ছিল যে বিদেশ থেকে ফুটবল টিম আসত এদেশে প্রতিযোগিতা করতে আর তাদের খেলার মান ছিল খুবই উন্নত। প্রথম দু'বছরের ট্রফি বিজয়ী হয় রয়্যাল আইরিশ রেজিমেণ্ট। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল ওয়েল্‌শ্‌ ফিউসিলিয়ার্স এই সম্মানের অধিকারী হয়। তখন যে সব অধিত শক্তিশালী মিলিটারী টিম শীল্ড প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের গৌরব অর্জন করে তাদের মধ্যে গ্লুসেস্টার রেজিমেণ্ট (১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জয়ী), সাউথ ল্যাঙ্কাশায়ার রেজিমেণ্ট (১৮৯৯), রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস্ (১৯০১, ১৯১২, ১৯১৩), নাইনটি থার্ড হাইল্যাণ্ডার্স (১৯০২), চাইল্যাণ্ড লাইট ইন্‌ফ্যান্ট্রি (১৯০৭), কিংস ওন্ রেজিমেণ্ট (১৯১৪), সেকেণ্ড নর্থ স্ট্যাফোর্ডস্ (১৯১৬), ১—১০ম মিডলসেক্স (১৯১৭), থার্ড ব্যাণ্ড ওয়েস্টারশায়ার রেজিমেণ্ট (১৯২১), সেকেণ্ড ব্যাণ্ড সেরউড ফরেস্টার্স (১৯২৬, ১৯২৭, ১৯২৮) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

এইসব টিমের ক্রীড়া নৈপুণ্য এদেশের খেলার ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এদের দৈহিক শক্তি, খেলার উৎকর্ষতা, টিম ওয়ার্ক লক্ষ লক্ষ দর্শকের আনন্দের উৎস হয়ে আছে।

তখনকার দিনে ইউরোপীয় দলগুলির মধ্যে কালীকাটা ফুটবল ক্লাব ও ডালহৌসী এথলেটিক ক্লাবও যে ক্রীড়াকুশলতা প্রদর্শন করেছে তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সে যুগে শোভাবাজার ফুটবল ক্লাব ও টাউন ক্লাবের খুব নামডাক ছিল। এদেশের ফুটবল ক্লাবগুলিকে তখন অসম প্রতিযোগিতায় নামতে হত। একদিকে দুর্ধর্ষ মিলিটারী টিম, অপরদিকে আমাদের এদেশীয় বীরযুবা। ভাবতেও রোমাঞ্চ লাগে তখন সেইসব লালমুখো গোরা পল্টনদের সঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়যুবা সমানে যুঝে এসেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধপূর্ব যুগে মোহনবাগানের অসামান্য কৃতিত্ব এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মোহনবাগান বিদেশী টিম ইস্ট ইয়র্ককে পরাজিত করে আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী হয় এবং তা এ দেশের খেলার ইতিহাসে জয়গৌরব হয়ে আছে। বাঙালী খেলোয়াড়দের উদ্যম, শক্তি ও সাহস সেদিন দেশবাসীকে বিস্মিত করেছিল।

তখনকার দিনের সঙ্গে তুলনায় আজকালকার ফুটবল খেলার মান অনেক নীচে নেমে এসেছে, একথা অনেক ক্রীড়ামোদীই আক্ষেপের সঙ্গে উচ্চারণ করেন। তবে একটা কথা স্বীকার করতে সকলেরই মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—আই. এফ. এ.—এর খ্যাতি ও গৌরব আগের মতই শীর্ষস্থানে বিরাজমান।

ইংলণ্ডের এফ. এ. কাপের কাহিনী

এদেশের শীল্ড প্রতিযোগিতার সঙ্গে ইংলণ্ডের এফ. এ. কাপের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

ফুটবল খেলার ইতিহাসে একটি নতুন যুগ সৃষ্টি করেছে এই এফ. এ. কাপ—এ যুগ প্রতিযোগিতার প্রাণবন্ত, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্র চাঞ্চল্যপূর্ণ। উত্থান-পতন ও জয়-পরাজয়ের আশা-আশঙ্কায় এই যুগ আন্দোলিত—কম্পমান। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই তারিখে ফুটবল এসোসিয়েশনের একটি অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন চ্যালেঞ্জ কাপ বা সংক্ষেপে এফ. এ. কাপের উদ্বোধন হল।

ক্লাব থেকে চাঁদা তুলে ২৫ পাউণ্ড দিয়ে কাপটি কেনা হল। তখন নিয়ম ছিল সহজ এবং সংক্ষিপ্ত, আজকের মত এত বিস্তৃত নয়। পাঁচ শিলিং চাঁদা দিয়ে যে সব ক্লাব এসোসিয়েশনের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হয়েছে তারাই কাপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারত। প্রথম দু রাউণ্ড কোন মাঠে খেলা হবে তা নির্বাচনের ভার ক্যাপ্টেন টস্ করতেন। বিজয়ী টীম পরক অথবা ব্যাজ লাভ করত। কমিটি ইচ্ছে করলে কোন টীমকে এক অথবা কয়েক রাউণ্ডের খেলা থেকে রেহাই দিতে পারতেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডের পর থেকে সব খেলাই 'ওভ্যাল' মাঠে অনুষ্ঠিত হত।

প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় পনেরোটি দল খেলার নামে কিন্তু তিনটি দল বাতিল হয়ে যায়। ঠিক হল 'কুইন্স্ পার্ক' টীম একেবারে সেমি ফাইন্যালে খেলবে। অবশেষে 'ওয়াণ্ডারার্স' দলের বিরুদ্ধে খেলার ভার উপরোক্ত দলটি এসে হাজির হল ওভ্যাল ময়দানে। খেলাটি 'ড্র' হল।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে বিরাট এক প্রদর্শনী হয়, সেটি ব্রিটিশ এম্পায়ার এগজিবিশন নামে স্মরণীয় হয়ে আছে। সেই উপলক্ষে ওয়েম্বলি পার্কে একটি সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রচিত হয়। ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম নামে এটি সারা বিশ্বে পরিচিত হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ফাইন্যাল খেলাটি এইখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দর্শক সংখ্যা ছিল প্রায় দু'লক্ষের মত।

১৯২৪-২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ফাইন্যাল কাপ প্রতিযোগিতা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করল।

এ বছরের এফ. এ. কাপ ফাইন্যাল

এবছর ইংলণ্ডে ফুটবল এসোসিয়েশনের কাপ ফাইন্যাল প্রতিযোগিতা নিয়ে ক্রীড়ামোদী মহলে বিপুল আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। স্পারস্ ও লিসেস্টার দলের মধ্যে এই খেলা হয়। কিন্তু তার আগেই স্পারস্ দল লীগ্ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় এই দলের সমর্থকগোষ্ঠী আশা করতে থাকেন যে এফ. এ. কাপ এরাই নেবে। অপরপক্ষে লিসেস্টার সমর্থকবৃন্দ আশা রাখেন খেলার প্রথম কুড়ি মিনিট যে প্রবল আক্রমণ সুরু হবে তা যদি তারা রুখে রাখতে পারেন তাহলে এরপরই অবশ্য বিজয়ী হবে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে স্পারস্ দল এফ. এ. কাপ বিজয়ী হয়েছিল, সেদিনের এক নাতিদীর্ঘ স্মৃতিকথা লিখলেন ১৯২১-এর স্পারস্ খেলোয়াড় জিমি সিড। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানালেন যে আজকের বিখ্যাত ওয়েম্বলি তখনও স্টেডিয়াম হয়নি আর আজকের কাপ-স্টার (যেমন সিনেমা-স্টার তেমনি কাপ-স্টার) বা কাপ ফাইন্যালের তারকাবৃন্দ যে আদর অভ্যর্থনা (গ্ল্যামার ট্রিটমেণ্ট) পাচ্ছেন আমরা তার কিছুই পাইনি।

৯ই মে ১৯৬১, ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে এক লক্ষ দর্শকের উপস্থিতিতে কাপ ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হল। খেলার ১৮ মিনিটের সময় স্পারস্ ইনসাইড লেফ্ট্ অ্যালেনের সহিত সংঘর্ষে লিসেস্টার রাইট ব্যাক চামার্স আহত হলেন। ফলে দুই সমান প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে লিসেস্টার দল দুর্বল হয়ে পড়ল। তবু ৯০ মিনিট ব্যাপী খেলার ঊনসত্তর মিনিট স্পারস্ দলের আক্রমণের মুখে দৃঢ় প্রতিরোধ স্থাপন করল লিসেস্টার। অবশেষে এল সেই অবশ্যম্ভাবী মুহূর্ত, ববি স্মিথের ডান পায়ের তীব্র শটে বল ঢুকল লিসেস্টারের গোলে। গত ন' মাস ধরে স্পারস্ দলের তীব্র সংগ্রাম জয়যুক্ত হল। এরপর ডাইসন হেড করে দ্বিতীয় গোল দিলেন।

অধিক শক্তিশালী স্পারের জয় হল। চতুর্দিকে সে কি উত্তেজনা। বিগত ৬৩ বছরের মধ্যে তারাই একমাত্র টীম যারা একসঙ্গে এফ. এ. কাপ বিজয়ী এবং লীগ চ্যাম্পিয়ন্ হতে পেরেছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে এ এক অসাধারণ সাফল্য।

দেশ-বিদেশ

খ্যাতনামা বিজ্ঞান-অধ্যাপক এবং রবীন্দ্রনাথের একান্ত সহচর, বিশ্ব-ভারতীর প্রতিষ্ঠাতা মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সংস্কৃতিবান সম্পাদক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পরলোক গমনে বাঙলা দেশের বিশেষ ক্ষতি হইল। চারুচন্দ্র বিগতকাল ও সাম্প্রতিককালের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র ছিলেন। এই দুই কালের মধ্যে নিবিড় বন্ধন স্থাপনে যাঁহারা বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন সাহিত্যরসিক চারুচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। পল্ল-ভারতীতে তাঁহার বিজ্ঞান সম্পর্কীয় মূল্যবান ধারাবাহিক রচনাবলী এবং সরল রচনাদিও প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্যক্তিগত জীবনে চারুচন্দ্র সদালাপী সামাজিক জীবনে তিনি সাংস্কৃতিক এবং বন্ধুমণ্ডলে মরমী ও দরদী, সাধারণের কাছে তিনি নিরহঙ্কারী। বাঙলার এই প্রাজ্ঞ মনীষীর স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিতেছি।

• • • •

উপাচার্য্য ডাঃ সুবোধ মিত্র আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া ৬৪ বৎসর বয়সে গত ১৩ই ভাদ্র ভিয়েনায় পরলোকগমন করিয়াছেন। ডাঃ মিত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক—হৃদারোগ্য ক্যান্সারের চিকিৎসায় তাঁহার মূল্যবান অবদান সার্ব্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ভিয়েনায় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে গিয়া এই হৃদয়বান শিক্ষাব্রতী বাঙালী আর দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন না। সুবোধ চন্দ্রের এই আকস্মিক প্রয়াণে আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে বেদনাপ্লুত চিত্তে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

• • • •

চুঁচুড়ার কবি সুবোধ রায়—সাংবাদিকরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক কালের পাঠক-পাঠিকারা তাঁহার লেখনীর সহিত বিশেষ পরিচিত না হইলেও—বাঙলার সাহিত্যিক সমাজের তিনি ছিলেন একান্ত প্রিয় 'সুবোধদা'। অধুনালুপ্ত 'খেয়ালী ও চিত্রালী'তে নূতন লেখক-লেখিকাদের লেখা তিনি বিশেষ উৎসাহে প্রকাশ করিতেন। রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহভাজন সাহিত্যব্রতী 'সুবোধদা' সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন।

• • • •

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র কাহিনীকার 'উদয়ের পথের' রচয়িতা শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায় অপরিণত বয়সে সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়বাবু 'কল্লোলের' সময় হইতে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। চিন্তাশীল প্রবন্ধ, মনোজ্ঞ ছোটগল্প, বিশ্লেষণমূলক মননধর্ম্মী উপন্যাস রচনার জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শ্রাবণসংখ্যা পল্ল-ভারতীতে প্রকাশিত অধ্যয়নরত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আলোকচিত্রটি শ্রীপরিমল গোস্বামীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

দি
ইউনাইটেড্ কমার্সিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ

(১৯৪৩ সালে রেজিষ্টারি কৃত)

হেড অফিস : ২, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা—১

অনুমোদিত মূলধন	—	৮,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও স্বীকৃত মূলধন	—	৪,০০,০০,০০০৲
সংগৃহীত মূলধন	—	২,০০,০০,০০০৲
সংরক্ষিত তহবিল	—	২,০৫,০০,০০০৲

শাখা সমূহ

ভারতে : সকল শিল্প ও বাণিজ্যপ্রধান নগর ও শহর

পাকিস্তানে : চট্টগ্রাম ও করাচী

ব্রহ্মদেশে : রেঙ্গুন, মৌলমিন, মান্দালয়

মালয়ে : পেনাং, কুয়ালা-লামপুর, ক্ল্যাং

সিঙ্গাপুর কলোনীতে : সেরাঙ্গণ রোড, সিঙ্গাপুর

যুক্তরাজ্যে : লণ্ডন

হংকং কলোনীতে : হংকং এবং কাউলুন।

পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্ট ও করেসপণ্ডেন্ট থাকায় সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্য্যের সুবিধা আছে।

জি. ডি. বিড়লা
চেয়ারম্যান

এস. টি. সদাশিবন
জেনারেল ম্যানেজার

গল্প-ভারতী

পূজার অর্ঘ্য

আশ্বিন

তেরশ আটষট্টি

গল্প-ভারতী

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম"

সম্পাদক

শ্রীপ্রফুল্লকুমার নাথ

এই সংখ্যায়

এশিয়ার সংস্কৃতি নৃত্যকলা

১।	এশিয়ার লোকনৃত্য	—ডঃ কালিদাস নাগ	৩
২।	ভারতের নৃত্যকলা	—নারায়ণ চৌধুরী	৭
৩।	নৃত্যচঞ্চল উপমহাদেশ : চীন প্রজাতন্ত্র	—নির্মলেন্দু নাহা	১১
৪।	জাপানের নৃত্যকলা	—সুদর্শন পাল	১৩
৫।	নৃত্যকলায় পাকিস্থান	—চিত্তরঞ্জন দেব	১৫
৬।	নাচের দেশ সিংহল	—রঞ্জনা রায়	১৮
৭।	ব্রহ্মদেশের নৃত্যকলা	—উপগুপ্ত	২০
৮।	শ্যামদেশের নৃত্যকলা	—মতিলাল দাস	২২
৯।	ভিয়েৎনামের লোকনৃত্য	—পবিত্র পাল	২৫
১০।	মঙ্গোলিয়া সাধারণতন্ত্রে নৃত্যগীত	—গোপাল ভৌমিক	২৭
১১।	ফিলিপাইনের নৃত্যশিল্প	—মনোরঞ্জন জানা	২৯
১২।	ইন্দোনেশিয়ার নৃত্যকলা	—শিবেন্দু মাহা	৩০
১৩।	একটি নিষিদ্ধ দেশের নৃত্যকলা : তিব্বত	—মণিপদ্ম	৩১
১৪।	মালয়ের সংকর নৃত্যকলা	—মাধব মেনন	৩২
১৫।	কাম্বোডিয়ার নৃত্যকলা	—জ্যোৎস্না মাইতি	৩৭

মহিষাসুরমর্দিনী

মহিষাসুরমর্দিনী

মহিষমর্দনের উদ্দেশ্যে এক মহতী দেবসভা আহূত হইল। তথায় বিষ্ণু ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, সমগ্র দেবগোষ্ঠীর সম্মিলিত তেজোরাশি হইতে একটি মহাতেজস্বিনী দেবীমূর্তির আবির্ভাব হউক।

দেবগণ সকলেই সানন্দে বিষ্ণুর এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নিজ নিজ তেজঃসার পরিত্যাগ করিলেন। সেই সমষ্টিভূত তেজঃপুঞ্জ দেখিতে দেখিতে এক বরবর্ণিণী শক্তিরূপিণী দেবীমূর্তি ধারণ করিল। ঐ দেবীর আনন শ্বেতবর্ণ, নেত্র কৃষ্ণবর্ণ ও অধরপল্লব আরক্তিম ও করতলদ্বয় তাম্রাভ। তিনি কখনও বা সহস্রভুজা আবার কখনও বা অষ্টাদশভুজারূপে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। এই ভীমকান্তরূপিণী দেবীই ত্রিগুণা মহালক্ষ্মী। তিনিই আদ্যা মহাশক্তি। যদিও তিনি নিত্যা, তথাপি দেবগণের কার্যসিদ্ধিহেতু সর্বদেবশরীরজ তেজঃপুঞ্জ হইতে তৎকালে প্রকাশিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এই অভিনব প্রকাশ বা আবির্ভাবকেই 'মহিষমর্দিনীর উৎপত্তি' বলা হইয়া থাকে।

অশোকনাথ শাস্ত্রী

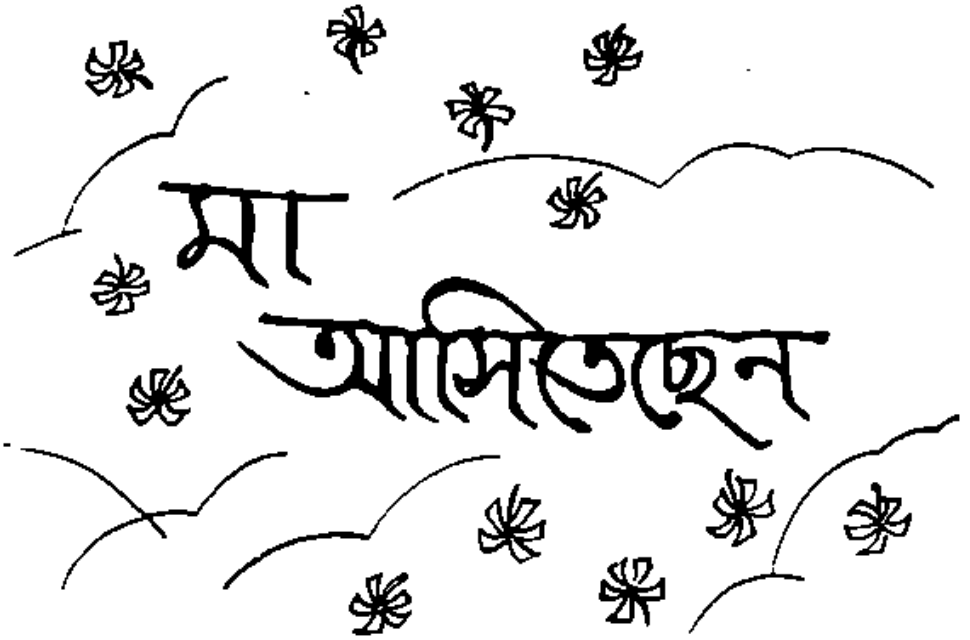

"এই, মা যা হইবেন. দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—" বলিতে বলিতে সন্তানের গদগদ কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। "দিগ্‌ভুজা—নানা-প্রহরণ-ধারিণী—শত্রু-বিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ; এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।"

বঙ্কিমচন্দ্র

গল্প-ভারতী

শ্রীদুর্গার উপাসনা—যুগে যুগে

লেখক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ

কোন্ স্মরণাতীত কালে শ্রীদুর্গার উপাসনা এই ভারতে প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা বিস্মৃতির অন্তরালে আজ বিলীন। তথাপি শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস তন্ত্র ও সদাচার প্রমাণে ইহা প্রতীত হয় যে,—শ্রীদুর্গার উপাসনা অতি প্রাচীনকালেই প্রবর্ত্তিত ছিল। ঋগ্বেদের প্রতি মণ্ডলেই দেখা যায় যে, যেমন পুরুষ দেবতার উপাসনা (স্তবস্তুতিমুখে যজ্ঞের দেবতারূপে) দৃষ্ট হয়; তেমনই স্ত্রী-দেবতার সংখ্যাও কম নহে। শ্রীভগবান্‌কে পিতৃরূপে চিন্তা করিয়া যেমন মানুষ তৃপ্তিলাভ করে, তেমনই মাতৃ-দেবীকে মাতৃরূপে গ্রহণ করা ভারতীয় আর্য্যমনীষার একটা অভিব্যক্তি দেখা যায়। কি বিরাট্ ভাবরাজ্যের অধিবাসী ছিলেন—প্রাচীন ঋষিগণ—'দ্যাবা পৃথিবী'কে মাতা ও পিতার আসনে বসাইয়া তাঁহারা যে আনন্দ পাইতেন, তাহার তুলনা নাই। এই পৃথিবীর বিশাল আয়তন—মাতৃক্রোড়, তাঁহারই নদনদী স্তন্যরসাধারা, আর তাহারই উপরে এই অনন্ত আকাশ—পিতৃরূপে সমস্ত প্রাণিগণকে অবকাশ প্রদান করিয়া বিরাজমান। সংসারে পিতামাতার স্নেহ যেমন অতুলনীয়, তেমনই দেব-দেবীর করুণা মানবের একমাত্র আশ্রয়নীয়—এই মধুর ভাব সমস্ত উপাসনার প্রাণকেন্দ্রে বর্ত্তমান। দেবীসূক্তে দেবী সর্ব্বশক্তির আশ্রয়—তিনি রুদ্রের ধনুকে জ্যাযুক্ত করিয়াছেন ও দ্যাবা পৃথিবীর মধ্যে আবিষ্ট হইয়া আছেন। ঐ দেবী শ্রীদুর্গা—জগজ্জননী, তিনি মাতৃভাবে সন্তানের যেমন পালনকারিণী, তেমনই সমস্ত বিপদ-আপদের রক্ষাকর্ত্রী—এই বিশিষ্ট ভাবধারা—শ্রীদুর্গার উপাসনার মধ্যে অনুস্যূত। তিনি শরণরক্ষিণী বিপত্তারিণী, তিনি অভয়দাত্রী। তিনি সমস্ত শক্তির উৎস।

'দুর্গা'—এই নামের শক্তি তন্ত্রে বহুভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে খিল পরিশিষ্টে প্রথম 'দুর্গা' এই নামের মহিমা উদ্ঘোষিত হইয়াছে। 'দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে'—এই মহাবাণী যজুর্

মন্ত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিল। উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, দুর্গাং দূরং গময়তীতি দুর্গা। যিনি দুর্গাকে দূরে প্রেরণ করেন, এই ব্যুৎপত্তি 'দুর্গা' শব্দ হইতে প্রদর্শিত হইয়াছে। 'উমাং হৈমবতীং বহু শোভমানাম্' কেনোপনিষদে—বহু ভূষণে ভূষিতা হিমালয় দুহিতা উমার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ওঙ্কার ও উমা যে একার্থক অর্থাৎ ব্রহ্মবাচক, তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অ+উ+ম=ওম্, আর উ+ম+অ=প্রতি বর্ণের একটি অর্থ আছে। তান্ত্রিক যে সকল বীজমন্ত্র সৃষ্ট হয়, তাহার প্রত্যেকটির বিশিষ্ট অর্থ আছে। যিনি তন্ত্রশাস্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই সে রহস্য উপলব্ধি করিতে পারেন, অপরের পক্ষে তাহা উপহাসের বস্তু। প্রকৃত কথা এই যে,—এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়—এই তিন অবস্থা যে শক্তির দ্বারা সংঘটিত হয়, সেই শক্তিই ব্রহ্মময়ী। বিষ্ণুশক্তি—পালনকর্ত্রী, রুদ্রশক্তি—সংহারিণী এবং ব্রহ্মশক্তি—সৃষ্টিকারিণী। অ=বিষ্ণু, উ=শিব, ম=ব্রহ্মা, ওঙ্কারের মধ্যে যে অর্থ নিহিত আছে, উমা শব্দের মধ্যেও সেই অর্থ অনুস্যূত, কেবলমাত্র—এখানে উকার অর্থাৎ শিবকে প্রথম স্থান দেওয়া আছে। উমা ও শিব—উভয়ে মিলিতরূপে বিশ্বের জনক-জননী হইয়া আছেন। তিনিই আবার সংহারিণী। নিদ্রিত শিশু যেমন মাতৃক্রোড়েই বিশ্রামলাভ করে, এই বিশ্ব প্রলয়কালে সেই বিশ্বজননী উমা বা দুর্গার অঙ্কেই বিলীন হইয়া থাকিবে। জীবের গতিদাত্রী তিনিই। তাই মানবের উপাসনা আবশ্যক। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মরূপে উপাসনা অপেক্ষা এই সগুণ সাকারের উপাসনা সহজসাধ্য।

প্রাচীন যুগে—অগ্নিকেই সমস্ত দেবতার মুখ বলা হইয়াছে। 'অগ্নির্বৈ দেবানাং মুখম্' অগ্নিতে যে কোন দেবতার উদ্দেশে হোম করিলে অগ্নি তাহা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেন। এই বিশ্বাস বলে তখনকার দিনে যজ্ঞকেই উপাসনার প্রকৃষ্টরূপ বলা হইত। এইজন্য বহু বিত্ত ব্যয় করিয়া বহু আয়াস স্বীকার করিয়া আর্য্যগণ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকে পরম উপাসনার পন্থা মনে করিতেন। 'অশ্বমেধ' কিছুকাল পর্য্যন্ত ভারতে প্রচলিত ছিল। সত্যযুগের সীমা নির্দেশ না করিলেও পৌরাণিক চিন্তা হৃদয়ে রাখিয়া ইহা বলা যায় যে,—সত্যযুগে মার্কণ্ডের পুরাণে সুরথ ও সমাধি, একজন রাজা ও একজন সাধারণ গৃহস্থ ও বৈশ্য—মৃণ্ময়ী প্রতিমাযোগে শ্রীদুর্গার উপাসনা করিয়াছিলেন। এই প্রতিমা পূজার ফলে রাজার রাজ্যলাভ ও বৈশ্যের নির্বাণলাভ সম্ভবপর হইয়াছিল। তৎপরে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীদুর্গার উপাসনা কালিকা পুরাণে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। যদিও মূল রামায়ণে স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তথাপি অন্য পুরাণের সহিত মিলাইলে এবং তদবধি এখনও পর্য্যন্ত মন্ত্রসাহিত্যের মধ্যে শারদীয় দুর্গাপূজার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়া আছে। দ্বাপর যুগে—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে সারথি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্জুন শ্রীদুর্গার স্তব করিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন পাইয়াছিলেন।

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাগবতের ও বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণেও দেখা যায় যে, কংসরাজ যখন বসুদেবের সপ্তম সন্তানরূপে প্রাপ্ত কন্যাটিকে বধ্যশিলায় আঘাত করিতে উদ্যত, তখন তিনি দুর্গারূপে দর্শন দিয়াই আকাশে বিলীনা হইলেন। কাত্যায়নীর আরাধনা গোপীগণের একটি বিশেষ ব্রতরূপে বর্ণিত আছে। কাত্যায়নী অনুগ্রহে গোপীগণ—শ্রীকৃষ্ণেরও কৃপালাভ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগে—শ্রীদুর্গাপূজা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। মহীশূর রাজ্যে দুর্গাপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে বহুকাল হইতে। নবরাত্রির অনুষ্ঠান ভারতের সকল প্রান্তেই প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়।

কাশীধামের দুর্গাবাড়ীতে এই সময়ে বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে। আহিমাচল কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই সপ্তশতী মন্ত্রপাঠ ও হোম প্রচলিত আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্রীদুর্গা প্রভাবে এতই অভিভূত ছিলেন যে, তাঁহার 'বন্দেমাতরম্'—এই মন্ত্র সঙ্গীতের মধ্যে 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'—এই বাণী চিরন্তন জাতীয়ভাবের প্রেরণা দান করিবে।

সুভাষচন্দ্রের মান্দালয় কারাগৃহে শ্রীদুর্গাপূজার অনুষ্ঠান সেই বঙ্কিমচন্দ্রেরই ভাবের অনুবৃত্তি।

যুগে যুগে শ্রীদুর্গার উপাসনা করিয়া সাধকগণ চিত্তে যে শক্তি, যে উৎসাহ ও যে প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন, তাহা সত্যই ভারতের এক সভ্যতার ইতিহাসে স্মরণীয় ব্যাপার।

ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের দুর্গাপূজা সমস্ত পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই পূজাকে হিন্দুমাত্রেই অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। ইহাকে হিন্দুদের জাতীয় পর্ব বলা যাইতে পারে। ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে জগন্মাতা দুর্গাদেবী ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজিত হইয়া থাকেন। তিনি কাশ্মীরে ও দাক্ষিণাত্যে 'অম্বা' ও 'অম্বিকা' নামে, গুজরাটে 'হিঙ্গলা' ও 'রুদ্রাণী' নামে, কান্যকুব্জে 'কল্যাণী' নামে, মিথিলায় 'উমা' নামে এবং কুমারিকা প্রদেশে 'কন্যাকুমারী' নামে পূজিত হইয়া থাকেন। এইরূপে হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত এবং দ্বারকাপুরী ও বেলুচিস্তানের হিঙ্গলাজ হইতে পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্র পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বস্থানে শারদীয়া দুর্গাপূজা অথবা নবরাত্র নামে পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই নবরাত্রিতে নেপাল, ভূটান, সিকিম্ ও তিব্বত দেশের বৌদ্ধেরাও দেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

—স্বামী অভেদানন্দ

আনন্দমুখর দিনে

উপলক্ষ্য যা-ই হোক না কেন উৎসবে যোগ দিতে গেলে চাই প্রসাধন। আর প্রসাধনের প্রথম এবং শেষ কথাও হচ্ছে কেশবিন্যাস। ঘন, সুকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, সযত্ন পারিপাট্যে উজ্জ্বল, আপনার লাবণ্যের, আপনার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। কেশলাবণ্য বর্দ্ধনে সহায়ক লক্ষ্মীবিলাস শতাব্দির অভিজ্ঞতা আর ঐতিহ্য নিয়ে আপনারই সেবায় নিয়োজিত।

লক্ষ্মীবিলাস তৈল

সুগন্ধিতে, বিশুদ্ধ, শতাব্দির ঐতিহ্য-পুষ্ট

এম. এল. বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ • লক্ষ্মীবিলাস হাউস, • কলিকাতা-৯

দুর্গাপূজা কেন ?

—শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

দুর্গাপূজা দেখিতে দেখিতে আমাদের এমন একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে আমাদের মনে দুর্গা-পূজা কেন যে করি এই সংশয়ই উঠে না। আমরা ভাবি প্রকৃতির বিধানে অথবা কোন দৈব বিধানে দুর্গাপূজা চিরকালই হইয়া আসিতেছে এবং হইবে। বাংলাদেশ হইতে পূজার সময়ে বাহির হইয়া যদি ভারতবর্ষের অন্য কোন এমন রাষ্ট্রে যাই যেখানে বাঙালী নাই অথবা তাঁদের সংখ্যা বহুকাল হইতেই বিরল, তাহা হইলে দেখিব যে সেখানে দুর্গাপূজার কোন আয়োজন নাই। আর যাঁরা ভারতের বাহিরে গিয়াছেন এবং শরৎকাল সেখানে কাটাইয়াছেন তাহাদের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন যে ঐসব দেশে দুর্গাপূজার নাম গন্ধ নাই। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে দুর্গাপূজা সার্ব্বজনীন নহে। অর্থাৎ এই পূজা দৈশিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়া উঠে—"যে দেশে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় সে দেশে কি এই পূজা চিরকাল ধরিয়া হইয়া আসিতেছে?" অর্থাৎ এই পূজা কি সর্ব্বকালীন? এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইতে হইলে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যাদি গ্রন্থ আলোচনা করিতে হইবে। প্রাচীনতম সাহিত্য গ্রন্থ বেদাদিতে দুর্গাপূজার সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ আমরা দেখিতে পাইব, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির জ্ঞানস্পৃহা হইলে নব নব প্রশ্ন উদিত হইতে থাকে এবং আমাদের অন্বেষণ প্রবৃত্তিকে আরও সক্রিয় করিয়া তুলে। এক কথায় প্রশ্নের ঝড় উঠিয়া নিদ্রিত হৃদয় সাগরকে তরঙ্গ-ব্যাকুল করিয়া তুলে। সমুদ্রের যেমন পার নাই, তেমনই প্রশ্নের কোন অন্ত নাই বলিয়া মনে হয়।

দুর্গাপূজার কথা উঠিলেই আমাদের কয়েকটি পুরাণের কথা মনে পড়ে। বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ ও কালিকা পুরাণ ইত্যাদি। তারপরে মনে পড়ে, না—এসব পুরাণ তত প্রাচীন নয়। গণেশের মূর্ত্তি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্ব্বে ত পাওয়া যায় নাই। গণপতিকে দুর্গার সঙ্গে যোগ অতি প্রাচীনকাল হইতেই করে না। অন্য রকম বিধিব্যবস্থা পূর্ব্বে ছিল কি? মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীতে দুর্গাদেবীর পার্থিব মূর্ত্তি গড়িয়া শরৎকালে পূজার ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। মহিষাসুর বধকালে দুর্গাদেবীর সাহায্যার্থে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, এমন কি, নবমাতৃকাও আসেন নাই। যুদ্ধ প্রারম্ভের পরে গণদলকে যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে দেখা যায়। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের সময়ে কালী দেবীর, যিনি পরে দেবী প্রদত্ত 'চামুণ্ডা' এই নাম প্রাপ্ত হন, তিনি সরস্বতীর সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। নব-মাতৃকারও দান সেই যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য। দুর্গাদেবী নিজেই লক্ষ্মী ও সরস্বতী। লক্ষ্মী ও সরস্বতী তাঁহার কন্যাদ্বয় নহেন। কার্ত্তিকেয়ের জননীরূপে দুর্গাদেবীর বর্ণনা এ গ্রন্থের কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। গণপতির নাম গন্ধও নাই। এই

সব বিষয়গুলি যদি আমরা পর্য্যালোচনা করি তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে বর্ত্তমান দুর্গামূর্ত্তির অভিব্যক্তি কালক্রমে ঘটিয়াছে। এই অভিব্যক্তির মূলে আছে মানব চিত্তের কল্পনার সংগ্রহন ক্রিয়ার পরিচয়।

কার্ত্তিকেয়ের কুকুটের ও সহিত সাদৃশ্য প্রাচীনকালে মুদ্রাদিতে পরিদৃষ্ট হইলেও বর্ত্তমানকালে শুধু ময়ূরই বাহনরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। ময়ূরের সৌন্দর্য্য অথবা কুকুটের অশুচিতা বোধ হয় এই গ্রহণ বা পরিবর্জ্জনের মূলে আছে। গণপতি ও লক্ষ্মীর বাহন নির্ণয়ের মূলে আছে মানুষের গভীর লৌকিক অভিজ্ঞতার পরিচয়। গণপতি যদি সর্ব্বদা সতর্ক আত্মরক্ষা বুদ্ধিতে জাগরূক থাকেন তাহা হইলেই তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ভারতের গণরাজ্যের প্রতি সাবধানবাণী এই মূর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইঁদুরের জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য করিলে এই কথাই সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়ে। ইঁদুরের বাসগৃহের শতধার, সঞ্চয়ের বুদ্ধি, সমাজবদ্ধভাবে বাস, একের সতর্কবাণীতে সকলে সাবধান হওয়া ইত্যাদি। অথবা জনসঙ্ঘের প্রত্যেক ব্যক্তি একজন ইঁদুরের মত অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্রের সমষ্টিই বিরাট শক্তি-সম্পন্ন। কিন্তু এই সমষ্টির চালক অধিক হওয়া উচিত নয়। এইজন্যই বোধ হয় হস্তীর মুণ্ড দেওয়া হইয়াছে। হস্তীমুণ্ড দেওয়ার আর একটি তাৎপর্য্য বেশ বুঝা যায় যে, চিন্তাশক্তির ও কর্ম্মশক্তির সুনিবিড় যোগ থাকা চাই। নিষ্কর্ম্মা মানুষ বহু দেখা যায়। কিন্তু নিষ্কর্ম্মা হস্তীর অস্তিত্ব গল্পেও শুনা যায় না। পরিকল্পনা রূপায়ণে বিমুখ কোন গণপতি বোধ হয় প্রাচীনকালে অদৃষ্টচর ছিলেন। এইজন্যই বোধহয় হস্ত ও মস্তকের নিত্যযোগ করা হইয়াছে।

লক্ষ্মীর পদ্মের সহিত সাদৃশ্য অতি প্রাচীনকালেই স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রী অতি প্রাচীন বৈদিক যুগের আদিত্যদের দেবতা। লক্ষ্মীর নামও তখন শুনা যায় নাই। এই শ্রী প্রকৃতির শোভা সম্পৎ। প্রভাতের প্রাচীন সৌন্দর্য্য ঊর্দ্ধাকাশে বিরাজমান। নিম্নে সরোবরাদি জলাশয়সমূহে পদ্মাবলীর বিকাশ। এই দুই শোভার মিলনেই শ্রীমূর্ত্তির পূর্ণতা। কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন পরিপক্ক শস্যাদির যে সৌন্দর্য্য এবং নদ-নদী সমুদ্রাদির যে শোভা সেই সৌন্দর্য্যেরই তাঁহার পদদ্বয়। ঊর্দ্ধমুখ কিরণমালা তাঁহার মুকুট। চন্দ্র সূর্য্যের সৌন্দর্য্যই তাঁহার মুখ। সন্ধ্যাম্বরে মেঘমালার রবি কিরণের সংমিশ্রণই তাঁহার দেহ। ক্ষণ-প্রভার তারল্যই তাঁহার অঙ্গলাবণ্য। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সমুচ্চয়ই মূর্ত্তিমতী শ্রী। সভ্যতার রূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মানুষের সৃষ্টিশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়। এই উদ্বোধনের ফলে কৃত্রিম শোভার প্রতি ভারত মনের অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। সুবর্ণ রত্নাদি ও হর্ম্ম্যাদি কৃত্রিম শোভার আস্পদ বলিয়া বিবেচিত হইল। এই শোভাদ্বয়ের সমন্বয়েই লক্ষ্মীর সৃষ্টি হইল। কল্পনার অগাধ সমুদ্র হইতে এই লক্ষ্মীর আবির্ভাব। এই লক্ষ্মীর আবির্ভাবের পরেই অখণ্ড মানব সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইল। সম্পৎ উৎপাদনে সমবেত প্রয়াস অপরিহার্য্য। কিন্তু সম্পৎ সম্ভোগেই বিরোধের উৎপত্তি। দেব ও দৈত্য এক পিতার সন্তান হইয়াও সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া পড়িল। লোভ, পরস্পর হিংসা, বিদ্বেষ, অন্তর্ঘাতী বিরোধ, ছল-চাতুরী প্রভৃতি বহুধাবিভক্ত কপটতা রূপ পরশেরও আবির্ভাব হইল। কুচক্রীর দল কদর্য্য-মনোবৃত্তির সহায়তায় লক্ষ্মীর সহচরে পরিণত হইল। বোধহয়, এই কুচক্রীর দল নৈশ অন্ধকারকেই আশ্রয় করিয়া স্বকার্য্য সাধন করেন। তাঁহাদের পরিচয় সম্যগ্‌ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে পেচক বাহনে। এইজন্যই লক্ষ্মীর বাহন পেচক এবং শ্রীর বাহন পদ্ম। শ্রী ও লক্ষ্মীর যখন সমন্বয় ঘটিয়াছে তখনই পদ্ম ও পেচক এই দুইটি বস্তুই লক্ষ্মীর বাহন হইয়াছে।

বৈদিক ভারতের মানব সমাজ কৃত্রিম সভ্যতার অনগ্রসর। কৃত্রিম সভ্যতা শব্দের দ্বারা মানুষের নিজ ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদিত সুখকর জীবনযাত্রার উপযোগী দ্রব্যসম্ভারকে বুঝাইতে চাহিয়াছি। প্রকৃতির মুখাপেক্ষী না হইয়া মানুষ নিজের শক্তিতে নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য খাদ্য উৎপাদন, বেশ-ভূষা রচনা, গৃহ নির্মাণ, বড় বড় নগরের পত্তন, প্রসাধনাদির আবিষ্কার, আত্মরক্ষার বিবিধ ব্যবস্থা সম্পাদন, নদ-নদীর বাঁধ রচনা প্রভৃতি এই সভ্যতার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে। এই সভ্যতার প্রভাবে মানব সমাজ প্রাকৃতিক বিধানের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। সে যুগে যখন কৃত্রিম আলোকের আবিষ্কার হয় নাই তখন রাত্রির বিভীষিকার কথা একবার স্মরণ করুন। রাত্রি ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত মানবসমাজের আত্মরক্ষার আশা ও ভরসা কোথায়? প্রকৃতির নিকট করুণা ভিক্ষা করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় সম্ভাব্য কিনা বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমার মনে হয় রাত্রির সচেতন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভিন্ন অপর কেহ ত্রাণকর্ত্রারূপে পরিকল্পিত হইতে পারে না। শিশুদের মাতাই যেমন সর্ব্বস্ব, তেমনই সভ্যতার শৈশবে মানবসমাজ মাতৃক্রোড়েই সুখে সুপ্ত হইতে পারে। মাতৃক্রোড়ই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। আশ্রয়ের দৃঢ়তায় মানব মনের সকল ভয়, দ্বিধা, সংশয় ও দুর্ব্বলতার গ্লানি অন্তর্হিত হয়। রাত্রির শীতল স্পর্শে দিবসের শ্রম ক্লান্তি প্রশমিত হয়। এ স্পর্শ মাতৃ-হস্তের স্নেহস্পর্শের সমতুল্য। রাত্রিতে মাতৃত্বের আরোপ যদি মানবমনে দৃঢ়প্রত্যয়ের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে সেই সামাজিক মনের সমস্যা সমাধান তখনকার মত সন্তোষজনকভাবেই হইয়া গেল ?

ঋগ্বেদের কুশিক মুনি রাত্রি দেবীকে অর্চনা করিতেছেন—

"সা নো অস্যন্তাবয়ং নিতেযামন্নবিক্ষহি। বৃক্ষেন বসতিং বয়।" ১০।১২৭।৪

"যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্যে। অথা নঃ সুতরা ভব।" ১০।১২৭।৬ ঋ বেঃ

বৃক্ষে যেমন পক্ষিদের বসতি তেমন তোমার আশ্রয়ে আমরা আজ নিবেশ লাভ করি। তুমি আমাদের বৃক ও চৌরাদি হইতে রক্ষা কর। রাত্রিটি সুখে কাটাইয়া দাও। ইত্যাদি ইত্যাদি। রাত্রি এখনও জননীর পর্য্যায়ে উন্নীত হয় নাই। শুধু সুতরা এই বিশেষণটি আপনাদের মনে রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। পরে আলোচনা করিব।

ইহার পরে ঋগ্বেদের পরিশিষ্ট রচিত হইয়াছে। তখন সভ্যতার সঙ্কট আরও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। অথচ সমাজ তখনও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা পূর্ণভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। রাত্রির সঙ্কট ঘনীভূত হওয়ায় রাত্রিদেবীর প্রতি শ্রদ্ধার মাত্রাও বাড়িয়াছে। কবি গাহিতেছেন,

"রাত্রীং প্রপদ্যে জননীং সর্ব্বভূতনিবেশনীম্। তন্ত্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো নিশাম্।" পরিশিষ্টে ৩য় মন্ত্র।

রাত্রি সর্ব্বপ্রাণীর আশ্রয়দাত্রী মাতৃরূপা।

এই রাত্রিকেই কবি দুর্গারূপে বর্ণনা করিতেছেন, "তোষামি প্রয়তোদেবীং শরণ্যাং বহ্বৃচ প্রিয়াম্। সহস্রদক্ষিতাং দুর্গাং জাতবেদসে সুনবাম সোমম্"॥ (৫ মঃ)

এখানে বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝা যাইতেছে যে ঋগ্বেদের বহ্বৃচ সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রথম দুর্গাদেবীর স্তব করেন। এই সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তিই দুর্গাদেবীকে আরাধ্যাদেবীরূপে সম্মান প্রদর্শন করেন। এখনও স্তব পাঠ ও দুর্গাদেবীর স্মরণের কথাই বলা হইয়াছে। পূজার কথা এখনও বলা হয় নাই।

দুর্গার শরণাপন্ন হইলেই বহুবিধ সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। দেবী আমাদের অভয়দান করেন। এই সকল সঙ্কটের মধ্যে সংগ্রাম ও রিপুসঙ্কটের কথা বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। সকল ভয় স্থান হইতেই দুর্গাদেবী রক্ষা করেন। এই বিশ্বাসের কথা আমরা মহাভারতেও দেখিতে পাই। সঙ্কট মোচনে দুর্গার তুলনা নাই।

পরে আমরা দেখিতে পাই দুর্গাদেবীকে ঘৃতে স্নান করাইবার বিধান। তৎপরে চন্দন বিলেপন ও বিল্বপত্রের শিরোভূষণ মালা রচনার ব্যবস্থা।

"ক্ষীরেণ স্নাপিতা দুর্গা চন্দনেন বিলেপিতা।
বিল্বপত্র কৃতাপীড়া নমো দুর্গেসমো নমঃ॥"

দুর্গার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা না হইলে স্নান করান, চন্দন বিলেপন ও বিল্বপত্রের আপীড় রচনা অর্থহীন হয়। তিনি এখন অগ্নিবর্ণা।

_ক এই পূজার প্রবর্ত্তন করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর পরিশিষ্টের মন্ত্রেই পাওয়া যায়—

"যা ঋগ্বেদে স্তুতা দেবী কাণ্বশাখেন উদাহৃতা।
সাত্ত বেদপ্রভা গৌরী সাত্ত বেদসে সুনবাম সোমম্।" (পরি ১৭)

এই কাণ্বশাখা কে? এই প্রশ্নের কোন উত্তরই আমরা দিতে পারি না। ইনি নানা দৃষ্টান্ত দিয়া দুর্গাপূজার প্রচারে সাহায্য করিয়াছেন।

রাত্রির তমোরাশি দুর্গাদেবীর কেশে পরিণত হইয়াছে। এইজন্য এঁর নাম কেশিনী। অগ্নিই বৈদেশিক যুগে অন্যতম রক্ষাকর্ত্তা। ইন্দ্র ও অগ্নিকে সকলেই রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। একটি প্রার্থনা মন্ত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি।

যেন: সপত্না অপ তে ভবন্তিন্দ্রাগ্নিভ্যামব বাধা মহে তান্।
বসবো রুদ্রা আদিত্যা উপস্পৃশং মোগ্রং চেত্তার মধিরাজমক্রন্। ১০।১২৮।২ ঋঃ বেঃ

দুর্গাও অগ্নিবর্ণা এবং অগ্নিরই দুহিতা। এজন্যই তাঁহাকে বৈরোচনী বলা হইয়াছে। দুর্গাকে পঞ্চমী বলা হইয়াছে। অগ্নি, ইন্দ্র, বসুগণ, রুদ্র ও আদিত্যের সম্মিলিত শক্তিই কি দুর্গা? না, অন্য গূঢ় অর্থ আছে?

যাহা হোক্, এই সুরারির বিজয়ের ও রাক্ষসাদি পূজিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের দুর্গা সিংহবাহিনী বলিয়া বর্ণিত হন নাই। ব্যাবিলোনিয়ার আমরা অষ্টভুজা সিংহবাহিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাই। ইনি নগররক্ষালিকা দেবী।

ইস্তার (Istar) এর বিবরণ আমরা পাই গিলগেমেস্ (Gilgames) রচিত মহাকাব্যে। সেই গ্রন্থে ব্যর্থ প্রেমের প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং অসীম শক্তিমত্তার পরিচয় পাই এই দেবীর। ব্যাবিলোনিয়ার ধর্ম্মসাহিত্যে ইস্তারের নানা রূপ আমরা দেখি। তমুজের পত্নীরূপে ইস্তারকে আমরা প্রথমে দেখি। এই যুগল মূর্ত্তির পূজা এশিয়ার প্রতীচ্য ভাগে বেশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এর পরবর্ত্তী যুগে ত্রয়ী দেবতার মধ্যে ইস্তারকে দেখা যায়। চন্দ্র, সূর্য্য ও ইস্তার (শুক্রতারা) এই তিন দেবতাকে লইয়া গঠিত এই ত্রয়ী। ইনি বোধহয় তৎকালে প্রেম ও বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন।

এর পরে আসিল অ্যাসিরিয়ানদের অভ্যুত্থান কাল। তাঁহারা ব্যাবিলোনিয়ান রাজা দখল করিলেও বিজিতদের ধর্ম বহুলাংশেই গ্রহণ করেন। ইঁহারা অসুর নামেই পরিচিত। ইস্তার এঁদের আরাধ্য দেবী। এঁদের নিকট ইস্তার শুধু প্রেমের দেবী নন, যুদ্ধদেবীও বটেন। ইস্তারের উপাসনা শুধু বিলাসীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। ব্যাবিলোনিয়ার দেবতাদের মধ্যে একমাত্র ইস্তারের পূজাই সার্বজনীন হইয়াছিল। অর্থাৎ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমানভাবেই এই দেবীর পূজা করিতেন। নিনেভে ও আরবেলে এই দেবীর প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল। সেখানে দৈববাণীও হইত। ঋক্ পরিশিষ্টে এই দেবীকে অসুর পূজিত বলা হইয়াছে। খৃঃপূর্ব সপ্তম শতকে এই দেবীর পূজা বিভিন্ন দেশে যোদ্ধৃত্ব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কারণ অসুরদের রাজত্বকাল প্রায় এই সময়েই বিলুপ্ত হয়। অসুরেরা ব্যবসায়ে বাণিজ্য করিত সুতরাং তাঁহাদের দেব-দেবীর পরিচয়ও বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের ঘটিয়াছিল। অসুরদের প্রস্তর স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে খ্যাতি বেশ ছিল। ইস্তারের প্রস্তরমূর্তির অনুকরণে যোদ্ধৃত্ব বিভিন্ন দেশে তাদৃশ দেবী মূর্তিপূজার প্রচলন হয়।

ঋগ্বেদের দুর্গা অসুরদের 'ইস্তার' পূর্বপুরিচয়ে না হইলেও এই দেবীর দ্বারা যে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাত্রি দেবী কৃষ্ণবর্ণা। নক্ষত্রগুলি তাঁর নেত্র। দুর্গা অগ্নিবর্ণা। ইন্দ্র ও অগ্নি রণে বিজয়প্রদ দেবতা। অন্য যেসব দেব রণক্ষেত্রে স্তুত্য ও স্মরণীয় তাঁহারা এই দুইজনের সমকক্ষ নন। দুর্গা সংগ্রামক্ষেত্রে বিস্তারকারী হঠাৎ কি করিয়া হইলেন। রাত্রি নৈশ সঙ্কটে ত্রাণকর্ত্রী হইলেও দিবাযুদ্ধে তাঁর প্রভাব ম্লান হইতে বাধ্য প্রাকৃতিক নিয়মে। রাত্রির তমোরাশি তাঁহার কেশগুচ্ছে পরিণত হইয়াছে। রাত্রিদেবী দুর্গাদেবীর অংশমাত্র। আর্যচিত্ত সন্ধানী কল্পনার সাহায্যে এই অপূর্ব দুর্গমূর্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দুর্গাদেবীর সৃষ্টিতে আর্যদের সমন্বয়চিত্তের নিদর্শন অবিসংবাদিত নিদর্শন। মানবের শক্তি যখন অতিশয় সীমাবদ্ধ তখন মনোবলের জন্য নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল মন যদি কোন স্বীকৃত আশ্রয়ের সন্ধান পায় তাহা হইলে তাহাকে অবলম্বন করার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। মানব মনের এই গতি প্রকৃতি শুধু কাল বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নয়। জড়বাদও যতদিন পর্যন্ত না অন্তর্নিহিত বিরোধতত্ত্বের সন্ধান না পাইয়াছে—ততদিন পর্যন্ত এই বাদ মানব মনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। রাশিয়ার সাম্যবাদ এই তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াই রুশিয়ার জনসমাজের মনে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছে। তাঁহাদের বিশ্বাস ধনতন্ত্রবাদ অন্তর্বিরোধের ফলেই কালের গর্ভে বিলীন হইবে। আর্য মন জড় শক্তির নিয়ন্ত্রারূপে চেতনশক্তিতে আস্থাবান্। এই চেতনশক্তির ক্রিয়াকলাপ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহারা অন্যায় করে তাহারাই দৈত্য। দৈবীশক্তি ন্যায়নিষ্ঠ। ন্যায় ও অন্যায়ের যুদ্ধে ন্যায়ের জয় অনিবার্য। পূর্বপুরুষ ক্রমে আমাদের মনে এই সংস্কার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। দুর্গাদেবী ন্যায়ের রক্ষাকর্ত্রী। এইজন্যই দৈত্যদলনেই তাঁহার পরিচয়। সমাজে ও রাষ্ট্রে নানা অবিচার চলিয়াছে। মূক জনগণ আত্মশক্তিতে অজ্ঞ। প্রতিকার করিবার শক্তি তাহাদের আছে এই ধারণাই তাহাদের নাই; কিন্তু নিরুপায় হইয়া তাহারা অত্যাচার সহ্য করিতে রাজী নয়। তাহাদের আন্তরাত্মা প্রতিকার চায়। তাই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া তাহারা মনে-প্রাণে দুর্গাদেবীর আহ্বান করে। তাহাদের বিশ্বাস দেবী প্রসন্ন হইলে তাহাদের সুদিন আসিবে—অত্যাচারের অবসান হইবে। ন্যায়ের জয় অনিবার্য। আজ আণবিক বোমার যুগে মানবসমাজের বিচার বুদ্ধি যখন ম্লান

হইয়া পড়িয়াছে—গোটা স্বার্থ ও দম্ভ মানবমনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে তখন দৈবীশক্তির নিকট প্রার্থনা করা ভিন্ন আর উপায় কি?

দেবি প্রপন্নার্তি হরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহিবিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

মানুষ যতদিন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ না হইবে ততদিন মানবচিত্ত নানা অভাব ও অসম্পূর্ণতার তাড়নায় লোকোত্তর অদৃষ্ট শক্তির আরাধনা করিবেই করিবে। দুর্গা চিদচিৎস্বরূপিণী। এইজন্যই দুর্গাপূজা সকল চিত্তকেই আকৃষ্ট করে। এইজন্যই দুর্গাপূজার এমন মাদক শক্তি। জড় ও চৈতন্যের অপূর্ব সমন্বয় এবং বিরোধ ও বিরোধ মুখে সমন্বয়ের মূর্তিমতী দেবী দুর্গা। চিত্তভূমির সকল স্তরেই পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন দুর্গা—এইজন্যই দুর্গাপূজা।

ভারতের বাহিরে চীন, জাপান, কম্বোজ, চম্পা, যবদ্বীপ (যাভা) প্রভৃতি দেশের যেখানে যেখানে হিন্দুধর্ম অথবা বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল সেখানে সেখানেই দুর্গাদেবী পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইবার চল্লিশ বৎসর পরে রাজ্ঞী সিন্‌কো-র রাজত্বকালে (৪২৩-৪২৮ খ্রীষ্টাব্দ) চীন হইতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অবলোকিতেশ্বর কোয়ানন্‌এর মধ্যে একটি দেবীমূর্তির পূজা হইয়া থাকে। জাপানী ভাষায় তাঁহার নাম 'চনষ্টী'। ইহা সংস্কৃত 'চণ্ডী' শব্দের অনুরূপ। তাঁহার আর একটি নাম 'কোটীশ্রী' অথবা 'সপ্তকোটী বুদ্ধমাতৃকা চনষ্টী দেবী'। ইনিই হিন্দুদিগের দুর্গাদেবী।

—স্বামী অভেদানন্দ

আগমনী

শ্রীরমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বছর আসে বছর যায়। আনন্দময়ীর আগমনের আনন্দের দিনগুলির জন্য মানুষ অপেক্ষা করে। বিশ্বাস, অবিশ্বাসের কথা নয়—এটা চিরন্তন সংস্কার। মনের কোন্ নিভৃত কোণে আনন্দের অনুভূতি জাগে। বাঙালী, ভারতবাসী এই শুভ দিনগুলিকে ভুলতে পারেনি। ভুলতে পারেনি সে পুরাণের কথা—শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধন, অভয়ার বরদান—বিশ্বজননীর সেদিন রামচন্দ্রের কপালে জয়তিলক পরিয়ে দেওয়া। সত্য অবিনাশী, সত্যের জয়—বিশ্বের এই মহামন্ত্র সেদিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সত্যের প্রতীক শ্রীরামচন্দ্র অসত্যকে বিনাশ করেছিলেন। তাই সেই অকাল বোধন সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য বরলাভ আজও আনন্দময় ও অবিস্মরণীয়। যুগে যুগে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে শ্রীরামচন্দ্রের সাধনা। জগতের মঙ্গলের জন্য এই সংকল্প, এই সাধনাই রামচন্দ্রের পূজাকে সার্থক করেছিল।

বর্ষাবিধৌত শুচিস্নাতা ধরণী, স্বর্ণাভাদীপ্ত শস্যক্ষেত্র, কলোলময়ী স্রোতস্বতী, শ্যামল শোভাময়ী বনানী, দিনকর প্রদীপ্ত স্বচ্ছনীলাকাশ, আনন্দময়ীর বরণ প্রতিক্ষারত। এ শুভ বার্তা দিকে দিকে সুমঙ্গল শঙ্খে ধ্বনিত। পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতির মিলনের এই দিন। বিশ্বজননীর চরণাম্বুজে মানুষ মিলিত মৈত্রীবন্ধনে। অহিংসারূপী রিপু দলিত। শারদীয়া প্রকৃতির সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আগমনী গানের সুর ভেসে চলেছে দিক দিগন্তে। কত সাধক ভক্ত এই গান দিয়ে মা'য়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে জীবন ধন্য করে গেছেন। কত কবি, গীতিকার এই গানেই ভগবৎ মার্গের সন্ধান পেয়েছিলেন। ভক্তের আকুল ডাকে বিশ্বজননী আবির্ভূতা হয়েছিলেন মাতৃরূপে, কন্যারূপে। মাতৃরূপে দিয়েছেন সান্ত্বনা, কন্যারূপে করেছেন আবদার। বাঙালী বিশ্বজননী দুর্গাকে কন্যারূপে কল্পনা করেছেন। কন্যা পিত্রালয়ে এলে মায়ের যে আনন্দ—বাঙালী হৃদয়ে সেই অনুভূতি জাগায়—যখন বৎসরান্তে চৈতন্যরূপিণী গৌরীর আগমনে বাঙলার ঘর অপরূপ আলোকে উদ্ভাসিত হয়। বাঙলার আগমনী গানে এই মধুর কল্পনাকে রূপায়িত করেছে। কত সাধ্য সাধনায় মহাদেবের তুষ্টি সাধন করে—গিরিরাজ গৌরীকে নিয়ে এসেছেন। গিরিরাজ, গিরিরাণী এবং গৌরীর মিলন ও আনন্দ, এই অল্প কয়েকদিন আগমনী গানের বিষয়বস্তু। বাঙালীর এই মহাপূজা এক সময়ে সুরু হত আগমনী গানের আনন্দধ্বনিতে এবং সমাপ্ত হত বিজয়া গানের করুণ সুরে। কিন্তু কালের স্রোতে মানুষ সেই চিন্তাধারা থেকে কত দূরে চলেছে সে কল্পনা। সে পূজায় নিষ্ঠা নেই—নানাবিধ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। দেশের মঙ্গলকামী যাঁরা তাঁদের মহৎ দায়িত্ব যথার্থ পথ নির্দেশ। পূজার অর্ঘ অন্তরের শুচিতা, সত্যতা ও ভক্তিরূপ নৈবেদ্য। রামপ্রসাদ রচিত একটি আগমনী গানের স্বরলিপি এই প্রসঙ্গে প্রদত্ত হল।

মিশ্র বিভাস—একতাল

ওগো রাণি নগরে কোলাহল উঠ চল চল
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
বরণ করিয়া গৃহে আনি গিরা
এসো না সঙ্গে আমার গো॥
রাণী ভাসে প্রেম জলে, দ্রুতগতি চলে
খসিল কুন্তল ভার গো।
কাছে দেখে যারে—সুধাইছে তারে
গৌরী কত দূরে গো॥
যেতে যেতে পথ উপনীত রথ
নিরখি বদন উমার গো॥

বায়স মাহাত্ম্য

—আশাপূর্ণা দেবী

সমস্ত ব্যাপারটার মীমাংসা করে দিয়ে গেল একটা দাঁড়কাক।

কাকটা বায়সরূপী নারায়ণ কিনা, সে কথা স্বয়ং নারায়ণই জানেন, এবং নারায়ণের স্বধর্ম ঘোষণায় দুটি পক্ষকে দুঃখে নিমগ্ন করা না আরো প্রবৃত্তি করা। সে কথা নারায়ণ চরিত্রাভিজ্ঞ মহাকুলেরা জানেন। তবে দাঁড়কাকটা ঠিক সেই সময় এসে না পড়লে, শেষ পর্যন্ত কী হ'ত বলা যায় না।

ইদানীং তো প্রতিবেশীরা আশা এবং আশঙ্কা করছিল কটিতির মধ্যেই না ঘোষবাড়ীর দুটি মহিলার একটিকে শাড়ী ছেড়ে খান, এবং মাছ চচ্চড়ি ছেড়ে সোজা চচ্চড়ি ধরতে হয়।

যুগল সুবল দু'জনেই যেমন কেপে বসে আছে, কে বলতে পারে কোন এক মাহেন্দ্রক্ষণে একে অপরের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে কিনা। প্রতিবেশীরা রুদ্ধশ্বাসে সেই ভয়ঙ্কর মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় দিন গুনছিল। ওদিকে মামলার আর ফয়সালা হচ্ছে না। উকিল মুহুরী রোজ একটা করে নতুন ভেট্ পেলছে।

'তোর ঘরে যম ঢুকুক,' এ অভিসম্পাতের চাইতে যে অনেক বেশী ভয়াবহ শাপ 'তোর ঘরে মামলা ঢুকুক', এই প্রবচনের সত্যটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে যুগল ঘোষ আর সুবল ঘোষের স্ত্রী ললিতা আর নবনলিনী। খুড়শাশুড়ী আর ভাসুরপো বৌ।

আগে প্রথম যখন নালিশ ঠুকে এসেছিল সুবল, তখন ললিতা আর নবনলিনী একসঙ্গে দালানে পা ছড়িয়ে বসে কচি শশা আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঘরে ভাজা গরম মুড়ি খেতে খেতে পুরুষদের মতিচ্ছন্নের নিন্দাবাদ করত!

ললিতা বলত, 'লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ভাইপোর সঙ্গে বিবাদ করছে! বলি, ভাসুরঠাকুর না হয়, ছোট ভাই বলে মায়া করে তোমাকে ছেলের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা করে বিষয়সম্পত্তি দিয়ে গেলেন কিন্তু তুমি নিলে কি বলে? নিয়েছ, আবার ভাই নিয়ে লড়ালড়ি করছ! ছি ছি ছি!

'তুমি'টির সামনে অবশ্য কথা হ'ত না। হতো তার অনুপস্থিতিতেই। তবে কিনা ললিতার কথার ধরনই ওই।

নবনলিনী আবখানা লজ্জায় একসঙ্গে কামড় দিয়ে উদারতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলত, 'আদর করে ছেলের দোষ ঢাকছ কেন খুড়ি, দোষ তো এরই। শ্বশুরমশাই তো হাবা পাগল ছিলেন না যে, না বুঝে-সুঝে একটা লেখাপড়া করে গেছেন? তুই কেন বাপের মুখ পুড়িয়ে, দেদি খুড়োর নামে নালিশ ঠুকতে?'

'তুই'টাও অবশ্য অনুপস্থিত থাকে।

ব্যাপারটা এই সুবলের বাপ নকুল ঘোষ মারা যাবার আগে এক কিম্ভূতকিমাকার উইল করে

গেছল। জলজ্যান্ত আস্ত সাবালক একটা ছেলে থাকতে ভাইকে আধাআধি বিষয়ের মালিক করে দিয়ে গেছল। এমন কথা কে কবে শুনেছে? তাও বিষয়ের জানাকড়াও দুকল নকুলের বাপের আমলের নয়। বাপতো কোন জন্মে মরে ভূত হয়েছিল, সব কিছুই নকুলের স্বোপার্জিত।

জমিজমা বাগানপুকুর, আর ঘানির তেলের অতবড় কারবার, সব করেছে নকুল নিজের গতরে, আর নিজের বুদ্ধিতে। বাপ নেই মা নেই, মামার বাড়ীতে মানুষ, একটু বয়েস হতেই টের পেল ভিক্ষায় অন্ন কত কদয়! বছর আষ্টেকের ভাইটার হাত ধরে বেরিয়ে এল একদিন মামার বাড়ী থেকে।

মামারা বলল, 'আচ্ছা দেখব, তেজ ক'দিন থাকে? পেটে কোদাল পড়লেই তেজ বেরিয়ে যাবে!'

তা' মামাদের ভবিষ্যৎ বাণী ফলপ্রসূ হল না। নকুল হতে দিল না। 'তেজ' কাকে বলে দেখিয়ে দিল। সেই মামারাই পরে নকুলের সাহায্যে খেয়েছে, মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হাত পেতেছে।

সে যাক্, নকুল স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ কৃতী পুরুষ, বিষয়ের ভাগ তার ভাইকে দেবার, অন্ততঃ চুল চিরে আধাআধি ভাগ দেবার দরকার ছিল না নিজের ছেলেকে বঞ্চিত করে।

তা'ও আবার ছেলেকেই বেশী জব্দ করে গেছে নকুল কড়া একটি শর্ত দিয়ে। বিষয়ের ভাগ পাবে সুবল এই শর্তে, যদি কাকার সঙ্গে এক অন্নে আর এক ভদ্রাসনে থাকতে পারে।

বাপ মরবার পর উইল শুনে মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল বটে সুবলের; কিন্তু সে নিতান্ত সাময়িক। তখন কাকার প্রতি ভালবাসায় নদী ভাদ্রের ভরা গঙ্গা!

জন্মাবধি কাকাই সুবলের প্রাণপুরুষ। কাকাই পরম বন্ধু।

বয়সে অনেকখানি তফাত থাকলেও সে বন্ধুত্বে ফাঁক ছিল না এক চিলতে। কাজেই সামান্য মন খারাপ সমুদ্রে জলবুদ্বুদের মত তখুনি মিলিয়ে গেল। কাকার সঙ্গে এক অন্নে এক ভদ্রাসনে থাকার প্রশ্নটা তখন প্রশ্নের অতীত।

মাথার ওপর থেকে ছাতা সরে গেল। কাকারূপী পরমাশ্রয়ে আরও বেশী করে আশ্রয় নিল সুবল।

দিন।

বেশ কিছুদিন চলল।

উইলখানাকে ছেঁড়া কাগজ মাত্র মনে করে সন্তোষ লাভ করে রইল সুবল।

কিন্তু—

ওই কিন্তুটা কোথায় যেন খচ্ খচ্ করতে লাগল। বাবা ভাইকে শর্তাধীন না করে, করে গেলেন কিনা ছেলেকে! বাপের ওপর অভিমানটাই একটু ধোঁয়ার সৃষ্টি করে রেখে দিল।

তারপর দিন গেল, মাস গেল, বছর যেতে বসল, দেখা গেল ধোঁয়াটা আয়তনে অনেকখানি বেড়ে গেছে। কালো কালো জমাট জমাট সেই ধোঁয়াটার যেন কিছুটা উত্তাপেরও সৃষ্টি হয়েছে।

কারণটা এই—

কারবারের কি একটা ব্যাপার নিয়ে হিসেব-নিকেশ করতে বসে একদিন দুকল ভাইপোকে তিরস্কার করল। বলল, 'তুই যেমন নির্বুদ্ধির ঢেঁকি, তাই দেশসুদ্ধ লোককে বিশ্বাস করিস। অত বিশ্বাস ভাল নয়। পরে পস্তাবি।'

সুবল নিজের দোষ স্বীকার না করে হঠাৎ বলে বসল, 'আমি নির্বুদ্ধির ঢেঁকি, এতো চোখের উপরই পড়ে আছে।'

যুগল একটু ভুরু কুঁচকে বলল, 'এ কথা কেন বলছি সুবল?'

'বললাম এমনি।'

বলে খাতা উল্টোতে লাগল সুবল। যুগলও গুম্ হয়ে বসে থাকল। সুবলের মনের ধোঁয়াটা গরম হল।

ওদিকে একসঙ্গে দাপানে পা ছড়িয়ে বসে শশী কাঁচা লঙ্কা দিয়ে তেলে জবজবে গরম মুড়ি খাওয়াটা যেন ইদানীং কমে এসেছে।

যদি নবনলিনী বলে, 'হাতটা অবসর করে একবার এসো খুড়ি, বুড়ি মাখছি—।'

ললিতা যেখানে আছে, সেখানে বসেই বলে, 'আমার এখন হাত অবসর হতে দেরী আছে বৌমা, আমার মুড়ি এখন মেখো না।'

আবার ললিতা যদি কোন সময় বলে, 'বৌমা চা জলখাবার খেয়ে নিয়ে তবে হেঁসেলে ঢুকলে ভাল হয়। এসো চা ছাঁকছি—'

নবনলিনী ভারী গলায় বলে, 'থাক, পরে গরম করে খাবো।'

ললিতা বলে ওঠে, 'এক পেয়ালা চা গলায় ঢালবার সময় নেই, এত কি রাজকার্য তা' জানিনে।'

নবনলিনী আরো ভারী গলায় বলে, 'না কাজ আর কি, রাতদিন তো হাত পা কোলে করে বসে আছি।'

দু'জনের একজনও আর এখন পতি-নিন্দার পাতকে লিপ্ত হয় না।

ধোঁয়া জিনিসটা উত্তপ্ত হয়ে উঠলে মুশকিল! তা'তে বিপরীত বাতাস ঠেকলেই হঠাৎ ঘচ্ করে আগুন জ্বলে ওঠে।

জমিজমা বাগান পুকুর নিয়ে সুবল কোনদিন মাথা ঘামাত না। হঠাৎ একদিন দেখা গেল। তাই নিয়ে সুবল শুধু মাথাই ঘামাচ্ছে না, গলদঘর্ম হয়ে উঠছে। কোন বাগানে কত আম, কোন বাগানে কত বাঁশ। কার কাছে জমা খরচের খাতা থাকে, কত করে উসুল হয়, ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্নে, যুগলকে ব্যস্ত করছে, নিজে ব্যস্ত হচ্ছে।

যুগল বিরক্ত হয়ে বলে, 'কাজের সময় বাগড়া দিচ্ছিস কেন? তালুক-মলুকের হিসেব নেবার বাসনা হয়, ঘরে গিয়ে হবে। রাতে বসিস মোটা খাতা নিয়ে, ষোল আনা হিসেব বোঝাবো তোকে।'

সুবল ভুরু কুঁচকে বলল, ষোলো আনার দরকার কি আমার! আধুলির ব্যাপারী, আধুলির হিসেবটুকু পেলেই হবে।'

আধুলির ব্যাপারী!

যুগল আবার সেদিনের মত গুম হয়ে গেল।

তারপর বলল, 'তোর টাকা কেটে আধুলি আমি করে দিইনিরে সুবল, তোর বিজ বিচক্ষণ বাপই করে গেছে।'

হঠাৎ সুবল কোঁস করে উঠে বলে, 'রামচন্দ্রকে বনে কৈকেয়ী পাঠায়নি, পাঠিয়েছিল রাজা দশরথই। মরণায় ভগবান তোলে, তা মানুষ তো কোন ছার!'

'কী বলনি ?' তুলসী রুখে উঠে বলে, 'কী বলনি রে সুবল ! আমি দাদাকে যন্ত্রণা দিয়ে বিষয় নিয়েছি ?'

'কি করেছ তার তুমিই জান।'

বলে সুবল বেজার মুখে আড়ত থেকে বেরিয়ে আসে। আর তুলসী স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে তার পিঠটার দিকে।

পিঠটা কতখানি চওড়া !

আগের থেকে অনেকটা মোটা হয়ে পড়েছে সুবল। সুবল একটা 'লোক' হয়ে গেছে !

রান্নাঘরের মূল চেহারা অবশ্য এখনো অপরিবর্তিত, যে হাঁড়িতে ভাত চড়ত, সে হাঁড়িতেই ভাত চড়ে। কিন্তু দুধ জলখাবার তো আর আইনের আওতায় পড়ে না ?

তাই এ দেয়ালের দিকে মুখ করে একটা উনুন জেলে নবনলিনী দুধ ঘন করে করে ক্ষীর বানায়। আর ও দেয়ালের দিকে মুখ করে ললিতা দুধ কাটিয়ে ছানা করে সন্দেশ বানায়।

দুবেলা গরুগুলো অবশ্য একই গামলায় জাবনা খায়, কিন্তু দুধগুলো ভাগ হয়ে গেছে।

খুব বেশীদিন অবশ্য নয়। এই সেদিনের কথা। নবনলিনী বাতাসকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল, 'ঘরে তিন তিনটে দুবেলা গরু তা একদিন ক্ষীর রাবড়ির পাট নেই, খালি সন্দেশ পাক হচ্ছে ? সন্দেশে অরুচি জন্মে গেল !'

ললিতা আকাশের গায়ে মন্তব্য ছুঁড়ল, 'সন্দেশটা করা সেরপুর সুলায় করতে। পুরুষরা তেতে পুড়ে এসে জলখাওয়া আছে, সংসারে 'এদোজন বদোজন' আছে। ঘরে গাই বিয়োলে যে মেয়ে মানুষকে ক্ষীরের বাটিতে চুমুক দিতে হয়, এতো কোনদিন শিখিনি।'

নবনলিনী দেয়ালকে দুঃখের গাথা শোনায়, 'ক্ষীরের বাটিতে চুমুক মেয়েমানুষে দেবে না কেন, একশোবার দেয়। অবশ্য থাকলেই দেয়। তবে কিনা আমার ভাগ্যে সব থেকেও আমি ভিখিরি। আপনার শ্বশুরের ঘর, পাঁচ পরের হাত তোলায় আছি।'

ললিতা যুগল নয় যে, স্তব্ধ হয়ে যাবে। সে যেই যেই করে ওঠে, 'হাত তোলা ! কে কাকে হাত তোলায় রেখেছে ? পুকুরে জাল পড়ল, মাছ উঠল, চক্ষে দেখতে পেলাম না। কোটা হল ভাজা হল, পাড়া-পড়শীকে দেওয়া হল। সিগীষের বাকী তো কিছু দেখলাম না।'

উপযুক্ত অভিযোগ খুঁজে না পেয়েই বোধ করি এ কথাটা তুলল ললিতা। কারণ একদা এককালে অনুরূপ কাজেই বাহবা পেয়েছে নবনলিনী। ললিতা সবাইকে ডেকে ডেকে বৌয়ের গুণপনা আর ব্যবহারপনার প্রশংসা শুনিয়েছে।

কিন্তু বাতাসের মোড় ঘুরে গেলে গুণও দোষ হয়ে দাঁড়ায়।

তবে ক্রমশঃ ধরা পড়ে, হুল ফোটানের ব্যাপারে ললিতার চেয়ে নবনলিনীর দক্ষতা অনেক বেশী !

ঘরে নবনলিনী দক্ষতা দেখায়, বাইরে সুবল।

আর হুল ফোটানো জিনিসটার মজা এই—ফোটাবার সঙ্গে সঙ্গে আহত ব্যক্তির যন্ত্রণার ছটফটানি হলওয়ালাকে যেন নেশা ধরিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই তাই ইচ্ছে করে—রসিয়ে রসিয়ে তারিয়ে তারিয়ে ওই যন্ত্রণাটা দেখি।

৬

মজা আরও আছে।

হঠাৎ একদিন দেখা যায়, দু'জনের কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই, আজও যে ক্ষেত্রটা দৃশ্যতঃ অক্ষিত রয়েছে—সেখানে কেমন করে যেন দুটো দল হয়ে গেছে। একদল এ পক্ষকে তাতাচ্ছে, একদল ও পক্ষকে তাতাচ্ছে।

আবার সেই পক্ষরাই যথাক্রমে দুই মালিকের কানভারী করছে। ওদের কল্যাণেই যুগল জানতে পারছে—সুবল তার নামে কি কি অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছে, আর সুবল জানতে পারছে যুগল তার নামে কি কি অসঙ্গত মন্তব্য করছে।

কারখানের কাজ প্রায় শিকেয় উঠেছে, কথাই চলছে খালি। যে কথাকে 'কথা' বলে।

যুগল আগে বিস্ময় অনুভব করত, মর্মাহত হ'ত, এখন রাগে জ্বলতে থাকে।

সুবলের মত লেখাপড়া সে শেখেনি, হিসেব লিখতে কলম ভাঙে, কাজেই মনটা তার 'সোজা'। কানভাঙানিতে সে মন ভাঙে।

তবু একদিন বড় বিজয় এল।

আড়তে একজন এসে লাগিয়ে গেল যুগলকে, সুবল বলেছে—উইল জাল! আর সেকথা সে আদালতে প্রমাণ করবে।

যুগল বাড়ী এসে ললিতাকে বলল, 'আর তো টেঁকা যাচ্ছে না, এভাবে থাকা অসম্ভব, চলো সর্বস্ব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আমরা কোথাও চলে যাই।'

ললিতা ভুরু কুঁচকে বলল, 'সর্বস্ব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কোথাও চলে যাই! বাঃ চমৎকার! তা অমনি যাবো কেন, দু'খানা সেরমার অর্ডার দাও, ভৈরব ভৈরবী হয়ে বেরিয়ে পড়ি! কথার ছিরি শুনলে গা জ্বলে যায়। গলায় একটা আইবুড়ো মেয়ে, তা 'বোধ হয় ভুলেই গেছ।'

যুগল বলে, 'যে আমাদেরও যা গতি হবে, ওরও তাই হবে।'

ললিতা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'গাছের দেড়খানা নারকেল লাগবে তা'হলে।'

হঠাৎ নারকেল প্রসঙ্গে অবাক যুগল বলে, 'তার মানে?'

মানে ব্যাখ্যা করে ললিতা।

'মানে অতি সোজা। ভিক্ষের বেরোতে দু'জনের হাতে দু'খানা মালা লাগত, একটা নারকেল হলেই চলতো, নিমূলির জন্যে আবার একখানা চাই তো!'

যুগল বোঝায় 'রোজ রোজ এত অশান্তি আর সয় না, এদের সংস্রব সহ্য করা কষ্ট। হাত পা আছে, মুটেগিরি করেও পেটটা চালাতে পারবো।'

ললিতা ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, 'তবে তো মস্ত বাহাদুরীর কথা হ'ল। কেন, 'হকের ধন মদনমোহন' ছেড়েই বা যাবো কেন?'

যুগল ক্ষুব্ধস্বরে বলে 'হকের ধন বলে কি আর আজ ব্যাঙে লাথি মারে। ব্যাঙের আধুলি আমি ব্যাঙকেই বানপত্তর করে দিয়ে চলে যাব।'

ললিতা বলে, 'তা' হলে ভাসুরঠাকুরের কাছে জোচ্চুরী করা হয়। হকের ধন না ভাবলে তিনি কখনো দিতেন না। কেন, সেই এতটুকু বয়েস থেকে দাদার খিদমদগারী করনি তুমি? দাদার পা টেপনি, তামাক সাজনি? ছালাছালা মাল বয়ে আননি মুটের মতন? দাদা যা করে গেছেন

ভায়াই বুঝে গেছেন। আজ যদি তুমি সব কেলে দিয়ে চলে যাও, তিনি ওই ওপরে বসে নিশ্বাস ফেলবেন না ?'

সুবল অনেক কড়া কথা বলে, অনেক পাঁচালো কথা বলে, কিন্তু একটা আধটা সত্যি কথাও বলে বৈকি।

'মরণের ভগবান ডেকেছেন' একথা কি মিথ্যে ?

ললিতার মন্তব্যটা তারসহ।

দাদা ওই ওপর থেকে বসে নিশ্বাস ফেলবেন, শুনেই যুগলের মনে হয় হয়তো সত্যিই তাই। সুবল অবোধ, সুবল ব্যবসার কি বা জানে, সুবলকে ভাসিয়ে দিয়ে যদি চলে যায় যুগল, সেটা স্বর্গস্থিত ব্যক্তিটির নিশ্বাস ফেলবার উপযুক্তই কাজ হবে।

'থাক না চুলচাল। ললিতা বলে, 'দেখ' শেষ অবধি কি করে।'

'নতুন আর কি করবে, নালিশ করবে। করবে কেন, করছে।'

'করুক না, তুমিই বা কম কিসে যে হারবে !'

যুক্তি, তুলনা, উদাহরণ ইত্যাদি অনেক কাঠ খড় পোড়াল ললিতা এবং তৎফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যুগল, 'আচ্ছা দেখে নেব, দাদার লেখা উইল কেমন করে জাল প্রতিপন্ন করতে পারে দাদার অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলে !'

ওদিকে নবনলিনী ষোল বাত্রে শুড়শাশুড়ীর দুর্ব্যবহার নিয়ে স্বামীর কাছে অশ্রুবিসর্জন করে, এবং দিনের বেলা যতক্ষণ স্বামী বাড়ী থাকে, এমন ভিজে বেড়াল হয়ে থোমটা দিয়ে বেড়ায় যে, রাত্রের সেই ভিজে বালিশের সঙ্গে মিলিয়ে সুবল খুড়িকে পৃথিবীর অষষ্ঠতম অপরাধিনী বলে স্থির করে।

অবশ্য এ সব বর্ণনা বাহুল্য মাত্র।

কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আমল থেকে আজ পর্যন্ত জাতি শতঘটিত যত কিছু কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটেছে, ঘটছে, এবং ভবিষ্যতে ঘটবে, তার মূল ইতিহাস এক, মূল সুর অভিন্ন। পার্থক্য যা কিছু. পরিবেশ আর পরিস্থিতির।

যুগল সুবলের পরিস্থিতি এখন এই, এক তন্ত্রাসনে বাস করেও কেউ কারুর সঙ্গে কথা কওয়া তো দূরের কথা, মুখ পর্যন্ত দেখে না। সেদিন যেদিন কোর্টে কেস্ থাকে, সুবল শেষরাত্রে বেরিয়ে গিয়ে সদরে ওর নিজের উকিলের বাড়ী গিয়ে বসে থাকে, পাছে কোন সূত্রে পথে দেখা হয়।

যুগল বেলায় বেরিয়ে একেবারে কোর্টে পৌঁছয়। পরস্পরের উকিল পরস্পরের নামে যথেচ্ছ কটূক্তি আর ব্যঙ্গোক্তি করে, এবং অদূর ভবিষ্যতে আর একটা 'ঘিন' ফেলে।

দু'জনে দু' ট্রেনে আসে জলতে জলতে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ধান পান পুকুর বাগান সব এখন সরকার বাহাদুরের হাতে, দু'পক্ষ মাসে মাসোহারা পায় উক্ত বিচক্ষণ বাহাদুরের হাত থেকে।

এক অঙ্কের শর্ত আর মানা হচ্ছে না।

সুবলের পেটের গোলমালের কাহিনী সৃষ্টি করে নবনলিনী তার জন্যে আলাদা পুরনো দাদখানি

চালের ভাত আর জীওল মাছের ঝোল রাঁধে, এবং এতকটি চালের ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যায় বলে নিজের ভাতটাও তার সঙ্গে রাঁধে। আর জীওল মাছের ঝোল খেয়ে খেয়ে তারও নাকি গায়ের রক্ত হচ্ছে।

ললিতা প্রথম প্রথম নবনলিনীর ভাত বেড়ে মেয়েকে বলে যেত 'এই তোর বৌদিকে বলিস ভাত বাড়া আছে দালানে।'

কিন্তু উপর্যুপরি সেই বাড়া ভাত বাড়াই পড়ে থাকত।

নিমলি এসে বলত, 'বৌদি বলেছে খিদে নেই……বৌদি বলেছে দাদার ভাত থেকে ভাত বেড়েছিল খেয়েছে, বৌদি বলেছে অত মাছ তরকারি খেলে ওর অসুখ করে।'

এইভাবে আইন বাঁচিয়ে অনেক কিছুই চলতে থাকে। যেমন ভদ্রাসনের মাঝখানে পাঁচিল পড়ানো চলবে না, যতক্ষণ না মামলা মেটে, কিন্তু দড়ি টাঙানো যাবে না এমন কোন আইন নেই।

দালানের মাঝখানে দড়ি টাঙিয়ে সেই দড়িতে নবনলিনী কাপড় শুকোতে দেয়, উদয়াস্ত ঝুলেই থাকে সে কাপড়। 'এক রাজা যায় তো অন্য রাজা হয়।'

ওদিকে উঠোনের মাঝখানে টানা লম্বা দড়ি টাঙিয়েছে ললিতা। সে দড়িতে দিনভোর ওর ঘরের বাদুর শতরঞ্চ কম্বল ঝুলতে থাকে। জিনিসগুলো নষ্ট হয় রোদে জলে ধুলোয়। তা থাক্, মুখ দেখাদেখি হওয়ার সমস্যাটা তো মেটে।

মুগলের মেয়েটা মাঝে মাঝে কম্বলের পাশ কাটিয়ে ওঘরে গিয়ে উঁকি মারে, 'কি সব চালাচ্ছ তোমরা বৌদি, আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে।'

নবনলিনী বলে, যাও ভাই ওঘরে যাও, তোমার মা টের পেলে এক্ষুণি গালমন্দ করবেন।'

'খুড়িমা' আর বলে না, 'তোমার মা' বলে।

ওঘরে গিয়ে দাঁড়ালেই ললিতা বলে। 'আবার ওঘরে গিয়ে সেঁধিয়েছিলি হাড়হাবাতে লক্ষীছাড়া বেহায়া মেয়ে?'

এমনি করতে করতেই মামলার রায়ের দিন ঘনিয়ে আসে।

এই সব মহামুহূর্তেই দেবদেবীদের প্রাপ্তিযোগ ঘটে। 'মানতে'রও রেষারেষি চলে।

বিবদমান দু'পক্ষই যখন জয়লাভের আবেদন জানিয়ে একই দেবতার কাছে মানত করে। তিনি তখন কি ভাবে কর্ম নির্ধারণ করেন, তিনিই জানেন। তবে 'দেশের কালী', 'বাবার থান' ইত্যাদিতে এমন হামেসাই ঘটে।

মুগল সুবলের ব্যাপারেও ঘটল।

দু'জনেই 'বাবার থানে' পুজো দেবার তোড়জোড় চালাতে লাগল রায় বেরোবার আগের দিন।

দিনটাও মোক্ষম—সোমবার, চতুর্দশী, বাবার শ্রেষ্ঠ দিন।

এখান থেকে যেতে হলে শেষ রাত্রে বেরোতে হয়, যানবাহন বলতে গরুর গাড়ীই ভরসা।

সুবল গাড়ী ঠিক করতে এসে শুনল, 'রঘুর' গাড়ী এই খানিক আগেই মুগল বায়না করে গেছে।

রঘুর গাড়ীর বলদ জোড়াই এ অঞ্চলে বিখ্যাত পালোয়ান, কাজেই মুগলের পুজো আগে পৌঁছে যাবে বাবার চরণে। তার মানে সবই ব্যর্থ।

সুবল তখন মজুরি কমাতে রঘুকে ভাঙাতে চেষ্টা করল, কিন্তু রঘু অটুট। বলল, 'বলেন কি দাদাবাবু? কথার দাম বেশী না টাকার দাম বেশী?'

অতএব ওপথে হল না।

সুবলের শুভানুধ্যায়ীরা বলল, 'অন্য পথ ধর, অন্য পথ আছে।'

কিন্তু না।

প্রাণ নিয়ে টানাটানিও না, কিছুই না। কোন প্রকারে যুগলের শরীর থেকে সামান্য একটু রক্তপাত ঘটাতে হবে। রক্তপাত ঘটলে 'বাবার' পুজো হয় না।

রক্তপাত!

সুবল একটু ভাবল, ভাবপর বলল, 'ঠিক আছে। বেশী কিছু অনিষ্ট না হয়।'

কিছু না। পায়ের তলায় একটু কাঁচের কুচি ফোটাবার ব্যবস্থা করলেই হবে। আর সে ভার শুভানুধ্যায়ীরাই নিচ্ছে।

মহোৎসাহে পুজোর যোগাড়-যন্ত্র নিয়ে পাড়ীতে উঠল সুবল।

শুনল যুগল এই খানিক আগেই বেরিয়েছে। শুভানুধ্যায়ীরাও কিভাবে যেন 'বিশেষ দরকার' বলে বন্ধুকে বলে-কয়ে সেই গাড়ীতেই একটু আশ্রয় নিয়েছে। না নেবার কারণও নেই, তার সত্য মূর্তি কার কাছেই বা প্রকাশিত হয়। পাড়ার লোক ভদ্রলোক।

সে বরং সারা রাস্তা যুগলের কাছে সুবলের নিন্দাবাদ করতে করতেই যাবে।

ঈশ্বরের লীলা!

জিনিসপত্র নিয়ে যে পাণ্ডার বাড়ী উঠল সুবল, দেখা গেল ইতিমধ্যেই সে যুগলকেও আশ্রয় দিয়েছে।

ছ্যাঁচা বেড়ার ঘর, তার দাওয়ার পাটিশান থেকে দেখা যাচ্ছে যুগল ওঘরে শুয়ে আছে, তার পায়ের চেটোয় এতখানি ন্যাকড়া জড়ানো।

পুলকিত সুবল হাত তুলে বলে, 'জয় বাবা! জয় ঠাকুর তুমি!'

তারপর মনে মনে আঁচ করতে থাকে কতটা পারিশ্রমিক চাইবে শুভানুধ্যায়ী।

যুগলের পুজো দেওয়া হয়নি। রক্তপাত হলে হয় না।

পাণ্ডার হাতে উপচারগুলি ধরে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে সে, এবং কাঁচটা যে কিভাবে ফুটল তাই ভাবছে।

হঠাৎ শুনতে পেল পাণ্ডাঠাকুর কার কাছে আক্ষেপ জানাচ্ছেন, 'এই দেখুন না কপালের ফের! একজন এল পুজো নিয়ে, কোথা থেকে পায়ে কাঁচ ফুটে সব পণ্ড! না হবার হলে এমনি হয়।'

কিন্তু এ কি! উত্তরটা দিচ্ছে কে!

বড় পরিচিত গলাটা যে!

সুবল শয়তানটাও তা'হলে এইখানেই উঠেছে!

উঃ কত শয়তানি! আবার দুঃখু জানানো হচ্ছে। আহা তাই বুঝি! বড় দুঃখের কথা তো!

আবার ভাবে, ও দুঃখু জানাবে না কেন। অন্য লোক তেবেই জানাচ্ছে। টের পেত যদি কাকা হতভাগা, আস্তো দু'হাত তুলে মাচত!

থাক আমি দেখাটি দিচ্ছি না।

শুয়ে শুয়েই টের পায় যুগল, সুবল পাওার সঙ্গে চলে গেল। পাওার গিন্নীর কাছে চাল ডাল তেল মশলা দিয়ে সেদ খিচুড়ি পাক করে রাখতে। পুজো দিয়ে এসে খেয়ে তবে ফিরবে।

যুগলের পুজো দেওয়া হয়নি।

মনের আক্ষেপে ও আজ উপোসী থাকবে। গাড়োয়ান রঘুর জন্যেই তার দেরী। রঘু স্নান পুজো সারবে, ভাত রেঁধে খাবে, তবে যাবে।

বেশ খানিক পরে হৈ-হৈ করে ফিরল সুবল। শুনল পাওাগিন্নী জানাচ্ছেন সব প্রস্তুত।

যুগলের কৌতূহল অদম্য হল।

কি রেঁধেছে পাওাগিন্নী। চিরকেলে খুঁতখুঁতে সুবলের মনের মত কি না। খুড়িকে তো আগিয়ে পুড়িয়ে খেত আগে—'ওই ধুলো পড়েছে। ওই কালো হয়েছে। ওই হাত দুলে না'—এই সব বলে।

পা ঘসটে ঘসটে এসে দরজার একটা কপাট বন্ধ করে বসল যুগল।

দেখল মেটে দাওয়ায় দিব্যি আওট পাতা ভর্তি করে সোনার বর্ণ খিচুড়ি ঢেলে দিয়েছে পাওা-গিন্নী, বড় বড় দুখানা বেগুন ভাজা, আলুর দম।

ঘাট ক্রোশ এতখানি বেলা অবধি উপোসী থেকে তবু ভাল খাওয়াটা পাচ্ছে।

অন্যমনস্কে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল যুগল।

সুবল বসল পাতের সামনে।

তারপর এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বলে উঠল—'কাঁচা লঙ্কা নেই?'

ওঃ বাবুর অব্যেসটির এদিক ওদিক হবার জো নেই! এক মুঠো কাঁচা লঙ্কা না হলে খাওয়া হয় না।

'কাঁচা লঙ্কা!'

পাওাঠাকুর এদিক ওদিক তাকালেন, তারপর বললেন, 'দেখছি।'

ঠাকুর মশাই চলে যেতেই সুবল হঠাৎ আপন মনেই বলে উঠল, 'আরে আমি কি গাধা! ওই তো ওখানে গাছ ভর্তি লঙ্কা!'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠোনে নেমে বেড়ার ওধারে এগিয়ে গেল সুবল। লাল টুকটুকে ঝুরিঝুরি লঙ্কা ফলে আছে গাছ আলো করে।

পটপট ছিঁড়তে লাগল সুবল, আর ঠিক—ঠিক সেই সময় ঘটে গেল ঘটনাটা। একেবারে যুগলের চোখের সামনে।

অথচ পিছন ফেরা সুবল টেরও পেল না।

চোখে সর্ষে ফুল দেখল যুগল।

এক্ষুণি সুবল এসে পরমানন্দে ওই পাতে বসবে।

হায় বাবা তারকনাথ! হতভাগা কি তাহলে আর বাঁচবে?

যে সে কাক নয়, দাঁড়কাক।

এই চতুর্দশীর ভর দুপুরে দাঁড়কাকের এঁটো খেয়ে কি বাঁচে মানুষ?

সুবল এসে পিঁড়িটা একটু টেনে নিয়ে বসল।

পারল না।

আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না যুগল। দরজার বাইরে বেরিয়ে এল সে। ঠোঁট কেঁপে গেল। গলা দিয়ে শব্দ বার করতে হল কষ্ট করে। তবু ভাঙা-ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'সুবল! আমি তোর কাকা, আমি তোকে পায়ে ধরে নিষেধ করছি ও খিচুড়ি খাসনি।'

সুবল চমকে হাত গুটিয়ে এদিকে তাকাল!

যুগল আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে তেমনি ভাঙা গলায় বলল, 'দাঁড়কাক!'

না, সন্দেহের কিছু নেই।

পরম শত্রু যুগল নিছিনিছি তার খাওয়ার হস্তারক হচ্ছে না। পাচিলে বসে দাঁড়কাকটা তখনও সেই মস্ত বেগুন ভাজার একখানা কামড়া করে যাচ্ছে।

পাতের চারপাশে ইতস্তত: খিচুড়ির কণা।

'দাঁড়কাকের উচ্ছিষ্ট খেলে সাতজন্মের প্রমাই ক্ষয় হয় সুবল, বারণ করছি তোকে—'

কিন্তু এ কথাটা আর শেষ করতে পারে না যুগল, ইতিমধ্যে সুবল এসে আছড়ে পড়েছে যুগলের কাছে।

শুধু আছড়েই পড়েনি, জড়িয়ে ধরেছে দু'হাতে আর চেঁচাচ্ছে—কাকা—কাকা গো, আমি এই মাত্তর 'বাবার থানে' তোমার মৃত্যু কামনা করে এলাম।'

পাণ্ডাঠাকুর এক মুঠো লঙ্কা হাতে করে এসে হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখেন তাঁর দুই যজমানের একজন আর একজনকে সাপ্টে-পাপ্টে জড়িয়ে ধরে ফ্যাস ফ্যাস করে কাঁদছে, আর সেই জল সন্দেহে তার গায়ে হাত বুলাতে বুলোতে বলছে, 'যেতে যে ওসব কথা; যেতে যে!'

তারপরের কথা সংক্ষিপ্ত।

রঘুর বাড়ীতেই দু'জনে বাড়ী ফেরে।

যেতে যেতে যুগল মনে মনে মানত করে, এরপর একদিন বাবার থানে এসে খিচুড়ি রাঁধিয়ে দাঁড়কাক ভোজন করাবে।

অসুবিধে নেই।

ওখানে সব কাকই দাঁড়কাক।

আচার্য প্রফুল্ল

[illegible]

বাল্যকালে আমার আদর্শ পুরুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অল্প কয়েকজন বাঙালী প্রধান। আমি অবশ্য কোনো দিনই বৈজ্ঞানিক হবার স্বপ্ন দেখিনি, সুতরাং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র হবার কথা কল্পনায় আনিনি। কিন্তু তাঁর তপস্যা ও ত্যাগ, তাঁর দেশপ্রেম ও দেশভাবনা আমাকে এমন মুগ্ধ করে যে আমি তাঁকে একদিন একখানি চিঠি লিখে জীবনের পাথেয়স্বরূপ কিছু উপদেশ চাই।

তাঁর কত কাজ! তিনি কত ব্যস্ত! উত্তর কি সত্যি আসবে! কিন্তু এলো একদিন তাঁর উত্তর। তাঁর নিজের হাতে লেখা বোধ হয়। অন্তত স্বাক্ষর তো তাঁর নিজেরই। সবটা আমার মনে নেই। চল্লিশ বছরের উপর কেটে গেছে। একটি উক্তি আমার স্মরণে আজো জ্বলজ্বল করেছে। ভোলবার মতো নয়।

"বাঙালীর উৎসাহ," লিখেছিলেন আচার্যদেব, "খড়ের আগুনের মতো দপ করে জ্বলে উঠে দপ করে নিবে যায়!"

অন্যান্য লাইনগুলি মনে নেই। বোধহয় তিনি আমাকে একটি ব্রত স্থির করে নিয়ে তাতে অবিচলিত থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

ওঃ। হাঁ, বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার সম্বন্ধেও দু'এক কথা ছিল। বাঙালীর বুদ্ধি আছে, কিন্তু সে বুদ্ধি সৎকাজে লাগে না। এ ক্ষোভ তাঁর অন্যত্র ব্যক্ত হয়েছিল। তাঁর লেখা একখানি পুস্তিকাও ছিল এই নামের। সেখানি আমি পড়েছিলুম।

তারপর প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে আমার আর কোনো যোগাযোগ ঘটেনি। মাঝে মাঝে লেখা দেখতুম। অথবা ভাষণ। সাক্ষাৎকারের জন্যে বিশেষ কোনো চেষ্টা করিনি। তিনি যে পথের পথিক আমি সে পথের পথিক নই। তবে বরাবরই আমি ছিলুম তাঁর গুণমুগ্ধ ও তাঁর ভক্ত। আমার মানসে তাঁর আসন কোনোদিন টলেনি।

চাকরির দ্বিতীয় বৎসরে রাজসাহী জেলার নওগাঁয় যখন বদলি হয়ে যাই তখন আমার বয়স সাতাশ বছর। বুদ্ধিসুদ্ধি পাকেনি। কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা শোভন সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাব। এমন সময় গান্ধীজী নওগাঁর সেশন টেবিল বৈঠক থেকে ফিরেই গ্রেপ্তার হন আর সঙ্গে সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এই আন্দোলনের প্রথম কয়েদী ছিলেন আত্রাইঘাটের যশোদাবাবু ডাক্তার। যতদূর মনে পড়ে আমি তাঁকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিই। মনে হলো দণ্ডটা অথবা গুরুদণ্ড হয়ে গেছে। যশোদাবাবু দেখলুম আদর্শ সত্যাগ্রহী। সাজাটাকে খেলোয়াড়ের মতো নিলেন। হাসি মুখেই। এর পর হও উত্তরোত্তর কষতে থাকে। খালাসও দেওয়া হয়। কারণ নওগাঁ মহকুমায় কয়েদী কেউ বিপজ্জনক ছিলেন না। দণ্ডটা বরং পড়ল আমারি মাথায়। যেহেতু আমি

ঘোরতর রাজদ্রোহের দৃষ্টান্ত দেখেও বড় বেশী নরম! যাক, সেসব দিনও গেছে। মনের দাগ আমি সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছি।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হই আমি যেদিন নওগাঁ থেকে বদলি হয়ে যাবার সময় আত্রাইঘাট স্টেশন অতিক্রম করি। মস্ত ভীড়ে কেই বা পোছে! দেখি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছেন যশোদাবাবু ডাক্তার। আমার বদলির খবর শুনে বিদায় দিতে এসেছেন। দুঃখের সহিত। আমি বললুম, "সে কী! আপনার তো এতে আনন্দিত হবার কথা। আপনাকেই যে আমি সকলের আগে আর সবচেয়ে বেশী সাজা দিয়েছিলুম।"

"সেইজন্যেই," বললেন যশোদাবাবু, "আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি চেয়েছিলুম যে আপনি আমাকে কঠোর সাজা দিয়ে সম্মানিত করেন। এতে আমার মান বেড়ে গেছে কত!"

সেই আত্রাইঘাটেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্কটত্রাণের কর্মীরা থাকতেন। এখনো রয়েছেন শ্রীরেনবাবু ডাক্তার। অসহযোগ আন্দোলনের বছর তিনেক পরে আত্রাই নদীতে যে ভয়ঙ্কর বন্যা আসে তার থেকে মানুষকে ত্রাণ করা ছিল এঁদের ব্রত। নীরেনবাবু মেডিকাল কলেজ ত্যাগ করে এসব গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ তথা কারাবরণ করেন। ত্যাগী পুরুষ ও পরোপকারী বলে এঁর আত্রাইঘাট অঞ্চলে প্রভূত খ্যাতি ছিল। ইনি ও এঁর মতো বহুকালের পরিচিত সেবাকর্মীরা যে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবেন এটা আমরা সরকারী মহলের লোকেরা ভাবতে পারিনি। এঁদের আমরা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্য বলেই জানতুম। তিনি তো আইন অমান্যের সঙ্গে জড়িত নন। এঁরা কেন জড়িত হবেন? সেবাকর্মী হিসাবে আমরা এঁদের পক্ষপাতী ও অনুরক্ত। অথচ আইন অমান্য করলে আমরা এঁদের বিচার করতে ও এঁদের আশ্রম দখল করতে বাধ্য। তাতে আবার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে বিরক্ত করা হবে। তিনি যে মাঝে মাঝে আশ্রমে এসে বিশ্রাম করতেন।

সঙ্কটত্রাণের কর্মীদের নিয়ে আমাদের হলো উভয়সঙ্কট। ইংরেজ কালেক্টার প্রফুল্লচন্দ্রকে বিরক্ত করতে চান না। অথচ আশ্রমকেও আইন অমান্যের ঘাঁটি হতে দেবেন না। তিনি জানতে চাইলেন সার প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে কি না। আমি বলি, হাঁ, পরিচয় আছে। কথাটা ঠিকও নয়, ভুলও নয়। তখন তিনি আমার উপর ভার দিলেন সার প্রফুল্লচন্দ্রকে জানাতে যে তাঁর আত্রাইঘাটের কেন্দ্র রাজনৈতিক কারণে বন্ধ করে দেওয়া হবে, যদি না তিনি তাঁর নৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করেন। আমি তাঁকে চিঠি লিখি ভক্ত হিসাবে নয়, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে, আধা সরকারী ধরনে, "ডিয়ার সার প্রফুল্লচন্দ্র" বলে সম্বোধন করে। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট হলে যে-ফর্মে ও যে-ভাষায় লিখতেন আমিও তাই করি। "আচার্যদেব" বলে সম্বোধন করিনে। তাঁর নাইট পদবীকে আমি যথারীতি স্বীকৃতি দিই।

দিন কয়েক পরে এলো নীরেনবাবুর চিঠি। বাঙালী হয়ে আমি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সম্মান জানিনে। নিজেকে আমি কী মনে করেছি। ছি! ছি! এই হলো তার মর্ম। এত দিন পরে সবটা মনে নেই। আচার্যদেব কী লিখলেন তাও ভুলে গেছি। আইন অনুসারে সঙ্কটত্রাণ কেন্দ্র আর কর্মীদের আবাস দুই পৃথক সত্তা। আমি শেষপর্যন্ত স্থির করি যে কোনোটাই দখল করব না। আচার্যদেবের মনে দেশমাত্র আঘাত দেব না। কিন্তু একটি কাজ আমাকে করতে হলো। তেরঙা নিশান যদি সরানো না হয় তাহলে এলাকাটাকেই নিষিদ্ধ এলাকা বলে গণ্য করা হবে। পুলিশ

সরিয়ে দিতে যাবেই। না সরালে রেল লাইনের এত কাছে যে, টহলদার উপরওয়ালার চোখে ঠেকবেই। আমি কর্মীদের অনুরোধ করি পস্তাকা অপসারণ করতে। তাঁরা বলেন, "এ কাজ আমাদের দিয়ে হবে না। অপসারণ করতে হয় আপনারাই করুন।" পুলিশের উপর ধরাত না দিয়ে আমি নিজেই সযত্নে অপসারণ করি। আমার নিজের কাছেই রেখে দিই। যত্ন করেই রেখেছিলুম। অনেকদিন পর্যন্ত ছিল। বোধহয় স্বাধীনতার পরেও।

তা সত্ত্বেও কর্মীদের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে যায়। গেলে ওঁদের ওখানেই বিশ্রাম করতুম। নীরেনবাবু এখনো আমাকে ভোলেননি। যখনি শান্তিনিকেতন আসেন একবার আমার এখানে পায়ের ধুলো দিয়ে যান। তিনি বা তাঁরাই আমাকে একদিন খবর দেন যে আচার্যদেব এসেছেন। আমি গিয়ে মেজের উপর আচার্যের পাশে বসি। মাটির ঘর। উপরের দিকে চেয়ে দেখি তাঁর তৈজসপত্র চাল থেকে ঝুলছে। কোনোটাতে আছে মুড়ি, কোনোটাতে বাতাসা কি গুড়। তাঁর সঙ্গে বসে জলযোগ করি। যেমনটি শুনেছিলুম। সরলতার অবতার। সেই বিখ্যাত কিস চড় আমাকেও খেতে হলো। কিন্তু আমার সরকারী কাজের জন্যে তিনি আমাকে দোষ দেননি। উল্লেখই করেননি।

সেই সময় তাঁকে ভালো করে দেখি। অত্যন্ত আপনভোলা মানুষ। বললেন, কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে পালিয়ে এসে আত্রাইঘাটে আত্মগোপন করেন। এটা তাঁর পলায়নের আশ্রয়। কত রকম গল্প করলেন। কর্মক্লান্ত পলাতকের মতো। আত্রাইঘাট সন্তরণ কেন্দ্র স্থাপন করার সময় তাঁর কর্মতৎপরতার নিদর্শন ছিল। কিন্তু আমি যে সময়কার কথা বলছি সে সময় আচার্যদেবের কর্মতৎপরতার তেমন কোনো চিহ্ন দেখতে পাইনি। হয়তো আমারি মনে নেই। কাজ যা কিছু তা চরকা খাদি ইত্যাদির বা দাতব্য চিকিৎসার। নীরেনবাবু আশা করেছিলেন যে মুসলমানরা তাঁর সেবা ভুলবে না, সদলবলে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে, আইন অমান্য করবে। কিন্তু সাড়া আমিও লক্ষ্য করেছিলুম। সেটা লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনের মাঝখানে। পরে তারা যদে যায় বা মোল্লাদের দলে চলে যায়। মোল্লারা ছিলেন ইংরেজ কালেকটারের প্রধান খুঁটি।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে পরে আমি আরো একবার দেখেছিলুম। সে সময় আমি নওগাঁর মহকুমা হাকিম নই, রাজসাহীর কালেকটার। স্পষ্ট মনে আছে আত্রাইঘাট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তিনি ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। আমি তাঁকে প্রণাম করতে তিনি আমাকে যা বললেন তা আমার অপ্রত্যাশিত। বললেন, "দেখলি রে। কারা জেল খেটে মোলো আর কারা কংগ্রেসের টিকিট পেয়ে আইনসভায় গেল!"

আমিও সেটা লক্ষ্য করেছিলুম। বললুম, "রাজনীতিতে এইরকমই হয়ে থাকে, স্যার।"

তিনি বিমর্ষ রইলেন। আকসোস জানাতে জানাতে ট্রেন এসে পড়ল। কংগ্রেস টিকিটে নির্বাচনে যারা জিতলেন তাঁরাও যে হাতে মোয়া পেলেন তা নয়। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল—কৃষকপ্রজা ও মুসলিম লীগ—হাতে হাত মিলিয়ে মোয়া লুকে নেয়। যারা জেল খাটল আর যারা তাদের জেলে পাঠাল তারা সমান তাজ্জব। সংগ্রামটা এইজন্যে হয়েছিল বটে! ইতিহাসে এইরকমই হয়ে থাকে, স্যার।

ওই কীণ শুষ্ক ইক্ষুদণ্ডখানির মধ্যে প্রগাঢ় বাৎসল্যরস ছিল। আমিও তার আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হইনি। গর্ব করবার মতো কিস চড় আমিও খেয়েছি। কুর্তি করে দেওয়া। কুর্তি করে খাওয়া।

অনাবৃষ্টি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'আরে নিখিল যে, কী মনে করে?' সুনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: 'কতদিন তোকে দেখিনি। কী ব্যাপার?'

'বিশেষ জরুরি কাজে তোর কাছে এসেছি।' কুণ্ঠিতমুখে হাসি আনবার চেষ্টা করল নিখিল।

'বোস। বল কী কাজ?'

মুখোমুখি চেয়ারে বসল নিখিল। বললে, 'একটি ভদ্রমহিলার বিরুদ্ধে মামলা করতে চাই।'

মহিলার থেকেও মামলার প্রতি বেশি কৌতূহল। সুনন্দ নির্লিপ্ত মুখে বললে, 'কী মামলা?'

একটু বুঝি বা দ্বিধা করল নিখিল। ঢোঁক গিলল।

'কী, মানহানি? ব্ল্যাকমেইল? এক্সটরশান?' গলা খাঁকরা করল সুনন্দ।

'না, ও সব কিছু নয়।'

'তবে?'

'জুডিশিয়াল সেপারেশান।' তীব্র মুখে তাকাল নিখিল।

'তবে ভদ্রমহিলা কে?'

'আর কে! আমার স্ত্রী।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। আর একসঙ্গে থাকা সম্ভব হচ্ছে না।' কঠিন-করুণ মুখ করল নিখিল।

'গ্রাউণ্ড কী করবে?'

'ক্রুয়েলটি। নিষ্ঠুরতা। আর এ নিষ্ঠুরতা শুধু শারীরিক হবে এমন তো কথা নেই, মানসিকও হতে পারে।'

'তা পারে।' সুনন্দ সিগারেট কেস বাড়িয়ে দিল নিখিলের দিকে। নিখিল নিল না দেখে নিজেই ধরাল একটা। বললে, 'এরকম নালিশ সচরাচর তো স্ত্রীরাই করে। স্ত্রীরাই তো বলে স্বামী নিষ্ঠুর, নির্যাতক, অত্যাসক্ত।'

'তুমি কি বলতে চাও স্ত্রীরা কম অত্যাচারী, কম নিষ্ঠুর হয়?' আগুনেভরা নিশ্বাস ফেলল নিখিল।

'হয় যে তা কে না জানে! তবু স্ত্রী দুর্দান্ত বলে স্বামীবিচ্ছেদ চায় এটা যেন বিশেষ সম্ভ্রান্ত দেখায় না। বরাবর উলটোটাই ঘটেছে কোর্টে। স্বামীই প্রপীড়ক আর স্ত্রীই নিপতিত।'

'কিন্তু আমার পক্ষে ও ছাড়া আর উপায় কী! আমার তো মনে হয় হৈ-হল্লা আরম্ভিট করার

চাইতে মামলাই সহজ। শান্তিকামী ভদ্রলোকের উপযুক্ত। থানা-পুলিশ-হাসপাতাল-ফৌজদারি এর কোনো সমাধান নয়।

'এখন, হ্যাঁ, বলো, কী ভাবে তোমার স্ত্রী নিধুর?' সুনন্দ এবার কথায় ব্যারিস্টারি ভঙ্গি আনল।

যা বলবে তাই তুচ্ছ শোনাবে এমনি মনে হল নিখিলের। কিন্তু পদে পদে পায়ের নিচে তপ্ত আঙারের মত এ যন্ত্রণা, না বললেও তো প্রতিকারের পথ নেই। অন্তত চিকিৎসক তো জানবে ব্যাধির লক্ষণ কী!

'প্রথমত খেতে দেয় না—'

নটার সময় আফিস, স্নান-টান সেরে স-আটটার মধ্যেই তৈরি নিখিল।

'মধুকর!'

কাঁচুমাচু মুখে চাকর কাছে এসে দাঁড়াল।

'ভাত হয়নি?'

'না, হুজুর।'

'হয়নি কেন? মা কোথায়?'

'ঘুমুচ্ছেন।'

'দরজা বন্ধ?'

'না, খোলা।'

'তার মানে ভোরে একবার উঠে আবার গিয়ে শুয়েছেন।'

চুপ করে রইল মধুকর। চোখ নামাল। মানে, সমর্থন করল।

নিখিল আভার ঘরে ঢুকল।

'তোমাদের আলাদা ঘর নাকি?' জিগ্‌গেস করল সুনন্দ।

'আলাদা ঘর।'

'কবে থেকে?'

'অনেকদিন থেকে। যেদিন থেকে বউদি বিদায় হয়েছেন।' চোখের দৃষ্টি একটু বা ছলছলে হয়ে এল নিখিলের।

ঘরে ঢুকে নিখিল বললে, 'ও কী, শুয়ে আছ, আমাকে খেতে দেবে না?'

'তোমার চাকরদের বলো গে।' আভা চোখ পর্যন্ত খুলল না।

সত্যিই তো, দু দুটো চাকর আছে, একজন অফিস থেকে পাওয়া যে রান্নাবান্না করে, আরেকজন বাইরে থেকে, ধরা। দুজনই তো রাতদিন বাড়ি থাকে। ঘরের গৃহিণীর যদি অসুখ হয় তা হলে ওদেরই তো দেখবার-শোনবার কথা। ওরা দুটো ছুটিয়ে দিতে পারত না তাকে?

ওদের দিকে সরোষ চোখ ফেলতে ধরা-চাকর রামসদয় বললে, ভাঁড়ার-ঘর তালাবন্ধ। চাল-ডাল বের করে না দিলে রাঁধবে কী মধুকর!

সেই কথাটাই বলতে গেল নিখিল।

আঁচল থেকে চাবির গোছাটা খুলে ঝনাৎ করে মেঝের উপর ছুঁড়ে মারল আভা।

রামসদয় বললে, চাল-ডাল হলেই বা কী হবে? আলু কই ডিম কই? সেসব বাজার থেকে কিনে আনতে হবে না? মা যদি বাজারের পয়সা না দেন কী করতে পারে রামসদয়?

'বাজার পাঠাওনি কেন?' জিগগেস না করে পারল না নিখিল।

'টাকা নেই।'

'নেই মানে?'

'যা দিয়েছিলে খরচ হয়ে গিয়েছে।'

'মিথ্যে কথা। হতে পারে না কখনো।' নিখিল দু পা এগিয়ে এল: 'হিসেব দাও।'

'আমি হিসেব দিতে বাধ্য নই।' কটকা মেরে পাশ ফিরল আভা।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ রইল নিখিল। পরে বললে, 'বেশ তো, টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে, চেয়ে নিলে পারতেই আমার কাছে।'

'তোমার কাছে পারব না চাইতে।'

'বেশ তো, এবার থেকে তবে চাকরের কাছে সংসার খরচের টাকা থাকবে। তোমাকে আর নাক ঢোকাতে হবে না।'

'তোমার চাকরের সংসারী নিয়ে তুমি থাকো, আমি পারব না থাকতে।' ঘরিত ভঙ্গিতে আভা আবার পাশ ফিরল।

'না পারো তো যেখানে খুশি সেখানে চলে যাও।' না খেয়েই অফিসে বেরিয়ে গেল নিখিল।

অফিস থেকে ফিরে এসে দেখল, কোথাও যায়নি আভা, দিব্যি আত্ত-সুস্থই আছে, আর এখন, বিকেলে, চায়ের সঙ্গে টোস্ট আর ওমলেট খাচ্ছে।

মধুকরের থেকে খবর নিয়ে জানল দুপুরেও খেয়েছে একপেট।

পোশাক-আশাক ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসল গিয়ে টেবলে। এখন যদি আবার সুর আসে। অলৌকিকের ছোঁয়া লাগে।

টেবল থেকে উঠে গেল আভা। বারান্দায় পাইচারি করতে গেল।

'খাবার কিছু আছে রে মধুকর?'

'মা তো কিছুই রাখেননি যোগাড় করে।' মধুকর বিষণ্ণমুখে বলল, 'একটা ওমলেট করে দেব?'

'খবরদার না।' রণচণ্ডীর মত হাঁকরে উঠল আভা: 'ছোলাসেদ্ধ আছে বাটিতে, তাই দাও।'

বাটিটা এগিয়ে দিল মধুকর।

'নিজে এত খেলে, আমার জন্যে রাখোনি কেন?' আভার উদ্দেশে চেঁচাল নিখিল।

'তোমার পয়সায় খাইনি।'

'আমার পয়সায় নয় তো, কার পয়সায়?'

'আমার বাবার পয়সায়।'

'তোমার বাবার পয়সায়, না,—' ক্ষুধার্তমুখে কী একটা কটিন কথা বলে ফেলল নিখিল।

আর তখুনি আভা গগনছোঁয়া আর্তনাদ করতে বসল। কখনো ঘরে কখনো বারান্দায় কখনো

বা পাশের ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার কাছে। ওগো বাবা গো, মাগো, আমাকে কার হাতে দিয়েছিলে গো, কী অমানুষ চাষা, কী হাড়কিপ্পন কঞ্জুস গো, আমাকে এসে নিয়ে যাও গো—'

নিখিল বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। গলিতে নয়, বড় রাস্তায়, একটা রেস্টোরেন্ট খুঁজে নিতে।

'বলো এ ক্রুয়েলটি নয়?' করুণচোখে তাকাল নিখিল।

'ক্রুয়েলটির চরম।' কষ্টে একটু হাসল সুনন্দ: 'আগে শুনেছি স্বামী স্ত্রীকে খেতে দেয় না, এখন দেখছি স্ত্রী দেয় না স্বামীকে।'

'আর এতে দেখতে পাচ্ছ আমার স্বাস্থ্য কেবল ভেঙে যাচ্ছে।' নিখিল সাগ্রহে বললে, 'এতে, শুধু এই গ্রাউণ্ডে কেস চলতে পারে না?'

'নিশ্চয়ই পারে; কিন্তু ঐ যে 'বাবার পয়সা' কথাটা বলে তার মানে কী?' কিছুই অন্ধকারে রাখতে চায় না সুনন্দ।

'দু কারণে বলে।' বললে নিখিল, 'এক কারণ, বিয়েতে ওর বাবা পাঁচ হাজার টাকা পণ দিয়েছিলেন, তাই যখনই ওর হাতে যা টাকা দিচ্ছি তাতে ওর বাবার ঋণই ক্রমাগত শোধ করছি। শত দিয়েও সে ঋণের শেষ হচ্ছে না। তাছাড়া কখন কোন টাকাটা যে 'বাবার পয়সা' বলে চিহ্নিত করবে তার কিছু ঠিকঠিকানা নেই।'

'দ্বিতীয় কারণ?'

'দ্বিতীয় কারণ, সামান্য দু হাজার টাকা ওর বাবা ওকে দিয়েছিলেন বিয়ের সময়। সেটা ব্যাঙ্কে সেভিংস অ্যাকাউণ্টে আছে ওর নামে, চেকবই ওর নিজের হেপাজতে। যদ্দুর জানি একটা চেকও কাটেনি এ পর্যন্ত। কিন্তু যখনই কোনো টাকা-খরচের প্রশ্ন উঠেছে, বলেছে এ আমার নিজের টাকা, মানে, বাবার টাকা। আসলে কিন্তু সবটাই আমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙা।'

'বুঝেছি।' সুনন্দ আরেকটা সিগারেট ধরাল: 'স্ত্রী বুঝি তোমাকে একটা শুধু টাকা-রোজগারের যন্ত্র বলে মনে করে?'

'ঠিক তাই। ও মনে করে যে-হাজার খানেক টাকা রোজগার করছি সব ওর জোরে, যেহেতু শাস্ত্রে বলেছে স্ত্রীভাগ্যে ধন, সুতরাং মাসান্তে সব টাকা এনে ওকেই আমার দেওয়া উচিত।'

'সমস্ত?' বিরক্ত হল সুনন্দ।

'সমস্ত। আমার যেন পৃথিবীতে আর কোনো আত্মীয় নেই, আর কোনো দায়দায়িত্ব নেই। সব টাকা ওর কোলেই ঢেলে দাও। তারপর ও ওর ইচ্ছামত খরচ করবে, ওড়াবে-পোড়াবে, ছড়াবে-ছিটাবে, কেউ কিছু বলতে-কইতে পারবে না। আমি পর্যন্ত মুখ বুজে থাকব। সামান্য ট্রাম-বাস ভাড়া পর্যন্ত হাত পেতে চেয়ে নিতে হবে ওর থেকে।'

'এ অসম্ভব।' টেবিলে একটা ঘুসি মেরে বসল সুনন্দ।

'তবু মায়ের কথা শুনে কয়েকমাস সব টাকাটা ওর হাতেই পৌঁছে দিয়েছিলাম।' হাড়কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস ফেলল নিখিল: 'কিন্তু কী করল ও টাকা দিয়ে? ছিনিমিনি খেলল। আমাদের পুঁইডাঁটার চচ্চড়ি খাইয়ে বাকি টাকায় শুদ্ধের শাড়ি কিনল। পরের মাসে হয়তো বা শুদ্ধের পর্দা-কার্পেট। নয়তো বা ফার্নিচার—'

'এই দড়ির খাটটা কিনেছ কেন?' তম্বি করে উঠল নিখিল।

'কী বুদ্ধি! ওটা দড়ির খাট?' আভা চোখ পাকাল।

'হলই বা না! নেয়ারের খাট। কিন্তু এটা কেনবার কী দরকার ছিল? এটায় কে শোবে?'

'আমি শোব।'

'কখন? কার সঙ্গে?'

'ভূতের সঙ্গে। যমের সঙ্গে। এ খাটে করে নিয়ে যেতে পারবে শ্মশানে।'

'কী আবদার! নেয়ারের খাটে করে শ্মশানে যাবে!' ঘুরে দাঁড়াল নিখিল: 'মামুলি একটা খাটিয়া কিনলে হত না? দড়ি খুলে, ইচ্ছে হলে, অন্য কাজেও লাগাতে পারতে।'

'মানে-সলায় দিয়ে ঝুলে পড়তে পারতাম!'

নিখিল চুপ করে রইল। 'এমন দিন কি হবে মা তারা—'গানের লাইনটা বারে বারে মনে আসতে লাগল।

'অত সহজে ছাড়ান দেব না।' উগ্র চোখে তাকাল আভা: 'যদি মরিও, পুলিশ সুপারের কাছে চিঠি লিখে যাব আমার মৃত্যুর জন্যে কোন্ অমানুষটা দায়ী।'

এও নিশ্চয়ই এক সম্মরণানির ব্যাপার। তবুও কাটান-ছাড়ানের নানা উপায়-কৌশল বার-করা যায় হয়তো। ইঙ্গিত দেওয়া যায় অসতী বলে। ব্যাধিগ্রস্ত বলে। অন্তত চাকরিটা বিপ্লিত হয় না।

প্রবীণ এক সাইকিয়াট্রিস্টকে নিয়ে এসেছিল নিখিল। সর্বক্ষণ কলহ করে, চেঁচায়, প্রতিবাদ করলে তো চটেই, প্রশংসা করলেও খেপে যায়। ঘুম কম, খিদে বেশি, চারপাশে কেবল বিকৃতি দেখে। কে ওর দিকে কী বিশ্রীভাবে তাকাল, কে ওকে নিয়ে কী গুজগুজ করছে, সর্বক্ষণ এই শুধু সন্দেহ। আর কেবল হাঁটে, হাঁটে, পাইচারি করে। এতটুকু ক্লান্ত হয় না।

কায়দা করে কথাবার্তার মধ্যে টেনে এনে যা সাধ্য বুঝে নিল ডাক্তার।

'আমাকে দেখছেন কী!' যখন আসল ব্যাপারটা বুঝল, বিশ্রী চেঁচিয়ে উঠল আভা: 'ওকে দেখুন, ওই জন্তুটাকে। ও একটা রক্তমাংসহীন কাঠকুণ্ড, বিকৃতির স্তূপ—'

নিভৃতে নিখিলকে বললে ডাক্তার, না, আত্মহত্যা করবার কেস নয়, বরং খুন করবার কেস। শুধু ভোগেচ্ছা, সবস্ত কিছু গ্রাস করবার ক্ষুধা। তাকে সব দাও, প্রভুত্ব আর প্রাচুর্য, আর সকলে তার পদানত হয়ে থাকো এই এক লালসার মূর্তি।

'উপায়?'

'গায়ের জোর।'

'প্রহার?'

'মন্দ কী।' ছোট্ট করে হাসল ডাক্তার।

'দু এক পশলা ইতিমধ্যে যে না হয়েছে তা নয়।' নিখিল বলতে লাগল: 'যদি গায়ে একটু জলের ছিটে পড়ে এমন চেঁচায় যেন কে ওকে বেঁধে বাঁশ দিয়ে পিটিয়েছে। ওর চিৎকারেই আমি উঠি। পুরুষ তন্ত্র, সভ্য, সহ্য করবার মত তার শালীনতা আছে। ওগো আমাকে আমার স্ত্রী

মেরেছে এই বলে সে কাঁদতে পারে না, চেঁচাতে পারে না, কৌতূহলী পাড়ার লোককে একত্র করতে পারে না। আর আমি যদি মারি, রক্তে-লজ্জায় মারব, আয়না বুকে মারব, হাতের বাইরে অস্ত্র অস্ত্রের আশ্রয় নেব না। কিন্তু ও যখন মারবে তখন পাগলের মত মারবে, আয়না-অস্ত্রাঘাত বিচার করবে না। আর এমন সব প্রহরণ ধরবে যা চতুর্মুখবিধাতিনীও ভাবতে পারেনি। আর স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায়, জানেন তো, পাড়ার লোক সকলে স্ত্রীর পক্ষে। স্বামী শত নির্দোষ হলেও কেউ তার পক্ষে নেই।'

'গাড়িচাপা পড়লে রাস্তার লোকেরা যেমন চাপাপড়াটার পক্ষে।' ডাক্তার বোধহয় এ ক্ষেত্রে দুরুদ্যোগী, তাই গলায় আশা নিয়ে বললে, 'ড্রাইভার শত নির্দোষ থাক তাকে কেউ রেহাই দেবে না। যদি কেউ আত্মহত্যা করবার জন্যেও গাড়ির চাকার তলায় এসে পড়ে, ড্রাইভারকেই দোষী করবে সকলে, তাকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবে।'

'স্বামীদেরও সেই দশা।' হতাশের মত মুখ করল নিখিল। 'তাই তেমনিধারা কোনো একটা সিন হোক, চাই না, প্রাণপণে এড়িয়ে চলি। ও না পারে করতে এমন কাজ নেই। হয়তো থানায় গিয়ে ডায়রি করে আসবে। হয়তো বা ছুটবে রাস্তা দিয়ে আর ছোটবার সময়, আপনি বিশ্বাস করবেন না, নিজের বেশবাসের দিকে লেশমাত্র লক্ষ্য রাখবে না। পাগলেরও অধম হয়ে ছুটবে।'

'না, আমি ঠিক বিশ্বাস করব; কিন্তু জিগগেস করি,' মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তার মৃদু হাসল: 'এ কি আপনাদের ভালোবাসার বিয়ে?'

'ভগবানের দয়া, ভালোবাসা কথাটার বদনাম হয়নি।' নিখিল বিদ্রূপে প্রখর হল: 'না, ভালোবাসার বিয়ে নয়। মা সাগর সেঁচে মানিক কুড়িয়ে এনেছেন। এ ব্যাপারে শুধু মাকে দোষী করাটা ঠিক হবে না। আমিও দেখে পছন্দ করেছিলাম। বি. এ. পাস, গানে-বাজনায় পারদর্শী, সাহিত্যে রুচি আছে, ডিবেটিংএ মেডেল পেয়েছে—'

'সে-মেডেলের কী জেল্লা তখনো বোঝেননি বোধহয়।' হাসল ডাক্তার।

'ঐ ডিবেটিংএর গ্রাউণ্ডেই রিজেক্ট করে দেওয়া উচিত ছিল।' সায় দিল নিখিল: 'রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী না হয়ে যদি গুণে লক্ষ্মী রূপে সরস্বতী—সরস্বতী ছেড়ে কালীকরালীও হত বেঁচে যেতাম।'

'ছেলেবেলা থেকেই খুব প্যাম্পার্ড হয়েছে বুঝি?' তত্ত্ববিৎ আবার প্রশ্ন করলেন।

'মা-বাবা আদর দিয়ে যাঁরা বানাবে তা বিচিত্র কী। কিন্তু মা, আমার মা, বিয়ের পর বউকে নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করতে লাগলেন, যেন সোনার প্রতিমা জলে পড়েছে। তাঁর কাছে আতা তো নয়, স্বর্গের দেবী। দুধের সর দিয়ে আঙুর পুষতে লাগলেন। সংসারের তৃণ কাজও করতে দিলেন না। সোহাগের চূড়ায় উপর বসিয়ে রাখলেন। সিনেমায় যাবে বউ, ইন্টারভেলে খাবার জন্যে সঙ্গে টিফিনকেরিয়ারে লুচি-সন্দেশ দিয়ে দিয়েছেন, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবার সময় আঁচলে আপেল বেঁধে নিয়েছেন পাছে সে-বাড়িতে বউকে আপেল খেতে না দেয়। ঐ-সোনার হাতে কি আপেল ছাড়া অন্য কোন ফল কাটা পড়তে পারে? এখন হয়েছেও তাই। স্বামীর মাথাটাকেই আপেল করে ছেড়েছে।'

'কিন্তু যাই বলুন, শক্ত ছাড়া ওকে শায়েস্তা করা যাবে না।' উঠল মনোবৈজ্ঞানিক। নিগূঢ় হবার চেষ্টায় একটু বা প্রগাঢ় হল: 'মারামারিতে-না পারেন স্বামীত্বের জোরে তো পারেন বশীভূত করতে।'

'সেখানেও প্রচণ্ড প্রত্যাখ্যান।' নিখিল মিনমিনে গলায় বললে।

বৈজ্ঞানিক চলে যাচ্ছে, আভা তার পথ আটকাল। বললে, 'ওর চিকিৎসার কী করলেন।'

'ওর—কার?' ডাক্তার ভাকা সাজতে চাইল।

'ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।' নিখিলকে ইশারা করল আভা: কলসী না পেয়ে যাকে গলায় বেঁধে বাবা-মা জলে ফেলেছেন আমাকে। ওকে ওষুধ দিন।'

'ওর তো কোন অসুখ করেনি।'

'অসুখ করেনি? ও পশু। ও পঠ! ও নৃশংস।' আভা মরীয়া হয়ে উঠল।

'কচা স্বামীই তো মেয়েরা পছন্দ করে।'

'খুব ডাক্তার হয়েছেন আপনি। রুগী চেনেন না, বড়কট্টাই করতে এসেছেন। আর আসবেন না এ বাড়ি। ধরজা দেখাল আভা: আর এলেও লুকিয়ে আসবেন, দেখতে চাইবেন না আমাকে।'

ডাক্তার চলে গেল।

'মানে ডাক্তারকে তাড়ালে।' বললে নিখিল।

'তোমার উচিত ছিল ডাক্তারকে ফের ফল দেওয়া। বারে বারে ফল দেওয়া।' বললে সুনন্দ; 'তোমার স্ত্রী বিরক্ত হয় তো হোক। বিরক্ত হয়ে কী করবে? বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবে?'

'উঃ, তাহলে তো বাঁচি!'

'আর কী করবে? পাগল হবে?'

'উঃ, তাহলে তো বিবাহ বিচ্ছেদেরই মামলা করতে পারি। ত্রাণ পাই।'

'তবে সবাই মিলে ওকে বিরক্তই কর না। দেখ না কি দাঁড়ায়।' সুনন্দ চিন্তিত মুখে ভাবতে বসল।

'কিছুই দাঁড়াবে না। যত বিরক্ত হবে তত চেঁচাবে।' অসহায় মুখ করল নিখিল: 'তত শক্ত হবে। কিছুতেই খুঁটি ছাড়বে না। আর বিরক্ত যে করব আমার দলবল কই? সবাই ছেড়েছে আমাকে। কিংবা বলতে পারো, ঐ ছাড়িয়েছে। আমার ছোটমামা সেদিন এসেছিলেন—'

'আমি তো তাকে চিনি।'

'এসে আভাকে বললেন, 'তুমি এমন সুন্দর মেয়ে, কোথায় তোমার সংসারকে কবিতার মত রচনা করবে—মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উত্তরে আভা কি বললে জানো? বললে, গৃহবধূর সৌন্দর্য দেখতে হবে না আপনাকে, অন্যত্র যান।'

'অপালীন।'

'কথাটা তুমি শালীন করে বললে। সেই থেকে ছোটমামা আর আসেন না। নিখিল নড়েচড়ে বসল: 'আর আমার মেসোমশাইকেও জানো বোধ হয়। তিনি এসে বলেছিলেন কত স্ত্রী কত বিপথগামীকে পর্যন্ত ফেরায়। তোমার স্বামী যদি নির্দয় হয়, বিমুখ হয়, তুমি তোমার ইন্দ্রজাল দিয়ে তাকে বশীভূত করো। তার উত্তরে কি বলতে জানো? বললে, আমি গণিকা নই, আমি ইন্দ্রজালের ব্যবসা করি না। যারা করে তাদের কাছে যান। সেই থেকে মেসোমশাইও ছেড়েছেন আমাকে। ছোট বোনটার হাপানি ছিল, সেদিন কী একটু কাশছিল দার কাছে এসে, তাকে বললে, বেঁপো রুগীর

আয়না হবে না এবাড়ি। সেই থেকে বোন আর তত্ত্বতল্লিও মুখ ফিরিয়েছে। কেউ আর আসে না, পরামর্শও দেয় না। বলে এ তোমার একার ব্যাপার, একার এক্তিয়ার, এতে আমাদের নাক গলাবার কিছু নেই। তুমি রাখতে হলে রাখো, ফেলতে হলে ফেল, এ তোমার মর্জি। এ নিয়ে আমরা কথা বলবার কে?'

'তারা ঠিকই বলে।' সুরঞ্জন সায় দিল: 'তাদের কথার দাম কি, ক্যাশেন কি? তারা যদি বলে বউকে তাড়িয়ে দাও লাথি মেরে কিংবা যদি বলে তুমিই ওকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাও নিরুদ্দেশ হয়ে, আর তুমি যদি তাদের পরামর্শ না শোনো—'

'সে-পরামর্শ তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কেন যে তা নেওয়া যাচ্ছে না সেই কারণটা এবার তোমাকে বলি।'

'তার আগে তোমার মার কথা বল।'

বেয়ারের খাট নিয়ে গোলমাল হবার পরও আভা নিরস্ত হল না। তারপর একটা স্টিলের আলমারি কিনল।

'এটা দিয়ে কী হবে?'

'তোমার কাছে জবাবদিহি দিতে হবে এমন কোনো কড়ার করে আসিনি। আভা খেঁকিয়ে উঠল।

'স্টিলের না কিনে কাঁচের কিনলেই পারতে।'

'যেমন ছিরি তেমন বুদ্ধি।'

'আর ঐ কাঁচের আলমারিতে, গ্লাস কেসে, নিজেকে পুরে রাখতে, লোকে দেখত, বিউটি পাস নিকারেড—'

'হ্যাঁ, পরের বার একটা খাঁচা কিনব', পাল্টা জবাব দিল আভা, 'আর সে খাঁচায় পুরব তোমাকে, লোকে দেখবে, বিস্ট হিউম্যানাইজড।'

সাকুল্য টাকা স্ত্রীর হাতে দেওয়া বন্ধ করল নিখিল। একশো টাকার দুখানা নোট হাতে দিয়ে বললে, 'এ দিয়ে সমস্ত মাসের প্রাত্যহিক বাজার চালাবে।'

চেঁচিয়ে উঠল আভা: 'আমার হাতখরচ?'

'যা কিছু বাঁচাতে পারো ওর থেকে তাই তোমার।'

'তবে এ মাসের মত এই আমার হাতখরচ।' বলে নোট দুটো আভা আঁচলে বাঁধল। বাজারে পাঠাল না চাকরকে।

'সমস্ত সংসার উপোস করে থাকবে নাকি?' নিখিলের মা, অনুপমা জিগ্‌গেস করলেন।

'তার আমি কী জানি।' আভা মুখ ঘোরাল।

'যে টাকাটা আঁচলে বাঁধলে সেটা তো তোমাকে দেওয়া হয়নি, সংসারকে দেওয়া হয়েছে।' অনুপমা রুঢ় হলেন: 'সে টাকা ফিরিয়ে দাও।'

অন্য বউ হলে হয়তো রাগের মাথায় নোট দুটো ছুঁড়ে মারত। আভার অন্যরূপ। আঁচলের গিটটা আরো আঁট করে নিয়ে বললে, 'তোমাকে ফিরিয়ে দেব? কেন, তুমিই একমাত্র সংসার নাকি? তুমি আর তোমার ছেলে এক অঙ্গ?'

এমনিতে প্রত্যহই বকুনি হয়, সেদিনেরটা একটুমাত্রা ছাড়া হল; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারিণীর সঙ্গে শব্দসম্পদে নন-ম্যাট্রিক শাশুড়ী পারবে কেন? অনুপমাকে ঘুরে দিল আভা।

'যখন প্রথম এসেছিল তখন খুব সোহাগ দেখিয়েছ, এমন কি, নিজেকে আপনি না বলিয়ে তুমি বলিয়েছ, এখন এই তার প্রতিফল।' মাকেই উল্টো তিরস্কার করল নিখিল।

'কিন্তু একটা কিছু প্রতিকার তো করবি?' অনুপমা গজরাতে লাগলেন?

'বলো কী করতে পারি?' সানুনয়ে তাকাল নিখিল।

'কী আশ্চর্য, স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, অন্য লোকে বলে দেবে?' ছেলের সংসারে মায়ের অপমানের প্রতিবিধান হবে না?'

পরের মাসে কোন টাকাই দিল না আভাকে। বাজার খরচের টাকাটাও মার হাতে তুলে দিল।

'আমার হাতখরচ?' স্বামীর কাছে হাত পাতল আভা।

'অনেক দিয়েছ। একমাস না নিলে কোন ক্ষতি হবে না।'

ওগো আমার কী হবে গো? কার হাতে দিয়েছিলে গো? আভা কান্নায় রোল তুলল।

অনুপমা বললেন, 'তোমার কী লাগবে বলো মো পাউডার তেল সাবান কিনে দিচ্ছি—'

ওগো আমার কর্ত্রীত্বের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা, ওগো দংষ্ট্রাকরালবদনী রাক্ষুসী—আভার তখনকার কান্না শাশুড়ীর উদ্দেশে।

'শ্বশুরকে টেলিগ্রাম করে দে, মেয়েকে নিয়ে যাক।'

টেলিগ্রাম পেয়ে আভার বাবা, হিতলাল এলেন। সব শুনলেন কিন্তু মেয়েকে নিয়ে যাবার নাম করলেন না। বললেন, 'আভা একা যাবে কেন?' তোমার ছুটি হোক, তোমরা দুজনে এক সঙ্গে যাবে।'

বাপের যোগ্য মেয়ে, আভাও যেতে চাইল না। স্বামীর ঘরই তার পরমতীর্থ, তাই সে আমৃত্যু আঁকড়ে থাকবে।

হিতলাল নিখিলকে বললে, 'তা ওকে কিছু হাতখরচ তো দেবে।'

এ কি মিনতি না আস্পর্ধা বুঝে উঠতে পারল না নিখিল। আমার স্ত্রী, আমি তাকে হাতখরচ দিই না দিই তাতে তোমার কী মাথাব্যথা?

'তা দেব!' তবু রুঢ় হতে পারল না নিখিল।

'হাঁ, আর একটা ভাষা সম্ভ্রান্ত অঙ্কই দেবে।'

নিখিলের সর্বশরীর রাগে জ্বলে গেল। কিন্তু বলবার সময় বললে, 'কত দিতে হবে?'

'ঐ যা দিচ্ছিলে। দুশো টাকা।' হিতলালের গলায় এতটুকু বাধল না।

'দুশো টাকা!' হৃৎপিণ্ডটা যেন খসে পড়ে গেল মাটিতে এমনি নিখিলের মনে হল। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে, 'এক পয়সাও দেব না।'

তবু হিতলাল বিচলিত হল না। হাসতে হাসতে একা একাই চলে গেল।

তারপর একদিন আভা নিখিলের পকেট থেকে মনিব্যাগটা চুরি করলে।

নিখিলের ফাঁকা ঘরে টিপি টিপি পায়ে ঢুকতেই অনুপমার সন্দেহ হয়েছিল। চোখটা তাই খাঁকা করে রেখেছিলেন ঘরের দিকে। দেখলেন ইতি-উতি তাকিয়ে ব্র্যাকেটের দিকে এগিয়ে ঝোলানো শার্টের বুকপকেট থেকে মনিব্যাগটা তুলে নিচ্ছে আভা।

'চোর! চোর!' চেঁচিয়ে উঠলেন অনুপমা।

নিখিল ছুটে এসে আভার হাত থেকে মনিব্যাগটা কেড়ে নিল।

'স্বামীর পকেট থেকে মনিব্যাগ নিলে চুরি করা হয়?' অনুপমার দিকে এগিয়ে এল আভা: 'তুমি এমনি নাওনি তোমার সোয়ামির পকেট থেকে?' তোমাকে তখন কেউ চোর-চোর বলে চেঁচিয়েছে?'

এই নিয়ে আবার বচসা।

ইতিমধ্যে মনিব্যাগ খুলে নিখিল দেখল দুশো দশ টাকার নোট উধাও। বুঝল তা এখন নিরাপদে, আভার বুকের মনিব্যাগে। মেয়ে-পুলিশ তলব না করলে তার আর উদ্ধারের আশা নেই।

নিখিল এখন থেকে তাই চেকবই-টই, টাকা-পয়সা ইত্যাদি আফিসে রাখে। মনিব্যাগে রাখে হুমারে বন্ধ করে। পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম পর্যন্ত আর পরে না। হাতের সোনার কবচটা কী করবে তাই নিয়েই এখন ভাবনা।

অনুপমা বাড়ি ছিল না, আভা তার একটা দামি শাড়ি শাশুড়ীর বাক্সে লুকিয়ে রাখল। পরে, পরদিন, অনুপমা আর নিখিল যখন বাড়িতে তখন আভা খুব ঝুলল তার মাইনোর জর্জেটটা পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর অনেক সূক্ষ্মগর্ভ গবেষণার পর বললে, ঐ শাড়িটার উপর শাশুড়ীর চোখ ছিল তাঁর ছোট মেয়েকে দেবেন বলে, কে জানে তিনিই সরিয়েছেন কিনা—

'তুমি আমাকে চোর বলো?' ভেঙে পড়লেন অনুপমা।

'আমি কিছুই বলি না। আমি শুধু একবার বাক্স-প্যাটরাগুলো সার্চ করতে চাই।' আভা নির্লজ্জের মত বললে।

আর বাক্স খুলে খুঁজতে বেরুল শাড়িটা।

অট্টহাস্য করে উঠল আভা। বললে, 'এবার চোর কে? শুধু চোর নয় চোরের মা চোর।'

তৎক্ষণাৎ চক্ষের নিমেষে অনুপমা আভার গালে প্রকাণ্ড এক চড় বসালেন।

আভা এবার আর কাঁদল না, চেঁচাল না, এলোপাথাড়ি শাশুড়ীকে মারতে লাগল। আর সেই সঙ্গে বর্ষণ করতে লাগল বস্তির গালাগাল।

নিখিল আভাকে ধাক্কা দিয়ে ছাড়িয়ে দিল।

'শুধু ছাড়িয়ে দিলে, ধাক্কা মেরে বাড়ির বার করে দিতে পারলে না?' সুনন্দ প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

'মা-ই চলে গেলেন বাড়ি ছেড়ে। ছোটমামার আশ্রয়ে।' বললে নিখিল।

'ছি, ওঁকে যেতে দিলে কেন? সংসারে থেকে ওঁর কর্ত্রীত্ব আরো প্রচণ্ডভাবে জাহির করা উচিত ছিল যাতে বউই পরাস্ত হয়, চলে যায় নিজের থেকে।'

'বাবা মারা যাবার পর থেকেই মার শরীর একদম ভেঙে গিয়েছে।' বললে নিখিল, 'বেশি হৈ-চৈ চেঁচামেচি করতে পারেন না, বুক কাঁপতে থাকে। তাই পিস্—পিস্‌এর জন্যে, শান্তির জন্যে তিনি সরে পড়লেন।'

'আর তুমি একটি নিরীহ মেষশাবকের মত স্ত্রীর অনুগত হয়ে রইলে!' বিদ্রূপ করে উঠল

সুনন্দ। 'শাস্তির জন্যে যে কোনো দায় দিতে রাজী হলে, যে কোনো চড়া দায়—মা, ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন—'

'আমার মত অবস্থায় না পড়লে বুঝবে না কোথায় যন্ত্রণা!'

'স্ত্রী বাড়ি থেকে না যায় তুমি তো অন্যত্র চলে যেতে পারো। সেটাও তো একটা প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের মত দেখায়।'

'গিয়েছিলাম।' বললে নিখিল, 'দু রাত ছিলাম এক বন্ধুর বাড়িতে।'

'দু রাত!' অনুকম্পায় হাসল সুনন্দ।

'সেই দু রাতের প্রতিক্রিয়াটাই দেখ না।'

'কী প্রতিক্রিয়া?'

'প্রথম দিন আফিসে ফোন, ফোনের পর ফোন, একেবারে জেনারেলকে ফোন, আমার স্বামীকে পাওয়া যাচ্ছে না, আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে উধাও হয়েছেন! ভাবো, সে কী লজ্জা, আমি আফিসে বসে, আর আমার সম্পর্কেই ঐ ফোন!'

'দ্বিতীয় দিন?'

'সে সশরীরে আফিসে এসে হাজির। স্বামীর খোঁজে সটান একেবারে জেনারেলের ঘরে। বুঝতেই পারছ কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত।'

'তার এত বড় সাহস হয় কোত্থেকে?'

'হয় কোত্থেকে!' মৃদু মুখে হাসি ফোটাল নিখিল: 'এইবার তবে তোমাকে আসল রহস্যটা বলি।' পকেট থেকে একটা টাইপকরা কাগজ বের করল: 'এই দেখ, এটা পড়।'

'কী এটা?'

'আমাদের আফিসের সার্কুলার।'

কাগজটা হাতে নিতে-নিতে সুনন্দ বললে, 'কী আছে এতে?'

'আছে, যদি কোনো কর্মচারী তার স্ত্রীকে অবহেলা করে অত্যাচার করে তা হলে তার বিরুদ্ধে প্রসিডিং হবে, আর সে-প্রসিডিঙের ফলে অন্য শাস্তি তো আছেই, চাকরি থেকে বরখাস্ত পর্যন্ত হতে পারে।'

'বটে?' তা হলে তো ভীষণ করুণ অবস্থা। সার্কুলারটা পড়তে লাগল সুনন্দ।

'স্ত্রী থেকে বরখাস্ত হওয়া সহজ, চাকরি থেকে বরখাস্ত হই কি করে?'

'তা হলে তোর স্ত্রী তো চমৎকার তুরুপের তাস পেয়েছে!'

'তাই তো তাকে তাড়াতে পারি না, নিজেকেও নিতে পারি না আলাদা করে। ও জানে যে কোনো অবস্থাতেই ওর বাপের বাড়িতে জায়গা হবে আর সেখানে থেকেই নালিশ পাঠাবে আফিসে, স্বামী আমাকে নেয় না, খাওয়ায় না, পরায় না, দেখাশোনা করে না, আর অমনি প্রসিডিং হয়ে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি।'

'তা হলে দেখা যাচ্ছে তোর স্ত্রীর দুই শক্তি—এক, তার বাপের বাড়ির আশ্রয়, আর দুই, এই সার্কুলার।'

'বাবা যদি বলত, কোনো অবস্থাতেই আমার ওখানে তোমার আশ্রয় হবে না, তোমাকে

স্বামীর ঘর করতে পাঠিয়েছি স্বামীর ঘরেই তুমি থাকবে, স্বামীর ঘরের বাইরে আর তোমার জগৎ নেই, তা হলেই সাকুলারটাকে নিষিদ্ধ করতে পারতাম। আর যদি সাকুলারটা না থাকত, পত্রপাঠ ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিতাম বাইরে, যাও চলে বাপের আস্তানায়।'

'তা হিতলাল মেয়েকে কী করে ফেলবে?' হাসল সুনন্দ: 'মেয়ের হিত না দেখুক, মেয়ে যাতে দাস' হয় তা ঠিক দেখবে।'

'তাই মামলার কথা ভাবছি। মামলা করলেই আদিসকে বোঝাতে পারব, কী চীজ আমার স্ত্রী, কেন সে অবহেলা বা অপমানের উপযুক্ত!' উৎসাহদীপ্ত মুখ করল নিখিল: 'তারপর যদি ডিক্রি পাই, কিসের সাকুলার, কিসের হিতলাল।

'কিন্তু,' হঠাৎ চমকে উঠল সুনন্দ: 'তোমার বউদির কথাটা তো বললে না।'

'তাকেও তাড়িয়েছে।'

'কী বলে?'

'আমার চেয়ে বয়েসে কত বড় বৌদি। দাদা মারা যাবার পর নিঃসন্তান বিধবাকে কত সম্মান করে রাখছিলাম সংসারে, কিন্তু ঐ বিষমুখী তার নামেও অপবাদ দিয়ে বসলো।'

'কী অপবাদ?'

'সে অত্যন্ত জঘন্য। শুনতে চেয়ো না।'

'তবু—'

'মুখে কিছু আটকায় না, আমাকে জড়িয়েই সে কুৎসিত কথাটা চাউর করলে।'

'আর বৌদি অভিমানে সংসার ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন।' সুনন্দর স্বরে ব্যঙ্গের ধার।

'তাই।'

'আশ্চর্য, এটারও কেউ বিরুদ্ধতা করল না?'

'আমি করলাম।'

'তুমি করলে? কী ভাবে?'

'মাস ছয়েক হল আভার একটা ছেলে হয়েছে।' নিখিল মুখে অপরাধীর ছায়া ফেলল: 'আমি তাকে বলেছি, সকলকে বলেছি, এ ছেলে আমার নয়।'

'সে কি, তোমার ছেলে হয়েছে? এ দুর্যোগেও ছেলে হয়েছে?' চেয়ারে এলিয়ে পড়ল সুনন্দ: 'তবে আর কেস কী? ক্রুয়েলটি কোথায়? ও যে কাইণ্ডেস্ট পসিবল থিং। না, কেস নেই। বাড়ি যাও নিখিল, আলাদা ঘরে শুলে কী হবে, খিল খুলে রেখো। নো কেস।'

উঠে পড়ল সুনন্দ।

সুনন্দ ছাড়াও ঢের-ঢের উকিল ব্যারিস্টার আছে।

মামলা ঠিক কবে না করলেও, মামলা যে একটা হচ্ছে এখনি একটা ভয়ঙ্কর খবর নিখিল রাষ্ট্র করে দিল সাড়ম্বরে।

হিতলাল ছুটে এল। নিখিলের শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করল। এর কী মীমাংসা হয় না?'

'ছেলে আমার নয়'—এ কী সাংঘাতিক কথা! আর, সার্থুলার থাকতে ভয় কী, যত পারিস লুটে-পুটে খা, দাড়ি ওপড়া, দাঁতের গোড়া ভেঙে দে—বাপ হয়ে মেয়েকে এরকম প্রশ্রয় দেওয়াও তো মারাত্মক।

একটা কনফারেন্স বসানো যাক। তাতে সকলে একত্র হোক। দু পক্ষের গুরুবাক্যিরা বিচার করুক, আর নিখিল আর আভা, দুই শত্রু, দাঁড়াক মুখোমুখি।

সন্ধির সর্ত রচনা করে দিক সালিশেরা। কী করে আভা নিখিলেশের বশীভূত থাকবে আর নিখিলেশই বা কী করে বদান্য হবে তার ক্ষমায়, তার ভালোবাসায়।

নিখিলের পিসেমশাই কুঞ্জলালবাবুর বাড়িতে সভা। সন্ধে সাড়ে ছটায়।

সকলে এসেছে, শুধু প্রতিপক্ষেরাই অনুপস্থিত।

মধুকরের জিম্মায় ছেলেকে রেখে নিখিল আর আভা বেরিয়েছে একসঙ্গে। দুজনেই ট্যাক্সি নিয়েছে।

আভা বললে, 'পিসেমশায়ের বাড়ি তো বালিগঞ্জে।'

'হ্যাঁ, আমরা চলেছি উত্তরে, চৌরঙ্গি ধরে। বললে নিখিল।

'ড্রাইভারকে কে বলল উত্তরে যেতে? চৌরঙ্গী ধরতে?' আভা অবাক হল।

'কই কেউ বলিনি তো?' অবাক হল নিখিল।

'বোধ হয় সেই পরমাশ্চর্য আবার ডেকেছে।' বললে আভা।

'হ্যাঁ, বোধ হয় সেই অলৌকিক। বলছে, কী হবে কনফারেন্সে গিয়ে? চল্ তোদের সিনেমা দেখিয়ে আনি।' বললে নিখিল।

ট্যাক্সিটা আপনা-আপনি লাইট হাউসের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

———

এনামেলের বাসন

* দামে সস্তা
* ভারে লঘু
* ব্যবহারে টেঁকসই
* বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

সেরামিক সেলস কর্পোরেশন লিমিটেড

২৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১২

বান্ধবী

শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত

রাস্তার ধারে রেস্তোরাঁয় বসে কফির পেয়ালায় যৌবনধর্মের আলোচনাটা বেশ জমে উঠেছিল।

প্রসঙ্গটা শুরু করেছিল শ্রীমতী মিশেল। কিন্তু তাতে আসল প্রেরণা জুগিয়েছে গল্পের রাজা জোয়েল দুর্ব। সত্যি কথা বলতে কি গোটা আলোচনাটাই মঃ দুর্ব তার হাতের মুঠোর মধ্যে যেন এনে ফেলেছে। শ্রীমতী মিশেল এবং দুর্বের অপর দুই বান্ধবী কলেত ও মিরাই ওর গল্প শুনে চলেছে মাত্র।

জোয়েল দুর্ব পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়োগ্রাফির ছাত্র হলেও বেশ একটু সাহিত্য-পাগল। অবশ্য সাহিত্যের নেশা অনেকটা মদের নেশার মতোই ওদের মেশে একটা কমন ফ্যাক্টর। তাহলেও যে কোনো প্রসঙ্গ আলোচনায় চট করে কোনো সাহিত্যিক বা সাহিত্য বিষয়ক গল্প টেনে বসার ব্যাপারে দুর্বের জুড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন। এ আলোচনাতেও তাই হলো।

আর বরতো বর একেবারে নোবেল পুরস্কার-কৃতী আনাতোল ফ্রাঁসকে নিয়েই টান। ফরাসী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিকপালকে যে জোয়েল এমনভাবে এ আলোচনায় হাজির করবে তা তার তিন বান্ধবীর মধ্যে একজনও আগে থেকে ভাবতে পারেনি।

আমাদের দেশটা যৌবনের দেশ, এ কে না জানে।—এই বলে আরম্ভ করে জোয়েল। তারপরেই আনাতোলের জীবনের একটি ছোট্ট ঘটনাকে বেশ একটি গল্পের মতো করে সে উপস্থিত করে তার বান্ধবীদের সামনে।

জানো মিশেল, যৌবনের তাড়নায় আনাতোল ফ্রাঁসের মতো লোকও একবার কি কাণ্ড করে বসেছিলেন?

জোয়েলের এ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে কলেত ও মিরাই চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে, দুজনেই ভাবে কী মজার গল্পই না জানি এবার তারা শুনতে পাবে। মিশেলের চোখ দুটো আনাতোলের প্রসঙ্গ উঠতেই হঠাৎ জ্বলে ওঠে।

কি এমন কাণ্ড করেছিলেন আনাতোল ফ্রাঁস?—মিশেল জিজ্ঞেস করে।

সেবার ভীষণ গরম পড়েছিলো পারীতে। সাঁজেলিজের ফুটপাতে একটা বড়ো কাফেতে জোর আড্ডা জমেছে। সেখানে সেই সান্ধ্য আড্ডার মধ্যমণি স্বয়ং আনাতোল ফ্রাঁস। চিত্র-বিচিত্র বড়ো বড়ো সব ছাতার নিচে নিচে টেবিলে টেবিলে রঙ-বেরঙ গ্লাসের ঐশ্বর্য্যের সামনে বহু গণ্যমান্য ও নগণ্য-অগণ্যের দল আলোচনারত। সারা কাফে জুড়ে যখন আলাপ-আলোচনার খৈ ফুটে চলেছে সেই সময় হঠাৎ একটা সোরগোল উঠলো, রাস্তায় দেখতে দেখতে জমে উঠলো একটা ভিড়। কাফের লোকেরাও সবাই বেশ উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন।—জোয়েল আনাতোলের গল্প বলে চলে।

কী সংবাদ? কিসের এতো ভিড়? কেন এতো লোক ছুটছে?—এক একজনের মুখে এমনি ধরণের এক একটি প্রশ্ন।

তেমন কিছু নয়, কার্পেন্তিয়ার যাচ্ছে কিনা, তাই।...কাকে থেকেই একজন ছুটে গিয়ে জেনে এসে জানালেন।

আনাতোল ফ্রাঁস সে কথা শোনা মাত্রই উঠে দাঁড়ালেন।

কি! আপনি কোথায় চললেন হঠাৎ?—এক ঝাঁক সবাক নির্বাক প্রশ্ন বর্ষণ হলো ফ্রাঁসকে লক্ষ্য করে।

যাচ্ছি রাস্তায়, আর সকলের মতো কার্পেন্তিয়ারকে দেখতে।

আপনি—আপনি যাচ্ছেন ওকে, ওই কার্পেন্তিয়ারকে দেখতে!—অপরিমিত বিস্ময় ও খানিকটা তাচ্ছিল্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে এক বৃদ্ধের প্রশ্নে এবং আর কিছু লোকের কণ্ঠে ও দৃষ্টিতে তার প্রতিধ্বনি।

পাকানো গোঁফ, উঁচলো দাড়ি এবং ধারালো নাক তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠলো আনাতোলের; উজ্জ্বলতর হলো তাঁর চোখের শাণিত দৃষ্টি। তিনি বললেন—

যাবো না? আমার দেশের যৌবন চলেছে মহিমান্বিত হয়ে, তাকে অভিনন্দন জানাবো না আমি? বলছেন কি আপনারা?—এই বলে কাকে থেকে দীর্ঘ পদবিক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন প্রৌঢ় আনাতোল ফ্রাঁস কৈশোরোত্তীর্ণ মাত্র আঠারো বছর বয়সের চ্যাম্পিয়ন ফরাসী মুষ্টিযোদ্ধা জর্জেস কার্পেন্তিয়ারের করমর্দন করতে। এজন্যেই বলছিলাম আমাদের দেশ সত্যি সত্যি যৌবনের দেশ—যৌবনের জয়ধ্বনি আমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে।—বলেই জোয়েল তার গল্প শেষ করে।

এ এমন একটা কী কাণ্ড যার মুখবন্ধ করতে গিয়ে তুমি আমাদের একেবারে চমকে দিয়েছিলে। —এতক্ষণ দম বন্ধ রেখে গল্প শুনে আশাতজের মনস্তাপ প্রকাশ করে শ্রীমতী কলেত। মিরাই এবং মিশেলেরও ঠিক ঐ একই অবস্থা।

আর ঠিক তখনই এসে রেস্তরাঁয় ঢোকে অর্জুন পট্টনায়ক।

আসুন মঁসিয়ে, আসুন।—বলে দাঁড়িয়ে উঠে জোয়েলই প্রথম করমর্দন করে অর্জুনের সঙ্গে। তারপর একে একে আর সবাই। ওরা সকলেই অর্জুনের খুব ভক্ত। জিওগ্রাফি ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলে তাঁর ওপর ওদের অগাধ শ্রদ্ধা।

বলো কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তোমাদের?

যৌবনের দেশ ফ্রান্স, এই প্রসঙ্গ নিয়ে আজ আলোচনা আরম্ভ হয়েছে।—জোয়েল জানায় পট্টনায়ককে।

ভেরি ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট নো ডাউট্!—এই মন্তব্য করে পাইপের পোড়া তামাকটা ফেলে দিয়ে পট্টনায়ক পকেটে পুরে রাখেন পাইপটাকে।

আপনাকে কিন্তু বেশ কিছুদিন দেখিনি পট্টনায়ক। কিছুদিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন বুঝি?

না তো।—পট্টনায়ক ছোট্ট জবাব দেন মিশেলের কথায়। তারপর একটু যেন দম নেন। মনে মনে তিনি ঠিক করে এসেছেন সুযোগমতো জোয়েলের সব কথাই আজ প্রকাশ করে দেবেন মিশেলের সামনে, কারণ সব কথা তার জানা উচিত।

অর্জুন পট্টনায়ক একজন কৃতী ভারতীয় ছাত্র। উড়িষ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করে তিনি উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্যারীতে আসেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা অধ্যাপক

ও ছাত্রছাত্রী মহলে তাঁদের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। কিন্তু আদিমতা ও আধুনিকতার মিলন-তীর্থ পারী নগরীর আকর্ষণ তাঁকে এমনভাবে বেঁধে ফেলেছে যে দু'বছরের মধ্যে এ পর্যন্ত একবারও তাঁর পক্ষে দেশে ঘুরে আসা সম্ভব হয়নি। এক পারী-সুন্দরীকে বিয়ে-থা করে এখন তিনি বলতে গেলে পারীরই একরূপ স্থায়ী বাসিন্দা।

পট্টনায়ক খুব বীয়ারের ভক্ত। তার জন্যে বীয়ারেরই অর্ডার দেয় জোয়েল।

কিন্তু মদের গ্লাস টেবিলে আসবার আগেই পট্টনায়ক যে সুরে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন তাতে মঃ দুরঁকে মহা অস্বস্তিতে পড়তে হলো।

হ্যাঁ মিশেল, তুমি জিজ্ঞেস করছিলে আমি কিছুদিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিলুম কিনা। যাবার অবশ্য কথা ছিল পশ্চিম জার্মানীতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি, এবং যাইনি বলেই তোমরা কে কোথায় কি করে বেড়াচ্ছ তার প্রায় সব খবরই আমি রাখি।

সে আবার কি! এক হপ্তার মধ্যে মঁসিয়েকে আমিও কোথাও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।—এবার উত্তর দেয় মিরাই।

তুমি আমায় না দেখতে পারো, আমি তোমায় দেখিনি সে কথাতো আর তোমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।—পট্টনায়কের এ জবাবে আর কেউ কিছু বলতে ভরসা পায় না, মিরাই তো মোটেই নয়। কারণ তার মনে পড়ে যায়, পরশু সন্ধ্যায় বারট্রাণ্ডের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে সে যখন সিনেমায় যাচ্ছিল কিংবা একটু বেসামাল অবস্থায় তারা যখন সিনেমা থেকে ফিরছিল তারই কোনো সময়ে হয়তো অর্জুন তাদের দেখে ফেলে থাকবেন। আসলে পট্টনায়ক তাদের দেখেননি, তবু সন্দেহের আড়াল থেকে এক রকমের ভয়ের ভূত উঁকি দেয় মিরাই-এর মনে। কলেজ বন্ধ হয়ে আছে সেই থেকেই। আদতেই সে কম কথার মানুষ—সব সময় হাসিখুশি, সত্যিকারের মিষ্টভাষিণী। তবু এই শান্তশ্রী কলেজের দিকে বার বার পট্টনায়কের চোখ পড়ছে কেন মিশেলের মনে সেই প্রশ্ন। একটি ছোট্ট জিজ্ঞাসায় মিশেল তাই জেনে নিতে চায় সব কিছু।

বেশতো, আপনি আমাদের কোথায় কি দেখেছেন বলুন না পট্টনায়ক।

এই অনুরোধে একটা যেন স্বাঁকুনি অনুভব করেন অর্জুন পট্টনায়ক। এক চুমুক বীয়ার টেনে নিয়ে তিনি বক্তব্য বলতে শুরু করেন।

কলেজের কথাই তাহলে প্রথম বলা যাক।

বেশ, তাই বলুন।—কলেজের মুখ থেকে এ কথা বেরিয়ে এলেও অন্য সবার চোখে-মুখেও গভীর আগ্রহের ছায়াপাত লক্ষ্য করেন পট্টনায়ক। আর সেই প্রতিবিম্বের প্রয়োচনাতেই যেন আরো বেশি করে তাঁর কথাগুলোকে রসায়িত করে তোলেন।

রু দু বাক এলাকায় আমি একটা ছোট্ট হোটেলে উঠে গেছি বেশ কয়েকদিন হলো। তা' হলেও তোমাদের কেউই হয়তো তা জানো না। শুধুমাত্র জোয়েল কাল জেনেছে। বেশ নিরিবিলি ঐ রাস্তাটা। হোটেলটি আরো নীরব নিস্তব্ধ। হোটেলের গা ঘেঁষেই একটি সুন্দর রেস্তরাঁ। থাকায় আমার ভারি সুবিধে। আরেকটা বড়ো সুবিধে কি হয়েছে জানো? রাস্তায় নেমেই একেবারে মুখোমুখি রু দু বাক মেট্রো স্টেশন।

এতো কেবল আপনার কথাই বলছেন দেখছি। কলেতের প্রসঙ্গ বেশ চাপা পড়ে গেলো ম'সিয়ে।—এই বলে বোধহয় একটু বাহাদুরিই নিতে চায় মিরাই।

ভালো, কারো কথাই বাদ পড়বে না। একে একে সবাইকেই ধরছি। কলেতের জানা ছিলো না বলেই হয়তো সেদিন আমার নতুন হোটেলের পাশের ঐ সুন্দর রেস্তরাঁয় একটি কোণায় সে তার এক বন্ধুকে নিয়ে ঘণ্টা দেড়েকের মতো সময় বেশ আনন্দে কাটিয়ে দিয়ে এসেছে।

কবে, কবে?

আপনি কী করে দেখলেন?—জোয়েল এবং মিশেল প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্ন তোলে।

ঠিক চারদিন আগেকার এই ঘটনা। আমার ইউনেস্কোর আফিস সেরে এসে হোটেলে ঢোকবার আগে পাশের ঐ রেস্তরাঁতেই আমি মোটামুটিভাবে আমার বৈকালিক পানাহারের অভ্যাসটা করে নিয়েছি। আর সেই অভ্যাস দোষেই সেদিনও প্রায় সন্ধো নাগাদ আমি সেই রেস্তরাঁতেই গিয়ে উঠি। বসতে গিয়ে চোখ পড়ে গেলো কলেতের দিকে। পিছন থেকে দেখলেও তাকে আমি ঠিক বুঝে নিতে পেরেছিলাম। ওর বন্ধুকে অবশ্য আমি চিনতে পারিনি। তার কারণ এর আগে তাকে আমি আর কখনো কোথাও দেখিনি। তবে কলেতকে নিয়ে সে বেচারা যে রকম হুড়োহুড়ি শুরু করে দিয়েছিল তাতে ওদের দু'জনের পরিচয় যে খুব নতুন নয় তা ধরে নেওয়া যায়।

কী রকম?—অনেকক্ষণ বাদে জোয়েল জিজ্ঞেস করে।

কী রকমের হুড়োহুড়ি চলছিলো তা বোধহয় এই একটি কথা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। মদের সঙ্গে সঙ্গে ওরা পরস্পর পরস্পরকে এমনি বে-পরোয়া হয়ে চুমু খাচ্ছিলো যে একবার তো দু'টো মদের গ্লাসই টেবিল থেকে পড়ে গিয়ে একেবারে চুরমার!

আপনি ভারি ইয়ে, বাড়িয়ে বাড়িয়ে যতো সব বাজে কথা বলছেন।—কলেত লজ্জায় কাচুমাচু মুখ লুকিয়ে নেয় এই বলে।

বেশ তো, আমি যদি কিছু বাড়িয়েই বলে থাকি, একটু না হয় কমিয়েই নেওয়া যাবে। তা হলেও তো ব্যাপারটা মিথ্যে হয়ে গেলো না—সত্যি যা সত্যিই থেকে গেলো। যাকগে, ও নিয়ে আমি আর কিছু বলছি না।

তারপর?—নিজেকে পুরোপুরি নিরাপদ ধরে নিয়েই এই প্রশ্ন তুলে পট্টনায়ককে একটু তাতিয়ে দেয় শ্রীমতী মিশেল।

তারপর কাকে ধরবো জিজ্ঞেস করছো? তোমাদের দু'জনকে না হয় এবারের মতো ছেড়েই দেওয়া যাক। এবার একেবারে সরাসরি বরং ম'সিয়ে জোয়েলের কথাই বলি। কী বলো?

বলুন, তাই বলুন।—তাড়াতাড়ি এই বলে সায় দিয়ে মিরাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। মিশেলেরও মনের অবস্থা অনেকটা তাই। কে জানে বানিয়ে-টানিয়েও যা হয় কিছু একটা বলেও ফেলতে পারতেন পট্টনায়ক। তাদের যে বাদ দেওয়া হয়েছে খুব রক্ষে।

জোয়েলের সব কথা শুনলে সত্যি সত্যি তুমি হয়তো রাগ করবে মিশেল, কিন্তু সুদর্শন বলে তোমরা সব মেয়েরাই যদি তার প্রেমে পড়ো তা হলে সে বেচারাই বা কী করবে বলো। এইতো পরশু রাত্রে হঠাৎ জোয়েলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো কোলিশ বার্জারে। প্যারীতে এসে কোলিশ বার্জারে নগ্ন-নৃত্য না দেখলে নাকি ফ্রান্সের কিছুই দেখা হয় না, কিছুই জানা হয় না। আমাদের দেশের এক নবাগত

বন্ধুকে সেজন্যেই আমাকে সে রাত্রে কোলিশ বার্জারে নিয়ে যেতে হয়েছিলো। হঠাৎ জোয়েলকে সেখানে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলাম। কারণ আমি তো জানি পারীসিয়ানদের কাছে পারীর নাইট ক্লাবের তেমন কোনো আকর্ষণ নেই, তার আসল আকর্ষণ বিদেশীদের কাছে এবং তাদের আকৃষ্ট করবার জন্যেই কোলিশ বার্জার, লিডো প্রভৃতির যতোরকম বিজ্ঞাপন। তাই ভাবছিলাম, জোয়েল এখানে, কী ব্যাপার! জোয়েল বলেছিলো আমার আগের সারির একটা সীটে, আমার বাঁদিকে বেশ খানিকটা দূরে। বিবসনা এক নারী নগ্নপ্রায় এক পুরুষের সঙ্গে নাচতে নাচতে হঠাৎ শুয়ে পড়ে অপূর্ব ভঙ্গিতে যখন তার একখানি পা মাথার সমান্তরাল রেখায় তুলে রাখলে কয়েক সেকেণ্ড ধরে, জোয়েলকে দেখলাম সে তার পাশের একটি নিগ্রো মেয়েকে নিয়ে চলা-ঢলিতে মেতে উঠেছে। পরক্ষণেই ইন্টারভেল। আমার সাধাসিধে দেশী বন্ধুকে আমি আর ইন্টারভেলের মজায় মজতে দিতে চাইনি। বেড়ে বেড়ে মেয়েরা তার কাছে এসে বা পাশে বসে মদ খেতে চাইলে সে বেচারা হয়তো অপ্রস্তুত হয়ে পড়তো। আমি তাই বন্ধুকে নিয়ে উঠে পড়লাম এবং জোয়েলকে ডাকতেই সে যেন একটু আঁৎকে উঠলো।

কেন, আঁৎকে উঠবে কেন?— অর্জুনের কথাগুলো এতোক্ষণ ধরে প্রায় এক নিঃশ্বাসে শুনতে শুনতে প্রশ্ন করে বসে মিরাই।

হয়তো ঐ মেয়েটা সঙ্গে ছিল বলেই অমনি চমকে উঠে থাকবে সে, কী বলো মঁসিয়ে দুবঁ?

যা ইচ্ছে তাই আপনি এখন বলতে পারেন মঁসিয়ে, কিন্তু আপনি যেমন আপনার এক বন্ধুর সখ মেটানোর জন্যে তাঁকে নিয়ে কোলিশ বার্জারে গিয়েছিলেন, আমিও তো ঠিক তেমনি কারণেই সেখানে গিয়েছিলাম ঐ নোলা মেয়েটির সখ মেটাবার উদ্দেশ্যে। কাজেই আমার বেলায় সেটা দোষের হবে আর আপনার বেলায় নয়, তাই বা কেমন কথা?—বেশ একটু রাগত স্বরে একটি আইনগত প্রশ্ন তুলে গোটা ব্যাপারটাকেই চাপা দেবার জন্যে জোয়েল একটি জাল ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে বাদ সেধে বসে মুখরা মিরাই।

ও, ঐ আমেরিকান নিগ্রো মেয়ে নোলার কথা বলছিলেন আপনি পট্টনায়ক? ঐ মেয়েটাকে নিয়েই তো এখন রোশনাই চলছে জোয়েলের।

হ্যাঁ, নোলা, নোলা! ঐ নামটাই সেদিন বলছিলো জোয়েল। ইন্টারভেলের সময় কোলিশ বার্জার থেকে আমাদের বাইরে নিয়ে এসে জোয়েল আমাদের প্রচুর খাইয়েছিলো এক রেস্তরাঁয়। মদও খাইয়েছিলো প্রচুর আর ঐ নোলা মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা দু' বন্ধু আর কোলিশ

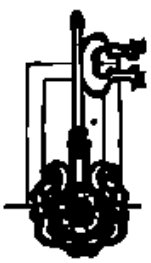

পরিকল্পনা ও সমৃদ্ধির সোনার কাঠি

ব্যক্তির কল্যাণ ও জাতীয় সমৃদ্ধি পরস্পর সাপেক্ষ। এই কল্যাণ বা সমৃদ্ধি সাধন একমাত্র পরিকল্পনাসম্মত প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্ভবপর। এই পরিকল্পনার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে জাতীয় তথা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর।

সুসংগঠিত ব্যাঙ্কের দায়িত্ব শুধু যেমন ব্যক্তিগত মূলধন বৃদ্ধি করে, তেমনি জাতীয় পরিকল্পনারও বল যোগায়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস: ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ব্রাঞ্চ অফিস এবং পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে বিশ্বস্ত এজেন্টের মাধ্যমে

আপনার ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যভার গ্রহণে প্রস্তুত

বার্জারে ফিরে যাইনি, হোটেলে চলে এসেছিলাম। শোবার আগেও মেলা আর জোয়েলকে আবার পোলিশ বার্জারে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো। সে রাতে তার ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি। কিন্তু কাল বিকেল বেলায় দেখি মেলাকে কোথায় বগলদাবা করে নিয়ে চলেছে জোয়েল। চোখে চোখ পড়তেই সে আমায় ডাকলে। বলে, চলুন মেলাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। আট-দশ পা হাটতেই মেলার হোটেল। কিন্তু বার থেকে খুব বেশি দূর নয়। ভাবলাম মেলার সঙ্গে মাঝে মাঝেই হয়তো দেখা হবে। মেয়েটিকে বিদায় দিয়ে চলে আসতে আসতে জোয়েলকে আমি সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা তোমার কি প্রণয় বলে কিছু নেই জোয়েল? সে প্রশ্নের উত্তরও এলো ঠিক তেমনি স্পষ্ট, আমি কি করবো বলুন মঁসিয়ে! এই তো দেখুন এই মেলা মেয়েটা, এইতো সেদিন মাত্র জিওগ্রাফি ইলস্ট্রিট্যুটে ভর্তি হয়েই আমার পিছু নিয়েছে। মিশেলের সঙ্গে সঙ্গে ওর ঐ বন্ধু দুটোও জুটে গেলো কলেজ আর নিরাই। তার আগে এম. এ. পাস করা ওরিল মেয়েটা কি কম লেগেছিলো আমার পিছনে। ওর প্রেমিক ওকে ছেড়ে গেছে বলায় ওকে কদিন ধরে সান্ত্বনা দিলাম ওর সঙ্গে ফ্লার্টিং চালিয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি ওদের একজনকেও ভালোবাসি না। ওদের সঙ্গে প্রেমের খেলা করি মাত্র, বিয়ের কথা ভাবিও না। ভালোবাসা নয়, বড়োজোর একে বান্ধবী-বিলাস বলা চলে।

শ্রীমতী মিশেল এতোক্ষণ ধরে এসব কথা শুনছিলো আর ফুলছিলো মনে মনে। এবার সে উঠে দাঁড়ালো।

কী বলো এতো তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে যে! আমার অন্তত তিন নম্বর গ্লাসটা শেষ করতে দাও এবং বাকি কথাটুকুও শোনো। জোয়েলকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার জন্যেই বুঝি তুমি বছরের পর বছর ধরে ফার্স্ট ইয়ারে থেকে যাচ্ছ। সরাসরি সে তার উত্তরে বলে, অনেকটা তাই, শতকরা পঁচাত্তরটা মেয়েই তো এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেমের জাল ফেলে স্বামী কুড়িয়ে নেয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয়টা সাত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে কী হবে বলুন! জোয়েলের সে কথা শুনে আমি আর হাসি সামলাতে পারিনি এবং আজ তাদের এই আসরে যৌবনের প্রেম ফ্রান্স প্রসঙ্গ আলোচনার পটভূমিকাটা জানা থাকায় সমস্ত বিষয়টা ধরে নিতে আমাকে কোনোরকম বেগও পেতে হয়নি।

তা আপনি যতো ইচ্ছে হাসুন পট্টনায়ক, আমি চলুম। আঁদ্রে রেনোর সঙ্গে আমার একটা জরুরী এনগেজমেন্ট রয়েছে—আমাকে তাই এখুনি যেতে হচ্ছে।—বলেই খটখট করে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে যায় শ্রীমতী মিশেল এবং তার পিছু পিছু নিরাই আর কলেত।

জোয়েল খুব আশ্চর্য হয়ে যায় আঁদ্রে রেনোর সঙ্গে মিশেলের এনগেজমেন্টের কথা শুনে। তার সঙ্গে যে জোয়েলের চরম রেষারেষি—ভীষণ শত্রুতা।

———

আমনাগ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

কুতুবমিনার

বনফুল

আমার নূতন বৈবাহিক মহাশয়ের পল্লীনিবাস গোপালবাটিতে আসিয়া আমাদের মনিহারীর বাড়ির কথা মনে পড়িতেছে। কেন জানিনা বিশেষ করিয়া কুতুবুদ্দিনকেই আজ মনে পড়িল। বহুদিন আগে সে মারা গিয়াছে। সে বিখ্যাত লোকও নয়, তবু তাহারই স্মরণে আজ কিছু লিখিলাম।

কুতুব আমাদের বাড়ির চাকর ঠিক ছিল না', কিন্তু প্রায়ই আমাদের বাড়িতে কাজ করিতে আসিত। ঘরামির কাজই প্রায় করিত। আমাদের বাড়ি খড়ের চালের। সেই চাপ মেরামত করিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার ডাক পড়িত। অন্য সময়ও তাহার কাজ ছিল। আমাদের চাষের জমি যখন কোপানো হইত তখনও ডাক পড়িত কুতুবের। কোড়নের কাজ করিতে সে অদ্বিতীয় ছিল। দুপুর রোদে কোদাল হাতে সে ক্রমাগত মাটি কোপাইতে পারিত। মাঝে মাঝে কোদালের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া 'কোম্মর'টা 'সিধা' করিয়া লইত, তাহার পর আবার কোপাইতে শুরু করিত।

বিশাল বলিষ্ঠ চেহারা ছিল তাহার। কুচকুচে কালো রঙ, মুখে মন্-মহেশ দাড়ি। আমার সহিত তাহার বিশেষ ভাব ছিল। কারণ আমার বাহন ছিল সে। মাঝে মাঝে সে আমাকে কাঁধে করিয়া লইয়া বেড়াইয়া আনিত। আমি তাহার কাঁধে বসিয়া তাহার মাথাটি ধরিয়া থাকিতাম, আমার পা দুইটি তাহার বুকের উপর দুলিত। গ্রামের বাহিরে গিয়া সে কখনও ঘোড়ার অনুকরণে ছুটিত, ঘোড়ার ডাকও ডাকিত। চিঁ হিঁ. হিঁ হিঁ করিতে করিতে একছুটে সে বারুইদের আমবাগানটা পার হইয়া যাইত। মাঝে মাঝে তাহার শখ হইত জমিদারদের হাতীর নকলে গজেন্দ্রগমনে চলিতে হইবে। লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সর্ব্বাঙ্গ দোলাইয়া ঠিক হাতীরই নকল করিত সে। নিজে মাহুতও হইত। মাহুতের বোলও বাহির হইত তাহার মুখ হইতে। 'ধেৎ' 'বিরি' 'আগং' প্রভৃতি হস্তি-বোধ্য ভাষা বলিতে বলিতে গজেন্দ্র-গমনে বনজঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িত সে।

একটা বদনাম ছিল তাহার। সকলে বলিত সে না কি চোর। সিঁদেল চোরদের বলে সে না কি চ্যাম্পিয়ন ছিল একজন।

ছিল কি না জানি না, এসব ব্যাপারে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা কঠিন। এ সম্বন্ধে দুইটি ঘটনা জানি তাহাই বলিতেছি।

একবার আমাদের ঘর ছাওয়া হইতেছে, প্রায় জন কুড়ি ঘরামি কাজ করিতেছে, তাহার মধ্যে কুতুবও আছে। হঠাৎ মা আবিষ্কার করিলেন তাঁহার গলার সোনার হারটা পাওয়া যাইতেছে না। তিনি স্নানের ঘরে হার খুলিয়া স্নান করিয়াছিলেন, তাহার পর হারটা আনেন নাই। তখন মনে পড়িল গিয়া দেখেন স্নানের ঘরে হার নাই।

চতুর্দ্দিকে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেই সন্দেহ করিতে লাগিল ঘরামিদের মধ্যেই কেহ লইয়াছে। 'কুতুবের উপরই অনেকের বেশী সন্দেহ হইতে লাগিল।

এমন সময় হাজির হইল রামশরিত, সিপাহী। স্থানীয় জমিদারের বিশ্বস্ত রক্ষক, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। যাহা খুশী তাহা করিতে পারে, তাহাকে রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। রামশরিত

বাবাকে খুব ভক্তি করিত, মাকেও। মাইজির হার চুরি গিয়াছে? তাহার নাকের নীচের গোঁফে একটা ঢেউ খেলিয়া গেল। বাবাকে সে আশ্বাস দিল—বন্‌কা সিপাহ ভাগে না কি ঘর! বনের সিপাহ কোথায় পালাইবে। সমস্ত ঘরামিগুলিকে সে উঠানে একত্রিত করিল—তাহার পর সংক্ষেপে বলিল—মাইজির হার চুরি গিয়াছে। তোমরা লইয়াছ কিনা তাহা আমি জানি না। কিন্তু হারটি তোমাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিতে হইবে। যদি না পার তাহা হইলে তোমাদের শরীরের একটি হাড়ও আস্ত রাখিব না। এই দেখ—। সে তাহার তৈলপক্ক গাঁট্টা গোট্টা বাঁশের লাঠিটি তুলিয়া দেখাইল।

কিন্তু ইহাতে বিশেষ ফল হইল না। দশদিন কাটিয়া গেল, হার পাওয়া গেল না।

ইহার পর মায়ের সহিত কুতুবের একদিন দেখা হইল। মা তাহাকে বলিলেন, "বাবা, আমার শাশুড়ীর দেওয়া হারটা কোথায় যে হারিয়ে ফেললাম, ওইটে দিয়ে তিনি বিয়ের সময় আমার মুখ দেখেছিলেন, কি করে যে হারিয়ে গেল!"

কুতুব তখন কিছু বলিল না। কিন্তু তাহার পরদিন মায়ের হারটি আনিয়া দিল। বলিল, ওই ঝোপটার ভিতর পড়িয়াছিল। সায়েদ্ কোই কৌয়া তোয়া গিরায়া হোগা। হয়তো কাকে-টাকে ফেলে দিয়েছিল!

ইহার পরদিন যাহা ঘটিল তাহা অপ্রত্যাশিত। দেখা গেল কুতুবুদ্দিন অজ্ঞান হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে। সর্ব্বাঙ্গ কালসিটে দাগ। কে বা কাহারা যেন উহাকে প্রচুর প্রহার করিয়াছে।

ইহার পর আমাদের বাড়িতে আর একবার চুরি হইয়াছিল। এবার সিঁদ কাটিয়া চুরি। চোরেরা অনেক বাক্স তোরঙ্গ বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল। আমরা অনেক মূল্যবান কাপড় জামা গহনা হারাইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু একেবারে সর্বনাশ হইয়াছিল আমার।

পূজার সময় মামা আমাকে যে রঙ-দেওয়া রংচঙে টিনের মোটরটি কিনিয়া দিয়াছিলেন সেটিও একটি বাক্সের মধ্যে ছিল। চুরির দিন সাতেক পরে কুতুবের সহিত দেখা হইল। তাহাকে বলিলাম, কুতুব জানো, আমার সেই মোটরটা চুরি হ'য়ে গেছে। বলিতে বলিতে আমার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। কুতুব তখন কিছু বলিল না। কিন্তু তাহার পরদিন সে আমাকে মোটরটি আনিয়া দিল। বলিল, কই মোটর তো চুরি হয়নি। ওই ঝোপের ধারে পড়েছিল। সায়েদ্ কোই কৌয়া তোয়া গিরায়া হোগা।

এ ব্যাপার কিন্তু এখানেই মিটিল না। ওই মোটরের 'ক্লু' ধরিয়া পুলিশ অবশেষে সমস্ত দলটাকেই ধরিয়া ফেলিল। পুলিশের হাতে নাকি প্রচুর মার খাইয়াছিল কুতুব।

কিন্তু ব্যাপার এখানেও শেষ হয় নাই। দিনকয়েক পরে যে সংবাদ জানা গেল তাহা নিদারুণ। কুতুবকে কে যেন খুন করিয়া গিয়াছে। রাত্রে সে মাঠে শুইয়াছিল, কে যেন তাহার গলাটা কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। চোরের দল ঘর-জোড়ী দ্বিতীয়বারকে বাঁচাইয়া রাখা নিরাপদ মনে করে নাই।

•

গোপাল বাটির শান্ত শ্যামল পরিবেশে বসিয়া বহুকাল পরে কুতুবের স্মৃতিকে ঘিরিয়া আমার মনের মধ্যে যে মিনার আকাশচুম্বী হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেও যদি কুতুবমিনার আখ্যা দিই তাহা হইলে কি ঐতিহাসিকেরা আপত্তি করিবেন?

———

•

দ্বিতীয় জন্মের ভূমিকা

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

চাটুজ্জে মশাই বাড়ী আছেন? চাটুজ্জে মশাই—বারকয়েক ডাকের সঙ্গে সঙ্গে কড়কড়িয়ে কড়া নড়ে উঠলো।

রান্নাঘরে বসে দুধ জ্বাল দিচ্ছিলেন সরলা। দুধটা গরম হয়ে উথলে উঠেছে কড়াইএর কানা বরাবর—সেইদিকে নিবিষ্টচিত্ত উনি। অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, মনু, দেখত রে—কে যেন ডাকছেন।

পাশের ঘর থেকে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো মনু, আমি বাপু পারব না দেখতে। তিন প্রাতঃকালে সবে বিছানা থেকে উঠেছি—দোক্তাটুকু গালে ঠেকিয়েছি কি না ঠেকিয়েছি—অমনি চেঁচানি সুরু করলে!

রান্নাঘর থেকে অনুনয় করলেন সরলা, লক্ষ্মীটি—একবার দেখ। উনি বোধ করি বাজারে বেরিয়েছেন।

তবে আর কি—মাথা কিনেছেন আমার! বাড়ীতে কি আর জনমনিষ্যি নেই যে আমাকেই সব মাথা খুঁড়ে পোয়াতে হবে! আমি পারব না।

একবারটি দেখ—

আমি পারব না—পারব না—পারব না। হাতপাখাটা মেঝের ঠুকতে ঠুকতে উঠে দাঁড়াল মনু। দড়াম করে ঘরের দরজাটা তেজিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল আবার।

অগত্যা দুধের কড়াইটা উনুন থেকে নামিয়ে—আধ-ঘোমটা টেনে সরলা এসে দাঁড়ালেন দুয়োর অপর পিঠে। গলা নামিয়ে বললেন, উনি এইমাত্র বাজারে গেলেন। একটু বলবেন কি?

না—আর বলব না। একটা কথা ছিল—তা আপনাকে বলে যাচ্ছি। আজ বিকেলে কোনসময় থেকে মেয়েরা আসবেন পাত্রী দেখতে। ওই যে বাঁড়ুজ্জে বাড়ী থেকে সেল সপ্তাহে যাঁরা দেখে গেছেন—তাঁদেরই বাড়ীর মেয়েরা। চাটুজ্জে মশাইকে বলবেন ওঁরা তিনটে থেকে চারটের মধ্যে আসবেন।

আচ্ছা বলব। আপনি যদি বসতেন একটু—

না, আর বসব না। তবে ছেলেরা যদি কেউ বাড়ীতে থাকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন—একটা জিনিস দেব।

আপনার নামটা যদি—

বলবেন মিত্তিরদের অভয় এসেছিল—তাহলেই সব বুঝতে পারবেন। তা ছেলেরা যদি কেউ থাকে—

দুয়োরের ও পিঠে বার দুই ঢোক গিললেন সরলা। একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, উনি এলে পাঠিয়ে দেব'খন।

কষ্ট করে উনি আবার যাবেন কেন? একখানা শাড়ী বইত না, ছেলেদের কেউ সঙ্গে এলে—তার হাতেই দিতাম।

সরলা কাতর কণ্ঠে বললেন, আপনি একটু বলবেন কি ?

আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, ছেলেদের কাউকে পাঠিয়ে দিন।

শোবার ঘরের ভেজানো দুয়ার ঠেলে সরলা ভিতরে ঢুকে ডাকলেন, মনু, মনুরে, ওঠ না একবার।

মনু ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, পারব না আমি। বলি আর কি কেউ নেই বাড়ীতে ?

কে আর আছে বল। আমি আর চুনি পড়তে গেছে মাস্টার বাড়ী, টুটুল তো দুধের বাচ্চা—

আমার মরণ হয়তো বাঁচি। পোড়া যম কেন যে আমাকে নেয় না। বিছানায় উঠে বসে কপালে করাঘাত করল মনু।

অপরাধিনীর মত সরলা সরে এলেন। সদর দরজার এপিঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলবার আগেই মিত্তির ওপিঠ থেকে বললেন, বুঝেছি বৌদি—ছেলেরা কেউ বাড়ীতে নেই। তা মেয়েটিকে নাই বা পাঠালেন। আমি বরঞ্চ ছেলেদের কাউকে দিয়ে··· আচ্ছা চলি আমি। চাটুজ্জে মশাইকে বলবেন—সকল সকাল যেন আপিস থেকে ফেরেন।

ছোট্ট বাড়ী। সদর অন্দরের ব্যবধান একটি মাত্র দুয়ার। ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠের আলাপ দু'ধারেই পৌঁছে যায় অনায়াসে।

মিত্তির বাড়ীর অভয়বাবু এ সত্ত্বেও একটু ভুল করেছিলেন। শুধু অভয়বাবু নন—বেপথ্য কণ্ঠস্বর শুনে যে কোন আগন্তুক এমনি ভুলই করেন। অথচ বাইরের মানুষের ভুলবে—সরলা কিংবা সরলার স্বামী দেবেনবাবু শুধরে দেবার চেষ্টা করেন না। তাতে লজ্জাই বাড়ে শুধু। ওঁরা জানেন—সংসারে মানুষের আসল পরিচয়টা না দিতে পারলেই লজ্জা। যেমন রঙ্গমঞ্চে—তেমনি সংসারে সকলকারই বিশেষ একটি ভূমিকা আছে; একটি চরিত্রও বলা যায়। যথাযথ অভিনীত না হলে চরিত্র ঠিকমত ফোটে না। যথাযথ অভিনয় করাও শক্ত, আর সেইজন্য লক্ষ কোটি চরিত্রের ভিড়ে আর একটি চরিত্র প্রায়ই মিশে যায়—বিশিষ্ট হয়ে ওঠার অবকাশ পায় না। সেজন্য অবশ্য দুঃখ কেউ করে না। শুধু সাজে-সজ্জায় চলনে ভঙ্গীতে শ্রেণীটি চিহ্নিত হলেই সমাজ সন্তুষ্ট। সবাই যা—তুমিও তাই—এইটুকু হলেই যথেষ্ট। কিন্তু আকার এক—পোষাক অন্য, শ্রেণী বদল করে যায়—সে ভারি দৃষ্টিকটু—লজ্জাকরও বটে। লোকসমাজে পরিচয় দিতে বাধে।

মনুর বেলাতে অবিকল তাই হয়েছে। ও যতই বাইরের জগৎ থেকে সরে এসে অন্তঃপুরকে আঁকড়ে ধরেছে—মনুর বাপ-মা ততই সন্তুচিত হয়ে উঠেছেন। একে বাইরের জগতে ঠেলে দেবার চেষ্টা কি করেন নি ? অথচ সে চেষ্টা সফল হলো না কেন ?

দুই মেয়ের পর ছেলে—আদর করে নাম রাখলেন মনোমোহন।·····বাপ-মায়ের সে কি আদর ! বাবা বাজার থেকে কিনে এনেছেন নানা রঙের নানা ধরনের খেলনা, মা অষ্টপ্রহর কোলে করে ফিরেছেন। এক হাতে নাড়িয়েছেন ভাতের হাঁড়ি—অন্য হাতে ছেলেকে বুকে চেপে ধরেছেন। বিশেষ কাজে পাঁচ মিনিট যদি কোলছাড়া করেছেন ছেলেকে—ছেলে কেঁদে ককিয়ে বাড়ী মাথায় করেছে। পাঁচ ছ'মাসের বোধহীন শিশুও সোহাগের স্বাদটুকু বোঝে।

প্রতিবেশীরা যদি মন্তব্য করেছে—অত কোল-ভাওটো করো না দিদি—একটু আধটু মেঝেয় নামিয়ে খেলতে দিয়ো—না হলে নিজেরই কষ্ট।

না তাই কষ্ট হয় না। মুখে হেসেছেন—মনে মনে বিরক্ত হয়েছেন—পরের অত মাথাব্যথা কেন ?

জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে পুরোমাত্রায় নিজের পাওনা গণ্ডা আদায় করে নিতে শিখেছে। নিত্য নতুন বায়না, সর্বক্ষণ খুঁতখুঁতুনি।

দুহাত ভরে খাবার চাই—দিদিদের মত রঙীন কাপড় জামা চাই ; চাই পুতুলের বাক্স আর বাক্সভর্তি পুতুল : পুতির মালা, জরির সাজ সব চাই। এছাড়া টিপ পরিয়ে দাও কপালে, চোখে টেনে দাও কাজল, ওদের মত লম্বা চুলে বাঁধ বিনুনি—আর হাতে চারগাছা চুড়ি।

একদিন প্রতিবাদ করলেন দেবেনবাবু, ওকে পুতুল সাজিয়েই রাখবে চিরকাল, মানুষ হতে দেবে না ?

সরলা হাসলেন। এ আর কদিনই বা। দিদিদের দেখে শখ হয়েছে—করুক। জ্ঞান হলে নিজেরই লজ্জা করবে।

দেবেনবাবু তবু প্রতিবাদ করলেন, মেয়েদের সঙ্গে ইঁটের খেলাঘর বেঁধে পুতুলখেলাটা অন্তত ছাড়ুক, এবার যে ইস্কুলে যাবার বয়স হলো।

থাক না এ বছরটা—এই তো সবে পাঁচে পা দিয়েছে। এখন ইস্কুলে গিয়ে মন টিকবে কেন ? প্রশ্রয়ের সুরে বললেন সরলা।

তবে রমা উমার সঙ্গে ওদের ইস্কুলে যাক না ?

যাবে—যাবে। তোমার সবেতেই তাড়া। সরলা মৃদু তাড়া দিলেন।

পরের বছরে ইস্কুল যাবার সময় পোশাক পরিবর্তন নিয়ে গোল বাধল। ছেলে কিছুতেই ফ্রক ছেড়ে প্যাণ্ট পরবে না, ছোট করে চুল কাটবে না—হাতের চুড়িও খুলবে না।

দেবেনবাবু রাগ করে বললেন, ছেলেকে মেয়ে সং সাজিয়ে ইস্কুলে নিয়ে যেতে পারব না। তোমাদের যা খুশি করগে !

ওগো দু' একদিন থাক—মন বসুক ইস্কুলে—তখন আপনিই সব ঠিক হয়ে যাবে। সরলা অনুনয় করলেন।

দেবেনবাবু আঘাত খেলেন ইস্কুলে। শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েটির নাম ?

আজ্ঞে মেয়ে নয়—ছেলে। নাম—

চোখ কপালে তুলে শিক্ষয়িত্রী বললেন, বলেন কি, যে ভাবে রেখেছেন, বোঝাই যুশকিল।

ওঁর বাঁকা হাসিতে দেবেনবাবুর মাথা নুয়ে পড়ল।

শিক্ষয়িত্রী বললেন, তা দেখুন, ওকে এ বেশে আনবেন না,—যদিও এটা মেয়েদের ইস্কুল—ছেলেরাও সাত বছর পর্যন্ত এখানে পড়তে পারে—তবু ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু নয় কি ?

দেবেনবাবু ঘাড় নাড়লেন।

যেমন ব্যাকরণ না শিখলে ভাষা শিক্ষা হয় না, তেমনি সংসারের ব্যাকরণ মেনে চলতে হয়—না হলে অনেক অসুবিধা ? বুঝলেন ?

মরমে মরে গেলেন দেবেনবাবু। বললেন, কাল থেকে ও প্যাণ্ট পরেই আসবে।

আর হাতের চুড়ি ক'গাছা খুলে নেবেন।

বিপদ বাধল ওইখানেই। হাতের চুড়ি খুলবার চেষ্টা করতেই হাত-পা ছুঁড়ে আঁচড়ে কামড়ে ছেলে এক বিপর্যয় কাণ্ড বাধিয়ে তুলল। দেবেনবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে গোটাকয়েক চড় বসিয়ে দিলেন ওর পিঠে। গগনভেদী চীৎকার করে ছেলে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। সরলা ছুটে এলেন। তারপর যা কাণ্ড বাধল—তার ধাক্কায় উপবাস করে সেদিন অফিস করলেন দেবেনবাবু।

এমনি করে কাটল আরও একটি বছর।

মা বললেন, আমার একটি মাত্তর ছেলে,—বোকা হোক, মুখ্যু হোক—বেঁচে-বর্তে থাক। ও বাড়ীতে বসে লেখাপড়া শিখুক।

আরও কিছুদিন বাদে মনু ইস্কুলে গেল। এখন বয়স বেড়েছে। হাতে চুড়ি রাখা আর মেয়েদের মত কাপড় পরা ঠিক নয়—এটা বুঝেছে; কিন্তু মেয়েলী ভঙ্গীতে হাত-মুখ নেড়ে কথা বলার হাতকর স্বভাবটুকু ছাড়তে পারেনি।

এ ছাড়া কথায় কথায়—কান্না—অভিমান—কিছু না খেয়ে ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়া—ওগুলোও চল্‌ছে।

একটুতেই কেঁদে ফেলে—সঙ্গীদের সঙ্গে কিছুতেই মানিয়ে চলতে পারে না।

সঙ্গীরা বলে, এই গাধা—

মনু প্রত্যুত্তরে গাল দেয়, খাটে পড়া—মুখপোড়া।

ছেলেরা হো হো করে হাসে—ছড়া কাটে:

ঘরে অ ঘরে আ।
মনোমোহন ঠাকুমা॥
হ্রস্ব ই—দীর্ঘ ঈ।
হাঁড়ি কই—মাতা কই॥

মনু রেগে যায় আরও। বলে—যমের বাড়ী যাও।

এমন করে আর কতদিন চলে। দু'টি ক্লাস পার হতে না হতেই ইস্কুল ছেড়ে দিলে মনু।

মা বললেন, মত উন পাঁজুরে ছেলে—যমের দক্ষিণ দুয়োরে যাক। ঘরে বসে লেখাপড়া করুক ছেলে।

ইতিমধ্যে আরও দুটি এসেছে কোলে। দুটিই ছেলে। এরা অবশ্য অষ্টিতীয় নয়—আদর পেয়ে মাথায় উঠলো না প্রথমটির মত। মনুকে দিয়ে কিছু শিক্ষাও হয়েছিল তো।

মনু কিন্তু ঘরে বসেও লেখাপড়ায় মন দিলে না। কোথায় ভাঁড়ার গোছানো, উনুনে কয়লার আঁচ তোলা, ছোট ছেলেকে দুধ খাওয়ানো—ঘুম পাড়ানো, রান্নাঘর ধোওয়া, কুটনো কোটা—এইসব নিয়ে মেতে রইলো।

সংসারে মা একা। দু'টি মেয়ে বড় হয়েছে। তারা সংসারে সাহায্য করতে পারে না—লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত বলে। তাদের কাজ-কর্মমাস খাটতে বললে মনু খেঁকে ওঠে, একটু আক্কেল নেই তোমার—পড়ার সময় টিক্‌টিক্ করলে পড়াশোনা হয়? বল না কি করতে হবে—আমি তো মরে যাই নি।

মা কাজ পেয়ে বর্তে যান। প্রতিবাদটা ওঁর তীব্র হয় না, শুধু বলেন, তোরও তো পড়াশুনো আছে—ইস্কুল না হয় না যাচ্ছিস—

মুখ হাত নেড়ে মুখ ঘুরিয়ে জবাব দেয়, আহা—কি কথার ছিরি—যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না। সব আমি করলা দিচ্ছি উনুনে। তোমার আবার শরীর খারাপ—দাঁত মুখ ছিরকুটে পড়লেই তো চোদ্দভুবন অন্ধকার দেখিয়ে দেবে!

পারিস তাহলেই, তবে পড়ার ক্ষেতি করিস নে বাবা।

ক্রমে কোন দিক থেকেই আপত্তি আসে না। আসবার কথাও নয়। সংসারে কাজের চাপটা কমে গেলে কে না খুশি হয়। সরলাও পড়শীদের কাছে গর্ব করে বলেন, আমার মনু যাই ছিল তাই সবাই ভরে গেল ঠাকুরঝি! এমন গুণের ছেলে হয় না। যে দিকে জল পড়ছে—সেই দিকে ছাতা ধরছে। ছেলেদের ঘর-আস্তি বল, ঘরদোর পরিষ্কার বল, হাঁড়ি হেঁসেল সামলানো বল—কোন্‌টি না করছে? আবার সব সামলে লেখাপড়াও চালিয়ে যাচ্ছে।

বড় মেয়ে উমার বিয়ে হয়ে গেল। বেশ ভাল ঘরেই বিয়ে হ'ল। জামাই কি যেন সরকারী আপিসে কাজ করেন—মাইনে পান ভাল। বাড়ীঘর আছে। আত্মীয়-পরিজনে ধন-সম্পদে লক্ষ্মীশ্রী-মাখানো সংসার।

কনকাঞ্জলি দিয়ে মেয়ে হাসিমুখেই উঠল মোটরে।

মা কাঁদছিলেন। মনু ওঁর মুখের কাছে দু'হাত নেড়ে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো, আর আদিখ্যেতা কর না মা। বস্তি কাঠপ্রাণ তোমার মেয়ের—কনকাঞ্জলি দিতে গিয়ে এক ফোঁটা চোখের জল বেরুলো না গা!

সরলা বললেন, ওরে তাই বলে কি মায়ের প্রাণ বোঝে?

না বোঝে তো মরগে—আমি বাপু তোমার সংসার ঠেলতে পারব না। নিজের জন পুজো তো মাথায় উঠেছে, এবার অল্পটুকু ত্যাগ করতে হবে দেখছি।

ধমক খেয়ে চুপ করলেন সরলা। মনে মনে ভাবলেন—যে শঙ্কটা দূর থেকে তার চাট সহ্য করতে হবে বইকি। মনু যদি না থাকতো—একদণ্ডও কি চালাতে পারতাম সংসার?

উমা শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে এলো—যেন কতকালের বুড়ী। তেমনি চলন—তেমনি কথা। মাকে বলল, মা, তুমি বাপু মনুর মাথাটি আর খেয়ো না। ওকে হাটে-বাজারে পাঠাও পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে শিখুক। ব্যাটা ছেলে ঘরকুণো হয়ে থাকলে চলে।

মনুকে সামনে পেয়ে বলল, নিজের গণ্ডা বুঝে নিতে শেখ—না হলে ঠকবি।

মনু ঠোঁট উল্টে হাত নেড়ে বলল, ইস্‌—দু'দিন বিয়ে হতে না হতে খুব যে গিন্নীপণা ফলাচ্ছিস্।

মনুর রাগ দেখে হেসে ফেলল উমা। বলল, তোর ভালর জন্যেই বলছি। বলি বাপ মা কি চিরকাল থাকবে? তখন ভাজেদের মুখ নাড়া খেয়ে—

খাই খাব—তোর কি?

উমা আর কোন কথা বলল না। ভাইকে জানে তো। এখনই কলহনিপুণা মেয়ের মত ঝুলুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে হয়তো।

নতুন জামাই এসেছে বাড়ীতে—ছেলেমেয়েরা ওকে ঘিরে রয়েছে সর্বক্ষণ। ওদের মধ্যে রমাই বড়—সম্পর্কে শালিকা, ঠাট্টা তামাসা করার মত বয়সও হয়েছে ; কিন্তু এই সব ব্যাপারে রমা তেমন পাকা মেয়ে নয়। ওকে সামনে রেখে—মধুই নেপথ্য থেকে চালাচ্ছে এসব। চূড়ান্তি ভাতের মধ্যে বাটি রাখা, পানের ডিবের আরশুলা ভর্তি করা, খড় ভিজিয়ে মিছরির পানা তৈরারী কিংবা জাকড়ার পোর দিয়ে ময়দার লুচি ভেজে পাতে দেওয়া—পিড়ির নীচের সুপারি রেখে জামাইকে সেই পিড়িতে বসতে দেওয়া ইত্যাদি সব জামাই ঠকানো ব্যাপার দু'দিন ধরেই চলছে।

শিক্ষাব্রত রমা বলল, ভাত ক'টি ভাল করে ভেঙ্গে নিন জামাইবাবু।

জামাই সত্যেন বলল, অমন সুন্দর করে মালা সাজিয়েছ, ভাতের চূড়া ভাঙ্গতে ইচ্ছে করছে না। পাশ থেকেই নিচ্ছি।

লুচি ক'খানা পাতে ফেলে রাখবেন না কিন্তু।

লুচি না ফুললে আমি খাই না।

বৈকালে গ্লাসে করে লাল রঙের খড় ভিজানো জল এনে বলল রমা, চিনির সরবৎটা খেয়ে নিন।

সরবৎ তো বিকালে খাই না—সর্দির ধাত।

তবে পান খান। ডিবেটা এগিয়ে দেয় রমা।

ওরে বাপরে ডাক্তারে পান খেতে বারণ করেছে যে।

রমা মাকে বলল, মা, আমরা যদি বেড়াই ডালে ডালে তোমার জামাইটি বেড়ান পাতায় পাতায়। শহুরে ছেলে কিনা।

মধু বলল, অত বুদ্ধি ওর মাথায় নেই—বড়দি সব বলে বলে দিচ্ছে। আচ্ছা আমিও দেখছি বাছাধনকে জব্দ করতে পারি কিনা!

প্রথম রাত্রির পাশের বাড়ী থেকে দু' একটা মেয়ে এলো আড়ি পাততে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ওরা হতাশ হয়ে চলে গেল।

তোমাদের জামাই বাপু ভারি ঝানু ছেলে—দিব্যি আলো জেলে বই পড়ছে। আলো নিভুছে না—একটিও কথা কইছে না। আমরা চললাম—দাঁড়িয়ে কে মশার কামড় খাবে বল!

গভীর রাতে সব ঘরের আলো নিভলে মধু এসে দাঁড়াল জানালার ধারে। ভিতরে অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। জানালার কপাটে কান পেতে রাখলে যদি কিছু শোনা যায়।

কি জানি কান পেতে থাকতে থাকতে ওর নিশ্বাসের শব্দ প্রবল হয়েছিল কিনা—হঠাৎ হড়াৎ করে খুলে গেল জানালাটা। ঘরে আলো ছিল না—ভিতর থেকে কে চুপি চুপি এলো জানালার ধারে চেনা গেল না—কিন্তু বাইরের হ্যারিকেনের ঝিমিত আলোয় যে মানুষটা চকিতে সরে গেল—তাকে ঘরের মধ্যেকার মানুষ চিনে রাখল বুঝি।

কে? কে? চোর নাকি? জামাই সত্যেন জানালার ধারে এগিয়ে এলো।

উমা জানালার কপাটটা ভেজিয়ে দিতে দিতে বলল, চোর নয়, পাড়ার মেয়েরা আড়ি পেতেছিল।

সকালে মধুকে একান্তে ডেকে ভর্ৎসনা করলে, ছি ছি, কি আক্কেল তোর, বড়দিদি হই না আমি? ছি ছি!

মন্থ হাসতে হাসতে বলল, তাতে কি—নতুন জামাই—সবাই অমন করে, তুই করিসনে ?

ইদানিং মায়ের মন খুঁত খুঁত করে। সরলা ভাবেন, সত্যি এমন ভাবে পুরুষ মানুষের কখনও চিরদিন চলে। সংসারে স্ত্রী পুরুষ দু'পক্ষেরই কাজের ভাগ আছে। দু'পক্ষের সহযোগিতায় সংসারের গতি ; কিন্তু একের কাজের সঙ্গে অন্যের কাজ মেলে না। আকাশে যেমন সূর্য ওঠে—চাঁদ ওঠে। একজন দিনের কর্তা—একজন রাতের। দু'জনকে নিয়ে আকাশের শোভা—তেমনি সংসারের দুই পক্ষ। ··মন্থর কাজে আজকাল বাধা দেন সরলা। –

মন্থ, তোর রান্নাঘরে গিয়ে কাজ নেই—আমি ভাতের ফেন গালব'খন। বঁটি রাখ—রমা কুটনো কুটে দেবে। কাপড়খানায় সাবান বুলিয়ে নিতে পারব আমি।

মন্থ রেগে ওঠে। বলে, তোমার ওই শরীরে পারবে। ডাক্তারবাবু পই পই করে বারণ করেছে না—শুয়ে থাকতে ? যে শত্তুরটা পেটে এসেছিল—সেই তো তোদার হাড়মাস চিবিয়ে খেয়ে গেছে। এখন ভালয় ভালয় সামলে ওঠ—সংসার বজায় থাক।

সরলা বলেন, আমি তো অনেকদিন ধরেই সংসার করলাম রে, এখন তোদের সংসার বেঁধে দিয়ে গেলেই খালাস।

তুমি চুপ করবে কিনা ?

ছেলের ধমক খেয়ে সরলা চুপ করেন।

সুতরাং ঘুম ভাঙে না সকালে রাত বারোটা পর্যন্ত মন্থকে সংসার ঠেলতে হয়। এ ছাড়া পূজা অর্চনাতে অনেকখানি সময় যায়। রথদোলের মেলা বা অন্য কোন পর্ব উপলক্ষে ঠাকুর পুতুল কেনার বাতিকটা ইদানিং বেড়েছে। সেগুলি পূজার ঘরে এসে জড়ো হয়। প্রত্যেকটির ভোগ, পূজা, আরতি ইত্যাদিতে বেলা গড়িয়ে যায়। সূর্য পাটে বসবার আগে কোনদিনই মন্থ আহারে বসতে পারে না।

মা বলেন, ওরে এত অনিয়ম সইবে না।

মন্থ বলে, শরীরের নাম মহাশয়—যা সওয়াও তাই সয়। ঠিক সইবে।

ছাই সয়। এদিকে তো বলিস অম্বলে বুক জ্বালা করে। দোক্তাটা না হয় ছাড়।

মন্থ প্রতিবাদ করে, তবে বাবার বুক জ্বালা করে কেন—বাবা তো দোক্তা খায় না !

চা খাওয়া না হয় একটু কমা।

বাসরে, তাহলে আর গতর নাড়তে পারব না। এই যে সংসার ঠেলছি—ওইটুকুর জোরেই তো।

প্রতিবাদ নিষ্ফল দেখে সরলা চুপ করেন।

সেদিন দেবেনবাবু বাজার থেকে ফিরতেই মন্থ বলল, আজ বাপু সকাল সকাল আপিস থেকে ফিরো—তোমায় মেজ মেয়েকে দেখতে আসবে কোন্নগর থেকে।

কে বললে ?

ওই মিত্তির মুখ পোড়া তিন প্রাতঃকালে কড়া নেড়ে জানিয়ে গেল। একখানা ভাল সিল্কের শাড়ী দেবে ও, তাই পরিয়ে মেয়ে দেখানো হবে। শাড়ীটা চেয়ে এনো।

তুই কেন গেলি মা ?

আমার বাপু মরবার অবসর নেই - আমি যাব শাড়ী আনতে। বলি ক'টা দাসী বাঁদী রেখেছ সংসারে ?

দেবেনবাবু কথা কাটাকাটি না করে সরে পড়লেন।

বিকেলে প্রসাধন দ্রব্য সাজিয়ে মনু ডাকলে, মেজদি, বেশ করে সাবান ঘষে গা-টা ধুয়ে আয় - আমি চুল বেঁধে সাজিয়ে দেব তোকে।

রমা বলল, মা না হয় চুল বেঁধে দেবে'খন।

আহা কি ছিরি চুল বাঁধার! একটা বড়ির মত খোঁপা টেনে খুলে বেঁধে দিলেই বুঝি চুল বাঁধা হ'লো! ওসব সেকেলে ফ্যাসান আজকাল নেই। দু'দিকে দুটো বিনুনি আর খোলা করে ঝুলিয়ে দেব ঠিক যেন প্রজাপতিটি।

পরিপাটি করে সাজিয়ে দিলে মনু।

পাশের বাড়ীর মেয়েরা দেখতে এসে বললে, বা: চমৎকার করে চুল বেঁধেছ তো? আপনিই বাঁধলে বুঝি ?

দোরের আড়াল থেকে চোখ ইসারা করলে মনু।

রমা মাথা নামিয়ে ডান দিকে ঘাড় কাত করলে।

মনু একটা ফুল তোলা কার্পেটের আসন ওদের সামনে মেলে ধরে বলল, মেয়ের হাতের কাজ। এই রাধা কেষ্টর ছবিটাও ও বুনেছে।

বা: বেশ কাজ। মেয়েরা প্রশংসা করলেন।

মনু সরে যেতেই ওঁরা বললেন, আপনাদের ঠাকুর বুঝি ?

সরলা কাষ্ঠহাসি হেসে মাথা নাড়লেন।

ওঁরা চলে যেতেই মনু সবেগে বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে। হাত মুখ ঘুরিয়ে চড়া গলায় বললে, এই রইল তোমার রান্নাবান্না—আমার দ্বারা আর হবে না।

কেন রে—কি হলো ?

কি হ'ল! ওরাও যেমন বে-আক্কেল—তোমরাও তেমনি বেহায়া। আমি ঠাকুর? তোমাদের ঝাঁটা মারুন—না ?

সরলা বিরক্ত হয়ে বললেন, তা তোর যেমন কাপড় পরার ছিরি। একখানা আধময়লা ধুতি তেল হলুদের ছোপ—ওদের অপরাধ কি !

চীৎকার করে উঠল মনু, যত দোষঘাট আমার! মুখটি বুজে তোমাদের সংসার ঠেলছি কি না—তাই !

সরলার মেজাজ ভাল ছিল না। মেয়েকে দেখে শুনে কোন রায় প্রকাশ করেননি ওঁরা। সরলার পীড়াপীড়িতে শুধু বলেছিলেন, ওঁরা দেখে গেছেন—আমরাও দেখলুম, বাড়ী গিয়ে দু'পক্ষ আলোচনা করে মতামত জানাব।

সরলা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। এত আদর-আপ্যায়ন আত্মীয়তা দেখিয়েও এই রকম না-চালা উত্তর আশা করেননি।

একটু চড়া গলাতেই উত্তর দিলেন, তোকে কি বলেছি নিজের কাজ ক্ষতি করে সংসার দেখতে ? যার যা বেশ-ভাইতেই তার পরিচয় দেখা যাচ্ছে।

মহু মেঝেতে চাপড় মেরে চীৎকার করে উঠল, এখন তো বলবেই—গলা দিয়ে কাঁটা মেরে গেছে যে! বলি তোমার ছেলে মেয়েদের দু'বেলা পিণ্ডি সেদ্ধ, আপিসের ভাত, গাদা গাদা কাঁথা ক্লাকড়াকানিতে সাবান দেওয়া, আঁতুর তোলা, পোয়াতির সেবা···

সরলা নরম গলায় বললেন, যাদের সংসারে কেউ নেই তাদের চলছে না? ভগবান যে করে হোক চালিয়ে দেন।

তাই দিন চালিয়ে—এই রইল তোমার সংসার। আনাজ শুদ্ধ পেতেটা পা দিয়ে ঠেলে দিলে, কাঁটা গাছি উঠোনে ছুড়ে ফেল্‌লে, বঁটিখানা এমনভাবে আছড়ে ফেল্‌লে—সেটা গিয়ে লাগলো জল ভর্তি বালতির গায়ে—খানিকটা জল চল্‌কে পড়ল মেঝেয়। তারপর হাত পা ছড়িয়ে মড়া কান্না জুড়ে দিলে মহু।

এই বিপর্যয় কাণ্ডে সরলাও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। চড়া গলায় বললেন, আ মলো যা—ভাল করতে পারিনে মন্দ করতে পারি কি দিবি তা বল! নিজের সংসার হোক তখন যত ইচ্ছে ফেতি অপচো করিস—আমার সংসারে তোর এত চিরকুটি কেন রে ভ্যাকরা?

মহু ক্ষ্যাপা-মুক্ত ধনুকের মত সোজা হয়ে উঠল। চোখ লাল করে বলল, তোমার সংসার?

আমারই তো। এক কড়া উপার্জনের মুরোদ নেই—তেজ দেখ বাবুর! বলে বিয়ের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্কর! ছি ছি, ঘেন্নার কথা!

রমা মায়ের মুখ চেপে ধরল। বলল, ছি মা, তুমিও অবুঝ হচ্ছ?

সরলা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, তোরা দেখলি তো—কার অন্যায় দেখলি তো? আমার সংসারে আমি চোর হয়ে থাকব? কেন? কেন? কেন?

মহু কোন কথা বলল না। খানিক গুম মেরে থেকে উঠে গেল। নিজের ছোট্ট ঘরখানিতে ঢুকে দুয়োর বন্ধ করলে। মাদুরটা বিছালো না—মেঝের শুয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে লাগল সতর্পণে—যেন আওয়াজটা ঘরের বাইরে না পৌছয়।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল—তবু দুয়োর খুলল না মহু।

রমা এসে ডাকল, দোরটা খোল না রে। বলি ভাত-টাত খাবিনে?

মহু ভিতর থেকে জবাব দিলে, খিদে নেই।

রমা বলল, তুই না খেলে মা-ও খেতে পারছেন না।

মহু শুধু বলল, আমি খাব না।

মা উপোসী থাকবেন?

জানি নে।

বাবা আপিস থেকে এসে ডাকলেন, মহু দোর খোল। আমাকে ভামাক সেজে দে।

আমি পারব না।

দোর খোল।

না।

অবশেষে মা এসে ডাকলেন, মহু, দোর খুলবিনে?

কেন—কি হবে?

ছুটো মুখে দিবি আয়। লক্ষ্মী সোনা আমার—

আর সোহাগে কাজ নেই—যা খাইয়েছ, তাতেই পেট ভরে রয়েছে! বিরক্ত করো না—আমি ঘুমুব।

শত সাধ্যসাধনাতেও সে রাত্রিতে দুয়ার খুললো না মনু। পরের দিন ভোর বেলাতেও না।

বেলা খুলল একেবারে দুপুরে। দেখল রান্না পাট সারা হয়েছে। বাবা যথাসময়ে আহারাদি সেরে আপিসে গেছেন—ছোট ভাইরা ইস্কুলে গেছে। মা কলতলায় বসেছেন একরাশ কাপড় নিয়ে—রমা উনুনের পাড়ে বসে কি যেন রান্না করছে।

ছ্যাৎ করে উঠল বুকের মধ্যে। সে ছিল না বলে তো সংসারের চাকা বন্ধ হয়নি। যেমন নিয়মে প্রতিদিন সূর্য ওঠেন—তেমনি নিয়মে সংসারের কাজকর্ম চলছে। সূর্য না উঠলে ত্রিভুবন যেমন অন্ধকার হয়—সংসারের বেলায় তো তেমনটি হয় না। মানুষ থাকুক না থাকুক সংসার ঠিক চলবেই।

স্নান আর পূজা আহ্নিক সারতে সন্ধ্যা হ'লো—মা তখনও ভাতের হাঁড়ি আগলে বসে আছেন।

রমা ডাকল, মনু খাবি আয়।

খাব না। নিজের ছোট ঘরে ঢুকলো মনু। আবার বুঝি ঘোরে খিল লাগিয়ে শুয়ে পড়ে—এই ভয়ে মা তাড়াতাড়ি উঠে এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়ালেন। বললেন, আয় বাবা খাবি আয়।

না। মুখ ফেরালে মনু।

লক্ষ্মী মাণিক আমার—

যাও।

দেখ, ছুই খাসনি—কাল থেকে আমিও উপোসী আছি। বুড়ো মানুষ—আর পারছি না রে।

ত্বরিতে মায়ের পানে ফিরে মনু বলল, আমারই বুঝি সব দোষ?

ধপ করে ওর দু'খানা হাত চেপে ধরে মা কেঁদে ফেললেন। ওরে সব সময়ে কি মাথার ঠিক থাকে! আইবুড়ো মেয়ে যার গলায় ঝুলছে তার মাথার ঠিক থাকে রে!

মনুর মনটা নরম হল। বলল, ভাত খেতে পারি।

আমারও একটা কথা কিন্তু রাখতে হবে।

বল।

আমার মাথায় হাত দিয়ে বল রাখবে। তিন সত্যি কর।

বলই আগে—

আমার একটা ব্যবস্থা তোমাদের করে দিতে হবে। চিরদিন ভায়েদের সংসারে দাসবৃত্তি করতে পারব না।

বল কি চাস?

বাবা যদি টাকা দিতে না পারে তোমার গহনাগুলো আমায় দিয়ো—তবু আমার অসময়ের সম্বল।

দেব। যে ক'খানা গহনা আছে তোরই রইল।

মনুর মুখে হাসি ফুটল। বলল, চল—মায়ে-পোয়ে একসঙ্গে খেতে বসি গে।

ফোগলরেই রমার বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে এলো আলাদা মানুষ। কেমন

হাসি হাসি মুখ। বললে কথায় মুক্তিখানার ভাব। চিরদিনের সংসার ব্যবস্থার খুঁত বার করছে—মাকে অনুযোগ করছে খাওয়া-শোয়ার অব্যবস্থা নিয়ে।

মনু বলল, তুই যে আটদিনেই পাকা গিন্নী হয়ে গেলি!

রমা বলল, ওদের বাড়ীর ব্যবস্থা যদি দেখতিস তো একথা বলতিস না। তেমন সব সাজানো গোছানো ঘর-দোর—পূবের জিনিস পত্তিকে ফেলে না। সে যাই হোক, এবার কিন্তু পুজো-আচ্চার মন্তর শিখে নে মনু। দেখলাম তো আমার শ্বশুরবাড়ীতে সিদ্ধেশ্বরীতলায় কি লোকের ভিড়—কি মানতশোধের ঘটা! অমাবস্তের কাপড়-চোপড় গামছা তুল্সি—ঘর থই থই করছে। তস্চাজ্জি মশায় শুধু পুজো করে—অতবড় সংসারে—তিন ছেলে—দুই মেয়ে—ছেলেদের বউ নাতি-নাতনী মিলে বিরাট সংসার প্রতিপালন করছেন।

মনুর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল।

সেদিকে লক্ষ্য না করে রমা বলে যেতে লাগল, আর নিজের সংসার না হ'লে সবই তখন ঘি ঢালা। আজ হয়তো ভাল লাগছে না আমার কথা—একদিন বুঝবি।

মনু উঠে গেল সেখান থেকে।

নিজের ছোট ঘরখানিতে শুয়ে ভাবতে লাগল, সাধ করে কি কথায় বলে—বিয়ে হলেই মেয়েরা পর হয়ে যায়? তখন আজন্মকালের সংসার তার ভাল লাগে না—যে সংসারকে নতুন দেখছে—সেই হয় আসল আপন, সেখানকার সব কিছুই ভাল লাগে।

কিন্তু পুরুষরা এমন হয় না। যে ঘরটিতে জন্মকালে সে চক্ষু মেলে চায়—চক্ষু না বোজা পর্যন্ত সেই ঘরখানিই তার আপন। পৃথিবীতে কত বড় বড় অট্টালিকা আছে—ঐশ্বর্যে সম্পদে যার আগাগোড়া ঠাসা—না দেখলে চক্ষুর পলক পড়ে না—দেখে দেখে দেখার আশা মেটে না অথচ নিজের ছোট পুরাতন একখানি ঘরের কাছে তার মূল্য কত কম! ছোট ঘরে নিজের খুশিমত চলাফেরা যায়, মন খুলে কথা বলা যায়—কান্নাহাসির বাধাও নাই, যেমন তেমন করে ঘুমুনো যায়—নিঃশ্বাস নেওয়া যায়—তেমন আপন আপন ভাব পৃথিবীর কোন ঘরেই কি মিলবে? মা যেমন কথায় কথায় বলেন:

আপন ঘরখানি আঁধারে আলো,
চুপ করে পড়ে মরি সেও ঘোর ভালো।

সেখানে যত অন্ধকারই হোক তারই মধ্যে আলো। হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েও তৃপ্তি। না, সংসারকে সে কোনমতেই আলাদা ভাবতে পারবে না। যে যাই বলুক—কোনমতেই তা পারবে না।

সুতরাং আর একবার নিজেকে মিশিয়ে দিলে সংসারের সঙ্গে। নতুন জামাই এলে ঠাট্টা-তামাসায় সহজ হয়ে উঠল মনু। এবার আট বছরের বোন গীতাকে সামনে রেখে তূণ থেকে শাণিত অস্ত্রগুলি বার করতে লাগল। কিন্তু এটুকু হিসাব তার ছিল না—ওই পুরাতন অস্ত্রের ধার এমন পড়ে গেছে—ওই সেকেলে ঠাট্টা রসিকতাকে নতুন ছেলেরা অসভ্যতা মনে করে। মেজ জামাই সুরেশ গীতাকে একটা ধমক দিতেই সে কাঁদো কাঁদো মুখে বললে, বাঃ রে, আমি করেছি নাকি? সেজদাই তো আমায় শিখিয়ে দিলে।

ওপরের সেজদাটি কে ? রমাকে প্রশ্ন করল সুরেশ।

রমা সামলে নিয়ে বলল, ওই পাশের বাড়ীর একটি ছেলে, আমাদের নিজের ভাইএর মত কিনা।

নিশ্চয় লেখাপড়া শেখেনি ? সহৃৎ জানে না।

প্রসঙ্গটি কোন রকমে চাপা দিলে রমা।

নিশুতি রাতে জানালার ধারে শব্দ হতেই সুরেশ বলল, দেখতো—তোমাদের সেই ওপরের সেজদাটি আড়ি পাতছেন কিনা ?

সকালে মধুকে একান্তে ডেকে রমা বলল, ছি ছি—কি তোর কাণ্ড রে ! শহরে লোকেরা ওসব পছন্দ করে না।

…ইস্—ভারি শহর আমার রে ! পছন্দ না করল তো বয়েই গেল। আমি স্পষ্ট ছাড়া কি করেছি ! জামাই মত না বলুক—তোর অত ফোড়ন কাটা কেন শুনি ?

রমা রেগে উঠল। বলল, ব্যাটাছেলে হয়ে তোরই বা অমন মতিগতি কেন ? এতো মেয়েছেলের কাজ।

মধু রাগ করল না—হাসতে হাসতে বলল, আর একটা উপযুক্ত বোন থাকলে আমার মাথা ব্যথা না করা। নেম আচার পালতে হবে তো।

মুখে বলল বটে আর একটি উপযুক্ত বোন থাকলে তার কি মাথাব্যথা ছিল—এসব নিয়ম-আচার পালন করতে, কিন্তু শুধু ঘর গৃহস্থালী নিয়ে, প্রতিদিন এক ঘেয়ে জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে—এটা ওটা হুকুম করে মন ভরে কি ? কোন্ দক্ষিণা হাওয়ার স্পর্শে অপরের প্রাণে রসের তুফান ওঠে, পুরাতন মানুষ নতুন হয় কোন সঞ্জীবনী মন্ত্রলাভ করে। অন্তের গোপন রহস্য খুঁজে বার করার মধ্যে কত মধু যে লুকিত রয়েছে—এসব কাউকে বলার নয়। এর লাভ—এর আনন্দ—যে ভোগ করে সেই জানে শুধু। সংসার যে এত মিষ্টি লাগে এই সব আছে বলেই তো—নুন না দিলে ব্যঞ্জনের আস্বাদ কি !

রাস্তা দিয়ে বাজনা বাজিয়ে বর বউ গেলে—মধু ছুটে এসে দাঁড়ায় সদর দরজায়—বাসর ঘরের রঙ্গরসের মাঝখানে গিয়ে বসতে না পারলে ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। অষ্ট বর্ষনে নতুন জামাই এলে ওর কৌতূহল উগ্র হয়ে ওঠে—নিশুতি রাতে নব-বিবাহিত দম্পতির বন্ধ ঘরের আনাচে-কানাচে সারারাত্রি আড়ি পেতে ঘুরতে ও একটুও ক্লান্তিবোধ করে না। কত ভৎর্সনা করেছেন মা—কত টিটকারি দিয়েছে প্রতিবেশীরা। সমবয়সী ছেলেরা ওর নামে ছড়া বেঁধে বাড়ীর দরজায় এসে উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করেছে, মধু নিজের স্বভাব শোধরাতে পারেনি। কতবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে—এই শেষবার—আর এসবে থাকবে না—কিন্তু মন বোঝেনি। চেষ্টা করেছে নিজেকে কাজের পাকে জড়িয়ে এসব থেকে দূরে সরে যেতে, কিন্তু শুটি পোকারা নিজের নালে যেমন জাল তৈরী করে নিজেকে বন্ধ করে সেই জালের ঘরেতে—তেমনি এই অন্তঃপুরের অন্তরাল ওকে আরও গভীরে টেনে নিয়ে গেছে। জীবন থাকতে এই মোহ-বন্ধন বুঝি ছেদন করা যাবে না।

এমনি করে কাটল আরও ক'টা বছর। মধুর ছোট দু'টি ভাই অমিয় আর চুণি…ম্যাট্রিক পাস করল—চাকরিতে ঢুকল। ওদের চাকরি পাকা হল। ইতিমধ্যে মেবেনবাবু গত হয়েছেন—কিন্তু…সংসার চলছে ঠিক মতই।

সংসারে আবার শুভকর্মের উৎসব আসন্ন হল। মেজভাই চুণির বিয়ে। দেনা-পাওনার ব্যাপারটা অন্তরাল থেকে মনুই পাকা করিয়ে নিলে।

মাকে বললে, ওরা তো ষোল ভরি সোনা দেবে—তুমি কি দিয়ে বৌয়ের মুখ দেখবে?

আমার আর কি-বা আছে বাবা, আশীর্বাদ করব।

না মা—তা হয় না। প্রথম বউ বরণ করে ঘরে তুলবে—সোনা দিয়ে মুখ না দেখলে পড়শীরা যে খাতেক ছি করবে। তুমি গলায় এক গাছা হাঁস হার দিয়ো—আমি গড়াতে দিয়েছি।

সে কি রে—ও সোনা যে তোকেই দিয়েছি—

আমি কি সোনা চিবিয়ে চিবিয়ে খাব—তোমার সাধ আহ্লাদ তো পুরতে হবে।

না মনু—ও সোনা থাক।…তোর সময় অসময় আছে—রোজগার তো করছিস না তুই—

আচ্ছা—আচ্ছা—আমার জিনিস আমি বুঝব'খন, ভাবছ তোমার ছেলেরা আমাকে দেখবে? না মা, ওরা তেমন নয়, সেজদা বলতে দুই ভাই-ই অজ্ঞান।

তবে বসত-বাড়ীটা তোর নামে লেখাপড়া করে দিই।

না-না-না। তা যদি কর তো কুরুক্ষেত্তর করব আমি।

নতুন বউ একে একে প্রণাম করল সবাইকে। পরিচয় করিয়ে দিলেন মা।

এই তোমার বড় ননদ বিষয়ের মুখুজ্জে বাড়ীর বউ, এই তোমার মেজ ননদ—কোন্নগরের রায় বাড়ীর ন ছেলে বনবাসী রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। ছেলে কি যেন কোন আপিসের বড়বাবু। এই তোমার ভাসুর—

মনুকে প্রণাম করবার আগে একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল বউ। এমন আধময়লা কাপড় পরা ক্ষ্যাপাটে আর বেয়াদান চেহারার মানুষ—ভেবেছিল রাঁধুনী বামুন কিংবা চাকর হবে।

মনু আশীর্বাদ করল, জন্ম এয়োস্ত্রী-হও—পাকা চুলে সিঁদুর পর—

মুখ ফিরিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলল বউ।

হাসিটা কারও চোখ এড়াল না। মনুও দেখল। অর্ধ-সমাপ্ত আশীর্বাদ-মুখে হন হন করে নিজের ঘরটিতে ঢুকে দুয়োর বন্ধ করে দিলে।

মাঝে মাঝে এমনি আঘাত আসে। মনটা মুষড়ে পড়ে—বেশীক্ষণ থাকে না সে ভাব। শুধু সংসারই তাকে শত পাকে জড়ায়নি—অভ্যাসগুলিও জড়িয়েছে। অন্তঃপুরের গণ্ডীবদ্ধ হয়ে কখন যেন সে অন্তঃপুরিকায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ সৎ যে তার নয়—সে বোধটুকু ওর নাই। যারা বাল্যকাল থেকে ওকে দেখছে—বাপ মা ভাই বোন আত্মীয় কুটুম পাড়া প্রতিবেশী—সকলের চোখেই ওর এই ভূমিকাটি সহজ। সংসারে ও এমনি করেই মানিয়ে গেছে। মেয়েরাও ওর সামনে অসঙ্কোচে এমন বিষয় নিয়ে আলাপ করে যা নাকি একান্তভাবে মেয়েদেরই প্রশ্ন। অথচ সে আলাপে কোন পক্ষেরই সঙ্কোচ-বোধ হয় না। মনুও সেই আসরে মন্তব্য করে—টিপ্পনী কাটে—হাসে। মেয়েরাও হাসে। বলে, ক্ষুদে ননদ। সে হাসি-ঠাট্টা প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করে মনু।

চুণির বউএর হাসিটা কিন্তু প্রসন্ন মনে নিতে পারল না। অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ নিঃশব্দ হাসি, তবু

কোথায় যেন একটু ছন্দ রয়েছে। ব্যঙ্গ? তাচ্ছিল্য? বেশ খানিকক্ষণ এ নিয়ে অন্যমনস্কভাবে ভাবল মধু। তারপর কার্যান্তরে যেতে শীঘ্রই এই ব্যথাটুকু ভুলে গেল।

ফুলশয্যার রাত্রিতে দেখা গেল—স্ত্রী আচারগুলিতে যাতে ত্রুটি না ঘটে—সেদিকে ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শোবার ঘরের প্রতিটি বস্তু—খাট বিছানা আরশী ছবি আলনা আলমারি—ফুল দিয়ে সাজানো। বর কনেকে ছুঁলে না ঘটে, স্ত্রী আচার করছিল যে মেয়েগুলি—তাদের নির্দেশ দিতে লাগল।

মরণ—হেসেই যে লুটিকাটা! আগে আচার নেমগুলো পাল। যোগামুনি ভাসিয়ে দে থালায়। হাত দিয়ে ঢেউ তোল, দেখ ভাসতে ভাসতে কোন্ দিকে যায়। কাছে আসে, না দূরে চলে যায়।

তুমিই কর না মধুদা।

ভাদর বউ না হলে করতাম রে—বৌরা যে নিষেধ। সে এইবার দু'জনকে খাটে বসাবার আগে ফুলের মালা পরিয়ে দে গলায়। হাতে খাবার দে। এ ওর মুখে খাবার দিক—ওদিক এর মুখে। উলু সে ভাল করে। মরণ জিভ নাড়তে পারিস নে তো মেয়ে হয়ে জন্মেছিস কেন?

মুখ ফিরিয়ে নিজেই ভাঁকিয়ে উলু দেয়। ঘরখানা হাসির শব্দে ভেঙে পড়ে।

শাঁক বাজা—শাঁক বাজা। ওমা, অমনি করে বুঝি ফুঁ দেয়। বলে শাঁকটা কেড়ে নিয়ে জোরে জোরে ফুঁ পাড়ে।

আবার হাসির লহর ছোটে।

উলু দে—উলু দে! মরণ :

খাবার বেলায় নবার মা,
উলু দেবার বেলায় ঝিতে মা।

নে—এইবার খাটে বসা ওদের, আমি চলি।

বাইরে চলে এলেও মনটা পড়ে থাকে ঘরের মধ্যে।

পাশের ঘরে গল্প করছিলেন মা—দূরসম্পর্কীয়া জ্যেঠিমার সঙ্গে।

দিদি, আমার সংসারের হাল হচ্ছে ওই ছেলে, কিন্তু আমার সংসার তো আর আমার রইলো না, এবার ছেলেদের সংসার। চুণির বিয়ে হল—আসচে বার অমিটারও বিয়ে দেব—ওদের সংসার ওরা চিনে নিক। যদি মধুকেও ওর সংসার চিনিয়ে দিতে পারতাম!

মায়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস স্পষ্ট শুনতে পেল মধু।

জ্যেঠিমা বললেন, এইবার খুঁজে পেতে ওর বুদ্ধি একটি বউ করে আন ছোটবৌ।

মা বললেন, নির্গুণে ছেলেকে কে মেয়ে দেবে দিদি! যদি পুজোআচ্চাটাও ভাল করে শিখত!

যে ঘরে বসে মা কথা কইছিলেন—মধু ভ্রূ-কুঁচকে সেই দিকে চাইল। এমন শুভদিনেও মায়ের মনে এইসব চিন্তা! ইচ্ছা হ'ল খুব জোরে একটা ধমক দেয় মাকে। অনেক কষ্টে সামলে নিলে। এক বাড়ী কুটুম—পাড়া-প্রতিবেশী। মা শুভদিনে চোখের জল ফেলবেন—সে ভাল নয়। এতে নতুন বরকনের অকল্যাণ হতে পারে।

অথচ মায়ের কথা এমন বেসুরো লাগছে। ঘুরে পশ্চিম দিকে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে বরকনের ঘরের সামনেটা দেখা যায় না। ঘরের মধ্যে কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে দেখা যাবে

না, কিন্তু একটু কান পেতে থাকলে কথাগুলো শোনা যাবে। সে আলাপ মা-জ্যেঠির আলাপের মত বেসুরো নয়—এই ভরসা!

ক্রমে রাত্রি বাড়ল—উৎসব-ক্লান্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ হল। সারাদিন যারা হৈ-চৈ করে বেড়িয়েছে—তারা যে যেখানে পেরেছে শুয়ে পড়েছে। ওদের মনের কৌতূহল চাপা পড়েছে ক্লান্ত দেহের শিথিল ভঙ্গিমায়। অবসন্ন অচেতন দেহগুলি দেখলে কে বলবে—এরাই সকাল থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত অনবরত কথা গল্প হাসি-হুল্লোড় ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে!

সে ক্লান্তি মধুরও কম নয়। এ ছাড়া ছিল কাজের চাপ। সমস্ত ভাঁড়ারটাই ছিল তার জিম্মায়। জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, হিসাব করে ভাঁড়ার বার করে দেওয়া, লৌকিকতা বুঝে নেওয়া। ক্ষতি অপচয়ের দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা—অথচ কেউ যাতে মনঃক্ষুণ্ণ না হয় তার সুব্যবস্থা করা—ছুটোছুটি—বকাবকি—পরিশ্রম কি কম! সব শেষে ভাঁড়ার গুছিয়ে—ভাঁড়ার ঘরে তালা লাগিয়ে চাবিটা পৈতার সঙ্গে বেঁধে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে।

ঘরে আসবার আগেই, আশ্চর্য—ক্লান্তির পর্বত প্রমাণ বোঝা ঠেলে কৌতূহলের অঙ্কুরটুকু, এই মুহূর্তে, কেমন করে না জানি মাথা তুলল মনের আঙিনায়। নিজের ঘরের দিকে না গিয়ে ওদের ঘরখানির দিকেই সন্তর্পণে এগিয়ে গেল মধু; ওই পুষ্পসুরভিত কল্পলোকবাঞ্ছিত ঘরখানির দিকে। সন্তর্পণে গিয়ে দাঁড়াল উত্তরের জানালা ঘেঁষে—যেখান থেকে বাইরের কেউ দেখতে পাবে না—অথচ সে দেখতে পাবে ঘরের ভিতর পর্যন্ত। ভিতরের আলো মিঝু মিঝু হয়, তবু ছায়া ছায়া অন্ধকারে খদ্যোত-সমা দৃষ্টিকে পাঠাবে জানালার ছিদ্রপথে। পুরাতন জানালার দুটি কপাট বন্ধ করলেও—সিকি ইঞ্চিটাক লম্বালম্বি ফাঁকেটুকুতে নরম আলোর একটি লাইন টানা রয়েছে। রজনীগন্ধার গন্ধ আসছে ভেসে। ভিতরে কাপড় জামার খস্‌খস্ শব্দও যেন পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু এটা উচিত হচ্ছে কি? গুরুজন হয়ে কল্যাণীয়দের পুষ্পবাসরে আড়িপাতা।

নিষিদ্ধ বিধিবিধানের কথা এক মুহূর্তের জন্য মনে উঠে নানা দৃষ্টান্তের চাপে কোথায় তলিয়ে গেল। বাসর ঘরে কত ছুতো-নাতায় মা-জ্যেঠিদের আনাগোনা, দুয়োরে ঘনকে দাঁড়ানো, রসিকতার সূত্র ধরিয়ে দেওয়া, ছদ্ম পরিচয়ে বাসরে সারারাত্রি কাটানো, ফুলশয্যার রাত্রিতেও জানালার ধারে আড়ি পেতে সারারাত্রি জাগরণ……প্রতি সংসারে লঘুগুরু বিধিচারে এইসব ব্যাপার ঘটেই থাকে। উৎসবে বাধানিষেধের আগল থাকে না—তখন আট বছরের কুমারী থেকে আশী বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত—সব মেয়েই কৌতূহলে কৌতুকময়ী। দিনের আলোয় কিংবা এক পক্ষ সামনে থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত মান সম্মান বাঁচিয়ে চলার বিধিটা অবশ্য পালনীয়। আসলে ওটা ছদ্মবেশই। সুযোগ-সুবিধা ঘটলে কৌতূহলকে ঠেকাতে পারে তেমন মেয়ে তা সে যে কোন রকমেই হোক না কেন—মধুর চোখে তো পড়েনি। অন্তঃপুরের এ নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য কোন অন্তঃপুরবাসিনীর নাই।

জানালার সঙ্গে মিশে গেল মধু।

ভিতরে চাপা কণ্ঠে আলাপ চলছিল।

তোমার দাদাটি এক অদ্ভুত জীব, এমন কোথাও দেখিনি।

ও ছেলেবেলা থেকেই ঐ রকম—মায়ের আদর পেয়ে পেয়ে মেয়ে-ছাকড়া হয়েছে।

এটা কিন্তু ভাল হয়নি।

উপায় কি! যে লেখাপড়া শিখলে না—

কিন্তু পুরুষের সমাজে কোনদিনই কি মিশতে পারবেন উনি?

মিশতে পারে না। মেয়েদের সমাজেই ওর আদর।

আদর! তাই মনে কর তুমি! নতুন বউএর স্বর স্পষ্ট হল—ঈষৎ তীক্ষ্ণ যেন। আসলে কোন সমাজেই ওদের স্থান নেই। শুধু হাসি-মস্করার জন্য এই রকম পুরুষকে মাঝে মাঝে দরকার হয়, কিন্তু তুমি কি মনে কর—মেয়েরা ওদের সত্যি সত্যিই পছন্দ করে? ছিঃ!

চুপি বলল, থাক ও সব কথা শুনলে কষ্ট পাবে মেজদা।

বিষাক্ত তীর তৎক্ষণে লক্ষ্যভেদ করেছে। টলতে টলতে জানালার ধার থেকে সরে এল মধু। কিন্তু নিজের ঘর পর্যন্ত আর পৌঁছতে পারল না। রোয়াকের একধারে স্তূপীভূত হয়েছিল··· পরিবেশনের ডাল তরকারি মাখা থালা বাসতি ডেকচি ঘটি বাটি হাতা সাঁড়াশি ইত্যাদি—তারই পাশে বসে পড়ল মধু। বসে থাকতেও পারল না। সারাদিনের পর্বত প্রমাণ ক্লান্তি ওর সমস্ত দেহকে অবসন্ন করে দিচ্ছে—সমস্ত শরীর কাঁপছে থর থর করে—নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সেই এঁটো বাসনের মাঝেই শুয়ে পড়ল। ও তখন তলিয়ে যাচ্ছে কোন্ ঘুমপুরীর ছায়া শীতল নদীর কিনারায়—ওর শেষ চৈতন্যটুকু ভাসা ঢেউএর মেঠে সুর—কখন আত্মসাৎ করে নিয়েছে।

•

বর বউ অষ্ট বর্ষনে চলে গেল।

মধুও নিজের রঙ-চটা সুটকেসটা গুছিয়ে নিলে।

এটা ওটা জিনিস ভরে ভরে মাকারি মত একটা পুঁটুলিও বাঁধলো।

মা অবাক হয়ে বললেন, ও কিরে পুঁটুলি বাঁধছিস কেন? কোথায় যাবি?

মধু হেসে বললে, আমার বুঝি ভূভারতে কোথাও যেতে নেই?

তাই কি বলছি আমি! বলি বিয়ের পর্ব চুকতে না চুকতে এত সাত তাড়াতাড়ি—

মধু বলল, ঘরে বউ এসেছে—তোমার ঘর বজায় হয়েছে—এখন আমার ছুটি। এবার হাত—পা মেলে একটু বেড়াব। ভাবছি বৃন্দাবনে যাব।

বৃন্দাবন! কার সঙ্গে যাবি? বিস্ময়ে আতঙ্কে মায়ের চোখের পলক আর পড়ে না।

মধু হেসে ফেলল। বলল, আমি যেন ছোট খোকাটি তোমার—বাড়ীর বার হলেই হারিয়ে যাব! ভয় নেই গো—ভয় নেই। সরকার গিন্নী, বোস গিন্নী—হারুর ঠাকুমা—নিমাইএর পিসি, বিন্দাবনের দিদি সবাই চলেছে বুলন দেখতে। ওখানে বুলনে নাকি খুব জাঁক হয়।

মা বললেন, তা এত তাড়াতাড়ি কেন—আর দু'টো বছর সবুর কর, ওদের সংসারটা গুছিয়ে দিয়ে আমিও না হয় যাব তোর সঙ্গে।

মধু বলল, ও হরি, তবেই আমার যাওয়া হয়েছে! তোমার ছোট ছেলের বিয়ে দাও, নাতি হোক—তার ভাতের ঘটা পৈতের ঘটা—

মা রাগ করে বললেন, হাঁ তোর যত কথা! অতদিন বাঁচব কিনা তার ঠিক নেই।

ওমা—বাঁচবে না কেন! লোকে বলে নাতির নাতি দেখে স্বর্গে বাতি জ্বালাচ্ছে আর তোমার তো সবে কলির সন্ধ্যে।

মায়ের মুখ ভারি হয়ে উঠছে দেখে খপ করে ওর একখানা হাত চেপে ধরে অনুনয় কোমল কণ্ঠে বললে—মনু, বাধা দিয়ো না মা। জন্মে অবধি সংসারের বাইরে পা দিইনি—দুনিয়ার ভালমন্দ কিছুই জানিনে—খাঁচা হাঁপ ধরে গেছে মা। একটু হাঁপ ছেড়ে আসিগে। যাগো—আবার কইটা একবার বোস। বলতে বলতে ওর দু'চোখ জলে ভরে উঠল।

মা সেই দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এ যেন অন্য মনু। আজন্মের পরিচয়টা ওর না কণ্ঠস্বরে না মুখের রেখায়—না পা হাত মাথা নাড়ার ভঙ্গীতে—কোথায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে!

মা বাধা দিলেন না।

ব্রজধামে রাধাবাগের নির্জন তরুছায়া তলে, কখনো বা ছোট্ট একটি কুটীর দাওয়ায় বসে গোপীযন্ত্র বাজিয়ে এক কৌপীনধারী বৈরাগী সর্বক্ষণই কৃষ্ণ গুণগান করেন। বৈরাগীর সর্বদাই হাসিমুখ।

যাত্রীরা পথ দিয়ে যেতে যেতে বলে, ওই দেখ বিশাখা সখী। কখন নায়—কখন খায়—কখনই বা ঘুমোয়—আবার কোন সময়ে ভজন-পূজন করে কেউ জানে না। হাতে একতারা, মুখে সর্বক্ষণ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলেও শোনা যায় একতারা বাজছে। যন্ত্রের তারে আর কণ্ঠের স্বরে মিশিয়ে অবিরাম ধ্বনি উঠছে—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ।

কেউ শুধোয় হয়তো, রাত্তিরে আপনি ঘুমোন না বাবাজী?

বৈরাগী হেসে ফেলেন। বাপরে, তাকি পারি! সারা রাত ধরে জাগবেন আমার প্রাণকৃষ্ণ রাধারাণীকে নিয়ে, আমি ঘুমোব? বাপরে—তা কি পারি!

আপনার কষ্ট হয় না?

কষ্ট! না—না—কিছু না—কিছু না। এ আনন্দের কি তুলনা আছে গো! নাগর ফুলের দোলায় দুলছেন—সেজ বাতি জ্বলছে, রাধারাণী ব্রজনন্দনের অর্ধ অঙ্গে অর্ধ অঙ্গ মেশিয়ে আনন্দে ভরপুর। দুলছে শিখিচূড়া—পীতধড়া—কানের কুণ্ডল নাকের বেশর—নীল শাড়ী—পায়ের নূপুর বাজছে তালে তালে—ওগো আনন্দের সুধা ধারায় সারারাত যে উথল পাথাল—ঘুম কখনো আসে চোখে! গোপীরা কি ঘুমোতেন এমন রাতে?

আপনি তো গোপী নন—পুরুষ মানুষ।

ছি ছি ছি—কি বলছ গো। দু'হাতে দু'টি কান চেপে ধরে বাবাজী শিউরে ওঠেন। খানিক পরে হো হো করে হেসে বললেন, বৃন্দাবনে বসে পুরুষালি! কি গো বাবা, রাজরাণী মীরার কথা মনে নেই—এই ব্রজধামে একজনই মাত্র পুরুষ আছেন—ওই ব্রজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। আর সবাই প্রকৃত মেয়ের দল।

কথা শেষে একতারাটার ঝঙ্কার দিয়ে সুর তোলেন, কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—

———

শেষ রাত্রির গান

শ্রীমতী কুমার সংযুক্তা

তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হল এই হাসপাতালে।

ইতিপূর্বে তাঁর নাম শুনেছি। প্রখ্যাত অধ্যাপক উমেশ ঘোষালের নাম বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজে কেই বা শোনেনি? বিস্মিত হয়েছিলাম নিশ্চয়। তাঁর মতো খ্যাতিমান ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম দর্শন হবে হাসপাতালে এ আমি ভাবতেই পারিনি।

পরিচয় করিয়ে দিলেন রাণী পিসিমা।

রাণী পিসিমা আমার নিজের পিসিমা নয়। দূরসম্পর্কীয়া পিসিমাও নন। তাঁর সঙ্গে, বলতে গেলে, আমার কোনো সম্পর্কই নেই। অথচ প্রায় নিজের পিসিমার মতোই।

আমার কাকা যে রাজ-এস্টেটে কাজ করতেন সেইখানকার ম্যানেজার ছিলেন রাণী পিসিমার দাদা। তিনি আমার কাকাকে ছেলের মতো স্নেহ করতেন। ওদের বাড়িতে কাকা প্রায় বাড়ির ছেলের মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

স্কুলের ছুটির সময় আমি প্রায়ই বেড়াতে যেতাম কাকার কাছে। পাশেই ম্যানেজারের বাংলো। আমাদের খেলবার স্থান ছিল ওঁদের বাগান।

সেই সূত্রে রাণী পিসিমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। তিনি কাকাকে দাদা বলতেন। সুতরাং আমিও তাঁকে পিসিমা বলতাম। কর্মসূত্রে যদিও আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, কিন্তু ঘনিষ্ঠতার সূত্রটা একেবারে ছিঁড়ে যায়নি। পত্রালাপ এবং মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎটা অব্যাহত ছিল।

এই অবস্থায় রাণী পিসিমার দাদার কাছ থেকে একখানা জরুরী তার পেলাম। তিনি বিহার সরকারের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর শেষ কর্মস্থল রাঁচিতে বাড়ি করে সেখানেই সপরিবারে বাস করছেন।

তারে জানিয়েছেন: গুরুতর অসুস্থ হয়ে রাণী হাসপাতালে গেছে। তার সঙ্গে শীঘ্র দেখা কর। সে একান্ত অসহায়।

বেড নম্বর খোঁজ করে যখন গিয়ে পৌঁছলাম, দেখি আর একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর শিয়রের কাছে বসে তাঁকে সযত্নে কমলালেবু খাওয়াচ্ছেন।

আপাদমস্তক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম।

মাথায় বিশৃঙ্খল বড় বড় চুল। তার বারো আনা পাকা। মুখে সেই রকমের কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি। গায়ে ভদরের গলাবন্ধ কোট। তার উপর চাদর। পরনে খান ধুতি। পায়ে ফিতেবন্ধ কালো জুতা। বার্ণিশের অভাবে বিবর্ণ। চোখে পুরু চশমা। হাতের মোটা লাঠিটা চেয়ারের গায়ে ঠেস দেওয়া।

একেবারে মনোযোগ আকর্ষণ করার চেহারা নয়। কিন্তু আর একটুক্ষণ চেয়ে থাকলে দুটি জিনিস আকর্ষণ করে: একটি মুখের শিশুসুলভ সরল, প্রসন্ন, উদার হাসি, অপরটি গুরুভারার মতো ছলছল করুণ চোখ।

রাণী পিসিমা আমাকে দেখে প্রসন্ন হাসো জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি করে খবর পেলে।

টেলিগ্রামের কথা বললাম।

হেসে বললেন, দাদা একটুতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

উমেশও হাসলেন : ওটা তোমাদের বংশের ধারা। তুমিও কম ব্যস্ত হও না।

—আমি! কখখনও না।

রাণী পিসির চোখে কলহ ঘনিয়ে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ বোধ হয় কোনো পুরোনো কথা মনে পড়ায় হেসে ফেললেন : ও, সেই কথাটা তুমি ভোলনি এখনও!

গম্ভীরভাবে উমেশবাবু বললেন, আমি কোনো কথাই সহজে ভুলি না। পাঁচ বছর বয়সের কথা পর্যন্ত মনে আছে।

—অমন স্মরণশক্তি ভালো নয়।

মনে হল রাণী পিসির এই কথার মধ্যেও কোন ইঙ্গিত যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

উমেশবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, তাও জানি। যখন পড়াশুনো করতাম, মনে হত ভগবানের এ কী আশীর্বাদ! যা পড়ি তা আর ভুলি না। এখন বুড়ো বয়সে মনে হয়, আশীর্বাদটা ঠিক অবিমিশ্র নয়। বাঁচতে গেলে কিছু কিছু ভুলতে পারাও দরকার।

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

তুচ্ছ কথা। তারপরে দীর্ঘশ্বাস। ব্যাপারটা গুরুতর কিছুই নয়। কিন্তু দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে কি যেন ছিল, আমার তারি কষ্ট বোধ হল। ভদ্রলোকের মুখখানাই দেখতে কি রকম করুণ এবং অসহায়।

উঠবার সময় রাণী পিসিকে বললাম, আমার ওপর রোজ এখানে আসার হুকুম; কিন্তু রোজ আসার কি দরকার হবে?

রাণী পিসি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ হাসে বললেন, নিশ্চয় হবে। নইলে থাকব কি করে?

আচ্ছা, বলে সেদিনের মতো চলে এলাম।

পরদিন গেলাম, এবং তার পরদিনও।

প্রতিদিনই দেখি আমার আগেই উমেশবাবু এসে বসে আছেন। সেই বিশৃঙ্খল কেশ ও শ্মশ্রুগুচ্ছ, সেই গলাবন্ধ কোট এবং মোটা দাড়িটা চেয়ারে ঠেস দেওয়া। প্রতিদিনই দেখি নিঃশব্দে নিজের হাতে রাণী পিসিকে কিছু-না-কিছু খাওয়াচ্ছেন।

বসবার জায়গার কোনো পরিবর্তন নেই। মুখভাবেরও কোনো বৈলক্ষণ নেই। আমি যাওয়ার আগে তাঁদের মধ্যে যে কোনো আলাপ-আলোচনা চলছিল তাও মনে হয় না। বরং মনে হয় আলাপ-আলোচনা আমি পৌঁছুবার পরেই যেন জমে।

—এত দেরি হল যে?

একদিন রাণী পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন। তার পরদিন উমেশবাবু।

তার মানে এ নয় যে, তিনদিনেই উমেশবাবুর সঙ্গে আমার জমে গেছে। উমেশবাবু এমন একজন অন্যভাবী বেচারা লোক যে, তাঁর সঙ্গে, তিন দিনে কেন তিন মাসেও, জমে যেতে পারে বিশ্বাস করা কঠিন।

মনে হয়, কারও কাছে তাঁর কিছু চাইবার নেই, কাকেও কিছু দেবারও নেই। তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক যেন দুই চলতি পথিকের মধ্যে মুহূর্তের জন্যে ইঙ্গিত বিনিময় এবং যে যার পথে চলে যাওয়া।

কাঁটা নয়, একটা সূচাগ্র কাঠি-দিয়ে উমেশবাবু আপেলের ছোট ছোট টুকরো খাওয়াচ্ছিলেন রাণী পিসিকে।

বোধ হয় লজ্জা হল রাণী পিসির। বললেন, থাক। রেখে দাও। একটু পরে খাব আবার।

কিন্তু উমেশবাবু সে কথা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না। আপেলের আর একটি টুকরো শলাকাবিদ্ধ করে রাণী পিসির সামনে ধরলেন। তারপরে আর একটি টুকরো। আর একটি। যতক্ষণ না সমস্ত টুকরোগুলো নিঃশেষ হয়।

তারপরে পকেট থেকে রুমাল বের করে তাঁর ঠোঁট মুছিয়ে দিলেন, যেমন আগের দু'দিন দিয়েছিলেন।

—এঁরা বলছেন অপারেশন করতে হবে।—রাণী পিসি এতক্ষণে কথা বলবার ফুরসুত পেলেন।

উমেশবাবু চমকে উঠলেন: অপারেশন!

—তাই তো আজ সকালে ডাক্তার বললেন। জিগেস করলেন আমার আপত্তি আছে কি না।

—নিশ্চয় আছে।

রাণী পিসির হয়ে উমেশবাবুই যেন সেই অদৃশ্য ডাক্তারকে জবাব দিয়ে দিলেন।

রাণী পিসির ঠোঁটে ম্লান হাসি: তা নইলে সারবে না বলছে যে? ভুগব কতদিন?

—ভুগবে কেন? আমি যখন মনে করি আমি আর কিছুতেই ভুগব না, তখনই সেরে যাই। ডাক্তারও ডাকতে হয় না, কিছুই না।

—তোমার মতো মনের জোর তো সকলের নেই।

—কেন নেই? সকলেরই আছে। শুধু জোর করতে চায় না। তারা ভুগতে ভালোবাসে।

রাণী পিসি হেসে বললেন, ভুগতে আর কে ভালোবাসে বল?

—অনেকে। অনেকে। একটু মাথা ধরেছে, কি একটু সর্দি হয়েছে, অমনি পরিবারের সবাইকে বিছানার চারদিকে জড় করতেন। তখনই ডাক্তার আসতেন, ওষুধ দিতেন। একশোর উপর জ্বর হলে তো নার্স আসত রাত্রি জাগবার জন্যে। একদিন জিগ্যেস করলাম, এত সামান্য ব্যাপারে তুমি ডাক্তারই বা ডাক কেন, নার্সই বা রাখ কেন? বললে, ভালো লাগে।

আমরা হেসে উঠলাম।

আমি বললাম, বোধ হয় ভয়ে অমন করেন।

—না হে! মোটেই ভয়ে নয়। এই সূত্রে বাড়িতে একটু সমারোহ হোক এইটে ভালো লাগে। আমি তোমাকে বলছি রাণী, অপারেশনে তুমি রাজী হয়ো না।

রাণী পিসিমা বললেন, বেহাইকে লিখেছি। দেখি তিনি কি বলেন।

উমেশবাবু চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন: সর্বনাশ করো! তুমি অতুলের পরামর্শ চেয়েছ! সে তো আর একটি 'লাইসেন্সড্ মার্ডারার!'

অতুলবাবু, রাণী পিসিমার মেজদা, জলপাইগুড়ির সিভিল সার্জেন। উমেশবাবুর সহপাঠী ও বন্ধু। সেই সূত্রেই তাঁর এই পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

রাণী পিসি হেসে বললেন, সে তোমাদের বেলায়। আমাকে তো আর তিনি খুন করতে চাইবেন না।

জোরের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে উমেশবাবু বললেন, চাইবেন। আমি বলছি চাইবেন। ডাক্তারের কাছে এ বিষয়ে আশ্চর্যের কোন নেই। এ আমার ঠেকে শেখা অভিজ্ঞতা।

অমন যে নিরীহ ভালো মানুষ উমেশবাবু, অপারেশনের নামে তিনি আশ্চর্য রকম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

এই উত্তেজনার সঙ্গে রাণী পিসিকে পরিচিত মনে হল। তিনি তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। উমেশবাবু একটু ভুলে যান, কিন্তু তারপরেই আবার অপারেশনের কথা তোলেন এবং উত্তেজিতভাবে রাণী পিসিকে অপারেশনে সম্মত হতে নিষেধ করেন।

উমেশবাবুকে শান্ত করবার জন্যে রাণী পিসিকে শেষ পর্যন্ত কথা দিতে হল তিনি অপারেশনে রাজী হবেন না।

রাণী পিসি চুপি চুপি এক সময় আমাকে বলেছিলেন, উমেশবাবুর রাগটা শুধু অপারেশনের উপরই নয়, সমগ্রভাবে ডাক্তার সম্প্রদায়ের উপরই।

উমেশবাবু এবং রাণী পিসির পূর্বেতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে কারণটা অনুমান করা আমার পক্ষে খুব শক্ত হল না।

দুজনেরই বয়স যখন অল্প, বহুকাল আগের কথা, উমেশবাবু রাণী পিসিকে ভালো বাসতেন। রাণী পিসির বাড়ির লোকের কাছেই শুনেছি, ওঁদের বিবাহ নাকি প্রায় স্থির হয়ে গিয়েছিল। উমেশবাবু তখন কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. পাস করে কলিকাতার কোনো কলেজে অধ্যাপনা করেন।

ইতিমধ্যে আর একটি পাত্রের আবির্ভাব হল। সাক্ষাৎভাবে নয়, ঘটক মারফত।

তখন অধ্যাপকদের বেতন বেশি ছিল না। অন্যদিকে ডাক্তারদের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল ছিল। সর্বোপরি রাণী পিসির বাবা জীবিত। তিনি তখনও রাজ-এস্টেটে ম্যানেজারী করেন। তাঁর কাছে রূপার মূল্যই সবচেয়ে বেশি ছিল।

পাত্র হিসাবে ডাক্তারের শ্রেষ্ঠত্ব রাণী পিসির মা ও দাদারা অস্বীকার করেননি; কিন্তু উমেশবাবু ও রাণী পিসির মধ্যেকার হৃদয়ের সম্পর্ক তাঁরা উপেক্ষা করতে পারেননি। মনে হয়েছিল, প্রস্তাবিত বিবাহ রাণীর পক্ষে সুখের হবে না। সেজন্যে বাধা দিয়েছিলেন।

রাণী পিসির বাবা লোক খারাপ ছিলেন না। কিন্তু রাজ-এস্টেটের রাজকীয় জের ছিল প্রবল। বিবাহের ক্ষেত্রে পূর্বরাগের প্রাধান্যও স্বীকার করতেন না।

বলতেন, ওসব কিছু নয়। বাজে। পারিবারিক শান্তির মূল হল অর্থ। যেখানে অর্থ নেই, সেখানে সুখ-শান্তি নেই। দারিদ্র্য ভালোবাসার অন্তরায়।

তখনও বাপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস কন্যাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি। রাণী পিসি হয়তো কেঁদেছিলেন, কিন্তু গোপনে, সকলের দৃষ্টির অন্তরালে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে পিতার মনোমত পাত্রের কণ্ঠেই বরমাল্য অর্পণ করেছিলেন।

ওঁদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়েছিল কিনা জানা নেই। রাণী পিসির মতো শান্ত, নিরীহ ও বুদ্ধিমতী মেয়ে নিশ্চয়ই যথাসাধ্য মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু পিতার উক্তির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করার মতো সময় তিনি পাননি। বিবাহের বছর তিনেকের মধ্যে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে এলেন।

তাঁর চোখে জল ছিল না। দৃষ্টি শান্ত।

একদিন বাবার কাছে এসে বললেন, আমি পড়াশুনা করতে চাই, তার ব্যবস্থা করে দাও।

ম্যানেজারবাবুর স্নেহ একেবারে নরম হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর উপর কারও অধিকার নেই। তবু কন্যার কাছে নিজেদের সকল সময় তিনি অপরাধী বোধ করতে লাগলেন। যেন কন্যার অকাল-বৈধব্যের জন্যে তিনি দায়ী।

অবসর নেবার বয়স তখনও হয়নি; কিন্তু কাজে মন বসছিল না। অবসর নিলেন। কাজের থেকেও, সংসারের থেকেও। দিনরাত্রি পূজার্চনা এবং শাস্ত্রপাঠে ডুব দিলেন।

নিমজ্জমান ব্যক্তি সামনে ভাসমান কাঠের টুকরো পেলে যেমন সাগ্রহে সেটাকে আঁকড়ে ধরে, কন্যার প্রস্তাব তেমনি আগ্রহভরে তিনি আঁকড়ে ধরলেন।

বললেন, বেশ তো মা। আবারও কাজ নেই। আমিই তোকে পড়াব।

বেথুন স্কুলে কিছুদূর রাণী পিসি পড়েছিলেন। সেই পুরোনো বইগুলির ধুলো ঝেড়ে তিনি বাবার কাছে পড়তে লাগলেন।

অল্প কয়েক বৎসর পরেই যখন মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলেন, তখন ম্যানেজারবাবু চিন্তিত হলেন। নিজের মনেই কি যেন ভাবলেন।

বললেন, এইবার তো মুশকিল করলি বুড়ি। কলেজের পড়া কি আমি পড়াতে পারব? বলছিলাম কি—

এদিক-ওদিক চেয়ে, বার কয়েক ঢোঁক গিলে ম্যানেজারবাবু বললেন, উমেশকে খবর দিলে কেমন হয়?

—কেন?

—তোকে পড়াত।

—না। তুমি যা পড়াবে তাতেই আমার হবে।

রাণী পিসির কথার মধ্যে কোনো জড়তা ছিল না। বললেন, বরং আমাকে কলেজে ভর্তি করে দাও। অল্প বয়সের মেয়েদের সঙ্গে পড়তে হবে, তা কি হয়েছে? পড়ার আবার বয়স আছে না কি?

তাই হল। রাণী পিসিকে কলেজেই ভর্তি করে দেওয়া হল। দ্বিতলপ্রকোষ্ঠে শ্বেতবসনা রাণী পিসির দিকে সহপাঠিনীরা অনেক সময় ব্যথিত বিস্ময়ে চেয়ে থাকত।

কিন্তু রাণী পিসি তা গ্রাহ্যই করতেন না।

ম্যানেজারবাবু তখন অনেক নরম হয়ে গেছেন। একদিন গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, উমেশের কোনো খবর রাখো?

—কে উমেশ?

—আমাদের উমেশ গো। অতুলের বন্ধু।

—সে তো পাগল হয়ে গেছে শুনিছি। এটি তোমার কীর্তি।

ম্যানেজারবাবু লজ্জা পেলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, পাগল হয়ে গিয়েছিল। এখন ভালো আছে। আবার অধ্যাপনা করছে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। কাল রাস্তায় দেখা হয়েছিল। তাকে বলেছি, মাঝে মাঝে এবাড়ি আসতে।

গৃহিণীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল : বেশ করেছ।

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ম্যানেজারবাবু যেন ভরসা পেলেন। বললেন, ভাবছি, যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু ভুল কি সংশোধন করা যায় না ?

—কি ভুল ?

—রাণীর বিয়ের ভুল গো।

—কি করে সংশোধন করবে ?

—ওদের দুজনে বিয়ে দিয়ে। যায় না ?

সংস্কার বড় প্রবল। গৃহিণী খুব উৎসাহিত হলেন বলে মনে হল না। কিন্তু বাধাও দিলেন না।

বললেন, দেখ মেয়েকে বলে।

আমি শুনেছি রাণী পিসিকে বলা হয়েছিল। উমেশবাবুর সম্মতি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু রাণী পিসি কিছুতে রাজী হননি।

এমন কি উমেশবাবু নিয়মিতভাবে আসা-যাওয়া সুরু করেছিলেন। এই প্রস্তাব উঠতে রাণী পিসি তাঁর সামনে বেরুন বন্ধ করে দেন। হতাশভাবে উমেশবাবু বিদায় নেন।

তারপরে হাসপাতালে এই দুজনের নতুন সাক্ষাৎ কি না জানি না ! দুটি প্রাণীই এমন আশ্চর্য এবং অদ্ভুত যে মুখ দেখে কি কথাবার্তা হয় কিছুই বোঝবার উপায় নেই।

এই সময় দিন পাঁচেক কাজের চাপে হাসপাতালে যেতে পারিনি। অতুলবাবু অপারেশনের পক্ষেই মত দিয়েছিলেন। রাণী পিসিরও যে বিশেষ আপত্তি ছিল মনে হয়নি ; কিন্তু উমেশবাবুর ঘোরতর আপত্তি। এই পর্যন্ত দেখে এসেছিলাম।

আমাকেও রাণী পিসি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বলেছিলাম, এ বিষয়ে আমি কিছু বুঝি না। তবে অতুলবাবু নিজে সার্জেন। তিনি যখন মত দিয়েছেন তখন ভয়ের কি আছে ?

মনে হয়েছিল, অপারেশন হবে।

পাঁচদিন পরে ভাবতে ভাবতেই হাসপাতাল গেলাম, অপারেশন হয়ে গেছে কি না। রাণী পিসিমাই বা কেমন আছেন।

গিয়ে দেখি সে বিছানায় অন্য রোগী।

কি ব্যাপার ? রাণী পিসি কোথায় গেলেন ?

একটি নার্সকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, উনি কাল চলে গেছেন।

—অপারেশন হয়ে গেছে ?

—না।

বেশি কথা বলবার সময় নার্সের নাই। ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফিরলাম : হয়তো অপারেশন করতে রাজী না হওয়ায় হাসপাতাল রাণী পিসিকে ছেড়ে দিয়েছে। তিনি উমেশবাবুর সঙ্গে বাড়ি ফিরেছেন।

তাঁর বাড়ি গিয়ে খবরটা নেওয়া নিশ্চয়ই উচিত ছিল। সে ইচ্ছা যে মনে জাগেনি তাও নয়।

কিন্তু কিছুটা কাজের চাপ, কিছুটা আলস্য। বাড়ি গিয়ে তাঁর খবর নেবার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। সেখানে তাঁকে দেখা-শোনা বা শুশ্রূষা করার লোকেরও অভাব ছিল না।

মাসখানেক পরে ওই রাস্তার কাছাকাছি যাবার দরকার পড়েছিল। ভাবলাম রাণী পিসির খবরটা নিয়ে গেলে হয়।

গিয়ে দেখি, নিচের বসবার ঘরে রাণী পিসি উমেশবাবুর সঙ্গে গল্প করছেন।

আমাকে দেখে রাণী পিসি চমকে উঠলেন। মুখে যেন এক ঝলক রক্ত ছুটে এল।

বললেন, দুষ্টু ছেলে! এতদিন পরে খবর নেবার সময় হল?

আমার কথাটা বললাম। ত্রুটি যে হয়েছে তার জন্যে মার্জনাও চাইলাম।

খুব মনোযোগের সঙ্গে যে রাণীপিসি আমার কথা শুনছিলেন তা মনে হল না। তেমন উসখুস করছিলেন। আমার কথা সমস্তটা শোনবার আগেই বললেন, বোস। তোমার চা নিয়ে আসি।

বলেই বেরিয়ে গেলেন।

উমেশবাবু কিন্তু গভীর মনোযোগের সঙ্গে সব কথা বললেন। সমস্ত বিষয়েই তাঁর উৎসাহ। বললেন, অপারেশন আমি কিছুতেই করতে দিলাম না। হাসপাতালের ডাক্তারেরা রেগে গেলেন। বললেন, তাহলে আর এখানে করবার কিছু নেই। আপনি রোগিণীকে নিয়ে যেতে পারেন। আমি তৎক্ষণাৎ গাড়ি ডেকে নিয়ে চলে এলাম।

—কেমন আছেন?

—ভালোই। হোমিওপ্যাথী চলছে।

উমেশবাবু হাসতে লাগলেন।

চাকরে চা দিয়ে গেল। খেতে খেতে অনেক গল্প হল, অনেকক্ষণ; কিন্তু রাণী পিসির দেখা নেই। বোধহয় সাংসারিক কাজে ব্যস্ত আছেন ভেবে উঠলাম।

নমস্কার করে উমেশবাবুকে বললাম, আচ্ছা, আমাকে এইবার উঠতে হবে। রাণী পিসিকে বলবেন।

উমেশবাবুও উঠতে উঠতে বললেন, উঠবে? মাঝে মাঝে এস কিন্তু। একেবারে ডুব দিও না।

—আসব।

দরজার কাছে এসে ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমার সন্ধানে বাড়ি আছে?

—বাড়ি!

—হ্যাঁ। কিংবা দু'খানা ঘরের একটা ফ্ল্যাট?

বিস্ময়কর প্রশ্ন!

জিজ্ঞাসা করলাম, যে বাড়িতে আছেন সেখানে অসুবিধা হচ্ছে কি?

উমেশবাবু হেসে উঠলেন: যে বাড়ি মানে তো এই বাড়ি। আমারটা তো ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু এঁরা পুজোয় আসছেন। তখন তো এবাড়ি আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। বুঝলে না?

বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম:

উমেশবাবুর গায়ে একটি হাফ-পাঞ্জাবি। পায়ে চটি। কাঁধের উড়ানি এবং হাতের মোটা লাঠি অনুপস্থিত। পোশাকটা বেড়াতে আসবার মতো নয়। আর রাণী পিসির···

বৈধব্যের পর বরাবর তাঁকে থান পরতে দেখেছি। মনে হচ্ছে, একটু আগে যে শাড়িটা তিনি পরেছিলেন সেটি লাল পাড়। গায়ের ব্লাউসটিও ছিটের। মনে হল, ছুটে গিয়ে দেখে আসি, কাঁচা-পাকা চুলে সিঁদুর কেমন মানিয়েছে।

কিন্তু সবচেয়ে যেটা লক্ষ্য করবার,—এবং লক্ষ্য যে করিনি তা নয়, কিন্তু তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিনি,—সেটা হচ্ছে, উমেশবাবুর দাড়ি-গোঁফ মসৃণভাবে ক্ষৌরীকৃত!

কেবল বুঝতে পারলাম না, কি করে এটা হল এবং এই বয়সে এর কী-ই বা প্রয়োজন ছিল?

———

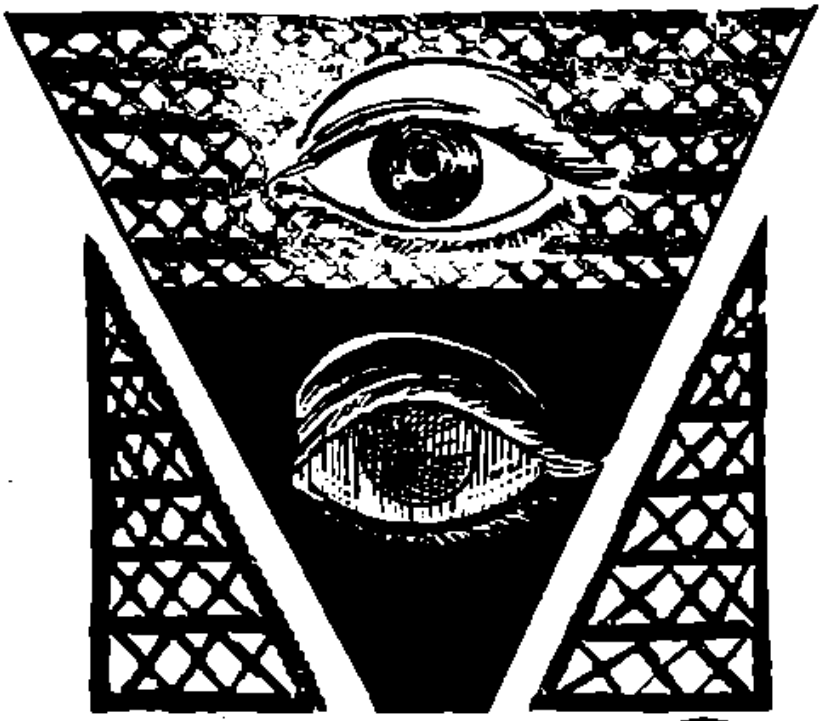

চোখের বাহিরে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

॥ উপন্যাস ॥

নতুন
জীবনের
নতুন
প্রয়োজন

পূরণ করতে নবজাতকের
জননীকে পুষ্টিকর
টনিকের ওপর নির্ভর
করতে হয়।
সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ
ভাইনো-মল্ট
ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায়
সাহায্য করে
এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি
ফিরিয়ে আনে।

ভাইনো-মল্ট

বেঙ্গল
ইমিউনিটি
কোং, লিঃ

চোখের বাহিরে

এক ॥

"সুদর্শনা। এই অন্ধকারে তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ ?

নেপথ্যে। হাঁ পাচ্ছি।

সুদর্শনা। কি রকম দেখছ ?

নেপথ্যে। আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার মধ্যে মেহ নিয়েছে যুগ-যুগান্তরের ধ্যান, লোক-লোকান্তরের আলোক, বহুশত শরৎ বসন্তের ফুলফল। তুমি বহু পুরাতনের নূতন রূপ।

সুদর্শনা। বলো বলো এমনি করে বলো। মনে হচ্ছে যেন অনাদিকালের গান জন্ম-জন্মান্তর থেকে শুনে আসছি। কিন্তু প্রভু, এ যে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার, এ যে আমার উপর চেপে আছে ঘুমের মতো, মূর্ছার মতো, মৃত্যুর মতো। এ জায়গায় তোমাতে আমাতে মিলন হবে কেমন করে ? না, না, হবে না, মিলন হবে না। এখানে নয়, চোখের দেখার জগতেই তোমাকে দেখব—সেইখানেই যে আমি আছি—"

এইখানেই টুনটুন পড়তে পড়তে থামল। বললে, পড়াটা ঠিক হচ্ছে তো সোনাদা ?

আমি বললুম, নিশ্চয়। ঠিক সুদর্শনার গলা শুনতে পাচ্ছিলুম আমি।

টুনটুনের মুখ আমি দেখতে পেলুম না, তবু ঠিক বুঝতে পারলুম ওর গালে লজ্জার রঙ লাগল একটুখানি। টুনটুন বললে, যাও,—ঠাট্টা করতে হবে না।

ঠাট্টা কেন ? সত্যি—চমৎকার হবে তোর সুদর্শনা।

টুনটুন চুপ করে রইল। ওকে দেখতে পাচ্ছি না—ওকে কোনোদিন আমি দেখিনি। 'অরূপ-রতনের' রাজার মতো সেই চোখ আমার নেই। শরৎ বসন্তের পূর্ণতা ওর ভেতরে ফুলে-ফলে কতখানি যে ভরে উঠেছে, তা-ও জানবার উপায় নেই আমার। তবু কি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। জানলা দিয়ে ভিজে ভিজে হাওয়া আসছে, অল্প অল্প উড়ছে ওর কপালের কুরো চুল, মাথাটি নামিয়ে তাকিয়ে আছে বইয়ের পাতার দিকে। হয়তো সুদর্শনার কথাই ভাবছে।

আবার শুনতে পেলুম টুনটুনের গলা। একটু বিষণ্ণ, একটু অভিমানে আচ্ছন্ন।

—কিন্তু জানো সোনাদা, এখন ওরা আপত্তি করছে।

—ওরা কারা ?

—কলেজের মেয়েরা।

—কেন, কী বলছে ওরা ?

—বলছে ভারী শক্ত—কিছু বোঝা যায় না। নাটকটা ওরা বদলে নেবে।

শক্তই তো। আমিও এবারে চুপ করলুম। চোখ দিয়ে যারা দেখে, চেনে, জানে—চোখ না দিয়ে দেখার রহস্য কি তারা বুঝতে পারে কোনোদিন ? কখনো তারা অনুভব করে সেই আলোকে—

সূর্য যাকে প্রকাশ করতে পারে না? দেখতে পায় সেই রঙ—যাকে দেখা পায় না কখনো? সবাই তো রবীন্দ্রনাথের সুদর্শনা নয়—অন্ধকারের রাজাকে সবাই তো খুঁজতে জানে না।

টুনটুন বললে, আচ্ছা সোনাদা?

—কি রে?

—ওরা বলছিল, 'কাল্পনী' করবে। কিন্তু তাতেও তো একই কথা। সবাইকে পথ দেখিয়ে যে নিয়ে যায় সে অন্ধ বাউল। কেউ যখন কোনো নিশানা খুঁজে পায় না—তখন বাউলই তাদের পথ দেখাতে দেখাতে আগে আগে চলে। একই তো কথা—তাই না? যার চোখ নেই—সত্য তার কাছে সব চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়—এই কথাই তো কবি বলেছেন।

কী জবাব দেব ভেবে পাচ্ছিলুম না। আর এই আলোচনাই বা এমন করে কেন তুলছে টুনটুন! আমাকে সান্ত্বনা দিতে চায়? বলতে চায়, আমি হারিয়ে যাইনি, মিথ্যে হয়ে যাইনি? সকলের চাইতে বড়ো সত্যের প্রকাশটা আমারি জন্যে অপেক্ষা করে আছে? হয়তো তাই। আমাকে ভোলাতে চায়—সান্ত্বনা দিতে চায়। ও আমার ছোটো বোন হলে কী হয়—মায়ের মতো ওর মন। আমার কখনো কখনো ইচ্ছে করে ওকে ছোট মা বলে ডাকতে।

কাকিমার ডাক ভেসে এল: টুনটুন—টুনটুন—

—যাচ্ছি মা—টুনটুন সাড়া দিলে। বললে, আমি যাই সোনাদা, কার্স্ট পিরিয়ডে ক্লাস আছে। ইস্, রোদ পড়ছে যে তোমার গায়ে। জানালাটা বন্ধ করে দিই।

জানালা বন্ধ করার আওয়াজ পেলুম। একটা মৃদু উত্তাপ এতক্ষণ শরীরের ওপর খেলে বেড়াচ্ছিল, খানিক শীতল ছায়ার প্রলেপ পড়ল তার বদলে।

টুনটুন বেরিয়ে গেল।

আমি এখন একা। নিজেকে নিয়ে, নিজে মনটা নিয়ে, আমার সে শরীরটাকে আমি দেখতে পাই না, তাকে নিয়ে। আমার চারদিক ঘিরে ঘিরে যে আলো ঘুরছিল—যে আকাশটা তাকিয়েছিল মুখের দিকে, সব মিলিয়ে গেল। এখন আবার নিঃসঙ্গ মনোমন্থনের পালা।

আকাশ! কতদিন আমি আকাশ দেখিনি।

অথচ যে আকাশ প্রথম আলোর ছোঁয়ায় পদ্মের মতো পাপড়ি মেলে দিত, যে আকাশে তারা উঠত, রামধনু দেখা দিত—তাকে আমি এখনো ভুলিনি! আজও তার কথা আমার মনে পড়ে।

কতদিন?

চোখ থাকলে হিসেব করতে হত, আঙুলে গুনে গুনে ঠিক করে নিতে হত সময়। কিন্তু আমার সব হিসেব—আমার অনন্তকাল একটা গণ্ডির মধ্যে থেকে গেছে আর আমায় হিসেব করতে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাই।

অনেকদিন হয়ে গেছে, ষোলো বছর। তবুও মনে পড়ে পশ্চিমদিক থেকে গাছগুলোর মাথার ওপর দিয়ে কালো মেঘেরা উঠে আসত দলে দলে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ছায়া। আর সেই মেঘের বুকের ভেতর দিয়ে হাওয়ার ভেসে চলা ঝড়-বৃষ্টির এক ঝাঁক চিঠির মতো পাগল পাগল বক

উড়ে যেত দলে দলে। তখন ঝিনুনি দুলিয়ে দুলিয়ে, দিদি—আমার চাইতে দু'বছরের বড়ো—গান গেয়ে উঠত :

মেঘের কোলে রোদ হাসে চলে বকের পাঁতি,
ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় যে ওরা গাঁথি গাঁথি—'

দিদি তখন গান শিখত। বাবাই শেখাতেন ওকে।

'যায়রে চলে বকের পাঁতি—'

ওই বকের দল কোথা থেকে আসে, কোনখানেই বা যায়, তা জানতুম না। দিনের আলো শেষ হয়ে গেলে—সারাটা রাত ভরে কোন মনোহরণ রাত্রির মায়ায় ওরা অলক্ষ্যের দিকে ছুটে চলত, তা-ও কি বোঝবার বয়েস ছিল আমার? গানের শেষ অংশটার কথা কোনোদিন ভাবিনি, বুঝতেও পারিনি। কিন্তু বকেরা সারাটা দিন কোথায় যে কাটাত—সে আমি দেখেছি।

আমাদের লাল রঙের দোতালা বাড়ীটার ছাতে উঠে দাঁড়ালে, একটা পুকুর, আমের বন আর কয়েকটা ঘর বাড়ী পেরিয়ে দেখা যেত ধুধু করছে নদী, তার নাম গড়াই। দেখতে পেতুম কত রঙের কত পাল তোলা নৌকো চলেছে নদী দিয়ে। নদীর ওপারে কত দূর পর্যন্ত চলে গেছে বিরাট বালুচর। সেই চরে কত বনঝাউ দুলছে হাওয়ায় আর পুজোর দিনগুলো ঘনিয়ে এলে কত যে কাশ ফুটেছে কে জানে! দেখতুম খেয়া নৌকা এপার ওপার করছে; ঝাঁকে ঝাঁকে দুধ দই নিয়ে আসছে গোয়ালারা এপারের শহরের বাজারে, আসছে বোঝা কাঁধে মানুষ, ঝাঁকা করে তুষোর আনছে হাঁড়িকুড়ি। আবার বিকেল বেলা খালি ঝাঁক খালি ঝাঁকা নিয়ে তারা ওপারে ফিরে যাচ্ছে, চরের ভেতর দিয়ে ছোট ছোট পুতুলের মতো মানুষগুলো কোথায় যে বাউবন আর কাশের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে—তাই বা কে বলতে পারে।

আমি দেখতুম গড়াই নদীর খানিক কেনার মতো কিংবা হাওয়ায় উড়ে-আসা একরাশ কাশের মতো বকেরা বসে আছে সেই চরে—একেবারে জলের ধার ঘেঁষে। জলের কোথায় ওরা যে কিভাবে বসে থাকত সে-ও আমি জানি। মাথার ঝুঁটি খাড়া করে কখনো দু পায়ে, কখনো বা এক পা তুলে তারা দাঁড়িয়ে থাকত, লম্বা ঠোঁটের ছোঁ দিয়ে কখনো বা তুলে নিত রুপোর টুকরোর মতো এক-আধটা মাছ, কখনো ঘাড় বাঁকিয়ে কী যেন ভেবে পিঠের পালক খুঁটত, যে সব লোক চরত লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘুরে বেড়াত তাদের পিছে পিছে, আবার কখনো বা কাঁ-কাঁ করে ডাক তুলত। গড়াই নদী দিয়ে যে সব নৌকো যেত, তাদের হিন্দুস্থানী মাঝিরা কখনো বা হাঁক দিয়ে বলত: এ ভাই বগুলা, তানি মাছোয়া দৈবো হো?

কিন্তু আমি তো আকাশের কথা বলতে যাচ্ছিলুম। এর মধ্যে কোথা থেকে নদী এসে গেল। এতদিন পরে—অন্ধকারের একটানা স্রোতের ভেতর দিয়ে ষোলোটা বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর, কোনো কিছুকে আর আলাদা করে দেখতে পাই না আমি। আকাশ-পাখী-নদী-নৌকা-আখের বন—সব মিলে আমার হারিয়ে যাওয়া আলোর একটা রূপ মনের সামনে স্থির হয়ে রয়েছে। জিনিসটা কি রকম জানি। এই যে আমার বেতের ডেস্ক চেয়ারটা, তার সামনে একটা বড়ো গোল টেবিল রাখা আছে। এই টেবিলে যার জন্যে চা আসে, খাবার আসে, দুধের কাপ আসে, আসে টুকিটাকি এটা ওটা জিনিস আসে। আমি জানি, টেবিলটা সোল। হাত বুলিয়ে তার যেটুকু আমি পাই—আমার জলের ঘ্রাণ,

ছবের পেয়ালা কিংবা খাবারের প্লেটের ভাই-ই সীমানা। অর্থাৎ ওই সোল আরসাটুকুই একটা মোবের মতো আমার সমস্ত পৃথিবী, সেটাকে অনায়াসে এক সঙ্গে হাতের মধ্যে আমি পেতে পারি, আমার খিদে তেষ্টা মেটাবার সম্পূর্ণ আয়োজন সেখানেই রয়েছে। তার বাইরে সব ফাঁকা, সবই শূন্যতা।

ঠিক তেমনিভাবে ষোলো বছরের ওপারে যখন তাকাই—তখন এই অন্ধকারের দিনগুলোকে দূরবীক্ষণের একটা কালো নলের মতো মনে হয়; সেই নলটা পেরিয়ে চোখ একটা বৃত্তাকার কোকাশের ওপর পড়ে। আমার স্মৃতি সেই বৃত্ত। একটা লাল দোতলা বাড়ী, তার ছাত, আবার বাগান, টিনের ঘর কতগুলো, একটা কাঁচা মাটির পথ, মেঘের সাঁতার কাটা আকাশ, পড়াই নদী আর তার চর, বন ঝাউ, কাশের সারি, বকের দল, বাঁক কাঁধে নিয়ে চওড়া বুক গোয়ালাদের হনহন করতে করতে চলে যাওয়া, বহাজনী নৌকোর মাঝিরা ঝুঁকে পড়ে নদীর জলে তাদের পেতলের থালা ধুয়ে নিচ্ছে, তার ছবি। এই সোল টেবিলটার কোনো অংশকে যেমন আলাদা করে আমি ভাবতে পারি না, তেমনি ষোলো বছর পর্যন্ত লম্বা একটা কালো নলের দূরবীণ দিয়ে আলোর একটা বিশেষরূপ দেখতে পাই, তাতে মাটি জল আকাশ সব একসঙ্গে রয়েছে, কোনোটা থেকেই কাউকে আলাদা করে নেবার জো নেই।

একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে। কয়েকটা লাইন গুনগুনিয়ে যাচ্ছে মনে। ধরা দিচ্ছে, ধরা দিচ্ছে না। তবু চেষ্টা করে দেখি। সন্ধ্যাবেলা টুনটুনকে শোনাব।

ছন্দটা চেনা-চেনা ঠেকছে। এমনি কারো একটা কবিতা টুনটুন শুনিয়েছিল সেদিন। তা হোক কবিতার নিয়মই তো তাই। 'প্রদীপিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ।' এক প্রদীপ থেকেই আর এক প্রদীপ জ্বলে, আসে দীপাবলী।

ব্রেল-এর বইটা টেনে নিলুম।

যদি পাখু গগনে কভু
সন্ধ্যা তারা
সখি, তাকায় তোমার মুখে
তন্দ্রাহারা;
বন পথের বাঁকে
শুধু ঝিল্লী ডাকে,
জানে আঁধার নদীর জলে
ছন্দ ধারা—

সেই নদীর ছবিই আসছে। সেই পথের বাঁক, সেই ঝিঁঝি-ডাকা সন্ধ্যা। আমার স্মৃতির বৃত্তির ভেতরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে মনটা। কিন্তু লেখাটা আমার ভালো লাগছে:

ঘুমে হাসবে খণ্ড শশী
বনের শিরে
ঘন-শ্রান্তি ঘুমের মতো
নামবে ধীরে;

সেই কাজল ছায়া
সখি, আনবে মায়া
মধু, গন্ধ মদির
হেনা কুঞ্জ ঘিরে—

কিন্তু এ যে প্রেমের কবিতা। একি শোনানো যাবে টুনটুনকে ?

আমি দেখা পালালুম। আমার আলোর বৃত্তে বাঁধা দিনগুলো—সে তো ছেলেবেলার স্মৃতি। তার ভেতরে কোথা থেকে প্রেম এল, কেমন করেই বা এল ? যে সখীর কথা বলছি—সে কেমন দেখতে ? যে মেয়েরা ভালোবাসে, যারা ব্যথা পায়, তারা কেমন হয় দেখতে ? কবিতায় তার বর্ণনা পড়েছি, পড়েছি উপন্যাসে। কালিদাসের পংক্তি ভেসে আসে মনের কাছে : হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং।' রবীন্দ্রনাথের গানের লাইনে বাঁধা পড়েছে সেই ছবিটি : অমল-পরশ-শীতল-নদীর বহিছে তোমারি কেশে, কিশোর অরুণ-কিরণ তোমার অধরে পড়েছে এসে।' কে সে মেয়েটি ? ষোলো বছর আগেকার নদী-জল-বাতাস ভিজে ভিজে ভিলোত্তমা করে গড়ে দিয়েছে যাকে ?

রত্না ? রত্না দাশগুপ্ত ?

ভারী পায়ের শব্দ বাইরে। চিনতে পেরেছি। কাকা আসছেন।

—কেমন আছিস আজ ?

চেয়ার টেনে বসলেন। যে চেয়ারটায় টুনটুন বসেছিল কিছুক্ষণ আগেই।

কাকা আবার বললেন, শরীর ভালো আছে তো ?

কালকে একটু জ্বর জ্বর হয়েছিল। সেইজন্যেই এই কুশল জিজ্ঞাসা করছেন।

—আজ বেশ আছি।

—সারাদিন একা একা লাগে না ? কোনো অকুপেশন তো নেই।

আমি জানি, কাকা কী কথাটা বলতে চাইছেন। কিন্তু সেদিকে আমি গেলুম না।

হেসে বললুম, আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। তা ছাড়া টুনটুন আমাকে প্রায়ই গড়ে শোনায়।

—তবু একটা ভাবছিলাম তো। একটু ভেবে দেখব কী করা যায় তোকে। আচ্ছা উঠি তবে—আমার কোর্টের বেলা হল।

চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, বেরিয়ে গেলেন দরজা দিয়ে। এ্যাডভোকেট মানুষ। মোটা ভারী গলা। টুনটুন কী করে যে ওঁর মেয়ে হল ভাবতে অবাক লাগে। হয়তো স্বভাবটা পেয়েছে কাকীমার কাছ থেকেই।

আবার দেখায় মন দিলুম :

তবে একটি প্রদীপ জ্বেলে
আপন হাতে
সেই বিজন নদীর তীরে
নিয়ে যাতে,

সেই শ্যামল ছায়ে
ধীর চপল পায়ে
যেন আসবে স্বপ্নময়ী

—শুনাতে—

টুনটুন শুনলে বলবে, এ কবিতা পুরোনো। আজকাল এসব ছন্দ অচল, এ ভাষা পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু আমিও তো আমার পুরোনো পৃথিবীতেই মুখ গুঁজে বসে আছি, আমার বাইরের জগৎ বলে কিছু নেই, একালের সঙ্গে কোনো যোগ নেই কোনোখানে। কিন্তু এ প্রেমের কবিতা। এ কখনো টুনটুনকে শোনানো যাবে না।

॥ দুই ॥

কবিতাটি শেষ করেছি।

"সখি তোমার প্রদীপখানি
চলবে ভেসে
কোথা আমার আঙুর গাছে
নিরুদ্দেশে।
কালো আকাশ তলে
কালো উছল জলে
কোন্ ছাড়ি এ পথের সীমা
কালের শেষে,
নতে সন্ধ্যাতারা যবে
উঠবে হেসে।

আমার নিজের আজ খুশি হয়েছে, মনের মধ্যে ছবি জেগে উঠেছে কতগুলো। তবু সন্ধ্যেবেলা টুনটুন যখন এল, তখন ওকে কিছুতেই এটা শোনানো গেল না। যেন এ আমার একান্ত গোপন কথা, নিজের ডাইরি। এর ভাষা পুরোনো, ছন্দ পুরোনো। আমিও তো পুরোনো হয়ে গেছি, আমার কাছেই এ লুকোনো থাক।

টুনটুন এল।

—সোনাদা।

—কী খবর?

—ওরা 'অরূপরতন' করতে রাজী হল না। কাস্টনীও বাদ দিয়েছে। —টুনটুনের মুখ বিষণ্ণ।

—কী ঠিক হল তা হলে?

—'মুক্তধারা।' সবাই মিলে ভোটে পাস করিয়ে নিলে।

—সেও তো ভালোই।

আমার কপালে এক গুচ্ছ চুল উড়ে এসে পড়েছিল, নরম আঙুলের আলতো ছোঁয়া বুলিয়ে টুনটুন সেগুলোকে সরিয়ে দিলে। এক মিষ্টি ওর আঙুলগুলো। সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে যায়।

টুনটুন বললে, তবু অরুপরতনই আমার ভাল মনে হয়েছিল। আমাকে সুদর্শনার পার্ট দিয়েছিল। জানো, আমি রাত্রে জেগে জেগে ভেবেছি অন্ধকারের রূপ। ভাবতে চেয়েছি সে রাজা কেমন—যাকে দেখা যায় না, যার রূপ নেই—অথচ যে জ্যোতির্ময় হয়ে দু চোখকে পূর্ণ করে দেয়।

আমি চুপ করে রইলুম। আমার কথা ঠিক উল্টো। আমি যদি রূপের জগতে ফিরে যেতে পারতুম। অন্ধকারের রাজাকে আমি চাই না—যদি সুবর্ণ এসে আমার মন ভোলাতে পারত! যদি বসন্তোৎসবের অশোক কিংশুকের সঙ্গে আমিও রঙের আনন্দে মাতাল হয়ে উঠতে পারতুম!

টুনটুনকে জিজ্ঞেস করলুম, কী পার্ট দিয়েছে তোকে?

—এখনো ঠিক নেই। কাস্টিং হবে কালকে।

তারপর কিছুক্ষণ এলোমেলো গল্প। ওদের কলেজের স্পোর্টসের কাহিনী। জোর্থ ইয়ারের মোটা মেয়ে মণিকা ঘোষ মিউজিক্যাল্ চেয়ারে বসতে গিয়ে কী করে চেয়ার ভেঙে পড়ে গিয়েছিল তার সরস বিবরণ।

টুনটুন যেন মনের ভেতরে খানিকটা বসন্তের বাতাস বইয়ে দিয়ে গেল। বার বার ইচ্ছে হল, কবিতাটা ওকে পড়ে শোনাই। কিন্তু সাহস হল না। নিজের কথা নিজের কাছেই লুকিয়ে থাকুক।

টুনটুন চলে গেলে আবার ব্রেল নিয়ে বসেছি। না—কবিতা লিখব না। এবার আবার সেই পুরোনো দিনগুলোর ভেতরে ফিরে যেতে চাইব। অতীত ছাড়া আমার আর কী আছে?

আকাশের কথাই বলছিলুম।

আমার ন'বছর বয়েসের স্মৃতির সীমাটা একদিকে ছুঁয়েছে সেই আকাশকে—যে আকাশে মেঘের পরে মেঘ উঠে আসে। আর আমাদের লাল দোতলা বাড়ীটা, আমের বাগান, ছোটোবড়ো কাঁচাপাকা বাড়ী—একটা ধুলোবালি ভরা পথ বেয়ে গড়াই নদীর ডাঙা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে বৃত্তটা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। আমার সামনের গোল টেবিলটার মতোই তারপরে আর কিছু নেই—সব ফাঁকা, সব অন্ধকার। এই টেবিলটা যেমন এখন আমার প্রয়োজনের জগৎ, তেমনি ঐটুকুই আমার আলোর পৃথিবী, আমার স্মৃতির সঞ্চয়।

তার মধ্যে বাবাকে দেখতে পাই।

সকালের রোদে—শীতের মিষ্টি নরম আলোয় সামনের ছোট কম্পাউণ্ডটিতে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। পায়ের টিপয়ের ওপর চায়ের পেয়ালা, পায়ের কাছে গুটিশুটি মেরে বসে আছে টমি কুকুর; বিদেশী কুকুরের বাচ্চা—লালে সাদায় রঙ, পুষতে হয়নি, আপনিই কখন এসে জুটে গেছে। আমাদের চাকর শম্ভু দেওয়ালীর দিনে ওর ল্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে দিয়েছিল, তারপর টমির সে কি দৌড়। একবার করে পেছনের দিকে তাকায়, তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে!

আর দেখছি মা-কে। বাড়ীর টুকিটাকি কাজ নিয়ে সামনের বারান্দাটা দিয়ে আসা-যাওয়া করছেন মাঝে মাঝে। শাড়ীর লাল পাড় ঝকঝক করছে—জ্বলজ্বল করছে কপালের সিঁদুরের টীপ। দিদিকে দেখছি—একটু আনেই হিসিং করছিল, এখন বিজলী ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে কয়েকটা ছাগলছানার পেছনে, গান গেয়ে উঠছে: 'এই তো ভালো লেগেছিল, আলোর নাচন পাতায় পাতায়।'

আর আমি সেই তখন থেকে লক্ষ্য করে দেখছি—মরা মরা ঘাসের ভেতর একটা ঝিঁঝি ব্যাঙীর মতো নিথর হয়ে বসে আছে।

—এরোপ্লেন—এরোপ্লেন—দিদি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। মা বেরিয়ে এলেন, বাবা উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালেন, এমন কি টম পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গিয়ে মুখ তুলে ল্যাজ নাড়তে লাগল। রাস্তার দিক থেকে লোকের চিৎকার উঠল।

নীতের নরম আলোয় একটা রুপোর পাখি উড়ে গেল ঘরঘর শব্দ করতে করতে। দেখতে চেঁকির মতো—দুধারে ঘুঘুর মতন তার ডানা।

মা বললেন, কী দস্যিপনা বাপু! নীচে পড়লে তো আর হাড়গোড় কিছু থাকবে না।

বাবা হাসলেন, জবাব দিলেন না।

আমি বললুম, বড়ো হয়ে আমি এরোপ্লেনে চড়ব।

এই কলকাতা শহরে এখন রাতদিন এরোপ্লেনের সাড়া পাই। কর্কশ শব্দে আকাশ ছিঁড়ে চলে যায়—কেউ লক্ষ্য করে না—কেউ চীৎকার করে ওঠে না। এখন ভাবি, আমিও একটা প্লেনে করে কোথাও চলেছি। পথের শেষ নেই, আকাশের সীমা নেই, অন্ধকারের পরে অতল অন্ধকার।

কিন্তু এখনকার কথা আর নয়। আমাদের দোতলার জানালা পর্যন্ত যে চাঁপা ফুলের গাছটা উঠে এসেছিল, সোনা রঙের ফুলে ফুলে তার পাতাগুলো ছেয়ে গেলে গন্ধে যখন নেশা ধরত, তখন কতদিন ভেবেছি, আমিও এরোপ্লেনে চড়ে কোথায় কোথায় চলে যাব। এই গড়াই নদী পার হয়ে—সমুদ্রের উপর দিয়ে—মেঘের ভেতর দিয়ে পাড়ি জমিয়ে কোথায় যে কতদূরে অদৃশ্য হয়ে যাব। আর তখন দেখব, নদীর চরের বকেরা আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কিনা।

সেই নদীর চর।

এক একদিন বিকেলে বাবা আমাদের বেড়াতে নিয়ে যেতেন গড়াই নদীর ধারে। জল চলেছে ছলছলিয়ে। কত জল—কত দিন ধরে বয়ে আসছে, কিছুতেই ফুরোয় না। খেয়া নৌকো করে গোয়ালারা বাঁক কাঁধে ওপারে চলে গেল—চরের ওপর শোঁ-শোঁ করে বনঝাউ আর কাশবনের মধ্য দিয়ে কোথায় যে মিলিয়ে গেল!

ওপারে কুঁচিওলা বকেরা মাছ ধরছে তখনো। দিদি চিৎকার করে ডাকত:

'বক মামা, বক মামা, পান দিয়ে যা,
নারকেল গাছে কড়ি আছে, গুনে নিয়ে যা—'

নদীর অতদূর ওপারে তারা কি সে ডাক শুনতে পেতো? কিন্তু আমি ভাবতুম, বক মামার কাছে পান চাইতে যাব কেন, মাছ চাইলে তো ভাল হয়। কিন্তু তারা পান তো দিতই না, মাছও নয়। নিজেদের মধ্যে কলহ করত, গা খুঁটত, টুকটুক করে মাছ ধরে—গলাটা ওপরে তুলে যেমন করে লোকে কুইনিন খায়—তেমনি ভাবে টুক করে গিলে ফেলত। আর চমকে উঠত দু-একটা বাছুরও —যারা একই মতলব নিয়ে আঘড়োয়া একটা ভাঙা নৌকোর গলুইয়ের ওপরে ঝিম ধরে বসে আছে।

আর সামনে দিয়ে [redacted] নৌকো: কখনো পাল তুলে, কখনো লগি ঠেলে, কখনো গুণ টেনে। ঢোল বাজিয়ে [redacted] তুলে। বাবা বলতেন, ওতে করে ধানপাট এই সব যায়।

আস্তে আস্তে বেলা ডুবত। সড়কী নদীর জল রুপোর রঙ বদলে তামার মতো হয়ে যেত। তারও পরে সূর্য যখন লাল হয়ে নামতে শুরু করত বনঝাউ আর কাশবনের ওপারে—রাঙা টকটক করত চরটা—যেন আগুন লেগেছে আর তাপের মাথাগুলো সেই আগুনের অসংখ্য শিখা হয়ে; ওপারের মানুষগুলো যেন একদল রঙিন পুতুলের মতো টুকটুক করে এগিয়ে যেত। আর নদীতে রাঙা হত নদীর পাল—আবির মাখা জলে এক আধটা শুশুক খুশিতে ফুস্ ফুস করে ভেসে উঠত। তখন বকেরা সেই রঙে ডানা রাঙিয়ে ঝাঁক বেঁধে উড়ত আকাশে—ডাকত, কাঁ-কাঁ-কাঁ। তারপর আগুন-ধরা চরটার ওপর ছাই রঙ ছড়িয়ে যেত, সারাদিনের মতো খেয়ার পালা মিটিয়ে এপারে ফিরে আসত মাঝিরা, নদীর আবির গোলা জল মলিন হয়ে যেত। খানিক দূরে বাঁকের মুখে গাছপালার আড়ালে দেখা যেত পুরোনো নীলকুঠির বাড়ীটাকে—সেইটেকে ঘিরে ঘিরে একটা কালো ছায়া উঠতে থাকত আকাশের দিকে। অন্ধকার মাখতে আরম্ভ করত পেছনের বন্য আমবাগানটা—শেয়াল ডেকে উঠত তার ভেতরে।

তখন বাবা বলতেন, ফিরে চলো।

আমরা বলতুম, আর একটু থাকি না বাবা!

বাবা বলতেন, না-না, অন্ধকার হয়ে যাবে এর পরে।

তখন আমরা ফিরে আসতুম বাড়ীর দিকে। আসবার সময় নদীর চড়া থেকে আমি ঝিনুক কুড়িয়ে নিতুম দুটো একটা। কাঁচা আম খেতে ঝিনুক খুব কাজে লাগে। অনেকদিন ভেবেছি একটা গোটা ঝিনুক যদি পাই, তাহলে তার ভেতরে মুক্তো পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করে দেখব। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো গোটা ঝিনুক আমি পাইনি—সব ভাঙা।

আমরা বাড়ীর দিকে ফিরে আসতুম। কোনো কোনোদিন বাবার হাত থেকে ছড়িটা নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে অনেকখানি এগিয়ে যেতুম আমি। বাবা বলতেন, আস্তে আস্তে। চলতে চলতে ঝোপের মধ্যে ঝুমঝুম করে আওয়াজ পেতুম কোনো-কোনো দিন—মনে হত কে যেন বাজছে মল পায়ে দিয়ে—সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা বাজিয়ে বাজিয়ে। কান খাড়া করা খরগোস লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে দেখতে না দেখতে কোথায় উধাও হয়ে যেত। তারপর দেখা দিত অন্ধকার আমের বাগানটা। দিনে কত রাশি রাশি ছায়া—কী ঠাণ্ডা মিষ্টি বাতাসে ভরা, আর সন্ধ্যে নামলেই অদ্ভুত চেহারা, চেনা গাছগুলোকেও কেমন এক ঠেঙে ভূতের মতো বলে মনে হতে থাকে। তখন আর আমার ভালো লাগত না—হাতে বাবার ছড়িটা থাকা সত্ত্বেও নয়। আমি পিছিয়ে এসে বাবার কোল ঘেঁষে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করতুম। বাবা তখন দিদিকে বলতেন, খুকী, গান ধর।

ওইটেই দিদির ডাক নাম ছিল।

দিদি গান ধরত:

'চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে,
অন্তরে আজ দেখব, যেথায়
আলোক নাহিরে—'

বাবার খুব প্রিয় গান ছিল এটা। শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন, সেইখানেই শিখেছিলেন গান। বলতেন, স্বয়ং গুরুদেব আমাদের পড়াতেন—তা জানিস? আর গান শিখিয়েছেন দিনু ঠাকুর নিজে।

এ-পার ও-পার জুড়ে মস্ত একটা রামধনু উঠলে। আর সব চাইতে ভালো মা-র কপালের সিঁদুরের রঙ—তাঁর শাড়ীর পাড়ের লাল টকটকে রঙ, পান খেয়ে ঠোঁট দুটি টুকটুকে হয়ে উঠলে সেই রঙ, হাতের সোনার চুড়ির সঙ্গে জড়িয়ে দুগাছা শাঁখার রঙ।

এত রঙ—এত রঙ আছে পৃথিবীতে। তবু অন্ধকার সব কিছুকে মুছে নেয়, কালো করে দেয়—একাকার করে ফেলে। বাপ আর দিদির ওই গানের সুর আমার মনের ভেতরে যেন আরো বেশি করে ভয়ের ছায়া ছড়িয়ে দিত। আমি বাবার একখানা হাত জড়িয়ে ধরে দেখতুম, আমের বাগানটার ভেতরে সারি সারি একঠেঙো কেমন অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর ঝুল গাছের মাথায় কত অসংখ্য জোনাকি ঝিকমিক করে জ্বলছে।

রঙের নেশা সেই বয়সেই আমাকে পাগল করে দিয়েছিল। হয়তো বড়ো হলে আর্টিস্ট হতুম আমি, পৃথিবীতে যত রঙ আছে সব ধরে আনতুম তুলির মুখে; সন্ধ্যার আকাশকে অমন করে রাজকন্যার মতো সাজিয়ে দেবার রহস্যটা আমি মেঘের কাছ থেকে শিখে নিতুম, সড়াই নদীর আবীরমাখা জল এনে ছিটিয়ে দিতুম ছবির গায়ে—বউ কথা কও পাখির হলুদ রঙ এনে গায়ে হলুদের ছবি আঁকতুম।

কিন্তু রঙ আমার কাছে ধরা দিল না।

তার বদলে যে এল, তাকে আমি কোনোদিন চাইনি। সে অন্ধকার।

দিনের আলো ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন আমার খারাপ হয়ে যেত। ঘরে যে লণ্ঠনটা জ্বলত—তা আমার মনকে সাহস দিতে পারত না। লণ্ঠনের আলোয় যেটুকু দেখি, তার বাইরে অনেক কিছুই আমি দেখতে পাই না—মনে হয়, আমবাগান থেকে সেই একঠেঙে ভূতুড়ে মূর্তিগুলো সন্ধ্যার সুযোগ নিয়ে আমাদের পিছে পিছে কখন নিঃশব্দে চলে এসেছে, গোল হয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে চারদিকে—যেন অপেক্ষা করে আছে তারা; বাতাস নয়—তারাই ফুঁ দিয়ে চলেছে একটানা—আলোটা একবার নেবাতে পারলেই আমার ওপর এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।

তাই বরাবর রাত্রে আমার মাথার কাছে একটা ছোট আলো জ্বালা থাকত। অন্ধকার হলেই আর আমি ঘুমুতে পারতুম না। বাবা মধ্যে মধ্যে রাগ করতেন। দিদি বলত, ছি ছি, এত ভয় পাস কেন? পুরুষ মানুষ না তুই? জানিস, আমি রাত্তির বেলা আলো না নিয়ে ছাতে যেতে পারি।

আমি বলতুম, বেশ যা তো।

দিদি বলত, আজ নয়—আর একদিন যাব। আজ আমার শরীরটা ভালো নেই।

আসল কথা, ওরও সাহস ছিল না। শুধু বাহাদুরী দেখাবার জন্যেই বলত। কিন্তু আমার মতো অত ভয় ওর ছিল না—রান্নাঘরে লণ্ঠন না থাকলেও ও ঠিক উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে চলে যেতে পারত।

কিন্তু আমি অন্ধকারকে চাইনি—একেবারেই চাইনি।

অথচ শেষ পর্যন্ত সেই-ই নেমে এল আমার দু চোখের পাতার ওপর। আমি কিছুতেই তাকে সরাতে পারলুম না। সেই এগারো বছর বয়সেই আমার দেখার জগৎটাকে সে সম্পূর্ণ কেড়ে নিলে—যার ভেতরে কোনোদিন সূর্যের আলো ফুটবে না—কখনো দেখা যাবে না ফুলের রঙ, পাখির রঙ।

কতদিন ভেবেছি, এমন তো হতে পারে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখব আমার দৃষ্টি খুলে গেছে। জানালা দিয়ে ভোরের আলো ফুটেছে, তার সঙ্গে বয়ে ফুলে ভরা লতা ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়েছে

আর মা এসে দাঁড়িয়েছেন আমার মাথার কাছে। কপালে তাঁর সিঁদুরের টীপ, লাল টকটক করছে শাড়ীর চওড়া পাড়টা।

কিন্তু—

[রেল সিস্টেমে খুটখুট করে এই পর্যন্ত কাগজের ওপর লিখেছি, হঠাৎ চমকে থেমে গেলুম। বাইরের রাস্তায় বিশ্রী গণ্ডগোল উঠেছে একটা। কে যেন অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করছে, কারা বলছে, 'মার—মার—ধরে তক্তা করে দে ব্যাটাকে।' হয়তো মাতাল—হয়তো বা পকেটমার ধরা পড়েছে একটা। কিন্তু আমার লেখার সুরটা কেটে গেল। পড়াই নদী নেই—সে লাল বাড়ীটা নেই—কী কথা কও এখানে চোখে পড়ে না। এমন কি, রাতের অন্ধকারে কৃষ্ণচূড়ার গায়ে সেই লক্ষ লক্ষ জোনাকিও এখানে ঝিলমিল করবে না কোনোদিন। আমি আবার ফিরে এসেছি কলকাতা শহরে। আর ঠিক বড় রাস্তার ওপরেই আমার ঘরখানা।

হালকা পায়ের শব্দ। কতদিন—কতকাল ধরে ও শব্দ আমি চিনি। পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষের পায়ের আওয়াজের সঙ্গে মিশে গেলেও আমার চিনে নিতে ভুল হবে না। মা।

কট্ করে সুইচের শব্দ হল। তা হলে ঘর এতক্ষণ অন্ধকার ছিল। আমার এইটুকুই সুবিধে। যখন খুশি আমি লিখতে পারি—সারা কলকাতার সব আলো চিরদিনের মতো নিবে গেলেও আমার কিছু যায় আসে না।

মা কাছে এলেন।

—এখনো শুলি না বাবা? রাত হয়েছে যে?

—ক'টা বাজল মা?

—প্রায় সাড়ে এগারোটা। কী করছিস এতক্ষণ ধরে?

—লিখছিলুম অল্প অল্প।

- হুঁ, সেই আওয়াজ পেয়েই তো আমি এলুম। কিন্তু আর দেরী কোরো না। এবার শুয়ে পড়ো।

মা আমার কপালে হাত রাখলেন। টুনটুনের আঙুলগুলো আমার মনে পড়ল—কিন্তু সে ছোঁয়ার স্বাদ এত ভরা নয়—এত গভীর নয়। টুনটুনের হাত পাপড়ির মতো, মা-র হাত পদ্মের মতো। আর সেই ভরাট হাতখানার ছোঁয়া লেগে আমি এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, আমার মাথা ধরেছে, দপদপ করছে কানের দু'পাশের শিরা দুটো।

মা বললেন, একি—কপাল গরম ঠেকছে কেন?

—ও কিছু নয় মা—সর্দির জন্যে হয়ে থাকবে।

—তুমি আমায় ভোগাবে দেখছি। নাও—শুয়ে পড়ো।

—আর দশ মিনিট মা, ঠিক দশ মিনিট। কয়েকটা কথা মনে এসেছে, এখন না লিখে রাখলে সব ভুলে যাব।

—না, পাঁচ মিনিট। তার বেশি কিছুতেই নয়। ঠিক পাঁচ মিনিট পরে যদি তোমার লেখার আওয়াজ পাই, তা হলে এসে কিন্তু জোর করে শুইয়ে দিয়ে যাব।

মা আমার চুলগুলোকে নিয়ে আদর করছিলেন, যাবার আগে আর একবার সেই ভরাট

নরম ছোঁয়া বুলিয়ে দিয়ে গেলেন আমার কপালে। আট-ন বছর বয়েস থেকেই ওই ছোঁয়াটার কথা আমি মনে করতে পারি। তারপর কত বছর পার হয়ে গেল, কত ঝড়-ঝাপটা চলে গেল এর ভেতর দিয়ে। মা-র হাতের সোনার চুড়িতে আর ঝঙ্কার ওঠে না, আমি জানি সে শাদা শাঁখা দুটোও আর নেই, আজ চার বছর হল বাবা চলে গেছেন। তবু মা-র এই ছোঁয়াটুকু বদলায়নি—কোনোদিনই কি বদলায়?

আবার কট্ করে সুইচের আওয়াজ। মা আলো নেবালেন।

আমার হাসি পেলো। আজ কত সহজেই মা ঘরের আলো নিবিয়ে দিতে পারেন! আজ আর আমার রাত্রিকে ভয় নেই—অন্ধকারকে ভয় নেই। আলো জ্বলুক আর নাই জ্বলুক, আমার কিছুই তাতে আসে যায় না।

দরজার সামনে পর্যন্ত গিয়ে মা থেমে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারলুম।

জিজ্ঞেস করলেন, কিছু লাগবে?

—না মা, কিছু দরকার নেই।

কিছু দরকার নেই? একটু ছিল। আরো খানিকক্ষণ যদি মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। এতক্ষণে বুঝতে পারছি, সত্যিই দারুণ ভাবে ধরেছে মাথাটা। আরো একটুখানি পদ্মের মতো ভরা হাতখানা সেখানে থাকলে সব জুড়িয়ে যেত। কিন্তু কথাটা আমি বলতে পারলুম না—কেমন লজ্জা হল আমার। মা-রও তো সারাদিন খাটনি গেছে, এবার বিশ্রাম দরকার।

পথের গোলমালটা কখন থেমে গেছে, আস্তে আস্তে নিঝুম হচ্ছে চারদিক। এইবার আমি বুঝতে পারছি রাত হয়েছে। কলকাতার এই ক্লান্তিকে আমি চিনি। জানি, কিভাবে তার সমস্ত শব্দগুলো ধীরে ধীরে থেমে আসবে—তার সারা আকাশ লক্ষ লক্ষ ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাসে ভরে যাবে। আমার জানালাটা দিয়ে সেই নিঃশ্বাসের স্পর্শটা যেন এখুনি ভেসে আসতে আরম্ভ করেছে।

আমি আবার সেখার যন্ত্রটায় হাত নামালুম। না—আর ভালো লাগছে না। ঘুমের ছোঁয়া আসছে হাওয়ায় হাওয়ায়। স্বপ্নেরা এখন ভিড় করে আসছে আশপাশে। এইখানেই আমার আর একটা জিৎ। চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু স্বপ্ন দেখতে আমার কোনো বাধা নেই। সেখানে আমার দেখাকে কেউ আড়াল করতে পারে না।

হাত বাড়িয়ে বিছানাটা স্পর্শ করলুম—তারপর উঠে গিয়ে শরীরটাকে এলিয়ে দিলুম তার ওপরে। কলকাতা এখন ঘুমোতে শুরু করেছে, কলকাতা এবার ঘুমিয়ে পড়বে। অথচ, এখানে কখনো আলো নেবে না। শুনেছি সারারাত ধরে তার পথে পথে বিদ্যুৎ জ্বলে—শূন্য নির্জন পথগুলো তার অকারণেই আলো হয়ে থাকে।

তবে কি কলকাতা আমারই মতো ভীরু? আমার মতোই আলো জ্বালা না থাকলে সে ভয় পায়?

তাই যদি, তা হলে একটা ঝড়ের রাতে—সমস্ত বিদ্যুতের বাতিগুলোকে চিরকালের মতো নিবিয়ে দিয়ে আমার মতো অন্ধকারের দীক্ষা নেয় না? তা হলে আর কোনো ভয় থাকে না—ভাবনা থাকে না, একেবারে নিশ্চিন্ত, নির্ভয় হয়ে যেতে পারে।

'তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি—'

কে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো—কে ? রঞ্জা ?

কিন্তু রঞ্জার কথা আর ভাবতে পারছি না—দু চোখে আমার কলকাতার ঘুমের হাওয়া এসে লেগেছে। এইবার স্বপ্নের ভেতরে আমার অন্ধ চোখ নতুন করে খুলে যাবে—সেইখানেই স্মৃতির আলোতে রঞ্জাকে আমি দেখতে পাব। দেখতে পাব ষোলো বছরের ওপারে গিয়ে।]

॥ তিন ॥

আজ আর সারাটা দিন সময় পাইনি। কাল থেকে যে কথাগুলো ক্রমাগত আসতে চাইছিল, সারাদিন ধরে তারা এক ঝাঁক ভোমরার মতো মাথার ভেতরে গুনগুন করে ঘুরে বেড়িয়েছে। অথচ, কিছুতেই হল না।

বিকেলে একটুখানি সময় পেয়েছিলুম, কাকা এলেন। একটা চিটিং কেসের গল্প করলেন অনেকক্ষণ। কেমন করে মিথ্যে বিল অফ্ লেডিং আর রেলওয়ে রসিদ বিক্রী করে ত্রিশ হাজার টাকা ঠকিয়েছে তার কাহিনী।

এ-সব বলা অনর্থক নয়। একটা কথা ঘুরছে কাকার মনের ভেতর। ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছেন না এখনো। বাবার সঙ্গে কাকার অনেক তফাত। একই মায়ের পেটের ভাই—অথচ দুজনে কত তফাত। বাবা ছিলেন সাহিত্য-পাগল মানুষ। তাঁর মুখেই তো প্রথম শুনেছিলুম লে মিজারেব্‌ল্‌ আর থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের গল্প, লাস্ট্ অফ দি মোহিকান্‌স্-এর কাহিনী। আরো বড়ো হলে বাবাই শোনাতেন শেলীর কবিতা—আর কী ভক্ত ছিলেন এ্যাউনিঙের। কিন্তু ও-সব দুর্বলতা কাকার নেই। তিনি অ্যাড্‌ভোকেট, কাজের মানুষ—সময়ের চেহারা তাঁর কাছে অন্যরকম।

আচ্ছা, টুনটুন কী করে কাকার মেয়ে হল ? ওতো আমার আপন বোন হতে পারত। আর তাইতেই ঠিক মানাতো ওকে।

কিন্তু টুনটুনের কথা এখন নয়। আমি রঞ্জার কাছেই ফিরে যাব।

আমার গোলটেবিলটার মতো স্মৃতির বৃত্তটাকে হাতড়াই। সেই চার বছরের ছোট পুতুলের মতো মেয়েটা। নামেও পুতুল। বাবা ছিলেন মুনসেফ—ওর বাবা সার্কল অফিসার। ওঁরা দুজন ছিলেন বন্ধু, আর পুতুলের মা ছিলেন আমার মা-র সই। কাছাকাছিই থাকতেন। আর প্রায়ই দুপুর বেলা পুতুলের মা বেড়াতে আসতেন আমাদের বাড়ীতে—সঙ্গে, পুতুলও আসত বলাই বাহুল্য।

দিব্যি ফুটফুটে মেয়ে। আসত, সারা বাড়ী ঘুরঘুর করে বেড়াত, আছাড় খেয়েও পড়ত কোনো কোনোদিন। কিন্তু তাতে আমার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। আমি আপত্তি করতুম অন্য কারণে।

ওর যত ঝোঁক ছিল আমার পড়ার টেবিলটার ওপর।

—তুই এখানে কেন ;—আমি গম্ভীর হয়ে বলতুম : মেয়েদের ওখানে যা।

যেত না। টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে থেকে, এক আধটা বই টেনে নিতে চেষ্টা করত।

আমি ধমক দিয়ে বলতুম : এই—যাবি। এ সব দিয়ে তোর কী দরকার ? ইতিহাস, জ্যোমেট্রি, ইংরেজি—কিছু বুঝতে পারবি ? যা—পালা এখান থেকে।

কিন্তু যাবার মেয়ে সে নয়।

তখন বসে পড়ত মেজেতেই। একটা ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে পড়তে থাকত : ক-অ-অ—

—উঁস, কী পড়াই হচ্ছে! যেন ম্যাট্রিক পাস করতে যাচ্ছেন!

সেদিন স্কুল থেকে এসে দেখি, পুতুল কোন্ ফাঁকে এসে আমার টেবিলে বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়েছে। এক গাদা বই খাতা সব নীচে টেনে নামিয়েছে, আমার ফুলস্কেপের বইতে পেন্সিল দিয়ে নানা রকম আঁকিবুকি কেটেছে, কালি ঢেলে দিয়েছে ব্লটিংয়ের খাতায়, তারপর আমার একটা পুরোনো রাফ খাতাকে উল্টো করে ধরে বেশ মন দিয়ে পড়ে যাচ্ছে : ক-খ-গ-অ-আ-ধ-গ—

—অ-আ-ধ-গ? দাঁড়া—তোকে দেখাচ্ছি।

ভীষণ রাগ হয়ে গিয়েছিল আমার। ঝুঁটিটা টেনে ধরে কষে একটা চড় বসিয়ে দিলুম। আর যাবে কোথায়। সারা বাড়ী কাটিয়ে চিৎকার জুড়ল : ভ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

মা আমাকে তেড়ে মারতে এসেছিলেন, কিন্তু পুতুলের মা-ই আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন সে-যাত্রা। বললেন, ওর কোনো দোষ নেই দিদি, মেয়েটার স্বভাবই এই। ভয়ঙ্কর চুলবুলে। বাড়ীতেও ওই উৎপাত—সেদিন ওঁর অফিসের ফাইলে এক দোয়াত লাল কালি ঢেলে দিয়েছে। সে এক কাণ্ড!

এখন সাক্ষী সাবুদ থাকতেও মা পুতুলের পক্ষই নিলেন।

রাগ করে আমাকে বললেন, ছোট আছে বলে এখন ওকে মারলি—ও বড় হোক, তখন মজা দেখাবে তোকে।

পুতুলের মা হেসে উঠেছিলেন।

—যা বলেছেন দিদি। বড় হোক, তারপরে দুটিতে বিয়ে দিয়ে দিন। তখন আমার মেয়ে এর শোধ নিতে পারবে।

আমি বলেছিলুম, ছ্যাঃ কেন?

পুতুলের মা তেমনি হাসিমুখে জিজ্ঞেস করেছিলেন : ছ্যাঃ কেন? পছন্দ হল না?

আমি জবাব দিয়েছিলুম : পছন্দ করতে বয়ে গেছে। ওই তো পুঁচকে একটা ছিচকাঁদুনে মেয়ে আমি ওকে বিয়ে করলে তো?

মা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন, হাঁ, সে একটা কথা বটে। একটু বড়োসড়ো বৌ না হলে আমার ছেলের তো চলবে না। সে এর মধ্যেই বৌ পছন্দ করে বসে আছে—জানেন না বুঝি?

—না তো। কাকে পছন্দ হল ঔরসের?

—রামপিয়ারীকে? ভারী ভাব তার সঙ্গে। সেই তো জাম-টা কুল-টা এনে দেয় ওকে।

তারপর দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়েছিলেন।

রামপিয়ারী আমাদের বাড়ীর ঝি। মাথার চুল অর্ধেক পাকা। মুখের সামনের দিকে তিনটে দাঁত নেই তাঁর।

—ছ্যাৎ!

আমি দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিলুম ওখান থেকে।

কিন্তু আমার সব মনে আছে, একটি কথাও আমি ভুলিনি। আমার শুদ্ধ হয়ে যাওয়া

আলোর জগতের ভেতর ওরাও যেন থমকে থেমে আছে। কিছু হারায়নি—একটা কথাও না। আর একটা স্মৃতিও মনে আসছে এই সঙ্গে। বিয়ের সময় দিদির যে ঘরে বাসর হয়েছিল, ওরা চলে যাবার পরে পাঁচ সাতদিন ঘরটা তালাবন্ধ হয়ে পড়েছিল। তারপর যখন সেই ঘরের দরজা খোলা হল, তখন সে-খানেই আমি দাঁড়িয়েছিলুম। সেই বাসর রাত্রির গন্ধের ঝলক তেমনি করে আমার চোখে মুখে এসে আছড়ে পড়েছিল—সেই ফুল, সেন্ট, চন্দন আর ধূপের গন্ধের উচ্ছ্বাস।

কিছুই হারায়নি।

আমার স্মৃতির ঘরটারও কোনো দরজা নেই। তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে চিরকালের কালো অন্ধকার। একটা স্থির-স্থবির কানা দেওয়াল। তাই সেখানে যা সঞ্চিত হয়ে আছে, তা চিরদিনের মতোই জমা হয়ে রইল। তাকে আমার হারাবার ভয় নেই। তার একটি কণাকেও নয়।

সেদিনের সব কথা আমার মনে আছে সব।

পুতুল সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়।

যখন ফুল খেতুম কিংবা একমনে বসে আমরুল চিবোতুম—তখন দেখতে পেতুম পুতুল ঠিক এসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ছোটখাটো দিব্যি দেখতে শুনতে মেয়েটা—কিন্তু কী যে লোভী! ভাগ না দিয়ে উপায় ছিল না।

একটা ফুল দিয়ে বলতুম, পালা—

পালাত বটে কিন্তু ফিরে আসতে দেরী করত না। সে ফুলটা সাবা হলেই হাজির৷ দিত আবার।

—আর দেব না। যা—

—না দাও। ওই লালটা।

—হুঁ, ওইটে দেব বই কি তোমায়। মিষ্টি বড়ো ফুল—সবশেষে খাব বলে রেখে দিয়েছি। আবার তোমার নজর গিয়ে ওটার ওপর পড়েছে!

—দাও না। নইলে কাঁদব কিন্তু।

—কাঁদ—যত ইচ্ছে। আমি দিলে তো!

কান্নার ভয় দেখিয়ে কাজ না হলে পুতুল তখন অন্য রাস্তা ধরত।

—তোমাকে মস্ত একটা বাঘ এসে হালুম করে কামড়ে দেবে। দেখো তখন।

আমি নির্বিকার চিত্তে বলতুম: আসুক না কামড়াতে। আমিও কামড়ে দেব বাঘকে।

অগত্যা সন্ধি।

—আচ্ছা—তবে ওই হলদে ফুলটা আমায় দাও—

কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল ওই ছোট্ট মেয়েটা। সেই গড়াই নদীর স্রোত সরে গিয়েছিল কত দূরে—বাঁকের মুখে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই নীলকুঠিটা তলিয়ে গিয়েছিল কোন অন্ধকারে।

তবু পুতুল আবার ফিরে এল নতুন করে।

আজ ষোলো বছর পরে তার কথা শুনতে পাচ্ছি। এখন আর সে পুতুল নেই। ওইটুকু মেয়ের এখন যে একটা নাম আছে, কে জানত সে কথা। এখন সে রঞ্জা—রঞ্জা দাশগুপ্ত। কিন্তু ইয়ারের ছাত্রী।

আমার মনে আছে, বাবা আমাকে কবে যেন মূলি গ্রে-র কবিতা শুনিয়েছিলেন। সেও একটি ছোট মেয়ে—তুষার পড়বে, ঝড় আসবে জেনে ছোট একটি লণ্ঠন হাতে করে মাকে আনবার জন্য শহরের দিকে রওনা হয়েছিল। তারপর সেই ঝড় এল, তুষার ঝরল—কিন্তু ছোট মেয়েটিকে আর খুঁজে পেলো না কেউ। তার ছোট ছোট পায়ের চিহ্ন অনেক দূর পর্যন্ত বাবা-মাকে পথ দেখালো, তারপর :

"And then an open field they crossed :
The marks were still the same ;
They tracked them on, nor ever lost ;
And to the bridge they came.
They followed from the snowy tank
Those footmarks one by one.
Into the middle of the plank ;
And further there were none—"

ছোট বেলায় এই কবিতাটা শুনতে শুনতে আমার দু-চোখ ভরে জল আসত। স্পষ্ট দেখতে পেতুম, ছোট মেয়েটি সেই ঝড় আর তুষার পাতের ভেতর দিয়ে একলা চলেছে পাহাড়ী পথ দিয়ে, হাওয়ায় উড়ছে তার চুল, হাতের লণ্ঠনটা নিবে গেছে—সে আর পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তারপর কখন নদীর সাঁকোটার ওপর গিয়ে সে উঠল, এল একটা ঝড়ো হাওয়ার দমক; কাঠের ওপর থেকে তার পা পিছলে গেল, একবার শুধু ডাকল : মা—মা—

আর কিছু নেই তারপর। শুধু সেই অন্ধকার হিমশীতল নদীটাই জানল তার খবর, আর তুষারের ওপর রাশি রাশি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো জেগে রইল তার পায়ের ছাপ—কোথায় সে—কোথায় গেল?

আমার ঘরের ভেতরেও ওই রকম কয়েকটা ছোট ছোট পায়ের চিহ্ন রয়েছে—সেই পুতুলের ছেলেবেলার দিনগুলি। তারপর ঝড় এল। সে ঝড়ে আমিই আর তাকে খুঁজে পাই না। আমারই চোখের সামনে দেখা দিল অন্ধকারের নদীটা—যার মাঝখান পর্যন্ত এসে সেই পদচিহ্ন চিরকালের মতো মিলিয়ে গেছে।

আজ এতদিন পরে সেই কালো স্রোতটার ভেতর থেকে কে উঠে এল? পাতাল যাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে কি রাজকন্যা সাজিয়ে ফিরিয়ে দিলে আবার? রঞ্জা!

দিদি এসেছিল কয়েক দিন আগে। গল্প করছিল মা-র সঙ্গে। আমার এই ঘরে বসেই।

অনেক কথা—অনেক বিবরণ। দিদির শ্বশুরবাড়ীর কাছাকাছিই নাকি ওরা থাকে বালীগঞ্জ গার্ডেন্স্-এ। পুতুলের বাপ এখন রিটায়ার করেছেন, তার দাদা চাকরি করে রাইটার্স বিল্ডিংএ। পুতুলের মাও খুব মোটা হয়ে গেছেন এখন। আর দারুণ পান খেতে ভালোবাসেন।

দু-একবার এমনি দেখা হয়েছে। দিদির মনে হয়েছে যেন 'চিনি-চিনি'—কিন্তু কিছুতেই ঠিক বুঝতে পারেনি। তারপরে একদিন পুতুলের মা-ই ওকে ডাকলেন।

—কিছু মনে কোরো না। তোমার নাম সমিতা নয়?

ব্যাস—তখুনি আলাপ হয়ে গেল। সেই পুরোনো দিনগুলির কথা। কত গল্পগুজব।

তারপর মাসিমাই দিদিকে টেনে নিয়ে গেলেন ওঁদের বাড়ীতে। পুতুল ছোট বেলায় সুন্দর তো ছিলই—এখন আরো অনেক সুন্দর হয়েছে। খুব ভালো গান শিখেছে, 'দক্ষিণী'র নামকরা ছাত্রী। কিন্তু এখন মা ছাড়া কেউই আর ওকে পুতুল বলে ডাকে না—এমন কি ওর বাবাও নয়। এখন ও রত্না দাশগুপ্ত।

—আমাদের সকলের কথা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন মাসিমা: দিদি বলছিলেন: জানো মা, ইস্ গিরই ওঁরা একদিন আসবেন এ বাড়ীতে।

আরো কী সব বললেন দিদি—তার সব আমি শুনতে পাইনি। চার বছরের পুতুল যে এখন একুশ বছরের রত্না—এই কথাটাই আমি ভাবতে চেষ্টা করছিলুম। খুব সুন্দর হয়েছে সে—কিন্তু কেমন সুন্দর? আমার চেনা আলোর জগতে একুশ বছরের কোনো সুন্দর মানুষকে আমি দেখিনি—দেখতে পাই না।

টুনটুনের বয়েস কত? আঠারোর বেশি নয়। ও ঘরে এলেই মনে হয় একটা ছোট্ট পাখি এল কোথা থেকে—যেমন করে আমাদের জানালায় এক একদিন ঝুঁটিওলা বুলবুলি এসে বসত। ওর গলার স্বর পাখির ডাকের মতো মনে হয়—ওর কাছে থাকাটুকু যেন একরাশ নরম পালক দিয়ে আমাকে ঘিরে রাখে।

বাংলার ও বস্ত্রশিল্পের লক্ষ্মী

বঙ্গলক্ষ্মী

মাতৃপূজায় ও নিত্য প্রয়োজনে

বঙ্গলক্ষ্মীর

ধুতি — শাড়ী — লংক্লথ

অপরিহার্য

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস লিঃ

হেড অফিস—৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩

রঞ্জাও কি অনেকটা ওই রকম? এমনি শান্ত, এমনি স্নিগ্ধ—এমনি পাখির মতো তার গলায় আওয়াজ?

জানি না। কোনোদিনই কি জানতে পারব?

[আমার লেখা বন্ধ করলুম। হাতটা দারুণ ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। কাগজের ওপর আঙুলগুলো বুলিয়ে নিলুম একবার—রাশি রাশি বিন্দুতে আমার মনের কথাগুলো ফুটে উঠেছে সেখানে। এ লেখা রঞ্জাকে পড়তে দিলে কেমন হয়? তার চার-পাঁচ বছর বয়েসের সেই সব দুষ্টুমির কাহিনী—তার সেই লোভের গল্প? এখনো কি সে তেমনি করে আমার কাছে এসে ফুল চাইতে পারে, আর ফুল না দিলে দেখাতে পারে সেই বাঘের ভয়?

কিন্তু এ লেখা তো রঞ্জা পড়তে পারবে না—তার চোখ আছে। অন্ধ ছাড়া অন্ধের লেখা কেউ বুঝতে পারে না—ব্রেলের এই বিন্দুগুলো তার কাছে অর্থহীন। কিন্তু শুধু কি এই বিন্দুগুলোই? আমি তো ষোলো বছরের ওপারে থেমে গেছি—রঞ্জার মন, আমারই পায়ের চিহ্ন নুসির মতো থেমে দাঁড়িয়েছে একটা অন্ধকার হিমশীতল নদীর ধারে। কিন্তু রঞ্জার জীবনে আলোর পরে আলোর ঢেউ এসেছে, নদীর পরে নদী এসেছে, এসব তার কাছে কী অর্থ আজ বয়ে আনবে?

লেখাটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিলুম।

রাত কত হল এখন? দশটা বাজল? সাড়ে দশটা? না—আরো বেশি? না—খুব বেশি নয়। ওই তো রাস্তার ওপারের কোন একটা বাড়ীতে রেডিয়ো বাজছে। আমি চকিত হয়ে উঠলুম। আশ্চর্য—এই রাত্রে আমার মনের কথাটা এমন করে কে জানল? কে জানল—আজ এই মুহূর্তে এই গানটাই একটা নৈপথ্য সঙ্গীতের মতো আমার প্রতিটি স্নায়ুতে স্নায়ুতে বেজে চলেছিল?

'অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহি রে—'

তো নেই—একুশ বছরের রঞ্জাকে আমি দেখব কী করে? শুধু স্বরে, শুধুই পায়ের শব্দে? সেই চার বছরের মেয়েটি—কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে যার লাল রিবন বাঁধা? ফুল কিংবা জামরুল খাওয়ার সময় যার লোভীর দৃষ্টি?

'তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম খেলার ঘরেতে
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে প্রলয় ঝড়েতে—'

ঠিক সেদিনে সে খেলা ঘরের পুতুলটা ভেঙে গেছে। কিন্তু সে পুতুল তো আমিই। এখন পেছনের তুষারের ওপর নিজের ছোট ছোট পায়ের চিহ্ন ছাড়া কিছুই আর দেখতে পাই না। রঞ্জা আজ একুশ বছরের বসন্তে রাজকন্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। কুঁড়ি যেমন করে ফুল হয়ে ওঠে, তেমনি ভাবেই সে ফুটে উঠেছে ধীরে ধীরে।

মালিমার কথাটা ভেসে উঠছে স্মৃতির ওপর।

—যা বলেছেন দিদি। বড় হোক—তারপর দুটিতে বিয়ে দিয়ে দিন। তখন আমার মেয়ে এর শোধ নিতে পারবে।

আমার হাসি পেলো।

আচ্ছা, সেদিনের প্রস্তাবটা আজ যদি মা আবার নতুন করে তোলেন? যদি বলেন, দিদি ছেলেবেলায় কিন্তু কথা হয়েছিল, এদের দুজনের বিয়ে দিয়ে—

ষোলো বছর আগেকার সেই হাল্‌কা একটা কথার টুকরো। নিতান্তই বাতাসে ভাসিয়ে দেওয়া।

আমি ছাড়া আর কেউ মনে রাখেনি—কারো মনে রাখবার মতোও নয়। এই ষোলো বছর ধরে কত সূর্য উঠেছে, বর্ষা পড়েছে, উলঙ্গা করেছে—গড়াই নদী দিয়ে কত জল এগিয়ে গেছে সাগরের দিকে। সেই স্রোতে আমি আর দিদি যে-সব কাগজের নৌকো ভাসিয়েছিলুম—তাদেরই মতো এই একটা কথার টুকরো কোথায় ডুবে গেছে, কবেকার জলের ধারায় মিশে গলে নিঃশেষ হয়ে গেছে। কেবল আমিই তাকে ধরে রেখেছি। দিদির সেই বাসর ঘরটার মতো স্মৃতির দরজাটা খুলে দিলেই কতদিনের হারানো গন্ধের উচ্ছ্বাস হয়ে আবার বুকের মধ্যে তা নতুন করে ছড়িয়ে যায়।

আমি আর রঞ্জা! এখন কে কোথায়!

আমি অঙ্ক। অঙ্কের স্কুলে লেখাপড়া শিখে বি. এ.টা পর্যন্ত পাস করেছি। বাবা আর কাকা মিলে এই ছোট বাড়ীটা তৈরী করেছিলেন কলকাতায়—তাই মাথা গোঁজবার জায়গাটুকু আছে। বড়দা দিল্লী থেকে মা-কে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠায়। আর আমি একেবারে নিশ্চিন্ত—নিজের ঘরে বসে বসে খেয়াল খুশি মতো এলোমেলো লিখে দিন কাটাই। রঞ্জা এখন অনেক দূরে—অনেকখানি আকাশ পেরিয়ে বহুদূরের কোনো তারার জগতে।

রঞ্জা আমাকে বিয়ে করবে?

কোনো পাগলও এমন অসম্ভব স্বপ্ন দেখতে পারে না। রঞ্জা দূরে থাক—কোনো মেয়েই কি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে? দিতে চাইবে একটা অন্ধ—অক্ষম—নিরুপায়ের ভার?

গানটা কে গাইছে রেডিয়োতে? ভারী সুন্দর গলাটি কিন্তু। রঞ্জাই নয় তো? দিদি বলছিল, খুব ভালো গান শিখেছে সে।

'থাক তবে সেই কেবল খেলা,
হোক না এখন প্রাণের মেলা
তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-বীণায় গাহিরে—'

না—আবার লেখা শুরু করি। আসলে আলো নেভার কাহিনীটাই লিখতে বসেছিলুম। সেই আকাশ-আলো-গড়াই নদীর ধারে কেমন করে আমার চোখ চিরদিনের মতো ডুবে গেল, সেইটেই বলতে চেয়েছিলুম। কিন্তু খেই হারিয়ে ফেলছি বারবার। কোথা থেকে কোথায় যে চলে যাই!

কিন্তু আর লেখা হল না। আজো মা চলে এসেছেন। সেই চেনা পায়ের আওয়াজ। সেই খুট করে সুইচ্ জ্বলে ওঠা।

—আজো আবার রাত জাগছিস বাবা?

—না মা, এই শুতে যাচ্ছি।

টেবিলের ওপর লেখাটা রাখলুম, এগিয়ে গেলুম বিছানার দিকে, শুয়ে পড়লুম ক্লান্ত মাথাটাকে বালিশে এলিয়ে দিয়ে। মা-র পদ্মের মতো হাতখানা টের পেলুম বুকের ওপর—চাদরটা টেনে দিচ্ছেন। ইচ্ছে করল, হাতখানা টেনে ধরে ছেলেবেলার মতো, বলি: মা তুমি যেয়ো না। আজ থাকো আমার কাছে। আমার ভয় করছে।

মা চলে গেলেন।

আমার পায়ের কাছের খোলা জানালা দিয়ে হাওয়া আসছে। কেমন ভিজে ভিজে হাওয়া।

হয়তো বৃষ্টি আসবে—হয়তো দক্ষিণের আকাশ ঘিরে মেঘ উঠছে—যেমন করে উঠে আসত গড়াই নদীর বাঁকের মুখে সেই নীলকুঠিটার ওপর দিয়ে।

সেই নীলকুঠি! বুকের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা ভয়ের তরঙ্গ দুলে উঠল। সেই কালো অন্ধকার ইঁদারাটা যার ভেতর থেকে—না—আজ আর নীলকুঠির কথা নয়। এই রাতে সেই বিভীষিকাকে আমি জোর করে দূরে সরিয়ে দেব। এখন আমার চোখে একটা নরম শান্ত ঘুম ঘনিয়ে আসুক ধীরে ধীরে। সেই ঘুমের ভেতর দিয়ে আমি দেখতে চেষ্টা করব—আমার অন্ধ চোখ দুটোকে স্বপ্নের মধ্যে ফুটিয়ে তুলে দেখতে চাইব—কেমন করে সেদিনের একটা ছোট পুতুল একুশ বছরের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে রাজকন্যা হয়ে জন্ম নিল!]

৮ চার ॥

চা খেয়ে সকালে আবার লিখতে বসেছি। আবার কাগজের ওপর খুট খুট করে ফুটিয়ে তুলছি রাশি রাশি বিন্দুকে। অন্ধের কথা। যেন বাজিয়ের হাত ছাড়া সেতারের তারে ঝঙ্কার ওঠে না, তেমনি অন্ধের আঙুল না হলে এ কথাগুলোর অর্থ ধরা দেবে না এ লেখা টুনটুন পড়তে পারবে না—রঞ্জাও নয়।

মনে পড়ছে যখন ব্রাইত্ স্কুলে ভর্তি হই, তখন আমাকে নিয়ে কী সমস্যা ওঁদের।

আমি জন্মান্ধ নই। অন্ধকারের বন্ধ দেওয়ালের ভেতর তো আমি আসিনি। বই চিনি, হরফ চিনি, পৃথিবীর আলো—রঙ—সব কিছুর রহস্যই আমার জানা। আমার চোখের সেই চেনাকে ভুলিয়ে দিয়ে—অনুভবের মধ্যে আমার তৃতীয় দৃষ্টিটিকে ফুটিয়ে তুলতে ওঁদের অনেক কষ্ট হয়েছিল—অনেকদিন সময় লেগেছিল।

'অন্তরে আজ দেখব, যেথায় আলোক নাহিরে।' 'কী ভেবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, তিনিই জানেন। চোখের আলো যার কখনো ছিল না, তার মনের চোখে তমসার সমুদ্রের ভেতর বিশ্ব অনুভূতির কালো পদ্মটি আপনা থেকেই ফুটে ওঠে—ধ্বনিতে, গন্ধে, স্পর্শে একে একে সেই নিশিপদ্মটি তার পাপড়িগুলোকে মেলে দিতে থাকে। কিন্তু গড়াই নদীর জলে যে সূর্যকে উঠতে দেখেছে, দেখেছে দুপুরের রোদে আকাশে মেঘের আসা-যাওয়া, সমস্ত পাতাগুলোকে একেবারে ঢেকে দিয়ে সারি সারি সোনারঙের চাপা ফুটেছে যার চোখের সামনে, সন্ধ্যের কাঁটার শেষে নির্জন পথে সন্ধ্যার গায়ে ঝমর ঝমর করে মল বাজলে যে কুলগাছের মাথায় মাথায় তারার ফুলকির মতো জোনাকি জ্বলতে দেখেছে—হঠাৎ আসা অন্ধকারে তার দৃষ্টি কি নতুন করে জাগতে চায়? দিনের শতপর্ণী যেখানে এখানে আলোর বৃন্তে স্থির হয়ে রয়েছে—সেখানে কি ফুটতে পারে নিশিপদ্ম—তামসী মধু দিয়ে ভরে নিতে পারে মর্মকোষ?

তাই আমাকে নিয়ে ওঁদের খুব কষ্ট পেতে হয়েছিল।

ধীরে ধীরে সব সহজ হয়ে এল, ফুটে উঠল অন্ধকারের কমলটি। আলোর স্মৃতি যা কিছু ছিল সব এখন এই সোল-টেবিলটার মতো একটা ছোটো বৃত্তে বাঁধা পড়েছে। বাকী সব ধ্বনিময়—গন্ধময়—স্পর্শময়।

আমি সেই বৃত্তের কথাই লিখছিলুম।

গড়াই নদীর বাঁকের মুখে নীলকুঠি। কতকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে জোপঝাড় আর কতগুলো গাছপালার আড়ালে। বড়ো বড়ো খালিঘর—বাদুড় চামচিকের আস্তানা, দরজার কবাট নেই—ঘরগুলো যেন হাঁ করে আছে। একদিকে খানিকটা ধ্বসে পড়েছে, সারা বাড়ীময় অজস্র ফাটল—অসংখ্য বট-অশথের চারা। লোকজন কেউ যায় না ওদিকে—শুনেছি কখনো কখনো এক আধজন পাগল কিংবা ভিক্ষুক এসে দু-চারদিনের জন্যে বাসা বাঁধে।

নদীর ধারে এসে দাঁড়ালেই ওই পোড়ো বাড়ীটা আমায় হাতছানি দিত। একটা অদ্ভুত আকর্ষণে টানতে থাকত।

কতবার বাবাকে বলেছি, বাবা—ওখানে বেড়াতে যাব।

বাবা বলতেন, না, ওই জংলা পোড়োবাড়ীতে যেতে নেই।

—ভূত আছে?

বাবা বলতেন, ভূত-টূত বাজে কথা। বন-জঙ্গলে না যাওয়াই ভালো। বিছুটি আছে, কাঁটাবন আছে; সাপ-খোপও থাকতে পারে।

কিন্তু ওই নিষেধটাই আমার মনকে আরো বেশি দুলিয়ে দিত। ভূতই যদি না থাকে, তবে কিসের ভয়—কাকে ভয়! তা ছাড়া যতক্ষণ আলো আছে, দিন আছে—ততক্ষণ আমার কোনো ভাবনা নেই। শুধু নীলকুঠি কেন—গড়াই নদী পার হয়ে, তার বনঝাউ আর কাশফুলে ভরা সেই মস্ত চরটাকে ছাড়িয়ে—কতদূরে—কতদূরে আমি চলে যেতে পারি।

AMRITA

an intimate and engrossing
BENGALI WEEKLY

EDITOR : TUSHAR KANTI GHOSH

Publishers
AMRITA PUBLISHERS
PRIVATE LTD.
11-D, Ananda Chatterjee Lane,
Calcutta-3
Telephone: 55-5231 (14 lines)

PRICE PER COPY
40 nP. ONLY

সেদিন ছুটির দুপুর। বাবা ঘুমুচ্ছিলেন। মা শোওয়ার ঘরে কী যেন সেলাই করছিলেন একমনে। আর দিদি গিয়েছিল রঞ্জাদের বাড়ীতে বেড়াতে। আমি বসে বসে একা একাই ক্যারম-প্যাডার খেলছিলুম।

তিনবার একশোর ঘরে পৌঁছুবার পর আর আমার ভালো লাগল না। আমি আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এলুম। শীতের শেষ—গাছে গাছে রূপালি-সোনালি আমের মুকুল ভরে উঠেছে। নরম শান্ত রোদে মুকুলের গন্ধ। কোকিল ডাকছে এদিকে—ওদিকে—আমাদের চাঁপা গাছটায় দুটো দোয়েল এসে বসেছে।

বাড়ীর দক্ষিণ দিক বেয়ে যে পায়ে চলার পথটা চলে গেছে রাখালদের পাড়ায়—আমি অন্যমনস্ক ভাবে সেইটে ধরে হাঁটতে শুরু করলুম। দুধারে ভাঁটফুল ফুটেছে, হাওয়ায় উড়ছে শিমুলের ফুল, তাদের সঙ্গে উড়ছে নানা রঙের প্রজাপতি। কাঁচপোকা দেখেছি এখানে ওখানে—এদের ধরতে পারলে দিদি টীপ তৈরি করবার জন্যে একটা ছোট কাচের শিশিতে আটকে রেখে দেয়। ফুল, প্রজাপতি, পাখি আর কাঁচপোকা দেখতে দেখতে কতদূরে চলে গেছি—তারপর—তারপর চমক ভাঙলে দেখি, আমার বাঁদিকে গড়াই, আর সামনে সেই নীলকুঠি।

দিনের আলোয়—প্রথম বসন্তের রোদে পুরোনো আস্তর-খসা, ভেঙে পড়া, কার্টল লাগা বাড়ীটা। সামনে ছোট মাঠটা জুড়ে চোর কাঁটা আর ভাঁটফুল। লালখোপ কোথাও চোখে পড়ল না। দেখলুম কয়েকটা ছাগল চরছে—তিন চারটে খঞ্জন পাখি ক্রমাগত লাফিয়ে লাফিয়ে কী যেন খুঁটে খাচ্ছে ঘাসের ভেতর। আর চারদিক কী নির্জন—কী নির্জন। শুধু বাতাসে ভাসছে শিমুল তুলো—উড়ে উড়ে ঘুরছে প্রজাপতি।

আমি নীলকুঠির দিকে এগোলুম। আর দেখতে পেলুম একটা পুরোনো মস্ত ইঁদারা।

ইঁদারাটার কাছে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিলুম।

প্রথমে কিছু দেখতে পাই না—শুধু অতল অথৈ অন্ধকার। মনে হল এই যেন পাতালের পথ—এর ভেতর দিয়ে একবার নেমে পড়তে পারলেই বুঝি সোজা নাগকন্যার দেশে গিয়ে পৌঁছোনো যায়। একমনে এমনি একটা কিছু ভাবছিলুম—হঠাৎ মনে হল, অন্ধকারের ভেতরে—আমার মাথা থেকে খানিক নীচেই—কেমন শোঁ শোঁ ফোঁস ফোঁস করে আওয়াজ উঠছে।

তারপরেই আমি দেখলুম।

কী দেখলুম? জানি না। শুধু সেই অন্ধকারের ভেতরে দুটো আগুনের টুকরোর মতো চোখ। কার চোখ—কিসের চোখ আমি জানি না। কেবল মনে পড়ে—সে দুটো জ্বলছিল—অসহ্য বিষাক্ত হিংসায় জ্বলছিল।

আকার নেই—কেবল সেই দুটো হিংস্র বিষাক্ত চোখের নিষ্ঠুর ক্রূরতা দেখে আমার রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালুম আমি। জানলুম—আকাশভরা আলোর ভেতরেও কোথাও কোথাও লুকিয়ে থাকে নির্মম ভয়ঙ্কর অন্ধকার—আলোর মানুষ তার ভেতরে অনধিকার চর্চা করলে তার জন্যে কঠিন মূল্য দিতে হয় তাকে।

বাড়ীতে পালিয়ে এলুম। কাউকে কিছু বলতে পারলুম না—ভয়ে, লজ্জায়। সারারাত ঘুম এল না—খালি মনে হতে লাগল এক চাপ অন্ধকারের ভেতর থেকে দুটো আগুনে হিংস্র চোখ উঠে এসে আমার বুকের মাঝখানে দুটো কাঁটার মতো বিঁধে রয়েছে।

অনধিকার প্রবেশের ঘণ্ড এল পরের দিন।

সকাল থেকেই কেমন যেন লাগছিল শরীরের ভেতর। আমি চুপচাপ বাইরের রোদে এসে বসেছিলুম।

মা বললেন, তখন থেকে অমন ভাবে রোদে বসে কেনরে?

বললুম, ভারী শীত করছে মা!

মা এসে হাত রাখলেন কপালে। সেই ভরা পদ্মের মতো নরম, ঠাণ্ডা হাতখানা।

—এ কি! জ্বর আসছে যে!

—না, জ্বর আসবে না!—আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাতে চাইলুম।

—আসবে না কিরে, এসেই তো গেছে। ওঠ হতভাগা, শীগ্‌গির ওঠ্—

জোর করে তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

কী যন্ত্রণা শরীরে—কী অসহ্য যন্ত্রণা! জ্বর বাড়তে লাগল, ঘোর নেমে এল চোখে। আর শরীরের সেই যন্ত্রণার সেই জ্বরের তীব্র নেশায়—আমি অনুভব করতে লাগলুম, জানালার বাইরে কাঁটালী চাঁপার গাছটার সোনা রঙের অসংখ্য ফুল ফুটেছে—দূরের গরম বাতাসে তার গন্ধ আমার মুখে চোখে এসে আছড়ে পড়ছে।

চাঁপার গন্ধের সুর আবার কেটে যায় পরক্ষণই। হঠাৎ চমকে উঠি। নীলকুঠির সেই ইঁদারার ভেতরে, সেই কালো পাতালের অন্ধকার গহ্বরটায় দুটো চোখ আমার দিকে এইভাবে তাকিয়ে আছে, আওয়াজ তুলছে, শোঁ শোঁ ফোঁস-ফোঁস্—

থেকে থেকে চিৎকার করে উঠি: মা—ও কিসের চোখ? কার চোখ?

চাঁপার গন্ধে, শরীরের যন্ত্রণায়—সেই দুটো দুর্বোধ্য চোখের দুর্বোধ্য আতঙ্কে কখন আমার রাত্রিদিন একাকার হয়ে গেল। একটা সুদীর্ঘ, স্থায়ী, কণ্টকশয্যার মতো অসীম ভয়ের কালো রাত আমায় ঘিরে রইল কতদিন। তারপর একদিন যন্ত্রণার পালা ফুরোলো, মা হাতে ধরে আমায় বিছানায় তুলে বসালেন।

—মা মাগো! ঘরে কত রাত। একটা আলোও যে তুমি জ্বালোনি।

মা জবাব দিলেন না।

—মা, ওই তো বাইরে পাখি ডাকছে। চাঁপার গন্ধ পাচ্ছি। ওই যে পুকুলের গলা শুনছি—সে তো কখনো রাতের বেলায় আসে না, আসে না আমাদের বাড়ীতে।

আমার হাতে মা-র হাতের মুঠোটা শক্ত হয়ে গেল।

—মা, তবে তো এ দিন। আমি তা হলে কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন? কেন পাচ্ছি না?

এবারেও মা জবাব দিলেন না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন কেবল।

সব জানলুম ক্রমে ক্রমে। আমার বসন্ত হয়েছিল। দুটো চোখের অর্ঘ্য নিয়ে এ যাত্রা সে আমায় মুক্তি দিয়েছে। নীলকুঠির অতল ছোয়া ইঁদারার ভেতরে অন্ধকারের দূত হয়ে সে দুটো চোখ উঠে এসেছিল, তারাই আমার আলো কেড়ে নিয়ে আপন করে নিলে।

—মা মাগো! তুমি কোথায়? তোমার হাতখানা কই? একবার রাখো আমার বুকের ওপর।

আমার অতল-সমুদ্রে প্রথম কুড়িটি জেগে উঠল। শুধু স্পর্শ, শুধু শব্দ, কেবল অনুভব।

নিজের মুখে নিজেই হাত বুলিয়েছি কতবার। বসন্তের ক্ষত চিহ্নগুলো এখনো আছে এখানে ওখানে; রেলের বিন্দুর মতো ওদের আমি আঙুলের ছোঁয়া দিয়ে পরীক্ষা করি—একটা দুর্বোধ্য লিপির মতো পাঠোদ্ধার করতে চাই। ওদেরও কি কোনো মানে আছে—কেউ কি কিছু সাজিয়ে সাজিয়ে লিখে দিয়েছে ওদের?

আমার ভাগ্যলেখা? আমার অদৃষ্টের সংকেতলিপি?

হাসি পায়। অদৃষ্টকে আমি বিশ্বাস করি না।

—সোনাদা!

ঘরে হাল্কা পায়ের শব্দ। একটা ছোট পাখি যেন টিপ টিপ করে হেঁটে এল। টুনটুন।

—কি করছ সোনাদা?

—কিছু না—কিছু না। একটু লিখছিলুম।

—কবিতা?—টুনটুনের স্বরে আগ্রহ: পড়ো না।

—না, কবিতা নয়। ['পাতুসগনে সখি সন্ধ্যা তারা'—নিজের লেখা সেই কবিতাটা ওকে শোনানো যায়? না—যায় না। ও আমার ছোট বোন, আর মায়ের মতো ওর মন।]—আমি একটু চুপ করে থেকে বললুম, এলোমেলো লেখা—কোনো মানে নেই।

—ও।

টুনটুনেরও কী যেন একটা ভালো নাম আছে বাবার মতো? হাঁ, মনে পড়েছে। এনাক্ষী। হরিণনয়না। হরিণের চোখ আমি কখনো দেখেনি, সংস্কৃত কবিতায় তার স্তুতি শুনেছি অনেক। কেমন সে চোখ? খুব সুন্দর, খুব গভীর, খুব কালো? না না কালো নয়, অনেক বড়ো একটা শরতের আকাশের মতো নিবিড় নীল? আর সেই নীলের ওপর কি সন্ধ্যা-সকালের সব রঙ—রামধনুর সমস্ত মায়া ধরা পড়ে?

টুনটুনের নাম এনাক্ষী। হরিণের মতো চোখ। আমি কখনো হরিণের চোখ দেখিনি—টুনটুনের চোখও দেখতে পাবো না।

আবার ডাকল: সোনাদা!

—কিরে?

—রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনবে?

ও গান গাইতে পারে না, মধ্যে মধ্যে মিষ্টি হাতে সেতার বাজায়। বর্ষায় ওর আঙুলে নটমল্লার নাচে, সন্ধ্যা বেহাগের সুরে ভরে ওঠে। শুনেছি ছবিও আঁকে, কিন্তু সে তো আমার সীমার বাইরে। আবৃত্তির গলাটিও ভারী সুন্দর ওর—নানা জায়গায় প্রাইজ পেয়েছে।

কাকার মতো বৈষয়িক এ্যাডভোকেটের মেয়ে হয়ে কেন জন্মালো টুনটুন? কেন ও আমার আপন বোন হল না?

কিন্তু চিন্তার বিন্দু সাজানোর চাইতে এই মুহূর্তে ওর কবিতা শোনাই আমার ভালো মনে হল। তা ছাড়া যা লিখতে চাইছি, তা কিছুতেই ঠিক মতো গুছিয়ে তুলতে পারছি না—কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ওকে বললুম, শোনা।

একটা ছোট মোড়া টেনে নিয়ে ও বসল—আমি টের পেলুম। ওর চুলের গন্ধ ভেসে এল হাওয়ায়।

—কী পড়ব সোনদা ?

একবার ইচ্ছে হল বলি, 'সুবলদাদের প্রথম।' কিন্তু ও কথাটা কি বরাবরই বলা যায় আজ ? আমার সেই ছেলেবেলার পুতুল কোথায় হারিয়ে গেছে, কী পাপ আছে আমার বক্ষ দশতন্ত্রের ওপর ?

টুনটুনকে বললুম, পড়—তোর যা খুশি।

টুনটুন বইয়ের পাতা উল্টে চলল। আমি কান পেতে রইলুম। প্রত্যেকটা পাতার উল্টে যাওয়া বুঝতে পারছি। একখানা ছবি চলে গেল, তারও আওয়াজ উঠল টুনটুনের আঙুলে। তারপর একটুখানি গলাটা পরিষ্কার করে নিলে, সুরেলা মিঠে আওয়াজে সমস্ত ঘরটা যেন ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে উঠল।

"বোলো, তারে বোলো
এতদিনে তারে চেনা গেছে।
যখন রয়ে রয়ে
ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে
উন্মীলিত ভস্মোরের খোলো।
বনের মন্দির মাঝে
তখন তম্বুরা বাজে
অনন্তের ওঠে শুধু গান,
স্তব্ধে জল বহে যায়—"

র‍্যালে

গত ৭৫ বছর ধরে সাইকেলের তালিকায়
শীর্ষতম নাম

১৮৮৮ সাল থেকেই র‍্যালের শ্রেষ্ঠত্ব সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের দ্বারা পরীক্ষিত ও স্বীকৃত। গত ৭৫ বছর ধরে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে র‍্যালে ক্রমাগতই উন্নততর হ'য়ে উঠছে। আজ তাই আগের তুলনায় সব চাইতে উন্নত যে র‍্যালে আপনি পাচ্ছেন তা' শুধু অতুলনীয় এবং কাজের দিক থেকে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।

র‍্যালে কেনা সব সময়ই লাভজনক।

অধিকতর আরামের জন্য
উইট্‌কপ
সীট লাগান

সেন-র‍্যালে

টুনটুনের গলার স্বরে কবিতার শান্ত গভীর মহিমায় আমার মনের চোখও বুজে আসতে চাইল। এ কবিতা কেমন করে লিখতে পারে মানুষ! এ কী দেখা—কী আশ্চর্য দেখা! বাইরের চোখ দিয়ে কি এমন করে দেখা যায়? মনের গভীরে তলিয়ে না গেলে, পৃথিবীর সব শব্দ নিরালোক নৈঃশব্দের নিবিড়ে না পৌঁছুলে এমন করে কি তম্বুরা বেজে ওঠে?

টুনটুন পড়ে চলেছে। অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে মগ্ন হয়ে যাচ্ছি আমি।

"ষোলো তারে আজ,—
অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ।
কিছু হয় নাই বলা,
রেখে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।
আমার বক্ষের কাছে
পূর্ণিমা লুকানো আছে,
সেদিন দেখেছ শুধু অমা।
দিনে দিনে অর্ঘ মম
পূর্ণ হবে, প্রিয়তম,
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা।"

—ভালো লাগল সোনাদা?

—ভালো লাগল।

—আরো পড়ি দুটো একটা।

—তুই যতক্ষণ খুসি পড়। আমার ভালো লাগা কিছুতেই ফুরোবে না, দেখে নিস।

টুনটুন পাতা উল্টাতে লাগল আবার। আর আমি ভেবে চললুম, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তো সহজেই বলে যেতে পেরেছেন। কিন্তু আমি কাকে বলব? কে শুনবে আমার পূর্ণিমার কথা?

টুনটুন আরো কয়েকটা কবিতা পড়ল একের পর এক। কিছু শুনছি—অনেকটা শুনতে পাচ্ছি না। সেই প্রথম কবিতাটাই গুনগুন করে চলেছে কানের ভেতরে। কত রাত্রির কত চৈত্র মাসের 'প্রচ্ছন্ন পুষ্পের বাস' অনুভব করছি আমি। বুকের মধ্যে তম্বুরা বেজে চলেছে একটানা। 'অনন্তের ওঠে স্তব গান—'

—সোনাদা?

আমার চমক ভাঙল।—আঁ?

—আজকে এখন থাক। কেমন?

—আচ্ছা, কাল শোনাবি আবার।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। টুনটুনের মনের ভিতরও কবিতার গুঞ্জন উঠেছে নিশ্চয়। ও-ও কিছু ভাবছে? কিন্তু কি ভাবছে? দু একবার খসখস করে আওয়াজ উঠল ওর শাড়ীতে, হাতের চুড়িও টিনটিন করে উঠল। কয়েক বছর আগে মা-র হাতেও অমনি চুড়ির আওয়াজ শুনতে পেতুম। এখন আর পাই না। মা-র হাত নিরাভরণ।

টুনটুন বললে, আসছে শনিবার কিন্তু আমাদের মোক্ষদাতে সোনাদা।

—সে কিরে! এর মধ্যে সব তৈরী হয়ে গেল? তোদের নাটক?

—সেই যে—বুদ্ধদার।

আমি ভাবতে চেষ্টা করলুম। দেখা না-দেখায়, অলস ভাবনায়, ঘুমে স্বপ্নে দিনগুলো আমার কী ভাবে কাটে। আমার সময়ের কোনো হিসেব নেই। একটা দিনের ভেতরে যখন তিনটে দিন আসে—একটা রাত যখন চারটে দিন পার করে দেয়। এই তো যেন সেদিন এসে ও আমাকে 'অক্ষদ-রতন' শুনিয়ে গেল। এর মধ্যে ক'বার সূর্য উঠল—ক'বার ডুবল? কিছুই জানি না, কিছুই আমি টের পাইনি।

—তুইও তো পার্ট করবি, না রে টুনটুন?

—বাঃ, তুমি সব ভুলে গেলে সোনাদা? আমি হচ্ছি হিরো—অভিজিৎ। মনে নেই তোমার?

—ঠিক মনে পড়েছে বই কি।—আমি লজ্জিত হলুম: কিন্তু এত ছোট্ট, এত রোগা অভিজিৎ? তুই কি বিভূতির যন্ত্রকে ভেঙে দিতে পারিস? তোকে মানাবেই বা কেন?

টুনটুন হাসল। একটা জলের ঢেউ যেন ভেঙে পড়ল কোথাও।

—সে হয়ে যাবে একরকম। যাবে তুমি দেখতে?

—দেখতে নয়।

একটু লজ্জা পেলো টুনটুন, আমি জানি ব্যথাও পেলো। এই ব্যথাটুকু ওকে দিতে আমার ভালো লাগে, যেমন ভালো লাগে, কখনো কখনো মা-র দু ফোঁটা চোখের জল আমার মুখের ওপর ঝরে পড়লে।

—তুমি শুনবে সোনাদা! —স্নিগ্ধ স্বরে টুনটুন বললে, শুনে বলবে কেমন হল।

—কিন্তু না দেখলে কি বলা যায় রে?

টুনটুন আবার চুপ করল। আমি ওর চোখ দেখতে পাচ্ছি না—হরিণের মতো, আকাশের নীলের মতো চোখ। তবু বুঝতে পারছি, এই মুহূর্তে সেই চোখের কোণা দুটো ওর জলে উঠেছে।

তারপর জোর করেই হেসে উঠল। সহজ করে নিতে চাইল সব।

—আমাদের সবাইকেই যে কেমন মানাবে সে তো ভালোই বুঝতে পারছ তুমি। কাজেই সে দৃশ্য দেখার চাইতে শোনাই ভালো হবে। সত্যি, যাবে তো তুমি?

আমি হাসলুম এবার। টুনটুনকে বুঝতে আমার বাকী নেই। সেই পুরোনো কথাটাই। আমার এই একলা বসে থাকা, এই ঘরের মধ্যে মেঘের ওপর মেঘের মতো ভাবনার ভার জমিয়ে তোলা, এইটে থেকেই ও আমায় মুক্তি দিতে চায়। বার বার নিয়ে যেতে চায় স্বাভাবিক সাধারণ জীবনের মাঝখানে, মনে করিয়ে দিতে চায়, সকলের ভেতরে আমিও একজন। বিচ্ছিন্নতার দ্বীপে আমার এই তামস নির্বাসন ও সইতে পারে না।

আমার ওপরে ওর আশ্চর্য মমতা। সেইজন্যেই তো ওকে ছোট মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে। টুনটুনেরও একদিন বিয়ে হবে—কেউ ওকে নিয়ে চলে যাবে, এটা ভাবতে আমার ভালো লাগে না। মা-র সঙ্গে আর একটি ছোট্ট মাকে পেয়েছিলুম, তার ফাঁকা আসনে আমি ভরে নেব কী দিয়ে?

টুনটুন বললে, তা ছাড়া ভালো গানও কিন্তু আছে সোনাদা।

—তাই নাকি? কে গাইবে?

—কলেজের মেয়েরা। আর—

—আর আমাদের একজন এক্স্-স্টুডেন্টও গাইবে সেদিনকার ফাংশনে। রঞ্জা দাশগুপ্ত। চমৎকার গায় সোনাদা। রেকর্ডও বেরিয়েছে একখানা। বেশ নাম করেছে।

রঞ্জা দাশগুপ্ত!

আমার বুকের ভেতরটা এমন করে দুলে উঠল যে মনে হল বাইরে থেকেও তার তরঙ্গটা দেখতে পাবে টুনটুন। বাংলাদেশে এই নামটা কি এতই সাধারণ—এখানকার মেয়েরা কি এই নামটি ছাড়া কিছুই খুঁজে পায় না আর? কিংবা তা যদি না হয় তাহলে আমার সামনের গোল টেবিলটার মতো পৃথিবীটা কি এতই ছোট হয়ে গেছে যে হাত বাড়ালেই আমি তার সম্পূর্ণটা পেয়ে যেতে পারি? আমার পুতুল কি আমারই আলোর সীমার ভেতরে স্থির হয়ে রয়েছে—তাকে ছাড়িয়ে এখনো সে চলে যেতে পারেনি—এই দীর্ঘ ষোলো সতেরো বছরেও নয়?

—যাবে তো সোনাদা?

আমাকে খুশি করতে চায়। শাদুকের মতো নিজের সত্তাটাকে গুটিয়ে নিয়ে বসে আছি—আমাকে নিয়ে আসতে চায় চারদিকের সাজান চকল প্রাণস্পর্শের ভেতর; কিন্তু হঠাৎ রঞ্জার কথাটা কেন বলল ও? ওকি কিছু বুঝতে পেরেছে? কিছু কি ও জানে?

কিন্তু কিই বা ও জানতে পারে?

সেই চার বছরের পুতুল। যার সেই একটুকরো ভাসিয়ে দেওয়া কথা। তার সইয়ের সেই একটুখানি লঘু কৌতুক। হাওয়ায় উড়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঝরিয়ে দেওয়া কোন পাখির একটা ছোট পালক।

না—তার কথা কারো মনে নেই। আর টুনটুন তখন তো একটি প্রাণের কণা হয়ে দুলছিল ভোরের শিশিরে, নতুন পাতায়, দোয়েলের গানে, ধানের শিসে। ওর শরীর তখনও ওর স্বপ্নের বাইরে। ও জানে না—কেউ জানে না। কেবল আমিই তাকে ধরে রেখেছি নিজের স্মৃতির বৃত্তের ভেতর। আমার কৃপণ আলোর কৃপণ সঞ্চয়।

—কী ভাবছ সোনাদা? যাবে না?

যেন এক যুগ পরে আবার জিজ্ঞেস করল টুনটুন।

আমি আবার নিজেকে ফিরিয়ে আনলুম এই ঘরে। টুনটুনের পাশে।

বললুম, তুই তো চলে যাবি সেই কখন। ভোরের স্টেজ রিহার্সাল আছে, মেক আপ আছে। আমি কেমন করে যাব তোর সঙ্গে? ফাঁকা হলে আমায় বসিয়ে রাখবি বুঝি?

টুনটুন হাসল: বাবাও তো যাবেন। মা-জেঠিমাও যেতে পারেন। তুমিও যাবে তাঁদের সঙ্গে। অভিনয় শুনবে—গান শুনবে। কেমন—রাজী তো?

—রাজী।

—লক্ষ্মী ছেলে!

আমার কপালে একটা ছোট টোকা দিয়ে আদর করল টুনটুন, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটি পাখির পা টিপটিপ করে বেরিয়ে গেল বাইরে। ওকে আমি কখনো দেখিনি, কিন্তু

তবু দেখতে পাই। ছেলেবেলায় আমাদের বাগানে সেই যে রজনীগন্ধা ফুটত, ও তাদেরই একটি। অভিজিতের ভূমিকাতে কি ওকে মানায়? সেই যে একটি মানুষ—যার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের নাটকে কোথাও নেই—যাকে অভিজিত কখনো দেখেনি অথচ তার আসনের সামনে প্রত্যেক দিন যে করুণ প্রণামের সঙ্গে একটি শ্বেত পদ্ম রেখে যায়—সেই না দেখা নিঃশব্দচারিণীর সঙ্গেই তো ওর সত্যিকারের মিল।

টুনটুন।

আমার ছোট্ট বোন—আমার ছোট্ট মা।

॥ পাঁচ ॥

কলকাতার অন্ধ দিকেগুলের দিনগুলো ভেসে আসছে আজ। এক পৃথিবী ছাড়িয়ে আর এক পৃথিবীর দরজা যেখানে আমার খুলে গিয়েছিল, তার কথাই ভাবছি।

ছোট লাঠিটা হাতে করে চলেছি। চোখ না থাকার অভাব এখন আর মনেও পড়ে না। সব চেনা—সব অভ্যস্ত হয়ে গেছে এখন। আমার ডানদিকে ফুলের সারি। বিলিতী সিজন ফ্লাওয়ারের উৎসব পড়ে গেছে এখন। বড়ো বড়ো ডালিয়া ফুটেছে, জিরেনিয়াম, মার্কস্পার, প্যান্‌সি। আরো যে কত আছে তাদের নাম জানি না। কোনদিন দেখিনি ওদের—আমাদের গড়াই নদীর ধারের সেই সরকারী বাসায় তখনো ওদের আনাগোনা ঘটেনি। আমি রঙ দিয়ে, রূপ দিয়ে ওদের জানি না, কিন্তু হাত বুলিয়ে সকলকে চিনতে পারি। আমার চারদিকে মৌমাছিদের আনাগোনা টের পাচ্ছি—এমন কি বাতাসে যে মৃদুতম তরঙ্গ উঠছে প্রজাপতির পাখায়—তাও আমার চেতনাকে এড়িয়ে যাচ্ছে না। এমন কি যদি ঘাসের মধ্যে কান পেতে থাকি, তাহলে পোকাদের নিঃশব্দ কথালাপও আমি শুনতে পাব।

বসন্ত!

এম্‌নি এক বসন্তই তার রঙের দরবার থেকে আমায় নির্বাসন দিয়েছিল, কিন্তু সেকথা আর মনে পড়ছে না। কেবল কানে বাজছে, এমনি সব দিনগুলোতেই দিদি যেন লুকিয়ে লুকিয়ে গান করত: 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে, আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।' তখন নতুন সাবডেপুটি দিব্যেন্দুদা ঘন ঘন আসা-যাওয়া করত আমাদের বাড়ীতে, রোজ বিকেলে আমাদের বাড়ীর সামনে ক্রিং ক্রিং করে তার সাইকেলের আওয়াজ উঠত।

আর মা খুশি হয়ে বলতেন, এস বাবা দিব্যেন্দু, এসো। ওরে পরী কোথায় গেলি? দিব্যেন্দু এসেছে যে—ওকে চা করে দে একটুখানি।

চা করতে করতে দিদি চাপা গলায় গাইত: এলো ওই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে—

এখন বুঝতে পারি, সে গানের অন্য অর্থ ছিল। তিনমাস পরেই আমার জামাইবাবু হল দিব্যেন্দুদা।

লাঠিটা হাতে করে চলেছি তো চলেইছি। বসন্তের রোদ মুখে পড়েছে, একটু একটু জ্বালা করছে কপালে। হাওয়া খেলে যাচ্ছে আমার চুলে। আমিও নিজের মনেই গুনগুন করতে লাগলুম।

'আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে—'

কে যেন হেসে উঠল ডানদিকে। লজ্জা পেয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম।

ওপাশে পুকুর। বাতাসে জলের ছলো ছলো শুনতে পাচ্ছিলুম মধ্যে-মধ্যে, টুপটাপ করে মাছ লাফাবার আওয়াজ আসছিল। আমি প্রায়ই ভেবেছি, আমাদের এই পুকুরের ধারেও কখনো কখনো বক এসে বসে কিনা—দিনের আলো ডুবে এলে তার রঙ পাখার সঙ্গে কোন সুর জগতে ওরা উড়ে যায় কিনা। কিন্তু লজ্জায় কাউকে কোনোদিন সেকথা জিজ্ঞেস করতে পারিনি আমি।

আবার এক ঝলক হাসি উঠল পুকুরের দিক থেকে। জলের নয়—মানুষেরই। বুঝলুম ঘাটলার কাছাকাছি এসে পড়েছি। আর হাসিটা যেন চন্দ্রাদির বলে মনে হল।

—তোমার গানের গলাটি তো বেশ মিষ্টি!

চন্দ্রাদিই বটে। হেসে বললুম, ঠাট্টা করছো?

—না, ঠাট্টা নয়। তুমি গান শিখলেই পারো।

—গান আমার শুনতেই ভালো লাগে। শোনাতে নয়।

ঘাটলার ওপর ঠক ঠক করে লাঠির আওয়াজ শুনতে পেলুম। চন্দ্রাদি বোধ হয় এতক্ষণ ওখানে একা চুপচাপ বসেছিল, আমার সাড়া পেয়ে এইবারে কাছে উঠে এল।

—কিন্তু শোনাবার যোগ্যতাও তোমার আছে দেখছি। এতদিন জানতুম না। এসো আমার ক্লাসে—তালিম দেব।

—হু এতজন শ্রোতা থাকা ভালো চন্দ্রাদি। সবাই যদি গাইয়ে হয়—শুনবে কে?

—তা বটে, কথায় তোমায় পারা যাবে না। চলেছ কোথায়?

—কোথাও না। ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—চলো, আমিও যাই তোমার সঙ্গে। একা একা বসে থাকতে আমারও ভালো লাগছে না।

দু'জনে কয়েক পা এগোলুম পাশাপাশি। তারপরে বললুম, পুকুরঘাটে অমন একা একা বসে থাকা ভালো নয় চন্দ্রাদি। শুনেছি অনেক জল। যদি পা পিছলে পড়ে যাও—

—ডুবে মরব, এই তো? তা হলে তো বেঁচে যাই হিরণ। আত্মহত্যা করবার সাহস তো নেই—অথচ কেন যে বাঁচতে চাই, তাও জানি না। মৃত্যু যদি এমন করে আসে, তবে তো সে আমার মুক্তি।

—ছি ছি, কী যে বলো।

চন্দ্রাদি হাসল মনে হল, সে হাসির আওয়াজ শুনতে পেলুম না।

আমার চাইতে চন্দ্রাদি বয়েসে বড়ো। কত বড়ো ঠিক বলতে পারব না—হয়তো আট দশ বছরের, হয়তো কম, হয়তো বেশি। কিন্তু বয়েসের কথা ভাবি না। সবাই চন্দ্রাদি বলে ডাকে, আমিও ডাকি। দিদির চাইতেও ভালো গাইতে পারেন (রঞ্জার চেয়েও ভালো কিনা জানি না—তার গান এখনো শুনিনি)—আমাদের এখানে তিনিই গান শেখান। খুব ভালো বাসেন মীরার ভজন: 'মেরী গিরিধারী গোপাল, দুসর ন কোই।' আর জানেন চমৎকার বুনুনির কাজ। আমাদের স্টল থেকে ওঁর হাতের কাজ খুব বিক্রী হয়, মেডেলও পেয়েছেন কয়েকবার। তাদের দুটো সোনার। চন্দ্রাদি হাত বুলিয়ে বলেছিল, সবই তো এক রকম। সোনা-রুপোর তফাত কী—বলতে পারো?

পারি। কিন্তু বলিনি। রঙ যে কখনো দেখেনি, রঙের তফাত সে কোনোদিন বুঝবে না।

চলেছে। বড়ো বড়ো মহাজনী নৌকো থেকে জলের মধ্যে ঝুঁয়ে পড়ে পেতলের থালা ধুয়ে নিচ্ছে হিন্দুস্থানী মাল্লারা। সার-দেওয়া বজরা উঠব-উঠব করছে তখন, দিদি হাততালি দিয়ে দিয়ে নেচে নেচে বলছে: বক মামা, বক মামা, গান দিয়ে যা—

চন্দ্রাদি অন্যমনস্কভাবে ওই গানটারই সুর টেনে চলেছে তখন।

'আলোতে কোন্ গগনে, মাধবী জাগল বনে, এলো ওই ফুল জাগানোর—'

দিদি—দিব্যেন্দুদা।

না ওরা নয়। আমি চন্দ্রাদির কথাই ভাবছিলুম।

জমাট। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। বাবার অনেক টাকা ছিল ওর. সেই টাকার জোরে মনের মতো একটি সুপাত্রও কিনতে পেরেছিলেন। তখন চন্দ্রাদি আর কতো বড়ো? ষোলো-সতেরোর বেশি নয় তাঁর বয়েস।

টাকা দিয়ে পাত্র কেনা যেতে পারে, কিন্তু তার বেশি যে আর কিছু করা যায় না—চন্দ্রাদির বাবা নামকরা কন্ট্রাক্টার হয়েও সে কথা বুঝতে পারেননি। নতুন মনের মতো বাড়ী তৈরী করে তিনি মেয়ে-জামাইকে দান করেছিলেন, বোঝেননি, বাইরের ঘর দিয়েই মনের ঘর বাঁধা যায় না।

চন্দ্রাদির ঘরও বাঁধা হল না।

স্বামী টাকার জন্যেই বিয়ে করেছিল। একদিনের জন্যে ভালোবাসেনি, শ্রদ্ধা করেনি, মর্যাদা দেয়নি। যেন পরম অনুগ্রহ করেছে, এমনিভাবে বলত: আমি না হলে কী গতি হত তোমার?

তাও সইত। স্বামী সেখানেই থামল না।

অন্ধ যে চক্ষুষ্মানের চাইতে অনেক বেশি দেখতে পায়, তার শরীরে প্রতিটি শিরায়ায়ু যে সাধারণ সহজ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ, চন্দ্রাদির স্বামী তা ভাবতেও পারেনি। তাই চরিত্রহীন স্বামী স্বচ্ছন্দে একাধিক মেয়ে ঘরে এনে তাদের সঙ্গে প্রেম করতেন—তারা আদৌ ভদ্রঘরের কিনা তাতেও সন্দেহ ছিল। স্বামী ভাবতেন, অন্ধ তার নিজের ঘরে ঘুঘুচ্ছে, কিন্তু চন্দ্রাদির কিছুই অজানা ছিল না।

একদিন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। মদের সঙ্গে শুরু হল কদর্যতম ইতরামি, যা ভদ্রপাড়ায় কল্পনা করা যায় না।

চন্দ্রাদি নিজেকে নিয়ে চুপ করেই থাকত এ পর্যন্ত। কিন্তু সেদিন সে আর পারল না। স্বামীর ব্যবহারের সে প্রতিবাদ করল।

: ছি ছি, লজ্জাও করে না! তুমি না লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকের ছেলে?

অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করল জানোয়ার স্বামী। গায়ে হাত তুলল। কপাল কেটে নামল রক্তের ধারা। চন্দ্রাদি ফিরে এল মা-বাপের কাছে।

বাপ বলেছিলেন, মামলা করব। জেলে পাঠাবো রাস্কেলকে।

চন্দ্রাদি বলেছিল: না।

: না কেন? ওর শিক্ষা হওয়া দরকার।

: শিক্ষা দিয়ে কী লাভ বাবা? আমি তো ও-ঘরে আর ফিরে যেতে পারব না। তা ছাড়া যা হওয়ার সে তো হয়েই গেছে। এখন আর কী দরকার চারদিকে কেলেঙ্কারী ছড়িয়ে।

কিন্তু বাপের বাড়ীতেও আর মন টিঁকল না। যে অন্ধত্ব সম্পর্কে এতকাল তার কোনো চেতনাই ছিল না, বাইরের পৃথিবীর কাছ থেকে নিষ্ঠুরতম আঘাত খেয়ে তার আসল চেহারাটা এখন চন্দ্রাদির কাছে এতদিনে স্পষ্ট হয়ে গেছে। স্বামীকে ছেড়ে আসার এতদিন বাদে যেন নিজের আসল অবস্থাটা বুঝতে পেরে কিছুদিন সমানে কাঁদল চন্দ্রাদি। মনে হল, এই বাড়ীতেও একদিন সকলের কাছে পুরো বাতিল হয়ে যাবে সে—এখানেও সকলের অপমান আর অনুগ্রহ নিয়ে তিলে তিলে দুঃসহ জীবন কাটাতে হবে তাকে। চন্দ্রাদি মরমে মরে গেল। না—এখানেও নয়।

শেষে একদিন বাপকে গিয়ে বললে, যেখানে হয় আমার একটা ব্যবস্থা করে দাও। পাঠিয়ে দাও আর কোথাও। নইলে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আমি আত্মহত্যা করব।

তারপর এই অন্ধ-নিকেতন। সে আজ বারো-তেরো বছর হয়ে গেল।

এ-সব কথা সম্পূর্ণভাবে চন্দ্রাদির মুখ থেকে কখনো শুনিনি, মধ্যে মধ্যে আভাস পেয়েছি কেবল। আর নানা জনের কাছ থেকে টুকরো টুকরো খবর জোগাড় করে জুড়ে নিয়েছি একসঙ্গে। আর তা থেকে আর একটা জিনিসও স্পষ্ট হয়ে গেছে আমার কাছে। আমরা অন্ধ—আমরা আলাদা। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সুর মিলবে না।

দুজনেই নিজের নিজের ভাবনা নিয়ে চলেছিলুম। পুকুরের আর এক ধার দিয়ে আমরা হাঁটছি। এইখানে ছোট কোয়ারা আছে একটা, তার ঝিরঝির আওয়াজ কানে এল, গায়ে লাগল বৃষ্টির রেণুর মতো জলের ছিটে।

চন্দ্রাদি দাঁড়ালো।

—কাল দাদা এসেছিল।

ওর দাদার কথা আমরা সবাই জানি। সেক্রেটেরিয়েট্ কর্মেল, পুণায় থাকে। যখনই চন্দ্রাদিকে দেখতে আসেন, তখনই এখানকার বাচ্চাদের জন্যে নিয়ে আসেন টফি-চকোলেট্-লজেন্স, পুতুল, যেকোনো সেট্। আমাদের এই অন্ধ-নিকেতনও মধ্যে মধ্যে সাহায্য পায় ওঁর কাছ থেকে।

বললুম, শুনেছি। প্রিন্সিপ্যাল বলছিলেন।

—জানো, দাদা এবারও আমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

—গেলেই তো পারো।

– দূর, কী হবে গিয়ে?

– কেন, তোমার যেতে ইচ্ছে করে না?

—না, একেবারেই না।

পরিষ্কার, স্পষ্ট গলার স্বর। এতটুকুও জড়তা নেই।

আমার খারাপ লাগল। আমি কিন্তু ঠিক এমনি করে ভাবতে চাই না—ভাবতে পারি না। কী হবে গিয়ে? তা বটে। আমি—আমিও কি তার উত্তর জানি? কিন্তু চন্দ্রাদির মতো তিক্ততার, শূন্যতার স্মৃতি তো আমার নয়। মা-র স্নেহ, সকলের স্নেহ, উছলে-পড়া সংসারের মমতা। সকলের কাছে আমার প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে ফুরিয়ে গেছে, একথা আমার মন তো কিছুতেই মানতে চায় না। কোথাও আমার কোনো দাম নিশ্চয়ই আছে—কোনো ভূমিকা আছে।

একদিন সে আমি পাবই। সেই ভূমিকায় আবিষ্কার করব নিজেকে।

—কী ভাবছ কিরণ?—চন্দ্রাদি জানতে চাইল।

—কিছু না।

আবার চুপচাপ। দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছি। আমাকে এখনো সাবধানে চলতে হয়, কিন্তু চন্দ্রাদির কাছে সব সহজ। যে কখনো আলো দেখেনি—তার কাছে সব সহজ; শুধু ঐ রকম একটা নিষ্ঠুর স্বামীর কাছ থেকে বীভৎস আঘাতটা না পেলে পৃথিবীর ওপর কোনো অভিযোগ করত না চন্দ্রাদি। শুধু দুঃখ তাদেরই—যারা আলো পেয়েও তাকে হারায়। যেমন আমি, যেমন জন মিল্টন।

একটা বাজনার স্বর। গীটার বাজছে। একটি অন্ধ ইহুদী ছেলে এখানে এসেছে মাস তিনেক হল। গীটার আর পিয়ানো শেখায়।

চন্দ্রাদি দাঁড়িয়ে পড়লেন: মুনলাইট সোনাটা।

আমি বললুম, বীঠোফেন।

চাঁদের আলোর এই আশ্চর্য সঙ্গীত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগুরু—গানের রাজ্যে সেক্সপীয়ারের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। আজ দুশো বছরেও পুরোনো হল না। কিন্তু যে অন্ধ কখনো জ্যোৎস্না দেখেনি, দেখেনি নদীর জলে—গাছের পাতায় তার আলো-ছায়ার নাচ—সে ওর সম্পূর্ণ ইঙ্গিত কী করে বোঝে, কেমন করে পায় ওর বিপুল গভীর সৌন্দর্যের আভাস? কিংবা চোখ না থাকলেও পূর্ব জন্ম-জন্মান্তরের পর থেকে জ্যোৎস্না দেখার স্মৃতি ওই গানে রক্তের মধ্যে জেগে ওঠে: 'জননান্তর সৌহৃদানি।' আজ যা দেখি না—কত আগে, কত জন্মে তাকে দু চোখ ভরে দেখেছি। তাকি কখনো হারাই—হারাতে পারে? সুর—গান—পাখীর ডাক—জলের শব্দ—অতিচেতনার গভীর থেকে তা উদ্ধার করে আনে, রূপহীন একটা জ্যোৎস্নার আলো সমস্ত মনকে উদ্ভাসিত করে দেয়।

[লেখা বন্ধ করলুম। মনের মধ্যে টুকরো টুকরো চিন্তা আসছে। যে জন্মান্ধ সেই দুঃখ পায়, যা আলো দেখেও হারিয়েছে—দুঃখটা কেবল তারই? অথচ যাঁর পদ্ধতি নিয়ে এই যে কাগজের বিন্দু সাজিয়ে চলেছি—সেই ফরাসী লুই ব্রেলও তো জন্মান্ধ ছিলেন না। তিন বছর বয়সে—বাপের ঘোড়ার জিনের কারখানার চামড়ার ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে খেলা করতে গিয়েও তিনিও তো অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ লুই ব্রেল ব্যর্থতার মধ্যে হারিয়ে যাননি। শিক্ষক হয়েছেন—অন্ধের লেখাপড়ার পথ সহজ করে দিয়েছেন—মুনলাইট সোনাটা রচনা হয়তো করেননি—কিন্তু সুরের রাজ্যে তাঁরও তো অনধিকার ছিল না। এক সময় প্যারীর শ্রেষ্ঠ অর্গ্যানবাদক হয়েছিলেন তিনি।

আমরাও পারি। হেলেন কেলার জীবনে কত বড়ো হয়েছেন। আমিও কেন বড়ো হতে পারব না? কেন নিজের চারদিকে বেদনার বৃত্ত রচনা করে যাব কেবল?

কাকা আসছেন। ভারী অথচ মাপা পায়ের আওয়াজে বুঝতে বাকী থাকে না, মানুষটার আত্মপ্রত্যয় আছে, আর খুব সাবধানী,—হিসেব করে চলেন। লোকের পায়ের শব্দ নিয়ে তার চরিত্র বিশ্লেষণ করবার কোনো বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা কেউ করেছে কিনা জানি না। আমার মধ্যে মধ্যে করতে ইচ্ছে হয়।

কাকা এলেন। চেয়ার টেনে বসলেন বুঝতে পারলুম।

—লিখছিলি বুঝি?

—চেষ্টা করছিলুম অল্প অল্প।

কাকা ব্রেল-ফ্রেমটাকে টেনে নিলেন। টের পাচ্ছি, হাত বুলোচ্ছেন বিন্দুগুলোর ওপর। তারপর মুগ্ধ হলেন।

—আশ্চর্য সায়েন্স। মানুষের কোনো অভাবকে থাকতে দেবে না।

বলুন, তাই।

কাকা ব্রেল সম্পর্কে বোঝবার চেষ্টা করছিলেন মনে হল: এর ওপর হাত বুলিয়ে তুই সব পড়তে পারিস বুঝি?

—অসুবিধে হয় না।

—তাই দেখছি।—ফ্রেমটা এবার নামিয়ে রাখলেন। বললেন, তোকে একটা কথা বলব ভাবছিলুম।

আমি জানি, কী বলবেন। টুনটুন আমায় আভাস দিয়ে গেছে আগেই। অলসভাবে জিজ্ঞেস করলুম:

—এইভাবে সময় কাটাতে তোর ভালো লাগে?

চলে যায় এক রকম।

—কিন্তু মনটা তো ক্লান্ত হয়ে পড়ে? আর এ-ভাবে বসে থাকতে থাকতে শরীরেরও তো ক্ষতি হয়। আমি বলছিলুম—আসছে সেশনে তোকে ল-কলেজে ভর্তি করে দেওয়া যাক—কী বলিস?

কাকা কাজের লোক। বেকার বসে থাকা ওঁর ভালো লাগে না।

আমি তক্ষুনি কোনো জবাব দিলুম না। বেশ তো আছি নিজেকে নিয়ে। অন্ধনিকেতন ছেড়ে চলে আসবার পর থেকে এই নিঃসঙ্গ মনোযন্ত্রনেই আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এই গোল টেবিলটা, আমার ঘরের ওই জানলা, বাতাসের ঝলক, রোদের ছোঁয়া, নীচের পথ থেকে ঠিকরে আসা চলতি-জীবনের ছাড়া ছাড়া ধ্বনির উৎক্ষেপ। আমারো নিজের একটা আলাদা—স্বয়ংবৃত্ত পরিবেশ তৈরী হয়ে গেছে। আমি কি আর ভিড় সইতে পারব এখন।

—তোর আপত্তি নেই তো?

কাকার জিজ্ঞাসা। এবার আমি বললুম, কী হবে পড়ে?

—পড়ে কী হবে?—কাকা একই সঙ্গে উত্তেজিত এবং উৎসাহিত হলেন। আমাকে বোঝাতে শুরু করে দিলেন বক্তৃতার ভঙ্গিতে। বলে চললেন, কত উকিল ব্যারিস্টার অন্ধ হয়েও কেমন নাম কিনেছেন, পশার জমিয়েছেন দুর্দান্তভাবে। আমি কিছু শুনছিলুম, কিছু কথার খেই হারিয়ে ফেলছিলুম। এ ধরনের কৃতী অন্ধ মানুষদের নামের তালিকা শুনতে আর আমার উৎসাহ হয় না। আমাদের অন্ধ-নিকেতনে এ রকম নামের তালিকা আগে শুনেছি দিনের পর দিন, শুধু ভারতবর্ষেরই নয়, সারা পৃথিবীর বাছাবাছা নামের দীর্ঘ বিবরণ।

কাকা ঠিক আর্গুমেন্ট ধরবার ভঙ্গিতে কথা বলেন। টুনটুনের বাবা হয়েও তার সঙ্গে ওঁর কত তফাত। টুনটুন কথা কইলে মনে হয় টুপটুপ করে শিশির পড়ছে, ভরা দুপুরে কুম্-কুম্ করে নিরালায় পায়রা ডাকছে, রাঁচীতে গিয়ে গৌতমধারার যে শব্দ শুনেছিলুম—তেমনি করে ঝর্ণা ঝরছে। অথচ, কাকা পুরোপুরি সংসারের মানুষ। কথার মধ্যে জোর যেন—যেখানে যেমন দেওয়া দরকার; প্রত্যেকটা শব্দের পেছনে ভারী ভারী অর্থ থাকে। আমার এই লেখাগুলো যদি পড়তে পারতেন, তা হলে নির্ঘাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন বাজে কাগজের ঝুড়ির ভেতরে।

কাকা বেশ সাজিয়ে গুজিয়ে আনলেন যুক্তিগুলো। অভ্যাসে আমার টেবিলে একটা টিপও যেন মারলেন বলে মনে হল। আমার ভয় হচ্ছিল, কখন আচমকা আমাকে বলে বসবেন, ইয়োর লর্ডশিপ।

তবু কাজের লোক, বেশিক্ষণ সময় নান না। কেসটা যেন জুরীদের সম্পূর্ণ বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন, শেষে এইভাবে বললেন, তা হলে ভেবে দেখিস।

—আচ্ছা ভাবব।

কাকা উঠলেন, চেয়ার সরল একটু। তারপর ভারী আর মাপা পায়ে চটির আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেলেন বাইরে। নীচে হয়তো মক্কেলরা এসে প্রতীক্ষা করছে।

কী হবে কৃতী অ্যাডভোকেট হয়ে? জিনিসটা আমি সত্যিই কল্পনা করতে চেষ্টা করি। ধরা যাক, খুব নামকরা উকিলই না হয় হওয়া গেল। অনেক টাকাই রোজগার করতে আরম্ভ করলুম; কিন্তু তারপর?

তার পরের কোনো জবাব নেই। আমাদের প্রাচীনকালের সেই ব্রহ্মবাদিনী বলেছিলেন, যেনাহং নামৃতাস্যাম কিমহং তেন কুর্যাম? ও তো গেল আধ্যাত্মিকের কথা। কিন্তু অমৃতের ভাবনা আমার নয়। অনেক টাকা আলোর জগতে আমার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনতে পারবে? আমি দেখতে পাব টুনটুনের মুখ—যাকে আমার বুকের ওপর একটা রজনীগন্ধা বলে মনে হয়? আমি কি দেখতে পাব আমার ছেলেবেলার পুতুল কেমন করে একুশ বছরের রঙ্গা হয়ে উঠল? তা যদি না হয়—তা হলে এখন যতটুকু পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি সুখ আমি কোথায় পাব? কেমন করে পাব?

আমি অন্ধ। জন্মান্ধদের আলো-না-দেখা স্বাভাবিক তৃপ্তির জগতে আমার বাস নয়। নিজেকে সান্ত্বনা তো দিই, তবু কি ভুলতে পারি সম্পূর্ণ? মিনটুনের যন্ত্রণা কি আমার মধ্যেও জেগে ওঠে না—যখন টুনটুনকে দেখবার একটা ব্যাকুল ইচ্ছার বন্যা আমার মনের ভেতরে ফেনিয়ে ওঠে? বোকা আর আমি বাড়াতে চাই না। আমি বেশ আছি। চক্ষুদানের মিথ্যে সকল করে আমার কী হবে?

আমার কোনো দরকার নেই। কাকা মিথ্যেই ভাবছেন আমার জন্যে।

তবে হ্যাঁ—অ্যাডভোকেট হয়ে রোজগার করতে পারলে মা-র কাজে লাগবে। মা-র তীর্থ করবার সখ। কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন-হরিদ্বার দেখিয়ে আনতে পারি মাকে। আমার দেখবার অবশ্য উপায় নেই।

ভেবে দেখব কাকার কথাটা।

আবার লেখা আরম্ভ করলুম।]

চন্দ্রাদিকেই ভাবছি।

একবার খুব অসুখে পড়েছিলেন। টাইফয়েড। শেষের দিকে তো প্রায় যমে-মানুষে টানাটানি চলেছিল কিছুদিন! আমি দেখতে যেতুম দুবেলা। তখন চন্দ্রাদি বলেছিলেন, এই ওষুধ আর ডাক্তারের উৎপাত আমার আর সহ্য হয় না।

—ওষুধ না হলে কী করে ভালো হবে চন্দ্রাদি?

—কে চায় ভালো হতে? আশীর্বাদ করো যেন আর সেরে না উঠি।

—মিথ্যে তুমি মরতে চাও কেন?

—কী হবে বেঁচে থেকে?

জানি না কেন, বলে ফেলেছিলুম, মরে গিয়েই বা কী লাভ হবে বলো তো ?

অসুখ অবস্থাতেও চন্দ্রাদি চমকে গিয়েছিল। হয়তো এদিক থেকে কোনোদিন ভাবেনি। জীবনের চাইতে মৃত্যু যে ঢের ভালো, একথাই বা কে বলতে পারে ? মরণের ওপারে যে আরো বড়ো দুঃখ লুকিয়ে নেই—চোখের জন্যে অপেক্ষা করে নেই আরো গভীর অন্ধকার—এমন নিশ্চয়তা কে দেবে ?

—একটু থেমে জবাব দিয়েছিল, তা হলে এ দুঃখ আর বইতে হয় না।

—দুঃখ কোথায় চন্দ্রাদি ? কিসের দুঃখ ?

চন্দ্রাদি আবার চুপ করে থেকেছিল কিছুক্ষণ। তারপর কথাটা আমার ওপরেই চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল।

—কিসের দুঃখ তুমি কি জানো না ?

না—আমি জানি না। আর যখন টুনটুনকে দেখতে পাই না, যখন আলোর বৃত্তের মধ্যে ষোলো বছর পরে পুতুলকে মিলিয়ে নিতে পারি না রঞ্জা দাশগুপ্তের সঙ্গে, তখন হয়তো জন মিল্‌টনের সঙ্গে কোথাও নিজের সাদৃশ্য খুঁজে পাই, মনে হয় 'অন্ হিজ্ ব্লাইণ্ডনেসের' কথা। তবু এও তো সাময়িক। এই ছোটখাটো মুহূর্ত মানুষের বেদনা থেকে নিজেকে যখন কিছুটা বিচ্ছিন্ন করতে পারি, একটা সমগ্র দৃষ্টি নিয়ে দেখি চারদিকে, তখন তো মনে হয় না আরো কারো চাইতে আমার দুঃখের পরিমাণ বেশি। অভাববোধ সংসারের প্রত্যেকের আছে—কে জোর গলায় বলতে পারে, আমি সব পেয়েছি—আমার চাইবার আর কিছু নেই। কাকা প্রচুর রোজগার করেন—কিন্তু কোন্ এক মক্কেল একশোটা টাকা ওঁকে ফাঁকি দিয়েছে—এ ক্ষোভটা কিছুতেই ভুলতে পারেন না।

অন্যের চাইতে সুখ আমার বেশি না থাক—দুঃখটাও তো বেশি না। পৃথিবী আর সকলের মতো আমার জন্যেও তার স্নেহের কোলটি মেলে রেখেছে। বাতাস আমাকে ছুঁয়ে যায়, ফুলের গন্ধ আমাকে প্রত্যেকদিন সুখী করে, গান আমাকে ডাক দিয়ে বলে, 'অন্ত নাই গো যে আনন্দে ভরা আমার অঙ্গ।' আমার অন্ধ দু-চোখের সামনে স্মৃতিটা স্বপ্নের বৃত্ত রচনা করে রেখেছে। আমার প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের অনুভব প্রতি পলে পলে সেই বৃত্ত থেকে—সেই বৃত্তের বাইরে ধ্বনি-গন্ধ-স্পর্শের অরূপ মধুচক্র থেকে মাধুকরী করে। মা-র হাতের সেই পদ্মনিভ স্পর্শটি পাই, টুনটুনের সেতারে বাজে সারং, ওরই গলায় আবৃত্তি শুনি : 'আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী।' কোনো কোনোদিন গ্রামোফোন রেকর্ড এনে টুনটুন আমায় শোনায় কবিকণ্ঠ : 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো বলে তারে গাঁয়ের লোক—'

আমার অন্ধকারে পৃথিবী কৃষ্ণকলি হয়ে ওঠে। তাকে দৃষ্টিবানেরা যাই বলুন, আমি তার আপন গাত্রচিহ্নগুলিকে একটির পর একটি স্পর্শ করি ; প্রণাম করি সেই তিমিরবর্ণা কৃষ্ণা বসুমতীকে, প্রণাম করি এই জীবনকে—যেখানে 'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব।' 'কী পাইনি তার হিসাব মেলাতে' গিয়ে দেখি কত পেয়েছি—কত বেশি করে পেয়েছি। জীবন একটা ক্ষতিরই খাতা মাত্র—কে তৈরী করে রেখেছে এমন একপেশে হিসেব ?

"Our own affections still at home to please
In a disease :
To cross the seas to any foreign soil,
Peril and toil :

Wars with their noise affright us ; when they cease,
We are worse in peace—
What then remains—"

এক তরফা—এক তরফা। এ শুধু নিজের মনের বিকারে শূন্যতার বোঝাকল টেনে নামানো। কিন্তু আমি দেখেছি—তোমার আমার ক্ষত আর ক্ষতিপূরণের জন্যে দিকে দিকে কী আয়োজন! একজন দুঃখ দেয় (আমাকে কেউ দিয়েছে বলে মনে পড়ে না), দশজন এসে মাধুর্যের প্রলেপ দিয়ে তাকে জুড়িয়ে দেয় ; বছরের দশদিন কাটে ব্যাধির বিকারে, বাকী তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সুস্থ শরীর বাতাসে স্বাস্থ্য দান করে, সূর্যের আলো দিয়ে রক্তকণিকার নবোজ্জীবন ঘটায়।

সেদিন এত কথা হয়তো ভাবিনি। তবু চন্দ্রাদিকে নিঃসংশয়ভাবেই জবাবটা দিয়েছিলুম।

—না, আমার কোনো দুঃখ নেই।

চন্দ্রাদি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, ছেলেমানুষ—তাই এখনো তোমার আশা আছে। আরো কিছু বড়ো হও, তখন বুঝতে পারবে।

আট-ন বছর তো পার হয়ে গেল তারপর। বয়েই বড়ো হয়েছি কিনা, জানি না। কিন্তু যে দুঃখ এপারের জীবনটাকে মিথ্যে করে দেয়—যে দুঃখ মানুষের শরীরকে কোনো বিবর্ণ শীতের রাতে লাশ কাটা ঘরের হাতছানি পাঠায়, সেই দুঃখের সন্ধান তো আমি এখনো পাইনি। আর বার বার এই কথাই তো আমার মনে হয়েছে, একদিনের একটুখানি দুঃখকেই আমরা বড়ো বেশি করে মনে রাখি—জমা-খরচের খাতায় দশদিনের আনন্দটুকুকে তুলে রাখতে চাই না।

তবে এইটুকু মানি, খুশি হতুম টুনটুনকে দেখলে—রঞ্জাকে দেখতে পেলে।

আমার এই লেখাগুলো যদি রঞ্জা পড়তে পারত, বেশ হত তা হলে। আমি মনে মনে বলতুম, 'তুমি যদি এরে লহো কোলে তুলি, তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি' সকল অগীত সঙ্গীতগুলি ক্ষণবাসীনা।' কিন্তু দৃষ্টিহীনের অন্ধ সরস্বতী না হলে—আর কারো হাতের ছোঁয়ায় আমার মর্মবিন্দুগুলি তো গান হয়ে উঠবে না।

আচ্ছা—রঞ্জাও যদি অন্ধ হয়ে যেত?

ছিঃ ছিঃ ছিঃ—এসব কী ভাবছি আমি!

টং—টং—টং—

ঠিক এগারোটা। কান পেতে শুনে শুনে দেখলুম। লেখা বন্ধ করব এখন। মা'র গলার শব্দ পাচ্ছি। এবার স্নান করতে হবে।

আমি অ্যাডভোকেট হলে মা কি খুব খুশি হবেন?

৭ ছয় ।

আমি কাকার পাশে বসেছিলুম। বুঝতে পারছি, হলঘর লোকে বোঝাই হয়ে গেছে। অনেকগুলো পাখার বাতাসে যেন ঝড় বইছে, আমার কেমন শীত-শীত করছে মধ্যে মধ্যে। পাড়ীর আওয়াজ, প্রসাধনের গন্ধ, পুরুষের মোটা গলার আওয়াজ, মেয়েদের কলধ্বনি—বাচ্চাদের কাকলি।

জানি, স্টেজ থেকে খুব দূরে নেই আমরা। নিশ্চয়ই কয়েকটা খুব জোরালো আলো জ্বলছে সামনে, আমার দু-চোখের ওপর যেন কেমন এক-একটা উত্তাপের ঢেউ থেকে থেকে দুলে যাচ্ছে।

সমুদ্রের ঢেউয়ে আছড়ে পড়া ঝিনুকের খোলা পাহাড়ের গায়ে লেগে যেমন করে দু ফাঁক হয়ে যায়, তেমনি এই আলোর তরঙ্গে—মানুষের আঘাতে হঠাৎ যদি আমার চোখের দৃষ্টি খুলে যায়? এত আলো, এমন ভয়ঙ্কর আলো আমি কি তবে সইতে পারব? চোখের যে তারা দুটো অন্ধকারের স্নিগ্ধ ছায়ার শীতল তৃপ্তিতে তলিয়ে আছে—অত আলোতে তারা হয়তো শেষ পর্যন্ত রোদের মতো গলে যাবে।

অথচ, ছেলেবেলায় অন্ধকারকে কী ভয়ই যে আমার ছিল!

ভাবনায় ছেদ পড়ল। মাইকে মেয়েলী গলার ঘোষণা।

: এইবার আমাদের অনুষ্ঠান আরম্ভ হচ্ছে। প্রথমেই উদ্বোধন সঙ্গীত গাইছেন আমাদের প্রাক্তন ছাত্রী রঞ্জা দাশগুপ্ত। আমি নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলুম। হাততালির তরঙ্গ উঠল ঘরময়। বোঝা গেল, এখানে সবাই-ই রঞ্জার গুণমুগ্ধ। কেবল আমিই জানতুম না। আমার ছেলেবেলার পুতুল খেলার ঘরেই সঞ্চিত হয়েছিল এতদিন।

রঞ্জা গান ধরল :

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে—'

চেনা পরিচিত গান। কতবার কতজনকে আমি গাইতে শুনেছি। কিন্তু আজ এই অনুষ্ঠানে ঘষ্টেরালো গলায় যে গান গাইছে, তাকে আমি দেখেছিলুম ছেলেবেলায়। সে তো এ নয়। সেই ঝুঁটিবাঁধা ছোট সোডী মেয়েটি গান গাইতে পারত না—সেদিন গানে দিদিরই ছিল একচেটে অধিকার। তার টুকরো টুকরো কথা মনে আছে—গম্ভীর হয়ে আমার বইখাতা ঘাঁটি করত। মাসিমা বলতেন, দেখেছেন দিদি, এইটুকু মেয়ের কেমন পটপট করে কথা! আর তার কান্নার সুর আমার কানে লেগে আছে—ঝুঁটি ধরে সেদিন একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিলুম।

এ সে নয়। আমাকে এ চেনে না—আমিও কি চিনি? আমার কথা রঞ্জা দাশগুপ্ত হয়তো কোনোদিন শোনেও নি।

'একি নিবিড় বেদনা বনমাঝে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে—'

সেই নীলকুঠির পথের ধারে ভাঁটফুল দুলছিল বসন্তের হাওয়ায়। সবুজে লালে ছেয়ে গিয়েছিল কাঠবাদামের পাতা। সজনে ফুল ঝরছিল কাদের যেন বাঁশের বেড়ার ধারে। কিন্তু আমি আমার নিজের পরিণামের জন্যে এগিয়ে চলেছিলুম একটা অন্ধকার ইঁদারার দিকে—যার ভেতরে দুটো উজ্জ্বল চোখ অপেক্ষা করছিল আমার চোখদুটো কেড়ে নেবার জন্যে।

আজ মনে হয়—কোনো বড়ো জাতের সাপ ছিল ওর ভেতরে, হয়তো গোখরো, হয়তো অজগর। কিংবা—

হাততালির আওয়াজে আবার সজাগ হয়ে উঠি। গান শেষ হয়েছে। কে কে যেন বলছে,

'আরো দু-একখানা গান হোক।' মাইকে আবার ঘোষণা করা হল, পরে ইনি আবার গান শোনাবেন, তার আগে অন্য অনুষ্ঠানগুলো হয়ে যাক।

বক্তৃতা। আবৃত্তি। গীটার বাজানো কে যেন। আমার অন্ধ-নিকেতনকে মনে পড়ল। আর চন্দ্রাদিকে। সেই ইহুদী ছেলেটি। মুনলাইট সোনাটা বাজাচ্ছিল। অন্ধ দুই ব্রেল্ পারীর কোন্ মিউজিক হলে অর্গ্যান বাজাতেন? মুনলাইট সোনাটা কি তিনি বাজিয়েছেন কোনোদিন? অন্ধের চোখে চন্দ্রালোকের রূপ কেমন ভাবে ফুটে উঠেছিল? অথবা পিয়ানো ছাড়া কি মুনলাইট সোনাটা বাজানো যায়? আমি ও-সব জানি না। চন্দ্রাদি এখানে থাকলে বলতে পারত।

আবার রঙ্গীন গান। পর পর চারখানা। আরো বলিষ্ঠ, আরো বেশি উজ্জ্বল। সবশেষে গাইল মীরার ভজন। যেমন গলা, তেমনি সুরের কাজ। চন্দ্রাদিও তো মীরার ভজন পছন্দ করত। তার চাইতেও কি ভালো গাইল? হয়তো—হয়তো নয়। এর গান যেন দুপুরের আলোর মতো—গড়াই নদীর স্রোতের ওপর দিয়ে নেচে বেড়ায়; আর চন্দ্রাদির গান ছিল ভোরের আলোর মতো—তখনো রাত্রি-মাখানো, তখনো শিশির-ভেজা।

আমার মনে হচ্ছে, সেই গানই ছিল ভালো। রাত্রি নামলে যে-আলো নদীর বুক থেকে পালিয়ে যায়—সে নয়; কালো জলের ওপর যে তারাটি তার ছোট্ট আলোর করুণ দোলাটি পাঠিয়ে দেয়—তার ক্ষমতা অনেক বেশি। দুপুরের আলো সকলের—তারার আলোটি রাত্রির নদী ছাড়া আর কারুর নয়।

মাইকে আবার উদ্বোধন। 'মুক্তধারা' আরম্ভ হল।

যন্ত্ররাজ বিভূতির যজ্ঞের চূড়ো উঠেছে আকাশে। ভৈরব-মন্দিরের ত্রিশূলকে ছাপিয়ে চন্দ্র-সূর্যকে বিঁধতে চাইছে তার উদ্ধত মাথাটা—যেন স্পর্ধা করছে দেবতাকে, বাধ করছে স্বর্গকে। এমন কি, রাজার পর্যন্ত মনে হয়, অতটা উঁচু করে তোলা ভালো হয়নি। কিন্তু বিভূতি নির্বিকার। সে জানে শিবতরাইকে যে পিপাসার জল দিয়েছেন দেবতা, সেই জল কেড়ে নিয়ে দেবতার মহিমার ওপরে প্রতিষ্ঠা করবে নিজের সিংহাসনকে। আজ তারই বন্দনা উঠছে দিকে দিকে।

'নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র—'

অভিনয় চলছে। রাজা এলেন, মন্ত্রী এলেন, গুরু এল, বটুক এসে ডেকে বলে গেল—'সাবধান—সাবধান।' এইবার কার গলা শুনছি? আমার ছোট বোন টুনটুন—যাকে আমার মনে মনে ছোট্ট মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে। সে-ই এসেছে অভিজিৎ হয়ে। অতটুকু মানুষটিকে কেমন দেখাচ্ছে রাজপুত্রের ভূমিকায়?

কাকাকে সে কথা জিজ্ঞেস করলুম।

কাকা হাসলেন। প্র্যাক্‌টিক্যাল্ মানুষটি একটু শিথিল হয়েছেন এই মুহূর্তে, গলায় আনন্দিত গর্বের আভাস।

—না, খুব মন্দ দেখাচ্ছে না। মেয়েটার তো পার্টস্ আছে দেখছি।

জীবনে এই প্রথম বোধ হয় কাকা নিজের মেয়েকে আবিষ্কার করলেন! কিন্তু কী যেন বলছে টুনটুন? না-না অভিজিৎ?

"আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে। আমি কঠোরতার অভিমান রাখিনে। চেয়ে ভাখো

ওই পাখি দেবদারু-গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে ; ওকি নীড়ে যাবে, না অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করবে জানিনে ; কিন্তু ও যে এই সূর্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে, সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে। সুন্দর এই পৃথিবী। যা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আমি আজ নমস্কার করি।"

মুক্তধারার বন্ধন খসিয়ে তাকে মুক্তি দেবে অভিজিৎ। ধরণীর সমস্ত সঙ্গীত রুদ্ধ করে দিয়ে যা বীভৎস লোহার দাঁত আকাশে মেলে দিয়ে অট্টহাসি হাসছে—তাকে ভেঙে না ফেলা পর্যন্ত তারও তো মুক্তি নেই।

এই আশ্চর্য আশা, এই অসীম শক্তিকে আমার ভাল লাগে। মানুষ ভয় পায় না—মানুষ হারতে জানে না। যখন রাতের অন্ধকার নিবিড়, বিশ্ব হয়ে আসবে উত্তরকূটের ওপর, যখন প্রলয়ের কালো মেঘ পাথরের মতো নিথর হয়ে সারা আকাশকে আচ্ছন্ন করে ধরবে, তখন সেই তমসার মধ্যে —চোখের আলো ডুবে যাওয়া সেই নীরন্ধ্র তমস্কতার ভেতরেও অভিজিৎ পথ খুঁজে পাবে। তার যাত্রাকে কেউ রোধ করতে পারবে না। সে আলো তো আমারও। আমিও অন্ধকারের মধ্যেই পথ চলেছি। অভিজিতের যেমন লক্ষ্য আছে, তেমনি একটা লক্ষ্য আমার জন্যেও রয়েছে কোথাও। কিন্তু তার কোন সন্ধান আমি এখনো পাইনি। আমি এখনো জানি না, কোন্ মুক্তধারাকে মুক্তি দেবার ভার পড়েছে আমার ওপর।

কোন না কোন ভার নিয়ে পৃথিবীতে সবাই আসে। হেলেন কেলার পেয়েছেন সে ভার—দুই ব্রেল্ পেয়েছেন। আমি ?

নাটক চলছে। অন্ধকার কান্নায় ভরে উঠল চারদিক। কোথা থেকে ছুটে এল ধনঞ্জয় : 'আগুন, আমার ভাই, আমি তোমারি জয় গাই।'

সে আগুন অভিজিতের লোহার শেকল দিলে গলিয়ে। তিমিরের অভিযানে যাত্রা করল অভিজিৎ। তারপর অন্ধকারের বুকে উচ্ছলিত হল মুক্তধারার কলহাসি, নেমে এল বাঁধন ভাঙা প্রাণের স্রোত (কাকা হঠাৎ বললেন, 'বেশ সাউণ্ড-এফেক্ট এনেছে তো এখানে)—আর তারপরে সেই প্রবল জীবন প্রবাহে অভিজিতের চিরমুক্তি।

'বজ্রযোগ-বাণী
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যু-সিন্ধু-সন্তর,
শঙ্কর শঙ্কর।'

গানের সুরে গমগম করে উঠল মঠটা। আবার আমার চোখে জল এল। মনে হল যে শান্ত অন্ধকারের ভেতর নিজেকে নিয়ে এতদিন মগ্ন হয়েছিলুম, সে আমার নিজেকে, আমার নিজেকেই ভোলানো। পরাজিত অবসাদের মধ্যে আমার নির্বাসন। আমারও মুক্তি চাই। কিন্তু কি সেই মুক্তি ? কেমন করেই বা আমি তাকে পাব ?

কখন যে সব শেষ হয়েছে জানি না। চারদিক থেকে ভিড় ভেঙে সবাই গেটের দিকে এগোতে আরম্ভ করেছে তারও কিছুই আমি টের পাইনি। আমি যেমন ছিলুম, তেমনিই বসে রইলুম একভাবে।

তারপর শুনলুম টুনটুনের গলা।

—বাবা, এই যে রঞ্জাদি।

আমার রক্ত চমকে উঠল, উত্তেজনায় তীব্র প্রখর হল স্নায়ুগুলো। আমি অনুভব করলুম, টুনটুনের পাশে আর একজনকার দীর্ঘ উজ্জ্বল উপস্থিতি। টুনটুন যদি রজনীগন্ধা হয়—সে উগ্র সুরভিত সোনাপগুচ্ছ।

রঞ্জা বোধ হয় কাকাকে প্রণাম করল। কাকার আশীর্বাদ শুনলুম, কল্যাণ হোক মা—কল্যাণ হোক। বড় ভালো লাগল তোমার গান।

—আর আমার অভিনয় বুঝি ভালো লাগল না বাবা?—টুনটুনের জিজ্ঞাসা।

—কেন ভালো লাগবে না? সব ভাল হয়েছে—কাকা অপ্রতিভের মত জবাব দিলেন।

আমি ভাবছিলুম, এমনি নেপথ্য শ্রোতার ভূমিকাতেই বুঝি দাঁড়িয়ে থাকব—এর মধ্যে আমার কোনো ভূমিকাই বুঝি নেই। কিন্তু তার পরেই শুনতে পেলুম, রঞ্জাদি—এই আমার সোনামা। হিরণ সেন।

একটি উজ্জ্বল গলার বিদ্যুৎ এল আমার দিকে।

—নমস্কার!

—নমস্কার।

টুনটুন রাতদিন আপনার গল্প করে, বলে—কী যেন সামলে নিলে রঞ্জা। হয়তো আমার চোখ নেই বলে যে সহানুভূতি জানায়, সেইটেই সে চেপে গেল। তারপর বললে, মার কাছেও শুনেছি আপনাদের কথা। ছোটবেলায় আমি নাকি খুব দুরন্ত ছিলুম আর ভীষণ বিরক্ত করতুম আপনাকে।

টুনটুন হেসে উঠল, কাকাও হাসলেন মনে হল।

ষোলো বছর আগেকার পুতুল। 'আর একটা ফুল দাও—ওই লাল বড় ফুলটা।' আমার স্মৃতির ভেতর দুটি নতুন পাতাকে ধরে রেখেছি কেবল, এখন উগ্র সুরভিত সোনাপগুচ্ছ এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। অনেক বড়ো। আকাশের নীচে—অনেক মুখ চোখের আলোজলা দুনিয়ার সামনে এখন সে ফুটে উঠেছে, নিজেকে জেনেছে। তার ছোট ছোট পায়ের চিহ্নগুলো আমাকে ছাড়িয়ে কত দূরে এগিয়ে চলে গেছে, আমার তীক্ষ্ণ বাসনার অঞ্জলিতে কেবল তার একটি মাত্র ছাঁচ তুলে নিতে পেরেছি!

কথাগুলোকে ভাবলুম মুহূর্তের মধ্যেই! আমিও হাসতে চাইলুম রঞ্জার কথায়।

—হ্যাঁ, সে গল্প আমিও শুনেছি।—তারপর ওর কাছে কিছুতেই হার মানব না বলে, একটুখানি মিথ্যে কথা জুড়ে দিলুম: তবে এতদিন পরে আর বিশেষ কিছু মনে পড়ে না। কিন্তু ডাক নামটা যেন কি ছিল? পুতুল নয়?

—পুতুলই বটে।—রঞ্জা হেসে উঠল: বাড়ীতে অবশ্য সে বদনামটা এখনো রয়েছে।

—বদনাম কেন?—প্রসন্নভাবে কাকা জানতে চাইলেন: তোমার পছন্দ হয় না বুঝি?

—একদম না। কেমন ছেলেমানুষী বলে মনে হয়।

ছেলেমানুষীই বটে! কিন্তু ইরারের ছাত্রীর আত্মসম্মানে ঘা দেয় এখন। কিন্তু আমারই মনের বয়স বাড়ে না। শুনেছি, পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে মহাশূন্যের অন্ধকার অনন্তপথে যে মানুষ ছুটে চলবে, তার আর বয়েস বাড়বে না। আমিও সেই মহাশূন্যতার যাত্রী। আমার গোল টেবিলটার মতোই

পায়ের নীচে পৃথিবীর সবুজ বৃন্তটা ঘুরপাক খাচ্ছে অবিরাম। সময়হীন—বয়সহীন কালের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিয়ে—শিশুর স্থির-চিরন্তন দৃষ্টি নিয়ে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি।

রঞ্জা কথা বলছে। আমাকেই বলছে।

মা বলেছেন একদিন যাবেন আপনাদের ওখানে। আজকেও মার এই কাংশনে আসবার কথা ছিল, হঠাৎ বিকেলে রিউম্যাটিক পেইনটা বেড়ে ওঠায় আর আসতে পারলেন না।

—তাহলে আপনারা কিন্তু খুব মীস্‌সির আসছেন আমাদের ওখানে।—টুনটুনের ব্যাকুল কণ্ঠ।

—দেখি, মার কবে সময় হয়। আচ্ছা আসি আজ। অনেক রাত হয়ে গেল।

রঞ্জা বোধ হয় আবার প্রণাম করল কাকাকে। কাকা বললেন, কল্যাণ হোক মা —কল্যাণ হোক।

—তাহলে চলি ভাই এনাক্ষী। নমস্কার হিরণ্ময়বাবু—

—আসবেন কিন্তু।—আবার মিনতি টুনটুনের।

—আসব—আসব—

হেসে চলে গেল রঞ্জা। সোনাগন্ধের উগ্র সৌরভ দূরে মিলিয়ে গেল, আমার সতর্ক-সচেতন প্রত্যেকটি স্নায়ু দিয়ে আমি তা অনুভব করলুম।

আমরাও বাড়ীর দিকে রওনা হলুম। আর ট্যাক্সিতে একটানা উচ্ছ্বাসের পালা টুনটুনের।

—তোমরা বুঝি ছেলেবেলায় এক জায়গাতেই থাকতে সোনাদা? সত্যি কি মজা! জানো সোনাদা—রঞ্জাদির মত মেয়ে হয় না। যেমন সুন্দর চেহারা তেমন সুন্দর স্বভাব। আর গান তো নিজের কানেই শুনলে! আমাদের বাড়ীতে এলে কী যে চমৎকার হবে!

জানতে ইচ্ছা করল, এখনো কুলের ওপর সেই লোভটা আছে কিনা রঞ্জার। কিন্তু সেকথা তো সত্যিই জিজ্ঞেস করা যায় না। রঞ্জা এলে খুব খুশি হবে টুনটুন। গল্প করবে, গান শুনবে। মাও তাঁর পুরোনো দিনের আলাপ বালিয়ে নেবেন প্রাণ খুলে। এ কোথায়—সে কোথায়—তার খবর কি? বেশ ছিলুম দিদি ওখানে—জিনিসপত্তরের কী সুবিধেই যে ছিল! রঞ্জার মাও পুরোনো সখী-সংবাদে উজ্জ্বল হয়ে উঠবেন। কেবল আমারই খুশি হওয়ার কিছু নেই। রঞ্জা এলে আমার কাছে আর কুল কিংবা তেঁতুল খেতে চাইবে না—আমিও আর ওসব খাই না এখন। আমার ব্রেন-ফেমটা নিয়ে সে উল্টো করে বসে[illegible]ার পড়বে না: ক-গ-অ-অ—

টুনটুন রঞ্জার আরো কিসব গুণাবলী ব্যাখ্যা করছিল, ঠিক সেই সময় ঘটল ব্যাপারটা।

জোরে ব্রেক কষল ড্রাইভার। নিদারুণ ঝাঁকুনি খেয়ে আমরা সবাই একসঙ্গে ভয়ঙ্কর ভাবে চমকে উঠলুম।

কাকা বললে, আরে ইস্-ইস্-ইস্!

পথে নিদারুণ কোলাহল উঠেছে। টুনটুন বলছে, কি হল বাবা—কী হল?

ড্রাইভারই জবাব দিলে, একটা অন্ধ ভিখিরী। একেবারে চাকার তলায় পড়ে গেল ট্রামের তলায়।

অন্ধ ভিখিরী। কথাটা যেন বন্দুকের গুলির মতো আমার মাথায় এসে বিঁধল। চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠল টুনটুন।

আর কাকা ছটফটিয়ে বললেন, ওসব আর দেখবার দরকার নেই। তাড়াতাড়ি বার করে নিয়ে যাও গাড়ীটা।

পথে আর একটা কথাও হল না।

সেদিন রাতে কেমন একটা বিশ্রী অস্বস্তি জমতে লাগল সারা শরীরে। ভালো করে ঘুমুতে পারলুম না আদৌ। বার বার তন্দ্রার মতো এসেই জোড়ো হাওয়ায় কাপট-লাগা শরতের মেঘের মতো ভেঙে ভেঙে সরে যেতে লাগল। কখনো যেন শুনছি রঞ্জার গান: 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'—তার পরেই তাকে দাপিয়ে উঠছে অন্ধার কান্না: 'সুমন, আমার সুমন!' আর হাল্কা হাল্কা স্বপ্নের ভেতর মনে হচ্ছে, আমি যেন অভিজিতের মতো অতল কালো অন্ধকারের পথ ঠেলে কোথায় চলেছি, কোথায় কে যেন একটা বিরাট যন্ত্রের মাথা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আকাশে: হাওড়ার ব্রীজটাই ও রকম দেখাচ্ছে নাকি? আমি ওই ব্রীজটাকে দেখিনি, বর্ণনা শুনেছি—তবু আমার মনকে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে ভরে দেয়। ও তো মুক্ত ধারার বাঁধ নয়—মানুষের বিজয়-মিনার! ভাবতে ভাবতে পথ চলেছি, হঠাৎ—

হঠাৎ দৈত্যের মতো দুটো লাল চোখ জেলে একটা ট্রামগাড়ী ছুটে এল। আমি যেন সেই দুটো চোখের আকর্ষণে সরে যেতে পারলুম না। নীলকুঠির ইঁদারা থেকে সেই অগ্নি-চক্ষু দুটো শনেরো গুণ কুড়ি গুণ বড়ো হয়ে আমার কাছে চলে এল, শুনলুম লোহার কর্কশ আওয়াজ—ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলুম মাটিতে, কয়েকটা নিষ্ঠুর চাকা আমার বুকের পাঁজরা গুঁড়িয়ে—

চাপা চিৎকার করে জেগে উঠলুম। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। দপদপ করছে মাথার ভেতরে, বুকের মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে একটা। গলা শুকিয়ে একরাশ বালির মতো খরখর করছে। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা নিয়ে এলুম।

আঃ—জল খেয়ে একটুখানি ভালো লাগছে তবু। আমি উঠে বসলুম বিছানায়। আজ আর ঘুম হবে না। রাতও বোধহয় বেশি বাকী নেই আর। বাইরে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক আসছে ঘরে।

লেখার বইটা টেনে নিয়ে বসে বসে এতক্ষণ লিখেছি। সেই তোর তিনটে থেকে লিখছি—এখন বোধহয় সাতটা হবে। আমার এই অসংখ্য বিন্দুগুলোর ভেতরে ধরা পড়েছে রঞ্জার গান, যুক্তধারা নাটক—দুঃস্বপ্নে ভরা তন্দ্রার টুকরোগুলো।

[কিন্তু আর হাত চলছে না। মাথার ভেতরে আবার দপদপ করতে আরম্ভ হয়েছে, বুকেও যন্ত্রণা হচ্ছে যেন। আর লিখতে পারছি না। বুকের নীচে দুটো বালিশ টেনে নিয়ে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম। উঃ এই সময় মা-র হাতখানা যদি একবার কপালে পড়ত! কিংবা টুনটুনের ছোট ছোট আঙুলগুলো যদি মাথার দু পাশটা টিপে দিত আস্তে আস্তে!

সেই অন্ধ ভিখারীটা কি মরে গেছে? সেই যে ট্রামের তলায় চাপা পড়েছিল?

না—আমি সে কথা স্বীকার করব না। ও আমার আপনার জন। যেদিন থেকে আমি চোখ হারিয়েছি, সেদিন থেকে পৃথিবীর সব অন্ধ আমার আত্মার আত্মীয়। নিশ্চয় ওর নিখেস কিছু লাগেনি, নিশ্চয় ওকে কার্স্ট এইড্ দিয়েই ছেড়ে দিয়েছে হাসপাতাল থেকে। হোক ভিখারী—তবু ওর বেঁচে থাকার কিছুমাত্র প্রয়োজন যে নেই, এ কথা মানতে আমার মন চায় না। হয়তো ওর ঘরে স্ত্রী আছে—যে দুঃখের সংসারেও সেবা মমতা দিয়ে ওকে ঘিরে রাখে, হয়তো ওর সন্তান আছে, যে—

কিন্তু চোখের সামনে সব এমন হয়ে যাচ্ছে কেন? হঠাৎ কোথা থেকে ট্রামের দুটো আলো এসে ভেঙে একাকার হয়ে গিয়ে খানিক নীহারিকার মতো এমন করে ঘুরপাক খাচ্ছে? আমার মাথার ভেতরে একটা ধারালো করাত চালিয়ে চলেছে কে? কেন এমন করে আমার পাঁজরগুলো এক সঙ্গে ভেঙে যেতে চাইছে?]

মা এসে ডাকলেন: খোকন—

কথা বলতে চাইলুম, পারলুম না! কে এসে গলাটা টিপে ধরেছে। বুকের ভেতরে ঢেউ পড়ছে যন্ত্রণার ঢেউয়ের পরে ঢেউ। মাথা তুলতে চেষ্টা করলুম, কে যেন সেটা চেপে বালিশে নামিয়ে দিলে। ঘরটা এখন যেন গোল হয়ে ঘুরছে। পরিষ্কার শুনতে পেলুম, একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরুচ্ছে আমার গলা দিয়ে—আমি গোঙাচ্ছি!

মা বললেন, খোকন—খোকা—

বলতে চাইলুম, মা—মা গো!—কিন্তু কী বললুম যে জানি না।

মা ছুটে এলেন আমার কাছে। আমাকে নাড়া দিয়ে বললেন, খোকন—খোকন—

অনেক দূর থেকে শুনতে পেলুম ডাকটা। যেন মস্ত একটা অন্ধকার মাঠের ভেতর দিয়ে মা-র সঙ্গে সঙ্গে চলেছিলুম—কখন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছি। আমি মা-র দিকে যত এগোতে চাই, ততই যেন মা দূরে সরে যান। শুধু ক্ষীণ থেকে আরো ক্ষীণ—আরো ক্ষীণ হয়ে শব্দ আসে: কী হল খোকন—কী হল তোর?

তারপর সব মুছে গেল।

॥ সাত ॥

তোমারে চাহিনি কভু, অকস্মাৎ তবু তুমি এসে
ডাকিলে অলক্ষ্য-লোকে অকরুণ অঙ্গুলি সংকেতে
মুহূর্তেই জীবনের সব দ্বিধা, সব দ্বন্দ্ব ফেলে
এ শ্রান্ত চেতনা মোর পেলো স্থান তোমার অঙ্কেতে।
তবু দেখি কোথা হতে অতি ক্ষীণ মৃণাল-বন্ধন
আমারে জড়ায়ে ধরে, বলে: বন্ধু রহ ক্ষণকাল
কান পেতে শোনো তুমি মৃত্তিকার নীরব ক্রন্দন—

কবিতা লিখেছি। এক মাস পরে। মৃত্যুর বন্দনা রচনা করতে চাইছি।

কিন্তু কবিতা যা লিখেছি, সে থাক। টুনটুন যদি শুনতে চায় শোনাবো, কিন্তু ওর হয়তো কষ্ট হবে। আমার অনেক নিঃশব্দ আত্মকথার মতো এও বিন্দুর বন্ধনেই নিজেকে লুকিয়ে রাখুক।

শ্লেটটা নিয়ে আবার বসেছি। কিন্তু ডাক্তারের বারণ বেশিক্ষণ আমার লেখা চলবে না।

এক মাস। তিরিশ না একত্রিশ দিন? এটা কি মাস? খেয়াল নেই।

কী ভাবেই যে কেটে গেল দিনগুলো! ছেলেবেলায় সেই যে দূত এসে চোখের আলো নিবিয়ে দিয়েছিল, সে-ই আবার নতুনরূপে এসেছিল আমার কাছে। যেন খবর নিতে এসেছিল, অন্ধকারের

দৃষ্টিতো আমার তৈরী হয়েই গেছে, এবার আমি নিশ্চিন্ত মনে অসীম তামসীর যাত্রাপথে বেরিয়ে পড়তে পারি কিনা।

হার্ট ডিজিজের প্রথম অ্যাটাক। মরণের প্রথম পরোয়ানা।

বিশ্বাস হয় না—কিছুতেই আমার বিশ্বাস হয় না। মাত্র সাতাশ বৎসর আমার বয়েস। অঙ্কের পৃথিবীতে আমি বেশ আছি—বেঁচে থাকবার আনন্দ আমার চারপাশে উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত হয়ে রয়েছে। মা-র সেই পদ্মের মতো হাত আছে, টুনটুনের আব্দার আছে—সেতার আছে—আবৃত্তি আছে। আমার ঘরের ফুলদানী থেকে পৃথিবীর বুকের গন্ধ আসে—সকাল-বিকেলে কাকিমা ধূপকাঠি জেলে দিয়ে যান। রেডিয়োতে গান শুনি, 'চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে।' দখিনের হাওয়া আছে, নরম রোদ এসে আমার মুখে পড়ে, একখানা চকচকে নতুন মোহরের মতো (ছেলেবেলায় দেখেছিলুম) আমার বৃত্তাকার স্মৃতির জগৎটুকু ঝকমক করে। আমি বেঁচে আছি—বাঁচতে আমার ভালো লাগে।

এই নিয়েই চন্দ্রাদির সঙ্গে তর্ক করেছিলুম।

বলেছিলুম, আমরাই তো বরং সব চাইতে সুখী। চোখের বাধায় আমাদের মনের ওপর আড়াল পড়ে না। চোখ এক জায়গায় থেমে যায়—মনকে আমরা পাঠাতে পারি যেখানে খুশি—যত দূরে হোক।

চন্দ্রাদি বলেছিল, তুমি কবি, খালি ভালো ভালো কথা সাজিয়ে বলতে পারো।

—কবিতা নয় চন্দ্রাদি। আমি একথা জানি, তুমি একথা মানো। আর কবিতা হলেই বা দোষ কী। কবিতা তো মিথ্যে নয়। জীবনের সত্যগুলোকে সে সুন্দর করে বলে।

চন্দ্রাদি হেসেছিল, বাপ্‌রে। থাক ভাই, তোমার সঙ্গে তর্ক করে আমি পারব না।

—তর্ক নয়। তুমি তো গান ভালোবাসো? গান কি মিথ্যে?

—মিথ্যে বলব কী করে? গাই যখন।

—গান থেকে যে আনন্দ তুমি পাও, সেটা কিসের? সে-ও জীবনেরই জিনিস। সুরের মধ্য দিয়ে সে আমাদের কাছে সুন্দর আর সুদূর হয়ে আসে। 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি—' তখন চেনাকেই দেখি—অথচ কী অপরূপ ভাবেই দেখি। তখন আমাদের চোখ বুজে আসে। কেন আসে? চোখের চঞ্চলতা মনের তন্ময়তাকে নষ্ট করে দেয়। আমরা যারা চিরকালের মতো। চোখ বুজেছি, আমরা চির-তন্ময়, অপরূপকে আমরা কখনো হারাবো না।

তাই আমার অন্ধতাই সবচেয়ে বড়ো পাথেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারের ভেতর দিয়েই সেই অন্ধ বাউলের মতো আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি—এগিয়ে যেতে পারি 'মুক্তধারার' বাঁধ বাঁধতে। আমার অনেক কাজ বাকী। আমি অনেকদিন বাঁচব, আমার স্মৃতি নিয়ে, আনন্দ নিয়ে, অনুভব নিয়ে।

"তারে মোহনমন্ত্র দিয়ে গেছে যত ফুলের গন্ধ,
তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত চেউয়ের ছন্দ—"

সেই আমি মরে যাব? হারিয়ে যাব পৃথিবী থেকে? এত তাড়াতাড়ি আমার সব কাজের পালা ফুরিয়ে গেল! এখুনি মৃত্যুর পরোয়ানা এসে পৌঁছে গেল আমার কাছে? তা হলে চন্দ্রাদির কাছে আমি অত জোর দেখিয়েছিলুম কেন?

আমি বিশ্বাস করি না। ডাক্তারেরা বুঝতে পারেনি। আমি মরব না—অনেক, অনেকদিন বাঁচব।

[—খোকন।

মা ডাকলেন। আমি সেখা থামালুম।

—ভাখ, কে এসেছে।

বলেই মা সামলে নিলেন। আমার যে আর দেখবার জো নেই—সে কথাটা এই ষোলো বছরেও মা সম্পূর্ণ যেন বিশ্বাস করতে পারেননি। বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে শক্ত।

নিজেকে শুধরে নিয়ে বললেন, তোর ছেলেবেলার সেই মাসিমা এসেছে রে! সেই সঙ্গে এসেছে পুতুল।

রঞ্জার হাসি ভেসে উঠল: পরিচয় করতে হবে না মাসিমা—ওটা এলাকী আগেই করিয়ে দিয়েছে। ভালো আছেন তো হিরণবাবু?

বললুম, হাঁ, এখন ভালোই আছি। আপনি?

এবার মাসিমা বললেন, ও আবার কী, 'আপনি আপনি' তোরা বলছিস কাকে? ছেলেবেলায় যে মেয়েটা তোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে হাড় জ্বালিয়ে মারত! ওকে তো তুই বলবি খোকন।

আমি হাসলুম, প্রথমেই অতটা পারব না—অনেক দিন হয়ে গেল তো। সইয়ে সইয়ে নিতে হবে।

রঞ্জা বললে, ঠিক আছে। আমিই চেষ্টা করে দেখছি। জানো হিরণদা, এলাকী বলে তুমি খুব ভালো কবিতা লেখো।

একটা রোমাঞ্চ বয়ে গেল শরীর দিয়ে। লোভ হল, সঙ্গে সঙ্গে ওকেও তুমি বলে ডাকি। কিন্তু সংকোচ কাটল না। বললুম, টুনটুন একটু বাড়িয়ে বলে সব সময় আমার সম্বন্ধে।

—বাড়িয়ে বলবে কেন? একদিন শুনব তোমার কবিতা।

একদিন কেন? আজই তো শুনতে পারে রঞ্জা। আজই তো আমার কবিতা শোনাতে শোনাতে বলতে পারি, জানো, আমার জীবনে—আমার আলোয় জগৎটুকুতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই—সেই পাঁচ বছরের তুমি। তোমার অনেক দেখার ভেতরে আমি আর কোথাও নেই—কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমি এক ব্রত। তাই প্রেমের কবিতা লিখতে গিয়ে মনে মনে যদি তোমাকেই আমি ভেবে থাকি, তবে সে অপরাধ আমায় ক্ষমা কোরো।

কিন্তু আমি কিছু বললুম না—রঞ্জাও নয়। মাসিমা কথা কইছিলেন।

—তোর অসুখের ভেতরে আমরা দু-বার এসে গেছি খোকন। এখন শরীরটা একটু ঠিক হয়েছে তো?

মনে হল, মাসিমাকে একটা প্রণাম করা উচিত। উঠে দাঁড়িয়ে গলায় স্বর অনুমান করে নিচু হলুম, স্পর্শ করলুম না।

—থাক, থাক বাবা। চিরজীবী হয়ে থাক।

মা'র ভিজে ভিজে স্বর: সেই আশীর্বাদই করো দিদি—মা তার ধরিয়ে দিয়েছিল আমার।

—না দিদি, ভাববার কিছু নেই। বাবা খোকন, একটু সাবধান হয়ে থাকিস। এখন কোনো পরিশ্রম করা তোর ঠিক নয়।

মাসিমার কথা শুনছি, আর ছেলেবেলাকার সেই ঘরে-রাখা টুকরো টুকরো শব্দের সঙ্গে তাদের মিলিয়ে নিতে চাইছি। কিন্তু মিলছে না। মাঝখানে ষোলোটা বছরের ব্যবধান দাঁড়িয়ে।

আমি নিরুত্তরে হাসলুম কেবল।

মা'র ঘরে অনুযোগ ফুটে বেরুল, বলুন তো—সে কথা কে বোঝায় ছেলেকে? সময় পেলেই খুট খুট করে লিখতে বসে। বলি, না হয় দুদিন পরেই লিখবি, শরীরটা একটু সেরে উঠুক—কিন্তু শুনছে কে?

—হিরণদা, তোমার কবিতা ছাপোনা কেন?—রত্না যোগ দিলে মাঝখানে।

—ছাপবে কে?—আমি সেই হাসিটাই টেনে রাখতে চাইলুম মুখের ওপর।

—এনাক্ষী বলে, তোমার কবিতা খুব ভালো। পাঠালেই ছাপবে।

—আচ্ছা দেখব।

কিন্তু এনাক্ষীর কথাই সব? রত্না কি এখুনি শুনতে পারে না দু-একটা কবিতা? আমি ভালো লিখি কি মন্দ লিখি, নিজেই তা পারে না যাচাই করে নিতে? কেবল পরের ওপরেই বরাত দিতে চায়?

আমার ভাবনার ছায়া রত্নার মনের ভেতরে পড়ল না।

—তোমরা কথা বলো মা। আমি যাই ওদিকে—দেখি এনাক্ষী কী করছে।

পায়ের শব্দ বেরিয়ে গেল বাইরে—সোনাপের উগ্র সুরভিটা দূরে সরে গেল। ওর পায়ের আওয়াজে টুনটুনের মতো লঘু নয়। অনেকখানি বলিষ্ঠতা আর আত্মপ্রত্যয়, অনেক বেশি উচ্ছলতা।

আমার কি আঘাত লাগল? কিন্তু কোনো তো কারণ নেই তার। কী এমন কৌতূহল রত্নার থাকতে পারে আমার সম্পর্কে? সে আমাকে বলতে গেলে চেনেও না, জানেও না। যেটুকু সহজ সম্পর্ক তৈরী করে নিয়েছে সে তার নিজ গুণে—টুনটুন বলে, ওর মতো ভালো মেয়ে নাকি বাংলা দেশে দুর্লভ। সেইজন্যই অসঙ্কোচে ভদ্রতাটুকু করতে পেরেছে।

আমি? আমি তো একান্তভাবে নিজের গণ্ডীটুকুতেই বাস করছি। তার জগতের সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই। তা ছাড়া বসন্তে আমি কুরূপ, কুৎসিত হয়ে গেছি, আমার মুখের ওপর ক্ষতচিহ্নগুলো ব্রেইলের লেখার মতো কী যেন দুর্বোধ্য ভাগ্যলিপি লিখে দিয়ে গেছে। একটা অসুন্দর, অপরিচিত, অন্ধ পৃথিবীর মানুষের সান্নিধ্য তার কেন বেশিক্ষণ ভালো লাগবে? তার কি তা ভালো লাগা উচিত?

মাসিমা গল্প করছেন মা-র সঙ্গে। আমার চেয়ার টেবিল থেকে একটু দূরে ওঁরা দুটো মোড়া পেতে বসেছেন বুঝতে পারছি। আমার ছেলেবেলার কথাই আলোচনা চলছে। আমি কি রকম ছিলুম দেখতে, কী কী করেছি, কালবোশেখীর ঝড়ে কিভাবে যে আমবাগানে ছুটে বেরিয়ে যেতুম—রাতে প্যাচা ডাকলে কেমন করে জড়িয়ে ধরতুম মা-কে—

মা-র দীর্ঘশ্বাস পড়ছে।

—কত আশাই যে করেছিলুম ভাই! এমন হীরের মতো ছেলে। ভগবান চোখ নিয়েছেন সে দুঃখও সয়েছিলুম, কিন্তু আমার কপালে কী যে আছে এরপর—

মাসিমা সান্ত্বনা দিচ্ছেন: কেন ও-সব ভাবনা ভাই? সময় হয়েস। একটু নজর রেখো, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।

আমি জানি। আমারি কোনো ভাবনা নেই। জীবনের ওপরে আমার কোনো দাবি এখনো মেটেনি; আমার অনেক পাওয়া বাকী, অনেক দেখা এখনো শেষ হয়নি। স্বনিময়, গন্ধময়, স্পর্শময় জীবন আমার অন্ধকার চেতনার ওপর কত রঙ, কত আলো, কত ছবি ফুটিয়ে তুলবে।

'অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহিরে—'

নিজের ভাবনাতেই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলুম। মাসিমার একটা কথা চকিতে আমায় উৎকর্ণ করে দিলে।

—মেয়ের বিয়ে তো দিতেই চাইছি দিদি। কিন্তু ওর জন্যেই তো হচ্ছে না।

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

—কর্তার আপত্তি কোথায়?—মা জানতে চাইছেন।

—আপত্তি আর কিছু নয়—মনের মতো পাত্র মিলছে না।

—সে কি কথা! আমাদের বস্তির ঘরে সুপাত্রের অভাব?—মা'র স্বরে কৌতূহল।

—সে আর বলবেন না দিদি। আপনার মতো আমারও তো ওই এক মেয়ে—বাপ আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটি খেয়েছেন। সুপাত্রের এক অভাব কী? কিন্তু ওর অনেক ফ্যাকড়া। জানেন তো আমাদের বৈষ্ণবের বাড়ী, মাছ-মাংস-ডিম কিছু চলে না। উনি বলেন, কোন্ রাক্ষসের বাড়ীতে পাঠাব—মাছের আঁশটে গন্ধেই মেয়েটা মরে যাবে। তার ওপর বাঙাল চলবে না, তাদের ভাষা নাকি আমার মেয়ের কানে বন্দুকের গুলির মতো লাগবে। এত বাছবিচার নিটিয়ে যদি বা একটি ছেলে পাওয়া গেল, তা-ও ওঁর পছন্দ হল না। দোষের মধ্যে ছেলের রঙ কালো। বলুন তো ভাই, পুরুষ মানুষের গায়ের রঙ নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? উত্তর হল: আমার অমন সুন্দর মেয়ে—বিউটি অ্যাণ্ড্ দি বীস্ট চলবে না।

মা হাসলেন: তবে তো ভারী মুশ্‌কিল।

—মুশকিল বই কি দিদি! আমিও খুব ঝগড়া করলুম। বললুম, অতই যদি, তা হলে বিলেত থেকে সাহেব বর নিয়ে এসো, আমাদের বাঙালীর ঘরে জুটবে না। উত্তর হল: আনতুম, কিন্তু ও ব্যাটারা আদত নর-রাক্ষস। আস্তো আস্তো গোরুর ঠ্যাং খায়। আমি ঠিক বলছি দিদি—সারাজীবন মেয়ে থুবড়ো হয়ে থাকবে। বলুন তো, এই দিনকাল—বৈষ্ণব কোথায় পাওয়া যাবে আজকাল? অত বাছলে চলে না। উনি বলেন, আমাদের গোস্বামী উপাধি আছে জানো তো? আমরা শুদ্ধ বংশ। চৌদ্দ পুরুষের ধারা আমি ভাঙতে পারব না—ছেলে যদি লাটসাহেবও হয়—তবুও না।

মা চুপ করে রইলেন। কিছু একটা ভাবছেন বলে আমার মনে হল। কিন্তু কী ভাবছেন? সেই ছেলেবেলার কথা? মাসিমার সেই হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া ঠাট্টাটুকু? কিন্তু কী করে তা ভাবছেন মা? আমরা তো বৈষ্ণব নই। পেঁয়াজ রসুন না হলে কারুর তো খাওয়াই হয় না—সপ্তাহে তিনদিন মুরগী আসে বাড়ীতে।

না—আমার এসব ভাবা উচিত নয়। কী ছেলেমানুষি করছি নিজের মনে। আমি কে? পঙ্গু অপদার্থ—অসহায়। মাত্র কিছুদিন আগেই মৃত্যুর দূত আমার দরজায় তার সাড়া জানিয়ে গেছে।

না—আমার কোনো দুঃখ হচ্ছে না। কোনো আশা ভঙ্গও হয়নি। যে আলাদা জগতের মধ্যে আমি বাস করছি, সেখানকার দরজা পুতুলকে নিয়েই বন্ধ হয়ে গেছে। বজ্র দাপওও সে বন্ধ দুয়ার কোনোদিনই খুলতে পারবে না—তার সেখানে ঢোকবার কোনো অর্থই নেই।

তবু কেন জানি না, মেসোমশাইয়ের ওপর আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি। তাঁর এই খুঁতখুঁতুনির

জন্যেই হয়তো পুতুলকে আবার নতুন করে পেলুম আমি। নইলে এতদিনে কে এসে তাকে কতদূরে নিয়ে চলে যেত।

অর্গ্যানের সুর ভেসে এল। তারপর সেই বলিষ্ঠ উজ্জ্বল গলায় শুরু হয়ে উঠল মীরার ভজন। অর্গ্যান আছে কাকিমার ঘরে। সেখানে বসেই গান গাইছে রঞ্জা। বৈষ্ণব বলেই হয়তো মীরার ভজন ওর এত পছন্দ। টুনটুন শুনছে, কাকিমা শুনছে, কাকাও আছেন হয়তো।

কিন্তু আমাকে ওরা ডাকেনি। ওদের আসরে আমি কেউ নই। আমার জন্যে কেবল মা আর মাসিমা—আর তাঁদের নিতান্ত বৈষয়িক আলোচনা। ওদের গানের মজলিসে আমার কথা কারুর মনেও পড়ে না; মা আর মাসিমা তাঁদের গল্পের একান্ততায় আমার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। আমি কেউ নই, কারো নই।

তবু টুনটুনও তো অন্তত একটিবার আমার কথা ভাবতে পারত।

আমি দাঁতে দাঁত চাপলুম। এই আমার যেন প্রথম মনে হল, আমার আত্মতৃপ্তির মধ্যে কোথাও ফাঁকা আছে। আমি যেন এইবারে অনুভব করলুম: সংসারে এমন বঞ্চনাও আছে যাকে সহ্য করা শক্ত। না—চন্দ্রাদিকে অনেক কথা কেবল বলবার জন্যেই আমি বলে গেছি, তাকে জিততে পারিনি।

মাসিমা বলছেন, আমি বলি, তোমার জন্যে শেষে একটা অঘটন ঘটবে। দিনকাল যেমন পড়েছে—এখনকার ছেলেমেয়েদের তো অসাধ্যি কিছু নেই। এখন যে গোঁসাই বংশ বলে নাক উঁচিয়ে বসে আছো, শেষে কোত্থেকে একটা অজাত-কুজাতের হাত ধরে এসে টিপ করে তোমার পায়ে প্রণাম করবে, বলবে—বাবা, সিভিল ম্যারেজ করে এলুম, তুমি আমায় আশীর্বাদ করো। এত বাছাবাছি আর লম্বা লম্বা কথা তখন কোথায় থাকবে—শুনি?

—না—না, পুতুল তেমন মেয়ে নয়।—মা আশ্বাস দিতে চাইছেন।

—কে জানে দিদি! ভালো বলেই তো মনে হয়। কিন্তু এই বয়েস আর যা দিনকাল—

আমার কাছ থেকে মাত্র হাত তিনেক দূরে বসে দুই সখী অসংকোচে মনের কথা বলছেন। আমার জন্যে কোনো কুণ্ঠা নেই—কোনো লজ্জাও আছে কিনা সন্দেহ। আমি এই বাড়ী শুদ্ধ সকলের কাছেই নিছক একটা জড়-পদার্থ। একটা পাথরের ধারে কিংবা কোনো গাছের তলায় বসে গোপন কথা বলতে গেলে গাছের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন কারো সচেতন থাকার দরকার হয় না, আমার ব্যাপারটাও ঠিক তাই!

সুখে আছি আমি? কী নির্বোধ—কী নিদারুণ নির্বোধ।

আর ওদিক থেকে ভেসে আসছে লহরে লহরে রঞ্জার গান:

"মীরা কী প্রভু গিরিধর নাগর
বিষ্‌সে অমৃত্‌ করে—"

কিন্তু ওখানে তো টুনটুন ছিল। সে-ও তো আমায় ডেকে নিয়ে যেতে পারত ওদের গানের আসরে। বলতে পারত, সোনাদা তুমি ওখানে অমন চুপটি করে বসে আছো কেন? চলো—চলো, আমাদের ঘরে গিয়ে বসবে—শুনবে রঞ্জাদির গান?

অথচ আমার কথা ওর একবারও মনে পড়ল না। আর ওর কাছেই আমি খুঁজতুম শান্তি

দুর্গোৎসব

দুর্গতিনাশিনী জগজ্জননী বরাভয় নিয়ে আসছেন বাঙালির ঘরে। শরতের নির্মেঘ আকাশের নির্মল নীলিমায়, কাশের শুভ্র স্বচ্ছ হাসিতে। ভরা নদীর কলোচ্ছ্বাসে, বিহগ কুলের কাকলি কূজনে আনন্দময়ীর আগমনী ঘোষিত হচ্ছে। সমাসন্ন মাতৃ-পূজার পবিত্র লগ্নে বাঙালী পুনর্বার সমবেত হবে সখ্য প্রীতির স্নিগ্ধ বন্ধনে। জগন্মাতার কাছে সংগ্রামে বিজয় বর লাভের প্রার্থনায় মুখর হবে।

দেশবাসীর সেই প্রার্থনার সঙ্গে আমরা আমাদের কণ্ঠস্বরও যুক্ত করি।

অজস্র দুঃখসমস্যায় তীব্র তিক্ত বাঙালীর জীবন আবার মধুময় হয়ে উঠুক।

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা

আবিষ্কারক—রসমালাই

আর সান্ত্বনা—ও এসে কবিতা শোনাবে তা আমাকে—শোনাতো সেতারা—ছোট বোন হলেও ওকে আমি ছোট না বলেই ভেবেছি এতকাল।

আমার কেউ নেই। আমি একা।

আচ্ছা—আমি আবার হাতের ওপর হাত চাপিয়ে দিলুম। রক্তাও যদি অন্ধ হয়ে যেত, তা হলে? যে চোখের খুশিতে আর গৌরবে সে এখন তাবে ভবিষ্যের মত জীবনের বসন্তের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে, সেখানে যদি হঠাৎ দেখা দেয় কোন ব্যাধের বাণ—কোনো একটা পুরোনো ইঁদারার কালো অতল থেকে উঠে আসে চোখ ছিনিয়ে নেওয়া শয়তানের সেই দুটো চোখ? কিছু বলা যায় না—কেউ বলতে পারে না। এখনো রক্তার টাইফয়েড হতে পারে, স্বল পক্স দেখা দিতে পারে—

ছিঃ ছিঃ ছিঃ—কী ভাবছি আমি? পাগল হয়ে গেছি নাকি? অন্ধ আমি হতে পারি, তাই বলে জানোয়ার তো নই! কোথা থেকে এমন কদর্য চিন্তা আমার মনে এল!

আমার নিঃসঙ্গতাই আমার গৌরব। সেই আমার অহঙ্কার। আমি সেখানে সম্রাট হয়ে বসে আছি—কে আমাকে সেখানে স্পর্শ করে? আমি সেই স্নো ঈগল—হিমালয়ের গ্লেসিয়ার্সের মধ্য দিয়ে নির্জীব ডানায় যার একক যাত্রা। আমি একাই চলব।

"The lone climber—snowy peaks ahead—"

কিন্তু গানটাকে তবু ভোলা যাচ্ছে না। স্নো ঈগলকে সে পিছু টানছে ক্রমাগত।

বীরা কী প্রভু গিরিবর নাগর—

॥ আট ॥

আমি কিছুতেই যেতে চাইনি। বলনুম, আমাকে আর কেন টানাটানি করছ মা? তোমরা যাবে যাও—আমি ঘরেই বেশ আছি।

মা রাগ করলেন।

—একি কুনো অভ্যেস হল তোর? আগে তো এমন ছিলি না। টুনটুনের সঙ্গে তবু মাঝে মাঝে পার্কে বেড়াতে যেতিস। এখন যে ঘরের কোণা ছেড়ে নড়তেই চাসনে।

—আমার ভালো লাগে না।

মা বললেন, ভাল তবে লাগে কি, শুনি? ওই যন্তরটা নিয়ে খুটুর-খাটুর করতে। দেব ওটা আমি রাস্তায় ফেলে।

আমি হেসে বলনুম, ও ভয় তুমি আগেও অনেকবার দেখিয়েছ, কিন্তু ওটা ফেলতে পারোনি। সত্যি বলছি মা—তোমরা যাও—আমাকে একলা থাকতে দাও।

—ডাক্তার যে তোকে খোলা হাওয়ায় বেড়াতে বলেছে।

—সেই খোলা হাওয়া বুঝি তোমার সইয়ের বাড়ী?

মা এবার হেসে ফেললেন বুঝতে পারলুম। তারপরেই আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন।

—না ভাখ, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। ওরা চার পাঁচদিন এল গেল, আমাদেরও এক আধদিন

না গেলে ভাল দেখায়? কী ভাববে ওরা? আজই দুপুরে সই টেলিফোন করছিল যাবার জন্যে। চল্ বাবা!

—টুনটুনকে নিয়ে যাও।

—কেন জ্বালাচ্ছিস খোকন? টুনটুন তো মামাবাড়ী গেছে কোন্নগরে।

তা বটে! কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম। কিসের জন্যে যেন ওদের কলেজ ছুটি আছে তিন চারদিন। কাল ওর মামা-মামীরা এসেছিলেন। তাঁরা জোর করে টুনটুনকে দু'দিনের জন্যে ধরে নিয়ে গেছেন।

মা আবার বললেন, বিশুকে নিয়ে যেতুম (বিশু আমার খুড়তুতো ভাই—কার্স্ট ইয়ারে পড়ে) —কিন্তু সে আবার সেল কোথায় টেবিল টেনিস খেলতে, তাদের নাকি কম্পিটিশন আছে। তুই চল্ সঙ্গে। ওরাও খুশি হবে।

—তোমার অন্ধ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কি করবে মা? আমি তো তোমার কোন সাহায্য করতে পারব না—কেবল বোঝাই বাড়াবো।

মা একটু চুপ করে রইলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলুম।

তুই জানিস এই কথাটায় আমি সব চাইতে দুঃখ পাই। কথাটা কি তোর না বললেই নয়।

আমার অনুতাপ হল।

—চলো মা, যাচ্ছি।

ট্যাক্সিতে রওনা হলুম যার সঙ্গে। একডালিয়া রোড থেকে পার্কসার্কাস। কতটা পথ জানি না। আমি শুনেছি কলকাতা যেমন বিপুল, তেমনি বিচিত্র। ট্রামে-বাসে আকাশ-ছোঁয়া বাড়ীতে লাখো লাখো মানুষে সে এক বিপর্যয় কাণ্ড। আমি তার কিছুই জানি না—যখন আমার চোখ ছিল, তখন কলকাতা আমি দেখিনি। কিন্তু শ্রুতিতে, ধ্বনিতে—অনুভবে আমি বুঝতে পারি। ট্রামের শব্দ চিনি, জানি বাসের আওয়াজ—যখন লরী যাচ্ছে আন্দাজ করতে পারি। জানি ঠেলাগাড়ির চাকার ছন্দ; ডবল-ডেকার বাসের মাটি কাঁপানো ভৈরব উল্লাস বুঝতে আমার দেরী হয় না। গাড়িতে বসেও টের পাই, কোন্ পথে ভিড়, কোন পথ লোকারণ্য।

মনে হচ্ছে, একটা ফাঁকা চওড়া রাস্তা দিয়ে চলেছি। অফুরন্ত হাওয়ার উচ্ছ্বাস আসছে গায়ে—রাস্তার ধারে সারি সারি গাছে পাতায় পাতায় ফুকান উঠছে বোধ হচ্ছে। শরৎ আসছে মনে হয়। গড়াই নদীর চরে এই সময় কত কাশ ফুটত—মাইলের পর মাইল বনঝাউ আর কাশ মেশামেশি করে যেন অসীমের সমুদ্র রচনা করত। আমাদের বাসানটা যেন একাকার হয়ে থাকত শিউলীতে। আশে-পাশে কোথাও নিশ্চয় শিউলি গাছ আছে—বাতাসে তার নতুন ফুঁড়ির শিহরণ টের পাচ্ছি।

কী ভাবছিলুম? ছেলেবেলার দিনগুলো?—না ঠিক তাও নয়। মনে হচ্ছিল আজ তো আমি সকলের বাইরে। কাকা ওকালতী পাস করতে বলেছিলেন, সেটা করলেও আমার কিছু না কিছু ভূমিকা ছিল। কিন্তু ওখানেও তো কিছুতেই নিজের উৎসাহটাকে জাগাতে পারলুম না। সকলের, সব কাজের থেকে আমি দূরে, নিঃসঙ্গতার রাজ্যে সম্রাট, ব্লিজার্ডের সঙ্গে লড়াই করে উড়ে চলা একাকী ঈগল। মা কেন সেই আমাকে রঞ্জনের বাড়িতে টেনে নিয়ে যেতে চান? আরো বিশেষ করে যে আমার

নিতান্তই খেলার পুতুল নিয়ে কারবার—নানা রঙের রূপও আলোয় সেই পুতুল নিয়ে নাড়াচাড়া করেই যে আমার দিন কাটে?

মাঝখানে একদিন একটু জোর মেঘেছিল; কিছুক্ষণের জন্যে তীব্র তিক্ততায় ভেবেছিলুম—যতই আত্মপ্রসাদ নিয়ে বসে থাকি না কেন, পৃথিবী আমায় কখনো কখনো কী নির্মমভাবেই বঞ্চনা করেছে। কিন্তু এখন আর কোনো নালিশ নেই কারো ওপর। আমি নিশ্চিন্ত, আমি নিরুদ্বেগ।

মা অবশ্য কেবল আমার ভরসাতেই আসেননি, বাড়ীর ছোকরা চাকর জনার্দনকেও এনেছিলেন। জনার্দনই হঠাৎ একসময় চেঁচিয়ে উঠল: বৌদি—বৌদি—এই যে বাঁয়ে বাড়ী।

গাড়ী আস্তে আস্তে একটা কম্পাউণ্ডে ঢুকল টের পাচ্ছি। চাকার নীচে পিচ নয়—কাঁকরের আওয়াজ উঠছে। একটা বাগান আছে নিশ্চয়—বাতাসে লতাপাতা, অকিড় আর অজানা ফুলের চাপা গন্ধ।

—এই যে দিদি, আসুন—আসুন।—মাসিমার সম্ভাষণ: পুতুল—তোর মাসিমা এসেছে।

মা'র হাত ধরে নামলুম গাড়ী থেকে।

রঞ্জা ছুটে এসেছে: এনাক্ষী আসেনি?

মা বললেন, না—সে মামাবাড়ী গেছে।

রঞ্জা নিরাশ হল, তা আমি বুঝতে পারছি; কিন্তু আমি এসেছি বলেও কি সে এতটুকু খুশি হয়নি?

মাসিমা বলছেন, চলুন দিদি—চলুন।

একটা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি। দুধারে অর্কিডের উপস্থিতি আমার স্নায়ুকে চকিত করছে। মনে হচ্ছে হাত বাড়িয়ে দিলেই কোথাও এক গুচ্ছ ফুলকে আমি স্পর্শ করতে পারব। উগ্র-সুরভিত একরাশ গোলাপ।

পায়ের তলায় কার্পেট। বসবার ঘর। মা বলছেন, বেশ বাড়ীটি হয়েছে ভাই।

মা আমাকে একটা সোফায় বসিয়েছেন। আমার পাশেই মা। মাসিমাও বসেছেন মুখোমুখি। রঞ্জাও নিশ্চয় ঘরে আছে—তার কথা শুনছি না—উপস্থিতিটা অনুভব করছি।

মাসিমা বলছেন: এ বাড়ীর আশা তো আমরা ছেড়েই দিয়েছিলুম। সেই যাবার সময়—জানেন তো? ভাড়াটে পালালো—পোড়ো হয়ে রইল প্রায় দু বছর। উনি তো বলেছিলেন যে দাম পাই বেচেই দিই। কিন্তু আমি বাধা দিলুম। বললুম, থাকে থাক যায় যাক, এত সাধ করে করা বাড়ী প্রাণে ধরে বেচতে পারব না। এখন তো উনি বলছেন, ভালোই তোমার কথায় বাড়ীটা রেখেছিলুম, নইলে আজ তো আর মাথা গোঁজবার জায়গা জুটত না।

—এনাক্ষী এল না! ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যাবে।—রঞ্জার অনুযোগ শোনা গেল এবার।

কাকার চাইতেও ভারী পায়ের আওয়াজ, তাঁর চাইতেও মোটা গলা নিয়ে মেসোমশাই ঢুকলেন।

—এই যে বৌদি, নমস্কার।

—নমস্কার। খোকন, তোর মেসোমশাই এসেছেন।

উঠে প্রণাম করতে গেলুম, দুখানা চওড়া হাত আমায় আবার বসিয়ে দিলে সোফায়।

—গৌর—গৌর। এমনিই আশীর্বাদ করছি বাবা। তোমার অসুখের কথা শুনেছিলুম—তা এখন বেশ ভালো আছো তো?

—আজ্ঞে হাঁ, ভালোই আছি।

তারপরেই আমার আর কোনো দরকার রইল না। সংসারের আলাপ, অতীতের স্মৃতি-মন্থন, মাসিমার বাতের কাহিনী, আমাকে নিয়ে মা-র দুশ্চিন্তার ইতিহাস। আর শেষে রঞ্জার বিয়ের কথা।

—আপনিই বলুন তো বৌদি—যেখানে হোক মেয়েটাকে আপদ বিদায় করলেই হল? একটা মাত্র মেয়ে আমার—দুম্ করে তুলে দেব যার-তার হাতে? বয়েসও তো এখন কিছু হয়নি। আমি বলি এম. এ. টা পাস করুক, তারপর—

রঞ্জা এতক্ষণ আলাপের ভেতরে টুকটাক করে নিজের কথা জুড়ে দিচ্ছিল, আমি বুঝতে পারলুম, এইবার ওর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। তারপরে ঠিক আমার পাশে ওর নীচু গলা শুনতে পেলুম।

—চলো হিরণদা, আমার পড়ার ঘরে। এখানে বুড়োবুড়ীরা সুখ-দুঃখের গল্প করুক।

মাসিমা হাসলেন: বিয়ের কথা উঠলেই পালায়। যা থোকন—তুই ওর সঙ্গেই যা।

লাঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। জানি, আমি টুনটুনের বিকল্প—আমার জন্যে রঞ্জার আলাদা কোনো পক্ষপাত নেই। মনের মধ্যে একটা প্রতিবাদ গর্জন করে উঠল একবার—কিন্তু রঞ্জা আমার হাত ধরেছে। মা নয়—টুনটুন নয়—আর এক স্পর্শ। আমার রক্তের ভেতরে ঝিন ঝিন করে উঠল।

আমি এগিয়ে চললুম। যেন নিজের ভাগ্য আমাকে নিয়ে চলেছে। আর কী অপরূপ মাদকতা জাগছে শরীরে—সেই হাতের ছোঁয়ায় আমার নিরালোক চেতনার মধ্যে যেন একটির পর একটি আলোর বিদ্যুৎ ছুটে চলেছে। এমনি করে সারাটা জীবন যদি কেউ আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যেত, তা হলে—

স্বপ্নের মধ্য দিয়ে পা ফেলছিলুম—যেন নীচে মাটি ছিল না, যেন মেঘের ভেতরে ভেসে চলেছিলুম খানিকক্ষণ। তারপর রঞ্জা বললে, বসুন।

একটা চেয়ার। হাত বাড়াতে টেবিল আর বইয়ের স্পর্শ। রঞ্জার পড়বার ঘর। বইগুলোর ওপর আমি হাত বুলিয়ে নিলুম। যদি ব্রেইলে লেখা হত, আমি পড়তে পারতুম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। গোলাপগুচ্ছের গন্ধে যেন নেশা ধরছে একটু একটু করে। আমার অন্ধত্বের অধিকার কথাটা ভুলে গেছি এখন। ভাবছি, এমনি করে ওর মুখোমুখি আমি একভাবে চুপ করে বসে থাকতে পারি, দিনের পর দিন—মাসের পর মাস।

তারপরেই সজাগ হয়ে উঠলুম। আমি যে টুনটুনের বিকল্প—গোলাপের একটা ছোট কাঁটা হয়ে সেইটে আমাকে বিঁধল। সৌজন্যের আলাপ শুরু করে দিলুম।

—কী নিয়ে এম. এ. পড়ছ?

—বিস্ট্রি।

এন্‌শেণ্ট্, না মডার্ণ?

—মডার্ণ।

—পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট খুব ভালো লাগে?

—মন্দ কী? পড়তে চাইলে পৃথিবীর সমস্ত বইয়ের দোকান—পড়তে না চাইলে একেবারে অখণ্ড স্বাধীনতা।

—তুমি কোন্‌টা বেছে নিয়েছ?

রঞ্জা হাসল: মাঝামাঝি রাস্তা। যতই চেষ্টা করি না কেন, আমার মেরিট নিয়ে কোনো দিনই ফার্স্ট ক্লাস পাবো না। কাজেই সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত বসে চশমার পাওয়ার বাড়াতে আর ইচ্ছে করে না। তবে মোটামুটি একটা সেকেণ্ড ক্লাস না পেলেও তো চলবে না—সেটাও দেখতে হবে।

কিন্তু কী ফুল—কী বৈষয়িক আলোচনার মধ্যে সময় কাটাচ্ছি আমরা। কোনো দরকার আছে এর? রঞ্জার মনের খবর জানি না, আসলে আমিই যেন কথা খুঁজে পাচ্ছি না। একটা কৃত্রিম স্বাভাবিকতা সৃষ্টি করতে চাইছি শুধু।

রঞ্জা হঠাৎ বললে, জানো হিরণদা, তোমার কবিতার কিছু কিছু লাইন আমি মুখস্থ বলতে পারি।

দারুণ চমকে উঠলুম।

—আমার কবিতার লাইন। তুমি পেলে কোথায়?

—বাড়ীতে যে তোমার মুগ্ধ ভক্তটি বসে আছে—তার কথা ভুলে গেলে? এনাক্ষীর মুখে বার বার শুনতে শুনতে আমার ডাল-মেমোরিতে পর্যন্ত ধরা পড়ে গেছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? শোন:

তারপরে কবে দেখেছি তোমার হে মোর চিত্রলেখা,
শিপ্রা সলিলে কেলিরাছে ছায়া সে কোন্ উজ্জয়িনী,
মণি-মরকত খচিত সে কোন্ মর্মর শিলাতলে,
কবরী বাঁধিছ প্রেয়সীকন্যা অগুরু ধূপাধারে।
রাশি রাশি ফুলে রেখায় ভরেছে সপ্তপর্ণী শাখা,
টলোমলো করে কানায় কানায় মরাল দীঘির জল—

—থাক, থাক।—আমি লজ্জা পেলুম: টুনটুনের এ ভারী অন্যায়।

—অন্যায় কেন?—রঞ্জা হাসল: ওর সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে তুমি নিয়মিত লিখলে কবি হিসেবে নাম করতে পারবে।

বললুম, এ কবিতা আজকের দিনে অচল। এই ভাষা, এই ছন্দ, এ সব কবি এখনকার পাঠকের ভালো লাগে না।

—সব কালেই সব রকম পাঠক আছে, কোনোদিনই পাঠকের বিশেষ কোনো চেহারা নেই। দেখতেই পাচ্ছ, এ যুগেই তোমার মুগ্ধ পাঠিকা রয়েছে এনাক্ষী—আর আমাকেও প্রায় দলে টেনে ফেলেছে।

—ঘরের লোকের দেওয়া মানপত্রের ওপর বেশি বিশ্বাস করতে নেই।

—বিনয়ে তোমার সঙ্গে পারা যাবে না।—রঞ্জা হাসল: সত্যিই তোমার কবিতার হাত ভারী মিষ্টি। পড়তে পড়তে কালিদাস মনে আসে। বললুম, তার কারণ ছবিটা আসাগোড়া কালিদাস থেকে চুরি।

—এটা তর্ক। কলহন না কার একটা শ্লোক পড়েছিলুম, 'পরকাব্যেষু কবয়ঃ'। সব কবিই অন্যের কাছ থেকে প্রেরণা নেন, একজনের বীজ কুড়িয়ে নিয়ে আর একজন ফুলের ফসল ফলান। কিন্তু এসব তত্ত্ব আলোচনা থাক। একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমায়? এর আগেও কয়েকবার মনে হয়েছে, কিন্তু বলতে—

—কিছু না—কিছু না বলো।

—তোমার এসব কবিতার কি সবটাই ইম্‌পার্সোনাল?

আমি একটুখানি চকিত হয়ে উঠলুম: তার মানে?

—বলছি। —রঞ্জা একবার ইতস্তত করল: যে চিত্রলেখার কথা এই কবিতায় তুমি বলেছ, সে কি শুধুই একটা রোম্যান্টিক স্বপ্ন? নিছক কালিদাসের কাব্য থেকেই সে বেরিয়ে এসেছে? জীবনে কোথাও কি তার এতটুকু মূল ছিল না? এমন একটা বিন্দু কি কোথাও নেই—যাকে আশ্রয় করে কবিতার বুকোটা গড়ে উঠতে থাকে?

আমার বুকে তুফান উঠল, মাথায় ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল রক্ত। কী করে জানতে পারল রঞ্জা? কেমন করে বুঝল আমার সেই স্মৃতির বৃন্তের ভেতর থেকে, চার বছরের পুতুলের সেই ছোট অঙ্কুরটিকে দিনের পর দিন লালন করেছি আমি? কী করে অনুমান করল: যে তরুণী মেয়ের দেহকান্তির কোনো চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আমার নেই, কালিদাসের কবিতা দিয়ে সেই অভাব আমি পূরণ করেছি—আর তিলে তিলে যে তিলোত্তমা চিত্রলেখাকে গড়ে নিয়েছি, সে—

রঞ্জা বলল, অবশ্য এ শুধুই কৌতূহল। কবিকে তার জীবন-চরিতে খুঁজে পাওয়া যায় না, একথা রবীন্দ্রনাথ বলে দিয়েছেন। তবু আমরা যারা কবি নই, আমাদের জানতে ইচ্ছে করে ইন্‌স্পিরেশন কি মন থেকে আপনি আসে, না বাইরেও তার একটা 'সোর্স' দরকার হয়?

নিজের হৃৎপিণ্ডের চঞ্চল স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি, রঞ্জাও শুনছে কিনা জানি না। বলব? এতদিনের সমস্ত নীরব সাধনার অর্ঘ্য ঢেলে দেব ওর পায়ে? আজ সব সংকোচের আড়াল সরিয়ে দিয়ে ওকে জানাবো: আমার প্রেরণার সেই উৎস তুমিই—তুমি ছাড়া আর কেউই নয়? তোমাকে আমি দেখিনি—চিনি না—জানি না। তুমি সুন্দর, একথা সবাই বলে। কিন্তু সকলের দেখা সেই রূপের সঙ্গে আমার ভাবনার কোন মিল নেই। আমি তোমাকে আমার জন্যে নতুন করে সৃষ্টি করে নিয়েছি, কালিদাসের কাব্য থেকে হোক আর ইংরেজি কবিতার স্বপ্ন থেকেই হোক—তোমার এক আলাদা ধ্যানরূপ আমি গড়ে রেখেছি নিজের হাতে, যেমন করে পিগ্‌ম্যালিয়ন শাদা পাথরের বুকে খোদাই করে নিজের মানসী মূর্তিকে রূপ দিয়েছিল।

আমি হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিলুম, হয়তো কোনো কথাই আমার ঠোঁটের সীমানা পেরুতে পারত না। ঠিক সেই সময় মাসিমার ডাক ভেসে এল: ওরে পুতুল, খোকনকে নিয়ে আয় এ ঘরে। তোর মাসিমা গান শুনতে চাইছে।

রঞ্জা বললে, দেখলে তো? তোমার সঙ্গে একটু যে কাব্য চর্চা করব, তারও জো নেই। বেহাত মাসিমা শুনতে চেয়েছেন, নইলে আমি বিদ্রোহ করতুম। চলো এখন ও-ঘরে। পরে এক সময় কবিতা নিয়ে বোঝাপড়া করা যাবে তোমার সঙ্গে।

আমি চেয়ারটা থেকে উঠে দাঁড়ালুম। তারপরে একটু বেরিয়েই কেমন করে জানি না, টেবিলের

একটা পায়া হোক কিংবা আর কিছু হোক—তার সঙ্গে আমার হোঁচট লাগল—মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল আমার।

—আহা—আহা—

রত্না দুহাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে। শাড়ী, সুগন্ধ আর মেঘের ফেনার মতো একটা নরম শরীর এক মুহূর্তে আমাকে যেন নিশ্চিহ্ন করে নিলে। এই কি আমার মৃত্যু? আমার নিঃশেষে হারিয়ে যাওয়া—ফুরিয়ে যাওয়ার এই কি লয়? একটি মিনিটের মধ্যে যেন যুগ-যুগান্ত পার হয়ে গেল।

পরক্ষণেই আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু তখনো থর থর করে কাঁপছি।

রত্না শক্ত করে আমার হাত ধরল। লজ্জায় ভড়ানো, কাঁপন লাগা মৃদু গলায়, দ্রুত ভীত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে জানতে চাইল: লাগল হিরণদা—লাগল তোমার?

—না—না।

আমার গলা কি শুনতে পেলো রত্না? বুঝতে পারলুম না।

॥ নয় ॥

সাত আটদিন কিছু আর লেখা হয়নি।

কেন যে হয়নি, নিজের কাছে সে কথা আর লুকোনো নেই। আমি কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছি না। আমার সব লেখা—সব ভাবনা—সেই মেঘের ফেনার মতো শরীরের অনুভবে, সেই সুগন্ধির ঘূর্ণির মাঝখানে হারিয়ে যাচ্ছে। আমার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু যেন এখনো নেশায় টলছে। একটা তীব্র সুখ, তারো চেয়ে তীব্র বেদনা আমাকে যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।

কিন্তু এ আমি কী করছি? এ কোন্ অর্থহীন পাগলামো আমাকে পেয়ে বসল? একজন অন্ধ মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল—একটি করুণাময়ী মেয়ে তাকে রক্ষা করেছে সেই সংকট মুহূর্তে। আমি তার সেই করুণাকে এ কোন দিক থেকে দেখছি? আমার মন কামনা করছে, এমনি করে আবার হোঁচট খেয়ে পড়ব, আবার দুখানি নিটোল কোমল হাত সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, নরম ফেনার মতো বুকের মধ্যে টেনে নেবে। ছি ছি, এ আবার কী হল?

তবু কিছুতেই ভুলতে পারছি না; মা'র ছোঁয়া নয়—যে সমস্ত ক্লান্ত দেহমনকে অতল বিশ্রামের ভেতরে মগ্ন করে দেবে; আমার ছোট বোন হয়েও যে ছোট্ট মা—সেই টুনটুনের মমতাও তাতে নেই। তবে কী আছে? জানি না। এ স্বাদ জীবনে আমি কখনো পাইনি।

কখনোই আর পাবো না!

ভাবতেই কেমন একটা যন্ত্রণা এসে বুকের সব নাড়ীগুলোকে ধরে যেন হিংস্রভাবে আকর্ষণ করতে থাকে। আমি প্রাণপণে ভুলতে চাই। বলি—রত্না তোমার কেউ নয়, যে নিরালোক নিবাসনে তুমি বাস করছ, সেখানে তার পা কোনোদিন পড়বে না। তার চেয়ে যা পেয়েছো, তাই নিয়েই খুশি হও। চন্দ্রাদি কখনো আলো দেখেনি, অন্ধ-নিকেতনে তার মতো আরো অনেককে তুমি দেখেছ, যারা একটি রঙকেও কোনোদিন দেখবার সুযোগ পেলো না। তোমার এই গোল-টেবিলের মতো স্মৃতির

বৃত্তটা রয়েছে—ষোলো বছরের কালো দীর্ঘ নদটার ভেতর দিয়ে সেই দিনগুলোকে তুমি তো আশ্চর্য উজ্জ্বলতায় দেখতে পাও। তোমার তো কিছুই হারায়নি। সেই গড়াই নদী—ভালো নাম হয়তো গৌরী—সে তেমনি বয়ে চলেছে সেখান দিয়ে, সকাল-সন্ধ্যায়-রাত্রে, ঋতুতে ঋতুতে রঙ বদলাচ্ছে; সেই বকেরা এখনো মাছ ধরতে ধরতে আর পালক খুঁটতে এক-আধবার শুনে নিচ্ছে তোমার ডাক: 'বক মামা, বক মামা—পান খেয়ে যা।' দেখতে পাচ্ছ খেয়া-নৌকোর যাওয়া-আসা, চরের ওপারে কালো কালো কতগুলো পুতুলের মতো ধীর ধীরে মানুষগুলোর কোন্ দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া; তোমার চোখের সামনে চেনা পাখিরা তেমনি করেই উড়ে যাচ্ছে, ডাঁটফুল দুলছে—চাপা ফুটছে, সন্ধ্যার তারার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে লক্ষ কোটি জোনাকি জ্বলছে। আর আছে সেই পুতুল—যে পুতুলকে রঞ্জা আর চেনে না, তার মা'ও হয়তো ভুলে গেছে। সেখানে তোমার অধিকার 'None to dispute!' তার বেশি কেন চাও—তার বেশি কেন করো অনধিকার চর্চা?

আমি তাই নিয়েই থাকব। সেই ক্ষণস্পর্শের মোহ আমার দূর হোক। রঞ্জার করুণাকে আমার লোভ দিয়ে যেন আমি অপমান না করি। আমার সীমানার ভেতরেই পরিক্রমা করব, তার বাইরে কিছুতেই যাব না।

[টুনটুন এল।

—সোনাদা।

—কিরে?

টুনটুন সেই মোড়াটা টেনে নিয়ে বসল। ও ছোট একটি মানুষ, বসলে ওকে কত আরো কত ছোট দেখায়, তা আমার জানতে ইচ্ছে করে।

—কী লিখছিলে সোনাদা?

—কিছু নয় বিশেষ। এমনি এলোমেলো লেখা।

—নতুন কবিতা লেখোনি কিছু? শোনাও না। অনেকদিন তোমার কবিতা শুনিনি।

লিখেছিলুম ক'দিন আগে—সেই মৃত্যুর বন্দনা। কিন্তু সে কবিতার কথা টুনটুনকে বলতে ইচ্ছে করে না, আমিও যেন সেটাকে ভুলে যেতেই চাই। চন্দ্রাদিকে জোরের সঙ্গে বলেছিলুম, জীবনকে আমি ভালোবাসি, আমি বাঁচতে চাই। তারপর কখনো কখনো দার্শনিক হয়ে উঠেছি, কখনো কখনো মনে হয়েছে, আমার সব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু এখন ভাবি, আমি তো আবার দাঁড়াতে পারি—আবার নতুন একটা কিছু আরম্ভ করতে পারি। হেলেন কেলারকে জানি—পৃথিবী জোড়া নাম কিনেছিলেন। আমি যেন ছাব্বিশ বছর বয়সেই প্রাজ্ঞতা আর বৈরাগ্যের চূড়োয় উঠে বসে থাকব?

টুনটুন জিজ্ঞেস করল, চুপ করে আছো যে সোনাদা? শোনাবে না কবিতা?

—নতুন কিছু লিখিনি এখনো।

—জানো, রঞ্জাদি তোমার খুব প্রশংসা করছিল।

আমার হৃৎপিণ্ড চঞ্চল হয়ে উঠল। যে স্মৃতির সাম্রাজ্যে বসেছিলুম, সেখান থেকে চক্ষের পলকে আবার সেই অসম্ভব চুরানীর জগতে নেমে এলুম। প্রাণপণে আত্ম-সংযম করে বললুম, কেন প্রশংসা করছিল? আমার কী এমন অসাধারণ গুণের পরিচয় পেলো সে?

—তোমার কবিতা ওর ভীষণ ভালো লেগেছে। বলে, ভারী মিষ্টি হাত।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে আবার আমি আত্ম-সংবরণ করলুম, তারপর বললুম, তোর ভারী অন্যায় টুনটুন। কেন তুই আমার কবিতা শোনাতে গেলি রঞ্জাকে?

টুনটুন দুষ্টুমির হাসি হেসে উঠল: বেশ করেছি। কবিতা তো কবির একার নয়—সংসারের সকলের জন্যে।

—না, আমার কবিতা আমার নিজের। তোকে শুনিয়েই আমি ভুল করেছি।

টুনটুন আবার হাসল: ভুল যখন করেইছো, তখন তার তো আর চারা নেই। রঞ্জাদি আরো কী বলেছে জানো? ওর জানাশোনা এক ভদ্রলোক 'নতুন আকাশ' পত্রিকাটার সম্পাদক। তুমি যদি কবিতা দাও—তাইতে ছেপে দেবে।

—ছাপাবে না। বাজে কাগজের বুড়িতে ফেলে দেবে।

—আচ্ছা সে দেখা যাবে এখন। রঞ্জাদি হয়তো নিজেই কবিতা চাইতে আসবে তোমার কাছে।

—এলেই দিচ্ছি কিনা!—রঞ্জা আসবে। আমার বুকের স্পন্দন কি টুনটুন শুনতে পাচ্ছে?

—ঠিক আদায় করে নেবে—দেখো।

আমি আবার চুপ করে রইলুম। তারপর: আচ্ছা, টুনটুন—

—কী বলছ?

—কাকা প্রায়ই বলেন, আমাকে ল-ক্লাসে ভর্তি হতে। হয়ে যাবো?

—সে তো ভালোই। টুনটুনের মায়ের মতো গলা মমতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠল: কিন্তু তুমি যে আবার শরীরটাকে খারাপ করে বসে আছো। অত স্ট্রেস তোমার সইবে কেন?

—কিছু না—আমি ঠিক হয়ে গেছি। আচ্ছা, তোর কী মনে হয় টুনটুন? আমি ভালো রেজাল্ট করতে পারব ল-তে? কাকার মতো বড়ো এ্যাড্‌ভোকেট হতে পারব?

—কেন পারবে না? ইচ্ছে করলে তুমি তো ব্যারিস্টারও হতে পারো সোনাদা!—কল্পনাতেই টুনটুন উত্তেজিত হয়ে উঠল: উঃ, তুমি ব্যারিস্টার হলে যে কী মজাই হবে! আমি তোমার হাত ধরে কোর্টে নিয়ে যাবো, তুমি আর্গুমেণ্ট করবে, আমি বসে বসে শুনব। আর তুমি যে পক্ষ নেবে, তারা কোনোদিনই হারবে না।

এই হলো টুনটুনের মতো কথা। আমার ছোট্ট মায়ের কথা।

আমি হাসলুম: এ সব ভাবতে তো ভালোই, কিন্তু তোকে আর তখন আমি পাচ্ছি কোথায়? ততদিনে তুই কবে একখানা টুকটুকে লাল শাড়ী পরে, কার একটা ময়ূরপঙ্খী মোটরে চেপে শ্বশুরবাড়ীতে চলে গেছিস।

—ছিঃ সোনাদা, ওসব বোলো না।—টুনটুন লজ্জা পাচ্ছে।

—কেন বলব না? কথাটা তো সত্যি।

—কক্ষণো সত্যি নয়। আমি বিয়ে করলে তো?

—হুঁ, মুখে ওসব সবাই বলে। কালকে কাকা একটি পাত্র জুটিয়ে আনুন—আর তর সইবে না, তক্ষুণি গিয়ে পিঁড়েতে বসে পড়বি।

—আর আসব না তোমার কাছে—

টুনটুন উঠে পড়ল, ছুটে পালালো ঘর থেকে।

ওর পালিয়ে যাওয়ার সেই লঘু মুহূর্তটির আবেশ মনের মধ্যে মাখিয়ে নিয়ে, আর রত্না আমার কবিতা চাইতে আসবে, এই সম্ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে আমি কল্পনার ছবি আঁকতে লাগলুম। আমি ল' পাস করেছি, অ্যাড্‌ভোকেট হয়েছি, হাইকোর্টে বেরুচ্ছি কাকার সঙ্গে। কাকা বলেন, খুব নাম করে ফেলেন, এরপরে ও আমায় ছাড়িয়ে যাবে। আর ওদিকে রত্নার এখনো বিয়ে হয়নি। বৈষ্ণব, অবাঙালি এবং সর্বগুণান্বিত পাত্রটি বাংলা দেশের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর শেষ পর্যন্ত মাসিমা এসে হয়তো মাকে বলেছিল, তাহলে ছেলেবেলার সেই কথাটাই থাকুক দিদি। খোকনের সঙ্গেই পুতুলের বিয়েটা দিয়ে দিই।

মা বলছেন, সে তো সবচেয়ে ভালোই হয় দিদি। কিন্তু ওই যে খুঁত হয়েছে একটুখানি? আমার ছেলেটার যে চোখ নেই।

: চোখ নেই তো কী হয়েছে? বিদ্যে রয়েছে, বুদ্ধি রয়েছে—চমৎকার স্বভাব। তার ওপর কত রোজগার করে। অমন ছেলে যে লাখে একটি পাওয়া যাবে না সারা দেশে!

: তা বটে, তা বটে!—মা-র গলার স্বরে গর্ব উছলে পড়ছে: সে কথা তাই বলতে পারো। কিন্তু পুতুলের মত হবে তো? হাজার ভালো হোক, একটা খুঁত তো রয়েছে!

নাসিমা এবার গলা নামিয়েছেন। হাসছেন অল্প অল্প।

: তা হলে সত্যি কথা বলি দিদি। আমার মেয়ে কিন্তু তোমার ছেলেকেই পছন্দ করে বসে আছে। সেই ষোলো বছর আগে কী কথাই বলেছিলুম তাই, প্রজাপতি ঠিক শুনে রেখেছেন। এবার ওদের—

আমি ভয়ানকভাবে চমকে উঠলুম। এ কি আকাশ কুসুম তৈরী করছি? এ রূপকথার চেয়েও অসম্ভব। সত্যিই যদি আমি ল-ক্লাসে ভর্তিও হই, যদি অ্যাড্‌ভোকেট হয়ে বেরিয়ে অনেক পশার করতে পারি—তা অন্তত দশ বারো বছরের আগে নয়। ততদিন রত্না আমার জন্যে অপেক্ষা করবে? আর সে আমাকে ভালোবাসে—এমন অদ্ভুত কল্প-কামনা পাগল ছাড়া কা'র মনেই বা জেগে উঠতে পারে?

কিন্তু সেই চমকটা ক্রমশ আমার বুকের ভেতরে এমন করে ছড়িয়ে যাচ্ছে কেন? আবার মাথায় একটা শিরাছেঁড়া তীক্ষ্ণ কুটিল যন্ত্রণা। গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি বিছানায় বুক পেতে শুয়ে পড়লুম।

জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। বৃষ্টি নামবে বোধ হয়। এই বাতাসে আমার কাছে অনেক দূর—অনেক দিগন্তের যেন খবর আসে। মনে পড়ে কোথায় কেয়া ফুটেছে (রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আর গানে কেয়া ফুল আর চেতনায় ধরা দিয়েছে—কখনো আমি তা দেখিনি), কোথায় কামিনী ফুলগুলো ঝরে ঝরে বনের পথ ঢেকে দিয়েছে, পড়াই নদীর ঘোলা জল চর ডুবিয়ে, কেনার ঘূর্ণি ছুটিয়ে কোন দূর-দূরান্তে ছুটে চলল। আর ধানের ক্ষেতে হাওয়া দিয়েছে, সবুজের সমুদ্র দুলছে মাইলের পর মাইল, এই বাতাস আমার সেই আশ্চর্য পৃথিবীর সন্ধান দিচ্ছে।

আঃ—বুকের যন্ত্রণাটা এমন বেড়ে উঠছে কেন? এমনভাবে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে চাপ দিচ্ছে কে?

না, ওসব কিছু নয়, আমার মনের ভুল। আমি আবার এক নতুন শৈশবের মধ্যে ফিরে যাচ্ছি, এক নতুন জীবন নিয়ে যেন বেঁচে উঠছি। যে অন্ধকার সেই পুরোনো নীলকুঠির অতলের মতো কালো

ইঁদারাটা মুঠোমুঠো করে আমার চোখে ছড়িয়ে দিয়েছিল, সে অন্ধকার আবার সে ফিরিয়ে নিচ্ছে। আবার আমি যেন চোখ মেলেছি, আমার ছোট বৃত্তটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে সারা পৃথিবীর রাশি রাশি আলোর ভেতর একাকার হয়ে যাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি গান :

'আকাশতলে উঠল ফুটে
আলোর শতদল,
পাপড়িগুলি থরে থরে
ছড়ালো দিক্-দিগন্তরে,
ঢেকে গেল অন্ধকারের
নিবিড় কালো জল—'

না—অন্তরের আলোয় আমার আর মোহ নেই ; যে কখনো আকাশ দেখেনি, রৌদ্র দেখেনি, রামধনু দেখেনি, যার চোখের সামনে দিয়ে কখনো শরতের নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে যায়নি, সে যা পায় তা-ই নিয়ে খুশি হোক। আমি সব পেতে চাই। একটা বৃত্তের জগতে নিজেকে নিয়ে আর আমি ভোলাতে পারছি না ; ছেলেবেলার পুতুল খেলার দিন আমার আর নয়। আমার যে যৌবন, আমার যে পরিণত দেহ, আমার যে শিরা-স্নায়ু একটা নিশ্চেতনার ঘোরে এতকাল তলিয়ে ছিল, মুহূর্তে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে রঞ্জা তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। মেঘের কোনার মতো, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো সেই শরীর আমাকে যে স্পর্শ দিয়েছিল, তাতে আমি পরিপূর্ণ যৌবনে জেগে উঠেছি। অলস কল্পনার রূপকথায় নয়—জীবনের মধ্যে আমি বেঁচে উঠব। সবাই যা পায়, তা-ই পাব, সংসারে সকলের জন্যে যা আছে, আমারই বা তাতে কেন ভাগ থাকবে না ?

অপেক্ষা করো রঞ্জা, অপেক্ষা করো। সময় দাও—সুযোগ দাও আমাকে। আমি অ্যাড্‌ভোকেট হবো—কৃতী হবো—যাবো ইয়োরোপে। শুনেছি, বিজ্ঞানের আজ জয়-জয়কার, শুনেছি মানুষের আজ অসীম শক্তি। আজ আর কেউ কোথায় হারের ঘরে বসে চোখের জল ফেলে না। আমি ইয়োরোপে যাব, গ্রাফটিং করিয়ে বসিয়ে নেব নোতুন চোখ। রঞ্জা, তোমাকে আমি দেখব, টুনটুনকে দেখব, মাকে দেখব, দেখব এই আশ্চর্য বিরাট কলকাতাকে। তখন বলব, রঞ্জা, তোমার আর আমার মাঝখানে আর কোনো বাধা নেই। শুধু দশ বছর—দশ বছর আমার সময় দাও। মানুষ তো মানুষের জন্যে সারা জীবন অপেক্ষা করে, তুমি কি এইটুকু মাত্র সময় আমাকে দিতে পারো না ?

এখুনি যেতে হবে কাকার কাছে। গিয়ে বলতে হবে, আর একটা মুহূর্তও আমি নষ্ট করতে পারব না। কাল—কালই আমায় ল-কলেজে ভর্তি হতে হবে। এক টুকরো আলোর খেলাঘরে পুতুল নিয়ে খেলা করার দিন আমার ফুরিয়ে গেছে।

কিন্তু বুকে ক্রমাগত এমন করে চাপ দিচ্ছে কে ? সেই নীলকুঠির ইঁদারার অলক্ষ্য সাপটা—যে তার দুটো হিংস্র চোখ দিয়ে আমার চোখ কেড়ে নিয়েছে ; সে-ই তার বন্য চাপ দিয়ে পাকে পাকে আমাকে বাঁধতে চাইছে, ভেঙে দিতে চাইছে আমার পাঁজরাগুলো ; মাথার ভেতরে যে যন্ত্রণার আগুন ছুটছে, সে আর কিছু নয়, তারই একটার পর একটা হিংস্র ছোবল এসে পড়ছে সেখানে। আমি ওর চক্রান্ত বুঝতে পেরেছি সব। স্মৃতির একটুখানি খেলাঘরে একটা পুতুল দিয়ে ও-ই আমায় ভুলিয়ে রেখেছে এতদিন। কিছুতেই জানতে দেবে না—কিছুতেই আমায় আলোর মধ্যে বাঁচতে দেবে না।

কিন্তু আমি বাঁচব। আমি জেগে উঠব আকাশভরা সূর্যতারার মধ্যে—আমার পরিপূর্ণ ছাব্বিশ বছরের যৌবনে। রঞ্জাকে দাবি করব, তাকে আমার করে নেব। বেরিয়ে আসব সেই সাপটার চক্রান্ত থেকে—তার নাগপাশ ছিঁড়ে, পাতালপুরীর কালো অন্ধকার পার হয়ে।

—সোনাদা!

টুনটুনের গলা শুনতে পাচ্ছি: সোনাদা, অবেলায় এমন করে শুয়ে আছো কেন? ওঠো—কে এসেছে!

আমি উঠতে চাইলুম, সাড়া দিতে চাইলুম, কিন্তু সেই কালো শত্রুটা শক্ত করে পাক দিচ্ছে আমার কণ্ঠনালীতে। কিন্তু হার আমি মানব না। না—না!

—সোনাদা, রঞ্জাদি এসেছে।

রঞ্জা এসেছে। তবে আর দেরী নয়। আমার কথা ওকে এখুনি বলতে হবে। আমার প্রতিজ্ঞার কথা—আমার আশার কথা। ওকে এই মুহূর্তেই বলতে হবে, মাত্র দশ বছর অপেক্ষা করো রঞ্জা, পুরুষের সব ঐশ্বর্য নিয়ে আমি তোমার সামনে এসে দাঁড়াব।

প্রাণপণে—সেই অদৃশ্য নাগপাশ ছিঁড়ে আমি উঠে দাঁড়াতে চাইলুম।

কিন্তু পায়ের নীচে মাটিটা কোথায় গেল? আমি কি সমুদ্রের ওপর দাঁড়িয়েছি? আমি কি ডুবে যাচ্ছি! আমি কি তলিয়ে যাচ্ছি কোনো নিঃসীম অতলে?

—সোনাদা—সোনাদা—সোনাদা—

—হিরণদা—

কে ডাকছে? টুনটুন? রঞ্জা? কে কেঁদে উঠল? ঘরে কারা এসেছে আরো? মা? কাকা? কারা আমায় ডাকছে! এই যে আমি—এই তো আমি। সাড়া দিতে চাই—কিন্তু কথা বলতে পারছি না কেন? আর এত অন্ধকারই বা কেন? আমি—আমি কি তবে মরে যাচ্ছি? না—মরব না, কিছুতেই মরব না। আমি আবার নতুন করে শুরু করতে চলেছি। আমার প্রথম যৌবন আমার জাগিয়েছে। রঞ্জাকে আমি পাবই। সেই ষোলো বছর আগে তার ওপর যে অধিকার আমি অর্জন করেছিলুম, সেই অধিকারের জোরেই তাকে আমি জয় করে নেব।

আঃ—আঃ! বুকের সমস্ত চাপটা এক মুহূর্তে সরে যাচ্ছে। আমি মুক্তি পেয়েছি। ধানক্ষেত থেকে ভিজে বাতাস আসছে, কেয়ার গন্ধ পাচ্ছি—চোখের সামনে পদ্মাই নদীর তরাজল ছলছল করে দুলে উঠল। ওই তো বিকেলের রঙ ডানায় মেখে বকেরা উড়ে চলল। আলো—আলো—অফুরন্ত আলো! রঞ্জা, আমি চোখ ফিরে পেয়েছি—রঞ্জা, তোমার মেঘের কেশের মতো শরীর আমায় ঘিরে ধরেছে, আমি বেঁচেছি—আমি বাঁচলুম!

"আকাশ তলে উঠল ফুটে আলোর শতদল"—

—শেষ—

চক্র-ব্যূহ

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

অনেকদিন পর তাকে দেখলাম। টার্মিনাসের কাছ থেকে উঠেছিলাম বলে আমি একটু বসবার জায়গা পেয়েছিলাম। আর, সে কখন উঠেছে, কোথায়, কোন্ স্টপ থেকে তা দেখিনি। শুধু তার হাতের ব্যাগটা আমার গায়ে এসে পড়ছিল। আমি একবার এদিকে আর একবার ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিলাম। তবু ব্যাগের ধাক্কা বাঁচাতে পারছিল না ও। আমার অসুবিধে দেখে ও খুব বিব্রত হয়েছিল। শেষ অবধি আমি ওর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে আমার কোলেই রাখলাম। ও আমাকে অপ্রস্তুতভাবে ধন্যবাদ দিল কি না, তা শুনতে পাইনি। বাসটা চলছিল। মানুষের গায়ে মানুষ। ধাক্কা লেগে টলে পড়বার জায়গাটুকুও নেই। ওর হাতটা আমি দেখেছিলাম। রোগা, কালো হাত, সরু চেনে বাঁধা ঘড়ি, লোহার সঙ্গে শাঁখা আর চুড়ি। ওর মুখ আমি দেখিনি। না দেখেও বলে দিতে পারতাম, ও নিশ্চয় কোন অফিসে যাচ্ছে। ওর প্লাস্টিকের ব্যাগে টিফিন কৌটা, চাবির গোছা, বাংলা উপন্যাস একখানা, আর একটা ছি-র শিশি। স্কুলের টিচার হলে বই খাতা থাকত।

গড়িয়াহাটা পৌঁছতে আমি নেমে গেলাম। ও কোনমতে বসল। তারপর আমার হাত থেকে ও যখন ব্যাগটা নিল, আমি আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে চাইলাম। কোথায় দেখেছি ওকে? ওর চোখ, ওর কপালের তিলটা, সিঁথি কাটবার ধরণ কেন বড্ড চেনা চেনা লাগছে?

ও হাসল। বললো—আমি আগেই চিনেছি। তোমার কথা আমার এত মনে পড়ে এত সময়ে ভাবি।

আমি কিছু বলতে পারলাম না। ও বললো—কত কথাই যে মনে পড়ে, আচ্ছা সেই কথাটা তোমার মনে আছে? আবার ও হাসলো। কিন্তু ওর মুখে তেমন হাসি আমি না দেখলেই পারতাম। আমি নামলাম। আমি ফুটপাথে ভিড় ঠেলে এগোতে এগোতে এদিকে-ওদিকে দেখলাম। বাতাসে পুজোর ছোঁয়াচ লেগেছে। মেয়েরা কেনাকাটা করতে বেরিয়েছেন। দুপাশের দোকানে ঝলমলে জামাকাপড়, ফুটপাথে নানারকম প্লাস্টিকের জিনিসের সওদা সাজানো। এইসব দেখতে দেখতে আমার মনে পড়লো,—ও আর আমি একদিন ডালহৌসী স্কোয়্যারে ঘুরে হাঁটছিলাম। ও বলেছিল—জান, চাকরীটা চলে যাচ্ছে, এ একপক্ষে ভালোই হলো তোমার। এবার তুমি খুব মনের সুখে লিখতে পারবে।

আমি ওর কথায় নিরুদ্বেগ হতে পারিনি। চাকরী যাবার কথা সেদিন ভাবতে পারি না। যে লাল রঙের চারতলা বাড়ীটায় দুটো বছর কাটিয়ে গেলাম, তার দরজা আমার মুখের সামনে বন্ধ হয়ে যাবে, এ কথা ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। আর ভাবপ্রবণতার কথা নয়, সেদিন সত্যিই, একশো সাতাত্তর টাকার চাকরীটার আমার বড্ড প্রয়োজন। আমি ভাবছিলাম এবার আবার অফিসে অফিসে দরখাস্ত করতে হবে। আবার এই ডালহৌসী স্কোয়্যারের বাড়ীগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে দুপুর থেকে বিকেলে পৌঁছে যাব। ও

আমার ভাবনার মধ্যে চুপ করে একটা ঢিল ছুঁড়েছিল। ও বলেছিল—তুমি আমাকে নিয়েই না হয় একটা গল্প লেখ!

ওর গলার স্বরটা বড় নরম। ও কথাগুলো, আমার ভাবনার গভীরতায় ঢেউ তুলতে পারেনি। আস্তে, নিঃশব্দে মিলিয়ে গিয়েছিল। তখন লিখি। মাঝে মাঝে এক আধটা লেখা কেউ ছাপেন, আর অফিসে তাই নিয়ে বেশ কথা হয়, আমাদের মধ্যে। কিন্তু সে পথের লেখা। তখন জানতাম না, পরে আরো কঠিন, আরো উঁচুর পথে হাঁটতে হবে। লেখক হবার জন্যে কত দাম দিতে হবে, কত দুঃখ পেতে হবে। আগামী দিনের চেহারা আমি সেই একান্ন সালের ডালহৌসী স্কোয়ার-এর মাঠে হাঁটতে হাঁটতে সেদিন দেখতে পাইনি। পরে, যখন সেই অফিসেই ফিরে গেছি, সম্মানিত প্রধান অতিথির আসনে বসেছি, সেদিন-ও ও পেছনে দাঁড়িয়েছিল। একটু হেসে বলেছিল—আমাকে নিয়ে ত লিখলে না, আমার নামটা তুমি কোন গল্পে জুড়ে দিও।

ওর বন্ধু শিখানী বলেছিল—সত্যি ওর ভারী সখ।

ও হেসেছিল। বলেছিল—তোমার গল্পের সে মেয়েটিকে কিন্তু···ওর কথা শেষ হয়নি। ব্যস্ত হয়ে সেক্রেটারী এসে বলেছিলেন—চলুন। আপনার গাড়ী যে এসে গেছে।

আমি চলে এসেছিলাম। তারপর আজ, এতদিন বাদ ওর কথা মনে হলো। সত্যিই ত আমি গল্প খুঁজেছি, গল্প ভেবেছি, যে জগৎ জানি না, চিনি না, তারই দরজায় বারবার অধৈর্য হয়ে ঘা দিয়েছি। তাতে হয়তো নতুনত্ব, বৈচিত্র্য পেয়েছি। কিন্তু যাদের এমন করে জেনেছি, যারা আমার সেই অতীতের আজকার দিনগুলোতে আমার সঙ্গী ছিল, বন্ধু ছিল, তাদের কথা কেন মনে হয়নি আমার? তারা সাধারণ বলে? সামান্য বলে? তারা রোজ রোজ নিতান্তন ভূমিকায় দেখা দেয় না বলে? ট্রামে বাসে চড়ে তারা অফিসে হাজিরা দেয় ঘন্টায়, আর পাঁচটার পর ক্লান্তি নিয়ে বাড়ী ফেরে। তাদের নিয়ে নায়করা নতুন নতুন জগতে উধাও হয় না। তাদের জীবনে বৈচিত্র্য নেই, বিচিত্র রঙ নেই। তবু তারা কল্পনার নায়িকার চেয়ে অনেক সত্যি।

ওর কথা ভাবতে ভাবতে আমার মনে হলো, ওর কথাই বলা যাক। ওকে নিয়েই সুরু করি, কেননা ওকে কথা দিয়েছিলাম।

আমাদের অফিসে না কি আগে মেয়ে নেওয়া হতো না। প্রথম যে তিনজন এসেছিল, তাদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে পড়ে। সে দেখতে সুন্দর নয়, লাজুক স্বভাবের, একটু গম্ভীর বলা চলে। কিন্তু তাকে সবাই পছন্দ করতো। সবাই তাকে ভালবাসতো। সে কোনদিন যেচে কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেনি, কিন্তু সবাই তাকে মনের কথা বলতো। সে অফিসে না এলে সবাই খোঁজ করতো। তখন আমি বুঝতে পারতাম না, হয়তো বা বুঝতে চাইতামও না, কেমন করে সে সকলের ভালোবাসা পেয়েছে। হয়তো বা আমার মনে মনে কোথায় একটা অধীরতা ছিল। অফিস, অফিসের মানুষ, অফিসের পরিবেশ—এ সবকে যে ভালবাসা যায়, আপন করে নেওয়া যায় আমি তাকেই বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু সেই মেয়েটি খুব আপন করে নিতে পেরেছিল তার কাজের জায়গাটিকে। ভালোবেসেছিল বলেই সে সকলের ভালোবাসা পেয়েছিল, আর মানুষের মনকে পাবার অন্য কোন পথ নেই, এই সহজ কথাটা শিখতে আমার অনেকদিন লেগেছে। কিন্তু আমি ত' আজ তার কথা বলব না। তার কথা বলব সবচেয়ে শেষে। আজ শুধু সেই মেয়েটির কথা বলব, যে

বলেছিল—'আমার নামটা তুমি তোমার কোন গল্পে জুড়ে দিও।' সে আরো বলেছিল—'তোমার গল্পের নায়িকাকে কিন্তু···' কথাটা তার শেষ হয়নি। সে কি বলতে চেয়েছিল? তুমি তাকে সুখ দিও, শান্তি দিও? আমি জানি না। হয়তো বা এ কথাই বলতে চেয়েছিল, 'আমার কথা তুমি আমার মতো করেই লিখো। খুব সাধারণ জীবনের কথা—যা পড়লে লোকে আমার মতো মেয়েদেরও জানবে। একটা কথা ও বলেনি—'শোন, অমলকে কিন্তু তুমি বিশ্বাসঘাতক ক'রো না।' ওর কথা আর অমলের কথা আমায় আজ লিখতে হবে। অমলকে কারু খারাপ মনে হলে, ও তা আরও সইতে পারে না, এ আমি জানি।

সরু চেরা সিঁথি, মস্তবড় একটা বেণী আর ছিপছিপে শরীর। জুঁইকে দেখে আমি ভাবতে পারিনি ও বিবাহিতা, ওর হাতে লোহা ছিল। কিন্তু হাতে লোহা ত কলকাতার কুমারী মেয়েরা পরে। কেন পরে, তা আমার জেনে নেওয়া হয়নি। হয়তো কোন নিয়ম আছে, যা আমি জানি না। এ সব কথা কোনদিন তেমন করে ভাবিনি। ও খুব হাসতো। চোখের চাহনিটা তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ, আর মুখে হাসি। আবে মাঝে দেখতাম, একটি ছেলে ওর কাছে আসে। সেদিন জুঁই তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নেয়। তারপর, ছুটির পর সেই ছেলেটির সঙ্গে বেরিয়ে যায়। ছেলেটির চেহারায় কেমন যেন একটা কঠিন নিষ্ঠুর ভাব। চৌরঙ্গীতে দেখেছি ওরা পাশাপাশি চলেছে। জুঁইয়ের মুখখানা কিসের আলোয় ঝলমল করছে, তা বলে দিতে হতো না। ছেলেটির মুখটা প্রথমে একটু কোমল। খুব কৌতূহলী হইনি। কেননা অফিসে কাজ করতে করতে এরকম করে অনেক মেয়েরই জীবনে প্রেম আসে। হয়তো জুঁইয়েরও এসেছে।

আবার একদিন শুনেছি, করিডোরে দাঁড়িয়ে ছেলেটি জুঁইকে কি নির্মম গলায় বলছে—'সব খবর পাই আমি। ভেব না আমায় তুমি ফাঁকি দিতে পারছ।' জুঁই কি বলছে তা শোনা যায়নি। ভেজা চোখ মুছে সে টেবিলে গিয়ে বসেছে। আর্থেস্ট স্টেটমেন্টের ফাইলটা টেনে নিয়েছে। আর সেই মেয়েটি যাকে সবাই ভালোবাসে, সে বলেছে—'জুঁইটা একটা বোকা। নিজের জীবনটা নষ্ট করছে। ওর কাছেই আমি সব শুনেছি।

জুঁই তার মায়ের একটি মাত্র সন্তান। আর, ওর মাও পিসিমার কাছে মানুষ। তাঁরা দুজনেই বিধবা। জুঁইয়ের সেই দিদিমা, তার মার পিসিমা, তাঁর টাকা-পয়সা আছে। জুঁইয়ের মা-ও নিঃসম্বল নন। উত্তর কলকাতায় তাঁর নিজের বাড়ী আছে। ছোট দোতলা বাড়ী। জুঁইকে তাঁরা ভাল স্কুলে পড়িয়েছেন, ভালোভাবে মানুষ করেছেন। জুঁইকে নিয়ে তাঁদের অনেক আশা।

অমল তাঁদেরই প্রতিবেশী। ছেলেটি জাতে নিচু। ওরা সুবর্ণ বণিক। ওদের অনেক টাকা। ওদের বাড়ীর জানলা পারতপক্ষে খোলা হয় না। ওদের বাড়ীর মেয়েরা, উনিশশো আটচল্লিশ সালেও কোনদিন স্কুলের বরজা মাড়ায়নি। ওদের বাড়ী যে পাড়ায়, সেখান থেকেই একদিন বাংলা দেশের প্রথম মেয়ে ইস্কুলের ছাত্রী সংগ্রহ হতো, অনেক আন্দোলন, অনেক প্রতিজ্ঞার জন্ম ওই সব অঞ্চল থেকেই হয়েছে, তা অমলের বাড়ীর মানুষরা ভাবতেও পারেন না। ওঁদের বংশে না কি, আইন পাস হবার পরও সতীদাহ হয়েছিল, আর টাকার জোরে ওঁরা সব মানিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, তবু ওঁদের সেই ধনী পূর্বপুরুষকে হতভাগা সাহেবরা জেলের ভাত খাইয়ে তবে ছেড়েছিল, এসব কথা ওঁরা সগর্বে বলেন। ওঁদের অন্দরে পুরুষ ডাক্তার আর পুরুষ চাকর ঢোকে না, এও ওঁদের আর একটা গর্ব করে বলবার কথা। ডাক্তার আর চাকর, দুটোই এক নিশ্বাসে বলে থাকেন ওঁরা। হয়তো ভাবেন, ডাক্তারকেও টাকা দিই, চাকরকেও টাকা দিই, তাই একসঙ্গে বললে কারো মানমর্যাদার হানি হয় না। বৌবাজারের সরকারদের মতো না হলেও

ওদেরও সোনার দোকান অনেকগুলো। তাই, অনেক টাকার জোরে অমলের বাবা এ যুগেও সমস্তে বলতে পারেন।

অমল ওঁদের বড় ছেলে। সে এম. এ. পাস করেছে। বাপের কারবারে ঢোকেনি। ছুঁইদের বাড়ীতে সে প্রথম ঢোকে, ছুঁইদের দিদিমার অসুখের সময়। দিদিমা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, ছুঁইদের মা বাড়ী ছিলেন না। ছুঁই ভয় পেয়ে দরজা খুলে পথে বেরিয়ে অমলকে দেখে বলেছিল—'একটু ডাক্তারকে খবর দেবেন? দিদিমা অজ্ঞান হয়ে গেছেন।' ছুঁই কেঁদে ফেলেছিল। অমল তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ডেকে আনে। এমনি করেই ওদের আলাপ।

অমল তারপর বারবার আসত। ছুঁইদের বাড়ীটা ওর চোখে খুব নতুন নতুন লাগত। দিদিমা আর মা, দুজনেই শুদ্ধ, শান্ত মানুষ। সারা বাড়ীতে কোন গোলমাল, কোন অপরিচ্ছন্নতা নেই। ছুঁইদের মা বাড়ীতে চটি পরেন। ওরা টেবিলে বসে চা খায়। দুজন ঝি ওদের কাজ করে। ওঁরা কখনো-সখনো স্টোভ জেলে খাবার তৈরী করেন। ছেলেপুলে, তরকারির খোসা, মশলার গন্ধ, ঝি রাঁধুনীর ঝগড়া, মা কাকীমার ঝগড়া, গোরুর খোল, গোবরের গন্ধ, অমলের মনে হতো, তার বাড়ী আর এ বাড়ীতে কত তফাত। ছুঁইদের সেতার, পড়ার টেবিল, বইয়ের আলমারি, তার স্কুলের প্রাইজ, তার ছোটবেলার পড়ুল বর বৌ, সব দেখে অমলের বুঝতে দেরী হয়নি, বাড়ীর সবটুকুই ছুঁইকে ঘিরে, ছুঁইকে কেন্দ্র করে। ছুঁই সবে জ্বরে ভুগে উঠেছে, তার খাবার ঠাণ্ডা হতে দিচ্ছেন না দিদিমা, তার একটু জ্বর হলে বড় ডাক্তার আসছেন। প্রথম প্রথম অমল ভেবেছে, ছুঁইদের অঙ্কে এ সব ডাকাডাকি, বাড়াবাড়ি। কিন্তু পরে শুনেছে, ওর বাবা মারা যান ঘুমিয়ে, ছুঁইদের পরিবারটা বড় পলকা। ওই দুটি মহিলার আর কেউ নেই বলে ওঁরা ওকে অমন করে আগলে রাখেন।

খুব আগলে রেখেছিলেন ওঁরা ছুঁইকে।

ও আই. এ. পাস করলে বিয়ের ভাল সম্বন্ধ এনেছিলেন। ছেলেটি ভাল কাজ করে। দিল্লীতে থাকে। অমল ওকানো জায়গায় থাকলে ছুঁওই ভাল থাকবে। কিন্তু মেয়ে দেখাবার আগেই ছুঁই কেঁদে ফেলল। সে অমলকে ভালবাসে। অমল তাকে বিয়ে করবে। সে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে না।

অমলরা সুবর্ণ বণিক। ওর বাবা ভয়ানক গোঁড়া। ও কি ওর বাবাকে অমান্য করবার সাহস পাবে?

এ সব কথা ছুঁই জানল না। অগত্যা ওঁরা অমলকে ডেকে পাঠালেন। অমল ওঁদের বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিল। তার চাকরী হচ্ছে। হলেই সে ছুঁইকে বিয়ে করবে। তখন ছুঁইয়ের দিদিমা আর মা ভাবলেন, জাতের কথা মন থেকে সরানো খুব কঠিন। কিন্তু তাই হোক। ছুঁই সুখী হোক। তারপর অমলের বাবার পাশাপাশি থাকা কঠিন হবে মনে করে, বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে ছুঁইয়ের মা ওয়েলেস্লীতে বাড়ী নিলেন।

অমল চাকরী পেল। ছুঁইয়ের সঙ্গে সে এ বাড়ীতেই থাকবে। আর এবার তাদের বিয়ে হবে এই আশ্বাসে ছুঁইয়ের মা ছুঁইকে তার সঙ্গে বেরুতে দিলেন। এমনি করে একটা বছর গেল। অমল বিয়ের কথা তুললে শুধু ভরসা দেয়, এবার হবে। কিন্তু ছুঁইয়ের দিদিমা মারা গেলেন, তখন ছুঁইয়ের মা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি অমলকে যখন চেপে ধরলেন, অমল বললো—'বিয়ে ত' আমি ওকে করেছি। ওকে জিজ্ঞাসা করুন।'

ছুঁই সব স্বীকার করলো। হ্যাঁ, ছ'মাস আগে কালীঘাটে নিয়ে অমল ওকে বিয়ে করেছে। অমলের চাকরীর কথা মিথ্যে। ও ওদের বড় দোকানটায় বসছে। বাবার সম্পত্তিটা হারাতে চায় না,

তাই ও কিছু জান'তে চাইছে না। বাবার না কি শরীর খারাপ। ওঁর কাছ থেকে কিছু টাকা সরিয়ে নিতে পারলেই ও সব ব্যাপারটাকে ঠৈথ করবে।

কালীঘাটের বিয়ে কি বিয়ে? ছুঁইয়ের মা মেয়েকে খুব বকলেন। বললেন—ও তোকে প্রাণ করেছে। ওর কথায় তুই বিশ্বাস করিস তোর বিয়ে হয়েছে। ওর কথায় তুই কুমারী সেজে বেড়াস? ও তোর সর্বনাশ করছে ছুঁই।' মা-র ওপর রেগে ছুঁই স্কুলে চাকরী নিল। অমলের ওপর ও বিশ্বাস হারাতে পারে না। আর তারপর, অমল যখন এ বাড়ীতে আসা-যাওয়া করিয়েছে, তখন ছুঁইয়ের মা খবর পেলেন, অমল ইতিমধ্যে-ই তাদের স্বজাতিতে বিয়ে করেছে। এই ক'মাসের মধ্যেই।

শোকে তিনি পাগল হয়েছিলেন। পুলিশে খবর দিতে চেয়েছিলেন। ছুঁই-ও ভেবে পড়েছিল। কিন্তু অমল যেই তাকে বুঝিয়ে বললো—'আইনে দুটো বিয়েতে ত' বাধন নেই। আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার সঙ্গেই আমি থাকব। ও থাকবে বাবা মা-র কাছে।'

সন্তান স্নেহ মানুষকে দিয়ে অনেক স্বভাব ও চরিত্র-বিরুদ্ধ কাজ করাতে পারে। ছুঁইয়ের মা শেষ অবধি ছুঁইয়ের দিকে চেয়ে তাতে-ও রাজী হন। তিনি বলেন—'যেদিন ওকে সামাজিক মতে বিয়ে করবে, সেদিন তুমি এ বাড়ীতে এস। নইলে এখানে এস না।'

আমাকে যে বলছিল, সেই মেয়েটি বলে—'তারপর তিন বছর কেটেছে। স্কুল ছেড়ে অফিসে এসেছে ছুঁই। অমল তার সে স্ত্রীকে ছাড়েনি। ছাড়বে কেন? তার নামে যে অনেক টাকা লিখে দিয়েছেন অমলের বাবা। ছেলেকে ত' অমনি করেই জব্দ করেছেন। অমলের দুটো ছেলেও হয়েছে। ছুঁইকে সে আজ-ও বৈধতা দেয়নি। অমলের সে বৌ না কি সূতিকায় ভুগছে। ও মারা গেলে ও ছুঁইকে নিয়ে যাবে। আর ছুঁই আজ-ও বিশ্বাস করে, ওর সব কথা বিশ্বাস করে। ওর মা ওর সঙ্গে কথা কন না। ও বাড়ীতে যায় না অমল। এখানে আসে। আর ছুঁই যদি কারু সঙ্গে কথা বলে, মেশে, তাহ'লে এখানে এসে শাসায়। আজকাল এরকম মেয়ে থাকে, তুমি বিশ্বাস করবে?'

ছুঁইকে আমিও না বলে পারিনি—'বড় বোকা তুমি ছুঁই, একটা মিথ্যে প্রতারণাকে সত্যি মনে করে এই কষ্টকে স্বীকার করে নিলে।'

—'মিথ্যে?'—ছুঁই মিষ্টি হেসেছিল। তারপর মুখ লাল করে বলেছিল—'আমি ত' সে বিয়েকে মিথ্যে মনে করি না। কালী ঠাকুরের সামনে মালা বদল করলে বিয়ে হয় না? আমি জানি আমার বিয়ে হয়েছে। এই-ই আমার জীবন।'

আমি আজ ভেবে ভেবে অবাক হই, ছুঁই ত' খুব সংস্কারহীন, প্রগতিবাদী ছিল না? ওকে কত কথা বলতে শুনেছি—'গোটা কলা খেতে নেই শিবানী, ঘিতে-ও নেই, শ্রাদ্ধে খেয় পিণ্ডে খেয় গোটা কলা, ভেঙে দিও। নইলে অমঙ্গল হয়।' এমনি আরো কত কথা বলত ও। সংস্কারের কথা, আচার-নিয়মের কথা। কিন্তু ও সেদিন যে কথা বলেছিল, সে কথাটার মানে কত বড়, তা কি আমি আজ-ও বুঝি? এমন সহজে, এমন সাধারণ ভাবে ও বলেছিল, সংস্কারের চেয়ে হৃদয় বড়, হৃদয়ের কাছে আর কিছু নেই। আমার মনে হয় ওর কথাটার মানে ও নিজেও জানে না। ওকে যদি আজ কেউ বলে—'ছুঁই, তোমার কথা আর বড় বড় সাহিত্যে, কাব্যে যে কথা বলা হয়, দুটোই এক', ও আশ্চর্য হবে। ছুঁইয়ের কথা ভাবলে আমার মনে হয়, বিন্দুতে সিন্ধু সত্যিই দেখা যায়। শুধু আমাদের চোখ নেই বলে আমরা দেখতে পাই না। বড় বড় আত্মত্যাগ, আর মহৎ প্রেমের আদর্শ খুঁজি আমরা, আর আমারই চোখের

সামনে যে ছুঁইকে দেখেছি, দু'পাছা মালার বিনিময়কে বিয়ে মনে করে নিয়ে বছরের পর বছর নিজেকে একটু একটু করে উৎসর্গ করতে, সেই ছুঁইকে দেখবার জন্যেই আমাকে এতদিন ধরে এত পথ হাঁটতে হলো।

তারপর আমাকে অন্যপথে সরে যেতে হয়েছে। সেই মেয়েটির সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে, সে-ই একদিন বলেছে, অমলের স্ত্রী মারা গেছে। বিয়ের সেই প্রথমদিনের আটবছর বাদে ছুঁইকে অমল বিয়ে করেছে। ছুঁই না কি অমলের ছেলে দুটিকে নিজের করে নিয়েছে। শুনে খুশী হয়েছিলাম। এমন কি অমল না কি ছুঁইয়ের অফিসের মেয়েদের নেমন্তন্ন করে খাইয়েছেও একদিন। আমি বলল'ম —'ছুঁই কি এখনো চাকরী করে?'

সে একটু চুপ করে রইল। তারপর বললো—'ছুঁইয়ের খাওয়া যা হয়েছে, তাতে ও চাকরী ছেড়ে দিলেই পারতো। কিন্তু ঐ অমল ওকে চাকরী ছাড়তে দেবে না। অমল বলেছে, ছুঁই ত' আর সুবর্ণ বণিকদের মেয়ে নয়! সে কেন নিজের স্বাধীন রোজগার ছাড়বে? এতদিনে যখন আড়াইশো' টাকায় উঠতে পেরেছে ছুঁই, তখন, অমলের পরিবারের জন্যে নয়, ওর নিজের জন্যেই চাকরীটা রাখা দরকার।'

ছুঁইকে হঠাৎ এই পথে, এখানে দেখলাম কেন? সেই কথাটা জানবার জন্যে আমার বন্ধুটির কাছে আমি আবার গেলাম, আজ তিন বছর বাদে। এই তার কাছ থেকে ফিরছি। ছুঁইকে নিয়ে গল্প লিখছি, তা ও জানে না। ওর সঙ্গেও কতদিন বাদে দেখা। ও অনেক খবর দিল। সি. সি. সেকশনের সেই বুড়ো ভদ্রলোকটি মারা গেছেন।

এস্টাব্লিস্‌মেণ্টের ব্যানার্জিবাবু হঠাৎ লটারীতে টাকা পেয়েছেন। কুসবালা নিয়োগী হঠাৎ খুব লীডার হয়ে গেছেন। তারপর, সবচেয়ে শেষে বললো—'ছুঁইয়ের কথা আর বলতে ইচ্ছে করে না।'

'কেন?'

ও আস্তে আস্তে বললো—'দেখ, মানুষ বোধ হয় ভাগ্যকে এড়াতে পারে না। কিছুতেই না।'

ছুঁইকে নিয়ে অমল মাসদুয়েক তার নতুন বাড়ীতেই রেখেছিল। কিন্তু তারপর অমলের সেই শ্বশুরবাড়ীর লোকরা গোলমাল করাতে ও ছুঁইকে নিয়ে আর একটা বাসা করে। শহরতলী ছাড়িয়ে অনেক দূরে। অমলের মাবা মারা গেছেন। তারা দশ ভাই ভাগাভাগি করে নিয়েছে সব। অমলের শাশুড়ী ইদানীং তাকে তার ছোট শালীকে বিয়ে করবার জন্যে ধরেছিলেন। ছুঁইকে তাঁরা সেইজন্যেই সহ্য করতে পারেননি। ছুঁই ছেলে দুটিকে ভালবাসবে, আপন করে নেবে, তা তাঁরা হতে দিলেন না। মাঝে মাঝেই এ বাড়ীতে এসে, ছেলে দুটির অসুখ হচ্ছে, সৎ মা কখনো আপন হয় না, এ সব কথা বলতেন। এই নিয়ে অশান্তি বাড়তে বাড়তে, শেষে একদিন ছুঁই প্রতিবাদ করে। আর তার ফলে তাঁরা ছুঁইকে যেচ্ছে গালাগালি করেন। ছুঁই অমলকে বলে—'তার চেয়ে তুমি ওদের নয় মামাবাড়ী পাঠিয়ে দাও।' অমল বলে—'বুঝেছি, ওরাই তোমার শত্রু হয়েছে।' ছুঁইকে তারপর অমল আলাদা বাসায় নিয়ে আসে। ছুঁই শোনে অমলের সেই পক্ষের ছোটশালী, শাশুড়ী, তাঁরা ও বাড়ী থেকে ছেলেদের নিয়ে যাবেন। ছুঁই খুব অসহায় বোধ করে। তার মা-ও মারা গেছেন। তার বাসবাজারের বাড়ীটা বিক্রী করে যে টাকা পেয়েছে ছুঁই, সেটার সব সে অমলকে দেয়নি, আর তাতেই অমলের রাগ।

ও বললো—'আসলে, এখন আইন পাস হবার পর অমল আর তার শালীকে বিয়ে করতে পারে না। ছুঁইয়ের যা আয়, তাকে নিয়ে ও আর যা-হোক, সুখী হতে পারে না। ছুঁইকে ও অন্যদের

ডাইভোর্স করতো, শুধু ঐ টাকাগুলোর লোভ ও সামলাতে পারে না। ব্যবসা চালাতে গিয়ে ও ও সবই ডুবিয়েছে। বাড়ী বিক্রীতেই সব টাকা আছে না কি মনে কর? জুঁই বারেবারে ওকে দিয়েছে। এখনও আছে কিছু। এদিকে অমলের স্বভাব সেই একই রকম আছে। ওকে সন্দেহ করে। ওর সম্পর্কে অন্য মেয়েদের কাছে খবর নিতে চেষ্টা করে।'

ও একটা নিশ্বাস ফেললো। বললো—মেয়েটার জীবন সেই একই রকম রয়ে গেল। সপ্তাহে কটা দিনই বা অমল যায়! ওকে সেই কি নিয়ে, একলা একলা সংসার চালাতে হয়।

আমি বললাম—'ওর টাকা-পয়সা কিছু আছে তা হ'লে? সেদিন যে পোশাক দেখলাম, তাতে ত' সে কথা মনে হয়নি!'

ও বললো—'জুঁই বরাবরই কি রকম সৌখীন ছিল জান ত?' সে কথা মনে পড়ল। ভাল শাড়ী, ভাল জামা পরতো। ভাল ভাল সাবান, স্নো মেখে। হ্যাঁ, জুঁই একটু সৌখীন ছিল।

ও বললো—'অমল সাজগোছাক করলে সন্দেহ করে। এখানে এসে হল্লা করে। তাই ও সব ছেড়েছে। আমি বলেছিলাম, জুঁই, আর কষ্ট করে কাজ কর কেন? তুমি না হয় পুরী বা দার্জিলিং কোথাও চলে যাও। যা আছে, বাকি জীবনটা তাই নিয়ে আরামে থাকতে পারবে। ও কি বললো জান? ও বললো, 'তবু এখানে থাকলে ওকে দেখতে পাব। আমি কিছু বলতে পারলাম না।' আমিও জুঁইয়ের কথা লিখে শেষ করে ভাবছি, সত্যিই, জুঁইকে কিই বা বলা যেত! অমল প্রতারক, অমল হীন, অমল ওর জীবনটা নষ্ট করেছে? এসব কথা ও কি জানে না? তবু যদি ও অমলকে ভালবাসতে পারে, বিশ্বাস করতে পারে, তাহ'লে অন্যরা ওর সম্পর্কে মন্তব্য করবার কে? এটাতো একবছর, ছ'মাসের একটা মোহ নয়। আজ বারো বছর ধরে জুঁই ওকে ভালোবেসেছে। ওকে ভালোবেসে ও শুধু দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু জুঁই যদি তাতে দুঃখ বা ক্ষতি না মনে করে, তাহ'লে আজ কি ওকে বোঝানো যাবে?

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। কখনো ঝিরঝির করে, কখনো বা জোরে। আমি জুঁইয়ের কথা ভাবছি। 'চতুরঙ্গ'-র ননীবালা পুরন্দরকে ভুলতে পারেনি, তাই অ্যাটর্নিশপের কাছে ক্ষমা চেয়ে সে মরেছিল। জুঁই যে জীবন যাপন করছে, তার চেয়ে তার মরণও ভাল, এ কথা যদি জুঁইকে কেউ বলে, সে খুব অবাক হবে আমি জানি। তার যে জীবন, তা সে জীবন নয়, পলে পলে মৃত্যু, এ কথা বলতে সে দুঃখিত হবে। সে আহত করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে। তার ঘন কালো চোখের পল্লবের ডগায় জলের ফোঁটা জমবে। তা-ও আমি জানি। কিন্তু সে কথা আমি তাকে বলব কেন? এতবড় কথাই বা বলবার অধিকার কোথায় আমার? হয়তো আমরাই দেখতে জানি না। ঐ পলে পলে, তিলে তিলে মরতে মরতে, আর দুঃখ পেতে পেতে জুঁই হয়তো জীবনকে, প্রেমকে, সুন্দরকে অনেক বেশী পাচ্ছে, আর যারা খুঁজে খুঁজে মরছে, তারা কোনদিনই জীবনকে জানতে পারছে না।

আমি জুঁইকে কিছুই বলব না।

আবার যদি দেখা হয়, আমি তার হাত ধরে অমলের কথা জিজ্ঞাসা করব। আমি জানি তাতে-ই ওর চোখে সেই আলো ফুটে উঠবে। অমলের কথা ও ওকে কেউ জিজ্ঞাসা করে না! ও হয়তো খুব কৃতজ্ঞ হয়ে খুব খুশী হয়ে আমাকে বলবে—'জান, ও কালকে আমার জন্যে খুব সুন্দর একটা……' তারপর নিচু সলজ্জ গলায় বলবে—'সেই আমায় নিয়ে গল্প লিখলে, কিন্তু ওকে কেন আরেকটু…'

আমি জানি, জুঁই তাই-ই বলবে।

দ্বৈপায়ন

রোহিণ্ডু মৈত্রেয়

গভীর রাতে ঘুমটা ভেঙে গেল আচমকা কলিং বেলের আওয়াজে। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম বাইরের ঘরের দরজা খুলে দিল আমার সংসারের দ্বিতীয় জীব বেয়ারাবন্ধু। বাইরের ঘরে কয়েকজনের পায়ের শব্দ পেলাম। বেয়ারাবন্ধুর গলার আওয়াজও পেলাম সঙ্গে সঙ্গে।

এতো রাতে এ্যা ব্যাপার কি? অহিয়াকে দরকার? তা আসুন স্যার আসুন। বসুন স্যার। অহিয়া যে এখন খুব ঘুমোচ্ছেন, চট করে তো ডাকা যাবে না।

যোগ্য ভৃত্যেরই কাজ করেছে বেয়ারাবন্ধু। কিন্তু তার গলা থেকে যে আওয়াজ বেরতে সুরু করল তাতে করে আশপাশের বাড়ীর কয়েকটারই লোক জেগে উঠতে পারে। সে জানেও সে কথা। সে এও জানে যে তার আওয়াজে তার মনিবের ঘুম বেশীক্ষণ কিছুতেই টিকতে পারবে না। কাজেই মনিবকে কাঁচা ঘুম থেকে ডেকে তোলার অপ্রীতিকর কাজটা থেকে তার রেহাই।

কাজেই আমায় জাগতে হল। একটু গলা খাঁকারি দিয়ে উঁচু গলায় ডাকলাম—বেয়ারাবন্ধু; কে এসেছে রে?

ঐ অহিয়া উঠে পড়েছেন। অহিয়ার ঘুম এতো পাতলা যে ছুচ পড়লে তা ভেঙে যায়। যাই অহিয়া।

বেয়ারাবন্ধু এসে আমার ঘরের আলো জেলে বিছানার সামনে দাঁড়াল। উঠতে ইচ্ছা করছিল না। সন্ধ্যে রাতে বাড়ীতে একটু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছিলাম। এখানে এই নিবান্ধব পুরীতে একটু উৎসবাদির আয়োজন করতে গেলেই খাটুনীটা গৃহকর্তার উপর এসে বর্তাবে ষোল আনা। তার ওপরে আমার আবার ব্যাচিলরের ঘর। কাজের ভাগ নেবার লোকও নেই। সুতরাং বেশ একটু রাত করেই শোওয়া হয়েছিল, বেশ খানিকটা খাটুনি এবং গুরুভোজনের পরে। শরীরটা এ সময়ে ঘুম থেকে উঠতে আদবেই রাজী ছিল না।

ঘুম জড়ান গলায় শুধালাম—কে এসেছে রে? এতো রাত্তিরে?

ওই যে পাসপোর্টের কর্তা, সন্ধ্যাবেলায় যিনি খেয়ে গেলেন। কি যেন নাম—

গোবিন্দ মেনন, ইমিগ্রেশন অফিসার। আজ সন্ধ্যারাতের পার্টিটা তাঁরই জন্যে দেওয়া হয়েছিল।

উঠে পড়তে হল। বাইরের ঘরে এসে দেখা দিলাম ঘুমের পোশাকেই।

গুড মর্ণিং, গুড মর্ণিং মিঃ মৈত্রেয়। এই এতো রাতে আপনার ঘুম ভাঙাবার জন্যে আমি ভয়ানক দুঃখিত। বন্ধুত্বের খাতীরে এতটা উৎপাত করা সত্যিই অনুচিত! কিন্তু আমার হাতটা ডান হাতে ধরতে ধরতে বললেন, গোবিন্দ মেনন।

কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার আর অন্য উপায় নেই। আপনার এখান থেকে খেয়ে যেতেই রাত্তির সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছিল। শোবার আয়োজন করছি এমন সময় আর্দালী এসে খবর দিল কাছেই

একটা জাহাজের থানার অফিসার ইন-চার্জ এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। এই যে ইনিই হলেন মিঃ সুব্রামানিয়াম্। মাধবপুরম থানার ও. সি.। ইনি এক্ষুনি একটা ইন্‌ফরমেশন্ নিয়ে এসেছেন। বলে দেখালেন সোফায় বসা একটি লোককে। লোকটি এক্ষুনি তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে মিলিটারী কায়দায় আমায় সেলাম দিলেন। দেখলাম তাঁর পরনে খাকি চাক্ প্যান্ট হাফ্‌সার্ট। বুকের ওপর দিয়ে চামড়ার বেল্ট, আর পাকান খাকী দড়িতে ক্রশ করা। পেটের বেল্টটা খুবই চওড়া। তাতে রয়েছে কার্ট্রিজের বাক্স আর পাশের খোলে ভরা একটা রিভলবার। বাঁ হাতে ধরা আছে তাঁর বগলে চাপা পুলিশী টুপীটা। ডানহাতটা মিঃ সুব্রামানিয়াম তাঁর কোমরে ঝোলান রিভলবারের ওপর বুলিয়ে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আপ্যায়িতের হাসি হাসলেন। বললেন—একটা জরুর খবর এনেছি স্যর। সময়ে যেতে পারলে বিরাট ক্যাচ। বলে আবার হাসতে লাগলেন মাধবপুরম থানার ও. সি. সুব্রামানিয়াম। দেখলাম নেকড়ের মতো বীভৎস একটা মুখে মতলববাজ শেয়ালের ধূর্ত হাসি ফুটে উঠেছে।

কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। আমার বন্ধু গোবিন্দ মেনন আমাকে তক্ষুনি সচেতন করলেন—মিস্টার বৈত্রের ইনি খবর এনেছেন মাধবপুরম-এর থেকে প্রায় শ' দুয়েক যাত্রী চলেছে সিলোনে। তারা সন্ধ্যে বেলাতে রওয়ানা হয়ে গেছে অনেকগুলো ছোট নৌকোতে। এই এখান থেকেই তারা বড় নৌকায় উঠবে। আজ বোধ হয় অষ্টমী কি নবমী? চাঁদ উঠবে রাত তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ। তখন জোয়ারে সেই নৌকো পাড়ি দেবে সিলোনের উদ্দেশে। তার আগে বলবল নিয়ে পৌঁছতে হবে আমাদের বীপটিতে। আপনার সাহায্য ছাড়া তো উপায় নেই বৈত্রের। দয়া করে আপনার একটা জাহাজ দিন আমাদের। আমি ইতি-মধ্যেই পোর্ট অফিসের লাইনটা চেয়ে ফোন করেছিলাম। তা শুনলাম সেটা বিগড়ে আছে। তাই এতো রাতে দৌড়ে এসেছি আপনার কাছে।

বললাম—ঠিক আছে চলুন। কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হবে। আপনাদের সঙ্গে আমিও যাব।

গোবিন্দ মেনন বললেন—সে কি আপনি যাবেন? কিন্তু ধরুন যদি ওপক্ষ গুলী-টুলী ছোড়ে। দরকার কী আপনার গিয়ে। আপনি বিশ্রাম করুন না।

বললাম—যদি গুলী ছোড়ে তা হলে আমার জাহাজের লোকগুলো তো রেহাই পাবে না। নিজে বিপদের মধ্যে না গিয়ে তাদের পাঠাব কেমন করে বলুন?

আমি ঐ জন্যেই আপনাদের সঙ্গে আসতে চাই।

গোবিন্দ মেনন বললেন—শুধু তাই নয়। আমি আপনাকে তো চিনি। এ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছেন ব্যাপারটিতে, তাই নয়?

* * * *

পাঁচ মিনিটে তৈরী হয়ে এসে জীপে বসলাম। ওঁরা জীপ নিয়েই বসেছিলেন। জীপটা আমার বাড়ীর থেকে একটু দূরে গাছতলায় দাঁড়িয়েছিল। রাস্তার আলোতে দেখলাম জীপের মধ্যে জনাচারেক বন্দুকধারী সিপাই বসে আছে। আর কপালে চওড়া বিভূতি দেখে চিনলাম গোবিন্দ মেননের সব সময়ের সঙ্গী, তাঁর একাধারে আর্দালী বাবুর্চি শরীররক্ষী সব কিছু শ্রীমান চিন্নাস্বামীকে। আমাকে দেখে শ্রীমান চিন্না-স্বামী তার দাঁতের সারির সবকটা বার করে ভক্তিভরে হাতজোড় করে নমস্কার জানালে।

আমার বাড়ী শহরের পশ্চিম প্রান্তে। সেখান থেকে শহরের মাইল দুই রাস্তা টপ্‌কে তবে গিয়ে পৌঁছতে হয় পোর্ট এলাকায়। শহরের পূর্বপ্রান্তে সমুদ্র, মান্নার উপসাগর। এ শহরের পোর্টটা মোটামুটি

বেশ বড়। অবশ্য কলকাতা, মাদ্রাজ কী বোম্বাই এর মতো নয়। তবুও এর মাল ওঠানামা কাজ রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সিংহলের সঙ্গে ব্যবসা এখান থেকেই সবচেয়ে ভাল হয় বলে অনেক বেশী সংখ্যায় জাহাজ এ বন্দরে এসে ভেড়ে।

সিংহল স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে যাবার পর থেকে সেখানকার সরকারের নানারকম আইন-কানুনের ফেরে কলম্বো পোর্টে মজুরদের পারিশ্রমিক অসম্ভব বেড়ে গেছে। তার ওপরে মাল তোলা নামার কাজে স্টিভেডোরের কাজ সরকার সব সরকারী আমলে এনে ফেলেছে। এই সব নানা কারণে কলম্বো পোর্টে খুব বেশী জাহাজ আজকাল আর দাঁড়াতে পারে না। তাই তাদের বেশীর ভাগই এসে নোঙর করে এই বন্দরটায়। এখানে মজুরী খরচা অনেক কম। আর তাছাড়া সিংহলের সঙ্গে এখানকার সমুদ্রে ব্যবধান মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল এপার ওপার। অনুকূল বাতাস যদি পায় তবে এখানকার একটা কাঠের নৌকো পাল তুলে দিয়ে অনায়াসে ১০।১২ ঘণ্টায় সিংহলে পৌঁছাতে পারে।

জীপে আসতে আসতে ভাবছিলাম সে সব কথা। এ সমুদ্রে আমার কাজের জন্যে ছোট জাহাজ নিয়ে ঘোরাফেরা করতে হয়। অনেক ব্যাপার নজরে পড়ে। দেখেছি দলে দলে এদিককার লোক রাতের বেলা নৌকো নিয়ে চলেছে ভারতের কূল ছেড়ে সিংহলের উদ্দেশে। তারই কিছু দিন পরে কাগজে পড়েছি—বে-আইনী লোক সমাগম হচ্ছে ভারত থেকে সিংহলে জীবন্তভাবে। সিংহল সরকার প্রতিবাদ জানিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারও তটস্থ হয়ে উঠেছেন। উপকূলের বন্দরগুলোতে কড়া আদেশ এসেছে যেমন করে পার এই বে-আইনী দেশান্তর বন্ধ কর।

কিন্তু বললেই তো হয় না। তামিলনাদের এই উপকূলের লোকেরা চিরকাল যাতায়াত করেছে সিংহল। সিংহল তাদের প্রতিবেশী ছিল এই সেদিন অবধি। তাছাড়া সেখানে তারা ধুলো মুঠো ধরে সোনা মুঠো নিয়ে এসেছে। স্বর্ণ-লঙ্কা গিয়ে এদিককার সবচেয়ে গরীবও রীতিমতো বিত্তবান ধনী হয়ে ফিরেছে। এই যাতায়াত চলছে হাজার হাজার বছর ধরে। বিদেশী শাসন ভারত আর সিংহল দু' দেশকেই এক সুতোয় গেঁথে শাসন চালিয়েছে। তখন ভারতের উপকূলের রাস্তায় পড়া জীবগুলি গুধুমাত্র খেয়ে বেঁচে থাকবার তাগিদেই দলে দলে ভারতের কূল ছেড়ে গিয়ে উঠেছে সিংহলে। চাকরী নিয়েছে সিংহলের চা আর রবির ক্ষেতে।

আর আজ বললেই হল—ওদিকে যেও না, সিংহলে যাওয়া তোমাদের মানা। মানা তাই কেউ শোনে না। তারা যেমন যাবার তেমনি যাচ্ছে ঠিক। কেবল বদল হয়েছে জায়গায়। এখন যাত্রীবাহী নৌকোগুলো আর বন্দর থেকে ছাড়ে না, ছাড়ে বন্দর থেকে লোকালয় থেকে অনেকদূরে আঘাটায় গভীর রাতের অন্ধকারে। সেখানে পুলিশের নজর সহজে পৌঁছবে না। ওদিকে সিংহলে গিয়েও তারা নামে আঘাটায়। তারপর একবার তারা গেলে তাদের সেখান থেকে নড়ায় কে?

এইভাবেই চলেছে ইল্লিসিট্ এমিগ্রেশন্ বা বেআইনী দেশান্তরী হওয়া।

এখানকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে শুনেছিলাম মনে পড়ল—চোরাই মাল আমদানী-রপ্তানীর কারবার আর এই লোক যাওয়ার ব্যাপার সরকার কিছুতেই বন্ধ করতে পারবে না।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন? কাইস্‌স্ আর এমিগ্রেশন অফিস একটু কড়া নজর দিলেই তো হয়।

ভদ্রলোক বলেছিলেন হয় না।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম তাঁর মুখের দিকে।

তিনি আমাকে অবাক হতে দেখে বুঝিয়ে বলেছিলেন—এখানকার ঐ দুটো কারবার কারা করে জানেন? যাদের বড় বড় কাঠের গেনী নৌকো আছে তারাই। যাদের গেনীগুলো সিংহল আর ভারতের মধ্যে মাল বওয়ার কাজ নিত্যি করে তারাই। তারা রীতিমতো পয়সাওয়ালা, প্রতিপত্তিশালী লোক এই এলাকার।

প্রতিবাদ করে বলেছিলাম—বুঝলাম চোরাইমালের কারবারে লোকে পয়সা পায়, কারণ সিলোনে কাস্টম্‌স্ ডিউটি অনেক কম। কিন্তু এত ঝুঁকি নিয়ে লোক বওয়ার কাজে তাদের লাভ কি?

ভদ্রলোক বলেছিলেন—এই লোক বওয়ার সওয়ারী ভাড়া মাথা পিছু কতো জানেন? দু'শো টাকা। সুতরাং একটা গেনী যাতে দুশো লোক কম করে ধরতে পারে, একটা ফেরা দিলেই চল্লিশ হাজার টাকা করকরে এসে গেল। তারপর ফিরে আসবার সময় খালি নৌকো বোঝাই করে আনবে চোরাই কাস্টম্‌স্ ফাঁকি দেওয়া মাল। এখানকার গেনীওয়ালা বড়লোকেদের এটা একটা রীতিমতো ব্যবসা। তাদের অনেকেই আবার রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। আইনকে তাঁরা ভয় পায় না। বরং সরকারী চাকররাই তাঁদের ভয়ে অস্থির।

কিন্তু গোবিন্দ যেমন ভয় পাবার ছেলে নয়। যেমন ডাংপিটে, তেমনি দুঃসাহসী। রাজনৈতিক দলের চোখরাঙানীতে আর কেউ যদিও ভড়কে যায় তো, গোবিন্দ যেমন নয়। ৪২ সালের আগষ্ট মুভমেণ্টে তিনি বৃটিশের চোখরাঙানীকেও গ্রাহ্য করেননি। এইজন্যেই গোবিন্দ যেমন আমার বন্ধু। আমি তাঁকে বলেছিলাম এই সব অবৈধ অসামাজিক ও রাষ্ট্রবিরোধী কাজ বন্ধ করার জন্যে আমি যে কোনরকম সাহায্য তাঁকে করতে রাজী আছি।

সেই দাবীতেই তিনি এসেছেন আজ রাত্রে আমার জাহাজ চাইতে।

• • •

জীপ এসে বন্দরে ঢুকল। নিশুতি রাত, চারদিকে থম থম করছে। বন্দরের ল্যাম্পপোষ্টগুলো ঝাঁয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে, আলোগুলো জ্বালিয়ে রেখে জেটীর ওপারে কাঠের গেনীগুলোতে কেন যে ঘুমপাড়ানী মন্ত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। একটা প্রাণীও জেগে নেই অতবড় বন্দরটার মধ্যে। ডেকের ওপরে গাদাকরা নুনের বস্তার ওপর, গুঁটকীমাছের চোপড়ার ওপর, পোর্টের রেললাইনে রাখা ট্রলিগুলোর ওপর যে যেমন পেয়েছে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আল্‌কাতরা ঢালা সমুদ্রের জলে শুধু আস্তে আস্তে ঢেউ উঠছে। সেইটাই এসে কংক্রীট বাঁধান জেটীর গায়ে লেগে একটা অলস শব্দ হচ্ছে ছলাৎ, ছলাৎ। তাতে সমস্ত নৌকোগুলো দুলে দুলে দোল খাচ্ছে আস্তে আস্তে।

এক পোঁচ গাঢ় কালির ছোপের মতো দূরে দেখা যাচ্ছে সেই কুখ্যাত দ্বীপটা। এখানকার লোকেরা যাকে জানে চোরাই মাল চালান ও আমদানী করবার ঘাঁটি বলে। দূরে দ্বীপের ওপর লাইট হাউসটা দাঁড়িয়ে এক নাগাড়ে চোখটিপে যাচ্ছে ফস্, ফস্, ফস্, ফস্। ওদিকে ঘন কালো সমুদ্রের জলের ওপরে অনেকদূরে দেখা যাচ্ছে সারে সারে আলোর মালা। গভীর সমুদ্রগামী জাহাজরা দাঁড়িয়ে আছে আলো জেলে। কিন্তু তারাও বাপের রাজের কনের মতো সাজ-পোশাকে সেজে আলো জেলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সমস্ত পৃথিবীটা ঘুমোচ্ছে। নিবিড়, নিবিড়, নিশ্চিন্ত সে ঘুম।

ডিউটিম্যান ডেকের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমাদের জুতোর আওয়াজ পেয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম দিলে। বললাম, 'বস্‌নকে' (ছোট জাহাজের ক্যাপ্টেন) ডেকে তোল, ড্রাইভারকে ডাক। এক্ষুনি সমুদ্রে যেতে হবে।

দশ মিনিটের মধ্যে জাহাজের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। গোবিন্দ যেমন যত শীঘ্র এগোতে পারেন তার হুকুম দেয়। তাই ড্রাইভার স্পীড দিলে প্রায় আটশ' রেভলুশন-পার-মিনিট। জাহাজ আলকাতরা গোলা কালো জলে আলোড়ন তুলে এগিয়ে চলতে লাগল। সমস্ত পৃথিবীতে কেবল একটা আওয়াজ উঠতে লাগল সে হল প্রপেলারের ঝঞ্ঝাতাড়ার আওয়াজ, তার সঙ্গে মিশতে লাগল ইঞ্জিনের শিক্ শিক্ কিক্ কিক্ মৃদু গর্জন।

ঘড়িতে দেখলাম রাত আড়াইটে। আকাশ সমুদ্র সব একাকার হয়ে গেছে গলা অন্ধকারের স্রোতে। তার মাঝে কেবল বিক্‌মিক্ করছে নক্ষত্রের রাশি। যেন কালো মখমলের একটা প্রকাণ্ড চাঁদনীতে মণিমাণিক্যের কাজ করা হয়েছে। আমি নিশ্চুপ হয়ে পৃথিবীর এই অপরূপ রূপ দেখছি। দারোগা সুব্রামানিয়ামের কথায় ধ্যান ভাঙল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কতক্ষণ লাগবে আমাদের দ্বীপে পৌঁছতে?

বললাম—এই স্পীডে একঘণ্টা বড় জোর।

সুব্রামানিয়াম বললেন—কিন্তু জাহাজটা যে বড্ড দুলছে স্যার। ডুবে যাবে না তো?

অগভীর সমুদ্রের ঘোলাটে কাটা খাল ছেড়ে গভীর সমুদ্রে আসতেই জাহাজে একটু বেশী দুলুনী সুরু হয়েছে। সমুদ্রের খোলা বাতাস এসে লাগছে হুহু করে, উত্তর-পূবের হাওয়া। গায়ে বেশ একটু সিরসিরে শীত ধরায়। এটা হল ভোরের বাতাস। এই বাতাসেই এই অঞ্চলে একটু বা শীত বাড়ে। নৈলে ঠাণ্ডা কারে বলে তা এখানকার লোক জানে না। অবশ্য এরা এই শীতেই মোটা পশমের জামা-কাপড়, র‍্যাপার কম্ফর্টার ব্যবহার করে থাকে। অন্ধকারেই তাকালাম সুব্রামানিয়ামের মূর্তির দিকে। দেখলাম, ইতিমধ্যে কান মাথা ঘিরে তিনি কম্ফর্টার জড়িয়েছেন একটু ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে। গোবিন্দ যেমন আমার হয়েই জবাব দিলেন দারোগাকে—এতো সহজে জাহাজ ডোবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিঃ সুব্রামানিয়াম।

সুব্রামানিয়াম বললেন—আমি স্যর ডাঙায় যমকে পর্যন্ত ডরাই না, শুধু আমার ভয় এই সমুদ্দুরকে। এখানে কখন যে কী হয় কেউ বলতে পারে কি স্যর। বিশেষ করে রাত্তের বেলায়। মাধবপুরম্-এর চার্জে আমি রয়েছি প্রায় সাত বছর হয়ে গেল। দেখেছি, ওখানকার জেলেরা রোগবালাই কাকে বলে জানে না। তবু তারা মরে, মরে সমুদ্দুরে ডুবে। আমারই স্যর একটা চাকর ছিল, জাতে ভেলাপার, আধালাক্কারণ। বিশ্বাস করবেন না স্যর, তার চোরাটা ছিল একটা হাতির মতো। দিনে আমার কাছে কাজ করত, রাতে মাছ ধরতে যেত সমুদ্দুরে। এক রাতে গেল আর ফিরে এল না। বড় নয় তুফান নয় ভাঁটো জলী জোয়ান মরদটা সমুদ্দুরের তলায় এমন তলিয়ে গেল যে তার আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। আমি অনেক খোঁজ করেছিলাম সমুদ্দুরের ধারে ধারে জেলেদের মধ্যে। তারা তার নৌকোটা পেয়েছিল পাঁচ মাইল দূরে একটা চড়ায়, কিন্তু লোকটাকে আর পাওয়া গেল না। সেই থেকে স্যর আমি সমুদ্দুরকে বড় ডরাই। এই বাবা ড্রাইভার, একটু আস্তে চালাও না বাবা, দুপুনীটা যে বড্ড বাড়ছে।

গোবিন্দ যেমন ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে চাপা ধমক দিলেন দারোগাকে—আস্তে গেলে আর কাটকে যেতে হবে না দ্বীপের কাছে।—

তারপর হুইল হাউসের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে 'বসুন'কে বললেন—দ্বীপটার পুব মাথা ঘুরে ওপারে দক্ষিণের কোণে জাহাজ নিয়ে চল।

'বসুন'-জবাব দিল না। শুধু তার মাথাটা নেড়ে জানাল আচ্ছা।

লাইট হাউসের আলোটাকে নজরে রেখে জাহাজ চলতে লাগল—কিক্ কিক্ কিক্ কিক্।

সেই কুখ্যাত দ্বীপটা পূব পশ্চিমে লম্বালম্বি হয়ে একটা ডিমের মতো ভাসছে সমুদ্রের ওপর। আমাদের ছোট্ট জাহাজটা একটা টাট্টু ঘোড়ার মতো ভয় ভয় করে তার ওপর দিক ঘেঁষে চলল। দ্বীপটা আবছা অন্ধকারে খুব ভাল দেখতে না পেলেও তার বাবলার জোপগুলি যার কালির ছোপের মতো নজরে পড়ছিল। লাইট হাউসটার মাথার আলো লম্বালম্বি গিয়ে পড়ছিল সমুদ্রের ওপর। কিন্তু তার পায়ের তলায় অন্ধকার জমাট বেঁধে দাঁড়িয়েছিল—

গোবিন্দ মেনন রেডিয়াম দেওয়া ঘড়িটার দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন—প্রায় সওয়া তিনটে বাজতে চলল, এখনও চাঁদের দেখা নেই।

দারোগা সুব্রামানিয়াম বললেন—চাঁদ না উঠে ভয় ভালই হয়েছে। চাঁদের আলোয় শয়তানগুলো আমাদের জাহাজ দেখতে পেত।

গোবিন্দ মেনন বললেন—ওরা যদি এখানে সত্যিই থাকে তবে আমাদের জাহাজের জলতাণ্ডার আওয়াজে ওরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে। বলতে বলতে আমাদের জাহাজ বেশ জোরে একটা মোড় ঘুরল ডানদিকে। বুঝলাম দ্বীপের মাথার দিকে পাক খেয়ে আমরা উত্তর থেকে দক্ষিণে যাচ্ছি। এরই একটু পরেই আমরা আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পড়লাম।

আমাদের জাহাজটা দ্বীপটার দক্ষিণ দিকে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটল। কাছেই অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল একটা মোটর লঞ্চ। আমরা পূবদিকের বাঁক ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন হঠাৎ গর্জন করে উঠে, জল তোলপাড় করে আমাদের জাহাজের একেবারে গা ঘেঁষে তীরের মতো সোঁ করে বার হয়ে গেল। এই ধাওয়ার ফলে জলে যে বিক্ষোভ উঠল তার ধাক্কায় আমাদের জাহাজটা ডাইনে বাঁয়ে প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠল। জাহাজের মধ্যে জিনিসপত্রগুলো ঝনঝন শব্দ করে ছিটকে পড়ে গেল। 'ইন্দুন' একবার হুমড়ি খেয়ে আবার ঠিক জায়গায় এসে হুইল ধরল। দারোগা সুব্রামানিয়াম ডেকের ওপর কুমড়োর মতো গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। সিপাইগুলো হাতের কাছে যা পেল তাই ধরে পতনরোধ করল। আমি পড়লাম গোবিন্দ মেননের গায়ে হুমড়ি খেয়ে। মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

আমাদের জাহাজটা মুহূর্তের জন্যে বেঁচে গেল। নাহলে ধাক্কা লাগলে দুটো জাহাজেরই কী যে হত বলা যায় না।

সেই লঞ্চটা পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম সেটা লোকে ভর্তি। সেদিকে দেখে গোবিন্দ মেনন হতাশার সুরে বললেন—শিকার ফসকে গেল। ঠিকই অনুমান করেছিলাম যে ওরা আমাদের জাহাজের আওয়াজ পেয়েছে। তবুও কিন্তু আমি দেখব জায়গাটা।

লঞ্চটা অনেক দূরে চলে গেছে মুহূর্ত মধ্যে। তাকে অনুসরণ করাও বৃথা। তাই গোবিন্দ মেনন সে কাজ করলেন না। ইতিমধ্যে সুব্রামানিয়াম বেড়ে-নুড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। গোবিন্দ মেননের কথায় সায় দিয়ে বললেন—নিশ্চয়ই এতদূর যখন এসেছি তখন খানাতল্লাশীটা ভাল করেই করতে হবে।

আমাদের জাহাজের পাশ থেকে লাইফ বোটটা খুলে জলে নামান হল। জল এখানে অনেক অগভীর, হবে দু' ফ্যাদম্। এর থেকে কম জলে জাহাজ আর যাবে না। এখান থেকে দ্বীপের দূরত্ব প্রায় তিন ফার্লং। আমরা ক'জন লাইফ বোট বেয়ে চললাম দ্বীপের দিকে। দ্বীপের কাছাকাছি আরও অগভীর জলে এসে দারোগা বললেন—এখানে কেমন করে লোকে নৌকোয় চড়ে তাতো ভেবে পাই না।

গোবিন্দ মেনন বললেন—এখানকার এই এক গলা জলে ডুবে দাঁড়িয়ে থাকে লোকগুলো।

পুলিশের লোক এলেই তারা জলে ডুবে পালায়। তাদের ধরা বড় সহজ কথা নয়। আর পুলিশ খোঁজ না পেলে তো তারা এখান থেকেই নৌকোয় ওঠে।

দারোগা বললেন—এই শীতে জানোয়ারগুলো একগলা জলে দাঁড়িয়ে থাকে কেমন করে? সান্নিপাতিক হয় না? কিন্তু এতো কষ্ট করে সুর সিংহলে যাবার দরকারটা কী?

গোবিন্দ মেনন বললেন—পেটের দায়ে। সেখানে অনেক অল্প আয়াসে অনেক বেশী পয়সা রোজগার করা যায়।

কিছুক্ষণ অল্পবিস্তর ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে, শেষের ব্রেকারটা ভেঙে আমরা এসে গেলাম দ্বীপের চড়ায়। ততক্ষণে দেখি আকাশে একফালি ক্ষীণ চাঁদ দেখা দিয়েছে। তারই করুণ খানিকটা কাক-জ্যোৎস্না মেড়মেড়ে আলো ফেলেছে সমুদ্র আর দ্বীপটার ওপর। সেই আলোয় দ্বীপে নামতে কষ্ট হল না।—আমরা সবাই জুতো মোজা খুলে হাঁটু জলে নেমে পড়লাম। সেখান থেকে জল ভেঙে গিয়ে উঠলাম দ্বীপের ওপর। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভরা দ্বীপটাতে কোন প্রাণের লক্ষণ নেই, নেই কোন সাড়াশব্দ। শুধু উত্তর পূবের হাওয়া—কানের পাশ দিয়ে বয়ে যাবার সময় মৃদু কান্নার মতো একটা আওয়াজ তুলছে উ উ উ উ। আর দূর থেকে শোনা যাচ্ছে ব্রেকারের গুরুগম্ভীর গম্ভীর আওয়াজ।

ছোট্ট একটা বালিভরা দ্বীপ। লম্বায় মাইল চারেক হলেও চওড়ায় এটা কোন জায়গায় একমাইলের বেশী নয়। এর একদিক থেকে অন্য দিকটা অনায়াসে দেখা যায়। এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে খালি বাবলা গাছের ঝাড়। তারই মাঝখানে ধর্মের ডাক ডাকবার জন্যে একটা ছোট্ট ঘর—কাস্টম্‌স্-এর অফিস। তাতে কোন লোক কখনও থাকে কিনা সন্দেহ। আর রয়েছে লাইট হাউসটা। পৃথিবী যখন গভীর ঘুমে ঢুলে পড়ে তখন সারারাত অতন্দ্র চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এই লাইট হাউসটা। আকাশের পঙ্খীরাজের মতো সমুদ্রের বুকে ধপধপ করে জ্বলে এর আলো।—সেই আলো গিয়ে পড়ে দূরে সমুদ্রের বুকে; কিন্তু আশ্চর্য লাইট হাউসের পায়ের কাছে এতটুকু আলো নেই। সেখানে রয়েছে জমাট বাঁধা অন্ধকার।

দ্বীপে উঠেই গোবিন্দ মেনন দারোগার সঙ্গে পরামর্শ করলেন—এর চারদিক ভাল করে দেখতে হবে। একটা মোটর লঞ্চে অতগুলো লোক যেতেই পারে না। খবর পাওয়া গেছে প্রায় দু'শো লোক মাধবপুরম্ থেকে যাচ্ছে।

দারোগা সুব্রামানিয়াম বললেন—কাউকে না কাউকে পাবই স্যর। দেখবেন চেষ্টা আমাদের বৃথা যাবে না। এবার আমি প্রোমোশন নিয়ে ছাড়ব।

আমরা দু' দলে ভাগ হয়ে পড়লাম। আমি আর দারোগা সুব্রামানিয়াম একদলে। অন্য দলে রইলেন গোবিন্দ মেনন আর চারজন সিপাই। চিন্নাস্বামী একা আলাদা হয়ে একটা টর্চ নিয়ে বালির ওপর কী যেন খুঁজতে লাগল। সেদিকে তাকিয়ে গোবিন্দ মেনন বললেন—চিন্নাস্বামীর চোখ দুটো রাতে বনবেড়ালের মতো জ্বলে।

বলতে বলতে তিনি সামনের দিকে টর্চের আলো ফেলে এগিয়ে চললেন।

গোবিন্দ মেননের অনুমানই ঠিক। চিন্নাস্বামী একটু পরেই দৌড়ে এসে গেল আমার কাছে। খুব উত্তেজিত হয়ে বললে—স্যর এখানে বালির ওপর চাটকা রক্তের দাগ দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয় এখানে একটা কিছু হয়েছে। সুব্রামানিয়াম আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—রক্ত? কিসের রক্ত? চিন্নাস্বামী

বললে—মানুষের রক্ত নয়, তার সঙ্গে সমুদ্রের জল ঝরে পড়ার চিহ্ন। নিশ্চয় এখান দিয়ে কেউ এইমাত্র সমুদ্রের থেকে উঠে এসেছে। আর তাড়াতাড়িতে আসতে গিয়ে কোন ঝিনুকে তার পা কেটে গিয়েছে।

সুব্রামানিয়াম বললেন—চল চল দেখি গিয়ে।

গোবিন্দ সেনন সিপাইদের নিয়ে ইতিমধ্যে বাবলার ঝোপের পিছনে অদৃশ্য হয়েছেন।

আমার আর সুব্রামানিয়ামের হাতের টর্চ দুটো জায়গাটার ওপর ঘুরে ফিরে পড়ল। দেখলাম নরম বালির ওপর সত্যিই পায়ের দাগ। তার ওপর রক্তের চিহ্নগুলোও খুব সুস্পষ্ট এবং বড় বড়। আশেপাশে জল ঝরে পড়ার দাগও রয়েছে। জলের দাগের পাশে কয়েক ফোঁটা গাঢ় কালো রক্তের দাগ আরও বেশী করে নজরে পড়ছে।

অন্ধকারে ঠিক দেখা গেল না। তবে দেখা গেলে দেখতে পেতাম দারোগা সুব্রামানিয়ামের চোখ দুটো নেকড়ের মতো জ্বলছে। তিনি বললেন—এই পায়ের দাগ আর রক্তের চিহ্ন বরাবর সামনের দিকে চলে গেছে। একে অনুসরণ করা দরকার।

আমি, চিন্নাস্বামী আর দারোগা সুব্রামানিয়াম সামনে আলো ফেলে অনুসরণ করলাম সেই পায়ের দাগ আর রক্তের চিহ্নকে। দেখলাম সত্যিই সেই চিহ্নগুলো সটান লাইট হাউসটার নীচে জমাট বাঁধা অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেছে।

দারোগা সুব্রামানিয়াম প্রায় স্বগতোক্তির মতো বললেন—যদি এক শালাকেও ধরতে পারি তাহলে আমার প্রমোশন কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। প্রায় শ' দুই হাত পথ আমরা চলে এলাম ঢিলে বালির রাশির ওপর দিয়ে। এই দু'শ হাত আসতে আমার মনে হচ্ছিল যেন আমরা দু'শ বছর অতিক্রম করছি। উৎকণ্ঠায়, উত্তেজনায়, আগ্রহে আমাদের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। সুব্রামানিয়াম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বালির ওপর রেখে আপন মনে মন্তব্য করে চলেছেন—একটা কোন সূত্রোও যদি আমি পাই তো আমি এই সমস্ত বজ্জাতির জালটা শেষ পর্যন্ত টেনে তুলবই। দেখি কেমন করে শয়তানগুলো রেহাই পায়।

হঠাৎ আমরা একটা বাবলার ঝোপের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সেখানে এসে পায়ের ছাপ আর রক্তের দাগ আদবে দেখতে পাওয়া গেল না। ছোট ছোট অনেকগুলো বাবলা গাছ মিলে এ জায়গাটায় একটা রীতিমতো দুর্ভেদ্য ঝোপ তৈরী করেছে। লাইট হাউসটার ডানদিকেই এই ঝোপটা রয়েছে দেখলাম। তাই অন্ধকারে জায়গাটা অত জমাট বাঁধা কালো দেখাচ্ছিল।

বটকরে দারোগা সুব্রামানিয়াম তাঁর রিভলবারটা বার করে ডানহাতে চেপে ধরলেন। বাঁ হাতে তাঁর টর্চ। ফিসফিস করে বললেন—এই ঝোপটার মধ্যে নিশ্চয় কেউ লুকিয়ে আছে। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব।

বলেই টর্চের আলোটা ফেললেন ঘুরে ঝোপের ভিতর দিকে। আমাদের হাতের টর্চের আলোগুলোও সেই আলোটাকে অনুসরণ করল।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ মর্মভেদী আওয়াজ উঠল ঝোপের ভিতর থেকে। আমরা সবাই প্রায় চমকে উঠলাম সেই চীৎকারে। স্ত্রীলোকের গলার আওয়াজ। মরণ চীৎকার ছেড়েছে স্ত্রীলোকটা—ভগবানের দিব্যি, দোহাই তোমরা আমার এখানে কেউ এসো না। দোহাই তোমাদের।

চিন্নাস্বামী অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমিও কম অবাক নই। গম্ভীর মুখে সে বললে—স্মার মেয়েছেলেরাও আজকাল এই কারবার সুরু করেছে। দারোগা সুব্রামানিয়াম বললেন—করতে

দোষ কি? সিলোনে একবার যেতে পারলেই হল। সেখানে বাবু খদ্দেররা মুঠো মুঠো পয়সা দেবে। তারপর নৌকোর টিণ্ডেলের সঙ্গে যদি পীরিতে থাকে তো চোরাই চালানী কারবার একটা মেয়েছেলে যেমন সহজে করতে পারে আর তো কেউ তেমন পারবে না। কিন্তু আমাকে দেখতে হচ্ছে মেয়ে মানুষটা কোথায় লুকিয়েছে।

আবার ঝোপের ভিতর দিকে আমাদের সবকটা টর্চের আলো পড়ল একসঙ্গে। আমার আকাশফাটা চীৎকার উঠল—দোহাই ভগবানের, দোহাই তোমাদের একটু অপেক্ষা কর।

দারোগা বললেন—আমরা অপেক্ষা করতে থাকি আর তুমি ওদিকের সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দাও। তারপর একবার সমুদ্দুরে নামলে তো ধরবার সাধ্যি স্বয়ং ভগবানেরও নেই। আমরা সেই চীৎকারে কান দিলাম না। চিন্নাস্বামী বাবলাগাছের ডালগুলোকে উঁচু করে ধরতে লাগল আর আমরা ভারি ভিতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে পথ করলাম। সুব্রামানিয়াম চলেছেন আমার আগে। একবার তিনি পিছন ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখে নিলেন।

টর্চের আলোয় আভায় দেখলাম জয়ের আনন্দে তাঁর মুখটা জলজল করছে।

বাবলা গাছের ঝোপগুলো ভেদ করে ভিতরে যেতেই দেখলাম সেখানে একটু করে ফাঁকা জায়গা। জায়গাটার চারদিক বাবলার ঝোপে ঘেরা। বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। এই দ্বীপে এমন জায়গা অনেক আছে। তারই একটা কোণে একটা মেয়েছেলের দেহ আড় হয়ে পড়ে আছে। পড়ে আছে বললে ভুল হবে। সে দেহটা কাতরাচ্ছে। তার বীভৎস রকমের প্রকাণ্ড পেটটা একবার করে কুঁচকে উঠছে আর একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার শূলবেধা সাপের মতো তার সারাটা দেহ পাক খাচ্ছে। এক একবার সে উঠে বসতে যাচ্ছে, আবার ধপাস করে বালিতে শুয়ে পড়ছে। তার জলে ভেজা শরীরটা প্রায় উলঙ্গ। সমস্ত শরীরের কাপড়ের রাশ এসে জমেছে নীচের দিকে দুপায়ের মাঝখানে। সেখানে দেখা যাচ্ছে সব কাপড়টাই রক্তে ভেসে লাল হয়ে গেছে। আমরা একটু এগিয়ে যেতেই সে তার মুখটা দু'হাত দিয়ে চাপা দিল। সেই চাপা মুখ থেকে শুধু একটা যন্ত্রণাকাতর গোঙানী বেরিয়ে আসতে লাগল। আমরা তখনও ভাল করে বুঝে উঠতে পারিনি সমস্ত ব্যাপারটা। একটা প্রচণ্ড বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়ে আমি আর সুব্রামানিয়াম থ' হয়ে গিয়েছি। চিন্নাস্বামী আস্তে আস্তে আমার কানের কাছে বললে—দয়া করে বাইরে যান স্যর। মেয়েটা ছেলে জন্ম দেবার আর জায়গা পেল না।

সেকথা দারোগা সুব্রামানিয়ামের কানে যায়নি। তিনি টর্চ নিয়ে এগিয়ে গেলেন আইডেন্টিফাই করতে। টর্চের আলোটা মুখে ফেলে তিনি জোর করে মেয়েটার মুখের ওপর থেকে হাত দুটো সরিয়ে দিলেন। মেয়েটা আবার একটা তীব্র চীৎকার করে চলে পড়ল। মনে হল অজ্ঞান হয়ে গেছে।

কিন্তু সুব্রামানিয়ামের কি হল? যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠে সুব্রামানিয়াম এক লাফে পিছিয়ে এলেন। তারপর কিছু না বলে একেবারে এক ছুটে ঝোপের বাইরে চলে গেলেন।

মেয়েটা অজ্ঞান অবস্থাতেই গোঙাতে গোঙাতে জোরে জোরে কোঁথাতে সুরু করল। হঠাৎ দেখি চিন্নাস্বামী পাগলের মতো ছুটে গেল মেয়েটার দিকে। চীৎকার করে বলে উঠল—টর্চটা একটু ভাল করে ধরুন স্যর।

আমি টর্চ হাতে দৌড়ে গেলাম তার কাছে। চিন্নাস্বামী ঝট করে হাঁটু গেড়ে বসে রীতিমতো

অত্যন্ত হাতে মেয়েটার কোলের কাছ থেকে এক ডেলা রক্ত বা'র করে নিয়ে এল দু'হাতে। টর্চের আলোয় দেখলাম সদ্যোজাত রক্তাক্ত একটি মানব শিশু।

এদিকে কখন ভোর হয়েছে তা খেয়াল করিনি কেউ। পুবের দিক থেকে একটা গাঢ় লালরঙের ছটা এসে সেই বালির চড়ার ওপর রক্তের লালরঙের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল। দেখলাম সমুদ্রের চক্রবালে রক্তাক্ত প্রকাণ্ড সূর্যটা যেন একটু থমকে দাঁড়িয়েছে।

চিন্তাস্বামীর অন্যদিকে নজর দেবার ফুরসত নেই। আমাকে সে প্রায় আদেশের সুরেই বললে—যা পকেটে আমার একটা পেন্সিল কাটা ছুরী আছে বার করুন তো। চট করে কলম সেরী করবেন না। আর আমার ভেষ্টির (কাপড়ের) পাড়টা চটপট ছিঁড়ে ফেলুন।

আমি যন্ত্রচালিতের মতো চিন্তাস্বামীর কথা শুনতে লাগলাম।

চিন্তাস্বামী এবার আদেশ করল—ধরুন তো দেখি বাচ্চাটাকে। ঠিক এমনি করে ধরুন। ঘেন্না করবেন না। এ স্বয়ং শিব।

বলতে বলতে আমার হাতে সেই নরম রক্তাক্ত পিছিল মাংসপিণ্ডটাকে তুলে দিল। আমি দু' হাত দিয়ে সেই জীবন্ত পিণ্ডটার উত্তাপ অনুভব করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে সেই পদার্থটা ভোরের শিরশিরে হাওয়ায় আমার হাতের মধ্যে কুঁচকে কুঁচকে উঠতে লাগল।

মুহূর্তে হাতে চিন্তাস্বামী তার নাড়ীর দু'দিক কাপড়ের পাড় দিয়ে বেঁধে পেন্সিলকাটা ছুরি দিয়ে সেটা কেটে দিলে। ফিনকি দিয়ে আবার খানিকটা রক্ত গিয়ে ছিটকে পড়ল বালির বালিতে।—চিন্তাস্বামী

● নির্ভীক ও স্বাধীন মতবাদ প্রচারে
● সত্য ও নির্ভুল সংবাদ পরিবেশনে
● নিঃস্বার্থ ও বলিষ্ঠ পরিচালনায়
● জাতি ও দেশের সেবায় উৎসর্গীত

লোকসেবক

মূল্য—
প্রতি সংখ্যা—১০ ন. প.

৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

টেলি : লোকসেবক • ফোন : ২৪-১১০৪ ও ১১০৫

বাচ্চাটাকে নীচুর দিকে মুখ করে ঝুলিয়ে গোটাকয়েক চাপড় দিল তার পিঠে। বাচ্চাটা হঠাৎ ওঁয়া ওঁয়া করে চেঁচিয়ে উঠল।—এখন আর টর্চ দরকার নেই। আলো ফুটে উঠেছে আকাশে। ওদিকে চিন্তাস্বামীর মুখেও ফুটে উঠেছে আনন্দের হাসি। চিন্তাস্বামী সমুদ্র থেকে কাপড় ভিজিয়ে জল এনে মেয়েটার মুখে চোখে ঝাপটা মারল বারকয়েক। বাচ্চাটাকে পরিষ্কার করল সেই ভিজে কাপড় দিয়ে।

ইতিমধ্যে গোবিন্দ মেনন ঘুরতে-ঘুরতে আমাদের কাছে এসে হাজির হয়েছেন। তিনি ব্যাপার দেখে দৌড়ে আরও কাছে এলেন। তারপর থ' হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চিন্তাস্বামী হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে গোবিন্দ মেননের দিকে চেয়ে বললে—স্যর, বেচারা আর একটু হলেই দম আটকে মারা যেত। কিন্তু স্যর মেয়েটার এখনও জ্ঞান হচ্ছে না।

বলতে বলতে সে বাচ্চাটাকে পরম স্নেহের সঙ্গে কাপড়ের মধ্যে জড়িয়ে নিতে লাগল।

গোবিন্দ মেনন বললেন—সিপাইগুলোকে বলো ধরাধরি করে নিয়ে জাহাজে তুলুক। এক্ষুনি ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করতে হবে। সারা দ্বীপ খুঁজে একটা প্রাণীও পেলাম না। ও বাঁচলে ওর কাছ থেকে হয়তো কোন সূত্র বার হতে পারে। কিন্তু দারোগা গেল কোথায়?

চিন্তাস্বামী এদিক ওদিক খোঁজ করে দারোগার পাত্তা পেল না। একটা সিপাই কিছুদূরে গিয়েছিল বোধহয় ভোরের কাজ সারতে, সেই এসে জানাল দারোগা সুব্রামানিয়াম একটা ছেলে ডিঙি কাছ দিয়ে যেতে দেখে তাইতে চড়ে পাড়ি দিয়েছেন ডাঙার দিকে। তাঁকে নাকি বেলা দশটার মধ্যে মাধবপুরমে পৌঁছতেই হবে কোন বিশেষ জরুরী কাজে। তিনি বলে যেতে পারেননি বলে দুঃখিত। তবে তিনি বলে গেছেন যে এই মেয়েটা দেশত্যাগীদের দলের নয়। হঠাৎ কীভাবে ও এখানে এসে পড়েছে তা বলা কঠিন। গোবিন্দ মেনন ভুরু কুঁচকে বললেন—যেমন অদ্ভুত লোক তেমনি অদ্ভুত তাঁর সিদ্ধান্ত। এদিকে বলা নেই কওয়া নেই একেবারে উধাও। তা ছাড়া তিনিই তো আইডেন্টিফাই করবেন। আশ্চর্য লোক বটে।

কিন্তু এসব কথা বলা বৃথা। দেখা যাচ্ছে অনেক দূরে সেই ছেলে ডিঙিটা পাল তুলে তীরের মতো ছুটে যাচ্ছে ডাঙার দিকে। সকালের বাতাস লেগে তার পালটা চতুর্গুণ ফুলে উঠেছে।

• • • • •

হাসপাতালের ডাক্তার প্রাণপণ যুঝতে লাগলেন রোগিণীর সঙ্গে। কিন্তু তার জ্বর ক্রমশঃ বাড়তেই লাগল। শেষে জ্বর উঠল প্রায় একশো চারের ওপর। সেই যে মেয়েটা দ্বীপের ওপর বালির চড়ায় জ্ঞান হারিয়েছিল দীর্ঘ চোদ্দ ঘণ্টা হয়ে গেল এখনও তার জ্ঞান হয়নি। সেই অজ্ঞান অবস্থাতেই তার মুখ থেকে বিরামহীন গোঙানীর আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল। হঠাৎ সেটা থেমে গেল। রোগিণীর বেডের পাশে বসে আছি আমি আর চিন্তাস্বামী। চিন্তাস্বামী মেয়েটার প্রসবকরণের পর থেকে তাকে বাঘের মতো আগলাচ্ছে দেখছি। গোবিন্দ মেনন জাহাজে আসতে আসতে বলেছিলেন আমাকে—চিন্তাস্বামীর বাহিরেটা ঐ রকম কাট কাট রুক্ষ; কিন্তু মনটা হল একজন মায়ের মন। কারুর দুঃখকষ্ট ও সহ্য করতে পারে না। তা ছাড়া ও নাকি নার্সিংএ অদ্বিতীয়। এমন নার্সিং অনেক মেয়েতেও করতে পারে না।

আমি এসেছি আমার ভিতরকার তাড়ায়। ডাঙায় ফিরে মেয়েটাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে আমি বাড়ী ফিরেছিলাম। কিন্তু সারা দুপুর টিকোতে পারিনি। একটা কেমন যেন অস্বস্তিকর অনুভূতি থেকে থেকে আমার ভিতরে খোঁচাতে সুরু করেছিল। তাই বাধ্য হয়ে সন্ধ্যাবেলা এসেছি

মেয়েটাকে দেখতো। ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে তার বেডের পাশে এসে বসেছি। আমাকে দেখে চিন্তাস্বামী মুখ ঘটকে বললে—কেন অসুবিধের নয় জ্বর। বোধ হয় আজ রাতেই টেঁসে যাবে। ডাক্তার বলছিল সেপটিক হয়ে সব বিষিয়ে গেছে। তাই জ্বর উঠেছে প্রায় সাড়ে চার।

জিজ্ঞাসা করলাম—বাচ্চাটা কেমন?

চিন্তাস্বামী বললে—সেটা বেশ ভালই আছে। কিন্তু হতভাগার বরাত দেখুন, জন্মে থেকে মা দেখতে পাবে না।

মেয়েটি নিঃসাড়ের মতো বিছানায় পড়েছিল। হঠাৎ দেখলাম সে যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। তার হাত দুটো পাশে যেন কাউকে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগল। যেন বিড় বিড় করে কী বলছে মেয়েটা সে অবস্থাতেই। চিন্তাস্বামী আর আমি দু'জনেই কান পাতলাম।—শুনি মেয়েটি বলছে—আমার ছেলে কোথায়? আমার ছেলে?

বলেই সে আবার নিঃসাড় হয়ে গেল। চিন্তাস্বামী তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে—তোমার ছেলে ভাল আছে। তুমি ভেবো না।

কিছুক্ষণ কোনো শব্দ শোনা গেল না। রোগিণীর শরীরে কোন নড়াচড়ার লক্ষণও দেখা গেল না। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। হঠাৎ শুনি মেয়েটি আবার বিড় বিড় করে বকছে।

চিন্তাস্বামী বললে—ঘোর বিকার জ্বর, আশা বড় কম।

আমি কিন্তু কান পেতে রইলাম তার কথাগুলো শোনবার জন্যে। কতকগুলো স্বগতোক্তি যেন বার হয়ে আসতে চাইছে।

শুনলাম সে ক্ষীণ ভেঙ্গা গলায় বলছে—বাছা আমার তোর কাছে আমার অপরাধের শেষ নেই। সে শয়তানটা কতো কষ্ট তোরে দিয়েছি বাপ আমার। আমার সর্বনাশ করেছে অপমানের ভয়ে সেই আমাকে ঘর ছাড়া দেশ ছাড়া করেছে। অথচ আমার অপরাধটা কী বল? অমন অসুরের মতো তোর বাপকে লোক লাগিয়ে গুম খুন করে পাথর বেঁধে সমুদ্দুরে ফেলে দিল। আমি সব খবর পেয়েছি। বাড়ীর চাকরের বৌকে হাতের মুঠোয় পেয়ে শকুনির মতো মাংস ছিঁড়ে খেয়েছে শয়তানটা।

মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(একটি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক)

দক্ষতা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতেছে

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং-এর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়

হেড অফিস :

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩

শাখা সমূহ :

মিশন রো, উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা, খড়্গপুর,

কোচবিহার এবং আলিপুর দুয়ার।

তুই তখন কতো কষ্ট পেয়েছিস বাছা আমার। আমাকে তুই কতো শাপ দিয়েছিস। তোর বাপের কতো সখ ছিল তোর মুখ দেখবে। আমি তোর বাপকে হারিয়ে তোর আসার জন্যে দিন গুনছিলাম। কিন্তু তুই যেই ছ'মাসের হলি অমনি মহাপাতকী চণ্ডাল আমাকে বাড়ী থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে। অপবাদ দিলে আমায় নষ্ট মেয়েমানুষ বলে। নেকড়েগুলো ওৎপেতে আমার পেছনে পেছনে ঘুরতে লাগল আমার মাংস খাবার জন্যে। আমি ঘোরে ঘোরে ভিক্ষে করেছি। পেটের জ্বালায় গাছের পাতা চিবিয়ে খেয়েছি, তবু আমায় দয়া করেনি। শেষে বাপ আমার, তোকে বাঁচাতে বাধ্য হয়ে আমি আমার দেহ বেচলাম। টাকা নিয়ে দেহ বিক্রী করেছি সেই নেকড়েগুলোর কাছে, কেবল তোকে বাঁচাব বলে। ভেবেছিলুম খেয়ে পরে কিছু বাঁচিয়ে চলে যাব সিলোনে। সেখানে তো আর কেউ আমায় চিনবে না। দুশো টাকা যোগাড় করতে আমার মাংস কেটে কেটে আমি শকুনিদের খাইয়েছি। ওঃ সে যে কি যন্ত্রণা!

মেয়েটা হেঁচকি তুলল দু'একবার, তারপর চুপ করে গেল। চিন্তাবাবী তার মুখে একটু গুকোজ গোলা জল জোর করে চামচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিলে।

একটু পরে আবার সে সেই রকম হাত দিয়ে বিছানার পাশ হাতড়াতে লাগল। বাছা আমার, মানিক আমার, কোথায় গেলি বাপ আমার।

চিন্তাবাবী আবার তার কানের কাছে মুখ এনে বললে—তোমার ছেলে পাশের ঘরেই আছে, ঘুমোচ্ছে। সে ভাল আছে ভেবো না।—

মেয়েটা আবার সেই রকম অজ্ঞান অবস্থার মধ্যে ডুবে গেল। কিছুক্ষণ পরে শুনলাম সে আবার বিড় বিড় করে বলছে—উঃ কী যন্ত্রণা! ছোঁড়তে যে আর পারছিনা রে। ওরে রাক্ষস, ওরে শয়তানের বাচ্চা, আমার পেট থেকে বেরিয়ে আয়। ঐ পুলিশ আসছে। ধরে ফেললেরে। উরে বাবা, কী অসহ্য কষ্টরে। লোকগুলো সব চলে গেল আমায় একলা ফেলে।

আবার সব চুপচাপ। কিছুক্ষণ চুপ করার পর মেয়েটা হাত কিড়মিড়িয়ে উঠল—তুই বাঁচ, আমার সমস্ত পরমায়ু নিয়ে তুই অক্ষয় হয়ে বেঁচে থাক। শোধ নেবার জন্যে তুই বেঁচে থাক। ঐ যে শয়তানটা আমার হাতের চাকা সরিয়ে আমার মুখ দেখছে আলো ফেলে, ওকে তুই চিনে রাখ। ও তোর বাপকে খুন করেছে, তোর মাকে নষ্ট করেছে। ওকে তুই কক্ষণো ক্ষমা করিসনে। যে দেশ, যে সমাজ আমাকে কুকুরের মতো খেদিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে—একডেলা ভাতও খাবার জন্যে দেয়নি, সে সমাজকে তুই কক্ষণো ক্ষমা করিসনি। যে লোকগুলো নেকড়ের মতো তোর মায়ের মাংস ছিঁড়ে খেয়েছে তাদের কক্ষনো ক্ষমা করিসনি। ঐ সব লোকগুলোর ওপর শোধ নেবার জন্যে তুই বাজের মতো কঠিন হয়ে বেঁচে থাক।—

মেয়েটার গলার থেকে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ বার হতে লাগল। দু'বার হেঁচকির মতো হল। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে নার্সকে খবর দিলাম। নার্স এসে তার মুখের ওপর অক্সিজেনের কানেলটা খুলে দিলে। বললে আর হয় ঘণ্টা দুই। মেয়েটা মরবার আগেই আমি বাড়ী ফিরলাম। কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারলাম না তার সেই কথাগুলো—সবার ওপর শোধ নেবার জন্যে তুই বজ্রের মতো কঠিন হয়ে বেঁচে থাক।

———

যখন দখিন হতে

শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

সহজ সোজা পথ কিছু দুর্গম বন্ধুর। নিরাপদ বাঁধানো পথ চলে এঁকেবেঁকে ঘুরে ঘুরে, বাধাকে ডিঙিয়ে নয়, বাধাকে পাশ কাটিয়ে। জীবনের পথের মতোই তার বিচিত্র গতি। জীবনে যেমনও না বেঁকিয়ে সোজা চলতে চাও, নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে চল। চোখ বুঁজে চলতে চাও, আঁকা-বাঁকা নিশ্চিন্ত পথ আছে সমাজের, জনতাকে অনুসরণ কর। মুসুরির লাল টিব্বা থেকে নামবার সময় আমার এইসব কথা মনে আসছিল। পরিচিত পথ ছেড়ে দিয়েছিলুম বলেই মনে আসছিল। একটু তাড়াতাড়ি নামব, একটু কম পথ হাঁটব, এই আশায়। হঠাৎ যখন ছায়া নামল পথের উপর, সায়াহ্নের ছায়া, অথচ পথের শেষ দেখা যাচ্ছে না, তখনই মন গেল প্রকৃতির কাছ থেকে সরে, চিন্তার ধারা ভাবনার পথ বেছে নিল।

লাল টিব্বার মাথায় যখন উঠেছিলুম, পশ্চিমাকাশে সূর্যাস্তের বিজ্ঞাপন তখনও দেখা দেয়নি, লাল বর্ণ বিভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি চারিদিকের পরিবেশ। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে প্রকৃতির সেই রূপ দেখা যাবে। কিন্তু তারপর? তারপর একটি নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা, অন্ধকার দুর্গম। এই উঁচু পর্বত-চূড়ায় আজ কোন ভ্রমণবিলাসী ওঠেনি, উঠবে কিনা তাও জানি না। যদি না ওঠে, তাহলে আমার স্বপ্ন হবে বিভীষিকায় পরিণত। একা এই নির্জন পাহাড়ে আতঙ্কে কণ্টকিত হব। সূর্যাস্ত দেখার জন্য তাই অপেক্ষা করিনি। দেখেছি বহুদূর দিগন্তে কেদারনাথের উদার বিস্তার। ভারতের মুক্তিলোভী অগণিত নরনারী ঐ পাহাড়ে উঠে প্রতি বছর, দেবতার দর্শনের আশায় জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য মনে করে। আমি লাল টিব্বার শিখর থেকে কেদার বদরীর শোভা দেখলুম। এক রকমের অদ্ভুত তৃপ্তিতে মন ভরে গেল। আমি দেখার জন্য পা বাড়িয়ে দিলুম।

পাহাড়ে উঠবার আগে শুনেছিলুম, একটা চোরা পথ আছে। পাহাড়ী লোকেরা সেই পথেই ওঠা-নামা করে। পথ সংক্ষেপ হয়, সময় কম লাগে। ওঠার সময় পরিশ্রম বেশি লাগলেও নামতে মন্দ লাগে না। বৈচিত্র্যের লোভে আমি সেই পথ ধরেছিলুম। নিজের ভুল বুঝতে পারলুম অন্ধকার নামবার পর। পাহাড়ে দেখছি অন্ধকার ধীরে ধীরে নামে না। পথের ধারে ওৎ পেতে লুকিয়ে থাকে, শিকার দেখে লাফিয়ে পড়ে। আমার উপরেও অন্ধকার তেমনই লাফিয়ে পড়ল।

আমি আশা করিনি যে এই পথে নূতন বিস্ময় লুকিয়ে আছে। রাত্রির সঙ্গে পরিচয়টা এমনই আকস্মিক যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি সহজভাবে কথা বলতে পারিনি। মনে হয়েছিল, এই পাহাড়ের মাথায় আমি কোন স্বপ্নরাজ্যে পৌঁছে গেছি। সে লাল টিব্বা আর ল্যাণ্ডর বাজারের মাঝখানে একটা কল্পনার রাজ্য। তা না হলে এই সন্ধ্যার অন্ধকারে উঁচু নিচু বন্ধুর পথে অতখানি চলবার পরে সে মেয়ে কোথায় হারিয়ে গেল— তার সঙ্গ তো মিথ্যা নয়। তার আলাপও নয় কল্পনা। তবে সে কেন হারিয়ে যাবে। কেন আমার তাকে মুসুরির রাজপথে খুঁজে পাব না।

স্মৃতিকে আমি দেখতে পাইনি। তার কথা শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম। পথের ধারে একটা পাথরের উপর এসে সে বিশ্রাম নিচ্ছিল। কিংবা আকাশ পাতাল ভেবে উতলা হয়েছিল। এ পথে যে আসেনি, সে নিশ্চয়ই একবার ভয়ের কথা ভাববে। এ পথ ভুল নয় তো, স্যাণ্ডর বাজারে গিয়ে পৌঁছবে তো। না কোন অজ্ঞাত দেশে নিয়ে যাবে, কিংবা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে না। জগতে এমন অনেক পথ তো আছে যার শেষ নেই।

স্মৃতি যে আমাকে দেখে খুশী হয়েছিল তা তার প্রশ্ন শুনেই বুঝেছিলুম। উঠে দাঁড়িয়ে জানতে চেয়েছিল স্যাণ্ডরে নামছেন বুঝি।

আমি চমকে থেমে পড়েছিলুম। তাকিয়ে দেখলুম মেয়েটিকে। বয়স হয়েছে, কিন্তু দেহ নীর্ণ। কাশ্মীরী শালে তার স্বাস্থ্যের অভাব ঢাকা পড়েনি। তেমনি ঢাকা পড়েনি তার বিষণ্ণ রূপ। মুখের দিকে চেয়ে থাকলে অশোভন হবে, তাই তাড়াতাড়ি উত্তর দিলুম ভুল করেছি, এ চোরা পথে না এলেই ভাল হত।

স্মৃতি ইংরেজীতেই কথা বলছিল, তাহলে আপনার সঙ্গে কী করে দেখা হত।

তারপরেই লজ্জিতভাবে বলল, আমি যে পথ হারিয়ে বসে পড়েছিলুম।

আমিও বসে পড়তুম।

কেন?

মনে হচ্ছে, ভুল করেছি। এ পথ কোথায় পৌঁছবে জানি না।

সামনে পা বাড়িয়েও স্মৃতি থেমে গেল। বলল: তবে কি ফিরে যাব?

কেরা সহজ কাজ হলে তাই করতুম। ওপরে আর উঠতে পারব না।

কিন্তু—

তার বেশি আর ভাবতে পাচ্ছিনে। যখন পা চলবে না, আমাকে বলবেন। বসে পড়ব। গল্প করেই রাত কাটিয়ে দেব।

সেই ভাল। দুর্ভাবনা ভেবে আমিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

বললুম, তাহলে ভালই হল। আমরা অন্য গল্প করি।

উঁচু নিচু পাথুরে পথের উপর দিয়ে আমরা সাবধানে নামছিলুম। একটু অসতর্ক হলেই বিপদ। তবু আমাদের মুখ বুঁজে হাঁটতে ইচ্ছে হল না। স্মৃতি বলল: শীত এখনও বেশি পড়েনি।

এ যে গল্প নয়। ভদ্রতার কথা। তা বুঝি। তবু বললুম: ওভার কোটের ভার বইতেই থেমে উঠছি।

বর্ষা কিন্তু অনেকদিন আগে শেষ হয়েছে।

মাঝখানে যে দুটো ঋতু—শরৎ আর হেমন্ত।

স্মৃতি যে আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে, তা আমি বুঝতে পারছি। তাই তাকে নূতন কিছু বলবার সুযোগ দিলুম না। বললুম: আপনি বুঝি এখানে অনেকদিন আছেন?

অনেকদিন—না না, বেশিদিন আর কোথায়।

এ কথায় কিছুই বোঝা যায় না। তবু অন্য কথা বলতে হয়: কোথায় উঠেছেন?

একটা হোটেলে।

কিন্তু কোন্ হোটেলে, স্মৃতি সেকথা বলল না। আমার মনে হল নিজের প্রসঙ্গ সে এড়িয়ে চলতে চায়। তবু আমি জিজ্ঞাসা করলুম : কিছুদিন থাকবেন তো ?

দেখি।

এবারে কী প্রশ্ন করি। কী নাম, কোথা থেকে এসেছেন এই সব ? না, কাল কোথায় আপনার দেখা পাব, আজ আমার সঙ্গে যাবেন কিনা ! বয়স আমারও হয়েছে। আর সেইজন্যই বোধ হয় নিঃসঙ্গ জীবন আর ভাল লাগছে না। কিন্তু ওই মেয়েটা সঙ্গী চায় না। নিঃসঙ্গ জীবনের জন্যে এখনও তার লোভ আছে। বললুম, সমতলে হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। ভাল লাগছিল না। কয়েকটা দিন পাহাড়ে কাটাব বলে এসেছি।

কেন ভাল লাগছিল না, সেকথা স্মৃতি জানতে চাইল না। আমিও তাকে বলতে পারলুম না। বলা যায় না। বয়স কম হলে বুঝি দুর্বলতার কথা সহজে বলা যায়। দুর্বলতা যখন লজ্জার জিনিস, স্মৃতি বলল : পাহাড় বুঝি আপনার ভাল লাগে ?

পাহাড়ে মানুষের সঙ্গ যে আরও ভাল লাগে, সেকথা মুখে আটকে গেল। বললুম, এখানে জীবনের আস্বাদ কিছু পাওয়া যায়।

স্মৃতি আমার মুখের দিকে তাকাল, তার পরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করল পথের পাথরে।

কথা না বলে কতক্ষণ আমরা নেমেছিলুম জানিনে। স্মৃতি কথার উত্তর দেয়, কিন্তু তার মন সাড়া দেয় না। গল্প করার উৎসাহ আমি হারিয়ে ফেলেছিলুম।

সহসা স্মৃতি বলল : আমরা ঠিক পথেই নামছি তো ?

জানিনে।

সত্যিই জানেন না ?

আজ প্রথম এ পথে চলেছি।

পথের উপর অন্ধকার আরও ঘনিয়েছে। ভাল করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। খাদের দিক থেকে শিরশিরে বাতাস আসছে, আর অল্প অল্প কুয়াশা। অল্পক্ষণ পরেই সব কিছু অন্ধকারে একাকার হয়ে যাবে। পৃথিবীতে তখন আর কেউ থাকবে না। শুধু আমি আর স্মৃতি। সেই আশংকাতেই স্মৃতি বিচলিত হল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বলল : আপনি বড় ধীরে চলেন।

পা ভাঙবার ইচ্ছে নেই।

তাড়াতাড়ি চললে কি পা ভাঙবেই ?

ধীরে চললে সে ভয় খুবই কম।

কিন্তু অন্ধকার গভীর হলে যে পথ চলাই দায় হবে।

রাতটা না হয় বসেই কাটাব।

শীত। শীতে যে জমে যাব, তাতে কি সন্দেহ আছে ?

স্মৃতি যে ভয় পেয়েছে তাতে আমার সন্দেহ নেই। বললুম একটু ধীরে চলুন।

আপনি সিগারেট খান ?

না। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?

আমি বেসলারের কথা ভাবছিলুম।

ও।

স্মৃতি বলল : পুরুষ মানুষের সিগারেট খাওয়া উচিত।

এখন থেকে খাব ভাবছি।

হঠাৎ একটা আর্তনাদ করে স্মৃতি দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যস্ত ভাবে আমি বললুম : কী হল ?

সামনে দিয়ে সর সর করে কী চলে গেল।

আমারও দৃষ্টি পথে নিবদ্ধ ছিল। বললুম : কিছু না, ও একটা গাছের ছায়া। হাওয়ায় পাতা দুলছে, তারই শব্দ।

স্মৃতির বোধ হয় বিশ্বাস হল না। বলল, আপনি দেখতে পাননি।

যা দেখতে আমাদের কারও ভুল হল না, সে কয়েকটা আলো। একটা বাঁক ঘুরতেই সেই আলো চোখে পড়ল। আনন্দে স্মৃতি আত্মহারা হল : আলো দেখেছেন ?

দেখেছি।

ঐ তো ল্যাণ্ডরের আলো। আপনি শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছিলেন।

বললুম : বেশ তো এবারে সাহস দেব। চীনাদের ঐ রেস্তোঁরায় চলুন।

বড় রাস্তায় পৌঁছে স্মৃতি এ কথার উত্তর দিল। বলল : আপনি তো রেস্তোঁরায় বসবেন। আমি চলি।

বলে হাত জুড়ে নমস্কার জানাল। তারপর আর অপেক্ষা করল না। আমি তার চলার দিকে চেয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলুম।

স্মৃতি আমাকে তার নাম বলেনি, তার পরিচয়ও দেয়নি আমাকে। নূতন এক অতিথির কাছে আমি ঐ নাম জেনেছিলুম। তিনি এসেছিলেন স্মৃতির খোঁজ করতে। সব শুনে আমি বলেছিলুম, স্মৃতিকে আমি চিনি। তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, ঘনিষ্ঠতাও হত। কিন্তু—

হোটেলের ম্যানেজার বললেন, তিনিও তাকে জানেন।

আরও অনেক বোর্ডার তাঁকে একই কথা বলল। কিন্তু কেউই বলল না যে তার সঙ্গে পরিচয় অন্তরঙ্গ হয়েছে। আমি কি আমার অভিজ্ঞতার কথা অকপটে বলতে পারি ? হয়তো তা উচিত হবে না। নূতন অতিথি হয়তো স্মৃতিকে ভুল বুঝবেন। তাতে আমার দাম নেই, কিন্তু ক্ষতি হবে তাঁদের দুজনেরই। গোলাপ যখন পাইনি, তখন শুধু কাঁটা কেন অন্যের হাতে তুলে দেব।

দুপুরের আহারের পর দক্ষিণের খোলা বারান্দায় এসে বসেছিলুম। হোটেলের এই বারান্দার একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আছে। মসুরির মিঠে রোদে সারাদিন ভরে থাকে। হোটেলের সামনে ফুলের বাগানে আমরা বসি না। গাছে গাছে ছায়াচ্ছন্ন সে বাগান। রোদ আসে লুকোচুরি খেলার মতো। যারা আড়াল ভালবাসে, তারাই গিয়ে সেই রোদে বসে। আমার লুকোচুরির কোন প্রয়োজন নেই, আমি তাই দক্ষিণের বারান্দায় বসে মসুরির উত্তাপ উপভোগ করি।

এরপরে আর বড় বাড়ী নেই। মসুরির পাহাড় স্তরে স্তরে নেমে দেরাদুনের সমতলে গিয়ে মিশেছে। কিনক্রেগে নামবার পথটা ডানদিকে। বিচিত্র বেশবাসে সজ্জিত নানা রঙের নরনারী নিরন্তর এই পথে আনাগোনা করছে। নিচের ঝর্ণার জলে ধোপার মেয়েরা এখন ব্যস্ত। কাপড় কেচে কেচে রোদে শুকোতে দিচ্ছে।

হেমন্তের দিনগুলি এখন আসন্ন ভরা। প্রকৃতির রস এখন মদের মতো আবহাওয়ায় ছড়িয়ে আছে। যে মানুষগুলো চাঁদির গ্লোতে কলের মতো কাজ করে, পাহাড়ে এসে তারাও মাতাল হয়। ক্ষণকালের জন্ত বস্তুকে বাদ দিয়ে দেহাতীত তৃপ্তি লাভ করে।

লম্বা বারান্দার একপ্রান্তে আমি হোটেলের ম্যানেজারকে দেখতে পেলুম। ম্যানেজার স্থূলত শাঁসালো স্থূল দেহ তাঁর নয়। মাথায় চুল পাকিয়েছেন, কিন্তু দেহে মাংস লাগতে পারেননি। গরম জামা-কাপড়ের ভারে সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকেই চলেন। এই সময়টায় বোধহয় তিনি সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কুশল প্রশ্ন করেন। হোটেল ভাল চালাতে হলে এসব দরকার। কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে নমস্কার ও শিষ্টাচার বিনিময় করে আমার কাছে এলেন। বললেন: আজকের রোদটি বেশ মিষ্টি, তাই না?

আমার পাশের চেয়ারটি ফাঁকা ছিল, সেটি এগিয়ে দিয়ে বললুম: প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বলে একটু বেশা লাগছে।

ম্যানেজার বললেন, মনে হয় আমাকে দেখেই বোধহয় বললেন। কিংবা নূতন বোর্ডারের কাছে একটু বেশি সময় খরচ করেন। বললেন: মাঝরাতে পাহাড়ে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। রোদটা তাই এত মিষ্টি। লোকে বলছে কেমটি কলন জলের তোড়ে আজ উত্তাল হয়ে উঠেছে।

সত্যি!

আমার কৌতূহল দেখে ভদ্রলোক খুশি হলেন। বললেন: একদিন দেখে আসুন না। বেশি দূর তো নয়। ভালো লাগবে।

যাব!

নিশ্চয়ই যাবেন। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

সহসা আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ল। তারও এখানে আসবার ইচ্ছা, ছুটির ব্যবস্থা হলেই চলে আসবে। আমি আমার ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছি। বললুম: প্রয়োজন হলে আর একটা ঘর পাওয়া যাবে?

ঘর?

আমার এক বন্ধু আসতে চাইছেন।

খুবই মুশকিল কথা। মুসুরিতে আমরা সাড়ে তিনশো হোটেলওয়ালা ঘর দিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। তবে আপনার জন্তে দরকার হলে ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।

এখানে এসে অবধি আমার পাশের ঘরটা বন্ধ দেখছিলুম। সেইদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম: এই ঘরটা বুঝি খালি আছে?

ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন: খালি।

আমি লজ্জা পেয়ে বললুম: না না, কাউকে যাতায়াত করতে দেখিনে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করলুম।

ভদ্রলোক আমার কথা মেনে নিলেন, বললেন: তা বটে। আমরাই তাঁকে দেখতে পাইনে। বেয়ারারা বলছিল, দরজার ভেতরে আর একখানা পর্দা লাগিয়েছেন। তারাও তাঁকে দেখতে পায় না।

সত্যি নাকি!

ম্যানেজার একবার চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন : একটু গোলমেলে ব্যাপার !

কী রকম ?

উৎসাহ পেয়ে ভদ্রলোক একটা রূপোর কৌটো বার করলেন। ঢাকনা খুলে বললেন : আসুন।

অর্থাৎ নিন, কয়েকটি লবঙ্গ।

সেই সঙ্গে যোগ করলেন : মুখটা পরিষ্কার রাখি। অন্ত নেশা না থাকলে দাঁতে কেটে সময়ও কাটে।

একটা তুলে মুখে ফেললুম, বললুম : মুখ জিনিসটা এমন যে সারাক্ষণ চালাতে ইচ্ছা করে। যে লোকটা নেশা করতে পারেনি, সে বেশি কথা বলে এই প্রাকৃতিক ধর্মের মর্যাদা রাখে।

একেবারে খাঁটি কথা। কোন নেশা নেই বলেই বোধহয় আমার বাজে বকার দোষ। চেষ্টা করেও চুপ করে থাকতে পারেনি। তার জন্যে বাড়ীতে কথা শুনতে হয়।

হেসে বললুম : ঘরে যাকে জবাব দিতে বারণ, সে তো দুর্ভাগা।

তা যা বলেছেন।

বলে ভদ্রলোক একবার সেই বন্ধ দরজার দিকে তাকালেন, আর একবার দেখলেন নিজের চারপাশটা। তারপর আস্তে আস্তে বললেন : কুমারী মেয়ে, কিন্তু বালিকা নয়। সামাজিক অনুশাসন মানলে অনেক কুমারীর জননী হতে পারতেন। দীর্ঘ শরীর ফ্যাকাশে রঙ। চোখের দৃষ্টি এমন তিরস্কারে ভরা যে কাছে ঘেঁষতে সাহস পাইনে। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি স্বল্পভাষী বলে কিছু বলতেও ভয় করে।

কেন জানি না, স্মৃতির কথা আমার মনে পড়ল। মনে হল লাল টিব্বার সেই অদ্ভুত মেয়েটি আমারই পাশের ঘরে থাকবে। কিন্তু কেন এমন লুকিয়ে থাকে। বললুম : ব্যাপার কী বলুন তো ?

সেইটেই বুঝতে পারিনে। কোনদিন সামনে পেয়ে কথা বলতে গিয়েছি—নমস্কার করে পালিয়ে গেছেন, বলেছেন, আপনার তো অনেক কাজ, আপনার আর সময় নষ্ট করব না। নিজে আমি কথা বলতে না পেলে হাঁপিয়ে উঠি, ঐ মেয়েটিকে দেখেও হাঁপাচ্ছি।

স্মৃতির সঙ্গে এই মেয়েটির বুঝি পার্থক্য কোথাও নেই। স্মৃতিও ঠিক এমনই করে আমার সামনে থেকে পালিয়ে গেছে। নিজের পালাবার প্রয়োজনের কথা বলেনি, বলেছে আমার প্রয়োজনের কথা। একে অসৌজন্য বলা চলে না, অথচ স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতেও দ্বিধা হয়। পাগলামি নয় অথচ সুস্থও নয়। এ এক ধরনের মানুষ, যারা পৃথিবীর জনতা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে চায়। মানুষের সঙ্গ তাদের ক্লান্তি আনে। কিন্তু এ মনোভাবের পিছনে একটা ইতিহাস থাকে। মানুষ অন্যেই মানুষকে দুঃসহ ভাবে না।

ম্যানেজারের কথায় আমার ভাল লাগছিল না। স্মৃতির ভাবনায় আমি হারিয়ে গিয়েছিলুম। হঠাৎ আমাকে অন্যমনস্ক দেখে ম্যানেজার লজ্জা পেলেন, বললেন : আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনি যে এত ক্লান্ত আমি বুঝতে পারিনি। ক্ষমা করবেন।

আমি তো ক্লান্ত নই !

কিন্তু ম্যানেজার সে কথা বিশ্বাস করলেন না। নমস্কার করে অন্য একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

অনেক রাতে আমি আমার নায়িকাকে দেখলুম। আকাশে তখন নক্ষত্রের সভা বসেছে নিস্তিত জগৎটাকে ঘিরে।

রাত কত হবে জানিনে, ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম এমনিই ভাঙে, আবার আসে। সে একটা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। পাশ ফিরে আবার আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার ঘুম এল না। এল অনেক আজগুবি চিন্তা। স্মৃতি এখন ঘুমাচ্ছে, না সেও জেগে আছে আমার মতো! ম্যানেজারের কথা যদি সত্য হয় তো সে ভারি অদ্ভুত মেয়ে। আমিও তো তাকে অদ্ভুত ভেবেছিলুম।

হঠাৎ আমার মনে হল, স্মৃতি ঘুমচ্ছে না, সে জেগে আছে। হয়তো ছটফট করছে কিংবা পায়চারি করছে ঘরের ভিতর। আমি আমার সমস্ত অনুভূতি একত্র করে উৎকর্ণ হয়ে রইলুম। হঠাৎ তার ছিটকিনি খোলার শব্দ পেলুম খট করে। স্মৃতি কি বাহিরে এল?

উৎকণ্ঠায় আমি বিছানার উপর উঠে বসেছিলুম, নিঃশ্বাস পড়ছিল ঘন ঘন। মনে হচ্ছিল, আমারও কিছু করা দরকার। একটা নিঃসঙ্গ মেয়ে, কেন কষ্ট হবে। আমি তো কিছু করতে পারি। কিন্তু পরক্ষণেই ম্যানেজারের কথা মনে পড়ল। সে কারও সঙ্গ চায় না, একা থাকতেই সে ভালবাসে, নীরব থাকতে।

ঘর আমার অন্ধকার। সেই অন্ধকারে মনে হল, চারিধারে দেওয়াল আরও কাছে সরে এসেছে, বড় সঙ্কীর্ণ হয়েছে পরিবেশ, ভারি অন্ধকারে নিঃশ্বাসে টান ধরছে। বাহিরে নিশ্চয়ই এমন গুমোট নেই, অসীম আকাশের নিচে হাল্কা বাতাস বইছে আকাশের। সেখানে গেলে আরাম পাব। বিছানা থেকে আমিও উঠে পড়লুম। গায়ে একটা গাউন চড়িয়ে দরজা খুলে বাহিরে এলুম।

সত্যিই স্মৃতি বাহিরে এসেছে! আলসের উপর হাত রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। স্মৃতিকে চিনতে আমার দেরী হল না। তার গায়ে সেই কাল শালখানা জড়ান ছিল।

আকাশে আজ একফালি চাঁদ, আর অসংখ্য নক্ষত্র। কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে চারিদিক! ঝিঝিরে ওঠা মনের মতো আবহাওয়ায় থমথম করছে! স্মৃতি কি দেখছে সেই জানে। দৃষ্টি তো ঘুরে যাচ্ছে না, বোধহয় ভাবছে কিছু।

সন্তর্পণে পা ফেলে আমি তার কাছে এগিয়ে গেলুম। কোথা থেকে একটু আলো এসে তার গালের উপর পড়েছে। মনে হল সেই গালে কিছু চিক্‌চিক্ করছে! স্মৃতি কি কাঁদছে!

তার ধ্যান ভাঙতে ভয় হল, ফিরে যেতেও পা উঠল না। স্থাণুর মত আমি দাঁড়িয়ে রইলুম! চোরের মত পরের আঙিনায় ঢুকেছি অসাবধানে। ধরা পড়ে সাজা পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বুক চিপ চিপ করছে। কিন্তু স্মৃতি কি ঘুমিয়ে পড়ল?

দূরে একটা ঘড়িতে ঢংঢং করে দুটো বাজল। সেই শব্দে স্মৃতি চমকে উঠল, স্বপ্নের জগৎ থেকে জাগ্রত জীবনে এল ফিরে। আমি আর দেরি করলুম না। সাহস করে এগিয়ে গেলুম। বললুম: ঘরে আজ বড্ড গুমোট, তাই না?

ইংরেজীতে আর কথা বলিনি, বলেছি বাংলাতেই। তার শাড়ী পরার ধরন দেখে তাকে চিনতে আমার ভুল হয়নি।

স্মৃতি চমকে উঠেছিল। কিন্তু চেঁচিয়ে পালিয়ে যায়নি নিজের ঘরে। আমার দিকে তাকিয়েই তার আতঙ্ক অন্তর্হিত হল। বলল: আপনি!

চিনতে পারছেন আমাকে?

এমনি অন্ধকারেই আমরা দুজনকে দেখেছিলুম। তখন দিনের আলোর উপরে সন্ধ্যার ছায়া

নামছিল। এখন রাতের অন্ধকারে জোৎস্নার উজ্জ্বল হয়েছে। স্মৃতি বলল: আপনিই তো কাল আমাকে পথ দেখিয়েছিলেন।

কিন্তু তখন কি জানতুম আমরা পাশাপাশি থাকি!

সে আমারই দোষ।

না না—দোষের কথা আমি বলছি না।

আমি বলছি। আমি আমার পরিচয় দিইনি।

একজন অপরিচিত মানুষকে নিজের পরিচয় আপনি কেনই বা দেবেন?

উপকার যে নিয়েছি। একটু কৃতজ্ঞতাও কি নেই।

দুজনেই কি দুজনার উপকার করিনি?

আপনি—

আমি কী?

একটু বেশি ভদ্র।

পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে এ কথা আর বলবেন না।

স্মৃতি হাসল। বড় বিষণ্ণ হাসি। আঁচল দিয়ে চোখের নিচেটাও এবার মুছে নিল। বলল: আপনার শীত করছে না?

তার চেয়ে ভাল লাগছে বেশি।

স্মৃতি আমার দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিতে আমি জিজ্ঞাসা দেখলুম। বোধ হয় এই ভাল লাগার কারণ জানতে চাইছে। বললুম: এসে অবধি কথা বলার সঙ্গী পাচ্ছিলুম না। নিজের ভাষার কথা না বললে প্রাণ বুঝি হাঁপিয়ে ওঠে।

আপনিও তাই মনে করেন?

আপনিও তাই করেন বুঝি? তাহলে ভালই হল। এবার থেকে—

স্মৃতির চোখের দিকে চেয়ে আমি থেমে গেলুম। সে চোখে কোন প্রশ্রয় নেই। তবু বলল: বেশ তো।

ভয় নেই। আপনার বিশ্রামের মুহূর্ত আমি বিঘ্নিত করব না।

আমার সঙ্কোচ দেখে স্মৃতি হাসল। বলল: বিশ্রামও বিরক্তির হয়। এখানে তো শ্রম নেই, শুধু বিশ্রাম।

সত্যি কথা।

পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই বলে আমিও বিশ্রাম সংক্ষেপের চেষ্টা করছি। আপনি আসবেন, সময়টা ভাল কাটবে।

তার পরেই হাত জুড়ে বলল: মাপ করবেন, অনেক রাত অবধি আপনাকে জাগিয়ে রাখলুম।

উত্তরের অপেক্ষা সে করল না। ত্বরিত পদে নিজের ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

হতবুদ্ধি-হয়ে আমি খানিকক্ষণ বাহিরে দাঁড়িয়েছিলুম, তারপরে নিজের ঘরে ফিরে এলুম অন্যমনস্ক ভাবে।

অলস অবসরে পরিচয় নিবিড় হয়, আমাদেরও হল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম: দাবা খেলতে জানেন?

স্মৃতি হেসে বলল : আমাড়ির মতো আমি সহজে মাৎ হই।

তখন আমার সাহস বেড়েছে। বললুম : তাতে লজ্জার কিছু নেই। আমার এক বন্ধু তার স্ত্রীকে বলে, ওতে গৌরব বাড়ে।

আপনাদের এক তরফা বিচার। আমরাও ও-কথা বলতে পারি।

স্মৃতি তার জীবনের অনেক কটা ধূসরাঙ্গ বসন্ত পেরিয়ে এসেছে। কিন্তু সে বসন্ত তার বিলাসে রঙীন হয়ে ওঠেনি। তার জীবন শিল্পীর হাতে একটা ধূসর রঙ ছিল। মোটা তুলিতে সেই বে-রঙটি তার সুন্দর রঙগুলিকে ঢেকে দিয়েছে ধূসর রঙে। স্মৃতি ইতিহাসে এম. এ. পাস করেছিল। চাকরি করছে উত্তর প্রদেশের একটা কলেজে। স্বাধীন জীবনযাত্রার স্বপ্ন সে তার শৈশবে দেখেছে। অনেকগুলো ছেলেমেয়ের আলাতনে তার মা যখন নিজের জন্যকে ধিক্কার দিতেন, স্মৃতি তখন নিজের কথা ভাবত। তার ভাঁড়ার ঘরের কাঁথা সেলাই আর রাতজাগা দেখে স্মৃতি নিজেকে এই রকম সংসার থেকে সরিয়ে নিত। ভাবত, নিজের জীবনে সে অন্যরকম পরিবেশ রচনা করবে। তাই তাকে তার পিতামাতাকে দুঃখ দিতে হয়েছে। পাণিপ্রার্থী হয়ে পুরুষেরা তার জীবনের দরজা থেকে গেছে ফিরে। কঠিনভাবে নির্দয়ভাবে অনেক স্মৃতি প্রত্যাখ্যান করেছে। আজ তার বয়স হয়েছে ত্রিশের কাছাকাছি।

অন্যমনস্কভাবে স্মৃতি তার ঘোড়াটাকে আমার ঘোড়ের মুখে বসাল। এ এক ধরনের বিষণ্ণ অন্যমনস্কতা, আফিঙের নেশার মতো ঝিমুনি। ঘোড়ার লোভ ত্যাগ করে ঘোড়েটা আমি বাড়িয়ে দিলুম। সামান্য জিনিসের উপর লোভ করে নিজের লোভের কেন অমর্যাদা করব! আলোর নিচে মুখোমুখি বসে আমরা দাবা খেলি। বাহিরে তারকিত আকাশ শুদ্ধ হয়ে দেখে, বাতাসে ঘুমের বিষ একটু একটু করে ঘন হয়। আমি তার জীবনের গল্প শুনি।

স্মৃতি বলে, নিঃসঙ্গটা মাঝে মাঝে অসহ্য বোধ হয়। মাঝে মাঝে ভাবি, ভুল করেছি কিনা। জীবনে যাদের জন্মের অধিকারে পেয়েছি, তাঁরা অনেক ছেড়ে গেছেন। যারা আছে তাদের হারিয়েছি সমাজের নিয়মে। এই রকমই তো হয়। বাপ মা ছেড়ে যান, ভাই বোন দূরে সরে যায়। এ নিয়ে দুঃখ করবার কিছু নেই।

এবারে স্মৃতি একটা ঘোড়ে বাড়িয়ে নিজের মন্ত্রীকে খুলে দিল আমার উটের মুখে। আমি আমার ঘোড়ে এগিয়ে তার মন্ত্রীকে ঢেকে দিলুম।

স্মৃতি বলছিল : আজ আমি একান্তভাবে একা। আমার শূন্যতা আমাকে তিলে তিলে গিলে খায়। আজ আমার অসুস্থ মন, রুগ্ন দেহ। শুধু বর্তমান দেখে আমার বিচার করলে আমার প্রতি অবিচার করা হবে।

স্মৃতি বেশ হাঁপাচ্ছিল, কাশলও দু-একবার, তারপর ঝিমিয়ে পড়ল।

বললুম, কী হল?

কিছু না।

স্মৃতি বিশ্রাম নিচ্ছিল। একটু সুস্থ হয়ে বলল : আমি মরতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু এক ডাক্তার আমাকে মরতে দেয়নি। সে বলে, আমার শরীরে কোন রোগ নেই, রোগ মাথায়।

ডাক্তার বোধ হয় ঠিকই বলেন।

না না, ঠিক নয়। ওতো আমার রোগের চিকিৎসা করে না, ও মনের চিকিৎসা করতে চায়। আপনিই বলুন, মনের আবার চিকিৎসা কিসের? আমি কি পাগল?

বাইরে শীতার্ত রাত্রি নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। তারায় তারায় সঞ্চারিত হচ্ছে দূরান্তরের বার্তা। দূরের অসীম ঘুমেই সে বাণী এখানে অর্থহীন। আমাদের তাসের খেলা অসমাপ্ত পড়ে রইল। আমিও উঠে গিয়ে আমার দরজা বন্ধ করে দিলুম।

আশা করেছিলুম, সকাল বেলায় স্মৃতি আবার আসবে। তাই আমি তাকে ডাকতে যাইনি; কিন্তু সকালের রোদ প্রখর হতে লাগল, স্মৃতি এল না। অসমাপ্ত তাসের ছক অনাবৃত পড়ে রইল।

ভাবলুম, এবারে খোঁজ করতে যাব কিনা। সেই সময়েই ম্যানেজারের শব্দ পেলুম। বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: আসতে পারি?

নিশ্চয়ই আসবেন।

ম্যানেজার কিন্তু একা এলেন না, এলেন আর একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে। বললেন: ডাক্তার গাঙ্গুলী আমাদের নতুন বোর্ডার, আপনার পাশের ঘরে থাকবেন।

পাশের ঘরে?

প্রসন্ন মনে ম্যানেজার বললেন: খালি ঘরে গেছে?

খালি ঘরে গেছে!

হ্যাঁ। ভোর ছটায় আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। পয়সা কড়ি মিটিয়ে দিয়ে তখনি নেমে গেলেন। বলেছিলুম, বাস তো সেই বেলা দশটায়। এত সকালে যাবার কী দরকার? উত্তর দিলেন, একটা দিনের ভাড়া কেন বেশি দিই!

এ কৈফিয়ত আমার বিশ্বাস হল না। মনে হল, স্মৃতি আমাদের ফাঁকি দিয়ে গেছে। আমি তাঁদের বসতে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম। ম্যানেজার একখানা চেয়ার ডাক্তার গাঙ্গুলীকে এগিয়ে দিলেন। বললেন: আপনারা গল্প করুন, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ডাক্তার গাঙ্গুলী বসে বললেন: স্মৃতি যে পালাবে আমি জানতুম!

তার নাম বুঝি স্মৃতি?

নাম বলেনি তো, ও ঐ রকমই। কারও কাছে পরিচয় দেয় না, ঠিকানা দেয় না কাউকে।

ডাক্তারকে বয়সে আমার চেয়ে ছোটই মনে হল, কিন্তু বলিষ্ঠ দেহ। চোখে মুখেও একই বলিষ্ঠ সংকল্পের ইঙ্গিত। বললেন: আমি তাকে অনুসরণ করতে পারতুম, কিন্তু আপনার জন্য আজ রয়ে গেলুম। ম্যানেজার বললেন, আপনার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল?

এ সময়টা আমার চুপ করে থাকতেই ভাল লাগত। কিন্তু ডাক্তারের অনুরোধে স্মৃতির গল্পটা সবটুকু বলতে হল।

সব শুনে ডাক্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন: তার একা থাকার সংকল্প গেছে ভেঙে, তাই এমন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

কেন?

একদিন যে তার গলা দিয়ে রক্ত উঠেছিল।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলুম। পাহাড়ের শীতেও মনে হল আগুন আছে।

কুমারসম্ভবম্

(বড় গল্প)

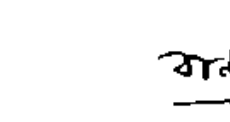

"অথোপাহিতে গিরিশায় গৌরী তপস্বিনে তাম্ররুচা করেণ।
বিশোষিতাং তাম্রমতো মধূচ্ছিষ্টবর্তিপুষ্করবীজমালাম্ ।"০০০০
—"ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥"

—কুমারসম্ভবম্—

তাম্ররুচি করে পার্বতী যে মধ্যাধিনীজাত পদ্মবীজমালা তপস্বী গিরিশের কণ্ঠে প্রদানে উদ্যতা ছিলেন, সেই মালা হরনয়নের কোপানলে ভস্মীভূত হয়েছিল একদা।

বিম্বফলতুল্য অধরবিশিষ্টা ঈষদ্রোষ্ঠ উমার নীল অলকমধ্যলোভী নবকর্ণিকা-মালার কোন মূল্যই সেদিন সে পায়নি। প্রাতঃসূর্যের ন্যায় রক্তবর্ণ বসনপরিহিতা, বকুলপুষ্পরচিত কাঞ্চীরামপরিশোভিতা, বসন্তপুষ্পশোভিতা গৌরী সেদিন যুবাই যোগাশ্রমে ধ্যানীর ধ্যানভঙ্গের নিমিত্ত আকৃতা হয়েছিলেন। যে মহেশ্বরের সর্পভূষণ, কৃষ্ণসারমৃগচর্ম উত্তরীয়, ব্যাঘ্রচর্ম আসন, সমাধিবজ্র ছদ্ম, তাঁর প্রসন্নতার নিমিত্ত তপস্যারি প্রয়োজন হয়।

পুষ্পধনু ভস্ম হয়ে গেলে কামকান্তা-রতিবিলাপ-মহাকবি কালিদাসের অনুপম কাব্যের চতুর্থ সর্গ রচনা করেছিল। বিরহিণীর সেই বিরহবিলাপ আজও বর্তমানে ভাসমান।

রতি বিরহবিলাপের পটভূমিকায় আর এক বিরহিণীর তপস্যার চিত্রে আমরা মুগ্ধ হই। বল্কলধারিণী গৌরী মৃগুত্বণ বিরচিত মেখলাধারণে কটীদেশ পীড়িত করে, কেশকলাপ জটাবন্ধরূপে জপমালা হস্তে অবশেষে নীলকণ্ঠের কণ্ঠলগ্না হবার অধিকার পান। শিলাশায়িনী সেই সুখদায়ী চারুহাসিনী উমাকে আমরা পঞ্চতপার সুকঠিন তপে নিমগ্না রেখে চলে আসি কোন আধুনিক মহাদেবের কাছে।

শাদা পাথরমণ্ডিত মেঝের উপর সাদা পাথরের একখানি জলচৌকী। সেখানে বিশালদেহী এক পুরুষ উপবিষ্ট। মধ্যবয়সী, অতি প্রচুর বলশালী। আতাম্র গাত্রবর্ণ, চুলগুলি কর্কশ। মনে হয়, বহুদিন তৈললেপনে অভ্যাস ছিল না।

নিরাঙ্গে প্রায় কৌপীনধারী তিনি। একজন চাকর দেহে সবেগে তৈল মর্দন করে দিচ্ছে। বাল্মীকিবীরের মতই দেহগৌষ্ঠব এই অতিক্রান্তযৌবন পুরুষের।

তিনি চোখ বন্ধ করে আছেন। বালারুণের আরক্ত দীপ্তি সম্মুখের বাগানের পদ্মবিলের জলে

খেলা করছে। বারান্দার লোহার রিলমিলির পাশে-পাশে অভিজাত ঝুলন্ত পাত্রে জংপুরী মীনা কাজ। সেওয়ালে টাঙানো তালুক-বাঘ-হরিণের মাউন্টকরা স্ত্রটী। কয়েকখানা প্রাচীন অস্ত্র।

পায়ে পায়ে বারান্দা পার হয়ে এসে শোবার ঘরে। ভোর চারটায় ছোটকুমার ওঠেন। কস্তুরী কাজ করা টীপয়ে ওঁর চায়ের ফুলদানিসেব। এমনি চাকর গৃহসংস্কারে লাগবে তিনি স্নানের ঘরে প্রবেশ করলে। নেটের শাদা মশারী ঝুলছে সত্য, কিন্তু বিছানাটি শক্ত। এই ঘরের অধিবাসীর যোগ্য বিলাসবর্জিত নয়। একটা মাত্র নীচু ছোট বালিশ, পাশবালিশ নেই। একহারা খাটে একজনের যোগ্য শয্যা।

তারপরে বসবার ঘরের পরদা ফেলা। ওখানে যাবার দরকার নেই। বড়মানুষের বাড়ীতে যেমন হয়, তেমনি একটা ঘর সাজানো। কোন বিশেষত্ব নেই সেখানে। সুতরাং অনর্থক পাতা উল্টিয়ে পাঠককে ফাঁকি দিতে পারব, কিন্তু গল্পটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে যে।

বসবার ঘরের ওপাশ দিয়ে ঘুরে এসে তবে একটি ছোট বারান্দা মেলে। বিরাট বাড়ীর দক্ষিণে হঠাৎ যেন নিজের খেয়ালখুশীতে মুখ বার করা ফুলনো বারান্দা একটি। এখানে দক্ষিণের অবাধ বাতাস বয়ে যায়। এখানেই যে ছোটকুমারের বেশীক্ষণ কাটে।

পূজার ঘর। হাঁা, বিশ্বিত হোয়ো না। গানের ঘর নয়, ছবি আঁকার ঘর নয়, লেখাপড়ার ঘর নয়। এখানে স্বর্ণখচিত সিংহাসনে বিশ্বপতিলক্ষিত। বক্তচন্দনের মর্মরে অতি বৃহৎ রূপোর পূজা-উপচার। থালাভরা ফুল-বেলপাতা, বাটীভরা চন্দন, ঘটীভরা গঙ্গাজল। পূজার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। অধিনায়ক আবৃত পূজারীর উদ্দেশে।

ঘরে মাত্র দুইজন মহিলা। বিধবা বড়রাণী, আর তাঁর ভাগ্নে বৌ সুরুচি। বড়রাণী দাঁড়িয়ে দেখছেন পূজার আয়োজন নিখুঁত হয়েছে কিনা। গৃহদেবতা শালগ্রামের পূজারী ব্রাহ্মণ কাজকর্ম সেরে রাখছেন। হাতে হাতে যোগান দিচ্ছে সুরুচি। অতএব স্নানাহ্নিক করে নিয়েছে সে এবং গরদের শাড়ী পরেছে। দীর্ঘ চুলের গোছা থেকে বিন্দু বিন্দু জল এখনও ঝরছে তার।

নধরমুখের শুভ্র-চিকন থান আঙুলে জড়াতে জড়াতে বড়রাণী বলেন, "আমার কি এখন এই সোমত্ত? সকালবেলায় উঠে এমন ছোটাছুটি করতে পারি না। ঠাকুরমশাই তবু করেকর্মে দেন, সুরুচি আছে। কিন্তু চোখ রাখতে হবে তো। একটু ত্রুটি হলেই রাগ। আজকাল এই যুগে পুরুষমানুষ এত পুজোআচ্চা নিয়ে থাকে জন্মে দেখিনি।" সুরুচি মামীশাশুড়ীর কথা শুনে নীরবে একটু হেসে তাঁর কথার মান রক্ষা করল। পূজারী বামুন ঘিন্‌মিন্ করে বলেন, "ঘরে দেখার লোক নেই ছোটকুমারের। কি করবেন রাণী মা? আপনার সন্তানতুল্য।"

বড়রাণী উত্তেজিত হয়ে বলেন, "তাইতো যায় আমার। হিমালয় থেকে কেরাতেও আমাকে যেতে হল। সেই দুর্গম সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম। সেখানে গেছি তাঁর আমার ছাইটাই মেখে বসে আছেন। এই জটা, গলায় তিনহাজি রুদ্রাক্ষের মালা। সে মূর্তি তো দেখেননি আপনারা। মা মৃত্যুঞ্জয়, ওই মূর্তি দেখলে সব পাপের বলে অতিকষ্টে শুকর মত নিয়ে চুল কাটাই, মালা খোলাই। তা, শাশুড়ী-মায়ের মুখ রক্ষা করেছি আমি। ছেলের হাতের আগুন তিনি পেয়েছেন।"

পূজারী বামুনের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আধঘণ্টা ঘটকার কোঁচায় হাত মুছে তিনি সায় দিলেন, "আপনার জন্যেই সব, রাণী মা। নইলে এত বড় রাজবংশে কোন উত্তরাধিকারী থাকত না। ভাগ্যি, আপনি ছুটে গেলেন।"

এঁরা গৌরবে নিজেদের 'রাজা-রাণী-কুমার' ইত্যাদি বললেও আসলে অমিয়ার মাত্র, তবে অর্থে-সামর্থ্যে রাজারাজড়া অবশ্যই।

বড়রাণী প্রশ্ন করলেন, "কেমন তো, আমাদের যেন সমস্ত যায়। মেজরাণী এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। কোন কাজে লাগে না। হিমালয়ে সঙ্গে যাবার কথা বলায় স্পষ্ট না করে দিল, 'ওই নীচের দেশে আমি বাপু, যেতে পারব না।' আমি গেলাম তাকে নিয়ে। আমরা হরুক নিতে পারি বটে, কিন্তু জলজ্যান্ত বংশধর থাকতে সেটা কি ভাল? এখন অবশ্য মেজরাণী একটি মাত্র কাজ করে আমাদের বাঁচিয়েছে। নানা কলকৌশলে আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে ছোটকুমারকে বিয়েতে রাজী করিয়েছে। তা-ও সেই শুকর পায়ে ধরে তবে। তিনি বলে দিয়েছেন, বিশবছর সংসার কর। তারপর ছেলের হাতে বিষয়-সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে আমার কাছে চলে এস। আমি ততদিন বেঁচেই থাকব।"

পূজারী বামুন বলে উঠল, "এখন পাত্রী মনোমত পেলেই হয়। এমন ঘরে—বরে—অভাব কি?"

বড়রাণী চিন্তিত ভাবে বললেন, "মনোমত পাচ্ছি কোথায়? বয়স হয়ে গেছে চল্লিশ। পাত্রীও বয়স্থা চাই। এত সম্বন্ধ আসছে। হয় কোষ্ঠী মেলে না, নয় রূপ মেলে না। হ্যাঁ, সুরুচি, তোমার সে জামুরত্তিকে দেখাবার কি করলে?"

এমন সময় বাইরেসে 'হর—হর—ব্যোম—ব্যোম' শব্দে তিনি ফিরে তাকালেন। ছোটকুমার স্নান সেরে উপস্থিত হয়েছেন। চোখ অতি জলদেকে আরক্ত, খালি পা।'

বড়রাণী সরে দাঁড়ালেন। সুরুচি ও পূজারী বামুন শশব্যস্তে বার হয়ে গেল।

ছোটকুমার পূজার আসনে ধ্যানে বসলে বড়রাণীও আস্তে আস্তে চলে এলেন। এখন পুরো দু'ঘণ্টা নিশ্চিন্ত।

এবারে মেজরাণীর মহলে চলি। সেখানেও ওই পাথরের জলচৌকী, কিন্তু কাপড় ছাড়বার ঘরে, খোলা বারান্দায় নয়। একপিঠ কালো চুল মেলে বিবস্ত্রা মেজরাণী ইঙ্গিতপাড় দিয়েই কাপড়ে বসে তেল মাখছেন। স্নানের ঘরে দাসী জলে গোলাপজল মিশিয়ে দিচ্ছে। এবারে জবাকুসুমের শিশিখোলা শিশি হাতে মেজরাণীর মিহি ঘুঘুরুরে চুলে তেল মাখাচ্ছে এক সমর্থ বাঙালী চাকর—কি নয়। মেজরাণীর খাস-চাকর।

মেজরাণীর তেলমাখা হয়ে গেল, উঠে দাঁড়ালেন তিনি। এখনও রূপী, এখনও রূপসী। স্নানের ঘরে যেতে যেতে চাকরকে হুকুম দিলেন, "ক্যাশ থেকে পঞ্চাশটা টাকা চেয়ে আনবো বাশরথি।"

বাশরথি মাথা চুলকে ফাঁকা সুরে জানাল, "মোটে পঞ্চাশ চাইছেন, মেজরাণী-ঠাকরুন?"

মেজরাণী ফিরে তাকালেন। সঙ্কীর্ণ তির্যক চোখে তাঁর কৌতুহল। এখনও সে চোখে ছোরাছুরির খেলা।

"ওঃ! তোমার দেশে পাঠানো কি আজই দরকার?"

বাশরথি কর্তা ঘুঁতির কোমরে জড়ানো লাল গামছায় হাত মুছে বলল, "এঁজে, আজ হলেই ভাল হত। টিন কিনে চালে না দিলে বর্ষা বাদলে সবলে ভিজে যাবে।"

"আচ্ছা, তা'হলে বেড়প চেয়ে আন। আমি স্নান করে রসিদ লিখে দেব, বোলো।"

বাশরথির মুখে চাপা ধূর্ত একটা আলো খেলে গেল। স্নান পর্ব শেষ হল মেজরাণীর, বাসমবাটা, সব মাখার পরে। এবারে দামী পেয়ার্স সোপ মাখালো, চুল মুছে দিল। অতঃপর সর্বাঙ্গলেপের প্রসাধন সুরু হল।

মেজরাণী তিন চার বছর বিধবা। যৌবনতা এখনও অস্তমিত হয়নি। বয়স দেহে যৌবনকে ধরে রাখবার দুরন্ত চেষ্টায় আরও প্রসাধনপরায়ণা হয়েছেন উনি। কি জন্য কে জানে? কার উদ্দেশে? 'কস্মিন দেবায় হবিষা বিধেম'? মন্দলোকের রসনা অতএব নিরঙ্কুশ।

বড়রাণী ঘরে ঢুকলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করে সারা ঘরে বিলাসের সুস্পষ্ট আয়োজন দেখলেন। তিনি সাত্ত্বিকস্বভাবা। কিন্তু মেজরাণীকে কিছু বলা চলে না। সোজাসুজি কাজের কথাটাই পাড়লেন,—"দেখ, যদি এখন বিয়ে থা কিছু ঠিক না হয়, হয়তো ছোট আবার উধাও হয়ে যাবে। একবার যখন রাজী হয়েছে, দেরী না করে কাজটা মিটিয়ে ফেলা ভাল।

মেজরাণী ধীরে-সুস্থে চুলে বাঁধানো হাতির দাঁতের চিরুণী বসাতে বসাতে বললেন, "তা, দিয়ে ফেল না। কে বারণ করেছে?"

"বেশ বল্লে তুমি। মেয়ে কোথায়? স্বামীর মনই আবার কোন্টা না মিললে নিষেধ করেছেন। যে ছেলে একবার সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল, তাকে বাঁধবার মোক্ষম স্ত্রী না হলে আরও প্রমাদ ঘটবে। এখানে ছবিগুলো দেখবার জন্যে ছোটর কাছে পাঠিয়েছিলাম। ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। বলেছে, 'বিয়ে যদি একটা করতেই হয়, যা ইচ্ছা ওঁদের দিন।' এর মানে যেমন তেমন বিয়ে একটা করে আবার চম্পট দেবে। তাই পছন্দসই মেয়ে একটি খুঁজছি, যে ওকে ঘরে বাঁধতে পারে।"

মেজরাণী বল্লেন, "ও যদি কারুর প্রেমে পড়ে তবেই হয়।" বড়রাণী গালে হাত রাখলেন, খুব কথা বললি। যে ছেলে যৌবনে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল, সে আবার কোন মেয়ের দিকে ফিরেও তাকাবে নাকি?"

"কেন তাকাবে না, শুনি? অমন যে মহাদেব, ওঁরও তো ধ্যানভঙ্গ হয়েছিল। সুরুচির তাম্বুরাটিকে এনে ফেলনা এখানে।" মেজরাণী সারা মুখে রূপটান মালিস করতে করতে রায় দিলেন।

সুরুচির তাম্বুরাটিকে আনা হ'ল। কিন্তু পরাস্ত মুখ নামিয়ে ফিরে গেল সে। বর তাকে ফিরেও দেখল না। আভাসে ব্যাপারটা বুঝে এটাই বিরক্ত হল যে, বড়রাণী জোর করতে সাহস পেলেন না। মেয়েটি বড়ো সুন্দরী নয়।

রাজকুমার হলেও, বিস্তীর্ণ সম্পত্তির মালিক হ'লেও এম. এ. পড়তে পড়তে যে ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল। তার করে ভক্তা সম্পূর্ণ সুকঠিন কাজ। বয়স অধিক হওয়াতে বয়স্থা পাত্রীও পছন্দমত পাওয়া যাচ্ছিল না। বংশে নিঃসন্তান বিধবা দুই ভ্রাতৃবধূর আশা ছোট দেওরটি। সে সংসারী হলে তবেই বংশে বাতি জ্বলবে। মেজ ছেলের অকাল মৃত্যুর পরে বুড়ো রাজীবা শয্যা নিয়েছিলেন। কোনমতে আশ্রমবাসী ছোট কুমারকে মায়ের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

সন্ন্যাসী-রাজা এক বিচিত্র সমন্বয়। ধ্যান ও পূজায় রোজ প্রায় ঘণ্টা চারেক ব্যয় করে বিষয়-সম্পত্তি তদারক করতেন। লেখাপড়ার চর্চা সন্ন্যাস জীবনেও অব্যাহত ছিল। তাতেও সময় যেত। দুই বৌদির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, আত্মীয়-স্বজন প্রার্থী কোনটাই বাদ দেওয়া চলত না। সন্ধ্যায় নিয়মিত গাড়ী করে বেড়াতে যেতেন। কিন্তু সমস্ত কাজকর্ম, চলাফেরার পটভূমিকা ছিল ওঁর ধর্ম।

সকালের পূজা অন্তে নীচে নেমে এলেন ছোটকুমার। বাহির বাড়ীতে এখন বিষয়-সম্পত্তি

ভয়ংকরী। ভাল লাগে না তাঁর। কিন্তু গুরুদেবের আদেশ অক্ষিত শয্যার মায়ের হাত ধরে পদপ করিয়ে নেওয়া—সমস্ত কিছুই বন্ধনে ফেলেছে তাঁকে।

বিশ বৎসর সংসার করতে হবে। ওঃ, কতদিন, কতদিন! সম্ভব নয়। তবে যদি এদিকের ব্যবস্থাটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, তবে নিশ্চয় আগেই তিনি চলে যাবেন। গুরুদেব অমত করবেন না।

বাহির বাড়ীর করিডোরের দেয়ালে পূর্বপুরুষদের তৈলচিত্র প্রলম্বিত। করুণ নয়নে তারা চেয়ে আছে তাঁরই দিকে। দৃষ্টি প্রার্থীর, মৌন অথচ বেদনা।

জীবন পুস্তকার পাতাগুলি সিক্তসৈকত চিহ্নিত। সেখানে অঙ্কিত হয়ে পড়ে সকল বস্তু—যশ, অর্থ, সামর্থ্য, ঔদার্যাহল্য। সর্বাপেক্ষা চঞ্চল আয়ু। সেই বিস্মৃতি সাগরে মানুষের কামনা বংশপরম্পরা সৃষ্টি করে নিজেকে অমরত্ব দেবার প্রয়াস পায়। বৈতরণী তীরেও মানুষ মরজগতের পিপাসায় ব্যাকুল হয় কিনা জানা নেই। তবে পরবর্তী ধারার কাছে সে চায়—ওই জলপ্রপুষ।

ছোটকুমার, অভিজাতবংশে জন্ম নেবার মাশুল তোমাকে দিতেই হবে। পূর্বপুরুষের ঋণ শোধ না করে সন্ন্যাস দুর্গে আশ্রয় নেবে কি করে?

তাম্রবর্ণ আরক্ত হয়ে উঠল কুমারের। গজদন্ত খচিত কাষ্ঠ পাদুকার গতি দ্রুত হল। ছবির শ্রেণী থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি 'মোহমুদ্গরম্' আবৃত্তি করলেন আপন মনে :—

"নলিনীদলগত জলমতি তরলম্
তদ্বৎ জীবনমতিশয় চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

বসবার ঘরে পদার্পণ করা মাত্র মাথা নুয়ে নমস্কার ম্যানেজার মশাই উপস্থিত হলেন—"ছোটকুমার, সেদিন কথকতা ভাল লাগেনি, উঠে চলে এলেন। আজ যাবেন? কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' হচ্ছে।"

ছোটকুমার পুস্তকার্পিত দৃষ্টি তুলে প্রশ্ন করলেন, "কোথায়?" "নিউ এম্পায়ারে।"

"ও সেই সিনেমাটা?" ছাত্রজীবন স্মরণে উন্মনা হলেন ছোটকুমার। ম্যানেজার মশাই তাড়াতাড়ি বল্লেন, "শহরের ভদ্রলোকেরা সকলে মিলে করছেন। উড়িষ্যায় বন্যাত্রাণের জন্য চ্যারিটি। টাকাটা সমস্তই ওখানে পাঠানো হবে।

বন্যাত্রাণের কথায় ছোটকুমার উৎসাহিত হলেন, "ভালো কাজ"। ম্যানেজার মশাইও উৎসাহিত হয়ে বলে চললেন, "ওঁরা আপনার কাছে টিকিট বিক্রী করতে এসেছেন। বিশেষ করে আপনাকে একবার যেতে বলেছেন। স্বামী পরমানন্দ আসবেন। ধর্মমূলক ব্যাপার কিনা, আগাগোড়া হেংডাবার।"

"বেশ। রেখে দিন টিকেট। দুখানা রাখবেন। আমি একা যাব না। আপনি সঙ্গে থাকবেন।"

"খ্যাঁ, কত টাকার রাখব? পঞ্চাশ টাকাই টিকিটের দাম সবচেয়ে বেশী।"

ছোটকুমার একটু চিন্তা করে বললেন, "বন্যাত্রাণে টাকা যাবে। একশো টাকা ভোলেক্স ফিলাথে দিয়ে দু'শো টাকার দুখানা টিকেট রাখুন। ভাল কাজ হচ্ছে।"

আমরা এখন প্রাচীন জমিদার বাড়ী ছেড়ে আধুনিক ফিল্মিলী পাড়ার পেক্ষাগৃহে উপস্থিত হই।

গরদের ধুতি পাঞ্জাবিপরা ছোটকুমারের পাশে সসম্ভ্রমে বসে আছেন ম্যানেজার মশাই। ওঁর পাশে উভোক্তাদের একজন। তিনি আবার ম্যানেজার মশাইএর বন্ধু।

আলো নিভল। পর্দা উঠল। ছোটকুমার তাঁর প্রিয় হিমালয়ের দৃশ্য দেখবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

মাইকে কম্পিত ভারী পুরুষ কণ্ঠ অবশ্য উচ্চারণ করে চলল সংস্কৃত ব্যঞ্জনা কালিদাসের মহাকাব্য থেকে—"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ"—কিন্তু কবির বর্ণনায় কুঞ্জরহস্তা সিংহ, গজমুক্তা সন্ধানী কেশরী-কিরাত, প্রেমপত্রিকারচয়িত্রী বিদ্যাধরী কিছুই দৃষ্ট হয় না। কীচক রন্ধ্রে শুধু বায়ু প্রবেশের বংশীধ্বনি শোনা গেল। তারপরেই মঞ্চে একদল উদ্দাম নৃত্যে আবির্ভূতা হরপরী দেখা দিল।

ছোটকুমার রোমকণ্টকিত চক্ষে ম্যানেজারের দিকে চাইলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "হিমালয়ের কিন্নরীদের দেখাচ্ছে।" ওপাশে বসেছিলেন স্বামী পরমানন্দ। তিনি সহাস্য সায় দিলেন। অগত্যা ছোটকুমার নিঃশব্দে সেই দৃশ্য দেখার যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগলেন।

লঘুদেহা হরপরীদের বস্ত্রও লঘু। নৃত্যলীলায় মুহুর্মুহু স্খলিত। ছোটকুমার মাথা নামিয়ে বসে রইলেন।

তারপরেই ব্রহ্মলোকে তারকাসুর বধে কুমার উৎপত্তির মন্ত্রণা সভা। ছোটকুমার এবারে মুগ্ধ হলেন।

অতঃপর—এ কে? কে এ?

দেবদারুতলে ব্যাঘ্রচর্মে সমাসীন মহাদেব। বীরাসনে ধ্যানমগ্ন মহাদেব। সত্তাগৃহদ্বারে বেত্রবতীধারী নন্দী। সম্মুখ পুষ্পবনস্পতি সেখানে প্রতীক্ষায়।

সেইখানে মূর্তিমতী উমা দেখা দিলেন—"পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা, সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা" সেই উমার অনুপম মুখে চন্দনের পত্রলেখা। পূজারিণী মূর্তি উমার, বিলাসিনী মূর্তি নয়। কজ্জলিত ভ্রমরগঞ্জন নয়নে আরতির শিখা, আরক্ত বিম্বাধরে ভক্তির স্নিগ্ধ সুষমা। হাতে পূজার্ঘ্য, পল্লবীজের মালা। ছোটকুমার শান্ত হয়ে দেখতে লাগলেন।

অবশেষে মদনদহন সমাপ্ত হ'ল। কম্পিতদেহা নিমীলিতাক্ষী উমার প্রতি ছোটকুমারের দৃষ্টি পড়ল।

তারপরে সেই অপরূপা ভক্তিমতী পঞ্চতপা তপস্বিনী। অতি কোমল দুধ দেহে বল্কল, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ, হস্তে জপমালা। কঠোর তপস্যায় বিশীর্ণা পার্শ্বতী, অনাবৃত শিলাতলে মহেশ্বরের আরাধনায় তন্ময়। দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় বিবর্ণদেহা সেই বিরহক্লিষ্টা তপস্বিনী। ছোটকুমার ঈষৎ চঞ্চল হলেন। রণোৎসুক কার্তিকেয়ের তারকাসুর নিধন ব্যাপার সম্পাদিত হলে "কুমারসম্ভবম্", সমাপ্ত হল। উমা পূর্ব্বেই মুক্তি পেয়েছিলেন।

ছোটকুমার উঠে দাঁড়ালেন। ম্যানেজার মশাই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, "একটু বসুন। ভিড়টা কমে যাক।" চঞ্চল হয়ে তিনি চতুর্দ্দিকে তাকাতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে দেখা দিলেন স্বয়ং উমা। তখনও বেশ পরিবর্ত্তন হয়নি। ম্যানেজার মশাইএর পার্শ্ববর্তী বন্ধুকন্যা তিনি, জানা গেল।

"প্রণাম কর মা, প্রণাম কর এখানে। লজ্জা কি? তুমি যেমন উমা সেজে অভিনয় করে এসেছ, ইনিও তেমনি সাক্ষাৎ মহা—মানে, অতি ধার্মিক ব্যক্তি।" বিচলিত কণ্ঠে ম্যানেজার মশাই বলে চললেন।

"যৌবনে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা অতিকষ্টে ধরে এনেছি। প্রণাম কর, মা।"

পদ্মাক্ষী তাঁর উজ্জ্বল কজ্জলিত দৃষ্টি সবিস্ময়ে মেলে দেখল প্রখর দীপ্তিশালী ব্রহ্মচারী পুরুষকে। অবনত হল সে, কবরীলগ্ন দুইফুলের দোদুল্যমান মালা লুটিয়ে পড়ল।

যুগান্তের বিস্মরণ জেগে করে বহু পুরাতন কবির লেখা বহু পুরাতন কাব্য শোনা গেল—একটু পূর্ব্বেই যে কাব্য অভিনীত হয়েছে, যে কাব্যের স্বাদে প্রেক্ষাগৃহ আচ্ছন্ন এখনও।

"উমাপি নীলালক মধ্যশোভি বিস্রংসয়ন্তী নব কর্ণিকারম্।
চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন মুক্তা প্রপাতং মুখমারুতস্য॥"

কূটবুদ্ধিসম্পন্ন পুরাতন ম্যানেজার একটু হাসলেন। বড়রাণী-মেজরাণীর অক্ষমতা দেখে তিনি নিজেই হাত লাগিয়েছেন।

অবশেষে 'পাণিগ্রীড়নবিধেরনন্তরং' যে পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ল, 'কুমারসম্ভবমের' অষ্টম সর্গ শিবসম্ভোগের সঙ্গে তার মিল সামান্যই।

নগরাধাধিতনয়ার আধুনিক শঙ্করকে পাবার জন্য প্রকৃত তপস্যা করতে হয়নি সত্য—তপস্বিনীর অভিনয় করেই সে নিজের কলাকুশলতায় পেয়েছে দুর্লভ বর। অবশ্য সুযোগ্য ম্যানেজার মশাইএর নির্দ্দেশে পুতুলনাচের পুতুলের মত পাত্রী অভিনয় করে গেছে আজন্ম। পিতা সহায় ছিলেন।

গঙ্গাস্নান করে পট্টবস্ত্রপরিধানের আরও একদিন আসতে হয়েছে মুক্ত প্রাঙ্গণে নিজের রূপবহ্নি উদ্দীপিত করে দেবিকারূপে। ম্যানেজার মশাই বলেছেন ছোটকুমারকে, শহরের কুমারী কন্যকা শিবরাত্রি পালনান্তে তাঁকে প্রণাম করতে চায়। ছোটকুমার দ্বিধাজড়িত সম্মতি দিয়েছেন।

গাড়ী করে গঙ্গার ধারে একদিন গেছে সে। নানা কৌশলে ম্যানেজার মশাই ছোটকুমারের সহযাত্রিণী করেছেন তাকে।

তারপরে পেচক গাম্ভীর্য্যে একদিন ম্যানেজার মশাই ছোটকুমারকে জানালেন যে, কুমারী কন্যা কালিঘাটের ভৈরব নকুলেশ্বর শিবলিঙ্গে মালা পরিয়ে ছোটকুমারকে পতিরূপে বরণ করেছে। সে অন্য কারুর গলায় মালা পরাতে পারবে না। ছোটকুমার স্তম্ভীর হয়ে রইলেন।

তারও পরদিন ম্যানেজার মশাই নিবেদন করলেন যে তাঁর বন্ধুকন্যা ব্রত উপবাসে শরীর ক্ষয় করে আনছে। কলেজের পড়া বন্ধ দিয়ে প্রহরে প্রহরে শিবলিঙ্গ গড়িয়ে পূজা করছে, আকন্দ-ধুতুরোর মালা পরাচ্ছে। লাজলজ্জা, পানাহারে রুচি নেই। পার্ব্বতীর দ্বিতীয় তপস্যা চলেছে।

ছোটকুমার বিচলিত হলেন।

অতঃপর বড়রাণী, মেজরাণী অশ্রু বিসর্জ্জন করতে করতে পূর্ব্বপুরুষের দোহাই দিয়ে, পার্ব্বতীর জন্য দয়া ভিক্ষা করে করে ছোটকুমারকে অস্থির করে তুললেন।

ছোটকুমার পূজার ঘরে ঘার দিয়ে শিবলিঙ্গের সম্মুখে ধ্যানে বসলেন। পিনাকপাণি কি আদেশ দিলেন অলক্ষিতে, জানা গেল না।

ছোটকুমার সম্মত হলেন।

আধুনিকী পার্বতীর চতুষ্পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্বলিত করে ও সূর্য্যাবর্ত্তদৃষ্টি হয়ে শিবকে যাচ্ঞা করতে হ'ল না। অতি সহজেই সে মহাদেবকে পেল। মদনদহন হল না, রতিবিলাপে কাননে বর্ষার জাগল না। হরপার্বতী মিলিত হলেন।

কিন্তু মহেশ্বরের ধ্যানভঙ্গ কুমার কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি হেতু। কোথায় সেই তরুণ স্কন্দ? নিত্য-নৈমিত্তিক দিনযাত্রা চলে ছোটকুমারের। ছোট ঘাটের পাশে অন্য ঘাট পড়ে। পূজার সদ্যনৈবেদ্য ওছিয়ে

প্রতি হাত দুভাবে
লাঙল ধরছে মাটির বুকে —
কঠিন ইস্পাতের ফলা ধরিত্রীর বুক
গভীর ভাবে কেটে চলেছে। ইস্পাতের
ট্রাক্টর উদ্বেল মাটি ফাঁক ধারণের জন্য
উন্মুখ হয়ে উঠেছে। পদ্ধতিটি পুরো-
নোর সন্দেহ নেই কিন্তু আজ নবীন
ইস্পাত এসে যোগ দিয়েছে
কৃষিকর্মে। পুরনো অজুর কাঠের
লাঙলের স্থান গ্রহণ করেছে
ইস্পাতের লাঙল। কম পরিশ্রমে
বেশী ফসল এনে দিচ্ছে চাষীর ঘরে।
শীঘ্রই ট্রাক্টরের প্রচণ্ড শক্তির
সাহায্যে মাটির বুক ভরে উঠবে
ফসলের প্রাচুর্যে। এই সমৃদ্ধি
চাষী-কর্মী নির্বিশেষে দেশের
জনসাধারণের জীবনধারণের
মান উন্নত করে তুলবে।
প্রত্যেকের জন্য আরও বেশী
ইস্পাত — এই একটি মাত্র
উদ্দেশ্য সাধনেই 'ইস্কো'র সমস্ত
শক্তি আজ নিয়োজিত।
আপনাদের সেবার মাধ্যমে সমগ্র
জাতির সেবা আমরা করছি ;
আমাদের গর্ব তো সেখানেই।

দি ইণ্ডিয়ান আয়রন
অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি
লিমিটেড

INDIAN ISCO STEEL

IIC-77 BEN

রাখেন ছোটরাণী নিজে। বড়রাণী নিশ্চিন্ত আরামে বিশ্রাম নেন, মেজরাণী বিলাসের মোতে ভেসে চলেন। সুরুচি সংসার দেখে। মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্ত ছোটরাণীর অখণ্ড অবসর।

রাজকুমার, তায় সন্ন্যাসী। তাঁর বিবাহ। অপরিসীম উৎসব ও আড়ম্বরে শিববিবাহের মতই তাৎপর্যপূর্ণ। বিবাহ বেশধারিণী কন্যা আয়তলোচনা পার্বতী অপেক্ষা কম মনোজ্ঞা ছিলেন না। মধ্যাহ্নের দীপ্তমূর্তি বর বিবাহবেশে মহেশ্বরের মতই মহিমমণ্ডিত রূপ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে 'কুমারসম্ভবমের' সুর বাজল কই?

আজ তাই ধন্-ধন্ করে বড়রাণী এলেন মেজরাণীদের ঘরে। বেড় হাত উঁচু গদির বিছানা ছেড়ে প্রৌঢ়াধিকা হেতু মেজরাণী সাদা মার্বেলের গড়াচ্ছেন শীতলপাটী ত্যাগ করে। ঘর অন্ধকার, সূর্যরশ্মির পথ রুদ্ধ। পূর্ণবেগে পাখা ঘুরছে।

"এস দিদি, বোস। গরমের জ্বালায় বাঁচিনে। বললাম, মশবার এবার গরমের আগে কখানা ঘর এয়ার কণ্ডিশান্ করে নাও। শুনলে না।"

বড়রাণী বিরক্ত হলেন, "হ্যাঁ, যে ধারে ঠেকেছি এখন—ও সমস্ত কথা আমার কানে ঢোকেই না।"

মেজরাণী স্ন্যাণ্ডেলের গন্ধ পেয়ে উঠে বসলেন, "কেন, কেন? আবার কি হল?"

বড়রাণী একখানা মখমলের চেয়ার টেনে বসলেন—"নতুন করে আবার কি হবে? হয়েই তো রয়েছে। সকলে মিলে হাতে পায়ে ধরে বিয়ে দিলাম। এখন কি করব? ছোটকুমার রাত্রে বারান্দায় শুচ্ছে।"

"নিশ্চয় গরমের জন্তে, দিদি। এতে ভাবনার কিছু নেই।"

"গরমের জন্তে না আরো কত? তোমার তো বিয়ে হয়েছিল বাপু, বশেখ মাসে। মেজ কি গরমের ভয়ে আলাদা শুতো?"

মেজরাণীর অধরে মায়াত্মক চাপা হাসি খেলে গেল পূর্বস্মৃতি রোমন্থনে। দুই জা কিছুক্ষণ পরামর্শ করে ভাগ্নেবৌকে ডাকলেন।

সুরুচি এল কোলা কোলা মুখ চোখ নিয়ে। ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ মামীশাশুড়ীর আহ্বানে ছুটে এসেছে। শিথিল বেশ, এলোমেলো চুল।

মেজরাণী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন, "এখন পাগলি সেজে এল যে বড়?"

সুরুচি মরমে মরে গেল। মেজরাণীর মুখে চিকন আভা, চুল সযত্নে বিন্যস্ত। মেজেতে গড়াগড়ি দিলেও কাপড়ের ইস্ত্রি অটুট। এখনি হয়তো চুল আঁচড়ে, মুখে ওটীন স্নো মেখে আসতে বলবেন।

কিন্তু বড়রাণী রক্ষা করলেন, "এখন বাজে কথা রেখে কাজের কথা বল। এখানে বোস। বলতো, ছোটকুমার আর ছোটরাণীর মধ্যে ব্যাপারটা কি? শুধু বিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিলে তো চলে না। আমরা সম্পর্কে বড়, খোলাখুলি জিজ্ঞেসও করতে পারি না।"

সুরুচি ঘুমকে ঘুমকে বলতে লাগল।

ছুটু খানসামা সকাল চারটের চা নিয়ে গেছে ছোটকুমার আর ছোটরাণী একা বিছানায়। চা রেখে এসেছে সে। তারপরে চা খেয়ে ওঁরা স্নান সেরে পূজোর ঘরে গেছেন। ছোটরাণী হাসিমুখে সন্নৈবেদ্য শুছিয়েছেন। কুমার পূজায় বসেছেন। কিন্তু আজকাল আর এসব দেখা যায় না।

ছোটকুমার বারান্দায় থাকেন, ছোটরাণী ঘরে। বেশীর ভাগ দিন পূজারী বামুন সাজায় সন্ন-নৈবেদ্য। ছোটরাণী একবার গেয়ে দেখেন মাত্র।

সুরুচি আবার বলল যে, তাকে নববিবাহিতার দশটার উপর চোখ রাখতে বলায় সে তা রেখেছিল। কামিনী কি বলেছে ছোটকুমার প্রথম কয়েকদিন বউকে নিয়ে খুবই মেতে উঠেছিলেন।

বাহিরের টানা বারান্দা আর ছোটকুমারের মহলের মধ্যে ঘেরানো তেলতেটের পর্দাটা প্রায়ই ফেলা থাকত। পুজোআর্চা ঠিকমত করলেও কুমার পড়াশোনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। সদর বাড়ীতেও বসতেন না বেশীক্ষণ। সবের মধ্যে কি হ'ত কামিনী জানে না। সে তো সবের খাস দাসী নয়।

বড়রাণী ভ্রূকুঞ্চিত করে সুরুচিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "খাসদাসী তো সৌরভী। ওকে জিজ্ঞেস করেছ?"

সুরুচি আমতা আমতা করে জানাল, না সেটা এখনও হয়নি।

"তবে তো তারী ঘেন্নেছ। ভাতো ওকে এখানেই।"

সুরুচি বেরিয়ে গেল। তারপরেই সৌরভীকে নিয়ে ঢুকল। এর মধ্যে চুলটা ঝাঁচড়ে, মুখে পাউডার বুলিয়ে এসেছে। হাল্কা গোলাপী কাজ করা একখানি পাটভাঙ্গা শাড়ীও পরে ফেলেছে।

বুকে ছাপা গাঢ়গোলাপী-ঝাঁকা কাপড় পরা দেহ ঠিতিয়ে দাঁড়াল সৌরভী, ছিটের জামা, হাতভরা রেশমী চুড়ি। চোখে কাজলটানা, টানেলগাঁথা খোঁপা ভর্তি বেলকুঁড়ি বাঁটা।

সৌরভী রিপোর্ট দিল, বিয়ের পরে কয়েকদিন দোর প্রায়ই বন্ধ থাকত শোবার ঘরে। কুমার বেরিয়ে গেলে সে ঘরে ঢুকে আলুথালু বেশভূষা ছোটরাণীর সামলে দিত। অবিশ্যি ছোটরাণীর নিজের কাজকর্ম নিজে করাই অভ্যেস। এখানে সৌরভী ঠোঁট উল্টালো। তখন নিত্যি নূতন সাজে সাজতেন ছোটরাণী। কুমার চেয়ে চেয়ে দেখতেন। এখনও রাণী সাজেন, কিন্তু কুমারের দেখার ফুরসত নেই। ঘরে বসে দিনকয়েক ছোটরাণীর গানবাজনা শুনেছিলেন। সন্ধ্যার পরে নিয়মিত বেড়াতে যেতেন। একদিন রাণীর পায়ের পাশে সিনেমা পর্যন্ত দেখেছিলেন। কিন্তু, কি জানি কি হ'ল দু'মাসের মধ্যে? দুজনের কেমন ছাড়া-ছাড়া ভাব।

তুমি রাণীকে সাজগোছাক পরিয়ে যাও তো ঠিকমত?" দুই রাণীর কড়া প্রশ্নে উত্তর দিল সৌরভী। হ্যাঁ, সে কোন ত্রুটি রাখে না। মেজমায়ের স্নটানটি নিয়মিত যাচ্ছে। সরষেতেও নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ছোটরাণীমা এতদিন জানেন যে তাঁর ওসব কিছুরই দরকার হয় না। বিলাতি প্রসাধনের দ্রব্যে টেবুল ভরে গেছে তেনার।

মেজরাণী গালে হাত দিলেন, "বল কি? ছোটরাণী অত ধরণের মেখে শুনেছিলাম?"

এবার সুরুচি মুখ খুলল, "আমি প্রায়ই যাই কিনা খবরাখবর নিতে। দেখি কত কি রোজ রোজ কিনে আনছেন উনি। অথচ বিয়ের সময় বাক্সে শুধু সিঁদুর আর আলতা দিয়েছিলেন ওঁরা।"

মেজরাণী বললেন, "তাই দেখেই তো স্নটানের ব্যবস্থা করলুম। সামনা-সামনি স্নো-পাউডার মাখলে ছোট হটে যাবে—। অবশ্য রূপযৌবনের টান না থাকলেও চলবে না। ওমা, ছোটরাণী এত জানে?"

সৌরভী ঠোঁট টিপে বলল, "তেনার সঙ্গে যে ভাঁটকী-কটাসে কি এসেছিল একটা, অষ্টমঙ্গল পর্যন্ত থেকে চলে গেল, সেটাই ফুলশয্যের দিন সিঁদি খেয়ে সকল ফাঁস করে দিয়েছিল। ছোটরাণীমাকে বাপের বাড়ী থেকে লিখিয়ে-পড়িয়ে সভ্যসাধীর বৌ-মত করে দিয়েছিল। আসলে উনি ভাবুনে।"

"তবে ছোট পালিয়ে বেড়ায় কেন?"

সৌরভী সবিনয়ে জানাল যে, একদিন ছোট রাজার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে তোমাকে অন্যরকম জেনেই বিয়ে করেছিলাম। তুমি এত সাধারণ জানতুম না। বড়রাণী প্রশ্ন করলেন, "তুই শুনলি কোথা থেকে? আর কি কি কথা হল? ছোটরাণী কি বল্লেন?"

সৌরভী উত্তর দিল, "আমি পোষাক কামরার দরজার আড়ে ছিলাম। কি সব সংস্কৃত কথাবার্তা বলতে লাগলেন ছোটকুমার—মহাদেব উমা—এই সব কথা। ছোটরাণী হেসে গড়িয়ে পড়ে বললেন, আগ, কি মহাদেব আমার! কই সে রং, কই সে রূপ? ছোটকুমার বার হয়ে গেলেন ঘর থেকে সোজা। খ্রাইভার বললো, দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী যেতে বলেছিলেন।"

"আচ্ছা, তুই যা। যখন যা শুনবি, তক্ষুণি এসে বলবি। সরকার মশাইকে বল আমার কাছ থেকে চিরকুট নিয়ে তোকে একটা শাড়ী দিতে।"

সৌরভী আহ্লাদে ডগমগ হয়ে বিদায় হ'লে আবার মন্ত্রণা সভা বসল। সুরুচি জানাল যে সত্যই দুজনের মধ্যে আর মিলমিশ নেই। ছোটকুমারের পূজা-আর্চ্চার সময় বেড়ে গেছে। উদাসীন ভাব দেখা দিয়েছে। অথচ বিয়ের পর কেমন বদলে গিয়েছিলেন।

বড়রাণী বললেন, "কপাল! সবি আমাদের কপাল! নইলে অলজ্যান্ত দু'দুটো স্বামীর এমন অকালে দুজনের বাসে কেন? কলিকেলে ছেলে হয়ে তাওরই বা সন্ন্যাসী হয়ে যাবে কেন?" মেজরাণী "আজকালকার কলেজে পড়া মেয়ে। গোড়াতেই কেমন তেজী তেজী ভাব দেখেছিলাম। কেমন করে পুরুষকে ধরে রাখতে হয়, মা শিক্ষা দিয়েও দেয়নি। ভাবে, ভাবে, সাজ-পোশাকে—"

"কিন্তু ছোট তো ও সমস্ত ভালবাসে না। শুনলে না ঝগড়া হ'ল? "তুমিও যেমন, দিদি। ওরকে কি ঝগড়া হয়? নরম হয়ে থাকেনি, কথা শোনেনি নিশ্চয়। তাই ঝগড়া।" মেজরাণী বড়রাণীকে জ্ঞানদান করলেন।

"কিন্তু, মহাদেব, উমা, এই ধরনের কথাবার্ত্তার মানে কি?"—

—বড়রাণী কিন্তু—কিন্তু করেন।

"মানে হচ্ছে উমা যেমন সর্বতোভাবে বিবাহের পরে মহাদেবের কথা পালন করেছে এ মেয়ে তা করছে না।"

অতঃপর মেজরাণী নিগূঢ় পুরুষচরিত্রের গোপন তথ্যসমূহ খোলাখুলি আলোচনা করলেন। ওই আলোচনা লিপিবদ্ধ করবার প্রয়োজন দেখি না। বড়রাণী জ্ঞানের আলোক পেলেন।

তারপরে বড়রাণী, মেজরাণী ও তাদের বউ সহ ছোটরাণীর মহলে উপস্থিত হলেন। ছোটকুমারকে এখন কমই সেখানে পাওয়া যায়। তিনি লাইব্রেরী ঘর, পূজার ঘর ও বাইর বাড়ীতে সময় কাটান।

এই রকম যাতায়াত কয়েকদিন ধরে চলল।

আজ আবার এক কুমারসম্ভবমের রাত্রি। সুধাংশু তার কিরণ অঙ্গুলি দ্বারা ত্রিদিবদেশ দারপে রজনীর মুখচুম্বনে রত। চন্দ্রকিরণ মেখলা সন্নিবিষ্টের জলে মুদিত সরোজলোচনে নবোদ্ভিত নিলানাথের স্পর্শ। দিকবিলম্ব কেতকপরাগরাশি যেন আবৃত করেছে।

ছোটকুমার যথানিয়মে বারান্দার দক্ষিণ দিক খচিত খট্টাঙ্কে প্রসুপ্ত।

দূরে কোথায় নবীন আম্রমুকুলের আমবিহ্বল কোকিল-কণ্ঠ মধুরে ধ্বনিত হ'ল। পদ্মের কাছে কোন ভ্রমর গুঞ্জন করল।

ছোটকুমারের নিদ্রা ব্যাহত হল দুগল বাহুর নির্দয় আলিঙ্গনে। সুবাসিত সূক্ষ্ম বসনাঞ্চল তাঁর বৈরাগ্য-প্রদীপ্ত দেহের দ্বিতীয় আবরণ নির্মাণ করে দিয়েছে। বিহ্বল সমীরণে প্লাবিত হয়ে গেছে কেতকীগন্ধ।

কিন্তু কেতকীতেই কাঁটা থাকে।

কুমার সংবেগে দাঁড়ালাল স্থির করে উঠে দাঁড়ালেন। হাতের পাশে আলো জ্বলে উঠল।

শিথিল বর্ণাভরণ একহাতে, শিথিল বস্ত্র অন্য হাতে ধরে কুটীল-ভ্রূ ছোটরাণীর।

কুমারের নয়ন লোহিতাভ ধারণ করল, "তুমি এমন? ছি, আমাকে প্রলুব্ধ করছো। তুমি এমন?"

ছোটরাণীর চোখে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল, "কি আশা করেছিলে? একজন আধুনিক মহিলার কাছ থেকে?"

"ভব্যতা, শালীনতা আশা করেছিলাম, বিশেষত্ব যা বর্তমান না থাকলেও। ছিঃ, ছিঃ। এমন লজ্জা ভাবিনি।"

উত্তেজিতা ছোটরাণী আঁচল ছেড়ে দিলেন, সমস্ত মুখ তাঁর রক্তিম হয়ে উঠেছে। আর কুমারসম্ভবের উমা নয়, ভয়ঙ্করী কালীমূর্তি।

"না, আমি এমন সস্তা নই। তোমার মন পাবার জন্যে নিজের সত্তা বিসর্জন দিয়ে উদাসিনী ভৈরবী সাজার ভাণও করতে পারতাম। তাও অবশ্য আমাকে প্রথমে করতে বাধ্য করা হয়েছিল। কিন্তু, পাথর যে কখনই মানুষ হয় না, জানতেম না। স্বেচ্ছায় তুমি বিয়ে করতে গিয়েছিলে কেন?"

"ইচ্ছা করে যাইনি। সকলে মিলে, বিশেষতঃ আমার বৌদিরা—গুরুদেব পর্যন্ত—"

"চুপ করো, একটা বুড়ো লোক তুমি, গুরুদেবের দোহাই দিয়ে ধোকা দেবে না বর্তমান যুগে। এতবড় বংশের দায়িত্ব তোমার উপরে, দায় এড়িয়ে ধর্ম করছ তুমি সন্ন্যাসী সেজে? তবে শোন, আমি এমন নয় সত্যি। তোমার ওই দুই বৌদি, বড়রাণী আর মেজরাণী আমাকে হাত ধরে রাজী করিয়েছেন দিনের পর দিন চেষ্টায়।"

ছোটকুমারের ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। কঠিন—নিষ্করুণ দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে ছোটরাণী বলেন, "অবশ্য একটা সত্যি কথাই বলি। কারুর কথায় আমি কোন কিছু করবার লোক নই। আমারও কৌতূহল হয়েছিল।"

"কী? কিসের কৌতূহল?" উগ্র কণ্ঠ কুমারের।

আকাশে শশাঙ্কলাঞ্ছন সুধাকর। বনপ্রান্তে এখনও অশোক, পলাশের উদ্ভট বর্ণবিলেপে কাননভূতলা ধরিত্রী পুষ্পগন্ধে ভরপুর গুচ্ছে গুচ্ছে কামদেবতার বিজয় ঘোষণা করে চলেছেন। কুসুমবিস্তীর্ণ তৃণাস্তরণ রতিশুঞ্জারের প্রতীক্ষায় হরিৎ শোভায় সুকোমল। শিরাল-গুঞ্জরীর পরাগকণা সহসাগত বাতাসে ইতস্তত নিক্ষিপ্ত। লতা-গৃহদ্বারে ধাবমান মৃগলোচন কোথায়? কোথায় অপরূপ কণ্ঠশীত মনোবিমোহন সঙ্গীত? তবু তো বসন্ত আসে। বৃথা তার সখা কন্দর্পের কুসুমায়ুধকে নবপুষ্পসারে সজ্জিত করে। ভ্রমরপংক্তিরচিত মুহূর্তগুলি যে মন্মথের, তার পর-সন্ধানের লক্ষ্য কে? ভৈরবের ওই প্রস্তর শিবলিঙ্গ, না রক্তমাংসের দ্বিতীয় মহেশ্বর?

উমার নয়নের কজ্জলপাশে যেন আজও অশ্রুচিহ্ন, উমার মালা আজও কবরীচ্যুত, ছিন্ন। চাঁদের আলোয় একবার সে স্বামীর দিকে নির্নিমেষে চেয়ে দেখল। কুমারী মনের সর্ব কামনায় আধার নীলকণ্ঠ নয়—স্মরদাহন ত্রিলোচন।

মুখ ফিরিয়ে নিল সাঙ্কেতা সুন্দরী, "কৌতূহল হয়েছিল। তুমি পুরোপুরি পাথর কি না।"

"এরকম করলে এখানে স্থান হবে না।"

"স্নান আমি চাইও না।" বলিতা ছোটরাণী শোবার ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। যার ফল হল।"

তারপর? ছোটকুমারের মহলের সেই খয়েরী কিংখাবের পর্দা আর অবনত হল না, কিন্তু আবার গয়ে একটি বংশিকা পড়ে গেল।

ছোটরাণীকে পিত্রালয় থেকে ফেরানো গেল না। দুইরাণী, ম্যানেজার দাদাই, আত্মীয়-স্বজন কেউ পারল না। তাঁর বাবা-মা অঞ্চ বিসর্জনান্তে কপালে করাঘাত করে তাগ্যকে ধিক্কার দিলেন। অতি সামান্য অবস্থার লোক হয়ে রাজা জামাই করার দোষের প্রতিফল তাঁরা হাড়ে হাড়ে পাচ্ছেন। ছোটরাণীর কোর্থ ইয়ারের পড়া ছিল। বি.এ. পাস করলেন তিনি।

বারবার বিফল হয়ে ছোটকুমারের পরিজনেরা ক্রুদ্ধ হলেন। বিবাহ বিচ্ছেদের কথা তুললেন তাঁরা।

ছোটকুমার শান্তভাবে জানালেন, হিন্দু বিবাহে বিচ্ছেদ হয় না।

তখন তাঁরা পত্নীত্যাগ করে আর একটি বিবাহ করবার অনুরোধ জানালেন।

ছোটকুমার বললেন, তিনি পুরুষের দ্বিবিবাহ সমর্থন করেন না এবং পত্নীত্যাগ করে তিনি ধর্মে পতিত হতে পারবেন না।

বড়রাণী মেজরাণী ভয়ে কাঠ হয়ে রইলেন। এবারে তো দেওরের 'উবাও' হয়ে যাবার অনুহাত আছে, কোন বাধাই নেই।

কিন্তু তাঁদের বিস্মিত করে দিয়ে ছোটকুমার কাজকর্ম, বিষয়সম্পত্তির কাজে ডুবে গেলেন। গৃহ সংস্কার, উদ্যানরচনার বিষয়ে আগ্রহ দেখা দিল।

ছোটরাণী যখন তিনমাসের মধ্যে ফিরলেন না, তখন ছোটকুমারের নির্দেশমত তাঁকে পাঁচশত টাকা মাসোহারা পাঠানো হল।

সকলকে বিস্মিত করে মাসোহারা ফেরত এল। কিছুদিন পরে শোনা গেল ছোটরাণী মেয়ে-স্কুলে কাজ নিয়েছেন। এখারে এম.এ. দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন।

সকলে ছি-ছি করল। এই বাড়ীর বৌ হয়ে চাকুরী করে নাম ডোবাল ছোটরাণী।

তারপরে জানা গেল ছোটরাণী মেয়ে-হোস্টেলে বাসা বেঁধেছেন। কারণ, মাসোহারা ফেরত দেওয়া নিয়ে বাবা মেয়েকে কঠোর তিরস্কার করেছিলেন। গরীব মানুষ তিনি। মেয়েকে একবার রাজরাণী করে দিয়ে তারপরে বসে খাওয়ানো সাধ্য নেই তাঁর।

তবু বড়রাণী, মেজরাণী আশ্বস্ত হ'লেন। বউ যে চটু করে সিনেমায় না নেমে ভদ্রভাবে খেটে খাবার চেষ্টা করছে, এটা তবু মন্দের ভাল।

সুরুচি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আহা, ওইরকম কি খেটে খাবার, মাসীমা? রাজা জমিদারের ঘরে না জন্মালেও অমনরূপ, রাণী হবারই রূপ।"

মেজরাণী হাতের নখ ঘষতে ঘষতে বলেন, "কপালে সুখ-না থাকলে কি হ'বে! অমন শিবের মত স্বামী পেয়েছিলি। আরে, রাজবাড়ীর পুরুষ মানুষ ধর্মো-ধর্মো করলে তো মঙ্গলই। তার মাথাটা অন্যদিকে যাবে না আর।"

মেজরাণী ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন একটা। তাঁর স্বামীর 'ধম্মো'-বাই ছিল না। ফল সুখকর হয়নি তাঁর পক্ষে।

বড়রাণী এতকাল বিধবা যে, তাঁর জ্বালা নিবৃত্তি হয়েছে। তিনি বল্লেন, "কি যে করা যায়? একমাত্র ছোট আনতে গেলে হয়তো আসবে। তা সে কি যাবে? ছোটর মনটা গলানো দরকার।"

আবার মন্ত্রণা-সভা বসল। ম্যানেজার মশাই প্রচার করতে লাগলেন যে, অতি পরিশ্রমে ছোটরাণীর শরীর পাত হ'বার উপক্রম হয়েছে। সকালে স্কুলে পড়ানো, দুপুরে ইউনিভার্সিটির ক্লাস, অপরাহ্ণে টিউশনি ওই তরুণ কমনীয় দেহের পক্ষে গুরু পরিশ্রম হচ্ছে। খাওয়া-পরার কষ্ট হচ্ছে। ভাল স্থানে থাকতে পারছেন না সামান্য উপার্জ্জনে। টি. বি. ধরে যাওয়া আশ্চর্য্য নয়।

ছোটকুমারের মনের প্রান্তের সজল মেঘরেখায় দুইটি গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ তাঁর গভীরতর দেখা গেল: আকাশের চাঁদ, বাগানের ফুল বিমনা করল তাঁকে। কোন ব্যর্থ অভিসার রজনীর ব্যর্থতায় বেদনায় অভিমানিনী নূতনতর তপস্যায় নিমগ্না। দৃঢ়কণ্ঠে তিনি আবৃত্তি করলেন—

"পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং শিরীষ-পুষ্পং ন পুনঃপতত্রিণঃ"—বিনিদ্র রাত্রে কানের কাছে কথাগুলো মধুকরের মত রংশনমালা নিয়ে গুঞ্জন করে ফিরতে লাগল।

স্বামী পরমানন্দ ম্যানেজার মশাইএর মুখে বলে পাঠিয়েছেন: স্ত্রীকে রক্ষা করা স্বামীর ধর্ম্ম।

মহিলা-হস্টেলে ভিজিটর্স রুম। সেখানে রাজসন্ন্যাসী উপস্থিত।

অপরিসর গলির বহিস্থ ছাত্রীবাস। একমাত্র অভ্রচেরায় ছোটকুমার উপবিষ্ট। বাইরে ম্যানেজার মশাই অপেক্ষায়।

শক্ত কাঠের বেঞ্চে বসেছেন ছোটরাণী। অপ্রসাধিত রূপ, মিলের মোটা শাড়ী পরিহিতা। উমার তপস্যা সত্যই। কিন্তু কি বলেছে উমা চন্দ্রচূড়কে?

বহুদিন পূর্বে-বলা বৃষভধ্বজের কথাগুলো এখানে এই ইঁটের নগরী সঙ্কীর্ণ গলি, বদ্ধ বায়ুস্তর পরিব্যাপ্ত করে ভাসছে—

"অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মিদাসঃ ক্রীতস্তপোভিঃ—" কিন্তু আধুনিক উমার কি উত্তর?

"আপনি আমাকে নিতে এসেছেন, বাধিত হলাম।" শাণিত স্বরে ছোটরাণীর অপরিচয়ের দুরত্ব। যেন তিনি কোনদিনই ওই পুরুষের কণ্ঠে মালা পরাননি।

"উমার তপস্যা বলছেন আপনি? উমার ভূমিকায় আমার অভিনয় দেখে আপনার ধারণা হয়েছিল বাস্তবজীবনেও আমি তাই। নিজেকে শিব ভাববার দৃষ্টতা আপনার থাকলেও, নিজেকে উমা মনে করার ভুল আমি করিনি। তবে তপস্যা আমি করছি বটে, সে কোন শিবের জন্য নয়, নিজের উন্নতির জন্য। ছিটগ্রস্ত ধনীর ক্রীতদাসী হওয়ার চেয়ে নিজের স্বাধীন আত্মার প্রতিষ্ঠাই আমি চাই। আপনি ফিরে যান, ছোটকুমার রাজবাড়ী কিম্বা হিমালয়ে। আমি যাব না।"

কালিদাস নগাধিরাজ-তনয়া পার্ব্বতীর আত্মসম্মান প্রখর করেন নি।

আধুনিক লেখিকা ভ্রমসংশোধনের দাবী রাখেন।

———

পুরস্কার

চিত্তরঞ্জন মাইতি

ক্ষমা করবেন প্রফেসর চৌধুরী। চিঠি লিখে বিরক্ত করছি বলে কিছু মনে করবেন না। বিশ্বাস করুন, আপনাকে এ ভাবে এতকাল পরে চিঠি লিখতে গিয়ে আমি নিজের মনে সংকোচে মরে যাচ্ছি। তবু লিখতে হোল, কারণ না লিখে আমার কোন উপায় ছিল না। কয়েকদিন পরে মনিঅর্ডার পিয়ন যখন আপনার হাতে কয়েকটা টাকা দিয়ে যাবে তখন আপনি অবাক হয়ে ভাববেন, একি হোল!

আপনাকে শুধু সেই এলোমেলো ভাবনার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্যেই আজ আমাকে এ চিঠিখানা লিখতে হচ্ছে। টাকাটা আপনার হাতে পড়ার আগেই যাতে আপনি আমার এই চিঠিখানা পান তাই তাড়াতাড়ি করে লিখতে হোল।

একজন নার্সের পক্ষে এতগুলো টাকা অতিরিক্ত পাওয়া সত্যি সৌভাগ্যের। আপনার যেদিনের স্থান যে কোন নার্সই সতীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করতো; কিন্তু আমি পারলাম না। আমার না পাবার কারণটুকুই শুধু আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই। নাহলে হয়তো আপনি আমার ব্যবহারকে ক্ষমা করতে পারবেন না, অথবা আমাকে অতিরিক্ত লোভী বলেই ভেবে বসবেন।

আচ্ছা, মমতা মিত্র বলে কোন মেয়েকে মনে পড়ে আপনার? বেশীদিনের কথা নয়, আজ থেকে মাত্র বছর সাতেক আগের কথা। কত ভাল ছাত্র ছিলেন আপনি। স্মৃতিশক্তি না থাকলে এতগুলো পরীক্ষায় এমন ভাল ফল করে বেরিয়ে আসতে পারতেন কি? তাই বলছি, মমতাকে হয়তো মনে আছে আপনার।

সত্যি কি আলাতনই না করেছে আপনাকে সে। মমতার সঙ্গে প্রথমদিনের পরিচয়ের কথা মনে করিয়ে দিলে নিশ্চয়ই হাসি পাবে আপনার।

সেই যে হোস্টেল থেকে নেমে সাতসকালে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন হন্‌হন্ করে। আপনার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল মমতা।

এই যে শুনুন।

আপনি মমতার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অবাক হয়ে বললেন, আমায় বলছেন!

মমতা আপনার মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, কাছে পিঠে আর কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে কি?

আপনি জিজ্ঞাসু চোখ মেলে মমতার দিকে তাকালেন।

ও বলল, আচ্ছা, আপনার ঘুমের ভেতর কেউ যদি চোখের ওপর আলো ফেলে তাহলে কি খুব ভাল লাগে?

কেন বলুন তো?

আগে আপনি আমার কথার উত্তরটা দয়া করে দিন।

আপনি বললেন, চোখে আলো পড়লে ঘুমের ব্যাঘাত হবারই কথা।

মেয়েটি বলল, যদি এতেই জানেন তাহলে এটুকু জানেন না যে নিশুতি রাতে অন্যের ঘুমের সময় আলো জেলে পড়তে নেই।

আপনি অমনি বললেন, সিলস সিটেড. রুমে আমি থাকি। অন্যের ঘুমের ব্যাঘাত হবার কথা নয়।

আলোটা কেবল আপনার ঘরেই বন্ধী হয়ে থাকবে, এমন কথা ভাবছেন কেন?

মমতা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার বাড়ীর জানালার দিকে। আপনার হোস্টেলের ঘর আর তার ঘরের দূরত্ব খুব বেশী নয়।

আপনি সবই বুঝলেন, কিন্তু জেদ চেপে গেল আপনার। বললেন, আমার আলো আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করলে আপনার অর্গ্যানও আমার পড়ার ব্যাঘাত করে।

সকাল সন্ধ্যে মমতার অর্গ্যান নিয়ে বাজানোর একটু সখ ছিল। আপনার কথায় মমতা হাসি চেপে বলল, সকাল আর সন্ধ্যে মানুষের গলা সাধার সময়।

আপনি অমনি বললেন, এবং ছাত্রদের পড়ার সময়ও। আপনি একপক্ষের পড়ার ব্যাঘাত ঘটালে তারাও আপনার ঘুম কেড়ে নেবে, এইটাই স্বাভাবিক।

তারপর আর কথা কাটাকাটি হয়নি। গান যেমন চলছিল তেমনি চলল আর আলোও গভীর রাতে যেমন জ্বলছিল তেমনি জ্বলতে লাগল।

কেবল একটি দিন ঘটল এর ব্যতিক্রম। আলো জ্বলল না ছেলেটির ঘরে। ঘাবরাতে ঘুম ভাঙাটা যার প্রায় অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, সেই মেয়েটি বিছানায় উঠে বসে অবাক!

ব্যাপার কি, হঠাৎ সুবুদ্ধির উদয়! কিন্তু কয়েকটা রাত পেরিয়ে গেল, তবু যখন কেউ ঘুম কেড়ে নেবার জন্যে আলো পাঠাল না তখন কৌতূহল গিয়ে দাঁড়াল দুশ্চিন্তায়।

মমতাই শুধু চিন্তিত হয়ে পড়ল না, মমতার অভিভাবকরাও চিন্তিত হোল। তাঁদের চিন্তা অবশ্য হোস্টেলের কোন একটি রাতজাগা বিশেষ ছেলেকে কেন্দ্র করে নয়, তাঁরা চিন্তিত হলেন মেয়ের জন্যে। গানে অরুচি, নিদ্রারও সম্ভবতঃ।

কয়েকটা দিন এমনি কেটে গেল। তারপর আবার দেখা হোল সেই ছেলেটির সঙ্গে মমতার।

এবার ছেলেটিই এগিয়ে এল মমতার কাছে।

আপনাকে আর অনেক রাতে আলো জেলে বিরক্ত করব না।

কি চেহারা হয়েছে ছেলেটির! অসুখে মানুষকে এমনি শীর্ণ করে দেয়।

মমতা মুখ নীচু করে বলল, আপনাকেও আর সকাল সন্ধ্যের অর্গ্যান বাজিয়ে জ্বালাতন করব না।

কেন, তাতে কি হয়েছে? গান কিন্তু আমার খুব ভাল লাগে।

তা বলে পরীক্ষার সময় কানের কাছে অর্গ্যান বেজে চললে সেটা নিশ্চয়ই ভাল নয়।

ছেলেটি হাসল।

মমতা এবার অন্য প্রসঙ্গে এল। এই তো সবে অসুখ থেকে উঠেছেন বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু এত ভোরে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

কাছে-পিঠে একটু বেড়াতে বলেছেন ডাক্তার।

গরম জামাকাপড় আরও বেশী সঙ্গে নেওয়া দরকার ছিল না কি ?

ছেলেটি হেসে বলল, আপনার নার্সিং এ থাকতে গেলে অনেক আগেই সেরে উঠতাম।

হেসে বলল মমতা, তাহলে হয়ে আবার সেই মস্ত ছেলের মত জ্বালাবেন তো ?

আমি যে মস্ত ছেলে আপনি তা জানলেন কি করে ?

নইলে নাকের ডগায় পরীক্ষা জেনেও কেউ জ্বর ডেকে আনে।

দেখুন, এই জ্বরের পরেও আমি ভাল রেজাল্ট করতে পারি কিনা।

থাক, আর বীরত্ব দেখিয়ে কাজ নেই। আবার সেই রাতজাগা সুরু করবেন তো। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। এক আধটু পরীক্ষাকে সইয়ে পড়লেই চলবে।

তারপর থেকেই এ-ঘর ও-ঘরে শাসনের পালা শুরু হোল। মমতার নীরব শাসনে আপনি সত্যিই লক্ষ্মী ছেলে হয়ে উঠলেন। রেজাল্ট আপনি হয়তো আরও ভাল করতেন, কিন্তু একেবারে যে খারাপ হয়নি তা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে।

আপনার ফল বের হবার দিনই দেখা হয়ে গেল মমতার সঙ্গে। তার সঙ্গে আপনার হঠাৎ সেখানে সেদিন দেখা হয়ে গেল সে খানটি সোভনীয় হলেও নেই।

রেডিও অফিস থেকে বেরিয়ে গভর্ণমেন্ট প্রেসের পশ্চিম দিক ধরে আসছিল মমতা, আর আপনি যাচ্ছিলেন সম্ভবতঃ গঙ্গার দিকে। সেদিন সবেমাত্র ইউনিভার্সিটি থেকে রেজাল্টটা জেনে এসেছেন আপনি। কিন্তু এমন দিনে নির্বান্ধব কেউ কি পথ চলে।

মমতাকে দেখে আপনি থমকে দাঁড়ালেন ; তারও সেই অবস্থা।

খুব ভাল লাগল আপনার গান। পথ চলতে একটি দোকানে নাম এনাউন্স করতেই দাঁড়িয়ে গেলাম।

মমতা বলল, যে খবরটা জানার জন্যে আমি উৎসুক হয়ে আছি দয়া করে সেটা জানাবেন কি ?

পাশ করেছি মমতা। একেবারে কোনরকমেও নয় ; আর সেজন্যে তোমার কাছে আমি ঋণী।

ঋণের কথা থাক। রাত জেগে পড়ে একেবারে পরীক্ষার ভেতরে যে জ্বরে পড়নি সেই আমার ভাগ্যি।

সেদিন কি করে যে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এল তারা দুজন, সে ইতিহাস যিনি মনের অধীশ্বর তিনিই শুধু জানেন।

তারপর গঙ্গার দিক থেকে যে বাতাস বয়ে এল তা শুধু গা জুড়িয়ে দিল না, দুটি মনকেও সাড়া দিয়ে গেল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ধারে পলাশ গাছটাকে যদি সেদিন অতিরিক্ত সুন্দর বলে মনে হয়ে থাকে, তাহলে সেদিন দুজনের চোখেই অঞ্জন লেগেছিল।

প্রফেসর চৌধুরীকে আমি আর মিথ্যা স্মৃতির জগতে নিয়ে যেতে চাই না। কারণ আজ তিনি সম্মানের যে আসনে বসেছেন, সামান্য একজন নার্সের পক্ষে সেখানে অতীতের কতকগুলো অসংলগ্ন কথা পৌঁছে দেওয়া ঠিক হবে না।

কিন্তু এমন একটা দিন ছিল, যেদিন নার্স হবার জন্যে, একটি মানুষকে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলার জন্যে মমতা দিন প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল।

পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে যে, হঠাৎ অনেকেই তার আত্মীয় হয়ে ওঠে।

প্রফেসর সেন সেদিন ঘরের ছেলের মতই আপনাকে ভাবতে শুরু করেছিলেন। সেটা নিশ্চয়ই কোন দোষের কাজ হয়নি। ছেলেবেলা থেকেই আপনি মা বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত। মিসেস সেন যদি আপনাকে নিজের কাছে রেখে মায়ের স্নেহ ঘরে ভরে দিতে চান, তাহলে অতি বড় নিন্দুকেরও তাতে আপত্তি করার কিছু থাকে না।

কিন্তু মমতা মিত্র, প্রফেসর সেন আর মিসেস সেনের আড়ালে তৃতীয় আর একটি ছায়া দেখেছিল। সে ছায়া প্রফেসর সেনের কন্যা সুতপার। মেয়েদের একটা-তৃতীয় নয়ন থাকে বোধহয়, নইলে মমতা মিত্র কেন আপনাকে ও বাড়ীতে না থাকার জন্যে উত্তেজিত করবে।

কিন্তু আপনি সেদিন মমতার সন্দেহকে অমূলক বলে প্রবল হাসির তোড়ে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া, প্রফেসর সেনকে তখন আপনার পক্ষে ছাড়া প্রায় অসম্ভব ছিল। কারণ আপনার বিদেশে যাবার সব কিছু ব্যবস্থাই তিনি করছিলেন। তাঁর সেই করুণা আপনি সেদিন সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় গ্রহণ করেছিলেন।

বিদেশে যাবার আগে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেদিন মমতাকে আপনার মনে পড়েছিল। মমতা মিত্র সেজন্য চিরদিনই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

আপনি তাকে চিঠিতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বিশ্বাস করুন, সেদিন সবকিছু বাধা সরিয়ে প্রফেসর সেনের বাড়ীতে গিয়েছিল।

কিন্তু সে সেবা পায়নি আপনার। একটি অপরিচিতা মেয়ে আপনার সেবা করবে জেনে মিসেস সেন বলেছিলেন, পাশকরা নার্স রাখা হবে সৈকতের জন্যে। ডাক্তার এখন কথাবার্তা বলতে বারণ করেছেন কারোর সঙ্গে। ভাল হলে আসবেন তখন।

অভিমানে ফিরে এসেছিল সেদিন মমতা মিত্র। কিন্তু বেশীদিন থাকতে পারেনি সে। আবার গিয়েছিলেন প্রফেসর সেনের বাড়ী।

মিসেস সেন সহাস্যে সেদিন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাকে তাঁর দর্শনীয় দুইং রুমে। কথায় কথায় বলেছিলেন আপনার কথা। মাত্র তার আগের দিনই আপনি পাড়ি দিয়েছিলেন বিদেশে। আর আপনার চিরদিনের সেবার ভার যাঁর ওপরে পড়েছিল তিনি প্রফেসর সেনেরই কন্যা।

কথাটা শুনে মমতা সেদিন সাধারণ মেয়ের মত ভাঙ্গায় ভেঙে পড়েনি মিসেস সেনের কাছে। সেটুকু বোধ সেদিন তার ছিল। আপনি তাকে গ্রহণ করার কথা দিলেও সে সেদিন আপনার জন্যে গড়ে তোলা তার অনেক আশাই ত্যাগ করেছিল।

মিসেস সেন যে তাঁর ভুল সংশোধন করে নেবার সুযোগ পেয়েছেন সেজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কলকাতার প্রাইভেট নার্সদের ভেতর তিনি মমতা মিত্রকে তাঁর একমাত্র দৌহিত্রের সেবার জন্যে বেছে নিয়েছেন সেটা আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমি যে সেদিনের মমতা মিত্র একথা জানতে পারলে এভাবে তিনি আমাকে নির্বাচন করতেন কিনা জানি না, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি এতে মনে-প্রাণে খুশি হয়েছি।

এমন ভাবে একটি মিষ্টি ছেলের সেবা করার সুযোগ পেয়ে যাব তা একেবারেই ভাবিনি। মিষ্টি মানে একবারে মায়ের মত মিষ্টি মুখখানা। স্বভাবে কিন্তু প্রফেসর চৌধুরী আপনারই ছাপ পেয়েছে ছেলে।

যেদিন ডিপ্‌থিরিয়া ওয়ার্ডে ভর্তি হল, তার ঠিক পরের দিনই এলাম আমি। বেডের কাছে এসে বসলাম।

খোকনমণি, নাম কি তোমার ?

আমি খোকনমণি নয়, তোতন।

বললাম, তোতন সোনা, তুমি এবার থেকে আমার কাছে থাকবে।

না, আমি মার কাছে থাকব। তুমি আমাকে মার কাছে নিয়ে যাবে ?

তাহলে, তুমি আমাকে ভালবাসবে ?

হুঁ।

খুব ?

খু—উ—ব।

মিসেস চৌধুরী জানালার ওপারে থেকে ছেলেকে দেখেছেন, স্পষ্ট আমি দিনের পর দিন তাকিয়ে দেখেছি মিসেস চৌধুরীকে।

সত্যি, তারিফ করবো আপনার সৌভাগ্যের। যেমন মুখশ্রী তেমনি ব্যবহার। আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে ছেলের জন্যে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তিনি। ওঁকে হাতে ধরে সান্ত্বনা দিয়েছি। বলেছি, তোতন আমারও ছেলে তাই, আপনি কিছু ভাববেন না।

কথাটা বলতে গিয়ে কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় আমার বুক ঠেলে সেদিন উঠে আসতে চেয়েছিল। আমাকে প্রগল্‌ভা ভাববেন না প্রফেসর চৌধুরী। এটুকু কথায় নিশ্চয়ই এ জগতে ক্ষতি হবে না কারো। সত্যিই তো তোতন আমার ছেলে। আর তাছাড়া মিসেস চৌধুরী সেদিন আমার মুখের এই কথাটুকু শুনে নিশ্চয়ই অনেকখানি আশ্বস্ত হয়ে বাড়ী ফিরেছিলেন।

আপনি আমাকে দেখেননি। আপনাকে দূর থেকে দেখেই আমি সরে গেছি আড়ালে। কি হবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একজন নার্স, কলকাতার বিখ্যাত এক প্রফেসরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অতীত স্মৃতি মন্থন করবে, কি লাভ তাতে, তাই দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম নিজেকে।

তোতন ধীরে ধীরে সেরে উঠল। বিশ্বাস করুন, সারা রাত আমি ওর শিয়রে মায়ের চোখ মেলে জেগে বসেছিলাম। কথাটুকু অহঙ্কারের মতই শোনাবে, তবু সত্যি জানবেন। ঘুমন্ত তোতনের রোগ-ক্লান্ত মুখখানি দেখে আমার কতবার মনে পড়েছে আর একখানা মুখ। এমনি রোগশীর্ণ, অসহায়। নার্সের স্বভাব নইলে সেবা করা যায় না তাই নার্সই হলাম জীবনে। সেবাকে ব্রত করেছি। ক্লান্ত শীর্ণ মুখে ধীরে ধীরে দেখেছি রক্তের জোয়ার জেগে উঠেছে। তাদের দেখে কি গভীর আনন্দে ভরে গেছে আমার মন। একটি মানুষের সেবা থেকে জীবনে বঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু শত শত মানুষ আজ পাচ্ছে আমার হাতের সেবা।

তবু মন কাঁদে। যাকে সবচেয়ে গভীর সেবায় ভরে দেব মনে করেছিলাম, কেন তার সেবা থেকে বঞ্চিত হলাম আমি।

অশেষ কৃপা দেবতার। তিনি আমার কোলে তুলে দিলেন তোতনকে। আপনারই প্রতিনিধি সে। তাই তাকে ছেড়ে দিতে প্রাণ কেঁদেছে।

অপারেশনের টেবিলে যখন তাকে তোলা হয়েছিল তখন কেন বুকটা কেঁপে উঠেছিল আমার। এমন কত অপারেশন, কত জীবন-মৃত্যুর লড়াই তো রোজই চোখের সামনে দেখছি।

নিজের সন্তানের চিকিৎসা করতে ডাক্তার ভয় পান। আমি কেমন করে তোতনের অপারেশান নিজের চোখে দেখব।

ভগবানকে ধন্যবাদ, সে টেবিল থেকে আমার বুকে ফিরে এসেছে।

কিন্তু কেন আপনি ওকে কেড়ে নিলেন আমার কাছ থেকে। আরও একটু সেবা, আরও কয়েকটি দিনের যত্ন দিয়ে ওকে আমি বেঁচে রাখতে চেয়েছিলাম। কেন আমাকে সেটুকু করুণা করলেন না।

জানি, একটি মাস মিসেস চৌধুরী ওঁর ছেলেকে দেখতে পাননি। তাই বলে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেলেন তোতনকে!

আচ্ছা, আমাকে সেবার থেকে তিনি কি বঞ্চিত করেননি। তিনি কি আমার সবচেয়ে বড় সেবার জনকে চিরদিনের মত কাছে টেনে নেননি। তবে কেন কদিনের সামান্য সেবার সুযোগ থেকে আপনারা আমাকে বঞ্চিত করলেন।

ক্ষমা করবেন, অনেক অসংলগ্ন খেয়োক্তি করে ফেললাম।

সব সয়েছিলাম। বড়ো সই দিয়ে আপনারা যখন তোতনকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যেতে চাইলেন, তাতে মন না মানলেও বাইরে সায় দিয়েছি, নইলে আপনারা হয়তো আমাকে অতিরিক্ত লোভী ভেবে বসবেন।

কিন্তু এ কি করে বসলেন আপনি!

মিসেস চৌধুরী যখন আমার কোল থেকে তোতনকে নিজের কোলে তুলে নিলেন তখন আপনি কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকলেও আমার দিকে ভাল করে লক্ষ্য করেননি। তোতন যে আমাকে ছেড়ে প্রথমে যেতে চায়নি তা আপনি দেখেছেন।

ঠিক সেই সময়েই মিসেস চৌধুরী কথাটা পাড়লেন, আপনিই তো সেবা দিয়ে ওকে সারিয়ে তুললেন তাই, আপনিই ওর যথার্থ মা।

চোখ বেয়ে তখন টপটপ করে জল ঝরছিল আমার। তোতন মায়ের কোলে থেকে দুটি হাত বাড়িয়ে রেখেছিল আমার দিকে।

অশেষ দয়ালু আপনি। একজন সামান্য নার্সকে কৃপা করে আপনি মিসেস চৌধুরীর হাত দিয়ে একশো টাকার একখানা নোট দিলেন।

আমার এতদিনের সেবার পুরস্কার দিলেন আপনি। টাকাটা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। সে নাটকের অভিনয়ে আর যিনি খুশি হোন মিসেস চৌধুরী হতেন না। কি দরকার তার মনে আঘাত দিয়ে। তবে আপনার সেই দান অনেক চোখের জলের সঙ্গে আজ ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। অনেক হারিয়ে কিছু পাবার দুঃখ আমি সইতে পারব না। তাই অশোভন হলেও ফিরিয়ে দিলাম আপনার করুণার দান।

মানুষের আত্মা মুক্তিলোকে আনন্দলোকে জন্মগ্রহণ করবে বলে বিশ্বের সূতিকাগৃহে অনেকদিন ধরে চন্দ্রসূর্যতারার মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো রয়েছে। যেমনি নবজাত মুক্ত আত্মার প্রাণচেষ্টার ক্রন্দনধ্বনি সমস্ত ক্রন্দসীকে পরিপূর্ণ করে উচ্ছ্বসিত হবে অমনি লোকে লোকান্তরে আনন্দশঙ্খ বেজে উঠবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করবার জন্যই মানুষ। —রবীন্দ্রনাথ।

মালতির মন

নীলিমা দাশগুপ্তা

শোনোই না কাণ্ড! কী যন্ত্রণাই না হলো এই শেষের দুদিন। দিল্লী গিয়ে তুমি খুব মিস্ করলে কিন্তু। প্রথম দিনের যজ্ঞা তো একেবারে শুরু থেকেই। 'রক্ত করবী' অভিনয়ের প্রথমে একটা ওপনিং ড্যান্স ছিলো, 'হিমের রাতে ঐ গগনে'…। মিস্ দাসের হঠাৎ কী যে হলো, রিহার্সেলের সময় কিন্তু কোনোদিন এ তাল তোলেননি—

তাঁর মেয়ে মঞ্জুলিকা ঐ তালটা করছে, শুনলাম, মঞ্জু বাচ্চা হ'লে কী হবে কথক-নৃত্যে পটিয়সী—দিল্লীতে কথক-নেচে একটা মেডেল নিয়ে এসেছে; স্টেজের যবনিকা যখন উঠবে উঠবে—, অডিটোরিয়ামের বাতি নিভেছে—ফুট লাইট জ্বলেছে, ঠিক সেই সময় মিসেস দাস ডাইরেক্টারের দিকে তাকিয়ে প্রায় যেন ঘোষণা করলেন,—হ্যাঁ, ভালকথা মিঃ মল্লিক, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, মঞ্জু প্রথমে কথকের একটা আইটেম্ করে নিয়ে তারপর রবীন্দ্র-নৃত্য করবে। সে কী! অত মৃত্যের কাকচাল রবীন্দ্র-নৃত্যে! মিঃ মল্লিকের চোখ একেবারে কপালে! মিসেস দাস বললেন,—হ্যাঁ, আপনি কিছু ভাববেন না। তবলাতেই আমি ঠেকা দেবো আর সারেঙ্গী বাজিয়ে আমি সঙ্গে করেই এনেছি। বোসো একবার কাণ্ড!…

মিসেস দাস কিছুতেই মানবেন না,—কথকের বোল্ প্রথমে ক'রে নিলে রবীন্দ্র-নৃত্যের কী অমহানি হ'তে পারে, অথচ, তাঁর মেয়ের ভেতরে কতখানি পার্টস্ আছে সংগত অভিযান তা বুঝবে। মেয়েদের মেক্-আপ রুম থেকে আমরা সব বেরিয়ে এসে বোঝাতে লাগলাম। তাতেও হতো না, নেহাত মঞ্জুলিকা বেঁকে বসলো—তাই রক্ষে।…তারপরের যজ্ঞা শোনো—, অভিনয়ের শেষের দিকে, যখন রাজা রাজ্য ভেঙে ফেললেন…। হীরু যে 'রক্ত-করবী'তে এক নম্বরের একটা পার্ট পেয়েছিলো জানো তো? বেচারা পাঁচ বছর ধরে শিলাচল-স্টেজে অকৃত্রিম উৎসাহে আলোক-সম্পাতের কাজ ক'রে যাচ্ছে। অথচ, একটিবার স্টেজে নামার সুযোগ কেউ দেননি। মিঃ মল্লিক অত্যন্ত ভালমানুষ, বলেছেন, হীরু ঘাবড়িয়ো না, এবার বারোদিনের উৎসবের মধ্যে তোমাকে একটা চান্স দেবোই। হীরুকে পায় কে? স্টেজে সকলের সঙ্গে রিহার্সেল দিয়ে তারপর যায় মিঃ মল্লিকের বাড়িতে। সেখানে ও একলা রিহার্সেল দেয়। সকলেই বলাবলি করলো, উল্লাসে হীরুর চেহারায় চেকনাই ফুটেছে। অভিনয়ের প্রায় শুরুতেই, হীরু বারে বারে বললো,—আমাকে যেন একটু আগে থেকেই বলবেন, কিন্তু মল্লিকদা, বুঝতেই তো পাচ্ছেন, স্টেজে ঢোকার আগেই, উইংসের পাশ থেকে মনে মনে একটু তালিম দিয়ে তো নিতে হবে—কী ভাবে ঢুকতে হবে, কোন্ পোজে দাঁড়াতে হবে…। মিঃ মল্লিক কোনোমতে হাসি চেপে বললেন,—তুমি ভেবো না হীরু, ঠিক সময়ে ঠিক মুডে তোমাকে আমি জানাবো। কেবল দেখো বাপু, অভিনয়ে তোমার কথার আদি টান্টা না এসে পড়ে। হীরু তো মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে মিঃ মল্লিকের সংশয় উড়িয়ে দিলো।

হীরুর পার্ট এসে গেছে। অনেক আগেই হীরুকে উইংসের পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। আমরা লক্ষ্য করছিলাম, বেশ কিছুক্ষণ ধরেই, হীরু রেডি-সেডি-গোছ ভঙ্গিতে ডানপাটা একবার সামনে বাড়াচ্ছিলো,

"মেয়েটাদ, আর্টিস্ট-সাব্ কিছু বললো ?"

"কী, নেহি—"

মালতি বেরিয়ে এলো। মনে মনে বললো মেয়েটাদ,—যা বিচ্ছুটি একখানা মেজাজ দেখলাম সাহেবের, সাহেব আবার কথা বলবে—!

আর্টিস্ট-সাব্ অর্থাৎ পবিত্র রায়, শিলাচল গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজে একটা চাকরী পেলো। সম্পূর্ণ সুব্রত চ্যাটার্জির বদান্যতায়। ব্যাপারটা কিছুটা নাটকীয়। শিলাচল-কালীবাড়ির স্টেজে রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পর পর বারোদিন ছায়া হলো। প্রথমদিন হয়েছিলো, বাচ্চাদের যারা অভিনীত 'মুকুট'। দু'টি দৃশ্যের দু'টি দৃশ্যপট।—এমন সীন-সিনারি কে আঁকলে ? এই যে তুলির টান এ তো সাধারণ নয়! এ শুধু অপূর্ব নয়—অদ্ভূতপূর্ব! শিলাচল-স্টেজে এমনটি আর কখনো হয়নি তো! তারপর, প্রতিদিন শিলাচলবাসী মুগ্ধ হয়ে শিল্পীর হাতের কারিগরি দেখেছে। তিনদিনের পর, চতুর্থদিন সকালে, চায়ের টেবিলে সুব্রত বলছিলো সে কথা,—সত্যি, এই শিল্পীটি অদ্ভূত ট্যালেন্টেড। মালতির পাতলা ঠোঁট বেঁকে গেলো, "নিষ্ক্রিয়, নিরুত্তাপ শুধু দুটো বাহবা—"মালতির গলার সুরে প্রচ্ছন্ন বিরূপ, "এ গুরুনো প্রশস্তির কী দাম আছে ? তোমার বন্ধু ডি. পি. আই. ও তো প্রথম দুদিন চীফ্ গেস্ট ছিলেন—সেটিং-এর প্রশংসা অকৃপণ ভাবে করলেন, কিন্তু সেই শিল্পী যে তিলে তিলে না খেয়ে মরছে, তার প্রতিকার কিছু কী করতে পারতেন না তিনি ?·· তুমি ?···তোমরা ?" মালতির গলায় মৃদু উত্তেজনা। সুব্রত নীরব কৌতুকে স্ত্রীর দিকে একচোখ তাকালো।—তোমাকে আর এককাপ চা কিম্বা আর একটু জ্যাম্—এই ধরনের কথা ছাড়া মালতি চায়ের টেবিলে আর কিছু বলে না। তাছাড়া, সংসারের অন্ধকার দিকটার কোনো খবরই তো জানে না মালতি, দারিদ্র্যের ভয়াবহ চেহারাটা তো মালতির জানার কথা নয়।

টেবিলের ওপর বাঁহাতের কনুই রেখে হাতের ওপর মুখ রাখলো সুব্রত। মুহূর্ত দুই হাল্কা বিস্ময়ে মালতির লালচে মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে স্মিতমুখে বললো, "তুমি কী করে জানলে, ভদ্রলোক না খেয়ে মরতে বসেছেন ?"

"ও তো দেখেই বোঝা যায়—" মালতির নাকের দুপাশে সরুচুলের মতো দুটো খাঁজ পড়লো।—সত্যি তাই। সুব্রত প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেলো না। সাহিত্য-চক্রের সেক্রেটারি, প্রথমদিন, শিল্পীকে স্টেজে একবার এনেছিলেন। সামনে ঝুলে-পড়া তেলহীন ঝালর-চুলগুলির ভেতর দিয়ে শিল্পীর অপলক চোখদুটো জ্বলছে—যেন বারুদের মতো জ্বলছে চোখদুটো—এটাই সকলের নজরে পড়েছিলো প্রথমে, তারপরই চোখে পড়লো শিল্পীর শীর্ণ লম্বা আর তার অস্বাভাবিক ক্লান্তিময় মুখের চেহারা।···

সরকারী বড়-চাকুরে সুব্রত একটা বিপরীত কাজই ক'রে বসলো। গুম্‌রিয় করে আর্ট-কলেজের একটা প্রফেসারি জুটিয়ে দিলো। রবিবার সকালে, কোন নাবিয়ে রেখে, সুব্রত ঔদার্যের সুরে স্ত্রীকে বললো, "এই তাখো মালা, এ দেখেও প্রতিভার দাম কেউ কেউ দেয়—সেই শিল্পীর চাকরী হ'য়ে গেলো। সাড়ে তিনশ' টাকার চাকরী এবং স্ত্রী কোয়ার্টারও মিলেছে—।"

"সত্যি চাকরী হলো—?" মালতির চোখ দুটোর ওপর একটা উজ্জ্বল বাগ্রতার আলো ঝপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো, তারপর সেই আলোটাকে আড়াল করার জন্য ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিলো মালতি।

মালতি কাপড় বদলে শোবার ঘরে এলো। সুব্রত ঘুমিয়ে পড়েছে। আলো নিবিয়ে মালতি শুয়ে পড়লো। ওর বন্ধ চোখের পাতায় একটি ছায়া এসে ছুঁলো। ভাবনার নোঙরটিকে টানলো সে।

তেল-রঙের জলরঙের ঝোলা নিয়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিলো কলকাতা ছেড়ে। তারপর, পাঁচবছর পরে, শিলাচল-স্টেজে আবার দেখা।—

: কিন্তু, বাঁচবে তো পবিত্র? স্টেজে এসে যখন দাঁড়ালো, মনে হলো যেন ঘুঁকছে, মনে হলো, পৃথিবীতে পবিত্রর মেয়াদ যেন আর বেশি দিন নেই, মনে হলো—বুকের কোথায় যেন একটা টান পড়লো মালতির। হৃদযন্ত্রের বাতাদটা ছটফটিয়ে উঠলো। মালতি চোখ খুললো। ঘর অন্ধকার। ছুঁচোলো মোচড় দিয়ে পেচিয়ে পেচিয়ে বেরিয়ে গেলো শ্বাসটা।

—না। জিংরাম একস্‌পার্ট বাবুর্চি—

তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ ক'রে, মালতি অস্বস্তির মেঘটা উড়িয়ে দিলো,—মাংসের সুরুয়া খাইয়ে খাইয়ে দুদিনেই চাঙা ক'রে দেবে পবিত্রকে। তাছাড়া আছে—শিলাচলের পাহাড়ী আবহাওয়া।—

মালতির উদ্বিগ্ন মনটা যেন হাঁফ ছেড়ে হাল্‌কা হ'য়ে গেলো।

: কিন্তু, কী অদ্ভুত গোঁয়ার ভদ্রলোক, কী নিদারুণ অভদ্র, কী অসহনীয় বর্বর···। মনের দিক থেকে একেবারে ছেঁউলিয়া মানুষটা···।—একরোখা, জেদী, খামখেয়ালি; যোগলাই-মেজাজের এখনো এতটুকু ভাটা পড়লো না···। সুব্রত ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরলো। একটা হাত এসে পড়লো মালতির গায়ে। দুহাত দিয়ে মালতি সুব্রতর হাতখানি চেপে ধরলো।—সুব্রতও সংগ্রাম করেছে। সংকল্পে অটুট হ'য়ে সৈনিকের মতো সংগ্রাম করেছে। কিন্তু, কী মোলায়েম মেজাজ এই সুব্রতর। কী ভদ্র, কী ভালো, কী সহানুভূতি-শীল। মমতায়, সহৃদয়তায়, সহযোগে···। সুব্রতর হাতখানি তার শক্ত হাতে চেপে ধরলো মালতি।

ঘুমের পর্দা ছিঁড়ে গেলো সুব্রতর। মালতির মুঠি থেকে হাত আল্‌গা ক'রে নিয়ে, দুহাতের সবল টানে জড়িয়ে ধরলো মালতিকে। একটু পরেই অনুভব করলো, ওর বুকের ভেতর, নরম একটা ছোট্ট পাখির মতো জড়িয়ে গেলো মালতি।

রাত্রি তিনটে। আর্টকলেজ-হোস্টেলের একটি কামরায় অশান্ত পায়ে ঘুরছে একটা মানুষ। রক্তের মধ্যে একটা তরঙ্গের দাপাদাপি নিয়ে ঘুরছে। অস্ফুট কোন্ বাধা-কণ্ঠস্বর যেন মনের দিগন্ত দুলিয়েছে মানুষটার। ঘরের চার দেয়ালে, এঁকের পর এক এঁকে যাচ্ছে একটি নারীমূর্তি। হচ্ছে না হচ্ছে না। সে চোখ হচ্ছে না। বিশ্বের মমতা দেখেছিলো সে চোখদুটিতে। আরো কিছু দেখেছিলো।

যেন নেশাখোরের একরোখা জেদে মানুষটা এঁকে যাচ্ছে পর পর নারীমূর্তি। সে চোখ সে আঁকবেই। তিনদিন দেখেছিলো সেই শীতল-স্নেহ কোমল চোখদুটিকে। সে চোখে আরো কিছু দেখেছিলো।

———

খুরুলবোরার ভূত

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বেবি আবার এসেছে আমার নতুন ভূতের গল্প শুনতে। আমিই তাকে খবর দিয়েছিলাম। তার দাবীতেই আমার ভূত দেখা, তার দাবীতেই আমার ভূতের গল্প। কিছুদিন ধরেই চলছে এটা।

ওকে আগেই জানিয়েছিলাম ১৯৪৬ সালে জয়ন্তীর সাঁকোর ধারে একটি ভূত দেখেছিলাম, আর সেই ভূতের গল্প "জয়ন্তীর জাদু" নামে বলেছি সবার কাছে। কিন্তু যাকে দেখেছিলাম সে প্রকৃতই ভূত কি না এখনও সন্দেহ আছে। মনে হয় সবটাই হয়তো ভয়ের ভূত। মানে, ভয় থেকে যে ভূতের সৃষ্টি। অধিকাংশেই অবশ্য তাই। ভয়ের ভূত থেকেই ভূতের ভয়।

বেবি সামনে এসে বসেছে। ঘরের আলো নিবিয়ে গাঢ় নীল আলো জেলে দিয়েছি, এই পটে ভূতের খোলতাই হয় বড় সুন্দর।

একটি কথা বেবি, তোমাকে বলি। আগে, তুমি তো জান, আমার ভূতে বিশ্বাসও ছিল না, কখনও ভাবতেও পারিনি যে যখন তখন ভূতের দেখা পাওয়া যায়। আর ঠিক এই কারণেই আগের দু একটা ঘটনা দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। শোন বেবি, এখন ভেবে দেখছি সে সব ভূতেরই ব্যাপার।

তার মানে আপনি পুরনো ঘটনা জোর করে ভূতের নামে চালাবেন?—বেবি হতাশভাবে বলল।

আগে শোন সব, তারপর সমালোচনা করো। জয়ন্তী থেকে আমরা কয়েক বন্ধু মিলে খুরুল-বোরায় গিয়েছিলাম হাতীখেদা দেখতে, সে গল্প তো পড়েছ তখনই, প্রবাসীতে বেরিয়েছিল। তবু আরও একবার সেই পরিবেশটা সংক্ষেপে বলছি আগে, কারণ এরই সঙ্গে খুরুলবোরার ভূতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।

শোন বেবি, ওখানে যেতে একটা নদী পার হতে হয়, তার নাম রাংডাক। অদ্ভুত সে নদী। এখন মনে হচ্ছে ঐ নদী পারের সময় তার অগভীর স্বচ্ছ জলের নিচে যে বিচিত্র রঙের পাথরের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম—সেইখান থেকেই ভূতের অদৃশ্য ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল আমার মনের উপর।

কিন্তু বেবি, এখন ভেবে দেখছি শুধু তাই নয়। সেখানকার পাহাড় নদী ঝরনা শালবন সব মিলিয়ে সে এক অদ্ভুত ভূতের খেলা। তার মধ্যে বাধা ঠিক রাখাই শক্ত। অথচ সেই সুন্দর সৌন্দর্য আর স্বপ্ন রাজ্যের ভিতর দিয়ে চলছিলাম অত্যন্ত স্থূল একটি জিনিস দেখতে। হাতী দেখতে। হাতীর চেয়ে স্থূল বস্তু আর কি আছে সংসারে?

হাতী কি করে ধরে তা একটা দেখবার মতো জিনিস। খুবই নিষ্ঠুর সে দৃশ্য, আর হয়তো এই কারণেই তার আকর্ষণ খুব বেশি। ফাঁদে ফেলে তার উপর ভীষণ আক্রমণ হয়, তারপর তাকে দুর্বল করে ফেলে তার গলায় ফাঁস পরানো হয়।

আমাদের নদী পার হবার পর যিনি মোটরে করে সেই জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি ও অঞ্চলের নামকরা শিকারী ছিলেন, তাঁর নাম অন্নদানাথ রায়। তিনি ছিলেন মীলপাড়া ভাংচুয়ারির গেম ওয়ার্ডেন।

তখন পর্যন্ত তিনি নিজহাতে ২৪টি টাইগার মেরেছেন এবং অন্তত ৪০০ শিকারের নেতৃত্ব করেছেন। আমাদের খেদা-অভিযানের নেতার তিনি ছিলেন বন্ধু। এখন আর তিনি জীবিত নেই।

হাতীখেদায় হাতী আগেই ধরা পড়েছিল—মোট পাঁচটি হাতী। আমরা গিয়েছিলাম তাদের দুর্দশা দেখতে, শুধু আমার দুর্দশা দেখার লোক সেখানে কেউ উপস্থিত ছিল না।

সেখানে যেতেই অন্নদাবাবু, মাটিতে সদ্য-চলে-যাওয়া প্রকাণ্ড বাঘের পায়ের চিহ্ন দেখালেন আমাদের। সব তাঁর চেনা, তাঁর দৃষ্টি কিছুই এড়ায় না। সেই চিহ্ন দেখার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বনভূমির উপর দিয়ে একটা ভয়াবহ ঠাণ্ডা হাওয়া যেন বয়ে গেল আমার সমস্ত দেহমন কাঁপিয়ে দিয়ে। ঠিক তখনই উপলব্ধি করলাম কি পরিবেশে এসে পড়েছি। মনে হল যেন আশেপাশের জঙ্গলে বহু ক্ষুধার্ত বাঘ লালায়িত জিহ্বা নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। তারপর কিছু এগিয়ে খেদার কাছে গিয়ে বহু লোকের সান্নিধ্যে এসে তবে খানিকটা আরামবোধ করলাম। বুঝতে পারছ বেবি, এমন লোকের কাছে ভূত সহজেই আসতে পারে। ভয় তো আগে ছিল না, কিছুদিন হল এ এক নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে। তার উপর বাঘ।

অবশেষে হাতীখেদা দর্শন। খেদার ঘেরের সঙ্গে বেশ বিপজ্জনক ভাবেই বাঁধা একটি বাঁশের মাচার উপর দাঁড়িয়ে সেই প্রচণ্ড বন্য শক্তিকে আয়ত্ত করার কৌশল দেখতে লাগলাম। তখন মনে কি কি ভাবের উদয় হয়েছিল তা এখানে বলব না, তবে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, না দেখলেই ভাল হত। বেবি, আমি হাতীদের দুর্দশার কথা বলছি না, আমার নিজের অবস্থা ভেবে বলছি। সমস্ত দিন প্রায় না খেয়ে একটি ক্যামেরা নিয়ে সেই মাচার উপর দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকা যায়? বেলা ১১টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত চলবে নতুন-ধরা হাতীদের গলায় ফাঁস পরানোর খেলা। ছ'ঘণ্টা দাঁড়ানো আমার অভ্যাস নেই কোনো কালে। তাই আমি মাঝে মাঝে নিচে নেমে এসে একটা গাছের ছায়ায় কিছু বিশ্রাম করে আবার উপরে উঠছিলাম।

বেলা সাড়ে তিন বা চারটের সময় শেষ নেমে এলাম। আর সেখানে ওঠা বা দাঁড়িয়ে থাকা কোনোটাই আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পা তখন সম্পূর্ণ অহিংস অসহযোগ আরম্ভ করে দিয়েছে, আমাকে আর মৈ বেয়ে উপরে উঠতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে দিতে রাজী নয়। একেবারে বাড়া অস্বীকার।

আমি তাতে খুব খুশিই হয়েছি। দেখলাম হাতী বাঁধা দেখার চেয়ে আমার পায়ের মুক্তি অনেক বড়। বন্ধুরা খুব সবল, তারা দমবার নয়, অতএব তারা যেমন ছিল তেমনি খাড়া রইল মাচার উপর। তখন ভিড় অত্যন্ত বেশি। পাঁচটি মাচা মোট। For Ladies Only মার্কা কোনোটাই নয়, অথচ মাচাগুলো সবই প্রায় লেডিতে ভরতি হয়ে গেল বিকেলের দিকে। তাদের মধ্যে গিয়ে কাঁপতে থাকলে হয়তো আমাকে তারা ঠেলে ফেলেই দিত হাতীদের সামনে। হেসো না বেবি, ঐ ভয়েই আরও মাচায় উঠতে শেষ পর্যন্ত সাহস করিনি। তার চেয়ে নিচেটা ঢের আরামপ্রদ। গাছের ছায়া তখন আমার কাছে অত্যন্ত উপাদেয় বোধ হচ্ছিল। আমি সেখানে প্রায় শুয়েই পড়লাম। দেহ ক্লান্ত, মন ক্লান্ত।

বেবি, এতক্ষণ খেয়াল করিনি, দেখি গাছের আর এক ধারে আরও একজন ক্লান্ত ব্যক্তি এসে বসেছেন। তাঁর হাতে রাইফল। পোষাক সাহেবী, যদিও শিকারের নয়।

আলাপ হল। তিনিই আলাপ আরম্ভ করলেন, কিন্তু আমার তখন কোনো বিষয়েই কোনো উৎসাহ ছিল না।

তিনি অন্নদাবাবুর শিকার-শিষ্য, এবং তাঁর সঙ্গে প্রায় সব শিকারেই গিয়েছেন। নাম কমলাক্ষ সরকার।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—বেবি, আমার তখন মনের মধ্যে হাতী মারার নিষ্ঠুরতার কথাটাই ঘুরে ফিরে উদয় হচ্ছিল—আমি জিজ্ঞাসা করলাম খেলা দেখে খুব আনন্দ হয় আপনার ?

কমলাক্ষবাবু বললেন—ভীষণ। এ একটি বড় রকম স্পোর্ট। দেখছেন না আমার গুরুদেব অন্নদাবাবু কি রকম হর্ষধ্বনি করছেন মাঝে মাঝে ? তিনি খুব আমোদ পান এ খেলা দেখে।

বুঝলাম এঁরা শিকারী, অতএব শিকারের মানবিক দিকটাই এঁদের কাছে বড়, পাশবিক দিকটি এঁদের চোখে পড়ে না। পাশবিক দিক অর্থাৎ পশুদের দিক। সেটি যে কি পরিমাণ করুণ তা অনুভব করতে পারলে এঁরা কি আর শিকারী হতে পারতেন ?

কিন্তু আমি তখন এতই ক্লান্ত যে কমলাক্ষবাবুর সঙ্গে নিতান্ত সৌজন্যবশতই আলাপ করছিলাম, নইলে অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়তাম সেই গাছের নিচে। বেবি, মেয়ার মর্শকদের হল্লা সত্ত্বেও আমার ঘুমের ব্যাঘাত হত না, এতই খারাপ লাগছিল সে সময়। তাই আমার দিকের আলাপ চলছিল নেহাত অনিচ্ছা সত্ত্বে, যেন একটা দায় কথা বলছে।

কমলাক্ষবাবুর আসল বক্তব্য ছিল এই যে একজন শিকারীর সঙ্গে বরাবর থাকলে, বিশেষ করে সেই শিকারীর যদি ব্যক্তিত্ব খুব জোরালো হয়, তা হলে নিজের হাতে-কলমে আর কিছু শেখা হয় না। শিকারের সমস্ত কৌশল হয় তন্ন করে শেখা হলেও নিজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা আসে না। অন্নদাবাবু কতবার কমলাক্ষবাবুকে গুলি করার সুযোগ দিয়েছেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে সুযোগ তিনি নিতে পারেন নি, শিকার-গুরুর পাশে বসে হাত কেঁপে গেছে। কি জানি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। এইভাবে চলতে চলতে নিজের উপর তিনি ক্রমে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে লাগলেন, এবং শেষে ঠিক করলেন শিকার শিখতে হলে একাই যেতে হবে জঙ্গলে। কাউকে না জানিয়ে যেতে হবে, বিশেষ করে অন্নদাবাবুকে না জানিয়ে। কারণ তিনি একথা শুনলে ভয় পেয়ে যাবেন।

"আমার যে হাতেকলমে শেখা হয়নি তা তাঁর মতো পাকা শিকারী ভাল করেই জানেন। তাঁর দুদিকে ঘুশকিল। তাঁকে না জানিয়ে যেতেও ইচ্ছা হয় না, অথচ জানিয়ে গেলে তিনি আমার কাছে যেটুকু সাফল্য আশা করবেন, সেটুকু তিনি পাবেন না, উপরন্তু আমার দুর্দশা কি ঘটবে তা ভেবে ভয় পেয়ে যাবেন। কারণ তিনি তো নিজের চোখেই দেখেছেন বাঘ গুলির আওতায় আসা সত্ত্বেও আমি গুলি চালাতে ভয় পেয়েছি। তাই ঘনাই, একদিন অন্নদাবাবু যখন এ অঞ্চল ছেড়ে কিছুদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন, আমি সেই সময় নিজের ক্ষমতা পরীক্ষার কাজে লাগলাম। ব্যর্থ হলে দেখবার কেউ নেই অথচ সফল হলে সবাই জানতে পারবে সে কথা।"

বেবি, কমলাক্ষবাবু একটানা নিজের কথা বলে যাচ্ছেন, কতক কানে আসছে, কতক আসছে না। মাঝে মাঝে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে, ঘুমিয়ে পড়ি আর কি, কিন্তু ভদ্রতার আটকাল, জোর করে জেগে রইলাম।

তিনি বলতে লাগলেন, "আয়োজন খুব ভালই হয়েছিল, পাকা শিকারীর সঙ্গে থেকে সেদিক দিয়ে কোনো ত্রুটি থাকবার কথা নয়।

"তারপর ঠিক ঠিক হিসাবমতো বাঘ তার খাদ্যের কাছে এলো, আমিও মাচা থেকে গুলি চালিয়ে দিলাম।"

"গুলি লাগল ?"—আমি তখন একটুখানি সচকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, যদিও এ প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য আমার কোনো ব্যগ্রতা ছিল না।

"অব্যর্থ গুলি মশায়, গুরুদেবকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম।"

ঘরের মতোই জিজ্ঞাসা করলাম,—যেমন আগেও দু'একবার করেছি—"তারপর কি হল?"

কমলাক্ষবাবু বললেন, "মশায় তখন আমার কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল, এ দৃশ্য অন্নদাবাবুকে দেখাতে পারলাম না। যাই হোক, আমি নিচে নেমে দেখতে গেলাম কোথায় গুলি লাগল।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "এক গুলিতেই মারা গেল? তাইটাল অংগে লেগেছে নিশ্চয়?

কমলাক্ষবাবু বললেন, "ঠিক তার বিপরীত। দুঃখের বিষয়, কিন্তু যা ঘটবার তাই ঘটল।"

আমি, বেবি, ভয় পেয়ে গেলাম, আবার এক দীর্ঘ কাহিনী শুনতে না হয়। কিন্তু আমার ভাগ্য ভাল, ঠিক এই সময় খেয়ার হাতী যার কাজ সেদিনের মতো হঠাৎ শেষ হয়ে গেল এবং মর্গকেরাও কোলাহল করতে করতে নেমে আসতে লাগল।

আমি ঘরে ফেরার আনন্দে লাফিয়ে উঠে বন্ধুদের সঙ্গে এসে জুটলাম এবং আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ ট্রাকে গিয়ে উঠলাম।

কমলাক্ষবাবুর কথা আর শেষ হল না। আমার দিক দিয়ে কিছু অভদ্রতা হল, তখন আর উপায় ছিল না। তারপর কোথায় গেলেন কমলাক্ষবাবু, আর কোথায় গেলাম আমি!

বেবি খুব বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ভূত কোথায়?

ভূত দেখছ না বেবি? ঘূর্ণঝোড়ার সমস্ত আকাশে বাতাসে ভূত, সমস্ত গাছে গাছে, পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে। কি এক অদ্ভুত শক্তির খেলা। নইলে কলকাতার বাঁধা আরাম ফেলে জলপাইগুড়ি জেলার কোন্ এক অখ্যাত কোণে বিরল জঙ্গলে একটি নিছুর প্রাচীন প্রথায় গোটাকত হাতী ধরা দেখতে ছুটে আসব কেন? সুখে ছিলাম, কে কিলিয়ে ঘরের বার করল? কে সুখে থাকতে কিলোয় জান না বেবি? কে কিলোয়?

জানি, কিন্তু কাব্য আর ভূত কি এক?—বেবি মধ্য বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করল। আপনি তো কাব্য করছেন। ভূত কোথায়?

একদিক দিয়ে সবই ভূতের খেলা। কিন্তু তবু আরও একটুখানি ধৈর্য ধরে শোন। শোন বেবি, আজ এতদিন পরে গত রাত্রে বিছানায় শুয়ে কি জানি কেন ঘূর্ণঝোড়ার কথা মনে পড়ল। কোন্ কথা কখন মনে পড়বে তা তুমি আমি কেউ বলতে পারব না। জানিনা, তুমি এই মুহূর্তে হয়তো কোনো একখানা নতুন শাড়ীর কথা ভাবছ।

বেবি বেশ চেঁচিয়ে বলে উঠল—না।

বেশ, তা হলে শোন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে দিনের সব ঘটনাই ভাবছিলাম। তার মধ্যে কমলাক্ষবাবুর কথাটাও এসে গেল, এবং খুবই মন খারাপ হল ভেবে যে তাঁর কাহিনীটা পুরো শুনলে আমার ভ্রমণ কাহিনীতে আরও একটা নতুন গল্প যোগ হত।

নিতান্তই কোনো অদৃশ্য যন্ত্রের নিয়মে, বেবি, তিনি যা যা বলেছিলেন এবং যেটুকু আমার কানে এসেছিল তা জুড়ে জুড়ে একটা অবিচ্ছিন্ন গল্প হয় কি না ভাবছিলাম, এমন সময় বিদ্যুতের মতো একটা কথা আমার মনে জ্বলে উঠল। তাই তো! কমলাক্ষবাবু তো তাঁর সব কথাই বলেছেন, আমি খেয়াল করিনি। তিনি যখন আমাকে তাঁর গল্প শোনাচ্ছিলেন তার আগেই তো তিনি মারা গেছেন!

মারা গেছেন। মারা গেছেন?—এই দুটি শব্দ প্রথমে অর্থচেতন অস্পষ্ট মনে এলো, তারপর তার সমস্ত বীভৎসতা নিয়ে এক মুহূর্তে আমার মর্মে বজ্রধ্বনির মতো বেজে উঠল।

আমি একলাফে বিছানায় উঠে বসলাম। আমি ভূতের পাশে বসে ভূতের সঙ্গে আলাপ করেছি পুরো এক ঘণ্টা! কি ভয়ানক কথা! বেবি, কমলাক্ষবাবুর শেষ কথাটির অর্থ আজ চোদ্দ বছর পরে মাত্র কাল রাত্রে বুঝতে পারলাম, আর আমার সমস্ত গা ঘেমে উঠল। এতদিনের দুরত্ব ঘুচে গেল মন্ত্র বলে, আমি যেন আবার সেই হাতীখেদার ধারে কমলাক্ষবাবুর পাশে বসে আছি। আমি যে আমার ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে আছি তা মনেই এলো না।

কমলাক্ষবাবু তো সবই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ঠিক তার বিপরীত", মানে 'বাঘ কি মরেছিল?' এ প্রশ্নের ঐ উত্তর দিয়েছিলেন। 'ঠিক বিপরীত' কথাটি ব্যাখ্যা করলে বোঝায় বাঘই তাঁকে মেরেছিল। তারপর বেবি, তিনি বলেছিলেন "দুঃখের বিষয় বলায়, কিন্তু যা ঘটবার তাই ঘটল।"—সবই এখন স্পষ্ট, আমি সেদিন বুঝতে চেষ্টা করিনি, তাই বুঝিনি।

কিন্তু বেবি, যখন বুঝলাম তখন আমার জ্ঞান লোপ পায় আর কি! দেখ বেবি মিথ্যে না। চোদ্দ বছর আগে যে ভয় পাওয়া উচিত ছিল, সেই ভয় পেলাম গত রাত্রে।

"কিন্তু আপনি আপনার একটি কল্পনাকে এতটা বাড়াচ্ছেন কেন? আপনি এখন যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, তা সত্যি নাও তো হতে পারে।"—বেবি খুব যুক্তিসঙ্গত একটা প্রশ্ন তুলল। কিন্তু সত্য যে আরও ভয়ানক। বেবিকে বললাম—"তোমার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এমন কি তুমি যা বলেছ তাতে আমার মনে সন্দেহ জাগলে আমাকেই benefit of the doubt দিতাম এবং তোমার কথা মেনে নিতাম। কিন্তু কাল যে তিনি এসেছিলেন।

অ্যাঁ!—বেবি চিৎকার করে বলে উঠল, কাল কে এসেছিলেন, কমলাক্ষবাবু? জীবিত আছেন তিনি?

না বেবি, তিনি আমার ভয়ের মুহূর্তে কাল রাত্রে শিকারের পোশাকেই এসেছিলেন, দেয়ালের ভিতর দিয়ে এসেছিলেন এবং দেয়ালেই মিলিয়ে গেছেন। আরও আশ্চর্য বেবি, তিনি মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, এবং ভূত দেখে এই দ্বিতীয় বার। বেবি, মনে হচ্ছে যেন তিনি যাননি, এই ঘরেই আছেন এবং এখনও আছেন।

কিন্তু এ কথা বলেই আমার খেয়াল হল, বেবি হয় তো ভয় পেয়ে যাবে, তাই আমি তাড়াতাড়ি উঠে নীল আলো নিবিয়ে সাদা আলো জেলে দিলাম।

কিন্তু এ কি ভৌতিক কাণ্ড! নীল আলো তো ঠিক নেবেনি। বেবির মুখের উপর নীল আলো ঠিকই আছে, আর সব দিকে সাদা। বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তারপর দেখি নীল আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে মুখ থেকে। পরে বুঝতে পারা গেল বেবি ভয়ে নীল হয়ে গিয়েছিল। তারপর সাদা আলোর ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে।

বেবি কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কাকাবাবু আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসুন।

———

শরৎ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য

অরবিন্দ পোদ্দার

প্রায় বছর চল্লিশেক আগে শরৎচন্দ্র একটি অভিভাষণে এই আশা ব্যক্ত করেছিলেন, "এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ-সাহিত্যের মত যেদিন সে (বাংলা সাহিত্য) আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার সাথখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।" শরৎচন্দ্রের এই আশার অভিব্যক্তির মধ্যে তাঁর আপন শিল্পাদর্শের একটি দিকের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ; সেটা হলো, মানবিক বোধের দিক। সেই বোধ কিভাবে তাঁর গল্পোপন্যাসকে পরিব্যাপ্ত করে আছে বাংলা উপন্যাসের পটভূমিকায় তারই ঈষৎ পরিচয় গ্রহণ করা যাক।

বাংলা উপন্যাসের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে অনেক বছর আগে। সাহিত্যের বিশ্বমর্যাদা লোকের পক্ষে এ সময়টা খুব দীর্ঘ নয় ; আবার আধুনিক জীবনপ্রবাহের দ্রুত রূপান্তরশীল সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্ত অল্পও নয়। এই সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক উপন্যাসে আমরা সমগ্র দেশের চিত্ত-সংবেদনার কলরোল শুনতে পাইনি বলে ক্ষুব্ধ হই, তাহলেও একথার প্রতিবাদ চলে না যে বাংলা উপন্যাসের বিষয়বস্তুর বৈভব বিস্ময়কর। এমন কি, শরৎচন্দ্রের কাল পর্যন্তও তার বিস্তার উল্লেখনীয় ভাবে বিপুল। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বিস্মৃত করেছিলেন রোমান্সের ঐন্দ্রজালিক জগতে, রবীন্দ্রনাথ মনোধর্মী কাব্যের সূক্ষ্মতায়, শরৎচন্দ্র করেন সমাজ-জীবনের প্রাঙ্গণে। পরিচিত কাহিনী, পরিচিত সমস্যা এবং চরিত্রেরা তাঁর গল্প ও উপন্যাসে ভিড় করে এলো—পরিচিতের মধ্যে বিস্মৃত হলাম আমরা। শরৎচন্দ্র ফিরে এলেন বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বন্দ্ব-আবেগমুখর গৃহাঙ্গণে, এবং আরও নিবিড়ভাবে মানুষের ক্রন্দনের সান্নিধ্যে। বলা বাহুল্য, এই জীবনের পরিসর বিশাল নয় ; তা একান্তভাবেই দেশকাল-নির্ভর, বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমায় সীমিত। এতটা সীমিত যে, সমগ্র বাংলাদেশও যেন তাঁর উপন্যাসের পাতায় সত্য হয়ে উঠেনি। পল্লী বাংলার কলরবহীন কর্মবিমুখ স্তিমিত জীবন তাঁর উপন্যাসে সত্য হয়ে ফুটে উঠল ; পল্লী বাংলা নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করল শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে। এই আবিষ্কারে আনন্দ, আনন্দ থেকে স্বীকৃতি, এবং স্বীকৃতির ব্যাপকতায় শরৎচন্দ্র বাংলার সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাসকার।

পূর্বেই বলেছি, এই পরিচিত ভুবন ক্ষীণ-পরিসর। কিন্তু, ক্ষীণ-পরিসর হওয়ায় অন্যদিক থেকে বিশেষ লাভজনকই হয়েছে—শরৎচন্দ্র এই সঙ্কীর্ণ ভুবনটিকে নিবিড় আত্মীয়তার স্পর্শে ভরে দিয়েছেন। তাঁর কাহিনীর মাধ্যমে সমাজ-জীবনের অঙ্গে, অঙ্গে হৃদয়ের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল, মানুষের সুখদুঃখের সমান অংশীদার এক হৃদয়ের সাক্ষাৎ পেলাম আমরা, আর পেলাম মাটির কোমল স্পর্শ। কল্পনার প্রসারে নয়, অতিশয়তায়ও নয়, রোমান্সের বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্যে নয়, সহানুভূতি ও সহানুভূতির আন্তরিকতায়, গভীরতায়, সমগ্রতায়, বাংলার পল্লীসমাজ শরৎ-সাহিত্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। ঐ পরিচয়, তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে, নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ; একথা বলার অন্য অর্থ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস এক ব্যাপকতর জীবনের সন্ধানী।

শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার অন্যতম হেতু, তিনি নিপুণ কাহিনীকার। যে যে উপাদান আশ্রয় করে উপন্যাস আপন রূপে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হয়ে উঠে, গল্প তার অন্যতম—যদিও একমাত্র নয়। পাঠকচিত্তে গল্পের আবেদন শাশ্বত। কিন্তু, সে আবেদন মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তির নিকট, যা সময়ের অনুবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ঘটনাবলীর বিবরণ শুনে অথবা পাঠ করে পরিতৃপ্ত হতে চায়। অত্যন্ত প্রাজ্ঞ মনের অন্তরেও সেই আদিকালের মানবশিশুটি আজও জীবিত; তার নিত্যকালের জিজ্ঞাসা 'তারপর? তারপর?' শরৎচন্দ্রের কাহিনীবিন্যাস খুব সহজে পাঠক মনের এই পিপাসা নিবারণ করে। কাহিনীর গ্রন্থনা অত্যন্ত অবিশ্বাস্য হলেও এবং কখনও কখনও গল্পের উন্মোচনে অতিপ্রাকৃতের আশ্রয় গ্রহণ করলেও এবং তজ্জনিত নানাবিধ অপটুত্ব সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাস যে একালেও এত জনপ্রিয় ও সমাদৃত, তার বিশেষ বিশেষ কারণের মধ্যে এও একটি যে, তা গল্পে অত্যধিক সরল।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চিন্তা, কর্ম ও ভাবনা অত্যধিক কাল-সচেতন, কালের বোধে সীমিত। কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা ঘটে বা ঘটতে পারে, কি কথার পর কি কথা আসে বা আসার সম্ভাবনা, তার একটি চিত্র, হয়তো বা অস্পষ্ট, আমাদের চৈতন্যে উদ্ভাসিত। সেজন্য আমাদের বেশির ভাগ কথায়, বেশির ভাগ কর্মে সময়ের পারম্পর্য লক্ষণীয়। কিন্তু, আমাদের দিনলিপিতে সময় ছাড়াও অন্য অনেক উপাদান আছে যা মানব সত্তাতার ঐতিহাসিক বিবর্তনের জটিলতা, হৃদয়াবেগের বিচিত্র প্রক্ষেপ ইত্যাদির ভিতর দিয়ে জন্মলাভ করেছে। মূল্যচেতনা তার অন্যতম। অবশ্য, কোন্ অভিজ্ঞতা মূল্যবান, কি হলে একটি অনুভব ও তার অভিব্যক্তি মূল্যবান হয়ে উঠে, মানুষে মানুষে মূল্যের বোধ এক কি বিভিন্ন, এসব জিজ্ঞাসার মতভেদ স্বাভাবিক। কিন্তু, একথা সত্য, বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা, অনুভব এবং আচরণ আমাদের নিকট মূল্যবান বলে গৃহীত হয়ে থাকে, এবং মূল্যের এই চেতনাই মানবেতিহাসকে সমৃদ্ধ করে, সংস্কৃতিকে করে বেগবান। সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে দুটি স্বতন্ত্র অথচ সৃষ্টিশীল ঐক্যের পরিমাপে ওজন করা চলে; একদিকে তা কাল-পরিমিত, অন্যদিকে অনুভবের তীব্রতায় অর্থাৎ মূল্যের বোধে উজ্জ্বল। সার্থক উপন্যাসকেও, জীবনের মত, গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক মূল্যের চেতনায় প্রোজ্জ্বল হতে হয়।

শরৎচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসেই শ্রেয়সের সুতীব্র চেতনা বিদ্যমান; তাঁর সমস্ত রচনাতেই সভীর মূল্যবোধের স্বাক্ষর। সে স্বাক্ষর অস্বচ্ছ হোক, রক্ষণশীল হোক অথবা সনাতন হিন্দু আচার-সম্মত হোক—সুস্থ মূল্যবোধের চেতনা তাঁর অধিকাংশ পাত্রপাত্রীর সামাজিক বা ব্যক্তিক আচরণে ও বোধে অবশ্য লক্ষণীয়। অবশ্য বলা যায়, এই মূল্যচেতনা যদিও স্বতঃস্ফূর্ত এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রগাঢ়, তথাপি তা ব্যক্তিক সীমায় মর্মাহতরূপে সীমিত। সেখানে ব্যক্তির বৃহত্তর সত্তার পরিচয় যেমন অনুপস্থিত, তেমনি বৃহত্তর শ্রেয়সের বা মূল্যের বোধও অত্যন্ত অস্পষ্ট। কিন্তু, অস্পষ্ট হলেও সেই বোধ যে বর্তমান তারও কোনো প্রতিবাদ চলে না। সেই বোধে অনুপ্রাণিত হয়েই শরৎচন্দ্র সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কার, পারিবারিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়কে নতুনভাবে বিচার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, এবং তাঁর বিচারে যা অসত্য বা অযৌক্তিক তাকে নানাভাবে আক্রমণও করেছেন তিনি। গ্রামীন সমাজের সমস্ত স্বার্থপরতা, সমাজবিধায়কদের কদাচার, অত্যাচার, শঠতা ইত্যাদিকে তিনি কঠোর ভাষায় ধিক্কার দিয়েছেন, তার আত্মম্ভরকারী চিত্র নিষ্করুণ সত্যতায় উদ্ঘাটিত করেছেন। কিন্তু, সেই সমাজেরই কিছু কিছু শাশ্বত মূল্যকে তিনি বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছেন, এবং তাকে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিতও করেছেন; যেমন, ভ্রাতৃপ্রেম,

সমাজসম্মত বিবাহ-সম্পর্ক, বৈধব্যদশায় ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি। বিবাহ যদি পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সুখ সম্পাদনে ব্যর্থও হয়ে থাকে তথাপি তার পবিত্রতা স্বীকার্য। যুগযুগান্তর ধরে চলতে থাকা হিন্দু নারীর পাতিব্রত্যের এই আদর্শ বা সংস্কার থেকে তাঁর অধিকাংশ নারীচরিত্রই মুক্ত হ'তে পারেনি। এমন কি, যাদের কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়েছে—যেমন কমল—তারাও বৈধব্য জীবনের রূঢ়কাঠিন্য থেকে আপনাদের বাঁচাতে পারেনি। এই স্বীকৃতির মধ্যেই তারা জীবনের চরিতার্থতা অন্বেষণ করেছে। শরৎ-মানসের রক্ষণশীল মনোভঙ্গি এসব ক্ষেত্রেই অতিশয় প্রকট, এবং যুক্তিহীনও বটে।

অবশ্য, এর বিপরীত সত্যের স্বীকৃতিও শরৎ-সাহিত্যে লক্ষণীয়। প্রেমপিপাসু নারীর হৃদয়-বিক্ষোভ তিনি শুনতে পেয়েছেন, তাদের বুভুক্ষিত অন্তরের হাহাকার ও ক্রন্দন তাঁর সংবেদনশীলতায় আঘাত করেছে, এবং তিনি সেই অতৃপ্ত কামনার সুতীব্র মর্মবেদনা ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর উপন্যাসে। সেসব ক্ষেত্রে সতীত্বের প্রচলিত আদর্শ ও ধারণা সম্পর্কে মৌল প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। তাঁর শিল্পীমানস স্বভাবতই নারী হৃদয়ের সেই সমুদ্র-তরঙ্গের, সেই অশান্ত আলোড়নের পরিচয়ে তৃপ্ত হয়েছে; সেই বেদনার সঙ্গে আপন সহানুভূতির অমৃত মিশ্রিত করে তাকে জীবন্ত করেছে। সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়েছে, তিনি যেন নারীপুরুষের প্রেম-সম্পর্কের সামগ্রিক বিচারের পক্ষপাতী। সে সব ক্ষেত্রে তাঁর দাবি, নিষ্প্রাণ সমাজ সম্পর্কের, নিকট প্রাণের সহজ প্রবণতার আত্মসমর্পণ নয়, প্রাণধর্মের সহজ অভিব্যক্তির নিরিখে সমাজধর্ম ও ধর্মীয় অনুশাসনের মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এই দাবি যে উত্থাপিত ও প্রচারিত হয়েছে, প্রকট রক্ষণশীলতাসত্ত্বেও এই বোধ তাঁর চিত্তকে যে মথিত করেছে, তাতেই তাঁর আধুনিক চিত্তটি উন্মোচিত হয়েছে, এবং তাঁর সাহিত্যও এ-কালের হৃদয়সান্নিধ্য লাভ করেছে।

নারীহৃদয়ের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্যই সার্থক রসোত্তীর্ণ নারীচরিত্র সৃষ্টির জন্য শরৎ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। চরিত্র-চিত্রণে টাইপ-চরিত্র সৃষ্টির দিকেই শরৎচন্দ্রের অত্যধিক প্রবণতা; সেজন্য পুরুষ চরিত্র হোক, নারী চরিত্র হোক সবগুলিই স্রষ্টার উপলব্ধির একই বিন্দু ও প্রত্যয় থেকে উৎসারিত। রমেশ-নরেন-মহিম-উপেন্দ্র প্রভৃতি যেন হয় একই বৃক্ষের প্রসূন; তাদের মধ্যে যে ব্যক্তিক পার্থক্য এবং মনোভঙ্গির প্রভেদ, তা একান্তই প্রতিবেশ-নির্ভর, প্রতিবেশের বিভিন্নতাই তাদের আচরণের বিভিন্নতার কারণ দায়ী। ঐ প্রভেদ ব্যক্তিত্বের মৌল ভিত্তি পর্যন্ত প্রসারিত নয়। আমাদের পক্ষে অনুমান করা কঠিন নয় যে, একই পরিবেশে একই মানসসংঘাতের পীড়নে তারা একই রূপ কর্ম বা অনুভবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে। সেজন্য, শরৎচন্দ্রের চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্যশীল অভিব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হই না, একই ব্যক্তিত্বের বিবিধ অনুভব ও সত্তার সঙ্গে আত্মীয়তা লাভ করি মাত্র।

নারীচরিত্রের ক্ষেত্রেও একটি প্যাটার্নের প্রতি বিশেষ ঝোঁক অনায়াসলক্ষ্য। নারী শরৎসাহিত্যে এক ভুবনভরা মহিমায় মহিমময়ী। এই সব মহিমময়ী নারীদের অধিকাংশই সমাজধর্মের বিচারে নিগৃহীতা, লাঞ্ছিতা, উপেক্ষিতা, কিন্তু অত্যাচারিত হয়েও তাদের হৃদয় প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল, আপন অধিকার ঘোষণায় ক্লান্তিহীন। শরৎচন্দ্র এই নারীদের মানসিক দ্বন্দ্ব, হৃদয়ানুভূতি ও যুগযুগান্তর স্বীকৃত সংস্কারের মধ্যে বিরোধ অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন, এবং ফলে তারা অনেকেই আমাদের হৃদয়ে স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত। এক কথায় বলা যায়, বাংলা উপন্যাসের অধিকাংশ অবিস্মরণীয় নারীচরিত্রই শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি।

কিন্তু, সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধাচারী নারী চরিত্রের বিদ্রোহের মনোভঙ্গি শরৎ-সাহিত্যে শাশ্বত সত্য বলে স্বীকৃত হয়নি। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের নারী চরিত্রে একটি অপরূপ কল্যাণময়ী সত্তা আবিষ্কার করা যায়, যা জীবন-পরিবার-সংসারকে এক অপূর্ব শ্রী ও মাধুর্যে মণ্ডিত করে রেখে। প্রেমে তাদের হৃদয় উপপ্লাবিত, কিন্তু যুগপৎ স্নেহের সিঞ্চনে তারা জননীর মত লালনও করে। সংসারের সমস্ত কর্ম, ব্যবস্থাপনা ও নিয়মের মধ্যে তাদের আপন শক্তির অভিপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই। এ প্রকাশে কোনো দুঃসহ আলোকের ঝলকানি নেই, আছে কল্যাণময়ী রূপের লাবণ্য ও জ্যোতি। সহজ হৃদয়বৃত্তির দ্বারিতে তারা সমাজধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করে, সন্তানস্নেহে সহস্র ধারায় তাদের হৃদয় উৎসারিত হয়, প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাদের কর্তৃত্বে মধুর হয়ে উঠে, কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত জীবনে শুধুই বঞ্চনা, আত্মক্ষয়ী ব্রতোপবাস। অপরকে অতিরিক্ত করার জন্যই তারা নিজেরা রিক্ত হয়, হতে ভালবাসে। পল্লী বাংলার ঘরে ঘরে সম্ভবত এখনও এমন নারীচরিত্র প্রতিদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায়, হৃদয় তাদের মধুক্ষরা, নয়নে নীরব আকুতি। উপন্যাসে এই ধরনের নারী চরিত্র অধুনা বিরলদৃষ্ট; জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও সংঘাতে নারীর অন্তর-জীবনেও আসছে অভাবনীয় রূপান্তর। জীবনের রূপান্তরিত পরিসরে শরৎচন্দ্র-অঙ্কিত দুর্বল অশক্ত নারী বিশেষ সফলতা অর্জন করবে না তা বলাই বাহুল্য।

গ্রামীন নিম্নকোটির জীবন থেকে তিনি উপন্যাসের উপাদান এবং রস আহরণ করেছেন বলেই নিম্ন-মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা, ভাবপ্রবণতা, আবেগের অতিশয়তা, চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব, ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য শরৎ-উপন্যাসকে বহু বুদ্ধিবিদগ্ধ পাঠকের কাছে অপাংক্তেয় করে রেখেছে। আবেগের আধিক্য জীবনকে যেমন শক্তিতে নয় দুর্বলতায় কুণ্ঠিত করে রাখে, শিল্পকর্মকেও তেমনি তা নানাভাবে শিথিল ও সংহতিহীন করে রাখে। উপন্যাস সামগ্রিকভাবে অনুভবের সংহত শক্তিবৃত্ত রূপ লাভ করে না; বর্ণনা ও সংলাপ ভাবাবেগের অতিশয়তায় প্রয়াস ভেঙে পড়ে। উপস্থিত প্রয়োজনের তুলনায় হৃদয়ানুভূতির প্রক্ষেপ অতিরিক্ত হয়ে পীড়াদায়ক বলে অনুভূত হয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি উপন্যাসের পাতায় পাতায় নাটকীয় সংঘাত ও পরিবেশ রচনায় অত্যন্ত কুশলী ছিলেন। তাঁর জীবনের বোধে ও চরিত্রের উপলব্ধিতে হৃদয়ের স্থান মুখ্য বলে তাঁর নারীপুরুষ উচ্ছ্বাসে ভরপুর। 'বলিয়া ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল,' 'ঝপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল', 'বলিতে বলিতে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল,' ইত্যাদি ধরনের বিবৃতি তাঁর উপন্যাসের সর্বত্র ছড়ানো। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে হৃদয়-সংঘাত নেই বলিনে, কিন্তু প্রতিটি কথা অথবা কাজই সংঘাত বা উচ্ছ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে না; শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে অবস্তুভাবীরূপে করে। এটা নিঃসন্দেহে দুর্বলতার লক্ষণ, শক্তির লক্ষণ নয়। সেজন্য রাসবিহারী এবং কতকাংশে বিপ্রদাস এবং আশুবাবু ছাড়া সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে বলিষ্ঠ পুরুষ চরিত্র আছে কিনা, সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ। এমন কি, গৃহদাহের সুরেশও আপন শক্তির চেতনায় আত্মসমাহিত ও স্থিরচিত্ত নয়। অন্যান্যরা হৃদয়বৃত্তির অতিশয়তায় অবিশ্বাস্য ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে কোমল। তাই, তাঁর উপন্যাসে সমবেত অনুবর্তনে সংঘটিত ঘটনাবলী ও আকস্মিকের সম্ভাবনা পাঠককে ধরে রাখলেও মন পরিতৃপ্ত হয় না, হৃদয় ভরে না, অনতর্ক অনিপুণ রূপকর্মের অপূর্ণতায় মন ক্ষুব্ধ হয়।

কিন্তু, তৎসত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের যাবতীয় রচনাই মানবিক প্রীতির রসে সমুজ্জ্বল। এই গুণটি তাঁর উৎকৃষ্ট গল্প উপন্যাসকে যেমন নিকৃষ্ট কাহিনীকেও তেমনি এক অম্লান মহিমায় উদ্ভাসিত করে রেখেছে। মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব এবং শ্রেণীরূপে তাঁর সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক সূত্রের সত্যতায় বিশ্লেষিত না হলেও,

এবং পল্লী বাংলার নিরক্ষরের মানুষ তাঁর উপন্যাসে মুখ্যচরিত্রের আসনে প্রতিষ্ঠিত না হলেও তাদের মর্মবেদনাকে আত্মগত করার প্রয়াস শরৎচন্দ্র কখনো বিস্মৃত হননি। তাঁর আপন সাহিত্য সাধনা দেশের সর্বাপেক্ষা দুঃখী-জনের সুখদুঃখের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাধনা। তাঁর অন্তর্নিহিত সেই মানবতা অমৃতধারার মত তাঁর লেখনীর হতে নিঃসৃত হয়েছে, এবং সমস্ত গ্লানি ও কলুষ উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর সাহিত্যকে ঐশ্বর্যশীল করেছে। অবশ্য, তিনি কখনও এই বাণীকে উচ্চগ্রামে বেঁধে এর প্রচারে আত্মনিয়োগ করেননি, ঘটনার সহজ পরিণতিতে আন্তর গরজের তাগিদেই সেই সত্য প্রতিভাত হয়েছে। 'একাদশী বৈরাগী', 'অভাগীর স্বর্গ' ইত্যাদি গল্পের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের মত শরৎচন্দ্রেরও মানুষের প্রতি বিশ্বাস ছিল অগাধ। তিনি যে কাহিনীর বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের অন্তরাত্মার লালসা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদির বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করতে ইচ্ছুক এবং সমস্ত ব্যক্তিক ও সামাজিক সমস্যার ন্যায়ধর্মসম্মত প্রতিকার প্রত্যাশা করেন, তাতেই তাঁর মানুষের প্রতি অবিচল বিশ্বাসের স্বাক্ষর বিদ্যমান। মানুষের প্রতি আস্থা না থাকলে কল্যাণের ও সংস্কারের প্রেরণা আসে না। শরৎচন্দ্র সেই প্রেরণা লাভ করেছিলেন, এবং লাভ করেছিলেন বলেই 'বেনা-পাওনা'র জীবানন্দ চৌধুরীর মত অত্যাচারী নীতিধর্মহীন লম্পটও রূপান্তরিত হয়, মানবিক কল্যাণের শুভচিন্তায় তার হৃদয় ভরে ওঠে, চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। মানুষের আত্মশক্তির উদ্‌বোধনের শক্তিতে তিনি ছিলেন আস্থাশীল। তাঁর সুদৃঢ় প্রত্যয়, নানাবিধ গ্লানিতে হীন হলেও মানুষ জ্ঞান-বোধ উপলব্ধিতে উন্নততর জীবনযাপনে সমর্থ; সেই প্রেরণা জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক তার মধ্যে ক্রিয়াশীল। তাই, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস মানুষ রূপান্তরিত হয়, বদলায়; বদলায়—অর্থাৎ বৃহত্তর মহত্তর সত্তায় পরিণত হয় সে, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে তার উত্তরণ। সেজন্য এখানকার অত্যন্ত পীড়াদায়ক তরল ভাবপ্রবণতা এবং হৃদয়রসও আমাদের সহ্য হয়, কিন্তু আধুনিক কালের বহু মানবিক বোধের অভাবে স্থিট পাশবিকতার বিবরণ পাঠে মন বিদ্রোহ করে; পশুত্বের অতিশয় চেতনায় ক্লান্ত হয়ে মন বিদ্রোহ করে।

কিন্তু মানুষে তাঁর অপ্রমেয় বিশ্বাস সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসে প্রজ্ঞার দীপ্তি বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয় না। এদিক থেকে একমাত্র ব্যতিক্রমবোধ করি 'শেষ প্রশ্ন'। সেখানে আমরা তাঁকে যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য চিন্তার আশ্রয়ে জীবনের কয়েকটি দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত দেখি। পূর্বেই বলেছি, তাঁর জীবনবোধে হৃদয়ের স্থান মুখ্য, তাই তা কদাচিৎ সুউচ্চ প্রজ্ঞাধর্মী চিন্তা ও মননশীলতার স্বাক্ষর বহন করে। সেজন্য, শুধু যে সামাজিক বিচরণভূমির বিচারেই তাঁর উপন্যাস ক্ষীণ-পরিসর তা নয়, চিন্তা-কল্পনা-প্রজ্ঞার ব্যাপ্তির অভাবও তাঁকে খুব গভীর করে তোলে নি।

পরিশেষে এটুকু বলা যেতে পারে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস আমাদের দৈনন্দিন জীবনের হাসি-কান্না, আনন্দ-বিষাদ, স্বপ্ন-ব্যর্থতা, ঈপ্সিত বস্তুটিকে সাময়িকভাবে হারানো এবং পুনরায় ফিরে পাওয়ার নিত্য-নৈমিত্তিকতা নিয়ে গঠিত। এর মূল সুরটি তাই কোমল, করুণ, স্নেহাভিষেকে দ্রব। প্রাজ্ঞ মন নিয়ে যখন আমরা তা অধ্যয়ন করি, তখন রূপকর্ম হিসেবে তার অসামান্য ব্যর্থতা ও অপূর্ণতায় আমাদের ক্ষোভের অবধি থাকে না, কিন্তু অধ্যয়নে আমরা অত্যাদি বীতস্পৃহ নই। নিজেদের প্রতি আমাদের ভালবাসা ও অনুরাগ কখনও মলিন হয় না বলেই, সম্ভবত শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বাঙালী পাঠকের এমন উৎসাহ। ইদানীংকালে বাংলা উপন্যাসের উল্লেখনীয় বিবর্তন সত্ত্বেও কাল তাঁকে বিস্মৃতির গর্ভে আজ নিক্ষেপ করেনি।

———

গল্পগুচ্ছে নারী চরিত্র

শ্রীশান্তি মাঝী

ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালের বরাঙ্গনাদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

"পরেন বটে জুতো মোজা
চলেন বটে সোজা সোজা
বলেন বটে কথাবার্তা
অল্প বেশী চালে"

প্রায় ৬০ বৎসর আগেকার কথা। তখন বাংলাদেশে জুতোমোজা পরা যে মহিলারা অল্প বেশী চালে কথাবার্তা বলতেন তাঁরা খুবই ছিলেন অল্পসংখ্যক। যাই হোক, স্ত্রী-স্বাধীনতার একজন অগ্রদূত ছিলেন কবির মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বাঙালী মহিলা হয়েও পর্দা ঘুচিয়ে গড়ের মাঠে বেড়িয়েছেন। কলকাতার রাস্তায় তিনি প্রথম বেরিয়েছিলেন সম্ভ্রান্তবংশীয়াদের মধ্যে। সুতরাং রহস্য করে রবীন্দ্রনাথ আধুনিকাদের 'জুতো মোজা পরা'র অপবাদ দিতেই পারেন।

কিন্তু ঐ যুগেই রবীন্দ্রনাথ যে গল্পগুচ্ছ লেখেন, তার নায়িকারা 'কালিদাসের কালে'র মালবিকা, নিপুণিকা চতুরিকার মত লোএরেন্থ মুখে মেখে অশোকতরুতে পদাঘাতও করতেন না, অথবা জুতো মোজা পরে অল্প বেশী কথাবার্তাও কইতেন না। এঁরা ছিলেন জুতো মোজাহীন এবং জামাহীন শাড়ী পরিহিতা একেবারে সনাতনী বাঙালী মেয়ে। তাই দেখি 'অধ্যাপক' গল্পে কলেজের ছেলে মহীন্দ্রও বলছেন, "আমার অন্তঃকরণ কল্পনাযোগবলে নারীসৌন্দর্যের একটা ধ্যানমূর্তি যে সৃজন করিয়া লয় নাই, একথা বলিতে পারি না। সেই মূর্তিকে নানা বেশভূষায় সজ্জিত এবং নানা অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়াছি কিন্তু কখনও সুদূর স্বপ্নেও তাহার পায়ে জুতা, গায়ে জামা, হাতে বই দেখিব, এমন আশাও করি নাই, ইচ্ছাও করি নাই।" কিন্তু মহীন্দ্রর হৃদয়লক্ষ্মী এইরূপেই দেখা দিলেন।

গল্পগুচ্ছের বেশীর ভাগ নায়িকারা এই কিরণের পর্যায়ে পড়েন না। শিলাইদহ বা সাজাদপুরে বাসকালে গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ গল্প রচিত। গল্পের মানুষগুলি সেই আবেষ্টনীর সঙ্গে মিল রেখেই কবির লেখনী হতে প্রকাশিত হয়েছে। কচিৎ দুচারটিতে যদি তা সহরে মানুষ আছে, তবু তারাও আধুনিকতায় গ্রামের চেয়ে দুই এক ধাপে ঊর্দ্ধে যায়। অন্তত নারী চরিত্রের বেলায় ত বটেই। তাঁরা শিশুকালে শিবপূজা করতেন, তারপর আট কি নয় বৎসর বয়সে কেউ শিবকুল্য কেউ বা নবী তৃণী কুল। স্বামী লাভ করে শ্বশুরালয়ে চলে যেতেন। সেখানে ঢেঁকিশালে নূতন ধান কুটতেন, সন্ধ্যাকালে "সন্ধ্যাদীপ হাতে গোয়ালঘরে আলো দেখাইতে যাইতেন। বয়স হলে "বিরল কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া প্রাঙ্গণে বড়ি দিতেন" এবং বন্ধুর সঙ্গে দুর্বল কণ্ঠে সাধু ভজনদাসের দেহতত্ত্ব গান গুঞ্জন করিতেন।" এই সময়টুকুর মধ্যেই তাঁদের চরিত্রের চিত্রগুলি নানাভাবে অঙ্কিত।

এটা হ'ল মোটামুটি পল্লীবাসিনী নারীদের রূপ। কিন্তু পল্লীবাসিনীই হোন আর সহরবাসিনীই হোন, নারী সর্ব্বত্রই নারী। বিশ্ব শিল্পী সহরে ও পল্লীতে সেকালে ও একালে সর্ব্বত্রই নারীকে নানারূপে গড়েছেন। একই ছাঁচে ঢেলে সব নারীকে অথবা সব পুরুষকে যদি বিধাতা গড়তেন তাহলে পৃথিবীতে কোথাও কিছু নূতনত্ব পাওয়া যেত না। সেই রকম গঠন নৈপুণ্য মানবশিল্পীর মধ্যে আমরা আশা করতে পারি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত শিল্পীর কাছেও বৈচিত্র্যের আশা যদি না করি ত কার কাছে করব? রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের ছোট গণ্ডীটুকুর মধ্যে যে সব নারী চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন তাদের 'বাংলার নারী নয়' একথা কেউ বলতে পারবে না, অথচ তাঁরা সকলেই সব বিষয়ে সনাতনী নন। অর্থাৎ সব বিষয়ে তাঁরা মনুসংহিতা মতে চলেন না। তাঁরা জন্মেছিলেন নব্বই বা আশি বৎসর পূর্ব্বে সনাতন সমাজেই। কিন্তু তাঁরা যেমন ভক্তিমতীও ছিলেন তেমন বিদ্রোহিনীও ছিলেন।

সচরাচর গ্রন্থকারদের রচনায় দেখা যায়, এক একজন এক এক রকমের স্ত্রী চরিত্র আঁকতেই ভালবাসেন। কাহারও নায়িকা সর্ব্বত্রই খড়্গ হস্তে, কেহ বা পতি ধ্যান পতি জ্ঞান ছাড়া কিছু ভাবেন না। কোনো লেখকের ধারণা হয় বাস্তবে যেমন নারী দেখা তার চেয়ে শাস্ত্রে নারীকে যেমন হতে বলা হয়েছে তাই আঁকাই নারী চরিত্র অঙ্কনের বিশিষ্টতা। এমনও অনেকে আছেন তাঁরা জীবনে যেমন মেয়ে দেখে চমকিত হয়েছিলেন সেটি শুধু একই রকমের। চরিত্রের বৈচিত্র্য তাঁদের আকর্ষণ করেনি। পরের ছেলেকে যাঁর নায়িকা নিজের ছেলের চেয়ে ভালবাসেন, তিনি কিছুতেই নিজের ছেলের প্রতি বাৎসল্যের চিত্র আঁকতে চান না, এমনও দেখা যায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোট ছোট গল্পেও আমরা বৈচিত্র্যের ছড়াছড়ি দেখি। তাই বলা যায় না কোন্ মেয়েটি তাঁকে বেশী চমকিত করেছিল! তিনি পতিপ্রাণা 'কুমু'কেও যেমন মমতা ও নিপুণতার সঙ্গে এঁকেছেন ভ্রাতৃস্নেহাতুরা শশীকেও তেমনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে এঁকেছেন। এঁরা নারীত্বের এক এক দিকে আদর্শ বলা যেতে পারে।

যাঁরা আদর্শ নারী তাঁদের কথা আমরা পরে বলব। কিন্তু যাঁরা নিতান্তই সাধারণ বা সাধারণের চেয়েও একটু নীচে এমন নারীর ছবিও গল্পগুচ্ছে আমরা দেখতে পাই। এক আধটা দেখি :—

ধরা যাক, গুরুচরণের দ্বিতীয় সংসারের কথা। গুরুচরণের মৃত্যুকালে এই দ্বিতীয় পক্ষ "এক পায়ের উপর বসিয়া দ্বিতীয় পায়ের হাঁটু চিবুক পর্য্যন্ত উত্থিত করিয়া কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা লঙ্কা এবং চিংড়ি মাছের কাল-চচ্চড়ি দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পান্তাভাত খাইতেছিলেন। যখন ডাক পড়িল তখন শুপাকৃতি চর্ব্বিত ডাঁটা এবং নিঃশেষিত অন্নপাত্রটি ফেলিয়া পত্নীর মুখে কহিলেন, 'ছুটো পান্তাভাত যে মুখে দেব, তারও সময় পাওয়া যায় না।' পরে দেখা গেল স্বামীর প্রতি টান না থাকিলেও তাঁর টাকার প্রতি গৃহিণী নিস্পৃহ নন।

বাংলাদেশে এমন নারীর অভাব নেই, তবে সকলে সে কথা স্বীকার না করতে পারেন। কারণ ইহা ত আদর্শ নয়।

কিন্তু যিনি শিল্পী তিনি ত কেবল আদর্শ আঁকেন না। আদর্শ নয় এমন চরিত্রেই বৈচিত্র্য বেশী, শিল্পকলাও একটুখানি খুঁৎকেই বেশী চিত্তহারী করে তোলে কত সময়।

কিন্তু বাংলাদেশের একদল মানুষ আছেন যাঁরা শিল্পের খাতিরে স্ত্রী চরিত্রে কোনো কোনো ত্রুটি কিছুতেই স্বীকার করতে পারেন না। পরচর্চ্চার সময় বা মুখরোচকভাবে দশজনকে শোনানো যায়, কাগজে

কলমে তা লেখা চলে না। রবীন্দ্রনাথ যে যুগে ছোটগল্প লিখেছিলেন সে যুগে আরোই চলত না। বঙ্কিমচন্দ্র যতটুকু বৈচিত্র্য স্ত্রী-চরিত্রে এনেছিলেন তার চেয়ে বেশী আনবার সাহস কারোরও ছিল না। যাঁরা করতেন তাঁরা স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতিকে বাদ করে অপ্রাকৃত নারী চরিত্র এঁকে করতেন। কিন্তু প্রকৃত নারী চরিত্রে যা আছে তার অনেকগুলি পাঠকচক্ষের অন্তরালেই থাকত।

এইরকম একজন ছিলেন 'মোক্ষদা'। ইনি একেবারেই অপ্রাকৃত নন। অধ্যবসায় থাকলে "স্বর্ণযুগে"র এই মোক্ষদা সুন্দরীকে এদিকে ওদিকে বাংলার ঘরে আমরা আবিষ্কার করতে পারি। যে দেশে রমণীরা স্বামীগর্বে গর্বিতা বলেই পরিচিতা এবং নিজেকে স্বামীর চেয়ে নিম্নস্তরের জীব বলেই চিরজীবন শুনে এসেছেন সেই দেশের রমণী মোক্ষদা স্বামীকে দারিদ্র্যে তিতিবিরক্ত হয়ে বলছেন, "পুরুষ মানুষের মাথায় মস্তিষ্কের পরিবর্তে এতটা গোময় থাকিতে পারে তাহা তাঁহার পূর্বে ধারণা ছিল না।"

মোক্ষদা ও তাঁহার স্বামী বৈদ্যনাথ দুজনে মিলে যে অর্থলাভের আশায় সন্ন্যাসীর ছুরাচুরিতে সর্বস্বান্ত হলেন তার জোরটা দাঁড়াল বৈদ্যনাথের একলারই। স্বামী কিছু বলতে গেলে মোক্ষদা বলতেন, "বুদ্ধির পরিচয় অনেক দিয়াছ, এখন কিছুদিন ক্ষান্ত থাক।"

মোক্ষদারই প্ররোচনায় বৈদ্যনাথ যখন গুপ্তধন আবিষ্কারের চেষ্টায় কাশী গেলেন, গহনাগাঁটি সব বিক্রী হয়ে গেল। কিন্তু ফিরে এলেন শূন্যহাতে, কোনো গুপ্তধন মেলেনি।

স্বামীকে মোক্ষদা নীরবে অভ্যর্থনা করলেন। "মোক্ষদার মুখ ভারী শক্ত হইয়া উঠিল। ঠোঁট দুটি ক্রমশই বন্ধের মত আঁটিয়া আসিল। অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।... কি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খুঁজিল, কোথাও দেখিতে পাইল না।"

বৈদ্যনাথ দরিদ্র এবং অকর্মণ্য হলেও স্বামী নিতান্তই নিরীহ স্বামী। সুতরাং মোক্ষদা সুন্দরীর এমন ব্যবহারে তাঁকে পতিপরায়ণা বলা যায় না। অথচ ইহা কবির কল্পনা মাত্র নয়, এমন সততই ঘটে।

বাংলাদেশে যাঁরা অভাব করার জন্যই প্রসিদ্ধ তেমন চরিত্রও কবির লেখনী থেকে বাদ যায়নি। বৌকাঁটকী শাশুড়ী ত বাংলার একটা প্রবাদ বাক্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। 'যেনাপাওনা'র নিরুপমার শাশুড়ী এই জাতীয়ার মধ্যেই পড়েন। বরপক্ষ পিতার অপরাধ পনের টাকা শোধ করতে না পারা। তাই পিতা ও কন্যার অশেষ লাঞ্ছনার পর "যেদিন সন্ধ্যায় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইল সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল এবং সেইদিনই ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।" তবে "বাড়ীর বড় বউ মরিয়াছে বলিয়া খুব ঘুম করিয়া অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।" শ্বশুরবাড়ীতে নিরুর এই প্রথম ও শেষ আদর। বাঙালী শাশুড়ীর এই চিত্রটি ছোট, কিন্তু এটি যদি না থাকত বঙ্গরমণী চিত্রের একটা দিক কবি উপেক্ষা করেছেন বলা যেতে পারত।

ইহাদেরই পাশে ঘুটিদানের কুসুম কথা যদি বলি তবে তাকে আর এক অন্য জগতের নারী বলে মনে হবে। কুসু পতিব্রতা স্ত্রী। বাংলাদেশে অসংখ্য ক্ষেত্রেই দেখা যায় বধূ বেচারী স্বামীর ঘর ও পিতার ঘর দুই দিকের মান রাখতে গিয়ে নিজের প্রাণান্ত করে। যে স্বামীকে ভালবাসে তার ত সমূহ বিপদ, যে নাও ভালবাসে সে ভয়ে দুইকূল রক্ষার সাধনায় তলিয়ে যায়। তাই কুসুর মুখে শুনি, "স্ত্রীজন্ম গ্রহণ করিলে এত মিথ্যাও বলিতে হয়! বাবার মনেও কষ্ট দিতে পারি না, স্বামীর ধনও ক্ষুণ্ণ করা চলে না। মা হইয়া শিশুকে ভুলাইতে হয়, স্ত্রী হইয়া শিশুর বাপকে ভুলাইতে হয়—মেয়েদের এত ছলনার প্রয়োজন।" অথচ ছলনা মহাপাপ।

কুমু ছলনা ক'রে দুকূল রক্ষা করতে পেরেছিল, কিন্তু ফলে চক্ষু দুটি চিরকালের মত গেল। দৃষ্টি-দানের কুমু আদর্শ হিন্দু নারী, গল্পটিও সুন্দর। কিন্তু গল্পটিকে সম্পূর্ণ রিয়ালিষ্টিক গল্প বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথ কবি, গল্পটিতে কবিত্বের বা কাব্যরসের উপাদান যথেষ্ট আছে। কাব্যরস ক্ষুণ্ণ না হয় এই মনে করেই কুমুর মনোভাবকে তিনি এত উচ্চে তুলেছিলেন মনে হয়। স্বামীর মানরক্ষা করার জন্য চক্ষু বিসর্জনের সম্ভাবনাও বরণ করে এমন মেয়ে যে নেই তা বলি না। এমন মেয়ে আছে যে নিজের স্বার্থ স্বামীর জন্য সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারে। কিন্তু অন্ধ হবার পরেও স্বামীর অনুতাপ শুনে যে মেয়ে বলে, "যেন করিয়াছ, তোমার জিনিস তুমি লইয়াছ। ভাবিয়া দেখো দেখি, যদি কোনো ডাক্তারের চিকিৎসায় আমার চোখ নষ্ট হইত তাহাতে আমার কি সান্ত্বনা থাকিত?···সে চোখ তোমার হাতে গিয়াছে এই আমার অন্ধতার একমাত্র সুখ। যখন পূজার ফুল কম পড়িয়াছিল তখন রামচন্দ্র তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবতাকে দিতে গিয়াছিলেন। আমার দেবতাকে আমার দৃষ্টি দিলাম।" সে মেয়ে সত্যই আছে মনে হয় না।

কবির মনেও যে এ সন্দেহ হয়নি তা নয়। তাই কুমুকে দিয়া একথা বলাবার পরই আবার বলিয়েছেন, "আমি এত কথা বলিতে পারি নাই, মুখে এমন করিয়া বলাও যায় না;···মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত,···নিজেকে ধিক্কৃত দুঃখিত দুর্ভাগ্যগ্রস্ত বলিয়া মনে হইত, তখন আমি নিজের মনকে দিয়া এই সকল কথা বলাইয়া লইতাম।"

দৃষ্টিদান গল্পের তুলনায় 'দিদি' গল্পের নারী চরিত্র তাই আরও বাস্তবধর্মী মনে হয়। করুণ ও মধুর রসের অভাব এখানে নাই; কিন্তু শশিকলা যখন যে অবস্থায় পড়েছে তার ছাপ মনে গভীর দাগ না রেখে যায়নি। তার পথও সে বেছে নিয়েছে, পতিব্রতা বঙ্গরমণীদের মত শশিকলাও একদিন মনে করত—'স্বামী সর্বস্ব, স্বামী প্রিয়তম, স্বামী দেবতা।' পল্লীবাসিনী কোনো রমণী যখন এক অত্যাচারী স্বামীর কথা উল্লেখ করে বলে, 'এমন স্বামী থাকার চেয়ে সাতজন্ম বিধবা হওয়া ভাল।' তখন শশিকলা মনে মনে কহিল, "স্বামীর এমন কোনো অপরাধ কল্পনা করতে পারি না, যাহাতে তাঁহার প্রতি মনের ভাব এত কঠিন হইয়া উঠিতে পারে।' এই কথা মনের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতেই তাহার কোমল হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিরস তাহার প্রবাসী স্বামীর অভিমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।"

কিন্তু শশীর ভাগ্য পরিবর্তিত হল। সে ছিল পিতামাতার একমাত্র সন্তান। শেষ বয়সে মাতার একটি পুত্রসন্তান হওয়াতে শশী পিতা ও মাতা কারুরই উপর খুসী হল না। শশীর স্বামীও খুসী হলেন না।

ভাগ্যের চাকা আবার ঘুরে শশীরই হাতে শিশুটিকে সঁপে দিয়ে তার মা ও বাবা ,চিরবিদায় নিলেন। শশী মাতৃজাতীয়া; অসহায় শিশুটি তার শিশুমনোচিত মধুর উপদ্রবে দিদির হৃদয় অধিকার করে নিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করল না। তার মা ছিল না বলে শশীর প্রতি শিশুর আধিপত্য আরও বেশি হল। ভুলে গেল একদিন এই শিশুর আগমন তার কাছে কত অবাঞ্ছিত ছিল।

শশীর স্বামী বিদেশে বাস করত, শ্বশুরের বিষয়ের তিন অংশ শিশুকে এবং এক অংশ মাত্র কন্যাকে দিয়ে দিয়ে গেলেন, তখন বিষয় রক্ষা করতে জামাই ব্রজগোপালকে ফিরে আসতে হল। অনেক দিন পরে স্বামীকে ফিরে পেয়ে শশীর মনে নববিবাহের প্রেম যেন জেগে উঠলো। সেই প্রতিজ্ঞা করিল, যেন দিনই অসুক, যত দিনই যাক্ স্বামীর প্রতি এই নীতি প্রেমের উজ্জ্বলতাকে কখনই ম্লান হতে দিব না।"

কিন্তু ব্রজগোপালের মন তখন অবস্থার উন্নতির নেশায় ভরপুর। বহুদিন ঘরে থেকে স্ত্রীর সঙ্গে

সমস্ত স্বার্থ অবিমিশ্র ভাবে দেখার অভ্যাস তাহাদের গিয়েছিল। তার উপর স্ত্রীর মনের একটা বিরাট অংশে যে শিশুটির প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার প্রতি জয়গোপালের কোনোই অনুরাগ নেই।

"স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্তন ঘটায় প্রেম, এবং পুরুষের ঘটায় দুশ্চেষ্টা।" যে শশী একদিন শিশু নীলমণির ধরাতলে আবির্ভাবে সুর হয়েছিল, আজ সে সেই শিশুরই প্রতি গভীর অনুরাগে "স্বামীর স্নেহহীন বিরাগদৃষ্টি হইতে তাহাকে ঢাকাতে রাখিতে চেষ্টা করিত। .....সকলেই জানেন স্নেহ যত গোপনের, যত নির্জনের হয় ততই প্রবল হইতে থাকে।"

সর্বদা শশী অব্রতাবে প্রীতির সহিত তাহার স্বামীর সেবা করিয়া থাকে, কেবল এই নীলমণিকে লইয়া ভিতরে ভিতরে উভয়ে উভয়কে অহরহ আঘাত দিতে লাগিল।

বিষয় লোভে জয়গোপাল একদিন শিশু নীলমণির সম্পত্তি বেনামীতে ক্রয় করে নিলে। স্পষ্টবাদিনী এক পল্লী রমণীর কাছে শশী তা জানতে পারলেন। পতিপ্রাণা স্ত্রীর মত সে স্বামীর অপরাধ অবিশ্বাস করে পল্লীবাসিনীকেই গাল দিল। কিন্তু সে স্বামীর কাছে কথা তুলেই তখন বাকি খাজনার দায়ে বিষয় সত্যই বিক্রী হয়ে গিয়েছে। নালিশ করে কোন লাভ নেই।

পতিপরায়ণতাই শশীর কাছে একদিন সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল। "আজও স্বামীর কথা বিশ্বাস করা শশীর পরম কর্তব্য। কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না। তখন সে সুখের সংসার এই প্রেমের সার্বস্ব সহসা তাহার নিকট বীভৎস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল।"

অন্যায়কারী স্বামীর প্রতি ঘৃণায় এবং বিপন্ন ভাইটির প্রতি স্নেহে তার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। অন্যায় যে করে সে স্বামী হলেও ঘৃণ্য, বধূ রমণী হয়েও শশীর মনে একথা আনতে বাধেনি। নীলমণির প্রত্যেক সুখে দুঃখেই লক্ষ্য করতে লাগল জয়গোপালের অন্যায় আচরণ, এবং বারে বারেই শশী বিদ্রোহ ঘোষণা করল। পীড়িত ভাইকে নিয়ে সহরে চিকিৎসা করতে গেল এবং স্বামী ক্রমে নীলমণির সব সম্পত্তি গ্রাস করছে দেখে ডেপুটি গিন্নিকে শিশুকে রক্ষা করতে অনুরোধ করল। ডেপুটিবাবু সনাতনপন্থী; স্ত্রীলোক স্বামীর সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ করতে চায় দেখে স্বামীকেই স্ত্রীর মতলব জানিয়ে দিলেন। শশী এবার বিফল হল।

কিন্তু শশী তখন শিশু ভাইটির জন্য মরণ পণ করেছে। সে শুনিল গ্রামে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন। স্বামী তাকে সেলাম করতে গিয়েছেন। এ সুযোগ শশী ছাড়তে পারে না। শিশু ভাইটিকে নিয়ে স্বামীর উপস্থিতি অগ্রাহ্য করেই সে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল এবং বালকের সমস্ত ইতিহাস সাহেবকে শোনাল। বাঙালী ডেপুটি শশীর বিদ্রোহ অস্বাভাবিক মনে করে তাকে স্বামীর হাতেই সঁপে দিয়েছিলেন। কিন্তু সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট জয়গোপালকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে শশীর কথা শুনলেন। শশী সাহেবের হাতে শিশুটিকে সমর্পণ করে বললেন, "সাহেব, এখন তুমি নীলমণিকে নিজের কাছে না রাখিলে কেহ ইহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।" বাড়ী ফিরে শশীর অবস্থা কি হবে সহজেই অনুমেয়। শশী কিন্তু নিজের কথা ভাবে নি। অনুগতা পত্নীর মতই স্বামীর ঘরে একলা ফিরে গেল। সেখানে তার জন্য কি উদ্যত বজ্র আছে তা তার জানা ছিল। কিন্তু প্রাণের মূল্য তার কাছে আজ কিছু নয়। সে স্বামীর প্রেম হারিয়েছে, স্বামীর প্রতি ভালবাসাও হারিয়েছে কিন্তু আপনার স্নেহের পুত্তলিটিকে নিরাপদ আশ্রয়ে সঁপে দিতে পেরেছে। এখন তার জীবনের কি প্রয়োজন? শশী বুঝেছিল পতিব্রতা না হয়েও সে ছোট নয়।

অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশী ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।"

একদিন যে শশী বলেছিল, "স্বামী সর্ব্বস্ব, স্বামী প্রিয়তম, স্বামী দেবতা" সেই শশী নিজের উপর অত্যাচারী দেবতাকে ক্ষমা করতে পারল না; কিন্তু আশুতোষা বঙ্গরমণীর মতই নিজের প্রাণটা দেবতার হাতে অথবা দেবতার উদ্দেশে বিসর্জ্জন দিল। নিজেকে রক্ষা করতে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোনো সহায়তা সে চায়নি।

'দৃষ্টিদান' গল্পের 'কুমু' ও বিদ্যাগর্ব্বে গর্ব্বিত স্বামীর মান রক্ষা করতে নিজের দৃষ্টি তার হাতে সঁপে দিয়েছিল। কিন্তু স্বামীর অর্থগৃধ্নুতাতে সেও যে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা হারাচ্ছিল না তা নয়। গোপনে বিবাহের চেষ্টাও কুমুর কাছে স্বামীকে ছোট করছিল। সে তাই মনে মনে বলে, "লুকাচুরি, চাকাচাকি, মিথ্যা কথা! অধর্ম্ম করিতে হয় ত কর, সে নিজের অশান্ত প্রবৃত্তির জন্য—কিন্তু আমার জন্য কেন হীনতা করা। আমাকে ভুলাইবার জন্য কেন মিথ্যাচরণ? কুমুর মত পতিপরায়ণা ও পতি দেবতার সব ত্রুটি মাথা পেতে নিতে পারেনি। তবু এরা সকলেরই মেয়ে।

এই গল্প দুটিতে—পুরুষের দুর্ব্বলতা ও ত্রুটিকে কবি উন্মুক্ত করে ধরেছেন। কিন্তু রমণীকে অর্দ্ধেক কল্পনা ও অর্দ্ধেক রমণীরূপে আঁকার একটা প্রবণতা আছে। দুটি নারীই স্বাভাবিক ও সাধারণ নারীর চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের। তার মধ্যে শশীই বেশী বাস্তব ঘেঁষা।

সাধারণ পল্লীবাসিনী বাঙালী মেয়েকে সর্ব্বত্রই তিনি উচ্চস্তরের করে গড়েন নি। স্বামীর সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে যারা অদ্বিতীয়া, এমন স্ত্রীর বিষয়ে তাই তাঁরা প্রসঙ্গের কীর্ত্তিতে বলেছেন, "বাগ্‌ যুদ্ধে স্ত্রীকে আত্মমুখে পরাজয় স্বীকার করাইতে পারে এমন ক্ষমতা ও এমন সৌভাগ্য কয়জন স্বামীর আছে?"

'প্রায়শ্চিত্তে'র বিদ্যাবাসিনী আর এক জাতীয়া। গল্পটি পড়ামাত্র মনে হয় মেয়ে কত দেখেছি! কিন্তু লিখেছে কয়জন? বিদ্যার মত "সকল স্ত্রীর সকল স্বামী অপেক্ষা তাঁহার স্বামী যে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ" এ ধারণা নবীনা পত্নীদের মধ্যে ত আছেই, প্রাচীনদের মধ্যেও কম নয়। তাঁরা স্বামীর দোষগুলি যখন চিন্‌তে পেরেন তখনও তাদের পুরুষ মানুষের ওইটুকু দোষ করা স্বামীর আর নেই।

কিন্তু আপন হৃদয়ের "ভক্তি পর্ব্বতের উচ্চতর শিখরে" স্বামীটিকে বসিয়েও মূঢ় মর্ত্ত্যবাসীদের কটাক্ষ-পাত থেকে বিদ্যা তাঁকে রক্ষা করতে পারেন নি।"

মূঢ় মর্ত্ত্যবাসীদের এই পক্ষপাত দোষ—কত ঘরের বধূই ত আবিষ্কার করেন দেখতে পাই।

বিদ্যার স্বামী কলেজে পড়েও পরীক্ষা দিলেন না, কারণ তাহারা "চতুর্ভুজ" হওয়া যায় না। আজ ত আমাদের দেশে ঘরে ঘরেই ছেলেরা চারিটি বাহির আশায় তুচ্ছ পড়াশুনায় জলাঞ্জলি দিয়ে রাস্তায় মিছিল করে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের নবীনা বধূরা নিশ্চয় স্বামীদের কীর্ত্তিতে মুগ্ধ। বিদ্যার স্বামী চাকরীও করলেন না, কারণ স্বামী ত ঠিকই বলেছেন, "তাঁহার উপযুক্ত চাকরী আছে বটে, কিন্তু পক্ষপাতী ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সে সকল পদে বড় বড় ইংরেজকে নিযুক্ত করে, বাঙালী হাজার যোগ্য হইলেও তাহার কোন আশা নাই।"

বিদ্যার স্বামী বিলাত যাবেন স্থির করলেন। কিন্তু বিদ্যার পিতার কাছে স্বামীর জন্য অর্থভিক্ষা করতে রাজী হল না। মূর্খ স্বামী বুঝল না যে এতে বিদ্যার স্বামীর মানহানি হচ্ছে।

এক বৎসর পরে পূজার পিতৃগৃহে এসে বিদ্যা বড় সুখে গভীর নিদ্রায় যখন মগ্ন, তখন তার পতিদেবতা নূতন বেশায় সজ্জিত। ভোরে বিদ্যা "শয্যা ছাড়িয়া নামিয়া দেখিল তাহার মাতার লোহার সিন্দুক খোলা এবং তাহার মধ্যে তাহার বাপের যে ক্যাশবাক্সটি থাকিত, সেটিও নাই।" বিদ্যাকে মা কাল আদর করে নিজের শয়নঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

বিদ্যার স্বামী টাকা চুরি করে পলায়ন করলেন, তবে চিঠিতে সে কথা বিদ্যাকে লিখে যেতে ভোলেন নি।

ধন্য বিদ্যা। এতদিনে স্বামীর মান রাখল বিদ্যা, বাপের পা ধরে কেঁদে বললে, "বাবা! আমাকে মাপ কর, আমি তোমার সিন্দুক হইতে টাকা চুরি করিয়াছি।"

কুমুর মত বিদ্যাও আজ মনে মনে বলছিল কিনা জানি না—"স্ত্রীলোক হয়ে জন্মগ্রহণ করলে এত মিথ্যাও বলতে হয়!" কিন্তু চোর হয়েও সে স্বামীর মান রক্ষা করল। নিজেকে ছোট করতে পারল, কিন্তু স্বামীকে ছোট বলে জানতে দিল না। স্বামীর মানরক্ষার জন্য এত বড় অপরাধ যে সে মাথায় নিল, তার দুরকম অর্থ করা যায়। এক—স্ত্রীলোক চুরি করলে অতটা ছোট হয় না যতটা পুরুষের মত শ্রেষ্ঠ জীব চুরি করলে হতে পারে। দ্বিতীয়—বাপের টাকা মেয়ে চুরি করলে মার্জনা করা যদি বা চলে, জামাই করলে চলে না। যাই হোক্ ন্যায়শাস্ত্র মতে এসবের বিচার চলে না, এ হল মানুষের মনের দুর্বলতার শাস্ত্র!

সমস্ত অপমান সহ্য করেও বিদ্যের স্বামীগর্ব শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা গেল না, যখন একটি ইংরেজ ললনা নিজেকে মিসেস্ অনাথবন্ধু সরকার বলে পরিচয় দিয়ে অনাথবন্ধুর দেশে ফেরার পর এসে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন। বিদ্যার মুখের আর কোনো কথা যদি কবি অতঃপর আর লিখতেন, হয়ত দেখা যেত তখনও সে স্বামীর কোনো একটা শ্রেষ্ঠত্বেরই এটা পরিচয় বলে মনে করছে।

স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া অন্য বিষয়েও নারী চরিত্রের যে নানা বিশেষত্ব থাকতে পারে তার পরিচয়ও আমরা গল্পগুচ্ছে পাই। এমনি একটি বিশিষ্ট নারী 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পের জয়কালী—। জয়কালী বয়স্কা মহিলা; সুতরাং ধরা যেতে পারে, তিনি শত বৎসরেরও পূর্বে জন্মেছিলেন। জয়কালী দীর্ঘাকার, দৃঢ়শরীর, তীক্ষ্ণনাসা, প্রখরবুদ্ধি স্ত্রীলোক। তাঁর "প্রকৃতির মধ্যে বহল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সঙ্গী কেহ ছিল না। পরনিন্দা ছোটকথা বা নাকীকান্না তাঁহার অসহ্য ছিল।" তিনি ছিলেন একদিকে নিষ্ঠাবতী রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী। ঠাকুরবাড়িটি তাঁর সর্বাপেক্ষা ঘরের। কোনো অনাচার সেখানে চলত না। কি মন্দিরে কি গৃহে মানুষের অপরাধ তিনি ক্ষমা করতেন না। কিন্তু অপরদিকে এই কঠোর মূর্তি নারীই যে অসহায়ের প্রতি করুণাময়ী তা একদিন অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হল। নিষ্ঠাবতী রমণীর এই পরস্পরবিরোধী রূপও জগতে বিরল নয়।

মন্দিরে একটি মাধবীলতার ঝাড় ছিল। জয়কালীর বড় যত্নের। একদিন দুটি বালক থালি রেখে তার ফুল তুলবে ঠিক করল। যে বালক ধরা পড়ল, সে জয়কালীর ভ্রাতুষ্পুত্র। পিসিমা তাকে প্রহারের শাস্তি ত দিলেনই; উপরন্তু অনাহারে ঘরে বন্ধ করে রাখলেন। বালকের করুণ ক্রন্দনও তাঁকে টলাতে পারল না। তিনি আপনমনে জপে নিরত। "এমন সময় আর একটি জীবের ভীত কাতরধ্বনি নিকটে ধ্বনিত হইতে লাগিল—সহসা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন ভূপর্যন্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে।" জয়কালী মনে করলেন ভ্রাতুষ্পুত্র কোনোরকমে পালিয়ে আবার তাঁকে রাগাতে এসেছে। সরোষকণ্ঠে ডাকলেন, "নলিন!" ঠাকুর বাড়ীর পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা রক্ষা করা তাঁর জীবনের বড় ব্রত। নলিনকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন না।

কিন্তু কোনো সাড়া নেই। লতাকুঞ্জের একটি শাখা তুলে দেখলেন, "একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।"

ঠাকুরবাড়ীতে শূকর! পূজারী ব্রাহ্মণ লাঠি নিয়ে তাড়া করে এল। কিন্তু জয়কালী তৎক্ষণাৎ নেমে এসে তাকে বারণ করলেন এবং মন্দিরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। একদল ডোম মন

খেয়ে শূকর বলি দেবার জন্ত পশুটিকে তাড়া করে এসেছিল। জয়কালী তাদের তাড়িয়ে দেওয়াতে তারা হতভম্ব। নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস হয় না! রাধানাথ জীউর মন্দিরে অপবিত্র শূকর আশ্রিত!

অন্যায় জীবের প্রতি করুণাময়ী জয়কালী বুদ্ধিমান মানুষের অনধিকার প্রবেশ ক্ষমা করতে পারেন না। কিন্তু অবোধ অপবিত্র পশুর প্রাণভয় তাঁর হৃদয় স্পর্শ করল। পল্লীর সনাতন সমাজ সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল কিন্তু "সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন।"

জয়কালীও সনাতন হিন্দু ললনা। হিন্দুগৃহে কত সনাতন ললনা কত পাপকে ক্ষমা করেছেন, পাপীকে আশ্রয় দিয়েছেন মনে পড়ে যায়।

'শান্তি' গল্পের চন্দরা একটি অদ্ভুত নারী চরিত্র। সে গ্রামের নিম্নশ্রেণীর মেয়ে। স্বামী ছিদাম জন খাটে আর চন্দরা সংসারের কাজ ও সংসারের ঝগড়ায় দিন কাটায়। ছিদাম স্ত্রীকে ভালবাসে, চন্দরাও স্বামীকে ভালবাসে। হঠাৎ একদিন রাগের মাথায় চন্দরার ভাসুর আপন স্ত্রীর মাথায় ঘা মেরে তাকে খুন করে বসল। এমন সর্বনাশ হবে কেহ ভাবেনি। মুহূর্তের বুদ্ধিবিপর্যয়ে ছিদাম বলে বসল, "ছোট বৌ বড় বৌয়ের মাথায় দায়ের এক কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

মুখের কথা কেরানো গেল না। অগত্যা ছিদাম স্ত্রীকে দায়ের "অপরাধ নিজ স্কন্ধে লইতে অনুরোধ করিল।" সে ত বজ্রাহত হয়ে গেল। "তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া স্বামী রাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।"

ছিদাম মনে করেছিল, খুন স্বীকার করলাম বটে কিন্তু চন্দরাকে রক্ষা করব। সে সেইমত নানা শিক্ষা দিল। যেন চন্দরা বলে 'বড়বৌ বটি লইয়া মারতে আসিয়াছিল, আমি দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ লাগিয়া গিয়াছে। দুর্জয় অভিমানিনী চন্দরা কিন্তু শিক্ষামত কিছু বলল না। সে কেবল বলল, "হাঁ, আমি খুন করিয়াছি। আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।" যে মুহূর্তে খুন স্বীকার করা সে ঠিক করে নেয় তখনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় আর কোন কথা বলবে না। স্বামীর এমন ব্যবহারে "চন্দরা বড় অভিমানে মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নব যৌবন লইয়া ফাঁসি কাঠকে বরণ করিলাম।" সে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছেও খুন স্বীকার করল। দুই ভাই পরে নিজেরা পাপ স্বীকার করেও তাকে রক্ষা করতে পারল না; কারণ যেমন জজের কাছেও চন্দরা বলিল, "ওগো সাহেব, এক কথা আর বার বার কতবার বলিব। সাহেব বলিল, ইহার শাস্তি ফাঁসি।"

চন্দরা বলিল, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তাই দাও না সাহেব। আমার ত আর সহ্য হয় না।"

কবি চন্দরার ব্যবহারে কোথাও এতটুকু অসঙ্গতি রাখেন নি, আদালতে স্বামী তাহাকে ভালবাসে কিনা জিজ্ঞাসা করায় চন্দরা অতি সংক্ষেপে বলিল, "উঃ! তারি ভালবাসে।"

সে যেন ব্যঙ্গ করিতেছে। স্বামীর এতই ভালবাসা যে স্ত্রীকে পরের কৃত খুন স্বীকার করায়! নিজের ভালবাসা যদিও চন্দরা স্বীকার করিল, খুব ভালবাসি।' তবু ফাঁসির পূর্বে দেখিতে চাহিল কেবল মাকে। বলিল "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই। অন্যায় স্বামীকে ভালবাসিলেও তাহার মুখ সে আর দেখিবে না। সিভিল সার্জন বলিল তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব?

চন্দরা বলিল, "মরণ!" একটি মাত্র কথা। ঐ একটি মাত্র কথায় তাহার রাগ অভিমান ও পুরুষ

জাতির প্রতি ঘৃণা মূর্ত হয়ে উঠেছে। যে স্বামী পুরুষ হয়ে আর একটা পুরুষ মানুষের পাপ স্ত্রীর কাঁধে চাপায় সে কোন্ লজ্জায় স্ত্রীকে দেখতে চায়?

যে একরত্তি কালো কালো ছোট মেয়েটি একদিন "বাপের ঘর হইতে খেলার পুতুল ফেলিয়া শ্বশুরের ঘরে আসিল" কে জানত আজ সে এমন করে দুটো পুরুষ মানুষকে লজ্জা দিয়ে ঘৃণায় ও জেদে ফাঁসি বরণ করে নেবে? প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত চন্দরার "কথার নড়চড় হয় নাই।"

চরিত্রটি সম্পূর্ণ অভিনব এবং মনে হয় গল্পটি যেন চোখে দেখা সত্য ঘটনা। কেন্দ্রী মেয়েটির পাশে পুরুষ দুটি যেন মেরুদণ্ডহীন, তুচ্ছ জীব মাত্র।

"গল্পগুচ্ছের যুগের পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ যে সব ছোট গল্প লিখেছেন, তাতে নূতন ধরনের অনেক নারী চরিত্র আছে। তারা পল্লীবাসিনী নয়। বিদ্রোহিনী রূপে তার মধ্যে "স্ত্রীর পত্রের" মৃণালই সুপ্রসিদ্ধ। স্বামীও সংসার ছেড়ে বিদ্রোহ করে যে ঘুরে চলে যায় সেরূপ নারী আধুনিকালকার যুগে অনেক আছে। "স্ত্রীর পত্রের" যুগেও যে ছিল না তা নয়। তবে মৃণাল প্রধানতঃ যে কারণে সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছিল সেই কারণে বনেদী ঘরের মান মর্য্যাদা ছেড়ে চলে যাওয়া সাধারণ নারীর পক্ষে সহজ নয়। মৃণাল বিদ্রোহ করেছিল নিজের অপমানে নয়, অসহায় নারিজাতির অপমানে। সে যেন বলছিল "নারীকে আপন ভাগ্যজয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার? স্ত্রীলোককে বলির পশুর মত যে কোন মানুষের হাতে যেমন কোরেই হোক উৎসর্গ করে দিতে হবে এবং তাকেই সে মূঢ় স্ত্রীলোক ভাগ্য বলে মেনে নিতে বাধ্য এই সনাতন প্রথার বিরুদ্ধেই মৃণালের বিদ্রোহ। এমন মৃণাল এদেশে থাকলেও খুবই কম আছে। আধুনিকারা বিদ্রোহ করেন স্বয়ং স্বামীর হাতে অপমানিতা হলেও অপরাপর অপমানে নয়। হৈমন্তীও একটি নারী চরিত্রের গল্প। পুরাতন দেনা-পাওনা গল্পের নিরু মত হৈমন্তীও পিতার অপমানে তিলে তিলে মরল স্বামীর ঘরে, কিন্তু পিতার অপমান সহ্য করল না। হৈমন্তীর পিতার অপরাধ তিনি সত্যবাদী এবং তিনি বিত্তহীন। এমন হৈমন্তীর নানা রূপ আমাদের ঘরে ঘরেই আছে। হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা ও রক্তক্ষয় করে যে কন্যাকে পিতামাতা মানুষ করে তোলে সে কন্যার কাছে পিতামাতার স্নেহের দাবী বিবাহের পর ক'টি শ্বশুর বাড়ী আমাদের দেশে স্বীকার করে? তবে সব মেয়েই ত নিরু বা হৈমন্তী নয়। এমন মেয়ে আছে যারা একদিন রুদ্রাণীরূপে পিতামাতার অপমানের শোধ দেয়। তেমন রুদ্রাণীর চরিত্র 'গল্পগুচ্ছে' বোধহয় নেই। কিন্তু সংসারে অনেক আছে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক নায়িকাই পুরুষ নায়ক চরিত্রের পাশাপাশি তুলনামূলক ভাবে সাজানো মনে হয়। কোনটা ইচ্ছাকৃত কোনটা দৈবাৎ ঘটে।

ধাকায়নী চরিত্রে এই তুলনামূলক আলোচনা ওঠেনি। 'তারাপ্রসন্নের কীর্তির ধাকায়নী ও তার স্বামী তারাপ্রসন্ন দুজনেই সাধারণ মানুষ। তাদের মধ্যে কোন কিছু নিয়ে বিরোধ নেই। বাংলার সেকালের সংসারে এমন দম্পতির অভাব ছিল না। তারা প্রসন্ন মুখচোরা লেখক, ধাকায়নী তাঁহার ভক্ত পাঠিকা। "ধাকায়নীর" দৃঢ় বিশ্বাস, বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষমতায় তাঁহার স্বামীর সমকক্ষ কেহ নাই এবং সে কথা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।" তারাপ্রসন্নর বই ছাপা হয় না। গৃহিণী তাই সহধর্মিণী বলে তাঁকে কলিকাতায় পাঠালেন বই ছাপাতে এবং সেই মহামূল্য পুস্তক বিক্রয়ের টাকায় কন্যাদের বিবাহের ব্যবস্থা করতে বই ছাপা হল কিন্তু হায়! বিক্রয় একখানিও হল না। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে ধাকায়নীর বিশ্বাস হল নিশ্চয় দোকানদারা তাঁহার স্বামীকে ঠকাইয়াছে, এবং বাংলা দেশের সমস্ত ক্রেতা ষড়যন্ত্র করিয়া দোকানদারদের ঠকাইয়াছে।" বেচার প্রতাকর ঘরেই পড়ে রইল। দাদুনা স্বরূপ মৃত্যুকালে ধাকায়নী তাঁর নবজাত পঞ্চমী

স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্

অমলেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়

ওদের বাড়িতে দেখেছিলাম রুমাকে। পাতলা একহারা চেহারা, সাধারণ বেশভূষার মধ্যেও বেশ ছিমছাম—চোখে-মুখে বুদ্ধির ছাপ বেশ স্পষ্ট।

শুভার বিয়েতে উৎসাহের তার অন্ত নেই—আধুনিক রুচিতে তারি উজ্জ্বল মেয়ে রুমা, অতবড় বিয়ের কতো কতো কাজ তার অনেক কিছুর ভার নিয়ে শুভাদের পরিবারের সকলেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তার জুড়ি আর কাউকেই দেখা গেল না।

গয়নাগাটি, তৈজস-পত্র, কাপড়-চোপড় কেনাকাটা থেকে আরম্ভ করে, কনে সাজানো, অভ্যাগত নিমন্ত্রিতদের আদর-আপ্যায়ন, আর আধুনিক রুচিতে বাসর সাজিয়ে, গান-বাজনা, আনন্দ-উৎসবে বিয়ে বাড়ি মাতিয়ে রাখলে, বিয়ের সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করলে শুভার কলেজের সহপাঠিনী একা রুমা গাঙ্গুলি। চোখে পড়বার মতন এবং মনে রাখবার মতন এই মেয়েটিকে তাই সহজে ভুলতে পারি নি।

শুধু আমি কেন, শুভাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং অভ্যাগতদের মধ্যে অনেকেই রুমাকে সেদিন দেখেছিলেন এবং আলো মনে রেখেছেন। বিয়ে বাড়িতেই শুনেছিলাম, 'এমন মেয়ে যে-বাড়িতেই যাবে, সেখানেই একদিনের মধ্যে সকলের অন্তর জয় করে নিতে পারবে'। আর সেইদিনই রুমার পিতৃকুল সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন করেছেন, অনেকেরই মনের মধ্যে বাসনা জেগেছিল, 'এমন মেয়েকে সংসার-লক্ষ্মী করার সংসারের আয়পথ বেড়ে যাবে।'

কিন্তু কারুর প্রত্যাশাকেই ফলবতী হতে দিলেন না রুমা গাঙ্গুলি। আর অত্যন্ত বিস্মিত হলাম শুভাদের বাড়িতেই যখন শুনলাম রুমার বিস্ময়কর আচরণের কথা।

শুভার বোন প্রীতা বললে, 'শুনেছেন, রুমার কথা?'

'কোন রুমা?'

'আহা ন্যাকা! কোন রুমা? রুমা বলতে সবাই তো পঞ্চমুখ হয়েছিলেন, এখন আবার না-চেনার ভাণ করছেন কেন?'

শুভার বোন প্রীতা—যাকে বয়েসে অত্যন্ত ছেলে মানুষ বলেই ধারণা করেছিলাম, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমারো গোপন দুর্বল স্থানটি কি করে যে দেখে ফেললে, তা বিস্ময়েরই কথা। তবুও গাম্ভীর্যের ভাণ বজায় রেখেই বললাম, 'কতো মেয়েকেই তো দেখি; কিন্তু মনে আর ক'জনকে বা ধরে রাখি বলো?'

প্রীতা পাল্টা জবাব দিলে, 'রুমা গাঙ্গুলি তো শুধু চোখে দেখার মেয়ে নয়। তাকে এমনভাবে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন?'

বললাম, 'ভণিতা রাখো। স্পষ্ট করে বলো দিকিন, কী ব্যাপার?'

প্রীতা বললে, 'রুমা চুরি করেছে।'

'চুরি করেছে?'

'হ্যাঁ। আর শুধু এক বাড়িতে নয়, পাড়ার অনেককে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বহু লোককেই ঠকিয়েছে।'

প্রীতার কথায় মন্তব্য করলাম, 'ঠকানো আর চুরি করা এক জিনিস নয় তাবলে।'

প্রীতা উত্তেজিতভাবে বললে, 'মেয়েদের খাওয়ার নাম ক'রে আমার কাছ থেকে আমার সোনার বালা জোড়া নিয়ে গেল। তার তরির গহনা। আজ দেবো, কাল দেবো বলে আর দেয়ই না। পরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, এক স্যাকরার দোকানে তা বন্ধক রেখেছে। একে চুরি করা বলে না?'

প্রীতার এই অভিযোগে অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। তারই বিধির সহপাঠিনী বন্ধু, শিক্ষিতা মেয়ের এই প্রবঞ্চনা বুঝতে অত্যন্ত আহত হলাম। তবুও বললাম, 'না এটা ঠিক চুরি করা হল না। কারণ বিদ্যাসাগরের ভাষায় 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। রুমা কিন্তু চেয়ে-চিন্তেই তোমার কাছ থেকে বালা জোড়া নিয়েছিল।'

'আঃ। কী সৎ মনোভাব!' ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রীতা বললে।

'বালা জোড়া আমার হয়েছে।'

'হ্যাঁ, বাবা পুলিশের সাহায্যে কোনরকমে দুশো টাকা ওনোগাৎ দিয়ে স্যাকরার দোকান থেকে বালা জোড়া উদ্ধার করেছেন।'

প্রীতা আরো জের টেনে বললে, 'শুধু কী এই। পাড়ার এক উকীল ভদ্রলোকের বাড়িতে রুমার যাতায়াত খুব। তাঁর দামি দু'বুকস্ পুরানো দোকানে বেচেছে!'

বললাম, 'হ্যাঁ, এইটেই ঠিক চুরি। কিন্তু উকিলের বই! বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা! জেল হলো না রুমার?'

প্রীতা বললে, 'ভদ্রলোক দয়া করে ছেড়ে দিলেন রুমার বুড়ো বাপের কান্নাকাটিতে।'

'কিন্তু ভদ্রলোকের মেয়ের এই জঘন্য প্রবৃত্তি কেন?'

আমার এ-প্রশ্নের উত্তরে প্রীতা বললে, 'সেইটেই রহস্য। কেউই ধরতে পারছে না, এইসব অসৎ প্রবৃত্তির টানার কী করে সে।'

প্রীতার বালা জোড়ার জন্যে তার বিতৃষ্ণা থাকতে পারে—উকীল ভদ্রলোকেরও অভিযোগ থাকা স্বাভাবিক। আরো আরো দু'চারজন—রুমা গাঙ্গুলির খপ্পরে পড়ে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন—রুমা গাঙ্গুলি সম্পর্কে তাঁদের তাঁরাও না হয় ভাবতে পারেন; কিন্তু আমার হঠাৎ মাথা-ব্যথার কারণ কী? রুমার সঙ্গে মাত্র আমার কয়দিনের পরিচয়—সেই পাতলা একহারা চেহারা, সাধারণ বেশ-ভূষার মাঝেও যার বেশ ছিমছাম ভাব—তাঁর এই জঘন্যতম প্রবৃত্তির জন্যে আমি ব্যথা পাই কেন?

প্রীতাকে বললাম, 'নিশ্চয়ই কোন গভীর কারণ আছে, যার জন্যে রুমা বাধ্য হয়েছে এই সব কাজ করতে। একটু খবর নাও তো?'

প্রীতা ঠোঁট উলটে বললে, 'আমার পরে গেছে তার খবর নেওয়ার জন্যে!'

শুধু প্রীতাই একদিন খবর আনলে। মেয়েদের সম্পর্কে মেয়েদেরই আগ্রহ বেশি। রুমা গাঙ্গুলি বিয়ে করেছে। আপদ গেছে, দুর্ভাবনা গেছে! প্রীতার অলঙ্কার আর খোওয়া যাবে না। উকীল ভদ্রলোকের দু'বুকস্‌ও নিরাপদ আশ্রয়ে থাকবে। আর আমারও অহেতুক কৌতূহলের অবসান।

রমা বিয়ে করেছে, একটি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু প্রীতা বললে, 'না, অনেক মিষ্টি আছে।'

জিগ্যেস করলাম, 'কী রকম?'

'সে সব বিশ্রী ব্যাপার।'

'যাক সে আলোচনায় আমাদের কাজ কী!'

আমার কথায় প্রীতা স্নেহের সুরে বললে, 'কিন্তু আপনাদের মতে, রমা যে আদর্শ মেয়ে!'

প্রীতার কথায় বিস্মিত হলাম। রমার প্রতি তার এত ঈর্ষা কেন?

রমার বিয়েতে সত্যিই মেয়েটিকে দেখেছিলাম স্মার্টলিং। তাই তার সম্পর্কে আর একটু আগ্রহ প্রকাশ করলাম, 'তা কোথায় বিয়ে হল রমার? তোমাদের নেমন্তন্ন করেছিল তো?'

আমার কথায় প্রীতা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'আমাদের নেমন্তন্ন করবে কোন্ লজ্জায়? আপনাদের ডাকেনি, এইটেই আফশোষের ব্যাপার!'

'সে আফশোষ না হয় তৈল; কিন্তু বিয়েটা হল কোথায়?'

প্রীতা তেমনি তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, 'ও মেয়ের আবার কোন রাজঘরে বিয়ে হবে?'

'তবু?'

'পাড়ার যারা রকবাজি করে, তাদেরই একজন। ছেলেটা আবার নন্-ম্যাট্রিক! কি একটা কেসে পড়েছিল। মামলার খরচ জোগাবার জন্যে রমা শেষে চুরি-জোচ্চুরি ধরেছিল।'

প্রীতার কথায় বিস্ময় বোধ করলাম। মনের মধ্যে যে-সন্দেহের কাঁটা খচখচ করে বিঁধছিল, সে কাঁটাটি বেরিয়ে এল।

প্রীতা বলে চলল, 'বুড়ো বাপ-মা অনেক ওরদা রেখেছিলেন মেয়ের ওপর। লেখা-পড়া জানা মেয়ে সংসারের এ্যাসেট হবে। তা, নয় মেয়ে-জামাই দুই-ই এসে এখন ঘাড়ের বোঝা হয়ে চেপে রইল। কী মূল্য আছে বলুন তো মেয়েদের এমন লেখাপড়ার?' প্রীতার কথাটাকে হাল্কাভাবে গ্রহণ করতে পারলাম না। রমার বুড়ো বাপ-মায়ের জন্যে অবশ্যই দুঃখ অনুভব করলাম। আফশোষ করলাম, তার নির্বুদ্ধিতার জন্যে।

প্রীতা বললে, 'আমরা হলে লজ্জায় আর মুখ দেখাতাম না!'

প্রীতার কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'তা বটে!'

রমাকে ভুলেই গিয়েছিলাম।

পাতলা একহারা সেই চেহারা, সাধারণ বেশভূষার মাঝেও বেশ ছিমছাম—চোখে-মুখে বুদ্ধির ছাপ বেশ স্পষ্ট—সীতার বিয়েতে একনজরের দেখা মেয়েটিকে আর মনে রাখার কথা নয়। কিন্তু মনে পড়ে গেল।

প্রীতাদের বাড়িতে বসে আছি। প্রীতার বাবার সঙ্গে গল্প-গুজব করছি, এমন সময় রমা এসে হাজির।

'মেসমশাই!'

রমার ডাকে প্রীতার বাবা চোখ তুললেন, অপ্রসন্ন দৃষ্টি।

প্রীতার বিয়ে দেবেন? একটি ভালো পাত্তর সন্ধানে আছে। মাসিমাকে বললাম, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না।'

প্রীতার বাবা বললেন, 'আমিই যে বিশ্বাস করবো এমন কী মানে আছে?'

অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে রুমা বললে, 'বারে, আমার কথায় বিশ্বাস করবেন কেন? নিজে চোখে দেখবেন, খোঁজ-খবর নেবেন, তবে তো বিয়ে?'

'তা ছেলেটি কী করে?'

শ্রীতার বাবার কথার প্রত্যুত্তরে রুমা বললে, 'প্রফেসর। ফিলজফিতে এম্. এ. টপ করেও ক্লাস। কলকাতাতেই এক বেসরকারী কলেজের প্রফেসর।' শ্রীতার মায়ের মন টলেছে। প্রফেসর পাত্র—মধ্যবিত্ত সংসারের আদর্শ।

আমিও সায় দিলাম, 'হাতছাড়া করবেন না।'

রুমা আগ্রহ প্রকাশ করলে, 'চলুন না মাসিমা, মেসমশাই, এইতো কাছেই আমাদের বাড়ি। ছেলেটি এসেছে। একনজর দেখে আসবেন।'

শ্রীতার মা-বাবা দুজনেই রাজী হলেন।

শ্রীতা কিন্তু বেঁকে বসল, 'না সমীরদা! বাবাকে মাকে আপনি বুঝিয়ে বলুন ও ছেলেকে আমি বিয়ে করব না। না, কিছুতেই নয়।'

বললাম, 'কেন? ফিলজফির প্রফেসর। ছেলেটি তো ভালোই।'

'ছাই ভালো।'

কেন, তুমি কী তাকে দেখেছো?'

'দেখেছি বৈকি!'

'তাহলে আপত্তি কিসের?'

'অত্যন্ত বোকা বোকা চেহারা।'

বিস্মিত হলাম শ্রীতার মন্তব্যে, 'বোকা বোকা চেহারা?'

'হ্যাঁ।'

রঙ্গ করে বললাম, 'রূপেতে কি করে বাপু, গুণ যদি থাকে!'

'পদ্মমালার কবিতা পড়ো নি?'

শ্রীতা কঠিন সুরে বললে, 'সমীরদা, রহস্য করবার ব্যাপার কিন্তু নয়। আপনি বাবা-মাকে বুঝিয়ে বলুন। ও ছেলেকে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না।'

বললাম, 'রহস্য থাক। সত্যি করে বলত, তোমার আপত্তির কারণটা কী!'

শ্রীতা বললে, 'রুমার দাতারকে আমি কেন বিয়ে করতে যাব। আমি কী এতই চীপ?'

'রুমার দাতার?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে রুমা ওকে বিয়ে করলে না কেন?'

'সেকথা রুমাই ভালো করে জানে। হয়ত ছেলেটির বোকা বোকা স্বভাবের জন্যেই। ফিলজফির প্রফেসর রকবাজি করা ছেলের মতন তো আর দুর্ধর্ষ নয়।'

শ্রীতার বক্তব্য ঠিক বুঝলাম না; কিন্তু যা বুঝলাম, তা হচ্ছে স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্।

বিজন ভট্টাচার্য

ছায়াপথ

সকাল বেলা। মহাদ্যুতি সূর্যের আলোয় জেগে উঠেছে সৃষ্টিপ্রাণ চরাচরে। মানুষ, তথা তাবৎ স্থাবরজঙ্গমে সূর্যোদয় স্বতোৎসারিত হচ্ছে। এ নয় বৈদিক আর্যোদয় অথবা কুসুমসংকাশং নয়। তার-ও আগেকার এক লোকায়ত মন্ত্র। দীর্ঘ মূর্চ্ছনার বালাই নেই এতে। আছে শুধু ক্ষুধার আর পরম রাগের শুদ্ধ স্বরব্যঞ্জনা,—এ বাবা, এ বাবা, এ বাবা···।

এরা ব্রাত্য। উদরান্নের কঠিন বাধীবার। এরা ভিকিরি। লাঠি আর বাটি হাতে ক'রে নগরশীমার উপান্ত ধরে সূর্যের কাছে ভিক্ষা নিয়ে চলেছে।

রাগরক্ত এই পটভূমিকায় নগরউদ্যানের সালগ্ন দেখি দুটি জোড়া। একটিতে থাকে এক কানা তার এক খোঁড়া বন্ধুকে নিয়ে, আর একটিতে তাপাবিড়ম্বিত এক চাষী পরিবার। প্রাণের খাদার নোনাকেনা হয়ে গিয়েছে বলে এরা-ও পথে এসে দাঁড়িয়েছে।

কানা খোঁড়া ভিক্ষের বেরিয়েছে। এক চাষা-ই ভিক্ষে ক'রছে উর্দ্ধশ্বাস পথচারীর কাছে ছেড়ে-ছেড়ে। বউটি বসেছে হাত পেতে। ঘোমটা টেনে। লোকে দেখলেও সে যদি না দেখে তো ইজ্জৎ যাবে না। কোলের ছেলে গোপাল। গোপাল খেলা করছে আপন মনে ফুটপাথে বসে। আর একপাট থেকে অন্য পাট—সূর্যদেব চলেছেন পূব থেকে পশ্চিমে রথচক্র ঘর্ঘরে।

চাষা। (উর্দ্ধশ্বাস পথচারীকে লক্ষ্য ক'রে) হেই বাবা, হেই বাবা, চোদ্দ দিন অনাহারে আছি বাবা, কোলের ছেলেডার পেটে পর্য্যন্ত এট্টা দানা পড়ে নি বাবা, তোরদিন না খেয়ে আছি বাবা, দুচ্চার আনার পয়সা দে যাবেন বাবা, হেই বাবা, হেই বাবা, তোমার দুখান্ পায়ে পড়ি বাবা, সব নোনাকেনা হয়ে গেছে বাবা, দুচার গণ্ডার পয়সা দে যাবেন বাবা, হেই বাবা, হেই বাবা···

[পথচারীদের কেউ পয়সা দেয়, কেউ দেয় না। চাষা কিন্তু অক্লান্ত। জোর কদমে ডিকে করে ডাইনে বাঁয়ে ছেড়ে ছেড়ে, একটি পথচারী-ও যেন বেমক্কা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে না যায়]

···দু গণ্ডার পয়সা দে যাবেন বাবা, তিনডে প্রাণী অভুক্ত আছি বাবা, হেই বাবা, হেই বাবা···

[চাষার কাতরোক্তি শুনে দাঁড়িয়ে পড়েন এক বৃদ্ধ ভদ্র]

ভদ্র। হেই বাবা, হেই বাবা—বলে কি আর সহজে মেলে বাবা? তাও আবার দু একপয়সা না, দুচ্চার আনা, হুঁঃ।

চাষা। তা আমরা বাবা তিনডে প্রাণী, শহরবাজারে এসে বড্ড হতশ্রান্ত হয়ে পড়িছি···

ভদ্র।···হতশ্রান্ত হয়ে পড়েছো!—বাড়ী কোথায়?

চাষা। বাড়ী বাবু সোনাডাঙা, দক্ষিণ তরফ। যমের জলে বাবা···

ভদ্র:···একেবারে কলকেতায় এনে ফেলেছে!

চাষা। আঁগে হাঁ বাবা।

ভদ্র। ভাল। তা এইরকম ভিক্ষে করে কদিন চালাবে? গায়ে শক্তি আছে খেটে খাও।

চাষা। তা খেটে খেতি পেলি তো বেঁচে যাই বাপ্। আমার তো জান্ পরিচয় নেই এ শহরে! কে আমারে কাজ দেবে বলুন?

ভদ্র। কাজ, কি কাজ জানো? ঘরের কাজ করতে পারবে? চাকর-বাকরের কাজ?

চাষা। পাঁ্যা বাবা, ঘরের কাজ পরের কাজ সব কাজ করতি পারবো।

ভদ্র। পরের কাজ! তা আপাততঃ সেই পরই তো আমি। আমার কাজ করতে পারবে?

চাষা। ছি ছি, বেখুনবিনি ··

ভদ্র। তা কলকাতার শহরে গরু বলতে এক আমরাই। দশটা পাঁচটার গরু। আর গরু কোথায়? কি!!

চাষা। তবে বাবা।

ভদ্র। কি হবে।

চাষা। করবো কাজ।

ভদ্র। সব কাজ করতে পারবে?

চাষা। জ্বী'সে বাবা।—তবে এঁটো বাসন মাজতি পারবো না, আর মেয়েমানুষির পরনের কাপড় কাচতি পারবো না বাবা।

ভদ্র। তবে তো দেখি কিছুই পারবে না। এঁটো বাসন আর মেয়েমানুষের পরনের কাপড় ছাড়া সংসারধর্ম হয়!—খুব কাজ করোছো তা হলে!···(পয়সা দিতে যান) যাগ্‌গে, এই নাও!

(হঠাৎ অন্য এক মুখোশ ভদ্রকে বান্ধব ঠাউরে)

চাষা। এট্টু দাঁড়ান বাবা। উমি বোধ করি কিছু দেবেন। আমি নিয়ে আসি খপ্ করে।···হেই বাবা, হেই বাবা, দুচার গণ্ডার পয়সা দে যাবেন বাবা·····

ভদ্র। আর আমি দাঁড়িয়ে থাকবো! ধ্যাঁ, ভাবো কপাল ঠুকে।···(চাষাকে ফিরে আসতে দেখে) কৈ, কি হলো?

চাষা। না বাপ আমার, দেলেন না উনি। বল্লেন বলে···

ভদ্র। ধাত্তা এখানে সব ঐ রকম।···এই নাও। (পয়সা দেন)

চাষা। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন বাবা।

ভদ্র। বুড়ো বয়সে তবু তো আমার 'বও' লিখে দিতে হলো। মঙ্গল আর করছেন কোথায় ভগবান!

[ভদ্রের প্রস্থান]

[চাষা আবার যথারীতি ভিক্ষে করতে আরম্ভ করে ছুটে ছুটে,···হেই বাবা, হেই বাবা···। সময় অতিবাহিত হয়। ইতিমধ্যে ছেলে গোপাল খেলতে খেলতে কখন যে বাইরে চলে গেছে, চাষার খেয়াল নেই। চাষা ভিক্ষেই করে চলে। বেলা পড়ে আসে। এমন সময় খোঁড়া ভিকিরি ঢোকে মেংচাতে মেংচাতে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করবার পর রান্নাবান্নার অধ্যায়। তিন ইঁটের উনুনে মাটির হাঁড়ি চাপিয়ে রান্নার যোগাড় করে নেয় খোঁড়া। সানকিতে করে চাল নেয়, আনাজ কোটে। কানা তখনও ঘরে ফেরেনি। সন্ধ্যা নামে শহরে। এমন সময় গোটা একটা সংসার বুধাতে কোলপাঁজা করে ধরে একটা মেয়ে ভিকিরি এসে হাজির হয়। চারদিকটা দেখে-শুনে এখানেই সে তার আস্তানা করবে বলে ঠিক করে। ঝোপড়া নেই, সুতরাং ফুটপাথেই সে সংসার পেতে বসে খুশী মনে। মেয়েটি তাতে প্রিয়া, লাস্যময়ী। যৌবন তাকে ফাঁকি দিলেও সে কিন্তু যৌবনকে ফাঁকি দিতে নারাজ। নিঃসঙ্গ খোঁড়াকে প্রীতির চক্ষে দেখে সে। চাষার ভিক্ষে করা দেখে হাসি পায় তার থেকে থেকে]

প্রিয়া। (খোঁড়াকে) মাগীটাকে বসিয়ে রেখে বিনসেটা করছে তাখ, করছে তাখ।

চাষা। ···হেই বাবা, হেই বাবা, দুচ্চার গণ্ডার পয়সা দে যাবেন বাবা। তিনডে প্রাণী চোপর দিন অনাহারে আছি বাবা, হেই বাবা, হেই বাবা···

প্রিয়া। (অনুকরণ করে ভেঙায়) হেই বাবা, হেই বাবা,···যত তাড়বি ততো পালাবে। কেউ দেবে না পয়সা, হে হে।

চাষা। (রেগে) মেয়েমানুষ দাঁত বের করে হাসছিস তোর লজ্জা করে না?—হেই বাবা, হেই বাবা···

প্রিয়া। মেয়েমানুষ দাঁত বের করে হাসলি তো শোভা হয়! হে হে হে···

চাষা। অপরের দুঃখে হাসবি নে তো কি ভগবান তোর এমনিতি ঐ অবস্থা করেছে? পেত্নি কোথাকার।··· হেই বাবা, হেই বাবা···

প্রিয়া। হেই বাবা, হেই বাবা···

চাষা। আমরা জানবি চাষী লোক। তোদের মত

জাত ক্যাঙালি না। হাত পেতে কোনদিন ভিক্ষে করিনি তোদের মত···এবার সব মোমাছেনা হয়ে গেছে বলে সহরে এইছি জীবনে রক্ষের দায়ে। হাল গরু সব ভেসে গেছে বানের জলে। জল সরে গেলি আবার ফিরে চলে যাবো। দাঁত বের করে হাসছিস যে বড়!' একে চড়ে আমি তোর চাবালি খুলে ফেলে দেবো শালা ভূত কোথাকার!

প্রিয়া। (তেড়ে আসে) মারবি?—মার তো দেখি, মার, মার! এ রে! তেজ দেখাচ্ছে! তোর বাপরে মারে না। আমার ওপর চোপা করছিস কেনরে? আমি তোর খাই না পরি! তোর হাত ভেঙে আদি···, থু থু···

চাষা। হেইয়্যা, হেইয়্যা···

প্রিয়া। আমার গায়ে যত থু থু পড়েছে সব থু থু আমি তোর গায়ে ঘুরিয়ে দেবো, থু থু থু···, হো-হ্যা-হ্যা··· (বীভৎস এক পাক খা করে ঘুরে গিয়ে পুদারের ঠমকে খোঁড়ার দিকে তাকিয়ে বসে হাসে)

চাষা। হেই বাবা, দেই বাবা···(হঠাৎ ছেলেকে উদ্দেশ করে ডাকতে থাকে) অ গোপাল, ফুট-এর থে রাস্তায় বাসনে যাবা, নরি চাপা পড়বি। অ গোপাল, এদিকি আয়!

চাষী বৌ। (সন্ত্রস্তভাবে উঠে পড়ে ছেলেকে ডাকে) অ গোপাল, গোপাল! (চাষাকে) ও মা, তুমি দাঁড়িয়ে দেখছো কি! ধরে নে এসো। অ গোপাল···!

(চাষা ছুটে গিয়ে ছেলেকে ধরে আনে)

চাষা। না বলে না ক'য়ে কোথায় গিয়ে ঘুর ঘুর করছিলি বলদিনি। ওবরদার যাবি নি বলে দেলাম। ব্যাদড়া ছেলে কাঁহাকা। (স্ত্রীকে) নাও ধর। যা মার কাছে যা। বসে থাক ওখানে। খোট্টে উঠতি দেখানা ওরে।···

চাষী বৌ। আয়, আমার কাছে আয়। সহর বাজার, একলা কি কখনও যেতি আছে? বোস, এখানে বোস।

(ছেলেটা বসে কাঁদতে থাকে এক সুরে)

চাষা। ব'সলো কি আর অমনি নাক যে সুর ধার করতি লেগে গেল। চুপ কর!

(ছেলের কান্না বাড়ে)

গোপাল। (নাকি সুরে) খি'-দে···, খাবো···

(চাষা বউ কাছের ঝাঁকে একটা খালি বাটি ধরিয়ে দেয় ছেলের হাতে। 'খাওয়া খাওয়া' খেলা দিয়ে ছেলেকে ভুলিয়ে রাখে)

চাষা বৌ। ও মা, গোপালের আমার বুঝি খিদে পেয়েছে!—নে, এই ধর।···এইবার তা হলি আমরা কি খাবো?

গোপাল। ভাল খাবো।

চাষা বৌ। ওমা, ভাত খাওয়ার আগেই ডাল!

চাষা। বেশ তো ভাই-ই খা, ডাল খা, মাছ খা, শুধু গলা দিয়ে সুর বার করিস নি বাপু।

চাষা বৌ। গামছিনি তুমি এট্টু! খামখা বকচি মেয়েছো ছেলেডারে। (ছেলেকে) হুঁ, তাহলে গোপাল কি খাবে, না ডাল খাবে।

[শূন্য বাটি উপুড় করে গোপাল ডাল···]

গোপাল। আর কি খাব?

চাষী বৌ। এবার গোপাল তরকারি খাবে।··· তরকারি খাও, তরকারি খাও!

(গোপাল তরকারি খায়)

গোপাল। হয়ে তো গেছে খাওয়া তরকারি।

চাষী বৌ। ওমা, তাই বুঝি! এবার গোপাল কি খাবে?

গোপাল। পিঠে খাবো।

(চাষী বৌ হাতে কাজ করে আর ছেলেকে ভুলোয়)

চাষী বৌ। সেই ভাল। ডাল তরকারি কি আর ভাল লাগে। তা হলি এবার গোপাল পিঠে খাবে। পুলি পিঠে।

(গোপাল তখন পুলি পিঠে খায়)

চাষা। আর খাসনি। বেশি খেলি আবার পেটের অসুখ করবে। এইবার শুয়ে থাক।

গোপাল। না শোব না।

চাষা। তো বসে থাক চুপচাপ।···এদিকি আয়। (গোপাল এসে বাবার কোলে বসে) চাষা সস্নেহে হাত বুলোয় ছেলের গায়ে)···শরীল হচ্ছে যেন দাঁড়কাকের বাচ্চা।

[কানার প্রবেশ]

খোঁড়া। বেরী হলো। গিছলি কোথায়?

কানা। যমের বাড়ী।

খোঁড়া। কি গেলি?

কানা। সোনা-দানা।

খোঁড়া। হুঁ:, তুই শালা খালি জায়গা পালটাবি আর খাঁটি বলবি, তার! কেন গোলের ওপর যে বসিয়ে দিয়ে গেলাম তোরে, তুই উঠে গেলি কেন?

কানা। শালা মগা এসে বসলো; ওয়োটা হুলো। সঙ্গে আবার সেই ভেমো মেয়েডা। তা বসবি বোস; তারপর দেখি পয়সা চায়। এট্টু পরে দেখি আবার কাছে এসে বসে।

খোঁড়া। মারি মারলি নি ক্যান!

কানা। কি করবো, উঠে চলে গেলাম।

খোঁড়া। ও শালী ভারি পাজি। ধারে কাছে ঘেঁসতি দিবি নে।

কানা। মগাডা এবার মরবে।

[কোপড়ার দিকে যায় কানা। খোঁড়া ভাত বেড়ে খাবার-দাবারের উদ্যোগ করে]

প্রিয়া। (খোঁড়াকে) কানা বুঝি তোর ওপরে খায়! তা হলি তোর তো দেখি খুব কষ্ট।

কানা। (দাঁড়িয়ে পড়ে) গলা পাই কার রে পচা? বলি কথা বলে কেডা?

খোঁড়া। ও, এট্টা মেয়ে।

প্রিয়া। এট্টা মেয়ে।

খোঁড়া। কেন, কি বলছিস?

কানা। না, তোর দুঃখি দুঃখিত হচ্ছে তাই শুধোলাম।

খোঁড়া। তা সুখ আছে ওর, ওকথা বলছে তার আমি কি করবো?

কানা। গায়ে পড়ে কথা বলবার তো দরকার নেই ওর। তোর কষ্ট কি আমার কষ্ট তা ওর বাপের কি?

প্রিয়া। (রেগে যায়) তোর বাপ তোরে হাত পা মুখ সব দেছে শুধু চোখ দেয় নি, সেই কথা শুধোচ্ছি খোঁড়ারে। তাই না রে নোড়ু?

খোঁড়া। খাম শালী পর ভালোনি। এট্টু পরে আবার বলবি তোর বাপ তোরে সব দেছে শুধু পা দেয়নি।

প্রিয়া। রাগ করছিস কেন? তোরে আমি কখনও সে কথা বলবো না। পা নেই তো কি। তুই তো নিজির হিম্মতে খাস। আর কানা, কানা বসে খায়।

কানা। কানা কারো ওপরে খায় না। আমারও চাল পুরা আমার। —হাত পেতে চাইলি পরে এক মুঠো পেতিও পারতিস। আর তো দেবো না। আর দেবো না।

প্রিয়া। তা হলি বল খোঁড়া তোর ওপরে খায়।

কানা। চালপটির সেই ঝুরো মালরে পচা।

খোঁড়া। হায়াশিত্তি নেই।

কানা। মেছোহাটার পেত্নি কোথাকার।

(রাগ করে কোপড়ায় ঢোকে কানা)

[প্রিয়া চুপ করে বসে চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে খোঁড়াকে লুব্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে। খোঁড়া কিন্তু বিশেষ আমল দেয় না]

প্রিয়া। রাগ করলি নোড়ু! ···কথা বলবি নে বুঝি! তো বলিস নে। রাগ মান আমারও আছে।···

[ভাত টিপে দেখে ভাত নামায় খোঁড়া। ক্যান গালবার উদ্যোগ করে নড়বড়িয়ে। প্রিয়া তখন গান ধরে খোঁড়ার দিকে কটাক্ষ ক'রে]

(গান)

রসমধু আছে বঁধু
পরাণেতে মোর
তাও ভরি রাখিয়াছি
সে দ্রব্য তোমার।

[উল্টে পাল্টে গায় প্রিয়া। খোঁড়া শোনে সে প্রেম-সঙ্গীত। কানে শোনে আর মরমে পশে তার সেই গান। হঠাৎ বেদিশা হয়ে যায়; হাত ফসকে গরম ফ্যান তার হাতের ওপর পড়ে। ছট্‌ফটিয়ে ওঠে খোঁড়া। তাই দেখে হাসি পায় প্রিয়ার। আবার সহানুভূতিও আসে। উঠে যায় খোঁড়াকে সাহায্য করতে]

প্রিয়া। গেছে, গেছে, গেছে। আচ্ছা, ফ্যান গালা কি বেটা ছেলের কাজ। আমি জানতাম! কোথায় লেগেছে!

খোঁড়া। (কাঁদে) এখানে।

প্রিয়া। ঠিক করে বল?

খোঁড়া। এই এখেনে।

প্রিয়া। তো আচ্ছা, কাদা লেপে দিলি আর ফোস্কা পড়বে না। (ফ্যানে কাদার প্রলেপ দেয়) আলা করছে তো? তবে যাবে'খন। তা সোজা করে ধর হাতখানা। ওমা, গায়ে পড়ছিস কেন? তুই নেড়ু বজ্ঞ পাজী। তো নে মুঁ দিয়ে দিচ্ছি, মুঁ দিয়ে দিচ্ছি। (মুঁ দেয় সুড়সুড়ি দেয়) সুড়সুড়ি যে লেগো? খুব ভাল লাগবেখন। চুপ কর, চুপ কর।

[কথাবার্ত্তা শুনে কানা বেরিয়ে আসে। প্রিয়া সরে যায়]

কানা। কি হয়েছে রে পচা!…

(খোঁড়া কোন কথা বলে না)

…কথা বলে না। পচা!!

খোঁড়া। (ক্ষোভে স্বগতঃ) এসে যে এট্ট হাতে সমে এগিয়ে নেবে, তা না। ঘুরিয়ে বসে বসে আছে শুধু তলব।

কানা। পচা।

খোঁড়া। মাকড়া খাবি আয়।…শালা হাত পুড়ে গেছে আমার ফ্যান পড়ে। জলডা পর্য্যন্তি গড়িয়ে নিতি পারিস নি তুই।

কানা। তুই খা, আমি খাবো না।

খোঁড়া। তার মানে?

কানা। যা বুঝিস।

খোঁড়া। কি বোঝবো। বলি বলতি চাস কি তুই?… দেরী হয়ে গেছে খেতি, তাই।

কানা। ও ভাগের প্রেমের বুলি মেলা কপচাস নি পচা, বুঝলি? চোখ না থাকলি কি হয়, আমি সব দেখতি পাই।

খোঁড়া। কি দেখতি পাস।

কানা। (ভেঙিয়ে) ও-হা-হা-হা-হা আমার হাত পুড়ে গেছে, হা-হা আমার কত কষ্ট;—আবার মুঁ পাড়াচ্ছে পেরিতারে দিয়ে।—তোর লজ্জা করে না?

খোঁড়া। আমি তারে ডেকেছিলাম!

কানা। না ডাকতিই আসে নাকি? তবে তো দেখি বজ্ঞ টান।

খোঁড়া। পুড়ে যখন গেল তখন এইছিলি তুই?—বসে তো ছিলি, এইছিলি?

কানা। বলি ডেকেছিলি?

খোঁড়া। এইছিলি?

কানা। ডেকেছিলি?

খোঁড়া। এইছিলি?

কানা। ডেকেছিলি?…শালা মেয়ে মানষির পোছা বজ্ঞ মিষ্টি লেগেছে।

খোঁড়া। হাঁ—।—।—।—।—ঃ!

কানা। না—।—।—।—।—ঃ!

[একজন আর একজনের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বীর ভঙ্গীতে খানিকক্ষণ দাঁড়মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর খেতে বসে। খোঁড়া খেতে থাকে। কানা ভাত চটকাতে থাকে। হঠাৎ সে মনের ক্ষোভে হাত ঝেড়ে উঠে পড়ে ঝটকা মেরে]

কানা। দুস্ শালা আমি খাবো না ভাত।

(উঠে যায় লাঠি ঠুকতে ঠুকতে)

খোঁড়া। হে ভা, হে ভা, মাকড়া বলছি আয়…

কানা। না আমি খাবো না।

খোঁড়া। আয় বলছি।

কানা। না খাবো না।

খোঁড়া। আজ্ঞা আমার ঘাট হয়েছে, আর।

কানা। কের যদি তুই ঐ ভেমো মেয়েছার সঙ্গে··· (লাঠি ঘোরায়)

খোঁড়া। হে ভা', লাগবে বলছি, হে ভা···!

কানা। শালা এট্ট এবার ওথার করেছো কি নেংড়া আমি তোমার ঠান খেয়ে নেবো।

খোঁড়া। বল্লাম বলি তো হয়েছে এট্টা অন্যায়। আর।

[আপোষ রফার পর দুজনে খেতে বসে। তারপর যে যার মত আস্তানা নেয়। চাষী পরিবার ইতিমধ্যে শুয়ে পড়েছে। প্রিয়া কিন্তু তখনও বসে আছে। প্রসাধন করে চুল আঁচড়াচ্ছে সে চিরুণী দিয়ে।

রাত গভীর হয়। একটা পুলিশ টহল দিয়ে যায়। দূরে কোথাও কুকুর ডাকে। পাড়ার এক মাতাল পা ঘসটে ঘসটে এসে থমকে দাঁড়ায়। প্রিয়া উঠে দাঁড়ায়। কি মনে করে ফিক্ করে হেসে মাতাল চলে যায় কাঁথা লেপটানো জামা-কাপড়ে টলতে টলতে। নাক ডাকবার শব্দ শোনা যায়। নিস্তব্ধ হয় রাত]

[ক্রমশঃ সকাল

পরদিন সকাল বেলা। কানা খোঁড়া ভিক্ষেয় বেরিয়েছে। চাষারও সন্ধান নেই। চাষী বৌ কাজে ব্যস্ত। প্রিয়া একা বসে বসে আঙুলে চুল বিনি কাটছে। আর গোপাল, একটা লাঠিকে লাঙল করে কুটপাথের ওপর লাঙল লাঙল খেলা করছে জমি চাষ করার ভঙ্গীতে]

গোপাল। আরে ডানি ডানি বাঁয় বাঁয়, হুঁ-হুঁ-হুঁ··· হেট্ যায় যায়···ডানি ডানি···

[চাষী বৌ সকালবেলা ছড়া ঝাঁট সেরে মেটে কলসী করে জল আনে। হঠাৎ মা-কে দেখে বিষে পায় তার]

···মা খেত্তি যে···। খাবো।

চাষী বৌ। কাজের সময় খাবো খাবো করিসনি গোপাল, আমার ভাল লাগে না।

গোপাল। (মায়ের আঁচল চেপে ধরে) তুই আমারে খেত্তি যে।

চাষী বৌ। হ, আগে তোর বাপ আসুক, তারপর খেব'খন। লাঙল খেলার কি হলো? বেশ তো ছিলি বাপ।···তারপর সেই সোনাডাঙার মাঠে হরিপদ কাকা কি রকম লাঙল দিতে সেতা করলি নে?

গোপাল। হরিপদ কাকার গরু তো ভেসে গেছে বানের জলে।

চাষী বৌ। গরু ভেসেছে, মাঠ ভেসেছে, সব ভেসে গেছে।

গোপাল। মা, আমরা বাড়ী যাবো না।

চাষী বৌ। যাবো বাবা।

গোপাল। কবে যাবো?

চাষী বৌ। জল নেমে গেলেই যাবো। (ছেলেকে সস্নেহে কোলে নেয় মা) আবার ঘর বাঁধতে হবে, হালগরু করতে হবে, তোর বাপের মাথায় কত ভাবনা বলদিনি! —আর তুই কাঁদছিলি! কাঁদিস নি বাপ, কাঁদিস নি।

[মায়ের চোখে জল দেখে গোপাল এবার মাকে ভোলায় মুখ টেনে ঘুরিয়ে ধরে]

গোপাল। আমরা তো বাড়ী যাবো, না মা?

[মুখ না ফিরিয়েই ছেলে কোলে চলে যায় মা।···প্রিয়া বসে বসে কি যেন খায় কৌচড় থেকে খাবা মেরে মেরে। এমন সময় সুন্দর রুচি চেহারার একটা কাগজ কুড়োনো ছেলে কাগজের বস্তা কাঁধে ফেলে টুকরো কাগজ কুড়োতে কুড়োতে এসে প্রিয়ার সংসারের ইতস্তত: ছড়ানো টুকিটাকি ধরে টান মারে। অমনি ফোঁস করে ওঠে প্রিয়া নাগিনীর মত]

প্রিয়া। হেই তুই আমার জিনিষ নিচ্ছিস রেখে যে। ধার কর শিগ্‌গির কি নিইছিস। সস্তায় মাল, কেমন? কাগজ নিছে?

কাগজ কুড়োনো ছেলে। গন্ধ চীজ, পড়া হয়া ছায় তো ক্যা হয়া।

প্রিয়া। বহুত হয়া, ক্যা হয়া। ঐ গন্ধ কাগজের অনেক দাম, বুঝলি?

কাগজ কুড়োনো ছেলে। কোতো দাম।

প্রিয়া। চার আনা দাম, দিবি?

কাগজ কুড়োনো ছেলে। তেরি,…সে সে তেরি চীজ।

প্রিয়া। আচ্ছা তো চার আনা না ছিস দু আনা দে।

কাগজ কুড়োনো ছেলে। (সিটি মেরে ওঠে) বাপরে বাপ। তো কির দো পয়সা যাওলে না হাম হামসে প্যারী।

প্রিয়া। তো যে, তাই যে।

কাগজ কুড়োনো ছেলে। লেঃ।

প্রিয়া। যা নে যা, সব নে যা, সব নে যা, নে যা…

[কাগজপত্তর কুড়িয়ে নিয়ে ছেলেটির প্রস্থান]

[চাষার প্রবেশ

চাষা। অ গোপাল! (স্ত্রীকে) পড়ন্ত বাজারে আলুটা মুলোটা যা পেলাম নিয়ে এলাম কুড়িয়ে বাড়িয়ে। অ গোপাল, এই দেখসে কি এনিছি তোর জন্যি। বিস্কুট খাবি, বিস্কুট!…

(গোপাল বাবার কোলে বসে বিস্কুট খায়। চাষী বৌ স্বামীকে বাতাস করে)…তো জাও এবার দুটো চাপিয়ে দাও চালিডালি। (গোপালকে) চল কলেথে চান করে আসি গে।…হেলে না পড়ে মাথার চুলগুলো হয়েছে যেন পাটের কেঁসো। (বউকে) দেখি তেলডা। (বউ ছেলের শিশি এগিয়ে দেয়। চাষা ছেলের মাথায় তেল দেয়। তারপর তেলা হাতখানা নিজের হাতে পায়ে ঘসে নেয়। তারপর গোপালকে কোলে করে স্নান করতে চলে যায়। বউ এদিকে রান্নার জোগাড় করে নেয়]

[ফলওয়ালার প্রবেশ

ফলওয়ালা। কেরা চাই কেরা।…কেরা চাই কেরা।…কেরা চাই কেরা।

(পার্কের রেলিংএর ধারে ফলের ঝুড়ি নামিয়ে ফল বাছাই করে ফলওয়ালা। বাসী পচা ফলগুলো ফেলে দিতেই প্রিয়া ছুটে এসে সেগুলো কুড়িয়ে নেয়)

ফলওয়ালা। (প্রিয়াকে) যা ভাগ!…কেরা চাই কেরা…কেরা চাই কেরা…

[ফলওয়ালার প্রস্থান

প্রিয়া বসে বসে গোগ্রাসে সেই ফলগুলো খায়। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা প্রিয়ার। সারাক্ষণই সে খেয়ে যায়।

[চাষা ও গোপালের প্রবেশ

চাষা। চান্ করে কোথায় মাথা একটু ঠাণ্ডা হবে, তা না 'মেজাজ' আরও চড়ে গেল তার পুড়ে। ছিটে ফোঁটা জল নেই কো। আর যে চাপা কলের কাছে লাঠালাঠি বেঁধে গেছে জলের জন্যি। কোনমতে জলের ছিটে দিয়ে গোপালরে চান করিয়ে আনলাম, এক ঘটি জলও মাথায় দিতে পারলাম না। একদিক ছেলে গেছে চড়া পড়ে। একরত্তি জলের জন্যি হা-হুতাস করছে মনিষ্যি। খাঁ খাঁ করছে চতুর্দিক।

চাষী বৌ। পোড়া শহরে জলেরও আকাল পড়েছে, বাব্বাঃ।

চাষা। আকাল বলে আকাল। এমন আকাল দেখিনি কোনদিন। জলেও আগুন ধরে গেছে।…কলির শেষ। ঠাকুর যে বলতেন, কিছু থাকবে না সব শেষ হয়ে যাবে, সেই কালাকালই বুঝি বা পূর্ণ হ'লো।

চাষী বৌ। (সভয়ে গোপালকে কোলে নেয়) সেই কথা লোকে বলাবলি করছে নাকি? তা হলি গোপালরে নিয়ে এখন কোথায় যাবো আমরা!

চাষা। তুই বউ তোরে নে আমি, গেরো কুত্ত কোথাকার! এ সব হচ্ছে শাস্তরের কথা। সেই কথা যদি মানষির মনে থাকবে তো কলি কি আর তোর এইরকম পথঘাট লাটে থামসে বেড়াতি পারে? সে কথা মানষির মনেই নেই। একেবারে বিস্মরণ।…তবে এট্টা কিছু হবে। শ্রাবনই হোক আশ্বনই লাগুক, এট্টা কিছু হবে। ঠাকুরির কথা মিথ্যে হবার নয়।…তা সে যাগগে যা হবার তা হবে, এখন সত্যি পেট জলে যাচ্ছে, খিদে হেট্টার ছাতি। সেই আগুনি জল ঢালি। দেখি নিয়ে আয় কি সেদ্ধ করিছিস।

(সামর্থিতে করে ভাত বেড়ে আনে চাষী বৌ। সবর থাঁচিয়ে সেও খেতে বসে আড়াল করে)

প্রিয়া এতক্ষণ খাওয়া শেষ করে প্রসাধন করছিল। প্রসাধন শেষে খানিকক্ষণ হাত কোলে করে কি যেন ভাবে। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ে সেই বিলসিত ভাবনার বাস্তব রূপ দিতে। ছন্নছাড়া প্রেত মনেও হয় তো বা ছিল সংসার বাঁধবার স্বপ্ন-কামনা। ছোট একটা ঘর গোছালো। সেজেগুজে প্রিয়া তাই লঘুহস্ত পায়ে সেই স্বপ্নাবেশেরই রচনা করে। সাধকামনা ব্যস্ত হয় তার চটুল অনর্গল কথাবার্তায় আর ক্লান্তিহীন কাজকর্মে। কোথা থেকে ইটকাঠ, ছেঁড়া মাদুর, কাপড় আর কাগজের টুকরো কুড়িয়ে এনে ঘর বাঁধতে থাকে প্রিয়া ঘোমাছির ব্রত আনাগোনায়। যেন আজই সেই বাসর, এখনই সেই শুভলগ্ন]

প্রিয়া। (তাজমহল তখনও গড়া হয়নি) এখানে বসবে সে, আর এখানে পায়ের কাছে এটা উঁচু মত জায়গা থাকবে, এখানে বসবো আমি। সে আমার দিকি তাকাবে, আর আমি তার দিকি তাকাবো। আকাশে চাঁদ ওঠবে, তারা ফোটবে। সে যখন হাসবে, আমিও তখন হাসবো। না না, তখন হাসবো না। আমি তার পরে হাসবো। অনেক পরে হাসবো। আমারে যখন খোঁচানি করবে, তখন হাসবো। তার আগে রাগ মান করবো। কথা বলবো না।…আবার যেদিন রাগ করবো, মনডা ব্যালায় থাকলে সেদিন অনেক কথা বলবো। ধরা ছোঁওয়া দেবো না। মুখি হাসবো কিন্তুক মনে মনে কাঁদবো। তারে জানতি বুঝতি দেবো না। নিজির দুঃখু হয় হোক। তারে আমি কক্ষনও দুঃখু দেবো না।… একদিন আবার এইরকম করবো, তেতোপুড়ে ঘরে আসলি বলবো কিছু ঘরে নেই। তখন সে আমারে খুব বকবে, চুলের মুঠি ধরে মারবে। ক্যাত ক্যাত করে লাথি মারবে বুঝি। অনেকগুলো লাথি মারবার পর যখন তার মনে হবে, তাইতো, তাই অন্যায় করে ফেলিছি, যখন তার কলজেডা আমার লাথি ছিঁড়ে পড়বে, তখন আমি হাসতি হাসতি বড় একখানা থালায় করে অনেক খাবার সাজিয়ে এনে দেবো। মিনসে তখন না পারবে গিলতি না পারবে ওগরাতি, এমন মজা করবো না!…এখেনে একখানা ছবি থাকবে, এখানে ফুল থাকবে…পটের পাশেই ঘট, তার মধ্যে ফুল, সাদা ফুল…(হঠাৎ হাতের নাড়া খেয়ে ভেঙে পড়ে ইমারৎ। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রিয়া। তারপর আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে সাধকামনার সেই বাসরঘর ভেঙে গেল বলে।…তারপর আবার বসে গিয়ে সেই বাসরেরই ধ্বংসস্তূপের ওপর। আউলে চুল বিনি কাটে তেমনই আনমনে। স্বাভাবিক সেই হাসিটাও এসে যায় ঠোঁট খুঁয়ে খুঁয়ে। সমস্ত অতিবাহিত হয় যেমনা দিনের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিধারায়)

[কানার প্রবেশ

কানা। (লাঠি ঠোকে) ও পচা! পচা।

প্রিয়া। পচা পচে গেছে।

(কানা সাড়া কাছে না। জোপড়ার দিকে যায়। চাষাকে দেখা যায়, ভেড়ে ভেড়ে ভিজে করছে)

চাষা। হেই বাবা, হেই বাবা, সব মোনাফেনা হয়ে গেছে বাবা। তুচার গণ্ডার পয়সা যে যাবেন বাবা। হেই বাবা, হেই বাবা…

(সন্ধ্যা হয়ে আসে। চাষী বৌ তখন ফুটপাথের সংসারে সন্ধ্যা দীপ জ্বালে)

[খোঁড়ার প্রবেশ

প্রিয়া। ঐ নেংড়ু এয়েছে।

কানা। পচা।

প্রিয়া। (খোঁড়াকে চুপ করতে ইঙ্গিত করে) পচা এখনও আসে নি।

খোঁড়া। কি বল।

কানা। মেয়েডা তো আলাদে দেখি।

খোঁড়া। বাঁচা যায়, বাঁচা যায়।

কানা। সেই-যে পেছনে লেগে আছে ভিখের মত।

খোঁড়া। তুই কতক্ষণ?

কানা। এই কিছুক্ষণ। তা মেয়ী হলো তোর!

খোঁড়া। তা হলো।…সে কি এখানে! (বসে) হাঁটতি হাঁটতি হাঁটতি হাঁটতি…

কানা। কি ব্যাপার খোলসা করে বলছিস নে ক্যান?

খোঁড়া। গিইলাম বড়বাজার।

কানা। হ্যাঁ সব বড় বড় মাড়োয়ারি মহাজনের বাস সেখানে। দেওয়া-থোওয়া ওনারা ভালই করে।

খোঁড়া। লোক বড় হলি কি হয় মন সব ছোট। ধারবার পোলে দেড় বছর আর কাটাই নি? তা সে যা হোক…

কানা। —কি হলো তারপর বল। ফলার হলো?

খোঁড়া। তা হলো। এক পেট খেয়ে আলাম আর আসবার সময় তোর জন্যি নিয়ে এলাম ছানা বেঁধে।

কানা। তা হলি তো আর অরন্ধন। কই দেখি।

খোঁড়া। ঝাঁক পাক করিস নি।…(হাতে দেয়) এই স্বাদ হয়েছে।

কানা। এত বড়? ক্ষীরমন না তো?

প্রিয়া। আজ রাঁধবিনে নেড়ু!

কানা। ঐ শালোরি মোটে পাত্তা দিবিনে।…আর কি আছে?

খোঁড়া। কি নেই তাই বল। লুচি আছে ভাল তরকারি আছে…

কানা। বাসি পচা না তো?

খোঁড়া। হাতে গরম বল।

কানা। তুই খাবি নে?

খোঁড়া। তুই খা, ধর।

(প্রিয়াকে মিষ্টি ছুঁড়ে দেয়)

কানা। মিষ্টি দেবা পরে খাবেখন। আগে লুচি তরকারি খাই।…ক্ষীরমতা গেল কোথায়?

খোঁড়া। আছে আছে, তুই খানা কত খাবি। এই ধর।

(হঠাৎ থমকে থেকে কানা আবার খেতে আরম্ভ করে। খোঁড়াও থমকে দেয় প্রিয়াকে ইঙ্গিতে।…খাওয়া শেষ করে কানা জল খায়)

খোঁড়া। মিষ্টি মতার বড্ড জল টানে।

কানা। (ঘটি এগিয়ে দেয়) খাবি? নে।

(খোঁড়া জল খায় ঘটি থেকে চক্ চক্ করে। খাওয়া শেষ করে কানা একটা বিড়ি ধরায়। পাল্টা-পাল্টি করে খোঁড়াও সেই বিড়িটা টানে। রাত হয়।

চাষার ঘরেও তখন সন্ধ্যা সমাগমে কীর্তনের আসর বসেছে। গোপাল আর চাষা কীর্তন গায়—হরিনাম গানে। বাপ ছেলে পাল্টাপাল্টি গান করে। চাষী বৌ সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়ে ঘরকন্নার কাজ করে।

(গান)

ও হরিবোল, হরিবোল
মনের আনন্দেতে হরিবোল।
একবার ঘুরে ঘুরে হরিবোল।
বিপদ রবে না রে হরিবোল।
সমন ঘুরে যাবে হরিবোল।
… … …
… … …

(কানা খোঁড়া একটু পরেই শুয়ে পড়ে। চাষী পরিবারও শুয়ে পড়ে। একা জেগে বসে থাকে শুধু প্রিয়া। একটু পরেই পুলিশ এসে টহল দিয়ে যায়। মাতাল ঘরে ফেরে টলতে টলতে। প্রিয়া দাঁড়িয়ে পড়ে। মাতাল চোখ টেনে প্রিয়াকে দেখে খুক্ করে হাসে)

মাতাল। পেটি মাতাল পেয়েছো বাবা!

[লুটোনো কোঁচা সামলে নিজেও গায়ের শালটায় কাদা ঝেপটানো। টলতে টলতে চলে যায় মাতাল। দূরে কুকুর ডাকে কোথাও। রাত গভীর হয়]

[প্রিয়া দেখে—খোঁড়া কানা ঘুমুচ্ছে। চাষী পরিবারও ঘুমে অচেতন। কেউ কোথাও নেই। দুই বুদ্ধি আসে তার মাথায়। ছুটে গিয়ে কতকগুলো ঢিল কুড়িয়ে আনে কোঁচড়ে। তারপর খোঁড়াকে তাক্ করে ঢিল ছুঁড়তে থাকে। ব্যর্থ হয় ইশারা প্রিয়ার। কোঁচড় থেকে ঢিলের কাঁড়ি ফেলে দিয়ে বন্দুকের মত সোজা হয়ে দাঁড়ায় প্রিয়া। গুটি গুটি এগিয়ে যায় খোঁড়ার কাছে। তারপর সন্তর্পণে খোঁড়ার পা ধরে টান মারে। হাউ মাউ করে উঠে পড়ে খোঁড়া। কানা-ও চোর ছ্যাচোড় মনে করে লাঠি ভাঁজতে থাকে।

কানা। কোনদিক পানে ?

খোঁড়া। ঐ দিক পানে।

কানা। ঠিক করে বল।

খোঁড়া। এই দিক পানে।

কানা। উল্টোপাল্টা বকিস নি ঠিক ঠিক বল।

খোঁড়া। ঐ দিক পানে।···নেংড়া পা ধরে টান মেরেছে।

কানা। নেংড়া পা ধরে টান মেরিছিল। তা হলি কোন অপদেবতা হবে। তালমদ্দ খাওয়া হয়েছে তো! সেই লোভে লোভে ঘুর ঘুর করতি লেগেছে।—ও কিছু হবে না। আমি গণ্ডী দিয়ে দেবখন। (খোঁড়া তবু ভয়ার্ত হয়) বলছি বলি গণ্ডী দিয়ে দেবোখন, কোন ভয় নেই। আয়, তুমি আয়। শুয়ে পড়। রাত-বিরেতে অমন আসে ওরা। আসে আবার চলে যায়। শুয়ে পড়। ···(হঠাৎ গোঙানি শুনে উৎকর্ণ হয় কানা) এট্টা গোঙানি শুনতি পাই! ও পচা! (খোঁড়া ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরে কানাকে) আরে এ মানষির গলা, শুনতি পাস নে? ঐ, ঐ···জাখদিনি উঠে। (খোঁড়া গোঙানি লক্ষ্য করে উঠে যায়। চাষী পরিবারের দিকে এগিয়ে যায়)

খোঁড়া। কি হয়েছে গো! হে ভা! বলি হয়েছে কি?···

(চাষা একটানা সুরে আর্তনাদ করে চলে। বৌটাও হা-হুতাশ করে) · কথা বলে না।

চাষা। পেট কামড়াচ্ছে। ও হো হো হো হো। ভাল শকুনি যেন খামচে খাচ্ছে পেটের অন্তেরা। প্রাণ যায়। ও হো-হো-হো-হো!

কানা। কি হয়েছে রে পচা?

খোঁড়া। পেট কামড়াচ্ছে।

কানা। তাই বল। আমি ভাবলাম বলি—ও পেট চেপে শুয়ে থাকতি বল। কমে যাবেখন।

(চাষা আর্তনাদ করে চলে সারা রাত। সকাল বেলা দেখা যায় অচৈতন্য প্রায় শুয়ে আছে চাষা ফুটপাথে। পাশে শোকাকুলা চাষী বৌ)

[পরদিন সকাল

(কানা খোঁড়া ভিক্ষের বেরিয়েছে। কয়েকজন অফিসযাত্রী ভদ্রলোক চাষাকে ঘিরে আছে। মন্তব্য করছে। অফিসারের সময় নেই। স্ত্রীও এ চক্রে তিনি ভ্রূক্ষেপ না করে ছুটে যান পাশ কাটিয়ে)

১নং ভদ্র। কেসটি হয়েছে।

২নং ভদ্র। কলেরা।

৩নং ভদ্র। ছাই-পাশ যা তা খাবে।

১নং ভদ্র। বাঁচবে না। চোখ বসে গেছে।

জনৈক ছোক্রা। তাদা চোখ ছিল কবে যাদা যে বসিয়ে দিলেন!

বন্ধু ছোক্রা। যা বলিছিস মাইরী।

১নং ভদ্র। ফুট না কেটে য়্যামবুলেন্সে খবর দাও না। সব টেকসাদ্ বয় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো। পাতলুনের ভেতর হাত ঢুকিয়ে।

ছোক্রা। পালাগান-এর বেলা গেল যাদা, অফিস যান অফিস যান।

(ইতিমধ্যে সশব্দে য়্যামবুলেন্স ভ্যান্ এসে পড়ে)

[স্ট্রেচার বাহকদ্বয়ের প্রবেশ স্ট্রেচার সহ]

[স্ট্রেচার বাহকদ্বয় তৎপরতার সঙ্গে চাষাকে তুলে নিয়ে যায়। চাষী বৌ আর্তনাদ করে কাঁদতে থাকে পড়ে পড়ে]

চাষী বৌ। ওরে নিয়ে যেও না গো তোমরা, তোমাদের দুখানা পায়ে পড়ি বাবা,···ও গোপাল তাখ তোর বাপ্‌রে ওরা নে গেল চলে···

(চাষী বৌ কেঁদে আকুল হয়।)

[ভদ্রজন ও ছোক্রাদের প্রস্থান]

প্রিয়া। ছেলে নিয়ে এখন করবি কি]···আমি বলি টাঁ্যাপাটুপো আছিস, অত সহ্য হয়। না খেয়ে মরবি কেন শহরে।

চাষী বৌ। আর্তনাদ করে চলে : ওগো তুমি আমারে বল কেন ভাসিয়ে দিয়ে গেলে গো···ও আমার গোপাল রে···

[প্রিয়া হাসিমুখে চুপ করে বসে থাকে]

(কাজের ধারার সময় বয়ে যায়। অন্ধকার ঘনায়মান হয়ে আসে শহরে)

[কানা খোঁড়া যথারীতি সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে রান্নাবান্নার উদ্যোগ আয়োজন করে। প্রিয়া যেমন বসেছিল, তেমনই বসে বসে চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়ায় মুখ ভঙ্গীতে। পাতলা অন্ধকারে গোপাল এসে দাঁড়ায় কানা খোঁড়ার খাবার-দাবার দেখে]

কানা। (নেপথ্যে) পচা কত্তুর!

খোঁড়া। র আগে বাচ্চা ছেলেডারে দুটো দিয়ে আসি।

প্রিয়া। যে যে, সারাদিন বেচারা খায়নি, যে।·· তুই নেংড়ু তোর বজ্ঞ ঘরার শরীর। তোর কলজে আছে। সে আমি পেরথম দিনই টের পেইছি। বাচ্চা ছেলেডার জন্তে তুই যা করলি না, কেউ তা করবে না।

খোঁড়া। আছে তাই দিলাম। এ আর এট্টা বেশী কি কথা। সময় অসময় নেই মানষির।

প্রিয়া। তুই বুঝিস। কজনা তা বোঝে বল?—তোর বন্ধু তো আমারে আমলই দেয় না। ঘর তো ভাবে, মাগী বুঝি সব হাতিয়ে নেবে, হুঁঃ। আচ্ছা দেখছিস তো আমারে, বল।—কোনদিন আমি তোর কাছে হাত পেতে কিছু চেইছি, বল।

খোঁড়া। সে কথা আমি তোরে বলিছি?

প্রিয়া। দেওয়া-নেওয়ায় কি এসে যায় বল। মনডাই বড় কথা। মন ছোট যার তারে আমি কক্ষনও দেখতি পারি নে।···হাসিমুখে তুই ছাই ক্যান দিস না আমার হাতে, সোনা জ্ঞানে আমি তা মাথায় করে নেবো। আর কালো মুখ করে যদি শীর ননীও দিস তুই আমার হাতে, তো আমি বলবো তা ও—ওক্ষুনই আমি তা টান মেরে ফেলে দেবো। আমি আবার এইরকম লোক, হ্যাঁ। সেইজন্তি তো পড়ে-না আমার সঙ্গে কারো।

খোঁড়া। লোকে যে অনেক কথা বলে। মানষির কথায় কি এসে যায়।

প্রিয়া। না বজ্ঞ খেঁচানি করে রে নেংড়ু।

খোঁড়া। ও স্বভাব, যার যা স্বভাব।

[কানার প্রবেশ

কানা। খুব যে দেখি হক্ কথার লেনদেন হচ্ছে।

খোঁড়া। ক্যান কি বলিছি?

কানা। যাই বলিস—বলি নি তোরে ওরে মোটে পাত্তা দিবি নে? শালী তোর জান খেয়ে নেবে! তবু স্বাখগে সেই·· (লাঠি ভাঁজে)

খোঁড়া। হে স্বা, নাগবে বলছি হে স্বা···নাগবে···হে স্বা, বলছি নাগবে···আঃ···

[কানা তবু লাঠি চালায়। খোঁড়া তখন লাঠি টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কানা তখন জাপটে ধরে খোঁড়াকে। খোঁড়া এতক্ষণে বদলা নেয়। ঘুঁষি মারে জোরে। কানা পড়ে যায়। খানিকক্ষণ স্থির ঘরে থেকে আবার উঠে পড়ে। একটা ইঁট তোলে বড়]

···খুব সাবধান কিন্তুক। আজ এট্টা খুনখারাবি হয়ে যাবে, খবরদার। (প্রিয়া একখানা দা এগিয়ে দেয় খোঁড়ার হাতে। কানার হাতে ইঁট আর খোঁড়ার হাতে দা—খানিকক্ষণ কেটে যায়। তারপর কানা কি মনে করে ইঁট-টা সশব্দে ফেলে দেয়। কানা রোপড়ার ঢোকে রাগ ও অভিমানে ফুলতে ফুলতে। খোঁড়াও দা ছুরি ফেলে দেয়। ঝনঝন করে শানের ওপর পড়ে ধাতব শব্দ করে সেই দা। রাত হয়। ন্যাস বাজে রাজপথের হোটেল বার-এ, মাতাল চলাফেরা করে। উচ্ছৃঙ্খল সমাজজীবনের বেহায়াপনা প্রকট হয়ে ওঠে মাতালের পদভরে। রোজকার মত মাতালটা আজও আসে। থমকে দাঁড়ায়। চাষী বৌ দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে।

মাতাল। (থমকে দাঁড়ায়) তুমি কার, কে তোমার! ···এ সংসার ধোকার টাটি। আমি কার? তোমার? না!! কেন? মদ খেইছি তাই। পয়সা আছে তাই খেইছি। তা অনেকদিন খাচ্ছি।· পেরথমে কি খাই কি খাই তাবলুম মদ খাই। সেই যে খেলুম···পয়সাও ফুরোয় না, মদও ফুরোয় না।···ঘরে পরমা সাধ্বী স্ত্রী, পালঙ্কে ডানলোপিলোর সুখশয্যা, আছে—সব আছে,—তবু

শরতের শোভাযাত্রা ... চলুন মেলামেশার মহোৎসবে

এই মহোৎসব আজ
শরতের পথে শুরুর।
সকলের ঘরওয়া সপরিবারে যোগদান।
তার জন্য এখুনি প্রস্তুত হতে
হবে। নতুন বেশে সাজতে হবে।
নতুন জুতোয় চলতে হবে। সেরা
জুতো পাবেন বাটার দোকানে।
সপরিবারে এখানে বিশেষ আমন্ত্রণ।

মনে রাখবেন, দিন যত যাবে,
ভিড় তত বাড়ে। সুতরাং আসুন
সকালের দিকে। সকালের বাজারে
—আরামের বাজারে।

Bata

নর্দমার পাকে একবার গড়াগড়ি না দিলে…! পাপ কি? পাপই। টাকার পাপে আমার পাপ, আমার পাপে টাকার পাপ, যেমন যেন একটা Vicious Circle হয়ে গেছে…আচ্ছা : !—দুঃখিনি জননী আমার (সুরে)

(প্রিয়া বসে আছে। চুলে বিলি কাটছে। দূরে কোথাও কুকুর ডাকে, রিক্সার টুং-টাং শব্দ শোনা যায়। সময় বয়ে যায়। ক্রমশঃ ভোর হয়)

[পরদিন সকাল]

[চাষার ছেলে গোপাল থালি বাটিতে থেলাছলে দুধ ভাত খাচ্ছে] প্রিয়া বসে আছে। কানা খোঁড়া ভিক্ষেয় বেরিয়েছে। চাষী বৌ-ও খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়েছে]

গোপাল। (বাটিতে তরতি করছে বকবক করে) দুধ দিলাম, ভাত দিলাম…(বাটি উপুড় করে খায়) এইবার ডাল দিলাম, তরকারি দিলাম…(বাটি উপুড় করে খায়) ……ও মা !……(সাড়া নেই) মা !!……ওরে বাপ্ রেঃ…

প্রিয়া। (হাসে) বাপ তোর মরে গেছে। সেই যে কলেরিয়া হইছিল, উলাউটো, তাইতি মারা গেছে তোর বাপ। (গোপাল কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে শোনে)…এখন কি খাবি? কে তোরে খেতি দেবে?

গোপাল। খাব তো!

প্রিয়া। (জোরে) খাবতো, কে দেবে কে? খাব তো! বসে থাকলি খাওয়া আসবে!…ঐ যা, দুই যে মিষ্টির দোকান দেখছিস রাস্তার ওপার, ওখানে যেয়ে চা-গে। দেবেখন। সকাল বেলা সেই যে বাসি লুচি তরকারি ফেলে দেয়, কাগরা খায়, যা: । চাইলি-ই দেবেখন। দুই যে কালো মোটাপানা ছেলেডা, ওর কাছে চাইবি। ঠিক দেবেখন। যা……(গোপাল এগিয়ে যায় রাস্তা পেরিয়ে—থমকে দাঁড়ায়) যা আবার ফিরে চেয়ে দেখছিস কি, যা। যা যা রাস্তা পেরিয়ে যা। যা—া—া……(গোপাল যায়, প্রিয়া দেখে। কর্মব্যস্ত শহরের কোলাহল শোনা যায়। চলন্ত গাড়ীর শব্দ। লরির আওয়াজ। হঠাৎ তীব্র একটা হর্ণ-এর সঙ্গে থামমান লরির ব্রেক কষার শব্দ ফেটে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে জ্যা-মুক্ত ধনুকের মত ছিটকে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রিয়া কর্কশ এক আর্তনাদ করে, সঙ্গে জনমানবের হৈ-চৈ গণ্ডগোল। মুহূর্তকাল পরেই সব শান্ত হয়ে যায়। প্রিয়া বসে পড়ে বিমূঢ় হয়ে। বসেই থাকে। সময় অতিবাহিত হয়। শহরে সন্ধ্যা নামে।

শহরে সন্ধ্যা নামে। নেপথ্যে চাষী বৌকে শোনা যায় ছেলেকে ডাকছে—গোপাল! গো-পা-ল!)

[একটু পরেই কানা খোঁড়া ফেরে। আজ একসঙ্গে]

প্রিয়া। আজ এট্টা তোর খবর আছে নে নেংড়ু।… সেই যে কালো কোলো ছেলেডা না, ছেলেডা চাপা গেছে লরিতি। মাথাডা সে একেবারে থেঁতো হয়ে গেছে পেছনের চাকার নিচি।

খোঁড়া। যাঃ !!

[কানার হাত থেকে লাঠি পড়ে যায়। দুজনেই বজ্রাহতের মত বসে পড়ে]

(নেপথ্যে চাষী বৌ-এর ডাক শোনা যায়—গোপাল! গোপাল!…গোপাল!… গোপাল!!…)

[সকাল]

[চাষী বৌ চোরের মত অন্য একটা ছেলে কোলে করে এসে ঢোকে। তাকে আদর করে বসায়, খেতে দেয় কৌটো বাটা ঘেঁটে]

চাষী বৌ। গোপালরে বলে আমি কত খেতি দেবো। ডালভাত দেবো, কত খেতি দেবো। আমার গোপাল দুধ খাবে, আমার গোপাল ভাত খাবে, তরকারি খাবে, না? সোনাবাবা…(আদর করে। হঠাৎ একটা মেয়ে ভিকিরি ঢুকে চাষী বৌকে চ্যালাকাঠ দিয়ে মেরে, ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ছেলেটাকে ঝটকা মেরে নিয়ে যায়) ভাইনী পুতখাগী আমার—ছেলে চুরি করে এনিছিস কান র‍্যা।…

[ছেলে নিয়ে প্রস্থান]

চাষী বৌ তখন পা ছড়িয়ে ছেলেমানুষের মত কাঁদে ইনিয়ে বিনিয়ে। প্রিয়া বসে হাসে। খানিকক্ষণ পর

কান্না থামে চাষী বৌ-এর। কি একটা আশ্বাস দেখতে পায় সামনে। উৎফুল্ল হয়। তারপর ছুটে বেরিয়ে যায়। প্রিয়া উঠে এসে আগ বাড়িয়ে দেখে। চাষী বৌ ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো করে সব ইঁট-কাঠের ছেলেমেয়ে বুকে করে নিয়ে এসে শুইয়ে শুইয়ে দেয় ঘরসংসার ছুড়ে। আর ঘুমে সুখদুঃখের কথা বলে ছড়া কেটে। খালি ঘরে ভরা সংসার—হুড়োহুড়ি করে চাষী বৌ। এক সন্তান ছেড়ে আর এক সন্তানের কাছে, কথা আর ছড়ার স্বপ্নলোক। ঘুমপাড়ানি গান করে চাষী বৌ।

চাষী বউ। রও, এডারে এট্টু ঠাণ্ডা করি। তারপর তোমার কাছে আসছি। একা মা কল্পনারে সামলাবে ওগো? কাঁদে না।…(সুরে) আয় ঘুম আয়……এইবার তুমি শোও। এক গোপাল ঘুমোলে আমি এখন আর এক গোপালের কাছে যাই।…এইতো এইছি! বাব্বাঃ, তোর হো দেখি খুব গলা। একেবারে বাপের গলা পেয়েছে। না না, এই তো এইছি। কিসে পেয়েছে? ও সোনা বাপ আমার! গান করে চাষী বৌ ঘুমপাড়ানি।

(ঘুমপাড়ানি গান)

ঘুমোরে গোপাল ঘুমো
ঘুমোরে গোপাল ঘুমো।
ঘুমোরে গোপাল হেসে
হট্টমামার দেশে।
সেখানে গোপাল কি করে?
—মা, পা তুলে তুলে নৃত্য করে
হাত তুলে তুলে ফুল তোলে
সব সখীদের মাঝখানেতে ঘুরে বেড়ায়।
আনতো গোপাল নাদ বাড়ি
ঝুমুকে মেরে খুন করি।
ঘুমোরে গোপাল ঘুমো
ঘুমোরে গোপাল ঘুমো।

[বেলা দিন। মেঁয়েরা ভাকে ওড়ওড়িয়ে। আধালি-পাধালি বাতাস বয়। ছাটবৃষ্টির সাঁপট চলে সন্ধ্যার দিকে। চাষী বৌ তখন ইঁটকাঠের সন্তানদের চাপা দেয় যা পায় তাই দিয়ে, দৌড় ঝাঁপ করে]

: ও মা আমার ছেলে ঘরে যাবে। বুকে জাপটে নেয় একটাকে। আঁকড়ে ধরে বুকে বাজবিজলি দেখে ভয়ার্ত চোখে। ঈশ্বর করুণাময়। সেই দিকে তাকিয়ে থাকে চাষী বৌ।…ভিজে গিয়ে শীত করে প্রিয়ার। সে-ও ছুটে বেরিয়ে যায়। চাষী বৌ সংসার সামলায়। এক মুহূর্ত পরেই আগুনের একটা মালসা নিয়ে ঢোকে প্রিয়া। আগুন পোয়ায়।….খোঁড়া ঢোকে শীতে কাঁপতে কাঁপতে।

[খোঁড়ার প্রবেশ]

খোঁড়া। হি হি হি হি……হি হি হি স্-স্……

প্রিয়া। খুব শীত, না রে নেংড়ু! বড্ড ঠাণ্ডা!… আগুন নিবি, আগুন!……

(আগুনের মালসা নিয়ে যায় প্রিয়া নেংড়ুর কাছে। খোঁড়া খুশীমনে সেঁকতাপ নেয়)

……এগিয়ে বোস, কোলের মধ্যি করে এগিয়ে বোস। সেঁকতাপ নে ভাল করে। বড্ড ঠাণ্ডা।

খোঁড়া। বাঁচালি রে।

প্রিয়া। শুধু মুখ ফুটে বলি। (গায়ে হাত দেয়) একেবারে ভিজে গিইছিস রে নেংড়ু…এগিয়ে বোস… ভাল করে সেকতাপ নে…(হাসে) বল, আমি ভাল না!

খোঁড়া। আগুন পেলি কনথে?

প্রিয়া। এট্টা পান খাবি, পান?……নেঃ, তুই এট্টা খা, আমি এট্টা খাই।……(পান খায়)…তোর জিব লাল হয়েছে? (নিজের জিব দেখে। খোঁড়াও নিজের জিব দেখে)…বাইরি বড্ড ঠাণ্ডা নেংড়ু। তোর ঝোপড়ায় এট্টা জায়গা দিবি?

খোঁড়া। আয়।

[দুজনে ঝোপড়ায় ঢোকে। একটু পরেই কানার প্রবেশ]

[কানার লাঠি ঠোকার শব্দ পেয়ে ঝোপড়া থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় প্রিয়া। কিন্তু কানা ধরে ফেলে তার আঁচল]

কানা। কে ছ্যা? কে তুই।…উত্তর নেই পাজী তোরে আমি…(লাঠি তোলে)

প্রিয়া। আ—।—।—।—(চীৎকার করে ওঠে)

(ছেড়ে দিতেই হড়মুড় করে গিয়ে পড়ে প্রিয়া মুটপাথে। চীৎকার শুনে খোঁড়া বেরিয়ে আসে মারমুখ হয়ে)

খোঁড়া। কি করছিস কি তুই এত রাত করে।

কানা। ওডা কেডা ?

খোঁড়া। কোনডা ?

কানা। কেডা ওডা ?

খোঁড়া। ওডা…!

কানা। কেডা ?…

(লুকপাত্তহীন লাঠি চালিয়ে কোঁড়া ভেঙে কানা বেরিয়ে যায়—তক্ষুনি। কিন্তু খোঁড়া ঘটনার গুরুত্ব বুঝে বন্ধুকে ফেরাবার চেষ্টা করে)

খোঁড়া। হে ভা, কের বলছি, হে ভা, কের, কের বলছি (ঘরে টেনে আনে) কিন্তু কানার মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। সে জোর করে ছাড়িয়ে যেতে চায়। ধস্তাধস্তি চলে। কিন্তু কানার সঙ্গে খোঁড়া পেরে ওঠে না। ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় কানা খোঁড়াকে। প্রিয়া সভয়ে প্রত্যক্ষ কোরে গোটা ব্যাপারটা।

উঠে দাঁড়ায় খোঁড়া। দেখে বন্ধু চলে যাচ্ছে তাকে ছেড়ে। হয় তো আর ফিরবে না। খোঁড়া তখন কান্নায় ভেঙে পড়ে।

খোঁড়া। বেশ যা। আমারও মনে থাকবে কথা। শালা হিংসুটে, কানা! তোরে আমি…(হিংস্র ক্রোধে আবার কেঁদে ভেঙে পড়ে) (প্রিয়া এগিয়ে আসে)

প্রিয়া। চুপ কর নেড়ু। চুপ কর। চুপ কর।

(খোঁড়া তাকে ঝটকা মেরে সরিয়ে দেয়)

খোঁড়া। না তুই যা।…(কানাকে উদ্দেশ করে) শালা তোর জন্যি আমি তিনির পর দিন ধরে কি করিছি আর না করিছি। আর তুই কি না আজ…; বেশ, যা—আমি-ও দেখে নেবো তোর দৌড় কতদূর। (আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে)

প্রিয়া। নেড়ু আয়। আমার ঘুম পাচ্ছে নেড়ু আয়।…নেড়ু আয়…আয়……আয়……

(খোঁড়া নিঃশব্দে বসে কাঁদে শিশুর মত)

[রাত গভীর হয়। অন্ধকার। পরদিন সকাল।]

[দিনের আলো পড়তেই উঠে দাঁড়ায় খোঁড়া। কঠিন শপথে থম থম করে তার মুখ। ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর ঝোপড়া ঘরে টেনে ভেঙে দেয় নিজ হাতে গড়া আবাস। চলে যায় কানার খোঁজে। উঠে দাঁড়ায় প্রিয়া ভাঙা ঝোপড়া কুঁড়ে।

এদিকে চাষী বৌ-এর ঘুম পাড়ানি গান উৎসারিত হতে থাকে আলোকধারার মত। বিশ্বসংসার যেন কোলে করে দোলাচ্ছে চাষী বৌ]:

(সুরে) আয় ঘুম আয়……

(প্রিয়া সকৌতুকে প্রত্যক্ষ করে)

… … …

[ওদিকে পটভূমিতে মিছিল সুরু হয়ে গিয়েছে লাঠি-ঝাটির। শীর্ণ বাহুতে উৎক্ষিপ্ত লাঠি আর ঝাটি নিয়ে ভ্রাতৃরা মিছিল নিয়ে চলেছে। সামনে ছিল ভাঙা কুলো। সেই কুলোর বাতাস দিতে দিতে প্রিয়া তার সাধ কামনা ছাই ভস্মের মত উড়িয়ে দিয়ে মিছিলে গিয়ে যোগ দেয়।

এ মহা মিছিলে যোগ দিলে হয় তো গোপালেরও সন্ধান পাওয়া যাবে। চাষী বৌ-ও যোগ দেয় মিছিলে]

…এ বাবা:—এ বাবা:—এ বাবা: !

নগর সীমার উপান্ত ধরে এগিয়ে চলে লাঠি-ঝাটির মিছিল কম্পুরেখায়িত ছায়াপথ ধরে।

—যবনিকা—

দি ওরিয়েন্টাল মার্কেণ্টাইল কোং লিঃ
কলিকাতা · দিল্লী · কানপুর · বোম্বাই · মাদ্রাজ

প্রেস্টিজ

সুধাময় দাশগুপ্ত

একটি একটি করে দোতলার সিঁড়ি ভাঙছিলেন ক্লান্ত অতীন্দ্রনাথ। সেই সিঁড়ি যে সিঁড়ি ওরতর করে নামতে নামতে সাগর থেকে ঝিনুক এনে সোপান গাইবার গান গাইতেন। বারান্দা পার হয়ে ঢুকে—ইজিচেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে—দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিলেন সেই আকাশের দিকে, যে আকাশের দিকে একবার চোখ দুটোকে ছেড়ে দিতে পারলে আজকের অতীন্দ্রনাথ—সে দিনের অতীনের মন নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ত নিঃসীমে বেড়িয়ে আসতে।

সংসারও বাধা হয়ে উঠেনি কখনো। বাবা ভালো কাজ করতেন। গাড়ী না থাক বাড়ী ছিল। ডিপোজিট না থাক ক্রেডিট ছিল না। সংসারের অর্থনৈতিক ব্যালেন্স পারিবারিক মর্যাদা নিয়ে এমন মুখ থুবড়ে পড়ত না। কিন্তু দিনকে দিন সব থাকাই যেন কি রকম আশ্চর্যজনক ভাবে কিছুই না থাকার দাঁড়াচ্ছে গিয়ে দেখতে পাচ্ছেন অতীন্দ্রনাথ। আর-বারের পাহাড়ায় বাঘ এসে ঠিকরে মাটিতে। আর উঠছে আকাশ পানে। যে বাড়ী ছিল তার বাবার সুখের, গর্বের, আনন্দের অতীন্দ্রনাথের কাছে তা দুর্বিসহ চাপের। টাক্স বেড়ে বেড়ে হয়ে উঠেছে চারগুণ। সে টাক্স বাকী পড়ে পড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তার দেবার সামর্থ্যের বাইরে। যদিও কারু দৃষ্টি পড়ার মতো বাড়ী তার নয়, তবু শেঠেদের লোলুপ দৃষ্টি এসে পড়েছে বাড়ীটার ওপর। এটা গ্রাস করতে পারলে ওদের বড় বাড়ীর পরিধি আরো বড় হয়। তিন মাথার মোড়ের বাড়ী হয়ে পাড়া জাঁকিয়ে বসতে পারে। যেমন মুখুজ্জেদের বাড়ী গ্রাস করে পাড়া জাঁকিয়ে বসেছে জৈন।

সিগারেট খেতে খেতে অফিসের পোশাক পরেই একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছিলেন অতীন্দ্রনাথ। স্ত্রীর চা খাবার তৈরী হয়ে যাবার ডাক শুনে জামা-কাপড় বদলে হাত মুখ ধুয়ে এলেন।

ইজিচেয়ারের পাশে ছোট তেপায়াটার ওপর হাতের চায়ের কাপ আর খাবার ডিস নামিয়ে রেখে মোড়া টেনে বসল সুষমা। স্বামীর ভেজা শরীরে আর চুলের দিকে তাকিয়ে বললো, বেশ, এই আশ্বিনের সন্ধ্যেবেলায় গা মাথা ভিজিয়ে এলে তো! তারপর নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হলে দেখব। মুখ মুছতে গিয়ে মানুষের গা মাথা চুল যে কি করে এতো ভেজে বুঝি না—নেও মুছে ফেল। হাত বাড়িয়ে খাটের মাথার ওপর থেকে তোয়ালে তুলে এনে স্বামীর হাতে দিলেন।

অতীন্দ্রনাথ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। সুষমার গলার স্বরে, মুখের চেহারায় আজ যেন কেমন একটা খুসীর ছটা লুকানো। যে বস্তু তার মুখে বহুকাল দেখেননি তিনি। বিশেষ করে খুসীটার ভেতর যেন কোথায় মেশানো রয়েছে একটা বধূ ভাব।

গা মাথা মুছে তোয়ালে রেখে চায়ের কাপ হাতে তুলে নিলেন অতীন্দ্রনাথ—

সুষমা বলল, বলছিলাম কি—

অতীন্দ্রনাথ তাকালেন সুষমার দিকে।

একটা কথা বলছিলাম—আবারও থেমে পড়ল সুষমা। যেন যে কথাটা সে বলতে চাচ্ছে, সে কথাটার উপর তার নিজের প্রতীতিও খুব দৃঢ়রূপে গড়ে ওঠেনি। যদি বলতে গিয়ে দেখেন মিলিয়ে যাচ্ছে। যেমন আলেয়ার আলো, ধরতে গেলে মিলিয়ে যায়।

অতীন্দ্রনাথ রুটি আলু ভাজার পুলিন্দা মুখে পুরে দু একটা চিবুনী দিয়ে নিয়ে বললেন, বলছিলাম কি, একটা কথা—যা বলবে তাইতো কথা। কথাটা কি তাই শুনি?

আচ্ছা, গৌতমকে দেখেছ তুমি?

ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন অতীন্দ্রনাথ। কে গৌতম?

বাঃ, ঐ যে ছেলেটি আজকাল প্রায়ই সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ী আসছে?

না দেখিনি। কে সে?

একই সঙ্গে পড়ে আমাদের রমা আর গৌতম—

রমা অতীন্দ্রনাথের বড় মেয়ে। সুষমার সব বক্তব্য বোঝা হয়ে গেল অতীন্দ্রনাথের। কিন্তু বোঝার পরেও শোনার যে কথাগুলো থাকে তা শোনবার জন্য স্ত্রীর দিকে চোখ রেখে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগলেন তিনি।

বি. এ.তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। এম. এ.তেও সবাই ভাবছে সেই প্রথম হবে। সুষমার চোখ চক্‌চক্ করে উঠল আনন্দে। ব্যাঙ্কে নাকি একটা ভালো কাজ পাওয়ার কথা আছে। পেলে নিয়ে নেবে। প্রফেসারির চাইতে অনেক বেশী মাইনের ভবিষ্যৎ নাকি তাতে। তারপর ফিস ফিসে কণ্ঠে বললো, এখন রমাকে প্রায় রোজই পড়াতে আসছে। কাল বিকেলে ওরা বেড়াতে বেরিয়েছিল। সন্ধ্যায় ফিরে এসে হঠাৎ রমা আমার গলা জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে পিঠের ওপর মুখ রাখলে না, জানো আমার মনে হয় গৌতম নিশ্চয় বিয়ের কথা বলেছে। তাই না?

হ্যাঁ, অতীন্দ্রনাথেরও মনে হচ্ছে রমা যেন আজ সকালবেলা তাকে কি বলতে এসেও মুখ নিচু করে গেছে তাকে ব্যস্ত দেখে। হয়ত সে তার অফিস থেকে ফেরবার অপেক্ষা করছে। সুষমা চলে গেলেই এসে পায়ের কাছে বসে পড়ে কথাটা তাকে জানাবে। ভাবতে লাগলেন অতীন্দ্রনাথ। যে মেয়ের বিয়ের কথা অনেক ভেবেছেন তিনি। অনেক সম্বন্ধও এনেছে সুষমা। কিন্তু ভেঙে গেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। টাকা, টাকা কোথায়। পড়ছে পড়ুক। এক সঙ্গে পাঁচ সাত হাজারের ধাক্কা তো নয়। ওটা চালিয়ে যেতে পারবেন তিনি কোন মতে সব কটি ছেলেমেয়ের কিন্তু তার বেশী কিছুই পারবেন না— কিছুই না।

উঠে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে লাগলেন তিনি। এখন রমা এসে যদি তার আশীর্বাদ চায় তবে আপনা থেকেই তো অতীন্দ্রনাথের আশীর্বাদের হাত ওঠে আসবে তার মাথার ওপর—কিন্তু……না… আজকালকার এ সমস্ত প্রণয় করা বিয়ে তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। এগুলো আবার বিয়ে নাকি। দুদিন না যেতেই তো বিচ্ছেদের জন্য ছোটাছুটি পড়ে যায় দেখতে পান। কই সুষমা ভাবতে পারে তার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা? মন তৈরী করে ফেললেন তিনি। হঠাৎ স্ত্রীর কাছে গিয়ে পড়ে বলে উঠলেন, দেখো, ছেলে প্রফেসর হবে না ব্যাঙ্কে অফিসর হবে—ভবিষ্যতে, সেটাই বাবা মার কাছে বড় কথা নয়। বড় কথা হলো ভবিষ্যৎ জীবনে সে সুখী হবে কি না। এ সব কলেজী প্রেম আর বিয়ে—এ ছেলের সঙ্গে রমার মেলামেশা বন্ধ করে দেও।

আস্তে আস্তে—তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছেড়ে ওঠে পড়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে স্বামীকে খাবাতে চাইল সুষমা। রমা কোথাও ধারে কাছেই তো রয়েছে। যদি শুনে ফেলে! সে তো কিছু বলেনি। সবই তো তার অনুমান মাত্র। বললেন, এতো চেঁচাবার কি আছে। বেশ তো—

বেশ তো নয়। তেমনি ক্রুদ্ধকণ্ঠেই বলতে লাগলেন অতীন্দ্রনাথ কাণ্ডজ্ঞান আছে কিছু তোমার। কে বাবা, কে মা। কেমন পরিবার কিছুই জানো না— মেয়েকে মিশতে দিয়েছ। এ ভাবে মিশতে মিশতে তার পরিণতি কি দাঁড়ায় যেন জানো না! বিনে পয়সার মাষ্টার—আকাশ থেকে টপ করে এসে পড়া লোভনীয় পাত্র, ভাগ্য যেন তোমার দরজায় নৃত্য সুরু করে দিয়েছে!

এ তো গলা চুলকিয়ে ঝগড়া করা। ইচ্ছা করে বিরোধ সৃষ্টি করা। সুষমা কি কিছু জোর করে বলেছে। তার ভালো লাগাটা তো কেবল জানিয়েছে। স্বামীর কথার ওপর কবে সে কথা বলে। অতীন্দ্র যা বলবে তাই তো সব সময় করে। দেবে না করে গৌতমকে, মুখ কালো করে বললো, বেশ আমি রমাকে বলে যোবো। কি বলে দেবে রমাকে? তেমনি ক্রুদ্ধকণ্ঠ অতীন্দ্রনাথের।

কেন, এই যে বললে গৌতমকে আসতে মানা করে দিতে।

রমাকে বলতে যাবে কেন?

তবে কাকে বলব?

কাউকে না। এলে আগ্রহ প্রকাশ করতে আদর করতে, এখন অনাদর অনাগ্রহ প্রকাশ করবে। শিক্ষিত ছেলের কাছে তাই যথেষ্ট।

বেশ।

কিন্তু যা করবে ভেবে-চিন্তে করবে। ফের আরামকেদারায় বসে সিগারেট ধরালেন অতীন্দ্রনাথ। বললেন, মেয়ে বড় হয়েছে। তাতে আজকালকার ছেলেমেয়ে সব। কি বলতে কি বলবে—আর গিয়ে লোকের জলে ঝাঁপ দেবে—এই তো আধুনিক ফ্যাসান। না, থাক। যা বলবার আমিই বলব। বুদ্ধি-বিবেচনা করে যা বলতে পারবে তুমি তা আমার জানা আছে। মেয়ের সম্বন্ধে, এমন প্রিয় মেয়ের সম্বন্ধে এমন বিশ্রী মন্তব্য স্বামীর মুখ দিয়ে বেরুতে পারে এ কল্পনাও ছিল না তার। তাই ভালো বলে এক পা এক পা করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সুষমা। বারান্দায় দেখা হলো অতীন্দ্রনাথের আশৈশব বন্ধু সীতাংশুর সঙ্গে। যার এ বাড়ীতে নিত্যদিন উপস্থিত অনিবার্য। অতীনের উঁচু গলা সে শুনতে পেয়েছিল। হেসে জিজ্ঞাসা করল, ঝগড়া করে এলেন তো? কি নিয়ে?

জিজ্ঞাসা করুন গিয়ে বন্ধুকে।

ঘরে ঢুকে আসন গ্রহণ করে অতীন্দ্রনাথের দিকে সিগারেট বাড়িয়ে ধরে সীতাংশুবাবু বললেন, কি হয়েছে? একটা সিগারেট টেনে নিতে নিতে অতীন্দ্রনাথ বললেন, যা সর্বত্র হচ্ছে আজকাল।

তাই যদি হয়—যা সর্বত্র হচ্ছে সেই রকমই কিছু তোমার এখানেও হয়েছে, তবে আর বেলাজ করা কেন?

এটা কোন যুক্তি হলো না। সবখানে যা হবে—আমার ভালো লাগুক আমি পছন্দ করি আর নাই করি আমাকে মানতেই হবে।

এটাই জগতে সেরা যুক্তি। 'যখন যেমন যথাকালের' মতো, যে কালে সমাজের যে রূপ নেয়—যে গতি নেয়—সে গতির দিকেই পা ভাসিয়ে দিতে হয়—না, আমার দ্বারা তা হবে না। ওঠে গিয়ে আলমারির

ঝাঁধার ওপর থেকে ঝাঁধার ছক আর গুটির বাক্স নামিয়ে খাটের উপর বিছিয়ে বললেন, এসো এক হাত খেলা যাক।

সীতাংশু উঠে এসে খাটের ওপর বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যবস্থাটা কি নিয়ে ?

এক চাল দিয়ে অতীন্দ্রনাথ বললেন, রমাকে নিয়ে।

কি ? সে কাউকে বিয়ে করবে বলছে ?

তার মাথা মনে হচ্ছে বলবে।

তোমার আপত্তি কোথায় ? ছেলে পছন্দ নয় ?

না ছেলে অপছন্দের নয়। কিন্তু এ জাতীয় বিয়েরই বিরোধী আমি। এসব কলের প্রেম—হিঃ হিঃ—বাধা দিল সীতাংশু। এ ভাষা তোমার মুখে মানায় !

বন্ধুর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালেন অতীন্দ্রনাথ। মানায় না ? আমারও মনে হচ্ছিল তাই। কিন্তু কি ভাবে বললে যে খুব কড়া করে বলা হয় বুঝে ওঠতে পারছিনে—মনে হচ্ছে সব সময়ই দুর্বল। বোধহয় ভেতরটা দুর্বল বলে !

দুজনেই খেলতে খেলতে কথা বলছিলেন। অতীন্দ্রনাথের কথা শুনিয়ে দেখল না সীতাংশু। ঘোড়ার আড়াই ঘরি চাল মেরে বলল—ভেতর দুর্বল কিনা জানিনে—কিন্তু যুক্তিটা যে অত্যন্ত দুর্বল শোনাচ্ছে—সে ঠিক।

তবে আর নাড়া দিও না। নেও মন্ত্রী সামলাও।

দু বন্ধুকে চা পাঠিয়ে দিয়ে মেয়ের ঘরের ভেতর উঁকি দিলেন মা। এক নজরেই বুঝলেন রমা সব শুনেছে। রাতটা শুয়ে ঘুমোতে পারলো না সুষমা। দু'তিনবার ওঠে গিয়ে দেখে এলেন মেয়েকে ঘুমচ্ছে কিনা। সকালবেলাও প্রথমেই গেলেন রমার ঘরে। বিছানায় মেয়েকে না দেখে বুকটা ধড়াস্ করে উঠল তার। এত ভোরে তো রমা ওঠে না। এক রকম ছুটেই রমার পড়ার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন তিনি। না, রমা মাথা গোঁজ করে একমনে মস্ত একটা বই থেকে কি যেন নোট করে চলেছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন তিনি। এ সব ব্যাপারে প্রথম দুঃখ অভিমানের বোঁকটা কেটে গেলে বিপদও অনেকখানি কেটে যায়।

সুষমা ভেবেছিল অতীন্দ্রনাথ মেয়েকে ডেকে আজ যা বলার বলে সাবধান ক'রে দেবেন। কিন্তু দেখল সে সব কিছুই করলেন না তিনি। শুধু যে মেয়ের সঙ্গে সব চাইতে বেশী কথা বলেন, সব চাইতে বেশী ভালবাসেন, তাকে এড়িয়ে কাই-ফরমাসগুলো অপরকে দিয়ে করিয়ে অফিসে বেরিয়ে গেলেন।

কান সজাগই রেখেছিল সুষমা। গৌতমের সাড়া পেতেই উঠে এসে আড়ালে দাঁড়ালেন মেয়ে কিছু বলে কিনা দেখবার জন্যে।

গৌতমকে দেখে হাতের কলম নামিয়ে রেখে দুহাতের আঙুল মটমট ক'রে ভাঙতে ভাঙতে ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে রমা। বইগুলি গুছিয়ে ঠেলে রাখতে রাখতে বলল —'চল।'

'এখন আর অমনি চলব মানে ? আজ তোমার ক্লাস নেই বলেছিলে না ?'

'তাই তো বলছি, চল একটু কফি খেয়ে আসা যাক।'

'কিছু দরকার নেই। তোমার মা'র হাতের চা কফি হাউসের কফির চাইতে অনেক বেশী উপাদেয়।'

'তোমার জন্যে আর এ বাড়ীতে চা হবে না।' কথাগুলো রমার কান্নায় ঠাসা।

সুষমার গালে প্রায় হাত উঠে আসে। গৌতম যে মেয়ের কাছে ওদের চাইতে আপন হয়ে উঠেছে দেখছি!

দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল গৌতম। জিজ্ঞাসা করল আমার চা বন্ধ করলেন কে—বাবা?

হাতের পিঠে চোখের জল মুছে নিয়ে রমা বললো—'হাঁ।'

একটু সময় মাটির দিকে তাকিয়ে চিন্তিত মুখে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল গৌতম। তারপর মুখ তুলে রমার দিকে তাকিয়ে বললো—তোমার বাবার সঙ্গে আমি যদি কথা বলি তবে কেমন হয়?

কাল পর্যন্ত ভেবেছি এখন সেটাই সবার আগে দরকার। কিন্তু আর তা ভাবার কারণ নেই। আবার গলা ধুয়ে আসতে চাইল রমার।

রমার একটু কাছে এগিয়ে এসে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে তার হাতটা হাতে তুলে নিল গৌতম। বললো, এত দুঃখ পাচ্ছ কেন বলত? সব কাজই কি জীবনে সরলভাবে দেখা দেয়? আমরা দুজনে যখন পরস্পরের মন জানি, তখন কোন বাধাই আমাদের বাগা দিতে পারবে না। চলো তো। ভেবে দেখা যাক কি করা যায়।

শান্ত ভাবেই দিন কাটতে লাগল। রমা মুখ গুঁজে কলেজের নোট তৈরী করে, গৌতম আর আসে না। অতীন্দ্রনাথ অফিসে যান। কোন তাড়া নেই তার মেয়েকে সাবধান করবার। সুষমা কয়েক দিনই মনে করিয়ে দিলেন কথাটা। বললেন, এখনও হয়ত সময় আছে। তারপর যদি তাও না থাকে। অতীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন, গৌতম আর আসে না তো?

না।

তবেই ঠিক আছে।

যদি বাইরে দেখা করে?

অতীন্দ্রনাথ শুধু শব্দ করেন—হুঁ।

কিন্তু সুষমা মনে মনে দুর্গা নাম স্মরণ করেন। তিনি জানেন, এ ঝড়ের পূর্বাভাস।

ঠিক তাই।

বিশ পঁচিশ দিন বাদে একটা চিঠি পড়তে একেবারে কেঁটে পড়লেন অতীন্দ্রনাথ। সুষমা ছুটে এসে তার দিকে চিঠিটা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, নেও পড়। তোমাদের গৌতমের বাবার চিঠি। ছেলের বাবা হয়ে আমাকে সাবছেন এ মত যেন একেবারে মাহাত্মা হয়ে গেছেন। ছেলেমেয়ে বড় হলে নিজেদের জোর চালাতে গেলে হিতে বিপরীত হয়—কি উপদেশ!

সুষমা কিন্তু চিঠির কোথাও ঝড় দেখতে পেল না। যা দেখল তা হলো শিক্ষিত মনের বিনীত আবেদন। সত্যি ছেলের বাপ হয়ে অনেকেই করতেন কিনা সন্দেহ।

এমনি সময় বিনা ভূমিকায় ঘরে এসে ঢুকল সীতাংশু। সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকালেন অতীন্দ্রনাথ।—কি এমন অসময়ে? কিংবা একেবারে ঠিক সময়ে—মানে চিঠিটার সঙ্গে সঙ্গে? রমা কি তার কাকাবাবুর আশ্রয় নিয়েছে নাকি?

বাবার পরেই কাকা, ঠিক আছে। বিয়েতে আপত্তি থাকলেও এটাতে তোমার আপত্তি থাকা উচিত নয়। শোন, বেশ ছাড় অতীন। কি বাজে গোঁ ধরে বসেছ। আমি তোমার সঙ্গে মানিয়েই উঠতে পারছিনে এই অযৌক্তিক ব্যবহার। ওরা রেজিস্ট্রেশন ম্যারেজ ঠিক করেছে। গৌতমের বাবা মত দিয়েছেন,

তুমিও যেও। গৌতম বলছে এত তাড়া সে করত না; কিন্তু তার ব্যাঙ্কের কাজটা হয়ে যাওয়ায় তাকে সাত দিনের ভেতর মাদ্রাজ চলে যেতে হচ্ছে—তাই এই তাড়া।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন অতীন্দ্রনাথ। সুষমা জিজ্ঞাসা করল— কবে বিয়ে? কাল। রমাকে এখন আমার বাড়ীতে রেখে এসেছি। অতীন যদি জেদ না ছাড়ে তবে আজ আমার ওখানেই থাক। কালকে গৌতমের মা এসে নিয়ে যাবেন বলেছেন।

পরের দিন অতীন্দ্রনাথ সীতাংশুর অপেক্ষাই যোলয়ে করছিলেন। তিনি জানতেন, যত রাতই হোক একবার সংবাদ বলতে সীতাংশু আসবেই। সীতাংশু এলে একটু বিস্রপের ভঙ্গিতেই বলতে চেষ্টা করলেন, বিয়ে খেলে?

আসন নিয়ে সীতাংশু বলল, খেলাম।

বৌদি কোথায়?

ছাদে বসে কাঁদছেন।

আর তুমি?

আমি? ভাবছি।

কি ভাবছ?

কি জানি কি ভাবছি নিজেই বুঝে উঠতে পারছিনে। তবে কাঁদছিনে যে তা তো দেখতেই পাচ্ছ।

তা ঠিক। তুমি কাঁদছ না। কিন্তু মা কাঁদছে। ওখানে রমা কাঁদছে। গৌতম চুলের ভেতর হাত চালাতে চালাতে বিমর্ষ মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকের দিনটা ওদের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। এই দিনে ওদের মুখে হাসি ফুটতে দিলে না, পরম ভালোবাসার আশীর্বাদ পেতে দিলে না,—আমি তোমাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিনে অতীন—কিছুতেই না। তারপর যেন আপন মনেই বলে চললো, কি সুন্দর যে লাগছে বনের বেশে রমাকে আর বরের বেশে গৌতমকে, যদি দেখতে—

আমি দেখছি সীতাংশু—

হঠাৎ চমকে উঠলো সীতাংশু অতীন্দ্রনাথের আবেগকম্পিত কথায়। মানে?

এর চাইতে বেশী দেখবার লোভ করতে নেই সীতাংশু আমাদের। চেয়ার ছেড়ে ওঠে পড়লেন তিনি। সীতাংশুর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বলতো এ ছাড়া কি করতে পারতাম আমি, শুধু মাত্র পারিবারিক মান বাঁচানো বিয়ের ব্যবস্থাটুকু করতে হলেও আমার পাঁচটি হাজার টাকার দরকার হতো। আছে আমার পাঁচটা পয়সা? উপায় ছিল কাবুলিওয়ালা, নয়ত বাড়ী বাঁধা রেখা। কিন্তু তাতেই কী কিছু হতো? ধিয়ে-থুয়ে সন্তুষ্ট করতে পারতাম? মান বাঁচত? তার চাইতে বল তো, এই ভালো হলো না? ছেলে সাধল, ছেলের বাপ সাধলো। মেয়ে কাঁদলো। মা কাঁদলো। আমার মাথা যে উঁচু সেই উঁচুতে রইল। বেশী লোভ করতে নেই সীতাংশু আমাদের। এর চাইতে বেশী চাইতে গেলে কেমন যেন সব পালিয়ে যায়। শুধু গলা বাঁচিয়ে বেরিয়ে যাওয়া—আর কিছু নয়।

সীতাংশু বোকার মতো তাকিয়ে রইল অতীন্দ্রনাথের বেদনার্ত মুখের দিকে।

———

— উৎসব অনুষ্ঠানে ও পূজা পার্ব্বণে —

লক্ষ্মী ঘি

বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দের বার্ত্তা বহন করে।

হাজার হাজার প্রশংসা পত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকটী —

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীসুধাংশুকান্তি ঘোষ
সম্পাদক – অমৃতবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মীঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সহিত একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

লক্ষ্মীঘৃত ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার ঘ্রাণ ও গন্ধ ভাল

শ্রীসীতা দেবী

লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই দুর্দ্দিনের বাজারে একপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্থাৎ লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডাঃ কালিদাস নাগ

লক্ষ্মীঘৃত ঘি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির ঘ্রাণ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, অসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

বিশুদ্ধ, পবিত্র ও স্বাস্থ্যপ্রদ

ছোট বড় সকল রকম টিনে পাওয়া যায়।

॥ লক্ষ্মীদাস প্রেমজী • ৮, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥

সতীলক্ষ্মী

রাস্তায় চলিয়াছিলাম। পাশের একটি গলিমুখ হইতে ডাক কানে আসিল, ও দাদা।

ফিরিয়া দেখিলাম, কবি। কবি তাহার নাম নয়। কবিতাও সে জন্মে লেখে নাই। তবুও আত্মীয় এবং বন্ধু মহলে সে কবি নামেই পরিচিত। আমার চেয়ে অনেক ছোট, অন্তত বছর দশকের ছোট। নিরীহ, অতি শান্ত ও সভ্য প্রকৃতির ছেলে। আমি তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতাম, অনেকেই করিত।

কহিলাম, কি হল?

কবির খালি পা, উত্তরীয় পরা। কহিল, যা।

—কি হয়েছিল?

—হার্ট-ফেলিওর, ঘুমের মধ্যে। আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়ে ভাল হল। কখন বাড়ি ফিরবেন?

—কেন?

—যেতে হবে ত। মানে, পরশু তাঁর কাজ।

—তাই বলতে?

—হ্যাঁ।

—আর যেতে হবে কেন? এই ত জেনে নিলাম।

—না না, সে হয় না।

—খুব হয়। তুমি একাই ঘুরছ ত? যেতে হবে না। গেলেও পাবে না।

—তবুও যাব। আপনি না থাকেন, বাড়িতে বলে আসব।

—দেখ গিয়ে, আমি তাহ'লে যাবই না মোটে।

—যাবেন না মানে?

—মানে যাব না। নিমন্ত্রণ নিয়ে নিলাম, এবং পরশু ঠিক যাব। কিন্তু মিছে হাঙ্গামা আর ফর্ম্যালিটি যদি কর, ত যাব না।

কবি নিরস্ত হইল। একবার কহিল, কিন্তু এটা অন্যায় হ'ল।

—না। তুমি গেলেই সেটা অন্যায় হবে। অনাবশ্যক কষ্টস্বরূপ আর ফর্ম্যালিটির দিন চলে গেছে। সে যাক। এখন এদিকে চলেছ কোথায়?

—এই কাজেই। এ পাড়ায় দু'একজনকে বলতে হবে।

—বাবা কেমন আছেন?

—ধাক্কাটা খেয়েছেন খুব, তবে আছেন মোটামুটি সুস্থই।

—আর তোমরা?

—আর আমরা মানে ত আমি আর—

—তোমার বৌ।

—হ্যাঁ। বিশেষ খারাপ থাকবার কিছুই নেই।

—ছোটগুলো ?

—আছে। কান্নাকাটি করছে, ঐ আর কি ? কথা বলতে বলতে আগাইয়া চলিয়াছিলাম। কবি কহিল, এই যে, এই বাড়িতে ঢুকব আমি। আপনি একটু দাঁড়াবেন ?

আমি একটু বিস্মিত হইলাম। কহিলাম, দাঁড়াবার দরকার কি, তোমার সঙ্গেই যেতে পারি। কিন্তু এটা কার বাড়ি ?

—বাবার এক বন্ধু। ডক্টর বোস। এক সময়ে নাকি খুব অন্তরঙ্গ ছিলেন দু'জনে। আমি অবশ্য চিনিনে ঠিক।

—আজ চিনবে। চল আমিও যাচ্ছি।

ডাক্তার বাহিরের ঘরেই ছিলেন। আমাকে দেখিয়া কহিলেন, আরে এস এস, অনেকক'ল দেখা নেই তোমার। কি হ'ল, কোথায় ডুব দিয়েছিলে ? এটি কে ?

কহিলাম, আমার বন্ধু, আত্মীয়ও বলা যায়। আপনার কাছেই এসেছে।

—আমার কাছে কেন ?

কবি চিঠি বাহির করিয়া দিল। কহিল, আমি বসন্তবাবুর ছেলে।

—বসন্তবাবু মানে, বসন্ত রায় ? কি হ'ল তার ?

—তিনি সুস্থ আছেন। আমার মা মারা গেছেন।

—তোমার মা ? ডাক্তার হঠাৎ থামিয়া গেলেন। চিঠিটা লইয়া পড়িলেন। কহিলেন, পরশু। বেশ বাবা। কিন্তু, বোসো, শুনে নিই। হঠাৎ মারা গেলেন, কি হয়েছিল তোমার মার ?

আমিও কহিলাম, বোসো, কবি।

কবি বসিল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হঠাৎ হার্ট ফেল, ঘুমের মধ্যে।

ডাক্তার চিঠিটির দিকে চাহিলেন। কহিলেন, আটুই আষাঢ়, তেইশে জুন—তার মানে ঠিক আটদিন হ'ল। বলিয়া মনে মনে যেন কি হিসাব করিলেন। তারপর কহিলেন, কি ভাবে কি হ'ল বল ত ?

কবি কহিল, কিছুই হয়নি। রাত্রে খেয়ে-দেয়ে শুতে গেলেন, রোজ যেমন যান। শরীর খারাপ-টারাপ কিছুই হয় নি, অন্তত আমাদের বলেননি। ঘন্টা আন্দাজ শুতে গিয়েছেন, এগারোটার সময় আলো নিবিয়েছেন, রোজ যেমন করেন। তারপর ভোরবেলায় উঠতে দেরি হচ্ছে দেখে ডেকে তুলতে গিয়েছে। গিয়ে দেখে এই কাণ্ড, তখন দেহ stiff। মানে ঘুমের মধ্যেই হয়েছে ব্যাপার।

—কে গিয়েছিল তুলতে ? তোমার স্ত্রী ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় শুতেন তিনি ? একা ছিলেন ?

—হ্যাঁ। একাই শুতেন। দোতলায় একটা মাত্র ঘর, সেইটে ওঁর ছিল, আমরা সবাই নীচে শুই। আমাদের নতুন বাড়ি। এখনও দোতলাটা সব হয় নি।

—তারপর, দেখে কি করল ?

—কি আর করবে। প্রথমটা ঘাবড়ে গেল, তারপর চেঁচামেচি করে উঠল। আমরা সবাই ছুটে গেলাম —আমি, বাবা, চাকর-বাকর। তখন আর করবার কি আছে ! ডাক্তারকে ডাকা হ'ল। তিনি বললেন, অন্তত পাঁচ-ছ ঘণ্টা হয়ে গেছে, মানে বারোটা-একটা আন্দাজ মারা গিয়েছেন, খুব সম্ভবত ঘুমের মধ্যেই।

—সেটা কি করে বুঝলে ?

—ডাক্তারের অনুমান। জেগে থাকলে কষ্টটা বোধ করতেন, ছটফট করতেন, বা কাউকে ডাকতে চেষ্টা করতেন। তা কিছু করেন নি, যেমন শুতেন বিছানায় তেমনি শুয়ে আছেন, বিছানার বালিশ-চাদরও কোনরকম ডিসটার্বড হয় নি। তাই থেকে অনুমান করা।

—এমন ত হতে পারে, ডেকেছিলেন, তোমরা শুনতে পাও নি।

—না। একা শোন বলে তাঁর ঘরে কলিংবেল বসানো আছে। ওপরে দুইজ টিপলে নীচে ঘণ্টা বাজে। দুইজ তিনি শুয়ে শুয়েই হাতে পেতেন। আর বারোটা-একটায় আমরা জেগেও থাকি অনেক সময়ে। বাবার ঘুম কম, তিনি ত প্রায় সারারাতই জেগে জেগে বই পড়েন।

ডাক্তার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি ভাবিতেছিলেন। কহিলেন, তোমাদের নতুন বাড়ি বললে না ? কোথায় ?

—চাকুরে। রেল লাইনের এপারেই।

ডাক্তার চিঠিটা তুলিয়া লইলেন, এই ত ঠিকানা রয়েছে। এই বাড়িই ত ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মাস তিনেক মাত্র আমরা চলে এসেছি এ বাড়িতে। মানে একতলাটা পাওয়া হতেই। দোতলা এখনও শেষ হয়নি। একটা মাত্র ঘর হয়েছে, সেইটেতেই মা থাকতেন।

—বাবা কেমন আছেন ?

—মোটের ওপর সুস্থই। তবে তাঁর ত জানেন—

—একটা পা অবশ। জানি, মানে শুনেছি। দেখিনি অনেক কাল। বেরোন-টেরোন ?

—না। মানে, নেহাত দরকার হলে, কালে-ভদ্রে।

—তুমি তাহলে এখন কোথায় যাচ্ছ ? বাড়ি ফিরবে ?

—আজ্ঞে না, আমার এখনও অনেক ঘোরা আছে।

—বেশ, তোমাকে আর আটকাব না।

—যাবেন ত ? বাবার বিশেষ অনুরোধ।

—বিশেষ অনুরোধ ? ডাক্তার হঠাৎ ঈষৎ হাসিলেন, কহিলেন, হ্যাঁ যাব, বোলো তাঁকে।

—বলব।

কবি দ্বারের দিকে ফিরিল। আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, দাদা চলুন।

ডাক্তার কহিলেন, আরে না না, তুমি বোসো, কতদিন পরে এলে। তারপর কহিলেন, ও হো, ওর সঙ্গে যাওয়া দরকার, আমি কহিলাম, না তা নেই। তুমি যাও কবি, আমি একটু বসব।

তাহার সঙ্গে গেট পর্যন্ত আসিলাম। বাহিরে আসিয়া কবি কহিল, আপনি এঁকে চিনলেন কি করে ?

কহিলাম, ডাক্তারকে চিনতে হয় যে জন্যে, রোগের উপলক্ষ্যে। তাই থেকে পরিচয়টা জমে গেছে। আচ্ছা, হঠাৎ হার্টফেল করলেন, তার কি হার্টের ব্যারাম ছিল ?

—ছিল বলে কেউ জানতাম না। অবশ্য এগুলো হঠাৎও হয়। আচ্ছা, যাই দাদা।

কবি চলিয়া গেল। আমি ফিরিয়া আসিলাম। ডাক্তার সেই চিঠিটার দিকে চাহিয়া, স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন, যেন কি একটা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কহিলেন, চলে গেল ?

—হ্যাঁ।

—বেশ ছেলেটি।

—হ্যাঁ, ভারি শান্ত।

—আর ভারি বোকা।

—মানে?

—মানে, কিছু না। কোথায় গেল?

—নিশ্চয় নিমন্ত্রণ করতে।

—বেশ সিস্টেমটা, না? আমার মা মরে গেছেন, অতএব সবাই তোমরা এস, একটা রাষকীস্ট করে যাও।

—ডাক্তারের গলায় অপ্রস্তুত সুর। কিছু বিস্মিত হইলাম, হয়ত একটু আহতও। কহিলাম, সে ত ওর দোষ নয়, ওর গড়া ব্যবস্থাও নয়। দেশের চিরকালের প্রথা।

—ডাক্তার হাসিলেন। ওকে বলিনি, প্রথাটাকে নিয়েই বলেছি। সে থাক। ওকে তুমি চিনলে কি করে?

—বললাম ত। এর বন্ধু ও, ওর বন্ধু সে, এমনি করে হয়ে যায়। তাছাড়া কি রকম একটা আত্মীয়তা হয় যেন ওরা। তার সম্পর্কটা বুঝিয়ে বলতে পারব না, কিন্তু পরিচয় আছে।

হুমায়ুন কবির সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে "চতুরঙ্গ" একটি চিহ্নিত নাম। বিগত বাইশ বছর ধরে বাংলাদেশের তরুণ ও প্রবীণ সাহিত্যিকার সৎসাহিত্য পাঠক ও সার্থক চিন্তাজীবীর মেলবন্ধন ঘটাবার দায়িত্ব পালন করতে পারার সৌভাগ্যে "চতুরঙ্গ" আনন্দিত। তেইশ বছরের সূচনায় দাঁড়িয়ে চতুরঙ্গ তার পৃষ্ঠপোষক গ্রাহক অনুগ্রাহক সাহিত্যসমাজ ও পাঠকবর্গকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছে।

বৈশাখ সংখ্যা থেকে চতুরঙ্গের বর্ষারম্ভ। আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ এবং চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার দাম ১'২০ নঃ পঃ। বার্ষিক চাঁদা সডাক ৫'৫০। যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

কার্তিক-পৌষ সংখ্যা 'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্র-সংখ্যা রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। বিশিষ্ট ভারতীয় সাহিত্যিকদের রচনা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন এমন কয়েকজন বিদেশী লেখক-লেখিকা ও রবীন্দ্রানুরাগীর ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত রচনা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

চতুরঙ্গ ঃ ৫৪, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা—১৩

—যাতায়াত ?

—একসময়ে ছিল। এখন, বহুদিন যাইনি। অন্তত দু-তিন বছর ত বটেই।

ডাক্তার ঘাড় কাৎ করিয়া, চশমার উপর দিয়া আমার দিকে তাকাইলেন। কহিলেন, আরও বেশী। চার বছর। মুক্তি যারা যাবার পরে আর যাওনি। চিনতে মুক্তিকে ?

—হ্যাঁ। আপনি চিনতেন ?

—জানতাম। আমি বিশ বছর যাইনি। মুক্তিকে তুমি দেখেছ ? কি রকম ছিল সে ?

—অদ্ভুত সুন্দরী।

—মানে মায়ের মত মোটেই নয়। বাপের মত ?

—তাও নয়। সে প্রকৃতিই আলাদা।

ডাক্তার হঠাৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইলেন। ছিল নাকি কিছু ?

—না।

—আরে বাপ, এত রাগ কর কেন ?

—তারপর ? সে মারা গিয়েছিল। বোধ হয় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে। তাই না ?

—হ্যাঁ। ট্রেনে কাটা পড়ে যায়, বালীগঞ্জ স্টেশনের কাছে। তার পরেই কবির বাবারও প্রেশার স্ট্রোক্ হয়, পা ধরে যায়।

—থাক সে ও-কথা। তারপর, তুমি এখন আছ কোথায় ? দেখা-টেখাই ত মেলেনি বহুদিন।

—আছি বহু দূরে। এখানে কচিৎ আসি। ক'মাস আগে একবার এসেছিলাম, খুঁজেও গিয়েছি।

—জানি। আমি ছিলাম না।

—তবে ? দোষ একা আমার ?

—আরে বাবা, দোষ বলছে কে ? আছ ক'দিন ?

—তা, এখন থাকব সপ্তাহ দুই।

—বেশ। থাক যদ্দিন, এসো মাঝে মাঝে, তবু দেখা-সাক্ষাৎটা হোক যদ্দিন আছি। আজ বিকেলে কি প্রোগ্রাম তোমার ?

—কিছুই নেই।

—বেকার ?

—একদম।

—বেশ ত। বিকেলে চলে এসো। ধরো চারটের।

—এসে ?

—আহা, এসোই না।

বিকালে চারটার কিছু আগেই গিয়ে হাজির হইলাম। ডাক্তার বই খুলিয়া বসিয়াছিলেন। বই সরাইয়া রাখিয়া কহিলেন, এস। তোমার জন্যেই বসে আছি। অনেক কথা তোমার সঙ্গে।

—কি কথা ?

—বলব। তার আগে, আমাকে কিছু খবর দাও। আজ যে ছেলেটি এল, কি নাম বললে কবি?

—হ্যাঁ।

—ওর সঙ্গে তোমার আলাপ কতদিনের?

—অনেক দিন। হিসেব করে বলতেও পারব না, এত দিন?

—খুব ঘনিষ্ঠতা?

—ওর সঙ্গে? হ্যাঁ, একসময়ে খুবই ছিল। ছেলেটা বড় ভাল। বয়সে অবশ্য অনেক ছোট। তাহলেও ওকে আমার বড় ভাল লাগত, প্রায় ছোট ভাইয়ের মতই দেখতাম বলতে গেলে।

—তারপর? এখন?

এখন ত দেখা-সাক্ষাৎই নেই অনেকদিন। তবু আজ ত দেখলাম, মনে হল ওর স্বভাবটা বদলায়নি। একই রকম আছে।

—ওদের বাড়িতে তোমার যাতায়াত আছে?

মানে, এখন নেই, ছিল। ওদের পরিবারটার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আইডিয়া দিতে পারবে আমাকে?

—তা পারব, মানে যে সময়ে যেমন দেখেছি; কিন্তু আপনার নাকি ওরা অন্তরঙ্গ বন্ধু?

—ওরা নয়, শুধু ওর বাবা, তাও বহুকাল আগের কথা। বোধহয় কুড়ি বছরের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎও হয়নি দুজনে। এক সময়ে অবশ্য খুবই অন্তরঙ্গ ছিলাম আমরা, মানে ছাত্রজীবনে, বা তারপরেও কিছুকাল। সেসব এখন ভুলে গেছি।

—খুব ভুলে গেছেন ত মনে হল না। তিনি আপনাকে নেমন্তন্ন করতে ভোলেননি; আপনিও তাঁকে এক নামেই চিনে ফেললেন।

—চিনলে কি হল। চেনা আর জানা কি এক কথা।

—তা না হোক।

—জানিনে ওদের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই। সেইটে জেনে নেওয়া দরকার মনে হচ্ছে।

—যুক্তির কথা ত জানেন দেখলাম।

—জানিনে, শুনেছি, খবরের কাগজে পড়েছি। তাকে জানা বলে না।

—বেশ। কি জানা দরকার, বলুন। আমি যতটা জানি, বলছি। কিন্তু, হঠাৎ ওদের কথা জানবার ইচ্ছে হল কেন আপনার?

—ইচ্ছে, হঠাৎই হয়। দরকারও হঠাৎই দেখা দেয়। তাছাড়া কেন হঠাৎ ইচ্ছে হল, আমাকে নেমন্তন্ন করবার?

—সে, হয়ত ভেবেছেন…

—কিচ্ছু ভাবেন নি। তোমার কেন হঠাৎ ইচ্ছে হল, ঠিক এই সময়টিতে, ওর সঙ্গে একত্রে এসে জুটবার?

—সে ত আমি ইচ্ছে করে করিনি।

—আমিও তাই-ই বলছি। ইচ্ছে, তোমারও নয়, আমারও নয়—সে যাঁর ইচ্ছে তিনিই করেন, তুমি-আমি নিমিত্ত মাত্র। যাক ওসব তত্ত্বকথা। এখন উপস্থিত কথাটা হচ্ছে, ওরা ডেকেছে, তুমি হাজির আছ, অতএব কিছু শুনে জেনে নিতে ইচ্ছে হল। তুমি বলবে, আমি শুনব।

—বেশ, বলুন কি বলবে।

—সকলের কথা। প্রথমে বলছ। তার সঙ্গে আলাপ আছে তোমার?

—না।

—কেন?

—এক আধবার দেখেছি, সেও বহু আগে। মনে নেই।

—খুব সুন্দর চেহারা ও?

—খুব সুন্দর। তা হবে। কিরকম যেন ভাঙা-ভাঙা ছিল চেহারাটা, যেন ভেতরে ভেতরে খুব অসুখ। কথাবার্তাও বিশেষ বলতেন না। খুব মৃদুভাষী ছিলেন, চেঁচিয়ে কথা কখনও শুনিনি। এইটুকুনই মনে আছে আবছা মতন। তবে তাঁর সুখ্যাতি অনেকের মুখেই শুনেছি, অত্যন্ত ভদ্র এবং সহিষ্ণু প্রকৃতির লোক বলে। কবিও তাঁর সেই প্রকৃতিটি পেয়েছে অনেকটা। সেইজন্যেই আমার এত ভাল লাগত ওকে!

—সহিষ্ণু বলে? বেশ। সহিষ্ণু না হয়েই বা করবে কি। বলিতে বলিতে—ডাক্তার হঠাৎ গলা নামাইলেন, অস্ফুটস্বরে কহিলেন, কুকোল্ড্।

—কি বললেন?

—ও একটা রাশিয়ান কথা।

—মানে?

—মানে কিছু নেই। অব্যয় পদ। সে থাক। তাহলে, তার সম্বন্ধে আর কিছু জান না?

—জানি না মানে, directly জানি না। শুনেছি অনেক কথা। অত্যন্ত ভদ্রলোক; অত্যন্ত পণ্ডিত। দারুণ লেখাপড়া করেন, সারাদিন বই নিয়ে কাটান। তার জন্যেই অনেক লাঞ্ছনাও সইতে হ'ত তাঁকে। তবু পড়াও ছাড়তে পারতেন না, প্রতিবাদও করতেন না।

—লাঞ্ছনা? কে করত?

—করত, মানে—আমি কথাটা কিভাবে বলিব না বুঝিয়া থামিয়া গেলাম।

—মানে, বলতে পারছ না, বলতে বাধছে। যাক। তারপর? করতেন কি তিনি? জীবিকা অর্জন হ'ত কি দিয়ে?

—সে জানিনে।

—তারপর?

—তারপর, ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসতেন।

—কটা ছেলেমেয়ে?

—সবার বড় কবি। তার পরে ছিল মুক্তি। তার পরে আরও গোটা দু'তিন আছে জানি, ভাল চিনিনে। অনেক ছোট।

—আচ্ছা? মুক্তির খবরটা কি?

—মুক্তি খুব সুন্দর ছিল দেখতে। বসন্তবাবুর সুন্দর চেহারা ছিল, মুক্তি তার চেয়েও ঢের বেশী সুন্দর। স্বভাবও ছিল খুব মিষ্টি, পড়াশোনাতেও শার্প। ফার্স্ট ছাড়া সেকেণ্ড হ'ত না কখনও। এক দোষ ছিল ভীষণ রাগী। সাধারণতঃ চটত না, চটলে আর জ্ঞান থাকত না। ছেলেবেলায় একবার নাকি ব্লেড্

—স্বভাব, অভ্যাস নাও। সহিষ্ণুতার সুখ্যাতি আছে, ওর বাবারই মত। মুক্তি চটে যেতে জানত, ও তা পারেই না।

—মনে মনেও নয়?

—অন্তত বাইরে নয়।

—করে কি?

—বি. এস-সি. পাস করেছে। কি একটা অফিসে চাকরি করছে। অফিসটা ঠিক জানিনে, রেলওয়ে হতে পারে।

—কবিতা লেখে?

—কোনদিন না।

—নামটা বল কি করে?

—একেবারেই দৈবাৎ। হয়ত বন্ধুবান্ধবের হাসি-তামাসায়। কারোর নাম-গন্ধও নেই ধারে-কাছে।

—আর?

—আর কি?

—কিছু নেই? ধর, একটু গম্ভীর বা বিষণ্ণ প্রকৃতি? যাকে মেলাংকলিয়া বলে?

—লক্ষ্য করিনি।

—আমার ত মনে হল।

—তাই নাকি।

—আচ্ছা, গেল কবি। তার ছোট ভাইবোন্‌রা?

—সে অনেক ছোট। তাদের সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা নেই আমার।

—কবির স্ত্রী?

—বিয়ের সময়েই মাত্র দেখেছি।

—কতদিন বিয়ে হয়েছে?

—বছর চারেক। কিন্তু কম-বেশি হতে পারে।

—তার মানে, মুক্তি যাবার আগে বা পরে, এবং তার পরেই তুমি ও বাড়িতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছ। এই ত?

—বোধ হয়।

—বেশ। যেটুকু দেখেছ, বা শুনেছ ওর স্ত্রীর সম্বন্ধে, তাই বল।

—দেখেছি, সুন্দরী, স্মার্ট। বিয়ের সময়ে বোধ হয় আই. এ. বা আই. এস-সি. পড়ত। বিয়ের পরে আর পড়েনি।

—কেন?

—তা জানিনে। খুব বুদ্ধিমতী এবং কর্মিষ্ঠ বলে শুনেছি। কিন্তু ভয়ানক মুখ চাপা, কথাই কয় না প্রায়।

—তারই নাম বুদ্ধিমতী। তারপর?

—আর জানিনে।

—বাচ্চা-কাচ্চা ?

—আছে বলে জানিনে। কিন্তু, এত প্রশ্ন করছেন কেন ?

—খেয়াল। পাঁচটা বাজল। চল, বেরোব। ডাক্তার জামা পরিয়া আসিলেন।

বালিগঞ্জ পার হইয়া গাড়ি ঢাকুরিয়ায় ঢুকিল। আমি বলিলাম, কি ব্যাপার ?

—ঠিক বুঝেছ।

গলির মধ্যে, ছোট্ট একটি বাড়ির সম্মুখে গাড়ি গিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে ভৃত্য দাঁড়াইয়াছিল, ডাক্তার তাহাকে কহিলেন, বাবুর সঙ্গে দেখা করব।

ঘরের মধ্যে গিয়া দুইজনে বসিলাম। মিনিট খানেক পরে বসন্তবাবু আসিয়া ঢুকিলেন। অচল নন, একটা পা কিছু টানিয়া হাঁটেন। সুন্দর সৌম্য মূর্তি, কিন্তু দেখিলে মনে হয় মনে মনে অত্যন্ত শ্রান্ত, অবসন্ন। দেহের কোথাও একটা ব্যথা ক্রমাগত লাগিয়া থাকিলে, যে রকমের একটা শ্রান্তির চেহারা ক্রমে ফুটিয়া উঠে।

ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, কে ?

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সম্মুখে গিয়া কহিলেন, আমি। বোস। চিনতে পারলে না ?

বসন্তবাবু একটুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, মনে হইল তাঁহার দৃষ্টি বেশ ক্ষীণ। তারপর হঠাৎ দুই হাত বাড়াইয়া ডাক্তারকে জড়াইয়া ধরিলেন, প্রাণপণ বলে তাঁহাকে বুকে চাপিয়া লইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, যেন বহুদিনের একটা রুদ্ধ আবেগ অকস্মাৎ ছাড়া পাইয়া গিয়াছে। ডাক্তারেরও দেখিলাম দুই আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। বন্ধুর আবেগ প্রকাশে তিনি বাধা দিলেন না, তাঁহার ভার সহিয়া লইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর একসময়ে ধীরে ধীরে তাঁহাকে একটা সোফায় বসাইয়া দিয়া, নিজেও পাশে বসিলেন। তাঁহার একখানা বাহু বসন্তবাবুর স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া রহিল। আমি তখনও দাঁড়াইয়া। ডাক্তার আমাকে ইঙ্গিত করিলেন, আমি ঘরের অন্য পাশে একটা আসনে বসিয়া পড়িলাম।

বসন্তবাবু কিছুটা সুস্থ হইলেন। আমাকে চিনিতে পারার কথা নয়। আমার দিকে চাহিয়া ডাক্তারকে কহিলেন, এটি কে ? ডাক্তার কহিলেন, আমার একটি আত্মীয়। বিশেষ স্নেহের পাত্র।

রক্ষা করিলেন। ভয় ছিল, কবির বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিবেন। দিলেই পরিচয়ের কথা উঠিতে পারিত। পারিবারিক পরিচয়টা সেখানে ব্যক্ত হউক, ইহা আমার ইচ্ছা ছিল না। অবশ্য সে-দিক দিয়া পরিচয় ডাক্তার জানিতেনও না।

সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে, মামুলী সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারণ করাই রীতি। ডাক্তার সে পথে গেলেন না, একেবারেই অন্য কথা পাড়িয়া বসিলেন। পুরানোকালের বিস্মৃত স্মৃতিকথা, কলেজ জীবনের কাহিনী, যাহাতে অতীত দিনের আনন্দটা ফিরিয়া পাওয়া যায়, বর্তমানের পীড়া হইতে মন ঘুরে চলিয়া গিয়া স্বস্তি পায়। হইলও তাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখিলাম, বসন্তবাবু প্রায় স্বাভাবিক সহজভাবেই কথাবার্তা বলিতেছেন। ডাক্তার একবারও তাঁহার পারিবারিক জীবনের কথা তুলিলেন না, স্ত্রী, পুত্রকন্যা, কিছু লইয়াই না। তাঁহার স্বাস্থ্য, কবির চাকুরি, কবির বিবাহ ইত্যাদি লইয়া আলাপ আরম্ভ করিলেন। তারপর একসময়ে দুইজনে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ডাক্তার বন্ধুর নবনির্মিত বাড়িটি ঘুরিয়া দেখিবেন। চিরদিন ভাড়াটে বাড়িতে কাটাইয়াছেন, নিজস্ব একটি বাড়ি তৈরি করিয়া রাখিয়া যাইবেন সাধ ছিল, সেই সাধ এতদিনে পূর্ণ হইল—বাল্যের বন্ধুকে সে বাড়ি দেখাইবার আগ্রহ থাকিবেই। বসন্তবাবু বলিলেন, চল আমি নিজেই দেখাচ্ছি সব ঘুরে ঘুরে।

ডাক্তার কহিলেন, তোমার কষ্ট হবে না ?

—কষ্ট আর কি ! পায়ের জন্যে বলছ ত ? তা, আমি কি বসেই থাকি সারাদিন ?

অসীম উৎসাহ লইয়া বসন্তবাবু ডাক্তারকে বাড়ি দেখাইতে লাগিলেন, আমিও সঙ্গে চলিলাম। ক্ষুদ্র বাড়ি, এমন কিছুই নয়, কিন্তু একটি মানুষের আজীবন স্বপ্ন তাহার সহিত জড়িত হইয়া আছে। অতি ক্ষুদ্র বস্তুটিকেও তিনি এমন আগ্রহে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, আমার মায়া বোধ হইল। অতি স্বল্পভাষী বলিয়াই শুনিতাম ; দেখিলাম, তাহারও মনের কপাট খুলিতে জানে। সামনের বারান্দা, একটি একটি ঘর, রান্নাশালা, স্নানের ঘর, সব দেখা হইল—পিছনে একটি উঠান আছে কাঠা দেড় দুই, সেখানে ফুলের গাছ বসাইয়াছেন ; অ্যাসনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরার একটি ছোট্ট চারা, সেটিকে দেখাইয়া কহিলেন, মুক্তি বড় ভালবাসত। একটি মাত্র মুহূর্ত, তারপরই সামলাইয়া লইলেন, ডাক্তারও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অন্য কথায় টানিয়া লইয়া গেলেন।

একতলা সারা করিয়া, দোতলা। ডাক্তার কহিলেন, তুমি এবার বোসো, তোমার কষ্ট হচ্ছে। নীচের রুগেরই মাপে ত, বুঝে নিচ্ছি।

বসন্তবাবু ছেলে মানুষের মত গলায় কহিলেন, তাই বলে দেখবে না ঘরটা ?

ডাক্তার কহিলেন, বেশ, আমিই উঠে গিয়ে দেখে আসছি। তোমার সিঁড়ি ভাঙবার দরকার নেই।

বসন্তবাবু কহিলেন, বেশ, তাহলে চাবিটা নাও। ভৃত্যকে কহিলেন, নিয়ে যা।

ডাক্তার কহিলেন, চাবি কেন ?

বসন্তবাবু কহিলেন, ওটা বন্ধই আছে সেদিন থেকে। বৌমা সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ দিয়ে আসে, ভেতরে যায় না।

উপরে উঠিলাম। ভৃত্য দ্বার খুলিয়া দিল, আমরা প্রবেশ করিলাম। তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। ভৃত্য আলো জ্বালিয়া দিল, জানালা খুলিয়া দিল।

ছোট ঘর, আসবাবও অল্পই। একপাশে খাটে বিছানা, সে বিছানা বোধ হয় আর তোলাই হয় নাই —দেহ সরাইয়া লইয়া ঈষৎ ঝাড়িয়া সোজা করিয়া রাখা

ক্রাউন মার্কা

সর্বশ্রেষ্ঠ এল্যুমিনিয়ামের বাসনপত্র

১। পবিত্রতার প্রতীক—সর্বশ্রেষ্ঠ আসল এল্যুমিনিয়াম হইতে প্রস্তুত।
২। গ্যারান্টির চিহ্ন—মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।
৩। সম্মানের প্রতীক —অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া লক্ষ লক্ষ লোক ব্যবহার করিতেছে।
৪। সন্তোষের প্রতীক —দেখতে ভাল, সহজে পরিষ্কার করা যায় এবং সুদৃঢ় ও মজবুত।
৫। অদ্বিতীয় —এইগুলি সস্তা এবং সর্বত্র সহজে মেলে।

দয়া করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমাদের শোরুমে পদার্পণ করিলে বাধিত হইব।

জীবনলাল (১৯২৯) লিমিটেড

ক্রাউন এল্যুমিনিয়াম হাউস

২৩, ব্রাবোর্ন রোড, কলিকাতা—১

বোম্বাই ঃ মাদ্রাজ ঃ রাজামুন্দ্রি ঃ দিল্লী ঃ এডেন

হইয়াছে মাত্র। মশারি তোলা। খাটের শিয়রে, খাটের সঙ্গে সংলগ্ন দুইটি সুইচ। ঘরের অন্য পাশে একটি বুকসেল্ফ, বই ভরা, একটি আলনা তাহাতে কাপড়জামা, দু'টি ডেকচেয়ার, একটি ড্রেসিং-টেবিল, তাহার উপরে সাধারণ প্রসাধনের দ্রব্য, কয়েকটি ছোট ছোট ঔষধের শিশি কাচের ও এলুমিনিয়মের। একটি শিশি ডাক্তার হাত বাড়াইয়া তুলিয়া লইলেন, খুলিয়া দেখিলেন, আবার রাখিয়া দিলেন।

ডাক্তার খাটের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, খাটের গায়ের সুইচ দুইটিকে পর পর টিপিলেন। একটি টিপিতে, ছাদের গায়ে ছোট নীল আলো জ্বলিয়া উঠিল। অন্যটি টিপিলেন, নীচে সিঁড়ির মুখে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, বেশ জোর আওয়াজ। সে ঘণ্টা বাজিলে নীচের ঘরের কোন লোকের না শুনিতে পাইবার কারণ নাই। ডাক্তার কহিলেন, বসন্তর ইঞ্জিনীয়ারিং। ও চিরদিনই ঐরকম, অত্যন্ত গোছালো, প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে ওর দৃষ্টি।

একপাশে দেওয়ালে একটি বড় ছবি। আমি কহিলাম, ছবিটা কার জানেন?

ভৃত্য কি উত্তর দিতে যাইতেছিল। এমন সময় ডাক্তার হঠাৎ বিষম খাইলেন। কাশিতে কাশিতে মুখ লাল হইয়া উঠিল, শ্বাস টানিতে পারেন না এমন অবস্থা। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া একটা ডেকচেয়ারে বসাইয়া দিলাম। ডাক্তার হাতের ইঙ্গিতে বুঝাইলেন, জল। ঘরের এক কোণে কুজা ও গ্লাস ছিল। ভৃত্য সেই জল ঢালিয়া দিতে গেল। ডাক্তার হাত নাড়াইয়া আপত্তি বুঝাইলেন। আমি কহিলাম, ওটা বাসি জল। নীচে থেকে নিয়ে এস। আর একটা হাত-পাখা যদি থাকে।

ভৃত্য ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ততোধিক ক্ষিপ্রবেগে উঠিয়া পড়িলেন, আমাকে বলিলেন, দরজার কাছে দাঁড়াও, কেউ এলেই বলবে।

আমি দরজার গিয়া দাঁড়াইলাম। ডাক্তার ড্রেসিং টেবিলের সব কটা টানা ক্ষিপ্রহস্তে টানিতে ও বন্ধ করিতে লাগিলেন, অত্যন্ত দ্রুতবেগে সেগুলির মধ্যে হাত ও দৃষ্টি চালাইয়া কি খুঁজিয়া দেখিলেন। টেবিলের উপরে ছোট ছোট শিশি ছিল বলিয়াছি, একটা টানার মধ্যে সেই রকমের অনেকগুলি শিশি জড়ো করা। ডাক্তার টেবিলের উপরের শিশিগুলি নিজের পকেটে পুরিলেন, টানা হইতে কয়েকটা শিশি বাহির করিয়া টেবিলে রাখিয়া দিলেন। টেবিলের এক কোণে গুঁড়ামতন কি খানিকটা পড়িয়াছিল। একটুখানি তুলিয়া তিনি জিভে ঠেকাইলেন, পকেট হইতে একটা কাগজের টুকরা বাহির করিয়া গুঁড়াটা সেই কাগজে মুড়িয়া পকেটে পুরিলেন। আমার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, আসছে?

নীচের দিকে চাহিয়া কহিলাম, না।

—এলেই বলবে।

বলিয়া ডাক্তার টেবিল ও ঘরের চতুর্দিকে আরেকবার চক্ষু ও হাত বুলাইলেন। তারপর হাত তুলিয়া লইয়া কহিলেন, ব্যস্। তাঁহার স্বরে একটা তৃপ্তির আভাস। আমি মুখ ফিরাইয়া তাকাইলাম, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার সেই ডেকচেয়ারের উপরে গিয়া বসিলেন, হাতের ইঙ্গিতে আমাকে কাছে ডাকিয়া লইয়া অত্যন্ত অবসন্নভাবে চলিয়া পড়িলেন। আমি তাঁহার মাথায় হাত দিয়া, পিঠে হাত ঘষিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিতে লাগিলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেই ভৃত্যটি জল ও পাখা লইয়া ছুটিয়া আসিল। ডাক্তারের কাশির বেগ তখন কমিয়াছে, শ্বাস প্রায় স্বাভাবিক হইয়াছে। জল খাইয়া তিনি অনেকটা সুস্থ হইলেন, ভৃত্য পাখা লইয়া জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

আরও দু'এক মিনিট থামিয়া ডাক্তার কহিলেন, হয়েছে, আর দরকার নেই। চল নীচে যাই।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে দেখিলাম, বসন্তবাবু ব্যস্ত হইয়া যথাসাধ্য দ্রুতপদে এইদিকে আসিতেছেন, একটি সুন্দরী তরুণী তাঁহাকে একরকম ধরিয়াই লইয়া আসিতেছে।

ডাক্তারের গলা তখনও স্বাভাবিক হয় নাই, ধরা-ধরা গলাতেই কহিলেন, উঠো না আমি নেবে যাচ্ছি।

সিঁড়ির নীচে সরু বারান্দা। বসন্তবাবু কহিলেন, এইখানেই বোসো।

ভৃত্য ছুটিয়া চেয়ার আনিয়া দিল। আমরা বসিলাম। বসন্তবাবুও বসিলেন, মেয়েটি তাঁহার চেয়ারের পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার কহিলেন, হঠাৎ কিরকম বিষম লেগে গেল। কেউ গালাগাল দিচ্ছিল আর কি! কিছু না, ও ঠিক হয়ে গেছে।

বসন্তবাবু কহিলেন, তা হোক, একটু বিশ্রাম করে নাও।

ডাক্তার কহিলেন, তা নিই। এই বুঝি বৌমা?

বসন্তবাবু সস্নেহে কহিলেন, হ্যাঁ। বড় লক্ষ্মী মেয়ে। বুড়ো বয়সে নতুন করে মা পেয়ে গেছি তাই।

মেয়েটি নিঃশব্দে আগাইয়া আসিয়া ডাক্তারকে প্রণাম করিল, তারপর বসন্তবাবুকে প্রণাম করিল। আমাকে প্রণাম করিতে আসিতেই আমি আপত্তি করিয়া উঠিলাম, আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়াই আমাকে ও প্রণাম করিল, তারপর আবার গিয়া বসন্তবাবুর পিছনে দাঁড়াইল।

বসন্তবাবু আবার কহিলেন, আমার বুড়ো বয়েসের—

ডাক্তার কহিলেন, নতুন মা। কিন্তু, পুরোনো মাকে ত তুমি চিনতে না, কখনও দেখনি। একে চিনে নিলে কি করে?

বসন্তবাবু কহিলেন, নিজের মাকে আমি সজ্ঞানে চোখে দেখিনি। কিন্তু, তোমার মনে আছে সেকথা?

—আছে। তুমি প্রায়ই বলতে।

—অনেক দুঃখেই বলতাম। কিন্তু সে দুঃখ আমার ঘুচেছে।

মেয়েটি একবার চক্ষু তুলিয়া আমাদের দিকে চাহিল, তারপর আবার চক্ষু নত করিল।

কিন্তু, আমারই ভুল, হঠাৎ মনে হইল, তাহার সে দৃষ্টিতে যেন কিসের একটা আশঙ্কা বা আতঙ্ক, একটা ভয়ের বিহ্বলতা যেন তাহার সঙ্গে মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। পরক্ষণেই মনে হইল, এ অর্থহীন চিন্তা, আমারই দেখিবার ভুল—তাহার মনে ভয় থাকিবে কিসের, আর থাকিলেই বা সে ভয়কে সে এভাবে ব্যক্ত করিবে কেন।

ডাক্তার কিছুক্ষণ বসিলেন, তারপর কহিলেন, এবার উঠি। পরশু আসব। বসন্তবাবু কহিলেন, আসবে?

—নিশ্চয়। আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, এ-ও আসবে।

বসন্তবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, সে ত আমার সৌভাগ্য। কিন্তু ছি ছি, আমারই অন্যায়! আমার ত ওকে—

—বলা হল না? হয়েছে, অনেক আগেই হয়ে গেছে। কবি বলেছে।

—কবি? সে চিনল কি করে?

—আমার ওখানে দেখা হয়েছে। আচ্ছা ভাই, আজ চললাম।

গাড়িতে উঠিয়া, ডাক্তার কহিলেন, কি মনে হল? কিছু বুঝলে?

আমি কহিলাম, বুঝলাম, আপনার মনে কোথাও খটকা লেগেছে। কিসের খটকা?

ডাক্তার কহিলেন, তুমিই আন্দাজ কর।

—আমি অনেকক্ষণ ধরেই চেষ্টা করছি আন্দাজ করতে। পারছি না।

—আবার কর চেষ্টা। Try Try Try again।

—হবে না। বলুন না।

—বলব না। অন্তত আজ নয়। তুমিই ভেবে দেখ। কোথায় কি লক্ষ্য করলে?

—লক্ষ্য করলাম, আপনার বিষম খাওয়াটা মিছে।

কিন্তু, আপনি ঘরটাকে সার্চ করলেন, কি পাবেন বলে?

—উত্তম প্রশ্ন। আর?

—আর, আরও একটা কথা মনে হয়েছিল হঠাৎ, কিন্তু সে নিশ্চয় আমারই চোখের ভুল। বললে আপনি হাসবেন।

—হাসব না। বল।

—কবির বৌয়ের মনে কি একটা ভয় আছে। কিসের ভয়? ভূতের ভয়?

—চোখে পড়েছে? বাঃ।

একটু থামিয়া কহিলেন, ভূতের ভয় নয়। ও মেয়ে ভূতের ভয় পাবার মেয়ে নয়। ওপরের ঘরে ও-ই রোজ প্রদীপ দিয়ে আসে।

—তবে? কিসের ভয়?

—সেইটেই জানতে হবে। ওকে কেউ চেনে, জান?

—না।

—তোমার স্ত্রী?

—সে ও-বাড়িতে যাবে না।

—বটে।

বলিয়া ডাক্তার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, মুক্তিকে তোমার বিয়ে করা উচিত ছিল।

—ভুল করলেন। উচিত ছিল না, সম্ভবও ছিল না।

—উচিত অনুচিত হঠাৎ বোঝা যায় না। সম্ভব অসম্ভবও অনেকটাই নিজের ওপরে নির্ভর করে।

—তা হলেও নয়। ও কথা থাক। আপনি এখন কি করবেন?

—তোমাকে সাধনের বোঝে নামিয়ে দেব। দিয়ে বাড়ি ফিরে যাব।

—সেকথা বলিনি।

—ঐ হল। তারপর, পরশু ওদের বাড়িতে যাব। তুমিও যাবে।

—আমাকে কেন?

—আছে দরকার। তুমিও কথা দিয়েছ। তুমি আমার ওখানে আসবে, একসঙ্গে যাব।

আমাকে নামাইয়া দিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

রাত্রে আমার ভাল ঘুম হইল না। নানাবিধ এলোমেলো চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

যথাসময়ে ডাক্তার ও আমি কর্মবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কবি তখন মুণ্ডিত মস্তকে মন্ত্র পাঠ করিতে বসিয়াছে। বসন্তবাবু একপাশে বসিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার কাছে গিয়া বসিলাম। নিমন্ত্রিতরা কতক আসিয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ পরেও আসিলেন। অফিসের দিন, কেহ বা কিছুক্ষণ বসিলেন, কেহ বা আসিয়াই চলিয়া গেলেন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা অল্প, নেহাৎ যাহারা আপনজন। আমাকে দেখিয়া কেহ বা হৃষ্ট হইলেন, কেহ বা বিস্মিত হইলেন। আমি কাহারও সঙ্গেই বিশেষ গল্প-গুজব করিলাম না, আমি শুধু লক্ষ্য করিতেছিলাম ডাঃ বোসের ভাবভঙ্গী। তিনি বেশ নিশ্চিন্তে বসন্তবাবুর কাছে ল্যাপ্টাইয়া বসিয়া রহিলেন, কাজ একেবারে শেষ হইবার পূর্বে তাঁহার উঠিবার কোন তাড়া আছে মনে হইল না।

অতিথিরা প্রায় কেহই তাঁহাকে চিনিতেন না। অনেকের সঙ্গেই তিনি পরিচয়ের আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। কাহারও কাহারও সঙ্গে পরিচয় করিলেনও, বসন্তবাবু আমার বাল্যবন্ধু বলিয়াই চিনাইয়া দিলেন তাঁহাকে। ডাক্তার বিশেষ গল্প-গুজব করিলেন না কাহারও সঙ্গে। শুধু একজন, একটি অল্প বয়সী ভদ্রলোক, তাঁহাকে দেখিয়া আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিলেন, কহিলেন, আপনি এখানে?

ডাক্তার কহিলেন, দৈবাৎ। তুমি?

—আমি এঁদের বাড়ির ডাক্তার।

—ও। তা, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। আমি তোমার কথা ভাবছিলাম কদিন ধরে, ঠিকানাটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

—কোন দরকার?

—হ্যাঁ, দরকার এবং জরুরি। কাল একবার আসবে আমার ওখানে? বা, যদি পার আজ রাত্রে?

—আজই যাব তাহলে, রাত্রেই ভাল, সময় থাকে। সেই বাড়ি ত?

—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন। আমি বলিলাম, কে? ডাক্তার কহিলেন, ছাত্র ছিল এককালে। বড় ভাল ছেলে। তোমাদের ফ্যামিলি ডক্টর বললে না, বসন্ত?

বসন্তবাবু কহিলেন, হ্যাঁ।

—সতী—মানে সেদিনও ত ওকেই ডেকেছিলে?

—হ্যাঁ। কেন?

—না, এমনি মনে হল কথাটা।

কাজ শেষ হইতে বেলা অনেক হইল। আমরা বিদায় লইলাম। বসন্তবাবু কহিলেন, পরশু নিরামভদ। সেদিনও কিন্তু আসতে হবে। দু'জনকেই।

ডাক্তার কহিলেন, আবার কেন? এই ত বেশ হল।

বসন্তবাবুর মুখ ঈষৎ বিষণ্ণ হইল। কহিলেন, আসবে না?

ডাক্তার কহিলেন, আসব। কিন্তু তোমারও একটি কথা রাখতে হবে।

—বল।

—আমার বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দেবে।

—না না, সে আবার কেন?

ডাক্তার কহিলেন, দেখ, এবার আমি রাগ করব। ভগবান দেয়েছেন, এরকম অকেশনে তোমাকে ডাকবার সুযোগ আমার হবে না। তাই বলে, তোমার বাড়ি আমাকে দেখালে, আমার বাড়িটা তুমি দেখবে না?

—দেখব। কিন্তু ভাই—

—কিন্তু নেই। পরশু নিরামিষ, বিষ্যুৎবার। রাত্রে ত?

—হ্যাঁ।

—আমরা আসব। তুমি আমার ওখানে যাবে, শনিবার। তুমি, মানে তোমরা। তুমি, কবি, বৌমা। বিকেলবেলা আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব, সন্ধ্যাটা থাকবে।

—খেয়ে-দেয়ে চলে আসবে, ঠিক ত?

—ওদের একবার—

—না। ওদের বলে কিছু নেই। আসছ, এবং তিনজনই আসছ। এ নেমন্তন্ন নয়। এ আমার প্রেসক্রিপশন।

বসন্তবাবু হঠাৎ চোখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইলেন। ডাক্তার নিশ্চল দৃঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন, দুইজনের দৃষ্টি মিলিল। কি দেখিলেন তিনিই জানেন। চক্ষু নামাইয়া কহিলেন, বেশ। যাব।

—রেডি থাকবে। ঠিক চারটেয় গাড়ি পাঠাব আমি।

পথে বাহির হইয়া ডাক্তার বিশেষ কথা কহিলেন না। আমি একবার কহিলাম, একটা কথা বলব?

ডাক্তার কহিলেন, এখন নয়।

—কি কথা আপনি জানেন?

—জানতেও পারি। আজ নয়, পরে।

—কবে?

—আমিই বলব।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরেই দুইজনে কবিদের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রান্নাবান্না সমস্ত প্রস্তুত ছিল, আমরা যখন খাইয়া উঠিলাম তখন আটটাও বাজে নাই। ডাক্তার কহিলেন, আমি এবার চলব।

বসন্তবাবু কহিলেন, এখনই যাবে? একটু বসবে না?

ডাক্তার কহিলেন, আজ নয়। অনেক কাজ পড়ে আছে।

বসন্তবাবু কহিলেন, তাহলে আর কি বলব। কি জান, কতকাল পরে দেখা হল ত—

—তাতে কি হল? পরশুই ত আবার দেখা হচ্ছে আমার ওখানে। ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই।

—তা যাইনি। কিন্তু—

—কিন্তু নেই। যাচ্ছ এবং সবাই যাচ্ছ। কবি, মনে রাখবে। বৌমা তুমিও না গেলে চলবে না কিন্তু

'বৌমা' একটু কিন্তু কিন্তু মুখ করিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, ডাক্তার কহিলেন, কোন কথা চলবে না। আমি আজকাল কানে অনেক কম শুনতে পাচ্ছি। আমার পছন্দসই না হলে সে কথা শুনতেই পাইনে।

বৌমা হাসিয়া ফেলিল।

ডাক্তার কহিলেন, পরশু। ঠিক চারটের আমার গাড়ি আসবে। যাবে, খাবে, আড্ডা দেবে, রাত জাগবে না, দশটার মধ্যে ছুটি। আচ্ছা চললাম।

বাড়ির বাহির হইয়া ডাক্তার কহিলেন, তোমার এখন কোন কাজ নেই।

—কে বললে?

—কারণ তুমি নেমন্তন্ন খেতে বেরিয়েছ, সেখানে কতক্ষণ দেরি হবে কেউ জানত না। আমার ওখানে চল। অনেক কথা আছে।

বাহিরে বৃষ্টির আভাস, ঠাণ্ডা হাওয়া। ঘরের মধ্যে আরাম করিয়া বসিয়া ডাক্তার কহিলেন, তুমি সেদিন আমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চেয়েছিলে। বল, কি প্রশ্ন?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

ডাক্তার কহিলেন, প্রশ্নটা আন্দাজ করতে আমিও পারি, তবু তুমিই বল। বল, আমার দরকার বলেই জানতে চাইছি।

আমি কহিলাম, প্রশ্ন প্রকাণ্ড কিছু নয়। হঠাৎ মনে হয়েছিল, ওদের পরিবারটার সম্বন্ধে আপনি অনেক কিছু জানেন। কি করে জানলেন তাই। আপনি ত বলেছেন কুড়ি বছরের মধ্যে ওদের সঙ্গে আপনার দেখাশোনা নেই।

—দেখা নেই, শোনা হতে বাধা কি। কি করে জানলে অনেক কিছু জানি ওদের সম্বন্ধে?

—কবির মার নাম আপনি জানেন। ছেলেবেলাকার ডাক নাম। একবার বলে ফেলেছিলেন নামটা, তারপর সামলে নিলেন।

—হুঁ। একই শহরে বাস করছি দুটো মানুষ, নাম জানা কি অসম্ভব?

—অসম্ভব নয়, কিন্তু যা সম্ভব তাই exputed নয় সর্বত্র। কি করে জানলেন?

—জানলাম, কারণ আমার বয়স চিরকালই ষাট বছর ছিল না। পঁচিশও ছিল একসময়ে।

কথাটার অর্থ বুঝিলাম কী বুঝিলাম না, কিন্তু হঠাৎ মনে হইল বুঝিয়াছি। কিন্তু বুঝিয়া মনটা বিশ্রী হইয়া গেল। যাহা ভাবিয়াছি তাই যদি ঠিক হয় তবে—

চিন্তায় বাধা পড়িল। ডাক্তার কহিলেন, অনেককাল দেখিনি ওদের। অনেক কিছু জেনে নেওয়া দরকার, নইলে জট খুলছে না।

—জট কিসের?

—সমস্যার। কবির মাকে তুমি চিনতে। তাঁর সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা আমাকে দিতে পার? বলে যাও ত কি কি জান।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

ডাক্তার কহিলেন, বল, আমার জানা দরকার। আচ্ছা, সেদিন যখন কবির সঙ্গে তুমি এলে, তাকে মোটালে কোথায়?

—পথে। মানে, এই গলিরই মাথায়। সে পাশের গলি থেকে বেরুল—এইদিকেই আসছিল। একেবারেই দৈবাৎ দেখা।

—তবেই বোঝ, দৈবাৎগুলো যিনি ঘটান তিনি স্বয়ং দৈব। সেই তুমি প্রথম জানলে তার মা মারা গেছে?

ডাক্তার 'গেছেন' বলেন না, আমার আগেও লক্ষ্য হইয়াছিল। কহিলাম, হ্যাঁ।

—শুনে কি বললে তুমি? প্রথম কথাটাই?

—মনে নেই।

—যা মুখে এল যে কথাটা, বললে না হয়ত। তবুও? কি সে কথাটা, বলবে?

আমি কহিলাম, মনে নেই।

—'আছে মনে। বলতে চাইছ না। বেশ।'

আমি বলে দিতে পারি ইচ্ছে করলে। দেব?

—দিন ত, দেখি।

ডাক্তার একটি স্লিপে কি লিখিয়া আমার হাতে দিলেন। কহিলেন, সত্যি কথা বলবে।

স্লিপে লেখা: 'বেঁচে গেলে।'

কহিলাম, কি করে বুঝলেন?

—ঠিক ধরেছি?

—একদম! কিন্তু, বুঝলেন কি করে?

—বুঝলাম, কারণ আমিও পৃথিবীর দু'একজন লোককে চিনি, বা তাদের সম্বন্ধে খবর রাখি।

—বলে হচ্ছে বটে।

—হবেই। ডাক্তাররা বলে না, কিন্তু অনেক কথা জানে। যেমন জানে—তুমি মুক্তিকে বিয়ে করলে না কেন?

—এ প্রশ্ন ত আগেও করেছেন। তাকে বিয়ে করতে আমি যাব কেন? তারাই বা দেবে কেন?

—তারা দিত। তুমিই রাজী হতে না। অথচ সে মেয়ে ভাল। তুমি তাকে অপছন্দও করতে না।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। বিষম লোক এ যে কি জানে আর কি জানে না—কথা বলা বিপজ্জনক, না-বলা হয়ত আরও বিষম।

ডাক্তার কহিলেন, মুক্তি মারা যাবার পর আর তুমি ওদের বাড়িতে যাওনি। যাবার প্রবৃত্তি হয়নি। মুক্তি অ্যাকসিডেন্টে মরে নি, আত্মহত্যা করেছিল। তুমি সেটা জানতে। আত্মহত্যার কারণটাও জানতে সম্ভবত। কিছু বলছ?

—না।

—তাকে বিয়ে করতে চাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ তার মাকে তুমি চিনতে। মুক্তির মনে তোমার সম্বন্ধে আগ্রহ ছিল। সম্ভবত তোমারও সেটা অজানা ছিল না। তবুও তুমি তাকে প্রশ্রয় দিতে পারনি বা চাওনি। তোমার মনে এতবড় একটা aversion ছিল তার মার প্রতি—

তার কারণটা আমাকে বলবে?

—আমার এরকম বলবার কিছু নেই। তাঁর প্রতি aversion থাকবে কেন আমার?

—কারণটাই ত জানতে চাইছি। তুমি বললে আমার খুঁজে বেড়াতে হ'ত না। কিছু পরিশ্রম বাঁচত। কিন্তু তোমার যখন বলবার ইচ্ছে নেই—

—বলবার সাধ্যিও নেই। আপনি কোথা থেকে এসব ধারণা পেলেন তাই আমি বুঝতে পারছি না।

—বেশ, আমিই বুঝিয়ে দেব একদিন। মানে, বোধ হয় পরশুদিন। সেদিন আমার এখানে তুমিও খেতে আসছ।

হঠাৎ আমার বুদ্ধি খুলিয়া গেল। কহিলাম, তার মানে আপনি সেদিন এদের ডেকেছেন, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে। শুধু নেমন্তন্ন খাওয়াবার জন্যে নয়।

ডাক্তার সহজকণ্ঠে কহিলেন, নিশ্চয়ই না। আমার স্ত্রীও মরেনি, মাও মরেনি। আমি কি পুণ্যাত্মী মহাপুরুষ, বা মুক্তিকামী পাপিষ্ঠ, যে তাহাতক মানুষজনকে ডেকে নেমন্তন্ন খাওয়াব?

শনিবার, ডাক্তারের বাড়িতে যখন গিয়া পৌঁছিলাম, তখন ঠিক সন্ধ্যা। মেঘ কাটিয়া চমৎকার চাঁদ উঠিয়াছে। কবি ও বসন্তবাবু সম্মুখের বাগানে বেড়াইতেছিলেন। বাগানে গাছের সংখ্যা অল্প কিন্তু অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন তাহাদের সমাবেশ। বসন্তবাবুর খুব ভাল লাগিয়াছে বুঝিলাম। আমাকে দেখিয়াই কবি বলিয়া উঠিল, আপনি লেট্।

আমি কহিলাম, মোটেই না। In at the killing,—আমি ঠিক সময়েই এসেছি, যখন খাবার ডেডি।

বসন্তবাবু কহিলেন, আমরা কিন্তু এসেছি অনেকক্ষণ।

কহিলাম, জানি। কারণও আছে। আপনি এসেছেন বহুকালের হারানো বন্ধুর কাছে। হাফ্ সেঞ্চুরির জমানো গল্প করতে। আমার ত তা নয়।

বসন্তবাবু সমস্তটা শুনিলেন না হয়ত। কতকটা আত্মগতভাবে কহিলেন, হারানো বন্ধু—ঠিক বলেছ। A lost friend. A friend lost—and regained?

—হ্যাঁ। regained।

বসন্তবাবু হঠাৎ থামিয়া আমার দিকে তাকাইলেন। কহিলেন, তুমি জান? Regained? কি করে জানলে?

—আমি কথাটা বিশেষ কিছু ভাবিয়া বলি নাই। তাঁহারই কথার প্রতিধ্বনি মাত্র করিয়াছিলাম। আমারও কি হইল, দৃঢ়স্বরে কহিলাম, জানি। কারণ উনি মানুষই তাই—a friend to all.

বসন্তবাবু মৃদুস্বরে কথাটা বার দুই আবৃত্তি করিলেন—a friend to all!

আমি কহিলাম, হ্যাঁ। আমি জানি।

বসন্তবাবু কহিলেন, অনেককাল দেখিনি ওকে। এককালে অবশ্য খুবই বন্ধু ছিল আমার। শুনেছি, ডাক্তারও খুব বড় হয়েছে।

আমার তখন কিরকম একটা উত্তেজনা চাপিয়াছে। কহিলাম, শুধু ডাক্তার বড় বলেই নয়। ডাক্তার, রোগ সারায়, পয়সা নেয়। He is much more than that.

বসন্তবাবু হঠাৎ কিরকম অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। তারপর কহিলেন, তোমার সঙ্গে ওর খুব ঘনিষ্ঠতা আছে, তাই না?

—কহিলাম, ঘনিষ্ঠতা কাকে বলছেন জানিনে। তবে ওর অনেক ব্যাপারে আমি জড়িয়ে থেকেছি।

—কি ব্যাপারে?

আমি হয়ত অনেক কথা বলিয়া ফেলিতাম, হঠাৎ সামলাইয়া গেলাম। ডাক্তার ইহাদের সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছেন এবং কৌতূহল অহেতুক নয়। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছিলাম। কিন্তু, সে কৌতূহল কেন এবং তাহার অভিপ্রায় কি, আমার জানা ছিল না। ডাক্তার নিজে আমাকে কিছুই বলিতেছেন না। এরূপ ক্ষেত্রে আমি অনুমানে কিছু কথা বলিতে বলিলে হয়ত তিনি ক্ষুব্ধ হইবেন, বা তাঁহার ক্ষতিহানি হইবে। এই আশঙ্কা আমার মনে হইল। কথাটাকে অতএব এড়াইয়া গেলাম। কহিলাম, ব্যাপার আর কি, রোগী দেখতে গিয়ে উনি শুধু রোগেরই চিকিৎসা করেন না, রোগীর সুখেদুঃখেও জড়িয়ে যেতে দেখেছি অনেক সময়ে, তাই বলছিলাম।

—ও। মৃদুস্বরে কহিলেন, Yes that's like him.

—আচ্ছা, থাকুন আপনারা, আমি যাই প্রেজেন্ট্ করে বলে নিই। বসবার ঘরে আছেন ত?

—হ্যাঁ, এই সামনের ঘরেই।

বারান্দায় উঠিতেই জানলা দিয়া চোখ পড়িল, ঘরের মধ্যে ডাক্তার ও কবির স্ত্রী মুখোমুখি বসিয়া। আমার পায়ে রবার সোলের জুতো, ইহারা আমার আগমন টের পান নাই। ডাক্তার নিম্নস্বরে কি বলিতেছিলেন। আমি যে মুহূর্তে জানলার সোজা পৌঁছিয়াছি, ঠিক তখনই কবির স্ত্রী চোখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইল, তাহার চোখে একটা তীব্র ভয়ের বিহ্বলতা ফুটিয়া উঠিল, আগের দিনে যেমন দেখিয়াছিলাম, তারপর তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। ডাক্তার সস্নেহে মৃদুস্বরে কহিলেন, ভয় নেই। আমি বলছি তোমাকে, তুমি যা সন্দেহ করেছ তা নয়।

মেয়েটি আবার চক্ষু তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিল।

আমি নিঃশব্দে জানলা হইতে সরিয়া আসিলাম। একটুকাল আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর সাড়া শব্দ করিয়া কহিলাম, আসতে পারি?

আমি দ্বারের সম্মুখে যাইতে না যাইতে কবির স্ত্রী ওদিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। ডাক্তার কহিলেন, এস।

আটটা আমার খাইবার ডাক পড়িল।

ডাক্তারের গৃহে স্ত্রী-পুত্রের বালাই নাই। কয়েকটি পুরানো এবং অনুগত ভৃত্যের হাতে সংসার।

খাইতে খাইতে নানাবিধ গল্পগুজব চলিল। বেশীর ভাগই ইহাদের ছাত্রজীবনের কাহিনী। দুজনে মিলিয়া কবে কোন্ মস্করা করিয়াছিলেন, দুর্বৃত্ত প্রতিবেশী বা কর্তব্য-বিমুখ অধ্যাপকের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার গল্প—ডাক্তার এমন অদ্ভুত ভাষা ও ভঙ্গীতে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন যে, হাসিতে হাসিতে আমাদের খাওয়া বন্ধ হইবার জো হইল। স্বভাবগম্ভীর বসন্তবাবু পর্যন্ত দু'একবার চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন, তুমি আমার বয়স কমাইয়া দিলে। সর্বাপেক্ষা বিপন্ন হইল বোধ হয় কবির স্ত্রীর, সে বেচারী না পারে সকলের মধ্যে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিতে, না পারে সামলাইতে। ডাক্তার একবার বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া তাহাকে বলিলেন, বিষম খেও না। তাহাতে তাহার অবস্থা আরও কাহিল হইল। আমি উপস্থিত থাকিয়া তাহার বিব্রত অবস্থাটা বাড়াইয়া তুলিতেছি মনে করিয়া আমার অস্বস্তি হইতে লা[illegible]

দোতলার একপাশে ছোট একটি ছাদ—তখন চাঁদের আলোয় ভাসিয়া যাইতেছে। খাওয়ার পরে সেই ছাদে গিয়া আমরা সকলে বসিলাম। একদিকে ডাক্তার তাঁহার পাশে আমি, অন্নদূরে কবি। অন্য পাশে ডাক্তারের মুখোমুখি বসিয়া বসন্তবাবু, তাঁহার পায়ে পা ঠেকাইয়া কবির স্ত্রী।

ডাক্তার কহিলেন, ভাল কথা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব। অনেকবার ভেবেছি, আবার ভুলে গেছি বসন্ত, তুমি তেতিশ পরে আমাকে স্মরণ করলে, আমার নাম তোমার মনে হল কি করে? ঠিকানাই বা পেলে কোথায়? বসন্তবাবু কহিলেন, সেইটেই আশ্চর্য, ও নিজে বলে গিয়েছিল।

—আমাকে বলতে? কিন্তু কবি ত বলেছিল—?

—হ্যাঁ। সেদিন নয়। বলেছিল, প্রায় দু'মাস আগে।

—তার মানে?

—কি জানি। কি কথার মধ্যে হঠাৎ বললে, আমি মারা গেলে আপিসে শ্রাদ্ধ একটা করবে ত? আমি বললাম শ্রাদ্ধটা কবে? বললে, যেদিনই যাই। সেদিন ত বন্ধুবান্ধবকে নেমন্তন্ন করবে। একজন পুরোনো বন্ধুকে কিন্তু ভুলো না। বলে, তোমার নাম বললে। ঠিকানাটাও।

শুনে আশ্চর্য লাগল। তোমার নাম নিয়ে আমাদের কোন আলোচনা বোধ হয় গত পনের কুড়ি বছরের মধ্যেও হয়নি। হঠাৎ ওকথা যে কেন বললে, তোমার নামটা তার কেন মনে পড়ল, ঠিকানাই বা জানল কি করে। কিন্তু আমি কোন কিছু নিয়েই অনাবশ্যক প্রশ্ন বা তর্ক করিনি। বরাবর থেকেই করিনি। সেদিনও করলাম না। তাছাড়া ওটা সে সীরিয়াসলি বলছে এমনও আমার মনে হয়নি। ভাবলাম, যা ওর স্বভাব, বিনা চিন্তায় দুটো চিমটি কেটে নিলে। তারপর হঠাৎ যখন এই ব্যাপার ঘটল, কেন জানিনে সেদিনের কথাটা মনে পড়ে গেল। সে কথা বলবার ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক—। তাছাড়া তোমার সঙ্গে একবার দেখা হোক, এ ইচ্ছাও প্রবল হল, ঠিকানা ভাল মনে ছিল না, ডাইরেক্টরি দেখে নিলাম এই।

ডাক্তার কহিলেন, আমিও তাই ভেবেছিলাম, তারপর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। মুখটি নীচু করিয়া যেন কিছু একটা ব্যাপারের অতি গভীর তলা হাতড়াইয়া দেখিতেছেন। দু'একবার চক্ষু তুলিলেন। বসন্তবাবু বা কবি বা কবির স্ত্রীর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। আবার চক্ষু নামাইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সে দৃষ্টির সম্মুখে ইহারাও কি রকম অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন, প্রত্যেকেই; ইহাদের অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব আমার চক্ষু এড়াইল না।

অনেকক্ষণ পরে ডাক্তার একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিলেন। দুই চক্ষুর পূর্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া ইহাদের দিকে চাহিয়া কহিলেন, শোন। তোমাদের আমি আজ ডেকে এনেছি, কতগুলো কথা বলব বলে। কথাগুলো শোনা তোমাদের একান্ত আবশ্যক। যদিও এ কথা একান্তই তোমাদের পারিবারিক জীবনের কথা। আমার সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, আমার পক্ষে এদিকে অনধিকার চর্চাও বলতে পার ইচ্ছে করলে। তবুও এ আমি বলতে চাই তোমাদের, কারণ বলাটা কর্তব্য মনে করছি।

কেহ উত্তর করিল না। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, ইহাদের সকলের মধ্যেই যেন একটা চাপা অস্বস্তি ও উৎকণ্ঠার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কবি মাথা নীচু করিয়া কি ভাবিতেছে, কবির স্ত্রীর ঠোঁট দুইটি এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছে, বসন্তবাবু নিষ্পলক চক্ষুর দৃষ্টি প্রাণপণে মেলিয়া ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া আছেন।

আমিই কি ইহাদের অস্বস্তিবোধের কারণ, ভাবিয়া কহিলাম, আমি তাহলে উঠি?

ডাক্তার কহিলেন, না তোমাকেও আমার দরকার হবে। বসন্ত একেবারে তুমি তোমার সব সমস্যা আর চিন্তার ভার আমার হাতে ছেড়ে দিতে পারবে? আজও কি পারবে? বসন্তবাবু অত্যন্ত স্থির কণ্ঠে কহিলেন, পারব। কবিকে ও পুত্রবধূকে কহিলেন, স্থির হয়ে বোস তোমরা।

ডাক্তারকে কহিলেন, বল তুমি কি বলবে?

ডাক্তার একমুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর কহিলেন, শোন।

সতী মারা গেছে। তার নাম নিয়ে কোন আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। সার্থকতা নেই কিছু। কিন্তু গত দশ দিন তোমরা একটা প্রকাণ্ড অস্বস্তিতে কাটাচ্ছ প্রত্যেকেই।

কবি কহিল, তার মানে?

—শুনে যাও। সতী মারা গেছে, কিন্তু হঠাৎ হার্টফেল করে নয়। হার্টটাবল তার ছিল না—।

তোমাদের প্রত্যেকেরই সে আপনজন, আমিই বাইরের; তবু বলতে হচ্ছে, ফেল করে মরবার মতও হার্ট কি তার ছিল?

কেহ উত্তর করিল না। ডাক্তার কহিলেন, গল্প বাড়িয়ে লাভ নেই। সেটা অনাবশ্যক, শ্রুতিমধুরও নয়। যেটুকু দরকার বলছি।

তোমরা আমার খোঁজ জানতে না। কিন্তু সতী জানতো। বসন্ত, তোমাকেও কথাটা যে বলেছিল মাস দুই আগে বললে? ঠিক তার আগেই সন্তর্পণে, আমার কাছে এসেছিল একদিন।

—কেন?

—এসে বললে, আমার কি হয়েছে বল। বললে, তার পেটে বুকে মাঝে মাঝে ব্যথা ধরে, জ্বালা হয়।

—তারপর?

—আমি তাকে দেখলাম। দেখে বললাম। লিভারে ক্যান্সার বলে মনে হচ্ছে। বললে, কতদিন বাঁচব? আমি বললাম, সেটা নির্ভর করছে রোগের গতি আর রোগীর মতির ওপর। সতর্কে থাকলে দু'চার বছরেও হয়ত হবে না। সতর্ক না হলে দু'মাসেও হয়ে যেতে পারে।

—বলে দিলে?

—কেন বলব না। সে আমার মত চেয়েছিল।

—আমাকে একথা বলেনি। তারপর?

—তারপর, প্রথম যেদিন গেলাম, তার ঘরে আমি এই জিনিস কটা খুঁজে পেয়েছি।

ডাক্তার পকেট হইতে একটি কাগজ-মোড়া প্যাকেট বাহির করিলেন। খুলিয়া একটি একটি করিয়া তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, প্রথম সোনেরিলের শিশি। সোনেরিল ঘুমের ওষুধ, বিনা প্রেস্‌ক্রিপশনে বিক্রী হয় না। তার পুরো শিশি কোন সাধারণ মানুষকে বেচবার কথা নয়। অথচ তার দ্রয়ারে অনেক অনেক খালি শিশি ছিল। তার মানে, ওটা সে নিয়মিত ব্যবহার করত এবং খুব ভারী ডোজে ব্যবহার করত।

বসন্তবাবু বলিলেন, জানি। তুমি কি বলছ—

—না। দ্বিতীয় জিনিস পেয়েছি, সোনেরিলেরই গুঁড়ো, টেবিলে ছড়ানো ছিল, তৃতীয় জিনিস পেয়েছি একটি বড় সেফটিপিন, টেনে সোজা করা, তার মাথাটাকে ঘোরালো করে মোড়া হয়েছে

তার মানে, পিন্ দিয়ে একটি পিলকে কুরে কুরে গর্ত করা হয়েছে, সেই গর্তে অন্য কোন জিনিস পুরে নেওয়া হয়েছে। তোমাদের ডাক্তার যাকে ডেকেছিলে, তার মুখে আমি মৃত দেহের বর্ণনা শুনেছি।

তার থেকে আমার ধারণা, সে জিনিসটা সায়ানাইড্ জাতীয়। রাত্রে শুয়ে যারা সোনেরিল খায়, তারা পর পর কটা খেয়ে নেয়। এও বোধহয় তাই করেছে—একটা দুটো খেয়ে যখন ঘুমের নেশা ধরে এল তখন সেই বিষাক্তটা খেয়েছে। সেটা পেটে গিয়ে ধীরে ধীরে গলে গেছে, ঘুমের মধ্যেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

আমি কহিলাম, তার মানে এটা আত্মহত্যা ?

—হ্যাঁ। কিন্তু শুধু তাই নয়। হার্টফেল নয়, বিষের কাজ, সে সন্দেহ ডাক্তারের হয়েছিল, এবং সেটা বাড়ির লোকদেরও চোখ এড়ায় নি। কি করে জানলাম বা আন্দাজ করলাম আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করবে না। কিন্তু এমন কায়দা করে ব্যাপারটি করা হয়েছে যে প্রত্যেকেরই সন্দেহ হয়েছে, বিষ দিলে কে।

মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে কুকথা বলতে নেই, কিন্তু তার মৃত্যু বোধ হয় পরিবারের কারোই অকাম্য ছিল না। ফলে, এভাবে যখন মৃত্যু হ'ল, তখন সবারই মনে খট্‌কা লেগেছে। আত্মহত্যা যারা সাধারণতঃ করে তাদের টাইপ আলাদা। আত্মহত্যা বলে মনে করতে পারেনি, ফলে প্রত্যেকেই মনে মনে অন্য কাউকে সন্দেহ করেছে। বসন্ত হয়ত ভেবেছে কবি করেছে, তোমার শান্তির জন্য কবি সম্ভবত ভেবেছে বৌমার কাজ। বৌমার ভয় হয়েছে কবির কাজ বলে।

কবি স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। কবির স্ত্রী চমকাইয়া কাঁপিয়া উঠিল। বসন্তবাবু স্পষ্ট ধীরকণ্ঠে কহিলেন, আমি যদি বলি, আমিই দিয়েছিলাম বিষ ?

ডাক্তার বলিলেন, বাজে কথা, আমি বিশ্বাস করব না। এখন একথা বলবার সার্থকতাও নেই কিছু।

ক্যান্সার হয়েছে শুনেই সে বুঝেছিল, এবার মৃত্যু আসন্ন। কোনদিন কাউকে কাছে টানেনি। মৃত্যুর মুখেও পরের সেবার কামনা বা আশা করেনি। নিজের মৃত্যুর ব্যবস্থা নিজেই করেছে, এবং এমন-ভাবে ব্যাপারটি সাজিয়ে রেখে গেছে যাতে সকলেরই মনে সন্দেহ দেখা দেয়, সকলেরই মনের শান্তি নষ্ট হয়। Just like he.

তোমাদের সেই সংশয়টা আমি দূর করে দিলাম। এর জন্য অপরাধী কেউ নয়—পরস্পরকে সন্দেহ করে তোমরা মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছিলে।

বসন্তবাবু কহিলেন, তোমার এ নিয়ে সন্দেহ হল কেন ?

ডাক্তার কহিলেন, Too much of cleverness. সতী জানত, আমিই তাকে ক্যান্সার রোগী বলেছি। তার হার্টের দোষ নেই আমি জানি। অতএব হার্টফেল করে মরেছে শুনলে আমি বিশ্বাস করব না। টাইম সম্বন্ধে আমার কিছু study এবং interest আছে, এও সে জানত। সেইজন্যেই তোমাকে বলে গেছে আমাকে নেমন্তন্ন করতে। যেন তার খবরটা আমি ঠিক পেয়ে যাই এবং তার মৃত্যু যে স্বাভাবিক মৃত্যু নয় এটা খুঁজে বার করি। অর্থাৎ যে সংশয়টা তোমাদের মনে জাগাতে চেয়েছিল, সেইটে সৃষ্টি করবার জন্যেই সে আমাকে ডাকবার ব্যবস্থা করে গিয়েছে। আমি তারও ফাঁকিটা বুঝে ফেলব, এটা সে ভাবেনি, Just like he।

যাক, রাত অনেক , আমারও কথা শেষ হল। এবার তোমাদের আমি good night

জানাব। তোমাদের মনের কাঁটা আমি তুলে দিলাম, all that I could do and should have done। বসন্ত, আশা করব, এবার জীবনের বাকি দিনগুলো তোমার সুখে না হোক, স্বস্তিতে কাটবে।

বসন্তবাবু কথা কহিলেন না। প্রথম দিনের মতই সহসা দুই হাত বাড়াইয়া ডাক্তারকে জড়াইয়া ধরিলেন। বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন, ডাক্তারকেও ছাড়িয়া দিলেন।

কবি ও কবির স্ত্রী নিঃশব্দে ডাক্তারকে প্রণাম করিল।

সকলে নীচে নামিয়া আসিলাম। ইঁহারা গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। ডাক্তার আমাকে বলিলেন, তুমিও কি এই সঙ্গেই যাবে?

আমি কহিলাম, না।

—বেশ।

ড্রাইভার গাড়ি লইয়া গেল। আমরা ঘরে আসিয়া বসিলাম। ডাক্তার কহিলেন, এইবার বলত খুলে, পুরো ব্যাপারটা কি?

—আমি কহিলাম, আমি কি করে জানব?

ডাক্তার কহিলেন, সবটা নয়। কিন্তু অনেকটা জান। বেশ, আমিই বলছি।

তিরিশ বছর আগের কথা। তখন কলকাতা শহর এতবড় নয়। মফঃস্বল থেকে একটি মধ্যবিত্ত পরিবার কলকাতায় এসে বাসা করল। বাপ মাস্টারি করেন, ছেলেমেয়েরা স্কুলে কলেজে। সেকালে বাঙালী মেয়ে কলেজে তেমন পড়ত না। এক মেয়ে, রং তার কালো, দাঁত উঁচু, কিন্তু টানাটানা চোখের দৃষ্টিতে এবং মুখের শ্রী আর বুদ্ধির দীপ্তিতে অনেক রূপসীকে হার মানায়—কলেজে ভর্তি হল। দু'দিনেই অনেকের মনে আগুন ধরিয়ে দিলে, কিন্তু দূর থেকে। নিজে কারু দিকে চাইলে না, চাইলে না বলেই বহু পতঙ্গ আরও ব্যগ্র হয়ে পুড়তে ছুটে এল।

আমি কহিলাম, উনি।

—হ্যাঁ। অনেকেই চঞ্চল হয়েছিল সেকালে, আমিও হয়েছিলাম বোধ হয়। শেষ অবধি শিকে ছিঁড়ল বসন্তর কপালে। বসন্ত ছিল অত্যন্ত সুপুরুষ। অতি ভদ্র, এবং অতি সচ্চরিত্র। আমার পরম বন্ধু, সে ওকে পেলো বলে আমি হিংসে করিনি; ওরা সুখী হোক, এই কামনাই মনেপ্রাণে করেছিলাম, হল না।

সুখ ওদের কপালে ছিল না। সুখ থাকে মনে, বাক্স পাড়ী গাড়িতে নয়। বিয়ের পর কিছুদিন কাটল, তারপর দেখা গেল সতীর প্রকৃতি দিন দিন অদ্ভুত হ'য়ে উঠ্‌ছে। তীক্ষ্ণতা ছিল তার, ছিল তীব্র কামনা—সেইটেই প্রকৃতিতে প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল। প্রথম জীবন বেঁচেছে অভাবে এবং সংযমে কেটেছে, তার ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্যেই যেন পাগল হ'য়ে উঠ্‌ল সে, তার বাকা সামাল দেবার সাধ্য বসন্তর ছিল না। ফলে সতী দিন দিন উগ্র এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠ্‌ল। বসন্ত নিঃশব্দে সব সহ্য করে নিয়ে নিজের মধ্যে নিজে মুখ লুকোলে। তার আত্মা আহত্‌ল, শান্তি নষ্ট হল, বাইরে বেরোনো বন্ধ হ'ল। আমি সেদিন কথাটা বলে ফেলেছিলাম 'কুকোল্ড্'। রাশিয়ান নয়, ইংরেজী কথাই ওটা। ওর মানে হচ্ছে, স্ত্রীর স্বামী। সে লজ্জার বিষয় বোঝা। তার চাপে বসন্ত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। অথচ, প্রতিবাদ করলে যে কেলেঙ্কারি হ'ত, তার রিস্ক নিতে পারলে না।

তুমি বলেছিলে, বসন্ত বড় সহিষ্ণু, কবিও সহিষ্ণু। বসন্তও তার পুত্রবধূর সম্বন্ধে ঐ কথাটাই বলেছে আমাকে, সহিষ্ণু। কিন্তু, কতটুকু বোঝায় ঐ সহিষ্ণু কথাটাতে? পুরো একটা যুগ ধরে কতখানি

সহ্য করেছে ওরা প্রত্যেকে, তা আমিই বুঝি—তুমি তার সত্যকার রূপ কল্পনা করতে পারবে না। অথচ, এই বসন্তর মধ্যে একটা কতবড় প্রাণ, কত বড় প্রতিভা লুকিয়ে ছিল, সেও আমিই জানি। সব নষ্ট হ'য়ে গেল তার।

সার্থক নাম রেখেছিল বাপ মা, সতী। সতীর সতীত্ব একেবারে চাকঢোল বাজিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরুল। কারণ সে যেটা করছিল, করছিল বসন্তকে অপদস্থ করবার অন্ধ আক্রোশে। যদি বল, কিসের আক্রোশ, আমি বলতে পারব না। অনেক ভেবেছি, উত্তর খুঁজে পাইনি। বোধহয় এটা বিধাতারই আত্ম-পরীক্ষা—একটা মানুষের মধ্যে কতরকম এবং কতখানি হীন ও বিকৃত প্রবৃত্তি ঠেসে দেওয়া যায় তার এক্সপেরিমেণ্ট করছিলেন তিনি। মাঝখান থেকে বসন্তটা মারা গেল। আমার দুঃখ সেইখানে। কবির সামনে দিন আছে, বসন্তর নেই।

কবির জন্ম হল, বিয়ের বছরখানেক পরে। দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক তখনই ফিকে হয়ে এসেছে। বসন্তর ওপরে সতীর প্রচণ্ড বিরাগ, তার জের কবির ওপরে গিয়ে পড়ল। কবি হেলাফেলিয়ার রোগী। অনিদ্রার রোগী। আমি দেখেই চিনেছি। তার কারণ তার মা।

কবির প্রায় দু'বছর পরে মুক্তির জন্ম। সতী তখন সতীত্বের রাজপথে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। মুক্তির বাবা বসন্ত নিজে নয়, এ সন্দেহ বসন্তর ছিল। আরও অনেকের ছিল। আমারও ধারণা, সন্দেহ অমূলক নয়। বসন্ত কারু ওপরে দুর্ব্যবহার করতে পারে না, মুক্তির প্রতিও করত না। কিন্তু মনের দিক থেকে তাকে কিছু এড়িয়ে চলত। সতী আবার, সেই আক্রোশেই, মুক্তিকে নিয়ে অত্যধিক মাতামাতি করত। মুক্তি কিন্তু মায়ের চাইতে বেশী ভালবাসত তার বাপকে, মানে বসন্তকে। হয়ত বসন্তর প্রতি মায়ের দুর্ব্যবহার লক্ষ্য করেই।

মুক্তির সামনে আদর্শ চরিত্র, বসন্ত। মনের দিক থেকে সে চমৎকার মেয়ে হ'য়ে গড়ে উঠল, রূপে এবং গুণেও। তোমাকে আমি তার কথা বারেবার জিজ্ঞেস করেছি, তুমি এড়িয়ে গেছ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাকে বিয়ে করলে তুমি ঠকতে না। সে মেয়েটিও বেঁচে যেত। অবশ্য এখন সে নিয়ে ভেবে লাভ নেই। তোমার দ্বিধা কোথায় ছিল আমি বোধহয় বুঝেছি—। সতীর ওপরে তোমার প্রচণ্ড অশ্রদ্ধা, তাকে শ্বশুরঘরের স্থানে বসাতে তোমার প্রবৃত্তি হয়নি।

আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, ঠিক তাই।

ডাক্তার কহিলেন, সতীর এক বোন ছিল, বেলা। ভাল ঘরে ভাল বরে বিয়ে হয়েছিল, কলকাতায়ই। তার এক দূর সম্পর্কের দেওর, নামটা বোধ হয় অবিনাশ, সতী তাকে নিয়ে চরম কেলেঙ্কারি জুড়ে দিলে।

অবিনাশের রূপ ছিল, গুণ বলতে কিছুই ছিল না, অন্তত বসন্তর তুলনায়। এটা সম্ভবত সে করছিল, বসন্তকে জ্বালিয়ে দেখাবার জন্যে, চ্যালেঞ্জ হিসেবে। বয়সেও সে ছিল অনেক ছোট সতীর চেয়ে।

মুক্তির চেহারার সঙ্গে অবিনাশের অদ্ভুত মিল ছিল। যত বড় হ'ল, ততই সে মিল স্পষ্ট হ'ল। দেখে, যার যা ভাববার ভেবে নিলে। আশ্চর্য, একা বসন্তই তখন মুক্তিকে প্রাণপণে আগলে রইল, অন্যের ঘৃণা থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করল। কিন্তু মুক্তি একদিন জেনে গেল। তার তখন বয়স হয়েছে। ঝগড়া তর্ক করল না, দু তিন দিন না খেয়ে পড়ে রইল, তারপর ধীরে-সুস্থে উঠে গিয়ে ট্রেনের তলায় শুয়ে পড়ল। তারপরই বসন্তও স্ট্রোক্ হয়ে পড়ে গেল।

আমি কহিলাম, এত কথা আপনি জানলেন কি করে?

ডাক্তার কাঁদলেন, জানতে চাই, কারণ বসন্তকে ভালবাসতাম। অথচ, তার কাছে যাওয়ার পথ খোলা ছিল না।

—কেন ?

—সে অন্য কথা। যাক। শুধু অসচ্চরিত্রতা বলেই নয়, সতীর মধ্যে কতগুলো হীন প্রবৃত্তি দেখা দিচ্ছিল। চোরা চালচলনও, বদলে যাচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে। মিথ্যে কথা, চুরকি, যাকে বলে না সংসারে অশান্তি ঘনিয়ে তোলা, কার বিয়ের কথা হচ্ছে জানলে নিজে থেকে গিয়ে ভাংচি দেওয়া, আবার ক্ষেত্র বিশেষে কোন ছেলে বা মেয়েকে কুপথে পা বাড়াবার উৎসাহ ও সুযোগ জানিয়ে দেওয়া, মানে সবশুদ্ধ একটা রীতিমত পৈশাচিক প্রকৃতি প্রবৃত্তি দেখা দিলে তার। এই সতী সেকালের সেই সতী, এ কথা দেখলেও বিশ্বাস করবে না, এমনই অবস্থা।

আমি কহিলাম, সিস্টার জাইভ ?

—হ্যাঁ। তফাতের মধ্যে ও গোপন করত না কোনটাই, সবই খোলাখুলি, উৎকট প্রকাশ্যে, যেন সারা সমাজকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে করছে। মুক্তি যখন মারা গেল সবাই ভাবলে এবার ধাক্কা খেয়ে থামবে। কিছুই হল না, আরও বরং বেপরোয়া হ'য়ে উঠল। ওদিকে বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে গেছে।

ওর এক বোনের কথা বলেছি। আরেক বোন ছিল, নিঃসন্তান। তার স্বামীর এক মা-মরা ভাগনী না ভাইঝি, তাকে তিনি নিজের মেয়ের মত করে মানুষ করেছিলেন। তার ওপরে ওর চটবার কোন কারণই নেই, অথচ সে মেয়েটার ওপরে প্রচণ্ড আক্রোশ দেখা দিলে ওর। ভদ্রলোক ছিলেন শান্ত-প্রকৃতির, তা ছাড়া তিনি থাকতেন সারাদিন বাইরে। আর মেয়েদের কামড়, গোপন কামড়, তার জ্বালা অনেক কিন্তু বাইরে তার প্রমাণ হয় না। এমনই অবস্থা করে তুলল, দুবার তিনবার বোধ হয় মেয়েটার মনের অবস্থা হল আত্মহত্যা করবার মত। করেও ফেলত হয়ত। হঠাৎ কি করে ওদের এক দূর আত্মীয় ছেলে ব্যাপারটা জেনে ফেললে। সে তেজী ছেলে, সোজা সেই মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে চলে গেল, সতীর মুখে জুতোর ঠোক্কর মেরে যাকে বলে।

সতীর জীবনে সেই প্রথম পরাজয়, এবং পরাজয় সহ্য করা তার শক্তির বাইরে। তারপর থেকেই দেখা গেল তার পাখার দান উল্‌টো উল্‌টো পড়ছে। অবিনাশ এতকাল ঘরে বেঁচে কলকাতায় লেপ্‌টে থাকত। সে হঠাৎ নতুন চাকরি জোগাড় করল, বৌকে নিয়ে একদম সিলোন চলে গেল। এরই কিছুদিন আগে মুক্তি মরেছে, তার ফল হতে পারে এটা। কিন্তু সতী এটাকে তার প্রতি অবিনাশের অবহেলা বলেই ধরে নিলে। অবিনাশের বৌটি ছিল অসম্ভব ভাল এবং শান্ত। কিংবা তুমি যাকে বল সহিষ্ণু। সতীর সব আক্রোশ পড়ল তার ওপরে, কিন্তু সে তখন সতীর নাগালের বাইরে। অবিনাশও, গেল ত গেল, কলকাতায় আসা-যাওয়াও প্রায় বন্ধ করে দিলে, এবং তার ঠিক অল্পদিন আগে কবি বিয়ে করে বসেছে।

কবির ওপরে একটা অন্ধ বিদ্বেষ ছিল সতীর। সে বিয়ে করবে এবং অমন ভাল একটা মেয়েকে, এ সতীর সহ্যের বাইরে। তার সে বৌ, আবার বসন্তরই এক বন্ধুর কন্যা। কবিকে পারছে না, বৌয়ের ওপরে প্রাণপণে দংশন চালাতে লাগল সতী। ওদিকে বসন্ত প্রাণপণে তাকে আগলে রাখতে লাগল। সতীর কামড়ের বিষ বসন্তের স্নেহের মলমে মুছে যায়। বসন্ত কবিকে বললে, বৌকে নিয়ে আলাদা বাড়ি করতে, বসন্তর আর ছোট ভাইবোনদের কথা ভেবে কবি রাজী হল না। একথা সতী জানল।

সতীর মনে হল, সংসারে সবাই তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। করলে দোষ হত না। আমারই

অনেকবার মনে হয়েছে ওকে যদি কেউ খুন করে, সে সমাজের একটা দুষ্ট ব্রণ সারিয়ে দেবে। কিন্তু আশ্চর্য তার ভাগ্য। সারা জীবন ধরে সে অন্যের জীবনে বিষ ঢেলেছে, অথচ সেই অন্যরা চিরদিন তাকেই খাতির দিয়েছে, মর্যাদা দিয়েছে, অন্যের কাছে তার সমস্ত দোষ ঢেকে তার মান বজায় রেখেছে।

পৃথিবীশুদ্ধ মানুষের ওপরে তার আক্রোশ আর বিদ্বেষ বেড়েই চলল ক্রমাগত, এবং বোধ হয় তারই ফলে তার স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু করল। একদালের রূপের তখন একেবারেই চিহ্নও নেই, সারাক্ষণ নোংরা কাজ আর নোংরা চিন্তার ফলে চেহারাতে ফুটে উঠেছে একটা কদর্য শয়তানী ছাপ, তার উপর চোখ বসে গিয়ে মুখ-টুখ ভেঙে সে এক অপরূপ চেহারা। অথচ, তারও অপরাধ সবই হল বসন্তর আর বৌয়ের।

আমি অবাক হতাম না, যদি শুনতাম বসন্ত তাকে খুন করেছে—সারাটা জীবন বিষে জ্বলল, এখন ছেলে আর বৌয়ের মুখ তাকিয়ে, মাতৃহত্যার পাপ তার হত কিনা আমি জানিনে—ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান আমার অত্যন্ত কম। অন্তত নারীহত্যা বা নরহত্যার পাপ হত না ঠিকই, নেহাত হলে হত সাপ মারার পাপ।

অনেক খবরই আমার কানে আসত। মাঝে মাঝে খুঁজে-টুজেও জেনেছি! তোমাদের ভগবানকে তোমরা কল্যাণময় বল—এইসব জীবকে সৃষ্টি তিনি কেন করেন, কোন্ কল্যাণ বুদ্ধি থেকে, দেখা পেলে একবার জিজ্ঞেস করা যেত। একটা কিন্তু দেখেছি, তাঁর রাজ্যে এরা শাস্তি পায় না—বেশ সগৌরবেই আজীবন বজ্জাতি করে চলে যায়। বোধ হয় এদের গায়ে হাত দিতে তিনি নিজেও ভয় পান। কিন্তু, এদের দৌরাত্ম্য দেখলে আর তাঁর ওপরে শ্রদ্ধা রাখা যায় না।

আমার সঙ্গে সতীর দেখা হত মাঝে মাঝে। সেই আসত। উদ্দেশ্য কিছু নিশ্চয়ই ছিল, সেটা ব্যক্ত করত না।

এরই মধ্যে, হঠাৎ একদিন বললে, আমার বুকে পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে, দেখ ত কি।

ক্রমাগত নোংরামি চিন্তার ফলে দেহও বিষিয়ে যায়, শাস্ত্রে এমন কথা আছে। সারাটের কুষ্ঠ হয়েছিল। ওর তাই হয়েছিল ভাবা যেতে পারে। She was a mental leper.

তা হোক, আমি ডাক্তার, আমি তাকে দেখলাম। বলে দিলাম, ক্যান্সার।

আমি কহিলাম, বলে দিলেন, মানে? সত্যি ক্যানসার হয়নি তাঁর?

—শাস্ত্রমতে হবার কথা। আর ডাক্তারের রোগ নির্ণয় আসলে hypothetical যায়। বলে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে এও বলে দিলাম এ তার প্রকৃতির ফল। সে চলে গেল। আর আসেনি। ভেবেছিলাম, আমার ঐ কথাটাতে কিছু ফল হবে, প্রাণের ভয়েও কিছু সভ্য হবে। তা হল। আমার চেয়ে তার বুদ্ধি বেশী ছিল। সে আমার ওপরেও টেক্কা দিলে। আত্মহত্যা করল, এবং এমনভাবে সব গুছিয়ে রেখে গেল যাতে পরিবারের প্রত্যেকেই অন্য প্রত্যেককে সন্দেহ করে, ফলে সারা জীবন কেউ না পারে মুখ খুলতে, না পারে স্বস্তিতে বাস করতে। আমাকে ডেকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও করে রেখে গেল, যাতে মৃত্যুর সম্বন্ধে সন্দেহটা আমার মনে আসে,—আমাকে দিয়েই তার কাজ উদ্ধার হয়।

ডাক্তার থামিলেন। তারপর কহিলেন, খুব অবাক লাগল শুনে?

কহিলাম, না।

—কারণ?

—কারণ এর খানিক খানিক আমিও জানি। তবে একটা খুঁটিনাটি জানতাম না।

—কি করে জানলে? কবি নিশ্চয়ই বলেনি।

—না। তাঁর ভগ্নীপতির সেই ভাই-বিকে আমি বিয়ে করেছি।

গঞ্জিকা-বিলাস

"ভাস্কর" (শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

১

পূজার আনন্দে কিঞ্চিৎ গঞ্জিকা-বিলাসে কেহ আপত্তি করিবেন না, এই আশায় আমাদের পুরাণ-ইতিহাস-উপকথার চক্কড়ির মধ্যে একটু গঞ্জিকারস মিশাইয়া সুরভিত করিয়া আপনাদের কাছে ধরিতেছি। অপরাধ মার্জনা করিবেন।

বহুদিন পূর্বের কথা। রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়াছেন। আজ তাঁহাদের ফুলশয্যা। সন্ধ্যার পর হইতে অধিক রাত্রি পর্যন্ত নানাপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান উৎসবাদিতে আকাশ বাতাস ভরিয়া গিয়াছে। ফুলশয্যার সজ্জিত পালঙ্কে নবদম্পতীকে বসাইয়া রাখিয়া অপর সকলে একে একে সরিয়া পড়িয়াছেন। রামচন্দ্র জানকীদেবীকে পাশে বসাইয়া তাঁহার ঘোমটা তুলিয়া চিবুক ধরিয়া সাদরে বলিলেন, এখন আর কেউ নেই এখানে। আমার সঙ্গে একটু কথা বলবে না?

সীতাদেবী লাজনম্র সুরে বলিলেন, কেন বলব না নাথ? চিরদিনই বলব।

কি সর্বনাশ! এ যে বিশুদ্ধ মৈথিলী! অযোধ্যার স্বামীর সঙ্গে মৈথিলী ভাষা! অসম্ভব!

রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া টেবিলের উপর হইতে এক টুকরা পরিষ্কার ব্লটিং পেপার লইয়া আসিলেন এবং সেটিকে দুই ভাঁজ করিয়া ডান হাতে ধরিয়া বাঁ হাতে দিয়া জানকীর নাকটা সজোরে টিপিয়া ধরিলেন। সীতাদেবী ভয়ে বিরক্তিতে কোন কথা বলিতে ত পারিলেনই না, তদুপরি তাঁহার নাক বন্ধ হইয়া যাওয়ায় মুখটা বিশ্রীভাবে হাঁ হইয়া গেল। তখন রামচন্দ্র ঐ খস্‌খসে ব্লটিংএর টুকরা দিয়া উহার জিভটা টানিয়া ধরিয়া বলিলেন, মৈথিলী-টৈথিলী এখানে চলবে না। যদি অভ্যাস না শোধরাও, তাহলে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেব. আজই আমি তোমার জিভ চেঁছে ঠিক করে দিচ্ছি।

এই কথা বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র পকেট হইতে একখানি ছুরি বাহির করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে আড়াল হইতে কে যেন চিৎকার করিয়া উঠিল, ও মা গো, নতুন বৌকে মেরে ফেল্‌লে গো।

বাড়ির একটি ঝি আড়ি পাতিয়াছিল। তাহার এই চিৎকার শুনিয়া বাড়ির ভিতর হইতে কৌশল্যা, কৈকেয়ী প্রভৃতি সকলেই ছুটিয়া আসিলেন। ইঁহাদিগকে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর জিভ ছাড়িয়া দিয়া ব্লটিং কাগজখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছিলেন। কৌশল্যা সীতাদেবীকে কোলের মধ্যে ধরিয়া আদর করিতে লাগিলেন। রামকে বলিলেন, তুই না নারায়ণের অবতার? আমার এ লক্ষ্মীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার তোর? লজ্জা করে না? ছিঃ!

সান্ত্বনা দিয়া বুঝাইয়া-সুঝাইয়া সকলে চলিয়া গেলেন। রাত্রিটা এর পরে বেশ ভাল ভাবেই কাটিয়া গেল।

ইহার পর হইতে সমস্ত জীবন ধরিয়াই জনমদুখিনী সীতার বিশ্বাসঘাতকতা তাহাকে বিব্রত করিয়াছে। গয়ায় পূর্বপুরুষদিগের পিণ্ডদান কালে, গুরুর চণ্ডালের আবাসে অবস্থান কালে, হরধনুর্ভারোত্তোলন নিরালা পরিবেশে, সূর্পনখার ষড়যন্ত্রে, রাবণের সীতা হরণকালে, কিষ্কিন্ধ্যার বানরযূথের মধ্যে, অশোক কাননে চেড়ীপরিবৃত অবস্থায়, শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনকালে, রাবণের সহিত সাংঘাতিক যুদ্ধঘটনা মধ্যে, হনুমানের গন্ধমাদন আনয়নের মধ্যে, সীতাদেবীর উদ্ধারে, তাঁহার অযোধ্যা প্রত্যাগমনকালে অগ্নিপরীক্ষায়, অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের পর প্রজারঞ্জন কারণে, জানকীর নির্বাসনে, তাঁহার পাতাল-প্রবেশ কালে—এক কথায় তাহার সমগ্র জীবনের সর্বকালে তাঁহার বাপের বাড়ীর মৈথিলী ভাষা তাঁহাকে নিপীড়িত করিয়াছে। বাল্মীকি বন্দীকের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে এই জিহ্বা ঘটনা প্রতিফলিত হইতে পারে নাই। সেইজন্য রামায়ণের এই অতি প্রয়োজনীয় দিকটা তাঁহার কাব্য হইতে একেবারে বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

কেমন করিয়া রামায়ণটাকে রিভাইভ করা যায়, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে গল্পিকার কলিকাটা ফেলিয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

২

গল্পিকার ঘুম তখনও কাটে নাই। সহসা দেখিলাম, দুষ্মন্ত শকুন্তলার হাত ধরিয়া নিভৃতে লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন। তারপর দুইজন পাশাপাশি বেশ ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিয়া গান্ধর্ব প্রেমে পাগল হইয়া উঠিয়াছেন। শকুন্তলা একবার ভয়ে ভয়ে বলিয়া ফেলিলেন,—তো অজ্জউত্ত, এর পরে এখান থেকে চলে গেলে আমাকে কি আর মনে থাকবে?

দুষ্মন্ত সহসা শকুন্তলার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, What's that? What do you mean by অজ্জউত্ত?

শকুন্তলা কাঁপিয়া উঠিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, আপনি রাগ করিলেন? এ অঞ্চলে মেয়েরা আর সাধারণ লোকেরা তো প্রাকৃত ভাষাতেই কথা বলে। সকলেই বেশ পছন্দ করে। লোকে বলে, ভারি মিষ্টি শুনতে।

তা হোক। আমার কাছে ওরকম দু'মিশেলী জিভ চলবে না।

তাতে আর রাগ করবার কি আছে? আমরা কণ্বমুনির কাছে সংস্কৃতও শিখেছি। সংস্কৃতেও আমি কথা বলতে পারি।

শুধু 'বলতে পারি' বললে হবে না। এখন থেকে ও প্রাকৃত জিভ্ থেকে মুছে ফেলতে হবে। দেখি, হাঁ কর ত?

শকুন্তলা অগত্যা হাঁ করিলেন। দুষ্মন্ত চট করিয়া তাঁহার মাথাটা বেশ জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া পকেট হইতে একখানি খদ্দরের ছাপা রুমাল বাহির করিয়া শকুন্তলার জিভ্টা চাপিয়া ধরিলেন এবং একটু জোরে জোরেই জিভ্টাকে ঘসিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা অশ্রুসিক্ত চোখে কোনমতে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ! প্রিয়তম, কি করছ?

তোমার ওই প্রাকৃতটাকে মুছে ফেলা যায় কি না, তাই দেখছি।

শকুন্তলা আরো একটু ঘনিষ্ঠভাবে বলিলেন, প্রিয়তম! এইজন্যই কি আমরা এখানে এসেছি? শকুন্তলা বুঝিয়াছেন, নরম হওয়া ছাড়া অন্য পথ নাই। এ যে গান্ধর্ব ব্যাপার! যারে কাছে কোন আত্মীয়-স্বজন নেই যে, চেঁচিয়ে ডেকে আনবেন।

শকুন্তলার অতি নরম সমর্পণ ভাব দেখিয়া দুষ্মন্তও ক্রমশ নরম হইয়া পড়িলেন। রাত্রিটা বেশ ভালভাবেই কাটিল। নিজের আঙুলের একটি আংটি আদর করিয়া শকুন্তলার হাতে পরাইয়া দিয়া দুষ্ট মনেই বুঝ পরিত্যাগ করিলেন।

গল্পিকার কলিকায় আর একটু টান দিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কালিদাসটা বেন কি! এ রকম ঘোড়াখী নাটক ভদ্রলোকে লেখে! অজ্ঞতঃ, নিলেহো—এসব কি! আর আমরাই বা কি? এই অপদার্থ লেখকের অপদার্থ লেখা নিয়ে সারা জগৎময় নেচে বেড়াচ্ছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমি কালই সিণ্ডিকেটে একটা মোশন আনবো, এই প্রাকৃত মেশানো নাটকটাকে ইউনিভারসিটিতে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয়।

৩

মাথাটা ঝিম-ঝিম করিতেছে। বেশ লম্বা কয়েকটি টান দিয়া বুদ হইয়া বসিয়া আছি। মাথার মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নানা দেশ হইতে নানা রথী, মহারথীরা আসিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন। কেহ দ্বারকা হইতে, কেহ বিদর্ভ হইতে, কেহ কাশী হইতে এবং অন্যান্য বহু স্থান হইতে বহু রাজন্যবর্গ সমবেত হইয়াছেন। আমার গল্পিকা-বিধূনিত মস্তিষ্কের মধ্যে স্পষ্ট দেখিলাম, প্রত্যেকের হস্তে অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের সহিত একটি করিয়া জিভছোলা। ভিন্ন ভাষাভাষী যোদ্ধা দেখিলেই অপেক্ষাকৃত বলবান্ ব্যক্তি দুর্বলতর ব্যক্তির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া জিহ্বা টানিয়া বাহির করিয়া জিভছোলা দিয়া তাহার জিভ চাঁছিয়া নিজের জিভের মত বেশ সমান করিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন। এই জিভ-ছোলার বিবরণ ব্যাসদেব স্লেক চাপিয়া গিয়াছেন।

মাথাটা রীতিমত ফাঁপা হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে ছোট ছোট আগুনের ফুলকি উড়িতেছে। ক্রমে ক্রমে ইতিহাসের পাতাগুলি যেন চোখের সম্মুখে ফর্ ফর্ করিয়া উড়িতেছে। মহেঞ্জোদারোর ছবিগুলোর মধ্যে, মূর্তিগুলোর মধ্যে জিভছোলার কোন চিত্র দেখা গেল না। গ্রীক আক্রমণের সময়ে অবশ্য সেলুকস এবং হেলেনের কথাবার্তার মধ্যে জিভের মারপ্যাঁচ ছিল, কিন্তু জিভছোলার প্রয়োগের কথা কেহ লিখিয়াছেন কিনা তাহা এই গল্পিকা-বিলাসী অঙ্কের মাস্টার কেমন করিয়া জানিবে? তারপর পাঠান যুগ, মোগল যুগ, মারাঠা যুগ, শিখ যুগ, ইংরেজ যুগ প্রভৃতি কত যুগ বহিয়া গেল এই ভারতের বুকের উপর দিয়া, কত প্রকার কত অস্ত্র-শস্ত্র, কত প্রকার কত বীরত্ব, কত প্রকার কত ত্যাগ, ভোগ, আচার-ব্যবহারের কত বিচিত্র লীলার কত ঢেউ চলিয়া গেল, অথচ ঐতিহাসিকেরা এমনই বেকুব, যে জিভছোলার বিবরণ, ব্যবহার, প্রয়োগরীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে একেবারে নীরব। কেন এ চাপাচাপি! ঐতিহাসিকরা সব কথা খুলিয়া বলেন না কেন?

৪

আবার দুই চারিটি টান দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছি, সহসা মনে হইল, আমি ধমধম এরোপ্লেনে। পৃথিবী ঘুরিয়া আসিবার সংকল্প লইয়া প্লেনের সীটের সঙ্গে নিজেকে বাঁধিয়া ঝিম-ঝিম করা মাথাটা পিছনের দিকে একটু কাৎ করিয়া বসিয়া বা শুইয়া রহিলাম। আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম, সম্মুখের সীটে একটি শৃগাল। সেও বোধ হয় পৃথিবী ভ্রমণে চলিয়াছে। প্লেন ছাড়িল। একটি তরুণী শৃগালিনী আসিয়া সামনের শৃগালটির সহিত মুখে মুখ দিয়া, নাক গুঁকিয়া, আস্তে আস্তে একটু হুকাহুয়া করিয়া বেশ আলাপ ও ভাব জমাইয়া লইল।

আমার হোস্টেলটি যখন আমার পাশে আসিয়া বল সমেত একটি সরবতের গ্লাস আনিয়া সম্মুখে ধরিল, তখন ঝিম-ঝিম-করা মাথা একটু যেন পরিষ্কার মনে হইতে লাগিল। আমি সবিস্ময়ে শৃগাল যুগলের দিকে চাহিয়া আমার হোস্টেলটির দিকে একটু ইঙ্গিত করিলাম। হোস্টেলটি আমার প্রশ্ন বুঝিয়া বলিল, ওদের কত সুবিধে। বম্বেতে গিয়ে এই শিয়াল হোস্টেলটি নেমে যাবে, আর একটি উঠবে। আমার বেইকটে গিয়েও আবার শিয়াল-হোস্টেল বদল হবে। এমনি করে, ক্রাকফুট, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, শিকাগো, টোকিও, হংকং প্রভৃতি সর্বত্রই একটি করে নূতন শিয়ালনী উঠে আসবে।

আমি যথাসম্ভব চোখ বড় করিয়া হোস্টেলটির মুখের দিকে আবার চাহিলাম। সে বলিতে লাগিল, আমাদের কত অসুবিধে। নানা যাত্রীর জন্যে আমাদের জিভগুলো নানারকম ছাঁচে অভ্যস্ত হতে হয়, যাত্রীদেরও তাই। ওদের সে অসুবিধে নেই। পৃথিবীর যেখানেই থাকে, সেই হুক্কা-হুয়া। ওদের জিভগুলোর কোন দরকার হয় না। সব দেশেই এখন ইংরেজের জিভটার অনুকরণ প্রায় চালু হয়ে এসেছে, তাই রক্ষে। নইলে আমাদের সব কাজই কাক-চিল-শকুন-কুকুর-বেড়াল-গরু-গাধা-শৃগাল এরাই যখন করে বসত।

আমি এই বক্তৃতা শুনিয়া প্রথমত হতবাক হইয়া গেলাম। পরক্ষণেই মস্তিষ্কের মধ্যে শ্রীভগবানের করুণা বিতরণের পক্ষপাতিত্ব অনুভব করিয়া অভিমানে ফুলিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, এই কাক, চিল প্রভৃতি জীবগুলির প্রতি শ্রীভগবানের কি অপার করুণা! পৃথিবীর সর্বত্র উহাদের জিভগুলি সব এক ছাঁচে গড়া। যত বজ্জাত মানুষের বেলা! ভগবান্ তুমি মানুষকে কাক-শৃগাল করিলে না কেন? তাহা হইলে আমরা সমস্বরে কা-কা, হুক্কা-হুয়া করিতে পারিতাম।

লক্ষ্য করিলাম, আমার হোস্টেলটি যেন আমার মনোভাব কতকটা বুঝিতে পারিয়াছে। হয়তো শৃগাল-লীলা লক্ষ্য করিয়া তাহার নিজের মনেও আমারই মত চিন্তা জাগিয়াছে। হাজার হোক মানুষ তো! তাছাড়া তার মধ্যে শুধু যাত্রী সন্তোষ বিধান ছাড়া অন্য চিন্তাও আছে। এক কাপ গরম কফি আমার সম্মুখে ধরিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, পথে, ঘাটে, ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, প্লেনে, যেমন তেমন একটা কা-কা বা হুক্কা-হুয়া দিয়ে কাজ চালান যেতে পারে, কিন্তু সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, কলা, এসবের বজ্জাট মানুষ এড়াবে কি করে? কা-কা আর হুক্কা-হুয়া দিয়ে গড়া যায় কি? আপনিই বলুন না।

বলিলাম, আমার চিরাভ্যস্ত কলিকাটার একটু ব্যবস্থা যদি করতে, তাহলে উপকৃত হতাম, তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা—

না, না, অত বলতে হবে না। আমি এখুনি সেজে এনে দিচ্ছি। দিন আপনার কলকেটা আর একটুখানি—

বলতে লজ্জা করছে বুঝি? এই নাও। এতেই অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারব।

হোস্টেস আসিয়া কলিকাটা হাতে দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বলিলাম, আর একটু দাঁড়াও! গন্ধ লাগছে বুঝি?

আমাদের কত রকম কত গন্ধ সইতে হয়।

হাঁ, যা বলছিলুম, শেক্সপীয়র যদি বাংলায় লিখতেন, তাহলে হ্যামলেট হ'ত না, কিংবা গোটে যদি ইংরেজিতে লিখতেন তাহলে ফাউস্ট হ'ত না। কাজেই জিভ্ চেঁছে ভগবানের তৈরী জিভগুলোকে পেটেন্ট জিভে পরিণত করার চেষ্টাটা—

হোস্টেস্ বলিল, তা হচ্ছে তো সে চেষ্টা। এই প্লেনেই তো শুনি কত রকম গালগল্প—ওয়ান ওয়ার্ল্ড —আরো কত কি!

বলিলাম, আমি পল্লিকাবিলাসী মানুষ, অত হুজ্জুত কথার মানে বুঝি নে। পলিটিক্সের গ'ও আমার মাথায় ঢোকে না। তবে জিভ্ দিয়ে রোজ চারবেলা খেতে হয়, আস্বাদ নিতে হয়, তোমার মত রূপসীদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, এইজন্ত জিভের জন্ত একটু না হয় গ্রাণ্ড্ ওয়ান্ ওয়ার্লড হোক আর পঞ্চাশ ওয়ার্লড হোক, আমার তাতে বয়েই গেল।"

আমাদেরও তাই। কত এরকম কত মানুষ আসেন, তাদের নিয়ে একটু স্বস্তিতে সময়টা কাটলেই হ'ল। যাই দেখি, ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করিগে। আপনার সুমুরে আপত্তি নেই তো?

মানুষ ছাড়া আর কিছুতেই আমার আপত্তি নেই।

বেশ! এই তো চাই আমরা। খাবার দিকে মুহ্যমানি আমাদের ভালো লাগে না।

হোস্টেস চলিয়া গেলেন। ব্রেকফাস্টের আশায় বসিয়া রহিলাম।

৫

চা-চোক্স-লেজ্-সেদ্ধ-সমন্বিত ব্রেকফাস্ট শেষ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। একটু পরে হোস্টেস আসিয়া বলিলেন, সামনের এয়ার স্টেশন এসে গেল বলে। নামবেন না কি?

না কি—মানে? নিশ্চয় নামবো। তুমি এতক্ষণ ধরে কত আদর যত্ন করলে—তোমার সঙ্গে একটু নিরিবিলি দেখা করতে ইচ্ছে করেছে।

বেশ তো কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। আপনাদের আগেই আমাদের প্লেনে এসে হাজিরা দিতে হবে।

তাই হবে।

এরোড্রোমে নামিয়া হোস্টেসের সঙ্গে তার খাস কামরায় গিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রম্ভালাপ করা গেল। প্লেনের একঘেয়ে বকলেশ বাঁধা অবস্থা হইতে কিছুক্ষণ মুক্তিলাভ করিয়া এবং এই 'ওগো বিদেশিনীর' সান্নিধ্যলাভ করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। একটু পরে মনে হইল, হোস্টেসটি বলিতেছে, এবার যান, প্লেনে বসুন গিয়ে। সময় হ'ল প্লেন ছাড়বার। আমি একটু পরেই আসছি।

মনে হইতেছে, সবই যেন সত্যি সত্যি হইতেছে। পল্লিকার প্রভাব যে এতদূর প্রসারী, তাহা জানিতাম না। প্লেনের সীটে ঠিক হইয়া বসিয়াছি। এমন সময়ে হোস্টেসটি একটি নীলরংএর ছোট ব্যাগ বগলে করিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, হুকুম পেলাম আমাকে এখান থেকে অন্য প্লেনে যেতে হবে। গুড-বাই!

তাহার হাতটা ধরিয়া বলিলাম, গুড-বাই! কিন্তু তোমার জিভটা কোন দেশের তা ত বললে না।

এতক্ষণ পরে বুঝি আমার জিভের খোঁজ পড়ল—এই কথা বলিয়া সে মুখ নীচু করিয়া এমন একটা কাজ করিয়া ফেলিল, যাহাতে আমি একেবারেই অভ্যস্ত নই। আর কোন কথা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া সে মৃদু হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল। আমি তবু বলিলাম, তোমার অতি মিষ্টি জিভটা কোন দেশের, বলই না।

সব দেশের—বলিয়া সে ঝড় করিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

আমি ছোট কলিকাটি পকেট হইতে বাহির করিয়া দেশলাই জ্বালিয়া আগুন দিয়া ছোট ছোট ঘন ঘন টান দিতে লাগিলাম। মনে হইল, প্লেনটা বোধ হয় নড়িয়া উঠিল। সামনে শৃগালটি ঠিক তেমনি বসিয়া আছে, কান খাড়া করিয়া, মুখ উঁচু করিয়া। পরম নিশ্চিন্ত! জিভের জন্ত কোন মাথাব্যথা নেই।

সঙ্গীতের অধ্যাত্ম পটভূমিকা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

আমরা সঙ্গীতের অনুশীলন করি জীবনে ব্যবহার তথা কাজে লাগাবার জন্য, কিন্তু শিক্ষা এক রকমের হোলেও তার প্রয়োগ ও উদ্দেশ্য পৃথকভাবে প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ সঙ্গীত শিখি ও আলোচনা করি আর্ট তথা শিল্পচর্চার জন্য এবং তারি জন্য তার নিয়মনীতি, বিচিত্র ধারা ও শ্রেণী, সঙ্গে সঙ্গে তার বিভিন্ন টেকনিক ও সব-কিছুর সঙ্গে পরিচিত হই। কিন্তু জিজ্ঞাসা হোল শিল্পের চর্চা করি কেন? হয়তো উত্তর আসে শিল্প ভাল লাগে বা শিল্পকে ভালবাসি বলে। কিন্তু ভাল লাগে বা ভালবাসি ছাড়া সঙ্গীতশিল্প শেখার কি আর কোন প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য থাকে না?—থাকে, শিল্পকে আয়ত্ত বা অধিগত ও তাতে পূর্ণতা লাভ ক'রে সাধারণের কাছে প্রকাশ করা তার সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে বোঝা ও বোঝানোর জন্য এবং সেই প্রসঙ্গে জীবনযাত্রার পাথেয় অর্থ, নামযশ, আত্মপ্রসাদ প্রভৃতিও লাভ করা জীবনে শিক্ষাব্রতের মুনাফা হিসাবে। কিন্তু এসব ছাড়াও কি শিল্পশিক্ষার আরো অন্য কিছু উদ্দেশ্য ও সার্থকতা শিল্পীর কাছে অনুভূত হয় না?—হয় বৈকি এবং সেটা হোল অপার্থিব তত্ত্বের কথা এবং ব্যবহারিক জীবনে প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে ও প্রতিটি প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গীতশিল্পের পরম আদর্শের যোগসূত্র রচনার কথা।

কিন্তু এতো হোল নিছক দর্শনের কথা। আসলে এই অপার্থিব তত্ত্বের সঙ্গে পার্থিব সঙ্গীতশিল্পের সম্পর্ক কি? শিল্পী চান সঙ্গীতশিল্পকে আয়ত্ত ক'রে তার দ্বারা প্রতিফলন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-সৃষ্টির আনন্দে আত্মপ্রসন্নতা লাভ করা। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ধনসম্পদ লাভ তো স্বাভাবিক ও যুক্তিসিদ্ধ। ভারতের সঙ্গীতসিদ্ধ সাধক ও শাস্ত্র এ'কথা অস্বীকার করে না, বরং তারা বলেছে পৃথিবীর ধূলিকে ভোলার কোন সার্থকতা নেই, তবে সঙ্গীতকে অধ্যাত্ম সাধনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, শিল্পী বিচরণ করবে পৃথিবীর মাটিতে কিন্তু দৃষ্টি থাকবে বাধাহীন দিগন্ত আকাশের দিকে। এজন্যই ভারতের চক্ষুষ্মানেরা সঙ্গীতকে বলেছে 'সাধনা' এবং এই সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রে দেখে ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি লীলায়িত ছন্দের সঙ্গে তার মিতালী পাতালে তবেই সঙ্গীত সার্থক হবে সুখ-দুঃখ মেশানো সংসারে ও সঙ্গে সঙ্গে অপার্থিব আনন্দের স্পর্শ লাভ করার আকুলতায়।

এটাই হোল সঙ্গীতের আসল সার্থকতার দিক। অতীতেও সঙ্গীত ছিল, অতীতেও সঙ্গীতের ব্যাপ্তি ছিল পৃথিবী ও স্বর্গে, আজও তাই, কিন্তু তার সাধনা ও ব্যাপ্তির চেতনা হয়েছে আজ যেন লুপ্ত আর তারি জন্য জীবনের সঙ্গে সঙ্গীতের নিবিড় সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া নিতান্ত কঠিন। অথচ শিল্পের সাধনার জ্ঞানের সিদ্ধি শিল্পীর অবশ্য প্রাপ্য।

সঙ্গীতের সৃষ্টি কেমন করে হোল এ' প্রশ্নের সমাধান ভারতের সঙ্গীতশাস্ত্র করেছে ও বলেছে অনাহত শব্দই আহত ও ব্যক্ত হয়ে হয় সঙ্গীত। শব্দের মধ্যে থাকে অফুরন্ত চেতনা ও সেই চেতনার দীপ্তিই প্রতিটি স্বর, রাগ, তাল ও ছন্দকে করে জাগ্রত, আনে পুলক ও শিহরণ, দেয় শাশ্বতলোকের সন্ধান, বন্ধনের মাঝেও দেখায় মুক্তির আলোক। সঙ্গীতে রাগ ও স্বরের ছন্দ, রস, ভাব, বর্ণ প্রভৃতির যেমন কল্পনা করা হয়েছে তেমনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বাদি প্রভৃতির সম্বন্ধেও তেমনি হয়েছে, এবং এ থেকেই মনে হয় অধ্যাত্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ভারতের পরিপ্রেক্ষণই ভারতেতর দেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বস্তুতন্ত্রবাদের পূজারীদের কাছে হয়তো এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত উপহাসের বস্তু বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই কল্পনাকে আশ্রয় করেই বিশ্বসৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে অধ্যাত্ম সাধনার সকল অনুভূতি ও দৃষ্টি হয়েছে বাস্তবে পরিণত। সঙ্গীতে স্বরের আলোচনায় সাংখ্য, বেদান্ত ও তন্ত্র-দৃষ্টির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে আদর্শকে প্রাণবন্ত করার জন্য। তন্ত্রে চক্র সাধনাও কল্পনা কাল্পনিক হলেও ঐ কল্পনাকে আশ্রয় কোরেই চক্রের ও চক্রস্থ দেবতাদের বাস্তব অনুভূতির বিকাশ হয়।

সঙ্গীতেও তাই। কল্পনাও সঙ্গীত সাধনা ও সঙ্গীতচিন্তার আশ্রয় হলেও ঐ কল্পনাই আবার চাক্ষুষ আকারে রূপায়িত হয় শিল্পী বা শ্রোতৃকের অনুরাগ, আগ্রহ, যত্ন ও নিষ্ঠার মাধ্যমে। ভারতীয় সঙ্গীতের এই অধ্যাত্ম পটভূমি আছে বলেই অপর সমস্ত দেশের সঙ্গীতের আদর্শের তুলনায় ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শ এত মহান্ ও এত মহিমময়।

ভারতীয় সঙ্গীতে রাগই একমাত্র প্রাণবন্ত। রাগ স্বরের আবর্তে রূপ গ্রহণ করলেও তার প্রক্ষেপ ও প্রভাবশক্তি অসাধারণ। রাগের বিমোহনশক্তিও যেমন আছে তেমনি রোগ ও অশান্তি—প্রশমনশক্তিও আছে। রাগ শ্রুতিমধুর স্বর কিনা সূক্ষ্মশব্দতরঙ্গের (vibration) সমষ্টি। শব্দতরঙ্গে বর্ণ, আলোক, বিদ্যুৎ প্রভৃতির মতো সঙ্গীত সৃষ্টিও হয়। পূর্বেই বলেছি সঙ্গীত সার্থক রাগকে নিয়ে। রাগে রঞ্জনাশক্তি থাকে এবং রঞ্জনাশক্তি মানুষ ও প্রাণীমাত্রের অন্তরে সৃষ্টি করে প্রসাদগুণ সংস্কার। সেই সংস্কারের শক্তি অসীম। ক্ষণিক আনন্দের মতো শাশ্বত আনন্দের কল্লোলও সে শক্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং এই সৃষ্টির সার্থকতাকে নিয়েই ভারতীয় সঙ্গীতের বিকাশ সার্থক।

সঙ্গীতে রাগের ধ্যান ও ধ্যানমন্ত্র রচিত হয়েছে। অনেকে সঙ্গীতশিল্পের ক্ষেত্রে ধ্যান ও ধ্যান-মন্ত্রের উপযোগিতা স্বীকার করেন না, বলেন সঙ্গীতে ধ্যান কাল্পনিক ও পণ্ডশ্রমের নামান্তর। কিন্তু অধ্যাত্মভূমি—ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মুখে একথা শোভা কোনদিনই পায় না।

রাগের রূপেও হয়েছে কত শত পরিবর্তন, সুতরাং কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে রচিত ধ্যান সকল সময়ের ও পরবর্তী বিবর্তনযুক্ত রাগে মানানসই বা কেন হবে? যদি কেউ এ প্রশ্ন করেন তবে প্রাচীন ভারতের শুধু কেন,—ভারতের সকল যুগের অধ্যাত্ম আদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করার জন্য অনুরোধ জানাই তাদের। মনোবৈজ্ঞানিকী নীতিও অনুধাবনযোগ্য। খ্রীষ্টীয় ১৫শো—১৭শো শতকের সমাজে ধ্যান ও ধ্যানমন্ত্রের প্রচলন সঙ্গীত-সমাজে হোলেও বৈদিক ও ক্ল্যাসিক্যাল যুগের আদর্শের ওপরই তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। গান্ধর্বসঙ্গীতকে 'মার্গ' বলা হত তার অপার্থিব প্রকৃতির জন্য। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদীর পাশে সামগান গাওয়া হত গানে অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের আহ্বান করার জন্য। বৈদিক ও গান্ধর্ব গানের অধ্যাত্মদৃষ্টি একই ছিল এবং সেই দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষণেই মধ্যযুগীয় রাগে ধ্যানের কল্পনা করা হয়েছিল শিল্পীর শিল্পপূর্ণতার জন্য। আধুনিক সঙ্গীতানুশীলনের ক্ষেত্রে ধ্যানের উপযোগিতা যদিও লাঞ্ছিত, কিন্তু তাই বলে সঙ্গীতের অধ্যাত্মিকী ভাবাধারা কোনদিনই ক্ষুণ্ণ হতে পারে না। অজ্ঞতার জন্য আদর্শভ্রষ্ট হলেই যে সঙ্গীত-বিদ্যার মহিমালোক হবে নিষ্প্রভ একথা কোন কল্যাণধর্ম মানুষই স্বীকার করে না। সঙ্গীতাদর্শের পুনর্ধ্যানরতই আমাদের কাম্য। সাধনার সিংহাসনে সঙ্গীত-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা কামনাই আমরা করি, কেননা ভারতবাসী ভারতের উন্নত দৃষ্টিকে কখনই মালিন্যদুষ্ট করতে রাজী নয়। সংস্কার করার দায়িত্ব শিল্পসেবীদেরই হাতে। সমালোচনার পরিবর্তে গঠন-মনোবৃত্তি নিয়ে তাই বর্তমান সঙ্গীতধারার প্রতি নূতন দৃষ্টি দান করা প্রয়োজন। অধ্যাত্ম পটভূমিকায় সঙ্গীত ও অনুশীলনকে প্রতিষ্ঠা করার কল্যাণপ্রচেষ্টাই এখন সকলের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত।

উপন্যাস

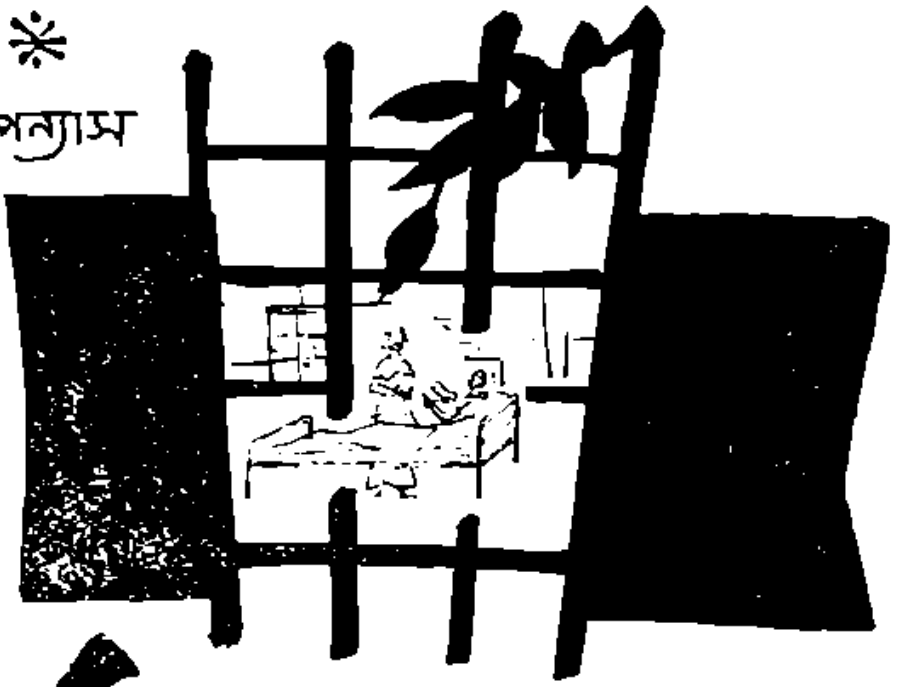

আর এক পৃথিবী

নরেন্দ্র নাথ মিত্র

আর এক পৃথিবী

ভোর হবার আগেই ঘুম ভাঙল।

ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারের মনে হল আজ তার ছাড়া পাওয়ার দিন। ছেড়ে যাওয়ার দিন। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিসের যেন একটা বেদনাও অনুভব করল সুকুমার। এ ব্যথা ঠিক শরীরের নয়। এখানকার টি. বি. স্পেশালিস্টরা এই যন্ত্রণার মূলকে দেহের কোথাও খুঁজে পাবেন না। এ রোগের বীজাণু তাঁদের চোখেও দুর্নীরিক্ষ হয়ে থাকবে। রঞ্জনরশ্মিতে ধরা পড়বে না, কোন ক্ষয় কি ক্ষতির চিহ্ন। তবু বেদনাটুকু ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে। আশ্চর্য দুঃখই বা কেন হবে সুকুমারের। এই স্যানাটরিয়ামে সে কি চিরকালের বাসিন্দা হয়ে থাকতে চায় নাকি? একটি শুশ্রূষাকারিণীর কাছে সে কি চির রোগী হয়ে জীবন কাটাতে চায়? ছি ছি ছি, মনের এ কি অদ্ভুত কাঙালপণা। না রোগ সে চায় না, অনুকম্পা কি সহানুভূতিও চায় না। চির রোগীর চির শুশ্রূষা তার কাম্য নয়। এখানকার ডাক্তাররা তাকে বলে দিয়েছেন তার আর চিকিৎসার দরকার নেই, সেবা-শুশ্রূষারও দরকার নেই। এবার সে নিজের দেখাশোনার ভার নিজেই নিতে পারবে। শুধু ক্লিনিকে গিয়ে একমাস অন্তর অন্তর ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। এই স্যানাটরিয়ামেরই অফিস আছে ক্লিনিক আছে কলকাতায়। কোন অসুবিধাই হবে না। কলকাতা, সুকুমার আবার কলকাতায় ফিরে যাবে। সে আবার তার কলকাতাকে ফিরে পাবে। এগারো মাস আগে কলকাতাকে ছেড়ে আসতে তার মনে কী কষ্টই না হয়েছিল! যেরূপ মাইল ঘুরে তো নয়, মনে হয়েছিল যেন হাজার হাজার মাইল ঘুরে দেশান্তরে যাচ্ছে। চেষ্টা করেছিল কলকাতার কাছাকাছি থাকতে। যাদবপুরে অন্তত কাঁচড়াপাড়ায় একটি বেড পাওয়ার জন্যে খোঁজ-খবর নিচ্ছিল। আর কিছুর জন্যে নয়, শুধু কলকাতার মধ্যে কি কলকাতার কাছে থাকতে পাবার লোভে। অথচ কীই বা এমন লোভের বস্তু ছিল তার কলকাতায়। বাড়ি নেই ঘর নেই, অস্থায়ী ভাড়াটে বাসা পর্যন্ত নেই। বাপ নেই, মা নেই, নিকট আত্মীয় কেউ নেই। আত্মীয়তার ক্ষীণ যোগসূত্র যদি বা কোথাও থেকে থাকে, সুকুমার তার সন্ধান পায়নি, সন্ধানে রাখেনি। কলকাতা মানে তার কাছে অস্থায়ী গৃহশিক্ষকতা, কখনো বা সস্তা মেসের ঘরের তৃতীয় কি চতুর্থাংশ, কখনো বা পাইস হোটেলের টেবিল, কখনো বা রাজনৈতিক দলের অফিসে ভূমিশয্যা। কী তাকে দিয়েছে ওই শিল্পবতী কলকাতা মহানগরী? ভালো করে খেতে দেয়নি, পরতে দেয়নি, শেষ পর্যন্ত ফুসফুসে যক্ষার বীজাণু ঢুকিয়ে তার পরম অনুরাগের নমুনা রেখে দিয়েছে। তবু বিদায় নেওয়ার সময় এই কলকাতার জন্যেই তার প্রাণ কেঁদেছিল। আজ যেমন মন কেমন করছে বীরভূমের রুক্ষ পাহাড়তলীর এই যক্ষ্মা নিবাসটিকে ছেড়ে যেতে। আশ্চর্য এই মন। সে যে আধারে যার নেই আধারকে আপন বলে জড়িয়ে ধরে তাকে ছেড়ে যেতেই তার কষ্ট হয়।

ঘর পরিষ্কার করে নেবার জন্যে মেথর আর ঝাড়ুদার এসেছে। সুকুমার যে জেগেছে তাদের টের পেতে বাকি নেই। বেডের কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'বাবু বকশিস দেবেন না? আজ তো চলে যাচ্ছেন।'

সুকুমার হেসে বলল, 'দেব নিশ্চয় দেব।'

পাশের বেডের হরিপদবাবুও জেগে উঠেছেন দেখা গেল। সাড়া দিয়ে বললেন, 'কী মশাই, আজই তো যাচ্ছেন।'

সুকুমার বলল, 'হ্যাঁ।'

হরিপদবাবু বললেন, 'বেঁচে গেলেন মশাই। এই খাঁচায় পোষা পাখি হয়ে মানুষ কতদিন থাকতে পারে? দেড় বছর হয়ে গেল পড়ে আছি এখানে। মন দিয়ে চিকিৎসাও করে না, ছেড়েও দেয় না। ঘরে বউ ছেলে দু দুটি সোমত্ত মেয়ে। কী ভাবে আছে কে জানে!

সুকুমার বলল, 'কেন আপনি তো মাঝে মাঝে বাড়ির চিঠিপত্র পান।'

হরিপদবাবু বললেন, 'পাইতো। কিন্তু তাতে কি সব সত্যি কথা থাকে? আমার যখন অসুখের বাড়াবাড়ি হয় আমি কি তাদের কাছে সব কথা খুলে লিখি? আমিও গোপন করি, তারাও গোপন করে। মেয়ে দুটোর জন্যেই ভাবনা। আছে কি কেউ বের করে নিয়ে গেছে কে জানে।'

সুকুমার বলল, ছিঃ, কী যে বলেন।'

হরিপদবাবু বললেন 'আরে মশাই, কিছুই বলা যায় না। যা দিনকাল আর পথ যা পিছল পা সড়কাতে কতক্ষণ। অভাবে-অনটনে বুদ্ধিমান মানুষেরও মতিভ্রম হয়। ওরা তো ওরা। আপনি মশাই কিন্তু গিয়েই দয়া করে আমার বাড়ির খবরটা নেবেন। বেলেঘাটা আর বারকেলডাঙার মাঝখানে যে চড়ক ডাঙা রোড সেখানে সব আছে। সতেরর বাই তিন। মনে থাকবে নম্বরটা। আচ্ছা যাওয়ার সময় লিখে দেব। পোস্টকার্ডও একখানা দিয়ে দেব আপনাকে!'

সুকুমার বলল, 'পোস্টকার্ড দিতে হবে না। আমি গিয়েই সব আপনাকে জানাব।'

সুকুমার এবার উঠে বাথরুমের দিকে চলল। এমন একদিন গেছে যখন বিছানায় শুয়েই সব সারতে হত। বেডপ্যান নিতে হত। নড়তে চড়তে পারত না। কিন্তু গত সাত আট মাস ধরে সে বেশ ভালো আছে। সুস্থ সবল মানুষের মত সে হাঁটা-চলা করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখানকার লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ানের কাজ করেছে, কালচারাল গ্রুপের সক্রিয় সদস্য হয়ে পেসেন্টদের পক্ষ থেকে হাতে লেখা কাগজ বের করেছে, ইউনিয়নের মুখপাত্রদের একজন হয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অভাব-অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করেছে, দাবি জানিয়েছে। এই হাসপাতালে সে শুধু রোগশয্যা পাততে আসেনি। গত এগারো মাস ধরে এই হাসপাতাল তার কর্মক্ষেত্র ছিল। সেইজন্যেই এখান থেকে চলে যেতে কষ্টবোধ হচ্ছে সুকুমারের। শুধু একটি মেয়ের জন্যে নয়; কিন্তু যদি একটি মেয়ের জন্যেই এই বেদনা বোধ হয়ে থাকে, তাকে ছেড়ে যেতে হবে বলেই যদি বুকটা টন টন করতে থাকে তাতেই বা লজ্জার কী আছে! বন্ধুরা তার কথা শুনে যতই হাসাহাসি করুক, এখানকার পেশেন্টরা, ডাক্তাররা, নার্সরা যতই নিজেদের মধ্যে গা টেপাটেপি করুক, সুকুমার প্রেমকে তুচ্ছ বলে মনে করে না। কেন যে ভালোবাসাকে মানুষ হৃদয়ের দুর্বলতা বলে, বুঝতে পারে না সুকুমার। ভালোবাসা যদি দুর্বলতা, হৃদয়ের কোন বৃত্তি, কোন প্রবৃত্তিকে তাহলে সবলতা বলবে? ভালোবাসা দুর্বল নয়। দুর্বল নয় বলেই তা সুকুমারকে এমন শক্তি দিয়েছে, এত তাড়াতাড়ি তাকে সেরে উঠতে দিয়েছে, ভালোবাসা আছে বলেই সুকুমার এই রোগক্ষেত্রকে কর্মক্ষেত্র করে তুলতে পেরেছে। এত কাজ সে কলকাতায় থেকে করতে পারত না।

প্রশস্ত বাথরুমে রাজকীয় ব্যবস্থা। সব ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। টাবের কাছে গিয়ে দাঁত মাজছে সুকুমার, চোখ মুখ ধুয়ে ফেলল ঠাণ্ডা জলে। জলের স্বাচ্ছন্দ্য কলকাতায় তার জোটেনি।

সাদা পরিষ্কার তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে ফের ঘরে ঢুকল সুকুমার। রোগীরা অনেকেই এতক্ষণে জেগেছে, উঠে বসেছে? এ ঘরে সাঁইত্রিশটি বেড। (বেশির ভাগই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। 'সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট রিফিউজীদের জন্যে এখানে শতকরা সত্তরটি বেডের ব্যবস্থা করেছেন। প্রত্যেক বেডের জন্যে সাহায্যও দিচ্ছেন মাসে প্রায় সত্তর টাকা করে।

সুকুমারের নিকট প্রতিবেশী হরিপদ দাসও উদ্বাস্তু। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার মালারীপুর মহকুমায় বাড়ি ছিল। গ্রামের নামটাও তিনি বলেছিলেন। এই মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না সুকুমারের।

সে ঘরে ঢুকতেই হরিপদবাবু ঠিকানা লেখা একটুকরো কাগজ তার দিকে এগিয়ে দিলেন, 'এই নিন। দেখবেন মশাই যেন হারাবেন না। বামুনের ছেলে সকালবেলায় কথা দিলেন, কথার খেলাপ করবেন না। আজ আপনাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। আচ্ছা সৈতা পরেননি কেন সুকুমারবাবু? সৈতা পরলে তো আরো ভালো দেখায়। যে জাতের যা।'

সুকুমার হেসে ঠিকানা লেখা কাগজটুকু তুলে নিল। এমন ঠিকানা আর চিঠি আরো অনেক জমেছে তার কাছে। বেলেঘাটা, ট্যাংরা, চেতলা, টালিগঞ্জ, নানা জায়গায় এখানকার পেশেণ্টদের আত্মীয়স্বজন ছড়ানো। তাঁদের সঙ্গে গিয়ে সুকুমারকে দেখা করতে হবে, নিজের মুখে এখানকার খবর দিয়ে জানাতে হবে। ভরসা দিয়ে বলতে হবে, 'আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি, ভালো আছেন তাঁরা।' প্রতিশ্রুতি কতখানি রাখতে পারবে তার ঠিক নেই। তবে হরিপদবাবুর কথা আলাদা। তিনি একেবারে পাশের বেডের পেসেণ্ট। গত ছয়মাস ধরে এই পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন বছরের প্রৌঢ় ভদ্রলোক তার সঙ্গে অনেক সুখদুঃখের কথা বলেছেন; সুকুমারের কথাও শুনেছেন। তার আপনজন কেউ নেই বলে সহানুভূতি জানিয়েছেন, বলেছেন অসুখ-বিসুখ সব সেরে গেলে বিয়ে করবেন। বয়স কত হল?'

সুকুমার বলেছিল, 'পঁচিশ।'

হরিপদবাবু বলেছিলেন, 'তবে আর কি! আপনার বয়সে আমি দুটি ছেলেমেয়েরও বাপ হয়ে গেছি। বিয়ে করবেন মশাই, নিশ্চয়ই বিয়ে করবেন। লোকে বলে দিল্লীকা লাড্ডু, খেলে পস্তাতে হয়, না খেলেও পস্তাতে হয়। তবু খেয়ে পস্তানোই ভালো। ছেলেবেলায় যেমন বাপ মা বয়স হলে তেমনি পরিবার। পরিবার না থাকলে কি পুরুষের চলে?'

ভদ্রলোক উপদেশ দিতেন।

বিয়ের কথা অবশ্য সুকুমার এখনো ভাবে না। তার অনেক দেরি। আগেকার দিনে টি. বি. হলে তাকে চিরকৌমার্য নিতে হত। আজকালকার দিনে আর তা হয় না। সুস্থ হবার পর দু'তিন বছর দেখে ডাক্তাররা ভূতপূর্ব টি. বি. রোগীকেও বিয়ে করবার অনুমতি দেন। সুকুমার নিজেও এমন কতজনকে দেখেছে। অসুখ সেরে যাওয়ার পর তাঁরা বিয়ে করেছেন, তাঁদের ছেলেমেয়ে হয়েছে। আরো পাঁচজন সাধারণ স্বাভাবিক ভদ্রলোকের মতই তাঁরা ঘরসংসার করছেন। সুকুমার নিজের চোখেই তাঁদের দেখেছে কলকাতায়। বিয়ে করবার পক্ষে সুকুমারেরও রোগটা বাধা হবে না। কিন্তু বিয়ে করবার আগে আর্থিক সচ্ছলতা চাই। যে তার সুখদুঃখের ভাগিনী হতে আসবে সে যেন শুধু দুঃখের সরিকই

না হয়। এখান থেকে কলকাতার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি করেছে সুকুমার। লিখেছে, 'ভাই, আমার জন্তে একটা কিছুর ব্যবস্থা রেখো। নিশ্চয়ই হয়তো দশটা পাঁচটা কলম পিষতে পারব না। ডাক্তাররা সে পারমিশন দেবেন না। কিন্তু পার্টটাইম গোছের একটা কিছুতো চাইই। যাতে অন্তত কোনরকমে নিজের খরচটা চলে যায়।' বন্ধুরা ভরসা দিয়ে লিখেছে, 'সে জন্তে ভাবতে হবে না। তুমি সুস্থ হয়ে এসো, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'হয়ে যাবে।' কথাটার মধ্যে খুব যেন নিশ্চয়তা আছে তা নয়। স্যানাটরিয়ামের বিছানায় শুয়ে ছিল বলে সে যে বিশ্বসংসারের কোন খোঁজখবর রাখেনি তাতো নয়। চাকরি-বাকরির ব্যাপারে দিনকাল খুবই খারাপ। শিক্ষিত ছেলেদের মধ্যে বেকার সমস্যা বেড়েছে ছাড়া কমেনি। বিশেষ করে সুকুমারের কোন কারিগরী বিদ্যা জানা নেই। একটি বি. এ. ডিগ্রী মাত্র আছে। কিন্তু সাধারণ আর্টস গ্রাজুয়েট আর নিরক্ষর আজকাল প্রায় সমান কথা। শুধু সার্টিফিকেটের জোরে কোন অফিস-টপিসে প্রবেশপত্র পাওয়া শক্ত। পাওয়া যায় যদি খুঁটির জোর থাকে। কিন্তু সেই জোর কোথায় সুকুমারের। তবু কলেজী আমলের বন্ধুদের ওইটুকু ভরসা বড় ভালো লাগে। 'হবে তোর হয়ে যাবে?' একথা শুনলে যার কোনো আশা নেই, সেও কান পাতে, যার কোনো ভরসা নেই সেও লাঠিতে ভরসা করে উঠে দাঁড়ায়। ভরসা তাকে অনেকেই দিয়েছেন। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, রাজনৈতিক কর্মী অনেকের সঙ্গেই কলকাতায় সুকুমারের পরিচয় হয়েছে। এরই মধ্যে যাদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তাঁরা কেউ কেউ চিঠির জবাবে চিঠি দিয়েছেন, অল্পস্বল্প টাকা পাঠিয়েছেন, কেউ গল্পের বই পাঠিয়েছেন, বই পাঠিয়েছেন অবসর কাটাবার জন্তে। কলকাতায় আত্মীয় কেউ না থাকলেও অনেক বন্ধু আছে সুকুমারের। সমবয়সী বন্ধু অসমবয়সী বন্ধু। সুকুমারকে তাঁরা ভালবাসেন। 'নি নাইয়ের শতেক নাও,' এই হরিপদবাবুই সেদিন বলছিলেন কথাটা। যার কোনো নৌকোই নেই, তার শত নৌকো আছে। সম্পর্ক যদি গড়ে তোলা যায়, যদি তা রাখতে জানা যায় তবে হৃদয় থেকে হৃদয়ে একূল থেকে ওকূলে পারাপারের খেয়া নৌকোর অভাব হয় না। কলকাতায় বন্ধুজনের মধ্যে ভবিষ্যৎ বৃহৎ কর্মক্ষেত্রের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে সুকুমার। তবু কেন অবুঝ মন কাতর মন বুঝেও বুঝতে চায় না। তবু কেন যেতে যেতে চায় না যেতে।

'এই যে, কখন উঠেছেন।'

সুকুমার না তাকিয়েও বুঝতে পারল কে। পরম চেনা লোক, পরম প্রিয়জনই। আজ বিদায়ের দিনে সোনার ঘণ্টার মত বেজে উঠেছে।

সুকুমার এবার মুখ তুলে তাকাল, 'খানিকক্ষণ হল। আপনার কি আজ মর্ণিং ডিউটি? ঈভ ওয়ার্ডে?'

শুভ্রা হেসে ঘাড় কাত করল।

এখনো অন্ত লোকের সামনে শুভ্রাকে সুকুমার আপনি বলেই ডাকে। একটু দূরত্ব রেখে সম্ভ্রম বাঁচিয়ে কথা বলে। শুভ্রাও তাই। দশজনের সামনে সুকুমার তার 'আপনি।' যখন একা তখন আরো আপন তখন তুমি। এখানে ইন্দ্রদেবের শুধু সহস্র লোচন নয় সহস্র কর্ণ। দুজনকে সেই চোখ আর বাঁচিয়ে চলতে হয়। তবু কি সবখানি বাঁচাতে পেরেছে, সবটুকু আড়াল করতে পেরেছে? তা পারেনি, অনেকে না হোক কেউ কেউ জেনেছে। বিশেষ করে শুভ্রার সমবয়সী সহকর্মিনীরা। এই শুভ্রা-

নিলয়ের একটি রোগীর সঙ্গে একটি শিক্ষানবিশী নার্সের যে বিশেষ একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সে কথা ওদের অজানা নেই। অজানা যে নেই সে কথা মানা দীপালি মল্লিকাদের একটু আধটু হাসি ঠাট্টাতেই টের পেয়ে গেছে সুকুমার।

একটু বাদে সুকুমার উঠে গিয়ে সামনের খোলা বারান্দায় দাঁড়াল।

শুক্লার ডিউটি আরম্ভ হতে এখনো কয়েক মিনিট দেরি আছে। সে এলে এই দুর্লভ কয়েকটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করে যাক এই ছিল সুকুমারের ইচ্ছা। কিন্তু পাঁচ মিনিট গেল সাত মিনিট গেল শুক্লা এল না। ইঙ্গিতটা কি ও বোঝেনি; না বুঝেই পারে না। তবে এল না কেন। আজই তো শেষ দেখা। অন্তত এখানকার মত, এখনকার মত তো শেষ। তারপর আবার দেখা-সাক্ষাৎ হবে কি হবে না কে জানে? আসা কি উচিত ছিল শুক্লার? অদ্ভুত মেয়েদের মন। তা যে কখন কোন যুক্তি মেনে চলে তা বুঝবার জো নেই। আসলে ওদের হয়তো কোন যুক্তির বালাইই নেই। ওরা সব সময় ঝোঁকের মাথায় চলে।

এখান থেকে হাসপাতালের অন্য বিল্ডিংগুলিও দেখা যাচ্ছে। সবগুলিরই রং সাদা। শুক্লা শুধু এখানে একাই শুক্লা নয়। ছোট ছোট বাড়িগুলি শুক্লা। নার্সদের সবাই শ্বেতবসনা। তবু শুক্লার মত গৌরবর্ণ এখানে খুব কম মেয়েরই আছে। গাতলা ছিপছিপে চেহারা। অপূর্ব সুন্দরী নয়, তবে মুখখানি ভারি মিষ্টি। স্বভাবটুকুও তাই, এইজন্য পেশেণ্টদের মধ্যে ওর এত ডাকাডাকি। কিন্তু ও এল না কেন? খুন্ন মনে ফিরে আসছিল সুকুমার, হঠাৎ দেখা গেল শুক্লা এদিকে এগিয়ে আসছে।

সুকুমার বলল, 'এত দেরি করলে কেন? কতখানি সময় নষ্ট হল বল তো?'

শুক্লা বলল, 'বাঃ রে স্টাফ নার্স যে ডাকলেন, অন্য কোন নার্স তো এখনো আসেনি। তিনি আমাকেই সব বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন।'

সুকুমার বলল, 'ও সব তো একটু পরে বুঝলেও চলত।'

শুক্লা একটু হাসল, 'আচ্ছা অবুঝ তো তুমি। স্টাফ নার্স ডাকলে আমার কি না গিয়ে উপায় আছে? তুমি না হয় চলে যাচ্ছ। কিন্তু আমাকে তো এখানে থাকতে হবে, চাকরি করতে হবে।'

সুকুমার হঠাৎ বলে ফেলল, 'শুক্লা, তুমিও চল যাই।'

শুক্লা সুকুমারের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে রইল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'যাবই তো একদিন। আগে সব ব্যবস্থা হোক, তারপর যাব। এবার যাই। লোকজন সব উঠে পড়ছে, নার্সরা ঘোরাঘুরি শুরু করেছে। কে কোত্থেকে দেখে ফেলবে এক ঘণ্টাকে সাত ঘণ্টা করে লাগাবে। যাই আমি।'

সুকুমার বলল, 'একটু দাঁড়াও। এক মিনিট। তুমি যে মর্ণিং-ডিউটি নিলে সেই দুটো পর্যন্ত এখানেই আটকে থাকবে। আর আমি সাড়ে এগারোটার মধ্যে এখান থেকে রওনা হয়ে পড়ব। তুমি কি ডিউটিটা বদলে নিতে পারতে না?'

শুক্লা বলল, 'বদলে নিলেই বা কী হত। আমি তো আর তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারতাম না। স্টেশন তো ভালো—আজ এই ভিড়ের মধ্যে তোমাকে সেট পর্যন্তও তো এগিয়ে দিতে পারতাম না। কথাও বলতে পারতাম না। জানতো আমাদের মত চুনো-পুঁটিদের বেলায় এখানকার আইনবাবু কি কড়া।'

একটু চুপ করে থেকে শুক্লা ফের বলল, 'মিছিমিছি একা একা শুয়ে শুয়ে মরতাম, তার চেয়ে ডিউটি নিয়ে থাকব বেশ থাকব।'

সুকুমার বলল, 'শুক্লা, ওই দেখ সেই টিলা পাহাড়ের সারি। ওর আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে কতদিন আমরা—। একটু দাঁড়াও, একটু দেখে যাও।'

শুক্লা বলল, তোমার আজ কি হয়েছে বলতো। তুমি আজ আমার চাকরিটি খাবে দেখছি। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ। তোমার হয়েও দেখ, আমার হয়েও দেখ।'

শুক্লা এবার তাড়াতাড়ি চলে গেল।

কিন্তু ওর গায়ের গন্ধের মত শেষ কথাটুকুর রেশ অনেকক্ষণ ধরে বাতাসে জড়িয়ে রইল।

সুকুমার এবার নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হল। সত্যি এত কাঙালপণা কেন সুকুমারের। কেন অত টানাটানি করছিল সে শুক্লাকে। সুকুমার আজ চলে যাচ্ছে বলে কি এই স্যানাটরিয়ামের নিয়মকানুন সব বদলে যাবে? শুক্লার দোষ নেই। ওর অন্তত আরো ছমাস এখানে ট্রেনিংএ থাকতে হবে। সব দিক রক্ষা করে চলতে হবে ওকে। কোন ব্যাপারে ওর শৈথিল্য দেখালে চলে না। নিয়মভঙ্গের শাস্তি তো ওকে একাই পেতে হবে। তবু মুখে একটু বিমর্ষতা, চোখে একটু বিষাদের ছায়া, কণ্ঠস্বরে একটু আর্দ্রতা, আশা করেছিল সুকুমার। তাতেও কি নিয়মভঙ্গ হত? সুকুমার ভাবল মেয়েরা বড় প্রাকটিক্যাল। বিশেষ করে যারা বাইরের জগতে কাজকর্ম করে, তারা লুকিয়ে লুকিয়ে ভালোবাসতে জানে। দরকার মত ভালোবাসাকে লুকোতেও কম জানে না।

সুকুমার চলে এল তার বেডে। শুক্লা থার্মোমিটার দিয়ে রোগীদের তাপ পরীক্ষা করছে আর চার্টে সেই তাপের অঙ্ক লিখে রাখছে। খানিকক্ষণ বাদে সুকুমারের কাছেও থার্মোমিটার নিয়ে এগিয়ে এল শুক্লা।

সুকুমার বলল, 'একি আজও আমার টেম্পারেচার নিতে হবে নাকি?'

শুক্লা হেসে বলল, 'যতক্ষণ আছেন আমাদের মধ্যে যা যা করা হয় সবই করতে হবে।'

সুকুমার জিবের নিচে থার্মোমিটার রাখল। শুক্লা এগিয়ে এসে ওর কপালে একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে হাসল, 'রাগ হয়েছে বুঝি খুব!'

সুকুমার বলল, 'রাগ আবার কিসের?'

শুক্লা মৃদুস্বরে বলল, 'আমার কথাটা যদি একটু ভেবে দেখতেন তাহলে আর রাগ হত না।'

সুকুমার ভাবল সব ভেবে-চিন্তে তবে যা করবার তাই করতে হবে। অভাবিত যেন কিছু বলতে নেই, করতে নেই।

টেম্পারেচার নেওয়া হয়ে গেলেও শুক্লা আরও একটু দাঁড়াল সুকুমারের বেডের পাশে। বলল, 'আপনাকে তো আজ পেশেন্টদের পক্ষ থেকে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হবে। যাওয়ার সময় ওরা সবাইকেই দেয়। এখানকার নিয়ম। কিন্তু আপনার জন্যে বোধহয় একটু বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে।'

সুকুমার বলল, 'বিশেষ অবিশেষের কোন ব্যবস্থারই কোন দরকার নেই।'

শুক্লা বলল, 'তাই কি হয়? ওদের যা নিয়ম তা ওরা করবেই। এখানে নিয়মমত চলাটাই নিয়ম, নইলে অসুখ সারে না, বাড়ে।'

ডানদিকের সারির আর একটি পেশেন্ট ডেকে বলল, 'নার্স, আমার টেম্পারেচার নিতে হয় নিন, না হয় আমি এবার বেরিয়ে পড়ি।'

শুক্লা হেসে বলল, 'আপনার টেম্পারেচার খুবই চড়ে গেছে মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই একশ একের কম উঠবে না।' তারপর তার বেডের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'ও ভদ্রলোক তো আজই চলে যাচ্ছেন, তাই ওঁকে একটু ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছিলাম। বলছিলাম, বেরিয়েও নিয়ম মেনে চলবেন। ঠিক সময় খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রাম চাই।'

মাঝবয়সী রোগীটি বললেন, 'ওঁকে ওসব উপদেশ দেওয়ার জন্যে এখানকার ডাক্তাররা আছেন। আপনার ভাবতে হবে না।'

শুক্লা আর কোন কথা না বলে একটির পর একটি রোগীর টেম্পারেচার নিতে লাগল।

হরিপদবাবু গলা নামিয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে তো এই নার্সটির খুব ভাব হয়েছিল দেখছি।'

সুকুমার অন্যমনস্কভাবে বলল, 'হুঁ।'

হরিপদবাবু বললেন, 'যাওয়ার সময় একটু বলে যাবেন আমাকে যেন দেখে শোনে, ভালো করে যত্ন-টত্ন করে। টাকাটা সিকিটা আমিও দিতে পারি মশাই। কিন্তু এতো শুধু টাকার কাজ নয়। আপনার যা আছে আমি তা অনেকদিন হারিয়ে ফেলেছি।

সুকুমার নিজের মনেই হাসল। বাপের বয়সী এই ভদ্রলোক ও তার যৌবনকে ঈর্ষা করছেন। তবু তো তার স্বাস্থ্য আগের মত নেই। অবশ্য কোনদিনই সে পালোয়ান ছিল না, ক্রীড়াবিদ কি ব্যায়ামবীরও ছিল না। কিন্তু কষ্ট সহ্য করবার শক্তি যথেষ্টই ছিল। আজ আর তা নেই। সেইটাই হয়েছে চিন্তার কথা। যুদ্ধক্ষেত্র রয়েছে, প্রতিপক্ষও রয়েছে কিন্তু লড়াই করবার মত সুকুমারের হাতিয়ার নেই হাতে। তার দেহ-দুর্গ আজ শত্রুর কবলে।

এবার খাবার এসেছে। ডিমসিদ্ধ পাউরুটি মর্তমান কলা আর একগ্লাস দুধ। যেমন রাজরোগ সেরে উঠবার জন্যে তেমনি রাজভোগ চাই। এমন সুখান্য হাসপাতাল ছাড়া সুকুমারের ভাগ্যে খুব বেশি জোটেনি। এখানে আসবার আগে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজেও কিছুদিন থেকে এসেছে সুকুমার। খাবার-টাবার সেখানেও ভালো ছিল। সেখানে একজন পেশেন্টের কাছে গল্প শুনেছিল সুকুমার, কে কে নাকি শুধু ভালো খাবার লোভে ফের সেই হাসপাতালে ভর্তি হতে এসেছিল। কোন কোন অপরাধী যেমন নিরাপদ আশ্রয়ের লোভে ফের জেলে গিয়ে ঢোকে।

খাওয়া শেষ হতে না হতেই এল আরো দুজন নার্স। দীপালি আর মল্লিকা। শুক্লারই সমবয়সী বাইশ তেইশের মধ্যে হবে বয়স। কি দু-এক বছর এদিক-ওদিকও হতে পারে। মেয়েদের বয়স তো সব সময় ওদের মুখ দেখে বোঝা যায় না। ওরা যেমন মনের ভাব লুকোতে ওস্তাদ, তেমনি শরীরের বয়স। শুক্লার মত ওরা দেখতে সুশ্রী নয়, তবে স্বাস্থ্য শুক্লার চেয়ে ভালো। বেশ পুষ্টাঙ্গী। তাছাড়া নার্সদের পোশাক পরবার ধরনই এমন আঁটসাট যে ওদের দেখলে সব রোগীই হৃষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাস্থ্য-হীনদের চোখের সামনে যখন এই স্বাস্থ্যবতীরা এসে দাঁড়ায় তখন যেন ভবিষ্যতের আশা-ভরসা সুখ-সমৃদ্ধি মূর্তি ধরে ওঠে। যোসেফ বিশ্বাস নামে এখানকার একজন পুরনো পেশেন্ট সেবার তাকে বলেছিলেন, 'সুকুমারবাবু শুনেছি লাল রংটাই প্যাশনের প্রতীক, সাদা রংটা পবিত্রতার। ভক্তি শ্রদ্ধা, স্নেহ বাৎসল্য ইত্যাদি, প্রভৃতি। কিন্তু আমার বেলায় একেবারে উল্টো।'

সুকুমার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী রকম?'

যোগেশবাবু বলেছিলেন, লাল বলুন, নীল বলুন, হলদে বলুন কোন রং দেখলেই আমার চিত্ত চঞ্চল হয় না। কিন্তু সাদা রং দেখলেই আমার মনে আতঙ্ক হয়। আমার মশাই পীতাতঙ্ক নেই, আছে শ্বেতাতঙ্ক। শ্বেতবসনা তরুণী বিধবা দেখলে আমার বুক ঢিপ ঢিপ করে, শ্বেতবসনা নার্স দেখলে আর কথা নেই, আমার হৃদয় ফুপোটি একেবারেই কাৎ।'

দীপালি বলল, 'কী ভাবছেন? খুব দেখছি অন্যমনস্ক। চলে যাচ্ছেন বলে মন খারাপ বুঝি?

সুকুমার বলল, 'মন খারাপ কি হয় না!'

মল্লিকা একটু হাসল, 'হবে না কেন। কারো কারো জন্যে খুবই হয়। গিয়ে চিঠি-টিঠি দেবেন তো?'

সুকুমার বলল, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু জবাব পাব কি না তার তো কিছু ঠিক নেই।'

দীপালি বলল, 'দিলে নিশ্চয়ই পাবেন। মনে রাখবেন আমাদের সঙ্গেই আপনার আগে আলাপ হয়েছিল।'

সুকুমার বলল, 'সে কথা কি ভুলবার? আপনারা অনেক যত্ন করেছেন। সেই এ. পি. করবার সময়—।'

দীপালি বলল, 'ওসব বাদ দিন। ধন্যবাদ একেবারে বাদ।'

সুকুমার বলল, 'একেবারে নয় যতটুকু থাক। ওকি চললেন যে?'

মল্লিকা বলল, 'কাজ আছে না, পাশের ওয়ার্ডে ডিউটিতে রয়েছি। আপনি চলে যাবেন তাই দেখা করে গেলাম।'

দুজনেই চলে গেল। যাওয়ার সময় দীপালি আর একবার পিছন ফিরে তাকাল। সুকুমারও একটু হেসে সেই প্রীতিটুকুকে স্বীকৃতি দিল।

দীপালির মনে একটু অভিমান আছে। ইদানীং সুকুমার আর তার বেশি খোঁজখবর নিতে পারত না। পারত না বিশেষ করে ওদ্ধার জন্যে। দীপালির সঙ্গে সামান্য মেলামেশাও ও পছন্দ করত না। মেয়েরা বড় জেলাস। ওরা বন্ধুত্ব-টন্ধুত্ব বোঝে না, সব মানুষকেই একই পাত্রে রেখে বিচার করে। যেন পুরুষের সব মাসই মদের গ্লাস, চায়ের কাপ কফির কাপ বলে যেন কিছু নেই।

দীপালি আর মল্লিকা দুজনেই ওদ্ধার চেয়ে সিনিয়র। এক বছর আগে ট্রেনিং পাস করে ওরা এখানকার স্টাফ নার্স হয়েছে। নার্স হিসাবে ওদের অভিজ্ঞতা বেশি। জীবনের অভিজ্ঞতাও কম নয়। বিশেষ করে ওই দীপালি। নিজের জীবনের অনেক কথাই সে সুকুমারকে বলেছে। এখানে অনেকেই অমন বলে। শুধু একটু সহানুভূতি দেখাতে পারলেই হয়। সেই চাবিতে সব তালাই খোলে। জং-ধরা সস্তা পুরনো তালাই হোক আর দরদের কঠিন ভারি সীসার তালাই হোক। রোগীরা এখানে একজন আর একজনের কাছে এক্স-রে প্লেটের মতই নিজের হৃদয়কে উন্মোচিত করে দেয়। ডাক্তারদের বেশি ধরা-ছোঁয়া পায়নি সুকুমার। কিন্তু নার্সদের পেয়েছে। বেশির ভাগ নার্সই এখানে এসেছে অতি দুঃস্থ পরিবার থেকে। কেউ কেউ বা পরিবার থেকে বহিষ্কৃত হয়ে এসেছে। আর ফিরে যেতে পারেনি, যাওয়ার ইচ্ছাও নেই। কিন্তু তাই বলে কি নতুন ঘর বাঁধবার ইচ্ছাটাও চলে গেছে? তা যায় নি। এমন দু একজন নার্সও আছে যারা প্রথমে পেশেন্ট হয়ে এসেছিল। ডিরেক্টারে পার্ট বদলে গেছে। এখন আর রোগিণী নয়, নার্সের ভূমিকা, ফিরে যাওয়ার আর জায়গা পায়নি। একজনের স্বামী মারা গেছে আর একজনের স্বামী কের বিয়ে করেছে। যাবে কোথায়?

কত বিচিত্র জীবন আর কত বিচিত্র তার কাহিনী। এখানে একজন পেশেণ্ট আছেন নাম সুরেন মোহানবীশ। দুতিনটে হাসপাতাল ঘুরে এখানে এসে পড়েছেন। ভদ্রলোকের বয়স বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ হবে। তিনি টি. বি. সম্বন্ধে অনেক পড়াশুনো করে সাধারণ লোকের জন্ত একখানা সহজ-পাঠ্য বই লিখেছেন। এ রোগের ইতিহাস দেশ-বিদেশে, এ রোগের চিকিৎসার ইতিহাস তার বিকাশ আর বিবর্তন রোগ নিবারণের উপায় নিয়ে তিনি লিখেই চলেছেন। শ তিনেক পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি হয়েছে এপর্যন্ত। আরো বড় হবে তাঁর বই। অসাধারণ তাঁর কৌতূহল, সন্ধিৎসা পরিশ্রম করবার ক্ষমতা। তাঁকে শ্রদ্ধা করে সুকুমার। কিন্তু সে যদি নিজে কিছু লিখতে পারত, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখত না, লিখত এখানকার প্রত্যেকটি রোগী আর প্রত্যেকটি নার্সকে নিয়ে একখানি করে উপন্যাস। লিখত প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন বৃত্তান্ত। এই ব্যক্তি মানুষ সুকুমারকে বড় আকৃষ্ট করে। যদিও জানে ব্যক্তি সমষ্টি থেকে আলাদা নয়, সমষ্টির সঙ্গে দৃশ্য অদৃশ্য সহস্র বন্ধনে সে বাঁধা, তবু ব্যক্তির ভিতর দিয়েই সমষ্টিকে সে ধারণায় আনতে চেষ্টা করে। ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয়ে সৌখ্য বন্ধুত্বের ভিতর দিয়ে জীবন-রসের আনন্দ পেতে চায়। সে নিরাকারের উপাসক নয়, বিশালাকারেরও উপাসক নয়। সীমাবদ্ধ সাকারের পূজক, সাকারের প্রেমিক। কিছু কিছু দুর্ভাগা রোগী আর নার্স যদি তার চারদিকে ভিড় করে থাকে এইজন্যেই করেছে। সে তাদের তিন নম্বর কি চার নম্বর কি সতের নম্বর বেড হিসাবে দেখেনি, ব্যক্তি হিসাবে দেখেছে। নার্সদের পাস করা এবং পাস না করা বিভিন্ন গ্রেডের সেবা যন্ত্র হিসাবে দেখেনি, নানা সুখদুঃখ ব্যর্থতা নিরাশ্বাস আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তাদের ব্যক্ত হতে দেখেছে।

পাশের ওয়ার্ডের পেশেণ্ট সুধীর দাস এসে বললেন, 'একি সুকুমারবাবু, আপনি এখনো তৈরি হননি, ওদিকে হলঘরে সবাই যে অপেক্ষা করছে। চলুন চলুন, জামাটা গায়ে দিয়ে নিন।'

সুকুমার বলল, 'কী ব্যাপার।'

সুধীরবাবু বললেন, আপনার জন্তে বশাই আমরা কর্তৃপক্ষকে বলে অডিটোরিয়ামটা চেয়ে নিয়েছি। একাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টের শৈলেন দত্তকে চেনেন তো? ওই যে তাগড়াই চেহারা, লম্বা পানা ভদ্রলোক—তাঁর সঙ্গে তো কর্তৃপক্ষের বেশ একটু দহরম-মহরম আছে। ওঁকে গিয়ে ধরেছিলাম। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

সুকুমার ভ্রূকুঞ্চকে বলল, 'আবার অত সব ঝামেলার মধ্যে কেন গেলেন।'

ফেয়ারওয়েলের ব্যাপারে শৈলেনবাবুর সাহায্য নেওয়া হয়েছে শুনে সুকুমার খুসি হতে পারল না। শুরু থেকেই তিনি তার বিরোধিতা করে এসেছেন। রোগীদের পক্ষ নিয়ে সুকুমার যখনই দু এক কথা বলতে গেছেন তিনি উপহাস করেছেন, পরিহাস করে বলেছেন, 'আপনারা কি রোগ সারতে এসেছেন না পলিটিকস্ করতে এসেছেন? রোগও কি একটা ট্রেড নাকি যে রোগীদেরও একটা ইউনিয়ন গড়ে তুলছেন?'

শুধু তাই নয়, সুকুমার শুনেছে শৈলেনবাবু ভিতরে ভিতরে তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছেন। উনি ত ডাক্তারও নন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডিরও কেউ নন। তবু কী কারণে যে কর্তৃপক্ষ ওঁর কথায় কান পাতেন তা বলা শক্ত। শোনা যায়, শৈলেনবাবু নাকি সেক্রেটারীর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তাই ওঁর পদের চেয়ে প্রভাব বেশি, প্রতিপত্তি বড়। সুকুমার শুনেছে সে আসবার আগে শুক্লা ওর ঘরে পড়েছিল। সে নিজেই বেরিয়ে এসেছে নাকি, শৈলেনবাবুই ছেড়ে দিয়েছে তার ঠিক নেই। ওঁর অনুগ্রহপ্রার্থিনীর

এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু সুকুমারের পক্ষে গ্রাহ্য না করা কঠিন নয়। অতীত নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী হবে। তার চেয়ে বর্তমানকে ভোগ করে ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি হও। তবু সুকুমার ভাবে আর যার সঙ্গেই হোক ওই শৈলেনবাবু লোকটির সঙ্গে শুক্লার কোন অতীত ইতিবৃত্ত না থাকলেই সে খুশি হয়। এখনো অবশ্য ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলে শুক্লা সম্ভ্রমের সঙ্গে নমস্কার জানায়, কথা বলে, যখন কথা বলবার সুবিধে না হয় একটু হেসে স্বীকৃতি জানায়! মাঝে মাঝে খটকা লাগে সুকুমারের। কেন এখনো অত কেন? একি সাধারণ ভদ্রতার সৌজন্য? অথবা টির পেছনে বলে এই শ্রদ্ধা সমীহা, বশংবদতা? নাকি এর মধ্যে আরো কিছু আছে? ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সুকুমার। কিন্তু শুক্লা কি জানে না শৈলেন দত্তের কাছে থেকে তার বেশি কিছু আশা করবার নেই, চাকরির উন্নতিটাই সংসারে সব নয়! সুকুমার শুক্লাকে বর্তমানে কিছুই দিতে পারেনি। কী তার আছে সে দেবে? একটি ভাঙা সুটকেশ, ছেঁড়া জামা আর দুটো ফুসফুস নিয়ে সে এখানে চলে এসেছিল। এক্সরের যা রিপোর্ট তাতে ফুসফুসটা সেরেছে। কিন্তু আর কোন সম্পত্তি সম্পদ বাড়েনি। সুকুমারের অতীত নেই, বর্তমান নেই, তবু ভবিষ্যৎ আছে ভুলে এখনো বিশ্বাস আছে। সেই ভবিষ্যৎ অখণ্ডভাবে শুক্লার। সেই আগামীকালের দিনগুলি সূর্যের আলোয় ভরা রাতগুলি নিরবচ্ছিন্ন শুক্লপক্ষের। সুকুমার ওকে কথা দিয়েছে, যে দিনই ডাক্তারের পারমিশন পাবে শুক্লাকে সে বিয়ে করবে। ওর জীবন আর প্রেমের অনিশ্চয়তার কথা ভাববে না, ওর অতীত চরিত্রে দাগ আছে কি নেই তা বুঁজতে যাবে না। শুক্লাকে সে ঘর দেবে, টি. বি. হেরিডিটারি নয়, এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে—একটি কি দুটি সন্তানও তাদের সেই ঘরে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে আসতে পারে। মৃত্যুর পরে ইমমর্টাল লাইফ নয়, মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত ঘর সংসার স্ত্রী পুত্রের মধ্যে অমর জীবনের অমৃত স্বাদ নিতান্ত তুচ্ছ অকৃতী অধম, সাধারণ মানুষও পায়, সেইটুকু পাওয়ার জন্যেই সুকুমার নিজেকে তৈরি করবে। আধিক প্রশ্ন অবশ্য আছে। কিন্তু আর কিছু না হোক, একটা মাষ্টারীও কি জুটবে না? আর তার আগে পিছনে সকাল-সন্ধ্যায় একটা করে টিউশনী? বি. এ. ডিগ্রীটা আছে, স্পেশাল অনার্সটাও দুবছর আগে পেয়েছে। শরীরটা ভাল হলে এম. এ.টাও দিয়ে নেবে। তখন স্কুল থেকে কলেজে কি প্রমোশন পাবো না সুকুমার? এত কলেজ হচ্ছে এখানে সেখানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে—কোন বিভাগে কি স্থান হবে না সুকুমারের?

শুক্লা বলে, 'তুমি বড় ভাবুক, কল্পনাবিলাসী। বড় বেশি দূরের কথা ভাবো।'

সুকুমার বলেছিল, 'তুমি ভাবো না?'

শুক্লা বলেছিল, 'না। আমি অত দূরের কথা ভাবতে ভরসা পাইনে। জানো, আমার ভাবনা বড় অলুক্ষুণে। আমি যা ভাবি তা হয় না, আমি যা স্বপ্ন দেখি তা ফলে না। তাই সুখস্বাদের কথা আমার মুখে আনতে ভয় করে। যদি তা ভেঙে যায়! আমার আশাকে আমি খুব বেশি দূর ডাল-পালা ছড়াতে দিইনে। যখন তা নির্মূল হবে, সবশুদ্ধ আমার ঘাড়েই ভেঙে পড়বে! এক চান্সে যদি এখান থেকে ট্রেনিংটা পাস করতে পারি তাই ঢের! তারপর যাতে কলকাতার বড় কোন হাসপাতালে চাকরি-টাকরি পেয়ে যাই সেই চেষ্টা করব। বড় জায়গায় সুবিধে অনেক।'

সুকুমার বলেছিল, 'উঁহু, কলকাতায় গেলে তোমাকে আমি হাসপাতালে ঢুকতে দেব কিনা। তোমাকে সেখানে একখানি ঘরে বন্দী করে রাখব। সে ঘর দোতলাতেই হোক, এক তলাতেই

হোক আর পাতালপুরীতেই হোক। অবশ্য আমাকে যদি ফের হাসপাতালে ঢুকতে হয় তাহলে তোমাকে সেখানেই চাইব।'

'কী যে অলুক্ষুণে কথা সব বল, বিশ্রী লাগে আমার।'

কোমল সুন্দর হাতখানি সুকুমারের মুখে চেপে ধরে অশুভ প্রসঙ্গটা বন্ধ করে দিয়েছিল শুক্লা। সুকুমার সেই সোনার করপল্লব সরিয়ে নেন নি। নিজের হাতে সে হাতখানা ঢেকে রেখেছিল।

ওই টিলা পাহাড়গুলির আড়ালে আড়ালে যে বেড়াবার জায়গা আছে, বসবার জায়গা আছে, সেই অখ্যাত অজ্ঞাত সুকুমারকে অনেক কিছু উপহার দিয়েছে অনেক সুখস্পর্শ আর সুখস্বপ্ন। কে জানতো অসুখের মধ্যেও এত সুখ।

'ওই মশাই চলুন দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।'

'হ্যাঁ চলুন।'

জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে সুকুমার সুধীরবাবুর পিছনে পিছনে চলল।

বেশ লম্বা ঘর। মাত্র গত বছর সুকুমার এখানে আসবার পর এটা তৈরী হয়েছে। দু দু'বার সুকুমাররা এখানে নাটক অভিনয় করেছে। একবার নায়কের ভূমিকায় আর একবার নায়িকার ভূমিকায়। এখানে রোগী আর রোগিণীদের প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে একসঙ্গে থিয়েটার করবার নিয়ম নেই। নেপথ্যলোকে যাই হোক না কেন, তাই ছেলেরা সমতল বুকে নারকেলের মালা কি নেকড়ার পুঁটুলি বেঁধে তরুণ-নরা হয়, মেয়েরা নকল দাড়ি গোঁফে পুরুষ সিংহ সাজে। এই রূপান্তরটা অবশ্য মন্দ লাগে না। শুক্লা যেবার সুকুমারকে তার শাড়ি পরতে দিয়েছিল, এই নিয়েও নাকি কথা হয়েছিল কত। সুধীরবাবুর অনুরোধে সুকুমার ভায়াসে উঠে বসল। সামনে একখানি টেবিল, তাতে ফুলদানি, এই স্যানাটরিয়ামের মালীই ফুল জুগিয়েছে।

পিছনে খান চারেক চেয়ার। গণ্যমান্যদের বসবার জন্যে। কয়েকজন ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাঁরা কেউ আসেননি। রোগদের কাজ-কর্মে ব্যস্ত। এখানকার সবচেয়ে পুরনো পেশেণ্ট বিপিন বিহারী বিশ্বাস। তাঁরই সভাপতি হবার কথা ছিল। কিন্তু কাল রাত থেকে হঠাৎ তাঁর শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে। বের কাশি দেখা দিয়াছে। কী করা যায়। শ্রোতাদের মধ্যে হরিপদ বাবু মশাই ছিলেন সামনের সারিতে। যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ সুধীরবাবু, তাঁকেই ধরে নিয়ে এসে সভাপতির চেয়ারে জোর করে বসিয়ে দিলেন।

হরিপদবাবুর গর্বও আছে, আবার লজ্জাও আছে।

তিনি সুধীরবাবুর দিকে চেয়ে বিকৃত ভাবে বললেন, 'মশাই, আমি যে জীবনে কোনদিন সভাপতিগিরি করিনি। একেবারেই কিছু বলতে-টলতে পারি না।'

সুধীরবাবু তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, 'আপনি যা বলবেন তাই যথেষ্ট। সুকুমারবাবুর কথা এখানে আপনার চেয়ে বেশি আর কে জানে। নেকস্ট ডোরও নয়, আপনি ছিলেন একেবারে ওঁর নেকস্ট ডোর নেবার। আপনি ওঁকে দিনে দেখেছেন রাত্রে দেখেছেন—।'

হরিপদবাবু বললেন, 'দেখব না কেন; কিন্তু যা যা দেখেছি তা কি আর সব বলতে পারব?'

সুকুমার আতঙ্কিত হয়ে উঠল। ভদ্রলোক সভার মধ্যেই বেফাঁস কিছু বলে বসবেন না তো?

হরিপদবাবু সুকুমারের দিকে তাকিয়ে বৌধহয় তাড়াতাড়ি সামনে নিয়ে কথাটা একটু ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মানে ভাষার ঝুলোবে না বুঝতে পেরেছেন ?'

সুধীরবাবু এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলবেন, 'যতটুকু ঝুলোর ততটুকুই বলবেন। বরং খুব সংক্ষেপে দুচার কথা বলে ছেড়ে দেবেন। বক্তৃতা কি আর কেউ শুনতে চায় মশাই! পেসেন্টই হোক সুস্থ লোকই হোক, আর বক্তৃতার সবাই ইমপেশেন্ট হয়ে ওঠে।'

হরিপদবাবু হেসে বললেন, 'লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে নিজেরা লোক তাড়াবেন না, দেখবেন, আমার জন্যে যেন দুচারজন শ্রোতা শেষ পর্যন্ত থাকে।'

সুধীরবাবু বললেন, 'এবার তাহলে সভার কাজ আরম্ভ করে দেওয়া যাক, আধঘণ্টা তো অপেক্ষা করে দেখলাম। এর চেয়ে বেশি লোক আর হবে না।'

সুকুমার সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল তার বিদায় সভায় বেশি লোক হয়নি ঠিকই। শ' তিনেক বেড আছে এই স্যানাটোরিয়ামে। কিন্তু যারা এসেছে শুনতিতে তারা জন তিরিশের মত, তার মধ্যে দশ বেশী হবে না। তার মধ্যে আবার দশ বারোটি বাচ্চা। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তারা সামনের চেয়ারগুলিতে বসে গোলমাল শুরু করেছে। মনে আছে প্রথমদিন এই স্যানাটোরিয়ামে শিশু পেসেন্টদের দেখে সুকুমারের মন কী খারাপই না হয়ে গিয়েছিল। এরাও পড়েছে রোগের কবলে। সে আজ সুস্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু এই এগারো মাসের মধ্যে ওদের বয়সী দু'তিন জনের মৃত্যু দেখেছে সুকুমার। আজকের এই সভায় যারা এসেছে তারা অবশ্য প্রায়ই সুস্থ হয়ে উঠেছে। অন্তত দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু এ রোগের কথা বলা যায় না। ভিতরের কীটগুলি আবার কখন কোন অতর্কিত মুহূর্তে কিলবিল করে উঠবে আর এই শুভ্র সুন্দর ফুলগুলিকে কেটে-কুটে ছারখার করে দেবে, তা যেন না হয়। ঈশ্বর তো মানে না সুকুমার। কিন্তু কার কাছে যেন মনে মনে প্রার্থনা জানাল—

'ইহাদেরে করো আশীর্বাদ
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র ফুলগুলি
নন্দনের এনেছে সংবাদ।'

এ সভায় ফিমেল ওয়ার্ডের পেসেন্ট কেউ আসেনি। নার্সরাও কেউ আসেনি। নিয়ম নেই আসবার। কিন্তু এর আগে সুকুমার নিজে উদ্যোগী হয়ে যে সব কেয়ার ওয়েল মীটিংএর আয়োজন করেছে তাতে অডিয়েন্স অনেক বেশী হয়েছে। সুধীরবাবুর তো তেমন অর্গানাইজ করবার ক্ষমতা নেই, এত বড় একটা হলঘর মিছিমিছি না নিলেই পারতেন। বারান্দায় শতরঞ্চি বিছিয়ে কি তিন নম্বর ওয়ার্ডের সামনের লনে এই সভা ডাকলেই হত। বড় ঘর নিয়ে তা ভরে তুলতে না পারলে ভারি খারাপ দেখায়। যাঁরা ডাকেন তাঁদেরও মান থাকে না, যার জন্যে ডাকা হয় তারও লজ্জা করে।

মাইক নেই, তার দরকারও নেই। সুধীরবাবুর গলার জোর আছে। তিনি শুরু করে দিলেন। "আমাদের বন্ধু শ্রীসুকুমার লাহিড়ীর এই বিদায় সম্বর্ধনার সভায় আমি প্রস্তাব করি আমাদের শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করে সভার কাজ পরিচালনা করবেন।'

অনিল সুর উঠে প্রস্তাব সমর্থন করল। ছেলেটির বয়স সুকুমারের চেয়েও কম। এসেছে তার চেয়ে মাস তিনেক আগে। আজও যাওয়ার অনুমতি পায়নি।

সেদিন বলছিল, সুকুমারদা, আপনি পরে এসে আগে চললেন। আমি যে কবে ছাড়া পাব—।'

উদ্বোধনী সঙ্গীতেরও ব্যবস্থা আছে। গাইল কুমারী রীণা সান্যাল। দশ এগারো বছর হবে মেয়েটির বয়স। ওকে এর আগে দেখেনি সুকুমার। কি দেখলেও লক্ষ্য করেনি। বোধ হয় নতুন এসেছে।

গানটি তো বেশ ভালোই বেছেছে। কে বেছে দিয়েছে কে জানে। সুধীরবাবুর অত বুদ্ধি আছে বলে তো মনে হয় না।

রীণা গাইতে লাগল, 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার যাওয়ার আগে।'

গলাটা মন্দ নয়। সুকুমারের কানে গানের এ কলিগুলিও খুব ভালো লাগতে লাগল, 'রং যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে—।'

তারপর মাল্যদানের পর্ব।

বারো বছরের ছেলেটি টিপু সুলতান—ওর আসল নামটা এখন আর মনে পড়ছে না—এ নামটা সুকুমার নিজেই ওকে দিয়েছিল। টিপু এল মালা নিয়ে, দুই ফুলের মালা। মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে টিপু বলল, 'সুকুমারদা, আমার মার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবেন তো? বাহারান অক্কুর লেন। মনে আছে?'

সুকুমার ওর গালটা টিপে দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই মনে আছে।' গিয়েই দেখা করব তোমার মার সঙ্গে।'

'আসতে বলবেন মাকে। বলবেন, আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে, নইলে আসবে না।'

সুকুমার বলল, 'দুষ্টু ছেলে।'

সুকুমারের মনে হল এসব ডায়াস-টায়াস না করে চালা আসর করাই ভাল ছিল। সবাইর সঙ্গে গল্পও করতে পারত, সুকুমার সবাইর গল্প শুনতেও পারত। বক্তৃতার চেয়ে তা ঢের ভাল হত।

হরিপদবাবু মালা পরে বেশ খুশি। মালাটায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতে লাগলেন। সুকুমারের মত মালাটা গলা থেকে খুলে রাখলেন না। মালাটা পরেই রইলেন।

সুকুমার মালা নামিয়ে রাখল টেবিলের উপর। তা দেখে সুধীরবাবু নিচু গলায় বললেন, সুকুমারবাবু, মালাটা কিন্তু ভুলে ফেলে যাবেন না। নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে।

সুকুমার হেসে বলল, 'আপনি গেঁথেছেন নাকি?'

সুধীরবাবু বললেন, 'ধরুন আমিই গেঁথেছি। কোমল হাতের গাঁথা নয় বলে দাম কম ভাববেন না। ছুঁচের খোঁচা খেতে খেতে আঙুল জখম হয়ে গেছে।'

সুকুমার বলল, 'এত কষ্টের যখন মালা, কলকাতা পর্যন্ত একে নেবই, নিয়ে মিউজিয়ামে রেখে দেব।'

বক্তৃতা দিতে উঠে সুধীরবাবু হরিপদবাবুর কথা মনে রাখলেন, বক্তৃতার পাখায় মশা তাড়াবার মত তিনি যাতে আগেই শ্রোতাদের না তাড়ান সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থেকে তিনি সংক্ষেপে ছুচার কথা বললেন। সুকুমারের কয়েকটি গুণপনার কথা উল্লেখ করলেন। সব বয়সের সব অবস্থার লোকেদের সঙ্গেই সে সমভাবে মিশেছে, নিজে সুস্থ থাকলে আশে-পাশের সকলের খোঁজ-খবর নিয়েছে। এখানে যত কিছু আনন্দ উৎসব হয়েছে—দুর্গা পুজো, সরস্বতী পুজো, রবীন্দ্র জয়ন্তী, নাটক অভিনয়, সুকুমার কোন কিছুতে পিছিয়ে থাকেনি, ডাকলেই এসে হাজির হয়েছে। যে ক'মাস লাইব্রেরীয়ান

হিসাবে কাজ করেছে সেখানেও তার সোগাতার পরিচয় দিয়েছে। নতুন করে বইগুলি সাজিয়েছে, বিষয় হিসাবে তালিকায় তৈরি করেছে, অনেক নতুন বই আর মাসিক পত্রিকা তার সময়ে লাইব্রেরীতে এসেছে। টাকা দিয়ে এনেছেন অবশ্য কর্তৃপক্ষই কিন্তু সুকুমারের কাছ থেকে বার বার তাগিদ না পেলে অত উৎসাহ কি তাঁদের থাকত?

শুনতে শুনতে ভারি অদ্ভুত লাগছিল সুকুমারের। নিজের নির্জলা প্রশংসা অবশ্য কান পেতে শুনতে অস্বস্তি লাগে। নিন্দার মত সামনা-সামনি প্রশংসা শোনাও সহজ ব্যাপার নয়। দুইই পরোক্ষে হওয়া ভালো। বিশেষ করে ভালো জিনিসের ছিঁটে-ফোঁটাই মধুর।

সুকুমারের দীর্ঘ আয়ু আর পূর্ণ স্বাস্থ্য কামনা করে সুধীরবাবু থামলেন। অনুরোধ জানালেন সুকুমার, যেন তাঁদের ভুলে না যায়। যেন দু'একখানা চিঠিপত্রে খোঁজ-খবর নেয়।

শুনতে শুনতে অনেক ভিন্ন ভিন্ন দিনের কথা, অনেক ছোট ছোট ঘটনার কথা মনে হচ্ছিল সুকুমারের। সাধারণভাবে অতীতকাল তাল পাকিয়ে পিণ্ডাকৃতি হয়ে থাকে। দিন মাস বছরে তাকে যেন আর ভাগ করা যায় না। শুধু ঘটনা দিয়ে আর সেই ঘটনাকে উপলক্ষ করে আনন্দ বিষাদ উল্লাস উত্তেজনা, রাগ দুঃখ, লজ্জা ভয় বৈরাগ্য কি আরো নামহীন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষণিক হৃদয়াবেগের সৃষ্টি হয়েছিল—তাদের কিছু কিছু কথা মনে করে সেই চিহ্ন ধরে ধরে অতীতের দিনগুলিকে, ক্ষণগুলিকে খানিক খানিক চেনা যায়। কিন্তু একেবারে অখণ্ডভাবে সবখানিকে ফিরে পাওয়া যায় না। সে দূর অতীতই হোক আর নিকট অতীতই হোক। আকাশের মেঘেরা সব একবার করেই আসে। যে মেঘ আজ উঠেছে সে মেঘ আর কাল উঠে না। সে বৈশাখী ঝড়ের কালো মেঘই হোক, আর ভাদ্র আশ্বিনের বিকেলের রঙীন মেঘই হোক—সবই আকাশের পটে শুধু একবারের জন্যেই আসে। পরদিন যাকে দেখা যায় সে পূর্বগামীর অনুরূপ হতে পারে কিন্তু অভিন্ন নয়।

'এবার আপনি কিছু বলুন সুকুমারবাবু। তারপরেই সভাপতিকে বলতে দেব। বেশি বক্তৃতা রাখিনি, লোকে এতেই বিরক্ত হচ্ছে।'

সুধীরবাবুর কথা শুনে সুকুমার চমকে উঠল। ভেসে উঠল যেন চিন্তার সমুদ্র থেকে।

লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমি আবার কী বলব।'

সুধীরবাবু বললেন, 'যা হয় বলুন দুচার কথা। একেবারে কিছু না বলাটা ভালো দেখায় না।'

বলবার জন্যে সুকুমার উঠে দাঁড়াতেই ছেলেরা এক সঙ্গে কলরব করে উঠল, 'বক্তৃতা নয় সুকুমারদা, আবৃত্তি করুন, আবৃত্তি করুন।'

পিছনের সারি থেকে বয়স্ক দু'একজন পেশেটও সায় দিলেন, 'হ্যাঁ মশাই, আবৃত্তিই ভালো।'

কিন্তু সভাপতির এতে সম্মতি নেই। তিনি বললেন, তাহলে আমার কথা আর কেউ শুনবে না মশাই। পদ্যের পরে কি আর গদ্য জমে? তাহলে বাধ্য হয়ে আমিও 'পাখি সব করে রব' আওড়াব। আর কোন পদ্য যে মুখস্থ নেই মশাই। আপনাদের মত তো আর তোতাপাখি হয়ে জন্মাই নি।'

সুধীরবাবু বললেন, 'ছেলেরা যখন শুনতে চাইছে করুন একটা আবৃত্তি।'

সুকুমার ছেলেদের দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'আচ্ছা তাই আবৃত্তিই হবে। তবে তার আগে দুটি কথা বলে নি।' একটি দুষ্ট ছেলে বলে উঠল, 'দুটি নয় একটি, আবৃত্তি বরং তিনটে করবেন।'

সুকুমার বলল, সুধীরবাবু যে সব সদ্‌গুণের পোশাক তার গায়ে পরিয়ে দিয়েছেন, তাতে তার নড়তে চড়তে কষ্ট হচ্ছে। আসলে ও সব গুণের কিছুই তার নেই। থাকলেও কণিকা মাত্র আছে। সুধীরবাবু তাকেই টেলিস্কোপ দিয়ে দেখেছেন। এই সভার আয়োজনের জন্যে তাঁকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানায় সুকুমার। সেই সঙ্গে আশা করি এই রকম কেয়ারওয়েল মীটিং যেন ঘন ঘন হয়। সব পেসেন্টই যেন খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে পারে। বিদায়ের দিনে এখানকার কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ জানায়। টি. বি. রোগের জন্যে এই ধরনের সম্পূর্ণ নূতন চিকিৎসা আর শুশ্রূষালয় বাংলাদেশে সুকুমার যতদূর জানে—তাঁরাই প্রথম গড়ে তুলেছেন। সরকারী সাহায্য এসেছে তার পরে। হাজার হাজার দুঃস্থ উদ্বাস্তু রোগী এখানে ওষুধ পাচ্ছে, পথ্য পাচ্ছে, শুশ্রূষা পাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই সারা দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন। যদি ছোট ছোট সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়ে তাঁদের সঙ্গে সুকুমারদের কিছু মতান্তর কথান্তর হয়ে থাকে সে কথা যেন তাঁরা মনে না রাখেন। তাঁদের পরিচালনা আরো নির্দোষ হোক, সম্পূর্ণ ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত হোক, দেশের লোক মুক্তকণ্ঠে তাঁদের জয়ধ্বনি করবে।

সুবক্তা সুকুমার। কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে, ছাত্র সংঘের সভায় বক্তৃতা দেওয়া তার অভ্যাস ছিল। বাধা রাজনৈতিক মঞ্চেও দু' একবার সে ওঠানামা করেছে। কথাগুলি সে বেশ গুছিয়ে বলতে পারল। তার বক্তব্য শেষ হওয়ার পরেও হাততালি কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ হল না।

সুধীরবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'বেশ বলেছেন মশাই। শেষে ওই খোঁচাটুকু দিয়ে ভালোই করেছেন তবে আপনি তো পগার পার হয়ে চললেন, ভুগব আমরা, জবাবদিহি আমাদেরই করতে হবে।'

সুকুমার বলতে যাচ্ছিল, টিপু সুলতান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ও কি সুকুমারদা, বসলে চলবে না। আপনি ফাঁকি দিয়ে একটি কথা বলব বলে একশ কথা বলে নিলেন। এবার অন্তত একটি কবিতা আবৃত্তি করুন।'

সভাপতি করুণ মুখে বললেন, 'করুন করুন,।'

সুকুমার শুরু করল—

'ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দার মালিকা
হে মঘোন, নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টীকা
মলিন ললাটে। পুণ্যবল হল ক্ষীণ
আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন
হে দেব, হে দেবীগণ।'

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'দেবীগণ কারা বুঝতে পেরেছ?'

'ছিঃ থামো।'

সুকুমারের মনটাও ছি ছি করে উঠল। এই কবিতাটি বেছে বড় ভুল করেছে সে। ভাবেনি এর অন্য রকম অর্থ হতে পারে। তাছাড়া সত্যি সত্যিই তো হাসপাতাল তার কাছে স্বর্গলোক নয়, হওয়া উচিতও নয়। স্বর্গএর বাইরে যেখানে কর্মক্ষেত্র। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুই বীরের স্পৃহা। এখানে এই হাসপাতালে কোটি কোটি বীজাণু শত্রুর আক্রমণে পরাজিত পর্যুদস্ত সৈনিকের যে রক্তাক্ত মৃত্যু তাতে গৌরব কোথায়।

সুকুমার লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হেসে বলল, এটা থাক আজ 'একটা কবিতা বলি।'

এ লজ্জা যেন টিপু সুলতানেরও। সে বলল, 'ভুলে গেছেন নাকি সুকুমারদা? এক ছুটে গিয়ে সকলিতাখানা নিয়ে আসব? আমার কাছে আছে। মা যে সেবার আমার জন্মদিনে এনেছিলেন। তিনি দিয়ে গেছেন। নিয়ে আসব?'

সুকুমার বলল, 'না না না। থাক, আনতে হবে না। আর একটা বলছি।'

কে যেন বলল, 'তাহলে তাজমহল করুন।'

আর একজন বলল, 'ঘেরতার গ্রাসটাই জমবে ভালো।'

টিপু সুলতান বলল, বলেই যখন নিজেন সুকুমারদা, তাহলে ওইটা বলুন—'পদ্ম নদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে'—

সুকুমার টিপুর অনুরোধ রক্ষা করল :

'দেখিতে দেখিতে ওরুর মনে
জাগিয়া উঠিল শিখ
নির্ভয় নির্ভীক।'

এরপর সভাপতি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি একটু কেসে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'ইয়ে, সুকুমারবাবু গন্ডে পদ্যে আপনাদের যা শোনালেন তারপর আমি আর কী বলব, আর আপনারাই বা কী শুনবেন। কিছু আরম্ভ করলেই আপনারা অমনি মনে মনে বলবেন বলে পড়ুন স্যার, বলে পড়ুন। কেউ বা পিছনের দোর দিয়ে পালাবার জন্যে পা বাড়াবেন। আমি তাই কিছু বলব না, ভয় নেই আপনাদের। দুটি একটি কথা বলতে গিয়ে সুকুমারবাবুর মতো একশ গজ লম্বা বক্তৃতা দেব না। আমরা শুধু পাকা চুলে বুড়ো, পড়া দাঁতে বুড়ো, আসল বুড়ো সুকুমারবাবু। জ্ঞানে আর গুণে থুরথুরে। আমি ওঁর কাছে শিশু। তাই একটি শিশুপাঠ্য কবিতা আপনাদের কাছে মুখস্থ বলছি। শুনুন।'

এর পর হরিপদবাবু সত্যি সত্যিই শুরু করলেন—

'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।'

দ্বিতীয় লাইনটি বলবার আগেই সবাই হো হো করে হেসে উঠল। ছেলেমেয়েরাই হাসতে লাগল বেশি। তাদের সেই তুমুল হাস্তরোলের মধ্যে বিদায়সভা শেষ হল।

সুকুমার ভাবল, এই ভালো হল। এ বিদায় তো অশ্রুজলের বিদায় হবার কথা নয়। এ বিদায় আনন্দ, কোলাহলের। দু'এক ফোঁটা অশ্রু যদি বা এসে পড়তে চায় তাকে লুকিয়ে রাখতে হবে, তাকে গোপন করে রাখতে হবে।

হরিপদবাবু যে এত রসিক তাঁর পাশাপাশি শয্যায় এতদিন কাটিয়েও সুকুমার তো তা এমন করে টের পায়নি। অসুখের বাড়াবাড়ির সময় এই বৃদ্ধকে মৃত্যুভয়ে ছটফট করতেই সে দেখেছে। সেই রোগযন্ত্রণার মধ্যে কোথায় লুকিয়েছিল এই রসনিঝরিনী? মানুষের বিশেষ পরিচয় কি এ ধরনের বিশেষ বিশেষ উপলক্ষের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে? যত সাধারণ মানুষই হোক তাকে চেনা জানা কি কোনদিনই শেষ হয় না?

ওয়ার্ডে ফিরে এসে ফের ওস্তাকে দেখতে পেল সুকুমার। দেখে খুশি হল। আজ যেন ওকে আরো বেশি সুন্দর লাগছে। ছেড়ে যেতে হবে বলেই কি। বিদায়পতি বললেন, 'নয়ন না তিরপিত

ভেদ।' দেখে দেখে তৃপ্তি নেই। বুকভরা তৃষ্ণা, চোখভরা অতৃপ্তি নিয়েই এখান থেকে চলে যেতে হবে।

গুরা বলল, 'আপনার স্যুটকেশ গুছিয়ে রেখেছি।'

সুকুমার বলল, 'বিদায় দেওয়ার জন্যে খুব বুঝি ব্যস্ত?'

গুরা বলল, 'তা ছাড়া কি। পেসেন্টকে সুস্থ করে ঘরে পাঠাতে পারলেই তো আমাদের দায় শেষ হয়।'

সুকুমার বলল, 'কিন্তু পেসেন্টের স্যুটকেসে হাত দিয়েছেন যে। আপনার তো ভারি সাহস।'

গুরা বলল, 'একটু সাহস তো রাখতেই হয়। আমাদের পেসেন্টরা মাঝে মাঝে যা নার্ভাস হয়ে পড়ে—। আচ্ছা প্রথম কবিতাটা আরম্ভ করে অমন ছেড়ে দিলেন কেন? বেশ তো হচ্ছিল।'

'আপনি শুনছিলেন বুঝি?'

গুরা বলল, 'হাঁ।, এক ফাঁকে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে একটু শুনে এলাম। আপনি যে কী ভীরু তার প্রমাণও পেয়ে এলাম। শেষে একটা বীররসের কবিতা রিসাইট করলে কি হবে—আপনার ভীরুতা তাতে ঢাকা পড়েনি।'

এ গঞ্জনা হাসিমুখে সহ্য করল সুকুমার। ডিউটি ফেলে গুরা যে তার আবৃত্তি শুনে এসেছে এই আনন্দ সংবাদের কাছে সব নিন্দা মন্দই তুচ্ছ।

সময় আর বেশি নাই। তাড়াতাড়ি স্নান করে ডাইনিংরুমে গিয়ে খেয়ে নিল সুকুমার। খাবার ঘরে অনেক পরিচিত মুখকে দেখতে পেল না। অনেক অপরিচিতের সঙ্গে মুখোমুখি হল।

ওয়ার্ডে গুরার ডিউটি তখনো শেষ হয়নি। শেষ হবে সেই দুটোয়। তার অনেক আগেই সুকুমার কলকাতাগামী গাড়িতে উঠে বসবে।

তবু এই ওয়ার্ডে ডিউটি পড়েছে বলে কয়েকবার দেখা হল। যাবার দিনেও বেশ কিছুক্ষণের জন্যে তারা একসঙ্গে থাকতে পারল। গুরা কি চেষ্টা করে ইচ্ছা করে এই ব্যবস্থা করেছে?

গুরা সতের আর আঠের নম্বর বেডের পেসেন্টকে ওষুধ খাইয়ে তবে এদিকে এল।

সুকুমারের দিকে চেয়ে বলল, 'এখুনি তো বেরোবেন? তার হাতে ঘড়ি নেই। গুরা নিজের হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'তাহলে আর দেরি করবেন না। রিকশায় স্টেশন পর্যন্ত যেতেও তো সময় লাগবে।'

সুকুমার কোন কথা বলল না।

একটি পেসেন্ট ডাকল, 'নার্স এদিকে আসুন।'

সকালের সেই হিংসুটে রোগীটি।

যাওয়ার আগে গুরা বলল, স্যুটকেসের মধ্যে একটা কৌটোয় খাবার রইল। মনে করে—। ভিতরে একটা চাদর রয়েছে গাড়িতে পেতে বসবার জন্যে।'

পেসেন্টটি আবার ডাকল, 'নার্স।'

গুরা তার দিকে এগিয়ে গেল।

হরিপদবাবু বললেন, 'তাহলে সত্যিই চললেন সুকুমারবাবু! গিয়ে কিন্তু ওদের একটা খোঁজ নেবেন মশাই, ভুলে যাবেন না। সত্যি ভারি ভাবনা হয় ওদের জন্যে। কী করে যে ওদের চলছে কে

জানে। আমি তো দিব্যি রাজার হালে আছি। ১৭০৲ টাকা করে সরকারী সাহায্য পাচ্ছি। কিন্তু ওরা—। আপনি গিয়েই কিন্তু একটা খবর নেবেন।'

সুটকেসটা হাতে তুলে নিল সুকুমার। যখন আসে বিছানা ছিল না সঙ্গে। বিছানা তো এখানেই আছে। একটা চাদর নিয়ে এসেছিল। সেটা ছিঁড়ে গেছে। আর যা আছে সুটকেসেই তা ধরে যায়। কিছু বইপত্র এখানকার লাইব্রেরীতে সুকুমার উপহার দিয়েছে। তবু একটু স্মৃতি থাকবে। কোন কোন বইয়ের পাতায় থাকবে নিজের হাতের লেখা নাম, কোন কোন বইয়ের পাতায় আর একজনের হাতের।

দোরের দিকে যাওয়ার আগে হঠাৎ কি মনে হল সুকুমারের। সুটকেসটা নামিয়ে রেখে হঠাৎ নিচু হয়ে হরিপদবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে বসল।

দু'পা পিছিয়ে গিয়ে জিভ কেটে হরিপদবাবু বললেন, 'এ কী এ কী! আপনি বামুনের ছেলে, আমি কায়েতের বাচ্চা। এ কী করলেন মশাই।'

সুকুমার বলল, 'তা হোক। আপনি আমার বাবার বয়সী। জানেন, বাবাকে কোনদিন দেখিনি।'

হরিপদবাবু এগিয়ে এসে সুকুমারের পিঠে হাত রেখে বললেন, 'গিয়ে চিঠি দিয়ো। সাবধান মত থেকো, ভালো খাওয়া-দাওয়া কোরো ঘর কোরো, শরীরের।'

হঠাৎ ছল ছল করে উঠল হরিপদবাবুর চোখ।

সুকুমার সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আরো দুটি চোখকে একটু খুঁজল। কিন্তু সেই চোখ দুটি অন্য রোগীদের বুকে নিবদ্ধ। ডিউটিতে বড় ব্যস্ত শুক্লা।

সুকুমার বেরোতে বেরোতে ভাবল কেন কাছে এল না শুক্লা, বিদায়ের মুহূর্তটিতে কেন চোখে চোখে তাকাল না। পাছে ওর ভিজে চোখ আর পাঁচজনের চোখে পড়ে? তখন খুব যে সাহসের কথা বলছিল শুক্লা? এই কি তার সাহসের নমুনা? কিন্তু আর একটু সাহস দেখাতে পারত শুক্লা। ওয়ার্ডের বাইরে যেখানে রিকশাটা এসে দাঁড়িয়েছে সেই পর্যন্ত আসতে পারত, তার চলে যাওয়াটুকু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে পারত। কিন্তু অত সাহস নেই শুক্লার। সত্যিই কি চোখের জলের ভয় না চক্ষু লজ্জার ভয়? লোকনিন্দা আর চাকরির ভয় কিনা কে জানে।

সুধীরবাবুর দাক্ষিণ্যের তুলনা নেই। তিনি এই রোদের মধ্যে সুকুমারের সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত যাবেন। বিশেষ অনুমতি নিয়ে রেখেছেন।

সুকুমার তাঁর পাশে রিকশায় উঠে বসল। ডাক্তারদের কাছে আগেই বিদায় নিয়ে রেখেছে।

সুধীরবাবু বললেন, 'কিবেল ওয়ার্ডের সামনে দিয়ে চলুন। কী বলুন সুকুমারবাবু। ওঁরা নিশ্চয়ই বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াবেন। কথা না বলেও দেখাটা তো নিশ্চয়ই হবে। ওঁরা নিশ্চয়ই আপনার জন্যে অপেক্ষা করবেন। মেয়েরা গুণীদের ভালোবাসে, বীরদের ভালোবাসে, বাক্যবীরদেরও বেশ পছন্দ করে।'

সুকুমার বলল, 'আপনি জানলেন কী করে! আপনি তো শুনেছি বিয়ে-থা করেননি।'

সুধীরবাবু বললেন, 'সে তো আপনিও করেননি। তাই বলে কি আপনার অভিজ্ঞতা কিছু কম?'

সুকুমার লজ্জিত হয়ে বলল, 'কী যে বলেন।'

সুধীরবাবু বললেন, 'চের চের মানুষ দেখেছি মশাই, আপনার মত এমন লেডীজ-ম্যান আর দ্বিতীয়টি দেখিনি।'

ডঃ কর আর ডঃ চন্দ দ্রুতবেগে তিন নম্বর ওয়ার্ডের দিকে যাচ্ছেন।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

সুধীরবাবু বললেন, 'জানেন না বুঝি? কাল যে পেসেন্টটির অপারেশন হয়েছে তার অবস্থা ভালো না। কে জানে হয়তো আজও হয়ে যেতে পারে। অবশ্য একেবারে শেষ অবস্থাতেই এখানেই নিয়ে আসা হয়েছিল।'

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল সুকুমারের। একটু আগে তার বিদায় সভায় কত বক্তৃতা আবৃত্তি গান হাস্যকৌতুক আর হাততালির ঘটাই না হয়েছে। কিন্তু যে চিরদিনের জন্যে সত্যি সত্যিই বিদায় নিচ্ছে সে চলেছে নিঃশব্দে। এই নিয়ম এখানকার। শুধু এখানকার কেন, এই পৃথিবীর। মৃত্যুর রহস্যময় আঁধার যবনিকা কোনদিনই কি মানুষের চোখের সামনে থেকে সরে যাবে? বিজ্ঞান কি মর্মভেদ করতে পারবে তার? মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পারবে কোনদিন? মৃতজনকে সত্যিই প্রাণ ফিরিয়ে এনে দিতে পারবে? তা যতদিন না পারবে ততদিন বিজ্ঞানের ওপর সেটা ফিজিক্সের জয়। জন্মমৃত্যুর দুই রহস্যদ্বার সেই আগলেই রাখবে।

কিমেল ওয়ার্ডের বারান্দায় সত্যিই কয়েকজন পেশেন্টকে দেখতে পেল সুকুমার। নার্সরাও কেউ কেউ আছে। যাদের ডিউটি নেই তারা রঙীন শাড়ী পরে এসেছে। দীপালি আর মালাকে গৃহকন্যার বেশে বেশ দেখাচ্ছে। ওরা দুজনেই সুকুমারের দিকে চেয়ে একটু হাসল। সুকুমার লক্ষ্য করে দেখল আর কেউ এসেছে কিনা। না আসেনি। সে ওয়ার্ডে ডিউটি দিচ্ছে।

আরো খানিকটা এগিয়ে ডানদিকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস। এখানে অ্যানাটোরিয়ামের সেক্রেটারিয়েট, ক্যাস ডিপার্টমেন্ট, একাউন্টস ডিপার্টমেন্ট—সব।

সুধীরবাবু বললেন, 'শৈলনবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে যাবেন নাকি?'

সুকুমার বলল, 'আপনি তো মশাই মহা রসিক। লোকে আগে তেতো খেতে বলে পরে মিঠে। আর আপনি আগে এত মিঠাই মণ্ডা খাইয়ে শেষে চিরতার জল নিয়ে সাধাসাধি করছেন?'

সুধীরবাবু হেসে বললেন, 'আগেই হোক পরেই হোক চিরতার জল ভালো মশাই, কৃমি-নাশক। না না দেখা করে যান। দেখা করে না যাওয়াটাই অভদ্রতা হবে। উনি আমাদের হলের ব্যবস্থাটা করে দিয়েছেন। একটা ধন্যবাদ ওর প্রাপ্য। তা ছাড়া এখানকার ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ব্যক্তি। কখন কি দরকার-টরকার হয়—।'

সুকুমার বলল, 'মানে আবার যদি ফিরে আসতে হয়—!'

সুধীরবাবু বললেন, 'কী যে বলেন!'

অফিসের সামনে রিকশাওয়ালাকে থামতে বলে সুকুমার সুধীরবাবুর সঙ্গে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। বেশ একখানা ঘরে দশ বারোজন কেরানী কাজ করছেন। ওরই মধ্যে উত্তর দিকের দেয়াল ঘেঁষে মাঝারি ধরনের একখানা সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বসে কিসের হিসাব মিলাচ্ছিলেন শৈলেন দত্ত। সুধীরবাবু সুকুমারকে নিয়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। হিসাবটা বোধ হয় জরুরী ছিল। শৈলেনবাবু

ওদের মিনিট খানেক দাঁড় করিয়ে রাখলেন। হাতের কাজটুকু শেষ করে তাকালেন ওদের দিকে। বললেন, 'কী ব্যাপার।'

তারপর যেন পুরোপুরি চিনতে পেরে বললেন, 'ও আপনারা? বসুন।'

কাগজপত্র ডাউচারগুলি সরিয়ে রাখলেন শৈলেনবাবু।

তাঁর সামনে একখানি চেয়ার ছিল, আর একখানি চেয়ার বেয়ারাকে দিয়ে আনিয়ে নিলেন শৈলেনবাবু। সুধীরবাবু বসলেন, সুকুমারও বসল। কালো মোটাসোটা চেহারা শৈলেনবাবুর। সুকুমার ওঁকে আগেও দেখেছেন। ইদানীং যেন আরো একটু মোটা হয়েছেন। গায়ের রং কালো। কিন্তু পোশাকের রং সাদা। ট্রপিক্যাল শার্ট বেশ একটু স্মার্ট হবার চেষ্টা করেছেন শৈলেনবাবু। বয়স চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশের কম হবে না। দেখায় আরো বেশি। গোলগাল মুখ। পুরু ঠোঁট। সৌন্দর্যের বিচারে সুকুমারের কাছে নিশ্চয়ই হার মানেন। কিন্তু স্বাস্থ্য, যেন লোহা দিয়ে গড়া শরীর। অটুট স্বাস্থ্য শৈলেনবাবুর। স্বাস্থ্য আর দৈহিক শক্তির প্রতিযোগিতায় সুকুমার ওঁর অনেক পিছনে পড়ে থাকবে। ভদ্রলোকের রূপ যেমন নেই, তেমনি রসবোধও নেই। এক লাইন কবিতা মুখস্থ বলতে পারবেন না। এক লাইন লিখতে গেলে ইংরেজীই হোক, বাংলাই হোক তিনটে ভুল করবেন। কিন্তু তাতে কি এসে যায়। ওঁর এখানে পাকা চাকরি, প্রভাব-প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি আরো পাকা। বিষয়বুদ্ধি নিশ্ছিদ্র। সুকুমার সব জেনে-শুনেই যাচ্ছে, তবু। যে কোন মুহূর্তে কের ওঁর খপ্পরে গিয়ে পড়তে পারে এবং পড়লে আর বেরিয়ে নাও আসতে পারে।

সুধীরবাবু বললেন, 'সুকুমারবাবু তো আজ চলে যাচ্ছেন।'

শৈলেনবাবু হেসে বললেন, 'জানি। প্যাসেজমানির ভাউচার তো আমিই পাস করে দিলাম? একাউন্টট্যাণ্ট মিঃ মেহানদীশ তো ছুটিতে আছেন। সবারই বেলায় এটা কনসিডার করা হয় না।'

সুধীরবাবু বললেন, 'তাতো বটেই। ছলটাও আপনার জন্যই গেলাম। আমাদের কাংশন কিন্তু মন্দ হয়নি। আপনি গেলেন না স্যার, গেলে আমাদের আরো আনন্দ হত।'

শৈলেনবাবু বললেন, 'অত সময় কোথায়? কী যে কাজের চাপ পড়েছে আপনি ভাবতে পারবেন না। যাকগে সুকুমারবাবু তো আবার আসছেন।'

মৃদু হাসলেন শৈলেনবাবু।

সুকুমার চমকে উঠল, 'আসছে মানে?'

শৈলেনবাবু তেমনি হাসিমুখে বললেন, 'পেসেণ্ট হিসেবে নয়, ভিজিটর হিসেবে আসতেও তো পারেন। আপনার তো এখানে অনেক বন্ধুবান্ধব, তাঁদের দেখতে আসবেন। আমাদের রেস্ট হাউস আছে। থাকবার তো কোন অসুবিধে নেই।'

একটু কি ব্যঙ্গ আছে ওই হাসির মধ্যে? পরিহাস? না কি সুস্থ আর কোন ইঙ্গিত?

সুকুমার এবার উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালো আর বলল, 'চলি। আর বেশি দেরি করলে ট্রেন ফেল করব। আপনার নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ।'

স্নেহমাখা তাঁর যে সুকুমারের মুখেও আছে তাই একটু দেখিয়ে দিল। অত ভয় কিসের এখন?

সুধীরবাবু তাকে নিয়ে কের রিকশায় উঠলেন। সাইকেল রিকশা। স্টেশন পর্যন্ত এখানে এই দ্বিচক্রযানই একমাত্র বাহন।

ডানদিকে ফাঁকা জমিটায় আরো ওয়ার্ড তৈরি হচ্ছে, কোয়ার্টার তৈরি হচ্ছে। স্যানাটোরিয়াম চারদিকে তার ডালপালা ছড়াচ্ছে। সুকুমার দেখতে দেখতে চলল। এই রঙের হাট আস্তে আস্তে বেশ একটা টাউন হয়ে উঠবে। এখনই উঠেছে। গেটের বাইরে রাস্তার দুদিকে দোকানপাট বসে গেছে। স্থানীয় লোকদের কারো কারো জীবিকার ব্যবস্থা হয়েছে।

মেইন গেটের বাইরে এসে আবার একটু পিছন ফিরে তাকাল সুকুমার। সবুজ দুটি দেবদারু গাছ স্যানাটোরিয়ামের স্থায়ী তোরণ রচনা করেছে। তার মধ্যে সাদা বাড়ি। সাইনবোর্ডে অলঙ্কৃত অক্ষরে বাংলায় লেখা 'শুশ্রূষা-নিলয়'। নিচে জায়গার নাম রঙের হাট।

এই নাম সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী আছে। যাই হোক নামটা কিন্তু অদ্ভুতভাবে মানিয়ে গেছে। রঙের হাটই বটে। এখানে মৃত্যুর নিকষ কালো রঙ আছে—টি. বি. রোগীর গলা থেকে প্রপাতের মত ঝরে পড়া রক্তের রঙ আছে, আবার রোগপাণ্ডুর মুখে অসুস্থতার আরক্ত আভাসেরও অভাব নেই।

স্টেশন পর্যন্ত পীচ বাঁধানো পাকা রাস্তা। এই স্যানাটোরিয়ামের জন্যেই হয়েছে। ডাইনে দিগন্তবিসারি প্রান্তর। বাঁয়ে লাল মাটির উঁচু নিচু ঢেউ। ওপরে রৌদ্রোজ্জ্বল নীল আকাশ। যেন অতি বিশাল একটি উপুড় হয়ে এই রোগক্লিষ্ট হাসপাতালটিকে পরম মমতায় চারদিক থেকে স্নেহ আশ্রয় দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

সত্যি এই মনোরম দৃশ্যও ছেড়ে হঠাৎ যেন চলে যেতে ইচ্ছা করে। রোগভোগের মধ্যে এই বিসদৃশ সম্ভোগের জাদু কে লুকিয়ে রেখেছে এখানে? স্যানাটোরিয়ামের কর্তৃপক্ষ? না কি আর কেউ?

পরপর দুখানা কালো রঙের মোটর গাড়ি সবেগে হাসপাতালের দিকে চলল। বোধ হয় কোন সম্ভ্রান্ত ভিজিটর এসে থাকবেন। তাঁরা তো প্রায়ই আসছেন। তারপর পথ ছেড়ে দিতে হল একটি গরুর গাড়িকে। একটি চাষী মুসলমান বাইরে বসে রয়েছে। পরনে খয়েরী রঙের লুঙ্গি। গায়ে আধময়লা গেঞ্জি। ভিতরে স্ত্রীলোক আছে বলে মনে হল। হয়তো রুগ্না স্ত্রীকে দেখাতে নিয়ে চলেছে। কে জানে কেমন আছে ওর স্ত্রী। লোকটি তো বাইরে বসে হুঁকো টানছে আর নিবিষ্ট মনে কী যেন ভাবছে।

সুকুমার দেখতে দেখতে চলল।

মাঠের প্রান্তে মাঝে মাঝে তালগাছের সারি। খানিকটা এগিয়ে ছোট ছোট শালের বন। গাছগুলিকে শাল্মলী বলা চলে না। ছোট ছোট গাছ। তবু ভিতরে ঢুকলে হারিয়ে যাওয়া যায়। হারিয়ে যাওয়ার নেশা মানা—মনে মনে। শুক্লাকে একদিন বলেছিল, 'যাবে একদিন ওই শালবনের মধ্যে হারিয়ে?'

শুক্লা বলেছিল, 'না বাবা অত কবিত্বে কাজ নেই। শেষে সাপ বাঘের পেটে চিরকালের মত হারিয়ে যেতে হবে। তাহলে আমার এই পেশেন্টটিকে দেখবে কে?'

সুকুমার বলেছিল তোমার পেশেন্ট কি একা একা হাসপাতালের শয্যায় পড়ে থাকবে নাকি? সেও তোমার সহযাত্রী হয়ে বাঘিনীর পেটে গিয়ে তোমার সহোদর হবে।'

শুক্লা একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'সত্যি বোন হয়ে ভালো বাসতে পারলে এত জ্বালা থাকত না। ভাই বোনের ভালোবাসা বাপ মেয়ের ভালোবাসা দুই বন্ধুর ভালোবাসা কত পবিত্র, কত স্নিগ্ধ। তাতে কোন জ্বালা নেই। কিন্তু এ ভালোবাসায় এত জ্বালা কেন বলোতো, এও যেন এক রোগ। যেন এক ধরনের টিউবারকিউলোসিস।'

সত্যিই কি তাই। কয় রোগীরাই নাকি বেশি করে প্রেমে পড়ে। তাদের ধ্বংস করবার জন্যেই নাকি তাদের বাসনা কামনা অস্বাভাবিক উগ্র হয়ে উঠে। তীব্র বাসনা আর মৃত্যুর মধ্যে সত্যি যেন সাদৃশ্য আছে। দুইই দুশ্চিকিৎস্য, দুইই রাজ ব্যাধি।

সুধীরবাবুর গলা শুনে চমকে উঠল সুকুমার। 'এই যে আমরা এসে গেছি। নামুন এবার। সারাটা পথ একেবারে ভাবনা সমুদ্রে ডুব দিয়ে রইলেন সুকুমারবাবু। আপনার আর হদিশই পাওয়া গেল না। আপনার রকম-সকম দেখে আদি আর ডিস্টার্ব করিনি আপনাকে। মনে হল যেন মনে মনে কবিতার ছন্দ মিলাতে মিলাতে চলেছেন। কোন কথা বললেই সেটা বাড়তি হয়ে যাবে। আপনার চতুর্দশপদীর মধ্যে অনাবশ্যকভাবে কতকগুলি অর্থহীন পদ এসে জায়গা জুড়ে বসে থাকবে, দরকার কি ছন্দভঙ্গের অভিসম্পাত কুড়িয়ে, তাই আপনাকে কুড়িয়ে।'

সুকুমার লজ্জিত হল। এই আড়াই মাইল পথ রিকশায় আসতে আসতে দুটি কি একটির বেশি সে কথা বলেনি সুধীরবাবুর সঙ্গে। অথচ ভদ্রলোক তাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যেই অসুস্থ শরীর নিয়ে এতদূর পর্যন্ত এসেছেন। ভাবতে এখন ভারি খারাপ লাগছে সুকুমারের। এই মানুষটি তাঁর আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ নেওয়ার জন্যে সুকুমারকে অনুরোধ করেননি। প্রীতির কোন প্রতিদান চাননি। সুকুমার যতদূর শুনেছে যতদূর তার অনুমান তিনি তার মত স্বজনহীন নন। নিশ্চয়ই কে কে যেন আছে। তাদের কারো সম্বন্ধে কি কোন দুঃখও জড়িয়ে আছে ওঁর মনে? কে জানে? সুধীরবাবু ভারি চাপা মানুষ। মনের কথা সহজে কাউকে বলেন না। অন্তত সুকুমার তো কিছুই শুনতে পায়নি। ওঁর কথা প্রায় সবই অজানা রয়ে গেল। সুকুমারের গর্ব ছিল সে এই হাসপাতালের অনেক রোগীর অনেক নার্সের এমন কি কোন কোন ডাক্তারেরও জীবনের কথা জানে। সে গর্ব যে কত মিথ্যা আজ তার প্রমাণ হয়ে গেল। সে এই পাশের মানুষটির, কাছের মানুষটির প্রায় কোন কথাই জানে না।

দেখ কাণ্ড, সুকুমারের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ভদ্রলোক নিজেই রিকশা ভাড়া বারো আনা দিয়ে দিলেন।

সুকুমার বলল, 'ও কি সুধীরবাবু, না না, তা হবে না। আপনি কেন দেবেন।'

সুধীরবাবু হেসে বললেন, 'একদিনই তো। রোজ তো আর দেব না আপনাকে। দিন তো, টিকেটটা কেটে নিয়ে আসি। আর বোধ হয় মিনিট দশেক সময় আছে। কিন্তু লোকজনের যে তেমন ভিড় দেখছিনে। ব্যাপারটা কি! আজ কি এখান থেকে প্যাসেঞ্জার বেশি যাবে না?'

ব্যাগ থেকে দশ টাকার একখানা নোট বের করে দিল সুকুমার।

সুধীরবাবু বললেন, 'থার্ডক্লাস তো?'

সুকুমার হেসে বলল, তাছাড়া কি। এদিক থেকে আমরা প্রত্যেকেই এক একজন মহাত্মা গান্ধী। যেহেতু ফোর্থ ক্লাস নেই। তাই থার্ড ক্লাস।'

সুধীরবাবু হেসে টিকেট কাটতে চলে গেলেন।

সুকুমার রোদ থেকে সরে প্লাটফর্মের ভিতরে চলে এল। এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গীকে বলছেন, 'গাড়ি নাকি দু ঘণ্টা লেট। নাকে মুখে কোন রকমে দুটো গুঁজে ছুটতে ছুটতে এলাম। এখন শুনি গাড়ি দু ঘণ্টা লেট। আমি যদি দু মিনিট লেট হতাম গাড়ি কি আমার জন্যে দাঁড়াত?'

ভদ্রলোকের সঙ্গী হেসে বললেন, দু সেকেণ্ডও দাঁড়াত না। দেখুন দু ঘণ্টা নাকি আরো বেশি। এরা বলবার সময় কম করে বলে। পাছে প্যাসেঞ্জারদের পিলে চমকে যায়।'

গাড়ি লেট শুনে সুকুমারের মনও খারাপ হয়ে গেল। স্টেশনে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার মত বিরক্তিকর অবস্থা আর নেই।

একটু বাদে সুধীরবাবুও টিকেট নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। সুকুমারের হাতে টিকেট আর চেঞ্জটা দিয়ে বললেন, 'মশাই আমরা মিছিমিছিই ছুটোছুটি করলাম। শুনছেন তো গাড়ি ঘণ্টাখানেক লেট।

সুকুমার বলল, 'শুনেছি।'

সুধীরবাবু বললেন, 'তাহলে কী করবেন তাই দেখুন। আমি বলি কি আজ আর গিয়ে কাজ নেই। প্রথমেই যখন বাধা পেয়ে গাড়ি দেখতে হবে। টিকেটটা ফেরত দিয়ে চলুন যাই। শুশ্রূষা-নিলয়ের আরো একদিনের শুশ্রূষা পেয়ে আসুন।'

সুধীরবাবু খুব ভদ্র। তাই বোধ হয় শুশ্রূষাকারিণীর নামটি উচ্চারণ করলেন না। একবারের জন্যে মনটা একটু দুলে উঠল সুকুমারের। সত্যি যাবে নাকি ফিরে? দুটোর সময় শুক্লার ডিউটি শেষ হয়ে যাবে। আরো একটি বিকেল পাহাড়তলীতে বেড়াতে যেতে পারবে সুকুমার। সে একটু আগে গিয়ে অপেক্ষা করবে। শুক্লা যাবে পরে। রঙের হাট আর একটি অতিরিক্ত অপ্রত্যাশিত রঙের অনুরাগ রাঙা সোনালী সন্ধ্যা তাদের উপহার দেবে। যাবে নাকি ফিরে?

কিন্তু পরক্ষণেই সুকুমারের আর একটা মন নাকি একই মনের আর একটি মুখ বলে উঠল, 'ছিঃ!' কেন এই দোদুল্যতা, কাঙালপনা? চুরি করা একদিনের একটু বেশি সান্নিধ্য নিয়ে সে করবে কি। তাকে ফিরে যেতে দেখে সেলেস্টরা তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাবে। এমন কি এই সুধীরবাবুই হয়তো মুখ ফিরিয়ে মুচকিয়ে একটু হেসে নেবেন। শুধু তাই নয়, নিজের মনই যেন আর ফিরে যেতে চাইছে না। যে কাল গত হয়েছে তাতে যেমন আর সশরীরে ঢোকা যায় না, স্মৃতি কল্পনায় গড়া দুয়ে শুধু নিয়ে ঢুকতে হয়, যে স্থান ত্যাগ করে এসেছে তাকেও স্মৃতি তীর্থ করনার স্বর্গ করে রাখাই ভালো। গিয়ে সেই জায়গাটিকে হয়তো আর ফিরে পাওয়া যায় না।

সুকুমার বলল, 'না না, তাই কি আর হয়? আমি দুঘণ্টা ওয়েটিং রুমে দিব্যি অপেক্ষা করতে পারব। সঙ্গে বই-টই আছে বেশ সময় কেটে যাবে। আপনি বরং এক্ষুণি রিকশায় উঠে পড়ুন। আর দেরি করবেন না। আপনার আজ রেস্ট নেওয়াই হল না। গিয়েই শুয়ে পড়বেন।'

সুধীরবাবু মৃদু আপত্তি করতে লাগলেন।

কিন্তু সুকুমার তাঁর কথা শুনল না। নিজেই গিয়ে একটা রিকশা ভাড়া করে সুধীরবাবুকে প্রায় টেনে নিয়ে তাতে তুলে দিল। ভাড়াটা আগেই দিয়ে দিল রিকশাওয়ালাকে। স্টেশনের ফলের দোকান থেকে এক ডজন মর্তমান কলাও কিনে দিল সুধীরবাবুকে।

তিনি বললেন, 'আসল আর সুদ দুইই বুঝি চুকিয়ে দিলেন!'

সুকুমার বলল, 'ছিঃ সুধীরবাবু, এ কিন্তু আপনার উপযুক্ত কথা হল না। ভালোবাসা আর ঋণ ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। জীবনের এই একটি জায়গায় দেওয়া আর পাওয়া এক হয়ে মিশে যায়।'

সুধীরবাবু আর কিছু না বলে রিকশায় বসেই সুকুমারের হাতে একটু চাপ দিলেন। রিকশাটা

স্টেশনের সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার আগে মুখ ফিরিয়ে হাতখানা তুলে ধরলেন। সুকুমারও হাত তুলে তাঁকে বিদায় জানাল।

তিনি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর একটি মুহূর্তে এই স্টেশন ইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভারি নিঃসঙ্গ মনে হল সুকুমারের। কিসের একটা আবেগে বুকটা যেন ভারি হয়ে উঠল। রোগ শয্যায় বুকের অনেক যন্ত্রণাই সুকুমার অনুভব করেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়েছে কতবার। মনে হয়েছে যে কোন মুহূর্তে বুঝি তা বন্ধ হয়ে যাবে। বিরহের যে চাপ তা ঠিক শ্বাসযন্ত্রের চাপ নয়। কিন্তু একই সঙ্গে তা শরীরের কষ্ট আর মনের কষ্ট। ঐ মন নামে এই যে এক অপূর্ব বস্তু দেহের কোথায় এর অবস্থান কে জানে। হৃদয়ের কথা বললে সুকুমার বুকে হাত দেয়, বুদ্ধির আসন মস্তিষ্কের মধ্যে মনে করে, কিন্তু মনের আসন কোথায় তা ঠিক জানে না। কোন কোন সময় সে একান্ত দেহবাদী। মনকে মানেও না, মনকে শরীরেরই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলির সমষ্টি বলে মনে করে। আবার মন এক এক সময় এর তীব্র প্রতিশোধ নেয়। তখন মনই একমাত্র হয়ে ওঠে, শারীরিক অস্তিত্বের কোন খেয়াল থাকে না।

সুটকেসটা হাতে নিয়ে ওয়েটিংরুমে এসে বসল সুকুমার। তৃতীয় শ্রেণীর টিকেটের যাত্রী হলেও আপার ক্লাসের বিশ্রাম গৃহই বেছে নিল সুকুমার। এটুকু আপোষ রফা সবাই করে।

একটা বড় ইজিচেয়ার খালি পাওয়া গেল। সুকুমার তাতে অর্ধশায়িত হবার উদ্যোগ করতে

সর্ব্ব ঋতুতে সর্ব্ব উৎসবে

বাংলার রেশম

* সেই সংগে কুটীর ও গ্রামীণ শিল্পের বিরাট সমাবেশ
* পূজা উপলক্ষে রিবেট ছাড়াও বিশেষ কমিশন

পশ্চিমবংগ রেশম শিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ

(পশ্চিম বাংলার শিল্পবিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত এবং
ভারত সরকারের খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন কর্তৃক প্রমাণিত)

ঃ বিক্রয় কেন্দ্র ঃ

১। ১২/১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১
২। কুটীর শিল্প বিপণি,
১১এ, এসপ্লানেড ইষ্ট,
কলিকাতা—১
১৫৯/১এ, রাসবিহারী এভেন্যু,
কলিকাতা—২৯
১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা—৭

করতে পাশের অপরিচিত ভদ্রলোককে বিনীতভাবে বলল, 'দেখুন, আমার শরীরটা ভালো না। যদি ঘুমিয়ে পড়ি ট্রেন এলে দয়া করে তুলে দেবেন।'

ভদ্রলোক বোধ হয় তাঁর গোয়েন্দা বাহিনীর বিশেষ একটা ছোকরাকের জায়গায় এসে হাজির হয়েছিলেন। মুখ তুলে তাকিয়ে একটু ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'সেজন্যে ভাববেন না। মেল ট্রেন ডিরেইলও হয়েছে। গাড়ি সন্ধ্যার আগে আসবে না। আপনি স্বচ্ছন্দে চারঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারেন।'

শুনে সুকুমারের মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। না যযৌ না তস্থৌ' হয়ে চারঘণ্টা পড়ে থাকতে হবে। এতো ভারি বিরক্তিকর ব্যাপার হল। স্টেশনটি খুব ছোট। গাড়ি এখন আসবে না শুনে জন-বিরল হয়ে গেছে জায়গাটি। অবশ্য নির্জনতা সুকুমার পছন্দই করে। অখ্যাত অজ্ঞাত এই ধরনের ছোট ছোট স্টেশন তার মনে রোমান্টিক অনুভূতি এনে দেয়। খুব বেশি ট্রেন এসব স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করে না। একখানি মেল ট্রেনের জন্য এইসব স্টেশন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করে থাকে। শুক্লা বলেছিল, 'জানো, এখানে এসে কতজনের সঙ্গেই তো আলাপ হল। কত ডাক্তার রোগী, তাদের আত্মীয়-স্বজন কিন্তু তোমার মত কাউকে দেখিনি। এত ঘনিষ্ঠতা আর কারো সঙ্গে হয়নি। মনে হয় আমি যেন তোমার জন্যেই অপেক্ষা করেছিলাম।'

সুকুমার বলেছিল 'কিন্তু আমার কি আছে, আমি তো একজন সাধারণ রোগী। শুনেছ বোধ হয় আমার বাড়ি নেই, ঘর নেই, আপন বলতে কেউ নেই, চাকরি-বাকরি নেই। আমার মধ্যে তুমি কী দেখলে।'

শুক্লা এ কথার জবাব দিতে পারেনি। কি ইচ্ছা করেই জবাব দেয়নি। তার পাশে বসে একটার পর একটা ঘাস ছিঁড়েছে।

খানিকক্ষণ বাদে বলেছে, 'কী জানি কী দেখলাম।' তারপর একটু হেসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'আচ্ছা সত্যি করে বলতো তুমিই বা আমার মধ্যে কী দেখেছো। আমিও তো একজন সাধারণ নার্স। এখনও ট্রেনিংটা পর্যন্ত পাস করতে পারিনি। গান জানিনে, বাজনা জানিনে। স্কুল ফাইনাল ক্লাস পর্যন্ত বিদ্যা। তাও তো পরীক্ষাটা আর দিয়ে উঠতে পারিনি। তুমি আমার মধ্যে কী দেখেছ সত্যি করে বলবে?'

'দেখতে তুমি বড় সুন্দর।' এ কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারেনি সুকুমার। মনে হয়েছে সেই মুহূর্তে কথাটার ওজন যথেষ্ট নয়। তাছাড়া শব্দ ক'টি যেন পুরোপুরি সত্যকেও বইতে পারে না। অবশ্য অন্য সময় ওই দিনের আগে আর পরে সুকুমার ওর চোখের প্রশংসা করেছে, কালো টানা ভ্রূর প্রশংসা করেছে—সুখ্যাতি করেছে পাতলা আরক্ত ঠোঁট আর কোমল চিবুকের কিন্তু সেদিন ওসব কিছুই বলেনি। শুধু রূপ নয়, ওর চেয়েও রূপবতী মেয়ে কলকাতার শহরে সে তো অনেক দেখেছে। অবশ্য এত কাছে এসে দেখেনি, স্পর্শ দিয়ে দেখেনি—শুধু চোখ দিয়েই দেখেছে। বিদ্যা তো ওর তেমন নেইই, কিন্তু ওর চেয়েও বুদ্ধিমতী মেয়ের সঙ্গে সুকুমার বড় লোকের ড্রয়িংরুমে বসে গল্প করেছে, তর্ক করেছে, কারো কারো সঙ্গে কফি হাউসে কফি খেতে খেতে সমবয়সী বন্ধুদের ঈর্ষাভাজন হয়েছে। ওসব কিছু নয়। সত্যি এই সাধারণ একটি শিক্ষার্থিনী নার্স মেয়ের মধ্যে কী দেখেছে সুকুমার, এক কথায় বলা অসম্ভব মনে হয়, যাদের কথাতেও তা বলা যায় না। চোখে যা দেখে মুখের ভাষার মধ্যে তার কতটুকুই বা প্রকাশ হয়? মন যা পায়, হৃদয় যা পায় তার কতটুকুই বা মুখের কথার মধ্যে ধরে দেওয়া যায়।

সুকুমারের সেদিন বলতে ইচ্ছা হয়েছিল, 'তোমাকে আমি পেয়ে দেখেছি।'

কিন্তু সেকথাও বলতে লজ্জা করেছিল। তখনো পাওয়া মানে শুধু কাছাকাছি পাওয়া। শুধু হাতখানা হাতের মুঠির মধ্যে ধরে রাখা। চুলে একটু হাত বুলিয়ে দেওয়া, কাঁধে একটু হাতখানি রাখা আর একটু নিজের দিকে ওকে টেনে দেওয়া এর চেয়ে বেশি আদর করবার জন্যে মন উন্মুখ হয়ে উঠলেও সাহস হয়নি সুকুমারের। শুধু নীতির জন্যে নয়, স্বাস্থ্যনীতির জন্যে। সে সংক্রামক রোগী। ভিতরে রোগের বীজাণু তার মধ্যে তখনো ক্রিয়াশীল। সে এমন কিছু করতে পারে না যাতে শুক্লার ক্ষতি হয়, যাতে তার মধ্যেও রোগ সংক্রামিত হয়ে জীবনকে দুঃসহ করে তোলে। এ হিসাব সব সময়েই ছিল সুকুমারের। সে তো দেখেছে রোগের ভয়ে ওরা কত সাবধানে থাকে। সব সময় অ্যাপ্রণ পরে কাজ করে। তার সঙ্গে হাসে গল্প করে, শুধু খাওয়ার, পথ্য খাওয়ায়, চুলে হাত বুলিয়ে দেয়, বুকেও হাত রাখে। কিন্তু তার কাছ থেকে সরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই হাত ওরা সাবান দিয়ে ধোয়, লাইজল দিয়ে ধোয়। যেখানে যেটুকু স্পর্শ লেগেছিল সব ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন করে। শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য করত সুকুমার। আত্মরক্ষার জন্যে ওদের কী সতর্কতা, কত আটঘাট বাঁধা। স্পর্শ দোষ কাটাবার ব্যবস্থা বীণালি মালা মল্লিকা করত, শুক্লাও করত। ওদের এই সতর্কতা দেখে মাঝে মাঝে সুকুমারের মনে হত ওদের ওই হাসি কৌতুক কি আশা আর আশ্বাসের কথা, ওদের এই সৌখ্য প্রীতি বন্ধুত্ব সব মিথ্যা, সব ছলনা। যারা রোগী আর যারা রোগী নয় তাদের মধ্যে শুধু একটি সম্পর্কই আছে। ঘৃণা আর অনুকম্পার সম্পর্ক। ওরা যে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করছে সে তো পেটের দায়ে জীবিকার জন্যে। টাকার প্রশ্ন না থাকলে ওরা কি তার কাছেও আসত। অনেক দূর থেকেই পালিয়ে যেত। রোগীর জগৎ আর সুস্থ মানুষের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। সুকুমার ভাবত, দুই জগতের মধ্যে সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান। পার হবার জন্যে ওদের দিক থেকে আছে অনুকম্পার ছুটো নৌকো আর রোগীদের দিক থেকে আছে ঈর্ষ্যার কলার ভেলা। সুকুমারের মনে এখনো সন্দেহ আছে, এখনো তার সব সংশয় ঘুচে যায়নি। শুক্লা কি সত্যিই তাকে ভালোবাসে? যেমন একটি সুস্থ সবল পুরুষকে ভালোবাসতে পারত ঠিক সেই রকম ভালোবাসে? না কি এ নার্সেরই রোগী ভোলানো মায়া? সহানুভূতি আর অনুকম্পাকে ভালোবাসার ছদ্মবেশ পরানো? বিশ্বাস করে না সুকুমার। ওই স্বাস্থ্যবতী রূপলাবণ্যবতী তরুণী শুক্লাকে সে এখনো ষোল আনা বিশ্বাস করে না। যতদিন না পুরোপুরি সুস্থ হতে পারবে সুকুমার ততদিন তার ছুঁচোলো সুপ্ত প্রশ্নটা দন্তাণীকের মত মনে এই অবিশ্বাসের বীজাণু স্থায়ী হয়ে থাকবে। শুক্লা তাকে সমস্ত কামনা বাসনা দিয়ে ভালোবাসে? যে ভাবে মানুষ ঝড়কে ভালোবাসে, বন্যাকে ভালোবাসে? সমুদ্রকে ভালোবাসে আর সেই ঝড়ের সমুদ্রের মধ্যে ডুবে মরতে ভালোবাসে, ঠিক সেইরকম করে কি সুকুমারকে ভালোবেসেছে শুক্লা? মনে তো হয় না। সব সময়েই ওই নার্স মেয়েটির রোগ সংক্রমণের ভয়। একজন ডাক্তার বলে বোধ হয় অত ভয় করত না শিক্ষানবীশ নার্স বলেই অত ভয় পায়। ওর অত ভয়ের জন্যেই তো ওর পাতলা রক্তাভ ছুটি ঠোঁটের কাছে নিজের উদগ্র একটি বাসনাকে বেশি নিয়ে যেতে পারে না। স্পর্শ দোষ যদি সাবান লাইজলে ধি অন্য কোন অ্যান্টিসেপটিক রাসায়নিকে না দূর হয়।

ভয় পায় শুক্লা, তবু ফিরে ফিরে কাছে আসে। আড়াল-আবডাল থেকেই কথা বলে, হাসে চোখে চোখে তাকায়। আর সুকুমারকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে কী দেখছ? আমার মধ্যে তুমি কী দেখছ?'

এক একদিন সুকুমারের বলতে ইচ্ছা করে রূপ নয়, লাবণ্য নয়, গুণ নয় যোগ্যতা নয়, তোমার মধ্যে আমি দেখেছি নীরোগ বিশুদ্ধ রক্ত আর মাংসকে। আমি রুগ্ন, আমি স্বাস্থ্যহীন। আর সেইজন্যেই আমি আমার সমস্ত কামনা বাসনা দিয়ে তোমার ওই নির্দোষ রক্ত মাংসকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে আমার বুকের সঙ্গে মিশিয়ে রাখতে চাই। যে বুকের তলায় আমার জীর্ণ ফুসফুস আছে, আমার অগাধ ভালোবাসাও আছে। সেই ভালোবাসার মধ্যে কোন রোগের বীজাণু নেই।

কিন্তু শুক্লা কি সেইভাবে ভালোবাসে? তা কিছুতেই বাসতে পারে না। শুক্লা মুখে বললেও সুকুমার সে কথা বিশ্বাস করে না। করত শুক্লা যদি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে বলতে পারত। কিন্তু তাতো পারে না। শুক্লা তাকে দেহ দিয়ে ভালোবাসে না, তার দেহকে ভালোবাসে না, শুধু মন দিয়ে ভালোবাসে। কিন্তু দেহ ছাড়া যে মন, সেই মনের ওপর সুকুমার বিশ্বাস রাখতে পারে না, সেই মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সে সন্দীহান হয়ে ওঠে:

একটু বাড়াবাড়ি করলে শুক্লা তাকে মায়ের মত দিদির মত সস্নেহে শাসন করে, 'লক্ষ্মীটি, এখন নয়। এখন ওসব করলে তোমার নিজেরই ক্ষতি! ওসব পরে হবে। তুমি যা যা চাও তার সবই পাবে, কিন্তু এখন নয়। তুমি তো জানো লেসেন্টের পক্ষে সংযম টেম্পারেন্স সবচেয়ে বড়কথা। একটু এদিক ওদিক হলেই তোমার অনিষ্ট হবে।'

রাগ করে দুদিন সুকুমার ওর সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিল। কিন্তু তৃতীয় দিনে আর পারেনি। নাইট ডিউটির সময় শুক্লাই ওকে ফের কথা বলিয়েছিল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'খুব বুঝি রাগ হয়েছে?'

সুকুমার বলেছিল, 'না, রাগ আবার কিসের? রাগ কার ওপর করব?'

শুক্লা মৃদু হেসে বলেছিল, 'তাইতো আপনার তো এখানে কেউ নেই।'

আপনজন কেউ নেই একথা তো সত্যি। আবার পুরোপুরি সত্যিও নয়। হাসপাতালে রোগীর কাছে ডাক্তার আর নার্সের চেয়ে বড় আপন কে আছে? কিন্তু নার্স তো এ হাসপাতালে আরো অনেকে আছে। মালা দীপালিরা ছাড়াও, লীলা রেখা মীরা বাসনা অনেকের নামই সুকুমার জানে। অনেকের জীবনের কথা, পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথাই সে শুনেছে। সুধীরবাবু ঠাট্টা করেছিলেন সুকুমার রমণীপ্রিয়। মেয়েরা তাকে ভালোবাসে। ভালোবাসুক আর না বাসুক, কাছে আসে, পরিচর্যা করতে করতে বসে কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকটা সময়ও করে যায়। কিছু জিজ্ঞাসা করলে জবাবও দেয়। 'Ask and you will know, knock and the door will be open to you.' ধর্মশাস্ত্রে বাইবেলের কথা। কামশাস্ত্র সম্বন্ধে ও একথা খাটে। ঠিক সময় বুঝে সুযোগ বুঝে জিজ্ঞাসা করতে পারলে মেয়েরা সব বলে। সব না হোক অনেকখানি। বাকিটুকু আন্দাজ করতে দেয়। যেমন লাজলজ্জার আড়ালে ওরা সমস্ত শরীরটি পুরুষের চোখের সামনে উদ্ভাসিত করে। জিজ্ঞাসা করলেই জানা যায়। যা দিতে পারলে দরজা খোলে। টোকা দিতে পারলে অন্তত জানলাটি তো খুলে যায়। অনেক সময় সেই জানলা দিয়ে দেখা, জানলায় বসে দেখাই যথেষ্ট। কথা বলতে পারে বসে, এখানে অনেক মেয়ের সঙ্গেই অন্য রোগীদের তুলনায় সুকুমারের বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। এ হাসপাতালে উদ্বাস্তুদেরই সংখ্যা বেশি। বেশির ভাগই কামার, কুমোর নানাধরণের বৃত্তিজীবী মানুষ। অবশ্য কেরাণী, ছাত্র, কি সুকুমারের মত কি শিক্ষিত বেকারও যে

কিছু কিছু না আছে তা নয়। তবু নার্সদের অন্য রোগীদের চেয়ে সুকুমারই বেশি আকৃষ্ট করেছে। কারণ আলাপ করবার তার আগ্রহ আছে। সাহিত্য শিল্প রাজনীতি স্যানাটোরিয়ামের দলাদলি রোগীদের মধ্যে ডাক্তারদের মধ্যে নার্সদের মধ্যে নানা উপদলীয় দ্বেষ-বিদ্বেষ সব বিষয়েই সুকুমারের উৎসাহ আছে। গল্প পেলেই হল। শুধু বলতে নয় শুনতেও ভালোবাসে সুকুমার। আর শুনছে কথা শোনা মানে তো শুধু কান দিয়ে শোনা নয় দুটি চোখ দিয়েও শোনা। কী বলে সেইটাই বড় কথা নয়, তারও চেয়ে বড় কেমন করে বলে। তাই দুটি চোখ খোলা রেখে মনে মনে দুটি কান মাঝে মাঝে বন্ধ করে রাখলেও চলে। টি. বি. রোগের চিকিৎসায় ডাক্তাররা যেমন কখনো কখনো অথম হয়ে যাওয়া একটি লাংসকে বন্ধ করে রেখে সুস্থ লাংসটিকে কাজ করতে দেন; কিন্তু সব সময় চোখকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। প্রশ্রয় তো ভালো, চোখ সামান্য আশ্রয়ও পায় না। সে সব ক্ষেত্রে মনে মনে চোখ বন্ধ করে শুধু কান দুটিকেই ছেড়ে দিতে হয়। যাদের রূপ মুখে নয় কণ্ঠস্বরে তাদের বেলায় চোখ বুজে উৎকর্ণ হয়ে থাকতে জানা চাই। নয়নমোহন রূপ গুণের চেয়েও দুর্লভ। কি নারীতে কি পুরুষে। দুর্লভ অথচ ক্ষণস্থায়ী আর ক্ষীণায়ু। গুণ বুড়ো বয়সেও থাকে, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাড়ানো যায়। কিন্তু রূপের বেলায় তা চলে না। সে শুধু যৌবনস্থ। যৌবনের মুক্তক্ষেত্রে আলো হাওয়ায় সে বাঁচে। লোলচর্ম আর পাকা চুলের অরণ্যে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এইজন্যেই কি সবাই কি মেয়ে কি পুরুষ গুণের চেয়ে রূপের কাঙাল বেশি?

এইসব তত্ত্ব নিয়ে সুকুমার কলকাতায় বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করত এখানেও করেছে। যাদের সঙ্গে কথা বলে তর্ক করে আরাম পাওয়া যায় তেমন কেউ কেউ এই হাসপাতালেও আছে।

কিন্তু সুকুমার জানে সে তাত্ত্বিক আর তার্কিক বলে নার্সরা তার দিকে আকৃষ্ট হয়নি। সুকুমার আবৃত্তি করতে পারে, অভিনয় করতে পারে, গল্প করতে পারে—তার এই সব ক্ষমতার কথা ভুলেই বরং দীপা আর মল্লিকেরা সুখ্যাতি করেছে। তারা তার তত্ত্বজ্ঞতার কথা ভুলেও উল্লেখ করেনি। আর একটা কথা ভুলতে বোধ হয় ওরা লজ্জা পেয়েছে, সে ক্ষমতা মেয়েদের দেখে ওর আকৃষ্ট হবার ক্ষমতা। এ ক্ষমতা পুরুষের কাছে নিন্দনীয়, দুর্বলতা অক্ষমতার সামিল। কিন্তু মেয়েদের কাছে তা নয়। মেয়েরা জানে তারা যত রূপবতী যৌবনবতীই হোক, সব পুরুষ সব সময় সব বয়সে তাদের নিয়ে মত্ত হয় না। কারো নেশার বস্তু যশ, কারো বা অর্থ, কারো বা প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি লাভের কামনা। সারা জীবন শুধু মেয়েদের নিয়ে পাগল হয়ে থাকে তেমন পুরুষরা নিশ্চয়ই দলে ভারী নয়। সুকুমার জানে ওদের দিকে সে আকৃষ্ট হয় বলেই আকৃষ্ট করে। নইলে তার মত দরিদ্র রোগী যে লালবাজারের পুরোর বস্ত্র থেকে সাহায্য নিয়ে এই হাসপাতালে আসবার গাড়ি ভাড়া জুটিয়েছিল, তার কী এমন অর্থ সম্পদ আছে, দৈহিক শক্তি সামর্থ্য আছে, যাতে এখানকার মেয়েরা আকৃষ্ট হবে? হরিপদবাবু তাকে যতই ঈর্ষ্যা করুন সে একটু বেশি সেবাযত্নের লোভে কোন নার্সের হাতে একটি টাকাও ধরে দেয়নি, কাউকে কিছু উপহার দেয়নি, অন্যান্য পেসেন্টদের বরং তা দিতে দেখেছে। লেডীজ ম্যান বলে সুবীরবাবু তাকে যতই ঠাট্টা-তামাসা করুন, সে কোন মেয়ের ফাইফরমায়েস খাটেনি, কারো তন্ত্রী-বাহক হয়নি। এখানেও না কলকাতাতেও না। দেওয়ার মধ্যে সে শুধু সঙ্গ দিয়েছে, সান্নিধ্য দিয়েছে আর ধৈর্য সহানুভূতি নিয়ে তাদের কথা শুনেছে।

দীপালির সঙ্গেও এইভাবেই তার প্রথম ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। একে কি ঘনিষ্ঠতা বলা যায়? কথা বলা আর কথা শোনার মধ্যে যে নৈকট্যটুকু থাকে তার চেয়ে বেশি কাছে তারা আসেনি। তখন দীপালির ডিউটি সুকুমারদের ওয়ার্ডেই বেশি পড়ত। পরিচর্যার ফাঁকে ফাঁকে দীপালি কথা বলত, গল্প করত। রাত্রে যখন ঘুম আসত না দীপালি তাকে ঘুমিয়ে পড়বার উপদেশ দিতে আসত। কিন্তু শুধু উপদেশে ঘুম আসে?

দীপালি ওর কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত. তাতেও ঘুম আসত না।

দীপালি তাকে ধমকাত, অবশ্য মিষ্টি করেই ধমকাত, 'আপনি যদি অমন বকবক করেন, ঘুম আসবে কী করে বলুনতো? যদি সহজে না হয় আপনাকে মর্ফিয়া দিতে হবে, ডক্টর কর বলেছেন। এ রোগের পক্ষে ঘুমটা এসেনসিয়াল। বিশেষ করে আপনার এই স্টেজে।'

সুকুমার বলল, 'কী রকম স্টেজ বলুন তো? একেবারে কি গঙ্গাযাত্রার মুখে?'

দীপালি জবাব দিত, 'অমন অকথা কুকথা যদি বলেন মুখ বন্ধ করে রাখব।'

সুকুমার মৃদুস্বরে মন্তব্য করত, 'যদি কোমল করপল্লবের হয় আপত্তি নেই।'

দীপালি রাগ করত না, হেসে বলত, কোমল করপল্লবের চেয়ে ঢের শক্ত কাজ আছে মশাই। আপনার মুখ আমি রুমাল কি তোয়ালে দিয়ে বেঁধে দিয়ে যাব, আর না হয় সুচ সুতোয় গেঁথে রাখব।'

সুকুমার বলল, 'ইনজেকসনের সুচ তো রোজই পড়ছে। তার চেয়ে আপনার সুচের ফোঁড় নিশ্চয়ই অনেক মধুর হবে।'

এই দীপালিই এসে একদিন খবর দিল, 'জানেন আপনার এ. পি. করানো হবে। তাহলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন।'

সুকুমার অজ্ঞতার ভান করে বলল, 'এ. পি.-টা কী বস্তু।'

দীপালি বলল, 'ও মা' তাও জানেন না?

আর্টিফিশিয়াল নিউমোথোরাক্স।'

সুকুমার বলল, 'ওরে বাবা, অত বড় কথা মুখস্থ রাখতে পারব না। তার চেয়ে ওই সংক্ষিপ্ত এ. পি. সি. পি. জি. পি ওই ভালো।'

দীপালি অবাক হয়ে বলল, 'জি. পি.-ও আবার কি।'

সুকুমার বলল, 'তাও জানেন না? জেনারেল পোষ্ট অফিস।'

দীপালি হেসে উঠল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'আপনার মত এমন অদ্ভুত মানুষ আমি আর দেখিনি। সংসারের কিছু বলতে কিছু জানেন না। কোন বিষয়ে জানবার কোন আগ্রহও নেই। সাধারণ রকম লেখাপড়া জানে এখানে তেমন পেসেন্টদের সঙ্গেও আলাপ করে দেখবেন তারা প্রত্যেকেই একেক জন টি. বি. স্পেশালিষ্ট ডক্টর। কখন স্ট্রেপটোমাইসিন দেওয়া হয়, তার সঙ্গে সি. এ. এস. আই. এন. এ. এইচ. মেশালে কী ফল হয় সব তাদের কণ্ঠস্থ। আর সেই জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে কথায় কথায় কী তর্ক। শুধু আমাদের সঙ্গে নয়, ডক্টর করের সঙ্গে, ডক্টর মুখার্জীর সঙ্গেও তুমুল বাদবিতণ্ডা লাগিয়ে দেয়। আর আপনি একটা ওষুধের নাম পর্যন্ত জানেন না।'

সুকুমার বলেছিল, 'জেনে কোন লাভ নেই সহোদরা। জ্ঞানমার্গ ছেড়ে আমি ভক্তি আর বিশ্বাসের পথ ধরেছি। আপনাদের ডাক্তাররাও বলেন বিশ্বাসে মিলায় আরোগ্য। নইলে তুকতাকে

এত ফল হত না। এখনো আমাদের দেশে কটা রোগী আপনাদের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সুযোগ পায়? বেশির ভাগই তো তুকতাক ঝুঁকফাক জলপড়া তেলপড়ার ওপর চলে। আমি ভেবে দেখেছি এখানে এসে যখন পড়েছি আপনাদের হাতে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে সরকারের পেতে দেওয়া এই বিছানায় নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকব। ডাক্তাররা মারেন ধরব, নার্সরা বাঁচান বাঁচব।

দীপালি হেসে বলেছে, 'আমরাই বুঝি বাঁচাবার মালিক?'

সুকুমার জবাব দিয়েছে, 'মালিক নন মালিকানী, এই মরুস্থানে মালিনী। মুমূর্ষুদের মুখের কাছে মৃতসঞ্জিবনী সুধা।'

দীপালি ওর কাছে এসে বলেছে, ঢের ঢের পেসেন্ট দেখেছি, আপনার মত এমন পয়লা নম্বরের ফ্লাটারার আর দেখিনি। সামনে এত বলছেন আড়ালে গেলেই তো নিন্দা সুরু করবেন।'

সুকুমার বলল, 'নিন্দা করব? আমার মুখে বাগ্‌দেবী নারী বন্দনা ছাড়া আর কোন ভাষা দেননি। কেন দেবেন? নিজে যে আপনার স্বজাতীয়া। শুধু আমি কেন সবাই তো আপনাদের প্রশংসা করে।'

দীপালি মাথা নেড়ে বলল, 'না সুকুমারবাবু' সবাই তা করে না। আমি নিজের কানে কত নিন্দা শুনেছি। দু' মিনিট আগে যে পেসেন্টকে নার্স করে এসেছি, যার দূষিত রক্ত ধুয়ে দিয়ে এসেছি, কী আশ্চর্য দেখুন সেই রোগীই আমার নিন্দা করছে। আমি টাকার লোভে কাজ করি, যেখানে সোপনে উপুরি টাকা পাই সেখানে বেশি যত্ন করি। এসব তো আছেই। তারপর আমাদের মধ্যে কে কেমন দেখতে, কার কোন অঙ্গের গঠন কি রকম, কার কোন সম্পদ আছে কি নেই, এসব নিয়ে অশ্লীল আলোচনাও চলে। আর আমাদের চরিত্র নিয়ে আলোচনা তো সব সময় লেগেই আছে। এটা আমাদের পেসেন্টদের সবচেয়ে কেজারিট টনিক।'

সুকুমার বলেছিল, 'কি রকম?'

দীপালি একটু হেসে বলেছিল, 'আমরা কে কোন ডাক্তারের সঙ্গে আছি, আমাদের পেসেন্টদের তা নখদর্পণে। ডাক্তারদের সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসের বড় মেজো সেজো কর্তা এমন কি ছোকরা কেরানীদের সঙ্গে আমাদের কার কি সম্পর্ক তা প্রত্যেকটি পেসেন্ট জানে। ভানাটোরিয়াম তো নয় যেন একটি গুপ্ত বৃন্দাবন। এই শুশ্রূষা-নিলয়ে আমরা যেন সেবা করতে আসিনি, হোমরা-চোমরাদের সেবাদাসী হতে এসেছি।'

সুকুমার চুপ করে রইল। পেসেন্টদের মধ্যে এ ধরনের আলোচনা সেও কিছু কিছু শুনেছে। তাদের মধ্যে শিক্ষিত ভদ্রঘরের পেসেন্টরাও আছে অবশ্য, সবাই যে খুব সিরিয়াসলি নিন্দা মন্দ করে কি যা বলে তা বিশ্বাস করে তা নয়। যেমন ওরা তাস পাশা দাবা কি ক্যারম খেলে এও তেমনি। নার্স আর আমাদের প্রণয় কাহিনী রচনাও তেমনি ওদের একটা ক্রিয়েটিভ রিক্রিয়েশন। সব সময় খুব একটু দোষ দেওয়া যায় না। যে প্রেমের স্বাদ হয়তো ওরা নিজেরা পায়নি কি পেতে পেতে অমির গরল হয়ে গেছে সেই প্রেমের ভাণ্ডার নার্স আর ডাক্তারদের কাছে যে অবারিত অফুরন্ত—রোগীরা এই কল্পনায় পরম আনন্দ পায়। পরের মুখে তারা শুধু ঝাল নয় মিষ্টিও খেতে চায়। সুকুমার ভাবে ওরা এসব নিয়ে পরচর্চা কিছু কিছু করতে চায় তো করুক। কিন্তু ভাষাটা শ্রাব্য হোক, ইসারা ইঙ্গিতগুলি সুন্দর হোক। তবে সুন্দরতার বেশির ভাগ লোকেরই আনন্দ নেই। সংসারে শৌনে ষোল আনি লোকের কাছে সুন্দরতা

আর শুকতা সব অর্থবাচক। শুধু হাসপাতালে কেন হাসপাতালের বাইরেও তাই। রোগীরা কেন ডোগীদেরও ভোগের পদ্ধতির ওই এক ধারায়। রসের ধারা অতিরিক্ত মোটা না হলে তাদের সম্ভোগে সুখ নেই।

শুধু কি নার্স আর আমাদের নিয়েই রোগীরা গল্প বানাত? কিমেল ওয়ার্ডের পেসেন্টরাও তাদের অনেক গল্পে নায়িকা হয়ে দেখা দিত। মেল আর কিমেল ওয়ার্ডের মধ্যে এখানে বাইরে কোন দেয়াল নেই, কিন্তু রীতিনীতি শাসন অনুশাসনের দেয়াল চীনের প্রাচীরের চেয়েও বড়। সেই দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল টপকেও নাকি রোগী আর রোগিণীদের মধ্যে চিঠি চালাচালি হয়। রোগী চিঠি উড়িয়ে দিয়ে বলে 'যাও পাখি বলো তারে।'

রোগিণী জবাব দেয় 'সে যেন ভোলে না মোরে।'

চিঠি বিনিময়, ছোটখাটো উপহার বিনিময়, বিশ্বাস অবিশ্বাস কতরকমের কত গল্পই শুনেছে সুকুমার। কে নাকি কিচেনের ঠাকুরের সাহায্য নিয়ে ভাতের থালার মধ্যে প্রেমপত্র গুঁজে দিয়েছিল, ভালোই করেছে। প্রেম যে অমঙ্গলের মতই অপরিহার্য, তারই প্রমাণ ওই পত্র।

নার্সদের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা শুনলে দীপালি প্রতিবাদ করত। মাঝে মাঝে নালিশ করত সুকুমারের কাছে। বলত, 'দেখুন কুমারবাহাদুর, আজও নার্সদের প্রফেসনকে সমাজ সেইরকম মর্যাদা দিতে পারে না। আজও তাদের কী সন্দেহের চোখেই না দেখে। আড়ালে-আবডালে কী অকথ্য কুৎসাই না রটায়। অথচ আমি তো জানি কত সব ভদ্রঘরের দুঃস্থ মেয়েরা এখানে এসেছে। কত টাকাই বা এখানে মাইনে পায়। নিজেদের খরচ বাঁচিয়ে সবাই বাড়ীতে টাকা পাঠায়। কারো বুড়ো বাপ মা আছে ঘরে। তাঁদের খেতে পরতে দিতে হয়, কেউ বা ভাইদের পড়ায়। কেউ বা অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার জন্যে টাকা পাঠায়। ঘরে বসে রুগ্ন স্বামীকে সেবা করবে সে ভাগ্য হয়নি। হাসপাতালে রোগীদের সেবা করে তাকে পয়সা রোজগার করতে হয়।'

সুকুমার জিজ্ঞাসা করেছিল 'এমনও আছে না কি?'

দীপালি বলেছিল, 'আছে বই কি। ওই যে নীলিমাদি—কালো মোটা মত মহিলা। উনি সুস্থ হয়ে উঠে ওঁর স্বামীই হয়তো ওঁকে একদিন বদনাম দেবেন। হাসপাতালে গিয়ে চরিত্র নষ্ট করে এসেছে। আর না হয় নিজেই একটি সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে করে বসবেন। আপনাদের পুরুষদের কথা আর বলবেন না।'

নার্স সমাজের ওপর এত যার সহানুভূতি, এত যার সমবেদনা, সেই দীপালিই কিন্তু এখানকার একজন বিশেষ নার্সকে ভালোর চোখে দেখে না। সুকুমার প্রথম প্রথম ভেবে পেত না ওদের দুজনের মধ্যে কেন এই চাপা দ্বেষ-বিদ্বেষ, কিসের এই প্রতিযোগিতা। শুভা ওর চেয়ে বয়সে ছোট, বিদ্যায় ছোট, অভিজ্ঞতায় ছোটো, রূপ শুধু বেশি। সেইজন্যেই কি ওর ওপর এত রাগ দীপালির? দেখতে ভালো বলে রোগী ডাক্তার নির্বিশেষে সবাই শুভাকে বেশি ডাকখোঁজ করে, একটু বেশিক্ষণ নিজের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখতে চায়। প্রাণপণে রোগীর সেবা করেও দীপালি যে আদরটুকু পায়না, ওই হতভাগী শুধু সুন্দর পানা মুখ দেখিয়ে সেই আদর কেড়ে নেয়, সেইজন্যেই কি ওর ওপর এত আক্রোশ দীপালির? পরে ঘটনাচক্রে সুকুমারই অবশ্য ওদের দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটা হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সুকুমারের আগেও কি কেউ ছিল না? তারই মত অন্য কোন রোগী? কি সুস্থ স্বাভাবান কোন

যুবক? কে জানে হয়তো ওই শৈলেনবাবুই ছিলেন ওদের মধ্যে, মধ্যবর্তী সেতু না মধ্যবর্তী বিরোধের হেতু। সুকুমার তাঁরই উত্তরাধিকারী। ওদের ভাবভঙ্গি দেখে কথায় বার্তায় এক আধটু আভাস পেয়ে তাই যেন সন্দেহ হত সুকুমারের। আজও সে সন্দেহ যায়নি। সুকুমার অকৃতজ্ঞ নয়। সত্যিই দীপালি তার খুবই সেবা করেছে। যতখানি করবার কথা তার চেয়ে বেশিই করেছে।

এ. পি. হওয়ার পর দীপালির হাতেই তো সুকুমারের পরিচর্যার ভার ছিল। তখনো শুক্লা আসেনি। মানে এমন করে আসেনি। মাঝে মাঝে এই ওয়ার্ডে তার ডিউটি পড়ত। সুকুমারের সঙ্গে তার দুটো একটা কথা হত। বেশি কথা হত দীপালির সঙ্গেই। শুক্লা হিংসুটে চোখে দীপালির দিকে তাকাত আর তা দেখে মনে মনে মজা পেত সুকুমার, ইচ্ছা করেই শুক্লার ওপর একটু উদাসীন হত, দীপালির ওপর আগ্রহটাকে বাড়িয়ে দেখাত। ওকে প্রবল বেগে কাছে টানবার জন্যেই ওকে অমন করে দূরে রাখত। প্রেমের ব্যাপারে কেন, সৎপুরুষ আর কোন্ সাধ্বী নারীই বা এই ছলাকলার সাহায্য না নেয়? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই অশিক্ষিত পটুত্ব এই অনুশীলিত দক্ষতা সবাইরই আসে, কি ছেলের কি মেয়ের। সুকুমারের মনে হয় শুক্লা যে অত তাড়াতাড়ি তার কাছে এসেছিল, সে দীপালির সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাবার জন্যেই অন্তত প্রথম প্রথম সেই কম্পিটিশনই শুক্লাকে এমন দ্রুতগতি দিয়েছিল। তারপর সে নিজের তাগিদে এসেছে সুকুমারও নিজের আবেগে তাকে কাছে টেনেছে। কিন্তু প্রথমেই তো আর এ সম্পর্ক ছিল না। ছিল সাধারণ সৌখ্য সৌহৃদ্য বন্ধুত্ব। সেইটুকু নিয়েও ওই দুটি মেয়ের মধ্যে কী কাড়াকাড়ি চলত, শুয়ে শুয়ে দেখত সুকুমার। মাঝে মাঝে এর মুখে ওর নিন্দা কান পেতে শুনত। এসব নিন্দায় সে কানে আঙুল দিত না। কারণ এই নিন্দার আড়ালে এই মাৎসর্যের আড়ালে ওদের গোপন ঐশ্বর্যকেও সুকুমার দেখতে পেত। ওদের সেই সম্পদ সুকুমার নিজে। অথচ কীই বা সুকুমারের দাম। ব্যাধিজর্জর দেহ নিয়ে এই হাসপাতালে সে এসেছে। ওই সব সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী দুটি তরুণী মেয়ের কাছে তার দাম কানাকড়িও হবার কথা নয়। তবু তো ওদের কাড়াকাড়ি চলেছিল। আসলে কাড়াকাড়ির মধ্যেই এক উত্তেজক আনন্দ আছে। কী নিয়ে কাড়াকাড়ি সেটা তুচ্ছ। গেমসেটদের যখন স্টেকে ব্রীজ খেলতে দেখেছে জিতে দু'টাকা একটাকা পাবে কিন্তু তাই নিয়ে কী উত্তেজনা, বাজি জিতবার পর উল্লাস! এও তেমনি। পাওয়ার বস্তুটা তুচ্ছ। আকাঙ্ক্ষা আর লড়াইয়ের গৌরবেই তার গৌরব। মানুষের এই সব বৃত্তিকে বলা হয় রিপু। কিন্তু এই রিপুর দল কী রসের মূর্তি ধরেই না আসে। মনে হয় রিপু তো নয়, এই তো জীবনের যথার্থ রূপ। এই রিপুর ছোঁয়ায় পাঁচী হয় পদ্মাননা, কানাকড়ি পদ্মরাগমণির প্রভা পায়।

দীপালির ওপর অকৃতজ্ঞ নয় সুকুমার। তার সেবাশুশ্রূষা যথেষ্টই করেছে দীপালি।

এ. পি. হবে শুনে সুকুমার যখন ভিতরে ভিতরে বেশ একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল, দীপালি তাকে অনেক সাহস ভরসা দিয়েছে।

বলেছে, 'ওই ইংরেজী দুটি অক্ষর দেখে ভয় পাবেন না। আসলে আপনার ভাল দিকের ফুসফুসকে রেস্ট দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। পাঁজরার ফাঁকের ভিতর বিশেষ ধরনের ইঞ্জেকশনের সূচ দিয়ে কিছু বাতাস ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।'

সুকুমার বলেছে, 'থাক থাক। ও সব হাড়-পাঁজরার কথা আমার কাছে তুলবেন না। যা আছে আমার শরীরের ভিতরে আছে। তাদের আমি দেখতেও চাইনে, তাদের কথা আমি শুনতেও চাইনে।'

দীপালি হেসে বলেছে, 'এই বুঝি বীরত্ব আমার। পাঁজরার নাম শুনেই অস্থির। ডক্টর কর কত বড় বড় অপারেশন করেন। শুনেছি, কলকাতার বড় বড় সার্জনরা পাঁজরার চারখানা পাঁচখানা হাড় পর্যন্ত কেটে ফেলেন। রোগী ভালো হয়ে ওঠে। সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টই আজকাল সেরা ট্রিটমেন্ট।'

সুকুমার বলেছিল, 'আমারও কি ওরকম কাটাকুটি করতে হবে নাকি? দয়া করে সেটা যেন না করেন। আমি তো আর ধনীচি নই। আমার হাড়ে ইন্দ্রের হাতের বজ্র হবে না।'

দীপালি বলেছে, 'আপনার হাড় মাংস যেখানে যা আছে ঠিক থাকবে। শুধু লাংসটা একটু কুঁচকে যাবে। ইচ্ছা ক'রেই সংকুচিত করে রেখেছি।'

সুকুমার বলল, 'বেশ। শুধু জখমটা প্রসারিত থাকলেই হয়।'

দীপালি হেসেছিল, 'জখম নিয়ে তো আপনার বড় ভাবনা। আপনি বোধ হয় ডাক্তার হলে হার্ট স্পেশালিস্ট হতেন।'

সুকুমার জবাব দিয়েছিল, 'ডাক্তার না হয়েও তা হয়েছি।'

রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও সে রসিকতা করতে পারত। সেজন্যে শুধু নার্সরা নয়, ডাক্তাররাও তাকে ভালোবাসতেন।

ডক্টর কর খুব ব্যস্ত মানুষ। তিনিও রাউণ্ড দিতে এসে সুকুমারের বেডের পাশে কয়েক মিনিট দাঁড়াতেন। একটু গল্পটল্প করে যেতেন। ডক্টর করকেও বেশ পছন্দ হত সুকুমারের। বেশ লম্বা চওড়া বিশাল দেহ পুরুষ। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। বড় ডাক্তার ছোট ডাক্তার সুকুমার বোঝে না। কিন্তু জবরদস্ত চেহারার ডাক্তার দেখে সুকুমার ভরসা পায়। মনে হয় সর্বাঘাতী যমের সঙ্গে ইনি একবার লড়তে পারবেন বটে।

ডক্টর কর বললেন, 'কী মশাই, আপনি নাকি খুব ঘাবড়ে গেছেন?'

সুকুমার বলল, 'কই না তো। মিস্ চক্রবর্তী হাড় পাঁজরার কথা তুলে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন অবশ্য।'

দীপালি পাশেই দাঁড়িয়েছিল। হাসিমুখে বলল, 'ওঁকে আবার ভয় দেখাতে হয় নাকি? উনি নিজেই কত দেখতে পারেন।'

ডক্টর করের মুখের দিকে তাকিয়ে সুকুমার বলেছিল, 'ভয় যেটুকু দেখি, সেটুকু লোক দেখানো। আসলে ওটা বরাভয়ের লোভ।'

ডক্টর কর বলেছিলেন, 'লোভকে সংবরণ করুন। আপনি নাকি রাত জেগে কবিতা-টবিতা লেখেন?'

'কই না তো?'

'নার্সরা যে বলে।'

সুকুমার বলেছিল, 'ও মাঝে মাঝে দু'এক পাতা ডায়েরি লিখি। নার্সরা আমাকে খুব খাতির করেন। ওরা ভাবেন আমি যা লিখি তাই সনেট কবিতা, আর যা বলি তা গদ্য কবিতা।'

ডক্টর কর হেসে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'কোন ভয় নেই।'

দুবার এ. পি. করবার পর ডক্টর কর মত বদলালেন। শল্য চিকিৎসার পরিবর্তে ওষুধের ব্যবস্থা হল। নার্স ও পালটে গেল দীপালির বদলে এল শুভা।

সেবা-শুশ্রূষা ধরন প্রায় একই রকমের। তবু ওরা আলাদা। কোন এক মূঢ় বন্ধু বলেছিল, 'সব মেয়েই সমান।' আসলে সে মেয়েদের কিছুই জানে না। সুরূপাই হোক, কুরূপাই হোক, প্রত্যেকটি মেয়ে আলাদা। রূপে রসে গন্ধে স্বাদে স্বতন্ত্র। সুস্থ সুখী মানুষের কাছে প্রতিটি নতুন ভোর যেমন নবজন্ম, প্রতিটি অন্নের গ্রাস যেমন নতুন সুধায় ভরা।

দু'একদিন যেতে না যেতেই শুক্লা বলেছিল, 'দীপালিদির সঙ্গে আপনার বুঝি খুব ভাব?'

সুকুমার বলেছিল, 'আমার অসদ্ভাব তো কারো সঙ্গেই নেই।'

শুক্লা একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'যা'রা সবাইর সঙ্গে সদ্ভাব রাখেন তাঁরা কিন্তু মানুষ ভালো না।'

সুকুমার বলেছিল, 'কেন বলুন তো, আপনার মুখে উল্টো কথা শুনছি। আমার ধারণা ছিল এখানে উল্টোপাল্টা কথা বলবার আর্ট কেবল আমারই জানা আছে।'

শুক্লা হেসে বলেছিল, 'অত অহংকার ভালো নয়। যাঁরা সবাইকে পছন্দ করেন, সবাইকে পছন্দ করেন বলে দেখান, আসলে তাঁরা কাউকেই ভালোবাসেন না। তারা ওপর ওপর ভালোমানুষ, ভিতরে ভিতরে খারাপ মানুষ। তাঁদের চেনা দায়।'

সুকুমারের নিন্দা দিয়েই বন্দনা শুরু করেছিল শুক্লা। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'তার চেয়ে যে মানুষ কাউকে ঘৃণা করে, কারো সঙ্গে ঝগড়া করে, কাউকে ভালোবাসে তাকে বোঝা যায়, বিশ্বাসও করা যায়।'

সুকুমার বলেছে, 'দেখুন, এখানে যতদিন আছি, আমিও আপনার বিশ্বাসভাজন হতে চাই। আপনি বলে দিন এখানে কাকে ঘৃণা করব, কার সঙ্গে ঝগড়া করব আর কাকে ভালোবাসব।'

শুক্লা আরক্ত মুখে বলেছিল, 'যান্, আপনার সঙ্গে আমি আর কথা বলব না।'

একটু বাদে বলেছিল, 'একি আপনার মেডিসিন আর ডায়েট যে পদে পদে বলে বলে দিতে হবে?'

সুকুমার তেমনি হেসে বলেছিল, 'থাক আর বলতে হবে না।'

শুক্লা বলেছিল, 'আপনি সব কথারই যদি এমন বাঁকা অর্থ করেন, আপনার সঙ্গে আর কথাই বলব না।'

কিন্তু কথা না বলে শুক্লা পারেনি। কথা বরং মাঝে মাঝে দীপালি বন্ধ করেছে। যখন হিংসা কি ঈর্ষ্যার কোন কারণই ছিল না, তখন থেকেই হিংসা করতে শুরু করেছে। নার্সদের মধ্যে পেশেন্টদের মধ্যে সুকুমার আর শুক্লার ঘনিষ্ঠতার কথা রটিয়েছে। নিজের আচরণ দিয়েই নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে দীপালি। নইলে ওর সঙ্গেও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখতে পারত সুকুমার। দীপালি বরং মাঝে মাঝে শুক্লার বিরুদ্ধে দুটি একটি কথা বলে সুকুমারের মন সংশয়ের আঁধারে ভরে দিয়েছে। সুকুমারের আগেও শুক্লার জীবনে নাকি অনেকে এসেছে। কখনো বা একে একে কখনো বা একসঙ্গে। মেয়ে ওইটুকু হলে কি হবে ও আসলে একটি ধানীলঙ্কা। সুকুমার যেন আগে থেকেই সাবধান হয়, নইলে ভবিষ্যতে পস্তাতে হবে। চোরাবালির ওপর দিয়ে যে হাঁটতে যায় তার প্রতিপদে বিপদ। একেবারে অপদস্থ হওয়ার আগে সুকুমার যেন সাবধান হয়। সুকুমার অবশ্য ভয় পায়নি। তার আছে কী যে বাটপাড়কে ভয় করবে? সে দিয়েছে কী যার জন্যে অনুতাপ করবে? সোনা নয়, দানা নয়

অর্থ নয়, সম্পদ নয়, সুখের কথা ছাড়া সে কিছুই কারো জন্যে ব্যয় করেনি। কিন্তু শৈলেনবাবুর কথা যখন দীপালি বলত, সুকুমারের মনে খোঁচা না লেগে যেত না। তিনি তো শুধু অতীত নন, তিনি বর্তমান কে জানে হয়তো ভবিষ্যৎ। তাঁর সোর্সেই নাকি এখানে শুক্লার চাকরি। তিনি বিশেষ অনুগ্রহ করেন শুক্লাকে। সেই কৃতজ্ঞতায় শুক্লা তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে, মাঝে মাঝে তাঁর কোয়ার্টারেও যায়। এতে দোষের কিছু নেই কিন্তু দীপালি বিশেষ একটু ব্যঞ্জনা দিয়ে কথাগুলি বলে। যাতে শব্দগুলির অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। শুক্লা এসব শুনে রাগে জ্বলে ওঠে। কিন্তু সেই জ্বালার আগুনে সুকুমারের মনের সব সংশয় দূর হয় না। শুক্লা বলে, 'অমন আমিও বলতে পারি। এখানে আসবার আগে কাঁচড়াপাড়ায় ওর কজন ছিল ওকে জিজ্ঞেস করে দেখো। সেই সাধের মায়না কেন ছেড়ে এসেছে তাও ওকে জিজ্ঞেস কোরো। ও নিজের দোষে সব হারিয়েছে, এখন কারো পাওয়া দেখতে পারে না।' 'ওরা কেউ কাউকে ক্ষমা করে না', কেউ কাউকে ছেড়ে দেয় না। শুক্লার এই ক্ষুদ্রতার সঙ্কীর্ণতা সুকুমারকে আঘাত করে। দীপালি বলে বলুক শুক্লা কেন অমন মুখ বাঁকিয়ে কথা বলবে? অমন করলে ওকে যে বিশ্রী দেখায় তা কি শুক্লা জানে না; শৈলেনবাবুর পক্ষেও অবশ্য বলবার কথা আছে। শুক্লার সঙ্গে যদি তাঁর বিশেষ সম্পর্কই থাকবে, সুকুমারের সঙ্গে ওর মেলামেশা তিনি কেন সহ্য করবেন? সুকুমার যত সোপনেই দেখা সাক্ষাৎ করুক তিনি কি আর কিছু শোনেন না; কিন্তু শৈলেনবাবু এখনো অবিবাহিতা। কে জানে কে কাকে কতখানি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে? কে কাকে কিসের জন্যে কতখানি প্রশ্রয় দেয় সে কথা কে বলতে পারে? হয়তো শৈলেনবাবু ঘুঘুকে ডাকবার মত যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন নি। তার মত দুর্বল রোগগ্রস্ত নিঃস্ব বেকার, পরের দয়ার ওপর নির্ভরশীল, অস্থায়ী অতিথিকে দূর থেকে স্নেহ বাস্প পরিহাসের তীরে মাঝে মাঝে বিদ্ধ করেছেন। হাত দিয়ে ছোঁননি, মশা মারতে কামান দাগেননি এমনও হতে পারে। সুকুমার আজ বিদায় নিয়েছে, এখন তিনি নিষ্কণ্টক হয়ে রইলেন। আর সহস্র সংশয়ের কাঁটায় বিদ্ধ ক্ষয় মন নিয়ে সুকুমার ফিরে চলল।

'ও মশাই আপনি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?' ট্রেন যে এসে গেছে, উঠুন উঠুন।

ইংরেজী থ্রিলারখানা বন্ধ করে ভদ্রলোক ওয়েটিংরুমের বাইরে এসে কুলি কুলি করে ডাকতে লাগলেন।

সুকুমারের কুলির দরকার নেই। সে স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এসে যে থার্ড ক্লাস কামরাখানা সামনে পেল তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। গাড়ির ব্যাপারে সে বড় নার্ভাস। সব সময় আতঙ্ক, এক সেকেণ্ড দেরি হলে ট্রেন তাকে ফেলে চলে যাবে। সে সিগন্যালের আলোর সঙ্কেতের দিকে তাকায় না, গার্ডের হাতের নিশানের মধ্যে কোন নিশানা খুঁজে পাওয়ার কথা তার মনে থাকে না।

গাড়িতে উঠে বসবার পর তার মনে পড়ল ওয়েটিংরুমের ভদ্রলোককে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে আসা হয়নি। অন্যায় না হোক বড় অভদ্রতা হয়েছে।

স্টেশনে বেশি লোক নামলও না, উঠলও না। সে ভদ্রলোক বোধ হয় ফার্স্ট ক্লাস কি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ মালপত্র তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর মত ছিল না। দু' মিনিট যাদেই গার্ডের হুইসেল পড়ল। নিশ্চল যানযান সচল হয়ে প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে ছুটতে লাগল।

আর হঠাৎ অদ্ভুত অজানা এক আবেগের বাষ্প সুকুমারের বুক থেকে গলা পর্যন্ত পূর্ণ করে দিল।

ঠিক সন্ধ্যার সময় ছেড়েছে গাড়ি। কোন জায়গা ছেড়ে যাওয়ার পক্ষে এই সন্ধ্যাটা বড় খারাপ। দিনের আলো দুপুরের খর রোদ অনেক ভালো এর চেয়ে। সন্ধ্যার সময় মন এমনিতেই বিষণ্ণ থাকে। কোন জায়গা ছেড়ে চলে এলে সে বিষণ্ণতার যেন আর সীমা থাকে না। কার জন্যে মন এমন করে কাঁদে? কার জন্যে হাহাকার করে? অবুঝ মনের কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। এর কি কোন মানে হয়? জীবনে এমন কত গিট পড়বে, কত গিট ছিঁড়বে। সারাটা জীবনই তো এই গিট বাঁধা গিট ছেঁড়ার পালা।

গাড়িটায় তেমন ভিড় নেই। সুকুমার বসবার জায়গা পেয়েছে। হয়তো একটু রাতে শোবার জায়গাও পাবে। তার বেঞ্চটায় জনচারেক লোক অবশ্য বসেছে। ওদের দু' একজন কি মাঝের কোন স্টেশনে নেমে যাবে না?

বেশ খিদে পেয়েছে সুকুমারের। বিকেলে হাসপাতালে দুধ ডিম কলটস জোটে। আজ আর কিছু পেটে পড়েনি। হঠাৎ মনে পড়ল খাবারের কথা বলেছিল শুক্লা। সুটকেসে নিশ্চয়ই কিছু খাবার-টাবার রেখে দিয়েছে। চাবিটা আবার হারায়নি তো? সুকুমার কুল পকেটে হাত দিয়ে দেখল না চাবিটা ঠিকই আছে।

তাড়াতাড়ি সুটকেস খুলল। আর কিছু আছে কি না আছে দেখবার আগে খাদ্যের সন্ধান করল সুকুমার। হ্যাঁ আছে। টিফিন ক্যারিয়ারের একটি বাটিতে আট দশখানা লুচি আর সেই সঙ্গে ডিম আলুর তরকারি করে দিয়েছে শুক্লা। রান্নার ঠাকুরকে বিশেষ অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছে নাকি নিজের হাতে করেছে? যা হোক, খাওয়া তো যাক। এখন পেটের যা অবস্থা তাতে ঠাকুরের রোমশ হাত, আর ঠাকুরাণীর কোমল পেলব হাতের মধ্যে কোন বৈষম্য বিচার নেই। খাদ্যের সঙ্গে পানীয়ের সমস্যা। কিন্তু এখন আর তা পাওয়া যাবে না। দু' একটা স্টেশন আরো অপেক্ষা করতে হবে। উঠে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এল সুকুমার। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ফেলল। মনে পড়ল যে রুমাল দিয়ে রক্ত মুছেছে সে রুমাল এখন আর নেই। কে জানে আবার সেই রক্তাক্ত দিন এসে হানা দেবে কিনা।

আরো কিছু দিয়েছে কিনা শুক্লা সুটকেস খুলে দেখতে বসল সুকুমার। না আর কিছুই দেয়নি। খাদ্য দিয়েছে, পানীয় দেয়নি। হাতখানা দিয়েছে ওষাধের দেয়নি। সুকুমারের জামা-কাপড় একখানা মোটা চাদর আর তারই খানকয়েক বই। তার মধ্যে একখানি সঞ্চয়িতা আর একখানা কীটসের কাব্য আর নির্বাচিত গদ্য রচনা সংকলন। সুকুমারের দুই বন্ধু অচিন্ত্য আর মনীশ উপহার দিয়েছিল। ওরা জিয়োলজির ছাত্র কিন্তু অসাধারণ ওদের কাব্য সাহিত্য প্রীতি। কীটসের বইখানা হাতে তুলে নিল সুকুমার। আশ্চর্য বইয়ের ভিতর থেকে নীলাভ রঙের একখানা খাম একটু যেন মুখ বার করে রয়েছে।

সেই নীল রঙটুকু দেখে হঠাৎ সমস্ত দুনিয়া নতুন করে রঙে ভরে উঠল সুকুমারের। খামের মুখ বন্ধ। ওপরে মোটা মোটা অক্ষরে বাংলায় সুকুমারের নাম লেখা।

চিঠিখানা বেশ ভারি। অনেক পাতার চিঠি লিখেছে নাকি শুক্লা? কী লিখেছে তা পড়বার জন্যে যদিও সুকুমারের মনচঞ্চল হয়ে উঠেছে, বুক টিপ টিপ করছে, তবু এখনই এ চিঠি সে খুলবে না। একেবারে কলকাতায় গিয়ে খুলবে। রাত পোহালেই তো কলকাতা।

কীটসের বইখানা খোলাই পড়ে রয়েছে। কোন জায়গাটায় চিঠিখানা ছিল এবার তা লক্ষ্য করে দেখল সুকুমার।

The day is gone. কবিতাটি চিঠিতে চিহ্নিত ছিল।

আশ্চর্য, এটা কি শুক্লার ইচ্ছাকৃত না আকস্মিকতা? বহুবার পড়া মুখস্থ করা কবিতাটি সুকুমার আবার পড়তে লাগল—

The day is gone and all its sweets are gone!
Sweet voice, sweet lips, soft hand and softer breast.

সহযাত্রীদের অবাক করে কৌতূহলী করে সুকুমার শব্দ করে পড়তে লাগল,

'Faded the flower and all its budded charms
Faded the sight of beauty from my eyes
Faded the shape of my from my arms.'

বই বন্ধ করে সুকুমার কের নিজেকে জিজ্ঞাসা করল, 'এটি ইচ্ছাকৃত না আকস্মিক?'

নিজেই যেন নিজের দৈবজ্ঞ।

চিঠিখানা বুক পকেটে রেখে দিল সুকুমার। বইয়ের মধ্যে আর রাখল না।

বইয়ের মধ্যে চিঠি ভরে দেওয়া শুক্লার নতুন নয়; আগেও ভরে দিয়েছে। অবশ্য এত বড় চিঠি নয়, ছোট ছোট টুকরো চিঠি। সুস্থ হয়ে সুকুমার তখন স্যানাটোরিয়ামে লাইব্রেরীয়ানে কাজ নিয়েছে। সন্ধ্যের গ্রন্থগারিক সকালে একঘণ্টা বিকেলে একঘণ্টা খোলা লাইব্রেরী। তার হাত থেকে রোগীরাও বই নিত, নার্সরাও বই নিত। কেউ বা নিজের হাতে, কেউ বা পরের হাতে। শুক্লার ফেরত দেওয়া একখানা বইয়ের মধ্যে একখানা চীরকুট একদিন দেখতে পেল সুকুমার। নায়কের সঙ্গে লাইব্রেরীয়ানের চরিত্রের খুব মিল। সেইজন্যেই কি বইখানি বেছে বেছে দেওয়া হয়েছে?'

কী দুঃসাহসিক কাজ আর কী ছেলেমানুষি। বইয়ের মধ্যে কি কেউ এমন করে চিঠি গুঁজে দেয়? যদি কারো চোখে পড়ত!

এবারের চীরকুট বইয়ের মধ্যে গুঁজে দেয়নি, অন্যভাবে ওর হাতে পৌঁছে দিয়েছিল—সুকুমার এবারে যে বইখানা পাঠানো হল তার নায়িকার সঙ্গে পাঠিকার মিল থাকবে।

কিন্তু এই বিনা নামে, বিনা স্বাক্ষর সম্বোধনে ভাববাচ্য পত্র বিনিময়ের দরকার ওদের আর বেশি দরকার হয়নি। সুকুমারই আগে থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল। সাবধান করে দিয়েছিল শুক্লাকে। লেখালেখির খেলায় বিপদ আছে।

কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ানো বন্ধ করেনি। তাতেও বিপদ কম ছিল না।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে সুকুমার তখন সকালে বিকালে বেড়াবার অনুমতি পেয়েছে। আরো অনেক পেসেন্ট বেড়াতে বেরোত। বেড়াবার জায়গা অনেক আছে, যার যেদিকে খুশি সেইদিকে যেত। সুকুমার যেত পাহাড়গুলির দিকে। দুপাশে সবুজ ধানের ক্ষেত দেখত। দেখতে দেখতে সেই ক্ষেতের রঙ সোনালী হয়ে উঠত। আকাশে অস্তসূর্য সোনা ছড়াত। আর তালগাছগুলির আড়ালে একজন স্বর্ণময়ী তার জন্যে অপেক্ষা করত। চারদিকে টিলা পাহাড় আর বুক উঁচু ঢেউ খেলানো জমি। সুকুমার কোন দিন বা শিলাসন বেছে নিত, কোন দিন বা সবুজ ঘাসের আসন। বেড়াতে আসবার

ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা শুধুই সর্বাধিক প্রচারিত নয়, সর্বাধিক জনপ্রিয়ও। তার কারণ অনেক। নির্ভীক ও বলিষ্ঠ সম্পাদকীয়, সুসম্পাদিত সংবাদ পরিবেশন আর বহুবিধ বিশেষ প্রবন্ধমালা।

যে-কোনো দিনের কাগজ বৈচিত্র্যে,
সুমুদ্রণে ও স্বকীয়তায় আপনাকে
মুগ্ধ করবে।

সংবাদপত্র জগতে নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্য এনেছে আনন্দবাজার পত্রিকা

দেশের সেরা

দেশ

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্য রচনা, কার্টুন, রসরচনা, বিচিত্র বার্তা, রঙ্গজগৎ, সঙ্গীত, পুস্তক সমালোচনা, ক্রীড়াজগৎ প্রভৃতি বহুবিধ রচনায় ভরপুর।

খ্যাতনামা লেখকেরাই দেশ পত্রিকায় লেখেন।

যেখানে প্রতিদিন দৈনিক কাগজ পৌঁছায় না, দূর গ্রামে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের জন্যে আছে—

অর্ধ-সাপ্তাহিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

প্রতি সোম ও শুক্রবার

প্রতি সংখ্যায় থাকে নিয়মিত সংবাদ, সম্পাদকীয় এবং রবিবাসরীয় বিভাগের বিশিষ্ট রচনা।

ইংরেজী খবরের কাগজ যাঁরা পড়েন তাঁদের জন্যে আছে

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড

এমন ভাল কাগজ আর দ্বিতীয় একখানি নেই

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড
৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১

সময় শুক্লা আর শুভ্রবসনা হয়ে আসত না। কোনদিন সবুজ শাড়ী পরত, কোনদিন নীল, কোনদিন বা চাঁপা রঙের। খোঁপায় কোনদিন বা গোঁজা থাকত রক্ত গোলাপ, কোনদিন বা বেল কি যুঁইয়ের মালা করবীকে বেড়ে রাখত। কোনদিন বা ওসব কিছুই থাকত না। শুধু ফণিনীর মত বেণীটি দুলত।

বসে বসে নিজের জীবনের কথা বলত সুকুমার। সে কথা শোনার জন্যে পার্শ্ববর্তিনীর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। বাপ মারা যান সুকুমার যখন মায়ের পেটে। মা মারা যান, মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াবার সময়। কারো কথাই সুকুমারের আর মনে নেই। মনে আছে কাশীতে মামা-মামীর কথা। কিন্তু সে স্মৃতি সুখকর নয়। ছেলে বয়সে স্কুল পালাত। আর মামীর হাতের মার খেত, মামার হাতের মার খেত। মামাত বোনেরাও ছেড়ে দিত না। স্কুলের পাঠ শেষ করে পালাল মামাবাড়ি থেকে। কলকাতায় এসে কত জায়গায় যে রইল তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই। গৃহশিক্ষকের কাজ কখনো বা বাজার সরকারি, কখনো বা ওষুধের দোকানে, কিছুদিন বা উকিলের সেরেস্তায় রাত্রি বাস করে করে বি. এ.টা পাস করল। শেষের দিকে খেত পাইস হোটেলে, থাকত সস্তা মেসে। একদিন রক্ত বমি করে বিছানা ভাসিয়ে দিল বলে সে আশ্রয় পেল। দু'একজন বন্ধুর চেষ্টায় বেড পেল মেডিক্যাল কলেজের এন. টি. বি. ওয়ার্ডে। এই শুশ্রূষা নিলয়ের সেক্রেটারীর সঙ্গে সেই ওয়ার্ডের একজন ডাক্তারের বন্ধুত্ব ছিল। তাই অনেক ঘাট ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত এই রক্তের হাটে আসতে পেরেছে সুকুমার।

শুক্লাও বলেছিল তার জীবনের কথা। প্রায় সমান্তরাল কাহিনী। যে কথা আর কাউকে বলেনি সেকথা সুকুমারের কাছে বলতে তার সংকোচ হয়নি।

ঘাটশিলায় শুক্লার মা আছেন। বাবা নেই। তিনি টি. বি.তে মারা গেছেন বছর কয়েক আগে। কিন্তু চলে যাওয়ার আগে বলে দিয়ে গেছেন সব রহস্য। ঘাটশিলার মা তার আপন মা নন, বাবাও পর। শুক্লা হাজারীবাগের হাসপাতালে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। বাবা সেখানে কাজ করতেন। মার তখন নিজের ছেলেমেয়ে হয়নি। তাই শুক্লাকে প্রথম সন্তান বলে কোলে তুলে নিয়েছিল। তারপর তাঁর কোলে আরো পাঁচটি এসেছে। শুক্লা তাঁদের কাছ থেকে পালিয়ে আসেনি, বলে-কয়েই এসেছে। তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক এখনো আছে। তবে তা বড়ই ক্ষীণ, এসেছে হাসপাতালে। এইরকম একটি হাসপাতালেই সে পরিত্যক্ত হয়েছিল। সে হাসপাতাল অবশ্য সাধারণ হাসপাতাল ছিল, টি. বি. হাসপাতাল ছিল না। কিন্তু শুক্লার বাবা অন্তত যাকে সে বাবা বলে জানত, বাবা বলে ডাকত, এই রোগেই মারা গিয়েছে। তাই এই রোগের শুশ্রূষাই সে বেছে নিয়েছে। বাবা তাকে বড় ভালোবাসতেন। বলতে বলতে শুক্লার দুটি চোখ সজল হয়ে উঠেছিল।

সুকুমার তার হাতখানি হাতের মধ্যে নিয়ে বলেছিল, 'আমরা দু'জনে রাজযোটক। আমাদের মিলন কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

সারারাত গাড়িতে শোয়ার জায়গা পেল না সুকুমার। হেলান দিয়ে বসে রইল। তবু ঘুম এল। স্বপ্ন এল কোন পথ দিয়ে কে জানে। গাড়ির গোলমালে ছোট বড় নানা স্টেশনের হৈ-চৈ-তে কতবার যে ঘুম ভাঙল, স্বপ্ন ভাঙল, কতবার যে সেই হাতখানা ধরল আর ছাড়ল তার ঠিক নেই।

হাওড়া স্টেশনে আসবার আগেই ভোর হয়ে গেল। কি একটা যেন গোলমালে প্যাসেঞ্জার ট্রেন আটকে পড়েছিল পথের মাঝখানে। ছাড়া পেয়ে আবার ছুটেছে।

ভোরের আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বুক পকেটের চিঠিখানার দিকে চোখ পড়ল সুকুমারের। হাত মুখ ধোয়ার আর সবুর সইল না। কলকাতায় গিয়ে পৌঁছাবে তেমন ধৈর্য কোথায়।

খামের মুখটি সংযত সন্তর্পণে ছিঁড়ে ফেলল সুকুমার। চিঠিতো না, যেন কারো নধনী কোমল তনু দেহ, তাতে আঁচড় না লাগে। তা যেন কোন আঘাত না পায়, ব্যথা না পায়।

কিন্তু একি, শুধু চিঠি তো নয়। অনেকগুলি নোট যে, দশ টাকার দশখানি নোট। আশি টাকা করে তো মাইনে পায় গুরু। এত টাকা জমাল কী করে, জমাল কতদিনে। নোটগুলি ভাঁজ করে খামের মধ্যে রেখে দিয়ে সুকুমার চিঠিখানা পড়তে লাগল। বড় চিঠি না, তবে সেই বইয়ের মধ্যে গুঁজে দেওয়া টুকরো চিঠির চেয়ে অনেক বড়।

গুরু লিখেছে—

সু,

তুমি সেই প্রথম দিন আমার চিঠি দেখে রাগ করেছিলে মনে আছে? তারপর থেকে ভেবেছিলাম তোমাকে আর চিঠি লিখব না, লিখিওনি। কিন্তু আজ আর না লিখে পারলাম না। কিন্তু নতুন কীই বা আর লিখব? যা বলিনি, এমন কোন্ কথাই বা আছে। না লিখে কথা বললাম। আছে আরো অনেক কথা আছে। কিন্তু সেগুলি বলবার মত নয়। আজকের দিনে তো নয়ই। আজ শুধু একটি কথা বলব, আমাকে ভুলে যেয়ো। আমার সব কথা ভুলে যেয়ো। মনে কোরো আমি তোমাকে ভুলিয়েছি। রোগীদের অনেকভাবে ভোলাবার বিদ্যে আমাদের শিখতে হয়। ভুলিয়ে তাদের ওষুধ খাওয়াতে হয়, পথ্য খাওয়াতে হয়, আরো কত কী করতে হয়। আমি সেই সব করেছি। আমি সেই শেখা বিদ্যা তোমার ওপর খাটিয়েছি। পাস করেছি কি ফেল করেছি জানিনে। আমাকে ভুলে যেয়ো। আমি তোমার যোগ্য নই। তুমি আমাকে বুকে তুলে নিতে চেয়েছিলে, কিন্তু আমি তোমার পায়ের তলায় বসবারও যোগ্য নই। কিন্তু প্রণাম করতে তো পারি। সেই প্রণামী বাবদ দিলাম এই কটি টাকা। শরীরের যত্ন কোরো। ঘর, নিতে যদি মন না সরে, যদি ঘৃণা হয় তার বলে নিয়ো, পরে সুবিধে মত একদিন শোধ করে দিয়ো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দিয়ো না। ইতি—

তোমার গুরু

চিঠি শেষ করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সুকুমার। হাওড়া স্টেশনে কখন যে গাড়ি ইন করল তাও যেন তার খেয়াল রইল না।

লোকজন নামতে লাগল। সুকুমার তবু বসেই রইল।

হঠাৎ সুধীন দত্তের কবিতার দুটি লাইন তার মনে পড়ে গেল। সম্প্রতি প্রিয় কবির খুবই সহজবোধ্য দুটি লাইন।

'সে ভোলে ভুলুক, কোটি জন্মান্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।'

যেন নতুন শক্তি পেল সুকুমার, বাঁচবার নতুন সম্পদ।

সুটকেস হাতে নেমে পড়ল সুকুমার। দেখে খুশি হল, অচিন্ত্য আর মণীশ দুজনেই এসেছেন।

অচিন্ত্য বলল, 'কাল এসে শুনলাম গাড়ির গোলমাল। আজ যে সে গোলমাল মিটেছে এই ভাগ্য। খুব মোটা হয়েছিস্ তো।

সুকুমার বলল, 'তাই নাকি!'

মনীশ বলল, 'কী বিড় বিড় করছিলি বল তো?'

সুকুমার বলল, 'ও কিছু না।'

অচিন্ত্য বলল, 'আরে বলই না। কবিতার মত লাগছিল যেন।'

সুকুমার বলল, 'শুনে ফেলেছিস' তবে শোন—

'সে ভোলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।'

যেতে যেতে অচিন্ত্য আর মনীশ দুজনেই থমকে দাঁড়াল। চিঠিপত্রে একটু একটু আভাস ওরা আগেই পেয়েছে। এবার ইসারাটাও পেল।

অচিন্ত্য বলল, 'ও হতভাগা, তুমি তাহলে মরে ভূত! শুধু শবদেহটি বয়ে নিয়ে এসেছ। মনীশ আর দাঁড়িয়ে দেখছিস কি। হরিধ্বনি দিয়ে ওকে কাঁধে তোল।'

কাঁধে না তুললেও দুই বন্ধু ওর দুই কাঁধে হাত রেখে সুকুমারকে প্লাটফরমের বাইরে নিয়ে এল।

ট্যাক্সীর চেষ্টা করল না। মালপত্র তো সঙ্গে বিশেষ নেই। সুটকেসটা মনীশ ওর হাত থেকে কেড়ে নিল। দুজনেই বেশ স্বাস্থ্যবান যুবক। কলজাতে বেশ ছোট। ওরা ভূত নয়, ভূতাধিক।

তিনজনে এসে ওঠে এগারো নম্বর বাসে। গঙ্গা পেরোতে পেরোতে অনেকদিন পরে কলকাতার মুখ দেখতে পেল সুকুমার।

রোদ উঠেছে। চলাচল শুরু হয়ে গেছে। মাত্র একটি দিন আগের সেই শান্ত শুদ্ধ বিলয় যেন এরই মধ্যে অনেক দূরে সরে গেছে। শুধু একখানি মুখ। সে মুখও অস্পষ্ট। আলোছায়ার জোরঙা ওড়নায় ঢাকা।

অচিন্ত্য বলল, 'ধ্যানী মুনীর মত গুম মেরে বসে আছিস যে। চেয়ে দেখ কোথায় এলি। চিনতে পারছিস্, না কি এগারো মাসেই একেবারে বারোটা বেজে গেছে?'

বুকপকেটটা ঠিক আছে কিনা একটু দেখে নিল সুকুমার। তারপর সামনের দিকে তাকাল। মহানগরের প্রবেশপথ এর মধ্যে জনাকীর্ণ।

রিষ্টের বাটের শেষে, শুরুতেই বড় বাজার।

—শেষ—

Why this symbol now means more to you

Familiar as you are with this symbol as the mark that identifies the finest products in tyres, tubes and automotive accessories, it now gains added significance at Goodyear India's giant factory goes into production on a 70-acre site at Ballabgarh, 21 miles from New Delhi.

Representing a capital investment of Rs. 6 crores this factory houses the most modern tyre-making machinery including the revolutionary, exclusive 3-T Process developed by Goodyear India's American associates after 5 years of research and an expenditure of 5 million dollars.

The Indian factory is the 59th Goodyear plant in the world .. the latest manufacturing unit to help further Goodyear's programme of serving people everywhere, in all walks of life. This factory will have full access to the experience, know-how and technical resources of the vast Goodyear international organisation, which is continually engaged in developing new products and improved processes.

At Ballabgarh, Goodyear India has not merely laid the foundation of a factory but also of an ideal—the ideal of serving India's expanding economy and at the same time, building an international edifice of progress and goodwill.

GOODYEAR

WORLD'S LARGEST TYRE COMPANY

JWTG 4501R

বাংলার মন্দির প্রাচীরে সমসাময়িক সমাজচিত্র

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে কবে মূর্তিপূজার প্রবর্তন হয় এবং মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম মন্দির তৈরী হয় তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা বোধ হয় ব্যাপকভাবে মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত ছিলেন না এবং হরপ্পা বা মহেঞ্জোদরোতে মন্দির বলা যায় এমন কোন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় নাই। বেদের আমলেও মন্দির নির্মাণের প্রচলন ছিল বলে মনে হয় না। পরবর্তী যুগে কিন্তু মন্দির নির্মাণ শিল্পে ভারত প্রভূত গৌরব অর্জন করে। নির্মাণ কৌশলে ভারতের মন্দিরগুলি যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনার বিকাশ, কর্মের সাহসিকতা ও সমাজমনের পরিচয় হিসাবেও এগুলি তেমনি উল্লেখযোগ্য।

মধ্যভারতের বেসনগরে খ্রীষ্ট জন্মের অনধিক একশত বছর আগেকার এমন কয়েকটি লেখা পাওয়া গিয়েছে, যাতে ঐখানে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মন্দিরের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। বেসনগরের এই অধুনা বিলুপ্ত মন্দিরগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর কোন মন্দিরের অস্তিত্বের কথা এখনও জানা যায় নাই। এরপরই গুপ্তরাজাদের আমলের তৈরী কয়েকটি মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পাথরের তৈরী এই মন্দিরগুলিতেই পরবর্তী কালের নাগর বা উত্তর ভারতীয় এবং দ্রাবিড় বা দক্ষিণ ভারতীয় রীতির মন্দিরের গঠনের আভাষ পাওয়া যায়। মন্দিরগুলির প্রারম্ভিক অবস্থার রূপ ছিল ছোট চতুষ্কোণাকৃতি কুঠুরির মত; দেওয়ালগুলি ছিল সমান ও মসৃণ, ছাত ছিল সমতল। এই মন্দিরের যা কিছু কারুকার্য ছিল মন্দিরের সামনেকার দরজার ধারে। ক্রমে নীচেকার কুঠুরীর ওপরে আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাওয়া ধাপের মত অংশ জুড়ে দিয়ে শিখর নির্মিত হল। সেই সঙ্গে চৌকোণা ভিত্তি নক্‌শার প্রতি বাহুর মাঝখানের অংশ বাড়িয়ে দেওয়া হল। এমনি করে মন্দিরের নক্‌শায় আর গড়নে নানা রকমের বৈচিত্র্যের সমাবেশ হল। মন্দিরের গর্ভগৃহ তিনদিকে বন্ধ; একদিকে ছোট দরজা দিয়ে প্রবেশের পথ। এই ব্যবস্থার ফলে মন্দিরের ভেতরটা প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকার অবস্থায় থাকে এবং একমাত্র প্রদীপের আলোতেই এখানকার দ্রষ্টব্যগুলি দৃষ্টিগোচর হয়। অনুমান হয় যে মন্দির নির্মাতারা ইচ্ছা করেই মন্দিরের অভ্যন্তরের অংশ এমনি অন্ধকারাচ্ছন্ন করে নির্মাণ করতেন; এখানে ঘৃতপ্রদীপের অনুজ্জ্বল দীপ্তিতে ভক্ত তীর্থকামী আকুল আগ্রহভরে প্রতীক্ষার অবসানে আপনার বাঞ্ছাতীত দেবতার দর্শন লাভে ধন্য হত। এই ব্যবস্থার মধ্যে ইঙ্গিতময়তার প্রাধান্য স্বভাবতই লক্ষ্য না করে পারা যায় না। এই প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে যে মন্দিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ভিত্তি নক্‌শা ও অলঙ্কার সবই ইঙ্গিত গর্ভ এবং সচেষ্ট প্রয়াসের সৃষ্টি, গর্ভগৃহের উপরে সন্নিবিষ্ট শিখরের ধাপগুলি একাধারে মানুষের ঊর্ধ্বদেহ এবং ক্রমে মানুষের স্তরের পর স্তর অতিক্রম করে ঊর্ধ্বতন লোকে আরোহণ করবার প্রয়াসের দ্যোতক। ভিত্তি নক্‌শায় রজঃগুলের অনুক্রমে বিন্যাস ও স্থান শুদ্ধির পরিচয় নিহিত রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। একদিকে মন্দিরের দেহকে যেমন মানবদেহের সঙ্গে তুলনা করে, তার বিভিন্ন অংশের নামকরণ করা হয়েছে দেখা যায় তেমনি স্তরে স্তরে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, জন, মহঃ, তপ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন লোকের অন্তিঃ প্রকাশের কল্পনাও লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয়

মানুষের ক্রিয়াকলাপের এবং সাধারণ দৃশ্যাবলীর অবতারণা দেখা যায়। কালের দিক থেকে বোধ হয় এই পাহাড়পুরের মন্দিরেই সর্বপ্রথম আপাতদৃষ্টিতে ধর্মনির্ভর নয় এমন চিত্র সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল বলে অনুমান হয়। এর আগে বাংলা ও উত্তর ভারতের নানা জায়গা থেকে মৃন্ময় উপকরণে উৎকীর্ণ সমাজচিত্রের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রীষ্টজন্মের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই পোড়ামাটিতে এই ধরনের ছবি ছাঁচ ঢেলে তৈরী করবার চলন হয় আর সেগুলি খুব জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠে। এইসব ছবিতে প্রচলিত রূপকথা ও সামাজিক আখ্যান যেমন শকুন্তলার কাহিনী, উদয়ন বাসবদত্তার গল্প ইত্যাদি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই ধারায় সাধারণ সমাজচিত্রেও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে এবং সাধারণ জীবনের নরনারী, প্রেমিক-প্রেমিকা, গৃহকর্ম ও প্রাত্যহিক কার্যকলাপ, হাতী, ঘোড়া, রথ, পাল্কী ইত্যাদির ছবি ব্যাপকভাবে তৈরী হতে থাকে, এবং সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। এই প্রবহমান ধারা থেকেই মন্দিরসজ্জায় নিয়োজিত শিল্পীরা যে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পোড়ামাটির ক্ষুদ্রায়তন ফলকের মধ্যে যার সংবেদন ছিল সীমাবদ্ধ, মন্দির প্রাচীরের বিস্তৃততর পরিসরে সেই শিল্প ব্যাপকতর ক্ষেত্র লাভ করল; ফলে এই শিল্পের এক নূতন পরিণতি ঘটল।

পাথরের সহজলভ্যতার প্রাচুর্য না থাকায় বাংলার মন্দির-নির্মাতারা স্বভাবতই ইঁটের ব্যবহারে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য পাথরে নির্মিত মন্দিরের প্রাচীর সজ্জাতে যদিও শ্রম ও অধ্যবসায় প্রয়োগে কিছুমাত্র ন্যূনতা দেখা যায় না, তাহলেও মাটির ফলকে উৎকীর্ণ চিত্রে গতিবিভঙ্গ অধিকতর সহজসাধ্য! স্বল্পতর শ্রমে ব্যাপকতর চিত্ররচনার সুযোগ থাকায় স্বভাবতই এই চিত্র বিস্তৃততর ক্ষেত্র এবং ব্যাপকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

বাংলাদেশের পাহাড়পুরের মন্দিরের গায় যে ধরনের ফলক পাওয়া যায় ঢাকা জেলার সাভারে, কুমিল্লার ময়নামতিতে এবং আরও নানা জায়গায় ঐ ধরনের ফলক পাওয়ায় অনুমান হয় যে, বাংলা দেশের বহু অঞ্চলের মন্দিরেই অনুরূপ ফলক সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল। মুসলমান আক্রমণের পরে কিছুকাল বাংলাদেশে মন্দির নির্মাণে যেন বাধার সৃষ্টি হয়েছিল এ অনুমান সহজেই করা চলে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলার সমাজজীবন আবার প্রতিষ্ঠা অর্জন করে এবং নব জাগ্রত সমাজের—অনুকূলে মন্দিরনির্মাণ শিল্প আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বাংলার বিস্তৃত নগর ও জনপদগুলিতে স্থপতি আর ভাস্করেরা আবার কর্ম-মুখর হয়ে ওঠে। এই নূতন পর্যায়ের মন্দিরগুলি মুসলমান শাসনাধীন বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিরোধের জাগ্রত সাক্ষ্য।

এই সব মন্দির নির্মাণে বাঙালী স্থপতি পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ গ্রহণ না করে স্থানীয় প্রয়োজন এবং উপকরণানুযায়ী এক নূতন শিল্পনির্দেশের সৃষ্টি করে, এই নূতন প্রকরণানুযায়ীই বাংলার নূতন মন্দির শিল্প মাথা তুলে দাঁড়ায়। বাংলার এই নূতন ধরনের পঞ্চরত্ন, নবরত্ন মন্দিরগুলির নীচেকার অংশ বাংলার নিজস্ব চালাঘরের আদর্শে তৈরী; উপরে নাগরমন্দিরের শিখর অপূর্ব কৌশলে সন্নিবিষ্ট। গর্ভগৃহের উপর একক শিখরে আবৃত রেখদেউলের রেখানির্ভর ছোতনা অধিকাংশ রক্ষিত হয়ে থাকলেও পরিসরের স্বল্পতায় এই ক্ষুদ্রতর শিখরগুলিতে ভাস্কর্যের অলঙ্করণের কোন সুযোগ রাখা হয় নাই। ফলে নীচের প্রশস্ততর প্রাচীর ব্যাপক চিত্রালঙ্করণের লীলাস্থলে পরিণত হয়। সাধারণতঃ মন্দিরের সম্মুখের অংশের মাঝখানের খিলেনশোভিত বরণ্ডা; এই বরণ্ডার উপরে এবং পাশের বিস্তৃত অংশ অলঙ্করণশিল্পীর অবাধ বিচরণের ক্ষেত্রে পরিণত হল। অধিকাংশ অলঙ্করণই আলাদা আলাদা করে ছাঁচে তৈরী করে লাগিয়ে দেওয়া হত; নয়ত মন্দিরের প্রাচীরে লাগান টালীকে নক্সা দিয়ে কেটে মূর্তিগুলিকে ফুটিয়ে তোলা হত।

এই সব ছবিতে ধর্মীয় চিত্রের সমাবেশই ছিল মুখ্য। অনেক মন্দিরের প্রবেশদ্বারের ঠিক ওপরে রামায়ণের ধনুর্ধর রাবণের সঙ্গে রামচন্দ্রের সংগ্রামের ছবি দেখা যায়। রামায়ণের নানা ছবি ছাড়া কৃষ্ণলীলার অপূর্ব ভোতনাপূর্ণ বহু ছবি ও মন্দিরের অলঙ্কারের শোভা বর্ধন করছে দেখা যায়। কিন্তু এই সব ধর্মীয় চিত্র ছাড়া মন্দিরের গায় এমন অনেক সব ছবি উৎকীর্ণ দেখা যায় যাকে ধর্মভিত্তিক বলে অনুমান করা যায় না। মন্দির নির্মাণের সমকালীন যুগের পারিপার্শ্বিক নানা দৃশ্যের নানা ঘটনার ছবি এই সব চিত্রের মধ্যে সমাবিষ্ট হয়েছে বলে সহজেই অনুভব করা যায়।

দক্ষিণ বাংলার অনেক মন্দিরে ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয়দের ব্যবহৃত অর্ণবপোতের নিখুঁত ছবি দেখা যায়। এই সব জাহাজে ইউরোপীয় ধরনের পোশাকপরা মালিমল্লার সমাবেশ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে শিল্পীরা সামরিক ঘটনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐ সব ছবি উৎকীর্ণ করেছিলেন। সব-চেয়ে রগড়ের কথা যে অনেক রামায়ণের যুদ্ধে বানর সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত রাক্ষসদের আকৃতি এবং পোশাক-পরিচ্ছদের তৎকালিন ইউরোপীয় বণিকদের হুবহু প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। পর্তুগীজ বণিকরা তখন বাণিজ্য অপেক্ষা জলদস্যুতাই অধিকতর লাভজনক বিবেচনায় দক্ষিণ বাংলায় বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করে-ছিল। বাঙ্গালী লোকশিল্পীর চোখে তারা যে বিভীষিকার সৃষ্টিকারী রাক্ষসের অনুকল্পবলে প্রতীয়মান হয়েছিল, এতে বিস্মিত হবার কিছু নাই। অনেক ফলকে পর্তুগীজ-ধর্মযাজক এবং ইউরোপীয় শিকারী কুকুরের ছবিও লক্ষ্য করা যায়; বন্দুকধারী সেপাই-এর ত কিছু অভাবই নাই। এত গেল একদিক; অন্যদিকে গৃহগত অন্তরঙ্গ সমাজের ছবিরও এই সব ফলকে কিছু অভাব নেই। হাতীঘোড়া গাড়ী পাল্কীর শোভাযাত্রার সে যুগের পথের উপর গতিশীলতা এক উজ্জ্বল ছবি পাওয়া যায়। আর আছে সুসজ্জিত গৃহ দরবার আর নানান্তরের মানুষ; দিল্লীর সম্রাটের ঐশ্বর্য বা সমারোহের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও স্থানীয় জমিদার বা নবাবরা অতি পরিচয়ের গণ্ডিতেই এই সব ছবিতে বিধৃত হয়ে আছেন। তাদের প্রাসাদের অন্দর মহল, যেখানে রাণী আর বেগমেরা বাস করেন, তাদের পোশাক-আসাক গয়না-পত্র, গড়গড়া তামাক, পরিচারিকা নফর, আসবাব-পত্র নিয়ে যে জীবন তা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে এই সব ছবিতে ফুটে আছে। দৃশ্যের পর দৃশ্যের সাহায্যে শিল্পীরা যে ছবি এই সব ফলকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার সমাজজীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অতিশয় স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বাংলার মন্দির প্রাচীরের এই ছবিগুলি শিল্পের দিক থেকে যেমন উল্লেখযোগ্য, তৎকালীন সমাজের অবিস্মরণীয় আলেখ্য হিসাবেও সেগুলি কম উল্লেখযোগ্য নয়। ধর্মীয় চিত্রের মধ্যেও শিল্পী আপনার মনের আবেগ সঞ্চার করে—উল্লেখযোগ্য অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি করতে পারেন; বিশেষ করে রামায়ণের যুদ্ধের দৃশ্যগুলি এবং কৃষ্ণলীলার নানা ব্যঞ্জনাময় কাহিনী শিল্পীর হাতে গতিশীল ছন্দোময় বৈচিত্র্যে সজীব হয়ে ওঠে। কিন্তু ধর্মের একটা সহজ সীমা নির্দেশ আছে; মানবীয় আবেগ প্রেরণা কিছু দূর পর্যন্ত এগিয়ে এলেও এই নির্দিষ্ট সীমায় বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে; তার পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে খুঁটিনাটির মধ্যে শিল্পী সেই সবেগপ্রলকে সম্পূর্ণভাবেই সঞ্চারিত করতে পারেন এবং সেই উপকরণকে সাধারণের উপভোগের সামগ্রী করে তুলতে পারেন। হিন্দুর ধর্ম মানুষের জীবনকে সর্বাঙ্গীণভাবেই স্বীকার করেছে, তার কোন অংশকেই কোন অজুহাতে বাদ দেয় নাই। হিন্দুর মন্দির মানুষের সর্বাঙ্গীণ জীবনেরই দ্যোতক; কাজে কাজেই মানুষের দেহের স্তরে স্তরে যেমন বিভিন্ন গ্রামের গুণ ও ঐশ্বর্যের সমাবেশ আছে, হিন্দুর মন্দিরের অলঙ্করণে তেমনি সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই দৈবী কাহিনীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সহজ জীবনযাত্রার কাহিনীও সন্নিবিষ্ট হয়েছে, এবং এই অলঙ্কারের ঐশ্বর্য মন্দিরগুলিকে মানবিক উপকরণ হিসাবে যে মহান ও ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মার্কিন দেশের যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি সারকথার এক কথা যে বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বসতি। তাঁকে পেতে গেলে অনন্ত হয়ে তাঁর পূজা করতে হয়, রাত্রি জাগরণ করতে হয়, তবেই তিনি আসেন দেখতে যে তার তপস্যায় একমন একপ্রাণ হয়েছে কে—কোজাগরীতে মহাতলি। সমুদ্র ডিঙিয়ে সপ্তডিঙা চড়ে সাত সমাগর চলেছেন লোক-লস্কর নিয়ে—এমনতরো কতো বনপতির কাহিনীই ত আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে আছে। সাগরে সাগরে তাঁরা শুক্তিমুক্তা কড়িয়েছেন, চন্দনকাষ্ঠের ভারে বোঝাই হয়েছে তরী, সূক্ষ্ম মসলিন তাঁরা পাঠিয়েছেন দেশে-দেশান্তরে, আরব থেকে এনেছেন তেজী ঘোড়া, ইরান তুরান থেকে তথা সুন্দরী, জাভা সুমাত্রা দ্বীপময় ভারত থেকে কতো মশলা। তাঁরা নাকি সমুদ্র পার হয়ে খাস মার্কিন মহাদেশেও পাড়ি জমিয়েছেন—মস্ত সভ্যতার দান নাকি তাঁদের, ইনকাদের সঙ্গে চলতো নাকি আদান-প্রদান, মেক্সিকোতে ছিল গমনাগমন। আবার শুনেছি কমলে-কামিনী দেখে তারা মজেছেন, বিদেশিনী তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখাদের সঙ্গে আরক্ত অধরে প্রেম বিনিময় করেছেন, স্প্রেনীদের দেখেছি শুধু রাজার সভায় নয়, মদন মহোৎসবেও, দেখেছি নিপুণিকা সোক্তনিকাদের আম্রমুকুলে কাননঘেরা বাটীতে। সাত ভাই চম্পার তবু ঘুম ভাঙেনি, সোনারবরণ পাকল বোনের ডাক সত্ত্বেও। তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে শুধু শুকসারী গেয়ে গেছে—রাই জাগো, রাই জাগো। রাই জেগেছেন, পথে-পান্থরে-ছন্দে-কীর্তনে গদগদ হয়ে ব্রজের রজঃ আমরা মাথায় নিয়েছি কিন্তু সপত্নী যে একেবারে সতীনের এলাকা থেকে অন্তর্ধান। মার্কিণ মুলুকের খাসতালুকে এসে মহা ঐশ্বর্যের নিম্নতলে বসে চল্লিশতলা বাড়ীর চোদ্দতলার এক নিভৃত ঘরে পূজনীয় তামখুড়োদের দিকে চেয়ে কানে কানে শোনা সেই তিমির হরবিদারণ মরণ বারণ মন্ত্রটি প্রাণপণে জপ করছি—টাকা, টাকা, লক্ষ্মীশ্রী কমলা বিদ্যা মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া সতী—টাকা, টাকা—ডলার, ষ্টার্লিং, মার্ক, ইয়েন্—নিউইয়র্ক, লণ্ডন, হ্যামবুর্গ, টোকিয়ো, আর টেলিভিশনের দিব্যদৃষ্টিতে চেয়ে দেখছি—

নাচত নাগর রাজ
ঝমর ঝমর ঝম
ঝমর ঝমর ঝম
.....
ঝুচকি ঝুচকি মধু হাস
কিঙ্কিনী কনকন, কিনিকিনি কনকন

আমার "উমরকুমর বুড়া" হয়ে গেছে—ব্যাজ, ওয়ালেট, কম্প্লেট, হুদাহুদা, রক এণ্ড রোল চলে না, তবু মনে পড়ছে ঝুমুরগানের এক কলি—

ঘিঘির ঘিতাং, ঘিতাং ঘিতাং
ছলমন লিব না, যৈবন দিব না।

ওয়াশিংটনে উঠেছি সকালে সাড়ে সাতটায়, নামিয়ে দিলে ঘণ্টার কিছু পরেই। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মাঝে যত বড় যে লেক আছে তারই একটির কোলের কাছে আমাদের গন্তব্যস্থান। শহরের নাম বাফেলো—লেক্ এরীর ধারে একটি সুন্দর শহর। চমকাবেন না, নামটা সত্যিই বাফেলো মোষেলো নয়। কবি বলছেন—

তরুণ বেলায় ছিল আমার পড়লেখার বদঅভ্যাস
মনে ছিল হই বুঝি বাল্মীকি কি বেদব্যাস
কিছু না হোক লংফেলোদের হব আমি সমান তো
এখন মাথাঠাণ্ডা, হয়েছে সেই ভ্রমান্ত।

সত্যি, শরৎচন্দ্র নই যে মহেশের গল্প লিখবো, রবীন্দ্রনাথ নই যে গ্রাম্য রাখালের দুর্দান্ত মহিষপ্রীতি কাব্যে অপরূপ মোলায়েম করে ছুটিয়ে তুলবো। বহাল তবিয়তে আছি বলে যমের বাহনের সঙ্গে যোগাযোগ এখনও ঘটে ওঠেনি। ঘউএর ব্যবসায় করি না, তবে উৎকৃষ্ট ঘৃত হলে সন্তর্পিত পরম পরম লুচির উপর এই বৃদ্ধ বয়সেও সম্প্রীতি সুমতি আছে।

সহযাত্রী ও যাত্রিনীদের মধ্যে অনেকেই যুগলে চলেছেন। মহিলাদের বিশেষ বর্ণনা করার সাধ থাকলেও সাধ্য আমার নেই—কেউবা 'লাজুকবদন', কেউ বা 'সিদার', কেউ বা 'পিয়ার,' পরিনী ও সবাই। আমি কালিদাস নই যে পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা সহকারিণী পরিনীদের আধুনিককালের নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোর্ট দেবো। চেউএর উপরে চেউ খেয়ে নীলা জলধিতীরে সেদিনের মিথুনলগ্নে এসে লাগলো একজোড়া নববিবাহিত কিশলয়—তারসিটির গন্ধ তখনও গায়ে লেগে—হনিমুনে চলেছে নায়েগ্রায়। বাফেলো থেকে নায়েগ্রা খুব বেশী দূর নয়—নদীর এপারে যুক্তরাষ্ট্র, ওপারে কানাডা। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা মোটর গাড়ীর লাইসেন্স দেখিয়েই বিনা বাধায় যাতায়াত করতে পারে—কাস্টমস্ ইমিগ্রেশন্ নাকচ হয়ে যায়। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে ভারতীয়দের এইটুকু সুবিধা যে কানাডায় ঢোকা সহজ, নিষ্ক্রমণের পথের জন্য হাতিয়ার চাই "ভিসা"।

অনতাত্ত্বিক তত্ত্বের বিচারে আমরা যদি এখন থাকি "take off" এর যুগে অর্থাৎ সবে প্রাচীন পদ্ধতি আর ট্রাডিশনের মোহ ছাড়িয়ে বড় বড় কলকারখানা গড়ার দিকে ঝুঁকি ও ধন উৎপাদনে ব্রতী হই, তাহলে আজকের আমেরিকাকে তুলনায় বলা যেতে পারে বিত্তমান বা "Affluent" সমাজ যেখানে higher mass Consumption বা বেশী হারে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন করে চাহিদা ও জাতীয় আয় বাড়ানো হয়। অনেকে মনে করেন আমেরিকার অর্থনৈতিক বনিয়াদ এখন সুদৃঢ় স্তরে পৌঁছেছে যে, ১৯৮০ সালের মধ্যে তার নাগরিকদের সপ্তাহে ত্রিশ ঘণ্টার বেশী কাজ করতে হবে না। সোভিয়েট রাশিয়াতেও ঐ সময়ের মধ্যে সাধারণের জন্য মাথার উপর আশ্রয়, খাবার জন্য রুটি প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য বহু জিনিস বিনামূল্যে হাতে দেওয়া যায় তার পরিকল্পনা হচ্ছে। একদিন রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে রাশিয়ার বিরাট উন্নতিমূলে কোন্ শক্তি কাজ করছে। ত্রিশ বছর আগে কবির অপর দূরপ্রসারী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে এই বিপুল আয়োজন সম্ভবপর ; কেননা ধনপ্রবাহকে ব্যক্তি থেকে সমষ্টির খাতে বহিয়া দেওয়া হয়েছে (turning the tide of wealth from the individual to collective humanity). আমেরিকাতেও অন্যদিক দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। যান্ত্রিক উপায়ে অর্থলাভকে বহুগুণীকৃত করা সম্ভবপর যখনই হয়, তখনই সেটাকে বলতে পারি বণিক ধর্ম—কিন্তু প্রশ্ন ওঠে—ভোগে আসে কার। কুবেরের ভূমিকা গ্রাফা

করবার ঐতিহাসিকতা কী, সে বিষয়ে গবেষণা না করেও একথা বলা যায় যে মহালক্ষ্মীর প্রসাদ পেতে হলে শরৎপ্রসন্ন দিনে মনকে একটু ছুটি দিতে হয়, লাগাম খুলে ধরতে হয়, জীবনের নিজস্ব নীতিকে নূতন করে গড়ে তুলতে হয়, একটু গভীরতার স্রোতে অবগাহন করতে হয়—তা না হলে সেই চিরকালের প্রশ্ন উঠবে ততঃ কিম্, কস্মৈ দেবায়—এই বাহু এই বাহু।

তবকথা থাক্—ভাবছি যখন লোকেদের সপ্তাহে ত্রিশ ঘণ্টার বেশী খাটতে হবে না কলী রোজগারের জন্য, তখন সেই ব্রেভ নিউওয়ার্ল্ডে বাকী একশো আটচল্লিশ ঘণ্টা কি ঘুমে প্রেমে মজায় মজলিসে পিকনিকে পার্টিতে কাটবে—Philosophy of leisure শুধু নয় psychology of leisure কি হবে তার physiology. আজকের দিনের এই দুর্ধান্ত গতি কি নিতে যাবে মন্থরগতি কচ্ছপীর মত—ট্রানকুইলাইজারের কী আর দরকার পড়বে না—করোনারীর বদলে বরনারীকে আশ্রয় করলেই শ্রেয় ও প্রেয় দুই অন্বেষণ।

আমেরিকার ইতিহাসে "I go west" এই স্লোগানের সঙ্গে যে চাঞ্চল্য সুরু আজ সে ঊর্ধ্বমুখী সূর্যমুখী—শূন্যে মহাশূন্যে পাখা মেলে চলেছে কালকের দিনের মানুষ, মহাকালের যাত্রী হয়ে। চলো, এগোও, চলে চলে ভনে ভনে—একদিন বীরভোগ্যা ছিল এই ধরিত্রী আজ বীর্যশুল্ক হবে এই শূন্যের প্রান্তর। কশো বছর আগে অতলান্তিকের ধারে, এধারে ওধারে ছড়ানো কয়েকটি ব্রিটিশ সেটেলমেন্ট জর্জিয়া থেকে বোস্টন ব্রাহ্মণদের পীঠস্থান ম্যাসাচুসেট্স্ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আজ তারাই ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। "মে ফ্লাওয়ারের" "পিলগ্রিম ফাদারসকে" নমস্কার, জাতির ঐতিহ্যে তাঁদের অনমনীয় দান আজও সব মানুষ স্মরণ করে। প্রেয়ারির ক্রন্দন ভেদ করে, মাটির কান্না ফুঁড়ে, শূলবিদ্ধ অরণ্যের হাহাকার ছাপিয়ে গড়ে উঠেছে লুইসিয়ানা থেকে ডেট্রয়ট আর নিউইয়র্ক থেকে টেক্সাস, বেভারলি হিল থেকে বাকেলোর একটা পরমাশ্চর্য ঐশ্বর্যের সফেন উচ্ছ্বাস। জানি দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। মানুষ নিজের মধ্যে যে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন গড়েছে সেই গতিময়তা তাকে থামতে দেবে না, শুদ্ধ হতে দেবে না, চুপ করে বসে ভাবতে বলবে না, সে চলবে—দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে নয়, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, মহাশূন্যের নীলিমে—সেদিন দূর নয় যেদিন ভিনাস সুন্দরীর (যদি তিনি থাকেন) সঙ্গে মর্ত্যানন্দনের যোগাযোগ ঘটবে পলে পলে বেতারে ইথারে। কেউ নিশান্তে দিনান্তে একবারও বলবে না যন তুমি শুদ্ধ হও।

আজকের আমেরিকার কেন সব সন্ত্রাসের mass mediaর ইতিহাস দেখলেই এই অশান্তির দ্রুততা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা অসম্ভব নয়। সাবিত্রী মন্ত্র আমরা ত্রিসন্ধ্যায় স্মরণ করি। এরা ব্রাহ্মীবৈষ্ণবী মাহেশ্বরীকে একত্র গুলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় পলে বিপলে তারে বেতারে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ১৯৫৬ সনের এক স্ট্যাটিসটিকসে দেখি (ব্যান্ড ফোর্ড স্মিথের বই—why we behave like Americans) যে বছরে দশহাজার কোটী ডলার খরচা হচ্ছে এই সূত্রে। ছয়শোর উপর মাসিকপত্র, সাতেরোশো দৈনিক, নয় হাজার সাপ্তাহিক, প্রায় তিন হাজার রেডিয়ো স্টেশন আর পাঁচশো টেলিভিশন কেন্দ্র শব্দব্রহ্ম হয়ে মহাব্যোমে ছড়িয়ে পড়ছে। এ হলো পাঁচ বছর আগের কথা। ন্যাশানাল ব্রডকাস্টিং কোম্পানী লরেন্স অলিভিয়ারের "Beehard II" পাঁচলক্ষ ডলার খরচ করে টেলিভিশনে অভিনয় করালেন আর পাঁচকোটি লোক ঘরে বসে তা দেখলে। স্বভাবতই রেডিয়োর চিত্তপ্রিয়তা পেছিয়ে পড়ছে। তবু এখনও 'যা দেবী রেডিয়োরূপেণ অবস্থিতা' তাঁকে অধিষ্ঠিত দেখি স্নানের ঘরে, শয়ন কক্ষে, রান্নাঘরে আর সবচেয়ে বেশী মোটর গাড়ীতে—অর্থাৎ হাত বা চোখ যখন অন্য কাজ করছে তখন কানটাকে ছুটি না দিয়ে কিছু শুনিয়ে নেওয়া—প্রায়

কর্পোরেশন আর কী। টেলিভিশনের দাপটে সিনেমা, যুক্তিও কিছুটা খাটতে পারে। কিন্তু হলিউডের কৃতিত্ব নাকি ক্রিটিকরা বলেন—ব্যাং ব্যাং আর কিস্-কিস্। এই নামকরণ করেছেন তাঁরা, যাঁরা বলেন ওয়েস্টার্ন ছিন্ন, গ্যাংস্টারের ছবি আর কোনো রকমে একটি নগ্ন নারীদেহ নিয়ে টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি ছাড়া সতরুয়া আমিটা কিছে আর বিশেষ কিছু নেই। কথাটা সত্যি কিনা জানি না কিন্তু আংশিক সত্য হলেও ওরই পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকান সমাজকে বিচার করবার দৃষ্টিটা যেন আমাদের না হয়—তা যেন বোঝা যায় এই দেশে দুদিনের জন্যও এলে। শুধু মারামারি, কাটাকাটি, প্রেম, মূর্খতা, ধূর্ততা দিয়েই আমেরিকা নয়, শান্তিপ্রিয় মানুষ সব দেশেই সমান। ওয়াশিংটন্ ফেকারসন, টমপেইন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, আব্রাহাম লিঙ্কন, টেডি রুজভেল্ট, উড্রো উইলসন, এফ ডি আর-দের কথা ছেড়েই দিলাম, কারণ তাঁরা রাষ্ট্রনেতা, রাজনীতির আবর্তে ঘোরেন, কিন্তু দূরে থেকে দূরে চলে যান, সেপ্টেম্বরে মেলেহেমের 'Bach Festival'-এ উপস্থিত হন দেখবেন মোৎজার্ট, বীথোফেন, ব্রাহ্মস, বিভাল্ডিকে পাবেন। রকীজ পেরিয়ে গ্রাণ্ড কেনিয়নের সীমানা ছাড়িয়ে যান টেনেসিস্যালিতে, দেখবেন "মিউজিক" কি ধরনের উন্নতি করতে পারে। চিরকালের মানুষ, সব দেশেই এক। জোর্ড, কার্নেগী, রকফেলার, রাসেল সেজ, জন হাইমন, গ্যাগেনহিম ফাউণ্ডেশনের কথা সারা পৃথিবীর সবাই জানে। ধনকুবেরের এরা, এও সত্যি। লাফেলো, এমার্সন, এরা সাউথ, এডগার এলান পো, ওয়াল্ট হুইটম্যান, নিনক্লেয়ার লুইস, আপটন সিনক্লেয়ার, হেমিংওয়ে, ও'হারা ও আমাদের অতি সুপরিচিত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমাজগত কর্তব্যের সামঞ্জস্য থাকলেই শুভ, না থাকলেই অশুভ। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে আমাদের দেশে আগেকার পল্লীসমাজে ছিল। গ্রামে বিশুদ্ধ জল, বৈদ্য, পণ্ডিত, দেবালয়, যাত্রা, গান, কথা, পথঘাট সমস্তই রক্ষিত হোত গ্রামের ব্যক্তিগত অর্থের সমাজমুখীন প্রবাহ থেকে। এটা ঠিক চ্যারিটি ছিল না—ইচ্ছা ও সমাজের ইচ্ছা দুইই মিলতো এক কর্তব্যবোধে। তফাত যে আজকে রাষ্ট্র সেই কর্তব্যবোধটাকে নিজের হাতে নিয়ে নিয়ন্ত্রিত করছে। ফলে লাভ হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু ক্ষতিও কিছু হয়েছে সেটাও ঠিক—সহজ সামাজিক বন্ধনের যে উদারতা তা মিলিয়ে যাচ্ছে, কর্তব্যবোধের যন্ত্রের মধ্যে।

এখানে এসে চোখ জুড়িয়ে গেলো। আকাশের চন্দ্রাতপের নীচে শুভ্রাহত ঐশ্বর্যময় সাউথরোপ হল এর যোসেইকে প্রকৃতি যেন সাজিয়ে রেখেছেন তার পসরা। অরণ্যেরী বিমানে আকাশপথের রূপ দেখেছি, অলঙ্কানস্কাম্যাকিনীর শিকাগোস্থিত উপল ব্যথিত কলস্বনার ভীমগর্জন শুনেছি, মহাসমুদ্রের বুকে তরঙ্গবিক্ষুব্ধের উন্মাদনার উত্তেজনাও বরদা করতে পারি, নদীর বুকে কালবৈশাখীর ভয়ংকরের প্রলয়ঙ্করণও ক্ষণে ক্ষণে স্মরণে আসে কিন্তু এই বিরাট জলধারার যে এক নিজস্ব রূপ ও রীতি আছে তা সত্যিই অপূর্ব। সকালে বিকালে রাত্রে, গভীর নিশীথে তার ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ছন্দ, ভিন্ন মূর্তি। হোটেলে নামটা লিখিয়েই ছুটলাম জলের ধারে। কানাডার দিকের ধারাগুলোই বেশী জমকালো চমকপ্রদ। বিরাট লেকের সব জলই যেন এলোকেশী হয়ে নেমে আসতে চায়। পাহাড়ের বুক চিরে ধাপে ধাপে নেমে আসা কলস্বনা জীবনকে ভালো করে দেখবার জন্য কতো বন্দোবস্ত আছে—এলিভিটারে নীচে নেমে, জাহাজে চড়ে ঘোরা যায়। বিকালের দিকে ম্যাকিনটশ আর বুট পরে জাহাজে চড়লাম। স্রোত ঠেলে যাচ্ছি—উচ্ছ্বসিত জলস্রোতের প্রতিটি কণাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করে বলছি—তৃপাতু—আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত জগৎ তৃপ্ত হোক।

জাহাজে অনেক যুগলের সাথে ছেলের কিশোর-কিশোরীকে আবার দেখলুম। আমার আধ-সোনালী গায়ের রং, শ্রীমুখের মনোহারী ছাঁদ অনুক্ষিত কুঞ্চকুন্তল অনেককেই প্রশ্নে প্ররোচিত করতো যে,

আমি কোন দেশের মানুষ, আর তারপর ভারতীয় না পাকিস্তানী। ছোকরাটিও আমাকে সেই প্রশ্ন করলে, অত্যন্ত সৌজন্য আর ভদ্রতার সঙ্গে। ভারতীয় কেনে 'গান্ধী' ও 'ঠাগোরে'র কথা জিজ্ঞাসা করলে—রবীন্দ্রনাথের বই পড়েছে, ত্রেসেন্টমুনের নাম জানে, পোষ্ট আফিসের অভিনয় দেখেছে—তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালী ছাত্রদের যাতায়াত আছে। মেয়েটিকে মনে হলো ফরাসিনী। ঁাঁত্রেলিঙ্ থেকে ভ্যা গল সাত্রের কথা উঠলো, অস্তিবাদীদের গল্পের সঙ্গে আলবেয়ার কামুর নাম পর্যন্ত। আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে তখন নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। সমুদ্রযাত্রের বুড়োমানুষ, মার্লিন মাছের কথা ম্যানোলিন সান্টিয়াগোর চরিত্র সবই কিছু এক মিনিটে শোনা ও বলা গেলো। নিউইয়র্ক টাইমসের দু লাইন কবিতা মনে ছিল।

Whittled a style for his time from a walnut stick
In a carpenters loft in a street of the April city

আমি বললাম—April city কাকে বলে জানেন?

তারা বললে—না তো।

আমি হেসে জবাব দিলাম—সে প্যারী—রাজার নন্দিনী পিয়ারী।

হো হো করে উল্লসিত হয়ে বললে তারা—আমাদের দেশগুলি করছেন নাকি—এপ্রিল ফুল—

উত্তর দিই—আমাদের ঠাগোরের একটা কবিতা নির্ভেজাল বাংলায় শুনুন আমাদের দেশে এপ্রিল মাস, মধুমাস—বসন্ত কাল—

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ—
এসেছে চৈত্র সন্ধ্যা
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল
পথতরু শাখে ধরেছে মুকুল
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল
পাকল রজনী গন্ধা

শুদ্ধ হয়ে তারা শুনলে, ইংরাজীতে বুঝিয়ে দিলুম অর্থটা আর সন্ন্যাসী উপগুপ্তের অভিসার রজনীর মধুচন্দ্র কাহিনী বললে—তোমাদের দেশেই এ রকম রিগ্রেশনের কল্পনা সম্ভব হয়—কেন আনাতোল ফ্রান্সের "থেইস"—

বললাম—থাক্ তবে শোনো রবীন্দ্রনাথের গানের ফরাসী দু'কলি—

তু ম্যাভাদুমে ত্যাঁ মঁ কুর
লে কু দা লা মুজিকি

তুমি যে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, আকাশে ফুটে উঠছে দুটি একটি তারা। ঘাটে ঘাটে শঙ্খঘণ্টামুখর মন্ত্র নেই বটে, কিন্তু অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জে আনন্দের অট্টহাসে বিশ্বের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলেছে। আজকের দিনের কবির কথায় নায়েগ্রাকে আজও জানাই আমার অভিবাদন—

তোমারে হেরিয়াছিনু একদিন কুসুম অঙ্কিত সন্ধ্যায়
স্মরণ—সরণি ধরি আজিও সেদিন পানে মন ধায়।

বানাস নদী পেরিয়ে

।ভ্রমণ।

প্রবোধকুমার সান্যাল

ঝরঝরানের উপরে ঘেমন্তকাল নেমে এসেছিল।—

দুলাদ পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আবার এসে পড়েছিলুম আরাবল্লির ঘন শাখা-প্রশাখার মধ্যে—তার শিরা-উপশিরার জটিলতায় জড়িয়ে গেছি। আরাবল্লির রুক্ষতা এবং বালুপাথরের শুষ্কতার দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ জ্বালা করে। তার হাড়-পাঁজরার মধ্যে রস নেই কোথাও। বন্ধ শুষ্ক, শ্রীহীন শস্পদল, কণ্টকাকীর্ণ ঝোপঝাড়, বড় জোর দু'চারটি বাবলা, না হয়ত মামুলি বৃক্ষ গোটাকতক,—এর বাইরে কোথাও তার শ্যামলতা নেই। মাঝে মাঝে আরাবল্লির দিকে চেয়ে তার পিঙ্গল রুক্ষ জটাজালের তলায় ভীষণ রুদ্রাক্ষর প্রতি চেয়ে থেকেছি। মনে হয়েছে বিশাল ভারতের দেহগঠনের পক্ষে আরাবল্লি এবং বিন্ধ্যগিরিশ্রেণীর হয়ত প্রয়োজনও ছিল। এরা হয়ত বা ভারতের পঞ্জরাস্থির মতো তার দেহাভ্যন্তরে আবহমান কাল ধরে কাজ করে এসেছে। প্রথম বাঁধন হিমালয়, দ্বিতীয় বাঁধন এই দুই গিরিশ্রেণী, তৃতীয় বাঁধন দক্ষিণ সাতপুরা,—এবং দক্ষিণ ভারতের দুই পারে পূর্ব ও পশ্চিমঘাট। এই ভৌগোলিক স্থিতি-স্থাপকতা হয়ত বা যুগযুগান্ত ধরে ভারতকে সকল প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে এসেছে।

ঘন নিবিড় আরাবল্লি চারিদিকে! কোথাও অন্তহীন গিরিখাদ, তলায় চলেছে শীর্ণ জলধারা। কোথাও নিবিড় বনভূমির ভূমিকা চোখে পড়ছে। দুই পাহাড়ের মাঝখানে কোথাও কোথাও পুল পার হতে হচ্ছে। পথ নীচের থেকে কখনও উঠছে উঁচুতে, বাঁক নিচ্ছে কখায় কখায়। পাহাড়ের তলার দিকে সুদীর্ঘ যুগযুগান্তের অন্ধকারে চলে যাচ্ছি "গোরাঘাট" ছাড়িয়ে;—পথ যেন হারিয়ে গেছে আরাবল্লির জটিল চক্রান্তের মধ্যে। এ যেন একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র! একবার ভিতরে প্রবেশ করলে একটির পর একটি গ্রন্থি, অবশেষে রুদ্ধশ্বাস। যখন সেই জটিল জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার পথ পাওয়া যায় তখন যেন স্বস্তির আশ্বাস! মুক্তিলাভের পর নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচা!

সন্ধ্যাসমাগমকালে সিরিশ্রেণীর ভিতর থেকে বেরিয়ে "খাবলী" নামক জনপদ ছাড়িয়ে "থেওপড় মদারিয়ার" দিকে এলুম। পিছনপথে পড়ে রইল ধনধনে ছায়াচ্ছন্ন আরাবল্লির সিরিসঙ্কট আশ্রমবাসী একদল নাঙ্গা সন্ন্যাসীর মতো। চোখ জুড়িয়ে গেল সমতল মাঠের দিকে চেয়ে। ছোট ছোট ম'ঝর ছড়ানো রয়েছে এখানে ওখানে। একটি শ্বেতবর্ণ অট্টালিকা দেখতে পাচ্ছিলুম দূর থেকে।

নাথদ্বার স্টেশনটি অন্ধকার। ঠিক অন্ধকার বললে ভুল হবে। অতি টিমটিমে তেলের আলো জ্বলছে। তাতে অন্ধকার বেড়েছে, কমেনি। সরকারপক্ষ যথাসময়ে তেল সরবরাহ করেন, কিন্তু সেই তেলের সমস্তটা যথাসময়ে এবং যথাস্থানে খরচ হয় কিনা—এ নিয়ে তর্ক আছে। একদিকে পুরনো দিল্লীর গন্ধবণিকের দিকে, লক্ষ্ণৌয়ের মকবুলগঞ্জের আশেপাশে, এলাহাবাদ, কাশী, পাটনা, গয়া প্রভৃতির পথেঘাটে শুক্লসপ্তমী থেকে পূর্ণিমা, প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী পর্যন্ত একপ্রকার আলোর জ্বালা হয় না,—কেননা মুনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ চন্দ্র লোকটি ওঁদের কাজে লাগাতেন। কিন্তু সেদিন তেলটুকু কোন্ পথ দিয়ে কোথায় গিয়ে খরচ হত সেই অপ্রিয় আলোচনা এখানে না করলেও চলবে! একদিকে কাশী বা গয়ার পথ সন্ধ্যার পরে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ধূধূ করত—গান গেয়ে গলার আওয়াজ ক'রে পথ পেরিয়ে যেতে হত। আজ দিল্লীর কেরলবাগ থেকে "সরাই রোহিল্লার" দিকে শত শত শাখাপথ বেরিয়েছে। হাজার হাজার বাড়িঘর এবং হাজার হাজার পরিবার জনপরিকীর্ণ এবং স্বল্পালোকিত সেই পথগুলিতে বসে গেছে। কিন্তু মাত্র পঁচিশ ত্রিশ বছর আগেও ওখানকার দুই দিকের বিশাল শ্মশান-প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে সন্ধ্যার পরে আনাগোনার গা ছমছম করত। আজ দিল্লী মহানগরীর দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। স্বাধীনতালাভের পর রাজধানী যেন ঝলমল ক'রে উঠেছে।

নাথদ্বারের নীল আকাশে নবমীর জ্যোৎস্না ঝলমল করছিল। আশেপাশে শুষ্ক বনশোভার উপরে সেই জ্যোৎস্না কারাময় হয়ে উঠেছিল। দিনের বেলাকার বাস্তব রাত্রির চন্দ্রালোকে যেমন অবাস্তব হয়ে ওঠে! স্টেশন থেকে শহর সাত মাইলের কিছু বেশি। পথ যথারীতি জনশূন্য। নগরপ্রবেশের একটি বহির্দ্বার রয়েছে,—অনেকটা হোরসের মতো।

সেদিন নাথদ্বারের শুভ্রবর্ণ দুর্গশালার হোটেলায় একটি ঘর দখল করেছিলুম। ক্ষুদ্র শহরটি একটি অনুচ্চ চিলাপাহাড়ের ধারে অবস্থিত। শহরের আশেপাশে পাহাড়ের বড় বড় দেওয়াল,—তাদের গায়ে গায়ে বাড়িগুলি মোটামুটি শ্বেতবর্ণ। উটের পিঠে চড়িয়ে দূরদূরান্তর থেকে পণ্যবিপণির সম্ভার আনা হয়,—যেমন বিকানেরে অথবা রতনগড়ে। মোটর লরীর আমলেও উষ্ট্রবাহনের মূল্য কমেনি। অনেক সময় মরুভূমি পেরিয়ে মাল আমদানি-রপ্তানি করতে হয়—গাড়ির চাকা সেই বালুতে ঘুরতে চায় না। আজও উটের পিঠে জল, ঘাস, গম, পাথরখণ্ড, সব্জি এবং নানাবিধ সামগ্রী এখানে ওখানে গিয়ে পৌঁছয়। উট পাওয়া না গেলে ভারতের বহু দুর্গ,—বিশেষ ক'রে আগ্রা দিল্লী যোধপুর বিকানের উদয়পুর জয়পলমের অথবা চিতোর গোয়ালীয়র ইত্যাদির দুর্গগুলি সগৌরবে দাঁড়িয়ে উঠত কিনা সন্দেহ। সমতলে গাধা, পাহাড়ে ঘোড়া এবং মরুকন্তার উট,—ভারতীয় স্থাপত্যে এদের কাজ সর্বাপেক্ষা বেশি।

নাথদ্বারের-বাজারটি বড়। এক-একটি গদি বৃহদাকার। কিন্তু দ্রব্যসম্ভার মামুলি। কলকাতা বা দিল্লীর চাঁদনিচকের সঙ্গে নাথদ্বারের বাজারের তফাত কম। তফাত শুধু আহার্য-বস্তুতে এবং কতকটা পোশাকে। জুতোর দোকানে দাঁড়িয়ে চামড়াওলার কাণ্ডিজ দেখলে ভয় করে। কিন্তু শুনেছি মাড়োয়ারিদের পায়ে ন্যাকি কোস্কা পড়ে না! বাসনী হালুয়ার দোকানে খাদ্যসামগ্রীগুলি অপরিচিত,—বালুশাই ছাড়া।

রাজকোট, ওজরাট, আহমেদাবাদ ও প্রভাসতীর্থের পথ মনে পড়ছে। সেখানে বাঙালী-রসনা চরম দুঃখ ভোগ করে। সমস্ত ভারতে কেবল একটি সামগ্রী শুধু সর্বব্যাপী—সেটি দুগ্ধ। দুগ্ধবতীরা এদেশে তাই পূজ্য। নারীকে আমরা বলি দেবী, গাভীকে বলি ভগবতী। পুরুষ হয়েছে পুরুষোত্তম, এবং ধর্মের ষাঁড় হয়ে উঠেছে নন্দী। দুগ্ধজাত সকল সামগ্রী ভারতের এদেশে সকল সম্প্রদায়েরই ভোজ্য। ঘই পাঁড়া মালাই রাবড়ির অভাব নেই।

নাথদ্বার শহরটি মন্দিরকেন্দ্রিক। সেটি নাথজীর মন্দির। সুখের কথা এই, মন্দিরটি দরিদ্র নয়। ভিতরে যেটি বিগ্রহ, সেইটি নাথজী। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি, কিন্তু শ্রীরাধা পাশে নেই। থাকার কথাও নয়—কেননা শ্রীকৃষ্ণের বালক বয়স। শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন অনেকটা যেন নাচনের ভঙ্গীতে,—বাঁ হাতখানা উঁচুতে তোলা,—বর্ণ কৃষ্ণাভ। বিগ্রহটির নাম "বালগোপাল রণছোড়নাথজী।"

মন্দিরটি তার চত্বরসমেত বড় বড়। এখন ঘনঘন যাত্রি পরিবৃত মন্দির রাজস্থানে কম। অর্থোপার্জনের এমন একটি কেন্দ্র আমার দেখতে বাকি ছিল। চারিদিকে অর্থলোভী পাণ্ডার দল, এবং বহু বিত্তশালী ধর্মার্থীদের আস্তাবিমান,—এই দুই মিলিয়ে নাথজীর মন্দির হয়ে উঠেছে যেন স্টক এক্সচেঞ্জের হলের হট্টগোল! শুধু দেখছিনে কোথাও, দেখছি ভাবকতা! প্রার্থনা দেখছিনে, দেখছি চাটুবাক্য! মূল নৈবেদ্য পড়ছে না ঠাকুরের সামনে, পড়ছে অহঙ্কারের এক একটি টুকরোর মতো টাকা-পয়সা! প্রণামী দিচ্ছে না কেউ, ঠুন্ ক'রে ছুড়ছে যেন ধরার দান! সেই আস্তাবিমানীদের দিকে তাকিয়ে রণছোড়নাথজী সকৌতুকে নাচতে চাইছেন!

হঠাৎ মন্দিরের সামনে যবনিকাপাত ঘটে। দর্শনকালটি ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে নিরূপিত। কয়েক মিনিটের দর্শন, তারপরেই পর্দা নেমে গেল। আবার পর্দা উঠবে হয়ত ঘণ্টা দেড়েক পরে। দিনে রাত্রে এমন অনেকবার। এই বিরতিকালগুলির মধ্যে ক্রমে ক্রমে আবার দর্শনার্থীর ভিড় বেড়ে যায়, এবং ইতিমধ্যে অন্য কাজও সেরে আসা চলে। মাড়োয়ারী মহিলারা তাঁদের রেশমী পোশাক দ্বিতীয়বার বদলে আসবার সময় পান। শুধু তাই নয়, আগেকার দফল দর্শনীর টাকা-পয়সাগুলি অলক্ষ্যে কুড়িয়ে নেবারও একটি সুযোগ মেলে। এ নিয়ম শুধু নাথদ্বারেই নয়, জয়পুরের গোবিন্দজীর মন্দিরেও এই। এই ব্যবস্থাপনাটি ভাল কিংবা মন্দ, সেটি আমার বিচার্য নয়। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটি আগাগোড়াই যুক্তিবাদীদের কাছে নিতান্তই বিরক্তিকর।

আমি দর্শনার্থী নই, পর্যবেক্ষক। সুন্দর একটি মন্দিরের ভিতর-বাহির আমাকে আকর্ষণ করে এই মাত্র। বিগ্রহপূজার ডাক আমার মধ্যে নেই, আমার ডাক অন্যত্র। একদা এই রাজস্থানে বানাস নদীর ওপারে দূর বনপথের মধ্যে যে সত্যনারায়ণ মন্দিরটি দেখে আনন্দ পেয়েছিলুম, সেটি তা'র বিগ্রহের জন্য নয়। আমাকে নদী সমুদ্র অরণ্য পর্বত ডাকে, ডাকে প্রাকৃতিক ভীষণতা, ডাকে হিমালয়ের বিজনতা কিন্তু বিগ্রহ আমাকে ডাকে না! আমি ভক্তি ভাসমান নই।

বালুপাথরের পথ বাড়িয়ে যাচ্ছিলুম 'কানক্রোলির' দিকে। যেমন হয় রাজস্থানে—সন্ধ্যার পর থেকে সকাল অবধি যেন ঠাণ্ডা, শীতের রাত্রে কাঁপিয়ে দেয় অনেক সময়,—আবার দিনের বেলায় উত্তাপ প্রখর হয়ে ওঠে। এখন এগারোটা বাজেনি, রৌদ্র ধূ ধূ ক'রে উঠেছে দূর মরুর মাঠে মাঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়লুম "বানাস" নদীর ধারে। বানাস! একবার চেয়ে দেখলুম নদীর দুই দিকে। এ নদী বন্য, ভিন্নিত,—এর গভীরতা নেই। বালু ও প্রস্তরখণ্ডে আকীর্ণ এর দুই পার। এই নদীর সঙ্গে রয়ে

গেছে আমার তরুণ বয়সের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত। এপার ওপার করেছি অনেকবার। এর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল বৈকি একদিন! আজ আবার দাঁড়িয়ে দেখছি এর উপরে এখনও সাঁকো নির্মিত হয়নি। এখানে মানুষের পারাপারের প্রয়োজন আজও কম। এরই নিরিবিলি অকূলে আরাবল্লির বন পেরিয়ে এসে হরিণেরা জল খেয়ে যেত, টিয়া আর চন্দনাবা নেমে আসত এর জলে অবগাহন ক'রে উড়ে যেতে,—মরুচারিনী রাজপুতানী মেয়েরা এর স্বচ্ছ জলে স্নান সেরে ঘট ভরে নিয়ে যেত। বাতাস যেন রাজস্থানের রুক্ষ ভূমিতে কোমলতা এনেছে!

বানাসের জলের উপর দিয়ে মোটর বাসের চাকা চলে গেল। এর পরে আবার এল একটি দীর্ঘস্রোতা নদী। নদী বলতে যেন বাধে। স্বচ্ছ সুন্দর জল,—নদীর মাঝখানে ব'সে দু'হাতের আঁজলা দিয়ে স্নান করা যায়। নদীটির নাম "খারি।" জলের নীচের পাথরগুলি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। গাড়ির চাকা সেগুলি মাড়িয়ে এপারে উঠে এল। এখান থেকেই কানক্রোলির ছোট্ট জনপদ আরম্ভ। ঘাট থেকে উঠে গিয়ে বাজারের কাছেই পাওয়া গেল 'হরজীবন ধর্মশালা।' রাস্তার ওপারে সামনেই একটি বিদ্যালয় দেখছি। ধর্মশালার ভিতরটি প্রশস্ত। একটি স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতা ছিল। সামনেই একটি ইন্দারা। ভিতরে কয়েকটি রাজস্থানী পরিবার রাজাপাট বসিয়েছে। ওদেরই পাশ দিয়ে একটি ঘর মনোনীত করা গেল। যাত্রির উৎপাত এখানে প্রচণ্ড।

কানক্রোলির প্রসিদ্ধি আমার জানা ছিল। এটি তীর্থস্থান, এবং এইটিকে ঘিরেই একটি জনপদ সৃষ্টি হয়েছে। আমার সময় ছিল কম। সুতরাং ব্যস্তসমস্ত হয়েই বেরিয়ে পড়লুম মন্দিরের দিকে। অদূরে একটি চানুপথ উপর দিকে উঠে গেছে। চড়াই পথ ভেঙে এসে পাওয়া গেল দক্ষ এক তোরণদ্বার। যেমন তোরণ জয়পুরে, যেমন আজমেরে, যেমন নাথদ্বারে। রাজস্থানের প্রায় প্রত্যেক শহরে ও মন্দির প্রবেশপথে এমন এক একটি তোরণ। শুধু রাজস্থানেই বা কেন, মথুরা অথবা বৃন্দাবনও বাদ যায়নি। অনেক শহর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তার তোরণ আছে, ঘণ্টাঘর আছে, তার সীমানা নির্দিষ্ট আছে। এটি এদিকের ঐতিহ্য। জরুরী কোনও অবস্থায় এই সব তোরণ বন্ধ হয়ে যেত একদিনে। বাহির থেকে আক্রমণের ভয় ক'রে এসেছে এরা। পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে অনেকস্থলে এই। অমৃতসরের ও লাহোর এই ঐতিহ্য থেকে বাদ পড়েনি। নতুন আর পুরনো দিল্লীর মাঝখানে আজও এই প্রাচীর অবলুপ্ত হয়নি। এখনও সেই 'কাশ্মীরি' গেট, 'লাহোরি' গেট আর সেই 'তুর্কোমান' গেট। আজ এদের দিকে চেয়ে দেখলে কৌতুক-বোধ আসে মনে। কাল থেকে কালান্তরে চলেছে ভারত,—সে দাঁড়িয়ে নেই।

সেই বৃহৎ তোরণ পেরিয়ে মন্দিরের চত্বরে উঠে এলুম প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে। মন্দিরটির নাম "দ্বারকেশ"। অনেকে বলে "দ্বারকাধীশ"। একদিনে এই মন্দিরের বিগ্রহটি নাকি এসেছিল দ্বারকা থেকে। কিন্তু এখানেও সেই একই কথা। সেই দামোদর শিশুগোপালের মূর্তি—বিশেষ একটি নৃত্যভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে! মন্দিরের ভিতরটি সোনারূপো জহরতে ঝলমল করছে। চারিদিকে শ্বেতমর্মর প্রস্তরের কাজ। মন্দির এবং তার পরিপার্শ্ব যেমন প্রশস্ত তেমনি বৃহৎ। এই মন্দিরেরও উপার্জন প্রচুর। মন্দিরের আর্থিক উপার্জনের চেহারাটা রাজস্থানে বড় প্রকট।

পাথর বাঁধানো একটি সঙ্কীর্ণ পথ মন্দিরের ভিতর থেকেই এদিক ওদিক ঘুরে হঠাৎ যেন এসে পৌঁছল একটা দিগন্তজোড়া অবকাশের মাঝখানে। সামনেই দেখি বিশাল এক সরোবর।

সরোবর, না সমুদ্র! এখানে যেন উঠে এল বাঁসির সেই "রাণী তালাও," কিংবা উদয়পুরের সেই "জয়সমুদ্র," আজমেরের "অনাসাগর,"—নাকি সেই যে আলোয়ার রাজপ্রাসাদের সম্মুখবর্তী পদ্ম সরোবরের ঘাট! কোথায় এলুম? এ যেন কাশীর অহল্যাবাঈয়ের ঘাট, মথুরার বিশ্রামঘাট, উজ্জয়িনীর মহাকাল নাসিক গোদাবরীর রামঘাট! অথবা আবার যেন কত কাল পরে এসে দাঁড়ালুম পুষ্কর হ্রদের ঘাটে!

এতগুলি নাম করার কারণ আছে। কেননা একটির সঙ্গে অপরটির নাড়ির যোগ। এরা বিভিন্ন নামে একই প্রকৃতির অধিকারী। জলাশয় ছাড়া দেবস্থান নেই। যেখানে অবগাহন সেখানেই পুণ্য। রামেশ্বরমের অথবা দ্বারকার, অথবা জগন্নাথের,—অমন তিনটি বিরাট মন্দির, সেজন্য বিরাটতর সমুদ্রের প্রয়োজন ছিল। ওই তিন ধামের পর চতুর্থ ধাম, অর্থাৎ হিমালয়ের বদরিকানাথ ধামে অলকানন্দার স্রোত বইছে! সেখানেও রয়েছে অবগাহনের কথা। অমরনাথের গুহার নীচে অমর গঙ্গা,—সেই গঙ্গায় উলঙ্গ অবগাহন স্নান বিধি! পশ্চিম পাকিস্তানে বিলমের তীরে বিরাট মন্দির! সেখানকার ঘাটে অবগাহন ক'রে শিবমন্দিরের বট-অশ্বত্থের ছায়াতলে গিয়ে দাঁড়াও,—মনে হবে দশাশ্বমেধে স্নান ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে দাঁড়ালুম সেই বটগাছটার তলায়! মাদুরায় গিয়ে মীনাক্ষী মন্দিরে ঢোকো,—মনে হবে এলুম বুঝি গয়ার গদাধরের মন্দিরে। এরা এক, অভিন্ন, অবিভাজ্য। ধর্ম নয়, সংস্কৃতি! অবগাহন-স্নান, মানে কলুষনাশন,—যেটি বিজ্ঞানসম্মত। সমস্ত ভারতবর্ষ একই সূত্রে বাঁধা,—একই অনুশাসনে। বিভিন্ন বৈচিত্র্য, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন সমাজনীতি, বিভিন্ন রুচি,—কিন্তু এগুলি সেই মূল সংস্কৃতির বহিরঙ্গ। একই আচমনী মন্ত্র সর্বভারতের—"গঙ্গেচ যমুনাচৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু কাবেরী।" সাতটি নদীর প্রতিতে ভারতবর্ষ বাঁধা। এইটি নিত্যপূজার মন্ত্র, এ মন্ত্র সর্বভারতীয় রাজনীতির,—এটি বেদের অনুশাসন।

এই বিশাল হ্রদটির নাম "রাজসাগর"। রাজস্থানে জল কম। জলের জন্য তাই সব পাগল। জল মানে জীবন, জল মানে শস্য। বর্ষার ও দিয়ে জনস্রোত জননী ধারা জীবন জলজ বনজ খনিজ,—সুতরাং হিন্দু সংস্কৃতির সকল কর্ম জল দিয়ে! রাজসাগরের স্বচ্ছ সুন্দর জল দেখে বাঁচলুম!

বেলার্ভের দিক হাওয়া জলের উপর দিয়ে ভেসে আসছে ফুরফুরিয়ে। রাজসাগরের এপার ওপার অনেক দূর। যখন এই হ্রদ পরিপূর্ণ থাকে, তখন এটির পরিমাপ নাকি আট বর্গমাইল। হ্রদের ওপারে দূর ও দূরান্তরে রাজপুতনার রুক্ষ প্রান্তর এবং আরাবল্লির শিরা-উপশিরা চোখে পড়ছে। হ্রদে নেমেছে রাজস্থানী মেয়েপুরুষ। পূজা দিচ্ছে কেউ ঘাটে। কাঁসর ঘণ্টা বাজছে কোথাও। মন্ত্রপাঠ করছে পুরোহিত।

একটি নিরিবিলি পাথরের আসন বেছে নিয়ে এ বেলার মতো ব'সে গেলুম।

দুই চোখ বলসিয়ে গিয়েছিল খর মরুভূমি পেরিয়ে আসতে। তবু জয়শলমের, রামগড়, কিষেনগড়, বারমের বা কালোদির পথ নয়,—পোকারণ থেকে মাত্র যোধপুরে আসছিলুম। কর্কশ বালু পাথরের পাণ্ডুর পীতাভা,—এছাড়া আর কোনও বর্ণ নেই। বালুর মধ্যে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় বিভিন্ন মনসা আর ওষধো বনঝাউ,—তাল, তমাল, পিয়াল বিল্বের কণ্ঠ ছায়া কোথাও নেই! না আছে আশ্রয়, না জল, না হরিৎ ক্ষেত্র, না রস। পশ্চিম রাজস্থানের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে।

যোধপুরের ঠিক আগে নির্মম প্রকৃতির চেহারা, সেদিন ঘনিয়ে গিয়েছিল 'রায়-কা-বাগ' স্টেশনে যখন এসে পৌঁছেছিলুম। যাচ্ছিলুম উদয়পুরে।

এখান থেকে পেয়েছিলুম প্রান্তরের সবুজ শ্যামলিমা। যারা চোখের ডাক্তার তারা জানে, মানুষের

চক্ষুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা স্বস্তিদায়ক হয় দুটি। একটি নিবিড় সবুজ, অন্যটি নীলিমা! সেইজন্য প্রকৃতির বর্ণ হল সবুজ, আকাশ নীলাভ, সমুদ্র নীল! লাল, কালো, সাদা, ঘন হরিদ্রাভা, বেগুনী,—এরা কেউ চক্ষুর বন্ধু হয়। তুষার রাজ্যের মধ্যে যারা ভ্রমণ করে তাদের চোখে অত্যুগ্র শ্বেতবর্ণটা আঘাত করে বলেই তারা রঙীণ চশমা চোখে দিতে বাধ্য হয়। রাশিয়া ভ্রমণকালে দেখেছি, সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন তুষারপাতে ঢেকে যাবার আগে শরৎকালের শেষ দিকে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সেখানকার বহু লোক সবুজ পাতাসুদ্ধ দুচারটি চারাগাছ অথবা গাছের ডাল ঘরের মধ্যে এনে অতি যত্নে রেখে দেয়। ওটি অস্তি, ওই সবুজ বর্ণের মধ্যেই আগামী বছরের বসন্তকালের স্বপ্ন। অতঃপর আশ্বিন থেকে বৈশাখ অবধি ওই কয়েকটি সবুজ পাতার দিকে অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকা!

মাড়োয়ার ছেড়ে বেরিয়ে গেলুম অপরাহ্ণকালে। ধীরে ধীরে আবার আরাবল্লির মধ্যে প্রবেশ করছিলুম। চারিদিকের মানুষের কোলাহল ও কলরবের মধ্যে আমি ছিলুম নিঃসঙ্গ। দূরে দূরে দেখতে পাচ্ছি ছবির মতো এক একটি উপত্যকা। কোথাও জলাশয়ের ধারে নেমে এসেছে রঙীন পাখি জাত-ভাইদের সঙ্গে গলাগলি করতে। ময়ূর আর ময়ূরী রয়েছে কোনও কোনও কুঞ্জবনে। ওদের যেন রাজকীয় চালচলন। আপন আভিজাত্যের গৌরব নিয়ে ওরা সরে থাকে আড়ালে-আবডালে। মাঝে মাঝে পা চুলকিয়ে এক একটি দীর্ঘ বর্ণচ্ছটা পালক ফেলে যায় এখানে ওখানে। আপন রূপ সম্বন্ধে এমন সচেতন পাখি আর ভূ-ভারতে নেই।

দেখতে দেখতে সেই অপরাহ্ণ এবং গোধূলিকাল সন্ধ্যার ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল। আরাবল্লির পাহাড়তলীতে নেমে এল ঘনান্ধকার। তারই ভিতর দিয়ে আমাদের ট্রেন বার বার সুড়ঙ্গ লোকে ঢুকল। যখন উদয়পুর এসে পৌঁছলুম রাত তখন প্রায় পৌনে দশটা।

একখানা টাঙ্গা নিয়ে স্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূর শহরের দিকে চললুম। অবশেষে যেখানে গিয়ে আস্তানা নিলুম সেটির নাম "লেক ভিউ হোটেল।" একটু আগে ভাব হয়েছিল। কুচ পরোয়া নেই!

পথে পথে দেখেছিলুম আরাবল্লির উপরে-উপরে ছোট বড় এক একটি দুর্গপ্রাকার। সেকালের সেই জীবন আজকে আর নেই, যেটি আগাগোড়া ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা। শুধু যে মোগল পাঠানের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম ঘোষণা ছিল তা ই নয়,—রাজস্থানে রাণায়-রাণায় দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ ছিল চিরকাল। একদিকে শৌর্য, জাতীয়তাবোধ, আত্মত্যাগ,—অন্যদিকে কপটতা কূটনীতি বিশ্বাসঘাতকতা স্বার্থপরতা,—এরা জীর্ণ করেছিল রাজস্থানকে। আজ আরাবল্লির চূড়ায়-চূড়ায় যে সকল দুর্গগুলি জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে,—তাদের সকল তাৎপর্য কালক্রমে হারিয়ে গেছে। প্রাকারের ভিতরে অন্ধকার কোণে কোণে বাদুড় আর চামচিকার বাসা। শূন্যপুরীর মধ্যে প্রেতান্ধকার। কেউ আর দুর্গের পথ মাড়ায় না। ওরা দাঁড়িয়ে রইল এক এক টুকরো করুণ কাহিনীর মতো।

আজ নতুন সজ্জা তুলে নিয়েছে রাজস্থান। সেই স্বর্গালী বিচিত্র সুন্দর পোশাক খসে গিয়েছে; কটি-বন্ধের স্বর্ণকোষে যে কলমলে তরবারি একদিন ঝলক করে উঠত, তার চিহ্নও আজ আর নেই। আজ তারা গল্প ও রূপকথার মধ্যে জায়গা পেয়েছে। শত শত বছর পরে রাজস্থান আজ জীবনের শান্তি এবং মনের স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে। রাজস্থানের মনে আর দুশ্চিন্তা নেই।

উদয়পুরে সর্বপ্রথমে যেটি চোখে পড়ে সেটি রাজস্থানের সৌধনির্মাণ প্রতিভা। চারিদিকে ধূসরোজ্জ্বল মরুভূমি,—বৃক্ষ-বনস্পতি নেই। তৃণলতা কম, তার মানে মাটিও কম। নব সভ্যতার সর্বপ্রধান সামগ্রী ফসল,

তাও দেখে নেই। লোহা নেই, তেল নেই। গাছ না থাকা মানে কাঠ নেই ; কয়লা না থাকা মানে ইঁট নেই। উদয়পুরের বিরাট সৌধশ্রেণী গ'ড়ে উঠেছে,—অথচ না আছে কাঠের কাজ, না আছে গাঁথুনিতে ইঁটের কাজ। বিকানের জংশনের দেখলে অবাক হতে হয়। বিশেষ ক'রে জংশনের। সেখানে সব বাড়ির একটিমাত্র কাঠের দরজা,—সেটি প্রধান প্রবেশ পথ। বাকি সমস্ত জানলা দরজা ছাদ—যা কিছু সব পাথর এবং পাথরের জাপরি। উদয়পুরও গড়ে উঠেছে সেই কাঠ আর ইঁটের অভাবের মধ্যে। কিন্তু এই দেখে অবাক হতে হয়, তার প্রত্যেকটি সৌধের কী অপরূপ কারুসৌন্দর্য। শহরটি পার্বত্য, কিন্তু অগণিত জলাশয়ের শোভা, এবং তার পৃষ্ঠপট আরাবল্লির পাহাড় দিয়ে ঘেরা। নগর হিসাবে পুরনো আগ্রা দিল্লীর কোনও বিশেষ শোভা নেই। কিন্তু শোভা আছে গোয়ালিয়রে, শোভা আছে রাজস্থানের প্রায় প্রত্যেকটি বড় শহরে। আগ্রার তাজ, আগ্রার দুর্গ,—এ দুটো বাদ দিলে অবশিষ্ট শহর যা থাকে তা বিরক্তিকর। নতুন দিল্লীর সরকারি শহর বাদ দিয়ে এবং লালকেল্লার দিকে না তাকিয়ে যা থাকে সে একঘেয়ে। কিন্তু জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, বিকানের—এরা এক একটি ছবি। বড় বড় শিল্পীর মহৎ এক একটি সৃষ্টি—যার তুলনা নেই। কোজাগরী পূর্ণিমায় কাশীর গঙ্গায় যারা নৌকাবিহার করেছে, যারা লক্ষ্ণৌয়ের নবাবী পাড়ায় ঘুরেছে, ফতেপুর সিক্রির বুলান্দ দরওয়াজা যারা লক্ষ্য করেছে,—তারা জানে নগর নির্মাণের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ কা'কে বলে।

উদয়পুরের মধ্যে সেই সৌন্দর্যবোধটি যেন একটি মায়ালোক সৃষ্টি করেছে। এই নগরের পুরনো নাম ছিল মেবার। এটি নির্মিত হয় প্রায় চারশো বছর আগে। চারিদিকে এই শহর প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত। জনবহুল অংশটা বাদ দিলে শহরের অবশিষ্ট যা থাকে, তার অধিকাংশই মহারানার অধিকারভুক্ত। প্রাকারের ভিতর দিয়ে নগর প্রবেশের তোরণগুলির নাম 'পোল।' যেমন হাতীদরওয়াজার নাম হাতীপোল। তেমনি সূরযপোল, দিল্লী পোল ইত্যাদি। সর্বাপেক্ষা সুন্দর হল এক একটি বিশাল হ্রদসমীপবর্তী প্রাসাদ। একটি হ্রদের মাঝখানে দুটি সুন্দর শ্বেতমর্মরের প্রাসাদ। একটির নাম জগনিবাস, অন্যটির নাম জগমন্দির।

এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি চারিদিকে সবুজের সুষমা। ঘনসবুজ ক্ষেত, মনোরম পুষ্পোদ্যান, বৃক্ষলতাবিতানের আশেপাশে রাখালপরিবারদের বাসস্থান,—বেশ লাগছিল। একখানা টাঙ্গা ভাড়া করে সেদিন সকালের মধুর রৌদ্রে পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। জনৈক সজ্জন মুসলমান গাড়ি হাঁকাচ্ছিল এবং আমি তার মুখে গল্প শুনছিলুম। লোকটি প্রবীণ।

মাত্র কিছুদিন আগেও প্রত্যেক রাজ্যেরই এক একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। কলকাতায় ইদানীং ঘুরে বেড়ালে মনে হবে, এ মহানগরী এখন কেবলমাত্র বাঙালীদের নয়। কাশীর দশাশ্বমেধ রোড হয়ে উঠেছে যেন সিন্ধু দেশ। কানপুরের বিশেষ বিশেষ অঞ্চল যেন পাঞ্জাব। বিগত যুদ্ধের কাল থেকে প্রত্যেক রাজ্যই তার লোকজনকে এ রাজ্যে ও রাজ্যে চালাচালি করেছে। উদয়পুরে যদি শিখব্যবসায়ী দেখি তাহলে আর বিস্মিত হইনে। বাঙলায় এসে ভারতের সকল সম্প্রদায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে,—কেবল ওড়িয়ারা ছাড়া। ভারতের সকল রাজ্যে গিয়ে বাঙালীরা কিন্তু ব্যবসা করেনি। রাজস্থানে বাঙালী ব্যবসায়ী নেই। অবশ্য পেশাদার বাঙালী কিছু আছেন। যেমন ডাক্তার, মাষ্টার, অধ্যাপক ইত্যাদি। বহুকাল আগে পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি শহরে একটি মস্ত বাঙালী হিন্দু ঔষধ ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান দেখেছিলুম। তাঁদের নাম ছিল 'সেন-কোম্পানি'। তাঁরা সেখানে আজও আছেন কিনা জানিনে।

আগাগোড়া একটি শহর পাথর দিয়ে তৈরি,—রাজস্থানে ঘুরে না বেড়ালে এটি বোঝবার জো নেই। কাশীও চুনারের পাথরে তৈরী, কিন্তু তার মূল গাঁথুনি প্রধানত ইঁটের। উদয়পুর শহরটি প্রথম থেকে শেষ

পর্বত প্রতি পর্যায়ে তিন রকম বা চার রকম পাথরে তৈরী। বালুপাথর, শ্বেত ও কালো পাথর এবং ধোলপুরের লাল পাথর। আমি অনেকবার কটূক্তি করেছি আরাবল্লি গিরিশ্রেণীকে। কিন্তু আরাবল্লি না থাকলে রাজস্থানের একটি পাথরও গ'ড়ে উঠতে পারত না, একথাটি বলতে ভুলেছি। 'লক্ষ্মীবিলাস' প্রমুখ যে প্রাসাদগুলি পাহাড়ের উপর নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলি পেতুম কোথায়? কোথায় পেতুম ওই 'পিচোলা' সরোবরের প্রাসাদ এবং ঘাটগুলি? কোথায়ই বা পেতুম ওই "জয়সমুদ্র" সরোবরের মনোরম সোপানশ্রেণীর দল?

টাঙাওয়ালা আমাকে নানাপথে ঘোরাচ্ছিল। বাদুঘর, চিড়িয়াখানা, তোপখানা, দুর্গ, জলপ্রাসাদ, জগদীশ মন্দির, সজ্জননিবাস ইত্যাদি। বাজারে দেখতে পাচ্ছি তিনটি প্রধান শিল্পকর্ম। একটি সূচীশিল্প, একটি "রংরেজি" শিল্প (dyeing), এবং আরেকটি মাটি, পিতল, রূপা ইত্যাদি নানাগ্রীর পাত্রনির্মাণের কাজ। সূচীশিল্পের সূক্ষ্ম কাজগুলি দেখে অনেক সময় দোকানের সামনে থমকিয়ে যেতে হয়। ঠিক তেমনি হাতীর দাঁতের সুন্দর সূক্ষ্ম কাজ। এসব কাজগুলি আগে ছিল ভারত প্রসিদ্ধ, এখন বিশ্বপ্রসিদ্ধ। পৃথিবীর সকল দেশের পর্যটক রাজস্থানের শিল্পসামগ্রী দেখে অবাক হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ছাঁচ তৈরী করা যেতে পারে, কিন্তু শিল্পী তার স্বপ্নকে রূপ দেয় আপন অঙ্গুলি চালনার দ্বারা। কৃষ্ণনগরের পুতুল তৈরির কাজে শিল্পীর সার্থক আঙুল দরকার, মেসিন সেখানে অনর্থক।

বর্তমান মহারাজা ভূপাল সিংহের রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঘুরছিলুম। তিনি তখন বৃদ্ধ, বাত এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তাঁর তিনজন মহারাণী, কিন্তু কারো সন্তান হয়নি। মহারাজা 'দত্তক' পুত্র গ্রহণ করেছেন। মহারাজার কোনও 'হারেম' ছিল কিনা ঠিক খবর পাইনি। কিন্তু টাঙাওয়ালা গল্প করল, মহারাজার রাজকোষ থেকে এখনও দুই শত বিভিন্ন বয়সের নারী প্রতিপালিত হন। তাঁরা ছড়িয়ে আছেন উদয়পুরের নানা অঞ্চলে। তাঁর রাজপ্রাসাদের ভিতর মহলটাকে ইন্দ্রালয় কিম্বা স্বপ্নপুরী কি বলব, ভেবে পাইনে। এই প্রাসাদের মধ্যেই বাস করেছেন একদা উদয় সিং, এটি ভাবতে রোমাঞ্চ লাগে। সেদিন এর নাম ছিল মেবার। সমগ্র ভারতের মধ্যে প্রথম এক বাঙালী নাট্যকার স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই মেবারকে নিয়ে ভারতবিশ্রুত নাটক লিখেছিলেন। সেই জাতীয়তাবাদী সার্থক নাটকটি বাঙলার তদানীন্তন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করেন। সেদিন সেই প্রাসাদটি ঘুরে বেড়াবার সময় "শিবমহলটি"কে পরীরাজ্য বলে মনে হয়েছিল। তাঁর প্রাসাদ এবং উদ্যানগুলির শোভা সৌন্দর্য আমাকে চমৎকৃত করেছিল।

উদয়পুরে ভ্রমণ ক'রে ফিরবার কিছুকাল পরে শুনেছিলুম মহারাজা ভূপাল সিং পরলোক-গমন করেছেন।

কোথা থেকে কোথায়!

মাড়োয়ার স্টেশনের ওয়েটিং রুমে সমস্ত রাত মেঝের উপর ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। পুঁটলি পাকিয়েছিলুম ঠাণ্ডায়। শেষ রাত্রের দিকে কুলি এসে ডাকল। ধড়মড়িয়ে উঠে গিয়ে গাড়িতে উঠলুম। শুক্লপক্ষের চন্দ্র তখন অস্ত গেছে। ভোরের আগে অন্ধকার সর্বাপেক্ষা ঘন। গাড়ির বেঞ্চিতে আবার ঘুমোলুম।

সকালে এসে নামলুম আবু রোড স্টেশনে। তখন বেশ রোদ উঠেছে। স্টেশনের বাইরে এসে আমি অবাক। কবে যে আবু রোড এমন শহরে পরিণত হয়েছে খোঁজ পাইনি। পিচের রাস্তা, বড় বড় বাড়ি, মস্ত কারবার, দোকান বেসাতি, থানা পুলিশ, সিনেমা হাউস, দোকানে দোকানে সেই নোংরা লাউড স্পীকার, বাজারে বাজারে চায়ের দোকান, মোটর মেরামতি কারখানা, কর্মব্যস্ত ইতর-ভদ্র সমাজ। আমি একেবারে অবাক। ট্রাফিক পুলিশ যান-বাহন নিয়ন্ত্রণ করছে! আমি বিমূঢ়!

আমার প্রথম ভারত পরিক্রমার কালটি মনে পড়ছে। সে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হতে চলল। তখন অনেক সময় বিনা টিকিটে রেলভ্রমণের প্রস্তাবে তেমন লজ্জা পেতুম না। মাথায় থাকত চুলের রাশি। পরনের ধুতিখানা হরিদ্বারের তোলাগিরির ধর্মশালায় ব'সে একপ্রকার গোলাপী রংয়ে ছুপে নিতুম। ওই রংয়েরই টুকরো কাপড় মাথায় বেঁধে নেওয়া যেত। কে আর দেখছে কোথায়? পায়ে নাই বা জুতো রইল! আর যদি সেই যাত্রা আনা জোড়ার কেড্‌স্ পাওয়া গেল, সেটাকেও রঙীন ক'রে নিতে অসুবিধা ছিল না। সেদিন দুই চোখে লেগে থাকত এই বৃহৎ ভারতভূমির স্বপ্ন! সেদিন কেউ ছিল না আমার পাশে। কোনও সমকালীন সাহিত্যকর্মী তখনও ভারতবর্ষ দেখেনি! কেবল তার বছর তিনচার আগে মাত্র "প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন" সুরু হয়েছিল। সেই উপলক্ষে পাঁচ সাতজন লেখক যেতেন এখান ওখান থেকে। বৃহৎ ভারতের কিছু কিছু সংবাদ সেই সূত্রে পাওয়া যেত।

আমি তখন যাচ্ছিলুম কাথিয়াবাড় ভ্রমণে। নেমেছিলুম এই আবু রোডে। কিন্তু সেই আবু রোড এ নয়। তখন এটি সামান্য স্টেশন। বালুপাথর এবং ধুলোয় পথ ডুবে থাকত। কোথায় যেন এখানে ছিল একটি ঘরওয়া-জানালাশূন্য জীর্ণ ধর্মশালা',—সেখানে তার ছিল নেকড়ে বাঘের। তাঁরা নাকি পাহাড়তলীর বন থেকে বেরিয়ে নদী পার হয়ে আসত ছাগল আর বাছুরের লোভে। পথে কোথাও তেলের আলো ছিল না, এবং সন্ধ্যার আগে একটিমাত্র পুরির দোকান থেকে বোলতা-ধরা পাঁড়া আর পুরি না কিনলে রাত্রি কাটত উপবাসে। সেদিন যানবাহনের মধ্যে ছিল একমাত্র বয়েল্ গাড়ি, এবং তারই উপরে চ'ড়ে বানাস নদী পেরিয়ে বন-পাহাড়ের তলায় তলায় গিয়েছিলুম এক সত্যনারায়ণ মন্দিরে! সেই মন্দির আজও অবশ্য আছে, কিন্তু তাঁর সন্ধান কেউ দিতে পারল না! ওই বয়েল্ গাড়িতেই সেদিন আবু পাহাড়ের শহরে গিয়ে উঠতে হত। আর নয়ত পাহাড়ি ঘোড়ার পিঠে। সেদিন মাসে তিনটি টাকা খরচের ভয়ে ওই আঠারো মাইল মাত্র পার্বত্যপথ অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। শুনতে পেতুম সেদিন রাজস্থানী ডাকাতরা নাকি সন্ন্যাসীর ঝুলিঝালাও নাড়াচাড়া ক'রে দেখতে চাইত! তারা নাকি আজ স'রে গেছে পশ্চিম রাজস্থান পেরিয়ে বয়েরপুর ও বাহাওয়ালপুরের দিকে, শুনে এলুম অমলমেরে।

আরাবল্লি গিরিশ্রেণীর রাজস্থান ছোড়া প্রসার বুঝতে পারা যায়, যখন দেখি তার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আবু পাহাড় একেবারে রাজস্থানের দক্ষিণ সীমারেখার উপর অবস্থিত। মাঝখানে এই আবু পাহাড়ের উপর দখল নিয়েছিল বোম্বাই-গুজরাট, কারণ গুজরাটে পার্বত্য শহর নেই। আবু পাহাড় আবার ফিরে এসেছে রাজস্থানে। আরাবল্লিও ঠিক এইখানে শেষ হয়েছে।

প্রাইভেট মোটরকার, ট্যাক্সি এবং মোটর-বাস আজ চলছে নিত্যনিয়মিত। সেই টাট্টু ঘোড়া আর বয়েল্ গাড়ি কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ নিঃশব্দে নতুন ক'রে গড়ে উঠছে,—অনেকেই তার খবর রাখে না। যে বিরাট দেশজোড়া কর্মযজ্ঞ চারিদিকে আজ আরম্ভ হয়েছে,—নিতান্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন রাজনীতিক সম্প্রদায় ছাড়া আর কে অস্বীকার করবে? আজ সকল ভারতবাসীর সুবিধা ও সুযোগলাভের স্বর্ণযুগ আরম্ভ হয়েছে। প্রতিটি রাজ্যের সরকারী মহলের যে কর্মতৎপরতা,—তার হিসাব রাখে কয়জন বিদ্বেষধর্মী?

মোটরবাসে উঠে আমার সেই একদাকালের অনতিক্রান্ত আঠারো মাইল পার হচ্ছিলুম। আট মাইল সমতল, দশ মাইল পার্বত্য। পাহাড়তলীতে সেই বানাস নদী পেরিয়ে গেলুম। কিন্তু আজ সেখানে পাকা ইমারতের সাঁকো। নীচের দিকে ঝিরঝিরিয়ে চলেছে বানাস। সেই অরণ্য কোথাও নেই,—

দেখতে পেলুম না সেই তপোবনের আশ্রম-মন্দির। বোধহয় আজ ভারত হারাতে বসেছে সেই মন্দির-সংস্কৃতি। কালের ধাক্কা এসেছে, এসেছে বিজ্ঞানের যুগ, যন্ত্রের কাল, জড় সভ্যতার সমারোহ। বোধ হয় এরই সঙ্গে এসে পৌঁছল সংশয়বাদ, ঐহিক সুখপরিকল্পনা, ধনবাদী জীবন-ব্যবস্থা। আজ আর কেউ দরিদ্র থাকতে চাইছে না, কেউ চাইছে না স্বল্পতুষ্ট জীবনযাত্রা!

সুন্দর মসৃণ রাজপথ বনময় নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়ে পাহাড়ে উঠে এঁকেবেঁকে চলেছে। কয়েকটি ঝরনা দেখতে পাচ্ছি ঝিলমিলিয়ে নামছে। দেখতে পাচ্ছি বনের নীচের দীর্ঘ নদীখাদ। এই পাহাড়ে এসে আরাবল্লির সমস্ত অংশ ঘুচেছে। এখানে সে সম্পদে এবং ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। চারিদিকের বনশ্রী এবং শ্যামলাভ বৃহৎ পর্বতশ্রেণী আবু পাহাড়ের স্তরে স্তরে সৌন্দর্যবিন্যাস করেছে। আমি মুগ্ধচক্ষে চেয়েছিলুম।

পথ আর কতটুকু? তিন্তাবাজার থেকে কালিমপঙ,—কতবেলী দশমাইল পাহাড়! আবু পাহাড়ও তাই! ভাড়া নিয়েছে সাড়ে তেরো আনা, তার ওপর এক টাকা টেক্স! যদি দশ টাকাই নিত, কী ক্ষতি ছিল? চারিদিকের দিকদিগন্ত জোড়া রাজস্থানের বিশাল মরুভূমির মাঝখানে এ যেন শান্ত স্নিগ্ধ বনচ্ছায়াময় তপোভূমি! বোধ হয় এই কারণেই আবু পাহাড় চুম্বকের মতো পর্যটকের মনকে টেনে ধরে। আমার মুগ্ধ মন এই পার্বত্য শহরের প্রতি অঙ্গে এক একটি কুঞ্জলোকের সন্ধান পেয়েছিল। আবু পাহাড়ের উচ্চতা চার হাজার ফুটের কিছু কম। এখন নবেম্বরের প্রায় মাঝামাঝি। এবার ঠাণ্ডা পড়ছে আবুতে। এমন বন-বাগান উদ্যানে ভরা পার্বত্য শহর সহসা চোখে পড়ে না।

গ্রন্থশ্রী গ্রন্থশ্রী এই মাত্র বেরুলো উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস যদি জানতেম ৪·০০ চিত্তরঞ্জন মাইতির সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস ডাঃ জনসনের ডায়েরী ৪·০০ সুবোধ ঘোষের উপন্যাস মুক্তিপ্রিয়া ২·৫০ বারীন দাসের উপন্যাস অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা ৪·০০ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস কন্যামৃগয়া (২য় সংস্করণ) ৩·০০	॥ সদ্য প্রকাশিত ॥ কলরোলের কবি অনিলকুমার ভট্টাচার্যের আর একখানি আধুনিক কবিতার বই সাগর-আকাশ ॥ দুটাকা ॥ লিরিকধর্মী কাব্য-উপন্যাস মেঘ-পাহাড়ের গান ॥ দুটাকা ॥
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প ৫·০০ সাতদিন ২·৫০ অনিলকুমার ভট্টাচার্যের উপন্যাস উপনদী ২·০০	
॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা—১২ ॥	॥ ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা—৬ ॥

পোলো খেলার বৃহৎ ময়দানের পাশে 'ভারতীয় নিবাস' নামক একটি যেমন-তেমন হোটেলে একটি ঘর নিয়েছিলুম। দৈনিক ঘর ভাড়া দু'টাকা। আহারাদি সস্তাগণ্ডার,—গায়ে লাগে না। বাজারহাট ছোট-খাটো। মনে পড়ছে পাঞ্জাবের ডালহাউসী পাহাড়ের কথা। ওই ধার তলা দিয়ে একদা গিয়েছিলুম ঘুরে ৫শো উপত্যকায় ইরাবতী নদী পার হয়ে।

দূর পাহাড়ের চূড়ায় জয়পুর মহারাজার প্রাসাদটি দেখা যাচ্ছে ছবির মতো। ভিন্ন প্রাসাদ একটি নয়। গুজরাটি এবং রাজস্থানী ধনীরা আগে ভাগে এসে বানিয়েছে বহু 'কোঠি।' আনন্দের কথা এই, এখানে প্রায় সর্বত্র হেঁটে যাওয়া চলে। দিলওয়ারার দিকে যাবার কালে 'নাক্কিতালাও' আবুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এটি যেন নৈনীতালের সেই নৈনী রূপ এখানে উঠে এসেছে রঘুনাথজির মন্দির দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পাহাড়ের ধারে। সেখানে রাজা রামচন্দ্রের কৃষ্ণবর্ণ বিগ্রহ বর্তমান। অন্যদিকে ইংরেজ আমলের রেসিডেন্সির 'কোঠি'। এটি এখন রাজস্থানের গভর্ণমেণ্টের অধীনে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে 'নাক্কিতলাও'য়ে নৌকাবিহার করা যায় রোশাকর জ্যোৎস্না রাতে,—ঠিক যেমনটি নৈনীতালে,—চারিদিকে পর্বতের প্রাচীর। এখানে আশেপাশে ভীল জাতির বস্তি পাওয়া যায়। জনসংখ্যার মধ্যে তাদেরও একটা অংশ আছে।

"নাক্কিতালাও"র মূল নামটি নাকি "নখিখতালাও।" প্রবাদ এই, আবুপাহাড় যেদিন জলের অভাবে হাহাকার করছিল, সেদিন এখানে একদল দেবতার আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা সেদিন আপন আপন নখের দ্বারা খাঁচড়িয়ে একটি প্রকাণ্ড সরোবর কেটে বার করেন। আজও বুঝি সেই দেবতাদের উত্তরাধিকারীরা আছে এই "নখ্‌খিতালাও"র আশেপাশে গুহাগহ্বরে, মন্দিরে এবং এখানে ওখানে। আবু থেকে ছয় মাইল পাহাড় পেরিয়ে গেলে 'গোমুখ'। সেখানে রয়েছে বশিষ্ঠ ও গৌতমের আশ্রম। ওর পরে সেই বিরাট "গুরুশিখর" পর্বত। গোমুখের নিকটবর্তী 'কোদরা ধাম' থেকে আবু পাহাড়ে জল সরবরাহ করা হয়। 'গুরুশিখর' পর্বতে উঠে গেলে পাওয়া যায় 'দত্তাত্রেয় আশ্রম,'—এখানে জীবন-বৈরাগী সন্ন্যাসীগণের দেখা মেলে। ওখানে আরেকটি মন্দির আছে, তার নাম "আনচোরিয়া মাতা।"

মাইল পাঁচেক মোটরযোগে গেলে অচলগড় পর্বত। এটির উচ্চতা সাড়ে চার হাজার ফুট। গুরুশিখর এবং অচলগড় মুখোমুখি—এপার ওপার। গুরুশিখর অবশ্য আবুপাহাড়ের মধ্যে সর্বোচ্চ চূড়া,—সাড়ে পাঁচ হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু। ওটার পথ 'ওরিয়া' ডাকবাংলোর পাশ দিয়ে গিয়ে মাইল দুই চড়াই ভাঙতে ভাঙতে পৌঁছেছে।

অচলগড় একটি পুরনো দুর্গ, একটি দুটি মন্দির, এবং একটি ক্ষুদ্র জনপদের ভগ্নাবশেষ। একটি প্রাকার ঘেরা সরোবরের মধ্যে তিনটি মহিষমূর্তি পাশাপাশি বসানো,—এবং তার দিকে এক রাজকুমারের প্রস্তরমূর্তি বল্গাহাত নিয়ে লক্ষ্য করছে। এটির নাম 'ঘৃত' সরোবর। পুরাকালে অসুরা এসে এখানে ঘি খেয়ে যেত! সেই অসুরা রামরাজ্যের বানর কিনা এটি জানা গেল না। প্রবাদ এই, পুরাকালে এই সরোবরটি ঘৃত পরিপূর্ণ থাকত। কিন্তু প্রতি রাত্রে গোপনে তিনটি বন্য মহিষ এসে সেই ঘি খেয়ে যেত। রাজা আদিপাল এতে ক্রুদ্ধ হন এবং ঘৃতকুণ্ড রক্ষার জন্য মহিষগুলিকে বধ করেন। অচলগড়ের মধ্যে রাণাকুম্ভ এবং তাঁর পত্নী ভজনসিদ্ধা মীরাবাঈয়ের নামে মহল ও গুহা রয়েছে। হনুমানের মূর্তি রয়েছে এই গড়ের দ্বারপাল হিসাবে। পাশ দিয়ে একটি সঙ্কীর্ণ পথ চলে গিয়েছে আদিনাথের মন্দিরে। তাঁর মূর্তি পিতলের। সেই মূর্তিটি বিশেষ মর্মস্পর্শী। পাশে ছোট ছোট চব্বিশটি জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি। গড়ের ছাদের উপরে এসে দাঁড়ালে নিকটে ও দূরে দেখা যায় চিতোর

পাহাড়, মাড়োয়ার, বানাস নদী, আবু পাহাড়ের পথ, গুরুশিখর প্রভৃতি। গড় থেকে নীচে নেমে এলে অচলেশ্বর এবং পার্বতীর মন্দির দর্শন করা চলে। চারিদিকের রুক্ষতার মাঝখানে এ মন্দিরের বৃক্ষছায়াতল যেন শান্তির নীড়। বুঝতে পারা যায় একদালে এখানে হিন্দু ও জৈনদের মধ্যে একটি ধর্মসংগ্রাম ও মনোবিরোধ ঘটেছিল—যার মধ্যে রাজনীতিক চেহারাটা ছিল বড়। ফিরবার পথে "কন্যাকুমারী মন্দির" দেখে এসেছিলুম। তারই উপরভাগে ছিল শ্বেতবর্ণ একটি জৈনমন্দির। এখানকার সর্বত্র পাহাড়ের গায়ে যে-বিচিত্র ধরনের গুহাগহ্বরগুলি চোখে পড়ে, সেগুলি বহুকাল অবধি মনের মধ্যে একটি ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখে। শহর থেকে প্রায় মাইল তিনেক দূরে পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে পাওয়া যায় "সান-সেট্-পয়েন্ট", সূর্যাস্ত দৃশ্যস্থল! সেখানে সূর্যাস্তটি দেখবার জন্য অপরাহ্ণ কাল থেকে একটি ছোটখাটো জনতার সমাবেশ ঘটতে থাকে। জায়গাটা ঠিক সমতল নয়, পাহাড়ের গা। অনেকে সুবিধামতো জায়গা বাছে। ক্যামেরা থাকে সঙ্গে। মেয়ে পুরুষ অনেকেই এটিকে সান্ধ্যভ্রমণের অঙ্গ মনে করে। চারদিকে বনজঙ্গল আর ছোট ছোট জলাশয়। সন্ধ্যার পর নাকি এদিকে আজও হিংস্র জানোয়ার চ'রে বেড়ায়। নির্জন বনময় স্থান। এখানে এসে দাঁড়ালে দেখা যায় পশ্চিম রাজস্থানের ধূধূকার মরুভূমির প্রান্তমিগন্তে ধীরে ধীরে লোহিতবর্ণ সূর্য অস্তাচলে নামতে থাকে। সূর্যের সেই রক্তগ্রাস দৃশ্যটি সত্যই মনোরম এবং উপভোগ্য।

দিলওয়ারা মন্দিরগুলির বাইরের চেহারাটা একেবারে সাধারণ, সাদামাটা,—না আছে চাকচিক্য, না বৈশিষ্ট্য। উপর দিকটায় বোধ হয় একদালে চুনকাম করা ছিল, এখন বৃষ্টির ভাংলা প'ড়ে কালচে হয়ে এসেছে। কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না এই মন্দিরগুলির মধ্যে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য লুকিয়ে রয়েছে!

কোলের কাছ দিয়ে চলে গেছে অচলগড়ের পথ। পথের ধারে বুঝি দু'একটি ঘরদোর। আবু শহর থেকে হেঁটে এলে মাইল দেড়েক।

অত্যন্ত সাধাসিধে বাইরের দিক। এদিক ওদিক ঘুরলে সবসুদ্ধ পাঁচটি মন্দির দেখা যায় একই পাড়ায়। এগুলি শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায়ের। একটি শুধু দিগম্বরী মন্দির পথের এপাশে। পাঁচটি দিলওয়ারা হল আদিশ্বর, নেমিনাথ, রিষভদেব, সুবিধিনাথ এবং পরশনাথ। আদিশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ। আদিশ্বরের মধ্যে একটি বৃহৎ কৃষ্ণকায়া নারীর মূর্তি—নাম অম্বিকাদেবী। বড় বড় স্ফটিকের চক্ষু—বৃদ্ধের মতো বেদীর উপরে সমাসীন। মূর্তির প্রকাশটি অমল, যেন ঝিকঝিক ক'রে নিঃসঙ্গ দর্শকের কানে কানে কিছু বলতে চায়। ছোট ছোট মূর্তি আরও আছে আশেপাশে। আরেকটি কৃষ্ণকায় মূর্তি দেওয়ালের মধ্যে লটকানো। প্রধান মূর্তি হল আদিশ্বর ভগবান। ভিতরের কক্ষে সেটি বেদীর উপর বসানো শ্বেতমূর্তি। এটিও স্ফটিক চক্ষু। আদিশ্বর হলেন চব্বিশ জনের মধ্যে প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর। সমগ্র মন্দির মনে সম্ভ্রম জাগায়।

নিঃসঙ্কোচে এবং নির্ভয়ে প্রকাশ করব, ভারতবর্ষের কোথাও মর্মরপ্রস্তর নিয়ে এমন ললিত লাবণ্যের খেলা আর কখনও দেখিনি। আশ্চর্য হয়ে উঠেছে চিত্রকলা, আশ্চর্য কারুশিল্প! প্রতি গম্বুজের ভিতরভাগ, প্রতি দেওয়াল, প্রতি সিলিং, প্রতি স্তম্ভ, প্রতিটি ছোট ও বড় মূর্তি,—স্থপতিশিল্পীর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি! এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চারুশিল্প কলা কেমন ক'রে মর্মর-প্রস্তরের ভিতর থেকে বাহির ক'রে আনা যায়, এইটি প্রধান বিস্ময়। আবুমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের কোনও মন্দিরে এবং কোনও স্থাপত্য কীর্তিতে মর্মরপ্রস্তরের এই পরমাশ্চর্য শিল্পকলা নেই।

পঞ্চাশটিরও বেশি মূর্তি রয়েছে নানা কক্ষে। আমার বিশ্বাস পৃথিবীর যে কোনও দেশের পর্যটক স্থাপত্যকলার এই বিস্ময়কর সীকল্য দেখে যদি বাড়ি ফিরে যায়, সেই তার সার্থকতা। শুধু একটি বিষয়ে আমার মনে কিন্তু আছে। অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে এই আশ্চর্য মন্দিরগুলি নির্মিত। এই বিপুল ঐশ্বর্যসম্ভার সঙ্কীর্ণতার মধ্যে প'ড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়েছে। এর জন্য মস্ত পটভূমির প্রয়োজন ছিল। তারই অভাবে এটি অপরূপ হয়েও মহৎ হতে পারেনি। বিস্ময়জনক হয়েও রাজকীয় হয়ে ওঠেনি। তাজমহল অপেক্ষা অনেক বেশি 'ধনী' হয়েও তাজমহলের সেই আবশ্যিক মহিমাকে আনতে পারেনি! দিলওয়ারা দেখে সেইজন্য সেদিন আমার মন হায় হায় করে উঠেছিল। তবুও বড় দরিদ্র মনে হয়েছিল সেদিন তাজমহলের শিল্পকলা! অথচ জানি, তাজমহলের পটভূমিতে কিছু আছে বেদনার আভাস, কিছু আছে বিধুর-বিচ্ছেদের ভাবনা। তার উপরে তাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে কালিন্দীর কূলে—যেখানে শতবর্ষ বিরহের অশ্রুধারা আকুল হয়ে বয়ে চলেছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে! তা ছাড়া তাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতের লোকচলাচলের যাতায়াতে, সেটি যাতায়াতের পথেই পড়ে। তাজের পিছনে ছিল সম্রাটের মন, রাজকোষ ছিল শাসন-বাঁধন হীন, স্থান নির্বাচনের সুযোগ ছিল,—তাই নিয়ে বিজ্ঞাপন এবং প্রচারকার্য প্রচুর। তাজের পিছনে সকল যুগের রাজশক্তি কাজ করেছে। ভালবাসা এখানে রাজবেশ পরেছে। তাজের সুবিধা অনেক। এসব ছাড়াও অন্যদিক আছে। আকবরের ইলাহি ধর্ম এবং তাজমহলের প্রণয়ধর্ম—রাজনীতিক দিক থেকে মোগল সাম্রাজ্যবাদকে ভারতের মনে সহনীয় ক'রে তুলেছে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাবের চেতনা এনেছে। কিন্তু দিলওয়ারার ধর্মীয় ব্যথাটা কোনদিক থেকে জোর পায়নি বলেই তাকে একান্তে পড়ে থাকতে হল।

এক হাজার বছর আগে দিলওয়ারার মন্দিরগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু দেখে মনে হবে গতকাল মাত্র নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে! এটিও আশ্চর্য। দশম শতাব্দিতে শেঠ বিমল শাহ নাকি আবু পাহাড়ে তিনশত মন্দির একে একে নির্মাণ করেন। তিনি ছিলেন জৈন। তাঁর এবম্বিধ আচরণে অম্বুনাশিনী অম্বিকাদেবী তাঁকে নাকি এক স্বপ্ন দিয়ে বলেন, কোন্ অধিকারে এত বড় অন্যায় তুমি করেছ? বিমল শাহ বলেন, আমার জৈনগুরুর আদেশে! দেবী রুষ্টা হন্ এবং বারম্বার প্রশ্নের একই জবাব পেয়ে তিনি বাসুকীকে ডাক দিয়ে ভূমিকম্প আনেন! সেই ভূমিকম্পনের ফলে বিমল শাহর বহু মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে ভীত হয়ে বিমল শাহ অম্বিকাদেবীর শরণাপন্ন হন এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। অতঃপর দেবীর ইচ্ছাক্রমে দিলওয়ারার জন্ম ঘটে। এই মন্দির নির্মাণের খরচ পড়েছিল ১৮ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। এটির নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১০৩১ খ্রীষ্টাব্দে।

দ্বিতীয় মন্দির নেমিনাথের। তাঁর মূর্তিও কৃষ্ণবর্ণ। তিনি ২২শ নম্বর তীর্থঙ্কর। রাজা বৃদ্ধবলের আমলে ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মন্ত্রী শেঠ বাস্তুপাল তেজপাল এই মন্দির নির্মাণ করেন ১২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকায়। তৃতীয় মন্দিরটি ঋষভদেবের নামাঙ্কিত। এটি নির্মাণ করেন ভীম শাহ ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে। চতুর্থ মন্দির সুবিধিনাথের,—এ মূর্তিটি শ্বেতবর্ণ। পঞ্চমটি পরশনাথ। পরশনাথ আমাদের অতি পরিচিত। মূর্তিটি সুশ্বেতবর্ণ, মুখশ্রীর অভিব্যক্তি মিষ্ট এবং করুণাময়। এই মূর্তিটিতে শিল্পীর গুণপনা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রতি মন্দির ও মূর্তির ইতিহাস শুনেছি মন দিয়ে, কেননা প্রতি মন্দিরেই একটি নিজস্ব কাহিনী রয়েছে—যেটি শোনবার মতো। মনে হচ্ছিল আমি যেন বহুকাল এই একটি 'অবাস্তব' এবং রূপকরাজ্যে বাস করছি! আমি এতক্ষণ যেন ছিলুম অন্তহীন কালের বাইরে! আমাকে বাদ দিয়েই মহাকাল তাঁর মালা জপ করছিলেন! সৌন্দর্যের অমরাবতীতে আমি হারিয়ে গিয়েছিলুম!

সমগ্র রাজস্থান ভ্রমণ করলে একটি কথা মনে আসে। সনাতনী হিন্দুদের অধিকার বোধ এবং জৈনদের প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠা। রাজস্থানে বৌদ্ধপ্রভাব কম। সব জায়গায় দেখেছি জৈনী স্থাপত্যের পাশে হিন্দু-স্থাপত্য এসে জায়গা দখল করেছে। এক একটি দল বানিয়েছে তাদের পছন্দ মতো উপকথা, প্রবাদ, স্বপ্নাদেশ, রূপকথা ইত্যাদি। কেউ হার মানতে চায়নি। কিন্তু এরই ভিতর দিয়ে প্রত্যেকে আপন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়েছে। ঐক্য এবং সংহতি সৃষ্টি করেছে। একটির সঙ্গে অন্যটিকে মেলাবার চেষ্টা পেয়েছে। অভিমান জানিয়ে কেউ সরে যায়নি।

অদূরে নীলকণ্ঠ মহাদেবের রক্তবরণ মন্দিরটি চোখে পড়ছে। বিরাট পাহাড়ের দেওয়াল ঘিরে রয়েছে। দূর উচ্চে "গুরু শিখরটি" দেখা যাচ্ছে—সেটি আবু পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। তার নীচে চির-রহস্য ছায়ার আভাস দিচ্ছে অসংখ্য গুহাগহ্বরের দল! কোনও কোনও বৃহৎ পাথরখণ্ড যেন মনুষ্যাকার লাভ করেছে। হঠাৎ মনে হয় যেন জটাজুটধারী নির্বাক মুনি ঋষিরা সামনে দাঁড়িয়ে। এমনই বিস্ময়কর পাথরের মনুষ্যাকার দেখেছিলুম একদা হিমালয়ের কুলু ও মানালীর পথে!

নীলকণ্ঠ মন্দিরের অঙ্গনে ছায়াচ্ছন্ন বিটপীর নীচে বিশ্রাম নিতে গিয়ে মৃদুমন্দ হন্টার টুংটাং শব্দে তন্দ্রা ছিঁড়িয়ে এসেছিল দুই চোখে। অদূরে একটি টিলাপাহাড়ের উপর অহর্ভূজার মন্দিরটি দেখা যাচ্ছিল।

আমার দিল্লী যাবার সময় হয়ে এসেছিল। কিন্তু দিলওয়ারার দেবের কথা শেষ করার আগে আর দু'একটি সংবাদ দিয়ে যাই। এখান থেকে গোমুখ পাহাড় ছাড়িয়ে দূরে গেলে 'হনুমান' মন্দিরটি দেখে আসতে হয়। বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে গেলে তবে শক্তির প্রতীক হনুমানের দাক্ষাৎ মেলে। বলতে ভুলেছি, আবু পাহাড়ে আসবার পথে জীবন্ত হনুমান প্রচুর। এই মন্দিরের অঞ্চলে নাকি প্রতি বছরে এক একটি সময়ে হঠাৎ একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কোথা থেকে যেন একটি মন্দিরের "নিশানা" হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য! এই সময় তীর্থযাত্রীরা তাদের মনস্কামনা জানাতে থাকে। কামনা পূর্ণ হয় কিনা সে খোঁজ আমি করিনি। তবে এটি জেনেছি প্রতি বছর ভাদ্র আশ্বিনে এখানে একটি মেলা বসে।

গোমুখের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র মন্দিরটি "অগ্নিকুণ্ড" নামে খ্যাত। অনেকে বলে এই অগ্নিকুণ্ডে সামরিক রাজপুতগণের জন্ম ঘটে, এবং এই অগ্নিকুণ্ডেই পরশুরাম ক্ষত্রিয়গণকে ভস্মীভূত করেন। এই অঞ্চলের অদূরে একটি "বৈষ্ণব" মন্দিরের নিকটে যে পবিত্র বৃষভ-নন্দী আসীন, তিনিই নাকি একদা আবু পাহাড় সৃষ্টি করেন, গুরুশিখর তাঁরই স্কন্ধপৃষ্ঠ। এই নন্দীটি একদা নাকি একটি গহ্বরে প'ড়ে যায়! রাজস্থানের নদী সরস্বতী তাঁর প্রবাহকে নিয়ে আসেন নন্দীকে উদ্ধার করবার জন্য! কিন্তু সেই প্রবাহে বন্যার সৃষ্টি হয়। তখন দেবতারা দেবাদিদেব হিমাচলের নিকট আবেদন জানান। হিমাচল পাঠিয়ে দেন তাঁর বিশালকায় ভৃত্যকে অর্বুদকে। অর্বুদ বলেন, আমি এই বিরাট বৃষভকে পাহাড়ের উপর অবশ্যই তুলে আনতে পারব, কিন্তু তার বিনিময়ে এই পাহাড়ের সঙ্গে আমার নামটি চিরকালের জন্য যুক্ত রাখতে হবে! অর্বুদের অপভ্রংশ আবু!

বিদায় নেবার সময় আবুর কানে কানে বলে এলুম, তুমি থাকো এই নিভৃত কোণে একান্তে আপন বিস্ময় নিয়ে! রাজস্থানের চারিদিকে বিপুল মরুসাগরের মাঝখানে দেবদারুর মতো তুমি পারিজাত পুষ্প শোভিতা হয়ে এই বিজন বনপর্বতচ্ছায়ায় হাসিমুখে বসে থাক!

তোমাকে মনে রাখব চিরদিন!

জনতা-এক্সপ্রেস ছেড়ে দিল

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

স্বামী ছিলেন উকিল। ওকালতি করে বিশেষ কিছুই করতে পারেননি। অতিকষ্টে তাঁর সংসার চলতো। মৃত্যুর পর দেখা গেল তিনি রেখে গেছেন কিছু ঋণ। গায়ের গয়না বিক্রি করে সুরবালা স্বামীর ঋণ পরিশোধ করলে। ছেলে নেই, আছে মাত্র একটা মেয়ে।

মেয়েটা সুন্দরী। বিয়েও হয়ে গেছে।

সুরবালা ভেবেছিল মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে নিজে কোথাও কোনও বড়লোকের বাড়ী রান্নাবান্না করে দিন চালাবে। সে যে উমেশ উকিলের স্ত্রী—সেকথা বলা চলবে না। বহু দূরে চলে যেতে হবে। তাই যাবে সুরবালা।

জামাইকে লিখলে, 'তুমি একবার এসো বাবা, এসে মৌরীকে নিয়ে যাও। আমি আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী যাব। মৌরীকে সেখানে নিয়ে যেতে চাই না।'

জবাবে জামাই যা লিখলে, তা যেমন মর্মান্তিক, তেমনি লজ্জাকর। জামাই লিখলে, আপনার মেয়েকে বিয়ে করা আমার উচিত হয়নি। বিয়ের পর যে-সব ব্যাপার আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি তাতে আপনাদের মা ও মেয়ের—দু'জনেরই চরিত্র সম্বন্ধে আমার গভীর সন্দেহ হয়েছে। এর পর আপনার মেয়েকে আমার বাড়ীতে আনবার জন্য আপনি আমাকে অনুরোধ করবেন না। সে অনুরোধ আমি রাখতে পারব না।

সুরবালা আর অনুরোধ করেওনি।

না করবার কারণ অবশ্য আছে, এবং তা অত্যন্ত গোপনীয়। সুরবালা চায় না যে সেই সামান্য কথাটা অতিরঞ্জিত হয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

সে আজ বেশি দিনের কথা নয়। উমেশ উকিল তখন বেঁচেছিলেন। সেই বৎসর মৌরীর বিয়ে হয়েছে। জামাই এসেছে। বাড়ীতেই রয়েছে সে।

স্বামীর মক্কেলের বড় অভাব। যদি বা কদাচিৎ এক-আধজন আসেন, তাদের আদর-যত্নের এত বেশি বাড়াবাড়ি করতে বলেন তাঁর স্বামী, সুরবালা এক-এক সময় বিরক্ত হয়ে ওঠে।

হঠাৎ একজন বড়লোক মক্কেল পেয়ে গেলেন উমেশবাবু। বিজয়গড়ের মস্ত বড় জমিদার বংশলোচনবাবু। পরের দিন আদালতে মামলা। বংশলোচনবাবুকে রাত্রি বাস করতে হবে। মফঃস্বলের কোর্ট। শহরে আসা হলেও বংশলোচনবাবুর থাকবার মত হোটেল সেখানে নেই। উমেশবাবু বললেন, 'আপনি আমার বাড়ীতে থাকবেন।' নিতান্ত ছোট একখানি দোতলা পুরনো বাড়ী। দোতলায় ছোট ঘরখানি মেয়ে-জামাইএর জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সেই ঘরেই থাকতে দেওয়া হলো বংশলোচনবাবুকে। সুরবালাকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ

তোমার কম সৌভাগ্য নয় সুরবালা। উনি যে তোমার বাড়ীতে অতিথি হবেন এ-কথা ভাবতে পেরেছিলে কোনদিন ?'

সুরবালা তাঁর দিকে তাকিয়ে একবার হেসেছিল শুধু। হাসতে তার ভাল লাগেনি তবু হাসতে তাকে হয়েছিল তার স্বামীর অবস্থার কথা ভেবে। জামাই এসেছে বাড়ীতে, তাকে যে একটু ভাল করে খাওয়াবে সে সঙ্গতিটুকুও নেই তার স্বামীর।

উমেশবাবু নীচে নেমে এসে স্ত্রীকে বারবার শুধু সেই এক অনুরোধই করেছিলেন, 'এবার তোমার হাতেই আমার ভাগ্য। এই লোকটিকে যদি একটু খুশী করতে পার, চাই-কি কপাল আমার ফিরেও যেতে পারে।'

হ্যাঁ, বংশলোচনবাবুকে খুশী করতে গিয়ে কপাল তার ফিরেছিল বই-কি! কেমন করে ফিরেছিল সেই কথাই বলি।

মক্কেলহীন উকিল উমেশবাবু রোজ সন্ধ্যাবেলা যান বগলাবাবুর বাড়ীতে। বগলাবাবু মোক্তার। ঠিক তাঁরই মত তার অখণ্ড অবসর। দু'জন বসে বসে দাবা খেলে আর জজ-মুন্সেফদের বাপান্ত করে। সেদিন বাড়ী ছেড়ে যাবার ইচ্ছে তাঁর ছিল না, কিন্তু একে দাবার নেশা, তার ওপর বগলাবাবু নিজে এসে ডাকতে। কাজেই তাঁকে যেতে হলো। যাবার সময় সুরবালার ওপর ভার দিয়ে গেলেন বংশলোচন-বাবুকে যত্ন করবার।

জামাইএর বসবার জায়গা নেই বাড়ীতে। ঘরখানি দখল করেছেন বংশলোচনবাবু। নীচে মাত্র দু'খানি ঘর। একে মশার উপদ্রব, তার ওপর দুখানি লণ্ঠনের মধ্যে একখানি নেছে দোতলায়। একখানি রান্নাঘরে। কাজেই জামাই নেছে বেড়াতে। কখন ফিরবে কে জানে।

বাড়ীতে মা আর মেয়ে।

গৌরীকে রান্নাঘরে রেখে সুরবালা গেল বংশলোচনবাবুকে চা আর জলখাবার দিতে।

দিতে গিয়ে আর ফিরে আসে না।

রান্নাঘরে ডাল চড়েছিল উনোনে। ডাল নামিয়ে তারপর কি চড়াবে কিছুই ঠিক করতে পারলে না গৌরী। মাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। একবার ডাকলে, মা!

কোনও সাড়া না পেয়ে নিজেই উঠে গেল দোতলায়।

গিয়ে দেখে ঘরখানা অন্ধকার। গৌরী সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে পড়লো। মাকে ডাকতে যাবে এমন সময় টুন্ করে চুড়ির আওয়াজ হলো ঘরের ভেতর। ডাকবে কি ডাকবে না ভাবছে, গৌরীর পেছনে ফস্ করে একটা দেশলাই জ্বালার আওয়াজ। তাকিয়ে দেখে, জামাই। নীচে কাউকে দেখতে না পেয়ে সেও ওপরে উঠে এসেছে চুপিচুপি।

ঘরের ভেতর থেকে সুরবালা বললে, 'কে? গৌরী? দেশলাইটা আন্ তো মা। লণ্ঠনটা নিবে গেল ফস্ করে।'

গৌরী তার স্বামীর দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, 'দাও না তোমার দেশলাইটা। বা-রে, চলে যাচ্ছে তাখো! শুনছো?'

দেশলাইটা সিঁড়ির ওপর ছুঁড়ে দিয়ে জামাই নীচে নেমে এসেছিল।

জামাইএর সে ছুঁড়ে-দেওয়া দেশলাইটা কুড়িয়ে নিয়ে গৌরীকে আর শেষ পর্যন্ত বংশলোচনবাবুর ঘরের ভেতর যেতে হয়নি। বংশলোচনবাবু নিজেই খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর দেশলাই।

মেয়ের কাছে, জামাইএর কাছে সুরবালার লজ্জার সীমা ছিল না সেদিন।

মেয়ের কাছে বলেছিল, 'মানুষটা বড় ভাল রে! আমাকে দিদি বলে ডাকছে!'

জামাইকে তো ডেকে বলতে পারে না! রাত্রে পরিপাটি করে আসন বিছিয়ে খাবার থালাটা ধরে দিয়ে বলেছিল, 'উনি কে জানো তো বাবা সন্তোষ? প্রতাপগড়ের মস্ত বড় জমিদার বংশলোচনবাবু তোমার শ্বশুরের মক্কেল। ভদ্রলোক এত ভালমানুষ, দিদি দিদি করে আমাকে একেবারে অস্থির করে তুললেন। চা দিতে গিয়েছিলাম, উনি বলছিলেন, 'তোমার মেয়ে-জামাইকে নিয়ে আমার বাড়ীতে একবার যেতে হবে দিদি।' সেই কথাই হচ্ছিল, এমন সময় কড়ো হাওয়ায় হঠাৎ লণ্ঠনটা গেল নিবে। দেশলাইটা উনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তুমি ভেবেছিলে বুঝি বাড়ীতে কেউ নেই, এরা সব গেল কোথায়? না?'

এমনি সব আবোল-তাবোল অনেক কিছু বলেই ব্যাপারটাকে হাল্কা করে নিতে চেয়েছিল সুরবালা। কিন্তু পারেনি হাল্কা করতে।

জামাই একটি কথাও না বলে পরের দিন সকালেই বাড়ী চলে গিয়েছিল। আর আসেনি।

রাত্রে মেয়েকে কি বলেছিল গৌরীকে সেকথা জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয়নি সুরবালার।

তার পরেই উমেশবাবুর মৃত্যু।

ইচ্ছা ছিল না, তবু সুরবালাকে যেতে হলো প্রতাপগড়ে। গৌরীকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো বংশলোচনবাবুর কাছে।

ভদ্রলোকের বিরাট বাড়ী। মস্ত বড়লোক। মা মেয়ের স্থান হয়ে গেল অনায়াসে।

বংশলোচনবাবুর একমাত্র সন্তান শ্যামসুন্দরের তখন বৌ মারা গেছে।

রেখে গেছে একটা কচি ছেলে। বয়স তখনও তার দু'মাস পেরোয়নি।

ছেলেটাকে মানুষ করবার জন্যে লোক খুঁজছিলেন প্রতাপগড়ের গিন্নিমা। সুরবালা বললে, 'লোক আপনাকে রাখতে হবে না দিদি, আমার মেয়ে গৌরী ওকে মানুষ করবে।'

গিন্নিমা বললেন, 'কিন্তু তোমার মেয়েটির তো বিয়ে হয়ে গেছে। সে তো শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে।'

সুরবালা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে, 'আমার অদৃষ্ট দিদি। মেয়ের বিয়েই হয়েছে—ওই পর্যন্ত। জামাইটা মাতাল, বদমায়েস, দুষ্টুর একশেষ। অমন লক্ষ্মীর মত মেয়ে আমার, তবু জামাইটা একবার ওর দিকে ভুলেও তাকায় না। নিয়েও যায় না, আসেও না।'

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। গৌরীর কোলেই তুলে দেওয়া হলো প্রতাপগড়ের ভবিষ্যৎ বংশধরকে।

কিন্তু গিন্নিমার ভাবনা হলো—ওইটুকু ছেলে—মরে কি বাঁচে তার ঠিক নেই, ওর ওপর ভরসা করলে তো চলবে না আমাদের। এত বড় বংশ লোপ হয়ে যাবে—শ্যামসুন্দর আবার যদি বিয়ে না করে।

শ্যামসুন্দরকে বলা হলো—'তুই আবার একটি বিয়ে কর বাবা।'

শ্যামসুন্দর জোর গলায় বললো, বিয়ে সে কিছুতেই করবে না।

বংশলোচনবাবু বললেন, 'ভাল একটি মেয়ে আমি দেখছি, শ্যামসুন্দর। তুই বিয়ে কর।'

শ্যামসুন্দর বললে, 'এই রকম করলে আমি কিন্তু পালাব বাড়ী থেকে।'

না বাবা, পালিয়ে কাজ নেই। একটি মাত্র ছেলে। গিন্নিও চুপ করে থাকেন। বংশলোচন-বাবুও কিছু বলেন না।

বলে শুধু গৌরী।

শ্যামসুন্দরকে একা পেলেই বলে, 'নাও তোমার ছেলে। আমি পারব না মানুষ করতে। বিয়ে করতে বলা হচ্ছে, কেন বিয়ে করবে না? লোকে বলবে কি?'

শ্যামসুন্দর মিটি মিটি করে হাসে। বলে, 'বলবে তোমার মাথা!'

গৌরী বলে, 'তোমার এ কাঁদুনে ছেলে আমি মানুষ করব বুঝি চিরকাল? আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না?'

শ্যামসুন্দর বলে, 'শ্বশুরবাড়ী থেকে চৌদ্দন আসছে যে তোমাকে নেবার জন্যে! আসছে আর ফিরে যাচ্ছে!'

'আসবে একদিন। তুমি দেখে নিও।'

শ্যামসুন্দর বলে, 'দেখতে চাই না। এলেও ফিরিয়ে দেবো।'

গৌরী বলে, 'না না, ও-সব বাজে কথা রাখো। তুমি বিয়ে কর।'

'বিয়ে যদি করতেই হয়', শ্যামসুন্দর চুপিচুপি বলে, 'তোমাকে করব।'

লজ্জায় মরে গেল গৌরী। বলে কি মানুষটা?

আশ্চর্য ব্যাপার, হাসিরঙ্গ করে যা বলেছিল গৌরী, শেষ পর্যন্ত তাই হলো।

গৌরীর স্বামী সরোজ একদিন বংশলোচনবাবুর বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালো।

সুরবালা অবাক্। গৌরীও অবাক্।

সরোজ বললে, 'আমার স্ত্রীকে আমি নিয়ে যাব এখান থেকে।'

গিন্নিমা বললেন, 'তোর কপাল সুরবালা! এমন করে যে ভগবান মুখ তুলে চাইবেন হঠাৎ, তাই-বা কে জানতো!'

সুরবালা কিন্তু ঠিক আশ্বস্ত হতে পারলে না। কিসের যেন একটা অজানা আতঙ্কে বুকটা তার কেঁপে উঠলো। মেয়েকে নিয়ে গিয়ে কষ্ট যন্ত্রণা দেবে কিনা তাই-বা কে জানে। বললে, 'কি জানি দিদি, এতদিন পরে আজকে হঠাৎ কেন যে নিতে এলো বুঝতে পারছি না।'

গিন্নিমা বললেন, 'মানুষের কখন কি হয় কিছু তো বলা যায় না সুরবালা। হয়ত জামাইএর সুমতি হয়েছে, হয়ত মেসো-ভাং ছেড়ে দিয়েছে! তাছাড়া তোর এমন সুন্দরী মেয়ে—ওকে ছেড়ে কখনও থাকতে পারে?'

সুরবালা বললে, 'তুমি যা বলবে দিদি, তাই করব।'

সিন্ধিমা বললে, 'আমি বলছি, সে পাঠিয়ে। গয়নাগাঁটি থাকতো তো না হয় তাবতায় গয়নার লোভে নিতে এসেছে। তা যখন নেই তখন তোর ভাবনা কি সুরবালা, পাঠিয়ে দে।'

সুরবালা মেয়ের মতটা একবার জানতে চাইলে।

সে আর কি বলবে! জলভরা চোখে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নামালে। মুখে কিছুই বললে না।

মা বুঝতে পারলে—মেয়ের যাবার ইচ্ছে নেই। কিন্তু এই আগুনের মত রূপবতী কন্যাকে বাড়ীতে রেখেই বা সে করবে কি? রাখবেই বা কোন্ ভরসায়?

যাওয়াই ভাল।

শ্যামসুন্দর সেদিন বাড়ীতেই ঢুকলো না। বাইরে বাইরে কাটিয়ে দিয়ে যাবার সময় বাড়ী যখন এলো, কারও মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালো না, কথা বললে না, মুখখানি দেখে মনে হলো—কি যেন ভাবছে।

সুরবালা কাছে দাঁড়িয়েছিল, সিন্ধিমা বললেন, 'দেখছিস সুরো, দেখলে বুক ফেটে যায় না?'

কথাটা সুরবালা বুঝতে পারেনি প্রথমে।

সিন্ধিমা বুঝিয়ে বললেন, 'পুরুষ মানুষ, জোর করে মনের কথা চেপে চেপে রাখে। আজ সৌরী চলে যাবে, ছেলেটার কষ্ট হবে—তাই আজ ওর মনে পড়েছে বৌকে।'

সুরবালা বললে, 'তা মনে পড়বে বই-কি দিদি। সৌরী ছেলে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, মনে হয় যেন ওরই ছেলে।'

সিন্ধিমা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

'শ্যামসুন্দর বিয়ে না করলে কি চলে ভাই?'

পরের দিন বেলা দশটায় ট্রেন।

সৌরী ছেলেটাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

ছেলেটা যত হাসে, সৌরী তত কাঁদে।

হঠাৎ শ্যামসুন্দর এসে দাঁড়ালো তার পিছনে।

'ও কি হচ্ছে? কাঁদছো কেন?'

সৌরী দু'হাত দিয়ে ছেলেকে ধরে আছে, চোখ মোছবার অবসর পেলে না। তবু বললে, 'কই না, কাঁদিনি তো। তোমার ছেলেটা দিলে হাসিয়ে তাই চোখে জল এসে গেল।'

শ্যামসুন্দর বললে, 'ভাখো, এই সুটকেশটার ভেতর তোমার যা যা দরকার সবই রইলো। খাম পোষ্টকার্ড আছে।'

'চিঠি দিও' কথাটা আর বলতে পারলে না শ্যামসুন্দর।

'যাও ঘর তোমার ছেলেকে ধর।' এই বলে খোকাকে তার বাপের কোলে তুলে দিয়ে চোখদুটো মুছে নিয়ে সৌরী বললে, 'আমার কি কি দরকার তা তুমি জানলে কেমন করে?'

শ্যামসুন্দর বললে, 'আমার একটা বৌ ছিল তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন?'

'কই দেখি।'

সুটকেসটা খুলে দেখলে সৌরী।—'ওমা, একী? এই এত এত জামা-কাপড়, তেল, সাবান —সর্বনাশ, এ তুমি করেছ কি?

'বেশ করেছি।'

বলে শ্যামসুন্দর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সৌরী যাবার আগে বংশলোচনবাবুকে প্রণাম করলে। গিন্নিমাকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখলে তাঁর কোলে খোকা রয়েছে। সুরবালাকে বললে, 'মা, খোকাকে তুমি একটু সরিয়ে-নিয়ে যাও তো মা।'

'কেন রে, সরিয়ে নিয়ে যাব কেন?'

সৌরীর চোখদুটো এতক্ষণ পরে জলে ভরে এলো। বললে, 'ওকে দেখলে আমি যেতে পারব না মা। আমাকে যেতে দেখলে ও কাঁদবে।'

সৌরী শ্যামসুন্দরকে খুঁজছিল প্রণাম করবার জন্যে, কিন্তু তাকে সে দেখতে পেলে না।

গিন্নিমা বললেন, 'কি জানি কোথায় গেছে বাছা। কাল থেকে দেখছি সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।'

সৌরী স্টেশনে গিয়ে দেখে, দু' হাঁড়ি সন্দেশ নিয়ে দু'খানি টিকিট কেটে শ্যামসুন্দর দাঁড়িয়ে আছে।

সৌরীর মুখে হাসি ফুটলো। ছুটে গিয়ে সে শ্যামসুন্দরের পায়ের ওপর পড় হয়ে প্রণাম করলে।

প্রণাম যেন আর শেষই হয় না!

শ্যামসুন্দর হাত বাড়িয়ে তাকে তুলে দিলে। দেখলে তার দুই গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে আসছে।

ট্রেন তখনও আসেনি।

সৌরী আর সরোজকে ওয়েটিং রুমের ভেতর বসিয়ে দিয়ে বাইরে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে রইলো শ্যামসুন্দর। টিকিট দুখানা সরোজ নিজের পকেটে রেখে বললে, 'খুব জমিয়েছ দেখছি।'

সৌরী বুঝতে পারলে না তার এই অদ্ভুত ইঙ্গিতটা। নির্বোধের মত হাঁ করে তাকিয়ে রইলো সরোজের মুখের দিকে।

সরোজ বুঝিয়ে বললে, 'মা জমিয়েছে বাপের সঙ্গে, মেয়ে জমিয়েছে ছেলের সঙ্গে।'

সৌরী রেগে উঠলো। —'কী বললে?'

"কিছু না। বলি ওই লোকটা তোমার কে?"

"কোন্ লোকটা?"

বাইরে আঙুল বাড়িয়ে দেখালে সরোজ। বললে, 'আমি ওই শ্যামসুন্দরের কথা বলছি। ও তোমার কে?'

"কেউ নয়।"

"তবে অত কেন?"

"অত কী?"

"অত ঘাড়াঘাড়ি?"

'কিসের কাড়াকাড়ি দেখলে তুমি ?"

'ভালবাসার। —ভালবাসার কাড়াকাড়ি। ও-লোকটা তোমার জন্যে এত করছে কেন ?"

গৌরী বললে, 'ও আমাকে ভালবাসে।'

সরোজ বললে, 'তুমিও ওকে ভালবাসো ?'

'বাসি।'

'এই কথা বলতে পারলে তুমি ?'

গৌরী বললে, 'কেন পারব না ? তুমি তোমার বোনকে ভালবাসো না ?'

'থামো। ওই সব কথা বলে আমার চোখে ধুলো দিও না।'

'আমি তোমার চোখে ধুলো দিচ্ছি, না তুমি আমার চোখে ধুলো দিচ্ছ ?'

সরোজ বললে, 'আমি তোমার চোখে আবার ধুলো দিলাম কখন ?'

গৌরী বললে, 'দিচ্ছ না ? আমি যদি জিজ্ঞাসা করি—তুমি আমার কে ? কী অধিকারে তুমি ?'

'সে অধিকার সবাই জানে। আমি তোমার স্বামী।'

গৌরী বললে, 'এখানে তুমি ভালবাসার দরকার কর না ? এখানে শুধু আমার কপালে একটুখানি সিঁদুর আর তোমার হাতে একটা ডাণ্ডা থাকলেই চলে ?'

ফোন-২৪-৩১৩৫

কাজে নিখুঁত
সময়ে নির্ভুল

ব্লক
ফিনিশিং
প্লেট

ক্যালকাটা প্রেস সার্ভিস
৪৫, আলগাঁ লেন। কলিকাতা - ১২

সরোজ বললে, ভাগু নয়—ছুতো। চল তুমি একবার আমার বাড়ীতে, তারপর তোমার ওই মুখ যদি আমি ছুতো মেরে না ভেঙে দিই তো আমার নাম সরোজ মুখুজ্যেই নয়।'

'ছুতো মারবার জন্যেই বুঝি তুমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছ?'

সরোজ বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালবাসবার মেয়ে তোমরা নও।'

'তোমরাই বুঝি ভালবাসবার মত পুরুষ?'

'হ্যাঁ, আমি জানি—যে চাবুক মারতে পারে, মেয়েরা তাকেই ভালবাসে।'

গৌরী বললে, সে-মেয়ে আমি নই। আমি সেরকম পুরুষকে ঘৃণা করি। তার ছেলের মা হতে আমি চাই না।'

'তাহ'লে তোমাকে নিয়ে গিয়ে আমার লাভ?'

'কোনও লাভ নেই।'

সরোজ বললে, 'আমি তোমাকে নিয়ে যাব না। তুমি এইখানেই মর।'

'তোমার কাছে গিয়ে বাঁচার চেয়ে সে মরণ অনেক ভাল।'

গাড়ী এসে গেল। প্ল্যাটফর্মে গাড়ী ঢুকছে। সরোজ উঠে দাঁড়ালো। বললে, 'আমি চললাম। তুমি যে পাপ করলে তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতে হবে।'

'না। আমি যে পুণ্য করলাম তার পুরস্কার আমি পাব?'

ফিরে দাঁড়িয়ে সরোজ বললে, 'পুণ্য করলে?'

গৌরী বললে, 'হ্যাঁ। তোমার মত মানুষের বংশবৃদ্ধি না হলে পৃথিবীর ভার অনেকটা কমে যাবে। সেটা পুণ্য কর্ম।'

গাড়ী বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না। সরোজ জবাব দেবার আর সময় পেলো না। তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়ে উঠলো।

গৌরীর সুটকেশ আর সন্দেশের হাঁড়ি নিয়ে কুলি বললে, 'জল্‌দি মা-জি, জল্‌দি কোরো। গাড়ী ছুট যায়েগা।'

সত্যি সত্যিই গাড়ী ছেড়ে দিলে।

শ্যামসুন্দর অবাক্ হয়ে গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এটা কি হলো?'

গৌরী বললে, 'বেঁচে গেলাম দাদা, চল বাড়ী ফিরে চল। খোকার জন্যে আমার মন কেমন করছে।'

শ্যামসুন্দর আর একটু অবাক্ হলো। বললে, 'তুমি আমাকে দাদা বলে ডাকলে গৌরী?'

গৌরী ম্লান একটুখানি হাসলে। হেসে বললে, 'তোমার ভেতরের জানোয়ারটাকে একটা চাবুক মারলাম। চল।'

গৌরী ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে এলো।

———

মহাজীবনের অজানা কাহিনী

আমেরিকার সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রনায়ক আব্রাহাম লিংকন সর্বকালের স্মরণীয় ব্যক্তিদের অন্যতম-রূপে সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের অসাধারণ কর্মকুশলতা, চরিত্রবল ও বীর্যবত্তা সকল দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে, প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু তাঁর জীবনে এমন একটি অধ্যায় ছিল, যা তাঁর কোন জীবন-চরিতে স্থান পায়নি। অথচ সেই ছোট্ট কাহিনীটি যখনই তিনি বলবার সুযোগ পেতেন তখনই ভারী খুশী হয়ে উঠ্‌তেন। বলতেন—"সময় সময় কত ছোট্ট ঘটনা কী ভাবেই না মানুষের জীবনের গতি বদ্‌লে দিতে পারে, ভাবলে অবাক লাগে।"

আব্রাহাম লিংকনের যে-ছবি বা যে মর্মরমূর্তি আমরা সচরাচর দেখি, তাতে দেখা যায়, তাঁর মুখে চাপ দাড়ি রয়েছে। তিনি যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন, তখন চার বছর দাড়ি রেখেছিলেন—সেই চেহারাই আমাদের কাছে পরিচিত। কেমন করে একটি একান্ত অপরিচিত ছোট্ট মেয়ের কথায় তিনি দাড়ি রাখার সিদ্ধান্ত করেন সেই কৌতূহলপ্রদ কাহিনীর মধ্যে ফুটে উঠেছে এই বিরাট মানুষটির অসামান্য শিশুপ্রীতি আর ভাবপ্রবণতা।

নিউইয়র্কের সহরতলী ওয়েস্ট্‌ফিল্ড নামক স্থানে এগারো বছরের মেয়ে গ্রেস বেডেল তার বাপ-মায়ের সঙ্গে থাকতো। একদিন তার বাবা মেলা থেকে গ্রেসের জন্যে একটি ছবি কিনে আনলেন—আব্রাহাম লিংকনের ছবি। লিংকন তখন সভাপতি-পদের জন্যে নির্বাচনপ্রার্থী হবার তোড়জোড় করছেন। চারদিকে তাঁর তখন খুব নামডাক। মেয়েটি নিজের ঘরে বসে তন্ময় হ'য়ে সেই ছবিটি দেখতে লাগল; বাবা বলেছেন, এই লোকটি দেশের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোক আর বড়লোক, শীগ্‌গির দেশের সভাপতি হবেন, তখন অনেক লোকের উপকার করবেন। ছবিটি দেখতে দেখতে গ্রেসের মনে হল, লোকটির মুখের গড়ন ভালই, কিন্তু বড্ড রোগা—দাড়ি থাকলে চমৎকার মানাতো। আচ্ছা, উনি কেন দাড়ি রাখেন না? তার বাবার দাড়ি আছে। মাস্টার মশায়ের দাড়ি আছে। ভারিক্কি লোকদের দাড়ি থাকাই তো উচিত, তা না হলে লোকে তাঁদের মানবে কেন? দেশের রাজা হোতে চলেছেন, ওঁর কিন্তু দাড়ি থাকাই চাই। গ্রেস স্থির করলো, এ-কথা তাঁকে জানাতে হবে। সত্যি সত্যিই এক চিঠি লিখলো সে :

"ওয়েস্টফিল্ড, ১৫ই অক্টোবর, ১৮৬০।

মাননীয় আব্রাহাম লিংকন,

প্রিয় মহাশয়, আমি একটি ছোট্ট মেয়ে, এগারো বছর আমার বয়স। আমার খুব ইচ্ছে, আপনি আমাদের দেশের সভাপতি হন। আপনার কি আমার বয়সী মেয়ে আছে?

যদি থাকে, তাকে আমার ভালবাসা দেবেন। আর আপনি যদি এই চিঠির জবাব দেবার সময় না পান, তাকে বলবেন, সে যেন উত্তর দেয়। আমার চার ভাই আছে, তারা সবাই আপনাকে ভোট দেবে। আমার চেনাজানা আর সবাই যাঁরা আছেন তাঁদের সবাইকে বলব আপনাকেই ভোট দিতে। কিন্তু একটি কথা আছে। আপনাকে দাড়ি রাখতে হবে। আপনার মুখখানা ছবিতে ভারী পাতলা দেখায়। দাড়ি রাখলে আরও সুন্দর আর ভারিক্কি দেখাবে। আমাদের পাড়ার মহিলারা সকলেই পুরুষের দাড়ি পছন্দ করে। আপনি দাড়ি রাখলে তারা সবাই খুসী হয়ে তাদের পরিজনবর্গকে আপনার পক্ষে ভোট দিতে বলবে এবং তাহলে আপনি নিশ্চিত প্রেসিডেন্ট হোতে পারবেন। ইতি—

গ্রেস বেডেল।"

লিংকনের নামে তখন প্রত্যহ অজস্র চিঠি আসে। দু'জন সেক্রেটারী তাদের বিলিব্যবস্থা করে। গ্রেসের পত্রখানা কাগজকেলার ঝুড়িতেই পড়েছিল, নিতান্ত দৈবক্রমে তা লিংকনের নজরে পড়ে। কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রেস তার চিঠির জবাব পেলো:

"স্প্রিং ফিল্ড, ১৯শে অক্টোবর, ১৮৬০।

মিস গ্রেস বেডেল, ওয়েস্টফিল্ড, নিউইয়র্ক,

আদরের ছোট্ট মেয়েটি, তোমার ১৫ই তারিখের মিষ্টি চিঠি পেয়েছি। বলতে দুঃখিত হচ্ছি যে আমার কোন মেয়ে নেই। আমার তিন ছেলে। বড়র বয়েস সতেরো, মেজোর নয়, ছোটর সাত। তারা আর তাদের মা—এই আমার সংসার। দাড়ির বিষয় যা লিখেছো তার উত্তরে বলি, কখনো তো দাড়ি রাখিনি, এখন হঠাৎ দাড়ি রাখলে লোকে আমায় মেকাতুরে আর ভাবপ্রবণ বলবে না তো? ইতি—

তোমার অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী

এ লিংকন।"

তারপর ১৫ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে জানা গেল, নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে নিয়ে যে ট্রেন নিউইয়র্ক অভিমুখে আসবে সেই ট্রেন ছোট অখ্যাতনামা ওয়েস্টফিল্ড, স্টেশনে থামবে। ছোট স্টেশনে মহাচাঞ্চল্য জাগলো। নগরের লোক ভেঙে পড়ল। আশাতীত সৌভাগ্য তাদের—এখানে তো ট্রেন দাঁড়াবার কথা ছিল না!

বাবার সঙ্গে গ্রেস বেডেল-ও স্টেশনে গিয়ে দাঁড়ালো। যথাসময়ে ট্রেন এলো। চারিদিকে কলরব কোলাহল আর জয়ধ্বনি। লম্বা কালো টুপী মাথায় এক ব্যক্তি ট্রেন থেকে নেমে বিশেষভাবে তৈরী বেদীর ওপর গিয়ে দাঁড়ালেন। আবার জয়ধ্বনি। গ্রেস দেখলো, ঠিক, এই সেই লোক, সেই চেহারা। শুনতে পেলো তিনি বলছেন—"সমবেত ভদ্রমহিলা ও বন্ধুগণ, বক্তৃতার সময় নেই, আমি শুধু আজ এখানে কয়েক মিনিটের জন্যে দাঁড়ালাম যাতে আপনারা আমায় দেখতে পান। আমিও আপনাদের দেখতে পাই। আমার দেশের এই পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে আজ আমার একটি মাত্র প্রশ্ন আছে; আমি যেমন দৃঢ়চিত্তে এই পতাকার নীচে দাঁড়িয়েছি, আপনারাও তেমনি দৃঢ়চিত্তে আমার পাশে থাকবেন তো?"

চারিদিকে রব উঠল—"নিশ্চয়। নিশ্চয়।"

লিংকন বলতে লাগলেন—"এই জায়গায় আমার একটি ছোট্ট বন্ধু থাকে, সে আমায় পত্র লিখেছে। আমার চেহারা কেমন করে ভাল হোতে পারে তার পরামর্শ ছিল সেই পত্রে। সে যদি এখানে উপস্থিত থাকে তাহলে আমি তার সঙ্গে আলাপ করতে চাই, তাকে দেখাতে চাই যে আমি তার পরামর্শ মতো কাজ করেছি।

ক্ষণকালের জন্যে চারিদিকে বিস্ময় আর স্তব্ধতা। তারপর বহুকণ্ঠে প্রশ্ন: "তার নাম কি বলুন?"

লিংকন বললেন—তার নাম গ্রেস বেডেল।

গ্রেস বেডেল। গ্রেস বেডেল। চীৎকার উঠল চারিদিকে। তার বাবা বিস্মিত অভিভূত গ্রেসকে নিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ গ্রেস যেন শূন্যে উঠে গেল। দুহাত বাড়িয়ে লিংকন তাকে কোলে তুলে নিয়েছেন। হাসতে হাসতে জনতাকে উদ্দেশ করে বললেন—"গ্রেস আমায় চিঠি লিখে জানিয়েছিল যে যদি আমি দাড়ি রাখি তাহলে সবাই আমায় ভোট দেবে আর আমি প্রেসিডেন্ট হব। আমার মুখের আজকের এই পাতলা দাড়ি তারই চিঠির ফল।"

চারদিকে সে কি উল্লাসধ্বনি! গ্রেস হাঁ করে বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে চুমো খেয়ে লিংকন বললেন—'এই দেখ, তোমার কথায় আমি সত্যিই দাড়ি রেখেছি।'

যাবার সময় হল। লিংকন ট্রেনে উঠলেন। বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে ট্রেন চলতে লাগল। গ্রেস আবিষ্ট নয়নে তাকিয়ে রইল। ছোট মেয়ের কত বড় বন্ধু! ভাবতে অবাক লাগছে গ্রেসের।

সেই ছোট্ট মেয়ের ছোট্ট চিঠিখানি আজো আছে। স্প্রিংফিল্ড্-এ আব্রাহাম লিংকনের যে দোতলা সাধারণ বাড়িটি ছিল, সযত্নে সেটিকে এবং তার ঘরের আসবাবপত্রগুলিকে রক্ষা করে রাখা হয়েছে। একটি ঘরের দেওয়ালে কাঠের ফ্রেমে একটি কাগজ আঁটা আছে, তার উপর শিশু-সুলভ আঁকা-বাঁকা হরফে লেখা—"প্রিয় মহাশয়, আমি একটি ছোট্ট মেয়ে, এগারো বছর বয়েস আমার।..."

———

পূজা ও উৎসবের দিনে—

আধুনিকতম রুচির স্বর্ণালঙ্কারের রূপ ও বৈচিত্র্য
প্রিয়জনকে উপহার দিবার নানাপ্রকার অভিনব ও
চিত্তাকর্ষক অলঙ্কারের অপূর্ব্ব সমাবেশ।

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চ্চেন্টস্

স্থাপিত—১৮৮২

১-এ, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, (মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস্), কলিকাতা ফোন: ২২-২২৭০
ব্রাঞ্চ: ৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ফোন: ৪৭-১২৫৮

রিণি

আনন্দকিশোর মুন্সী

'ডাক্তারের ডায়েরী' যখন শেষ করি তখন বলেছিলাম আর লিখব না। তার কারণও ছিল তখন। দেখেছিলাম, যাঁদের বাড়িতে চিকিৎসা করে আমি নিজের সংসার চালাই তাঁরাও অনেকে বিরক্ত হয়েছেন আমার ওপর। মনে সংশয় ঢুকেছে, কখন না আমি তাঁদের কথাও লিখে ফেলি। নিতান্ত ঘরোয়া এবং গোপন কথাও ফাঁস করে দিই। তাই নিজেও ঘাবড়ে গিয়েছিলাম তখন। কাজে কাজেই গুটিয়ে নিয়েছিলাম নিজেকে। 'ডায়েরী' আর লিখিনি।

তারপর দেখলাম, মুখ বুজে থাকলেও নিস্তার নেই আমার। চিঠির পর চিঠি আসতে লাগল আমার ঐ মৌনতাকে বিদ্ধ করে। বিদ্রূপ এবং ব্যঙ্গ করতেও দ্বিধা করলেন না অনেকে।

বললেন, সে কারণটা আমি দিয়েছি সেটা নাকি নিতান্তই একটা বাজে কথা। আসল কথা, ওটা একটা পাবলিসিটি স্টাণ্ট।

গত কয়েক বছর ধরে এমনি চিঠি অনেক আমি পেয়েছি। বুঝেছি সবাই চায় অপরের ঘরের কথা জানতে। কিন্তু নিজের গোপন কথা প্রকাশ করতে কেউ চায় না।

'ডাক্তারের ডায়েরী' বেরোবার পর থেকে যত নতুন রোগী বা রোগিণী আমার কাছে এসেছেন ঐ লেখা পড়ে সবাই বলেছেন যেন তাঁদের কথা না লিখি।

লিখব না বলে যাঁদের কথা দিয়েছিলাম তাঁদের কথা এখনও অবশ্য আমি লিখিনি। কিন্তু দিন যতই যাচ্ছে ততই বুঝছি ঐ সব কথা রাখারও সত্যি কোন মূল্য নেই এই সংসারে।

নিজের চোখের সামনেই তো নিত্য দেখছি আজকের কথা, আজকের দুঃখ শোক অভিমান, কাল কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

নিজের গোপন কথা প্রকাশ হবার আশংকা আছে। ভেবে যাঁরা একদিন আমাকে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ করে নিয়েছিলেন কিছুই না বলতে, নিজেরাই তাঁরা সে কথা সবাইকে পরে বলে বেড়াচ্ছেন হাসি ঠাট্টা-গল্পের মধ্যে। দেখছি এসব কথা প্রকাশ্যে আলোচনা করেই যেন তাঁরা মজা পান। অর্থাৎ এখন তাঁদের বয়েস যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে মনের। আগে যে বস্তু ছিল নিতান্ত গোপন এবং লজ্জার, তাই এখন হয়েছে হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার!

কাজেই সেই সব কথা এখন যদি আমি লিখি তাহলে আমার ওপর মনে মনে নিশ্চয়ই খুশি হবেন তাঁরা। অন্তত চটে যে যাবেন না তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ ছাড়া আরও একটি দিক আছে। ঐ ডায়েরী লিখবার পরে আমার অনেক বিশিষ্ট বন্ধু ও বান্ধবীরা সত্যিই খুবই ক্ষুণ্ণ এবং ক্ষুব্ধ হয়েছেন আমার উপর তাঁদের কথা কিছুই লিখিনি বলে।

তাই অনেকে এমন পর্যন্ত স্বাধীনতা আমাকে দিয়েছেন যে তাঁদের নাম, ধাম, পরিচয় ইত্যাদি গোপন না করেও সব ঘটনা আমি লিখে দিতে পারি অনায়াসে।

যখনি এঁদের বাড়ি যাই, তখনই এঁরা আমায় অনুযোগ দেন। বলেন কৈ আমাদের নিয়ে সে কিছু লিখলেন না? কবে লিখবেন?

গত পাঁচ বছর ধরে এমনি প্রশ্ন শুনে শুনে এখন ঠিক করেছি, মানব চরিত্রের যতটুকু আমি দেখেছি সবই এবার লিখে ফেলব; অবশ্য যতটা লিখে প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব।

তাই ভেবেছি রিণির কথাটাই আজ আগে লিখব। অনেকদিন পর এই সেদিন ওকে হঠাৎ দেখলাম পুরনো বালীগঞ্জের এ কেয়ারের কাছে।

আমার ঝরঝরে পুরনো গাড়িটায় চড়ে সেদিন কবি দেখতে যাচ্ছিলাম পাম-অ্যাভিনিউতে। সৈয়দ আমীর আলি অ্যাভিনিউ থেকে বাঁক নিয়ে যে কেয়ারে ঢুকতেই দেখলাম, বাঁদিকের মস্ত বড় একটা বাড়ির খোলা গেট দিয়ে আকাশ নীল রঙের ঝকঝকে একখানা নতুন অ্যামবাসেডার বেরিয়ে এল। গাড়িটা চালাচ্ছিলেন একজন মহিলা। মনে হল, আমার গাড়িটা দেখেই যেন হঠাৎ তিনি ব্রেক কসে দিলেন।

ততক্ষণে আমার গাড়িটা ঐ গাড়ির পাশে এসে পড়েছে। হঠাৎ ব্রেক কষার ঐ ঘ্যাচাং ঘ্যাচ আওয়াজ শুনে আমিও চমকে ফিরে তাকিয়েছি ঐ গাড়িটার দিকে। ড্রাইভারের দিকে।

তাকিয়েই হঠাৎ বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। দেখলাম, ড্রাইভারের সিটে স্টিয়ারিংএ হাত রেখে রিণি মুক্তোর মত দাঁত বার করে হাসছে আমাকে দেখে। মাথায় ওর ঘাড় ছাঁটা ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল, ঠোঁটে এবং গালে ফিকে গোলাপী রঙ। গায়ে হাতকাটা এবং পেট খোলা চলদে রঙের আধুনিক ব্লাউজ। পরনে ঘন সবুজ রঙের নাইলনের শাড়ি।

রিণিকে এই পরিস্থিতে এবং এই পোশাকে দেখব কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি আমি। ভাবা সম্ভবও ছিল না।

রিণির বাবা ছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের একটা শহরের ইস্কুল মাস্টার। তাই মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। ম্যাট্রিক পাস করার পর যখন রিণি কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হল, তখন ওর বাবা শুধু ওর থাকার ব্যবস্থাটাই করে দিয়েছিলেন তাঁর এক আত্মীয়ের বাসায়। তারপর রিণি নিজের খরচ নিজে চালিয়েছে টিউসানি করে। কলেজের মাইনে দিয়েছে এবং যে বাসায় থাকত সেখানেও নানাভাবে এমন অনেক কিছু প্রতি মাসে দিয়েছে যাতে তাঁরা না ভাবেন যে ও তাঁদের অনুগৃহীতা।

কলকাতায় এসে ক্রমে রিণি বি. এস-সি. পাস করল। অংকে অনার্স নিয়ে। ইচ্ছে ছিল এম. এস-সি. পড়বে। কিন্তু ওর অদৃষ্টে তা হল না।

যে বাড়িতে ও ছিল কলকাতায় সেই বাড়ির কর্তা ওর বাবার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। কর্তা গিন্নী দুজনেই ওকে নিজের মেয়ের মতনই দেখতেন। রিণিও ওঁদের ভাবত জ্যেঠামশাই এবং জ্যেঠিমা বলে। বাড়ির ছেলেমেয়েদেরও নিজের ভাইবোনদের মতই ভাবত এবং সেইরকম ব্যবহার করত।

শুধু একটি ছেলে ছাড়া। সে তখন পড়ত ডাক্তারী। রিণি যখন বি. এস-সি. পাস করল তখন এই ছেলেটি ডাক্তারীতে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। রিণির চেয়ে বছর ২।৩ বয়সে বড়।

ওদের দুজনের এমন ভাব হয়ে গেল যে ওরা একদিন হঠাৎ বিয়ে করে বসল তিন আইনে রেজিস্টারী করে। কাউকে কিছু না জানিয়ে।

ছেলেটির ইচ্ছে ছিল ব্যাপারটি আপাতত গোপন থাকুক। বছর দুই পরে ও যখন ডাক্তারী

পাস করবে তখনই সব কথা খুলে বলবে বাবা মাকে। এই দুটো বছর রিণি ওদের বাড়িতেই থাকুক যেমন আগে ছিল।

কিন্তু এই ছলনায় রাজী হতে পারেনি রিণি। সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে ছেলেটির হাত ধরে বিয়ের পর তার বাবা মাকে এসে প্রণাম করেছিল।

এই কাণ্ড দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন ছেলেটির বাবা মা।

রিণি ভেবেছিল, ওকে যেরকম ভালবাসতেন ওঁরা তাতে বোধহয় অনায়াসেই কিংবা খুব আয়াসেই এটা সহজে মেনে নেবেন তাঁরা।

কিন্তু তা হল না। ছেলের মা রিণিকে গালাগাল দিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। আর ছেলের বাবা স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে কঠিন কণ্ঠে স্ত্রীকে শাসন করে বললেন, ছিঃ, ও রকম কোরো না। ইতর লোকের মত। তোমার ছেলে কি করেছে সেইটাই ভেবে দেখো আগে।

তারপর গম্ভীর হয়ে রিণির মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, কিন্তু মা! এরপর তো এ বাসায় আর তোমাদের থাকা চলে না।

সেইদিন রাত্রেই রিণি তার স্বামীকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে উঠে এসেছিল, সঙ্গে একটি মাত্র সুটকেশ্ নিয়ে। উঠেছিল এক বন্ধুর বাসায়। বন্ধুটি পরের দিনই একটা ঘর ঠিক করে দিল এক বস্তিতে। মাসে তার পনেরো টাকা ভাড়া।

বস্তির এই ঘরে রিণি তার সংসার পাতল। বিয়ের রাতটা কেটেছিল বন্ধুর বাড়ি। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রি কাটল বস্তিতে। একলা।

কিন্তু তাতেও রিণি ঘাবড়ায়নি। কয়েকদিনের চেষ্টায় একটা মেয়ে স্কুলের অংকের মাস্টারি জুটিয়ে নিল রিণি। দুটো টিউসনি ওর আগে থাকতেই ছিল। এখন হল ইস্কুলের কাজ। সকাল ৬টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত।

ভোর বেলা পাঁচটায় সময় উঠে রিণি চা খেয়ে ইস্কুলে যেত। ফিরত ১১টায়। তারপর রান্না-বান্না করে ১টা নাগাদ দুজনে বসে খেত। ঘণ্টা দু'তিন বিশ্রাম করেই আবার যেত টিউসানিতে। ফিরত সন্ধ্যা ৭টায়। তারপর এসে রান্না করত।

একটুও ক্লান্তি বোধ করত না তখন। মনে ছিল উৎসাহ এবং ফুর্তি। দেহে ছিল যৌবন।

কিন্তু দুটি মাসের মধ্যেই রিণির এই নতুন সংসার ভেঙ্গে গেল। স্বামী-নিয়ে রিণির এই সংসারে সেই ছেলেটির হাবভাব ক্রমশ বদলে গেল।

প্রথমে রিণি কিছু বোঝে নি। ভেবেছিল পড়াশুনা ছেড়ে এবং বাপ মা ছেড়ে রয়েছে বলেই বুঝি এমন উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মনে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল যেদিন ছেলেটি বলল, রিণিকে নিয়ে যাবে হাসপাতালে ওর দেহটা পরীক্ষা করবার জন্য।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল রিণি। লোকটা বলে কি? ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? নিজের শরীরে তার তো কোনো রোগ নেই! কখনও তো বলে নি তার শরীর খারাপ! তাহলে?

তাই রাজী হয়নি সে প্রথমে। উল্টে হেসে বলেছিল, তুমিই যাও হাসপাতালে। নিজের মাথাটির এক্স্-রে করে ভাল করে পরীক্ষা করিয়ে এস আগে।

কিন্তু ওর স্বামী এতে ভোলে নি। গম্ভীর হয়ে বলেছিল, দেখ চারটি বৎসর আমি ডাক্তারী পড়েছি। শরীর সম্বন্ধে আমি যা বুঝি, তুমি তা বুঝবে না কখনও। আমি বুঝেছি তোমার দেহে খুঁৎ আছে। শরীরের গঠনটা যদিও তোমার স্বাভাবিক এবং আর পাঁচজন মেয়ের মত কিন্তু ভেতরটা এখনও তোমার অপুষ্ট। বিয়ে করে মা হবার যোগ্য তুমি হওনি এখনও। তাই এটার চিকিৎসা করানো দরকার।

সাংঘাতিক এই কথা শুনে হঠাৎ যেন বজ্রাঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল রিণি। মাথার ভেতরটাও কেমন যেন করে উঠেছিল তখন। সমস্ত ঘরটাও যেন দুলে উঠেছিল। আর অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল রিণি।

সেই থেকেই তার অসুখের শুরু।

তারপর স্বামীর কথায় একদিন তবু রিণি দাদপাতালে গিয়েছিল। বড় বড় ডাক্তাররা ওকে নানা রকম পরীক্ষাও করেছিলেন। অজ্ঞান করে একটা অস্ত্রোপচারও করা হয়েছিল ওর দেহে। কিন্তু স্বামীকে সহজভাবে নিতে আর রিণি পারেনি। কেবলি সন্দেহ হয়েছে ছেলেটি ওকে বিয়ে করে খুশি হয়নি। কখনও বুঝি হবে না।

তাহলে কিসের জন্য রিণি এই হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটছে? আর পড়ে আছে এই নোংরা বস্তিতে? আর ছেলেটিকেই বা সে কিসের দাবীতে নিজের কাছে রাখবে? তার বাপ-মার কাছ থেকে অযন করে ছিনিয়ে নিয়ে এসে? রিণির মনে হল, জীবনটা তার ব্যর্থ হয়ে গেছে। এইভাবে ঘর করতে আর সে পারবে না।

তাই দু'মাসের মধ্যেই তার সংসার ভেঙে গেল। ছেলেটিকে তার বাপমার কাছে পাঠিয়ে দিল রিণি। নিজে এক বন্ধুর বাড়িতে একটা ঘর ঠিক করে চলে গেল। স্বামীকে বলল, আগে আমি চিকিৎসা করে নিজেকে সারিয়ে নিই তারপর আবার সংসার করা যাবে।

সে আজ দশবছর আগেকার কথা যখন প্রথম আমার সঙ্গে রিণির পরিচয় হয়।

সেই সময় প্রায় রোজই রিণি আমার কাছে আসত।

ওকে পরীক্ষা করে যখন ওর শরীরে কোথাও কোনো দোষ পেলাম না তখনই রিণি ধীরে ধীরে ওর সব কথা আমায় খুলে বলল।

সেই সময় রিণির চেহারা ছিল অস্থি চর্মসার। চোখ দুটি গর্তে। কিছুই খেত না ভাল করে। খেলেও হজম হয় না। পেটে ব্যথা হয়।

যেদিন রিণি শুনল সত্যি ওর শরীরে কোনো রোগ নেই অথবা দেহের কোনো কলকব্জা বিকৃত কি অপুষ্ট নয় সেইদিন থেকেই ওর পরিবর্তন শুরু হল। আস্তে আস্তে আবার সজীব ও সতেজ হয়ে উঠল রিণি।

তবুও মাঝে মাঝে রিণি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ত। পেটে একটা ব্যথা হত, আর মাথায় হত যন্ত্রণা। আমাকে তখন ডেকে পাঠাত রিণি।

বলত, ভাল করে দেখুন তো আমার কোনো টিউমার হয়েছে কিনা? নাকি ক্যানসার?

রিণিকে তরলা দিয়ে টেবিলে রাখা ওর স্বামীর ফটোটা দেখিয়ে ঠাট্টা করে বলতাম, তোমার এই ডাক্তারটি তাই বলে নাকি?

রিণি বলত, অত আর ঠাট্টা করবেন না। এইবার ও ডাক্তার হবেই। খুব নাকি পড়াশুনা করছে মন দিয়ে।

পরে আবার যখন একদিন রিণির ডাকে ওর বাসায় গেলাম। দেখলাম এবারকার যন্ত্রণা যেন আগের চেয়ে অনেক বেশী সুতীব্র এবং কঠিন। আমার হাত দুটি ধরে রিণি বলল, আর পারছি না। একটা ইনজেকশন দিয়ে ব্যথাটা কমিয়ে দিন স্যর।

এতদিন ধরে রিণির চিকিৎসা করছি কিন্তু ব্যথা কমাতে ইনজেকশন দিতে হয়নি কখনও। কিন্তু এবারে দিতে হল। যতক্ষণ না ব্যথা কমে ততক্ষণ রিণি আমাকে ছাড়বে না বলে আমার হাতটি শক্ত করে ধরে রইল। আমিও বসে রইলাম ওর খাটের পাশে একটা চেয়ারে।

দেখলাম সিঁথিতে যে ছোট্ট একটু সিঁদুর রিণি দিত এবার তার চিহ্নমাত্র নেই। টেবিলের ওপর ডাক্তারের সেই কটোটিও দেখতে পেলাম না এবার। আধঘণ্টার মধ্যেই রিণি ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও উঠে এলাম।

পরের দিন গিয়ে দেখলাম রিণি অনেক সুস্থ হয়েছে। স্নান করে রান্নার যোগাড় করছে। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি চায়ের জল চড়িয়ে দিল।

তারপর হেসে বলল, ডাক্তারের সঙ্গে ডিভোর্স করাই ঠিক করলাম শেষ পর্যন্ত। ডাক্তারী পাস করেছে। এখন শুনলাম বিয়ে-থা করে সংসারী হতে চায়। তাই আমিও আর বাগড়া দিলাম না। কাগজপত্রে সই করে দিয়ে এসেছি। খুশি হয়ে বললাম, ভালই করেছ। এবার থেকে অনেক নিশ্চিন্তে ও নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে থাকতে পারবে তুমি। মনটাও বেশ ভাল থাকবে, শরীরও আর অত খারাপ হবে না ঘন ঘন।

তারপর সত্যি রিণির শরীর ভাল হয়েছিল। আমাকেও আর যেতে হয়নি আগের মত। রিণি অবিশ্যি মাঝে মাঝে আসত। কিছুদিন পরে তাও বন্ধ হয়ে গেল।

গত কয়েক বছর ওর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। শুনেছিলাম ও বিয়ে করেছে এবং সুখে আছে।

সেদিন রিণিকে কিছুতেই আমি চিনতে পারতাম না যদি ও নিজে থেকে আমাকে দেখে গাড়ি না থামাত। আমি ওকে চিরদিন দেখেছি সরু পাড় সাদা শাড়ি ও সাদা ব্লাউজ পরতে। আর চুলে ছিল খোঁপা। ওর স্বামী যে বড়লোক তাও আমি শুনেছিলাম। কিন্তু তার স্ত্রী হয়ে রিণি যে এই ২।৩ বছরের মধ্যেই অমন আধুনিক পোশাকে সেজে নিজে গাড়ি চালাতে পর্যন্ত শিখে যাবে তা কখনও ভাবিনি। খুবই ভাল লাগল ওকে দেখে।

গাড়ি থামিয়ে রিণি ছুটে আমার গাড়ির কাছে এল। দেখে আমিও নেমে দাঁড়ালাম।

সর্ব অংগে খুশির ঢেউ ছড়িয়ে হাসতে হাসতে এসে রিণি চিপ করে আমাকে একটি প্রণাম করল।

রোডফাইটার

সাইকেল

টায়ার ও টিউব

ন্যাশনাল রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • কানপুর • মাদ্রাজ • কোয়েম্বাটুর

সুকোমল রেশমী কেশরাশির জন্য

ক্যাম্থারাইডিন

কেশ তৈল

কেশ বিন্যাসের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে, সৌন্দর্যকামী প্রত্যেক রমণীরই একান্ত কাম্য—ক্যাম্থারাইডিন কেশ তৈল।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

প্রাণান্তকর গল্প

প্র. না. বি

যমদূত পিছু পিছু তাড়া করলে মনের ঠিক কী অবস্থা হয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলা সম্ভব নয়; কিন্তু সম্পাদকের হাতে পড়লে যেমনটি হয়ে থাকে তার চেয়ে বোধ করি বেশি কঠিন নয়, বিশেষ সে সম্পাদক আবার যদি পূজাসংখ্যার কাগজ বের করতে উদ্যত হন। অধিক বলবো কি, বৃদ্ধ চাণক্যের আমলে যে সাময়িক পত্র ছিল না তা এক প্রকার নিশ্চিত নতুবা তিনি নন্দী ভৃঙ্গী ভরতীদের সঙ্গে সম্পাদকের নামটারও উল্লেখ করতেন। আমার এই গল্প সম্পাদক বনাম লেখকের নিদারুণ অভিজ্ঞতা।

পাঠক বোধহয় ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন যে আমি একজন সাহিত্যিক, গল্প লিখি, সম্পাদকগণ বলেন গাল্পিক। গল্প লিখতে বিদ্যার আবশ্যক হয় না, নানা ভাষার কোটেশনও অনাবশ্যক—অবশ্য কিছু বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, সে পরিমাণ বুদ্ধি আমার আছে, আরও বেশি থাকলে গল্প না লিখে উপন্যাস লিখতাম। এখন, পূজার বাজারে এ হেন গাল্পিকের বিরাম নাই, সকলেরই দাবী,—একটি গল্প চাই। কিন্তু চাইলেই পাওয়া যায় এমন বস্তু গল্প নয়। তবে সে কথা শোনে কে। পারবো না বললে ভাবে মোচড় দিয়ে কিছু বেশি আদায় করবার চেষ্টায় আছি। হায় কেমন ক'রে সম্পাদকদের বোঝাবো যে সব বস্তুর মতো লেখকের শক্তিরও সীমা আছে, বিশেষ বাঙালী সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর যাবতীয় অভিজ্ঞতা এতগুলি লেখকের কলমের আঘাতে আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়ে কবে শেষ হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু এই নিদারুণ সত্যটা স্বীকার ক'রে নিলে সাহিত্যিকতা ও সম্পাদকতা দুই-ই ছেড়ে দিতে হয়। তা সম্ভব নয়, বছর ঘোরে, পূজা আসে, সঙ্গে আসে পূজা সংখ্যার গল্পের তাগিদ আর তারপরেই আসেন সশরীরে সম্পাদক।

সেই চির পুরাতন হাসিটি মসৃণ পুরাতন মুদ্রাটির মতো ওষ্ঠপুটের ফাঁকে একটুখানি বের ক'রে বলেন, গল্পটির জন্য এলাম।

এবারে আর সম্ভব নয়, মাথায় কিছু আসছে না। সে কি একটা কথা হ'ল! কে না জানে যে আপনার মাথা কুবেরের ভাণ্ডার।

কালধর্মে কুবের এখন দেউলে।

কথাটাকে উচ্চাঙ্গের রসিকতা মনে ক'রে সম্পাদক এমন উচ্চরবে হেসে উঠলেন যে ভয় হ'ল পাছে আমার দশ ইঞ্চি গাঁথুনির দেয়াল (কর্পোরেশনকে ফাঁকি দিয়ে ১৫" স্থলে ১০" গেঁথেছি) বুঝি বা খসে যায়।

দিন, দিন, ওসব মামুলী কথা রাখুন। এই বলে তিনি পকেটে হাত চালিয়ে দিলেন। বোঝা গেল এখন মোক্ষম যুক্তি প্রয়োগ করবেন।

সলজ্জ ভাবে (তাঁর লজ্জা কেন জানি না) একগোছা নোট আমার হাতে গুঁজে দিতে দিতে বললেন—এবারে পুরো ক'রেই দিলাম—থার্ড প্ল্যানে ইনফ্লেশন বাড়ছে কিনা, পুরো না দিলে চলবে কেন!

পুরো বলতে কী বোঝায় বুঝলাম না, শুনতেও ভরসা হয় না, হয়তো বা তাতেই সম্মতির স্বীকৃতি হবে। তাই নোটশুদ্ধ হাতখানা একটু আড়ষ্টভাবে রাখলাম—না-গ্রহণ না-বর্জন নীতির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। কিন্তু একি সম্পাদক কোথায়! মুহূর্তে অন্তর্হিত হ'য়েছেন। তিনি জানেন টাকা গছিয়ে দেওয়ার পরে আর বসে থাকতে নেই—অযথা চায়ের খরচ বাড়িয়ে লেখকের সময় ও অর্থনাশ ক'রে কি লাভ। তাছাড়া, একটু আধ্যাত্মিক কারণও আছে। প্রতিমার চিত্রকর চক্ষুদানের পরে নিঃশব্দে প্রস্থান করে। লেখকের হাতে টাকা গছিয়ে দেওয়া সেই চক্ষুদানের অনুরূপ। ঐ টাকা গছানো পর্যন্তই যা কঠিন, তারপরে হিসাবান্তে যেমন রাত্রি, রাত্রির অন্তে যেমন দিবস অবধারিত—তেমনি সমস্তই সুনিশ্চিত ও সুবিহিত। সম্পাদক অন্তর্হিত হ'লেন, হায়, আমিও যদি অমনি যাদুমন্ত্র বলে অন্তর্হিত হ'তে পারতাম।

(দুই)

বড়শি গিলবার পরে মাছের এবং টাকা গিলবার পরে লেখকের দশা প্রায় একরকম দাঁড়ায়, একটু টান পড়তেই প্রাণ বের হয় আর কি! ঐ 'প্রায়' শব্দটির বিশেষ অর্থ আছে। মাছের টান শুধু সুতোয়, লেখকের টান অনেক রকমে। চিঠির পরে চিঠি আসে গল্পটি, লোকের পরে লোক আসে গল্পটি; বৃহৎচক্র টেলিফোন নিরন্তর ঝঙ্কার তোলে গল্পটি; এমন কি মাঝে মাঝে স্বপ্নেও সম্পাদক দেখা দিয়ে বাণী জানান গল্পটি। দিনে রাতে স্বপ্নে জাগরণে আর লেখকের স্বস্তি থাকে না। কাজেই এবারে আমার অবস্থাটা পাঠকে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। কেবল বুঝতে পারছেন না মা সরস্বতী, তাঁরই নিচুর ইঙ্গিতে কল্পনার রাজপথ থেকে গলিঘুঁজি সমস্ত রুদ্ধ। কিছুই মাথায় আসে না। আর যা আসে তাবলে দেখতে পাই সমস্তই কেউ না কেউ বাল্মীকি থেকে বনফুল লিখে ফেলেছে। আমিও কম ক'রে হাজার খানেক গল্প লিখেছি, কাল্পনিক, কিম্বুত বা বাস্তব কোন পরিস্থিতিই বাদ দিই না, কাজেই হাত এখন শূন্য, মাথাও তদ্রূপ। অথচ শয়নে জাগরণে টেলিফোনে লোকমুখে নিত্য ধ্বনিত হচ্ছে গল্পটি, গল্পটি! অবস্থা যখন চরমে পৌঁছিয়াছে তখন সহসা "বাঙ্ময় বিদ্যুৎদীপ্ত হন্তখান" মনের মধ্যে ঝলসে উঠ্‌ল, ঠিক, ঠিক, একেবারে নিঃস্ব নই, এখনো কিছু হাতে আছে। গলায় দড়ি দিয়ে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করলে মনের যে অবস্থা হয় নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই—এ পর্যন্ত তা লিপিবদ্ধ হয়নি। আমি কেন তা না লিখি। কথাটি

With the best compliments of :—

THE EAST BENGAL RIVER STEAM SERVICE LTD.

Managing Agents : **RAJA SREENATH ROY & BROS. PRIVATE LTD.**
67, SOVABAZAR STREET, CALCUTTA-5.

Telegrams :
"INDOSTEAM" Calcutta.

Telegrams :
55 | 1199
1019 (8 Lines)

মনে হওয়া মাত্র বড় স্বস্তি অনুভব করলাম। সরস্বতী নিষ্ঠুর মন, বিধাতা উদাসীন মন, তেমন তেমন ক'রে প্রার্থনা করতে জানলে তাঁরা অভীষ্ট পূরণ করতে কার্পণ্য করেন না। কিন্তু উপায়টা কি! গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়লে অভিজ্ঞতা অবশ্যই একটা অর্জিত হবে কিন্তু জেনে এসে তা কি লিখে কেলা সম্ভব হবে। অনেক চিন্তার পরে আবিষ্কার করলাম 'যাহা মুশকিল তাঁহা আসান'। স্থির করলাম যে গল্পের আগাগোড়া লিখে ফেলে উপসংহারটুকু হাতে রেখে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়বো, কাছে থাকবে, কাছে উপস্থিত থাকবে আমার পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য দামোদর। সে আমার মুখ চোখের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে, আর ঠিক চরম সঙ্কটের পূর্ব মুহূর্তে তীক্ষ্ণ কাটারি দিয়ে দড়ি কেটে দেবে। আমি পুনরায় ভূতলে অবতরণ করে ওর কাছে বিবরণ শুনে নিয়ে গল্পের উপসংহারটুকু লিখে ফেলবো। ব্যস্ তারপরে সম্পাদককে পাঠিয়ে দিতে কতক্ষণ! আর এরকম একটা অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হলে শুধু সম্পাদক খুশি হবেন না সংসারের জ্ঞানভাণ্ডারের ঐশ্বর্যও বাড়বে। তবে আর বিলম্ব কিসের? অতএব গল্পটি লিখে ফেললাম, বিষয়টা সম্পাদক ও লেখকের মধ্যে বড়শি টানাটানি, নাম দিলাম "প্রাণান্তর গল্প" (হায় কে জানতো গল্পটি এমন সার্থকনামা হবে)। তারপরে দামোদরকে নিভৃতে সব বুঝিয়ে বললাম, আরও বললাম, চট ক'রে সময়মতো দড়ি কেটে আমাকে নামাতে পারলে পূজা-বোনাস হিসাবে এক মাসের বেতন দান করবো। দামোদর একজন প্রগত ভৃত্য, সব কথা শুনে, সব ব্যবস্থা বুঝে সহজেই রাজী হল। তখন সেই উপসংহারহীন গল্পটি ফাউন্টেন পেন, দড়ি ও কাটারি নিয়ে দু'জনে রবীন্দ্র সরোবরের এক নির্জন স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন দুপুর বেলা কাজেই লোক আসবার আশঙ্কা ছিল না। তারপরে দামোদরকে যথাকর্তব্য আর একবার বুঝিয়ে দিলাম—আমার মুখ চোখের ভাবগতিক লক্ষ্য করতে হবে আর চরম সঙ্কটের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে দড়ি কেটে নামিয়ে নিতে হবে আমাকে। তখন গল্পটি, ফাউন্টেন পেন ও কাটারিখানা তার হাতে দিয়ে গাছের একটি মাঝারি উচ্চ ডালের উপরে দাঁড়িয়ে গলায় ফাঁস বেঁধে প্রস্তুত হলাম। বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য দামোদর আমাকে ঠেলে দিল। পাঠক আমি ফাঁসবদ্ধ অবস্থায় শূন্যে দুলছি। আমার এই নিখুঁত অভিযান পরিকল্পনার মধ্যে একটি যে খুঁত ছিল তা আগে মনে পড়েনি। দামোদর একজন নব সাক্ষর বা Neo literate, আর সদ্যবোধে সে লিখতে শুরু করেছে, আর যেসব সম্পাদক চাকরকে খুশি ক'রে মনিবকে হাত করতে চায় তারা সেগুলো ছেপে ওকে কিছু কিছু টাকা দেয়। ওর উপরেও যে পূজাসংখ্যার দাবী থাকতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার চৈতন্যে ক্রমেই ভাঁটা পড়ে আসছে। বাহবা দামোদর, বাহবা, কেমন তন্ময়ভাবে আমার মুখ চোখের অবস্থা নিরীক্ষণ করছে, এমন তন্ময়তা তো ওর নিত্যকর্মে দেখিনি। বেশ, বেশ। চৈতন্য বিলীয়মান প্রায়। এখন দড়ি কাটে না কেন! একি, একি, কাটারি না নিয়ে ও কলম হাতে করল কেন! কি লিখছে ও? উপসংহারটুকু পূরণ করছে নাকি? চৈতন্যের শেষ শিখা নির্বাপিত হল ব'লে! ওকি, ওকি, উপসংহার লিখে ফেলে গল্পটা নিয়ে ও ছুটলো নাকি? কোথায়, কেন? এমন অপূর্ববস্তু যে কোন পূজাসংখ্যা মোটা টাকায় লুফে নেবে। একথা জানে প্রখ্যাত সাহিত্যিকের বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য! সাত্যিই কি ছুটলো! এদিকে আমি যে মরি! ও ছুটলো, আমি মরলাম, সম্পাদক (কোন্ কাগজের জানিনা) পেলো পূজাসংখ্যার গল্প।

———

অর্দ্ধ শতাব্দীর জয়-গৌরব

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, যেদিন বাংলা দেশ প্রথম বিদেশী বর্জনের ব্রত গ্রহণ করে, সেদিন আমরা আর্ত্ত সেই মন্ত্রকে জাতির জীবনে সার্থক করে তোলবার জন্যে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি।

এই দেশের জল-হাওয়ায়, এই দেশের প্রাচীন চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে, বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে, দেশের স্বাস্থ্য ও শক্তি বর্দ্ধনের জন্যেই আমরা আয়ুর্বেদোক্ত প্রণালী বিস্তার সাহিত্য অনুসরণ করে, দেশীয় ঔষধ প্রস্তুতের এই বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি।

আজ এই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতকৃত ঔষধ, শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভারতবর্ষের বাহিরের বিশ্ব-বাজারেও আয়ুর্বেদের মাহাত্ম্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

তাই সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, আচার্য কৃপালনী প্রমুখ ভারত-নায়কগণ প্রত্যক্ষভাবে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য-কারিতা পরিদর্শন করে সানন্দে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে ইহাকে গৌরবান্বিত করেছেন।

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর

কাশীশ ঔষধালয়

অকৃত্রিম আয়ুর্বেদীয় ঔষধাবলীর আদি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

ঢাকা প্রাইভেট লিঃ

কারখানা :—ঢাকা (পূর্ব্ব পাকিস্থান) ও চন্দননগর (ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন)

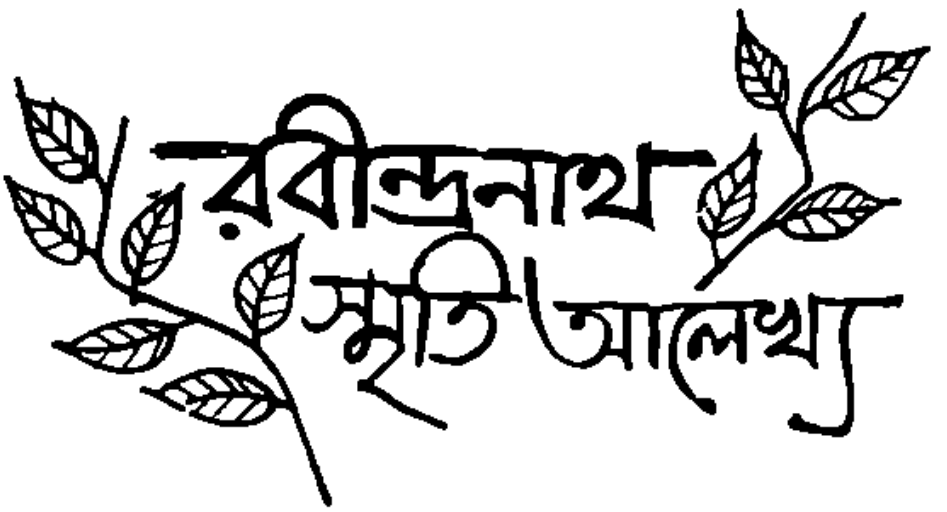

মনে করিয়াছিলাম, জীবনবৃত্তান্তের দুই-চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আপন হাতে লিখিব, তার পরে পড়িয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে, তাহা কোনোএক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে, সে রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের। সে রঙ তাহাকে নিজের বাসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে, সুতরাং পটের উপর যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা আর-কাহাকে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজা

ভূমিকা

সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমালা পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়া ছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সখিরা তাহাকে বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্ব্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না;—নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল,—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়,—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

এই নাট্য-কলকটি "রাজা" নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কার্ত্তিক, ১৩৭২

শারদীয়া গল্প-ভারতী ১৩৬৮

এশিয়ার সংস্কৃতি
ও নৃত্যকলা

অকৃত্রিম,
বিশুদ্ধ ও ফলপ্রদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাবলী

বলিতে

সাধনাকেই

বোঝায়

আয়ুর্ব্বেদ জগতে
বহু সাধনার ফল

সাধনা

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ. পি. এস. (লণ্ডন) এফ. পি. এস (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের ফার্মেসী শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

এশিয়ার লোকনৃত্য

ডঃ কালিদাস নাগ

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সময় দুই মনীষীদের অভাব অনুভব করি : একজন বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর-রত্ন রদ্যা যাঁর Dance of Siva লেখাটি ফরাসী থেকে অনুবাদ (১৯২০) করে একটি বিখ্যাত পত্রিকায় আমি ছাপাই। আর একজন প্রত্নতাত্ত্বিক Ed. Chavannes (শাভান্) যিনি চীনভাষা ও পুরাতত্ত্বে অদ্বিতীয় পণ্ডিত তিনি আমার অধ্যাপক Paul Pellect-র শিক্ষক। আমার গুরু Sylvain Levi ও তার সহকর্মী শাভান্ই প্রথম বৌদ্ধ মূর্তির সঙ্গে গণেশের মূর্তিও দেখান, আবার বিষ্ণুর বাহন গরুড় এসে প্রমাণ করেন শুধু সৌর ও শৈব দেব-দেবী নয়, বিষ্ণু ও ময়ূরবাহন কার্তিকেয় সুদূর চীনে বোধিসত্ত্বরূপে সেকালে পূজা পেতেন। সেই পথে কোরিয়া হয়ে জাপানে গিয়ে দেখি এই হিন্দু ও বৌদ্ধশিল্পের অপূর্ব মিলন। সুদূর প্রাচ্যের চিত্র ও নৃত্যকলায় এর অনেক ছাপ দেখেছি। ভারতীয় নামগুলি এবং মাটাশাস্ত্র তারা ভুলেছে কিন্তু ভারতীয় ছন্দ ভোলেনি এবং তারা নতুন করে চীনা ও জাপানী নৃত্যরূপে উঁকি মারছে। Tang সাম্রাজ্য থেকে ভারতে এলেন হিউয়েন্ সাঙ্ ; তিনি কাশ্মীর থেকে বুদ্ধগয়া ও কামরূপ অবধি অনেক ঘুরে অনেক কিছু দেখে গেছেন। তার ছয় শতাব্দী পরে সম্রাট কুবলাই খাঁ (১২৫০) তিব্বত-ভারতীয় মুখোশ নৃত্য (mask dance), যাত্রা ও নাটক জমালেন মোঙ্গল চীন সাম্রাজ্যে, সেই আদান-প্রদানের ঢেউ খেলিয়ে গেল চীন থেকে কোরিয়া ও জাপানে। Li-Po-র কাব্যমুক্ত বর্ষণের পর Lady Murasaki জাপানী ভাষায় প্রথম উপন্যাস লেখেন ১১ শতকে। সেটি অবলম্বনে জাপানী বহু শিল্পী ছবি এঁকেছেন ও নৃত্য পরিকল্পনা করে গেছেন। ১৯২৪-এ Peking রঙ্গমঞ্চে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে চীনা ওস্তাদরা সম্বর্ধনা করে (৬৪ বর্ষপূর্তি, ২৫শে বৈশাখ), সেই উপলক্ষে প্রবীণতম অভিনেতা Mei-lang Fang রাজকুমারী-নৃত্য (কারণ মেয়েদের নাচা নিষিদ্ধ) দেখিয়ে আমাদের মোহিত করেন—(এ বছর প্রায় ৭০ পার হয়ে তিনি গত হলেন)। তারপর জাপানী চিত্রশিল্পী ইওকোইয়ামা টাইকান (Y. Taikan) তাঁর "হে বিরাট নদী" ছবিখানি রবীন্দ্রনাথকে ও আমাদের দেখালেন। বলাকা যেন রেখায় ও রঙে জীবন্ত হয়ে উঠল। কবি তখন, যেন চিত্ররূপময়-রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন এবং সংস্কৃত মন্ত্র ও বাংলা হরফের বাণীগুলির মধ্যে যেন চিত্র-সঙ্কেত ও ভারতীয় ছবির ছন্দ রেখে এলেন। হঠাৎ পটপরিবর্তন। প্রাচীন ভারতের কোন্ ভুলে-যাওয়া বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গতে শুরু হল Luvibrine Orchestra (Levi সাহেব এ বিষয়ে লিখেছেন), যেন গৌতম-বুদ্ধের জন্মোৎসব হচ্ছে : মহামানবের আবির্ভাবে কৃতার্থ নরনারী নৃত্যবন্দনা করছে : এমনি শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে অপূর্ব সংযমে জাপানী মেয়েরা নৃত্যরস পরিবেশন করে গেলেন। ভুলে গিয়েছিলাম লুম্বিনী ও বৌদ্ধ জগৎ থেকে কত দূরে এসে এই Sino-Japanese নৃত্যকলার স্বাদ পেলাম।

জাপান ছেড়ে আবার সাংহাই ও হংকং এসে কবির কাছে বিদায় নিয়ে—তাঁর সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের টিকিট কেরত দিয়ে—পালিয়ে এলাম চম্পা ও কাম্বোজের শৈব বৌদ্ধ এবং শাক্ত

বিষ্ণুমন্দির দেখতে। মন্দিরে দেবতা মুমূর্ষু, পূজার্চনা থেমে গেছে; কিন্তু কাম্বোজ, বালী ও শ্যামদেশের নৃত্যকলা দেখে বুঝে এলাম যে নাট্যশাস্ত্র আমরা প্রায় আক্ষরিকভাবেই রেখেছি, কিন্তু প্রয়োগ-বিজ্ঞানে সে শাস্ত্র সার্থক হয়েছে হিন্দু-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র এই শ্যাম, কাম্বোডিয়া ও ইন্দোচীনের কলাকেন্দ্র-গুলিতে। এদের মন্দিরগাত্রে আজও পাথরের ভাস্কর্যশিল্পে নৃত্য করছে শুরু নরনারী—কখনও রামায়ণ কখনও মহাভারত ও ভাগবৎ পুরাণাদি অবলম্বন করে। চম্পা-কাম্বোজ ও শ্যামদেশের মন্দিরে ও স্থাপত্যে এসব এখানো জীবন্ত হয়ে আছে।

সেই ভারতীয় নৃত্যধারা অনুসরণ করে ভেসে এলাম জাভা ও বলীদ্বীপে। মুসলমান ধর্ম সারা মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার আজ প্রাধান্য (majority) লাভ করেছে; কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতা ও করুণা নর-নারীদের প্রাণে জীবন্ত! French Indo-China শিল্পচর্চায় ফরাসী প্রভাব ওরা এড়াতে পারেনি। কিন্তু জাভা-বলীর মন্দিরে, মঠে ও রাজপ্রাসাদে বিশুদ্ধ হিন্দু জাভানী শিল্প ও নৃত্যকলাই খাঁটি লোকনৃত্য হয়ে আজও বেঁচে আছে। বিশেষ বলী ও লম্বক দ্বীপে প্রায় ২০ লক্ষ হিন্দু আজও পূজা-অর্চনা ও নৃত্যাদি করে যাচ্ছে। তা' থেকে ছবি (Slides) দেখিয়ে "বৃহত্তর ভারত" সম্বন্ধে জাতীয় নব চেতনা জাগাতে চেষ্টা করেছি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে। তিনি এ ক্ষেত্রে আমাদের পুরোধা। ১৯২৬ সালে আমার পরিক্রমা শেষ হতেই তাঁকে এ বিষয়টি জানাতে বন্ধুবর সুনীতি চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে কবিগুরু ১৯২৭ সালে তাঁর প্রাচ্য তীর্থ পরিক্রমা শেষ করেন ও বোরোবুদুর, সিয়াম ও সাগরিকা ইত্যাদি অনুপম কাব্য রচনা করেন। তাঁর মনের অগোচরে ইন্দোনেশিয়ার নৃত্যের তাল থেকে যায় ও নেশা লেগে যায়; তাই 'নটরাজ' থেকে সুরু করে তাঁর গানে, ছন্দে ও নাচে এবং পরে "শাপমোচন" থেকে সুরু করে নতুন নৃত্য নাট্যগুলি সৃষ্টি করে ছেলেমেয়েদের একটি "বৃহত্তর ভারতের" উত্তরাধিকার তিনি দিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথের কাছে সে ঋণ অপরিশোধনীয়। ১৯২০-১৯৬০ এই চল্লিশ বছর ধরে কবিগুরুর নাম নিয়ে ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা ঘুরেছি; মধ্যে ইন্দোনেশিয়া ছুবার অষ্ট্রেলেশিয়া, পলিনেশিয়া, হাওয়াই, ফিলিপিনি নৃত্য এবং মলয়েশিয়ার সংস্কৃতি কেন্দ্র দেখে মনে হয়েছে যে যেখানেই লোক নৃত্য, সেইখানেই শিল্প জীবন্ত। তার মধ্যে দরবারের (Court dances) বা মন্দির-প্রাঙ্গণের অথবা চত্বরে দেবদাসীদের নাচের সঙ্গে মিলে গেছে যাদের গুরুগম্ভীর বোল, যেমন সুপ্রাচীন Mundari সাঁওতালী নারীদের নৃত্যছন্দে মিলে গেছে পুরুষদের দৃপ্ত পৌরুষের আবেগ। ঘর পার্বতীর মিলনেই নটরাজের চরম আনন্দ, অথচ নটরাজের রুদ্র মূর্তিতে একক-নৃত্য দেখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আধুনিক ভাস্কর Rodin মুগ্ধ হয়ে গেছেন। 'নটনারায়ণ' শুধু আজ রাগের নামমাত্র কিন্তু শিল্পীর দেবতা বিষ্ণু ও তাঁর নৃত্য-কল্পনা দেখে গেছেন "সমুদ্র মন্থন" ও লক্ষ্মীর উদ্ধার পুরাণ-কথায় সেটি পাথরের ভাস্কর্যে স্থায়ী রূপ দিয়েছেন কাম্বোজ শিল্পীরা (তাঁরা নৃত্যবিদ্যাবিশারদ ছিলেন) আঙ্কোর ভাটের বিরাট মন্দিরগুলি প্রদক্ষিণ করে সে সব দেখেছি। আবার বিষ্ণু পুরাণাদি থেকে বাসগোপালের "পুতনা বধ" রাজারূপ পেয়েছে Baphuon বৈষ্ণব মন্দিরের ভাস্কর্যে। এমনি কত শত নাড়ীর যোগ ভারতের সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের শিল্প ও নৃত্যকলায়। আমাদের দেশে জার্মানীর মত কারিগর নেই শুধু জাপানীদের সাহায্য নিয়ে ছবি ছাপার ব্যবস্থা হলে শেষ জীবনে এই সব শিল্প-রহস্য প্রকাশ করার চেষ্টা করা যাবে। এখন শুধু বর্ণনা দিয়ে "অবর্ণনীয়ের" পূজা সারলাম সেই আশায়। ভারতের ভাবদূত সাঁচি থেকে অজন্তা, ইলোরা, সিওন, বার্মা, সিংহলের Sigiriya পর্যন্ত কত ভারতীয় শিল্পের ছন্দ-বিন্যাস ছড়ান

দি
ইউনাইটেড্ কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

(১৯৪৩ সালে রেজিষ্টারি কৃত)

হেড অফিস : ২, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা—১

অনুমোদিত মূলধন	—	৮,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও গৃহীত মূলধন	—	৪,০০,০০,০০০৲
সংগৃহীত মূলধন	—	২,০০,০০,০০০৲
সংরক্ষিত তহবিল	—	২,০৫,০০,০০০৲

শাখা সমূহ

ভারতে : সকল শিল্প ও বাণিজ্যপ্রধান নগর ও শহর

পাকিস্তানে : চট্টগ্রাম ও করাচী

ব্রহ্মদেশে : রেঙ্গুন, মৌলমিন, মান্দালয়

মালয়ে : পেনাং, কুয়ালা-লামপুর, ইপ্যাং

সিঙ্গাপুর কলোনীতে : সেরাপণ রোড, সিঙ্গাপুর

যুক্তরাজ্যে : লণ্ডন

হংকং কলোনীতে : হংকং এবং কাউলুন।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র এজেন্ট ও করেসপণ্ডেণ্ট থাকায় সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্য্যের সুবিধা আছে।

জি. ডি. বিড়লা
চেয়ারম্যান

এস. টি. সদাশিবন
জেনারেল ম্যানেজার

ভারতের নৃত্যকলা

নারায়ণ চৌধুরী

ভারতবিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর তাঁর নৃত্যসম্বন্ধীয় এক প্রবন্ধে বলেছেন, ভারতীয় মাত্রেরই দেহভঙ্গিমায় ও চলনে একটি ছন্দের হিল্লোল লক্ষ্য করা যায়। এ ভারতবাসীর স্বাভাবিক নৃত্যানুরাগের পরিচায়ক। বাস্তবিক, ভারতবর্ষীয় নর-নারীর নৃত্য-প্রীতির তুলনা হয় না। কত রকমারি নৃত্য যে ভারতবর্ষে চলিত আছে তার ইয়ত্তা করা যায় না। এই নৃত্য বৈচিত্র্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগে পড়ে লোক-নৃত্য; অন্য ভাগে ক্লাসিকাল বা ক্রপদী নৃত্যরীতি। ক্রপদী নৃত্য-রীতির প্রধান আধারস্থল হল দক্ষিণ-ভারত, আর লোক-নৃত্যের প্রচলন সর্বত্র। ক্রপদী নৃত্যরীতিগুলির মধ্যে প্রধান হল ভারতনাট্যম্, কথাকলি, কুটা, চক্যরকুট, কুটিয়া টম্, ওটম-তুল্লাল, কীর্তি-আটম্, মোহিনী আটম্, দাসী-আটম্ প্রভৃতি নাচ। এর মধ্যে তিনটি নৃত্যরীতি সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে—ভারতনাট্যম্, কথাকলি ও মোহিনী। ভারতনাট্যম্ নৃত্যের চর্চায় রুক্মিণী দেবী আরুণ্ডেল, বালা সরস্বতী, কমলা, কথাকলি নৃত্যে শঙ্করন্ নাম্বুদ্রি, কেলু নায়ার, বালকৃষ্ণ মেনন, রামগোপাল প্রভৃতি এবং মোহিনী নৃত্যে রাগিণী দেবী, ইন্দ্রাণী রহমান, শ্রীমতী কল্যাণী, মাধবী ও চিন্নুথ প্রমুখ নৃত্যশিল্পীদের খ্যাতি আজ দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিদেশেও পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

ক্রপদী নৃত্যকলার আর একটি ধারা প্রবাহিত হয়েছে উড়িষ্যায়। পাহাড়ের গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ উড়িষ্যার জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতে যে সকল নৃত্যপর ভাস্কর্য-মূর্তি খোদিত আছে তাদের আদর্শ অবলম্বন করে উড়িষ্যায় ক্রপদী নৃত্যভঙ্গীর উদ্ভব হয়েছে। উদয়গিরির নূর রাণী গুম্ফার একটি কক্ষের প্রাচীর গাত্রে চমৎকার একটি নৃত্যলীলা বালিকার মূর্তি খোদিত আছে। বর্তমান বৌদ্ধ গুহা মন্দির-গুলিতেও নর-নারীর নৃত্য ভঙ্গিমার একাধিক মূর্তি খোদিত। এই সব বিভিন্ন নমুনা থেকে পরে একটি বিশিষ্ট প্রণালীবদ্ধ নৃত্যরীতির জন্ম হয়েছে উড়িষ্যায়, যা 'ওড্র-মগধ নৃত্যরীতি' নামে পরিচিত। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ওড্র-মগধ নৃত্যরীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে উড়িষ্যার ক্রপদী নৃত্যরীতির প্রাচীনতা অনুমিত হয়।

এতকাল দাক্ষিণাত্যের দেবদাসীদের অনুরূপ প্রথায় লালিত উড়িষ্যার মাহরীদের দ্বারা উড়িষ্যার প্রাচীন নৃত্যশিল্পের ধারাটির অনুশীলন হয়ে আসছিল, এখন ওই সম্প্রদায়ের বাইরেও অনেকে এই নৃত্য-রীতির ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হয়ে তার অনুশীলনে মনোযোগী হয়েছেন। সুপরিচিত শিল্পীদের মধ্যে রাগিণী দেবী, ইন্দ্রাণী রহমান প্রমুখ ওড়িয়া নৃত্য-শিল্পের সবিশেষ চর্চা করছেন বলে জানা যায়।

দক্ষিণ-ভারতের সুপরিচিত বৃত্তের বাইরে ক্রপদী নৃত্যরীতির আর একটি কেন্দ্র হল মণিপুর। মণিপুরের বৈষ্ণব ভাবসমৃদ্ধ ভক্তিরসান্বিত রাস-নৃত্য এক অপূর্ব শিল্প-সৃষ্টি। এই নৃত্যে সোপিনীবেশিনী নৃত্যপরা বালিকাদের পোশাকের যেমন বাহার তেমনি তাদের নৃত্যছন্দের লাবণ্যলীলতা ও সুষমা। মণিপুরী বালিকাদের ছন্দোকলা রঞ্জিত নৃত্যভঙ্গী দর্শকের মনে যদি কোন রসের সঞ্চার করে থাকে, তা হল ভক্তির রস; দর্শকচিত্তে সম্মোহন ও বিভ্রম জাগতে পারে এমন কোন মুদ রসের আবেদন সে নৃত্যে নেই।

এ থেকে মনে হতে পারে মণিপুরী নৃত্য নিতান্ত সরল ভঙ্গীর নৃত্য, সুতরাং লোক-নৃত্যের পর্যায়ভুক্ত হবার যোগ্য। তা মোটেই নয়। মণিপুরী নৃত্য সবিশেষ আয়াস সাপেক্ষ নৃত্য। এই নৃত্যে কুশলতা অর্জন করতে হলে দীর্ঘদিন সাধনায় নিরত থাকতে হয়। এর তাল লয়ও অতিশয় দুরূহ। উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতের পঞ্চম-সওয়ারী তালের মত ১৫ মাত্রার একটি তালে নৃত্যভঙ্গীকে ব্যক্তিত করা নিয়ম। লয়ের বিন্যাসেও যথেষ্ট জটিলতা আছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা পরিদর্শনে যখন যান তখন তিনি মণিপুরী নৃত্য দেখে সবিশেষ মুগ্ধ হন। এর শ্রী, সংযম ও শান্ত মাধুর্যে কবির সংবেদনশীল রুচি স্বতঃই পরিতৃপ্ত হয়। পরে তিনি মণিপুরী নৃত্যকলার শিক্ষক আনিয়ে শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যশৈলীর প্রবর্তন করেন। শান্তিনিকেতনে বহুবিধ নৃত্যশৈলীর চর্চা হয়, তার মধ্যে মণিপুরী নৃত্যশৈলীর প্রভাবটাই সর্বাধিক বলবৎ বলা যায়। এখানকার শিল্পীদের দ্বারা এই বিশিষ্ট নৃত্যশৈলীর যে রকম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে এমন আর কোথাও হয়নি।

পূর্বে ভারতনাট্যম্ আর কথাকলির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় নি। এখানে এই দুটি নৃত্যশাখা সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করা যেতে পারে।

ভারতনাট্যম্ ভারতের নাট্যশাস্ত্রকে ভিত্তি করে রচিত। এই নৃত্য পূর্বে দাসীয়াত্তম্ নৃত্য নামে অভিহিত ছিল। তার কারণ তখন দেবদাসীরাই কেবল মন্দির প্রাঙ্গণে এই নৃত্য প্রদর্শন করতেন। এখন পুরুষেরাও এই নৃত্যের চর্চা করে থাকেন। ভারতনাট্যমে সঙ্গীতের অংশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গীত-শিল্পী মঞ্চের পশ্চাদ্ভাগে থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং সেই সঙ্গীতের রাগ ও তাল অনুযায়ী নৃত্যশিল্পী নৃত্য পরিবেশন করেন। যদিও বর্তমানে বিশিষ্ট আধুনিক ভারতনাট্যম্ শিল্পীদের দ্বারা ভারতনাট্যমের শৈলীতে যুগোচিত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা হলেও এখনও পর্যন্ত তার সনাতন অঙ্গগুলিই (যথা আলারিম্, জাতিস্বরম্ প্রভৃতি) সর্বাধিক জনপ্রিয় বলে মনে হয়।

কথাকলির ইতিহাসও ভারতনাট্যমের মতই পুরাতন। কেরালায় পূর্বে 'কৃষ্ণনাট্যম্', 'রামনাট্যম্' নামের এক জাতীয় নৃত্য-ভঙ্গী প্রচলিত ছিল। তা থেকেই কথাকলির উদ্ভব হয়েছে বলে মনে হয়। কথাকলি নৃত্যের কাহিনী অংশে রামায়ণের ও কৃষ্ণ উপাখ্যানের প্রাধান্য এই অনুমানকে আরও জোরালো করে তুলেছে।

কথাকলি অতিশয় জটিল ও আড়ম্বরবহুল নৃত্য। এর অঙ্গ ও পরিচ্ছদসজ্জায় প্রভূত সময় ব্যয় করা হয়। নৃত্যশিক্ষার্থীদেরও বহুদিন শিক্ষাধীনে থাকতে হয়। তবে বর্তমানে কথাকলি নৃত্যের আড়ম্বর ও সজ্জাবৈচিত্র্যকে যুগের রুচির সঙ্গে খাপ খাইয়ে সরল করে তোলার চেষ্টা চলছে। এ ক্ষেত্রে কথাকলি নৃত্যের অন্যতম সার্থক প্রচারক নটকলানিধি গোপীনাথের চেষ্টা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তিনিই প্রথম কথাকলি নৃত্যকে যুগোপযোগী ধারায় সংস্কার করে মালাবারের বাইরে তাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। কথাকলির প্রচারপ্রায় পরলোকগত মালয়ালী কবি প্রখ্যাত ভাল্লাথোলের অবদানও বিশেষ স্মরণীয়। তাঁর সাহিত্য-জীবনের একটি মূল্যবান অংশ তিনি এই নৃত্যের সংগঠন ও উৎকর্ষ বিধানে ব্যয় করেন। কথাকলি নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ ছিল গভীর। কেরালার সুপ্রসিদ্ধ কেরালা কলামণ্ডলম্ কথাকলি নৃত্যানুশীলনের এক প্রধান কেন্দ্র এবং সেটি কবি ভাল্লাথোলেরই সৃষ্টি।

ধ্রুপদী নৃত্যরীতির আর একটি বিশিষ্ট শাখা হচ্ছে উত্তর-ভারতের কথক নৃত্য। এই নৃত্যের কথক নামটি 'কথকতা' থেকে এসেছে এবং এই নামসাদৃশ্য থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন কথক

নৃত্যের আদি নমুনা হিন্দু নাট্যশাস্ত্রের ভিতর নিহিত আছে। কিন্তু গোড়ায় হিন্দু নৃত্য-শাস্ত্রের নির্দেশিত নৃত্যবিধিগুলির সঙ্গে এই নৃত্যের আত্মীয়তা সম্বন্ধ থাকুক আর না-ই থাকুক, পরবর্তীকালের মুসলমানী প্রভাব এই নৃত্যভঙ্গীর উপর গভীর রেখাপাত করেছে এবং তার ফলে তার গোত্র বদল হয়ে গেছে বললেও চলে। মুঘল আমলে মুঘল বাদশাহ ও তাঁদের অনুগ্রহপুষ্ট রাজপুত রাজাদের দরবারে কথক নৃত্যের সবিশেষ চর্চা হত এবং এই নৃত্যকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ নর্তকী সম্প্রদায়েরই সৃষ্টি হয় সেই কালে। বাদশাহ ও রাজাদের মনোরঞ্জনকারিণী এই নর্তকী-পরম্পরা থেকেই পরবর্তী যুগের বাইজী শ্রেণীর উদ্ভব।

কথক নৃত্যে হস্তমুদ্রা অপেক্ষা পায়ের কাজের ভূমিকা প্রধান। পদসঞ্চালনের প্রাধান্যের দিক থেকে দক্ষিণ-ভারতের কোন্‌কল নৃত্যের সঙ্গে কথক নৃত্যের সাদৃশ্য আছে। কথক নৃত্যের 'পরন্' অংশে হাতে তাল দিয়ে মুখে তালের বোল্ উচ্চারণ করতে হয়। তারপর সেই বোল্‌গুলিকে 'সংভাবের' দ্বারা অর্থাৎ শুধু তাল লয়যুক্ত উপযুক্ত পদসঞ্চালনের দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে হয়। পায়ের কাজ যখন চলতে থাকে তখনও মুখে বোল উচ্চারণ করবার নিয়ম। বোলের এই বিধি কারও কারও মতে 'কথক' নামটির উৎপত্তির মূলে; তবে এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না।

কথক-নৃত্য অতিশয় লয়দার ও পরিশ্রমী নৃত্য। মেয়ে-পুরুষ উভয়কেই এই নৃত্যে যথেষ্ট শ্রম-সহনক্ষমতার অধিকারী হতে হয়। তবে এই নৃত্যে ছন্দ ও লয়ের কাজ যত প্রবল, ভাবব্যঞ্জনার দিকটা তত প্রবল নয়। কথক নৃত্যে অনুভূতির সৌকুমার্য কতকটা উপেক্ষিত। তবে যে-সকল কথক নৃত্যে ভাঁও (ভাব) বাৎলাবার অর্থাৎ অনুষঙ্গী গজল বা ঠুংরী গানের কথার তাৎপর্য অনুযায়ী নৃত্যমধ্যে অঙ্গভঙ্গী সহযোগে বাণীর ভাবরূপ ব্যঞ্জিত করবার নিয়ম আছে, সেখানে কথক নৃত্যের পরুষ-কঠোরতা তথা লয়সর্বস্বতা কিছুটা কোমল হতে দেখা যায়। কথক নৃত্যের সহযোগী গানে রাধাকৃষ্ণের স্তুতিও অলক্ষ্য নয়।

লক্ষ্ণৌর শেষ নবাব ওয়াজিদ্ আলীর সময়ে কথক নৃত্যের বিশেষ চর্চা হত। তাঁরই সভাপায়ক ভক্ত সঙ্গীতজ্ঞ ঠাকুর দাসের পুত্র বৃন্দাদীন ও কালকাপ্রসাদের নাম কথক নৃত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। ইদানীং কালে শম্ভু মহারাজ, কার্তিকরাম, রোশনকুমারী প্রভৃতি কথক নৃত্যে সবিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন এবং সর্ব-ভারতীয় সঙ্গীত-সম্মেলনগুলিতে তাঁদের নৃত্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করে প্রভূত সুনাম কিনেছেন।

এতাবৎ ক্লাসী নৃত্যরীতিগুলির বিষয়েই মুখ্যতঃ আলোচনা করা হল। এবার লোকনৃত্যগুলির দিকে মনোযোগ ফেরানো যেতে পারে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে কত যে লোকনৃত্যের নমুনা ছড়িয়ে আছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। এক বাংলাদেশেই হরেক প্রকারের লোকনৃত্যের প্রচলন দেখতে পাই। পূর্ববঙ্গের ঝুমুর ও নীলের নাচ, শ্রীহট্টের ঘাটু নৃত্য, মালদহের গম্ভীরা, বীরভূমের রাইবেঁশে ও গাজন, পুরুলিয়ার করম, নাটুয়া ও ছৌ নৃত্য—কত নাম করব। তার উপর বাংলাদেশের বাইরে গুজরাটে আছে গুজরাটী গর্বা, পাঞ্জাবে ভাঙ্গড়া, রাজস্থানে বিভিন্ন দেহাতি নৃত্য, উড়িষ্যার দণ্ড ও উদ্দিষোড়ম্ নাচ এবং অন্যান্য আদিবাসী নৃত্য, সেরাইকেলা ও ময়ূরভঞ্জের ছৌ, আসামে 'বিহু' পরবের নাচ, সাঁওতালীদের ঝুমুর, ভাঙ্গোরের কুরবঞ্জি, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের খট্টক ও বঞ্জি ইত্যাদি ইত্যাদি। উদয়শঙ্করের মতে শেষোক্ত বঞ্জি নৃত্য মূলে ঠিক ভারতীয় বলা চলে না। ওটি পারস্য দেশ থেকে এ দেশে চালান হয়েছে বলে মনে হয়।

অঞ্চলভেদে ভারতীয় লোকনৃত্যগুলির মধ্যে যত ভেদই থাকুক না কেন, তাদের মধ্যে ঐক্য সম্বন্ধও কম নয়। প্রথমতঃ অধিকাংশ লোকনৃত্যই সামূহিক বা যৌথ নৃত্য। গ্রামের মানুষ সারাদিনের কৃষিকার্যের খাটুনির পর সন্ধ্যার অবসরে মিলিত হয়ে যে-সকল নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়ে তাদের শ্রান্তি অপনোদন ও আনন্দ আহরণে সচেষ্ট হয়, নৃত্য তাদের মধ্যে একটি। সুতরাং অবধারিত ভাবেই তাদের নৃত্য যৌথ রূপ ধারণ করে। একক নৃত্য ধরবারী নৃত্যকলার অঙ্গ, অতএব শহরাঞ্চলেই তার প্রচলন বেশী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শের সঙ্গে একক নৃত্যের গভীর যোগ। যাই হোক, লোক-নৃত্যের এই সামূহিকতা তার সজীব প্রাণশক্তির একটা প্রধান উৎস, এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের লোকনৃত্যে লাঠি খেলার প্রচলন কোন-না-কোন আকারে সর্বত্র প্রচলিত আছে। মাদ্রাজ ও মালাবার অঞ্চলে এক ধরনের লাঠি-নৃত্যের প্রচলন আছে, তাকে বলা হয় কোঠারি নৃত্য। কোঠারি নৃত্য বাংলাদেশের পাইক নৃত্য ও রাঢ়বঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গুজরাটের সাম্য-ভাবময় গরবা নৃত্যে ঠিক লাঠি নৃত্যের স্মরণ না নেওয়া হলেও যুদ্ধভাবে লাঠি নৃত্যের মুদ্রা অনুসরণ করতে দেখা যায়। লাঠি নৃত্যের সমধর্মী তরবারি নৃত্য পঞ্জাব, রাজস্থান, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে আন্তাবধি প্রচলিত। বাংলায়ও তরবারি নৃত্যের প্রকারভেদের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। মাদ্রাজে এই নৃত্যকে বলা হয় 'ভাল্লাক', অর্থাৎ অসি-ক্রীড়া। তাছাড়া, নানারূপ ব্যায়াম-কৌশলের নৃত্য ভারতের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশের রাঢ়বঙ্গে, মানভূমের নাটুয়া প্রভৃতি নৃত্যে দৈহিক ব্যায়াম-নৈপুণ্য প্রদর্শন ওই নৃত্যরীতিগুলির অপরিহার্য অঙ্গ বললেও চলে। মালাবারেও এই রকম শারীরিক ব্যায়ামের নৃত্য আছে, তার নাম কাপ্পাটেল-কুলকম্ ও জাদুমেলকালী (তাল-নৃত্য)।

তৃতীয়তঃ, কৃষ্ণবিষয়ক কাহিনী সম্বলিত নৃত্যেরও একটি দীর্ঘকালপুষ্ট ঐতিহ্য আছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নাচে। এর থেকে লোকনৃত্যগুলির অন্তর্নিহিত ঐক্য-সম্পর্কেরই শুধু প্রমাণ মেলে। গুজরাটের গরবা, মালাবারের তিরুভা থিরাকালি, রাজপুতানার ঘুমর ও হোলি, বাংলার কুলার নাচন, উত্তর প্রদেশের কাজরী প্রভৃতি নৃত্যভঙ্গীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে রাধিকা ও গোপিনীদের রসোল্লাসের ভাবটিকেই বিশেষভাবে পরিস্ফুট করে তোলা হয়। তাছাড়া যাদুরসাত্মক লোক-নৃত্যের কিছু-না-কিছু নমুনা ভারতের সকল প্রান্তেই ছড়িয়ে আছে।

কোল, ভীল,মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাচ, ভূত তাড়ানো নাচ, চড়ক-পূজার গাজন নাচ, মধ্য প্রদেশের গিপ্‌সীদের নাচ, মাদুরার বহু প্রাচীন লোকনৃত্য, গুজরাটের ভাওয়া নৃত্য, উড়িষ্যার বালক নাচিয়েদের নাচ—এরকম আরও রকমারি নৃত্যচর্যা ভারতীয় লোকনৃত্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

ভারতীয় লোকনৃত্যগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার কোন সংঘবদ্ধ চেষ্টা আজও হয় নি। এ রকম চেষ্টার আবশ্যকতা আছে বলে মনে করি। বাংলাদেশে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন বাংলার লুপ্তপ্রায় লোক-নৃত্যগুলিকে সঞ্জীবিত করবার জন্যে কয়েক বৎসর ধরে বিধিবদ্ধ চেষ্টা করে আসছেন, এটি সুখের বিষয়। তবে এখনও এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণাধর্মী উদ্যোগের সূত্রপাত হয় নি, সে কথা স্বীকার করতেই হয়। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে রাজধানী দিল্লীতে প্রতি বৎসর কিছু-কিছু আঞ্চলিক লোকনৃত্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারী স্তরের এই উদ্যোগ লোকসংস্কৃতির উজ্জীবনে যে একটি মূল্যবান পদক্ষেপ, তাতে সন্দেহ নেই।

———

নৃত্যচঞ্চল উপমহাদেশ ঃ চীন প্রজাতন্ত্র

বিমলেন্দু যাত্রা

নৃত্যকলার প্রতীকী ভাষায় মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে সুন্দর আর আনন্দের কথা বলে এসেছে। চীনের ইতিহাস তার গৌরব বহন করছে। বিরাট বিশাল এক উপমহাদেশ এই চীন—শত সহস্র বৎসরের সংস্কৃতি-সম্পদ বহন করে চলেছে—কত সম্রাটের কত রাজবংশের উত্থান-পতনে এর ইতিহাস মন্ত্রিত।

রাজদরবার থেকেই চীনের চিরায়ত নৃত্যকলার বিকাশ। পাত্র মিত্রসহ সম্রাট নৃত্যাভিনয় উপভোগ করতেন। সে সব নাচের ভাষায় ছিল প্রতীকের প্রাধান্য। ফলে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারত না, কিন্তু রাজ-রাজড়াদের পক্ষে তা ছিল অবসর বিনোদনের চমৎকার পন্থা।

ধীরে ধীরে নৃত্যশিল্প জনসাধারণের সামগ্রী হয়ে দাঁড়াল। কৃষিপ্রধান দেশের মানুষগুলি নাচের ভেতর দিয়ে তাদের জীবনযাত্রার সৌন্দর্যময় রূপ তুলে ধরল।

প্রায় চার হাজার বছর ধরে চীনে নৃত্যকলার চর্চা চলে আসছে। তখন কোথায় গ্রীক সংস্কৃতি কোথায় বা মিশরীয় সভ্যতা!

প্রাচীন যুগে সঙ্গীতেরও প্রচলন ছিল কিন্তু ৭দিন বংশের পূর্বে সঙ্গীত ও নৃত্যকলার মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত হয়নি। চীনের একটি সুপ্রাচীন পীঠিনাট্য পু কু নামে পরিচিত।

পরবর্তী পীঠিনাট্যগুলি যথা লিয়ন লিং শুয়াং, লিয়ান লিং এর রাজা, তাও ইয়াও লিয়াং প্রভৃতি পু কু-এর আঙ্গিকে রচিত।

আজকের চীন দেশে বিরাট পরিবর্তন চলেছে, একদিকে প্রাচীন সংস্কৃতি, অন্যদিকে নূতন শিল্পোদ্যোগ, কৃষিভিত্তিক দেশটি অতি দ্রুত চলেছে শিল্পায়নের পথে। এদেশের মানুষের গভীর সাধনায় রয়ে গেছে শিল্পকলা, নৃত্যকলা ক্ষেত্রে চীন এখনো যেমন ঐতিহ্য প্রীতির পরিচয় দেয় তেমনি নূতনত্বের উপস্থাপনাতেও চমক লাগায়।

চীনের ক্ল্যাসিক্যাল অপেরাকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়: দক্ষিণের কুন্, উত্তরের ইয়াং, পূর্বের লিউৎসে ও পশ্চিমের প্যাংসি। লিউৎসে অপেরা কুংলিউ নামেও পরিচিত ছিল।

সাম্প্রতিককালে শিল্পক্ষেত্রে শত শত ফুল ফুটে ওঠার কামনা প্রকাশিত হওয়ায় চৈনিক ক্ল্যাসিক্যাল অপেরাগুলি আবার নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করছে।

আজকের চীনের প্রমোদ জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে পিকিং ও রিজিওন্যাল অপেরা। এই অপেরাগোষ্ঠী গ্রামে গিয়ে শুধু প্রমোদ বিতরণ করেই আসে না, স্থানীয় অধিবাসীদের দল গঠনে সহায়তাও করে থাকে। বর্তমানে চীনের প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব এক একটি 'সঙ্ অ্যাণ্ড ড্যান্স এন্সেম্বল' আছে, এগুলি পেশাদারী দল। এছাড়া আছে সৌখীন দল, যেমন 'ওয়ার্কার্স' ড্যান্স অ্যাণ্ড

ড্রামাটিক গ্রুপ অফ সাংহাই'। এদের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে একক ও সম্মিলিত লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

পিকিং স্কুল অব ড্যান্সিং চীনের নৃত্যকলার একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। এখানে তিনটি বিভাগ আছে: প্রাচ্য, স্বদেশীয় ও ব্যালে। প্রাচ্য বিভাগে শেখানো হয় একালের মনোপযোগী চীনা লোকনৃত্য। লোক-ঐতিহ্য অনুসারী অথচ এ যুগের নয়া রাষ্ট্র তথা সমাজের উপযোগী করে আধুনিক নৃত্যকলার শিক্ষা দেয়া হয় দ্বিতীয় বিভাগে। তৃতীয় বিভাগে পাশ্চাত্য ব্যালে শিক্ষা দান করা হয়।

বিখ্যাত চৈনিক ব্যালে 'রেড অব দি লী' অপরূপ দৃশ্যাবলী ও নৃত্যসম্ভারে সমৃদ্ধ। পিকিং স্কুল অব ড্যান্সিং-এর পি. এ. ওসেভ এই ব্যালেতে চিরায়ত চৈনিক নৃত্যকলার সঙ্গে পাশ্চাত্য নৃত্য শিল্পের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, শুধু তাই নয়—তিনি চীনের লোকনৃত্য ও চীনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নৃত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের কয়েকটি দেশের নৃত্যধারাও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন এখানে। সাম্প্রতিককালের যাঁটি চৈনিক নৃত্যনাট্য হল ক্যান্টন কান্‌চারাল্ ট্রুপের নৃত্যনাট্য 'রেড ক্লাউডস্'। প্রথমাংশের পরিকল্পনা অতি সুন্দর, শান্ত গ্রামের সরল মানুষগুলি নাচছে, গাইছে, শিকার করছে। কিন্তু তারপরই এটি হয়ে পড়েছে প্রচারমূলক।

বস্তুতঃ আধুনিক চীনা নৃত্যকলার মান অত্যন্ত উন্নত, সেটিং সুন্দর, স্টেজ একেই অনবদ্য, পোশাকের জাঁকজমক ও বাহুল্য লক্ষণীয়ভাবে প্রকট কিন্তু নৃত্যের বিষয়বস্তু কতখানি বিশুদ্ধ শিল্প-সম্মত আর কতখানি প্রচারমূলক তা বিচার সাপেক্ষ। এ যুগের নাচের বিষয়বস্তু হয়েছে ইস্পাত উৎপাদন, নদীবক্ষে জলাধার নির্মাণ, কৃষির উন্নতি, জাপান অথবা কুয়োমিন্টং-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে কৃষক ও রেড আর্মির বীরত্ব ইত্যাদি।

নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের জন্য চীন দেশে বহু অতি বৃহৎ রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হয়েছে, যেখানে একসঙ্গে একহাজার থেকে দু'হাজার দর্শক আসন গ্রহণ করতে পারবেন।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় চৈনিক নৃত্যকলা এখন শুধু আনন্দের জন্য নয়, পরন্তু নয়া সমাজ গঠনের জন্য, বিরাট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও ঐক্যসাধনের জন্য এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্যও অনুষ্ঠিত ও সমাদৃত হচ্ছে।

সদ্য প্রকাশিত
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দুই কবি
(রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ)
রবীন্দ্রকাব্যের আলোকে অরবিন্দকাব্যের আলোচনা
"শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির উপরে অপরূপ আলোকসম্পাত"—ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
"A thought provoking···searching yet synthetic study···"
Dr. Kalidas Nag in Hindusthan Standard.
বীভার্স কর্ণার
৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

জাপানের নৃত্যকলা

সুদর্শন পাল

এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলেও জাপান এ মহাদেশের অন্যান্য দেশগুলো থেকে পৃথক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত জাপানে পশ্চিমী রীতিনীতি চাল-চলনের অনুকরণ অন্ধের মতো দেখা দিয়েছে বটে, আসলে জাপান নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির অনন্য প্রাণশক্তিকে জিইয়ে রেখেছে। সাময়িকভাবে একটু নিজত্বের ধর্ম থেকে স্খলন হলেও আবার বেঁচে উঠবে। যে প্রাণশক্তির কথা এবং প্রাণশক্তির ব্যাপারে জাপানের যে নিজত্বের কথা বলা হল, এ জাপানের সর্বত্র পরিলক্ষিত। কি ধর্মাচরণে, কি শিল্প সংগঠনে, কি ললিতকলায়, কি সঙ্গীত নৃত্যকলা—সর্বত্র জাপানের এ অক্ষয় নিজস্বতা।

একটা জাপানী কবিতায় জাপানের মানুষের অন্তরদৃষ্টির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

"স্বর্গ এবং মর্ত হচ্ছে ফুল,
দেবতারা এবং বুদ্ধ হচ্ছেন ফুল,
মানুষের হৃদয় হচ্ছে ফুলের অন্তরাত্মা"

জাপান সমস্ত কিছুকে বিকশিত নির্মল একটি ফুলের মতো করে দেখছে। এ নিরাসক্ত ধ্যান তাদের সমগ্র জীবনাচরণকে করেছে সংহত, সাধনীয় বস্তুর তুল্য করে তুলেছে জীবনভঙ্গীর প্রতিটি ছন্দকে। জাপানের লোকনৃত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে জাপানী মানুষের এ মনকে লক্ষ্য করা দরকার হয়ে পড়ে। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাপান যাত্রী' বইতে লিখেছেন: 'জাপানের যে সৌন্দর্যবোধ সে তার সাধনা, একটা প্রবল শক্তি।' বিকশিত ফুলের মতো যে জাতি স্বর্গ ও মর্তকে দেখছেন, তাদের সৌন্দর্যবোধ বাস্তবিকই একটা সাধনার বস্তু।

জাপানের লোকনৃত্যে সে সৌন্দর্যবোধের প্রলেপ লেগে আছে। জাপানী নৃত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সুন্দর মন্তব্য করেছেন যা ওপরের উক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে। 'এ যেন দেহভঙ্গির সংগীত। এই সংগীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাৎ পদে পদে মীড়। ভঙ্গিবৈচিত্র্যের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই, কিম্বা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না।' সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মতো একসঙ্গে দুলতে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে।...সৌন্দর্যপ্রিয়তা জাপানীর মনে এমন সত্য যে তার মধ্যে কোন রকমের মিলন তাদের দরকার হয় না এবং সহ্য হয় না।' (জাপান যাত্রী পৃঃ ১০১—২)

নৃত্যকলায় জাপানের নৈপুণ্য ও উৎকর্ষ বহু পুরাতন কালের অর্জন। তেরো শ' বছর পূর্বে বুগাকু এবং গাগাকুর আবির্ভাব হয়েছিল। ছাসন বা গোলো নাচ জাপানী সম্রাটেরা খুব উপভোগ করতেন। আজ পশ্চিমী দুনিয়ার ভারোলিন বা পিয়ানো সহযোগে নাচের যে যাদুকরী কলাকৌশল, তার তখনো জন্ম হয়নি যখন জাপান তার নৃত্য চর্চায় সেই রকম যাদুকরী আনন্দ ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে। সামন্ত প্রভুরা সে নাচের সর্বাপেক্ষা বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পশ্চিমী বিশেষজ্ঞরা ছাসন বা গোলো নাচকে লোকনৃত্যের মধ্যে ধরেন না কেন বুঝতে পারিনে, কিন্তু এ দুটো নাচই খুব জনপ্রিয় এবং আদি লোকনৃত্য জাপানের। লোকনৃত্য সাধারণতঃ দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কর্মকে রূপ দেয়।

নববর্ষকে নিয়ে নবান্নকে নিয়ে জাপানের লোকনৃত্য আজো তার সুপ্রাচীন সুষমা নিয়ে পালিত হয়। বসন্ত ঋতুর আগমনে সদাপ্রফুল্ল হয়ে ওঠে বিমর্ষ মন। বসন্তোৎসবে চেরীনৃত্য প্রদর্শিত হয়।

এ নৃত্য এক অমূল্য দ্রষ্টব্য জিনিস তা ছাড়া ছাতানৃত্য, পাখানৃত্য, অশ্বনৃত্য, মৎস্যরাজ নৃত্য প্রভৃতি লোকনৃত্য রয়েছে।

গ্রীষ্মের শেষে 'বন' (Bon) নৃত্য খুব সমারোহের সঙ্গে সারা দেশব্যাপী গভীর রাত্রি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এ নৃত্য জাপানের প্রসিদ্ধ লোকনৃত্য। যে যে সময়কে ঘিরে যে লোকনৃত্যের জন্ম হয়েছে, সে সে সময়ে সময়োপযোগী লোকনৃত্য আজো নগর সভ্যতার দ্বারা পুরোপুরি আকৃষ্ট টোকিওর ভজন খানেক সংগীত ভবনে পরিবেশিত হয়। কেউ বা উৎসবের প্রয়োজনে অপেশাদারি ভাবে করেন, কেউ বা পেশাদারীভাবে। টোকিওর বিখ্যাত Nichigeki নাট্যগৃহে দিনে তিনবার করে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ফাঁকে ফাঁকে লোকনৃত্য দেখান হয়।

এ লোকনৃত্যগুলোর আধুনিকীকরণও হচ্ছে। বিশেষ করে 'গেইশা' মেয়েদের হাতে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। চিরাচরিত জাপানী সৌন্দর্যবোধ যুদ্ধোত্তর জাপানে মার্কিনী জীবনের ভোগোন্মত্ততার প্রবাহে ক্রমশঃ রূপ পাল্টাচ্ছে। যাহোক হলেও জাপান সে সৌন্দর্যবোধকে আবার বাঁচিয়ে তুলবে। এ সৌন্দর্যবোধ জাপানী মানসিকতার বড় সম্পদ। আধুনিকীকরণ যেন সে সৌন্দর্যবোধকে বিকৃত না করে। জাপানী লোকনৃত্যের ভবিষ্যৎ এর ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে।

———

PIONEER
VESTS

ARE
HYGIENICALLY
BLEACHED

EVERY BODY NEEDS
PIONEER VESTS

They are standard in size too

PIONEER KNITTING MILLS LIMITED
PIONEER BUILDINGS, CALCUTTA-2

"PROF. BOSE'S REMARKS"

I have to-day visited Pioneer Knitting Mills Ltd., at Cossipur on the B. T. Road. The rotating machines of the most modern designs are at work, and I have seen bleaching vat, which is fed from water flowing through an jon-exchanging column. I have been charmed, and carry away very pleasing memories, and with great hopes for the future of this progressive firm, and also for the future Bengalis who will come and make their mark in the world's competing market as Pioneer has already begun.

Sd/- **Satyendra Nath Bose**
(*National Professor of India*)
28. 2. 5.

নৃত্যকলায় পাকিস্থান

চিত্তরঞ্জন দেব

সর্বকালে সর্বযুগে জীবনের গভীরতম অনুভূতি এবং অভিব্যক্তি প্রকাশের কাজে নৃত্যকলা এক গুরুতর স্থান দখল করেছে। এই নৃত্য কখনও হয়েছে শাস্ত্রীয় রীতিনীতি এবং বাঁধাধরা নিয়মানুসারে, কখনও বা প্রকাশ পেয়েছে নিরক্ষর সরল পল্লীজীবনের অনাড়ম্বর অভিব্যক্তির মাধ্যমে। সংগীতের মত নৃত্যকলার ব্যাপারেও পাকিস্থানের জীবনযাত্রা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তবে এ কথা ঠিক যে পাকিস্থান অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হল তার অপূর্ব লোকনৃত্যে।

সাধারণতঃ কোন উৎসব বা অনুষ্ঠানকে ঘিরেই এর লোকনৃত্যগুলির উৎপত্তি এবং বিকাশ। বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান যথা বিবাহ উৎসব, তথা শস্যকর্তন উৎসব, পালপার্বণকে উপলক্ষ্য করেই সরল পল্লীবাসীরা বিনা প্রস্তুতিতে মনের আনন্দে এই সব নৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকে।

নৃত্যকলার ব্যাপারে পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় পাকিস্থানই বেশ সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু পাকিস্থানের দুই অঞ্চলের নৃত্যকলা এবং এর সঙ্গে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রাদি সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। হয়ত জলবায়ু এবং ভৌগোলিক পরিবেশের জন্যই এটা সম্ভব হয়।

পশ্চিম পাকিস্থানে বিশেষ করে পশ্চিম পাঞ্জাবে, সিন্ধু, করাচী, বেলুচিস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে ভাংরা, লুড্ডি, ঝুমরি, কুড়ায়, সাম্মী, কীসল, এবং কিচ্চাই হ'ল প্রধান লোকনৃত্য, পক্ষান্তরে পূর্ব-পাকিস্থানে জারিসারি, নীল, সাজন, ধানকাটা, সাঁপুড়ে, বাউল, বৌ-নাচ প্রভৃতিই প্রধান লোকনৃত্য।

পশ্চিম পাকিস্থানের নৃত্যকলা সম্পর্কে বর্ণনা করতে বসে প্রথমেই উল্লেখ করা উচিত এ অঞ্চলের বহুল প্রচারিত ভাংরা নৃত্য।

সাধারণতঃ শস্যকর্তন উপলক্ষ্যেই এর প্রচলন। গাঁয়ের সংলগ্ন কোন খোলা মাঠে ঢাক বাজাতে থাকে ঢাক-বাদক—এর অর্থ হ'ল নৃত্যগীতে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান। ঢাকের এই শব্দ শুনে সংকেতধ্বনির মত গাঁয়ের যত ছেলে এবং বুড়ো সবাই এসে জমায়েত হয় সেই ঢাকবাদককে গোলাকার করে ঘিরে ধরে। এরপর একটুক্ষণ সকলেই একদম চুপচাপ করে থাকে দাঁড়িয়ে, তারপর হঠাৎ এক রকম অতর্কিত ভাবেই বেজে ওঠে ঢাক আর সেই ঢাকের বাজনার তালে তালে সুরু হয়ে যায় তাদের সম্মিলিত নাচ। আর এই সঙ্গে চলে আঞ্চলিক লোকসংগীত।

যে হেতু ভাংরা হ'ল কৃষিপ্রধান দেশের বহুল প্রচারিত নাচ, সেই হেতু এপ্রিল ও মে মাসে পাঞ্জাবের প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে গুজরানওয়ালা, গুজরাট ও সারগোধা জেলায় এর চরম উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। এই উপলক্ষ্যে যে মেলা বসে সেখানেও এই ভাংরা নাচের বড় সমাদর। এর সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্থানের 'ধানকাটা' নাচের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

পশ্চিম পাকিস্থানের অন্যতম বিশিষ্ট নাচ হ'ল "লুড্ডি।" ফসল ঘরে তোলার পর অবসর মাসেই এর প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। "লুড্ডি" নাচ বীররসের নাচ। কিন্তু এর সঙ্গে কোন গান নেই। লুড্ডি নাচে দর্শক সাধারণের মনে বীরত্ব রসের সঞ্চার করে। ঢাকবাদককে ঘিরে, নাচিয়ে তার এক

পায়ের উপর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে হাত দু'খানা উপরে ঠিক পাখীর ডানার মত সমান্তর করে মেলে ধরে গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণের মতই চাকবাদককে প্রদক্ষিণ করে থাকে। এর পর নাচের শেষে নাচিয়েরা একে অপরকে পকেট থেকে আশী বের করে দেখতে থাকে আর খুব পড়ে যায় হাসাহাসির। এর মধ্যে আবার কোন একজন যুবক একটা শাড়ী কাপড় পরে আসরে এসে এদের সঙ্গে যোগ দিলে হাসি-ঠাট্টা, হৈ-হোল্লোড়ের হাট বসে যায়। "ঝুম্মি" নাচ মন্টগোমরী, লয়ালপুর, সারগোদা, গুজরাণওয়ালা এবং গুজরাটের মধ্যেই সমধিক প্রসিদ্ধ।

ঝুমির (ঝুমরি) নাচ আসতে ছিল বেলুচিস্থানের। এর প্রধান উৎপত্তি হ'ল মুজাফ্ফর গড় জেলায় বিবাহ উৎসব উপলক্ষ্যে। ক্রমান্বয়ে এর জনপ্রিয়তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঝুমরি নাচ পুরুষ এবং নারী উভয়ের সম্মিলিত বা দ্বৈত নৃত্য।

পশ্চিম পাকিস্থানে মেয়েলী নাচের সংখ্যাও বড় কম নয়। "সাপী", "সিন্ধী" এবং "কীলকি" নাচ হ'ল শুধু মাত্র মেয়েলী নাচ। এর সঙ্গে কোন গানের প্রচলন নেই।

পূর্বপাকিস্থানের অন্যতম প্রসিদ্ধ নাচ হ'ল 'জারি' এবং 'ধানকাটা' নাচ। জারি কথার অর্থ হ'ল বিলাপ করা। কাশেমের উদ্দেশ্যে ছাকিনার খেদই হল গানের মূল বিষয়বস্তু। মহরম পর্ব উপলক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এ নাচের খুবই প্রচলন দেখা যায়। জারি নাচের সময় সাধারণতঃ কয়েকজন পুরুষ লুঙ্গি পরে মাথায় সিঁদুর কাপড়ের টুপি অথবা আঁট করে রুমাল মাথায় বেঁধে হাতে নিয়ে রুমাল সারিবদ্ধভাবে মূল গায়েনের বা বয়াতীর গানের ছন্দের সাথে সাথে ঘুঙুর বাঁধা পায়ে নাচতে নাচতে একবার এগুতে একবার পেছুতে থাকে। গানের সুর বিলাপের সুর। কাজেই এ নাচ বীরত্বব্যঞ্জক হয়েও বিষাদের সুর মাখান। তাই এর ভিতর কোথাও উগ্রতা প্রকাশ পায়নি। নদীমাতৃক বাংলার অপরাপর লোক-সংগীতের মত এ গানের সুরও যেন অশ্রুজলের দ্বারা সিক্ত। তাই এ অনুষ্ঠান সহজেই একটি বিষাদময় পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলে।

পূর্ববঙ্গের অন্যান্য নাচের ভিতর ধানকাটা এবং মাছধরা বা 'জেলে জেলেনী' নাচও অন্যতম। কৃষিপ্রধান দেশ পূর্ববঙ্গ, তাই ফসল কাটার পর সম্মিলিত পুরুষালী নৃত্য বহুল প্রচারিত। এই প্রসঙ্গে সাঁপুড়ে বা বেদে-বেদেনী নাচের কথাও উল্লেখ করা চলে। বর্ষায় যখন পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জায়গা থাকে জলের তলায় তখন এই বেদেনীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাপ খেলা দেখিয়ে বেড়ায়—এই তাদের জীবিকা। সাপের ঝাঁপি মাথায় নিয়ে অথবা সাপ খেলা দেখাতে দেখাতে তাদের সুরেলা কণ্ঠের সাথে যোগ হয় তাদের নৃত্য আর তাদের নৃত্যের ছন্দের সাথে যোগ রাখে নৃত্যরত সাপ। বেদেনীর নাচ এবং গান, সেই সঙ্গে ফণাতোলা সাপ—সব কিছু মিলে সৃষ্টি হয় এক অপূর্ব রোমাঞ্চকর পরিবেশের।

পূর্বপাকিস্থানের নাচের কথা বলতে বসে হিন্দুসমাজে প্রচলিত নীলের নাচের কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। চৈত্রমাসের শেষে নীল বা পাটগোসাঁইকে মাথায় নিয়ে নীল সন্ন্যাসীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে নীলের নাচ দেখিয়ে বেড়ায়। পাটগোসাইকে মাঝখানে রেখে পায়ে ঘুঙুর, মাথায় পাগড়ী বেঁধে তরুণ নীল-সন্ন্যাসী বা ভক্তের দল সম্মিলিতভাবে নাচতে থাকে, সঙ্গে চলে কলের গান আর ঢাকী ও কাঁসি বাজনা। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে বাউল নাচেরও প্রচলন রয়েছে। এ ছাড়া

মুখোশ নৃত্যেরও প্রচলন রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ঢাকার কালীকাটের—কালীর মুখোশ পরে যে তাণ্ডব নৃত্য প্রদর্শন করে থাকে নাচিয়েরা, তার উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে।

এ ছাড়া শ্রীহট্টে যৌনাচেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এক সময় সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে-বৌদের ভিতরও নাচের বিশেষ প্রচলন ছিল। বিশেষ করে বিবাহ উৎসবাদিতে নৃত্য গীতের প্রচলন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল—এর প্রচুর উদাহরণ আছে। কালক্রমে অবশ্য এগুলি প্রায়ই লুপ্ত হয়ে আসছে: তবু আশার কথা এই, পাকিস্থানের জনসাধারণ তাদের নাচের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে যথেষ্ট যত্নবান। তারা শুধুমাত্র তাদের দেশীয় নৃত্যশিল্পেরই উন্নতি বিধান করেনি, শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পের পিছনেও তাদের উদ্যম প্রশংসনীয়। উদাহরণস্বরূপ ভারতনাট্যম্, মণিপুরী নৃত্য, মযুর নৃত্য আছেই—তা ছাড়াও পাশ্চাত্য রীতিতে সৃষ্টি করেছে বহু 'ব্যালে নৃত্য' বা নৃত্য কাহিনী বহু জনপ্রিয় ঘটনা বা কাব্যকে অবলম্বন করে। এর মধ্যে কবি জসীম উদ্দীনের "নকশী কাঁথার মাঠ" ব্যালে নাচ সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

বাংলা সাহিত্যের অনন্যসাধারণ ভ্রমণকাহিনীর অন্যতম

শম্ভু মহারাজের গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী-গোমুখীর ভ্রমণ বিবরণ

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা

॥ অসংখ্য চিত্র, মানচিত্র, ও পথপঞ্জীসহ—ছ' টাকা ॥

অবধূতের
তীর্থযাত্রাপথের বিচিত্র কাহিনী
দুর্গম পন্থা ৪৲

প্রবোধকুমার সান্যালের
নূতন উপন্যাস
বিবাগী ভ্রমর ৭৲

মনোজ বসুর
নূতন উপন্যাস
বন কেটে বসত ৯৲

সুমথনাথ ঘোষের
নীলাঞ্জনা ৭৲
সর্বংসহা ৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
'কলকাতার কাছেই' গ্রন্থের ২য় খণ্ড
উপকণ্ঠে ৯৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
গল্প-পঞ্চাশৎ ৯৲

প্রমথনাথ বিশীর
গল্প-পঞ্চাশৎ ৮৲

আশাপূর্ণা দেবীর
গল্প-পঞ্চাশৎ ৮৲

মনোজ বসুর গল্প-পঞ্চাশৎ (যন্ত্রস্থ)

প্রমথনাথ বিশীর
রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ (১ম খণ্ড) ৫৲ (২য় খণ্ড) ৫৷৷
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ৫৲
কেরী সাহেবের মুন্সী ৮৷৷

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা—১২

নাচের দেশ সিংহল

রঞ্জনা রায়

তাল আর নারিকেল কুঞ্জে ঘেরা এই সিংহল দেশ! অপূর্ব এর প্রাকৃতিক শোভা। যুগে যুগে নানা জাতির আগমন ঘটেছে এখানে, তাদের অনেকেই হয়ে গেছে এখানকার অধিবাসী। তাই এখানে বহু সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে। কিন্তু তা'হলেও সিংহল তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারায়নি—বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে।

এক কথায় সিংহলের প্রায় পঁচাত্তর জনই হল বৌদ্ধ। তাই বৌদ্ধ পাল-পার্বণ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিই হ'ল এখানকার প্রধান সংস্কৃতি। সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন হ'ল নৃত্যকলা। সিংহল ও নৃত্যকলার ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমান তালেই পা ফেলে চলেছে। অন্যান্য দেশের মত সিংহলেও নৃত্যের দুটি ধারা প্রবহমান। একটি দক্ষিণ ভারতীয় প্রভাবান্বিত "কথাকলি" ও "ভরতনাট্যম্", অপরটি সিংহলের নিজস্ব লোকনৃত্য। দুটি ধারাই নিজস্ব পথে এগিয়ে চলেছে।

এই দ্বীপের উল্লেখযোগ্য নৃত্যকলার ভিতর "শয়তান নৃত্য" (Devil dance) এবং "কাণ্ডী নৃত্য"। কান্ডী হ'ল এই দেশের রাজধানী, সেই নাম অনুসারেই এদের নাম হয়েছে "কাণ্ডী নৃত্য"। এখানেই এ নাচের প্রধান কেন্দ্রস্থল। যতদূর জানা যায় তাতে দেখা যায় ষোড়শ শতাব্দীতে কান্ডীর রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় এ নাচের প্রসার লাভ করে। এখনও এ নাচ এদেশের অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে।

"কান্ডী নৃত্যের" ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায়—এ হ'ল ভারতের কথা কলি নৃত্যেরই অনুরূপ। ভারতবর্ষিয়েরা এদেশে এসেই এই নৃত্যের প্রবর্তন করেন, এবং এখনও পর্যন্ত এই কান্ডী নৃত্যের সঙ্গে যে বাদ্যযন্ত্র সংযোগে গীতাদি পরিবেশিত হয় তার ভিতর পূর্ণমাত্রায় হিন্দু প্রভাব বিদ্যমান। তবে পার্থক্যের মধ্যে এই, ভারতীয় "কথাকলি নৃত্য" যেহেতু হিন্দুধর্ম প্রভাবিত সেইহেতু এর বিষয়বস্তু এবং চরিত্রাদি সবই রামায়ণের রাম, সীতা, রাবণ, হনুমান, অথবা গণেশ প্রভৃতিকে নিয়ে। "কথাকলি নৃত্যের" মূল উপজীব্য হল শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা আগমন এবং সীতা উদ্ধার। কিন্তু সিংহল যেহেতু বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত দেশ সেইহেতু এখানকার লোকেরা এর বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন সাধন করে নিয়েছেন নিজেদের উপযোগী করে। এর ভিতর স্থান পেয়েছে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় ঘটনাবলী।

"কাণ্ডী নৃত্যে"র পোশাক বৈচিত্র্যও কম নয়। এক কথায় বলতে গেলে সমগ্র এশিয়ায় এই ধরনের মনোরম নাচের পোশাক দেখতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। গাঢ় রূপোলী রংয়ের অবরাস মাথায় টুপির আকারে লম্বা শিরস্ত্রাণ, তাতে বড় বড় রূপোলী তারকা—টুপির মেরুটিতেও অনেকটা যেন তালে ফোলান আমের মত রূপোলী রং-এর তারকা। হাতে এবং পায়ে রূপোলী গহনা এবং ঘুঙুর। রাজকীয় কোন উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষতঃ বৌদ্ধ উৎসবাদিতে যথা বুদ্ধের জন্মদিন, তার মহা পরিনির্বাণের দিন প্রভৃতি দিনে এই নৃত্যসহ যে বিরাট মিছিল কলম্বোর পথে বের হয় তার তুলনা দেওয়া কঠিন।

সিংহলের আদিতম নৃত্যের ভিতর "শয়তান নৃত্য" (Devil dance) বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমনি তাদের পোশাক বৈচিত্র্য তেমনি তাদের নৃত্য কুশলতা। বিপদাপন্ন এবং অসুস্থ মানুষের কল্যাণ কামনায় এই "শয়তান নৃত্য" অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

কতকগুলি পুরুষ মুখে শয়তানের মুখোশ এঁটে (কখনও ভূত, প্রেত, দস্যি-দানব, সাপ, বাঘ প্রভৃতি) গায় মেখে পীত বা হলুদ রং, মাথায় দিয়ে তালপাতার ঝুরি (চুলের কাজ করে) একে একে এসিয়ে আসে নৃত্য ক্ষেত্রে। এদের ভিতর যে সর্দার নাচিয়ে তার হাতে থাকে একটা দণ্ড—অনেকটা যেন যাদুকরের "যাদু দণ্ডের" মত। যাদু ক্রীড়ার মতই সে তার ঐ দণ্ড উঁচু করে নৃত্য আরম্ভের সংকেত করে এবং দণ্ড নামিয়ে ফেললে বোঝা যেল নৃত্যের সমাপ্তি ঘটল। এসবের উদ্দেশ্য অশরীরী দেবতা বা শয়তানকে তুষ্ট করা যেন তাঁর কৃপায় বিপদমুক্ত হওয়া যায়। এ নাচের সব চাইতে আকর্ষণ হল আগুন নিয়ে খেলা। যেমনি ভয়ঙ্কর তেমনি লোমহর্ষক। এর সঙ্গে বাজতে থাকে গম্ভীর সুরে দামামা। সবকিছু মিলে সৃষ্টি হয় এক ভয়াবহ পরিবেশের। এরা এত সতর্ক যে কারণে আগুন নিয়ে খেললেও কখনও কারও জামা-কাপড়ে আগুন লাগতে দেখা যায় না।

"কাণ্ডী নৃত্য" বা "শয়তান নৃত্য" সবই পুরুষালি নৃত্য। এর ভিতর যে সব নারী চরিত্র আছে পুরুষেরাই সেগুলি নারী বেশ ধারণ করে নৃত্যাভিনয় করে থাকে। কিন্তু এসব ছাড়া সিংহলে শুধুমাত্র "নারী নৃত্য"ও দেখা যায়। তার মধ্যে একটি হ'ল "স্বাগত নৃত্য" (Welcome dance)—গৃহে কোন সম্মানিত অতিথি এলে তার সম্বর্ধনার জন্য এর প্রচলন হয়। সহজ রং-এর ব্লাউজ পরে অতি উজ্জ্বল সাদা শাড়ী অঙ্গে জড়িয়ে তারা অনেকটা দক্ষিণ ভারতীয় দেবদাসী নৃত্যের অনুরূপ নৃত্য দেখিয়ে থাকে। এ ছাড়া আর একটি নৃত্যের উল্লেখ করা যায়, তার নাম "পাত্র নৃত্য" (Pot dance)। মেয়েরা মাথায় ঘট নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায় তারপর বিভিন্ন মুদ্রা সহযোগে এমনি প্রদর্শন করে থাকে। এসব নাচের দেখা পাওয়া যায় সামাজিক ও পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানে।

দক্ষিণ সিংহলে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর অনুল্লেখযোগ্য দুটি নৃত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি হ'ল "অসি নৃত্য" তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধের পটভূমিকায় নাচ এবং অপরটি হ'ল "লাঠি নৃত্য"।

———

* * * *Puja Greetings* * * *

From

SHREE GOBINDDEO GLASS WORKS LTD.

RAMRAJTALA, HOWRAH.

Phone : 67-2248.

ব্রহ্মদেশের নৃত্যকলা

উপগুপ্ত

ব্রহ্মদেশ হচ্ছে মূলতঃ উৎসব দিয়ে ভরা। কোথাও না কোথাও কোন না কোন উৎসব লেগেই আছে। আগেকার দিনে যখন ব্রহ্মদেশের রাজারা যুদ্ধে যেতেন তখন পথের মাঝে মাঝে তাঁবু ফেলে নাচগান দিয়ে সমস্ত যুদ্ধযাত্রাপথ ভরিয়ে রাখতেন। সে যুদ্ধ যাত্রাপথের মাঝে মাঝে সংগীতজ্ঞ এবং নৃত্যকুশলীদের প্রস্তর মূর্তি তৈরি করে রাখতেন। এই সংগীতজ্ঞ এবং নৃত্যকুশলীদের প্রস্তর মূর্তিগুলো যুদ্ধসাফল্যের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। উত্তর ব্রহ্ম চীনাদের হাতে যখন যায় নবম শতাব্দীতে, তখন ব্রহ্মদেশের দূতেরা রাজাদের সামনে শ্রদ্ধার স্বাক্ষরস্বরূপ দেশীয় ভঙ্গীতে নাচগান করতেন। এমনি বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর দ্বারা এটাই স্পষ্ট হয়, নৃত্যসংগীত ব্রহ্মবাসীদের—উচ্চনীচ নির্বিশেষে সবার—স্বভাববৈশিষ্ট্য। এভাবে উৎসবের ভিতর দিয়ে ব্রহ্মবাসিগণ জীবনের কঠোর বাস্তব দিককে মুখোমুখি করার শক্তি অর্জন করতেন এবং এখনো করেন।

ব্রহ্মদেশের নৃত্যচর্চার দীক্ষা মুখ্যতঃ ভারতবর্ষের কাছে ঋণী। জাতক কাহিনী অর্থাৎ বুদ্ধদেবের জীবন সম্পর্কে নানা ঘটনা নিয়ে তৈরী কাহিনী অবলম্বন করে ব্রহ্মদেশের নৃত্যবস্তু রচিত হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের গোঁড়া ভক্ত ব্রহ্মদেশের লোকের মনে এ ধরণের নৃত্য দারুণ প্রেরণার সঞ্চার করে। শক্তি উৎসাহের কেন্দ্র এই জাতক কাহিনীগুলো নিয়ে অবলম্বিত নৃত্যে মেয়ে-পুরুষ উভয় শ্রেণী একত্রে অংশ গ্রহণ করেন। কখনো কখনো মেয়েরা পুরুষের নাচের ভূমিকাও নেন। বিচিত্র বর্ণের পোশাক—এ সমস্ত নাচের লক্ষ্যণীয় উপকরণ। উজ্জ্বল বর্ণটি এঁদের সবচেয়ে প্রিয়।

এখানকার নৃত্যরীতির একটা দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া গেল। প্রথমে নাচিয়ে কয়েকটা লাইন গাইবেন। গানের শব্দগুলো সুর প্রবাহের সৃষ্টি করে। ড্রাম বাজিয়ে সে সুরকে পুনর্বার তোলা হয়। অর্কেষ্ট্রার ভূমিকা আরম্ভ হয় এবং তখন আস্তে আস্তে নৃত্যশিল্পীনাচ আরম্ভ করেন।

জাতকের কাহিনী বাদ দিয়েও নৃত্যবস্তুর রচনাও কেউ কেউ করেন। যেমন, গ্রামের সৌন্দর্য বর্ণনা করে অথবা বনের রহস্য নিয়ে অথবা তীর্থক্ষেত্রের শুদ্ধতা নিয়েও গান রচিত হয়, এবং সে গানের সংগে সংগে নাচ চলে। প্রেম বিষয়ক নৃত্যও আনন্দপূর্ণ ব্রহ্মদেশে খুব প্রিয়।

নৃত্য বিষয় সম্পর্কে বলতে গেলে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, দুঃখ বিষয়ক নাচ বা করুণ রসাত্মক নাচ ব্রহ্মদেশে খুব জমে না বা খুব প্রিয় নয়। এটা সেখানে খুবই স্বাভাবিক, আনন্দে মেতে থাকাই সেখানকার স্বভাব ধর্ম। সেখানকার লোকেরা বলেন, কেউ যদি সত্যিই দুঃখিত বা শোকার্ত হন সেখানে নাচের অবকাশ খুব সীমিত। 'হে আমার প্রিয়তম! আমাদের ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী।' এ ধরনের নাচ আছে সেখানে, কিন্তু সে নাচে গ্রাণ তৈরী হয় না।

ব্রহ্মদেশের নাচে মুখোশ বা পুতুল নৃত্যের একটা চল আছে, সে কারণে মুখোশ বা পুতুল নাচের ধরণ-ধারণ অন্যান্য নাচের ভঙ্গীকে প্রভাবিত করে। যেমন Youssbim Bwe বা Yokthe Pwe' (Pwe' মানে 'শো') ব্রহ্মদেশে বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় মুখোশ বা পুতুল নাচ। অষ্টাদশ এবং

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের নাচের চলন খুব বেশি ছিল। স্বাধীনতা পাবার পর নাট্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় যখন দেশের নাট্য সংগীত চর্চার সমৃদ্ধি সাধনে ব্রতী হলেন, তখন তারা চেষ্টা করলেন এ শ্রেণীর নৃত্যকে সর্বব্যাপী করে চালু করতে। কিন্তু এ আর আগের প্রাণ ফিরে পেল না। বোধহয়, রুচির পরিবর্তনের সাথে এ তাল দিতে পারল না।

Anyein Pwe´ জাতক (Zat Pwe´) নৃত্য থেকে উৎসারিত হলেও সংগঠনের তফাত আছে। চারজন এ নাচের দৃশ্যে থাকেন। দু'জন নৃত্যকুশলী এবং দু'জন ভাঁড়। হাস্যরসাত্মক নাচ।

Nat Pwe´ বা spirit dance এর প্রচলন সেখানে আছে। সাধারণতঃ নববর্ষ উদ্‌যাপনের সময় এ ধরনের নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। সিংহলের Devil dance বা শয়তানের নৃত্যের সংগে এ নাচের অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এ নৃত্য সাধারণতঃ সন্ধ্যাকাল থেকে গভীর মধ্যরাত্রি সময়ের মধ্যে সম্পাদিত হয়। ব্রহ্মবাসীদের মতে প্রাচীনকালে রাজাদের স্বেচ্ছাচারী শাসনে গণতন্ত্রের অন্যতম অস্ত্র বলে বিবেচিত ছিল। কারণ, "If a medium in a trance fell upon one member of the audience and attributed Godlike qualities to him, even the King was forced to respect him and listen to his advice."

অঙ্গ-জানোয়ারের নৃত্য, যুদ্ধ নৃত্য ইত্যাদিও উত্তর ব্রহ্মদেশে চালু আছে।

ব্রহ্মের নৃত্যকলায় সবচেয়ে আকর্ষণ তরুণী। সুষমা এবং লাবণ্যে ভরা সে তরুণী ছন্দের তালে তালে নাচতে থাকেন।

"হিজ মাস্টার্স ভয়েস"
উৎসবের উপযোগী মডেল
মডেল ৫১৮১
ফক্স্
৮-ব্যাণ্ড রেডিও
কেবল এ-সি মেইনের জন্য
দাম ৪৫০৲
মডেল ৫১৮০
এ্যালবাট্রস্
৫-ব্যাণ্ড এ-সি
মাল্টি-মেচ সুপার হেটারোডাইন
দাম ৪২৫৲
মডেল ৫১৮৮
এচাভেষ্ট - ১
মাল্টি ট্রান্সিস্টার পোর্টেবল
রেডিওগ্রাম
দাম ৪৩৫৲
মডেল ৫১৮৫
ফ্লেমিঙ্গো
৪-স্পীড, ৮-ব্যাণ্ড অটোমেটিক
রেডিওগ্রাম, কেবল এ-সি মেইনের জন্য
দাম ৮২৫৲
শেরপা
৪-স্পীড রেকর্ড-প্লেয়ার
মডেল ৮১৮০
এ-সি মেইনের জন্য
মডেল ৮৮৮০
ডুয়াল ম্যাচড্ পিকআপ
দাম ১৮৫৲
পরিবারের সকলকে আনন্দদানে সর্বোত্তম
সকল দামী এক্সচেঞ্জ ছিটিং নহেত। (বিক্রয়কর অতিরিক্ত)
(বিক্রয়কেন্দ্র ঃ দি ইণ্ডিয়া রেডিও ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বোম্বে-১৯)।

শ্যামদেশের নৃত্যকলা

অতিলাল দাস

ভারতবর্ষের পূর্বে ব্রহ্মদেশ,-তাহার পূর্বে শ্যামদেশ। শ্যামদেশে থাই জাতি বাস করে। কয়েক বৎসর পূর্বে তাই ইহারা দেশের নাম পরিবর্তন করে থাইল্যাণ্ড নাম দিয়েছে। শ্যামদেশের সভ্যতা গড়ে উঠেছে—দুটি ভাবধারার সম্মেলনে—একটি চৈনিক, অপরটি ভারতীয়। এই দুই ধারার মধ্যে আমার মনে হয় প্রাচ্যে ভারতবর্ষ অবিসম্বাদীয় প্রভাব পরিব্যাপ্ত করেছে।

ভারতীয় নৃত্যকলা বহু পুরাকাল থেকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে—কিন্তু সমাদরের অভাবে সেই শিল্প বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। রাশিয়ান নর্তকী শ্রেষ্ঠা আনা পাভালোভা ভারতবর্ষে এসে অজন্তা গুহাতে অঙ্কিত নৃত্যের ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে যান, তারপর উদয়শঙ্করের সহায়তায় সারা পৃথিবীতে হিন্দু নৃত্যকলার মাধুর্য এবং অপূর্বতা প্রচার করেন। সেই থেকে আমাদের দৃষ্টি এই শিল্প-চর্চার দিকে নিবদ্ধ হয়েছে।

শ্যামদেশে ভারতীয় বহু ভাবধারা আজও অব্যাহতভাবে বর্তমান রয়েছে, কাজেই আমাদের নৃত্যশিল্পীরা যদি শ্যামদেশে যান এবং তাদের অতি মোহন নৃত্যভঙ্গিমা পুনর্গ্রহণ করেন, তাহলে আমরা আমাদের প্রাচীন শিল্পরীতির বহু বিস্মৃত অংশ জানতে পারব।

শ্যামদেশের নানা ধরনের নৃত্যের ভঙ্গিমা, মুদ্রা এবং লালিত্য চমৎকার। সেই সব বহুধাবিচিত্র অপরূপ শিল্পচাতুর্যের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, অল্প কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করব।

এদের একটি বহু প্রাচীন নৃত্যশিল্প মুখোশ পরা নাচ -থাই ভাষায় একে বলা হয় খোন। এইসব মুখোশ নানা রঙের এবং নানা গড়নের হয়—তা দিয়ে মুখোশধারীকে চেনা যায়। যারা মুখোশ পরে নাচে, তারা কোনও কথা বলতে পারে না। যাত্রার ছুড়িদারদের মত একদল লোক থাকে, যারা নাচের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করে এবং গান গেয়ে অভিনয়ের গল্পটিকে শ্রোতার নিকট প্রকাশ করে—এই কোরাস গায়কদের থাইভাষায় বলা হয় কনকাক। এই মুখোশ নৃত্যের উপজীব্য বিষয়বস্তু রামায়ণের কাহিনী। এই সব নাচে সাধারণতঃ পুরুষেরা অংশগ্রহণ করে, সময় সময় অবশ্য মেয়েরাও ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই মুখোশ-পরা নাচের অভিনেতাদের উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়, ভঙ্গিমা দিয়ে মনোভাব প্রকাশ করা সহজ নহে। তার জন্য চাই অটল অধ্যবসায়, গভীর নিষ্ঠা এবং দৃঢ় তপস্যা। সংস্কৃত নাটকে বিয়োগান্ত কোনও দৃশ্য দেখানো হয় না—এই সব মুখোশপরা খোন নাটকে কোনও দুঃখজনক পরিস্থিতি পরিবেশন করা যায় না। এই সব অভিনেতাদের জন্য নানা কারুকার্যময় পোশাক তৈরি করতে হয়।

খোনের নানা বিভাগ আছে—এক ধরনের খোন খোলা মাঠে সর্বসমক্ষে অভিনীত হয়। দ্বিতীয় প্রকার অভিনয় হয় রঙ্গমঞ্চে পিছনের দিকে একটি স্তম্ভ থাকে, তার উপর একটি পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তৃতীয় প্রকার খোন একটি সাদা যবনিকার সামনে করা হয়। চতুর্থ প্রকারকে রাজকীয় খোন

বলা হয়। কারণ এগুলি সাধারণতঃ বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে অভিনীত হয়—সকল প্রকারের খোন—আধুনিক রীতিতে আধুনিক রঙ্গমঞ্চে দেখানো হয়। খোনের নৃত্যনাটক গাইয়েদেরও খুবই প্রিয়।

দক্ষিণ ভারতের কথাকলি নাচ আর খোন একই ধরনের জিনিস। মুখের ভঙ্গী এবং হাতের মুদ্রা দিয়ে গল্প ফুটিয়ে তোলাই দুয়ের বিশেষত্ব। মুখের, চোখের এবং হাতের ভঙ্গী দিয়ে ফুটিয়েই অসাধ্যসাধন করা হয়। এই নাচের সাথে থাকে বাদক দল, তারা সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ঐকতান সৃষ্টি করে।

খোন ছাড়া ওদেশে আছে আর এক ধরনের নৃত্যনাটক যাকে বলা হয় নাঙ,—এগুলি ভারতীয় ছায়ানাটের আদর্শে উৎপন্ন হয়েছে।

তারপর সাদা কাপড়ের একটি যবনিকা দড়ি দিয়ে শক্ত করে টানানো হয়। সন্ধ্যার সময় উদ্যোক্তা অভিনেতৃ দলকে দক্ষিণা এবং তিনটি বাতি দেন। একটি বাতি বাদক দলের সামনে জ্বালিয়ে গান সুরু হয় এবং দেবদেবীর বন্দনা হয়। নানা ধরনের স্তব ও স্তুতি আবৃত্তির পর রামলীলা প্রদর্শিত হয়। প্রথমে খর, দূষণ ও সূর্পণখা কাহিনীর পরিবেশন হয়। এইসব পরিচিত কাহিনীও দর্শন নৈপুণ্যে দর্শকের চিত্তে অনুভূতির এক তীব্র তপ্ত স্বাদ বহন করে। সাধারণতঃ সন্ধ্যায় আরম্ভ হয়ে মধ্যরাত্রে এই অভিনয় সমাপ্ত হয়। মহীরাবণের কাহিনীটিও খুব লোকচিত্ত বিনোদক। ব্রহ্মাস্ত্রকে যাই ভাষায় বলা হয় ক্রামাস্ত—ব্রহ্মাস্ত্র আনয়ন কাহিনীটিও উৎসাহী দর্শকের মনে কৌতূহল ও পরিতৃপ্তি জাগ্রত করে।

রামায়ণের কাহিনী ছাড়াও অন্যান্য কাহিনী নিয়েও ছায়া নাটক রচিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর এক থাইরাজা, যার নাম রামাধিপতি, তিনি সমুদ্র ঘোষের কাহিনীটিকে ছায়া নাটক করতে বলেন, আখ্যায়িকার মূল কথা এই সমুদ্র ঘোষ ছিলেন স্বর্গের দেবতা। তিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। শর-চালনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়—কেহ তাকে পরাজয় করতে পারত না—এই অপরাজেয় ধানুকী স্বয়ম্বর সভায় অন্য সকলকে পরাভূত করে পরমাসুন্দরী বিষ্ণুমতীর পাণিগ্রহণে সমর্থ হল। ইহা ছাড়া রবীন্দ্রের একটি প্রণয় কাহিনী নিয়ে পঞ্জি ছায়ানাটক অভিনীত হ'ত কিন্তু আধুনিক যুগে সমুদ্র ঘোষ বা পঞ্জির অভিনয় আর হয় না।

আর এক ধরনের নাঙ নাটক আছে—এগুলি রাতে দেখানো না হয়ে দিনে দেখানো হয়। থাই ভাষায় একে নাঙ রাম বলা হয়। এর ছবিগুলি সবই নানা রঙে রঞ্জিত, যারা এই সব ছবি নাচায়, তারাও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ পরে নাটক দেখায়। দেবী মেখলা অসুর রামাসুরকে কেমন করে খেলিয়ে খেলিয়ে নিজের বৈদ্যুতিক গহনায় তাকে প্রলুব্ধ ও প্রবঞ্চিত করেন, সেই কাহিনীটি সাধারণতঃ পরিবেশিত হয়।

ছায়া নাটকের নাচের মূল উৎস ভারতীয়, কিন্তু শ্যামদেশে তাকে নূতনত্বের রসে রসায়িত করা হয়েছিল। ছায়া নাটক থেকেই মুখোশ পরা খোন নৃত্য নাটকের উদ্ভব—।

ইহা ছাড়া শ্যামে নানা ধরনের লোকনৃত্য আছে। আমাদের মতই ওদের বছর ভরে নানা পার্বণ। জনসাধারণ এই সব উৎসব নৃত্যে, গানে এবং ক্রীড়ায় মুখর করে তোলে।

উপরে যে সব নাচের কথা বলা হয়েছে, তাছাড়া এদের সমস্ত অভিনয়েই নৃত্য এক উচ্চ স্থান অধিকার করে আছে—তাই শ্যামদেশে নাচকে তার ভঙ্গী, মুদ্রা, তাল ও মানের সঙ্গে যথার্থ অভ্যাস

সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়। অল্পবয়সে যারা এই কলা অভ্যাস করতে সুরু করে, তারাই দক্ষ নর্তক হয়। প্রথমতঃ বাদ্যসঙ্গীতের সাথে নাচ শেখানো হয়, পরে কৃতিত্ব অর্জন করলে কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে শেখানো হয়।

আমাদের দেশে নাট্যশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ আচার্য হলেন ভরত। তাঁরই নির্দেশিত আঙ্গিক, মুদ্রা, মস্তক, চক্ষু, গলদেশ, হস্তের বিবিধ ভঙ্গিমার সাহায্যে নট ভাবকে অভিব্যক্ত করেন, তাছাড়া পায়ের সাহায্যে গতি এবং হস্ত ভঙ্গিমার সৃষ্টি করে তিনি দর্শকের মনে রসের প্রকাশ করেন। শ্যামদেশের নৃত্য ভারতের নাট্যশাস্ত্রের এই সব সুকঠিন সুদুর্লভ পদ্ধতি আয়ত্ত করা হয়েছে।

গানে বলা হল 'সোত সই মালা' অর্থাৎ একজন মালা বুনছে। নর্তকদের কল্পনা দিয়ে সেই চমৎকার দৃশ্যটি মনে আনতে হবে—তারপর হাতের এবং আঙ্গুলের ভঙ্গিমা দিয়ে মালারচনাকে প্রকাশ করতে হবে।

বনেতে হরিণী চলে—গায়কের পদে এই কথা বলা হল। নর্তক ও নর্তকী নিজেদের ভাবে ও মুদ্রায় সেই সুন্দর গমনকে অভিব্যক্ত করবেন। এর জন্য নটের কল্পনা শক্তির প্রয়োজন, মাছিমারা কেরানীর মত কেবল নকল করলেই নাচ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হয় না। এই কারণেই যাদের রয়েছে কবি হৃদয়, রয়েছে উদ্ভাবনী শক্তি, তারা কেবল পুরাতন পদ্ধতিকে অনুসরণ করে না। তারা প্রায়ই নূতন পরিচ্ছদ, নূতন আঙ্গিক, নূতন গতি এবং ভঙ্গিমা প্রবর্তন করে; নৃত্যের অন্তরঙ্গ বিষয়বস্তুটিকে নব নব রূপে নব নব রসে প্রকাশের চেষ্টা করেন।

———

BUY
BEST COAL
From
SAMLA COLLIERIES LIMITED.

Collieries at :—
SAMLA, Ramnagar, Kendra & Chhatrisgonda.
P. O. PANDAVESWAR (BURDWAN)
Gram : SAMLA
Phone : BAHULA 54.

Registered Office :—
33, Netaji Subhas Road,
Calcutta—1.
Gram : "JAIPURIA"
Phone : 22-2405-69 (Five Lines).

A JOYPURIA ENTERPRISE

ভিয়েৎনামের লোকনৃত্য

পবিত্র পাল

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত দেশ বৈদেশিক শাসন এবং সামন্ততন্ত্রের নিষ্ঠুর পীড়নে বছরের পর বছর অবহেলিত, রিক্ত অবস্থায় থাকলেও সেখানকার নিঃস্ব, অত্যাচারিত জনগণের অন্তর্সম্পদ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। বরঞ্চ ক্রমশঃ সে সম্পদকে তাঁরা নিষ্ঠা-সহকারে লালন করে এসেছেন তাঁরা। সময়ের অগ্রগতির সংগে সংগে তাঁদের মনের সূক্ষ্মতাও এগিয়ে চলেছে।

একথা বলা চলে অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মত ভিয়েৎনাম সম্পর্কে-ও। ভিয়েৎনামের অধিবাসীরা ভারতবর্ষ যেমন বৃটিশের শাসনে, তেমনি ফরাসী শাসনে পরাধীন জীবন কাটিয়েছেন বহুদিন ধরে। এ ছাড়া সেখানকার সামন্ত প্রভুরা চিরকাল নিষ্ঠুরতার জন্য খ্যাতি অর্জন করে এসেছে। ফলে গ্রামের চাষী ত বটেই, মুষ্টিমেয় ফরাসী ও তাদের দালাল শ্রেণীর কয়েকজন ব্যতীত সবার জীবনে দারিদ্র্য ছিল প্রতিদিনকার সঙ্গী। অপমান, লাঞ্ছনা স্বভাবতই সংগে সংগে চলেছিল। কিন্তু সেখানকার সে নিঃস্ব গ্রামবাসীরা বিভিন্নভাবে জীবনের বিচিত্র দিককে গানে এবং নৃত্যে ধরে রেখেছেন। যেমন সৌন্দর্যের দিক, তেমনি রিক্ততা কদর্যতার দিক। সেগুলোর মধ্যে অপূর্ব শিল্পীমন তার সূক্ষ্ম কারিগরী ছাপ রেখে দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলা বাহুল্য। ভারতবর্ষের সংগে ভিয়েৎনামের যোগ বহুকালের। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এককালে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক অভিযান চলেছিল। কম্বোডিয়া, ইন্দোচীন, চীন, ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম প্রভৃতি দেশে যেমন, তেমনি ভিয়েৎনামেও ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক অভিযান সফলতার সংগে চলেছিল। সে জন্যযাত্রার স্বাক্ষর ভিয়েৎনামের সর্বব্যাপী হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের বিরাট প্রভাব দেখেশে রয়েছে। জীবনযাত্রার মধ্যে দু' দেশের মিল বিশেষ চোখে পড়ে। বিয়ের উৎসব বা মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বা দেবদেবী উপাসনা ইত্যাদির বহুবিধ বিষয়ে একটা হুবহু মিল দেখা যায়। আর তা ছাড়া বহু মন্দির এবং প্যাগোডার মধ্যে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব স্পষ্ট রয়েছে। ভারতবর্ষীয় শিল্পের বা জীবনের মাধুর্য, কমনীয়তা এবং লাবণ্য সেখানেও জীবনযাত্রার মধ্যে বর্তমান।

সেখানকার লোকনৃত্য সম্পর্কে বলতে গেলে উপরের কথাগুলো বলা অপরিহার্য। বাস্তব-জীবনের সংগে লোকনৃত্যের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। জীবনের যা অন্তরঙ্গ দিক, সেটা বহিরঙ্গ শিল্পচর্চাকে প্রভাবিত করে। তাই দেখতে পাই, লোকনৃত্যে সাধারণতঃ প্রতিফলিত হয়, জীবন সংগ্রামের কঠোর দিকগুলো, জন্মভূমিকে ভালবাসবার বিভিন্ন দিক, আধ্যাত্মিক জীবন ইত্যাদি, ইত্যাদি। সংগে সংগে জীবনকে নানারসে নানা রঙের আনন্দে ভরিয়ে তুলবার সূক্ষ্ম ও মধুর চর্চা। ভিয়েৎনামী কৃষক যারা চিরকাল সামন্ত প্রভুদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছেন, শত দারিদ্র্য ও প্রতিদিনকার জৈবিক ব্যথা বেদনার

মানেও লোকনৃত্যকে সুস্থ শিল্পের মর্যাদা দান করে গেছেন। এর মধ্যে ভিয়েৎনামী কৃষক নিজেদের আত্মিক শক্তির অপরাজিত ও অদম্য দৃষ্টান্তকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন।

অতীতে লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান সাধারণতঃ ভিয়েৎনামীরা ধর্মীয় উৎসবে বা সামন্ত প্রভুদের প্রাসাদে বা জনসংঘের নিকট প্রকাশ্যে সম্পন্ন করতেন। অতি প্রাচীনকালে ঘোড়াকে কেন্দ্র করে লোক নৃত্যের বেশি অনুষ্ঠান বিভিন্ন দলের লোকেরা করতেন। প্রজাপতি নৃত্য, সুখ পরিবেশন নৃত্য, পাখা নৃত্য ইত্যাদি নৃত্যই বহুদিন ধরে চলে এসেছে। সুন্দরী তরুণীদের দেহভঙ্গিমায় অপূর্ব মনোরম কলা-কৌশলে পাখা নৃত্যটি উপভোগ্যকর অনুষ্ঠান। এটি রাজপ্রাসাদে বেশি দেখা যেত।

বীরত্বের দিক দিয়েও লাঠি নৃত্য বা তরবারি নৃত্য ভিয়েৎনামী শিল্পীদের ভিতর প্রচলিত আছে। শরৎ বসন্তকালে 'সিংহ শোভাযাত্রা'র ভিতর দিয়ে আনন্দ ও আশার বাণীকে নৃত্যায়িত করার অনুষ্ঠানটি সেখানকার চাষীর উৎসবের অন্তর্গত বললেও চলে। আরেকটি জনপ্রিয় নৃত্য—'বালিকা বাজনা বাজায়'। এ নাচটি পুরুষ শিল্পীদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। এ নৃত্যের লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, পুরুষ শিল্পীরা দুবাই হোন আর বৃদ্ধই হোন যুবতী মেয়ের—মনোরম এবং সুন্দর ভঙ্গিগুলো অবিকল নৃত্যে রূপ দেন।

লোকনৃত্যের চর্চা ভিয়েৎনামের পার্বত্য অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। অবকাশ সময়ে বা ধর্মীয় উৎসবোপলক্ষে পার্বত্য অঞ্চলবাসিরা নৃত্য দর্শনে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের ছাপ বিভিন্ন লোকনৃত্যে দৃষ্ট হয়। যেমন caolan সম্প্রদায়ের প্রিয় নৃত্য, বানর নাচ, Ede সম্প্রদায়ের যেমন বর্শা নৃত্য, ইত্যাদি ইত্যাদি।

শোষিত, দরিদ্র অথচ সুস্থ শিল্প রসিক ভিয়েৎনামী কৃষক সম্প্রদায় আপনাদের স্বচেষ্টায় লোক-নৃত্যের চর্চা করে দেশ ও দেশবাসীর আনন্দ এবং গৌরব বাড়িয়েছেন। ১৯৪৫ সালের অগস্ট বিপ্লবের পর থেকে লোকনৃত্যের সুসংহতভাবে সমৃদ্ধিসাধন এবং নূতনভাবে জীবনদানের চেষ্টা পুরোদমে সুরু হয়েছে। ১৯৪৬ সালে যে দেশব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু হল হো চি মিনের নেতৃত্বে, তখন শহরের শিল্পীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে লোকনৃত্যে অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী হয়ে দেশের সর্বত্র জনগণের নিকট তা দেখাতে থাকলেন। ১৯৫০ সালে লোকনৃত্যের এক নূতন দিগন্ত দেখা দিল। কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকনৃত্য শিল্পীদের সংঘ তৈরী হল এবং সে সংঘগুলো দেশের লোক-নৃত্যের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন। সে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল দেখা দিল ১৯৫৪ সালে হ্যানয় শহরে সাংস্কৃতিক কর্মীদের মেলায়। সেখানে শহরবাসীরা নিজেদের দেশের লোকনৃত্যের এমন সুন্দর এবং জীবনসঞ্চারক পরিবেশনে মুগ্ধ হলেন। বাঁশ নৃত্য এবং পাখা নৃত্য আগের চাইতে অনেক বেশি উন্নত হয়েছে শিল্পী সংঘগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা। পুরানো লোকনৃত্যের ওপর ভিত্তি করে নূতন নূতন লোকনৃত্যের প্রচলন হয়েছে। যেমন 'Meo' সম্প্রদায়ের ছাতা নৃত্য, থাই সম্প্রদায়ের বাঘনৃত্য, Khmer সম্প্রদায়ের পদ্মনৃত্য ইত্যাদি আরো বহুরকম লোকনৃত্য। জনসৈনিকদের জন্য অবসর সময়ের নৃত্য, প্রেমিকের প্রেমপত্র নৃত্য, এমনি ধরনের নাচও খুব জনপ্রিয় সেখানে।

বিপ্লবের পরে উত্তর ভিয়েৎনামের লোকনৃত্য জাতীয় জীবনের আনন্দ ও প্রেরণার একটি মস্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সম্পদের ভিতর ভিয়েৎনামী জনগণের শিল্পপ্রীতি এবং জীবনীশক্তি প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়।

মঙ্গোলিয়া সাধারণতন্ত্রে নৃত্যগীত

গোপাল ভৌমিক

মঙ্গোলিয়া সাধারণতন্ত্র এশিয়ার অন্যতম রাষ্ট্র হলেও ভারতীয় জনসমাজে তার পরিচিতি বড় একটা নেই। তাই স্বাধীন সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে অবস্থিত। আয়তন প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। পীতকায় মঙ্গোল জাতি চীন বা জাপানীদের সমগোত্রীয় নয়। একদা যাযাবর প্রকৃতির এই জাতি যে ভাষায় কথা বলে তা তুর্কী ভাষাগোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত। মঙ্গোলিয়ার ভূ-প্রকৃতি পাহাড়-প্রধান এবং বিরাট তৃণাকল পরিবৃত। গো-মেষ অশ্বাদি পালন অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। এই রাজ্যের রাজধানীর নাম উলানবাটর। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্যে মঙ্গোলিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে এই রাজ্যটি দীর্ঘকাল চীনের অধীন ছিল। এখনও এই মঙ্গোলিয়া রাজ্যের একাংশ স্বায়ত্তশাসিত অন্তর্মঙ্গোলিয়া নামে চীনের অন্তর্ভুক্ত।

১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে কেরুলেন নদীর তীরে রচিত মঙ্গোল জাতির যে ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়েছে এবং যার নাম দেওয়া হয়েছে 'দি সিক্রেট হিস্ট্রি' বা 'গোপন পুরাণ' তার থেকে প্রাচীন মঙ্গোল জাতির সভ্যতা সংস্কৃতির বহু নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায়। মঙ্গোলদের জাতীয় নৃত্যগীতের দুটি অপরিহার্য অঙ্গ হল ড্রাম ও ঘুর নামক বাদ্যযন্ত্র। ঘুর চার তারের বাদ্যযন্ত্র—বাজাতে হয় ধনুকের মত একটা জিনিস দিয়ে। এই দুটি বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা ছাড়াও অন্যান্য অনেক বাদ্যযন্ত্রের চলন আছে গোপন পুরাণে। চেঙ্গিস খাঁ, কুবলাই খাঁ প্রমুখের মত রক্তপিপাসু মঙ্গোলাধিপতিগণ যে আবার নৃত্যগীত ও শিল্পকাব্যের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন তারও পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থ থেকে। তাঁদের রাজসভা নৃত্যগীতে মুখর হয়ে থাকত। সাধারণ জনসমাজেও ছিল নৃত্যগীতের অপরিসীম জনপ্রিয়তা।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে মঙ্গোলদের জাতীয় জীবনে নেমে আসে দুর্দৈব। তারা ক্রমশ বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী চীনের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং তার ফলে এই আদিম যাযাবর জাতির মুক্ত প্রাণের লীলা বহুলাংশে ব্যাহত হয়। তৎপূর্বে মঙ্গোলরা ছিল পৌত্তলিক শামানীতন্ত্রের উপাসক অর্থাৎ কুল-প্রধানদের পূজারী। তাদের নৃত্যগীতেরও মূল উৎস ছিল তাদের এই সহজাত ধর্মবোধ। অতি স্বাভাবিক-ভাবেই বৌদ্ধ লামাগণ এই ধরনের সহজ স্বাভাবিক নৃত্যগীতকে সুচক্ষে দেখেন নি এবং তাঁরা এই ধরনের নৃত্যকে বলতেন "অপবিত্র শামানীবাদীদের দানবীয় নৃত্য।" লামাদের প্রভাবে মঙ্গোলদের জাতীয় নৃত্য-গীত ধর্মমন্দির ও রাজসভা থেকে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় নেয় দূর পল্লীর অজ্ঞ নিরক্ষর মঙ্গোলদের মধ্যে। আর লামাদের উৎসাহে মঠ-মন্দিরে সুরু হয় বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের চর্চা। এই সময় চীনা ভাষা, তিব্বতী ভাষা, এমন কি ভারতীয় ভাষা থেকে বহু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, পঞ্চতন্ত্র, বত্রিশ সিংহাসনের কাহিনী প্রভৃতি মঙ্গোলীয় ভাষায় অনূদিত হয়। একযোগে চীন, তিব্বত ও ভারতের সঙ্গে মঙ্গোলিয়ার এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন এক স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। লামাদের প্রভাবে এই সময় চীনের নাটকলা ও নৃত্যশিল্পও মঙ্গোলিয়ায় প্রবর্তনের চেষ্টা চলে। কিন্তু এ চেষ্টা মূলত শহরাঞ্চলে নিবদ্ধ ছিল বলে মঙ্গোলিয়ার জাতীয় জীবনে তা গভীর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। জাতির এই পরাধীনতার দুর্দিনে মঙ্গোলিয়ার জাতীয় নৃত্যসঙ্গীতকে সেদিন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন পল্লীর শিল্পী ও চারণ কবিরা। তাঁরা ঘুর বাজিয়ে গ্রামে গ্রামে নৃত্য সহযোগে জাতীয় গাথা গেয়ে বেড়াতেন, গ্রামের মেলায় চারণ কবিরা মুখে মুখে জাতীয় গাথা রচনা করে পরাধীনতার গ্লানিতে ক্লান্ত জাতির জীবনে আনতেন আনন্দের জোয়ার। কোন কোন

চারণ কবি তাঁদের গাথা কাব্য রচনা করেই ক্ষান্ত হতেন না, তাকে রূপ দিতেন নাটকীয় ভঙ্গিতে। এমনই করে মঙ্গোলিয়ার জাতীয় নাটকেরও গোড়াপত্তন হয়েছিল সেদিন।

মঙ্গোলদের জাতীয় ইতিহাস "গোপন পুরাণে" বহু প্রকারের নৃত্য—এমন কি নৃত্যনাট্যেরও বর্ণনা আছে। সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজপ্রাসাদে এই ধরনের নৃত্যগীতের আয়োজন কি করে করা হত ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। শামানী ধর্মের বাসন্তজ উপলক্ষে এবং রাজপ্রাসাদে সম্রাটের সম্মুখে এই সব নৃত্যগীতের আয়োজন হত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মঙ্গোল রাজধানী দাদাতু শহরে মন্দিরে এবং রাজসভায় এমন নৃত্যানুষ্ঠানের বর্ণনাও আছে যাতে একযোগে ৩২০ জন নর্তক-নর্তকী অংশ গ্রহণ করত। বাদ্যযন্ত্রীও থাকত প্রায় সমসংখ্যক। আজকের দিনেও এত বড় অনুষ্ঠানের কথা কল্পনা করা সহজ নয়। নর্তকীরা যখন দেবীর সাজ পরে কামদেবতার নাচ নাচত, তখন শেষ মঙ্গোল সম্রাট টোগোনটেমুর তাদের সম্বন্ধে যে দুর্বলতার পরিচয় দিতেন তা দেখে পণ্ডিত কনফুসীয়সের মনে যে ঘৃণার উদ্রেক হত তারও উল্লেখ আছে এই "গোপন পুরাণে"। নর্তক-নর্তকীরা বৌদ্ধ-ধর্মের নানা দেবদেবীর মুখোস পরে নাচত, পরম কারুণিক বোধিসত্ত্বের রূপও তারা পরিগ্রহ করত। বর্ণিত নৃত্যগুলির মধ্যে আছে "চিরযৌবন ও স্বাস্থ্য"; একযোগে ৩০টি সুন্দরী তরুণী মনোমুগ্ধকর রেশমী পোশাক পরে এই নাচ নাচত। আর একটি নাচ "শান্তি ও সমৃদ্ধি"—এতে সোনাবরা সূর্য ও রৌপ্যভ্রাবী চাঁদের প্রতীক সাতটি নর্তকী তরুণী অংশ গ্রহণ করত। আর একটি নাচ ছিল রিংড্যান্স বা চক্রাকারে নাচ; এতে অংশ গ্রহণ করত নয়টি তরুণী কালো-লাল উঁচু স্কার্ট এবং নীল হাতাবিহীন ব্লাউজ পরে। "গোপন পুরাণে" বর্ণিত এই সব নাচ বর্তমান মঙ্গোলিয়ায়ও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে একযোগে ৩২০টি বাদ্যযন্ত্রসহ ৩২০ জন নর্তক-নর্তকীর অপূর্ব নৃত্যের যে বর্ণনা "গোপন পুরাণে" দেওয়া হয়েছে, বাস্তবে সেইরূপ নৃত্যানুষ্ঠান করা আজও সম্ভব হয় নি। তবে এবিষয়ে পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাদ্যযন্ত্রাদির যে রূপ বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে, তাতে আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে কোনদিন কেউ হয়তো বাস্তবে এই নৃত্যানুষ্ঠান সম্ভব করেও তুলতে পারেন।

মঙ্গোলিয়ার পাখী ও জীবজন্তু সম্পর্কিত অন্ত কয়েকটি নৃত্যও খুব প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। এ নৃত্যগুলিও যুগপরম্পরায় লোকনৃত্যের ধারা বেয়ে এসেছে। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ময়ূর নৃত্য, সারস নৃত্য, তিত্তির নৃত্য, হরিণ নৃত্য, কাক নৃত্য এবং পক্ষীরাজ গরুড় নৃত্য প্রভৃতি। ক্রেন নৃত্য নামক একটি নৃত্যে দেখা যায় যে একদল লাজুক ও ভীরু নারী ঘুঘু পাখীর ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তাদের ঘিরে ঘিরে নাচে, বাজপাখীর ভূমিকা গ্রহণকারী একজন নর্তক। ভীরু ঘুঘুপাখীরা বাজপাখীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে উদ্বিগ্ন। দ্রুত তালে নিষ্পন্ন হরিণ নৃত্যটিও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। পক্ষীরাজ গরুড় ছিল একসময়ে মঙ্গোল রাজদরবারের প্রতীকবিশেষ। তাই গরুড় নৃত্যটিকে মঙ্গোলিয়-বাসীরা বরাবরই শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছে। এই ধরনের নৃত্যগুলি প্রায়শ লোকনৃত্য থেকে উদ্ভূত বলে এগুলির মধ্যে কখনও নৈপুণ্য হয়তো সে পরিমাণে পাওয়া যায় না। তবে যা পাওয়া যায় সেটা হল জাতির ঐতিহ্যপ্রিয়তা এবং তার প্রাণসম্পদের পরিচয়। সেদিন থেকে এই নৃত্যগুলি অপূর্ব। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর কয়েক বৎসর পূর্বে মঙ্গোলিয়ার একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল ভারতে এসে তাঁদের জাতীয় নৃত্যগীত পরিবেশন করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের সে প্রয়াস সারা ভারতের কলামোদী জনসমাজের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিল। তিন শ বৎসরের পরাধীনতার শেষে মঙ্গোলিয়া যে আবার নতুন করে নিজেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করছে, এই নৃত্যগীতের মধ্যে আমরা তারই পরিচয় পাই।

ফিলিপাইনের নৃত্যশিল্প

মনোরঞ্জন জানা

ফিলিপাইনের নৃত্যশিল্পকে প্রধানতঃ চারটি ভাগে ভাগ করা যায়: স্প্যানিশ, স্বদেশীয়, প্রাচীন ও মুসলিম। প্রথমটি শহরে, দ্বিতীয়টি ফিলিপাইনের গ্রামে গ্রামে, তৃতীয় নাচটি উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে ও শেষেরটি দক্ষিণের দ্বীপগুলিতে প্রচলিত।

যদিও স্পেনের সংস্কৃতি তথা নৃত্যপদ্ধতির প্রভাব পড়েছে এখানে তবুও দ্বীপগুলি স্পেনের অধিকারে যাবার পূর্বে যে সব নাচের প্রচলন ছিল তাদেরই এদেশের খাঁটি নাচ বলা চলে। ফিলিপাইনের উল্লেখযোগ্য লোকনৃত্য হল বিন্সান্ ধাতি নাচ ও টীনিকলিং নাচ। প্রথমটিতে নর্তক অথবা নর্তকী মাথায় জলন্ত বাতি নিয়ে এমনভাবে করতালি ও বাঁটারের তালে তালে নাচতে থাকে যে একটি বাতিও নেভে না বা পড়ে যায় না। দ্বিতীয় নাচটির ক্ষেত্রে চারটি লম্বা বাঁশ আড়াআড়ি ভাবে থাকে চারজনে, বাজনার তালে তালে তারা পরস্পরের নিকটস্থ হয়, আবার সরে যায়। মূল নর্তক চারটি বাঁশের মধ্যে চৌকো স্থানটিতে একপায়ে লাফিয়ে প্রবেশ করে ও বেরিয়ে আসে এবং তারই মধ্যে নানা মুদ্রা প্রদর্শন করে। তালে একটু ভুল হলেই দুটি আড়াআড়ি বাঁশের চাপে নর্তকের পায়ের গোড়ালি ভেঙে যাবার উপক্রম হয়। প্রধানতঃ Leonor Orosagoquingco-এর প্রেরণায় ফিলিপাইনের লোকনৃত্যকলার উপাদানগুলিকে সংগ্রথিত করে জাতীয় নৃত্যকলার চরিত্র দান করার একটা আন্দোলন সম্প্রতি সুরু হয়েছে।

উত্তর লুজনের পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাত্রার অঙ্গরূপে বহুপ্রকার নৃত্যের প্রচলন আছে। তারা বিবাহ, যুদ্ধযাত্রা, মস্তকশিকার, মৃত্যু, ফসলতোলা, এবং বীজ বোনা উপলক্ষ্যে নেচে থাকে। এখন 'মস্তক শিকার' নাচে মানুষের কাটা মুণ্ড থাকে না, থাকে গাছের ফল। তাদের কাছে নাচ হল এক ধরনের ওষুধ, যদি অন্য কোন উপায়ে রোগ না সারে তবে নেচে রোগ সারাতে হবে—এই তাদের বিশ্বাস।

আশ্চর্যের বিষয় এশিয়ার আরব রাজ্য ও অন্যান্য দেশগুলিতে যেখানে মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে নৃত্যশিল্পের অবনতি ঘটেছে, সেখানে ফিলিপাইনের মুসলমানদের মধ্যে এই শিল্পটির বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়। অবশ্য ইন্দোনেশিয়া এর ব্যতিক্রম কিন্তু সেখানে হিন্দু সংস্কৃতিই প্রবল, একথা স্মরণে রাখতে হবে।

বহু দ্বীপের সমবায়ে গঠিত এই ফিলিপাইন, প্রতিটি অঞ্চলেই নৃত্যশিল্প এক একটি বিশিষ্ট আঙ্গিকে বিকশিত হয়ে উঠেছে। দ্বীপময় রাজ্যের মানুষগুলি নাচে কেবল অপরকে আনন্দ দিতে নয়, নিজেকেও একটা অপরূপের রাজ্যে নিয়ে যাবার জন্যে। সেখানে জীবনের অনেকখানিই সুন্দর, সুখদ এবং প্রীতিপদ।

ইন্দোনেশিয়ার নৃত্যকলা

শিবেন্দু মান্না

অপরূপ বৈচিত্র্যের দেশ ইন্দোনেশিয়া—হাজার হাজার দ্বীপ ছড়িয়ে আছে সমুদ্রে—এখানের আট কোটি অধিবাসী দুশো রকমের ভাষা ও উপভাষায় কথা বলে—এরা ধর্মে প্রধানতঃ মুসলমান কিন্তু ভারতের বাইরে এখানেই উজ্জ্বলরূপে বিরাজমান হিন্দুসংস্কৃতি।

নৃত্যকলার দিক থেকে পৃথিবীর আর কোন দেশ এত রোমাঞ্চকর নয়। একটি মানুষ সারাজীবন ধরে অন্বেষণ করলেও এদেশের সংখ্যাতীত নৃত্যকলার সন্ধান পাবেন না। আনন্দের বিষয় পারমাণবিক যুগেও ইন্দোনেশিয়ার নৃত্যকলা বৈদেশিক প্রভাববর্জিত। উদ্ভাবনী শক্তি এবং আঙ্গিকের উৎকর্ষতার দিক দিয়ে এখানের নৃত্যকলার মান অত্যন্ত উঁচু। আমরা ভারতবর্ষে শিবকে দেবতারূপে আরাধনা করি আর ওখানের মানুষ নৃত্যের সাধনায় মহাকালের পদতল স্পর্শ করে—তাদের চেতনায় বিরাজ করেন দেবাদিদেব। নৃত্যকলা এখানে অমূল্য সম্পদরূপে রক্ষিত, এই শিল্পটিকে ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীরা বলে তাদের জাতীয় আত্মা।

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী থেকে নৃত্যের বিষয়বস্তু চয়ন করা হয়।

সুন্দ অঞ্চলের বিখ্যাত নৃত্য হল Tari Topeng বা মুখোশ নৃত্য। সুমাত্রা অঞ্চলে যতগুলি কুমারী ততগুলি নর্তকী অর্থাৎ ওদেশে প্রতিটি মেয়েকে নাচ শিখতে হয় এবং বিবাহের অনুষ্ঠানে নাচতে হয়। এখানের Gending Sri Vijaya নাচ অত্যন্ত উপভোগ্য।

লাবণ্য, কমনীয়তা এবং মাধুর্য হল এদের নাচের মূল কথা। শরীরের নমনীয় ছন্দ—দীর্ঘ অঙ্গ সঞ্চালন—সমস্তই শান্ত অথচ অতলস্পর্শী নৃত্যরূপের ঐশ্বর্য সমুদ্রে এনে দেয়।

দ্বীপ নৃত্য, রেকাবি নৃত্য এবং রুমাল নৃত্য সুমাত্রায় বহুল প্রচলিত। বাটক নৃত্য ও পুলাউ পুত্রি নৃত্য অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেলিবিস দ্বীপে লোকনৃত্য প্রভাবান্বিত Pajaga ও Pakarena নৃত্য দুটি অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছে। বোর্ণিওর নৃত্যকলা দুটি ভাগে বিভক্ত: একটি সামাজিক নৃত্য, অপরটি আদিবাসীদের নৃত্য।

বস্তুতঃ ইন্দোনেশিয়ার প্রতিটি দ্বীপেই সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ এবং উৎসবের জন্য বিভিন্ন ধরনের নাচ প্রচলিত আছে। সুমার মানুষরা নাচে অশ্ব-নাচ, ফ্লোরেসের মানুষ নাচের মধ্যে যুদ্ধযাত্রা করে, নিয়াস দ্বীপের বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নৃত্য করে বৃহৎ সোনাকার পাথরের ওপর।

বালী দ্বীপের নৃত্য ব্যতীত ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নৃত্যানুষ্ঠান চলে জাকার্তা এবং মধ্য জাভার সোলোতে। Penchak অথবা Silat নৃত্যের অনন্যসাধারণ কলাকৌশল অন্যত্র দুর্লভ।

বালী দ্বীপের নাচ পৃথিবীবিখ্যাত। এর সৌন্দর্যের তুলনা নেই। বলতে কি এইখানেই হিন্দু সংস্কৃতি অপরূপ উৎকর্ষতা লাভ করেছে, আবার এইখানেই তার বিস্তার সম্পূর্ণ। এখানের প্রতিটি গ্রামে শিল্পী-সংঘ বিদ্যমান। এদের সৃষ্টি প্রতিভা বিস্ময়কর; কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করবার যে, এরা কখনো নিজেদের ঐতিহ্য বিস্মৃত হয় না বা শিল্পের মূল তত্ত্ব অস্বীকার করে উদ্ভট কিছু করে বসে না নতুনের নামে। নূতন প্রতিভার সমাদর এখানের সর্বত্র। নূতন ধারায় নৃত্যকলা প্রচলিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে পুরাতন ধারার নৃত্যকলা অবলুপ্ত হয়ে যাও। এইভাবে বহু নৃত্যকলা চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে।

বালী দ্বীপের অধিবাসীরা কাজ করে বাঁচবার জন্যে, আর নৃত্য করে জীবনে সমৃদ্ধি ও পূর্ণতা আনার জন্যে।

একটি নিষিদ্ধ দেশের নৃত্যকলা : তিব্বত

মণিপদ্ম

তিব্বতের সংস্কৃতিতে বিমিশ্রধারার সম্মিলন দেখা যায়। তিব্বত বৌদ্ধপ্রধান দেশ; কিন্তু ইসলাম ধর্মী লোকও সেখানে বসবাস করে। প্রাচীন তিব্বতীরা রসপ্রিয় জাতি; কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিক জীবনধারায় তাদের জীবনে সে রসনীতি আর কার্যকরী নয়। তিব্বতের একচ্ছত্র রাজতন্ত্র বিনষ্ট হয় খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মাঝামাঝি। অবিরত গৃহযুদ্ধের ফলে ছোট ছোট রাজতন্ত্র গড়ে ওঠে। তারপর মোঙ্গল শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে ছোট ছোট সামন্ত শ্রেণীর অভিজাত পরিচয় এবং মঠের অধ্যক্ষদের শাসনে তিব্বত শাসিত হতে থাকে। চীনের মিঙ্ রাজবংশের অনুশাসনের ফলে তখনই লামার সর্বাধ্যক্ষতা গড়ে ওঠে। একদিকে অভিজাত সম্প্রদায়ের লামা, অপরদিকে গরিব কৃষক ও শ্রমিক। দুইটি ভিন্নপন্থী জীবন-ধারার প্রবাহ তিব্বতে। বর্তমানের তিব্বতীয় কথা সকলেরই জানা।

তিব্বতের মানুষ ধর্মপ্রিয়—মঠের বড় বড় ঢাকের বাদ্য আর শিঙার শব্দ তাদের জীবনকে উদ্বুদ্ধ করে। পথের আশেপাশে মণি-স্তেউল তার গায়ে উৎকীর্ণ 'ওঁ মণিপদ্মে হুং'—একটি আধ্যাত্মিক চেতনায় উজ্জ্বল।

তিব্বতের শিল্পাভ্যাসে তাদের জীবনের সুকুমার বৃত্তির পরিস্ফুরণ। তাদের শিল্পে দুটি ভাগ। একটি ধর্মীয় শিল্প এবং অপরটি লোকশিল্প। সাহিত্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ভাবধারা সংমিশ্রিত; বিশেষ করে বৌদ্ধ-সাহিত্যের প্রভাব। কিছু কিছু মৌলিক সাহিত্যও অবশ্য আছে। কাব্য-সাহিত্যে শুধুমাত্র গীতি সাহিত্যের অনুসরণ। তাদের লোক-গীতি সাধারণ তিব্বতী মানুষের প্রাণের উচ্ছ্বাস—জীবনধারার সহজ সরল প্রকাশ।

নাচ-গানের মধ্যে প্রাচীন ভারতের নৃত্যভঙ্গিমা এবং গীতকলার স্পর্শ। নাচে ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং লৌকিক জীবনের প্রভাব।

তিব্বতের অধিবাসিগণ উৎসবপ্রিয়। নববর্ষ, বিবাহ, জন্মোৎসব,—এই সব সামাজিক অনুষ্ঠান-গুলিতে খাওয়া-দাওয়া সাজ-পোশাকের জাঁকজমক এবং নাচগান লেগেই থাকে।

তিব্বতী-নাচের ভেতর প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের স্পর্শকে খুঁজে পাওয়া যায়। ধর্মীয় সংস্কৃতির নৃত্যে বুদ্ধদেবের সঙ্গে মারের যুদ্ধ ভারতীয় নৃত্যের কিছুটা অনুরূপ। তাছাড়া কঙ্কাল নৃত্যের বিভীষিকা আর নানা আখ্যান বস্তুকে কেন্দ্র করে নৃত্যনাট্য ভারতীয় নৃত্যধারার অনুরূপ। এই নাচ সময় সময় সঙ্ঘনৃত্য; কখনো বা একক।

ধর্মীয় নৃত্য ছাড়া লোকনৃত্য তিব্বতীদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে বিকশিত। 'হলযোগর', 'ইয়াক'—এই সব নাচ সাধারণ মানুষের জীবন-দুঃখের স্তোত্রবায় ছন্দিত। মেয়ে-পুরুষ পাশাপাশি নাচে—সে নাচ সরল, সহজ, স্বাভাবিক। এই নাচ পথে-ঘাটে, উৎসবে-ব্যসনে স্বতঃস্ফূর্ত। বৌদ্ধমঠের ভেতরেও লোকনৃত্যের প্রচলন দেখা যায়। তবে সেখানে নারী-পুরুষের মিলিত নৃত্য চলে না।

নৃত্যের সঙ্গে বাজে শিঙা, ঢাক, ঢোল, পটহ, বড় বড় করতাল। বেশ-ভূষাও চমৎকার অথচ সাধারণ।

নৃত্যশিল্প তিব্বতীদের জীবনের সুকুমার বৃত্তিরই প্রকাশ। কালের ইতিহাসে তিব্বতেও বিবর্তনবাদ অবশ্যম্ভাবী—তবে সংস্কৃতির ধারায় তিব্বতের ধর্ম এবং লৌকিক জীবনের নাচের স্পর্শ বেঁচে থাকবে—এ ধারণা বোধ হয় মিথ্যে নয়।

মালয়ের সংকর নৃত্যকলা

মাধব মেনন

মালয় সম্পর্কে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, মূলতঃ মালয়বাসী অর্থাৎ যাদের থেকে মালয় নামটির উদ্ভব হয়েছে, নিজদেশে সংখ্যালঘু। সেখানে ব্রিটিশ আছেন, চীনা আছেন, ভারতবাসী আছেন। ফলে সেখানকার জীবনযাত্রা একটা হ-য-ব-র-ল গোছের। স্বদেশীয় কিছু থাকলেও আড়ালে পড়ে আছে। সব কিছু সংকর অর্থাৎ পাঁচমিশেলি। ব্রিটিশরা যেখানেই কলোনী বসিয়েছে, সেখানেই স্বদেশীয় কোন কিছু মূলসত্তা নিয়ে থাকতে পারেনি। তেমনি হয়েছিল মালয়ে। কিন্তু যখন চীনবাসীরা সেখানে প্রবেশ করতে লাগলেন, সংগে নিয়ে এলেন নিজদেশের পরম সম্পদগুলো। নাটক, সংগীত এবং নৃত্য। ফলে মালয়ের নিজত্বকে স্পষ্ট করার চেষ্টা হল। ভারতবাসীরাও চীনাদের সংগে যোগ দিলেন, স্বাভাবিক কারণে, চীন ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতির অবশ্যম্ভাবী প্রভাব এসে মালয় দেশের মূল সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করল। মুসলমানদের প্রভাবও পরবর্তীকালে পড়েছে। কালের গতিতে ব্রিটিশ প্রভাবও এড়ানো গেল না।

তবে মূল মালয়বাসীর কিছু কিছু লোকনৃত্যও মালয়ের উত্তর প্রান্তে দেখা যায়। সিঙ্গাপুর থেকে অনতিদূরে মালাক্কা জায়গাটি সর্বপ্রথম বহিরাগতদের কবলে পড়েছিল। হিন্দু, আরব, পর্তুগীজ এবং ইংরেজ প্রভৃতির কালে। সেখানকার লোকনৃত্য Donang Sayan আস্তে আস্তে মিশ্রণের ছাঁচে গড়া হয়ে গেছে। কিছুটা আরবের, কিছুটা পর্তুগালের, আবার কিছুটা ইংরেজের প্রভাবে মিশ্রিত। এ নাচ সাধারণতঃ দু'জোড়া দম্পতির দ্বারা সম্পাদিত হয়। এখানকার আরেকটি নাচ Donak Donay অর্থাৎ যুদ্ধ নৃত্য। এ নাচ কতকগুলো যুবকের হাতাহাতি প্রদর্শনের ভিতর দিয়ে রূপ পায়।

ভারতবর্ষ থেকে কতকগুলো নাচ মালয়ে প্রচলিত হয়েছে। সবগুলো ধর্মীয় নাচ। বেশির ভাগ ধর্মীয় নাচ মুখোশের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়। এ ধরনের নাচের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, উষাকাল থেকে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। আবার দক্ষিণ শ্যাম থেকে আমদানি করা 'Mendra dance' এরকমভাবে সম্পন্ন হয়। এ নাচে পুরুষেরা নাচেন। তারা মেয়েদের মত সাজ নেন। এ নৃত্যে যারা থাকেন তারা উন্মত্তের মত নাচেন এবং তারা নিজেরা জানেন না তারা কী করছেন। Puten নাচ মালয়ের সম্পূর্ণ নিজস্ব। সেখানে বালকী মেয়েরাই অংশগ্রহণ করেন। এ ধরনের নাচ উৎসবেই চলে। যারা এ ধরনের নাচ দেখতে আশে-পাশে থাকেন, এক সময় দেখা যায় তাদের অনেকেই নৃত্যকুশলীদের সংগে যোগ দিয়েছেন। সেই উন্মত্ত অবস্থা, বেহুঁস। এ এক অদ্ভুত নাচ।

মালয়ের নাচ সম্পর্কে মোদ্দা কথা,—সেখানকার যা নেটিভ খাঁটি ছিল, তা এখন পাঁচ জাতির কাছ থেকে ধৈর্যলা গ্রহণ করতে করতে এক সংকর অবস্থায় পরিণত হয়েছে। মালয়ের নিজস্ব বলতে কিছুই রইল না বলা চলে।

শারদীয় সম্ভাষণী

কেশরঞ্জন

কবিরাজ এস. এন. সেন এণ্ড কোং
কেশতৈল নির্মাতৃগণ
কলিকাতা-১

কাম্বোডিয়ার নৃত্যকলা

জ্যোৎস্না মাইতি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূমিপ্রদেশ কাম্বোডিয়া শত শত বৎসর ধরে নৃত্যকলার প্রতীকী ভাষায় সুন্দরের আরাধনা করে এসেছে। ফরাসী আধিপত্যের পর থেকেই এদেশের অপরূপ নৃত্যকলার সংবাদ পাশ্চাত্য জগতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ফ্রান্সের মত বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীও বলে ওঠেন, এদের চিরায়ত শিল্প-সাহিত্য আমাদের চেয়েও মহৎ। মানব প্রকৃতিতে এর চেয়ে উচ্চতর, এর চেয়ে পরিপূর্ণ কোন কিছুর সন্ধান পাওয়া অসম্ভব···এরা এমন সব ভঙ্গীর সন্ধান পেয়েছে যা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, এদের গতি-ভঙ্গিমা আমাদের দেশে প্রাচীনকালেও ছিল অজানা।

বস্তুতঃ আঙ্কোরের বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপ কীর্তিতে উৎকীর্ণ নারীমূর্তিতে যে সব মুদ্রা এবং কাহিনী রূপায়িত তা অতুলনীয় এবং আজকের নৃত্যকলাকে সেই ভাস্কর্য-শিল্পের সঙ্গেই মিলিয়ে নিয়ে বুঝতে হবে। অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে শত শত বৎসর ধরে এখানের নৃত্যশিল্প নিশ্চল হয়ে আছে।

এশিয়ার কয়েকটি দেশের মত রাজপ্রাসাদেই কাম্বোডিয়ার নৃত্যকলার বিকাশ ও বিবর্তন সাধিত হয়েছে। এখানে Royal Khmer Palace-এর নৃত্যশিল্পীরা বিশ্বের অন্যতম নিপুণ সম্প্রদায়রূপে প্রশংসিত; তারা মুক্তা পান্না খচিত এদের স্বর্ণালঙ্কার, শিরস্ত্রাণ, জেলভেট এবং স্বর্ণসূত্রের সাজসজ্জা লক্ষ্য করার মতো। শৈশবকাল থেকে এখানের শিল্পীরা কঠোর সাধনায় আয়ত্ত করেন নাচের মুদ্রা, এদের জীবনযাপন পদ্ধতি একই ছন্দে বাঁধা, প্রচলিত অনুশাসনের বাইরে যাবার উপায় নেই। এখানের প্রচলিত সংস্কার এই যে শিল্পী-মনের দ্বারা শিল্প প্রভাবিত হয়। কাজেই সুন্দরের আরাধনা করতে হলে পবিত্র-ভাবে জীবনযাপন অবশ্যই করতে হবে।

নর্তক-নর্তকীর অঙ্গসঞ্চালন এবং হাতের মুদ্রার দ্বারা সাধারণতঃ কোন কাহিনী রূপায়িত হয়। এখানেও হিন্দু সংস্কৃতি বর্তমান। রামায়ণের ঘটনা, হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী বা বৌদ্ধ কথা থেকে নাচের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়।

রাজপ্রাসাদের বাইরে কাম্বোডিয়ার যে বৃহৎ জনজীবন সেখানেও নানাপ্রকার নাচের প্রচলন আছে। তবে Lamthong-এর চেয়ে প্রাচীন লোকনৃত্যের বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না। পূজাপার্বণে এরা শিকার নৃত্যটি খুবই উপভোগ করে।

রাজনীতির অশান্ত আবহাওয়া প্রায় দূর হয়ে গেছে, আশা করা যায় কাম্বোডিয়ার সাধারণ মানুষের অঙ্গন এবং রাজপ্রাসাদের নৃত্যশালা আবার রূপময় নৃত্যানুষ্ঠানে মুখরিত হয়ে উঠবে।

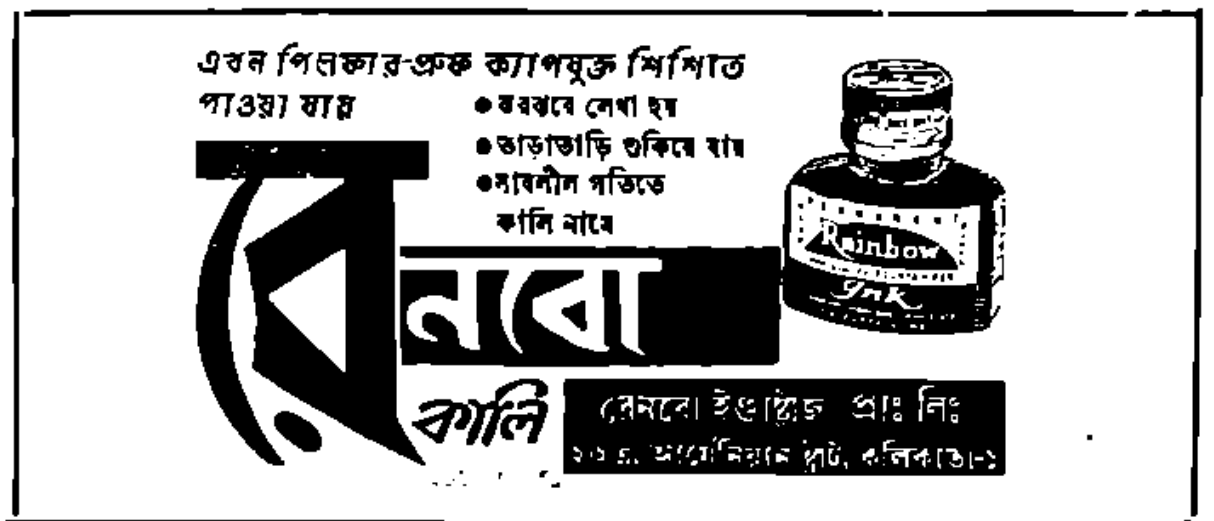

গল্পভারতী

দীপালী সংখ্যা—১৩৫৮

সম্পাদক :

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ
২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ,
কলিকাতা—৬

মূল্য—এক টাকা

সহঃ সম্পাদক——শ্রীকল্যাণ রায়

শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতাস্থিত, ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

.....কেশ পড়িলে টনিক কেশে?

সাদা চুলকে চিরস্থায়ী কালো ক'রতে—অদ্বিতীয়—

সোল এজেন্ট :এম, এম, খাম্বাটওয়ালা, আমেদাবাদ

এজেন্ট :—শা বত্তিশী এণ্ড কোং
১২৯ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

সোল এজেন্টস্ :—
এম. এম. খাম্বাটওয়ালা
আমেদাবাদ—১

এজেন্ট :—
শাহ বাত্তিশী এণ্ড কোং
১২৯, রাধাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১

ফোন :- ২২-১০১৮

বাৎসরিক মেলায়

"সেদিন সালেমের মেলায় এমন চমৎকার একখানা শাড়ী দেখে এসেছি। সুন্দরী পসারিণী গর্ব্বভরে বলছিলো-যে সেই মনোহর শাড়ীটি নাকি ওরই তাঁতে তৈরী।"

তামিল পল্লীগীতি

হাতের তাঁতের বস্ত্রসামগ্রী

একটি জাতীর ঐতিহ্য

DA 61-329 (Beng.)

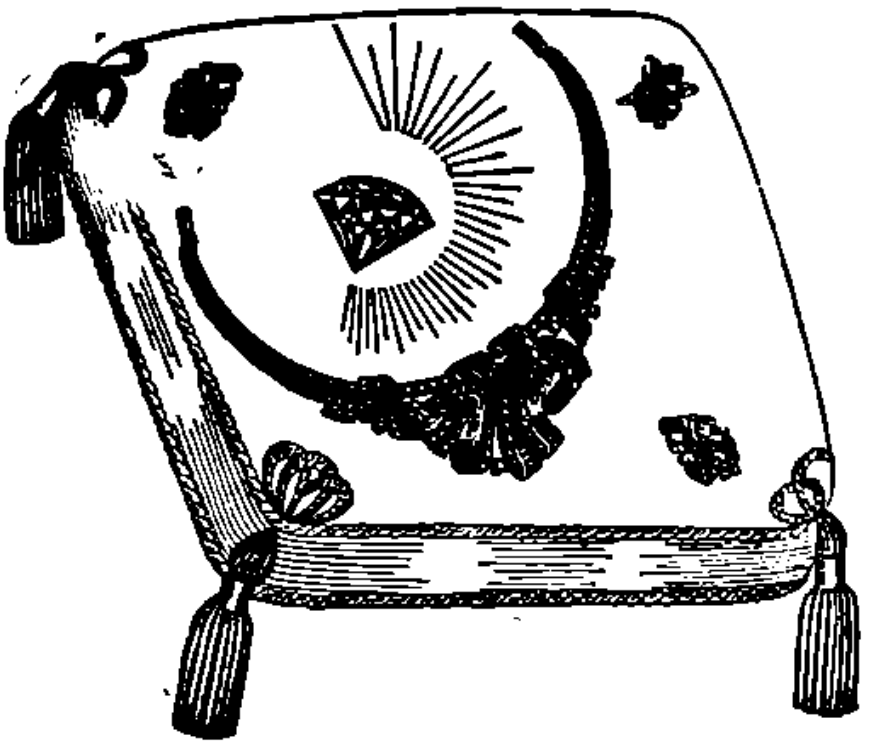

আধুনিকতম রুচির সর্ব্বপ্রকার স্বর্ণ-অলঙ্কার, মণি, মুক্তা, হীরা,
জহরত প্রভৃতির অপূর্ব্ব সম্ভার।
বিবাহ ও উৎসব অনুষ্ঠানে প্রিয়জনকে উপহার দিবার
নানাপ্রকার অভিনব ও চিত্তাকর্ষক অলঙ্কার।

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড জায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

স্থাপিত ১৮৮২

১-এ, বেন্টিক ষ্ট্রীট (মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস্), কলিকাতা।

ফোন : ২২-২২৭০

ব্রাঞ্চ :—৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন : ৪৭-১২৫৮

গল্প-ভারতী
সপ্তদশ বর্ষ, দীপালী সংখ্যা
কার্ত্তিক—১৩৬৮

সম্পাদকীয়

গল্প-ভারতীর শুভার্থী বন্ধুদের, সহকর্মীদের এবং গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকদের সবাইকে বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশা করছি আগামী দিনে তাঁদের সবার ঐকান্তিক সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা নিয়ে আমরা আমাদের কর্মপথে এগিয়ে চলতে পারব।

দীপান্বিতায় বিরহ কীর্ত্তন

কীর্ত্তন বলতেই বৈষ্ণব-পদাবলীর 'সখি! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' মনে পড়ে কিন্তু ভোলা উচিত নয় শাক্ত-বাংলার মাতাল "শ্যামা-সঙ্গীত"। আমরাও ছেলেবেলায় শুনেছি শিবপুর থেকে শাক্ত গাইয়ে দল চলত কালীঘাট—ভবানীপুরের দলের সঙ্গে গানের লড়াই করতে। শিবপুরের প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ৺নিকুঞ্জ বক্স মুখ করতেন আমাদের—

শ্মশান ভালোবাসিস বলে
শ্মশান করেছি হৃদি
শ্মশানবাসিনী শ্যামা
নাচবি বলে নিরবধি।

এ-গানের তর্জ হয়ত হয়েছে পুরাতন কিন্তু সুরের ঝঙ্কার এখনো কানে বাজে।

ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ

ঘাটশীলার নিষ্ঠুর ট্রেন দুর্ঘটনার ফলে কত নরনারী মরল। তার মধ্যে আমার প্রিয় বন্ধু বিরজাশঙ্কর গুহ ঘাটশিলা কুটীরের কাছে বিজয়া দশমীর রাতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর নৃতত্ত্ব (Anthropology) বিজ্ঞানে অধিকার ও মৌলিকতা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁর রচনাবলী Harvard বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Berlin

Zurich London Paris ও UNESCOর পণ্ডিত মহলে যোগ্য প্রশংসা পেয়েছে। আসাম—বিহার বাংলা থেকে সুরু করে মহীশূর কোচিন ত্রিবাঙ্কুর পর্য্যন্ত যত আদিবাসী আছে তাদের সম্বন্ধে ডাঃ গুহ শেষদিন পর্য্যন্ত যা লিখে গেছেন তার সবই মূল্যবান তথ্য ও ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। কিন্তু বিজয়ার সময় এমন নিদারুণ বিদায় বন্ধু বিরজাশঙ্কর নেবেন তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তাঁর পত্নী ও পুত্রকন্যাদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। ডাঃ গুহের বহু রচনা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, সব একত্রে ছাপান উচিত—তবেই তাঁর নাম থাকবে!

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রবীণ অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র বহুকাল রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর তিরোধানে 'গল্প-ভারতী'র একজন হিতাকাঙ্ক্ষীকে হারালাম। খগেনবাবু ছিলেন দক্ষ ছোট গল্প' লেখক। খগেন্দ্রবাবু যতদিন পেরেছেন তাঁর অতি প্রিয় 'বৈষ্ণব পদাবলী' দিব্যকণ্ঠে পরিবেশন করে গেছেন। নাটোরের মহারাজার বন্ধুরূপে তাঁকে দেখেছি একসঙ্গে সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চ্চা করতে। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' যুগলে সে যুগের কথা অনেক মিলবে। মিত্র-পরিবারের সবাইকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাই। খগেনবাবু সৌভাগ্যক্রমে বৈষ্ণব পণ্ডিত-কীর্ত্তনিয়ার নাম রেখে গেছেন "পদরত্নাবলী" ৪র্থ খণ্ডে প্রকাশ করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের 'রামতনু অধ্যাপক' মিত্র মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করবেন। তাঁর ভাবদীপ্ত মধুর কীর্ত্তন এখনো যেন কানে শুনছি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সভার তাঁর বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব আছে তাদের স্মরণ করাই।

অধ্যাপক ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসু

তরুণের মৃত্যু আরো শোচনীয়। আমাদের সহকর্ম্মী অধ্যাপক অতীন্দ্রনাথ বসু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিশেষ করে অর্থনীতি নিয়ে বহু মূল্যবান রচনা রেখে গেছেন। আবার রাজনৈতিক প্রগতিবাদী দলের নেতারূপে বাংলায় ও দিল্লীতে তিনি সুনাম অর্জ্জন করেন। বিদায়ে এবার বিশিষ্ট এক বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার মধ্যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ডাঃ অতীন বসু হাসপাতালে যান। সেখানেই অস্ত্রোপচারের ফলে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। তাঁর আত্মীয় পরিজনদের কাছে আমাদের সমবেদনা জানালাম। তাঁর ছাত্রদের অনুরোধ করি তাঁর সুচিন্তিত রচনাগুলি সংগ্রহ করে এক খণ্ডে প্রকাশ করুন।

॥ শক্তি-সাধনা ও মনুষ্যত্ব ॥

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

গীতার 'বিশ্বরূপ-দর্শন' অধ্যায়ে শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন—'আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল, সম্প্রতি লোকসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি'। এই যে অনন্ত, অজের মহাকাল ইনিই মহাভারতের নায়করূপে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার ধ্বংস সাধন করিয়া কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনকে এক ভয়সঙ্কুল মহা-শ্মশানে পরিণত করিয়াছিলেন। এই মহাকালই স্থাবর, জঙ্গম ও ভূতসমূহকে ধ্বংস করিয়া প্রতি মুহূর্তে বিশ্বকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। অর্জুন ভগবানের কালানলসদৃশ দংষ্ট্রাকরাল মুখসমূহ দর্শন করিয়া সভয়ে সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন—'যেমন নদীসমূহের নানা জলধারা সমুদ্রের দিকে প্রধাবিত হইয়া সমুদ্রেই বিলীন হয়, সেইরূপ এই বীরপুরুষেরা আপনার সর্ব্বত্র দীপ্যমান মুখ-বিবরে প্রবিষ্ট হইতেছেন। পতঙ্গেরা যেরূপ ক্ষিপ্র গতিতে মৃত্যুর জন্যই দীপ্যমান অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই লোকসমূহ মরণের জন্যই দ্রুতগতিতে আপনার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছেন'।

এই মহাকাল রুদ্ররূপে আমাদের নিকট আবির্ভূত হন। অথচ তিনি শিব অর্থাৎ কল্যাণের নিদান। আবার তিনিই সর্ব্বধ্বংসী, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

তিনি এই সর্ব্বধ্বংসী মহাকালকেও গ্রাস করেন, তিনিই কালী। তিনিই মৃত্যুরূপা, আবার তিনিই মাতৃরূপা। শ্মশানবাসিনী তিনি,—যে হৃদয় শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, যে হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা ধ্বস্ত হইয়াছে, সেই হৃদয়েই তিনি নৃত্য করেন। সাধক কবি গাহিয়াছেন—

'শ্মশান ভালোবাসিস্ বলে
শ্মশান করেছি হৃদি,
শ্মশানবাসিনী শ্যামা
নাচ্‌বে বলে নিরবধি।'

স্বামী বিবেকানন্দও 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতায় লিখিয়াছেন—

'চূর্ণ হোক্ স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।'

'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র মন্বন্তরে বিধ্বস্ত, শ্মশানে পরিণত বাংলার মধ্যে কালীমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

'কালী—অন্ধকার-সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃত-সর্ব্বস্ব, তুই জন নায়িকা। আজ দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান, তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপন শিব আপন পদতলে দলিতেছেন'।

মা আমার করালবদনী, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, ভীমা, প্রলয়ঙ্করী। সংসারে পর্ব্বতপ্রমাণ দুঃখ আছে, পুঞ্জীভূত অবসাদের অন্ধকার আছে, দারিদ্র্যের হাহাকার, ও মৃত্যুর বিভীষিকা আছে। তথাপি ভয় নাই, ভয় নাই, মায়ের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ভয় ও ক্ষয়কে জয় করিতে হইবে। ঐ

দেখ, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মা তোমাদের প্রত্যেককে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য বাহু প্রসারণ করিয়া রহিয়াছেন। যদি শ্রীরামপ্রসাদের মত একবার গাহিতে পার—

'মন কেনরে ভাবিস এত,
ও তুই মাতৃহীন বালকের মত
কাঁদি হয়ে ডেকে ডাক, এ যে বড় অদ্ভুত,
ওরে তুই করিস কালের ভয় হোয়ে ব্রহ্মময়ীসুত'

তখন দেখিবে, তুমি নবজন্ম লাভ করিয়াছ, তুমি অশোক, অভয়, অমৃত হইয়াছ। মা আর তখন তোমার নিকট ভীমা নহেন, তিনি বরাভয়-দায়িনী কল্যাণময়ী বিশ্বজননী, বিশ্বেশ্বরী। এই বিশ্বেশ্বরীর পাদ-পদ্ম আশ্রয় করিয়া সাধক মৃত্যুঞ্জয়কেও জয় করিয়াছেন। সাধক গোবিন্দ চৌধুরী গাহিয়াছেন—

'আমি চরেছি রে ভাই সেই আনন্দ-কাননে,
ওরে সংসারেরি লোকে যারে শ্মশান বলে ভয় পায় মনে'।

কিন্তু মা যেমন ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী, তেমনি আমাদের প্রত্যেকেরই দেহ-ভাণ্ডে বিরাজিতা। 'যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা আছে ভাণ্ডে',—ইহা উপলব্ধিরই কথা। আমাদের অন্তরে যে মহাশক্তি নিদ্রিতা আছেন, সাধনার দ্বারা উহাকে জাগাইয়া তোলা, আমাদের নিম্নগামিনী প্রবৃত্তিকে ঊর্দ্ধগামিনী করা,—ইহাই তো জীবনের লক্ষ্য। তান্ত্রিক সাধক মানুষের প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করেন নাই, অথচ সকলকেই আশা ও আনন্দের বাণী শুনাইয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্র তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকের জন্য যথাক্রমে পশ্বাচার, বীরাচার ও দেবাচারের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আসল কথা, শক্তি-সাধনার লক্ষ্যই অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ ও ইহার ফল রূপান্তর-লাভ। যাহারা শক্তি-সাধনা করিয়াও ভীরুতা, কাপুরুষতা, নিষ্ক্রিয়তা ও জড়তাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, তাহাদের সাধনা ব্যর্থ হইয়াছে। 'শক্তিপূজা যে কথার কথা নয়,' একজন সংগীত-রচয়িতা সে কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। আর এই শক্তির সাধনাই তো মনুষ্যত্বের সাধনা। আজ আমাদিগকে এই শক্তি-মন্ত্রে নূতন্ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

অমাবস্যার অন্ধকারময়ী নিশীথিনী। প্রকৃতি স্তব্ধা, ধ্যান-মগ্না, যেন আপনার মধ্যে আপনি সমাহিতা। সন্ধ্যায় গৃহে গৃহে যে দীপমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা একে একে নিভিয়া যাইতেছে। এই পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে ভীমা, প্রলয়ঙ্করীর পূজা। পূজার পূর্ব্বে ভূতশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, প্রাণায়াম, কেননা, 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ', 'দেবী ভূত্বা দেবীং যজেৎ'। সুতরাং, এই পূজার সঙ্গে অধিকার-বাদের প্রশ্নও অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে কথিত আছে, চণ্ড মুণ্ড বধের সময় দেবীর ভ্রূকুটি-কুটিল ললাটদেশ হইতে করালবদনা কালী বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন।

'বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা　　নরমালা বিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্ম পরীধানা　　শুষ্কমাংসাতি ভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা　　জিহ্বা ললনভীষণী।
নিমগ্না রক্তনয়না　　নাদাপূরিতদিঙ্মুখা'॥

(উত্তর চরিত্র, ৭ম অধ্যায়, চণ্ডমুণ্ড বধ)

দেবীর ললাট হইতে উদ্ভূতা সেই কালিকা বিচিত্র খট্টাঙ্গধারিণী, নৃমুণ্ডমালিনী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিহিতা, অস্থিচর্ম্মময় দেহা, অতিবিশাল-বদনা, সর্ব্বদা জিহ্বালোলনহেতু ভয়ঙ্করী, কোটরগত ও রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্টা, এবং হুঙ্কার শব্দের দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পূর্ণকারিণী।

অথচ ভক্তের চোখে ইনিই তো স্নেহময়ী বিশ্বজননী। শ্রীরামপ্রসাদ তো ইঁহারই কাছে আবদার করিয়াছেন, অভিমান করিয়াছেন, ইঁহাকে ভৎর্সনা বা তিরস্কার করিয়াছেন, আবার ইঁহারই কাছে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। মা যে আমার কল্প-তরু, ইনি যে ভোগ-মোক্ষ-দায়িনী।

'যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষঃ
যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।
দেবী পদাম্ভোজ সমাশ্রিতানাং
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব'।

যেখানে ভোগ, সেখানে মোক্ষ নাই, যেখানে মোক্ষ, সেখানে ভোগ নাই, কিন্তু যাঁহারা দেবীর পাদ-পদ্ম আশ্রয় করেন, ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই তাঁহাদের করতলগত।

কিন্তু জগন্মাতার কাছে অনিত্য ভোগ-সম্পদ প্রার্থনা করিব কেন? ভোগের দ্বারা তো কেহ কোনদিনই শান্তি বা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। মোক্ষই বা তাঁহার কাছে চাহিব কেন? মোক্ষ কামনাও তো স্বার্থপরতা। তাঁহার কাছে তবে কি চাহিব। চাহিব বীর্য্য, বল, তেজ, ওজঃ, চাহিব অক্ষয় মনুষ্যত্ব, দুর্জ্জয় পৌরুষ। প্রার্থনা করিব—মা, সেই শক্তি আমায় দান কর, যে শক্তির বলে আমি সর্ব্বপ্রকার অন্যায়, অনাচার, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারি।

শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ইঁহারা সকলেই ছিলেন শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত। উপনিষদের ঋষিও পরব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

ওঁ তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
ওঁ বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি।
ওঁ বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
ওঁ ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি।
ওঁ সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি।
ওঁ মন্যুরসি মন্যুর্ময়ি ধেহি।

হে তেজঃস্বরূপ, আমার মধ্যে তেজের সঞ্চার কর, হে বীর্য্যস্বরূপ, আমায় বীর্য্য দাও, হে বলস্বরূপ, আমায় বল প্রদান কর, হে ওজঃস্বরূপ, আমায় ওজস্বান্ কর, হে সহস্বরূপ, আমায় সহিষ্ণু কর, হে মন্যুস্বরূপ, পাপের প্রতি, অন্যায়ের প্রতি আমার মনে ক্রোধের সঞ্চার কর।

উপনিষদের ঋষি একথাও বলিয়াছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ,' অর্থাৎ বলহীন ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। ভাষ্যকার বলেন—বলহীনেন ব্রহ্মচর্য্যহীনেন। এই ব্রহ্মচর্য্য বা চরিত্রবলই তো মনুষ্যত্বের প্রধান সাধন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

'Neither money pays, nor name nor fame, it is character that can cleave through the adamantine walls of difficulties.'

প্রত্যেক নরনারী অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার। সূর্য্য স্বপ্রকাশ, আমাদের আত্মাও তাহাই। তাই আমরা প্রতিদিন প্রাতঃকালে উচ্চারণ করি—

'অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্' ॥

আমি দেবতা, অপর কেহ নহি, আমি ব্রহ্ম, শোকভাক নহি, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমি নিত্য মুক্তস্বভাব।

সূর্য্য ঘন মেঘে আবৃত হয়, আমাদের আত্মাও অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। আর এই আবরণকে সরাইয়া দেওয়ার নামই সাধনা।

আমরা নানাভাবে মহাশক্তির আরাধনা করি—দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, প্রভৃতি। কিন্তু যথার্থ শক্তিসাধনা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বরং এক দিক দিয়া পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহই শক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিয়াছে, শক্তিকে করায়ত্ত করিয়াছে। অবশ্য এই শক্তিমত্ততা একদিন তাহাদেরও ধ্বংসের কারণ হইতে পারে। তথাপি তাহারা যে জড়শক্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা কি অন্তঃপ্রকৃতির উপর জয়লাভ করিয়াছি? আমরা কি সুপ্ত শক্তিকে জাগরিত করিয়াছি?

আজ শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার পুণ্য তিথিতে আমরা যেন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করি। যে মহাশক্তি আমাদের মধ্যে নিদ্রিতা রহিয়াছেন, তাহাকে জাগ্রত করিয়া আমরা যেন দেহে ও মনে অপরিসীম বল ও বীর্য্যের সঞ্চার অনুভব করিতে পারি এবং পুঞ্জীভূত অন্ধকার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আনন্দ-মুখর আলোর রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি।

॥ দুই নয়া পয়সা ॥

সম্বুদ্ধ

আয় করিয়াছি।

দুইটি নয়া পয়সা নয়। একটি দুই-নয়া-পয়সা মুদ্রা। আস্ত, সুস্থ, চকচকে!

আয় করিয়াছি, কিন্তু বিনা ক্লেশে। ইচ্ছা করিলে আপনিও পারিবেন। পথেঘাটে সুযোগ ছড়াইয়া আছে। অতএব ঘটনাটি, তথা কায়দাটি, বলিতেছি, বিলাইয়া দিতেছি।

ঘটনাটির তারিখ ১১।১০।১৯৮১, বুধবার। কাল, সন্ধ্যা, সাড়ে ছ'টা হইতে সাড়ে ছ'টার মধ্যে। স্থান—অক্টারলোনি রোডএর বাস ষ্ট্যাণ্ড হইতে সার্কুলার রোড পর্যন্ত ব্যাপী চৌরঙ্গী রোড। ঘটনাস্থল, একটি বাসের অভ্যন্তর। পাত্র আমি এবং আরও কয়েকজন, পাত্রী কেহ নাই। স্টেটবাস, তাহার মাথায় নম্বর লেখা ৮ পড়িবে, মধ্যে রেজিষ্টার্ড নম্বর লেখা WBS 1469; যদি ভুল না করে থাকি কতজন যাত্রী বসিবে তাহার সংখ্যাও বোধ হয় লেখা ছিল, কতজন দাঁড়াইবে, বা ঝুলিবে বা পিছেপিছে দৌড়িয়া চলিবে তাহার কোন সংখ্যা লেখা ছিল না।

ভোর পাঁচটায় বাহির হইয়াছি। ঐ সময়ে বাড়ি ফিরিতেছিলাম। গড়িয়ায় পৌঁছিয়া, তবে পেট-জলে তেলজল পড়িবে। সারাদিন অভুক্ত ও কর্মশ্রান্ত, স্বভাবতই দেহটা কিঞ্চিৎ সুস্থতর ও মেজাজটা কিঞ্চিৎ রুক্ষতর বোধ করিতেছিলাম।

খান পাঁচেক বাস ধর্মনিরপেক্ষে ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে এইখানায় উঠিয়া পড়িলাম; টিকিট কিনিয়া, ভিড়ের ফাঁক গলিয়া গাড়ির মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার চেহারাটা সুদৃশ্য নয়। সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া বহুই চাপ খাই, কোন সুলোচনার কোন সুদর্শন আঁখির দৃষ্টি আমার দিকে পড়ে না। আমিও তাই মিথ্যা সে আশায় গুঁতা খাইয়া সিঁড়ির মুখে থাকি না—গাড়ির ভিতরে হইয়া যাই।

কাঁধঝুলা হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, আমি এবং আরও অনেকে। আমার পাশে একটি ব্যক্তি (তরুণই বোধ হয় বলে ঐরকম চেহারাকে) অনতিবৃদ্ধ মুখ, ভরাপুরা দেহ। প্যান্ট ও সার্ট পরা।

তাহার সম্মুখের সীটের রেলিংএর যাত্রী নামিয়া গেলেন। ইনি (বয়স হিসাবে না হোক, গল্পের নায়ক হিসাবে 'ইনি' বলিতেই আমি বাধ্য) সম্মুখের যাত্রীকে বলিলেন, 'সরে বসুন'।

তিনি বলিলেন, আমি সামনেই নামব, আপনি ভেতরে চলে আসুন।

এ পর্যন্ত সাধারণ ঘটনা। যাকে বলে নর্মাল বিহেভিয়ার। কিন্তু তারপরই দেখা গেল, এ ব্যক্তি একখানা ঝম্পপ্রদান করিলেন। দেহের ঊর্ধ্বভাগ ও বাঁ পা খানা কথঞ্চিৎ বাড়াইয়া সে ব্যক্তির (উপবিষ্ট যাত্রীর) একেবারে উপর দিয়া উল্লম্ফন করিয়া ভিতরদিকের সেই সীটে গিয়া পড়িলেন। শিহনের অন্য পা খানা দীর্ঘায়িত ও বিস্তৃত হইয়া আমার উদরদেশে আসিয়া প্রতিহত হইল। গ্রাম্য বাংলায় যাহার নাম লাথি।

অভিপ্রেত বা ইচ্ছাকৃত নয়, অনবধানকৃত, সেটা আমিও বুঝি। তবুও লাথি is লাথি। আমার বরিশালীয় রক্ত মস্তকে চড়িয়া যাইতেছিল, তাহাকে নিরস্ত করিলাম। হাত পাতিয়া সে ব্যক্তিকে বলিলাম, দুটো পয়সা দিন তো।

তিনি তখন দেশজয় (বা চর-দখল, যাই বলুন) করার আনন্দে প্রসন্নবদনে সম্মুখে চাহিয়া গ্যাট হইয়া বসিয়াছেন। একবারের ডাক কানে গেল না। আবার ডাকিতে হইল। তৃতীয় বা চতুর্থ বারে শুনিতে পাইলেন। মুখ ফিরাইলেন, কহিলেন, আমাকে বলছেন ?

—হ্যাঁ। দুটো পয়সা দিন।

—আপনাকে ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—ঐ সীটটাতে বসবার আপনার দরকার ছিল, আগ্রহও ছিল। ভাল কথা। কিন্তু আপনার লাথিটা খাওয়ার আমার দরকারও ছিল না, আগ্রহও ছিল না। বিনা মজুরিতে হজম করতে পারব না। দুটো পয়সা দিন।

আরে। বেশ নির্বিকার হইয়া শুনিল। কথা বলে না। অতএব আমার মেজাজ চড়িতে লাগিল। সে ব্যক্তি নির্বাক হইয়া রহিল, আমার দিকে তাকায়, আবার মুখ ফিরায়, আবার তাকায় আর প্রায়ই মন্তবিকাশ করিয়া হাসে। (পাঠক ঘাবড়াইবেন না। খাঁটি বাঙালী ইয়ংম্যান, কায়দা দুরস্ত। কে জানে হয়ত আপনি নিজেই সেই লোক এটা পড়িতেছেন) আমি কি করি বলুন। ব্যয় করিয়াছি, এখন আমিও হঠাৎ থামিতে পারি না—নেহাৎ মানের দায়ে চালাইয়া যাইতে হয়। অতএব সে ব্যক্তি তেমনই করিয়া বসিয়া রহিল। আমি একটি একটি করিয়া কয়েকটি যুক্তি ও আলোচনা তাহাকে শুনাইয়া চলিলাম।

১। বিনা মজুরিতে আমি লাথি-খেতে পারব না। পয়সা দিন।

২। বড় পয়সা দুটো দিতে যদি দিলে লাগে মনে করেন, কিছু কনসেসন করে দিচ্ছি—নয়া পয়সাই দিন দুটো, তাই নেব।

৩। আপনার বসবার দরকার আছে, অন্য লোকেরও বেঁচে থাকবার দরকার আছে। সেটা যখন জানেননি, তখন কিছু প্রায়শ্চিত্ত করতেই হল।

৪। ছেলে লাভ নেই। আপনার দাঁত ভেঙে আমার লাথির দুঃখ বা আমার মরলা ঘুচে যাবে না।

৫। আমি কালচু রসিকতা করছি ভেবে নিশ্চিন্ত হবেন না। পয়সা আপনাকে দিতে হবে, এবং নিশ্চয়ই দিতে হবে। বলবামাত্র দিয়ে ফেললে কাজ হত। কেউ জানত না। এখন বাসসুদ্ধ লোক তাকিয়ে দেখছে। আর কেন কেলেঙ্কারি বাড়াবেন। বার করুন পয়সা।

৬। অত হটকটানি ছিল কিসের ? আপনি ঐ সীটে বসতে চেয়েছিলেন, ইনি পথ ছেড়ে দিয়েছিলেন। উপরে মুছে নিয়ে বসে পড়তেন, কেউই বাধা দিত না। অমন লাথি মেরার কি হয়েছিল ?

প্রত্যেকটি কথার শেষের ঘুষা, কই, বার করুন পয়সা, দিন।

সে ব্যক্তি দেখিলাম, বেশ নির্বিকার এবং প্রসন্নমুখে বসিয়া আছে। আমি মফঃস্বলের বাসিন্দা, ঠিক জানি না, কিন্তু বাসে ট্রামেই বোধ হয় চামড়া ঐরকম মজবুত হইয়া যায়। শার্ট একটা গায়ে ছিল। কিন্তু শুধু শার্ট সব দুর্ভেদ্য হয় না।

৭। ভয় নেই, পয়সা নিয়ে আপনার নামটাম জিগ্যেস করব না। কিন্তু আমার নাম ঠিকানা আপনাকে বলে যাব। ইচ্ছে করলে সেই নামধামসুদ্ধ আপনি খবরের কাগজে প্রতিবাদপত্র লিখতে পারবেন, আমার অনুমতি দেওয়া থাকবে।

এতক্ষণে বলা হইল, একটা কথা শোনা গেল।

—আপনাকে আমি লাথি মারলাম কখন?

—এই যাসেই। সেই যে, জয়রাম বসে যখন লম্ফ দিলেন, অবপ্রত্যঙ্গ যে গুলোকে পেছনে ফেলে যাচ্ছিলেন তাদের কি দশা হল তা ত খেয়াল রাখা দরকার মনে করেন নি। অমন উতলা হয়ে লাফটা দেবার দরকার ছিল কি। সোনার লঙ্কা কেউ কেড়ে নিচ্ছিল?

এবার পাশের এক যাত্রী কহিলেন, বোধহয় ভয় হয়েছিল আমি লাফ মেরে গিয়ে পড়্‌ব।

৮। এই কথা। কিন্তু মাসের সীট, পাঁচমিনিটের ব্যাপার, তার জন্যে এত? তাহলে বিয়ের দিনে কি করবেন? আধখানা বাড়ি কামিয়ে জোয়েলা থেকে গিয়ে ঠেসে বসে থাকবেন পিঁড়ির ওপরে, পাছে কেউ এসে বসে যায়?

দ্বিতীয়বার বলা হইল। আপনি নেবেন দু'টো পয়সা?

৯। আপনার কি ধারণা হ'ল আমি এতক্ষণ ধরে রসিকতা করছি আপনার সঙ্গে? দিন দু' নয়া পয়সা। সবাই দাঁড়িয়ে, আপনার বসে যাবার সাধ হয়েছে। কিন্তু তাড়াই যেন দিন না হয়।

এই কথাবার্ত্তার ফাঁকে তাহার ডান হাতটি বাম বুকপকেটের দিকে কয়েকবারই অগ্রসর হ'য়েছিল। আবার অর্ধপথে নিবৃত্ত হ'য়েছিল। এবার হাত পকেটে ঢুকিল; কিছু রেজকী তুলিয়া আনিল, একটি (মিথ্যা বলিব না, বেশ চকচকে স্বাস্থ্যবান দোহারা) দুই নয়াপয়সা তুলিয়া লইয়া আমার হাতে দিলেন।

আমি পয়সাটি লইলাম, কহিলাম, থ্যাঙ্ক ইউ। এটা কিন্তু ভাববেন না আমি সৌজন্য করে পয়সাটা আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। একে আমি নিয়ে যাব এবং কাজে লাগাব। তারপর, আমার নাম ঠিকানা জানবার ইচ্ছে আছে আপনার?

তৃতীয়বার বাক্যস্ফূর্তি। বলুন না আপনার নাম।

আমি এবার গলা আরেকটু স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, জেনে নিন। আমার নাম অমূল্য দাশগুপ্ত, কাঁথি কলেজে প্রফেসারী করি। আমার নাম সম্বন্ধে, যদিও এ নাম আপনার জানা থাকবার কথা নয়। আপনার নাম ঠিকানা কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করব না।

মুখ আবার ফিরিয়া গেল। আমি বলিলাম, ইচ্ছে করলে আমার নাম নিয়ে লেখালেখি করতে পারেন। আমিও কিছু করব। এই পয়সাটা হচ্ছে বঙ্কী, গোটাকতক টাকা বার করে নেব একে উপলক্ষ্য করে।

ইনি আর জবাব দিলেন না। পয়সা দিয়াছেন, লেনদেনের সম্পর্ক চুকিয়াছে, আর তাঁহার আমাকে চিনিবার কথাও নয়।

আমি রুচ্‌ করিয়া সিধা হইয়া দাঁড়াইলাম। পয়সাটা দুই আঙুলে তুলিয়া ধরিয়া চতুর্দিকের যাত্রীদের দেখাইলাম। এই যেমুন্য দু' নয়া পয়সা যার করলাম।

সামনের দিকে কয়েকটি ছেলের মধ্যে আলোচনা শুরু হইল—নিম্নস্বরে, যদিও আমাকে শুনাইয়াই:

—টাকা আর করবে কি করে? লিখবে?

—দূর। ও-ত ওকে লিখতে বলল।

আমি কহিলাম, উনি লিখলে, নিজের টাকার বিজ্ঞাপন বেশী দিয়ে ছাপাবেন। আমি লিখে টাকা নেব।

আবার আলোচনা!

—লিখে টাকা নেবে কি করে?

—তবে যে বললে প্রুফের?

—বোধ হয় পার্ট টাইম।

আমি বলিলাম, না, হোল্ টাইম হয়েও টাকা পাওয়া যেতে পারে।

ইহার পর অন্য কথাবার্তা। এই কাহিনীর পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। ইতিমধ্যে সার্কুলার রোড পার হইয়াছি। ভবানীপুরে পৌঁছিয়া নায়ক নামিয়া গেলেন।

তাঁহার ঠিক পিছনের সীটটিতে একটি ভদ্রলোক। আমার চেয়ে বুড়া দেখায় কাজেই আমার বয়সী হইবেন, থাকিয়া থাকিয়া বিষম খাইতেছিলেন।

এবার সবার দিকে চাহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে একটি স্পষ্ট প্রশ্ন, কাণ্ডটা করলেন কি?

আমি সে প্রশ্নের উত্তর দিলাম। কহিলাম, কথাগুলো মনে থাকবে না, বেড়ে ফেলে দেবে। দু' নয়াপয়সাটাকে অত সহজে ভুলবে না। ওটা হ'ল যোতাম, জামাটাকে আটকে রাখবার জন্যে।

—তা বটে।

—তা ছাড়া। এমনিতে এই গল্প ও বাড়িতে গিয়ে বলত না। এমন, দুই নয়াপয়সার দুঃখে সবাইকে বলে বেড়াবে। আমার কিছু শ্রাদ্ধ-সপিণ্ডকরণ হবে সেই সঙ্গে। তা হোক, গল্পটাকে ও নিজেই ছড়িয়ে বেড়াবে সর্বত্র।

—সত্যও ঠিক বলেছেন।

পয়সা উপার্জনের পন্থাটা বাতলাইলাম। এরূপ সুযোগ আপনিও সহজেই পাইবেন। কিন্তু। ইহার সঙ্গে একটি সমস্যাও জড়িত আছে। সেটা না বলিয়া দেওয়া অধর্ম। সমস্যাটা গল্পের মধ্যে ছিল না। সেটা দেখা দিল পরে—সেই রাত্রে এবং পরদিন সকালে।

বাড়ি ফিরিয়া, কাহিনী-বিবৃত করিলাম, দুই নয়া-পয়সাটাকে আলাদা পকেটে রাখিয়াছিলাম, বাড়ী ফিরিয়া দেখিয়াছিলাম। দেখিয়া শুনিয়া গৃহিনীর মুখ গম্ভীর হইল। কহিলেন, হাত পেতে নিয়ে এলে ঐ পয়সা?

—কেন আনব না?

—ঐ লাখি-খাওয়া পয়সা?

—আপত্তি কিসের। লাথি কি এমনিতে কম খাচ্ছি? ছাত্ররা লাথাচ্ছে, প্রিন্সিপ্যাল লাথাচ্ছে, গভরমেণ্ট ইউ. জি. সি. সবাই জুৎবুঝে এক এক পাড় বেড়ে যাচ্ছে। তাও, সেগুলো প্রায় সবই সেকেণ্ড হ্যাণ্ড্ লাথি। ছাত্রদের লাথি বাড়ছে তাদের পলিটিক্যাল পার্টি, প্রিন্সিপ্যালকে লাগাচ্ছেন গভর্নিং বডি

বা গভর্মেণ্ট বা তাঁর অন্য কোন ব্যক্তিবিশেষ ধনিব; এঁরা সেওলোকে গড়িয়ে বেড়ে দিচ্ছেন প্রফেসরদের ওপরে। এ লোক নিজে, খাবতে লাখি মেরেছে, এবং তার বদলে নগদ পয়সা গুণে দিয়েছে। এমন কজন বেয়?

গৃহিনী কিন্তু শান্ত হইলেন না। এখনও তাহারই জের চলিতেছে। শুরুজনের চক্ষু ও কান এড়াইয়া ফাঁকে ফাঁকে মুটু করিয়া একটি একটি বাণী আমার শ্রবণগোচরে পৌছাইয়া দিয়া যাইতেছেন। ঐ লাথির পয়সায় দুধমাছ কিনিয়া তিনি ছেলেমেয়েকে খাইতে দিবেন না, প্রাণ থাক আর থাক। নাকছাবি বা দুল গড়াইয়া নাকে কানে দিবেন না—নাক কান থাক আর যাক।

অতএব এবার শুনুন আমার দশা। পাইলাম, ভাবিলাম সংসারে দু'টা পয়সা (নয়া) সাশ্রয় হইল। তা কিন্তু, সংসারে লাগাইব এমন ভরসা দেখি না। পুকুরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিব, সেটা প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রের অবজ্ঞা-সাধন, আমি শিষ্টোশান নাগরিক অতএব সেটাকে অন্যায় বলিয়া জানি। ভিখারীকে দিয়া দিব তাহাও পারিতেছি না; আমি তাহাকে লাথি মারি নাই, সে আমার কাছ হইতে ও পয়সা নিবে কেন?

কি করি কি করি, ভাবিতেছি—

এই পর্যন্ত লিখিয়া মনে পড়িল। ভাল স্মরণ নাই, কিন্তু কেমন যেন মনে পড়িতেছে, 'জাতীয় সৌজন্য সপ্তাহ' জাতীয় কি একটা খবর বা আলোচনা কিছুদিন পূর্বে কাগজে পড়িয়াছিলাম। আপনারাও হয়ত কেহ না কেহ পড়িয়াছেন, সেই ভরসাতেই লিখিতেছি।' সৌজন্য সপ্তাহ: সেই যে, বনমহোৎসবের মত, একটা সপ্তাহ ধরিয়া, রাজাপাল, অভাবে মন্ত্রী, অভাবে এম্ এল্ এ অভাবে ইউনিয়ন বোর্ড মেম্বার বা সাহিত্যিককে দিয়া রুক্করবী বা উড়িকচু বা চেঁকিশাকের চারা লাগাইতে হয় ঢাকঢোল বাজাইতে ও ফটো তোলাইতে হয়, তারপর সেই পুণ্যের বলে সারা বছরের বাকি ৫১ সপ্তাহ ধরিয়া আম, জাম, নারিকেল, সুপারি কাঁঠাল সব কাটিয়া নির্বংশ করিতে হয়। এও সেইরকম, একটি সপ্তাহ রুটিন ধরিয়া সকলকে জয়রাম নমস্তে গুডমর্নিং বা হুলাহুলাহু বলিয়া সৌজন্য জানাইতে হয় তারপর সেই কৃত্রিম সাধনের লভ্যাংশ হিসাবে বাকি ৫১ সপ্তাহ মাকড়সার মত আট ঠ্যাং মেলিয়া বিশ্বিদিক পথ সন্ধান করিতে হয়।

তা, সেই সৌজন্য সপ্তাহের কোন অফিস-টফিস নাই? নিদেন, তাঁহাদের চাঁদার খাতা রাখেন এমন কোন জনসেবী সংঘ-টংঘ? থাকিলে এই দুই নয়া পয়সা সেই হাতে দিয়া দিতাম। সেই কথাই এই পয়সাটার সত্যকার স্থান।

আমি মফঃস্বলের লোক, ঠিক জানি আপনারা যদি কেহ পারেন, তাঁহাদের বলিয়া দিন না। একদিন দয়া করিয়া আসিয়া পয়সা (নয়া) দু'টো লইয়া যাইবেন। অবশ্য রসিদ দিতে হইবে। আমিও রসিদ দিয়াই লইয়াছি। একবার বাস ভর্তি বা ওভারলোডি ট্রাকের সম্মুখে নিজের নামধাম বলিয়া। আরেকবার এই রচনা প্রকাশ করিয়া।

দেশ-বিদেশ

আইভো আন্দ্রিক :

১৯৬১ সালে সাহিত্যের জন্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন যুগোস্লাভিয়ার আইভো আন্দ্রিক। তাঁর "দি ব্রীজ অন দি ড্রিনাই" বইটিই তাঁকে এ সম্মান এনে দেয়।

আইভো আন্দ্রিক ১৮৯২ সালে যুগোস্লাভিয়ার বসনিয়ার ট্রাভনিকের কাছে ডোলাকে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন দরিদ্র কারুজীবী। আন্দ্রিকের বয়স যখন দু'বছর তখন বাবা মারা যান। মা খুবই উচ্চাভিলাষিনী ছিলেন। ফলে নিজের ছেলের পড়াশুনা এ চরম দুরবস্থাতেও বন্ধ রাখেন নি। তাঁকে শেষ পর্যন্ত দর্শনে 'ডক্টরেট' উপাধি লাভের গৌরব অর্জন করতে সাহায্য করেছিলেন। এমন মায়ের ছেলে কখনো চুপটি মেরে জীবন কাটাতে পারেন না।

আন্দ্রিক জীবননিষ্ঠ লেখক। তিনি জীবনকে দূর থেকে বিলাসের উপকরণ হিসেবে দেখেননি। রাষ্ট্রনীতির যুপকাষ্ঠে মানুষের আজ বলি। রাষ্ট্র যখনই হাত বাড়িয়ে বন্দুক তুলে চোখ রাঙিয়েছে যুবক আন্দ্রিক প্রতিবাদ করেছেন। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতেই যুব আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ফলে কারাবাস কপালে জুটল। এই কারাবাসই তাঁর জীবনে পরে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ, তিনি লেখক হবার স্বপ্ন কোনদিন দেখেন নি। অথচ জেলে থাকতেই তিনি লিখেছেন পাতার পর পাতা। তিনি বলেন সময় কাটাবার জন্যই কারাগারে তখন তিনি কলম ধরেছিলেন।

পরে পররাষ্ট্র দপ্তরে তিনি কাজ নিয়ে হিটলারের বার্লিনে যুগোস্লাভিয়ার রাজদূত হয়ে যান। যুদ্ধের সময় তিনি আবার কলম ধরেন। তিনি লিখবার কথা না ভাবলে কী হবে, আসলে তাঁর ভেতর লুক্কায়িত লেখক মন তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। তিনি যুদ্ধের সময়ই তাঁর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বইটি লেখেন। এই বইটির মূলবক্তব্য হল : একজন ব্যক্তি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা বা আবেগ যাই হোক না কেন, সমকালের নিয়ামক অথচ সমাজ সৃষ্টিতে নবরূপ ধারণ করে।

তাঁর লিখিত অন্যান্য বইগুলোর মধ্যে 'ট্রাভনিকের ইতিহাস', 'বসনিয়ান স্টোরি', 'দি স্পিনষ্টার,' 'দি ক্রাস্ড,' 'কোর্ট ইয়ার্ড' প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য।

তিনি কবিতা-ও লিখেছেন বেশ কিছু। ফলে তাঁর গদ্য লেখার ভেতর গীতি কবিতার মিষ্টি এবং সুখ সুরটিই বেশি ধরা পড়ে। প্রথমে মানুষ হিসেবে এবং লেখক হিসেবে তিনি জীবনকে দেখেছেন তন্নতন্ন করে। বিভিন্ন অবস্থাতেই। কিন্তু মানুষের ওপর কোনদিন তিনি বিশ্বাস হারাননি। সবচেয়ে অধম লোকটির ভেতর-ও মনুষ্যত্বের দীপটি জ্বল্‌জ্বল্ করে আছে এটা স্বীকার এবং জোর করে বক্তব্য সে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানবোচিত শুভ চেতনার জয়ধ্বজাকে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি কর্মে।

তাঁর বয়স এখন ঊনসত্তর। কিন্তু এখনো তিনি বলিষ্ঠ এবং ঋজু হয়ে চলেন ফেরেন। তিনি যুগোস্লাভিয়ার 'বেষ্ট সেলার'। যুগোস্লাভ রাইটার্স ইউনিয়নের সভাপতি। ইউরোপের সমালোচকদের অনেকে বলেন, তিনি ইউরোপের যুদ্ধোত্তর যুগের সেরা লেখক।

দু দুটো যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত মানবমূল্য। এমন অবস্থায় আইভো আন্দ্রিকের মত গভীর মানবপ্রত্যয়ী লেখকের কাছ থেকে পৃথিবীর লোক মানবের জয়যাত্রার গানই শুনতে চান।

॥ পোল্যাণ্ডে ছাত্র-উৎসব ও জাতীয় আনন্দলোক ॥

প্রবল প্রাণবেগে ধেয়ে চলবার ধর্ম স্বভাবতই যৌবন বয়সের। শুধু তাই নয়, আপনবেগে ধেয়ে চলার দুর্বার স্রোত যখন এবয়সে তাড়না করে, তখন এ-বয়সের সাথে সাথে সবাই হেলতে দুলতে দুলতে চলতে থাকে। যৌবন বয়সের এ বিরল ধর্ম, যা নাকি অনুপম ক্ষমতার পরিচয় বহন করে মানব সভ্যতার সমস্ত বড় বড় কীর্ত্তিকে সম্ভব করেছে। নন্দিত বন্দিত করেছে সৃষ্টির আনন্দকে। জরা তখনি আসে, যখন যৌবনধর্মের বিন্দুমাত্র অধঃপতন বা অধমাননা ঘটে। সৃষ্টির মৌল কারিগর যৌবন ধর্মের অধিকারীরা নিজেদের স্বচ্ছন্দ কর্মধারাকে সাবলীল এবং প্রবল গতি দিতে পারে দুটো দাবীর পূরণ হলে। (১) নিজেদের সৃষ্টিক্ষমতাকে অবিরাম পরিশ্রম, সংস্কার-মুক্ত সঙ্কীর্ণতামুক্ত মনোভাব এবং মৌলিক ভাবনাধারা দ্বারা পরিচালনা করতে হবে যুবকদের। (২) দেশের সরকারকে সুযোগ করে দিতে হবে এবং তেমন আবহাওয়া গড়ে তুলতে হবে যাতে যুবকসমাজ নির্ভয়ে এবং উৎসাহে নিজেদের আনন্দলোককে তৈরী করে জাতিগুদ্ধ সবাইকে মাতিয়ে তুলতে পারেন। সে আনন্দলোক অবশ্যই হওয়া চাই চরিত্রহীনতামুক্ত, অবশ্যই সে আনন্দলোক জাতির ব্যাপক কর্মজগতের প্রেরণার উৎস।

আজ পোল্যাণ্ডের যুবসমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় যে সেখানে আজ সে আনন্দলোক গড়ে উঠেছে। সে আনন্দলোক থেকে নাকি কর্মপ্রেরণার বিপুল তরঙ্গ সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে, এবং সে আনন্দলোক তৈরী করেছেন পোল্যাণ্ডে সদাচঞ্চল প্রাণবেগে স্বতঃস্ফূর্ত যুবসমাজ। সে আনন্দলোক তাঁরা তৈরী করেছেন সঙ্গীতে, নৃত্যে, নাট্যে, কবিতাপাঠের ভিতর দিয়ে।

প্রতি বছর বাৎসরিক ছাত্র-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাত্র-উৎসবের প্রস্তুতি চলে সারা বছর ধরে। আকাঙ্খিত সময় যখন আসে তখন ছাত্রময় হয়ে যায় শহরের সবকিছু। রাস্তা ঘাট, তাদের পরিচালিত রঙ্গালয়, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সবকিছু। ক'দিন ধরে চলে তাদের আনন্দধারা। রাস্তায় যখন সে সময় ছেলেরা গান গাইতে গাইতে চলেন, তাদের সাথে সবাই যোগ দেন। প্রৌঢ় বলুন আর বৃদ্ধই বলুন। রঙ্গালয়গুলো ভর্তি হয়ে যায়। যেখানেই ছাত্ররা তাদের আনন্দের পাত্র উদ্বাড় করছেন, সেখানেই ভীড় জমছে। সান্ধ্যকালে কফি হাউস বা ক্লাবের কোথাও কোন জায়গা খালি থাকে না তখন। —আনন্দপুরী হয়ে ওঠে পোল্যাণ্ডের শহরগুলো। যৌবনবেদনাবেগে সৃষ্টির পুত্ররা জাতির আনন্দজাগরণের বড় পুরোহিত হয়ে ওঠেন সে সময়।

এমনি এক মৌলিক এবং অকৃত্রিম আন্দোলনের জন্মযাত্রী পোল্যাণ্ড সেজন্যে গর্ব করতে পারে। এর শুরু বেশি দিনের নয়। ১৯৫৫ সালে পোল্যাণ্ডের একটি শহর Gdan'sk-এ একদল যুবক শিল্পী এবং অভিনেতা প্রথম রঙ্গালয় স্থাপন করেন। ব্যঙ্গ এবং কৌতুক কাহিনী নিয়েই এ রঙ্গালয় দল অভিনয় শুরু করেন। ওটার নাম "বিস্-বস্"। পরবর্তীকালে এদল থেকেই কয়েকজন সিনেমাশিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। অল্পদিনের মধ্যেই এদল সমগ্র পোল্যাণ্ডে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে ফেললেন। এঁরা সাধারণতঃ কবিতার ভিতর দিয়ে ব্যঙ্গ বিষয়ের অভিনয়-রূপ দিতেন। তারপর এদলের অনুকরণে তৈরী হ'ল ওয়ারশ'র "Students Satirical Theatre"। ব্যঙ্গ এবং বিদ্রূপের পর এদল খানিকটা সাহিত্যিক মূল্যবোধ আরোপ করলেন। এঁদের বিষয় নির্বাচন এবং অভিনয়ভঙ্গী এমনি আকর্ষণীয় হয়ে উঠল, যেন এনিয়ে

প্রবল আলোচনার সূত্রপাত হল। কাগজে কাগজে লেখা হতে থাকল এবং নামাস্থানে যেকোন জমায়েতেই এ-নিয়ে কথাবার্তা হত। ফলে এধরণের রসালয় বা দলের সংখ্যা বেড়ে চলল।

এ আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়ে ছিল ঠাট্টা বিদ্রূপ, প্যারডি করা ইত্যাদি। নাচ গান কবিতা নাটক এগুলোই ছিল মুখ্য। তারপর এক সময় নতুন অন্বেষণের ফলে সে অধ্যায় শেষ হল। তখন কবিতাপাঠের ভিতর দিয়ে সমাজ সমস্যাপ্রধান বিষয়গুলো এল। আধুনিক রীতির যাদুকরী ধারায় সেবিষয়গুলো এমন জীবন্ত মনে হত, তা দর্শকদের মুগ্ধ করত। এধরি ধরণের অনুষ্ঠান যে সন্ধ্যায় হত, তার নাম ছিল "কাব্য-সন্ধ্যা"। পোল্যাণ্ডে এই কাব্য-সন্ধ্যাই ভীষণ জনপ্রিয়। গোলাকার ঘরে এ অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। অভিনেতারা কখনো কখনো হঠাৎ দর্শকদের মধ্যে গিয়ে হাজির হয়ে কবিতা আউড়ে যান। অভিনয়েরি অংশভাগ কবিতা। এতে দর্শকদের কাছে সুরটা হয় খুব অন্তরঙ্গ। অভিনয় কৌশলটা হয় খুব সাবলীল এবং অকৃত্রিম। কবিতাগুলোও স্পষ্ট উচ্চারিত হয়ে দর্শকদের কানে একটা নূতন ধ্বনির সৃষ্টি করে এবং মনে প্রবিষ্ট হয়ে গেঁথে যায় বলে দর্শকদের কাছে এ রীতি আজ খুব অভিনন্দন যোগ্য এবং প্রিয়। এ ছাত্র-উৎসবের পুতুল নাচের মাধ্যমে অভিনয়ও আদরের সংগে গৃহীত হয়।

এ আন্দোলনের জন্মদাত্রী শহর হল Odan'sk। আজ সারা দেশে তা ছড়িয়ে আছে।

সাধারণতঃ অন্যান্য দেশে যে ছাত্রউৎসব হয় না তা নয়। তবে তা বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশিষ্ট কোন স্থানের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। আমেরিকায় আবার শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র ছাড়াও পেশাদারী গন্ধ থাকে। কিন্তু পোল্যাণ্ডে এ এক অনন্য চরিত্র, এ কোন বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সীমিত থাকে না, সমগ্র জাতীয়সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত, ছাত্রউৎসবে রাস্তাঘাট রেস্তোঁরা ক্লাব বিদ্যালয় সব কিছু একসংগে নেচে ওঠে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ চরিত্র পোল্যাণ্ড ছাড়া আর অন্য কোন দেশ অর্জন করতে পারে নি।

অন্য দেশের সংগে পোল্যাণ্ডের এ ব্যাপারে আরেকটি বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করার আছে। সাধারণতঃ অন্য দেশগুলোতে কলা বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের ভেতরই এ ধরণের কবিতা-অভিনয়, নৃত্য বা সংগীতের অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। পোল্যাণ্ড কোন বিশেষ বিষয়ের ছাত্রদের মধ্যেই এর আদর বা অনুশীলন সীমাবদ্ধ নয়। বরং বলতে গেলে, বিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্রদের মধ্যেই এর চল বেশি। এর পেছনে দুটো কারণ রয়েছে। (১) দেশের সৃষ্টিধর্মী মনোভাবসম্পন্ন ছেলেরা বেশির ভাগই কারিগরী বিদ্যার দিকে ঝুঁকে। (২) কারিগরী বিদ্যাবিষয়ের ছাত্ররা মনে করেন, শুধুমাত্র কারিগরী বিষয়ে মনকে নিযুক্ত রাখলে তাতে মনের তাজা ভাব মরে যায়। এবং মনে তাহলে রসবোধ আর অবশিষ্ট থাকে না। এজন্যে জীবিকার প্রয়োজনে কারিগরিক্ষেত্রে প্রবেশ করলেও মনকে তাঁরা হত্যা করতে চান না। তার হাত থেকে বেঁচে থাকবার রক্ষাকবচ হিসেবে এ বিভাগের ছাত্ররা বা খুব প্রমিকরা যারা ছাত্র উৎসবে যোগ দেন। এ নাচগান নাটক কবিতা পাঠের উৎসবে মাতিয়ে পড়েন।

সারা বছর চলে এ ছাত্র উৎসবের মহড়া। যৌবনের প্রচণ্ড সৃষ্টিক্ষমতাকে প্রবল বেগে ধাবিত করার এ-ই আন্দোলন পোল্যাণ্ডের যুবসমাজের বড় অর্জন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে এ এক পথপ্রদর্শক বিশেষ।

॥ পারের বিমান ॥

ডঃ হিরণ্ময় ঘোষাল

পাগল করে-দেওয়া চিৎকারের মত সে যন্ত্রণা। পর্দায় পর্দায় উঠে মূর্ছিত নিশীথে বিরামহীন বারান্তরে ভবঘরের অস্তি-নাস্তির তালে তালে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে। জান্তব আর্তনাদে অন্তরাত্মা কাঁদনা করে মুক্তি—দেহের বেদনাময় বন্ধন হতে মুক্তি।

গভীর রাতের নিস্তব্ধ যন্ত্রণাটা যখন ঘন হয়ে এলো, শহরের বিরল যান-ধ্বনিও তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। সমগ্র বিশ্ব যেন জেগে আছি আমি, আমার শিয়রের আলোটা আর আমার সর্ব-নির্যাতনী বেদনা।

স্নায়ুশিরা, অকাট্য সত্যের মত বেদনা আত্মপ্রকাশ করে। পার্শ্বশায়িনী ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন। ওঘর থেকে পুত্র এসে পায়ে হাত দিয়ে নীচু গলায় শুধায়—"বড় কষ্ট হচ্ছে নাকি?" বারান্দায় আলো জ্বলে ওঠে। তুমি মৃদু কথোপকথন। স্ত্রী বলছেন—"আর দেরী করা চলে না।" পুত্র সায় দিলো—"আমারও তাই মনে হয়।" টেলিফোনে কী কথা হলো কার সঙ্গে। আঃ, বাচ্চা মেয়েটাকে না জাগিয়ে দেয়। কতদিনের হলো? চোদ্দ কি পনেরো? দেখি হিসেব করে। জন্মালো তো ন'তারিখে··· ভারী ফুটফুটে, সত্যিই ফুলের মত···আর যে পারি না···ওমা, মাগো···মা, মা, মা···দেখা হয়নি। সেই তো দেশে ফিরেছিলাম কতবছর পরে। তার মাত্র ছ'মাস আগে মা চলে গেলেন। আবার হয়তো ঐ ছোট্ট মেয়েটা হয়ে ফিরে এসেছেন আমার কাছে। ওমা, মাগো···

হাসি পেলো। বাড়ীতে তো বাংলা বলি না। অথচ জীবন-মরণের সন্ধিতে এসে মুখ দিয়ে যে আর কিছু বেরতে চায় না। ওটা মাতৃভাষা বলে না বাংলা ভাষা বলে, কে জানে···

হিসাব-নিকাশের সময় এলো বুঝি। যে অন্তিমক্ষণে নিরীশ্বরবাদী ভল্‌তেয়রকেও সংস্কারের কাছে হার মেনে পাদ্রী ডাকতে পাঠাতে হয়েছিলো। তবু এদের দিকে তাকিয়ে বাঁচবার আশা মনে জাগে। শুধু এদের জন্যে বললে সত্যকে গোপন করা হবে। নিজের জন্যেই মুখ্যতঃ। কত বাসনা, কত কামনা, কত কল্পনা, কত ঈপ্সা ও পিপাসা ক্ষুধার্ত বুকের মত লেলিহান জিহ্বায় দংষ্ট্রাপংক্তির ওপর নিঃশব্দ হিংস্র সুর সাধে। তারা যেন জীবনের বহির্দ্বার আগলে বসেছে। পাওনা-গণ্ডা না চুকিয়ে দিলে যেতে দেবে না। অথচ বেলা ফুরিয়ে এসেছে। নির্দ্ধারিত শ্বাস-প্রশ্বাসের কোটি-কোটি অপচয়, অসংখ্য আনন্দ-রক্তিম জীবনক্ষণ দৈনন্দিনতার ধুলায় ধুলায় ধূসর হয়েছে। আশার প্রতিশ্রুতি প্রগল্‌ভার মত স্নেহহাতে আলিঙ্গন মোচন করে দূরে সরে গেছে।

অন্তিমক্ষণে যারা বিবেকের সঙ্গে হিসাব-নিকাশ করে তারা সত্যই মৃত্যুঞ্জয়ী, কারণ তারা মৃত্যুকে ভয় করে না। আমাদের ঠাকুরদাদা, দাদামশায়, ঠাকুরমা, দিদিমা, এঁদের তো যেতে দেখেছি। হাসিমুখে হরিনাম করতে করতে বিদায় নিয়েছেন, যেন যথার্থই পরপার বলে একটা তীর্থ আছে। তাঁরা সেইদিকে যাত্রা করলেন। মরণের কথা ভাবতে গেলে আমাদের পুরুষের মনটা ভীষণ অজ্ঞাতের আতঙ্কে

অমন মুষড়ে পড়ে কেন? যুক্তির হাতুড়ী দিয়ে আমাদের মনের রূপকথার রাজ্যটা গুঁড়িয়ে দিয়েছি বলে। তা ছাড়া···তা ছাড়া সারা জীবন ধরে আমরা বেঁচে থাকবার আয়োজন করেছি, সত্যকার জীবনযাপন করা আমাদের হয়ে ওঠেনি। তাই জীবন-বিরতির ভয় আমাদের পঙ্গু করে ফেলে।

বেদনাটা হয়তো মানবিক সীমারেখা অতিক্রম করে অনেক উর্দ্ধে উঠে গেছে। যেখানে অনুভূতির তারতম্য হয় না, বেদন শব্দের শ্রুতি-সীমার উর্দ্ধে উচ্চতা বা আয়তনের অনুভূতির পার্থক্য নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেদনার আবরণে জীবকে ঘুমপাড়ান করা হয় যেন, কে জানে। বেদনা সৃষ্টি করে বেদনা-মুক্তির অজুহাতে জীবনমোচনের কারসাজি হয়তো।

বেদনাও কিন্তু বরদাস্ত করা যায়। গা-সওয়া হয়ে গেলে বিশেষ কষ্ট নেই। অপমানের মত। তবে অপমানের মতই ভেতর থেকে সত্তার উচ্ছেদ করে চলে। সিগারেৎ ধরিয়ে বিবি খোলা-সন্ন করা যায়, কিন্তু সানাইয়ের একটানা পোঁ-ধরার মত অস্বস্তির পটভূমি মনকে অস্থির করে তোলে। প্রতিবেশীর সানাইকে বন্ধ করবার অধিকার নেই, অথচ ওটাকে না থামালে মাথার ভেতর যেন একটা মাকড়সা হেঁটে বেড়ায়।

মন অনেক সহ্য করতে পারে, কিন্তু শরীরের সহ্যের একটা সীমা আছে। যা অতিক্রম করলে যন্ত্রটা বিকল হয়ে যেতে যায়। জানিনা, বিরতির সে নিমেষ খুব কাছে এসে পড়েছে কিনা। "সজ্ঞানে গঙ্গালাভ" একেবারে বাজে কথা, নিছক কল্পনা, শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্রের অলঙ্কার। শেষ নিমেষ পর্যন্ত জীবাত্মার বিরতি-পারের অনুভূতি বা জ্ঞানের অধিকার নেই। ভূতাত্মা হয়ে গেলে হয়তো জানতে পারে। জীবাত্মা যদি কোনো রকমে ঠারে-ঠোরেও জেনে ফেলে, তাহলে সমগ্র সৃষ্টির যন্ত্রগুলি ফাঁস হয়ে যাবে। রয়টার বা পি. টি. আই মার্ফৎ যেমে যেমে চলে যাবে সে খবর। বড় বড় পতাকা শীর্ষকরে সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ঘোষিত হবে পরপারের কথা।

ওটা কী কোটালো, কে জানে? গোখরো সাপের দাঁতের মত বড় ছুঁচ। মিষ্টি গা-ঘষি-ঘষি-করা অধরের গন্ধ-মাখা, পালিশ্-করা-নখ-দীপ্ত কলি-কলি করেকটা আঙুল দুটো কাঁধ ধরে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে পা দুটোয় চটি পরিয়ে দিলো। আলখাল্লার ওয়-ওয়ালা হাতা দুটোর ভেতর যন্ত্রচালিতের মত হাত চালিয়ে দিলাম। চারিদিকে কেবল হাত, মোটা-মোটা আঙুল-ওয়ালা। কুইনীন্ না কী একটা ওষুধের বিজ্ঞাপনের মত। শত শত হাত, ছেংরা করে ছড়ানো, জ্যোতির্ময় ওষুধের শিশিটাকে ধরবার চেষ্টা করছে। আমার মাথার তলায়, ঘাড়ের তলায়, পিঠের তলায়, কোমরের তলায়, পায়ের ডিমের তলায়, পায়ের তলায়। হাতগুলো আমায় শূন্যে তুলে ধরেছে। লোফালুফি করবে নাকি? মন্ কিছুৎকে কখনো ফেলে লোফার মত। মন্ কিছুৎ না সাজো পান্ৎসা, কিছুতেই মনে পড়ছে না।

মেয়েটা কেঁদে উঠলো। ঘুমের ঘোরেও সব বুঝতে পেরেছে। তার মা চাপা গলায় ঘুম-পাড়ানি গানের সুরে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করে। দুটি নীল চোখতরা জল টলমল করছে। পুত্রের স্নেহভরা উষ্ণ হাতের মৃদু স্পর্শ পেলাম কপালের ওপর। বারান্দা পার হয়ে খোলা দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলাম। হাঁ, স্ট্রেচারেইতো। আপন মেয়ের তার ও তারিকী মেজাজ সম্বন্ধে কী একটা হাসির কথা বলেছিলাম। লোকগুলো কিন্তু হাসলো না। রোগীরা প্রায় হাসির কথা বলে নিজেদের মনে ভরসা আনতে চেষ্টা করে। তাতে ওরা অভ্যস্ত।

জনহীন, আবছা পথে রেখা-রঙের আধুলাল্ মিলিগুভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার আলোর

কাঁচে লাল ক্রশ আঁকা। হাতগুলো গাসচুলার ভেতর হোস্টের ট্রে পুরে দেওয়ার ভঙ্গিতে স্ট্রেচারটা ভেতরে চালিয়ে দিয়ে ঠাই করে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। এক টুকরো আলো দিয়ে দেখি মে-শেষের ভোরের আলোয় আকাশিয়ার নতুন পাতাগুলো ঝিরঝির করছে। মড়াকান্নার মত রোল তুলে আম্বুলান্স ছুটলো হাসপাতালের দিকে।

রাতের দু'একটা বিরল ট্রাম মাতালের মত টলতে টলতে চলেছে বিভ্রান্ত, লক্ষ্যহীনভাবে। অ্যাম্বুলেন্সের চিৎকার অগ্রাহ্য করে রাস্তা পার হতে গিয়ে একটা লোক খেলো মুখখিস্তি। দরজার কাছে স্বাস্থ্যবীমার বইটা উলটে-পালটে পরীক্ষা করে সন্ত পিতরের মত কড়া চেহারার দারোয়ান একটা ঘরের দিকে ইঙ্গিত করলো। মৃদু, খসখসে ঘুমজড়ানো নারীকণ্ঠে প্রশ্ন এলো, কী হয়েছে আমার? পুরো ঘরখানা সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত খসড়ে দিলো। পেন্সিল দিয়ে স্পষ্ট করা ভ্রূ দুটোর একটা বাঁকে-নাচের ভঙ্গিতে তীক্ষ্ণভাবে ওপরে উঠে গিয়ে এবং অপরটা ছিটকে নীচে পড়ে গভীর বিস্ময় ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। হ্যাঁ। ব্যাপারটা গুরুতর। গুরুতম হতে বেরী নেই। সে তো আমি নিজেই বুঝতে পারছি। তবু সব দেখা চাই। পৃথিবী থেকে হালকাভাবে সুট করে সরে পড়বার ভোটি নেই, এক রাস্তার দুর্ঘটনায় ছাড়া। খসখসে গলার সঙ্গে কাগজের ওপর চলে সস্তা বোচের খসখসানি। জন্ম কোথায়? কালকুতায়? আরে বাস্। সে যে অনেক দূর! শুনে হাসি পেলো। মৃত্যুপারের দেশ সে যে আরো দূরে। মহাবিশ্ব জয় করতে চলেছে মানুষ। অথচ এপাড়া থেকে ওপাড়া যেতে হলে মনে হয় সে অনেক দূর। বাংলাদেশের কলকাতা আর পোলদেশের ভারসৌ, হাজার আড়াই ক্রোশ হবে বৈকি। এখানে চোখ বুজলে ওখানে চোখ খোলা যায় হয়তো। বাগানের পেয়ারাগাছটায় ঝিঙ্যি ভূত হয়ে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা যায়। চা-কুমু মাখা পেয়ারা খায়। কাঁচা খায়, পাকা খায়···ডাঁশা, ডাঁসা, ঘেৎ, কিছুই মনে পড়ে না আজ। যাতনা শুধু শরীর নয়, মনটাকেও অধিকার করে বসেছে। স্ট্রেচার লিফটে পুরে দিলো। ঠিক আগের মত চুলায় ট্রে ভরে দেওয়ার ভঙ্গিতে। আরো অন্ধকার লম্বা বারান্দা। বারান্দার শেষ নেই। যুগ যুগ ধরে চলেছি, যেন হাওয়ায় ভর করে। একটা মেজের ওপর রাতের আলোর কাছে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে রাত্রির সেবিকা। পাশে রাখা মাড়-দড়খড়ে, কালো মখমলের ফিতেওয়ালা শাদা রুমাল-টুপী। তাকে জাগাতেই সে চোখ রগড়াবার আগে প্রবৃত্তি প্রণোদিতভাবে মাথায় টুপীটা বসিয়ে দিলো, আলগোছে, সম্ভ্রমী রেস্তোরাঁয় বেয়ন অভিজ্ঞতা পরিণত পরিবেশক খাবার মেজের ওপর সেভিয়েৎ বসিয়ে দেয়। ১৩ নম্বর বালান। ঐ যে বাঁদিকে। এই যেয়েছে। ১৩ নম্বরটা আবার কোত্থেকে এলো! সংখ্যাটা অলক্ষুণে বলে রটে, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় তা বলে না। সুলক্ষুণেও না, অলক্ষুণেও না। নপুংসক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা, দেখেছো তো। ইজিপ্ত থেকে ঝিঙ্যি পরিত্রাণ পাওয়াতে পারি। জীবনটা বেড়ে মজার জিনিষ ছিলো। কত রকম মনোগ্রাহী জিনিষ সেখানে। সব ছেড়ে চলে যেতে হবে। ওপারে হুক্-কথার বাঁধা আছে কী?

ধবধবে শাদা বিছানা-ওয়ালা একটা উঁচু, শাদা রং করা লোহার খাটের সঙ্গে স্ট্রেচারটাকে লাগোয়া করে ধরে আমাকে পাশ বালিশের মত গড়িয়ে দিলো বিছানায়। বালানের অন্যান্য রোগীদের কেউ কেউ পাশের আলো জেলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। ওদেরও বোধহয় এইভাবে মাঝরাতে আনা হয়েছিলো। রোগীদের মধ্যেই আছে যথার্থ গণতন্ত্র। পীড়ার পীড়নের গণতন্ত্র। একের প্রতি অপরের সহানুভূতি, সাথীয়তা।

রাতের সেবিকা সিগারেটের পচা গন্ধওয়ালা ঘরে ফিস্‌ফিসিয়ে কানের কাছে বললো, এবার একটু ঘুমোতে চেষ্টা করুন। বলে বহির্গামিনী অভিনেত্রীর মত যেন আপনি পালা শেষ করে খসখস্ করে

বেরিয়ে গেলো। বিছানার পাশে পাশে আলোগুলো এক একটা করে নিবে গেলো। ভোরের আলো। উন্মিলিত দৃষ্টির মত ক্রমে পরিষ্কার হয়ে আসে। ভেতলার বারান্দের চারিপাশের দেওয়ালগুলো, ছাদটা রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটের মত আস্তে আস্তে প্রায় অলক্ষিতে সরিয়ে নেওয়া হলো। খাটের তলা থেকে ভরা বসন্তের টাটকা সবুজ ঘাস দূরের গাছপালায় রেখায় গিয়ে মিশেছে। মাথার ওপর ফ্যাকাশে একফালি চাঁদওয়ালা ফিকে আসমানী রঙের আকাশ। কোথা থেকে অগ্রায়মান বিমানের ঘর্ঘর শব্দ আসছে।

ছোট্ট একটি বিমান কয়েকটা চক্কর দিয়ে ঘুরে ঘাসের ওপর এসে নামলো। তারপর সন্তর্পণে করে পাখার জোরালো বাতাসে রোগীদের মেজের ওপর রাখা চিঠিপত্রগুলো ছড়িয়ে দিয়ে আমার খাটের কাছে এসে থামলো। ভারী সুন্দর দেখতে। ঝকঝকে পালিশ করা কক্ষপের খোলা দিয়ে তৈরী। আগাগোড়া, পাখাটা পর্যন্ত। ককপিট থেকে মুক্তা-শুক্তির তৈরী একটা মই দিয়ে নেমে এলো চালক। সঙ্গে ভারী মোলায়েম চেহারার একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক। দু'জনেরই পরণে সাদা পোষাক। আমার বিছানার কাছে এসে মাথা নুঁইয়ে অভিবাদন জানালো। তারপর শুরু হলো কথোপকথন। কী ভাষায় জানি না। অথচ যে ভাষা বোধের মত প্রাঞ্জল, স্রোতের মত প্রবহমান, গিরি-গহ্বরের মত আত্মগুপ্ত, চোখের ইঙ্গিতের মত ব্যঞ্জনাময়।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি আরো কাছে সরে এসে খুব ঘনিষ্ঠভাবে বললেন, যেন অন্য রোগীরা শুনতে না পায় এমনভাবে চাপা গলায়:

"একটু দেরী হয়ে গেলো আসতে। মার্জনা করবেন। অনেকখানি পথ, তাছাড়া হুকুমপত্রটা গোলেমালে অন্য একজনের কাছে চলে গিয়েছিলো। তা না হলে সন্ধ্যে রাত্রিতেই আমরা যাত্রা করতে পারতাম। চলুন। পোষাক-টোষাকের আর হাঙ্গামা করবেন না। যেমন আছেন অমনিই উঠুন। ওসবের আর প্রয়োজন হবে না।" একটু রহস্যের হাসি তাঁর উজ্জ্বল অথচ প্রশান্ত চোখদুটোয় যেন সমবেদনার অঞ্জন পরিয়ে দিলো। সেখানে কুকনে তারা স্থির হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলো।

"'চলুন' মানে?" বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলাম। "আমি তো কোথাও যাবার ঠিক করিনি।"

"সব কাজ কি আপনাকে নিজেই ঠিক করতে হয়? আপনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, বয়সও তো কম হয়নি। আপনার যতদূর মনে পড়ে, জীবনে সব কাজই কি আপনি আগে থেকেই বিধিব্যবস্থা করে করতে পেরেছেন?"

"না তা পারিনি বটে। তবে যাওয়া-আসা সম্বন্ধে সব ব্যবস্থা নিজেই করেছি। অবকাশ অনেক সময়ে অযাচিত, অপ্রত্যাশিতভাবে এসেছে, সত্য, কিন্তু কোথাও যাবো কি যাবো না, সে মীমাংসা চিরকালই আমার নিজের বিচারাধীন। হুট বলতেই কোনোখানে যাওয়া আসার রেওয়াজ নয়।"

"আপনি যে সব যাওয়া-আসার কথা বলছেন সেগুলো হচ্ছে স্বল্প জলে ব্যাঙাচির কিলবিলিনি। মহাবিশ্বের দৃষ্টিতে তাদের 'যাত্রা' নাম দেওয়া চলে না। আপনার এ যাত্রাটা একবারে অন্য ধরণের হবে।..."

কথায় বাধা দিয়ে বললাম: "কিছু বুঝতে পারছিনা। আমি যাবো, অথচ তাতে আমার নিজের কোনো হাত নেই, তার মানে?"

ইহুদীদের মত ওয়েস্ট কোটের বগল দুটোয় তলার বুড়ো আঙুল দিয়ে হাত ছেৎরে অসন্তুষ্টভাবে শিবনেত্র করে ভদ্রলোক জবাব দিলেন: "মানে তো একেবারে স্পষ্ট। ওপরওয়ালাদের হুকুম। ঠিক হুকুম বলাও না। নির্দেশ। যাকে আজকাল 'ডিরেক্টিভ' বলা রেওয়াজ হয়েছে। তাছাড়া আপনি তো বহুদিন

ধরে মনে মনে খেতে চাইছেন। কোনো কিছুতে বিফল হলে, বা মনে সামান্য আঘাত পেলে আপনার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে চলে যাওয়া। এই ভাবে কত দেশ ঘুরেছেন, মনে পড়ছে কী? অথচ এই একটা সুযোগ এসেছে, যাকে বলে সুবর্ণ সুযোগ। আর আপনি ভানা-ঝাপা করে আমাদের সময় নষ্ট করছেন।'

"হাঁ, চলে যাওয়া, কারো জীবনের পথ থেকে সরে যাওয়া—এ ধরণের প্রতিবাদ আমার স্বভাব-সিদ্ধ। তাই বলে যার তার সঙ্গে উড়ো জাহাজ করে যে দিকে দুচক্ষু যায় চলে যাবো, সে রকম হঠকারিতা আমার চরিত্রে নেই। তাছাড়া কারো সঙ্গে তো আমার মনোমালিন্য হয়নি…"

কথা সমাপ্ত করতে না দিয়ে ভদ্রলোক সৌজন্য বজায় রেখে বেশ একটু অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন: "না, মনোমালিন্য হয়নি বটে, তবে জীবনের সঙ্গে বনাবনিও হয়নি। ফলে যখনই একলা থাকেন তখন প্রায়ই মনে মনে ভাবেন গলায় দড়ি দিয়ে মরে পড়বেন। তার ওপর মনে এত দোষভাব জড়ো করেছেন, অবশ্য, ধর্মঘট, মার্জনা করবেন, তার সবটাই যে ভিত্তিহীন তা বলা চলে না। সেই দোষের আসন, আপনার মতে, সম্ভব একমাত্র সব শেষ করে দিয়ে। জীবনে দু'একটা মোটা রকমের অপরাধের ফলে আপনার মনে শান্তি নেই। আপনি প্রায়ই বলেন নিজেকে, আপনি বাঁচতে চান না। তাই তো আমাদের পাঠানো হলো। দেরী হয়ে যাচ্ছে, উঠুন। আমাদের কাজ অনেক, একটুও সময় নেই।"

"নিজের মনে আমি যাই বলি না কেন, তা নিয়ে আপনাদের অত মাথা ঘামানোর অর্থ আমি বুঝি না।" বললাম।

"আমাদের মাথা ব্যথার কোনো প্রয়োজনই নেই। আমাদের কাজ সমগ্র মহাবিশ্বে সামঞ্জস্য রক্ষা করা। যাদের যা আকাঙ্ক্ষা তা যথাযথ সময়ে চরিতার্থ করা। ব্যক্তির অপরিপূর্ণ কামনা বিশ্বে ছোট ছোট ব্যোমের বুদ্বুদ সৃষ্টি করে। সৃষ্ট হয় অসন্তোষ, ব্যাপার। সেগুলো জমা হয়ে মাঝে মাঝে অন্তরের প্রলয় ঘটে যায়। তারই দু'একটা ঝাপটা আপনারা পান পৃথিবীতে যুদ্ধ বা বিপ্লবের রূপে। শুধু আপনাদের এই বসুন্ধরায় নয়, সমস্ত সৌরলোকের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহে। যেখানেই জীবকে প্রবৃত্তির উপরি বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে সেইখানেই ঐ একই প্রশ্ন। বুদ্ধির সমস্যা দুটো। এক, সৎ-অসতের বিচার। দুই সে কেবলই প্রশ্নই ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করে। ফলে বুদ্ধিমান জীব একদিকে কর্তব্য-অকর্তব্যের গোলক ধাঁধায় কেবলই পথ হারিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, অপর দিকে তার আশা দিনে দিনে মরু-পিপাসায় পরিণত হচ্ছে…"

বাধা দিয়ে বলি: "আপনার দার্শনিক তথ্যের অর্থ বুঝতে খুব বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না। যা বললেন, বুঝলাম, শুধু এই সব সমস্যায় আপনাদের কী কাজ সেইটুকুই বুঝতে পারছি না।"

উনি বললেন: "আমার মোদ্দা কথাটা যে শেষ করতেই দিলেন না। আমাদের কাজ কতকটা ঝাড়ুদারের কাজের মত। সমস্যার জঞ্জাল জমে উঠলে আমরা এসে তা ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিই। সে কাজ হলো সমষ্টির সমস্যার সমাধান। ব্যক্তির সমস্যা অত্যন্ত জটিল এবং সূক্ষ্ম। তার সমস্যার সমাধান করি তার পরিবেশের আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি করে। অর্থাৎ তাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়ে। এই ধরুন না। আপনি…"

"আমি?"

"হ্যাঁ, আপনি। আপনি সমষ্টির সাতেও নেই পাঁচেও নেই। আপনার সমস্যা একেবারে ব্যক্তিগত। আপনি যে জীবন যাপন করছেন, সে জীবন নিয়ে বাঁচতে চান না। সুতরাং আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আর এক জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। তাইতো এলাম। উঠুন এইবার।"

"আর এক জায়গায় মানে?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

"হ্যাঁ, আর এক জায়গায়, অন্য এক দেশে, অবশ্য এই পৃথিবীতেই, কারণ পৃথিবীটা আপনার পছন্দসই। যখন তখন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কবির উক্তি উল্লেখ করেন—পৃথিবী পরিত্রাণ কারণ সেখানে ফুল ফোটে। ওপরওয়ালাদের হুকুম হয়েছে আপনাকে নিয়ে যেতে।"

"কোথায়?"

"মেক্সিকোতে।"

"মেক্সিকোতে?"

"হ্যাঁ, ওদেশটা দেখেননি। আপনার খুব পছন্দ হবে। তার আগাগোড়া যেন আপনার মনের অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে। যেখানে যেমনটি চান। প্রথমতঃ, হৃদ্‌যন্ত্র, মার্জনা করবেন, স্ত্রীজাতির কথা তোলা থাক্। মেয়েদের সম্বন্ধে ভাবনা, ধারণা ও কল্পনায় আপনি বিশ বছরের যুবকই রয়ে গেছেন। তা সে নিন্দনীয় সেকথা বলতে চাইনে। অনেক ক্ষেত্রে তা প্রশংসনীয়। মেয়েরা যে পুরুষের ভোগবিলাস চরিতার্থ করতে সৃষ্ট হয়েছে, তা বলবো না, কিন্তু তাদের ওদিকটাকে চাপা দেওয়াও সঙ্গত মনে করি না। আপনি আপনাদের কবির "নহ মাতা" প্রভৃতি যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে উর্বশীর নারীত্বকে উপলব্ধি করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। আমরা তার সম্পূর্ণ অনুমোদন না করলেও আপনার পুরুষসুলভ কামরিপুকে দমন করবার পক্ষপাতী নই। সৃষ্টির আদ্যাশক্তির মূলে যে কাম তা কে না স্বীকার করবে? আপনি মেয়েদের বিশেষতঃ সুন্দরী মেয়েদের কামনা করেছেন বরাবর। সেই অতি কাম্য ও রম্য নারীর সাক্ষাৎ পাবেন মেক্সিকোয়। লোহিত আর্তি ও হিস্পানীদের সংমিশ্রণে জন্মলাভ করেছে নারী অপরূপা। তার নৃত্যছন্দ চলনে ইঙ্গিত, তার চটুল বলনে কোকেংরী, তার তড়িৎপ্রভ প্রেক্ষণে আকাশ আর যদি অন্তরের কথা তোলেন, তো সত্যিই তার বুকভরা মধু। ঘটঘটে, গটগটে এউরোপীয় মেয়েদের কামনাদরী পেয়েছেন, কিন্তু তাদের কামোদ্দীপ্ত, তন্ময় ভালোবাসা দেবার শক্তি নেই বলে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে আপনার পিপাসা ও অনুসন্ধিৎসা কোনোটাই মেটেনি। চলুন আমাদের সঙ্গে, অপরূপা নারীর অনবরুদ্ধ প্রেম উপলব্ধি করে আমার ক্রমোন্নতির পথ নিষ্কণ্টক করবেন।"

"লোকটা বলে কী," ভাবি মনে মনে। "আমার ভেতরের কথা ও জানলো কেমন করে? তাছাড়া ভাষাটাও ওর আমার চেনের, জাকামীর বাল ঝড়ার মত। হ্যাঁ, কাঁচা বয়সে মেক্সিকো সম্বন্ধে বইপত্তরে দেখেছি মেয়েদের ছবি দেখতাম কাবুলি চাটার মত তাকিয়ে তাকিয়ে। একবার ঘুরে এলে মন্দ কী···"

"উঠুন, ভোর হয়ে গেছে, কাকপক্ষী জাগবার আগেই আমাদের চলে যেতে হবে।" ভদ্রলোকের মেয়ে পটানোর মত ঘোলাটেমে স্বর যেন মাথায় বিলি কেটে দেয়।

মনে মনে সতর্ক হই, "সাবধান। লোকটা আবার রাজী করিয়ে না ফেলে। ফেরার কথা বলছে না তো। একবার গেলে আর ফেরা যাবে না নিশ্চয়। ছোট্ট বাচ্চাটার জন্যে তারী মন কেমন করবে। এখনো ভালো করে দেখিনি। তবু দেখবার প্রথম ঝলকটা মনে আছে। আধো ফোটা চাঁপার কলির মত। সৌরভিনী, সৌরবিনী। চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, চাহনিতে সিংহশিশুর তেজ। আর ছেলেটাকে অতবড় করে মানুষ করলাম, মায়ের মায়া দিয়ে পিতার শাসনে। ওর মা-বাপ দুইই তো আমি। সামনে থালা ধরে না দিলে খায় না, ছোট-বড় দাবলো আমার প্রশংসা পাবার জন্যে মুখ চেয়ে থাকে। আমি চলে

গেলে ওর হবে কী?···আর আমার স্ত্রীর? ওরও যে আর কেউ নেই। মাথা ভরা পিঙ্গলোনা চুল, কৌশুভনীল চোখ, রূপবতী, স্নেহভরা যৌবন, প্রাণভরা আত্মীয়তা, তবু চিত্তবিকার হয় কেন, জানি না, পারিবারিক দৈনন্দিন জীবনের সংঘর্ষে। দুই পক্ষের স্নায়ুর যুদ্ধে। এক একদিন মনে হয়েছে, এই যে সকালে বেরোলাম, আর ফিরবো না। পরে ওর বিষণ্ণ, উৎকণ্ঠিত, ছেলেমানুষের-মত-ভয়-পাওয়া সুশ্রী মুখখানির কথা মনে করে প্রাণটা হাহাকার করে উঠেছে। কেরবার সময়ের বহু পূর্বেই ফিরে এসেছি। আর এখন যদি চলে যাই, ওর মুখখানিও হয়তো মনে পড়বে না। কিন্তু সে দুঃখের বিষাদ মুছে দেবে, সলজ্জ হাসি আঁকিয়ে দেবে কে? না, না, যেতে রাজী হলে চলবে না। লোকটা শয়তান-টয়তান গোছের কেউ হবে। মেফিস্তোফিলিস্ নয় তো? মানুষের মেধিকে দুর্বলতা সেই ফিকরার লোভের কোষাগারের দোরটা খুলে ধরে লাল্চায়। খুব সাবধান হতে হবে। মুখ ফিরে অলক্ষিতে কী করে 'হাঁ' বেরিয়ে না যায়।"

হেসে নাটকী ভঙ্গিতে মাথার ওপর হাতের চক্কর কেটে ভদ্রলোক বলে চললেন: "কী মশাই আপনি যে আকাশ পাতাল ভেবে কিছুই স্থির করতে পারছেন না। অথচ ব্যাপারটা একেবারে সহজ। টুপ করে উঠে বসে খুট করে সরে পড়া আমাদের সঙ্গে। যাই হোক, জোর জবরদস্তি করা আমাদের রীতি নয়। কাজে বহাল হবার পূর্বে আমাদের তদ্বিজ-এক্সিকেতের একটা কোর্স নিতে হয়। তারপর কী বলছিলেন, শুনুন। আপনার বেয়ারাটা তো পেটের? তা আর হবে না? এদেশে বেদের ভালো ভালো খাবার ছিলো তা যুদ্ধের আগে। মনে আছে নিশ্চয়। এখন এদের পাকশাস্ত্র আর শাস্ত্র নেই। কতকগুলো সহজ ফরমুলা মাফিক এখন রান্না হয় সস্তা জনতা-মার্কা রেস্তোরাঁয়। ওরা ছাই ভস্ম খেতে খেতে পেট শ্মশান হয়ে ওঠে মশাই। আর বলুন আপনি যেখানে যাচ্ছেন, সেই মেক্সিকোয়। বড়মানুষি খাওয়ার কথা বলবো না। তা দেবভোগ্য, মশাই, দেবাধিদেবভোগ্য, অতি সাধারণ মানুষও যা খায় তা খাও, দৈনিক প্রাতঃকৃত্যের মত কর্তব্যপালন নয়। এই ধরুন না, ফুটি। ওরা এদের মতন প্যাটুপেটে পাউরুটী খায় না। যা খায় তার নামটাই বা কী? তর্তীলা। তর্তীলা-লা। ভুট্টার আটার তৈরী, প্যাটিসাপটার মত পিঠে। রুটীর বদলে খায় পিঠে।"

মেক্সিকোর খাবারের ব্যাখ্যান শেষ হয় না। তেলেভিজিয়ার পাক-প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতারত নায়রাদা হোটেলের প্রধান শেফ্-এর ভঙ্গিতে উনি খাদ্যের বিবরণ দিয়ে যান: "তাখালেস্। ভুট্টার পাতায় মোড়া হয় এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। মাংস, পনীরে লঙ্কা দিয়ে মাখো-মাখো ভাবে রাঁধা। তার সঙ্গে ভুট্টা সেদ্ধ। তারপর এই ধরুন না, তাকস্। অতি সাধারণ ভিকিরী-নাকারীদের খোরাক। কিন্তু তার স্বাদ কী! তর্তীলা ভাজা বরবটি কিংবা মাংসের সঙ্গে। খুন-খারাপীর মত লঙ্কার ঝাল মেওয়া। তারপর হলো গিয়ে এন্‌কিলাদাস্। পেঁয়াজ মাংস লঙ্কা দিয়ে ভাজা ভাজা করে তর্তীলার ভেতরে প্যাটিসাপটার মত পুর মেওয়া হয়। তারপর এই ধরুন না কোয়েসাদিল্লাস্। সে একটা ঝিলখোস্ ব্যাপার। সঙ্গে আনি নি। না হলে একটু চাখিয়ে দেখাতাম। তর্তীলার ভেতরে একটি সম্পূর্ণ পাক-সৌন্দর্য। ভেড়ার মাংস, বেশ চর্বিওয়ালা, খানিকটা সসেজ, একটু চীজ্ আর···আর বলবো নাকি? মশাই, সে স্বর্গীয় বস্তু। কুমড়ো ফুল ভাজা। সব এক সঙ্গে মিশিয়ে লঙ্কার ঝালে সাঁতলানো।···হেঁ, হেঁ, হেঁ, হেঁ···চলুন এবার। বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে···"

"কতদিন ভালো করে খেতে দেয় নি।" ভাবি মনে মনে। "ডাক্তারদের তোতালিতারিয়ানিজম্, সে তাদের ব্যবস্থা। মানুষকে শুধু বেঁচিয়ে রাখুক্ ক'রে ফেলে। ডাক্তারেরা সব করতে পারে। বেচারী

ফ্রয়েডকে সরাবার দরকার হয়েছিলো তালিনের। একদিন গভীর আন্তরিকতার সহিত বললেন, 'ফ্রয়েড, ভাই, তোর শরীরটা তো ভালো দেখাচ্ছে না। দিনরাত লেখাপড়া করিস, শরীরের দিকে একটুও নজর দিস্ না। এইবার শরীরটা সারিয়ে নে, তারপর কাজ। যা, পাশের ঘরে ডাক্তার তোর অপেক্ষায় বসে আছে।' কিছুদিনের মধ্যেই চিকিৎসা সাঙ্গ হলো।···এ খেতে নেই, ও খেতে নেই করতে করতে আমার তো খাবি খাবার অবস্থা হয়েছে। এইবার একটু অত্যাচার করে দেখলে মন্দ কী? লোকটা মেক্সিকোর খাবারের যেসব বিবরণ দিলো, তাতে মেনটাকে খারাপ বলে মনে হয় না তো। যেমন তেমন একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে দিব্যি গ্যাট হয়ে এককোণে বসে একটার পর একটা ঝাল-পরপরে খাবার আনতে হুকুম দেওয়া, এ-ধরণের ভবিষ্যৎ কল্পনায় আমারও ভয় করে। ডাক্তারদের আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশের বেড়া-জাল ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে পড়ে ছড়ি ঘুরিয়ে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে গটগটিয়ে চলে যাওয়া, সে মন্দ কী?···কিন্তু সাবধান। লোকটা আবার মনের কথা জেনে ফেলে মৌনং সম্মতি লক্ষণম্ না ধরে নেয়।···"

"কী ভাবছেন অত?" ভদ্রলোক শুধান, তারপর বলে চলেন: "শুনেছি আপনি ফুল ভালোবাসেন, যথাই ওটা ফুলের দেশ, আপনাদের দেশের মতই। ওদেশে যেসব ফুল পাওয়া যায় তা আপনাদের দেশেও পাওয়া যায় না। আর তার রঙেরই বা বাহার কী? অর্কিডের সে কী ঐশ্বর্য! ক্যাকটাস্-এর সে কী রকমারি? ধরুন না, ওদের দেশে অতি সাধারণ ক্যাকটাস্, ফরেলীনা। যা থেকে রং তৈরী হয়। ক্যাকটাসের ভেতরে লাল রক্তের মত রস। সবুজ রঙের ফুল, তার ভেতর থেকে টকটকে লাল জিভ বেরিয়ে এসেছে, গলায় ঘড়ি দেওয়া মানুষের মত। দেখেছেন এ-ধরণের উদ্ভিদ? না, দেখবেন কী করে ওদেশে না গিয়ে! তারপর ধরুন, ক্যাকটাস্। মিষ্টান্নাদিতে কখনো কখনো গন্ধ পান, এই পর্যন্ত। কিন্তু চোখে দেখেন নি তো ওর কালো ফুল? হেঁ, হেঁ, হেঁ, হেঁ···"

"ও তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে নানা ফন্দী আঁটছে। কিন্তু রাজী হয়ো না।" বলি মনে মনে। তুমি ভারী ভবঘুরে লোক। কোথাও যাবার নাম শুনলে প্রাণটা আঁকুপাঁকু করে। তাছাড়া, তুমি ভারী লাজুক। 'না' বলবার মত মনের জোর তোমার প্রায়ই হয় না। তাই লোকের পাল্লায় পড়ে অনুরোধ এড়াতে না পেরে তুমি যুগ যুগ নষ্ট করেছো। আর নয়। একটু ভরসা করে চোখ কান বুজে 'না' বলে দাও···"

"আজতেকদের আমলে নাম ছিলো টেনকৃতিত্লান্, এখন হয়েছে মেক্সিকো। চলুন সেই অতি প্রাচীন এবং অতি আধুনিক মেক্সিকো শহরে। দেখবেন গাছের আর ফুলের সে কী বাহার। স্থাপত্যে বর্ণের কী ঐশ্বর্য। পরিকল্পনার সে কী অকুণ্ঠতা! দেখবেন বর্ণের দেবতা তুলুতের মন্দির। বায়ু ও পবনের দেবতা কোয়েৎসাল্কোয়াৎল্-এর মন্দির। আর দেখবেন বিশ্ববিশ্রুত 'মরণের মহাপথ।' সেই পথ দিয়েই আমরা প্রবেশ করবো·····হেঁ, হেঁ, হেঁ, হেঁ···"

"ওহে শুনছো?" হাঁকি নিজেকে। "এইবার বুঝতে পেরেছো তো ওর মতলবটা কী! তাগিদে যাও লোকটাকে। বলো, যাবো না, কিছুতেই যাবো না, ব্যস্।"

"অত চিন্তা করছেন কেন? ব্যাপারটা একেবারে সহজ। টুপ করে উঠে বসবেন আমাদের বিমানে, তারপর ফুট করে নেমে পড়বেন। জাহাজটাতে একবার উঠেই দেখুন না। সব বদলে যাবে। প্রথমতঃ ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি একটা অনাবশ্যক বোঝা থেকে মুক্তি পাবেন। তা হচ্ছে আপনার দেহের ভার। যা টেনে টেনে জীবযাত্রাই হয়রান হয়ে পড়ে। থাকেন তো চার তলায়। জানেন তো

সিঁড়ি ভেঙে উঠতে কী রকম কষ্ট হয়। আমাদের জাহাজের উঠে পড়লে আর সেই বেদের ভার বহন করতে হবে না। আপনি একবারে নির্ভার হয়ে যাবেন! এই দেখুন না।" বলে ভদ্রলোক পাশেই একটা ছোট তাঁবুর ভেতরে রাখা একটা বেদের ওপরে সাজানো একরাশ জিনিষের মধ্যে থেকে একটা মোটা কম্বলের খোলার চশমা তুলে নিয়ে আমার হাতে দিলেন।

"তাঁবুটা আর ঐ জিনিষগুলো আমার এলো কোথা থেকে?" মনে মনে আশ্চর্য হই। লোকটা নিশ্চয় ভেল্কিবাজী জানে।

হাতের তেলোয় ধরে আছি মোটা চশমাটাকে! কিন্তু তার একটুও ভার নেই। রেখা আছে, রূপ আছে, অথচ তার নেই। এ কেমন করে হয়। কিছুই বুঝতে পারছি না।

"দেখছেন কী?"—জিজ্ঞেস করেন ভদ্রলোক।

"দেখছি চশমা, অথচ হাতের ওপর তার ভার ঠাহর হচ্ছেনা।" উত্তর দিই।

"ঠিক তাই। রূপ আছে ভার নেই। এইবার ধরুন এই মোটা বইখানা।" বলে তুলসীদাসের "রামচরিত মানস"-এর মত একটা প্রমাণ গ্রন্থ আমার হাতে চড়িয়ে দিলেন।

ভারের প্রত্যাশায় হাতটা একটু নামিয়ে নেওয়াতে উনি হো হো করে হেসে উঠলেন। "অভ্যেসের দোষ," বললেন হাসি থামিয়ে। "দেখছেন তো সংসার কী জিনিষ? বইটার চেহারাটা বিরাট, কিন্তু ঐ চেহারা পর্যন্ত। শাঁসও নেই, ভারও নেই। আমাদের উড়োজাহাজটার উঠে বসলে আপনারও শাঁসও থাকবে না, ভারও থাকবে না। আপনি আমাদের মত ভারশূন্য আত্মা হয়ে যাবেন। আমাদের চালকেরও ভারের বালাই নেই, ঐ জাহাজটারও ভারের বোঝা নেই। আর আমারও সে বালাই নেই। এই দেখুন না আমার হাতটা ধরে।" উনি ওঁর শিল্পীর মত সুষ্ঠু হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

"এই!" হাঁক দিলাম নিজেকে। "এই, হাঁদা, খবর্দার ধরিস্‌নি এই শুন্‌ছিস্, পরা? যে ওজের ভাগিবে! বলে দে সাফ্ সাফ্, যাবি না, ব্যস্!"

আমি লোহার খাটটার দুপাশ ধরে একটু একটু করে উঠে বসলাম্।

"হ্যাঁ, উঠুন, আর একটু।" ভদ্রলোক একগাল হেসে উৎসাহ দেন।" এইবার ধরুন আমার হাত।"

আমি বিছানার ওপর চেপে বসে, বহু চেষ্টা করে মনে জোর এনে একেবারে অভদ্রভাবে চেঁচিয়ে উঠলাম: "ভাগো ইহাঁসে! জাবাদি করবার আর জায়গা পাওনি তোমরা? আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যেতে এসেছো। আমি যাবো না, যাবো না, যাবো না! ভাগো ইহাঁসে! যাও। ভাগো।"

"আঃ, অমন চেঁচাচ্ছেন কেন?" অনুযোগ করেন ভদ্রলোক। "বললেই তো হতো, আপনি বাঁচতে চান্, এই জীবনটার মত প্রিয় জিনিষ আপনার আর কিছুই নেই। এখান থেকে নিয়ে যেতে গেলে আপনি ধস্তাধস্তি করতে প্রস্তুত। শুধে অত গুড়ং করেন কেন? আমাদের সঙ্গে যেতে যদি একান্তই না চান্, তো জোর জবরদস্তি করা আমাদের রেওয়াজ নয়, সে কথা তো আগেই বলেছি। আচ্ছা, তাহলে আসি। পুনর্দর্শনায়। হেঁ, হেঁ, হেঁ, হেঁ…"

দৃশ্যপট পরিবর্তনের মত সমস্ত পরিবেশ আবার বদলে গেলো। আমার চেওয়াল ঘেরা হাসপাতালের তেতলার সেই প্রকাণ্ড দালান। সঙ্গে-আনা টয়েন্‌বি-র মোটা বইখানা হাতে তুলে নিয়ে আশ্বস্ত হলাম? বইখানার ভার ঠিকই আছে।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

॥ ক্নুট হামসুন ॥

সুকুমার ঘোষ

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ। শিকাগো শহরের বাসের এক কনডাকটর মনোযোগ দিয়ে ইউরিপিডিস পড়ছেন। এতই মগ্ন হয়ে পড়ছেন যে যাত্রীদের ওঠা-নামা কোনদিকেই তাঁর খেয়াল নেই। অমার্জনীয় এই অপরাধের জন্য তাঁকে চাকরিটি খোয়াতে হল। সেদিনকার সেই সাধারণ মানুষটি পরবর্তীকালে আত্মপ্রতিষ্ঠায় অসাধারণ—ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ক্নুট হামসুন।

নরওয়ের লোম-এর এক গোঁড়া কৃষক পরিবার—পবিত্র মাটির সঙ্গে যাদের প্রাণের যোগ, তেমনতর এক কৃষক পরিবারে জন্ম হল ক্নুট হামসুনের ১৮৫৯ সালের ৪ঠা আগষ্ট। লৌকিক অর্থে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা

কিছুই হয়নি। চার বছর বয়স থেকেই পিতৃব্যের সঙ্গে সুদূর উত্তরের নির্জন লাফোতের দ্বীপে তাঁর বাল্যকাল কেটেছে। তারপর এক জুতা প্রস্তুতকারীর সহকারী হিসেবে কর্মজীবনের শুরু। কঠিন দারিদ্রের মধ্য দিয়ে তাঁর সমগ্র শৈশব ও কৈশোর কাল অতিক্রান্ত হয়। বস্তুত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তিনি দুঃখের স্বরূপ চিনেছিলেন। উনিশ বছর বয়সে একটি দীর্ঘ কবিতা এবং উপন্যাসের দক্ষিণার উপর নির্ভর করে চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। শুরু হল দীর্ঘ বারো বছরের বিচিত্র বর্ণসমারোহময় এক মহৎ পর্যটক জীবনের। ক্রিশ্চিয়ানিয়া [এখনকার অস্‌লো] বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনোর ইচ্ছেটাই প্রবল ছিল। অবস্থা বিপাকে তা আর হয়ে উঠল না। বহুরূপী জীবিকার মধ্য দিয়ে তাঁর এ সময়টা অতিবাহিত হয়। দেশ ভ্রমণের নেশায় ইতিমধ্যে দু-দুবার আমেরিকা ঘুরে এসেছেন।

তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত একই রকম কেটে গেল। কোন দিকেই কোন সুরাহা হোল না। তবে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, পর্ব থেকে পর্বান্তরে সঞ্চিত হয়েছে অভিজ্ঞতার স্বর্ণভাণ্ডার। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকবার জন্য প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছেন আর তাদের সহগামী হামসুন হৃদয় দিয়ে বারবার তা অনুভবও করেছেন। তাঁর নিজের জীবনেও একাকীত্বের ফলে প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে নিবিড়। ১৮৮৮ সালে কিনেমারের এক পত্রিকায় 'ক্ষুধা' প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি তাঁর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা এনে দিল। তবে নরওয়ের রক্ষণশীল সমাজের তিনি বিরাগভাজন হলেন। বিদ্রূপ আর বিরুদ্ধ সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল। মাত্র ৬ বছর আগে

ইবসেনের 'প্রেত'-এর অভিনয় নিষিদ্ধ হয়েছে। প্রগতিশীল চিন্তাধারার সমর্থক সংখ্যা তখনও মুষ্টিমেয়। উনবিংশ শতাব্দীর নরওয়ে সমাজের রক্ষণশীলতার জগদ্দল পাথরটি তখন ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত হচ্ছে। তখনকার দিনে 'আমি হামসুনের ভক্ত' এ কথা বলতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন হত। ১৮৮৯ সাল থেকে পরবর্তী তিরিশ বছর অনলস সাহিত্য সাধনার ইতিহাস। একদা ইবসেনের আবাসভূমি গ্রিমষ্টাডের কাছাকাছি নোরেরহোলমেনে, যেখানে উত্তর সমুদ্র বাঁক নিয়েছে, সেখানে একটা ছোট্ট শাদা দোতলা বাড়ি তাঁর আশ্রয়স্থল ছিল।

নির্জনতাপ্রিয় হামসুন বরাবরই নিজেকে আড়াল করা অপছন্দ করতেন। তাঁর সত্তর বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে নরওয়ের লেখকসমিতি জয়ন্তী উৎসবে স্মারকচিহ্ন হিসেবে একটি মনোরম কাপ দেবার ব্যবস্থা করেন। সারা ইউরোপ থেকে সাংবাদিকরা এসে জড়ো হলেন হামসুনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আশায়। হামসুন এদিকে বাড়ি থেকে পালিয়ে একেবারে দিন তিনেক গুপ্ত আবাসে লুকিয়ে রইলেন। এতে সাক্ষাৎকারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। আর সমিতিকে উপদেশ দিলেন তাঁর নামটি উঠিয়ে অন্য আর কাউকে ওটা দিতে। কখন কখন উত্তান-সংলগ্ন অপরিচ্ছন্ন ধূলিধূসরিত একটি বদ্ধ ঘরে বসে লিখতেন আবার কখন চলে যেতেন নিকটবর্তী মৎস্যজীবীদের গ্রামে। সেখানকার সরাইখানাতে বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে দিতেন পাণ্ডুলিপি রচনায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মাৎসীবাহিনীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি অনেকের মর্মপীড়ার কারণ হয়ে ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী নরওয়ে দখল করে ১৯৪০ সালে। মাৎসীবাহিনী অসলোতে পৌঁছবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হামসুনের আশীর্বাদ লাভ করে। প্রবীণ লেখককে এর জন্য চেনস্থাও কম সহ্য করতে হয়নি। নেগাৎই বয়সের জন্য তিনি হাজত বাসের দুর্ভাগ্য এড়াতে পেরেছিলেন। অনুমান করা যায় অবজ্ঞা আর অপমানের তীক্ষ্ণ তাঁকে কতখানি ব্যথিত করেছিল। রাজনীতির তর্কজীর্ণ প্রকাশ্যতা থেকে তাই নিজেকে ফিরিয়ে নিলেন। একাকিত্বের অন্তরালে জীবনের শেষ কটা দিন গ্রিমষ্টাডে তাঁর খামার বাড়িতে কেটে গেল। ১৯৫২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি এই মহৎ জীবনের অবসান হয়। 'মানবসত্তার মহৎ বৃত্তির মধ্যে সৌন্দর্য ও সুবিচার —এ দুইই সবার সেরা'—হামসুন বলেছিলেন তাঁর প্রকাশকের প্রশ্নের উত্তরে।

হামসুনের অধিকাংশ রচনা আত্মজীবনীমূলক। উত্তর নরওয়েতে তাঁর শৈশবের বেদনাময় স্মৃতি অথবা যাদের মধ্যে সেই দিনগুলো অতিবাহিত হয়েছিল তাঁদের জীবন-সংগ্রামের কাহিনী পরবর্তীকালে হামসুনের অধিকাংশ রচনার প্রধান উপজীব্য হয়। তাঁর প্রথম পর্যায়ের লেখায় যেমন যৌবনের উদ্দামতা লক্ষণীয় তেমনি অনুধাবনীয় তাঁর জীবনবোধ পরবর্তী কালের রচনায়। বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে দুটি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হোল।

হামসুনের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ক্ষুধা' উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশে ও বিদেশে যে আলোড়ন হয়েছিল তা বিশেষ লক্ষণীয়। প্রতিভাবান ও অক্ষম অনুকারক—একই সঙ্গে নিন্দা এবং প্রশংসা দুইই বর্ষিত হল। তবে তাঁর অতিবড় বিরুদ্ধ সমালোচকও স্বীকার করেছেন যে, নরওয়েজীয়ান সাহিত্যে হামসুন একটি অভিনবপূর্ব ধ্বনির সুর সংযোজন করেছেন। তাঁর বাহুল্যবর্জিত সহজ সরল ভাষা বর্ণনাগুণে উজ্জ্বল ও প্রাণময়। শব্দ নির্বাচনের সূক্ষ্মতা, কাব্যময়তা এবং বাক্যগঠনের প্রতীকধর্মিতা তাঁর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, স্বদেশী ভাষা সংস্কারে হামসুনের অবদান বিস্ময়কর। অল্পদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক ও

স্বকীয়তার একটি নতুন ধারার প্রবর্ত্তক হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। হামসুনের মত মহৎ শিল্পীর কাছে সমাজের চেয়ে জীবনের প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক। বাস্তবতার নিরাবরণ নির্ভীক প্রকাশ হামসুন-সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'ক্ষুধায়' বর্ণিত হয়েছে ঘরবাইহীন দারিদ্র্যের কাহিনী। জৈবিক ক্ষুধা একটি মানুষের জীবনে কী সর্বগ্রাসী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নিপুণ মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখক তা ব্যক্ত করেছেন। আসলে সে যুগের বঞ্চিত জীবনের চিত্র তিনি রূপায়িত করেছিলেন তাঁর সাহিত্যে আর রক্ষণশীল সমালোচকদের তাই তাঁর কারণ হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থটি রচিত হলেও তৎকালীন পরিবেশ থেকে সঞ্চারিত আবেগ ও অনুভূতি সমৃদ্ধ তবুও দীর্ঘকাল পরে আজও তার আবেদন এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়নি। কালের বিচারে আজ নিঃসন্দেহে তাঁর মহৎ শিল্পী সত্তা স্বীকৃত। আধুনিক নরওয়েজীয়ান সাহিত্যের প্রায় সব লেখকই পূর্বসূরি হামসুনের নিকট কোনও না কোন ভাবে ঋণী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাংলা সাহিত্যের পালাবদলে, কল্লোল যুগে যার সূত্রপাত, হামসুনের সাহিত্যাদর্শ প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল।

হামসুনের অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'মাটির জাগরণ' তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার অভ্রান্ত স্বাক্ষর। যৌবনের প্রমিথিউস তাঁর উদ্যমতা থেকে আজও রয়েছেন জীবনবোধের গভীরতায়। এই দীর্ঘায়তন উপন্যাসটিতে মহাকাব্যের লক্ষণলক্ষণ প্রতিভাত। ১৯৩০ সালে হামসুন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নোবেল প্রাইজ পান প্রধানত এই উপন্যাসটির জন্য। নরওয়ের পটভূমিকাতে লিখিত এই সামাজিক ইতিবৃত্তটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। সময়কাল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ। নরওয়ের এক নির্জন বন্ধ্যা প্রান্তরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আইসাক আর ইঙ্গের-এর প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম, অনাবাদী জমির রূপান্তর এবং জনপদসৃষ্টির কাহিনী এই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। আইসাক-এর নিকট মাটির অর্থই জীবন। প্রধান ও অবিস্মরণীয় চরিত্র আইসাক সকল দেশের সকল জাতির মুক্তপ্রাণ মানুষের প্রতিনিধি, যারা দুঃখবরণ ও সংগ্রাম করে অবশেষে জয়ী হয়। মহান মানবিকতা, সুগভীর জীবনবোধ আর সংগ্রামী ঐতিহ্য হামসুন সাহিত্যের মর্মকথা।

জনৈক সৈনিকপুরুষ নগরের বহির্দেশে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া সেনাবাসের নিকট উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'আমি একজন তাতারকে ধরিয়াছি।' ভিতর হইতে একজন বলিল, 'উহাকে ভিতরে লইয়া আইস।' সৈনিক বলিল, 'সে আসিতেছে না মহাশয়।' 'তবে তুমি একলাই ভিতরে চলিয়া আইস।'—'সে যাইতে দিতেছে না মহাশয়।' আমাদের মনের ভিতরেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। আমরা সকলেই 'তাতার ধরিয়াছি'। আমরাও উহাকে থামাইতে পারিতেছি না, উহাও আমাদিগকে শান্ত হইতে দিতেছে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

॥ একজন ও আরেকজন ॥

শ্রীজবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এতক্ষণ কাৎরাচ্ছিলো, এখন সেই ক্ষমতাও অন্তর্হিত ; বিষম ঠাণ্ডায় এখন একেবারে জিম মেরে আছে সন্ধেটা। মস্ত তোরণটার তলায় দাঁড়িয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলো সে ; ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, আর তারই ঝাপসা পাখা সকেন রেখার ভিতর ছায়া নেমে এলো ঘেঘলা আকাশ আর গোধূলিবেলার। কোনো কিছুই ভাবছে না সে, মাথার ভিতরটা একেবারেই ফাঁকা ; যেন যেখানে তার ভেতরে মধু এবং বিষ্ণু থাকতো, এখন সেখানটায় শূন্য একটা গহ্বর কেবল কালো হা বের ক'রে প'ড়ে আছে। শুধু বৃষ্টির আবছায়ার দিকে তাকিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগলো, কখন বৃষ্টিটা ধ'রে আসে। কতক্ষণ হ'য়ে গেলো—একা সে দাঁড়িয়ে আছে এমনি, বৃষ্টির ঝাঁট থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তোরণের মস্ত থামের আড়ালে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, একা, একটানা।

বিশাল সেই তোরণের তলায় সে ছাড়া আর কেউই নেই। মস্ত চওড়া থামটার উপর কোনো এককালে গালার পালিশ ছিলো ; এখন কোনো কোনো জায়গায় চলটা উঠে গেছে, কালো কালো দাগ বেরিয়ে পড়েছে নানা রকম—কোনোটা প্রায় গোল, কোনোটা আঁকাবাঁকা, কোনো-কোনোটা আবার তিনকোণা কি চারকোণা। একটা দাঁড়কাক ভিজে একশা হ'য়ে থামটার পাশে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো—এখন তার কালো পালকগুলি কী রকম যেন রোঁয়া-ওঠা আর খুটিখুটিয়ারা—যেন পাখনাগুলি দিয়ে কোনো রকমে তার ছোট্ট একটুখানি ধড়ফড়ে বুককে সে কোনো ভীষণ দৈবের হাত থেকে আড়াল ক'রে রাখতে চাচ্ছে। বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আরেকটা শব্দ সেই নিঃঝুমকে অনেকক্ষণ থেকে বাড়িয়ে তুলছে : গম্ভীর, ভরাট গলায় কতগুলি ব্যাঙ ডাকছে সেই থেকে—কোথায় তারা লুকিয়ে আছে, সে আশপাশে তাকিয়েও তা দেখতে পেলো না। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের কাছে তোরণটা ; কাল সকালে উৎসব শুরু হবে ; উচিত ছিলো নিশ্চয় আরো কয়েকজন লোক এই তোরণের তলায় এসে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষা করছে—এই দৃশ্যটা তার চোখে পড়া। তাদের কারো মাথায় পাগড়ি থাকতে পারতো, কেউ হয়তো মণিখচিত শিরোভূষণ আর জমকালো পোশাকে বৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতো—দূরের গ্রাম থেকে একদল নারীপুরুষ তীর্থযাত্রী কলরব ও উত্তেজনায় বৃষ্টির আওয়াজকে ডুবিয়ে দিলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকতো না। কিন্তু কেউ নেই, কিছু নেই। শুধু সে দাঁড়িয়ে আছে একা, হতবাক—ওই দাঁড়কাকটি ছাড়া আশপাশে আর-কোনো চিহ্নই নেই জীবনের।

গত কয়েক বছর ধ'রে ভুবনেশ্বর ও তার আশপাশের অঞ্চল একের পর এক দুর্ঘটনার কবলে প'ড়ে নাজেহাল ও বেসামাল হয়েছে : প্রথমে এলো যবনদের তীব্র ও প্রচণ্ড আক্রমণ, নিরস্ত্র ও শান্তিপ্রিয় বাসিন্দাদের কাতর মোহ্যমান ও বিমূঢ় ক'রে তা চ'লে গেলো। তার পরেই এলো ভূমিকম্প, একবার উঠলো ঝড় আর ঘূর্ণিবাত্যা, অগ্নিকাণ্ড হ'লো পর পর কয়েকবার, এমন কি দুর্ভিক্ষও তার সুযোগ এবং দাবি একতিলও ছাড়লো না। প্রায় বিধ্বস্ত হ'য়ে গেছে ভুবনেশ্বর—যেন অচিরেই তার অবসান অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য। জনরব দেবদেবীদের প্রতিমা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিশ স্তূপাকারে প'ড়ে আছে রাস্তায়

আলানি কাঠ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য—সোনারূপো লাক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় মূল্যবান অলংকার ও আবরণ সব তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই যখন অবস্থা তখন মন্দিরে যাবার পথে তোরণগুলির তত্ত্বাবধান যে মেরামত করা হবে না, তা তো বলাই বাহুল্য। আর প্রত্নতাত্ত্বিক এই দুর্দৈবের সুযোগ পেয়ে শেয়াল, চিতা ও অন্যান্য জন্তুজানোয়ার এই সব তোরণ ও মন্দিরের আশপাশে নিজেদের বাসস্থান রচনা করেছে, চোর ডাকাত ও বন্যজন্তুও উৎপাতের মধ্যে আরেক কাঠি বিভীষিকা সঞ্চার করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করছে না। শকুন আর গৃধিনীদের উল্লাস অনন্ত বিপ্রহরকেও কর্কশ কলহ ও চীৎকারে ছিঁড়ে ফালে। ফলে ক্রমশ এটাই রেওয়াজ দাঁড়িয়েছে যে বেওয়ারিশ লাশগুলিকে জনপদের প্রান্তে এই সব তোরণের ধারে-কাছে ফেলে রেখে চ'লে যাওয়া কেননা দু-তিন দিনের বেশি অপেক্ষা করতে হয় না, শেয়াল শকুন ও কুকুরের উপদ্রবে তার মধ্যেই হাড়গোড় ছাড়া আর কিছুই প'ড়ে থাকে না সেখানে; শুধু হাওয়া আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে পচা মাংসের দুর্গন্ধে—বিকট সেই গন্ধ এমন, যে মনে হয় যেন অন্নপ্রাশনের ভূরিভোজ থেকে শুরু ক'রে পাকস্থলির যাবতীয় নাড়িভুড়ি সমেত সব উল্টে বের ক'রে দেবে। সন্ধের পরে তো গোটা অঞ্চলটাই এমন অপার্থিব ও ভৌতিক ব'লে বোধ হয় যে কেউই আর ধারে-কাছে আসার সাহস করে না।

কোত্থেকে যেন একদল কাক জিরে কুকড়ে উড়ে এলো সেখানে। দিনের বেলায় এরা তোরণের মাথার উপর ঘুরে ঘুরে চক্কর দেয়, পাক খায়, আর টেনে টেনে ডেকে দিনের আলোকে পর্যন্ত বিভীষিকার ধারে কাছে নিয়ে আসে। অস্ত সূর্যের পড়ন্ত আলোয় আস্ত আকাশটাই যখন লাল হ'য়ে ওঠে, তখন তারা যখন তোরণের উপর দিয়ে উড়ে যায়, মনে হয় যেন তিলের দানা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলেছে। আজ কিন্তু এতক্ষণ ওই একলা দাঁড়কাকটা ছাড়া আর কোনো কাকই ছিলো না আকাশে, হয়তো বেলাশেষের আকাশে তারা ভেসে বেড়ায় না, হয়তো বর্ষার জন্য এতক্ষণ তারা অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়েছিলো। এখন দেখা গেলো সিঁড়ির উপর থামের ধারে কার্নিশের উপরে কালো ফুটকির মতো একটা দুটো ক'রে অনেক এসে ব'সে পড়লো। সিঁড়ি, থাম, কার্নিশ সব কিছুরই ভগ্ন দশা; ফাওলা জমেছে এদিক-ওদিক, কোথাও বা কার্টলের মধ্য থেকে মাথা তুলেছে অশ্বত্থের চারা, কচি পাতাগুলি বৃষ্টির ছাটে কেঁপে কেঁপে উঠছে। লোকটা ব'সে আছে সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িতে, চত্বরের ঠিক পাশেই, মস্ত গভীর সেই কুয়োটার ধারে। গায়ে তার নীল জামা; চওড়া পাড়ের ধুতি পরেছে এমনভাবে যেন কাপড় পরাটা বস্তুত লজ্জাবশতই পরা, নয়তো উলঙ্গ সে ঘুরে বেড়াতো চারপাশে। সিঁড়ির উপর ব'সে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে সে বৃষ্টির দিকে। কখনো মনোযোগের সঙ্গে দেখছে সরু রেখার মতো জলের ধারা কী ভাবে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে চত্বর, নানা রেখায় ছোটো ছোটো জলধারা চত্বরটাকে কীভাবে আস্তে-আস্তে মসৃণ ক'রে নিচ্ছে। তারপর এক সময় তার সব মনোযোগ গিয়ে পড়লো: ডান গালের সেই ব্রণটায়, যার অনুভূতি হঠাৎ ক্রমশ যেন বর্ধমান হ'তে চলেছে।

বৃষ্টি কখন ধ'রে আসে ব'সে ব'সে তারই জন্য অপেক্ষা করছে সে। কিন্তু বৃষ্টি থেমে গেলে সে কী করবে, তা সে সঠিক জানে না। কোনো পরিকল্পনাই নেই তার, কোনো সংকল্প কিংবা দায়িত্ব নেই—আসলে কিছুই করার নেই একেবারে। আরো কয়েকদিন আগে হ'লেও সে বলতে পারতো আমার এতসব কাজ আছে, অমুক অমুক জায়গায় যেতে হবে। কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই তার। এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর বাড়িতে সে কাজ করতো কিছুকাল আগে, সম্প্রতি তাকে বরখাস্ত ক'রে দেয়া হয়েছে। নগরের যা কিছু উন্নতি ঘটেছিলো একদা, এখন তা লীয়মান। যেন হঠাৎ আস্ত নগরটাই গরীব

হ'য়ে গেছে। ফলে বহু বছর কৃতিত্বের সঙ্গে প্রভুর সেবা করা সত্ত্বেও প্রভু যাঁরা হলেন তাকে বিদায় দিতে। আর শেষ যে-ভূমিকম্প হ'লো, তাতে দেখে তার ঘরবাড়িই যে শুধু ধূলিসাৎ হয়েছে তা নয়, পরিবার পরিজন গোরু সব ওই দুর্ঘটনায় মারা গেছে। এখন তবু বৃষ্টির জন্য বন্দী হ'য়ে আছে—অন্তত চেষ্টা করলে এখন সে জীবনের একমাত্র আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে এই ব'লে প্রকাশ করতে পারে যে—'আমি চাই বৃষ্টিটা থেমে যাক—'; যেন বৃষ্টির জন্যই তার যাবতীয় সংকল্প ও পরিকল্পনা নষ্ট হ'তে বসেছে। কিন্তু বৃষ্টি থেমে গেলে সে কী করবে, কোথায় যাবে, কেমন ক'রে যাবে—কিছুই সে জানে না। মনের ভেতরটা গহ্বরের মতো ফাঁকা: এইসব প্রশ্ন কেবল দীর্ঘ ও ক্ষীণ প্রতিধ্বনিই তোলে অক্লান্তভাবে কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া যায় না, কিংবা কোনো ভাবেই সে সাহায্য করে না। আর তার এই বিমর্ষ ও অসহায় মেজাজকে এই মেঘলা আবহাওয়া আরো গুরুভার ও বিষণ্ণ ক'রে গেলো। বৃষ্টি যে আদৌ কোনোকালে থামবে, তা মনে হয় না। বেশ হয়, যদি প্লাবন ভাসিয়ে নেয় সব কিছু; বোধহয় এটাই বাকি ছিলো দুর্ভোগের তালিকায়। কী ক'রে যে জীবিকা নির্বাহ করবে, কী ক'রে ভূমিবৃত্তি ক'রে চিরকাল ধ'রে বেঁচে থাকবে, এই ভাবনার অসীম পথের মধ্যে সে যেন ক্রমে হারিয়ে গেলো। অসহায় ও অসংলগ্ন ভাবনা, এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত—একটির সঙ্গে আরেকটির কোনো যোগসূত্র নেই, নেই কোনো সামঞ্জস্য কি তারসাম্য—শুধু অবিশ্বাদিত অসংবরণীয় ও অসংশোধনীয় ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো ছাড়া আর কিছুই তারা করছে না। বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম, আর চৈতন্যকে স্থির ধরিয়ে দিতে চাচ্ছে যেন; হাপশাভাবে সে কেবল একটানা ওই বৃষ্টির শব্দ শুনে চললো।

হঠাৎ আরো জোরে হাওয়া এলো, বৃষ্টির প্রবলতাও বেড়ে গেলো। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে তোরণের চারপাশে—অনেক দূর থেকেও যেন তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো, তোরণের ঠিক ছাতের উপরটা রঙমার্কা কালো মেঘ ওৎ পেতে আছে—যেন সুযোগ পেলেই তুমুল শব্দ ক'রে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে মাথার উপর।

উপায় বলতে কিছুই তার নেই; ভালো কি মন্দ, সৎ কি অসৎ, ন্যায় কি অন্যায়, এ সব প্রশ্নই ওঠে না; পরিস্থিতি যে রকম তাতে তাকে টিকে থাকতে হ'লে বাছাবাছি করলে চলবে না। নির্বাচনের কোনোই সুযোগ নেই—হয় সে বাঁচবে, নয় মেনে নিতে হবে মৃত্যুকে। যদি সৎপথে থাকার চেষ্টা করে, তা'হলে অচিরেই তাকে উপবাসে জীর্ণ ও নির্জীব হ'য়ে নর্দমায় প'ড়ে পচতে হবে। অন্য সব বেওয়ারিশ লাশের মতো তার মৃতদেহও অচিরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে তোরণের আশেপাশে ফেলে দিয়ে যাওয়া হবে। ঠিক পথের কুকুরের মতো ম'রে প'ড়ে থাকবে সে আর শেয়াল ও শকুনকে খাদ্য জোগাবে। আর যদি সে চুরি করবে ব'লেই সংকল্প করে, যদি বিবেক নামক বিগ্রহটিকে বুক থেকে ছিঁড়ে খুবলে বের ক'রে নিয়ে ওই বেওয়ারিশ লাশের মতো নর্দমার পাশে ফেলে দিতে পারে……নানা দিক পর্যালোচনা ক'রে বারে বারে একটি খাদের পাশে এসে দাঁড়ালো তার ভাবনা;—হ্যাঁ, চুরিই করবে সে; তস্কর না হ'য়ে উপায় নেই তার; পারলে সে যেন বাঘের মতো থাবা বাড়িয়ে সে নিজের বুক থেকে বিবেককে থাবলে তুলে নিতো। সর্বনাশ সমুৎপন্ন হ'লে বিজ্ঞজনেরা অর্ধেক ত্যাগ করেন; সে তো কেবল একটি অবাঞ্ছিত জিনিসকেই উপড়ে ফেলতে চাইছে, উটের পিঠে কুঁজের মতো যা কদাকার, বেখাপ্পা ও নিষ্ক্রিয় ক'রে রাখে মানুষকে।

কিন্তু সন্দেহ, সংশয়, দ্বিধা—এরাও তাদের হিংস্র অধিকার ছাড়লো না। বারে বারে তারা সার বেঁধে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। বাছাবাছি করার কোনো সুযোগই নেই, একান্তই নিরুপায় ও অসহায়

সে—এটা মর্মান্তিকভাবে অনুধাবন করলেও চৌর্যবৃত্তিকে এ-রকম অবস্থাতেও সমর্থন করা যায় কিনা এই বিষয়ে কিছুতেই সে মনস্থির করতে পারলো না।

ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিলো—কয়েকবার তাকে হাঁচতে হ'লো অনিচ্ছা সত্ত্বেও। হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়েছে, কনকনে ঠাণ্ডা—পাঁজরার ভিতর চোখা ছুরির মতো হাওয়া বিঁধে যাচ্ছে বারে বারে। কুকুর যেমন ক'রে অপরীরীদের অনুভব করে হঠাৎ, আর রাগ, ভয় ও ক্রোধে আচ্ছন্ন হ'য়ে চাঁচায় একটানা—তেমনিভাবে তোরণের থামের গায়ে বুনো হাওয়া চীৎকার ক'রে আছড়ে পড়ছে। ঝিল্লির শব্দ এখন আর নেই—কেবল মাঝে মাঝে কতিপয় ব্যাঙের সম্মিলিত গলা ঐকতানটিকে আবার শুরু করবার ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে।

ঘাড় বাঁকিয়ে আশপাশে একবার সব অবলোকন ক'রে নিলো; কামিজটাকে আরো টেনে নিয়ে এমনভাবে চিবুকে হাঁটু ঠেকিয়ে গুটিয়ে বসলো যেন নিজের বুকের গরমে আত্ত শরীরটাকে সে ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করবে। যদি বৃষ্টি আর হাওয়ার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার উপযোগী কোনো কোনাখামচি পাওয়া যায়, তা'হলে রাতটা সে এখানেই কাটিয়ে দেবে স্থির করলো। চওড়া একটা শান-বাঁধানো সিঁড়ি উঠে গেছে মিনারের ধারে। সেখানে মস্ত একটা চাতাল আছে—ছাতও আছে,—অনেকটা কোনো চাকা অলিন্দের মতো। কেউ থাকে না সেখানে; কেউ থাকবে না নিশ্চয়ই, যদি থাকে তো কেবল মৃতদেহ থাকবে কতিপয়। প্রথমে উঠে সাবধানে দেখলো যাতে কোথাও তরবারি প'ড়ে না থাকে; খাপের মধ্যে ভালো ক'রে তরবারিটি ঢুকিয়ে রেখে হাতলে হাত রেখে সিঁড়ি বেয়ে সে উঠতে লাগলো আস্তে আস্তে।

কেবল কয়েক মুহূর্ত গেছে, এমন সময় হঠাৎ দেখলো কী যেন ন'ড়ে উঠলো সিঁড়ির উপর, কে যেন শাঁৎ করে স'রে গেলো একপাশে। নিশ্বেস বন্ধ হ'য়ে যেতে চাইলো প্রথমে, তারপর রুদ্ধশ্বাসে কোনো শিকারি মার্জারের মতো স্তব্ধ, স্থির ও অনিবার্য পায়ে মিনারের সিঁড়ির দিকে আরেকটু এগিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে সমস্ত অস্তিত্বকে উৎকর্ণ করে সে তাকিয়ে থাকলো। কোনো-এক আশঙ্কায় ও পূর্ববোধে তার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যেন তীব্র তীক্ষ্ণ ও প্রচণ্ড হ'য়ে উঠলো যাতে সামান্যতম শব্দ কিংবা চলাফেরা তার কাছে অতিকায় ও বিস্ফারিত ভাবে পৌঁছে যেতে পারে। মিনারের উপরে একটা জায়গায় একটা গোল ঘুলঘুলি মতো; বাসন্তী দেখলো আলো আসছে সেখান দিয়ে: বাঁকাভাবে সেই ক্ষীণ আলো এসে তার পায়ের সেই ব্রণটির উপর পড়লো। কোপের মতো দাড়ি সারা মুখময়, আর তারই ভিতর দিয়ে ব্রণটি তার পক্ক ও শ্বেত মুখ তুলে দিয়েছে। কেবল মৃতদেহই আছে এখানে, এই সে ভেবেছিলো; কিন্তু আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দেখলো উপরের সেই চাতালের মতো জায়গাটায় কে যেন অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়েছে; ভিজে কাঠের ধোঁয়া, সোঁদা গন্ধ আর আগুনের লাল শিখা—সব যেন অন্তর্দৃষ্টিতে তার উপর একসঙ্গে লাফিয়ে পড়লো। তাকিয়ে দেখলো ওই আগুনের পাশেই কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে দেখলো, ছাতের ধারে, দেয়ালের উপরে মাকড়সার জালের উপরে আগুনের দীপ্ত ছায়া লাফিয়ে লাফিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে, আর একটা হলুদ, সকাতর, ও কম্পিত আলোর নাচে মাকড়সাগুলি কেমন ভৌতিক আর অপার্থিব দেখাচ্ছে—যেন এই জায়গাটা মুহূর্তে প্রেতলোক থেকে উঠে এসেছে। এই তোরণের উপরে আলো জ্বালালো কে? কী ধরণের লোক হ'তে পারে সে? কেমন লোক? এই ঝড়ের মধ্যে কে এখানে আশ্রয় নিতে পারে? অজ্ঞাত এক অশুভ কালোছায়া যেন ঘুরে গেলো তার উপর দিয়ে। যেন কোনো অচিন্তিত বিভীষিকা তাকে সজোরে এক ধাক্কা মেরে চ'লে গেলো।

সরীসৃপের মতো নিঃশব্দে ওই খাড়া সিঁড়িগুলি বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো সে। তারপর হামাগুড়ি দিতেই গলা বাড়িয়ে মিনারের ওই বাসিন্দাটির দিকে তাকাবার চেষ্টা করলো।

অনুভব যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ সে স্বচক্ষে দেখতে পেলো। সত্যি, বেওয়ারিশ কতগুলি লাশ প'ড়ে আছে চাতালে। আলো যেহেতু ক্ষীণ, এবং যেহেতু সে বুকে হাঁটছে ব'লে মেঝের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে রেখেছে সেইজন্যে সে শুনতে পায়লো না ক'টা লাশ প'ড়ে আছে। শুধু দেখলো কতগুলি লাশ সম্পূর্ণ নগ্ন—আপাদমস্তক অনাবৃত, কোনো কোনো লাশের গায়ে তখনো পোশাক রয়েছে। স্ত্রীলোকের মৃতদেহও আছে কতগুলি; মেঝের উপর প'ড়ে আছে তারা—যা ক'রে আছে কেউ কেউ, কারো কারো হাত পা ছড়িয়ে আছে, কারো মরা চোখ অপলকে তাকিয়ে আছে—যারা মড়াগুলিকে এখানে এনে ফেলে রেখে গেছে তারা মৃতের চোখের পাতা পর্যন্ত বুজিয়ে দেয় নি। যেন কতগুলি মাটির পুতুল প'ড়ে আছে এলোমেলো। যে এই পুতুলগুলিকে বানিয়েছিলো, সে যেন বিভীষিকা ভালোবাসে ব'লেই তার পুতুলগুলিকে ও-রকম বীভৎস, কদাকার ও নিষ্প্রাণ ক'রে বানিয়েছে। তারা যে কোনো কালে বেঁচে ছিলো, প্রাণবন্ত ও স্পন্দমান ছিলো—তার কোনো চিহ্নই নেই এমন ভীষণভাবে তাঁরা স্তব্ধ ও নিঃসাড়। গ্রীবা, ঘাড়, কাঁধের হাড় কিংবা মাথার চুল সেই ঝাপসা আলোর মধ্যে যেন তীক্ষ্ণভাবে ফুটে বেরোচ্ছে, শরীরের বাকি অংশটুকু আপোপাস্ত ডুবে আছে ছায়ার ভিতরে। পচা ও গলমান সেই সব মড়ার তীব্র দুর্গন্ধ তাকে মুহূর্তে নাকে হাতচাপা দিতে বাধ্য করলো।

কিন্তু পরক্ষণেই কলের পুতুলের মতো তার হাত খুলে পড়লো। দেখতে পেলো প্রেতের মতো একটা লোক ও-রকম একটা গলা মৃতদেহের উপর ঝুঁকে প'ড়ে কী যেন দেখছে। হাতে তার জ্বলন্ত এক টুকরো কাঠ, তারই ভুতুড়ে আলোয় দীপ্ত হয়েছে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ—আর ভূতের মতো সে তাকিয়ে আছে তারই দিকে।

কৌতূহলের বদলে আতঙ্ক আর বিভীষিকা প্রথমটায় তাকে এতই আচ্ছন্ন করলে যে সে নিশ্বেস নিতেও ভুলে গেলো। তার রোমকূপগুলি যেন খাড়া হ'য়ে উঠলো ভয়ে, মাথার চুলগুলি পর্যন্ত সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হ'য়ে গেলো। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো, ওই ভূতের মতো লোকটা মৃতের গলায় হাত রাখলো। তারপরে যখন হাত তুলে আনলো, দেখা গেলো তার হাতে একটা কণ্ঠহার ঝলমল ক'রে উঠলো। জ্বলন্ত কাঠটির কাছে হারটিকে ধ'রে খুব ভালো ক'রে তাকে দেখতে লাগলো লোকটা। আর সে তাকিয়ে দেখলো লোকটার চুল শণের মতো শাদা, ঝোপের মতো শাদা দাড়ি লোকটার মুখময়; ঘাড়ের কাছে মাংসের মধ্যে ঢিলে ঢিলে ভাঁজ পড়েছে, চামড়া কুঁচকোনো ও শিথিল।

যেই বুঝলো লোকটা বুড়ো অমনি ভয় কেটে ঘৃণায় তার আপাদমস্তক রী-রী ক'রে উঠলো। ঘৃণা নয় শুধু, তাকেও ছাপিয়ে গেলো তার বোধ; যেন এক তীব্র অনীহা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে—পাপের বিরুদ্ধে অনীহা, অশুভের বিরুদ্ধে অনীহা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনীহা। প্রচণ্ড বিরোধিতা যেন হঠাৎ বুকের মধ্যে গর্জন ক'রে উঠলো। এই মুহূর্তে যদি কেউ তাকে জিজ্ঞেস করতো, কী চাও তুমি? অসৎ পথ অবলম্বন ক'রে বেঁচে থাকতে, না, সৎপথে থেকে অনাহারে উপবাসে ঢিলে ঢিলে শুকিয়ে মরতে, তাহ'লে সে উত্তর দিতে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করতো না, তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট ও তীব্রস্বরে নির্ঘাৎ মৃত্যুকেই আরাধ্য ও অভীষ্ট ব'লে নির্বাচন করতো। বুড়োটা তখনো হাতের মশালটি মেঝের নামিয়ে রেখে দুই হাতে হারটিকে ধ'রে আছে। পাপের বিরুদ্ধে তার যে ঘৃণা, ঠিক ওই মশালটার মতোই তা বহ্নিমান ও দীপ্ত হ'য়ে উঠলো।

কোনো ঝড়ের রাতে এমনি কোনো পাশুবর্জিত তোরণে কোনো মৃতের গলা থেকে হার খুলে

নেয়াটা দোষের কি না, তা সে বুঝতে পারলো না। মৃতের গলার হার থেকে কী লাভ হ'তো এবং কোন পুণ্য ও সৎকর্ম সাধিত হ'তো, তাও সে জানে না। তবু তার সমস্ত অন্তরাত্মা বললে, এটা অন্যায়, এটা খারাপ, এটা ঠিক নয়। অথচ এটা তার মাথায় একবারও ঢুকলো না যে একটু আগে সে নিজেই চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করার সংকল্প নিয়েছিলো।

তৎক্ষণাৎ যেন তার হাঁটুর জোড়ায় শক্তি ফিরে এলো; দাঁড়িয়ে পড়লো সে চক্ষের পলকে, তারপর তলোয়ারটাকে খাপ থেকে খুলে প্রবল পায়ে সেই বুড়োর কাছে এগিয়ে গেলো। একটি দীর্ঘকায় লোকের ছায়া পাশে পড়তেই বুড়োটা চমকে লাফিয়ে উঠলো, তবে তার চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে যখন সে সামনেই উদ্যত দেখলো তরবারি। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে খিক-খিক ক'রে কৌতুক একটা হাসি হেসে উঠলো, তারপর আরেক লাফে গোলা সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকে চ'লে গেলো।

তাকে পালাতে দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'শয়তান! কোথায় পালাবি তুই?' ব'লে সেও লাফ দিয়ে ঠিক তার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালো। বুড়োটা তাকে ধাক্কা দিয়ে পথ থেকে সরাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সে কিছুতেই সরলো না, বরং তাকে বাধা দিলো। বুড়োটা তখন ধাক্কা দিলে তাকে সজোরে, অমনি অতর্কিতে তার হাত থেকে তরবারিটা ছিটকে পড়লো, আর নিজেকে সামলাতে না পেরে সে ওই মৃতদেহ-গুলির মধ্যে প'ড়ে গেলো। কিন্তু প'ড়েই সে দুই হাতে বুড়োটার পা ধ'রে এমনভাবে হ্যাঁচকা টান দিলো যে সেও টাল সামলাতে না পেরে তৎক্ষণাৎ হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেলো। তারপর ওই মড়াগুলির মধ্যেই তাদের যুদ্ধ চললো, কিন্তু তার মতো টগবগে যুবকের সঙ্গে বুড়ো আর কতক্ষণ যুঝতে পারবে? বুড়োর কব্জিটা সে চেপে ধরলো শক্ত হাতে, তারপর মচকে দিলো সজোরে, তারপর যন্ত্রণায় বুড়ো কাৎরে উঠতেই তাকে মেঝের চিৎ ক'রে ফেলে বুকের উপর উঠে বসলো। লোকটা শুধুই অস্থিসর্বস্ব যেন, চিলে আর খোলা চামড়া দিয়ে মানুষের একটি কঙ্কালকেই শুধু আটকে রাখা হয়েছে যেন; কোঁস কোঁস ক'রে নিশ্বেস নিতে চাচ্ছে—যেন এত বোড়ো হাওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর সব হাওয়া মুহূর্তে তার জগৎ থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেছে। তারপর বুড়োর চোখের সামনে ঝলসে উঠলো তরবারির তীক্ষ্ণ ও চকচকে ফলা। সে ভয়ে চোখ বুজলো। একটি কথাও বলছে না সে, টুঁ শব্দটি বের করছে না, কেবল দর্বাঙ্গ দিয়ে হাঁপাচ্ছে। তারপরে ভয়ই আবার তাকে চোখ খুলতে বাধ্য করলো; কোটরগত অক্ষিগুগল যেন বেরিয়ে এলো মৃত্যুভয়ে, শ্বাসকষ্ট শুরু হ'লো প্রায়।

এই হতভাগা বুড়োর প্রাণ এখন তার দয়ার উপর নির্ভরশীল, একথা ভাবতেই তার টগবগে ক্রোধ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হ'লো। শুধু তা-ই নয়, কিছুটা তৃপ্তি ও গর্বও অনুভব করলো সে। শান্ত গলায় বললো, 'ভাখো', আমি নগর-কোতোয়ালির লোক নই। জগতের শান্তিরক্ষা ও দুষ্টের দমন আমার কাজ নয়। নিছকই একজন রাস্তার লোক আমি। তোমাকে আমি বাঁধবোও না, মারবোও না—শুধু আমাকে বলো এখানে তুমি কী করছিলে।'

যেন হাড়িকাঠে দমিত সিঁদুর পরানো ছাগশিশু, এমনিভাবে বুড়ো বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। ঠোঁট কেঁপে উঠলো তার; কণ্ঠা ঠোকা হ'য়ে ঝুলে উঠেছে, হা করা মুখের মধ্য থেকে জিভ যেন বেরিয়ে আসছে। মনে হ'লো যেন চোক গিলছে, এমনিভাবে গলার শিরা ও কণ্ঠা আরো ঝুলে গেলো, তারপরে সে যখন কথা বললো, তখন তা শোনালো দাঁড়কাকের কর্কশ ও একটানা চীৎকারের মতো, 'ভাকা না ইচ্ছে ক'রে বোকা সাজছো? কী করছিলাম, স্বচক্ষেই তো তা দেখেছো? মৃতদের সম্পত্তি চুরি করি আমি। হাঁ, আমি চোর—ধর্মাধর্ম, সত্যাসত্য, নিছুর এক ভয়ঙ্কর কেবল।'

তার উত্তর শুনে সব আকর্ষণ হারিয়ে ফেললো সে। সে প্রেত নয়, ভূত নয়, কোনো রহস্যই নেই তার সম্বন্ধে: গায়ে জোর নেই ব'লে জীবিতের থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নিতে পারে না সে, তাই মৃতরাই তার চৌর্যবৃত্তির ক্ষেত্র। এত বুড়ো যে জোরে ধাক্কা মারলেই ম'রে যাবে—কিন্তু তবু পোকার মতো, কীটের মতো বেঁচে থাকার জন্য এই পথ সে অবলম্বন করেছে। ঠাণ্ডা এক ঘৃণায় সে ভ'রে গেলো, বমি পাবে যেন তার—নাড়িভুড়ি যেন উল্টে বেরিয়ে আসবে জঠর থেকে। বুড়ো যেন তার মনোভাব বুঝতে পারলো, তাই শুষ্কতাকে চিরে তার গলা কোনো ধাতুময় আওয়াজের মতো বেজে উঠলো: 'মৃতের গলা থেকে হার ছিনিয়ে নেয়াটা তোমার কাছে জঘন্য ও ঘৃণ্য ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে নয়। যে মেয়েটির গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়েছি, সে বেশ্যা ছিলো—তা জানো? নিজের রূপ যৌবন ও লাবণ্যকে বিক্রি করে সে বেঁচে থাকতো। মহামারিতে যারা না গেলে এখনো সে হাজার লোকের কাছে নিজেকে বেচে দিয়ে বেঁচে থাকতে চাইতো। ভুল করেনি সে—তা না করলে তাকে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরতে হ'তো। যদি সে জানতো, যে এইভাবে তার মৃত্যু হবে, আর তার মৃতদেহ থেকে তার অলংকার আমি ছিনিয়ে নেবো: তবু তা না-ক'রে তার কোনো উপায় ছিলো না। কেননা এর নাম হ'লো বেঁচে থাকা; জীবনধারণ এত মর্মান্তিক এবং এখন তীব্র যে তার হাতে সব তার নীতি বিধা দ্বন্দ্ব নিঃসংশয়ে সমর্পণ ক'রে না দিয়ে কোনো উপায় থাকে না।'

তরবারিটা খাপে ঢুকিয়ে ফেলে সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বুড়োর কথা শুনছিলো। ডান হাত দিয়ে ব্রণের চারপাশে টিপে টিপে দেখছিলো সে তা কতখানি পেকেছে এতক্ষণ। তারপরে বুড়ো থামতেই অদ্ভুত এক সাহস জেগে উঠলো তার বুকে—এতক্ষণ যখন দাঁড়কাকের সঙ্গী হ'য়ে সে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে একা উদাসভাবে ব'সেছিলো তখন চেষ্টা ক'রেও এই সাহস সে অর্জন করতে পারেনি। যেন তীব্র এক শক্তি তাকে অপ্রতিরোধ্যভাবে অন্যদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে; যখন সে বুড়োকে কব্জিতে এনে ফেলেছিলো ঠিক তার বিপরীত এক শক্তি যেন এখন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। উপবাসে মৃত্যু না তস্করবৃত্তি—কোনটা কাঙ্ক্ষনীয়, এ-বিষয়ে এখন আর কোনো সংশয়ই তার নেই। নিজের সমস্যার মীমাংসায় সে এতটাই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো যে বুড়ো কথা থামাতে সে তাকে ঠাট্টা না ক'রে পারলো না। 'ঠিক বলছো তো?' সে ব'লে উঠলো, 'তাহ'লে তোমার সর্বস্ব চুরি ক'রে যদি আমি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, তাহ'লে সেটাও তো তেমন দোষের হয় না। কেননা তা না-হ'লে আমাকেও যে উপোষ ক'রে মরতে হয়।' ব'লেই সে জোর ক'রে বুড়োর গা থেকে নীল জামা, আর খাঁটো কাপড় খুলে নিলো:—ঠিক তারই মতো পোশাক প'রে ছিলো লোকটা। ছিনিয়ে নিলো তার হাত থেকে হারটা' তারপর ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিলো। বুড়োটা যখন ধাক্কার চোটে সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে, তখন সে ছুটে তার পাশ দিয়ে নিচে নেমে গেলো, তারপর সোজা অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে মিলিয়ে গেলো মুহূর্তে। তার সব সমস্যার সমাধান এত সহজে হ'য়ে গেলো ভূমিতে আর উদাসে বৃষ্টি, অন্ধকার কি পথের পাশের কালো ঝোপ—কোনো কিছুকেই সে তোয়াক্কা করলে না। ফাঁকা সেই তোরণের বাঁধানো চাতাল থেকে তার ধাবমান পায়ের শব্দ একটু পরেই মিলিয়ে গেলো।

একটু পরে বুড়ো ক্ষতবিক্ষত শরীরে কোনো রকমে নুঁকতে নুঁকতে উঠে বসলো। ডান গালে চিবুকের পাশে তার ব্রণটা পেকে উঠেছে—রক্ত আলোড়ন বোধ হচ্ছে তার জন্য। টিপে সে ব্রণটা ফেলে ফেললো। তারপর ঠাণ্ডায় তার গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠলো যেন—কোনো জামা নেই তার। যেন আদিকালের কোনো জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে উলঙ্গ—পৃথিবীর আদি মানবদের একজন। উপরে তারই জ্বালানো আগুনের ফুতে শব্দ ক'রে একটা বাঁশ ফেটে উঠলো—তারপর আগুনটা আবার দীপ্ত শিখায় জ্ব'লে উঠলো। কোনো রকমে টলতে টলতে ওই আগুনের ধারে এসে বসলো—এখানে আগুন পুইয়ে শরীর গরম করা ছাড়া কোনো কিছুই তার করার নেই।

আগুনের পাশে ব'সে ব'সে নগ্ন ঠাণ্ডা শরীর সেঁকতে-সেঁকতে সে ঘুমের দিকে তাকিয়ে রইলো; যেখানে কেবল অন্তহীন, অজ্ঞাত, অগম্য ও ঘন কালো পুঞ্জ-পুঞ্জ হ'য়ে আদিকাল থেকে জেগে আছে।

॥ অন্ধ ॥

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুপুর থেকে কাতারে কাতারে লোক চলেছে সহরের চারদিক থেকে ময়দানের দিকে। বড়বাজার থেকে ধারোয়াড়ি ব্যবসায়ীদের দল, ক্যানিং-স্ট্রীটের গুজরাটি ব্যবসায়ীরা আর সহরতলীর বাঙালী ধনীরা—বড় বড় গাড়ি চড়ে চলেছেন এঁরা ময়দানের দিকে। কলের মালিকেরা লরি ভর্তি করে মজুরদের আনছে কলকাতার বাইরের মিলগুলো থেকে ময়দানের মিটিংয়ে। 'নেহেরু জিন্দাবাদ' ধ্বনি শোনা যাচ্ছে লরি-বোঝাই করা মানুষদের মুখ থেকে। আজ বিকেলে ময়দানে গ্যারিসন ঘাটে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বক্তৃতা দেবেন। কয়েকদিন থেকেই তার আয়োজন চলছে। হাজার হাজার টাকা খরচ করে ময়দানে মঞ্চ বাঁধা হচ্ছে, ধনীদের বসবার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছে। আর জনসাধারণের বসবার জন্যে চারদিকে বাঁশ বাঁধা খোঁয়াড় তৈরী হচ্ছে মাঠ-জুড়ে। স্বেচ্ছাসেবিকারা কদিন থেকেই সেই বিকেলের মিটিংয়ের মহড়া দিতে ব্যস্ত। কংগ্রেস অফিসগুলোর সামনে ধনীদের ও ব্যবসায়ীদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোটরগুলির ভিড় লেগেই রয়েছে দিনভোর। কলকাতা সহরের কালি-ঝুলি-ধুলো-মাখা মুখটিকে ঘেমে ঘসে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত শত শত মজুরের দল। নগরী তার প্রসাধন করা রঙীন মুখটি জওহরলালের দিকে তুলে ধরতে অধীরা। যতো বিকেল হয়ে আসতে লাগলো মনে হতে লাগলো যে রাস্তাগুলো যেন ধূসর মুখ খোক হাজার হাজার লোককে ছুঁড়ে দিচ্ছে ময়দানের দিকে। চৌরঙ্গী দিয়ে, রেড রোড দিয়ে গাড়িগুলো সার বাঁধা শামুকের মতো অতি ধীরে ধীরে চলেছে। পার্ক স্ট্রীট আর চৌরঙ্গীর মোড়ে লাল আলোর চোখ রাঙানিতে গাড়িগুলো দাঁড়াচ্ছে ঘুমুচ্ছে আবার সবুজ আলোর ডাকে চলছে।

গাড়িগুলির কাছে হকারদের কাগজ ও ক্যালেণ্ডার বিক্রীর রেষারেষি করছে। ভিখারীর দলও সার-বাঁধা গাড়িগুলোর দরজায় দরজায় ধরা দিচ্ছে ভিক্ষের জন্যে।

এক বুড়ি ভিখারিণী তার তোবড়ানো মুখটি গাড়ির দরজার সার্শির কাছে এগিয়ে দিয়ে শীর্ণ একটি হাত বাড়িয়ে গাড়িগুলোর দরজায় দরজায় ভিক্ষে চেয়ে ঘুরছিলো। ক্ষীণ আর্ত কণ্ঠে বলছিলো—জওহরলাল বেঁচে থাকুন। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। সারাদিন খাওয়া জোটেনি। একটা পয়সা দাও। কেউ দিলো, কেউ হাত নেড়ে তাড়ালো। বুড়ি কোনো রকমে দুর্বল শরীর টেনে টেনে ঘুরছে তো ঘুরছেই গাড়িগুলির পাশে পাশে। একটি গাড়ির পাশে এসে বুড়ি দাঁড়ালো।

গাড়িতে বসে ছিলো কোণ ঘেঁসে একটি মেয়ে। সুন্দরী সে, তার উপর প্রসাধনের নিপুণতায় সৌন্দর্যকে আরো শানিয়ে তুলেছে মেয়েটি। ময়দানের উৎসবে পৌঁছবার জন্যে অধীরতা ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে। লাল আলোর ইসারায় গাড়িটা যে থেমেছে, এটা যেন তার কাছে অসহ্য বেয়াদবি বলে ঠেকছে। বুড়ি গিয়ে আস্তে আস্তে পৌঁছলো সেই গাড়ির ধারে। কাঁপা গলায় বলে—সারাদিন কিছু খাইনি। একটি পয়সা দাও না মা। তুমি রাজরাণী হও। এই বলে গাড়ির দরজার কাঁচ নামানো ফাঁকটার মধ্যে দিয়ে হাতটি বাড়িয়ে দিলো গাড়ির ভিতরে।

বুড়ির হাতটি তার গায়ের কাছাকাছি দেখে মেয়েটি ঘেন্নায় মুখ বিকৃত করে কোলের উপর থেকে ব্যাগটি তুলে, সেই ব্যাগ দিয়ে বুড়ির হাতের উপর জোরে ধাক্কা দিয়ে বললে—সরাও হাত। আস্পর্দা দেখ বুড়ির, গাড়ির ভিতরে নোংরা হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে। সারাদিন খাওনি তো আমার কি।

গাড়ি চলতে সুরু করলো। ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে বুড়ি পড়ে গেলো ফুটপাতের ধারে। মুখ থেকে বের হলো অস্ফুট স্বরে—মাগো, দয়া করো।

ফুটপাতের ধারে বসেছিলো অন্ধ ভিখারী, তার ডান হাতটি বাড়িয়ে। ঠিক তার সামনে দিয়েই যাচ্ছিল একটি লোক। ভিখারী তখন লাঠিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। পায়ের আওয়াজ শুনে বললে—বাবু, বাবু, বুড়িটা বুঝি পড়ে গেছে। আহা! সারা দিন কিছু খায়নি ও। আমার এই কৌটতে কয়েকটা পয়সা আছে। বাবু, দয়া করে বুড়িটার হাতে দিয়ে দিন।

অন্ধের চোখের কোণে চোখের জলের আলো ঝলমিল।

চক্ষুষ্মানরা তখন কাতারে কাতারে চলেছে ময়দানের মীনা বাজারের দিকে।

একটু দূরে আসিয়া না দাঁড়াইতে পারিলে কোনো বড়ো জিনিসকে ঠিক বড়ো করিয়া দেখা যায় না। যখন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হইয়া থাকি তখন নিজের পরিমাণেই সকল জিনিসকে খাটো করিয়া লই। তাহা না করিলে প্রতিদিনের কাজ চলে না। ● ● ●

শাস্ত্রে তাই বলে আমাদের সমস্ত আবরণ আসক্তিই অর্থাৎ আকর্ষণেরই রচনা। নিজের দিকে যতই টান দিব নিজের উপরকার ঢাকাটাকে ততই ঘন করিয়া তুলিব। এই টান হালকা হইলে তবেই পর্দা ফাঁক হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ

॥ রোগ ॥

জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুইটজারল্যাণ্ড থেকে চিকিৎসা করাবার পর বনানী স্বামীকে আবার বাড়িতেই ফিরিয়ে আনলো। তা'ছাড়া আর করবারই বা কি ছিল? চিকিৎসায় কারও হ'য়েছে বেশ। আজকাল আর বিনয়বাবু সবসময় চেঁচামেচি করছেন না বরং সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণই দেখা দিয়েছে। কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে বসেই থাকেন ইজি চেয়ারে। হঠাৎ ডাকলে প্রথমে সাড়াই পাওয়া যায় না। তারপর অনেক পরে যেন বহুদূর থেকে সাড়া দেন—'এ্যাঁ! কিছু কি বলছ?'

এ তবু মন্দের ভাল। সর্বদা পাড়া মাতান আর্ত চিৎকার নেই, দুরন্ত পদক্ষেপের দাপাদাপিও শান্ত। বনানী তবু একটু অবকাশ পাচ্ছে।

প্রকাশের হাতেই কেসটা দিয়েছে বনানী। গতানুগতিক চিকিৎসা। সেটা প্রকাশই করতে পারবে। এ রোগের বিশেষজ্ঞ সে অবশ্য নয় কিন্তু প্রকাশ নামী ডাক্তার। তা' ছাড়া প্রকাশ বিনয়বাবুরও প্রায় ছেলেবেলার বন্ধু। তাঁর নাড়ী-নক্ষত্রের খবরাখবর সে রাখে। চিকিৎসা করবার পক্ষে ওটা সাহায্য করবে, অন্তরায় অবশ্য একটা রয়েছে;···কিন্তু উপায়ই বা কি? প্রকাশ প্রকাশ্যে আজ আর স্বীকার করে না তার দুর্বলতাকে। তা' হলেও বনানী সম্পর্কে তার উদাসীনতা কিছুটা হয়ত অভিমানের।

আপাততঃ প্রকাশের উপরই স্বামীর চিকিৎসার ভার ছেড়ে দিয়েছিল বনানী। মিঃ বাসুর উপর প্রকাশের মনোভাব যে তেমন সুবিধার নয় সে কথাটা অবশ্য বনানী জানে এবং তার হেতু যে সে নিজে তা'ও তার জানা। কিন্তু এ রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তার জানাও নেই। প্রকাশেরই কথামত বিনয়বাবুকে যতটা সম্ভব শান্ত রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে: মাঝে, মাঝে গরম কখন আর মাথায় আইস্-ব্যাগও চলছিল। পরিচিত কবিরাজ মহাশয়ের সর্পগন্ধাচূর্ণ এবং আরও নানান্ কবিরাজি হাকিমী ঝাড়ফুঁকও তেমন কোনও কাজ দেয়নি। প্রকাশের চিকিৎসায় মিঃ বাসু বর্তমানে বরং একটু ভালই রয়েছেন।

আজ কিন্তু প্রকাশ উত্তেজনামূলক প্রসঙ্গের উত্থাপন করল। যেটা বিনয়বাবুর পক্ষে মারাত্মক। বললে, এগুলো ওঁকে পরীক্ষা করা। এসব প্রসঙ্গ মিঃ বাসু যদি সহজ ভাবে নিতে পারেন তা'হলে নাকি বোঝা যাবে যে উনি আরোগ্যের পথেই এগিয়ে চলেছেন।

বিনয়বাবু কিন্তু ক্লান্তিতে অবসন্ন হ'য়ে পড়েছেন, কপালে তাঁর ঘিন্‌ঘিনে ঘাম ঘানা পাকিয়ে উঠেছে।

'আমার ওসব কাটা-ছেঁড়া, অপরেশন্ সংক্রান্ত আলোচনা ভাল লাগে না,' মিঃ বাসু একটু লজ্জিত ভাবেই বল্লেন, 'কেমন যেন গা ঘিন্‌ঘিন্ করতে থাকে, মনে হয় বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়ব···'

বনানীর আকার-ইঙ্গিত, চাপা কণ্ঠের সতর্কতা বাণী প্রায় উপেক্ষা করেই কিন্তু প্রকাশ আবার ঐ প্রসঙ্গই উত্থাপন করতে থাকে। প্রসঙ্গের পরিবর্তন করবার কোন প্রয়াসই সে করে না। বলে—লক্ষণটা কিন্তু ভাল নয়, মিঃ বাসু···ঐ উপসর্গ থেকে একটা মারাত্মক রোগ হয়ত আপনাকে চিরকালের জন্যে পেয়ে বসবে। একটু সাবধানে থাকবেন।'

—'আচ্ছা ব্রোমাইডটা কি এখনও চালিয়ে যাব ?', বনানী কথার মোড় ঘোরাতেই বলে।

—'আঃ! কথায় বাধা দাও কেন, বনানী ?' বিনয়বাবু একটু বিরক্ত হয়েই বলেন। বনানী যে তাঁকে আঁচল চাকা দিয়ে রাখতে চাইছে সেটা ওঁর খারাপ লাগে। পুরুষত্বের কোথায় যেন তিনি একটা ধাক্কা খান।

'হাঁ, যা' বলছিলুম,' প্রকাশ আবার সুরু করে, 'আপনার জীবনের দু' একটা মারাত্মক ঘটনার আতঙ্ক হতে আপনাকে এমনই পেয়ে বসেছে যে সে প্রসঙ্গের অবতারণার ইঙ্গিতেই আপনি ঘেমে ওঠেন। ফ্রয়েড্ ইত্যাদি মনস্তত্ত্ববিদদের মতে এমন একটা সময় আপনার জীবনে আসা সম্ভব, যখন আর একটা কাউন্টার এ্যাটাকে আপনার মস্তিষ্ক আর ও ঘটনাগুলোকে আমলই দেবে না। শারীরিক অবসাদ আনে বা আতঙ্ক সৃষ্টি করে, এসব ঘটনা শেষ অবধি আপনাকে আর অস্থির করে তুলবে না। কিন্তু অনবরত যদি একটা নিদারুণ আতঙ্কের সঙ্গে আপনি যুদ্ধ করতে থাকেন তা' হলে ত মারা পড়বেন!' বনানী প্রকাশের কথায় চমকে ওঠে।

বিনয়বাবু সন্ত্রস্ত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন। বনানী বলে—'প্রকাশবাবু!'

—'Where ignorance is bliss, it is folley to be wise, না: ?'—প্রকাশ হাসলে।

বিনয়বাবু সামলে নিয়েছেন নিজেকে। মৃত্যুর নামে হঠাৎ ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠেছিলেন। পেয়ালার চা টা অকারণে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে তিনি সস্নেহ ভৎর্সনাভরা কণ্ঠে বলেন, 'না ব'নী, প্রকাশবাবুর উপর তুমি অবিচার করছ। সত্যিই ত, তুমি-আমি জানি না বলেই ত আর ডাক্তারী শাস্ত্র আমাদের সুবিধের জন্যে পালটে যাবে না।...'

—'জীবনটাই আসল। বেঁচে থাকাটাই প্রথম কথা—পাগলামী হচ্ছে আমার ঘুম···সমাধি!' প্রকাশের কথায় বিনয়বাবু সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক কথা, বনানী বড় অবুঝ। একথা বোঝ না পাগলামী তবু হয়ত একদিন সারবে কিন্তু মরে গেলে বনানী কি আর আমাকে বাঁচাতে পারবে!' ইজিচেয়ারটাতে বেশ একটু নড়ে চড়ে বসলেন বিনয়বাবু খাড়া সোজা হয়ে। মনে হ'ল নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন তিনি। অবসাদ-বোধকে জোর করে হটিয়ে রাখতে চাইছেন।

বনানীকে উদ্দেশ করে বললে প্রকাশ, 'হঠাৎ মাঝে মাঝে সিনেমা-টিনেমা দেখান না কেন?' বনানী বললে, 'বন্ধ ঘরে ওঁকে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক? আর কি ছবিই বা ওঁর উপযুক্ত!' প্রকাশ বললে, 'যাতে উত্তেজনা বেশি। ক্রাইটেরিয়ন জাতীয় ছবি। সেদিন একটা বাঙলা বই-এ দেখছিলাম একটা নোংরামিক হত্যার দৃশ্য। একজায়গায় গলাটিপে হত্যার একটা সিন্ বা আছে···। লোকটার জীব বেরিয়ে এসেছে, কপালে ঘিন্‌ঘিনে ঘাম, চোখে শেষ-আতঙ্ক। wonderful!—'আঃ, চুপ করুন ত আপনি,' বনানী এবার বেশ চড়া গলাতেই প্রকাশকে ধমকে বলে, 'একটা রুচির বালাইও কি নেই আপনার? মানুষের অমন প্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করার কি সুখ?' প্রকাশ বলে, 'বিনয়বাবুর সাইকো ট্রিটমেন্টে এইটেই দরকার।'

প্রকাশ আবার সুরু করলে, সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের নায়কীয় বর্ণনা।

বিনয়বাবু হঠাৎ ছোট পেপারওয়েটটার মুখ খুবড়ে পড়লেন। বনানী ক্ষিপ্র গতিতে পাশে গিয়ে বসে। সারা মুখে তার উৎকণ্ঠা। প্রকাশও ওপাশে ততক্ষণে দাঁড়িয়েছে এসে। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে লাগল নাড়ী সে। বলে, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। নার্ভাসনেস।'

—'কি হ'ল, পড়লে কি করে?', নাকে 'স্মেলিং সল্ট্' সোঁকাতে, সোঁকাতে বনানী স্বামীর মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'উঠে পড় দেখি। কিছু হয়নি। প্রকাশবাবু বলছেন।' স্বামীর দিকে নজর রেখেই বনানী এক বার প্রকাশের দিকেও চেয়ে নিলে, বল্লে, 'আপনি একটু ঘরে বসান না, আমি একটু জল আনি।' ততক্ষণে বিনয়বাবু সুস্থ হয়েছেন। ইজি চেয়ারটায় একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, 'মাথাটা হঠাৎ কেমন ঘুরে উঠল, ক'রাত্রি ভাল করে ঘুম হ'চ্ছে না ত। আচ্ছা প্রকাশবাবু, ব্রোমাইডটা আর একটু বাড়িয়ে দিলে হয় না?'

—'পাগল হয়েছেন!···এখনই যা' চলছে সেটাই কমান উচিত। কিছু না। শরীরটা একটু ঠাণ্ডা রাখবেন: ভাব্-টাব্, একটু খান, আর চা'র মাত্রাটা আরও একটু কমিয়ে দিন···। অমবরত ভয়-ভয় করবেন না, ওতে···'

—'না, না, ভয় আমি পাইনি, কি যে বলেন!,' মিঃ বাসু যেন একটু লজ্জিত হ'য়ে পড়েন। বনানীর দিকে প্রকাশই বিরক্ত কণ্ঠে বলেন, 'ঐ বনানীরই সব তাতে ভয়, ওই আমাকে পাগল করে ছাড়বে!'

—'একটু জল খাবে!···লেমন্-স্কোয়াস্ মিশিয়ে, দিই না একটু?,' বনানী শুধোলে। বিনয়বাবু আবার সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কথা শুনতে চাইলেন।

প্রকাশ বলে চলে সেই কাহিনী।

কাহিনী শুনতে শুনতে বিনয়বাবু আবার সংজ্ঞা হারালেন।

বনানী তীব্র ভর্ৎসনা জানালে প্রকাশকে, 'কেন আপনি বার বার এই টেন্সেজনার প্রসঙ্গ তুলছেন?'

প্রকাশ বললে, 'তোমার স্বামীর চেয়ে আমার পেশেন্টের ওপর দরদ একটুও কম নয় বনানী। মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসায়—'

বনানী বললে, 'থাক আপনার মনতত্ত্ব, এইবার আসুন আপনি। আর আপনাকে আটকাব না!'

প্রায় নির্জন পথ দিয়ে ছাইভ করে যেতে যেতে প্রকাশ একবার সে কথা মনে করে হাসলে। 'আর আটকাব না আপনাকে।' অল্প ক'মাস আগেও কিন্তু এই বনানী,—বনী, বন্যা, ছানী, ছান্নী—এই বনানীই বলেছিল অন্য কথা। 'তোমাকে অত সহজেই আজ আর ছাড়ছি না মশাই। শুধু আজ কেন? আর কোনদিনই না!'··· কথা শেষ করে বনানী সেদিন হেসেছিল কলকণ্ঠে। সে বনানী আজ আর নেই। ঐশ্বর্যের গুরুভারে চাপা পড়ে রয়েছে তথী বনানী, কলকণ্ঠী বনানী।···কি যেন একটা গান গেয়েছিল সে রাত্রে সে!···সেদিন ছিল ওর জন্মদিন আর প্রকাশ ছিল সেই মধুরাত্রির প্রধান এবং প্রত্যাশিত অতিথি।···হ্যাঁ, মনে পড়েছে···। রবীন্দ্রনাথেরই একখানা গান—'ভয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না, হায় ভীরু প্রেম হায়রে।'···সেদিনের সে বনানীর কথা আজও মনে আছে প্রকাশের। বলেছিল সে, 'আচ্ছা ডাক্তার, তোমাদের কেতাবে এত সব আছে আর প্রেমরোগ আরোগ্য করতে পারে এমন কিছু নেই?' চিন্তার ভাণ করে প্রকাশ উত্তর দিয়েছিল, 'ডাক্তারী বিজ্ঞানে না থাকলেও, দু' একটা টোটকা অবশ্য আছে।'

কৌতূহলী আঁখি তুলে বনানী প্রশ্ন করেছিল—'সত্যি!···কি রকম!'

তখন প্রকাশের মনের বয়স ছিল অনেক কম। তাই চিন্তা না করেই সে বনানীর আরক্তিম গালে মৃদু টোকা মেরে বলেছিল, 'এই রকম আর কি!' বনানী কিন্তু কিছু বলেনি। শুধু চারপাশ একবার চকিতে চেয়ে নিয়ে বলেছিল, 'যাও, তোমার আজকাল বড্ড সাহস বাড়ছে কিন্তু।'

সারা সন্ধ্যা বনানী তাকে চোখের আড়াল করেনি। আরও রাতে, প্রকাশের বিদায় মুহূর্তে, মৃদু বনানী অনুযোগ করেছিল—'রোজই ত আস আর যাও, আজ না হয় একটু বেশিক্ষণই থাকলে ?···নাঃ, আজ তোমাকে অত সহজেই ছাড়ছি না মশাই।'

প্রায় নির্জন পথ। শহরের রাত্তিরটা বুঝি একটু তা'রি। ইঞ্জিনের একটা ঘুমপাড়ানি ঝিস্ ঝিস্ শব্দ। পথে এক আধজন পথিক বা ঠুং ঠুং এ রিক্সাওয়ালা। হঠাৎ একসময় সোঁ করে একটা মিহন্-সাইন্ উল্কার মতন পার হ'য়ে যাচ্ছে। কোন একটা আঁধার গলির মোড়ে গোটা কয়েক কুকুরের উচ্ছিষ্ট কাড়াকাড়ি। তারপর ওদিক থেকে আসা অন্য কোন গাড়ির হেড্ লাইটের তীব্র আলোক-রশ্মি। তারপর আবার—অন্ধকার। গভীর নির্জনতা।

একটা সিগারেট ধরালে প্রকাশ। অনেকখানি ধোঁয়া একসঙ্গে উদ্গীরণ করে প্রায় নাটকীয় ভঙ্গীতে সে উচ্চারণ করলে—'হেয়ার-মাই-লিব !'···'গোলাস্'···'ব্লেক্ সাহে'···'thy name is woman'···।

সমস্ত রাগটা শেষ পর্যন্ত ঐ মাত্র অর্ধ সিগারেটটার উপরই তা'র কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে সেটাকে সে সজোরে দূরে নিক্ষেপ করে।

বনানীর একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। অজগরের মত। নিজেকে সে আলোড়ন করে না, হয়ত বা আপনার সম্মোহনী শক্তি সম্বন্ধে নিজে সে যথেষ্ট সচেতনও নয়। সাদা চোখে দেখলে তা'কে এমন কিছু একটা সুন্দরীও বলা চলে না কিছুতেই। তবুও...।

পরের দিন তা'ই হয়ত প্রকাশ আবার হাজির হ'ল। বনানী একাই ছিল তখন। সামনের জাফ্রী বারান্দায়, বেতের একটা ডেক্-চেয়ারে বসে ছিল সে। এত সকালেই স্নান শেষ করে নিয়েছে। চুল-ঘেঁষা কপোলে, নাকের ধারে, ঘাড়ের উপর বিন্দু বিন্দু জলের কণা তখনও লেগে রয়েছে। ভেজা-চুলের কাপ্‌টা খেয়ে ওর বাদামী রংএর ব্লাউজটা পিঠের সঙ্গে সেপটে গেছে। ব্রসেটের ষ্ট্রাপ্‌টা যে মিহি তা'ও বোঝা যাচ্ছে।

জুতার শব্দে বনানী ফিরে দাঁড়ায়। 'এত সকালে ?'···'রাতে কি তুমি · রাত্রে ঘুমানও ছেড়ে দিয়েছেন না কি ?'

'তুমি' আর আপনির দোলায় বনানীর দোল খাওয়া লক্ষ্য করলে প্রকাশ। একটু হাসলে সে। কথার উত্তর না দিয়ে বলে, 'আপনার পতিদেবতাটি কি এখনও ঘোমাইছের ঘুম ঘুমচ্ছেন !...তোমারো বুঝি আমারই মত রাত্রে ঘুম হয় না, বলে এত সকালেই চান করে নিয়েছ কি করে ?'

প্রকাশ যে ভাল ভাবেই ওর নিজের কড়ি দিয়ে ওকে পরিশোধ করলো সে কথা বনানী বুঝলে এবং বুঝেই মাথা নিচু করলে হয়ত। প্রকাশ একটা টাকিশ্ সিগারেট ধরায়। ও জানে যে টাকিশের ঝাঁঝালো গন্ধ বনানীর সহ্য হয় না। বনানী একবার মুখ তুলে চায় মাত্র। প্রকাশ নির্বিকার।

বারান্দায় লম্বাটে একফালি চকচকে রোদ্দুর পড়েছে। সেই রৌদ্রের ঘায়ে দিয়ে সিগারেটের কুণ্ডলী পাকান, নীলচে ধোঁয়া নাচতে নাচতে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। প্রকাশ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে।

প্রকাশ দেখে বনানীর চোখের কোণে কালি। না জানি ক-রাত্রি জাগরণে কাটিয়েছে সে।··· বনানীর ঠোঁট দু'টো একবার যেন কেঁপে কেঁপে উঠল।...কিছু বলতে চাইছে নাকি ব'নী ?···তা বলছে না কেন ?···বনানীতে কি জীবন অসহায় বোধ হচ্ছে।···কিন্তু সে ত কিছুই করতে পারবে না।···প্রকাশ ত পর-পুরুষ : সে ত বাইরের লোক। সে বনানীর কেউ নয়, সে নিছক বাইরের লোক। 'ফী' ভোগী ডাক্তার।

'চা ?'—নীরবতা ভঙ্গ করে বনানী এতক্ষণে প্রশ্ন করতে পারলো। অসহায় বনানীকে দেখে প্রকাশের কেমন যেন একটা রুদ্ধ নিষ্ঠুরতা জেগে ওঠে। 'নাঃ, চা খাবার জন্যে হোটেল ছিল, এসেছি আমার 'খা'টার জন্যে। জানোনই ত আমি ভিখিরি নই, আমি গরীব ডাক্তার। দিন আমি দিন খাই'।

বনানী সচকিতে প্রকাশের দিকে চাইলে, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলে সে। বল্লে, 'তোমার চেয়ারে যাও ডাক্তার। বিলটা আজই পাঠালে, আজই পুরোপুরি পাওনা পেয়ে যাবে।'

'মানে ?'

'মানে একটা রোগ সারাতে, আর একটা রোগ চিরকাল আমি পুষে রাখতে চাই যে। আমার স্বামীর ভবিষ্যৎ কি জানিনে; কিন্তু তোমার আর আমার ভবিষ্যৎকে বন্ধ্যার বীজাণুতে আর জড়িয়ে রাখতে চাইনে প্রকাশ।'

বনানীর কথায় প্রকাশ স্তম্ভিত। একটা বোধ হয় সে আশা করেনি। স্নায়ুবিকারগ্রস্ত স্বামীর জন্যে প্রকাশ অন্ততঃ অত্যাবশ্যক বনানীর জীবনে। বনানী সে বন্ধনকেও আজ অস্বীকার করতে চায় ?

প্রকাশ কণ্ঠস্বরকে নরম করে বলল, 'বনানী।' উত্তর দেওয়ার জন্যে বনানী আর তখন সেখানে নেই।

কামালপাশা তখন পুরাতন তুরস্কের লৌহশৃঙ্খল ভেঙে তাকে জগৎ-সভার এক সিংহাসনে বসিয়েছেন।

চারদিকে ধন্য ধন্য রব। কামালপাশা কিন্তু তুরস্ককে আরও শক্তিশালী, আরও মহান্ করে তুলতে চান।

একদিন একটু অবসর পেয়ে তিনি তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে সেই বন্ধুর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করলেন, তুরস্কের মান রক্ষার জন্যে তোমরা কে কি দিতে পার ?

সকলে যখন তাদের খেলাঘরের জিনিষপত্তর, বইখাতা, পুতুল, গাড়ী,—এই সব দিতে চাইল, তখন একটি ছোট ছেলে বলল, আমি আমার মাকে সবচেয়ে ভালবাসি, —আমি আমার মাকে দোব।

কামালপাশা আনন্দে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

॥ দেওয়াল ॥

শক্তিপদ রাজগুরু

রাতের অন্ধকারে ছুটে চলেছে ট্রাকটা।

ভিতর থেকে আসে অস্ফুট কাতরানির শব্দ। অন্ধকারে ওদের সম্মিলিত কাতরানি আর আর্তনাদের শব্দ সারা বন ভরিয়ে তো'লে বসন্তের।

দুর্গম পাহাড়ী পথ।

থমথম করছে জমাট অন্ধকারে বনভূমি। কোথায় একটা চাপা গর্জনধ্বনি পাহাড়ে ঘা খেয়ে ফিরে আসে।

হিংসা আর মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে ঘুরছে এই বনে বনে মৃত্যুদূত। ওর গাড়ীর পিছনে পিছনে আসছে। কোথাও যেন সুযোগ পেলেই চরম আক্রমণ হানবে।

মৃত্যুর জগৎ থেকে জীবনের আলোর দিকে ছুটে চলেছে ট্রাকখানা।

—একটু জল!

বসন্ত বাঁ হাত দিয়ে পাশের সিটে বসা লোকটির দিকে এগিয়ে দিল ওয়াটার বটলটা।

অন্ধকারে হাঁপানির শব্দ শোনা যায়।

দাঁত চেপে অসহ্য যন্ত্রণার কাতর আর্তনাদ চেপে যাবার চেষ্টা করছে সে প্রাণপণে।

রাতের প্রথম দিকেই ঘটেছে দুর্ঘটনাটা। পাহাড়ের প্রত্যন্তে বনরাজ্যে নোতুন মাইন খোলা হয়েছে। সন্ধানী মানুষ এই দুর্গম বনরাজ্যে এসে হানা দিয়েছে। কঠিন মৃত্তিকার বুক কাটিয়েছে ডিনামাইটে টি এন টি দিয়ে। অতলে নেমেছে ওর বুকের সম্পদ হরণ করতে। একদিন মুখ বুজে ধরিত্রী সেই অত্যাচার সহ্য করেছিল। আজ সুযোগ বুঝে হানা দিয়েছে সেই অতল পাতাল রাজ্যে।

—হামার হকে খোলা ব্লাই বৎ করো ইয়ার—গ্যাসী মাইন। মিথিন গ্যাস ভিন পারসেন্টকা জ্যাদা হো গিয়া অব্।

বিড় বিড় করছে লোকটা পাশে বসে।

সিপট্ ইন চার্জই হবে বোধ হয়।

আবছা অন্ধকারে বনের মধ্যে দিয়ে সরু একফালি রাস্তাটা সোজা নেমে গেছে—বহু নীচে কলকল শব্দে বয়ে চলেছে একটা পাহাড়ী নদী। হেডলাইটের আলো পড়ে পাশের সিগন্যালের উপর।

রোড সিগন্যাল দিয়েছে কোম্পানী। একটা লম্বা বাঁধা আর দুখানা আড়াআড়ি করে রাখা হাড়।

মৃত্যুর নিশান।

গাড়ীখানা নড়ছে—নড়বড় করছে এবড়ো খেবড়ো খোয়া ফেলা রাস্তায়। ভিতর থেকে আহত বন্দীদের লোকগুলোর আর্তনাদ ভেসে ওঠে।

—এ্যাও শূয়ার কা বাচ্চা! ঠিকসে চালাও।

চাপা গর্জন করে ওঠে পাশের সিটের লোকটাই।

বসন্ত বিরক্তিভরে চাইল ওর দিকে।

ড্যাসবোর্ডের নীলাভ ছোট বাতিটা জ্বলছে তারই একটু আভায় লেগেছে ওর দাড়ি গোঁফ ঢাকা মুখে চোখে। কেমন যেন জ্বলছে চোখদুটো। দুহাতে সিটটা চেপে ধরে হাঁপাচ্ছে লোকটা।

কঠিন কঠোর একটি মানুষ। বসন্তকে চাইতে দেখে যেন অপেক্ষাকৃত একটু শান্তস্বরে বলে ওঠে, ধীর সে চালাও ইহার। ও লোগ্ খতম্ হো যায়েগা।

…বসন্ত কথা কইল না। ওদের জন্ত দুঃখবোধ করে।

…চোখের সামনে দেখেছে বনরাজ্যের ওই জীবনের কঠিন দুঃসহ নিঃস্বতা আর কষ্ট। কোনরকমে বেঁচে থাকা যায় মাত্র—মানুষ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্ত শুধু কঠিন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্তই এত দুঃসহ কষ্ট মেনে নেয়। জীবনের নেশায় যেন পাগল হয়ে ওঠে ওরা।

সেই দুর্বার বেঁচে থাকার চেষ্টায় নামে অতলে, এগিয়ে যায় পাথরের ফাঁকে জমা সামান্ত কয়লার সঞ্চয়টুকুও ছিনিয়ে আনতে।

আজ সন্ধ্যার আগেও ওই লোকগুলো বেঁচে ছিল। বাঁচবার ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল। পিটের অতলে নেমেছিল রোজকার মতই।

…অন্ধকারে জ্বলে উঠেছিল বনপাহাড়ের মধ্যে বিজলীর বাতিগুলো। সামান্ত একটু রাস্তা—আশেপাশে ক'টা খাওড়া, অপিসঘর। বাবুদের কোয়ার্টার্স বাস আবার ওই সামান্ত ঠাইটুকুর আশপাশে সামান্ত সমতল ভূমির পরই আবার গহন বন—সেই পার্বত্য পরিবেশ।

ক্রমাট অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে আসে সেখানে।

চুপ করে বসেছিল বসন্ত।

সেও এতদিন কাজ খুঁজেছে। কখনও পেয়েছে আবার সে কাজও হারিয়েছে। সারা জীবনের এতগুলো দিনের বেশী সময় কেটেছে তার কাজ খোঁজায়। বাঁচবার পাথেয় চাই।

ঘর সংসার পাতবে। কালিঝাটের নামে বস্তির সেই অখ্যাতঘর থেকে বের হয়ে এসে নোতুন বৌকে নিয়ে ঘর পাতবে—বাঁচবে নোতুন করে।

কি যেন নেশায় পেয়েছে তাকে—বাঁচার নেশা।

জীবনের নেশা।

সেই চাকরীর খোঁজেই এসে পড়েছিল রঘুবর পাহাড়ীর এই বনে বসন্তও। কিন্তু কোথায় বা চাকরী!

আগেকার পরিচিত ম্যানেজার, বহুকাল আগে তার গাড়ী চালিয়েছিল বসন্ত রাণীগঞ্জ কিল্ডে। তিনিও আশ্বাস দিতে পারেন না।

—কিছুরই ঠিক নেই। তুমি বরং অন্তত্র চেষ্টা দেখ।

হঠাৎ চলে যেতে বলছেন তাকে। বসন্ত তবু শেষবারের মত অনুনয় করে।

—একটা কাজও পাবো না?

মাথা নাড়েন ম্যানেজার—সরি বসন্ত।

সন্ধ্যা রাত্রিটা থাকবার ঠাঁই পায় অপিস ঘরের বারান্দায়, হু হু শীত। পাহাড় বন যেন জমে উঠেছে।

বয়লার ঘরের পাশে নাইট সিফ্টের অপারেটারের সঙ্গে ভাব জমিয়ে বয়লারের তাপে একটু আরাম করে বসেছে বসন্ত।

এমনি সময় ঘটে ঘটনাটা।

হাজার ফুট উপরকার শক্ত পাথর অবধি কেঁপে ওঠে। বেজে ওঠে বরদারের বাঁশীটা ভীতচকিত আর্তনাদে।

অন্ধকার নির্জন বনতলে ওর সঙ্গে মিশেছে কয়েকশো অসহায় মানুষের আর্তনাদ।

বনরাজ্য নিঃস্পৃহভাবে লক্ষ্য করছে ওদের চরম এই বিপদটুকুকে।

সমস্ত আলোই অন্ধ হয়ে যায়।

চারিদিকে কারা ছুটোছুটি করছে। অতলে গ্যাস জমে বিস্ফোরণ ঘটেছে। অন্ধকারে ওঠানামা করছে লিফটটা।

কাদের কাতর অস্ফুট আর্তনাদ ভেসে ওঠে।

মানুষের জগতে নেমেছে দুঃসহ বেদনার অন্ধকার। ঘুরে আটকে রেখেছে ওদের। কাউকে লিফ্ট মাউথের কাছে আসতে দিতে চায় না ওরা।

ম্যানেজার যেন তাদেরই খুঁজছিল।

কাঁটাতারের বেড়ার পিছনে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে। হেরণল ঢাকা ঘুমন্ত একটা ট্রাক। ভিতরে কারা পড়ে আছে।

চমকে ওঠে বসন্ত।

মানুষ বলে তাদের চেনা যায় না।

পুঁজ বিস্ফোরণে বিবর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে। মনে হয় ছিটকে পড়েছে কারোও হাত পা। যেন কতকগুলো মৃত অচেতন গলসানো পদার্থ।

কাতর অস্ফুট আর্তনাদ ওঠে।

ম্যানেজার বলে চলেছেন কথাগুলো।

ঠিক বুঝতে পারে না বসন্ত। পাঁচ হাজার টাকা পাবে।

—নগদ পাঁচ হাজার। দু'হাজার এখনই—তিন হাজার কাজ সেরে ফিরে এলে।

চমকে ওঠে বসন্ত।

আবছা অন্ধকারে ম্যানেজারের কথাগুলো শুনছে।

এখান থেকে বাঁ হাতি রাস্তা ধরে সোজা চৌদ্দ মাইল এগুলেই পাথরচুঁয়া লেক। পাহাড়ের ধার দিয়ে রাস্তা চলে গেছে।

এক পাশে পাহাড় অন্যদিকে লেকের অথৈ জল।

—হুঁ সিয়ার।

কচ্ করে কুড়িখানা নোট এগিয়ে দেয় ওর হাতে। খসখস একটা অনুভূতি। আরও তিরিশখানা সকাল বেলায় ফিরে এলেই।

…এক রাতের কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রমে যেন রাজা হয় করবে সে।

—কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। কালই তোমাকে গাড়ী করে বাহান্ন মাইল দূরের ষ্টেশনে কোলকাতা মেল-এ তুলে দেবে।

স্যার।

চমকে ওঠে বসন্ত। ...কালিঘাটের সেই নোংরা বস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

বাঁচতে পারবে সে। ইনস্টলমেণ্টে একটা ট্যাক্সিও কিনতে পারবে। একখানা থেকে কিনবে আরও কয়েকখানা।

ছোট্ট একটা বাড়ী।

আনন্দীও খুশী হবে।

কেমন যেন অন্ধকার জীবন থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যাবার ব্যাকুল স্বপ্ন।

বাঁচবার নেশা।

শোচকে দেখো বসন্ত।

অন্ধকারে কতজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বাঁচার এই রঙীন স্বপ্নটাকে।

বসন্ত নিজেই অবাক হয়েছে।

কি যেন এক নিবিড় উত্তেজনায় মাথাটা ঝম্ ঝম্ করছে। কোঁচড়ে কড় কড় করছে নোতুন একশো টাকার নোটগুলো।

বিচিত্র পদার্থ ওরা। মানুষের সবকিছু বদলে দেয়।

উন্মাদ করে তোলে। জীবনের অস্তিত্বের সঙ্গে ওর নিবিড় নিকট সম্বন্ধ।

নইলে এই কাজে এগিয়ে আসবে কেন বসন্ত!

চাকার গতিবেগ আর বনের বুকের বাতাসের শব্দটা একাকার হয়ে মিশে গেছে। হেডলাইটের আলো পড়েছে।

এক ঝলক আলো।

ঝলসে ওঠে বনভূমি। ড্যাসবোর্ডের নীল আলোটা পড়েছে পাশের লোকটার মুখে। দাড়ি-গোঁফ ঢাকা চেহারা।

সিটে কাৎ হয়ে হেলান দিয়ে রয়েছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ও।

ওর হাতে পায়ে মুখে ক্ষতের কোন চিহ্ন নেই।

কম্বল ঢাকা মূর্তিটা বিমুচ্ছে ক্লান্তিতে। ট্রাকের ভিতরের বিকৃত পোড়া মাংসপিণ্ড আর আধমরা জীবগুলোকে দেখেনি বসন্ত। ওদের আর্তনাদও কানে সয়ে গেছে।

চলেছে গাড়ীখানা। চড়াই এর বুক ঠেলে উঠেছে টপ গিয়ারে, ওপাশেই অনেক নীচে অতল বনের মাথাগুলো দেখা যায়। একটু ওদিকে বেঁসলেই কোন অতলে পড়বে গাড়ীখানা। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে যেতেও কেমন যেন জীবনের সামান্য সূত্রটুকু আঁকড়ে ধরে থাকবার ব্যাকুলতা।

ঘুঁসিয়ার সে।

লোকটা নীচের অতল উৎরাই-এর আঁধারে চেয়ে আছে।

ও জানে না—একটু পরেই কোথায় যাবে। কোন অন্য জগতে।

—আঁহাকা রহনেবালে?

বসন্ত চুপ করে থাকে। লোকটা চেয়ে আছে তার দিকে। দাড়িগোঁফের আড়ালে দুচোখ জ্বলছে। কেমন যেন হাঁপাচ্ছে লোকটা। বসন্ত কি ভেবে জবাব দেয়।

—কলকাত্তার লোক।

—কলকাতা! ভবানীপুর পদ্মপুকুর? বকুলবাগান?

লোকটা কণ্ঠস্বরে একটু খুশির আভাস ফুটে ওঠে। মুখে দেখা দেয় ম্লান হাসির আভা।

ঘাড় নাড়ে বসন্ত।

লোকটাই বলে চলেছে তার নাম নেহাল সিং। ওখানে অনেকদিন ছিল।

এ কাজ ভাল লাগে না—ওখানেই ফিরে যাবে।

বসন্ত ওর দিকে চেয়ে থাকে।

ম্যানেজার বলে দিয়েছে, কড়া হুকুম, কেউ জানবে না, এ গাড়ীর একটি লোকও।

সব সমেত গাড়ীর গন্তব্যস্থল কোথায় জানে একমাত্র বসন্ত—আর ম্যানেজার।

পাথরচুয়া লেকের জল কত গভীর কে জানে?

বোধহয় পাঁচ সাতশো ফিট হবেই। খাড়া পাহাড়ের নীচেই থৈ থৈ করছে প্রাকৃতিক সেই জলাশয়।

নেহাল সিং বসন্তের দিকে চেয়ে আছে।

পানি দেও!

লোকটা কম্পিত হাতে জল খাচ্ছে। চালতে পারছেনা মুখে, দাড়িগোঁফ বেয়ে কম্বলের উপর পড়ছে। বসন্তের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—শালে লোক রোতা কাহে?

অন্ধকার লরীর পিছন থেকে কার কান্নার শব্দ উঠছে—কার অস্পষ্ট আর্তনাদে মিশেছে সেই শব্দটা।

কি যেন স্বপ্ন দেখছে নেহাল সিং।

বাঁচার স্বপ্ন। আগেকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। উজ্জ্বল অতীত তার নিষ্ঠুর বর্তমানকে ভুলতে সাহায্য করে, তরলা দেয় ভবিষ্যতের আনন্দ স্বপ্ন।

…পদ্মপুকুর চেনো? ওর ওদিকেই খেলতে যেতাম। হররোজ!

বসন্ত লোকটার দিকে চেয়ে থাকে।

এক একটা কথা বলছে আর হাঁপাচ্ছে, যেন দম নিঃশেষ হয়ে যাবে।

বসন্তেরও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পদ্মপুকুরের পাশে ছায়াঘন মেহগিনী গাছগুলো ওপাশের সেই মাঠটা। বিরাট পাঁচীল ঘেরা একটা বাঁই।

একটা হারাণো অনেক কালের বাড়ী। গাছের ছায়া অন্ধকারে বৈকালের পর থম থম করতো।

ওই মাঠটাকে চেনে সে। নেহাল সিং বলে চলেছে।

—মাঠের মধ্যিখানে বড় পাঁচীলঘেরা কোঠি দেখা?

ঘাড় নাড়ে বসন্ত।

সেও দেখেছে। পাঁচীলটার বহুকালের শেওলা জমেছে। পাশের দেওদার মেহগিনী গাছের ঘন কালো ছায়া ঠাঁই ঠাঁই জমে উঠতো।

ছেলের দল উঁকি ঝুঁকি মারতো।

কি আছে পাঁচীলের ওপারে। জানার অদম্য কৌতূহল। নানা কল্পনা জল্পনা চলে ওদের মধ্যে তাই নিয়ে। কেউ বলে—সুন্দর ফুলবাগান আছে। সাজানো বাগান।

কেউ বলে অতল একটা দিঘী আছে। ওরে আছে পাথর—জ্যান্ত সেই পাথর। চারি পাশে তার বিকল ছেলেপুলেকে ভরিয়ে নিয়ে জলের নীচে টেনে নেয়।

তাই পাঁচীল দিয়ে ঘিরে রেখেছে তাকে।

কেউ বা বলে—সে শুনেছে মস্ত এক সুড়ঙ্গ আছে। কোন রাজার ধনাগারে যাবার সুড়ঙ্গ। দুই মুখ আর মহাল সাপ পাহারা দেয় দিনরাত।

কেউ বলে—কুট বাত। বিলকুল কুট।

তবু নানা আলোচনা ওকে কেন্দ্র করে। বার বার চেষ্টা করেছে উঁচু পাচীলে ওঠবার। কিন্তু পারেনি।

বাধা পেয়েছে।

তাই বেড়েছে কৌতূহল।

ওই অকলের ছেলেদের মধ্যে তাই একদিন ওটা ছিল আলোচনার বস্তু।

বসন্ত চমকে ওঠে। একটু ভাবলে বলে—হ্যাঁ, মনে পড়ে।

দীর্ঘ দিন আর ওদিকে যায়নি।

যুদ্ধে গিয়েছিল সাত বছর; তারপর কালীঘাটের সেই এঁদো বস্তিতে ফিরেছিল কয়েক দিনের জন্য। কলকাতায় তার ঠাঁই হয়নি। বেরিয়ে পড়েছিল বাইরে অন্নের সন্ধানে। বাঁচার নেশায়।

—দেওয়ালের ওপাশে কি ছিল কম্ জানে!

লোকটা হাঁপাচ্ছে কি যেন অসহ্য যন্ত্রণায়—পানি।

কাঁপছে ওর হাত। চলকে পড়ে অবশিষ্ট জলটুকু।

এক বিন্দু জলও আর নেই।

বিবর্ণ ব্যাকাসে দুচোখ মেলে লোকটা চাইল ওর দিকে। ব্যাকুল কাতর সেই চাহনি।

কম্বলটা ধরে রাখবার চেষ্টাও করে না, করবার মত সামর্থ্যটুকুও আর নেই। খসে পড়ে কম্বলটা গা থেকে।

চমকে ওঠে বসন্ত। অসহ্য যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠছে ওর সারা দেহ!

নীচেকার দিকে কি যেন ভিজে উঠে একটা স্পর্শ অনুভব করে বসন্ত।

চমকে ওঠে—রক্ত! চাপ বেঁধে আসছে।

ওর দিকে চেয়ে শিউরে ওঠে।

হাত কাঁপছে কি এক জমাট আতঙ্কে।

লোকটার নীচেকার অংশ যেন খেঁতলে গিয়ে ডলে দিয়েছে কেউ। পাটা ঝুলছে—ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে আসছে ওর দেহের শেষ রক্তবিন্দু।

এতক্ষণ দাঁত চেপে সহ্য করেছে ওই অসহ্য যন্ত্রণা।

বুঝেছে মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপণে বাঁচার আশ্বাসে।

—হাসপাতাল আর কতদূর?

বসন্ত ওর কথায় চমকে ওঠে, ওরা জানেনা ওদের গন্তব্যস্থল।

কোন বাঁচার আশ্বাস সেখানে নেই।

পাথরচুয়া লেকের জলের অতলে—

শিউরে ওঠে বসন্ত!

—ক্যা ইয়ার?

বসন্ত বাইরের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে। তারার আলোজ্বলা গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি। চকমক করছে তারাগুলো লেকের জলে।

ঠাণ্ডা জলো হাওয়া কাঁপছে।

…শরীর ভিতর ওরা কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে।

আর্তনাদ উঠছে তখনও। কেউ থেমে গেছে চিরদিনের জন্য। নেহাল সিং বুঝছে—চোখের চাহনি ঘোলাটে—কেমন একটা অস্বচ্ছ যবনিকা নেমে আসছে ওর দুচোখের উপর।

কিতনা দূর? ঘোড়া জলদি চলো ভাই?

বাঁচবার আশা এখনও ছাড়েনি নেহালসিং। তাই অতীতের কথা ভাবে। সেই ছেলেবেলার কথা।

…কত স্বপ্নরঙীন দিন। রুদ্ধ প্রাচীরের অন্তরালে কি এক স্বপ্নরাজ্যের কল্পনা। কত দিন কত পড়ন্ত সন্ধ্যার আলোয়ায়। ওই গাছগুলির মাথার দিকে চেয়ে ভেবেছে কত উজ্জ্বল সেই কল্পনার ছবি।

একদিন সে দেখবে পাঁচীলের ওপারে কি এক রহস্যপুরী রয়েছে।

পরে সে দেখেছিল।

পাঁচীল মেরামত অভাবে ধ্বসে পড়ে একদিন! ধ্বসে পড়ে ওদের কল্পনার তাসের মিনার।

ছেলের দল ভিড় করে চেয়ে থাকে নেহাল সিংও ছিল তাদের দলে। চোখের সামনে কেমন একটা অসীম শূন্যতা।

শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে।

নেমে আসে আঁধার দুচোখের পাতায়।

শন শন ঝড় ওঠে বনে।

—পাঁচীলের ওদিকে কি ছিল জানো?

…হঠাৎ একটা ঝটকায় চোখ মেলে চাইল নেহাল সিং।

পাশের সিটএ ড্রাইভার নেই।

গাড়ীটা টপ গিয়ারে ভুলে স্পিডের মাথায় নেমে পড়েছে।

…গাড়ীটা চলেছে নীচের দিকে—গড়িয়ে চলেছে।

অতল অন্ধকার হাঁ করে রয়েছে নীচে—চোখের সামনে দেখা যায় তারার ঘোল খাওয়া অথৈ জলরাশি।

নামছে গাড়ীটা।

চীৎকার করে ওঠে নেহাল সিং।

একটা সাড়া পড়ে যায় শরীর ভিতরে তালগোল পাকানো আহতদের মধ্যেও। মাইনস্ কোম্পানী তাদের হাসপাতালে পাঠায়নি।

পাঠিয়েছে অথৈ জলরাশির অতলে সব প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে।

অন্ধকারে চীৎকার ওঠে।

নেহাল সিং চেয়ে চেয়ে দেখছে কেমন গড়িয়ে পড়েছে ওর অচেতন দেহটা সিট থেকে নীচে।

চোখের সামনে সেই পুরোণো গাছগাছালির ফাঁকে ভাঙ্গাপাঁচীলটা।

এতদিন প্রতীক্ষার পর ভেঙ্গে পড়েছে খসে পড়েছে তার বাঁধন।

কেমন অসীম শূন্যতা সেখানে খাঁ খাঁ করছে।

ভুল-হিসেবে ওরা শান্ত উলোটপালো দিঘী কোন গুপ্ত ঐশ্বর্যের সন্ধান—সব ফাঁকে ফাঁকা।

জীবনের শেষ যেন ওই অসীম শূন্যতার মাঝেই।

পাঁচীলের ওপারে আর কিছুই নেই সব ফাঁকা; শূন্য!

এতদিন ওরা মিথ্যা স্বপ্ন দেখেছিল।

ধমকে দাঁড়াল বসন্ত।

তারা কাঁপছে—নীচে য নীচে ওদের আর্তনাদ আর শোনা যায় না। সমুখে পড়েছে গাড়ীখানা—এতক্ষণে অতল তলে কোন পাথরের ভিড়ে হারিয়ে গেছে গাড়ীখানা ওদের নিয়ে।

চমকে ওঠে।

বিশাল পাহাড়শ্রীমা কালো প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। নীচে ওই আবছা দেখা যায় অথৈ জলরাশি বহু উর্দ্ধে জ্বলছে তারার নিশানা। হাওয়া হাঁকে মত্ত গর্জনে। তারই মাঝে হারিয়ে গেছে একটি প্রাণী—বসন্ত।

অজানা আতঙ্কে দৌড়চ্ছে অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধানে পালাচ্ছে।

পাঁচীলের ওপারে কি ছিল তা আর শোনেনি বসন্ত। ওর চারিদিকে পাহাড়ের প্রাচীর বনের প্রহরা।

পূর্বদিক ফরসা হয়ে আসছে। পাখী ডাকছে।

বসন্তের দুচোখে অন্তস্বপ্ন। পাহাড় শ্রেণীর ওপারে কোন দূর কলকাতার স্বপ্ন দেখে সে।

ছোট একটি ঘর—শান্ত নির্ভর একটি জীবন।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বসন্ত দৌড়চ্ছে।

মরীচিকার পিছনে এমনি করে বোধ হয় ছুটে চলে কোন তৃষ্ণার্ত হরিণ।

হঠাৎ চমকে ওঠে।

পায়ে কাপড় চোপড়ে তখনও লেগে রয়েছে নেহাল সিংএর রক্ত। সকালের নোতুন সূর্যের আলোয় বনভূমি রঙীন হয়ে উঠেছে। বনের মধ্য দিয়ে দৌড়চ্ছে একটি রক্তস্নাত আদিম মানুষ; বাঁচার নেশায় সে দৌড়চ্ছে।

উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

উপলক্ষ্য যা-ই হোক না কেন উৎসবে যোগ দিতে গেলে চাই প্রসাধন। আর প্রসাধনের প্রথম এবং শেষ কথাও হচ্ছে কেশবিন্যাস। ঘন, সুকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, সযত্ন পারিপাট্যে উজ্জ্বল, আপনার লাবণ্যের, আপনার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। কেশলাবণ্য বর্ধনে সহায়ক লক্ষ্মীবিলাস শতাব্দির অভিজ্ঞতা আর ঐতিহ্য নিয়ে আপনারই সেবায় **নিয়োজিত।**

লক্ষ্মীবিলাস তৈল

গুণসম্পন্ন, বিশুদ্ধ, শতাব্দির ঐতিহ্য-পুষ্ট

পশ্চিমের বারান্দায় রোদ পড়েছে।

হেমন্তের বিকেল। সারাদিন ঘোলাটে মেঘ আকাশটাকে অবসন্ন করে রেখেছিল। থেকে থেকে হাওয়া দিচ্ছিল। এখন মেঘ কেটেছে। রোদে তাপ নেই। রোদের রংটা লালচে। সুরনাথ সেনের পায়ের ওপর চাদরটা টেনে দিল চাকরটা। চেয়ারটা টেনে আনল কিনারে। সুরনাথ চাকরকে চলে যেতে বললেন। সুরনাথ একলা থাকতে চাইলেন।

বারান্দার নিচে মাধবী লতার ঝাড়টা এখন নেই। অথচ একদিন বারান্দায় দাঁড়ালে গাছটার পাতা ছুঁয়ে ছোঁয়া যেত। কবে মরে গেল গাছটা, সুরনাথ মনে করতে পারেন না। এসব গাছে ত জল দিতে হয় না। বরষাড়াই ত' বাঁচে। তবু গাছটা মরে গেল। একদিন সুরনাথের মনে হলো, বারান্দার রেলিং দিয়ে নিচে চাইতে গিয়ে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। প্রথমে বুঝতে দেরী হয়েছিল, তারপর বুঝলেন গাছটা আর দেখতে পারছেন না। —'কে গাছটা কাটল, কে?' প্রশ্ন করতে গিয়ে তিনি থেমে যান। এমনি এমনিই মরে গেছে গাছটা। কেউই হয়তো বলেনি। কে বলবে? এদিকে ত কেউ আসে না। এ বাড়ীতে যারা থাকে, তারা এদিকে আসতে চায় না।

পশ্চিমের বারান্দার নিচের তিনকোনা জায়গাটুকুতে একদিন বাগান ছিল। সামনে একটা বড় গেট ছিল। পাশে ছিল গ্যারেজ। দক্ষিণ দিকের বড়গেটের পাশে সুরনাথের বাবা রমানাথ সেন, গভর্ণমেণ্ট প্রীচারের নাম সাদা মার্বেলের ফলকে বড় বড় হরফে লেখা ছিল। এদিক দিয়ে শুধু গাড়ী ঢুকত। সদ্য একটা কালো গাড়ী।

তারপর যুদ্ধ এল। তারপর গেট ভেঙে ফেলে পাঁচিল গাঁথা হলো। তারপর ছোট্ট জমিটুকু ধীরে ধীরে বাড়ীর জঞ্জাল জমাবার একটা আস্তাকুঁড় হলো। যুদ্ধ থেকে যখন ফিরলেন সুরনাথ ততদিনে শিবনাথ নতুন গাড়ী কিনেছে। এ গাড়ীটা তখনো বাইরের গ্যারেজে থাকে।

তারপর সুরনাথের আর গাড়ীর প্রয়োজন হলো না। হাঁটাচলার দরকারই ঘুচে গেল তাঁর। তারও পরে অনেক পরে সুরনাথ পশ্চিমের ঘরটায় আশ্রয় নিলেন। পশ্চিমের ঘর আর বারান্দাটুকু শুধু তাঁর রইল।

এখনও রোজ তিনি হুইল চেয়ারটা টেনে এনে এখানে বসেন। দেওয়ালের পেণ্ডুলাম ঘড়িটায় যখন পাঁচটা বাজে তখন আসেন সুরনাথ। তিনি যখন বেরিয়ে আসেন, তখনো ঘড়িটায় পাঁচটা ঘণ্টা বাজছে। ছোটবেলা চৌকিতে শুয়ে শুয়ে ঘড়িটার বাজনা শুনে কতরকম কথাই যে ভাবতেন সুরনাথ। তখন ছোট ছিলেন। নিচের কাছারীঘরের চাদর ঢাকা তক্তোপোষে শুয়ে শুয়ে ঘড়ির বাজনা শুনতেন। তিনটে বাজল, টং—টং—টং! খোকাবাবু ঘোর খোল—খোকাবাবু—ঘোর খোল! চারটে বাজল, টং টং টং টং! খোকাবাবু বাবা—এল! খোকাবাবু বাবা এল! রেলের চাকার শব্দে যেমন অনেক কথা শুনতে পেতেন ছোটবেলা ঘড়ির শব্দেও তেমনি অনেক কথা শুনতে পেতেন। শব্দটা কানে বাজত, মনে মনে কথা বানাতেন। তারপর, বহুবছর ধরে তাঁর জীবনটা নানা কাজ, নানামানুষ নানা ঘটনা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। ঘড়ির শব্দ শোনবার সময় ছিল না তাঁর।

এখন আবার সময় হয়েছে। এখন তাঁর সামনে দীর্ঘ অবসর। এখন তাঁর মনে হয় ঘড়িটা তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছে—'ওঠো বাইরে গিয়ে বোস। এস, শুয়ে পড়। ঘুমোতে চেষ্টা কর!'

বারান্দায় বসলে নিচের অন্ধকারটা চোখে পড়ে তাঁর। নিচে টিনের গ্যারেজ। তার দরজা নেই। বাঁশের ঝাঁপ টেনে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল কেউ। দড়িটা পচে ছিঁড়ে গেছে। ঝাঁপটা খসে গেছে। এখন ওখানে বৃষ্টি ঢোকে, বাতাস লাগে। এখন ওখানে ধুলো, ময়লা, চুনবালির অবাধ প্রবেশাধিকার।

সুরনাথ গাড়ীটাকে বেচতে চাননি।

পেট্রোল পাওয়া যেতনা তখন। তাই পড়ে থাকত গাড়ীটা। তারপর যখন পেট্রোল পাবার আর অসুবিধে রইল না, তখন শিবনাথের গাড়ীটাই ব্যবহার হতো। তবু পুরনো গাড়ীটা মাঝে মধ্যে বেরুত।

সুরনাথের স্ত্রী আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে সিনেমাইতে যেতেন। সুরনাথের পিসেমশাই ছানী কাটাবেন, তাই আর. জি. কর-এ যাওয়া দরকার। সুরনাথের এক মামা হঠাৎ এসে পড়লেন। তাঁকে নিয়ে বেরুনো দরকার। এইরকম অনেক দরকার তখন হতো। সুরনাথের মা তখন অবশ্য নেই। আগে বাবা গেলেন, তারপর মা। তবু আত্মীয় পরিজন, আশ্রিত কতজন ছিলেন! সুরনাথ যখন ছিলেন না, যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তখন থেকেই একে একে সরে যেতে লাগলেন তাঁরা। আসলে এ বাড়ীর মানুষদের জীবনটার আয়তন তখন ক্রমেই বাড়ছে ক্রমেই বাড়ছে। তাই আস্তে আস্তে শিবনাথ, অলকা, অমিত, সুনীলা আর সুনীতার জন্যে অনেক জায়গার দরকার হলো। দোতলার চারখানা ঘর ছাদের দু'খানা ঘর, একতলার চারটে ঘর সবটুকু তাদের দরকার।

সুরনাথ যুদ্ধের পর এসে তাঁর দুই ভাগ্নে, ভাগ্নে বৌ এদের না দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন। তাঁর দিদির গলা না শুনতে পেয়ে আরো আশ্চর্য হয়েছিলেন। তাঁর আপন দিদি নন। খুড়তুতো বোন। প্রথমে তাঁর বাবার, পরে তাঁর দাদার এখানে ছিলেন। সুরনাথের এই দিদিটির অতি সহজে কান্না আসতো। সুরনাথ গাড়ীথেকে নামতে নামতে সেই শুরুই করছিলেন। দু'খানা পা হারিয়ে এসেছেন। দিদি দেখলেই চেঁচিয়ে কেঁদে উঠবেন। বলবেন—'কাকীমার ভাগ্নি আছে, দেখতে হলো না। ওরে সুরু এ তুই আমার কি দেখলি?' কিন্তু দিদির গলা তিনি শুনতে পাননি। দিদির ছেলে এতদিনে বাটানগরে কোয়ার্টার পেয়েছে। সেখানে মা, ভাই, স্ত্রী তার ছেলেদের নিয়ে সে চলে গেছে।

কোয়ার্টার ত সে আগেও পেয়েছিল? তখন ত' মা-কে সে নিয়ে যায়নি? নিজেই এসেছে সপ্তাহে সপ্তাহে। সুরনাথের দিদির বড় আচার বিচার ছিল। ছেলে টাকা দিলে চট্ করে ছুঁতেন না। বলতেন—'কাকীর হাতে দাও।' সুরনাথের স্ত্রী টাকা নিয়ে রাখতেন। ছেলেটিকে সুরনাথই বিয়ে দেন। তারা চলে গেল।

কেন গেল, তা আর জিজ্ঞাসা করেনি সুরনাথ। তারা চলে গেল বাটানগর। অন্তরা নেমে এল নিচে। তারাও ধীরে ধীরে সরে গেল। কেউ চাকরী নিয়ে বা বিয়ে করে। সকলের সব হিসেব মনে পড়েনা সুরনাথের।

তখন গাড়ীটার দরকারও ফুরোলো। আর শিবনাথ যখন গাড়ীটা বিক্রী করতে চাইল, তখন তিনি গাড়ীটা সরিয়ে আনলেন। ভেতরের গ্যারেজে রাখলেন।

সুরনাথ নিচের দিকে চাইলেন।

গাড়ীটাকে তিনি দেখেন, প্রায়ই দেখেন। দেখেন ওই গাড়ীটার মতো, আর যে সব জিনিষ এ বাড়ীর মানুষের কাছে অকেজো হয়ে গেছে, তারা কেমন ওখানে জায়গা করে নিয়েছে। রং-চটা

ষোলনা ঘোড়া—তাঁর প্রথম নাতির জন্যে কিনেছিলেন। একটা পেরাম্বুলেটারে—ঐ পেরাম্বুলেটার শিবনাথের বাবা সোমনাথ শুয়ে থাকত। প্রথম রোজগারের টাকা দিয়ে ছেলের জন্যে গাড়ী কিনে ফেলে সুরনাথ লজ্জা পেয়েছিলেন। তখনো বাবা আছেন, মা আছেন। ছেলের জন্যে ঠেলাগাড়ী কেনাটা যেন সুরনাথের ঠিক হয়নি। ঠেলাগাড়ীর ওপাশে একটা নড়বড়ে তক্তাপোষ খাড়া করে রাখা। জলচৌকি পাখীর খাঁচা, এমন সব জিনিষই যে জমেছে ওখানে। সুরনাথ চেয়ারটার হাতল ঘুরিয়ে পেছনে সরে এলেন। টং টং করে শব্দ হলো। সাতটা বাজল। সুরনাথ চেয়ারটার হাতল ঠেলে ঠেলে ঘরে এলেন।

॥ ২ ॥

সুরনাথ-এর ঘরে বড় আলোটা জ্বললো।

শ্যামল ঢুকলো। সুরনাথের পিসতুতো বোনের ছেলে শ্যামল। বোনটিকে সুরনাথ দেখেছিলেন ছোটবেলা। তারপর তাকে দেখলেন বিধবা হবার পর। যেন ভাস হবার পর ছেলেটাকে নিয়ে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিল।

খবর পেয়ে সুরনাথ ওকে আনালেন।

জানতেন যে, এ বাড়ীতে নিচের কোণার ঘর ছাড়া ওদের অন্য ঘর জুটবেনা। জানতেন নাতি-নাতনীকে সম্পর্কটা বোঝাবার সময়ে ওদের ভুরু কপালে উঠে যাবে। তাঁর পিসতুতো বোন। সম্পর্কে ওদের ঠাকুমা। বয়সটা যদিও কম। আর ওদের সমবয়সী ছেলেটা ওদের কাকা। ওরা এসব সম্পর্ক বোঝে না বুঝতে চায় না।

তবু শৈবাল এই বাড়ীতে রয়ে গেল।

শ্যামল পাড়ার স্কুলে পড়ে টড়ে ম্যাট্রিকটা পাশ করলো। কি ভাগ্যে ওর হাতের কাজ শেখার দিকে ঝোঁক ছিল। তাই টেকনোলজিক্যাল স্কুল থেকে ও চারবছর বাদে বেরুল। আর সুরনাথের চেষ্টায় একটা কারখানায় ও অ্যাপ্রাটিস হলেও ঢুকতে পেরেছে। সুরনাথ জানেন এর পরে মাইনে বাড়লেই ও-ও সরে যাবে। অন্যরা যেমন সরে গিয়েছে।

শ্যামলের মুখে একটা বিব্রত ভাব। ওর মা-কে সুরনাথ কাছে ডাকেন! কথা বলেন। কিন্তু বয়সে অনেক বড় দাদার কাছে দাঁড়িয়ে শৈবাল কখনো সহজ হতে পারে না। তার মুখে একটা কুণ্ঠাও সঙ্কোচের ভাব লেগে থাকে। আগে সুরনাথের খারাপ লাগতো। ওর সঙ্গে ত উনি ওর বাবা, ওর মা, তাঁদের কথাই বলেন। কত সহজে ওর সঙ্গে মেশেন। তবু ওর মুখ থেকে ওই করুণ অসহায়তাটা যায় না কেন?

এখন আর তাঁর খারাপ লাগে না। এই ঘরে বসে বসে নিজের সঙ্গে নিজে মুখোমুখি হয়ে সুরনাথ অনেক কিছু এখন বুঝতে পারেন। যে একবার যেনেছে সে আশ্রিত, পরের দয়া ও করুণার ওপর তার নির্ভর, কোনদিন, অন্তত যতদিন আশ্রয়দাতার কাছে আছে ততদিন, তার মন থেকে ঐ অসহায়তা মুছে যাবে না। মুখ যখন মনেরই দর্পণ, তখন সুরনাথ ওদের মুখে সহজ বোধকরার অনকুণ্ঠ ভাব দেখবেন না। হয়তো পরে দেখবেন। যখন শ্যামল নিজের বাসা করবে। যখন শৈবাল নিজের সংসার পাবে। অবশ্য তখন আর সুরনাথের সঙ্গে ওদের দেখা হবে না। বিজয়ার প্রণাম করবার দিনটি ছাড়া। হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো। বাটানগর থেকে তাঁর ভায়ে আর ভাগ্নের ছেলে গত বছর বিজয়ার পর এসেও ফিরে গিয়েছে। তিনি বিশ্রাম করছিলেন বলে। তাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাঁকে-ও কেউ ডাকেনি।

শ্যামল বাঁধানো একটা ফ্রেম রাখল। বললো—আজই পেয়েছি।

কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলেন সুরনাথ। বোয়ালিয়ার সেন বংশের বংশ পত্রিকাটা তিনি নতুন করে বাঁধাতে দিয়েছিলেন। সুন্দর ফ্রেমটা পছন্দ করেছে শ্যামল। কিন্তু নতুন কাগজ, নতুন করে লেখা,—তিনি বললেন—'এ কি? নতুন করে করালি না কি?'

শ্যামল বিব্রত ভাবে হাসলো। বললো—'এটা নতুন করে লিখিয়েছি। কেমন ভাল হয়নি? পুরাণটাও এনেছি।' সে শেষের কথাগুলো তাড়াতাড়ি বললো।

সুরনাথ বললেন—'চমৎকার হয়েছে। দে টাঙিয়ে দে ওটা।' শ্যামল টাঙিয়ে দিল।

সুরনাথের মনটা ভাল হয়ে গেল। তাঁর কথা মনে করে শ্যামল নতুন করে একটা কপি করিয়েছে। সেটা বাঁধিয়েছে। তাঁর মনে পড়লো, ঐ গ্র্যাণ্ডফাদার ঘড়িটি যখন সারাবার দরকার হয়েছিল। শ্যামলই খুঁজে খুঁজে একটা পুরণো দোকান, একজন পুরণো কারিগরকে যোগাড় করে। ও-ই অনেক যত্নে ঘড়িটা সারিয়ে এনে দেয়। ঘড়িটার তখন রোগ হয়েছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে থাকত। আবার কখনো, কেপে উঠে ঘণ্টা বাজাতে সুরু করতো। টং-টং-টং-টং পাগলা ঘণ্টি বাজছে ত' বাজছেই। নিজের খেয়ালে না থামলে ওকে থামানো যেত না। আজকাল ওসব ঘড়ি কেউ ব্যবহার করে না। শ্যামলের চেষ্টা ছাড়া ঘড়িটাকে হয়তো সারানোই যেত না। সুরনাথ আর শ্যামল দু'জনের চেষ্টায় ঘড়িটাকে বাঁচানো গেল। নইলে একদিন ওটাকেও নিশ্চয় নিচের ঐ গ্যারেজে আশ্রয় নিতে হতো।

সুরনাথ তাঁর ভাবনাটাকে সরিয়ে শ্যামলের ওপর আনলেন। বললেন—'কাজ কর্ম কেমন হচ্ছে?'

—'ভালই।'

—'এবার তোরা পূজো বোনাস পাবি না?'

—'বোধ হয় পাবো।'

—'টাকা মার হাতে দিস্ ত? না সব খরচ করে ফেলিস্?'

—'দিই।'

সুরনাথ মাথা নাড়লেন। বললেন—'তোর নামে একটা এ্যাকাউণ্ট করে দিয়েছিলাম না পোষ্টাপিসে? তাতে টাকা দিবি। পঁচাত্তর টাকার সব মাকে দিবি না। মা-কে ত আমিই দিই।'

শ্যামল কিন্তু কিছু বললো না। একটু উসখুস করে বললো—'বৌদি বলছিলেন একবার শ্যামবাজার যাবার কথা।'

—'ও! আচ্ছা, যা। কিন্তু, অমিত কোথায়? সে বেলেঘাটায় কাজ করতে যায়। শ্যামবাজারে মার কাছে থাকলে সেরে আসতে পারে না? আলোয়ান নিয়ে যাস। নতুন ঠাণ্ডা পড়েছে।'

শ্যামল বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ অসহায়ের চুপ করে রইলেন সুরনাথ। ছেলেটা কিছু বলতে পারে না, তাই ওকে চৌরঙ্গীর লণ্ড্রী, শ্যামবাজারে বাপের বাড়ী, ডাক্তারের বাড়ী সব জায়গায় পাঠাতে হবে? এতগুলো লোকজন, গাড়ী তবু এরা গুছিয়ে চলতে পারে না কেন? শ্যামলকে যাওয়া আসার খরচ দেয় কি না, তাই বা কে জানে?

সুরনাথ সেন বসেছিলেন। ডাক্তার তাঁর হাতে রবারের পটিটা খুলে নিল। বাঁধল। তারপর রক্ত চাপ নিরূপণের যন্ত্রটার দিকে চেয়ে রইল। ডাক্তারটি সুরনাথের পুত্রবধূ অলকার ভাই। বয়স বছর

চৌত্রিশ। ডাক্তারী পাশ করবার আট বছরের মধ্যেই অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। অবনীশের মেধা ছিল। সে ভাল ছাত্র ছিল। সুরনাথ খুব আগ্রহ নিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা কইতেন। বলতেন—'তুমি সবচেয়ে মোস্ট প্রফেশান নিয়েছ অবনীশ।' অবনীশ একটু হাসতো। তার সার্জারিতে দক্ষতা ছিল। সুরনাথ তাকে বড় বড় সার্জনদের কথা বলতেন। এখন বড় সার্জন কারা? তাঁরা কোন হাসপাতালে আছেন, সে সব জানতে চাইতেন। অবনীশ ডক্টর বোসের প্রিয় ছাত্র শুনে তিনি খুব খুসী হয়েছিলেন। বলেছিলেন—'লোকটি বড় ভাল। টাকা পয়সার লোভ নেই। দেখ, ডাক্তারের মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকাটা কত বড় গুণ। অবনীশ তাঁর কথায় সায় দিত। বলতো—'টাকা করতে চাইলে সার অনেক টাকা করতে পারতেন। বড় বড় কেস পেলে, তিনি নিজের নার্সিংহোমেই রাখতে পারতেন। কিন্তু বড় কেস জটিল অপারেশনের ব্যাপার হলেই তিনি হসপিটালে নিয়ে আসেন। টাকাটা একেবারেই বোঝেন না। বলেন, কেন হসপিটালে অনেক ডাক্তার, রক্ত পাবার সুবিধে। অপারেশনের ঘরটি এসার কনডিসনড। তা ছাড়া যন্ত্রপাতির কোন অসুবিধে নেই।'

সুরনাথ বলতেন—'ভাল খুব ভাল'।

অবনীশ বলতো—'তাই ত বলি সার হাজার হাজার টাকা করতে পারতেন। যে নার্সিংহোমটা করেছেন সেখানেও রুগীর বাড়ীর অবস্থা বুঝে খুব কনসিডার করেন।'

সুরনাথ বলতেন—বেশ বেশ। সব ডাক্তারই যদি টাকার কথা ভাববে তাহলে রুগীরা যাবে কোথায় বল? সত্যিই ত! হাসপাতালে অপারেশান করবার সুবিধে কত! দরকার হলেই তুমি স্কিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পাচ্ছ। রক্ত দরকার হলেও কোন অসুবিধে নেই টাকা ফেললে সবই পাওয়া যায়। কিন্তু টাকা ত' সবাই দিতে পারে না। দেখ, কোহিমার মেডিক্যাল মিশানে আমরা কত ডাক্তার ছিলাম। আমার অবশ্য তখন বয়স হয়েছে। কিন্তু অনেকে ত' তরুণ ছিল। তারা ত' নাম লিখিয়ে চলে গিয়েছিল। তখন যুদ্ধের সময় যদি তারা কলকাতায় বসে থাকতে পারতো, তাহ'লে হয়তো অনেক পয়সা করতে পারত। অনেকেই করেছিল!'

সেই অবনীশ আজকাল অন্য কথা বলে।

সে সার্জারিতে ভাল করে। ডক্টর বোস তাকে নিজের কাছে রেখেছিলেন তিন বছর। সেই তিন বছর অবনীশ বৃথা কাটায়নি। সে নার্সিংহোম সম্পর্কে খবরাখবর নিয়েছে। তারপর তার নিজের বাড়ীতেই এককোণে দু'খানা ঘর নিয়ে সাজিয়ে ফেলেছে। ডাক্তারের পেশায় ঠিক কোন পথটা বেছে নিয়েছিল অবনীশ, তা সুরনাথ ইচ্ছে করেই জানতে চান না। তবে আট বছরের মধ্যে সে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। এখন তার নিজের একটা ছোট্ট নার্সিংহোমও হয়েছে বালিগঞ্জে। গাড়ীও কিনতে পেরেছে অবনীশ।

অবনীশ আজকাল ডক্টর বোসের নামটা অন্যভাবে ব্যবহার করে। সে বলে—'সার যে কি করলেন! এত সুযোগ ছিল, পয়সা করলেন না, নার্সিংহোমের দিকেও মন দিলেন না। ডক্টর ব্যানার্জি ওঁর থেকে জুনিয়র। অথচ কি রকম নাম করে ফেলেছেন।'

অর্থাৎ টাকা করে ফেলেছেন। সুরনাথ ভাবছিলেন মানুষ এত তাড়াতাড়ি বদলে যায় কেন? না কি অবনীশ বরাবরই এরকম ছিল। তিনিই বুঝতে পারেননি?

হাতটা টনটন করছিল। হঠাৎ জ্বালা মনে হলো। অবনীশ সোজা হয়ে দাঁড়াল। বললো—'চোখটা একবার দেখাবেন?'

—'কেন, চোখ কেন?' সুরনাথ আশ্চর্য হয়ে তাকালেন। অবনীশ বললো—'আপনার চোখটা লাল হচ্ছে বলছিলেন না? আমার মনে হয় চোখের নার্ভ-এ হয়তো ব্লাড প্রেসারটা বাড়ছে। এখন একবার দেখিয়ে নিলেই ভাল হয়। আমার বন্ধু সুধীর, সুধীর সেন এখন খুব নাম করেছে। আপনি কবে যাবেন বলুন? আমিই নিয়ে যাব।'

শিবনাথ ভ্রূকুটি করছিল। অবনীশ তাড়াতাড়ি নিজের ভুল সংশোধন করলো। বললো—'আমি তাকে নিয়ে আসব। কোন অসুবিধে হবে না।' সুরনাথ যেন অসহায় বোধ করলেন। বললেন—'তাই ভাল। চোখটা দেখিয়ে নেওয়া যাক। পড়তে কষ্ট হয় না, তাই চোখের কষ্ট কিছু ত বুঝিনি। তাই ভাল। শিবনাথ!'

বাবার মুখে ক্ষণিক অসহায়তা দেখে শিবনাথ বিব্রত হলো। বললো—'আপনি ভাববেন না বাবা। আমিই ওকে খবর দেব।'

ওরা চলে গেল। পর্দাটা টেনে দিয়ে গেল। সুরনাথ চুপচাপ শুয়ে রইলেন। শরীরটা তাহলে বিশ্বাসঘাতকতা করছে? চোখের নার্ভ তাহ'লে একদিন কেটে যেতে পারে? তাঁর হঠাৎ সুদেব চৌধুরীর কথা মনে পড়ল। চোখের ভেতরে রক্তমোক্ষণ হয়ে চোখটা তাঁর ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল। সুরনাথ তখন সবে ডাক্তারী পাশ করে বেরিয়েছেন। একদিন দেখা করতে গিয়েছিলেন। সুদেব চৌধুরী তাঁকে কাছে ডাকলেন। খুব কাছে। তারপর তাঁর মুখে চড়া আলো ফেলে মুখটা কাছে এনে বললেন—'ও, রমানাথের ছেলে? বেশ, বেশ!' তাঁর লাল ঘোলাটে চোখ দুটো দেখে সুরনাথের খুব অস্বস্তি হয়েছিল। সুদেব চৌধুরীর চোখ দুটো ধীরে ধীরে একেবারে অন্ধ হয়ে যায়। ডাক্তার বলেছিলেন, চোখের নার্ভ-এ প্রেসার-ই তার কারণ। কিন্তু তখন সুদেব চৌধুরীর ছেলেদের ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা করাবার পয়সা ছিল না। তাদের যখন পয়সা হলো, তখন আর সুদেব চৌধুরী ছিলেন না।

সুরনাথ ঘণ্টাটা টিপলেন। অলকা ঢুকলো। বললো—'কি, বাবা?'

—'আমি একটু উঠব।'

—'ও। সতীশকে ডাকি।' সে বেরিয়ে গেল। সতীশকে নিয়ে আবার ঢুকলো অলকা। সুরনাথ হুইল চেয়ারে বসলেন। চেয়ারটায় বসবার পর তিনি হাতল দুটো চালিয়ে বারান্দায় এলেন। অলকা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এল। বললো—'মন্টু বলছিল, রোজ আপনাকে খানিকটা খোলাবাতাসে বেড়াতে। আর খাওয়া দাওয়ার কথা……'

—'কি বলছিল?'

—'বলছিল হালকা জিনিস খেতে। মাছ মাংস, মাখন, এসব বাদ দিয়ে…আপনার জন্যে একটু স্টু করতে বলেছি।'

অলকার তাঁতের শাড়ীটার আঁচল উড়ে যাচ্ছিল। সুরনাথ তার দিকে তাকালেন। অলকার বাবা মাষ্টার ছিলেন। মেয়ের ভাল মানুষ মাষ্টার। তাঁর পয়সা ছিল না। অলকার চেহারাটা ছিল মিষ্টি। আর রান্নাবান্নার হাতটি ছিল ভাল। তার মা রুগ্ন ছিলেন। ঘর সংসার সব অলকাই দেখত। তার কাজের নিপুণতা দেখে সুরনাথ খুশী হয়েছিলেন। তাকে আশীর্বাদ করবার সময়ে বলেছিলেন—মাঝে মাঝে আমাকে রেঁধে খাওয়াবে ত মা?'

সেই অলকা বদলে গেল। বদলে যাওয়াই নাকি পৃথিবীর নিয়ম। যে মানুষ যুগের পরিবর্তনের

সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না, তার আপাতত অবস্থাভাবী। তিনি অলকার দিকে তাকালেন। অলকা নিচের দিকে চেয়ে আছে। তার মুখ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর মনে হলো অলকা তাঁর একটা কথার প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো তিনি তাকে আটকে রেখেছেন। তিনি বললেন—'নিচে কি কেউ এসেছে বৌমা?'

—'হ্যাঁ। অমিতের দু'জন বন্ধু।'

—'আচ্ছা। তুমি যাও।'

অলকা চলে গেল। সুরনাথ সামনে টানলেন চেয়ারটা। একটু ঠিম পড়ছে পড়ুক। তিনি সামনের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলেন। অলকা আজকাল ক্বচিৎ এ বারান্দায় আসে।

নিচের প্যারোটা, নিচের জমিটা, নিচের ঐ পুরোনো ডজ গাড়ীটা, অলকা বা শিবনাথ দেখতে চায় না। ওদের ভাল লাগে না।

আজকাল ওরা সম্পূর্ণ নিজেদের জীবন যাপন করে। সুরনাথ তাতে বাধা দিতে পারেননি। বাবা ছিলেন উকীল। তিনি হলেন ডাক্তার। বাবা সেকালের মানুষ ছিলেন। ওকালতিতে অনেক পয়সা করেন। কিন্তু খরচের বহরও কম ছিল না। ভাইবোন, আত্মীয় স্বজন সকলকে নিয়ে বাস করতেন। সুরনাথের মনে পড়ে সকালে দশটার সময়ে রামধারী চাকর একটা পেতলের ঘণ্টা বাজত। রান্নাঘরের দালানে অনেকগুলো পিঁড়ি পড়তো। ইস্কুলের ছাত্র, অফিসের যাত্রী, সবাই একসঙ্গে খেতে বসতো। সুরনাথও তাদের সঙ্গেই বসতেন। ডাল, আলুভাজা আর মাছের ঝোল দিয়ে খেয়ে উঠে যেতেন। এক ছেলে বলে তাঁর কোন আলাদা সম্মান ছিল না। পূজোর সময়ে গাঁট বেঁধে কাপড়

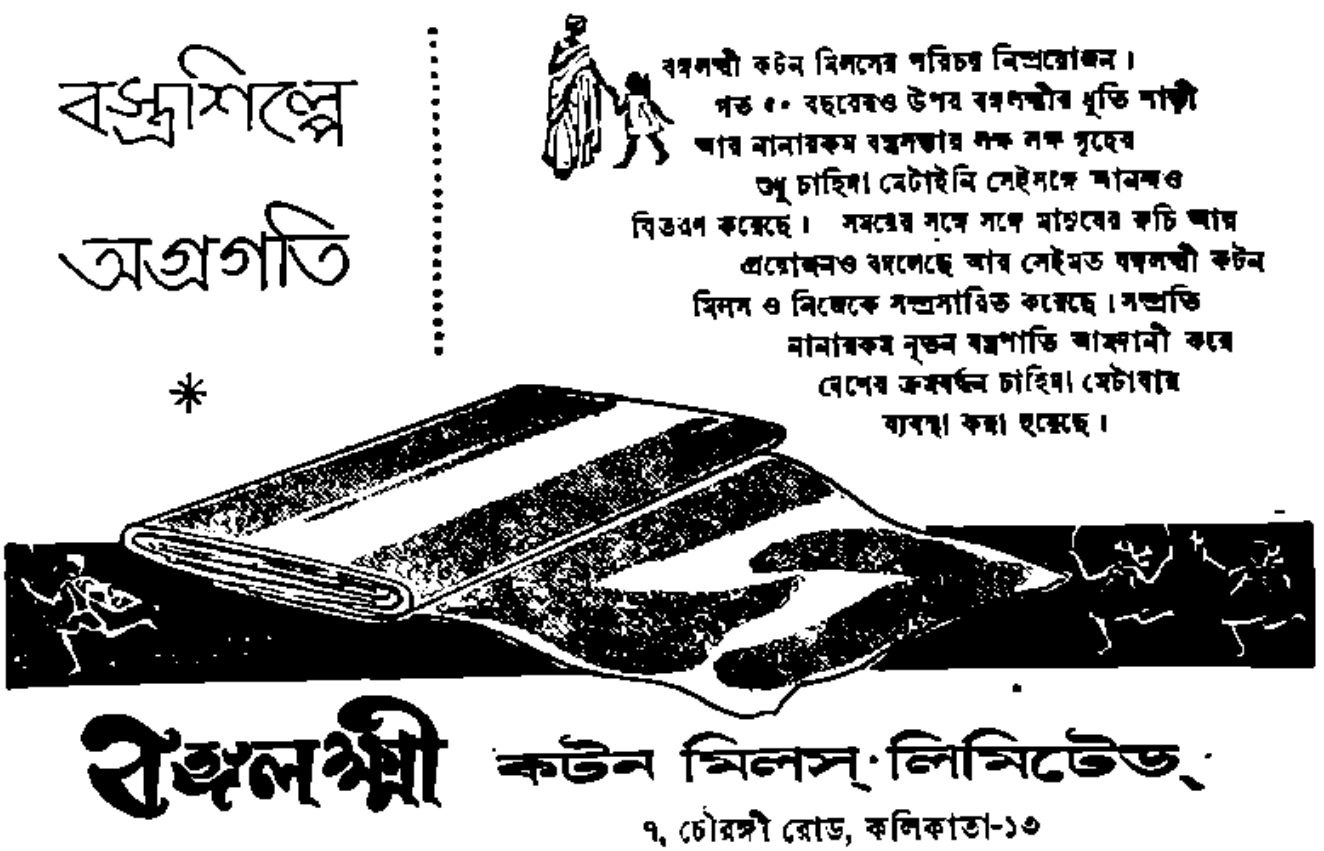

আসতো। কেরোসিন দিয়ে ধুতি আর শাড়ী জোড়ায় জোড়ায় রাখা হতো। সুরনাথ আর অন্য ছেলেরা পাশে বসতেন। রামধারী কাঁচি দিয়ে কাপড় কাটতো। তাঁরা পেনসিল নিয়ে বসে থাকতেন। কাপড়ের ওপর লিখতেন —'সেজ বৌদীমাতা, বিনোদিনী, বিশ্বাস কাকা, নগেন মুহুরী—!' মেয়েদের কাপড়ের পাড় বছর বছর বদলাত। লতাপাড়, রেলপাড়, শঙ্খ-পদ্ম পাড়। সুরনাথ অন্য ছেলেদের মতোই একখানা নতুন ধুতি পরে বাবার সঙ্গে ঠাকুর দেখতেন। নতুন কাপড়ের গায়ের ছবি আঁকা রঙীন কাগজটা নেবার জন্যে সবাই কাড়াকাড়ি করতো। নতুন কাপড়ের গন্ধ পেলেই সুরনাথের কেমন মনে হতো পুজো এসে গেল। তখন, নিচের এই তিনকোনো জমিতে একটা শিউলী গাছ ছিল। শিউলী অতসী, ধোপাটি। সুরনাথের এক বুড়ী পিসীমা ফুল তুলতে যেতেন।

মাঝে মাঝে ঐ পাঁচিলের ওপাশ থেকে রুটি বিস্কুটওয়ালাকে ডাকা হতো। জল হলে দুধে পাউরুটি ডুবিয়ে খেতে দিতেন মা। সুরনাথের মনে পড়ে রুটির উপরে ছোট একটা বিস্কুট আঁটা থাকত। সেটার জন্যেও তাঁরা কাড়াকাড়ি করেছেন।

তখন ঐ জমিটুকু ছিল তাঁদের খেলা করবার জায়গা। বাইরে যাওয়া মানা ছিল। নিচে, বাবার কাছারী ঘরের পাশের ঘরে তক্তাপোশে চাদর পাতা থাকতো। সেখানে লণ্ঠনের চারি পাশে গোল হয়ে বসে সুরনাথরা অনেকে পড়তেন। পড়তে পড়তে চোখ ঢুলে আসতো, তখন শুনতেন, ঘড়িটা বলছে—'টং, টং, খেতে যাও। টং টং খেতে যাও! ভেতর বাড়ীতে ঘণ্টা বাজত। সিঁড়ি থেকে উঠে মুখ ধুয়ে ওপরে যাবার সময়ে সিঁড়ির নিচের অন্ধকারটা দেখতে ভয় করতো। এক ছুটে চলে যেতেন তিনি কোনদিকে না তাকিয়ে।

মাঝে মাঝে জলপুরের ঐ জমিটায় একলা একলা ঘুরতেন সুরনাথ। তখন আশেপাশের বাড়ীতে গাছ ছিল, পুকুর ছিল! দুপুরবেলা ঢিল ডাকতো। তিনি একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারতেন, তাঁর দুপুরের নেশা লাগছে। ঝিম্‌ঝিম রোদ, থালাবাসন ওয়ালার টং টং শব্দ, চিলের ডাক, নারকেল গাছের পাতায় বাতাসের শব্দ, তাঁর শরীরটা আস্তে আস্তে ঝুঁম হয়ে আসতো। হঠাৎ চমক ভাঙতো মা-র ডাকে। মা খেয়ে ওপরে যাচ্ছেন। মা তাঁর হাত ধরে নিয়ে যেতেন। ওপরে পাটির ওপর মা তাকে জোর করে শুইয়ে দিতেন। নিজে পাশে বসে সুপুরী কুচোতেন। মার হাতে চুড়ি বাজত, আর রুকরুকে কাঁসার থালায় ঝিরঝির করে সুপুরী পড়তো। সুরনাথের মনে হতো, কটক থেকে মাকে তিনি একটা জাঁতি এনে দেন। মা খুব খুশী হয়েছিলেন।

বৌ-বয়সে মা গিন্নী হয়েও, মা নিজের খুশীমতো কিছু করতেন না। বাড়ীর আর সকলের চেয়ে খেয়াল খুশী মেটাবার অধিকার তাঁরই বেশী সেইজন্যেই যেন তিনি নিজেকে অত সামলে রাখতেন। মোটাকাপড় পরতেন। দশটি ছেলের সঙ্গে ছেলেকে মানুষ করতেন। বাড়িতে ঝিয়ে পৈতে হলেও তাঁর সময় কাটতো কাজে কর্মে। ভাল শাড়ী, ভাল গয়না পরবার অবকাশ তাঁর হতো না।

তবে তাঁর একটি সখ ছিল। পুজোর আগে ভদ্রলোকের ছেলেরা, বই কিরি করতে আসতো। একশিশি ফুলেল তেল, একখানা বাংলা বই। সুরনাথের হাত দিয়ে তাঁর মা পাঁচটাকায় বই কিনতেন কি বছর। লাল, কাঁপানো ললাটে সোনালী জলে নামলেখা বই। পাতায় পাতায় ছবি। এক পাতা থেকে অন্য পাতায় যাবার মুখে, কোণায় কোণায় হাত আঁকা। আঙুল বাড়িয়ে আছে একখানা হাত। সুরনাথের বাবা জানতে পেরে একবার রাগ করেছিলেন। বলেছিলেন—'বসুমতী' আসে 'সচিত্র শিশির আসে, তবু তুমি বই কিনে কিনে পয়সা নষ্ট কর কেন?'

মা-র আর একটা চেহারা মনে পড়ে সুরনাথের। বাবা মারা গেছেন। ঘরে কম্বলের আসনে বসে আছেন মা। সামনে সিথীশ বসছে। সরকার মশাই বাবা সংকোচের কথা বলছেন। মা আস্তে আস্তে বলেন—'আত্মীয়-স্বজন যে যেমন ছিলেন, তেমনিই থাকবেন। সেই কথা মনে রেখেই কর্তা কানিংয়ে ধানজমি কিনেছিলেন। কিছুদিন কষ্ট হবে, তারপর খোকা দাঁড়াবে।'

সুরনাথ একটা নিশ্বাস ফেললেন।

সুরনাথ ডাক্তার হলেন। আত্মীয় পরিজনের ভার তিনিও বহন করলেন। মেঘকুন্তলা স্বামীর কাজে কখনো বাধা দেননি। তাঁর মনে হয়েছিল, এ দায়িত্ব তাঁদেরই বহন করবার কথা। তিনি খুব বেশী কিছু করছেন না।

সুরনাথ মেঘকুন্তলার কথা মনে করলেন। বড় সুন্দর লেগেছিল তাঁর নামটি। মেঘকুন্তলা পুষ্পলোরস্ত শ্যামকুন্তলা! নাম শুনেই হেসে রমানাথ বলেছিলেন, 'বেয়াই দুই পুরুষ কলকাতায় আছেন, কিন্তু আদিবাস যে চট্টগ্রাম, তা বলে দিতে হবে না। কথাবার্তা বদলে ফেলেছেন, কিন্তু নাম শুনেই যে লোকে ধরে ফেলবে।' মেঘকুন্তলার মেঘের মতো কুন্তল, বা অনবদ্য রূপ কিছুই ছিল না। তখনকার মানুষ বংশ দেখতো, রূপ সবসময় দেখত না। তবু সুরনাথ খুব সুখী হয়েছিলেন। সারাজীবন মেঘকুন্তলা তাঁর কোন কথার প্রতিবাদ করেননি। শুধু একবার।

তখন সুরনাথ পশ্চিমের ঘরে এলেন।

মেঘকুন্তলা বলেছিলেন—'তোমার কি এই রোদ সহ্য হবে? যে গরম ঘর। আর সারাদিন ত বসে থাকা।' তিনি খুব আপত্তি করেছিলেন। শিবনাথ বলেছিল—'আমি কি বাবাকে সরে যেতে বলছি? ঘর গুলো নতুন করছি। মেঝে বদলানো হচ্ছে, তাই দক্ষিণের ঘরে যেতে বলেছিলাম। পশ্চিমের ঘরে থাকলে ত' কাজের-ও অসুবিধে। মেঝেটা মোজেইক করাব, দেয়ালগুলো নতুন করে টেম্পার করাতে হবে!'

—'না। কিছু করাতে হবে না।' সুরনাথ গম্ভীর গলায় বলেছিলেন। বলেছিলেন—'আমার জিনিষগুলো এই ঘরে সরিয়ে আন। এ ঘরে মিস্ত্রীর কাজ করবার দরকার নেই।' সুরনাথের এ গলাটা শিবনাথ চেনে। তাই সে কিছু বলেনি। এ ঘরে সুরনাথের মা-র পালঙ্ক এসেছে। বংশপত্রিকা, রমানাথের তৈলচিত্র, বংশের দীক্ষাগুরুর ছবি, মার্বেল টপ্ ভারী টেবিল, রমানাথসেনের কয়েকটা আইনের বই, সব একে একে এসেছে। মেঘকুন্তলা চোখের জল মুছেছেন। বলেছেন, 'বিয়ে হয়ে এসে অবধি পঁয়তাল্লিশ বছর ও ঘরে বাস করেছি। তুমি সে টুকুও মনে রাখলে না?'

সুরনাথ তাঁকে পাশে বসিয়েছেন। বলেছেন—'বড় বৌ, পুবের ঘর এখন ওদের দরকার। আমার তোমার পশ্চিমের ঘর-ই ভাল, পশ্চিমের ঘর-ই ভাল।'

সুরনাথ সচকিত হলেন। সুনীপা তাঁকে ডাকতে এসেছে। বড় নাতনী সুনীপা বললো—'আজ তোমাকে টেবিলে খেতে হবে। বাবা বলছিল তোমার একটু নাড়াচাড়া করা দরকার।' সুরনাথ বললেন —'চল।'

দুজনে চলতে লাগলেন। সুরনাথ বললেন—'অমিত কোথায়? অফি আছে, না বেরিয়েছে?'

ঘরে ঢুকলেন সুরনাথ। চমৎকার পরিবেশ। মাঝখানে বড় টেবিল। শিবনাথ, অলকা, সুনীতা, অমিত সবাই বসে আছে। মনে হলো একটা আলোচনার ঝড় এইমাত্র থেমেছে। অলকা সুরনাথের চেয়ারের কাছে আসল। হাত ধোবার জল দিল। তারপর খাবারটা সামনে রাখল। কয়েক টুকরো পাউরুটি, একটু স্টু,

মাছের ঝোল। সে সবাইকে পরিবেশন করছিল। সুরনাথ দেখলেন শিবনাথ ভাল করে খাচ্ছে না। সে যেন কি ভাবছে। অমিতের সঙ্গে কিছু হয়েছে বোধ হয়। পিতাপুত্রের তর্ক লেগেই থাকে। চেঁচামেচি শুনতে পান তিনি নিজের ঘর থেকে। ছেলে বাবাকে চোখাচোখা যুক্তি দিয়ে পরাস্ত করে। আর তখন শিবনাথের জন্যে তাঁর দুঃখ হয়। অমিত হঠাৎ মুখ তুললো। বললো—'শ্যামল খেতে আসেনি? শ্যামল?'

'শ্যামবাজার থেকে আসেনি এখনো।' অলকা অমিতকে ভাত দিল। সুরনাথ বললেন—'আমি বলব ভাবছিলাম, এখন মনে পড়লো। অমিত ত' বেলেঘাটাতেই যায়। ওদিকে কাজ থাকলে ওকে বললেই পার!'

অমিত একটু বিস্মিত হয়ে তাকাল। বললো—'বললেই পার ত। সত্যিই। আমার মনে থাকেনা। তুমিই বলতে পার না।' অলকা জবাব দিলনা। মুখটা তার লাল হয়ে গেল। সুরনাথ দৃশ্যটা উপভোগ করছিলেন। অলকা ইচ্ছে করলেই অমিতকে কিছু করমাস করতে পারেনা। শিবনাথ ইচ্ছে করলেই সুনীপাকে ধমক দিতে পারেন না। সুনীপা যখন অমিতের বন্ধুর সঙ্গে স্কুটারে চড়ে ফিরেছিল, অমিত রেগে লাল হয়ে গিয়েছিল, তবু কিছু বলতে পারেনি দু'বছরের ছোট বোনকে। এরা সবাই সবাইএর সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশেছে। বাবা মা-র সঙ্গে সন্তানদের দূরত্ব নেই। বড় ভাই-এর সামনে ছোট বোনের সঙ্কোচ নেই। সেইজন্যে, শুরুতর একটা সঙ্কট যখন দেখা দেয়, এরা বন্ধুর মতো আলোচনা করে সে সব সমস্যাকে সহজ করতে চায়। খুব সহজ ভাবে মিশতে মিশতে এরা নিজেদের জোর হারিয়েছে। ছেলেকে অলকা জোর গলায় হুকুম করতে পারেনা। অতএব শ্যামলকে দৌড়তে হয় সন্ধ্যাবেলা। সেদিন সুনীপা, তার বন্ধু সৌরী মিত্রের সঙ্গে রমরম থেকে রাত এগারোটায় ফিরলো। শিবনাথ আর অলকা অস্থির হয়ে পায়চারী করছিল। শিবনাথকে ডেকে তিনি বলেছিলেন— 'শাসন কর শিবনাথ। এই সব উদ্‌ভ্রান্ত ব্যবহার মেয়েকে কোন স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছে?' শিবনাথ মুখ লাল করে মৃদু কণ্ঠে বলেছিল—'বুঝিয়ে বলব, বড় হয়েছে, এখন চট করে কিছু বলে বসলে.....'

তাঁর ছেলের ভয়ে কষ্ট হয়েছিল। তাঁর বলতে ইচ্ছে হয়েছিল,—'খোকা, আমি জানি তুই ভয় পাস। পাছে ওরা তোকে অমান্য করে। ওরা তোর শাসন করবার অধিকার অস্বীকার করে চলে যায়? ভয় পাস না। ভয় পেয়েছিস জানলে ওরা তোর দুর্বলতা ধরে ফেলবে। তুই আমার কাছে এসে বোস। আমি তোকে যা বলব, ভাল-র জন্যেই বলব। তোর তাতে খারাপ হবে না।' কিন্তু তিনি কি বলতেন?

শিবনাথকে 'খোকা' তিনি কতদিন বলেননি। তার ছেলেমেয়ের ব্যাপারে কথা বলেননি। হঠাৎ অভ্যেস বদলে ফেলতেন কি করে?

শিবনাথের গলা শুনলেন তিনি। শিবনাথ বলছে—'তা হ'লে দরখাস্ত চলে গিয়েছে তোমার?'

—'হ্যাঁ।' সুনীপা বললে।

—'কিসের দরখাস্ত?' সুরনাথ জানতে চাইলেন।

—'একটা কাজের।' সুনীপা জবাব দিল।

—'কাজ? কেন, তুমি আবার পরীক্ষা দেবেনা।'

—'না। পড়া আমার হবে না।'

—'ও। তা কাজটা কি, জানতে পারি কি?'

—'এই, রিপ্রেজেন্টেটিভ এর কাজ বলতে পার।'

অমৃত

সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক

॥ পরিবারের সকলেই পড়ে
অনাবিল আনন্দে মুগ্ধ হবে ॥

সুরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, দীপক চৌধুরী, আশাপূর্ণা দেবী, বিমল মিত্র, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রাণতোষ ঘটক, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য প্রমুখ প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি নিয়মিত রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে অমৃত আজ ঘরে ঘরে সমাদৃত।

সম্পাদক ঃ তুষারকান্তি ঘোষ

প্রকাশক
অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা-৩
ফোন: ৪৪-৪২৩১ (১১টি লাইন)

মূল্য প্রতি সংখ্যা
৪০ নয়া পয়সা

অমৃত

PRO-AM-1B

অমিত মুখ তুলল। সে বললো—'না। সত্যি কথাটা বল তুমি। কাজটা সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর দাদু। হিন্দুস্থান লিভার্স-এর।'

—'তার মানে বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে জিনিষ বিক্রী করা? কাজ করতে চাইলে স্কুলে কাজ নিলেই ত' পারতে।'

অমিত অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো—'স্কুলের কাজে কেউ মাইনে দেয় না। আর সুনীপা ওসব পছন্দ করে না। ও যখন স্টেনোগ্রাফি শিখতে চেয়েছিল তখন ওকে সেক্রেটারীয়াল ট্রেনিংয়ে যেতে দেওয়াই উচিত ছিল। এই ধরনের কাজ ওর পছন্দ।'

—'এ ধরনের কাজে স্বাধীনতা আছে।' সুনীপা যেন কৈফিয়ৎ দেবার সুরে বললো।

—'তা, স্বাধীনতার অভাবে তুমি কষ্ট পাচ্ছ, তাই কাজ খুঁজছো?'

—'ঠিক তা নয়। সুনীপা কেরিয়ার করতে চায়। এ কাজটাতে মনে হচ্ছে যারা যা-রও আপত্তি আছে।'

—'তা সেক্রেটারিয়াল ট্রেনিং-ই না হয় নাও!'

—'এখন আর তা হয় না। সৌরী মিত্র ওকে পরে এক্সারওয়েজ-এ একটা কাজ করে দেবে বলেছে। এ কাজটার জন্যে সে অনেক চেষ্টা করেছে। এখন আর তা হয় না।'

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল সুরনাথের। তিনি হেলান দিলেন। বললেন—'তোমার নিজের কাজ কিরকম চলছে?'

অমিত বললো —'এতদিন ভালই চলছিল। এবার শেখর বোস আমাদের বড্ড জ্বালাচ্ছে।'

—'কি রকম?'

—'পুরনোকেলে বস্ একটি। কড়াকড়ি আরম্ভ করেছে তীষণ। ঠিক দশটায় পৌঁছতে হবে। টিফিনে আধঘণ্টার বেশী বাইরে থাকা চলবে না। অফিসে মহলা জামাকাপড় পরে আসা চলবে না। তা ছাড়া সুযোগপেলেই বড় বড় কথা শোনায়। এই ফার্মটা হঠাৎ গড়ে ওঠেনি। যাঁরা গড়ে ছিলেন, তাঁরা অনেক চেষ্টায় এই দেশী ওষুধের কোম্পানী গড়ে গেছেন। আমরা যদি ভাল করে কাজ করি, ওয়ার্কাররা কেমিষ্টরা যদি প্রাণ ঢেলে কাজ করে তাহ'লেই আমরা সকলে ফার্মটাকে টিকিয়ে রাখতে পারব। অফিসে বসে গল্পগাছা করা চলবে না।' সুরনাথ হঠাৎ আত্মসচেতন হলেন। তিনি বললেন—'তাতে তোমার আপত্তি কোথায়?'

—'আমার না, সকলের। হঠাৎ ক্যাশে হাজারখানেক টাকা কম পড়াতে ক্যাশিয়ার-এর ওপর সাসপেন্সানের খর্ডার ঝুলছে। যেকোন মুহূর্তে শেখর বোস ওকে সাসপেণ্ড করবে। তাতে অফিসে সবাই গরম হয়ে আছে।'

—'টাকাটা ক্যাশিয়ার নেয়নি?'

—'নিয়েছে, হয়তো নিয়েছে। কিন্তু টাকাটা খুব বড় নয়। আসলে সাসপেণ্ড হলে লোকটা পথে দাঁড়াবে। ছাটাই হলে আর কোথাও কাজ পাবে না। আমরা তা' হতে দেব না।'

অমিত উঠে দাঁড়াল। সুরনাথ তাঁর নিজের ঘরে চললেন। অমিত গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। দক্ষিণের বারান্দায়।

এই অফিসে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে তবে ঢুকতে পেরেছে অমিত। দেড় বছর ভালভাবে

কাজ করেছে। অফিস থেকেই সে বিলেতে যাবার চেষ্টা করছিল। হয়তো যেতেও পারতো। কিন্তু শেখর বোস যেদিন ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে এল, সেদিন থেকে তার জীবনের একটা নতুন অধ্যায় সুরু হয়েছে।

শেখর বোস। বেঁটে নার্ভাস চেহারা। আস্তে হাঁটেন। আস্তে কথা বলেন। কাজ ছাড়া কিছু বোঝেন না। কাজ ছাড়া কিছু চান না। প্রথম প্রথম সকলের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করেছেন তিনি। ঘুরে ঘুরে তাদের টেবিলে গিয়ে দাঁড়াতেন। ওয়ার্কারদের সঙ্গে মিশতেন। কেমিষ্টদের ডেকে এনে আলোচনা করতেন। কার্মের পঞ্চাশবছর বয়স হওয়ার উপলক্ষ্যে যেদিন সভা হলো, সেদিন শেখর বোস লম্বা একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশে ওষুধের কার্মগুলো কোনদিনই এগিয়ে এল না। আজ কলকাতায়-ই সব ওষুধের সবচেয়ে বড় বাজার। অথচ সেখানে অন্যান্য বিদেশী কার্ম আমাদের নাকের ডগায় তুড়ি মেরে পয়সা নিয়ে যাচ্ছে। তিনি চেষ্টা করবেন, দেশী কেমিষ্টদের রিসার্চ করবার সুযোগ দিতে। তিনি দেখবেন, যাতে নতুন নতুন ওষুধ, একটু সস্তায় বাজারে ছাড়া যায়। তিনি দেখছিলেন, শ্রোতারা উসখুস করছে! কেউ কেউ উঠে চলে যাচ্ছে। তিনি তখন তাঁর বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করবার জন্যে অন্য চেষ্টা করলেন। বললেন, তিনি একটি গল্প শোনাবেন। একটি বাঙালী কেমিষ্টের গল্প। এই হতদরিদ্র কেমিষ্টটি জলের ট্যাঙ্কের ছাং গাস থেকে পেনিসিলিন বের করবার ফরমূলা তৈরী করেন। কোন দেশী কার্মের কাছে উৎসাহ না পেয়ে তিনি ত' একটি বিদেশী কার্মের কাছে ছুটে যান। জানান, এই ফরমূলাকে পেটেন্ট করলে, জলের দামে পেনিসিলিন বাজারে ছাড়া যাবে! অনেক প্রাণ বাঁচবে, অনেক কাজ হবে। বিদেশী কার্মটি ফরমূলাটি আত্মসাৎ করে। তাঁর ফরমূলায় তৈরী পেনিসিলিন শেষ অবধি বম্বের বিদেশী ওষুধ কারখানা থেকে তৈরী হয়ে এল। কেমিষ্টটি কোন পাত্তা পেলেন না। তিনি শেষ অবধি আত্মহত্যা করেন।

শেখর বোস বলেছিলেন—'আপনাদের এই গল্পটা বলতে চাইনি। এই গল্পটাই মনে এল। আসলে আমি যা বলতে চাইছি তা হলো, আমাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস রাখা দরকার। কাজকে ভালোবাসা দরকার। আপনারা কার্মের উন্নতি করুন। কার্ম-ও আপনাদের দেখবে। অনেককে সুবিধে করে দেবে। ব্যবসাকে আরও জনে বাড়াতে পারবে।'

আবহাওয়াটা যেন একাগ্র হয়ে উঠেছিল। সবাই শুনছিল শেখর বোসের কথা। কিছু পেছন থেকে হঠাৎ কে বলে ওঠে—মুনাফা যাবে কে? বেড়ালের ডাক ডেকে ওঠে কেউ কেউ। শেখর বোস হঠাৎ চেঁচিয়ে—'ইউ! ইউ!' বলে বেজায় খারাপ করেন। অত্যন্ত চটে তিনি বেরিয়ে যান। এবং তখন সবাই হেসেছিল। তারপরই আধুনিক গান সুরু হয়। আর কোন গোলমাল হয়নি। সভার কাজ শেষ হয়ে জলসার কাজ সুরু হয়েছিল। সেদিন অমিত বোঝেনি। পরে বুঝেছে, শেখর বোসের চরিত্রে একটা ভয়ানক দুর্বলতা আছে। তাঁর কথার মাঝখানে, কথার প্রত্যুত্তরে কেউ যদি তাঁকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, তাহ'লে তিনি ক্ষেপে যান, নিজের ওপর সব শাসন ভুলে গিয়ে চেঁচান।

শেখর বোস-এর নানারকম কড়াকড়ির বিরুদ্ধে অমিতরা বিদ্রোহ প্রকাশ করেছে। তবু শেখর বোস বুঝছেন না। তিনি তাঁর নানারকম আইডিয়ার জুসেড চালিয়ে-ই যাচ্ছেন। ক্যাশিয়ার কৃষ্ণধন। কৃষ্ণধন ঘোষাল। ক্যাশিয়ার কৃষ্ণধনের সম্পর্কে অমিতের কোন ভুল হয়নি। সে বুঝেছে, কৃষ্ণধন অল্প অল্প ক'রে সরিয়েছে। কিছু টাকা সরিয়েছে। এবং টাকা চুরি করা খারাপ কাজ, তাতে অমিতের কোন সংশয় নেই।

তবু তারা কৃষ্ণধন-এর ব্যাপারটা নিয়েই শেখর বোসের সঙ্গে মুখোমুখি হবে! শেখর বোস তাদের প্রত্যেকের মনকে কোন না কোন ভাবে স্পর্শ করেছে। আগেকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর কখন আসতেন, কখন যেতেন, কেউ তার খবর রাখত না। কিন্তু শেখর বোস সম্পর্কে সবাই সচেতন। শেখর বোস এল, শেখর বোস করিডোর দিয়ে হাঁটছে, শেখর বোস ক্যান্টিনের কন্ট্রাকটরের সঙ্গে কথা বলছে, সব তারা টের পায়। সেদিন সিগারেট খেতে খেতে আসছিল অমিত! সিগারেটটা করিডোরের কোণায় সে ছুঁড়ে ফেলে। শেখর বোস যে সামনে পড়বেন, তা সে ভাবেনি।

শেখর বোস তাকে বলেন—'মিস্টার সেন, আপনি কি দয়া করে একটু দাঁড়াবেন?'

তাকে দাঁড় করিয়ে তিনি, সিগারেট যেখানে সেখানে ফেলার মধ্যে যে নোংরামি আছে, সেটা নিয়ে কয়েকটা কথা বলেন। তারপর বলেন—'বিপদের কথা ভেবে দেখেন আপনি? কত রকম বিপদ হতে পারে? অসাবধানে সিগারেট ফেললে ইলেকট্রিক ওয়্যারিং জ্বলে যেতে পারে, বাড়ীতে আগুন লাগতে পারে, নিজের পক্ষে কার কোকা পড়তে পারে।

তাঁর কথা শুনতে শুনতে অমিতের নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল এবং এই অপরাধের বোধ জাগিয়ে তাকে বিব্রত করবার জন্যে সে ক্রুদ্ধ হয়েছিল।

তার মনে হয়েছিল শেখর বোস তাকে কোণঠাসা করে ফেলছে। শেখর বোস তাকে যে কথাগুলো বলছে সেগুলো সত্যি। সত্যিই সে অন্যায় করেছে, অশোভন আচরণ করেছে।

সে হঠাৎ বলে উঠেছিল—'ডোণ্ট্ মেক্ট্ আস মেক এ মাউণ্টেন অফ এ মোলহিল্।' যথেষ্ট হয়েছে।

শেখর বোস চটে যাননি। তার দিকে তাকিয়ে আস্তে বলেছিলেন—'আপনিও বলবেন এটা তুচ্ছ ঘটনা? খুব তুচ্ছ ঘটনা?'

অমিত কথা খুঁজে পায়নি। শেখর বোস বলেছিলেন—'আমি জানি আপনারা স্বীকার করেন না। কিন্তু আমি স্বীকার করি, আমি বিশ্বাস করি, এগুলো তুচ্ছ ঘটনা নয়!

একটু চুপ করে থেকে শেখর বোস বলেছিল—'দেখুন ত, কার্শ গাছটার পাতাটা কেমন ঝলসে গেছে? আচ্ছা মিস্টার সেন, বলতে পারেন, ছোট ছোট জিনিষ শিখতে আমরা লজ্জা পাই কেন? সবসময় কেন মনে করি, নিজেকে নিচু করতে পারব না, নিজেকে নিচু করতে পারব না? আসলে আমার মনে হয়, ছোট ছোট ডিসিপ্লিন সেইজন্যেই এখানে কেউ মানতে চায় না। সবাই মনে করে সেটা মানলেই তারা হেরে যাবে, নিচু হয়ে যাবে। হুলস্! কেউ কি অত সহজে নিচু হয়? অত সহজেই কি ছোট করা যায় মানুষকে? কিন্তু, আমিও চেষ্টা করব, চেষ্টা করব!' শেষের কথাগুলো যেন নিজেকেই শুনিয়েছিলেন শেখর বোস।

কার্শের পাতাটা সত্যিই ঝলসে যায়। করিডোরের কোণে কোণে কার্শ, লতানে গাছ, পাতাবাহারের টব রাখা শেখর বোসের আর একটা পাগলামি। ছোট অফিস বাড়ীটার ঘরজায় তারের পাপোষ দেওয়া। নিচের কম্পাউণ্ডে নতুন করে বাগান তৈরী করা, এ সবও তারই এক একটা কাজ, যা কর্মচারীদের মনে অস্বস্তি জাগিয়েছে।

হঠাৎ অমিতের মনে হলো সুরনাথকে তার শেখর বোসের কথা বলা দরকার। দাদু অনেককে জানেন। ঐ কার্শের ব্যাকগ্রাউণ্ড জানেন হয়তো তিনি। তা ছাড়া, কয়দিন ধরে, তার মনটা বিরক্ত হয়ে আছে। চিন্‌চিন্ করছে। সিগারেট ছুঁড়ে ফেলবার সম্পর্কে লেকচারটি সে ভুলতে পারছে না। তার খুব অপমান লেগেছে।

সে সুরনাথের ঘরে ঢুকে কথা বলতে সুরু করলো।

। তিন ।

সুরনাথ ঘোরে ঘোরে হাতল চালিয়ে বারান্দায় ঘুরছিলেন। এদিক থেকে ওদিক। ওদিক থেকে এদিক। তিনি সম্প্রতি জীবনে সাম্প্রতিক জীবনের প্রতি একটা আগ্রহে অনুভব করছেন। অমিত সেই রাতের পর তাঁকে নতুন একটা আগ্রহের খোরাক দিয়েছে।

তিনি বলছিলেন। অমিত শুনছিল।

তিনি কেন যেন অমিতকে নিজের জীবনের কথা বলছিলেন। একদিন, যখন কয়েকজন দেশ-হিতব্রতীর চেষ্টায় (দেশহিতব্রতী কথাটায় অমিত হেসেছিল। তিনি বলেছিলেন—'যাঁদের দেশহিতব্রতী বলা হয়েছে, তাঁরা সে নামটা সেকেলার দিয়ে, বা দলের পাণ্ডা হয়ে প্রোপাগাণ্ডার গুণে অর্জন করেননি। দেশবাসী-ই তাঁদের সেই নাম দিয়েছিল। দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, আচার্য, এ সব নাম যেমন সি, আর, দাশ, জে, এম, সেনগুপ্ত, পি, সি, রায়, নিজেরা অর্জন করেন তেমনি।) ঐ কার্যটা পড়া হয় তখন তার পেছনে একটা আদর্শ ছিল। প্রথম যাঁরা সেখানে ভলান্টিয়ারি সার্ভিস দেন, তাঁদের মধ্যে সুরনাথও ছিলেন। পরে সুরনাথ সরে আসেন। তাঁর ওপর বৃহৎ পরিবার পরিপোষণের ভার ছিল। তাঁর অনেক কাজ ছিল।

তারপর দীর্ঘদিন বাদে প্রৌঢ় বয়সে সুরনাথ যখন প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করলেন, শিবনাথ যখন কাজ করতে সুরু করলো, হাজার টাকা মাইনের চেয়ারে বসলো, তখন সুরনাথ যুদ্ধে নাম লেখালেন।

('ব্রিটিশের হয়ে যুদ্ধ।' অমিত বলেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা মনে করিনি আমরা ব্রিটিশের হয়ে যুদ্ধ করছি। ডাক্তারের কাজ আহতকে বাঁচানো, মুমূর্ষুর যন্ত্রণা লাঘব করা। আমরা সেই কাজ করছিলাম। কলকাতায় বসে ওষুধের চোরাকারবার করলে অনেক টাকা করতে পারতাম। আর এখনকার মানুষ তোমাদের কাছে স্বদেশপ্রেমিক ইত্যাদি নাম কিনতে পারতাম একটু ওপর মহলে ঘোরাঘুরি করলে। তা আমি জানি। কিন্তু আমি তাতে বিশ্বাস করিনি।'

—'আজকালকার মানুষকে তুমি ছোট করে দেখছ।'

—'না। দেখছি না। তোমাদের মধ্যে কী কী সদ্‌গুণ আছে, তাই নিয়ে গলাবাজি করে তোমরা আত্মসন্তুষ্টি লাভ করতে পার। কিন্তু এখানে এই চেয়ারে বসে বসে আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে যে কোন পথকে গ্রহণ করতে লজ্জিত হও না। সহজে মেডা হও। সহজে পরীক্ষায় পাশ করব। সহজে চাকরী নেব। এই তোমাদের পলিসি। এবং তার বিপক্ষে কোন বাধা এলে তখন তোমাদের স্বাধীনসত্তা জেগে উঠে, তখন তোমরা বিদ্রোহ কর।'

—'এর নাম যুদ্ধ ক'রে বাঁচা। তোমাদের যুগটা আর নেই, সেকথা ভুলে যাচ্ছ কেন?'

—'এর নাম যুদ্ধ নয়, অমিত। আমাদের যুগ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা থাকতে পারে? আমরা কষ্ট ক'রে পড়তাম। কষ্ট করে সাফল্য অর্জন করতাম। আমরা নিজেদের নিয়ে বাঁচতাম না। অনেকের দায়িত্ব নিতাম। অনেককে নিয়ে বাঁচতাম।'

—'অকর্মণ্যতাকে প্রশ্রয় দিতে। বার বার তার তাকেই বহন করতে যেওয়া উচিত।'

—'না। এটা-ও স্বার্থপরের মতো চিন্তা, অমিত। আমার বুড়ী কাকীমা, রুগ্ন মামাতো ভাই, নাবালক ভাগ্নে। সকলকে জীবন থেকে ছেঁটে ফেললে তোমাদের জন্যে আরো কিছু টাকা থাকত। কিন্তু তুমি ঠিক বুঝবেনা। তোমরা যে টাকার কথাই ভাবছ, আমি তা বলতে চাই না। তবু মনে হয়, আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ বলতে আমরা যা বুঝি, তা হলো মানুষ। আসলে তখন মানুষ সমানাধিকারের কথা

বলে বক্তৃতা দিত না। দিতে জানত না। তারা সাধারণতো অপরকে নিয়ে বাঁচতো। তার ফলে অনেক ছেলে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেত। অনেক মেয়ের বিয়ে হতো। বুড়োরা, অর্থাৎ আমার আজ যা বয়স, সেই বয়সের মানুষরা সসম্মানে বাঁচতে পারতেন। রোজগার করবার, বা পরিশ্রম করবার ক্ষমতা চলে গেলেও পরিবারে তাঁদের একটা সম্মানের জায়গা থাকত। কিন্তু সে কথা নয়। জীবনের যুদ্ধ-র কথা বলছ তুমি। আমি কিন্তু দেখছি, সুবিধেবাদিতায় তোমাদের পেয়ে বসেছে! তোমরা সর্টকাট বিশ্বাস কর। এই যেমন, তুমি অফিসের ইউনিয়ন আর মালিকের অবিচার নিয়ে এত কথা বলছ। ঐ অফিস যখন তোমায় বিলেত পাঠাবে, তুমি চলে যাবে। এবং তারপর তুমিও আর একটি 'বস্' হয়ে বসবে। এবং একজন 'বস্'-ই হবে। জীবনে আজকে কি শ্রদ্ধা করতে পেরেছ কোনদিন? পরীক্ষার হলে দাদা করেছ, চেয়ার ভেঙেছ! ফেল করলে পর তোমার বাবা একজামিনার ট্যাবুলেটারের বাড়ী ছুটেছে। কলেজে ঢুকে থেকে রাজনীতি করছ, রাস্তায় রাস্তায় স্লোগান হেঁকেছ। অথচ ভাল বিছানা, ভাল খাবার, তাতে তোমার অরুচি নেই।'

—'আজকের জীবনই যে তাই!'

—'না। তবে তুমি সব ছেড়ে রাজনীতি করতে। সব ছেড়ে, যে আদর্শে বিশ্বাস কর, তাই নিয়ে বাঁচতে। আসলে তোমাদের সততা নেই। সে সততা নেই। তুমি কেন, সারা দেশটা তাতে-ই ভুগছে। তোমরা কোন কাজ না করে, শুধু গলাবাজি করে সব বদলে ফেলতে চাও। এবং এখনও তোমরা নিজেদের

অবস্থা দেখতে পাওনা। তোমরা কথা বলবে, শুধুই কথা বলবে, এবং কলমের মুখে আগুন ছোটাবে সকলেরই সুবিধে। ব্যবসা, বাণিজ্য, কারখানা, পাট, কারখানা, সব অন্যদের হাতে, সব অন্যদের। এমন কি ছোট ছোট কাজগুলো পর্যন্ত অন্যরা নিয়ে নিয়েছে। তোমরা যারা বক্তৃতা দিচ্ছ, যারা প্রতিবাদ জানাচ্ছ, তারাও একটি ভাল চাকরী পেলে, একটি ধনীর মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে, একেবারে চুপ করে যাবে।'

—'জীবন যুদ্ধ-র ব্যাপার তুমি বোঝনা।'

—'এর নাম যুদ্ধ নয়। যুদ্ধ আমি দেখেছি।'

সুরনাথ যুদ্ধে গিয়েছিলেন!

যুদ্ধের সময়ে তাঁদের মেডিক্যাল স্কোয়াড ছিল কোহিমা ফ্রন্ট-এ। যুদ্ধের বীভৎসতা যুদ্ধের নির্মমতা দেখে তাঁর মন ব্যথিত হতো। তবে যুদ্ধ হওয়া উচিত কি অনুচিত, তা নিয়ে তিনি বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। যুদ্ধ হচ্ছিল। তাঁর চোখের সামনেই হচ্ছিল। যুদ্ধের উন্মত্ত প্রসারিত থাবাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ধরা পড়েছিল। তিনি-ও তাদেরই একজন। এখন তিনি বসে বসে অনেক কথা ভাবতে পারেন। বুঝতে পারেন। সেদিন তাঁর সে অবকাশ ছিল না।

তিনি যদি বলতেন—'যুদ্ধ করা অন্যায়। ব্যক্তিগত ভাবে আমি এর বিরোধী। আমি একে সমর্থন করি না।' তাতে কি কোন লাভ হতো? আর সুরনাথ সেদিন সে সব কথা তলিয়ে ভাবতে-ও পারতেন না।

তাঁর অনেক কাজ ছিল।

ঘটনাক্ষেত্র থেকে অনেকদূরে সরে এসেছেন আজ। আজ তিনি চিন্তা করেন। বুঝতে পারেন। যুদ্ধের মতো অনাচার, যুদ্ধের মতো বীভৎসতা আর না ঘটলেই ভাল। আর ঘটা উচিত নয়।

সেদিন তিনি ছিলেন ঘটনার একেবারে মাঝখানে। চোখের সামনে যা দেখতেন, তাই নিয়েই তাঁর মন ব্যস্ত থাকত। তিনি দেখতেন, যুদ্ধের মধ্যে কি শৃঙ্খলা, কি কর্মনিপুণতা। রাত নেই, দিন নেই। হাঁসপাতালের বাড়ীর বাইরে ক্যাম্প পড়ছে। আহতরা আসছে। গ্রাম থেকে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। বৃষ্টি, বৃষ্টি অবিশ্রাম, বৃষ্টি। কাদা, জোঁক, সাপ। কিট ব্যাগ তিজে যাচ্ছে, ওষুধে ড্যাম্প লাগছে। তবু নীরবে সৈন্যরা স্ট্রেচার বয়ে আনছে। দুর্গম পাহাড়ের পথে, বর্ষার রাতে, অন্ধকারে প্রাণ বিপন্ন করে অ্যাম্বুলেন্স ট্রাক নিয়ে আসছে ড্রাইভার। ডাক্তারদের বিশ্রাম নেই। ডাক্তাররা সারাদিন, সারারাত ব্যস্ত। আর যারা ডাক্তার নয়, তারা-ও ডাক্তারদের সাহায্য করছে। কেউ প্রতিবাদ করছে না। প্রতিবাদ করবার কথা ভাবছে না। কার কি জাত, কার চামড়ার কি রং, সে সব কথা কেউ ভাবছে না।

সেই যুদ্ধে তিনি পা খুইয়ে আসেন।

শেলের টুকরো বিঁধেছিল। ডান পা-টা গোড়ালীর নিচ থেকে উড়ে যায়। বাঁ পা-টা তালগোল পাকিয়ে হাঁটুর নিচ থেকে ঝুলছিল।

গ্যাংগ্রীণের প্রথম লক্ষণ দেখা দিতেই গার্থার আর টিওলকার দু'জনে মিলে তাঁর পা অপারেশান করে। গার্থার বলেছিল—'আমি তোমার চৎকার একজোড়া পা এনে দেব, সেন। দেখলে অন্যরা হিংসে করবে।'

সুরনাথ যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন।

ভেবেছিলেন, এরা যুদ্ধ থেকে দূরে আছে, এরা ভাল আছে। যুদ্ধের উত্তাপ এদের গায়ে লাগেনি। কিন্তু যুদ্ধ এখানেও হানা দিয়ে গেছে।

তিনি দেখলেন হঠাৎ সব বদলে গেছে। মানুষগুলো নতুন হয়েছে। যা কিছু পুরণো, সব বেড়ে ফেলে দিয়ে তারা নতুন জীবনে গা ভাসিয়েছে।

অমিতকে তিনি এইসব কথা-ই বলেছিলেন।

শেষের দিকে অমিতের আর আগ্রহ ছিল না। সে হাই চেপে উঠে গেল। সে দাদুর কাছে, দাদুর জীবনের কথা শুনতে আসেনি।

সুরনাথ চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন।

এখন, সেই সব দিনের কথা ভাবলে তাঁর যেন কেমন লাগে।

ছোট ছোট ঘটনা মনে পড়ে। সুরনাথ ফিরে আসবার পর, অমিতের জন্মদিনে তিনি অমিতের জন্য একটা সাইকেল কিনেছিলেন। ছোট একটা সাইকেল। বাড়ী থেকে পার্কে নিয়ে যাবে চাকর। পার্কের মধ্যে চড়বে অমিত। নয়তো নিজেদের বাগানে গাড়ী বারান্দায়।

কিন্তু অমিতের জন্মদিনে অলকার দাদা সুবিনয় আরো অনেক দামী একটা বাইসাইকেল কিনে আনে। তাতে হর্ণ আছে, লাইট আছে, ক্যারিআর আছে। টুকটুকে লাল রঙ। ওজনে ভারী। সুবিনয় বলেছিল একশো নব্বুই টাকা যায়।

একশো নব্বুই টাকা!

একটা খেলনা কেনবার ব্যাপার থেকে অনেকদূর দেখতে পেয়েছিলেন সুরনাথ। তাঁর মনে পড়েছিল, অলকার বিয়ের সময়ে সুবিনয় ছাত্র। পরে সে ব্যবসায়ে নেমেছে জানলেন। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে, ছোট একটা টর্চ, ব্যাটারীর দোকান থেকে সুবিনয় কেমন করে এত টাকা করেছিল তা তিনি জানেননি। জানতে চাননি। তখন থেকেই তাঁর বাড়ীতেই উলটো হাওয়া লাগল। ছোট ছোট ঘটনা। ছোট ছোট জিনিষ। অমিত, সুনীপা, সুনীতা এরা পনেরো কুড়ি টাকার নিচে জুতো পরে না। আগে কারুকে খেতে বললে আয়োজনে একটু প্রাচুর্য করা হতো, আদরযত্নে তাকে সমাদর করা হতো। কিন্তু তাঁর বাড়ীতেই কারুকে খেতে বললে আর বাড়ীর রান্নার সম্ভ্রম রাখা যাচ্ছিল না। বাড়ীর রান্নার সঙ্গে হোটেল থেকেও প্রচুর খাবার আসছিল। বাঙালীরা ভাতের সঙ্গে ফল খায় না। তবু টেবিলে দুর্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য ফল এনে সাজিয়ে রাখা হচ্ছিল। শিবনাথ দশজোড়া জুতো ব্যবহার করছিল। অলকার শাড়ী আর তাঁজ করে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। তাক-বিহীন বড় আলমারীতে ঝাপসারে শাড়ী আর জামা টাঙিয়ে রাখা হচ্ছিল। রেফ্রিজারেটারের জল ছাড়া কেউ খেতে পারছিল না। সীট না পেয়ে, বিলিতী ইস্কুলের নামে গভর্ণরের চ্যারিটির কণ্ড-এ মোটা টাকা দান করে শিবনাথ ছেলেকে ভর্তি করে।

সুরনাথ সব দেখছিলেন।

তিনি মেয়কুন্তলাকে বলতেন—'ওরা আজ বদলাচ্ছে। একেই বলে আজ বদলানো। ওরা উঠতে উঠছে। ছোট ছেলেকে তিনপয়সার পুতুল দিলে, বা চার আনার রবারের বল দিলেও সে খুশী হয়। সাধারণ জুতো জামা পরলে-ও তার চলে যায়। প্রতিদিন মাংস, মাখন, আঙুর, এসব না খেলেও তার কিছু মনে হয় না। সুস্থ থাকবার মতো পুষ্টিকর খাবার খেলেই তার চলে। ছোটদের মনে চাইবার আকাঙ্ক্ষাকে ওরা জাগতে দিচ্ছে না। না চাইতে অনেক দিয়ে দিয়ে ওদের মনকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এরপরে যদি বাবা যার অবস্থায় না কুলোয়, ঐ সব ছেলেমেয়ে কি কম পেলে সন্তুষ্ট থাকতে পারবে? না। ওরাই এই অনিষ্ট করছে। অনেক খরচ না করলে মেয় দেখানো হয় না, অনেক খরচ না করলে নিজের সমান রাখা হয় না।

আসলে ওরা নিজেদের পরিচয় ভুলে, হঠাৎ গজানো একদল মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে নেমেছে। এ প্রতিযোগিতার শেষ নেই।'

তিনি দেখছিলেন, দাদা, বেশ-ভাগ, এর জন্যে যেসব যে গুরুতর পরিস্থিতির সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, এ পরিবারে তার দাগ পড়ছিল না! সুবিনয়ের জ্ঞাতিরা উদ্বাস্তু ক্যাম্পে পড়ছিলেন, তবু সে কথা মনে না রেখে সে একশো নব্বুই টাকা দিয়ে খেলনা কিনতে পারছিল। সুরনাথ সেন, তাঁর স্ত্রী, তাঁরা আজও মিলের ধুতি পরেন। বাড়ীর অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার তফাৎ করেন না। এসব ভুলে শিবনাথ তার স্ত্রীকে ছোট একটি 'কিচেনেট' বানিয়ে দিয়েছিল। গ্যাসের রেঞ্জ, রেফ্রিজারেটার শাদা টাইলের সিঙ্ক! তাদের খাওয়া দাওয়া একসঙ্গেই চলছিল। কিন্তু প্রথমে ছেলে মেয়ে, তারপর শিবনাথ, খাবার টেবিলে বসে স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে সিদ্ধ মাংস, সিদ্ধ আপেল, সিদ্ধ মাছ, শসা বীন ইত্যাদি স্বাস্থ্যকর খাদ্য খাচ্ছিল।

তারপর একটার পর একটা ঘর, ঘারান্দা, নতুন করে সারানো হলো। মার্বেল তুলে মোজেইক। কাছারীঘর হলো হলঘর। সেখানে টেবিল টেনিস খেলা সুরু হলো। বাথরুমে টব বসলো। ছাদে একটা বাগান তৈরী হলো।

সুরনাথ এবার ঘরে ঢুকবেন। অনেকক্ষণ বাইরে বসে আছেন। পায়ের কাছে চাদরটা ছিঁড়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকে তিনি বেডসুইচ টিপে আলোটা জ্বাললেন।

এ বাড়ীর সব বদলে গেছে। সব।

শুধু তিনি বদলাননি। তিনি এই ঘর, এই পরিবেশ আশ্রয় ক'রে বসে আছেন। বছর আঠারো ধরে তাঁর পরিবারে যে উদ্‌ভ্রান্তগামিতা দেখে আসছেন সুরনাথ তার থাকাটা-ও যুদ্ধের চেয়ে কম জোরালো নয়। সে-ও লক্ষ লক্ষ মানুষকে ধরেছে। এবং খেটে খাওয়া দুঃস্থ পরিবার, তাঁর মতো স্বচ্ছল পরিবার, অত্যন্ত ধনী পরিবার, সবাই সেই থাবার ধরা পড়েছে। এই উদ্‌ভ্রান্ত, অস্থির জীবনটা তাদের পুতুলনাচের পুতুলের মতো নাচাচ্ছে। তাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাথার মধ্যে ঘূর্ণী সৃষ্টি করে ছেড়ে দিচ্ছে তারা ঘুরছে, ঘুরে চলেছে।

আগামী কালের ভাবনা এরা ভাবে না।

এরা বর্ত্তমানে বাঁচে, এই মুহূর্ত্তে বাঁচে। তাই নিয়মহীনতা-ই এদের নিয়ম। শৃঙ্খলাকে অস্বীকার করে-ই এরা বাঁচবার জোর পায়। বর্ত্তমানটা সত্যি।

আর সব মিথ্যে।

তাই এ বছরের গরম শাল, জামা, কোটের ফ্যাসান ও বছরে বাতিল। তাই এ বছরের গাড়ী পারলে দু'বছর যাবেই বদলে ফেলা। নিজের সঙ্গে নিজে একাকী আলাপ করতে মানুষ ভয় পায়। তাই, আমোদ প্রমোদের সহস্র উপকরণ দরকার। সিনেমা, থিয়েটার, শখের অভিনয়, শখের সিনেমা তোলা, একস্‌কারসান আউটিং, নাচের স্কুল, গানের স্কুল, ক্লাব, রেস্তোরাঁ, বার এবং মহদান সবজায়গায় সবরকম নেশার সমান ভীড়।

চেহারা দেখে বা কথা শুনে কার বাড়ীর অবস্থা কী রকম, কে কোন্ পেশা আশ্রয় করে আছে, তা বুঝবার উপায় নেই। সকলেরই পরনে সার্কিন, নাইলন, সানগ্লাস, সকলেরই চুল রুক্ষ। সকলেই সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিল্প, সব বিষয়ে শেষ এবং চূড়ান্ত মতামত জানিয়ে থাকে।

এবং যেহেতু এইভাবে চলতে হলে, সবসময়ই দম ফুরিয়ে এলে চাবি দিয়ে দেবার দরকার—সেই চাবি দিয়ে দম দেবার কাজটি এক এক সময়ে এক একটি ঘটনার হাতে ন্যস্ত হচ্ছে। কাছাড়, খাদ্য আন্দোলন, গান্ধারিন, ফিল্‌থ ফেষ্টিভ্যাল, যখন যা হয় পেলেই হলো।

সুরনাথ আমেরিকান একটা ডাক্তারী জার্ণাল খুললেন। দুটো পাতা উল্‌টে মনটা আবার চিন্তায় ব্যস্ত হলো। তাঁর মনে হলো, আজকাল যারা এই চিন্তাহীন জীবনের স্রোতে গা ভাসাতে পারছে না, সেইসব চিন্তাশীল ডাক্তার, মনীষী, বৈজ্ঞানিকরাই মারা যাচ্ছেন। করোনারীতে আক্রমণ তাঁদেরই হচ্ছে।

করোনারীর আক্রমণ হলে সর্পগন্ধা প্রয়োগ না করে, সভ্যতার জীবনের গতি কমিয়ে ফেললে কি হয়? অর্থাৎ, করোনারীতে আক্রমণটা ঠেকাবার চেষ্টা করলে কি হয়? সুরনাথ একটু ভাবলেন।

তারপর নিঃশ্বাস ফেললেন। ভাবলেন ঠেকাবে কে? কেউ না। কোন শক্তি না। সবাই যে যার মতো আরো আবর্ত্ত, আরো গতি সৃষ্টি করতে ব্যস্ত। একদিকে নতুন নতুন ডাক্তার; বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষকে বাঁচাবার, সুস্থ করবার দিকে এগিয়ে চলা; নতুন নতুন আশ্চর্যকে সম্ভব করা। আবার অন্যদিকে নতুন নতুন রোগ সৃষ্টি করে তাকেও ছড়িয়ে দেওয়া। ব্লাডে ক্যানসার সিরোসিস, ক্যানসার এবং ব্লাড-প্রেসার—কখনো মাথায়, কখনো চোখে, কখনো হার্টে।

সুরনাথ জার্ণালটা বন্ধ করলেন।

হ্যাঁ। আজকার জীবনটা তাঁকে পীড়িত করে ভাবিত করে। তবু তিনি এই আজকের জীবনে এতই আগ্রহ বোধ করছেন।

শেখর বোস, তাঁর অজানা, মধ্যবয়সী একটি নার্ভাস মানুষ—সে নিচু গলায় ধীরে ধীরে কয়েকজন মানুষকে বলছে, রোজ বলছে—'ভাল করে কাজ করা উচিত। সিগারেট যেখানে সেখানে ফেলা উচিত নয়। কার্মের কাজে কর্মচারীদের সহযোগিতা করা উচিত। সে রোজ বলছে, আর, সুরনাথ অনুভব করতে পারলেন। তার এই সব কথায় অন্যদের মনে ঈর্ষা জমছে, তারা ক্রুদ্ধ হচ্ছে। সে তা জানছে, তবু সে রোজ বলছে। বলছে, অনুরোধ করছে, আদেশ করছে।

সুরনাথ সোজা হয়ে বসলেন।

তাঁর মনে হলো, বহু লোক ক্রুদ্ধ হলে বিপদ আছে। ভয়ানক বিপদ। শেখর বোসের বয়স বেশী নয়। সে কি তা জানে? মানুষ তার দোষ, বিচ্যুতি, স্খলন, সব কিছু নিয়ে খুব স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে। কিন্তু যদি কেউ তাকে হাতে ধরে তার ভুল দেখিয়ে দেয়, তার ভাল করবার চেষ্টা করে। মানুষ আগে তাকে-ই মারবে। পৃথিবীর বড় বড় মানুষ, তাঁদের মানুষই দেবতার আসনে বসিয়েছে, মানুষই তাঁদের হত্যা করেছে, এবং মানুষই তাঁদের নামে ধর্ম, মঠ, সঙ্ঘ স্থাপন করে পাপের প্রায়শ্চিত করেছে। সুরনাথ নিজেকে ভর্ৎসনা করলেন। আমি, আবোল তাবোল ভাবছি। আমি অনেক দূরে যাচ্ছি। এতদূরে যাবার দরকার নেই। আসলে শেখর বোস মানুষটির কথা শুনে আমার ভালো লাগল। শেখর বোসকে অন্যেরা কিভাবে গ্রহণ করে আমি তা আগ্রহ নিয়ে শুনব।

॥ চার ॥

অমিত এবং অন্যদের, শেখর বোস ক্রমেই কোণঠাসা করলেন। অবশ্য তা তিনি জানতেন না।

অমিত সুরনাথকে বলছিল। সুরনাথ শুনছিলেন। তিনি খুব কঠিন চিন্তার ভারে পীড়িত করেন নিজেকে। শেখর বোস খুব সোজা মানুষ। কাজ করছিল সে। ছোট ছোট কাজ। এবং কাজের মধ্যে দিয়েই সে নিজের পরিচয় দিচ্ছিল।

সে অমিতকে বলেছিল—'আমি চেষ্টা করব।' এবং অমিতের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলার ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে শেখর বোস অনেকক্ষণ কথা বলে, তা সবাই লক্ষ্য করেছিল। অমিত বললো—'আমরা ভাবছিলাম, ও কী করবে। হয়তো অফিসে কালই সার্কুলার বেরুবে, অফিস-এ কেউ যেন স্মোক না করে। আমি বলেছিলাম, তা করলে বাস্তাবন বিপদে পড়বেন। এটা ল্যাবরেটরী নয়, ফ্যাক্টরী নয়। এটা অফিস। এখানে স্মোক করতে বারণ করলে আমরা সহ্য করব না।'

শেখর বোস স্মোক করতে বারণ করবে, এই ধরণের একটা ধারণা করে নিয়ে তারা নিজেদের উত্তেজিত করছিল। অবশ্য পরে তারা ভেবেছে, শেখর বোস হঠাৎ এই রকম হাস্যকর একটা নিষেধাজ্ঞা জারী করবে, তাই ভেবে, তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে তারা বোকামি করে ফেলেছে। শেখর বোস সেরকম কিছুই করেনি।

করিডোরের কোণে, সিঁড়ির কোণে, বালি বোঝাই সুদৃশ্য সবুজ টিনের বাক্স দেখতে পেল অমিতরা। অফিসঘরের কোণেও সেইরকম টিনের বাক্স। দেওয়ালে সুন্দর ছাপানো সব বোর্ড টাঙানো ছিল—'দয়া করে এখানে ফেলুন সিগারেটের টুকরো, এবং অন্যান্য জঞ্জাল। ছেঁড়া কাগজ ফেলতে হলে বাস্কেট ব্যবহার করুন।'

সবাই ভ্যাবাগঙ্গা খেয়েছিল। ঠিক এজন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। এতে শেখর বোসের ভদ্রমনের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। কর্মীদের প্রতি তার সহযোগিতা করবার মৃদু, আন্তরিক ইচ্ছা শোনা গিয়েছিল। সে কারু সঙ্গে বিরোধিতা করতে চায় না। সে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চায় এই যেন মনে হয়েছিল। এবং সকলেই মনে মনে শেখর বোসের অস্তিত্ব অনুভব করেছিল। শেখর বোসকে আর সরিয়ে রাখা যাচ্ছে না। সে তাদের স্পর্শ করছে। তাদের মনে জায়গা খুঁজছে।

তারা সকলেই এত অপ্রস্তুত বোধ করছিল, যে তারা এই অবস্থাওয়াটা সহ্য করতে পারছিল না।

তারা অমিতকে বলে—'কি হে সেন, তোমার জন্যে যে আপিস মাথিয়ে দিচ্ছে শেখর বোস।'

অমিত কিছু বলেনি।

কিন্তু তারপর সে-ই শেখর বোসকে অপমান করবার জন্যেই, সিগারেটের টুকরো ফেলে টিনটার বাইরে। (সুরনাথ বলেছিলেন—'স্বাভাবিক। তাজমহলে গেলে তোমরা নিজের নামটা লিখে আসতে কাঠকয়লায়। অজন্তায় দেখেছিলাম ফ্রেস্কোর ওপর টিন দিয়ে নিজের নাম লিখে এসেছে কতজন। তোমাদের হাত থেকে তাজমহল বা অজন্তা-কে বাঁচাবার জন্যে গভর্ণমেণ্টকে ফাইন পাশ করতে হয়েছিল। তখন ছিল বিলিতী গভর্ণমেণ্ট।'

—'আমি, আমিই প্রথম সিগারেটটা ফেললাম।' অমিত নিরাশ, ক্লান্ত এবং ক্রুদ্ধ গলায় বলেছিল।

—'শুনলাম। কিন্তু বুঝতে পারছি না। বুঝতে কষ্ট হচ্ছে আমার। তোমাকে দেখে অবাক হচ্ছে। বল, তোমার লজ্জা করছে না?'

অমিত জবাব দেয়নি।

তার লজ্জা করেছিল। নিজের কাছে সে নিজেই ছোট বোধ করেছিল। যেন সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে করেই চোখ বুঁজে সে অন্য দিকটা দেখেনি। সে যদি সহজ হতে পারত। যদি বিনীত হেসে সিগারেটটা সেই টিনে ফেলতে পারত! কিন্তু শেখরকে অস্বীকার এবং অপমান করবার জন্যে সে সারাদিন ধরে নিজেকে ছোট করল। মেঝেতে কাগজ ফেলল, সিঁড়ির কোণায়ালে সিগারেট নেবাল। যেন সে নিজের গায়ে নিজেই মূত্র ছিটিয়েছে, এইরকম মনে হচ্ছিল তার।

পরদিনও সার্কুলার বেরোয়নি। পরদিন বাকেট, টিন, সব ঠিক জায়গায়, পরিষ্কারভাবে রাখা ছিল। শেখর বোস নাকি জমাদারকে নিয়ে রাত ন'টা পর্যন্ত অফিসে থেকে অফিসটা পরিষ্কার করে। কার্পের ঝিরঝিরে লতায় প্রত্যহ সিকদার থুথু ফেলেছিল। সেই পাতাটা কাঁচি দিয়ে নিজে কেটে দেয় শেখর বোস।

(সুরনাথ আশ্চর্য উত্তেজনা অনুভব করছিলেন। সুরনাথ জানতে চাইছিলেন, তারপর শেখর বোস কি করে।) তারপর, একদিন নিচের বাগানটা কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা হয়। তারপর ঝাউগাছ, দেবদারু গাছ, ইউক্যালিপটাস গাছের নিচ থেকে আবর্জনা সরিয়ে সেখানে বসবার বেঞ্চি পাতা হয়। বাগানের মধ্যে একটা ফোয়ারা ছিল। সেটার পাইপ, প্লাগ, ট্যাপ মেরামত করা হয়। এইসব কাজ নিয়ে মেতে-ছিল শেখর বোস। এইসব কাজ নিয়ে সে বুঁদ হয়ে ছিল। অমিত অথবা অমিতরা অফিস নোংরা করছে কিনা, সে সব দিকে তার যেন খেয়াল ছিল না। তারপর সেইসব মরশুমী ফুলের বেডে চারা লাগানো হয়। গোপাটি আর ব্যানার সারিতে ফুল ফোটে। আর, শেখর বোস একদিন ওদের সকলকে আরো বিভ্রান্তিতে ফেলে। কাঠের বোর্ডে সুন্দর সাদা হরফে অনেকগুলো কথা লিখে নেয় শেখর বোস। বাগানের সামনে সেই বোর্ডটা দাঁড় করিয়ে দেয়। তাতে লেখা ছিল—এই গাছ, এই বাগান, এই কার্যের সকলের। সকলে যেন একে নিজের মনে করে এর সৌন্দর্য রক্ষা করে। একটি পাতা, একটি ফুল ছিঁড়বার ইচ্ছে হ'লে তারা যেন মনে রাখে, গাছ মানুষের প্রাচীনতম বন্ধু। গাছ মানুষের শরীরকে খাদ্য দেয়, ওষুধ জোগায়। কাঠ, বাকল, ফল, সবই সে মানুষের সেবাতেই নিয়োজিত রাখে। গাছ মানুষের মনকে আনন্দ দেয়, শান্তি দেয়।

অমিত বুঝেছিল—কথাগুলো সুইডেনের অরণ্য সংরক্ষণ বিভাগের প্রচারিত। শেখর বোস তাকে নিজের সুবিধে মতো অনুবাদ করে নিয়েছে।

শেখর বোসের এই চালটা বুঝতে পারছিল না কেউ। সবুজ ঘাস, কচি পাতা, সুন্দর ফুল, এগুলো কি তারা জুতো দিয়ে মাড়াবে? অবহেলা করে চলে যাবে?

সবাই অমিতকে জিজ্ঞাসা করছিল। অমিত শিক্ষিত, অমিত সংস্কৃতি এবং রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায়, অমিত নানারকম পত্রপত্রিকা পড়ে।

অমিত নিজেও বোঝেনি। সে শুধু অনুভব করছিল, শেখর বোস এমন ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা কইছে, যা সে কখনো শোনেনি। বুঝতে না পেরে, মূঢ়, ক্ষুব্ধ ক্রোধে নিজেকে অপমানিত মনে করে অমিত। এবং সে, 'কার্যের খরচে ম্যানেজারের উদ্যান বিলাসিতা' এই গোছের একটা প্রবন্ধ লিখে একটি কাগজে পাঠায়। কাগজটির বহুল প্রচার, বহু পাঠক, এবং সে কাগজ সকলকেই সমালোচনা করে থাকে। কাগজটা পড়ে অফিসে সবাই যেন পায়ের নিচে মাটি পায়। তারা জেগে যাচ্ছিল। শেখর বোসের

এইসব কাজের মধ্যে দিয়ে যে স্বাধীনতা, সভ্যতা, এবং সহযোগিতা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা প্রকাশ পাচ্ছিল, তার তোড়ে তারা নিজেরা ভেসে যাচ্ছিল। তারা ভদ্র হয়ে যাচ্ছিল। কাগজটা পড়বার পর, তারা বেশ গম্ভীর হয়ে ওঠে।

শেখর বোস যখন অমিতকে ডেকে পাঠান, অমিত তখন বুক ফুলিয়ে ওর ঘরে ঢুকেছিল। হ্যাঁ, আমি লিখেছি, এই গোছের একটা ভাব তার মধ্যে।

শেখর বোস তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে। তার দুই চোখ রক্তাভ। তার মুখে অসহায়তা, ক্রোধ, এবং একটা বিমূঢ় হতাশা একই সঙ্গে আলো অন্ধকার সৃষ্টি করেছিল। সে অমিতকে বসতে বলে। তারপর, কিছুক্ষণ বাদে বলে—'কত তাড়াতাড়ি আপনি লেখাটা সম্পর্কে ক্ষমা চেয়ে ভুল সংশোধন করতে পারেন?'

অমিত উল্লসিত হয়। আঃ, আরাম পাচ্ছে সে। মুক্তির নিশ্বাস টানতে পারছে। শেখর বোস ভয় পেয়েছে।

শেখর বোস হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে।

সে বলে—'খবর নিয়ে লেখা উচিত ছিল আপনার। একটি পয়সা কার্ম নেয়নি। সমস্ত, সমস্ত খরচ করেছি আমি। আমি মালা এনেছি। আমি নার্শারী থেকে টব এনেছি।'

অমিত তখন শাদা হয়ে যায়। অবিশ্বাসে তার মুখটা হাঁ হয়ে থাকে। শেখর বোস বলে—'আপনাদের বাক্সেট, টিন, এগুলোও আমি দিয়েছি। আমিই দিয়েছি। কিন্তু সে কথাও নয়। কেন, কেন আপনারা এ রকম করছেন বলতে পারেন? যান!' তার গলায় যথেষ্ট জোর ছিল।

অমিত বেরিয়ে আসে।

সুরনাথ অমিতকে বলেন—'তুমি কেন একাজ করলে, তা কি তুমিই জান?

—'শেখর বোসকে এক্সপোজ করতে চেয়েছিলাম।'

—'তোমার নিজের নগ্ন চেহারাটা দেখতে পাচ্ছ?' অমিত চুপ করে থাকে। সুরনাথ বলেন—'এরপর তোমরা কি করবে?'

—'শেখর বোস সম্পর্কে আমরা চুপ করে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু…'

—'কিন্তু কি?'

—'সে কৃষ্ণধন ঘোষালকে সাসপেণ্ড করেছে।'

—'তাতে কি হয়েছে?'

—'না। ইউনিয়ন আছে। সে জানাতে পারত।'

—'তুমি কি ইউনিয়নের একজন পাণ্ডা?'

—'না।'

—'বুঝেছি। বদনাম কিনতে চাও না।'

—'কৃষ্ণধনকে সাসপেণ্ড করবার অর্ডার ওকে প্রত্যাহার করতে হবে। অবশ্য'…

—'কি?'

—'অবশ্য ও এমন কথাও বলেছে, যে কৃষ্ণধন যদি টাকাটা ফিরিয়ে দেয়, তাহ'লে ও ওর বিরুদ্ধে কোন কড়াকড়ি করবে না। ক্যাস থেকে সরিয়ে অন্য ডিপার্টমেণ্টে দেবে।'

—'তোমরা কি করবে ঠিক করেছ ?'

—'ডেপুটেশানে যাব ওর কাছে। এক হাজার টাকার জন্যে একটা লোকের কেরিয়ার নষ্ট করার কোন মানে হয় না। ও-ও তা জানে। ঘোষালের কেসটাকে, ও ওর প্রিন্সিপলের খাতিরে এতখানি কড়া চোখে দেখছে।'

অসিত উঠে যায়।

অসিত চলে যাবার পর অনেকক্ষণ বসে থাকেন সুরনাথ। অনেকক্ষণ ব্যস্ত থাকে তাঁর মাথাটা। শেখর বোস সম্পর্কে ক্রমেই তিনি বেশী আগ্রহ বোধ করছেন। শেখর বোস নিজেকে ভয়ানক বিপদের মধ্যে নামিয়েছে। সে আজকের কলকাতায়, আজকের মানুষকে বলেছে পরিষ্কার হও, কাজকে শ্রদ্ধা কর, গাছকে ভালবাসো। সে বলেছে—দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিও না। নিজেদের দুর্বলতাকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়োনা। একটুও না।'

এসব কথা ভয়ঙ্কর। সুরনাথ ভাবলেন, এ সব কথার প্রতিক্রিয়া যে কি ভয়ানক হতে পারে তা শেখর বোস জানে না। এর চেয়ে অনেক তুচ্ছ, অনেক ছোট কথা বলবার জন্যে মানুষের হাতে মানুষকে মরতে হয়েছে। 'বসন্ত হলে টিকে নিতে হয়', পৃথিবী গোল এবং ঘূর্ণায়মান—সূর্যকে সে আবর্তন করছে', এইসব শিশুবোধ্য কথা বলবার জন্যে মধ্যযুগে মানুষদের পোড়ানো হতো। এ যুগেও হয় সোজা কথা বলবার অপরাধে মানুষের গলা বন্ধ করা হয়।

সে তুলনায় শেখর বোস অনেক বেশী অপরাধ করেছে। সে এদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতার ওপর ঘা দিয়েছে। এদের সামনে আয়না ধরে এদের নিজেদের চেহারা দেখতে দিয়েছে।

অতএব, এখন, এরা ক্রুদ্ধ হয়েছে। অতএব, এখন শেখর বোস বিপদাপন্ন।

সুরনাথ খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করলেন।

॥ পাঁচ ॥

সুরনাথ আলো নিবিয়ে ঘরে বসেছিলেন। শেখর বোসের বিপদ নিয়ে তিনি যখন ভাবছিলেন, ব্যস্ত হয়েও থাকছিলেন, তখন তাঁরই বাড়ীর আবহাওয়াটা থমথমে হতে থাকে। একটা আসন্ন দুর্যোগ নামবে। এ বাড়ীর ওপরই নামবে, তা বুঝতে পারছিলেন সুরনাথ। কিন্তু সে বিপদকে কেমন করে থামানো যায়, তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। ক'দিন ধরে, শ্যামল ছাড়া আর কেউ তাঁর ঘরে আসে না। শ্যামলও বোধ হয় জানে, যে কিছু হচ্ছে, কিছু একটা ঘটতে চলেছে, কিন্তু সে সুরনাথকে কিছু বলেনি। অলকাকে দেখতে পাননা সুরনাথ। শৈবাল এসে খাবার সময়ে দাঁড়ায়। শৈবালও কিছু বলে না।

আজ শ্যামলও আসেনি। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। সুরনাথ একলা বসে আছেন।

শিবনাথের ঘরে,অলকার গলা শুনতে পান সুরনাথ। ওই গলাটা কিছুক্ষণ ধরে বাধ প্রতিবাদ করছে। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে। শুনতে শুনতে সুরনাথ যেন অস্থির বোধ করলেন। তাঁর মনে হলো তাঁর শরীরটা ভয়ানক খারাপ লাগছে। তিনি ছড়িটা তুলে নিয়ে দরজার ওপর মারলেন। ডাকলেন—'খোকা।'

শিবনাথ ছুটে এল। অলকা-ও।

দুজোড়া ভীত সন্ত্রস্ত ভাব দু'জনের। অলকার মুখ নাক সব ফোলা ফোলা, চোখের নিচটা লাল।

—'কি হয়েছে বাবা ?'

শিবনাথ খুব ভয় পেয়ে গেছে। এরকম গলায় অনেকদিন তাকে ডাকেননা সুরনাথ।

—'আমার শরীর খারাপ লাগছে।'

—'কি রকম লাগছে?'

সুরনাথ ছেলে এবং বৌ-য়ের দিকে তাকালেন। বললেন—'তোমাদের কি হয়েছে?'

—'কি হয়েছে?'

সুরনাথ হঠাৎ ধমকে উঠলেন। বললেন—'কি হয়েছে, সেটা তোমরা স্পষ্ট করে বল। বৌমা তাহ'লে বাড়ীতেই আছে? অন্তরা কোথায়?'

শিবনাথ হঠাৎ বাবার সামনে ধপ করে বসে পড়লো।

—'সুনীপা চলে গেছে।'

—'সুনীপা চলে গেছে!'

—'হ্যাঁ।'

—'কার সঙ্গে?'

শিবনাথ বললো—'সৌরী মিত্রের সঙ্গে। ওরা ঘর গেছে। সেখানেই বিয়ে করবে।'

—'ভাল ভাল। তা দুঃখ করছ কেন?'

—'দুঃখ করছি কেন? কি বলছেন বাবা?'

—'ইচ্ছে করছে একবার তোমাকে প্রহার করি। বুঝলে শিবনাথ। তোমাকে প্রহার করি। কিন্তু তুমিও যে এত বড় মূর্খ তা জানা ছিল না বৌমা।'

অলকা মুখে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেন হাতটা সরিয়ে নিলেই ও চেঁচিয়ে উঠবে। নিজেকে আর সামলাতে পারবেনা।

সুরনাথের হাতদুটো কাঁপছিল। তিনি নিজেকে সামলালেন। এর দিক থেকে ওর দিকে চেয়ে বললেন—'যেমন দেবে তেমনটি-ই পাবে। মেয়েদের বন্ধু বানিয়েছ। অপার স্বাধীনতা দিয়েছ। অথচ ভাল শিক্ষা দিয়ে মনেমনে শক্ত করে যাওনি। আজ সুনীপা এ কাজ না করলেই আমি আশ্চর্য হতাম। কবে গেছে?'

—'পরশু।'

—'এ দু'দিন আমাকে না জানিয়ে তোমরা কোন্ উপকারটা করেছ? শ্রীবিলাসকে খবর দিয়েছ!'

—'শ্রীবিলাস কা-কে?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার মামার ছেলেকে। সে হোম-এ অতবড় পোষ্ট-এ আছে, তাকে খবর দাও। সে তাড়াতাড়ি খবর আনতে পারবে। না কি তোমরা জানাতে চাও না?'

শিবনাথ মুখ তুললো। বললো—'হ্যাঁ জানাতে চাই। ওরা যদি বিয়ে না ক'রে থাকে, ফিরিয়ে এনে বিয়ে দিতে চাই। যদি বিয়ে ক'রে থাকে, সেটাকে স্বীকার করতে চাই।'

—'হ্যাঁ। জ্ঞান বুদ্ধিগুলো ত' স্বাভাবিকই আছে। তবে যাও। ফোনটা এ ঘরে আন। আমার কাছে আন। সুনীপা কি খালি হাতে গেছে?'

—'না। টাকা নিয়ে গেছে দেড় হাজার।'

—'টাকা নিয়ে গেছে? আর কিছু নিয়ে গেছে?'

—'হ্যাঁ, অলকার গয়না ক'খানা ?'

শিবনাথ মাথা নিচু করলো। কোনে নম্বর ডায়াল করতে করতে সুরনাথ বললেন—'তাহ'লে নো মার্সি। এতে প্রেম নেই, কিছুই নেই। যে মেয়ে গয়না ভেঙে পালায়, যে ছেলে সেটা অ্যাপ্রুভ করে··· হ্যালো! শ্রীবিলাস ? আমি পিসেমশাই।'

শিবনাথ-এর স্ত্রী এতক্ষণে মূর্ছিত হলো। শিবনাথ বলতে লাগলো—'আপনি আমাকে দিন আমাকে দিন ফোনটা।'

সুরনাথ সবগুলো কথা বললেন। তারপর, শিবনাথ আর অলকাকে আরো কি বলতে গিয়ে তাঁর হঠাৎ গলাটা থেমে গেল। খুব অসুস্থ, খুব দুর্বল বোধ করলেন সুরনাথ। বললেন—'অমিত! অমিত কোথায় ?'

—'অমিতকে দিয়ে কি হবে ?'

—'অমিতকে দিয়ে কি হবে ? তোমার মেয়ে একটা ক্রাইম করেছে, ছেলে-ও তৈরী হয়েছে একটি ধুরন্ধর! সে অফিসের পর কি করে ? বাড়ী ফেরে না কেন ?'

এমনি অনেক কথা বলে গেলেন সুরনাথ। বললেন, ক্লান্ত হলেন, শেষ অবধি ওষুধ খাইয়ে শান্ত করতে হলো তাঁকে। বাবার চোখদুটো অস্বাভাবিক লাল হয়ে উঠেছে দেখে শিবনাথের ভয় করছিল।

॥ ছয় ॥

সুনীপা ফেরেনি। সে সৌরী মিত্র-কে বিয়ে করে। বিয়ের পর তারা বম্বেতে থাকবে এই মর্মে একটা তার করে সুনীপা।

অমিত কয়েকদিন বেশ রাত করে বাড়ী ফেরে।

দাদুর ঘরের সামনে দিয়ে সে পা টিপে টিপে চলে যায় নিজের ঘরে। দাদুর ঘরে সে ঢোকেনি। কেন যেন, দাদুর সামনে দাঁড়াবার মতো মনের জোর পাচ্ছিল না অমিত।

এই ক'দিনে অনেক ঘটনা ঘটেছে।

শেষ অবধি কৃষ্ণধন সাসপেণ্ডেড হয়। তাই নিয়ে অফিসে অনেক জল্পনা চলে, অনেক ঘটনার ঘটনা।

একমাত্র অমিতই বুঝেছিল কি ক'রে কোন্ কৌশলে শেখর বোসকে জব্দ করা যাবে। ওকে ভয় দেখালে কাজ হবে না। ওকে ওরা আরো বিরক্ত করতে পারতো। টেক্‌নিক্যাল প্রশ্ন তুলতে পারত—'মশায়, বাপান করবেন, নিজের খরচে করবেন, ভাল কথা। কিন্তু কার্যের জমিটা কেন ব্যবহার করছেন। এটা কি আপনার আইন সম্মত কাজ হচ্ছে ?

সে সব কথা বলেনি অমিত।

সে শুধু শেখর বোসের কথাই ভেবেছে। ঐ মানুষটিকে ঘিরে তার মন, তার চিন্তা ব্যস্ত থেকেছে। শেখর বোস। এই কার্য। এই কার্যে কতদিন ধরে কত গোলমাল চলেছে। সুষ্ঠুভাবে কাজ হতো না। লক্‌আউট, স্ট্রাইক, দাঙ্গাহাঙ্গামার এই সব ঘটনা এর অতীতকে বিপর্যস্ত করেছে। তারপর শেখর বোস এলো। কার্মাকোলোজিতে ডিগ্রী নিয়ে সে সাত বছর বিলেতে ছিল। তারপর হঠাৎ ফিরল এখানে। বম্বের দুটো,

এখানকার একটা বিদেশী ফার্মের চাকরী ছেড়ে দিয়ে এই ফার্মে এল। তারপর এখানকার জীবনে সে জোর করে শৃঙ্খলা আনল। সে এখনও জোর খাটাচ্ছে।

কৃষ্ণধন ঘোষাল যে কাজ করেছে, তাতে তাকে আর রাখা চলেনা। ক্যাশ থেকে সে টাকা নিয়েছে। এমন সে আগেও নিয়েছে। আবার ফেরৎ দিয়েছে। সময় মতো হিসেব দিতে পেরেছে। মনে হয় আগের ডিরেক্টরদের মধ্যে কেউ কেউ জানতেন।

কিন্তু এখন সে বিপদে পড়েছে।

এখন তার হাতে টাকা নেই। সে দিতে পারছেনা। তা ছাড়া ওষুধ পত্র সে অনেক পাচার করেছে। ওকে জেলে দিতে পারে, এমন প্রমাণ জোগাড় করে তবে শেখর বোস ওকে সাসপেণ্ড করে। ও পালাতে চেষ্টা করতে পারে, এমন সন্দেহ শেখর বোসও করেছে। তাই ফার্মের নেপালী গার্ড ওর ওপর নজর রাখছে।

অমিতরা তাই নিয়েও গোলমাল করতে পারত। শেখর বোস কৃষ্ণধন ঘোষালের ওপর অন্যায় জুলুম করছে, এ কথা বলতে পারত। কিন্তু তাতে শেখর বোসকেই সুবিধে করে দেওয়া হতো। তৎক্ষণাৎ পুলিশকে খবর দিত শেখর বোস।

কৃষ্ণধনকে বাঁচাবার জন্যে যে অমিতের খুব আবশ্যক আছে তা নয়। কৃষ্ণধনের বৌ আছে, ছেলেপুলে আছে, এসব তার মনে রাগ কাটে না। সে নিজে অভাবের জ্বালার চেহারা দেখেনি। কৃষ্ণধনের সংসারটা যে বিপদে পড়তে পারে, সে কথা নিয়ে সে ভাবে না। আর চুরি যখন করেছে, তখন শাস্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কৃষ্ণধন কি করবে?

তবু কৃষ্ণধনকেই সামনে রাখল অমিত। কৃষ্ণধনকে উপলক্ষ্য ক'রে সে শেখর বোসকে জব্দ করবে এই তার ইচ্ছে। কৃষ্ণধন গৌণ। কৃষ্ণধন উপলক্ষ্য। আসলে সে শেখর বোসকে সহ্য করতে পারছে না। তার খারাপ লাগছে।

অমিত শেখর বোসের কাছে গেল। একাই গেল। শেখর বোস তার টেবিলে বসেছিল। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ওর মুখটা লালচে দেখাচ্ছিল। ওকে খুব ক্লান্ত, খুব অসহায় দেখাচ্ছিল। অমিতকে সে বসতে বলে।

অমিত প্রথমে কথা বলতে চায়নি।

চুপ করে সে সময়টাকে সরে যেতে দিচ্ছিল। বড় ঘর। দরজার ওপাশ থেকে শব্দ আসে না। পেছনের দেওয়ালে ফার্মের প্রথম প্রতিষ্ঠাতার ছবি টাঙানো।

—'আমি ঘোষালের কথা বলছিলাম।' অমিত আস্তে আস্তে বলতে সুরু করলো। একটু ঝুঁকে পড়ে সে কথা বলছিল। শেখর বোস একটু নড়েচড়ে বসলো। মাথাটা পেছনে হেলিয়ে রাখল। মুখটা অন্ধকার হলো। টেবিল ল্যাম্পের আলোটা তার গলা, হাত, সার্ট-এর বুক, সবটুকুতে একটা বলয়ে আলো দিচ্ছিল।

অমিত বললো— 'আপনি, আপনি কি ঘোষালকে একটা সুযোগ দিতে পারেন না?'

—'কিসের সুযোগ?'

—'ঘোষাল সত্যিই অপরাধ করেছে। কিন্তু একবার একটা সুযোগ আপনি ওকে দিন, এই আমাদের অনুরোধ। যদি, যদি আপনি আমাদের এই অনুরোধটুকু রাখতে পারেন, তাহ'লে আমরা কৃতজ্ঞ

থাকব। আমরা, আমরা আপনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিনি—কিন্তু—আপনি আমাদেরও আর একটা সুযোগ দিন!'

অমিতের মুখ লাল হয়ে যায়। বিধায় দীর্ণ হয়। আমি কি এ সব কথা বানিয়ে বলছি? শুধুই বানিয়ে বলছি? তবে আমার এরকম লাগছে কেন? এই সব কথা বিশ্বাস করতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে। আমি এখানে থাকবনা। এই কার্যে পড়ে থাকবনা। কিন্তু এই লোকটির বিশ্বাসের যোগ্য হতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে, সে আমার বিশ্বাস করেছে,আমি তার বিশ্বাস রেখেছি, এই স্মৃতিটা যেন আমি ধরে রাখতে পারি।

শেখর বোস ঝুঁকে পড়ে। হঠাৎ তার মুখটা আলোয় আসে। তার চোখ লালচে। তার গলাটা ক্লান্ত। সে বলে—

—'সেন, তুমি জান, এ কার্মটা কে গড়েছিল?'

—'এন. এন. বসুমল্লিক।' অমিত জবাব দেয়।

—'হ্যাঁ।'

—'তাঁর টাকাতেই এটা সুরু হয়।'

—'ইয়েস ইয়েস।' শেখর বোসের গলায় এবার একটা আগ্রহ ফুটে ওঠে। সে বলে—'তিনি তাঁর সমস্ত টাকা দিয়েছিলেন। এবং আই টেল ইউ, হি হ্যাড বিগ ড্রীম্‌স্। অনেক স্বপ্ন! জান, এই কার্যে চমৎকার বাগান থাকবে, বসবার মতো পার্ক থাকবে, কর্মীদের জন্যে ক্যান্টিন, ক্লাবরুম, লাইব্রেরী থাকবে, এসব কথা তিনি পঞ্চাশ বছর আগেই ভেবেছিলেন। এর পেছনে যে আদর্শ আছে, সেটা কোনদিন ক্ষুণ্ণ হবে না। এরকম একটা আবসার্ড ড্রীমও তাঁর ছিল। ইয়েস। দ্যাট এ্যাও দ্যান ওয়াজ ইনকরিজিবল ড্রীমার। হি স্টুড নট বি কিওর্ড অফ ড্রীম্‌স্ টিল্ হিজ্ লাষ্ট! এবং আমি, আর এক ড্রীমার, ইউ. কে থেকে এখানে ফিরলাম। এখানে আসব বলেই ফিরলাম। নইলে হয়তো ফিরতাম না।'

অমিত শেখর বোসের দিকে তাকিয়ে ছিল। শেখর বোসের চোখ দুটো যেন আলোর আগুনে জ্বলে উঠেছিল। গলাটা শোনাচ্ছিল কিশোরের মতো ভাবপ্রবণ। শেখর বোস বললো—'আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব, তোমরাও করবে, আমার ড্রীম এইটে-ই। আমি এই স্বপ্ন-ই দেখি।'

তারপর একটু থেমে, শেখর বোস বলল—'তুমি যাও। আমি যা হয় করবো। আর, আর তোমরা একটু কো-অপারেট্ ক'রো।' সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো। অমিতের হাতের ওপর রাখল।

শেখর বোসের সে বিশ্বাস অমিতরা খুব সহজে ভাঙল। নিজে থেকে টাকা দিয়ে শেখর বোস কৃষ্ণধনের দোকটা চাকলো। কৃষ্ণধন ফি-ইনফ্লেটেড হলো। তাকে ওয়ার্নিং দিয়ে দেওয়া হলো।

অমিতেরা জিতলো। তারপর তারা ক্যান্টিনে সবাই একত্র হয়। তারা শেখর বোসের দুর্বলতা নিয়ে হাসাহাসি করে। হ্যাঁ অমিত তাকে নকল করছিল। তার কথাগুলোকে নকল করে দেখা হচ্ছিল। অমিত কি বুঝেছিল, সে শেখর বোসকে নকল করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও ছোট করছে। নিজেকেও সে ছিঁড়ছে, কদর্য করেছে, নিজেকে সে তখন মারছে? না। অমিত বোঝেনি যে সে নিজেকেই তখন হত্যা করছিল।

এবং শেখর বোস তাই দেখে। ক্যান্টিনের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে। তখন মুখটা সাদা হয়। তার হাতটা কাঁপে। সে কথা বলে না। সে বেরিয়ে যায়।

তখন হঠাৎ অমিতরা চুপ করে যায়। হঠাৎ তারা থেমে যায়। তাদের মধ্যে একটা কঠিন নীরবতা নেমে আসে। সেই নীরবতা তাদের বুকে চেপে বসে। অমিতের বুকে অন্তত, মস্ত একটা ধাক্কা লাগে। আলো নেবানো ট্রেন ইঞ্জিনের মতো একটা ভয়ঙ্কর এসে যেন তাকে আঘাত করে।

॥ সাত ॥

শেখর বোস এই চূড়ান্ত আঘাতটা সইতে পারেনি। নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্তটা নেবার পর সে নিজের বাড়ীতে শোবার ঘরে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। এন. এন. বসুমল্লিকের একমাত্র ছেলে শেখর যখন ইউ. কে. থেকে ফিরে আসে, সে নিজের নাম থেকে মল্লিকটা বাদ দিয়েছিল। সে নিজের পরিচয় দিতে চায়নি। সে তার বাবার স্বপ্নটার কথা জানত। যখন তার স্ত্রী মারা গেল, তখন শেখর বোস ভেঙে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে একটা মুক্তির আস্বাদ পেয়েছিল। এখন সে মুক্ত। এখন আর তাকে অ্যাক্সিনা পেকটোরিস-এর দুর্বল হার্ট নিয়ে অনেকদিন বাঁচবার জন্যে সাবধানে থাকতে হবেনা। এখন সে ফিরতে পারে। এখন সে বাকি জীবনটুকু কাজ করতে পারবে। সে বাবার স্বপ্নটা যেখানে প্রাণ পেয়েছে সেখানে ফিরে যেতে পারবে।

বাবার স্বপ্নটা ভেঙে গিয়েছিল। শেখর সে স্বপ্নকে জোড়া দিয়ে দিয়ে আবার দাঁড় করাতে চাইছিল। স্বপ্ন! সবই ত স্বপ্ন। স্বপ্ন আছে বলেই ত স্বপ্নকে জীবন দেবার জন্যে মানুষ চেষ্টা করে, মানুষ বাঁচে। শেখর নিজেও কি স্বপ্নদর্শী নয়? তাই কি সে ফেরেনি?

কিন্তু সে আর ভাবল না। হ্যাঁ এইরকমই-হবে। কিছু লোক স্বপ্নকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে, আর কিছু লোক সে স্বপ্নকে ভাঙবে। এর নামই জীবন।

অজস্র বই। এ সব বই তবে ঐ কার্মের লাইব্রেরীতে থাক। তার টাকা তা-ও ঐ কার্মের-ই ওআর্কার্স ফাণ্ড-এ থাক। যা যা সে দিতে পারে, তা সে দিয়ে যাবে। তার স্বপ্নকে দেখিয়ে যেতে পারবে না। পারলে সে দিত। কিন্তু না। একজনের স্বপ্ন আর একজনকে দেওয়া যায়না। কেউ দিতে পারে না।

তাই, শেখর বোস পিস্তলটায় গুলি ভরে। তাই সে নলটা চিবুকের নিচে লাগায়।

—'হ্যাঁ। তোমরা তাকে খুন করেছ।'

সুরনাথ অমিতকে বলছিলেন। সুরনাথ কাঁপছিলেন। শিবনাথ, অলকা, অবনীশ দাঁড়িয়ে ছিল। সবাই নীরব। সবাই অপেক্ষমান।

—'এই তোমাদের জীবন! আর এ জীবন তোমাদেরই সৃষ্টি। তোমরা বড় বড় কথা বল! তোমরা ভীরু। তোমরা কাপুরুষ। তোমাদের মধ্যে শেখর বোস আসে, তোমরা তাকে চিনতে পার না। তোমরা জীবনকে কলুষ করেছ। তোমরা ভ্রষ্ট।' সুরনাথ শিবনাথকে হাত তুলে থামালেন। তাকে এগোতে দিলেন না।

—'আমি কথা বলব! আমাকে বলতেই হবে। তোমরা ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্য নিয়ে কথা বল! অথচ তোমরাই অপরাধ কর। তোমরা সে অপরাধের চেহারা দেখতে পাওনা। যা কিছু সুন্দর পবিত্র, তাকে তোমরা সহ্য করতে পার না। সত্যকে তোমরা সহ্য করতে পার না। কেমন করে পারবে? সত্যকে স্বীকার করা বড় কঠিন। তোমাদের সে ক্ষমতা নেই।

—'আর নেই বলেই, শেখর বোসকে তোমরা সহ্য করতে পারলে না। কেমন করে পারবে? তোমরা তাকে চেননি। সে তোমাদের ঠিকই চিনেছিল। তাই সে তোমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। তার কথাগুলো তোমরা সহ্য করতে পারনি। কেমন করে পারবে? একটা গাছের পাতা মুচড়ে ছিঁড়ে নেবার লোভ সম্বরণ না করা, একটা বেওয়ালের সাদা পবিত্রতাকে রক্ষা করা, এগুলো দুর্বলের কাজ নয়। এর জন্যে চরিত্র চাই। শক্তি চাই। তার সে শক্তি ছিল।

—'আমি বুঝতে পারছিলাম শেখর বোস বিপদে পড়েছে। আমি বুঝেছিলাম, সে নিজেকে বিপন্ন করছে। আমি তাকে সাবধান করতে পারতাম। আমার তার কথা মনে হয়েছিল। আমি তোমাদের চেয়ে আমার পরিবারের চেয়ে তার জীবনটা অনেক মূল্যবান মনে করেছিলাম। তাই আমি তার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু আমি সাবধান করলে সে শুনত না। সে বুঝত না। সে আবার তোমাদের মধ্যেই ফিরে যেত। আর, সে বারবার গেলে তোমরা তখন হিংস্র হয়ে উঠতে! হয়তো তোমরাই তাকে হত্যা করতে। কিন্তু সে তোমাদের হারিয়ে দিয়ে গেছে!'

সকলে নিশ্চুপ।

সুরনাথ আবার হাত তুললেন। আঃ সমস্ত শরীর যন্ত্রণায় কাঁপছে। চোখের সামনে নামছে অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকারের রং লাল কেন?

তিনি তাঁর রক্তাক্ত চোখ তুললেন। যন্ত্র হানবার মতো ভীষণ স্বরে বললেন—'এখন তার রক্ত তোমাদের হাতে। না অমিত! এই রক্ত তুমি কোনদিন মুছতে পারবে না। এখন থেকে এই রক্ত তোমার হাতকে অপরাধী বলে চিনিয়ে দেবে।'

তিনি হাসতে চাইলেন। তিনি কাঁদতে চাইলেন। তাঁর চোখ যেন ফেটে গেল। দুহাতে রক্ত মুছে, দুই হাত তুলে তিনি বললেন—'নাউ, শেড টিয়ার্স, ইফ উই ক্যান। সেড টিয়ার্স'। এখনো সময় আছে। কাঁদ, মাথা নিচু কর, শেড টিয়ার্স আই সে!'

সুরনাথ চলে গেলেন। সুরনাথের চেয়ারটা পেছনে হেলে গেল। অনেকগুলো হাত তাঁকে জড়িয়ে ধরল। অনেকগুলো পা তাঁর দিকে ছুটে এল। তারা তাঁর শেষ কথাটা শুনতে পেল।

ভ্রম-সংশোধন

গত পূজা সংখ্যার গল্প-ভারতীতে প্রকাশিত অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধটির শিরোনামা 'আচার্য প্রফুল্ল'র পরিবর্তে 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র' হইবে।

॥ পুস্তক পরিচিতি ॥

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা : শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যেমন বিশ্বতোমুখী তাঁহার মনীষাও তেমনই বিচিত্রপথ-গামিনী। রবীন্দ্র-মনীষার দীপ্তি সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়েই আলোকপাত করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্পর্কে যে পরিমাণ আলোচনা হইয়াছে, তাঁহার মননশীল গদ্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাহার তুলনায় কিছুই হয় নাই। তাঁহার প্রবন্ধাবলীর সামগ্রিক আলোচনা আজও কেহ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, তবে তাঁহার মনীষার বিশেষ কয়েকটি দিক সম্পর্কে কয়েকজন মনস্বী লেখক আলোচনা করিয়াছেন।

ভাবীকালে পৃথিবীর ইতিহাসে যে কয়েক জন শিক্ষাব্রতীর নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয়ে তাঁহাদের অন্যতম। প্রাক্-রবীন্দ্র যুগেও বাংলা দেশের অনেক বরেণ্য সন্তান এ কালের শিক্ষা-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এমন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আর কেহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। শিক্ষা-সমস্যার উপর রবীন্দ্রনাথ যে আলোকপাত করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মননশীল শিক্ষাব্রতীর প্রণিধান-যোগ্য।

রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষ্যে যে সকল মনস্বী লেখকের রচনা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, তাহার মধ্যে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মননশীল নিবন্ধকার হিসাবে প্রবোধবাবু লব্ধ-প্রতিষ্ঠ, তাহা ছাড়া বিশ্ব-ভারতীর সঙ্গে দীর্ঘকালের সংযোগ ও গভীরভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য-চর্চার ফলে তিনি এ বিষয়ে উত্তম অধিকারী হইয়াছেন। 'লেখকের বক্তব্যে' লেখক বিনয় প্রকাশ পূর্বক বলিয়াছেন—'এই ক্ষুদ্র পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার কিছু পরিচয় দিতে প্রয়াসী হইয়াছি। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারার সর্বাঙ্গীন পরিচয় দেবার যোগ্যতা আমার নেই।' আলোচনা সর্বাঙ্গীণ না হউক, প্রত্যেকটি প্রবন্ধ যে লেখকের মননশীলতার পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই।

'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার' প্রথম প্রবন্ধ 'বাংলাবিশ্ববিদ্যালয়'। কবিগুরুর মনে 'স্বাধীন পূর্ণাঙ্গ বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষা' ছিল সে সম্পর্কে লেখক এই প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন এবং নানা উদ্ধৃতির সাহায্যে দেখাইয়াছেন, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কবির মনে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন জাগিয়াছিল, সে স্বপ্নকে তিনি আজীবন সযত্নে লালন করিয়াছেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দেই রবীন্দ্রনাথ এই সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। তিনি এ বিষয়ে বাংলা দেশের তিনজন মনস্বী সন্তানের,—আনন্দমোহন বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্রের—অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করিয়াছিলেন। লেখক বলিয়াছেন, '১৮৮৩ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার স্রোতোধারাকে মাতৃভাষার স্বাভাবিক পথে বিশ্ববিদ্যার সঙ্গমতীর্থে পরিচালিত করবার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছিলেন'। (পৃঃ ৪৫) লেখক এই প্রসঙ্গে এমন একটি তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন যাহা অনেকেরই জানা নাই। লেখক দেখাইয়াছেন, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মনস্বী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বঙ্গদর্শনে' 'কলেজী শিক্ষা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতেই তিনি উচ্চ শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার দাবী সমর্থন করেন! লোকভাষাই যে দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে মনস্বী লেখক স্বামী বিবেকানন্দের রচনা হইতেও দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

'বিশ্বভারতী-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন, বিশ্বভারতীর নীতি ছিল, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরেই মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকৃতিদানের নীতি। (পৃঃ ৫৯) বিশ্বভারতী সর্বভারতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এই অজুহাতে আজ সেখানেও বাংলা ভাষার মর্যাদা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কবিগুরুর স্বপ্ন সেখানে

বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে নাই, লেখক দুঃখের সহিত একথার উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা জাতীয় সংহতির দোহাই দিয়া হিন্দীর অযৌক্তিক দাবী প্রতিষ্ঠা করিতে চান, তাঁহাদের সম্পর্কে লেখক রবীন্দ্রনাথের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'এমন বাহ্য সামাকে যারা চায় তারা তাদের বৈচিত্র্যের উপর ষ্টীম রোলার চালিয়ে দিয়ে আপন রাজপথের পথ সমভূমি করতে চায়।...বাইরের যে এক, তা হচ্ছে প্রলয়, তাই একাকারত্ব। আর অন্তরের যে এক তা হল সৃষ্টি, তাই ঐক্য। একটা হল পক্ষত্ব, আর একটা হল পঞ্চায়েত'।

এই প্রসঙ্গে লেখক বাংলার পুরুষসিংহ, অনলস শিক্ষাব্রতী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয়ে উভয় মনীষীর চিন্তার ঐক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। 'ভাষার যুক্তি' প্রবন্ধেও লেখক এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'মনের যুক্তি মানে ভাষা ও সাহিত্যের যুক্তি। তার প্রধান অন্তরায় দুটি, ইংরেজি ও হিন্দি।' (পৃঃ ১৪৭) প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—'ইংলণ্ডীয়ার মিলটনের ভাষার আসনে যদি তুলসীদাস-সুরদাসের ভাষাকে বসানো হয়, তবে আমাদের তুলসীদাস-সুরদাসের যুগেই ফিরে যেতে হবে, সে যুগের রাহু এসে গ্রাস করবে আধুনিক যুগের মধ্যাহ্ন-সূর্যকে। সুখের বিষয়, সময়ের নদীতে জীবনের তরণীকে উজানে বইয়ে নেওয়া মানুষের সাধ্য নয়, চেষ্টা করলে নৌকাডুবি অনিবার্য। অথচ সে চেষ্টার হাওয়াই বইছে আজ চারিদিকে। (পৃঃ ১৪২)

'সাহিত্যের যুক্তি' প্রবন্ধে লেখক প্রধানত 'মনের যুক্তির' কথাই বলিয়াছেন। 'শিক্ষার লক্ষ্য' নিবন্ধটিরও ইহাই প্রতিপাদ্য। তবে 'সাহিত্যের যুক্তি' প্রবন্ধে দুই একটি নূতন কথাও আছে। যথা—আমাদের 'মৃত্যু-তরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে ইংরিজি অপরা বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ'। (পৃঃ ১৬৯) প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—'বাঙলা সাহিত্যকে বাঙলা দেশের সর্বসাধারণের সম্পদ করে তোলা চাই। নতুবা এ সাহিত্য আমাদের বাঁচাতে পারবে না।' (পৃঃ ১৮০) এই উক্তিটি আমাদের বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য।

'শিক্ষার লক্ষ্য' প্রবন্ধে লেখক দেখাইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য—মনের মোহমুক্তি ও সংস্কারমুক্তি। লেখক নানা উদ্ধৃতির যোগে প্রমাণ করিয়াছেন যে—

'রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের সমস্ত দুঃখ-লাঞ্ছনার মূলে রয়েছে দেশজোড়া অজ্ঞানতার অবসাদ, এবং তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় জ্ঞানের আলোকন' (পৃঃ ৯৩)। বাস্তবিকই, রবীন্দ্রনাথ এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে আমাদের সমস্ত দুর্গতির মূল কারণ প্রথার দাসত্ব, বিচারবিহীন আচারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, বুদ্ধির জড়তা ও উহার ফলস্বরূপ ধর্মান্ধতা। আর্থিক দৈন্য অপেক্ষা চিন্তার দৈন্যকে, রাজনৈতিক পরাধীনতা অপেক্ষা মনের পরবশতাকে তিনি অধিকতর ভয়াবহ বলিয়া মনে করিয়াছেন।

'শিক্ষা-সমস্যা' প্রবন্ধে প্রবোধ বাবু একটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'আজ আমাদের দেশে সর্বপ্রথম শিক্ষা-নায়কের একান্ত অভাব। রবীন্দ্রনাথ বা আশুতোষের ন্যায় শিক্ষা-নায়ক বিদ্যমান থাকলে আজ আমাদের এত দুর্ভাবনার কারণ থাকত না'। (পৃঃ ১০৮) 'শিক্ষা-সমস্যা' প্রবন্ধে লেখক আমাদের বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির অপূর্ণতা-সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছিলেন সেই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা যে শিক্ষায় আমাদের বীক্ষণশক্তি, মননশক্তি ও কল্পনাশক্তির সম্যক স্ফূর্তি ঘটে। শুধু সাহিত্যপ্রধান শিক্ষার দ্বারা মানুষ যথার্থ শিক্ষিত হইতে পারে না, তাই জড়বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতিও শিক্ষার অঙ্গীভূত হওয়া উচিত। আমাদের শিক্ষার আর একটি ত্রুটি এই যে এ শিক্ষায় স্বদেশ ও স্বজাতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে না। রবীন্দ্রনাথ বলেন—'জানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, সুবিদিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে।'

'শিক্ষার মুক্তি' প্রবন্ধে মনীষী লেখক বাংলা দেশের 'শিক্ষা সংগ্রামের' একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'রামমোহনের এ্যাংলো হিন্দু স্কুল এবং দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা পরবর্ত্তী কালের রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের (১৯০১) অগ্রদূত'। (পৃঃ ১৪০) এই উক্তিটি বিশদ আলোচনার যোগ্য।

'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা' সম্পর্কে প্রবোধ বাবু যে তথ্যপূর্ণ ও সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাইতেছি।

পরিশেষে গ্রন্থখানির অপূর্ণতা সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। গ্রন্থখানিতে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বাংলার মনস্বীদের শিক্ষা-চিন্তা সম্পর্কে একটি তুলনামূলক আলোচনা থাকিলে শোভন হইত। লোক শিক্ষা-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের মতের কোথায় সাদৃশ্য তাহাও নিশ্চয়ই আলোচনার যোগ্য। লেখক অবশ্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা করেন নাই, তথাপি এই বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থখানিতে কয়েকটি মুদ্রাকর প্রমাদও চোখে পড়িল, এগুলি নিশ্চয়ই অবাঞ্ছিত। কয়েকটি প্রমাদ অতি গুরুতর, যেমন বিদ্যাসাগর ভূদেব প্রভৃতি শিক্ষাব্রতীদের নামের তালিকার সঙ্গে 'রাজেন্দ্রসুন্দর' (?) নামটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। (পৃঃ ১৩৫) আবার ১৬২ পৃষ্ঠার অষ্টম সংক্তিতে 'শিক্ষাব্যবস্থার' স্থলে 'শিল্প-ব্যবস্থা' কথাটি মুদ্রিত হইয়াছে।

একটি নির্ঘণ্ট থাকিলে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

সর্ব ঋতুতে সর্ব উৎসবে

বাংলার রেশম

সেই সঙ্গে কুটীর ও গ্রামীণ শিল্পের

বিরাট সমাবেশ

পশ্চিম বংগ রেশম শিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ

(পশ্চিম বাংলার শিল্প-বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত এবং
ভারত সরকারের খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন কর্তৃক প্রমাণিত)

ঃ বিক্রয় কেন্দ্র ঃ

(১) ১২।১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
(২) কুটীর শিল্প বিপনি
১১এ, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-১
(৩) ১৫৯।১এ, রাসবিহারী এভেনিউ,
কলিকাতা-২৯
(৪) ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

॥ অমনোনীত ॥

ডাঃ মধুগোপাল দাস

জয়দীপের নির্বুদ্ধিতার কথা উৎপল যখনই ভাবছিল তখনই বিরক্তিতে তার মন ভরে উঠছিল। অসহ্য এই প্রকার ব্যবহার, জয়দীপকে স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে ভবিষ্যতে যেন পাশে পড়ে সে ইভার সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা না করে।

কিন্তু সত্যি কি নির্বুদ্ধিতা? না, এই লোক-দেখানো বুদ্ধিহীন আচরণের পেছনে রয়েছে অত্যন্ত নিপুণ কলাকৌশল, যার রহস্য সে ভেদ করতে পারছে না!

ইভা এসেছিল তরুণ অধ্যাপক উৎপল মুখার্জির বাড়ীতে। কলেজে খানিকক্ষণের জন্যও অবসর হয় না, তাই উৎপল বলে দিয়েছিল রবিবার দিন বেলা নটা দশটার সময় ইভা যদি তার বাড়ীতে আসে তা'হলে তার সঙ্গে নিরুপদ্রবে আলোচনা করতে পারবে, বলতে পারবে কী ভাবে বাকী কয়টা মাস পড়লে অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া তার পক্ষে সহজসাধ্য হবে।

আধ ঘণ্টারও বেশী হয়নি। উৎপল সবেমাত্র ইভার প্রব্লেমটা মোটামুটি বুঝে নিয়েছে, এবং বলতে সুরু করেছে, কি কি বই তাকে পড়তে হবে, কী ভাবে য়ুনিভারসিটির পরীক্ষার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এমন সময় অনাহূতভাবে জয়দীপ এসে হাজির।

এজন্য অবশ্য জয়দীপকে দোষ দেওয়া যায় না। প্রায় প্রতি রবিবারই সকালে বা সন্ধ্যায় সে একবার উৎপলের ওখানে হাজিরা দেয়, বিশেষ কোন কাজ উপলক্ষে নয়, শুধু গল্প করতে। উৎপলের সঙ্গে তার স্বভাবতঃ মিল যদিও খুব কম, তবু তার সাহচর্য সে কামনা করে, এক সপ্তাহ দেখা না হলে হাঁপিয়ে ওঠে।

শুধু স্বভাবের অসাদৃশ্য কেন, চেহারার দিক দিয়েও তারা সম্পূর্ণ বিপরীত। উৎপল রোগা পাতলা, মাঝারি গড়ন। চোখে মুখে বিদ্যাবত্তার দীপ্তি, কিন্তু শান্ত, আপনভোলা, অনেকখানি নিজের মধ্যেই লুপ্ত। আর জয়দীপ দীর্ঘদেহ, বলিষ্ঠ, মাংসপেশীবহুল। লেখাপড়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই কম, কিন্তু সরল ব্যবহারে এবং প্রাণখোলা হাসি দিয়ে সে উৎপলের এবং উৎপলের মত আরও অনেকের মন জয় ক'রে নিয়েছে।

উৎপলের সঙ্গে জয়দীপের পরিচয়ের সুরু কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে। বারো বছর আগে গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উঁচু আসন অধিকার ক'রে উৎপল পড়তে এসেছিল কলকাতায়। স্বভাবতঃই সে লাজুক, নতুন পরিবেশে এসে আরও যাবড়ে গিয়েছিল। ঠিক ঐ সময় জয়দীপ এগিয়ে এসে তার সঙ্গে ভাব করে, কলেজের এবং কলকাতার ঘাঁটিঘাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। বারো বছরে বন্ধুত্বে এতটুকু ছেদ পড়েনি, যদিও তাদের জীবন চলেছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধারায়। জয়দীপ পরীক্ষায় তেমন কোন উৎকর্ষ দেখাতে পারেনি। তাই বি. এ. ফেল ক'রে শিক্ষানবিশ হিসেবে একটা কারখানায় ঢুকে পড়ে। পাঁচ বছরের মধ্যেই সেখানে সে একটা ডিপার্টমেন্টের ইন্-চার্জ হিসেবে বহাল হ'য়ে যায়। ওদিকে উৎপল প্রথম শ্রেণীতে বি. এ. তারপর এম্. এ. পাশ ক'রে সুরু ক'রে অধ্যাপনা।

দু'জনেরই বয়স পৌঁচেছে প্রায় ত্রিশের কোঠায়, কিন্তু কেউই বিয়ে করেনি। বিয়ে করতে জয়ন্তীপের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু বাংলা দেশে মনের মত মেয়ে সে আজ পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছেনা, অথচ দেশের বাইরে থেকে কোন মনোনীতাকে সংগ্রহ করতে সে নারাজ। আর উৎপলের মতে স্ত্রী হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড বিঘ্ন, বিশেষ করে রিসার্চের পথে। ডক্টরেটএর থিসিস্‌টা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের কথা সে ভাবতেই পারে না।

কিন্তু ইভার সঙ্গে পরিচয় হবার পর অবধি উৎপলের মত যেন একটু বদলাতে সুরু করেছিল। এরকম একজন তীক্ষ্ণধী মেয়ে বিঘ্ন না হয়ে তার থীসিস্ লেখায় বরং সহায়ক হতে পারে, এই সম্ভাবনা তার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছিল। ইভাকে যে সে তার বাড়ীতে আসতে বলেছিল তার পেছনে ছিল এই সম্ভাবনাটা পরখ করে দেখবার অভিপ্রায়।

অত্যন্ত সঙ্গীন মুহূর্ত্তে এসে উপস্থিত হ'ল জয়ন্তীপ।

ইভাকে দেখে জয়ন্তীপ প্রথমে চলে যাবার ভাণ করেছিল, বলেছিল, তুমি আজ ব্যস্ত রয়েছ, উৎপল, আরেকদিন না হয় আসব।

উৎপলই ভদ্রতা ক'রে জবাব দিয়েছিল, না না, ব্যস্ত আর কি! এ হচ্ছে আমার ছাত্রী, ইভা বসু, এবার বি. এ. দিচ্ছে, ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স নিয়েছে, আমার কাছে নির্দ্দেশ নিতে এসেছে।··· আর এ হচ্ছে জয়ন্তীপ রায়, আমার বহুদিনের বন্ধু।

ইভা ছোট্ট একটি নমস্কার করেছিল।

পলকের মধ্যে ইভাকে পরিমাপ করে নিয়েছিল জয়ন্তীপ। স্থির করে ফেলেছিল, ইভার সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হ'তে হবে তাকে।

তবু সে ভাবখানা দেখিয়েছিল যেন কোনরকমে চলে যেতে পারলে বাঁচে। টেবিলের উপর থেকে সেদিনের খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে বলেছিল, আপনার কাজে ব্যাঘাত করলাম, সেজন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আমি গাড়ীতে বসে কাগজটা দেখছি, আমার কোন তাড়া নেই।

বাধ্য হয়ে উৎপলকে তখন বলতে হয়েছিল, না, না, একা গাড়ীতে বসে কি করবে? এখানেই বসো। আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল।

আর কোন দ্বিধা না করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে জয়ন্তীপ সেখানেই বসে পড়েছিল।

উৎপল আরও আধ ঘণ্টা কাটিয়েছিল ইভাকে পড়ার নির্দ্দেশ দিতে। কিন্তু মাঝে মাঝেই ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল জয়ন্তীপ। সংলগ্ন অসংলগ্ন ছোটখাট প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অধ্যাপকের অধ্যাপনা নিরবচ্ছিন্ন গতিতে চলতে পারেনি।

অবশেষে উৎপলই বলেছিল, আজ এই পর্যন্ত থাক্, ইভা। আরেকদিন সময় করে এসো, ফিলজফির পেপারটা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

বইখাতা গুটিয়ে ইভা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তীপও উঠে পড়েছিল। কৃত্রিম অনুতাপের সুরে বলেছিল, ভারী অন্যায় করলাম ত আমি, আপনাদের আলোচনাটা অর্দ্ধ সমাপ্ত হয়ে রইল।

ইভা বলেছিল, না, না, তাতে আর কি হয়েছে! অনেকক্ষণ এসেছি, প্রোফেসার মুখার্জ্জিও নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, ছুটির দিনেও ছাত্রী ঠ্যাঙানো কতক্ষণ আর ভাল লাগে।

জয়দীপ সায় দিয়ে বলে উঠেছিল, সেটা কিন্তু সত্যি, মিস্ বসু। উৎপল যে কি ক'রে পারে অবাক্ হয়ে যাই মাঝে মাঝে ভাবি!

তারপর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ইভার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আপনি নিশ্চয়ই ওর প্রিয় ছাত্রী!

উৎপল বা ইভা এর জবাবে কিছু বলবার আগেই জয়দীপ বলেছিল, আপনি কোথায় যাবেন, মিস বসু? আমার গাড়ী রয়েছে, চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।…আর উৎপল, তুমিও এসো না, যেতে যেতে গল্প করা যাবে।

বিরক্ত হয়ে উঠেছিল উৎপল। বলেছিল, আমি আসতে পারব না, জয়দীপ, আমার কাজ রয়েছে।

—কাজ আর কাজ! কালে তোমার বিরতি আসবে বাড়ীতে একটি বৌ এলে!…বেশ, তুমি থাকো, আমি মিস্ বসুকে পৌঁছে দিয়েই চলে আসছি।

ইভা প্রতিবাদ করেছিল, বলেছিল, সে অনায়াসে ট্রামে চলে যেতে পারবে, কিন্তু জয়দীপ তার আপত্তি শোনেনি। একরকম জোর করেই সে ইভাকে তুলে নিয়েছিল তার গাড়ীতে।

ষ্টার্ট দিতে দিতে সে উৎপলকে বলেছিল, যদি আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে না আসি তা'হলে বুঝবে তোমার ছাত্রী আমাকে আটকে রেখেছেন!

জয়দীপের এই প্রগল্‌ভতা যে ইভার পছন্দ হয়নি উৎপল তার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝেছিল, কিন্তু ইভার সামনে জয়দীপকে সাবধান করে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে তাকে নীরব থাকতে হয়েছিল।

বলা বাহুল্য, জয়দীপ সেদিন ফিরে আসেনি। পরে উৎপল জানতে পেরেছিল যে জয়দীপ এক ঘণ্টারও বেশী সময় কাটিয়েছিল ইভাদের বাড়ীতে, তার বাবা মার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে।

পরের সপ্তাহের রবিবারে জয়দীপ আবার এসে হাজির হ'ল উৎপলের বাড়ীতে। লজ্জিত মুখে বলল, সেদিন দেরী হ'য়ে গেল বলে আর এলাম না। তুমি আমার জন্য বসে থাকোনি ত?

উৎপল গম্ভীরভাবে জবাব দিল, তুমি যে আসতে পারবে না আগে থেকেই জানতাম।

তিরস্কারটা গায়ে না মেখে জয়দীপ বলল, তোমার ছাত্রীটি কিন্তু ভারী সপ্রতিভ। এই প্রথম একটি বাঙালী মেয়ে দেখলাম যার সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ গল্প করা যায়।

উৎপল কোন জবাব দিল না।

জয়দীপ বলে চলল, কিন্তু, বাবা, কী ভয়ানক বিদুষী! আমার ত রীতিমত ভয় করছিল!

—ভয় ভাঙতে বেশী দেরী হয়নি আশাকরি।

—না, তা হয়নি। তোমার ছাত্রীর মহৎ গুণ এই যে নিজের বিদ্যার এতটুকু প্রচার নেই। খুব সহজভাবে সকলের সঙ্গে মিশতে পারে।

—তাহলে আর কি, এবার আলাপটা জমিয়ে নাও!…একটু শ্লেষ মিশিয়েই বলল উৎপল।

—আরে না, না। তুমি যা ভাবছ সেসব কিছু নয়। ইভা মোটেই আমার টাইপ নয়। আর যতদূর মনে হ'ল, মেয়েটা তোমাকে গভীর শ্রদ্ধা করে। এ শ্রদ্ধা ভালবাসার পর্য্যায়ে পৌঁছুতে খুব দেরী হবেনা, যদি তোমার তরফ থেকে খানিকটা প্রশ্রয় পায়।

উৎপলের হৃৎপিণ্ডের গতি যেন হঠাৎ চড়া থাপে চলতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সে সামলে নিল।

বলল, পাগল হয়েছ জয়দীপ ? ইভা আমার ছাত্রী, ওর সঙ্গে অন্য কোন সম্পর্কের কথা ভাবতেই পারিনা। তবে, তুমি এখনুনি যে কথা বললে সেটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ইভা সত্যি তোমার টাইপ নয়, শুধু শুধু আলেয়ার পেছনে ঘুরোনা।

—আমি মনে রাখব, উৎপল।…জয়দীপ জবাব দিল।

কিন্তু ইভার আকর্ষণ দুর্নিবার হয়ে উঠল। পরের দিনই জয়দীপ গেল তার বাড়ীতে। তার বাবা মাকে ব'লে সে ইভাকে নিয়ে গেল সিনেমায়, তারপর এক রেস্তোরাঁয়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জয়দীপের জীবনে ইভা অপরিহার্য্য সঙ্গিনী হ'য়ে দাঁড়াল। উৎপলের বাড়ীতে না গিয়ে সে হাজিরা দিতে লাগল ইভাদের বাড়ীতে।

পরীক্ষা সামনে, বিকেলের দিকে ইভা প্রায়ই ক্লান্ত হ'য়ে থাকত। সেই সময় জয়দীপ এসে তাকে গাড়ীতে করে নিয়ে যেত এদিকে ওদিকে, কোনদিন গঙ্গার ধারে, কখনও বা ময়দানে অথবা ইডেন গার্ডেনে। তার উচ্ছল, ভাবসর্বস্ব ব্যবহার ইভার মন্দ লাগছিল না।

দূর থেকে উৎপল সমস্তই লক্ষ্য করছিল। জয়দীপ যে তার কাছে আর আসেনা এজন্য তার ক্ষোভ হচ্ছিল বইকি! কিন্তু ক্ষোভের চেয়ে বেশী অনুভব করছিল রাগ, যে ইভা তার একমাত্র বন্ধুকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ তার অবচেতন মন বলছিল যে ইভা কোনদিনই জয়দীপকে বিয়ে করবেনা, যত ঘনিষ্ঠতাই জয়দীপ রচনা করুক না কেন।

তাই কলেজে যখন ইভার সঙ্গে উৎপলের দেখা হ'ত, তাকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে না গেলেও বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে কথা বলতে সে সুরু করেছিল। ইভাকে বাড়ীতে আসবার কথা সে আর বলেনি, ছোটখাট উপদেশ নির্দ্দেশ উৎপল দেয়া ছেড়ত কলেজেই।

ইভা একদিন তাকে বলেছিল, আর দিন দুই যদি আপনার কাছে যেতে পারতাম, স্যার, তাহ'লে সিক্সথ্ পেপারটা ভাল ক'রে তৈরী হয়ে যেত। ঐ পেপারটাতেই আমার সবচেয়ে ভয়।

উৎপল জবাব দিয়েছিল, আমার থীসিস্টা নিয়ে আমি খুব ব্যস্ত রয়েছি, ইভা। কলেজে অফ্ পিরিয়ড্-এ আমাদের কমনরুমে এসো, আমি সব বুঝিয়ে দেব।

বাধ্য হয়ে এই ব্যবস্থায়ই ইভা রাজী হয়েছিল, কিন্তু উৎপলের বুঝতে দেরী হয়নি যে তার ব্যবহারে ইভা ক্ষুণ্ন বোধ করেছে।

একদিন সোজা সে প্রশ্ন ক'রে বসল, আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন, স্যার ?

উৎপল চমকে উঠল। বলল, না, না, রাগ করব কেন ?

—কি জানি, আপনি আজকাল যেন আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন। অথচ আপনি নিজেই জানেন, এই সময়টায় আপনার সাহায্য আমার কত দরকার ছিল।

লজ্জিত বোধ করল উৎপল। বলল, আমি তোমাকে সাহায্য করতে সবসময় প্রস্তুত রয়েছি, ইভা। কিন্তু বুঝতেই ত পারছ, আমার কাজেও ব্যাঘাত।…তবে তুমি যদি নিতান্তই আসতে চাও, সামনের রবিবারে এসো।

এর জবাবে ইভা বলল, না, থাক।

উৎপলও বেশী পীড়াপীড়ি করল না।

ওদিকে জয়দীপ রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কিছুতেই যেন সে ইভার মনের নাগাল পাচ্ছিলনা। ইভা যদিও তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে কোন আপত্তি করে না, বরং খুশীই হয়, তবু কিসের যেন এক ব্যবধান সে সর্বক্ষণ রচনা করে রাখে, যা জয়দীপের পক্ষে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।

অবশেষে সে স্থির করল, খোলাখুলিভাবে সে ইভাকে জিজ্ঞাসা করবে। তবে ধৈর্য্য সে হারাবে না, সে অপেক্ষা করবে যতদিন পর্য্যন্ত ইভার পরীক্ষা শেষ না হয়।

রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। উত্তেজিত বেশে জয়দীপ উৎপলের বাড়ীতে এসে হাজির। তার তিন চার মাস আগে এই যোগাযোগ প্রথম সে এল উৎপলের কাছে।

—ব্যাপার কি? এত রাতে?···উৎকণ্ঠিত ভাবে উৎপল প্রশ্ন করল।

চৌকিটার উপর সোজা শুয়ে পড়ল জয়দীপ। প্রায় পনর মিনিট পর্য্যন্ত কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে জয়দীপ যা বলল তার সারমর্ম্ম এই। পরীক্ষা যেদিন শেষ হয় তার পরের দিনই ইভাকে নিয়ে সে গিয়েছিল একটা নিরিবিলি জায়গায়। দু'চারটে অবান্তর কথার পর সে ইভাকে জানিয়ে ছিল তার প্রার্থনা, সম্মতি চেয়েছিল তার বাবামার কাছে প্রস্তাবটা পাড়তে।

—ইভা কি বলল?···পাংশুমুখে প্রশ্ন করল উৎপল।

—প্রথমে কিছুই বলল না। তারপর খিল খিল করে হেসে উঠল। তোমাকে সত্যি বলছি। উৎপল, ইভার এরকম হাসি আমি আর কখনও দেখিনি। আমি হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। একটু পরে হাসিটা চেপে সে বলল, জয়দীপবাবু, এতদিনে বুঝতে পারছি আমার সম্বন্ধে আপনার এতখানি উদ্বেগ উৎকণ্ঠার আসল কারণ। কিন্তু আপনাকে নিরাশ করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ আমার মন অন্য জায়গায় বাঁধা।

—তুমি কি বললে?

—কি আর বলব! কোনরকমে বললাম, আমাকে মাপ ক'রো, ইভা, জানলে কিছুতেই এসব কথা তুলতাম না।···তারপর ওকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

—নিঃশ্বাস নিশ্চয়ই ফেলেছ, তবে বেঁচে উঠতে এখনও দেরী আছে।···সে যাক্, ইভার ব্যবহার কিন্তু আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারছি না। ও যে অন্যের প্রতি অনুরক্ত তার খানিকটা আভাষ তোমাকে আগে থেকেই দেওয়া উচিত ছিল।

—আভাষ দিয়েছিল বই কি! আমি নির্বোধ, বুঝতে পারিনি!

—তাই নাকি? কে সেই ভাগ্যবান পুরুষটি?

—এখনও বুঝতে পারছ না, উৎপল? সেই ভাগ্যবান পুরুষটি হচ্ছ তুমি। তোমাকে যে সে কত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, তা' তুমি বুঝেও বুঝতে চাওনা। ও চায় তোমাকে, আমার মত বি, এ, ফেল করা একটা বাউণ্ডুলে লোককে নয়।

—অসম্ভব, এ শুধু তোমার মনগড়া কল্পনা।···উৎপল বলল।

—কল্পনা নয়, উৎপল। দু'দিন অপেক্ষা করো, আমি যে মিথ্যে বলছিনা, তার প্রমাণ পাবে।··· জয়দীপ জবাব দিল।

মুখে যদিও বলল, অসম্ভব, কিন্তু উৎপলের মনের মধ্যে গুণ গুণ করতে লাগল জয়দীপের কথাগুলো।

যে ইভা সত্যি সত্যি তাকেই ভালবাসে। ইভার সঙ্গে তার পরিচয়ের খণ্ড মুহূর্তগুলির স্মৃতি আহরণ ক'রে তার উপর প্রলেপ দিল নানা রংএর. নিজের অবিমৃষ্টকারিতার জন্য নিজেকে ধিক্কার করল বারম্বার। আর ভাবতে লাগল, কি ক'রে ইভার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায়! পরীক্ষা সুরু হবার পর অবধি ইভার সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, পুনরায় সেতুবন্ধন করতে হ'লে তাকেই হতে হবে অগ্রণী।

কিন্তু উৎপল অধৈর্য নয়। জয়দীপের মত অসমসাহসিক, ব্রীড়াহীন ব্যবহার করা তার স্বভাব বহির্ভূত। সে স্থির করল, আপাততঃ সে কিছুই করবে না। পরীক্ষার ফল বার হয়ে গেলে সে নিজেই যাবে ইভাকে অভিনন্দন জানাতে এবং সেই সুযোগে সে অনুমান করতে চেষ্টা করবে ইভা তাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে কিনা।

উৎপলের এই পরিকল্পনা জয়দীপ অনুমোদন করল না। নিজের নেশা কেটে যাবার পর সে গুরুসংকল্প হয়ে উঠেছিল। যেমন করে হোক ইভার সঙ্গে উৎপলের মিলন ঘটাবেই। নানা যুক্তির দেখিয়ে সে প্রমাণ করতে চেষ্টা করল যে উৎপল প্রথমেই একটা ভুল করছে, অবিলম্বে ইভার সঙ্গে দেখা করা তার কর্তব্য।

তর্কে অভিভূত হয়ে অবশেষে উৎপল একদিন ইভাদের বাড়ীতে গেল। গিয়ে শুনল যে পরীক্ষা শেষ হবার কয়েকদিন বাদেই ইভা চলে গেছে লক্ষ্ণৌএ, তার বাবার এক বন্ধুর কাছে। ফিরবে মাস দুই পরে, পরীক্ষার ফল বেরুবার প্রাক্কালে।

যেন একটা সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পেল উৎপল। জয়দীপকে বলল, দেখলে ত, জোর ক'রে কোন কিছুই এগোনো যায় না। সময় এবং সুযোগের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়।

যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বেরুল। দেখা গেল, ইভা প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছে। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এসে উৎপলকে অভিনন্দন জানালেন তার ছাত্রীর কৃতিত্বের জন্য।

লক্ষ্ণৌ থেকে ইভা ফিরে এসেছে এই খবর উৎপল আগেই পেয়েছিল, জয়দীপের মারফৎ। ইভাদের ওখানে যাবার জন্য সে তৈরী হচ্ছিল, এমন সময় ইভাই এসে হাজির। সঙ্গে একটি অল্প বয়সী যুবক। উৎপল তাকে চেনে না।

—আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি, স্যার। আপনার সাহায্য না পেলে আমি কিছুতেই এরকম রেজাল্ট করতে পারতাম না।...উজ্জ্বলমুখে ইভা বলল।

—বসো, আমি তোমাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম। উৎপল বলল। তারপর ইভার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। এঁকে এর আগে দেখিনি ত! এঁর পরিচয় ত দিলে না!

ইভার মুখটা যেন ঈষৎ লাল হয়ে উঠল। মৃদুকণ্ঠে বলল, ও হচ্ছে তড়িৎ। গত বছর লক্ষ্ণৌ মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম্, বি, বি, এস্, পাশ করে বেরিয়েছে। আমার বাবার বন্ধুর ছেলে।

তড়িৎ এবার এগিয়ে এল। বলল, আসল কথাটা বলতে ইভা লজ্জা পাচ্ছে। আমরা শীগ্গীরই বিয়ে করছি, ওর বি, এ, পরীক্ষাটা শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। যথা সময়ে নেমন্তন্ন চিঠি পাবেন, মিঃ মুখার্জি, আপনাকে আসতেই হবে কিন্তু। বিয়েটা বোধ হয় লক্ষ্ণৌতেই হবে।

হঠাৎ একটা ঘোমা কাটলেও উৎপল বোধ হয় এতখানি চমকে উঠত না, যতখানি সে চমকে উঠল তড়িতের এই সংবাদ জ্ঞাপনে।

পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ওঃ, তাই নাকি; তা'হলে ত ভবল কংগ্র্যাচুলেশন্স্ তোমার পাওনা হয়েছে, ইভা!...তোমার বিয়ে, নিশ্চয় যাব আমি। শুধু আমি কেন, জয়দীপও যাবে।

গত কয়েক মাসের ঘটনাগুলি তাজা স্বপ্নের মত আবার জাগ্রত চেতনার জোড়া লেগে উজ্জ্বল, স্পষ্ট হয়ে উঠল উৎপলের কাছে। তাই বোধ হয়, প্রাসঙ্গিক না হলেও, জয়দীপের নামটা তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

বিশ্ব
বুড়ো
চিত্র

আমাদের কথা

বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র পর্যায়ে আমরা বৎসরাধিক কাল ধরে বিভিন্ন দেশের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে আসছি ও সঙ্গে সঙ্গে তার ইতিহাস এবং আলোচনা দিচ্ছি। এই অধ্যায়টি অল্প দিনের মধ্যেই পাঠকমহলে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। এরূপ প্রচেষ্টা এদেশে অভিনব। মনে হয় সেজন্যই আমরা বিভিন্ন স্থান থেকে অভিনন্দিত হচ্ছি।। অনেকে আমাদের উৎসাহ দিচ্ছেন এবং এটি নিয়মিতভাবে চালাতে বলছেন।

আজ পৃথিবীজোড়া যে দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা ও অন্তহীন আতঙ্কের রাজত্ব চলেছে তাতে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচার জন্য মানুষ খুঁজে মরছে এতটুকু আনন্দ। এই সব কারণেই আমরা ঠিক করেছি আগামী সংখ্যা থেকে বিশ্বের এক একটি দেশ ধরে তার ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করব এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সূচনা, ক্রমবিকাশ ও বর্তমান রূপ সম্পর্কে আলোচনা করব।

আমরা আশা করি বিষয়টি আরো উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

— বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র —

॥ ইংলণ্ড ॥

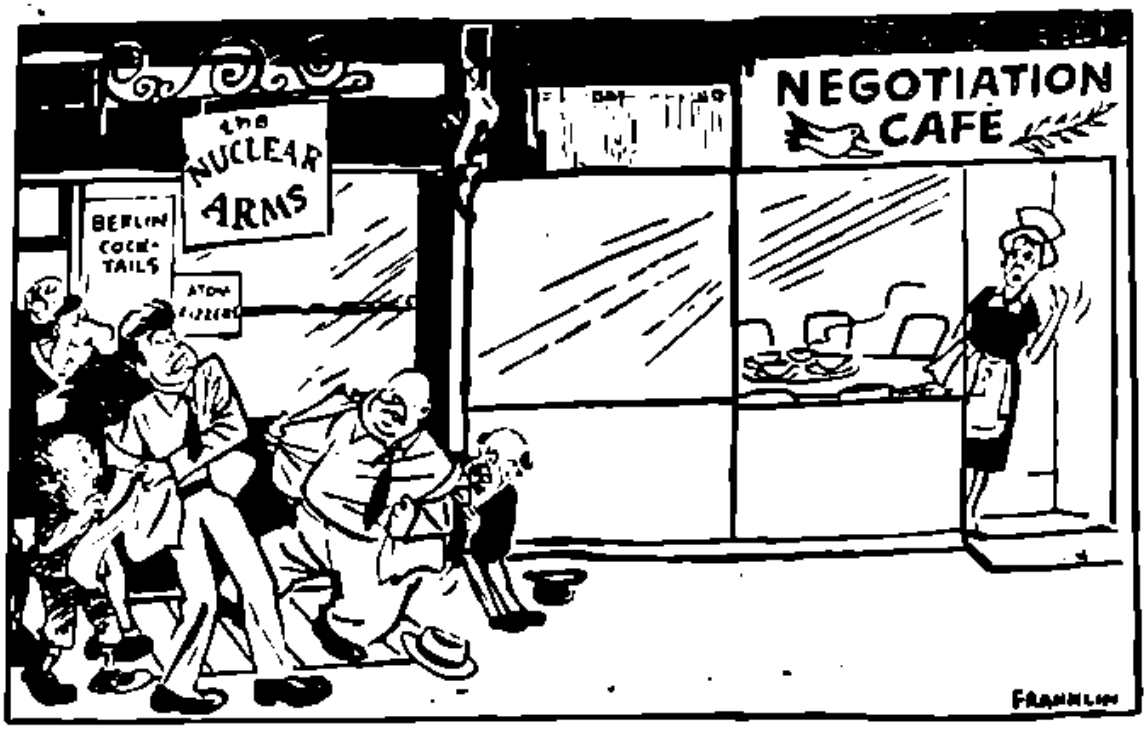

"How about some strong black coffee, gentlemen?"

THE OTHER PRISONER

পারমাণবিক যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন, নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক ও বিশ্বশান্তি প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে ইংলণ্ডের বিখ্যাত ব্যঙ্গ-চিত্রশিল্পী ফ্র্যাঙ্কলিন্ কর্তৃক অঙ্কিত দুটি অপূর্ব চিত্র ।

—ডেলি মিররের সৌজন্যে ।

— বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র —

॥ জার্মানী ॥

দুই বিরোধী পক্ষ—
মামলার পূর্বে
ও
পরে।

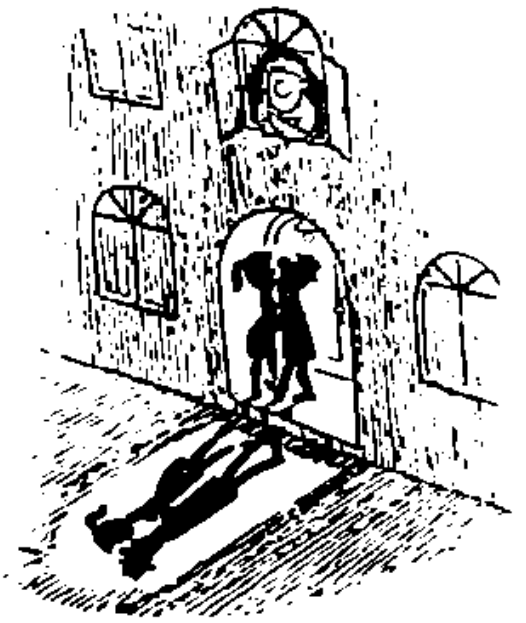

—হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তোমাকে
ওপরে নিয়ে যাব, কিন্তু জেনো
আবার মাথের ঘুম খুব হাল্কা।

—আগে একটু খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে
নিন — তারপর সব জানবেন।

— বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র —

॥ কবিতা ॥

এ যে গভীর বন, এ তুমি কোথায় নিয়ে এলে, কই, কথা বলছ না যে.....

আঃ থামো, জানোনা গাড়ী চালাবার সময় কথা কইতে নেই.....

শুধু তুমি আর আমি.....

.....আরে ভাবছ কেন, আমিও সাঁতার জানি না।

বিশ্বের
পুতুলনাচ

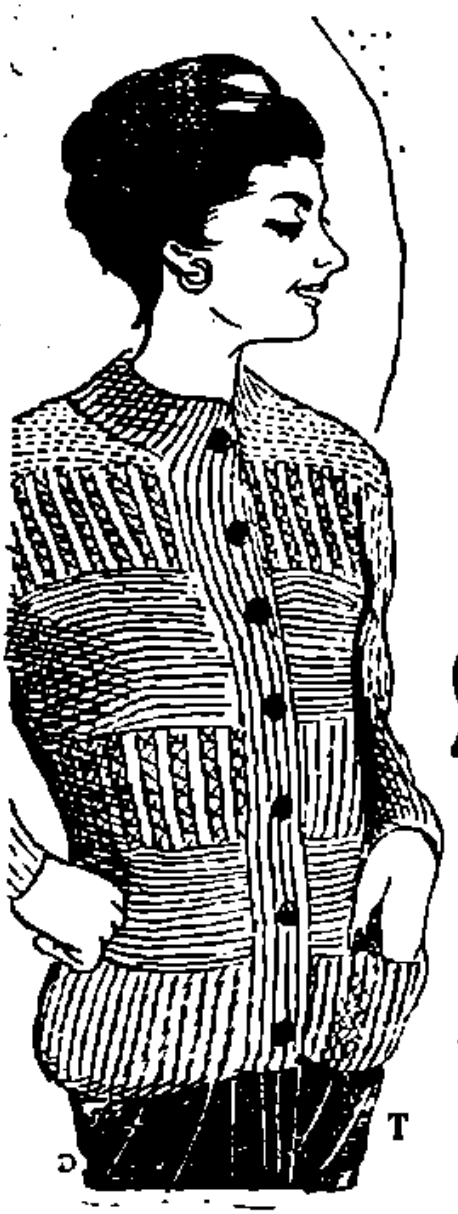

আপনিই বিচার করুন…

বেঙ্গল-এর

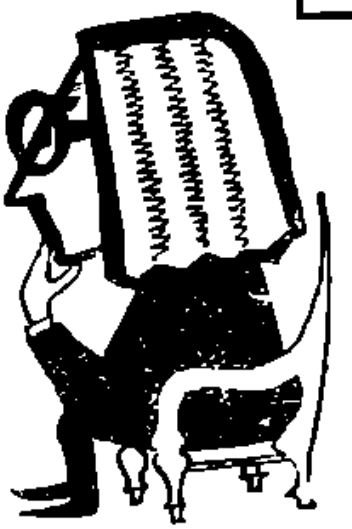

বোনার পশমের
উৎকর্ষ পরখ
করে দেখুন
সাতটি
মনোরম বৈচিত্র্যে

বেঙ্গলের পশমে বুনে
যোগদান করুন :

আপনার ডীলারের কাছে নিয়ম
ও যোগদানের ফর্ম পাবেন

দি বেঙ্গল ন্যাশনাল টেক্সটাইল মিল্‌স্ লিঃ

৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

॥ পুতুলনাচ এবং তার ক্রমবিকাশ ॥

সুবর্ণন পাল

অধুনা যন্ত্রশিল্পের কল্যাণে চলচ্চিত্র শিল্প আমাদের আনন্দবিধানের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পূর্বে ও পুতুলনাচের আসরই ছিল সর্বজনবন্দিত আনন্দলোক। চলচ্চিত্রশিল্পের অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় তার দারুণ প্রভাবে পুতুলনাচের আসর যে একদময় একটি বৈচিত্র্যে ভরা আনন্দদায়ক জগৎ ছিল, এ ভুলে গিয়েছি এবং আরো অনেকের ধারণা হয়েছে, এ পুতুল নাচের মাধ্যমে অভিনয় এবং তার থেকে বিচ্ছুরিত আনন্দ অর্জন শুধু শিশুদেরি সাজে। কিন্তু শুনলে অবাক হতে হয়, জগদ্বিখ্যাত মনীষীদের কাছে এ পুতুলনাচ কী রকম প্রিয় ছিল। কারো কাছে এ ছিল আনন্দ আহরণের মাধ্যম, কারো কাছে নিজস্ব মতামত বা আদর্শ প্রচারের মাধ্যম। এবং কেউ কেউ এ পুতুলনাচের মাধ্যমে জীবনের যা কিছু অন্যায়, যা কিছু অসঙ্গতিকারক তাদের বাদ করতেন। গ্যেটে ত কিশোর কাল থেকে বরাবর পুতুলনাচকে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং এ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছিলেন। তলস্টয়ের প্রথম দিকে এবিষয়ে খুব আগ্রহ দেখাননি বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে নিজের আদর্শ এবং বক্তব্য প্রচারের বড় এবং প্রিয় মাধ্যম বলে গ্রহণ করেছিলেন পুতুলনাচকে। পুতুলনাচের সাহায্যে আদর্শ প্রচার করেওছিলেন। আরিস্টিফিনিস, প্লেটো, মাইকেল এঞ্জেলো, সেক্সপীয়র, মলিয়ের, আনাতোল ফ্রাঁ, বার্নাডশ' প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত মনীষীদের জীবনে এ পুতুলনাচের প্রিয় আসন ছিল। এর থেকেই এটা স্পষ্ট হয় যে, শুধু আনন্দদানই এর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তা যদি হত, তবে এরকম বহুল প্রভাব প্রদর্শন করতে কখনো সমর্থ হত না এ পুতুলনাচ-শিল্প। লোকশিক্ষাদান এবং বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণকে সজাগ করে তোলা-ও এ শিল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

এবার সংক্ষেপে পুতুলনাচশিল্পের ক্রমবিকাশের ধারাটিকে লক্ষ্য করা যাক।

ঠিক কবে কীভাবে এ পুতুলনাচের উদ্ভব হয়েছিল, এসম্পর্কে ছড়ানো ছিটানো তথ্যগুলো থেকে জানা যায় মানুষের সভ্যতার প্রথম থেকেই এর উৎপত্তি। নাট্যশিল্পের মতই এর আবির্ভাব ধর্ম প্রতিষ্ঠান-গুলোতে। পশ্চিমী জগতে এর উৎপত্তি সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তাতে দেখা যায় কুমারী মেরীর প্রতিমূর্তিগুলোর অবিকল প্রতিচ্ছবি করে তৈরী পুতুলই সর্বপ্রথম জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ঘরে ঘরে এ পুতুলগুলো বাড়ির লোকজনের হাতে হাতে ঘুরতে থাকত। এজন্যে এর নামকরণ হয়েছে সেখানে, 'ম্যারিওনেট'।

পশ্চিমীজগতের আগে চীন, গ্রীস, মিশর, রোম এবং ভারতে-ও পুতুল শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছিল। পুতুল শিল্পই হল পুতুলনাচ শিল্পের গোড়ার কথা।

পুতুলকে নাচানো বা পুতুলের হাত উঁচুনীচু করানো, মাথা এদিক ওদিক ঘোরানো—এগুলোর শুরু হয়েছে কোথায় প্রথম এসম্পর্কে কোন স্থির তথ্য জানা না গেলে-ও অনুমানে বোঝা যায়, চীনদেশেই এটা সর্বপ্রথম সম্ভব হয়েছে। বিভিন্নভাবে পুতুলের নতুন চঙ্গন সম্ভব করা হয়েছে, যেমন উত্তাপের

সাহায্যে ধাতুর বিস্তার দ্বারা, তারের সাহায্যে, রজ্জুর সাহায্যে। সেখানে এত সুন্দরভাবে মূর্ত্তিগুলো তৈরী হোত এবং এরকম আশ্চর্যজনক দক্ষতার সাথে মূর্ত্তিগুলোর আন্দোলন করতেন 'অপারেটররা' যে লোকের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাত যে ভগবৎ অনুপ্রেরণায়ই বুঝি এগুলো নড়ছে চড়ছে।

বাষ্পীয়শক্তির সাহায্যে-ও পুতুলগুলোকে প্রয়োজনমত নড়ানো চড়ানোর একটা অধ্যায়-ও পাওয়া যায় এ ক্রমবিকাশের ধারায়।

বাজারে এবং গ্রাম্যমেলায় পুতুলনাচের প্রদর্শনী আগে খুব হত। পুতুলনাচের উৎপত্তিকাল থেকেই এ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রথম প্রথম পরিচিত কাহিনী এবং রূপকথাগুলোকে প্রতিফলিত করা হোত। তারপর এর উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা দেখে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বাড়লো এবং এ শিল্পের কর্ত্তারা শুধু লোকরঞ্জনের পথ ছেড়ে লোকরঞ্জনের মাধ্যমে লোকশিক্ষার দিকে নজর দিলেন। সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং ব্যক্তিবর্গ যেমন রাজা-রাণী, খ্যাতিমান কর্ম-সংগ্রাহক অথবা সমাজনিন্দিত ব্যক্তিদের 'প্যারডি' করা হত পুতুলনাচের মাধ্যমে।

চলচ্চিত্র শিল্পের উৎপত্তির পূর্ব পর্যন্ত এ পুতুলনাচ শিল্পই ছিল সর্বজনপ্রিয় শিল্প। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রাম্যমাণ পুতুলনাচের দল আনন্দদান, লোকশিক্ষা বা সমাজবিপ্লবের বিভিন্ন ভূমিকা নিয়ে যেতেন। তাঁরা কোন বাধা হয়নি কোনদিন দর্শকদের কাছে।

মধ্যযুগের পূর্বে কিছুদিন অন্ধকার যুগ ছিল এ শিল্পের। কারণ, প্রবল ধর্মান্ধতাই অন্ধকার যুগ এনে দিয়েছিল। চার্চের কর্ত্তারা প্রচার করতেন, এ শিল্পের কারিগর বা চালকদের সাথে শয়তানের যোগ আছে। এমন অনেক ঘটনাও লিপিবদ্ধ আছে, বহু 'শোম্যান' বা চালককে পুড়িয়ে মেরা হয়েছে এ অপরাধে।

বলতে গেলে প্রাচ্য দেশগুলোতেই এ পুতুলনাচশিল্পের চরম উৎকর্ষ অর্জিত হয়েছিল। বিরল-গুণ কাঠ, পরিমার্জিত গজদন্ত এবং মূল্যবান প্রস্তর দিয়ে যে মূর্ত্তিগুলো প্রাচ্যদেশে তৈরী হোত। বস্তুতঃপক্ষে পশ্চিমীদের দৃষ্টিকে ছাড়িয়ে যেত সূক্ষ্ম অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন প্রাচ্যদেশীয় শিল্পরস। মূর্ত্তিগুলোও তাই এমি লাবণ্য এবং অনিন্দ্যসুন্দর মানুষীমাখা হত। পশ্চিমী মেজাজ এবং প্রাচ্য মেজাজ যেহেতু একরকমের নয়, সেহেতু মূর্ত্তিগুলোর মধ্যে ফুটে ওঠা ভাবগুলোও তেমি তফাৎ হোত। প্রাচ্যমূর্ত্তি হত বিনম্র, শান্ত, লাজুক, অন্যদিকে পশ্চিমী মূর্ত্তি হত অতিরিক্ত উদ্ধত, সপ্রতিভ, অতিরিক্ত চতুর।

জড়, স্থির যেহেতু কোনকালেই ছিলনা পুতুলনাচশিল্প, সেহেতু সময়ের অগ্রগতির সংগে সংগে এ-ও থেমে থাকেনি। এর-ও গতি আছে, এরও বৈচিত্র্য জন্মাচ্ছে, উৎকর্ষ বাড়ছে। এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে পুতুলনাচ-শিল্পও দিন দিন তার ক্রমউন্নতির দ্বারা অন্যান্য শিল্পের সংগে পাল্লা দিতে এগিয়ে চলেছে।

———

॥ পুতুল-নাচের রঙ্গ : জার্মানীর মঞ্চে ॥

নির্মলেন্দু মাল্লা

পুতুলের অভিনয় চলেছে মঞ্চে, অদৃশ্য শিল্পীর আঙুলের ইশারায় তারা নাচছে, হাত নাড়ছে, মাথা দোলাচ্ছে।

কে বলবে পুতুলওয়ালা গরীব, সে জার্মানীর রঙ্গমঞ্চে ঘুরে বেড়ায়! কী চমৎকার পোষাক পরিচ্ছেদে পুতুলগুলোকে, সোনা রূপো সিল্কের ছড়াছড়ি, আর কী জীবন্ত মনে হচ্ছে ওদের, মুখ চোখ যেন কথা কইছে।

একটি মুগ্ধ বালকের দৃষ্টির সম্মুখে এক অপরূপ জগতের চিত্র মেলে আসে, ওরা আর পুতুল নয়, ওই তো ডক্টর ফাউস্ট, ওইতো মেফিস্টোফেলিস, পুতুল বলে অবজ্ঞা করার কিছু নেই, অত্যন্ত গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে অভিনয় চলেছে, নাটকের নাম : ডক্টর ফাউস্ট। না-না ও অভিনয় নয়, ওইটেই জীবন-গভীরের সার কথা।

মুগ্ধ বালকটির মর্মে গেঁথে গেল সেই পুতুল-নাচ আর পঞ্চাশ বছর পরে সেদিনের সেই কিশোর দ্রষ্টা পরিণত প্রজ্ঞায় রচনা করলেন বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য রত্ন ডক্টর ফাউস্ট।

মহাকবি গ্যয়টে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন নিজ জীবনে পুতুল-নাচের প্রভাবের কথা।

বহু শতাব্দী ধরে মানুষকে আনন্দ দিয়ে আসছে এই অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পকর্মটি। চিত্রশিল্পের মতই সর্বজনীন এর ভাষা। রাজপ্রাসাদ থেকে দরিদ্রের আঙিনা—সর্বত্র এর সমান আনন্দআসর।

পুতুল-নাচের দীর্ঘ ইতিহাস এবং ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে জার্মানীতে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই পুতুল-নাচের মাধ্যমে প্রমোদ বিতরণ পর্ব বেশ সুরু হয়ে যায় দেশের নানাস্থানে। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ নবজাগরণের যুগে পুতুল-নাচ এবং অভিনয়-মঞ্চ সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বস্তুতঃ পুতুল-নাচ সমগ্র নাট্যশিল্পের একটা শাখা হলেও একে কখনোই লঘুভাবে গ্রহণ করেনি জার্মানী। শিক্ষায়, আনন্দদানে এবং শিল্পকর্ম হিসেবে এর গুরুত্ব বহুকাল ধরেই স্বীকৃত। বিশ্বযের কথা ষাটোক এবং রেণেসাঁস-এর যুগে পুতুল-অভিনেতার সঙ্গে রক্তমাংসের অভিনেতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত—কে বেশি দর্শকদের চিত্ত জয় করতে পারে। দুশো বছর আগে পুতুল-নাচের দরিদ্র শিল্পী জার্মানীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াত, রঙ্গমঞ্চের শিল্পীর সমান ছিল তাদের যোগ্যতা এবং মর্যাদা। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের মতই পুতুল-নাচের মঞ্চে জটিল প্রটিল এবং জাঁকজমকে ভরা নাটক অভিনীত হত। ক্রমে শাসক, জনসাধারণ এবং প্রতিভাধর নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতার চেষ্টায় ও সংযোগিতায় জার্মানীর রঙ্গমঞ্চ এগিয়ে গেল বহুদূর, পুতুল-নাচ রয়ে গেল লোক-শিল্পের নিদর্শন হিসেবে। এ হয়ে উঠল সাধারণ মানুষের থিয়েটার, জনগণের নাট্যক্ষেত্র।

দরিদ্র শিল্পী জীপসীর মত এখানে ওখানে ঘুরতে লাগল, কখনো কখনো দুটো পয়সার আশায় জার্মানী পেরিয়ে চলে গেল সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সুইডেন, এমন কি আমেরিকায়। অন্য দেশের পুতুল-নাচের দলও জার্মানীতে আসতে লাগল, তারা এল ইটালী, ফ্রান্স,

অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ থেকে। জার্মানী ইয়োরোপের মধ্যবিন্দুতে বিভিন্ন দেশের শিল্পধারার একটি অনুপম মিলন তথা মিশ্রণকেন্দ্র হয়ে উঠল আর এখান থেকেই উদ্ভব হল পুতুল-নাচের নতুন ভাবধারা, নতুন আঙ্গিক, নতুন শিল্পকর্ম।

জনসাধারণের দ্বারা গঠিত এবং জনগণের জন্য এই অভিনয়শিল্পটি ধনী এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের আসরেও সমান আদর এবং মর্যাদা পেয়েছে। আমাদের দেশে জমিদার যেমন পুতুলের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ করতেন তেমনি জার্মানীর ধনাঢ্য সম্প্রদায় পুতুল-নাচের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করতেন খেয়ালখেয়ার বাসনা চরিতার্থ করতে। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ম্যানহাইমে যে পুতুল-নাচের মঞ্চটি নির্মিত হয় তার পেছনে ছিল প্যালেটিনেট বাহিনীর পদস্থ কর্মচারীদের পরিকল্পনা। তার প্রায় কুড়ি বছর পরে ম্যানহাইমের রাষ্ট্রপরিষদের প্রধান মন্ত্রী Franz Albert Graf von Oberdroff একটি ম্যারিওনেট থিয়েটার রেখেছিলেন নিজের কাছে। আধুনিক ১৮৪০ সালে ব্যাভেরিয়ার সম্রাট Ludwig পুতুলের অভিনয় দেখতে সপার্ষদ আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন লেফটেন্যাণ্ট-জেনারেল Carl Wilhelm Freiherr von Heideck-এর।

জার্মানীর বহু বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনে অম্লান হয়ে রয়েছে পুতুল-নাচের স্মৃতি। কৈশোরে ফ্রেডরিক শিলার তাঁর বোন ক্রিস্টোফাইনের সঙ্গে মিলে স্বরচিত বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় দেখাতেন পুতুলের মাধ্যমে। মহাকবি গ্যয়টের প্রথম নাট্যপ্রচেষ্টা এই পুতুল নিয়েই, তিনিও তখন কর্ণেলিয়ার সংযোগিতায় পরিচালনা করতেন ছোট্ট থিয়েটার। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে গ্যয়টে তাঁর পুত্র অগস্টাসকে উপহার দেন একটি পুতুল-নাচের মঞ্চ। তিনি এবং তাঁর প্রাক্তন সচিব উভয়ে মিলে তৈরী করেন এর দৃশ্যপট। জার্মানীর বিখ্যাত সুরকার রিচার্ড ভ্যাগনার-এর বাড়ীতে যখনই কোনো উৎসব হত তখনই সুরু হত পুতুলের অভিনয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রঙমঞ্চের ছবি প্রথম ছেপে বেরোয় আর তারপর থেকেই লোকে একটা নতুন জিনিষ গ্রহণ করতে সুরু করে, সেটি আর কিছুই নয়—প্রিয়পরিজনকে নিয়ে ছোট্ট করে নিজেদের মধ্যে পুতুলের মঞ্চাভিনয়। Fuentes, Sobinkel এর মত শিল্পীদের আঁকা চমৎকার সব ছাপা দৃশ্যপট, আর চরিত্রগুলিও আঁকা রয়েছে, অতএব ছোট্ট মঞ্চ তৈরীর হাঙ্গামা কম, আনন্দ প্রচুর।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে একটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটল। ঐ বছর জোসেফ লিওনহার্ড শ্বিড মিউনিকের ছোট্ট Heidock থিয়েটারটি কিনে নিয়ে প্রথম স্থায়ী পুতুল-নাচের মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করলেন। এই শিল্পটির ইতিহাসে এক অরণীয় আন্দোলন সুরু হল। জার্মানীতে এবং অন্যান্য দেশে পুতুল-নাচের মঞ্চ গড়ে উঠতে লাগল। কৃতজ্ঞ দেশবাসী সেজন্যে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিকের একটি রাস্তা করেছে শ্বিডের নামে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পল ব্রান্ যে মিউনিক আর্টিস্টস্ পাপেট থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করলেন তাতে অভিনীত হতে লাগল মেটারলিঙ্ক, গোলসার, মলেয়ার ও গ্যয়টের মত বিশ্ববন্দিত লেখকবৃন্দের নাটকসমূহ। "Literary Puppet Theatre"-এর জন্ম হল্। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিকে যে "Solln Puppet Theatre" প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রচার সুদূর আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। জার্মানীর পুতুল-নাচকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছে আর একটি প্রতিষ্ঠান—The Baden-Baden Artists' Puppet Theatre. এটি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। Ernst Eblert-এর সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে এর শিল্পিবৃন্দ নৃত্যশিল্পের অন্যতম বিশিষ্ট কেন্দ্র জাভার পর্যন্ত পুতুল-নাচ দেখিয়ে পর্যাপ্ত প্রশংসা অর্জন করেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর নবসৃষ্টির সাধনায় তৎপর হন জার্মানীর শিল্পীগোষ্ঠি। অভূতপূর্ব উৎকর্ষ লাভ করে এই শিল্পটি, আর এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে এই সময়কে জার্মান পাপেট থিয়েটারের নব-জাগরণের কাল বলা যেতে পারে। পূর্বে হাতে নাচিয়ে পুতুলগুলি যেখানে ছত্র পাক ও ছুতির প্রদর্শনীতে। এই জিনিষটাই নতুন শিল্পীর হাতে পড়ে আরো সজীব ও রূপময় হয়ে উঠল। ১৯১৯ সালে Karl Iwowski চরিত্রগুলির মধ্যে অনেক বেশি অ্যাকশন সৃষ্টি করলেন। ১৯২১ সালে Max Jacob যে "Hartenstein Puppets" (পরবর্তী কালে এর নাম হয় "Hohnstein Troupe") প্রতিষ্ঠা করেন তাই এখন পর্যন্ত পুতুল-নাচের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হয়ে আছে।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'পাপেট থিয়েটার' নামে জার্মানীতে পুতুল-নাচের ওপর প্রথম সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। গবেষকবৃন্দ এগিয়ে এলেন, অভিনীত নাট্যগ্রন্থ সংগৃহীত হল, অতীতের অভিনেতা-অভিনেত্রী অর্থাৎ পুতুলগুলি সংরক্ষণের উদ্যম জেগে উঠল, অভিনয় সংশ্লিষ্ট সমস্তরকম কাগজপত্র জোগাড়ের চেষ্টা হতে লাগল। পুতুল-নাচ সংক্রান্ত সম্মেলন চলল ম্যাগডেবার্গে (১৯২৭ খ্রী:), ব্যাডেন-ব্যাডেনে (১৯২৮-খ্রী:) ও আইসেনাকে (১৯৩১ খ্রী:)। ১৯২৯-এ প্রাগে যে International Marionette Union (UNIMA) প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে জার্মানীর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৩৭-এ প্যারিসের বিশ্বপ্রদর্শনীতে জার্মানীর পুতুল-নাচ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। পুতুল-নাচের মাধ্যমে দেশসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৬ সালে জার্মান ফেডারেল প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট শিল্পী হ্যান্স ত্যাকংকে প্রথম শ্রেণীর ফেডারেল ক্রশ অব মেরিট-এ ভূষিত করেন।

আজকের জার্মানীতে পুতুল-নাচের নতুন অধ্যায় সুরু হয়েছে। স্কুলে, কলেজে, কারিগরী বিদ্যালয়ে, ক্লাবে, এমন কি হাসপাতালে, স্যানাটোরিয়ামে নাচের মঞ্চ স্থাপিত হচ্ছে। ধর্মশিক্ষা দানের জন্য এর উপযোগিতা গির্জাতেও স্বীকৃত। সামাজিক আন্দোলনে যেমন শত্রুশেষ নিবারণের উদ্দেশ্যে দেশবাসীকে সচেতন করার জন্যে পুতুল-নাচের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। সেখাদেখি বিজ্ঞাপনদাতারাও পুতুল-নাচের মাধ্যমে আপন-আপন পণ্যের গুণাগুণ কীর্তনে মেতেছেন।

নাচের পুতুলের সংগ্রহালয় গড়ে উঠছে আজকের জার্মানীতে। পাপেট থিয়েটারের বৃহত্তম সংগ্রহকারী হিসেবে তো নাম কিনে ফেলেছেন Walter Bobler. ১৯৩০ সাল থেকে Diehl Brothers-এর স্টুডিয়োতে পুতুল-নাচের চলচ্চিত্র তৈরী হচ্ছে। বর্তমানে পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের সঙ্গে রঙীন চলচ্চিত্রও নির্মিত হচ্ছে। টেলিভিশন তো এ শিল্পটির সম্মুখে অভাবিত সুযোগ এনে দিয়েছে।

বহু নামী-অনামী শিল্পীর জীবনব্যাপী কঠোর সাধনায় জার্মানীর পুতুল-নাচের ঐতিহ্য ও গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত। পুতুল-নাচের পীঠস্থান আজকের জার্মানী।

॥ চেকোশ্লোভাকিয়া ॥

জয়া রায়

চেকোশ্লোভাকিয়ায় জনপ্রিয় আনন্দদায়ক শিল্প বলেই শুধু নয়, শিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে পুতুলনাচ-শিল্পও বিবেচিত হয়।

এখানকার এ শিল্পের ঐতিহ্যকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। অনেকটা ফরাসীদের মত। (১) ভ্রাম্যমান শিল্পীসমাজ। এঁরা গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে লোকদের আনন্দ দিয়ে বেড়ান। তারপর তৈরী হল Puppet Theatre। জোসেফ স্কুপা (১৮৯৩-১৯৫৭) তাঁর নিজের পুতুল তাঁড় Kasparel-এর সাহায্যে অষ্ট্রো হাঙ্গেরীয়ান রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপকর বক্তব্য করে জনসাধারণকে আকর্ষণ করে। আস্তে আস্তে তাঁর প্রভাব সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্কুপাই প্রথম পেশাদারী থিয়েটার স্থাপন করেন।

চেকোশ্লোভাকিয়াতে এ বিষয়ে দু'জন প্রধান ব্যক্তির অবদান অনস্বীকার্য। অধ্যাপক জেসেলির এবং ডঃ জান মালিক। অধ্যাপক জেসেলি পুতুলনাচ-শিল্প বিষয়ে গবেষণা করছেন এমন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান Union Internationale des Marionnettes-এর প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। এর প্রধান কেন্দ্রস্থল হচ্ছে প্রাগ।

ডঃ জানমালিকও এ পুতুলনাচ-শিল্পে আরেকজন কৃতী পুরুষ। তিনি থিয়েটারের পরিকল্পনা করেছেন বহু। তিনি প্রযোজকৌশল সম্পর্কেও যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। তার দৃশ্যপট পর্যন্ত নির্বাচনে তিনি তার নজর দিয়েছেন। আবার নাটক-ও লিখেছেন একটি। বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় নাটক 'The Little Football'।

Unima বা Union International des Marionnettes এর প্রথম যুদ্ধোত্তর অধিবেশন বসে প্রাগে ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। যুদ্ধের সময় যখন দেশ বিধ্বস্ত হবার মুখে তখন ডঃ মালিক সযত্নে Unima-র সংগ্রহগুলোকে রক্ষা করেন। তিনি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করেন। ডঃ মালিকের এ শিল্পনিষ্ঠা সত্যিই অনুকরণীয়। পৃথিবীর এ শিল্পের বড় পৃষ্ঠপোষক এবং গবেষকদের মধ্যে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে; প্রাগের ১৯৫৭ সালের অধিবেশনে ষোলটি দেশের প্রতিনিধি যোগ দেন। পাঁচটি ভাষায় অধিবেশনের বিবরণী প্রচার করা হয়। এ আন্তর্জাতিক অধিবেশনের আবহাওয়া রাজনীতিমুক্ত ছিল।

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিখ্যাত শক্তিশালী বস্তুবিশ্বে এ শিল্পকে সেখানে নূতনভাবে অনুশীলন করা হচ্ছে। Masaryk Institute-এ এ সম্পর্কে বিশেষ গবেষণা করা হচ্ছে। এ ইনষ্টিটিউটের কাজগুলো হচ্ছে: গ্রন্থাগারের জন্য বই প্রকাশ করা, সঙ্গীতের উন্নতিসাধন, শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধন, চলচ্চিত্র শিল্পের মান বাড়ানো, অভিনয় কৌশলকে সমৃদ্ধ করা।

১৯৪৮ সালের Theater Act-এ সরকারী ভাবে এ শিল্পের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। শিল্পকলার অন্যান্য শাখার সংগে সমান মর্যাদা দিয়ে পুতুলনাচ-শিল্পের দিন দিন বিকাশসাধনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এই আইনে।

এখন সেখানে দশটি পেশাদার থিয়েটার আছে। এগুলোর মধ্যে Central Puppet Theatre এবং The Spojbl and Hurvinek Theatre উল্লেখযোগ্য। দুটোই প্রাগে অবস্থিত। পরের থিয়েটারটি জোসেফ স্কুপার সংগে তাঁর স্ত্রী মাধাম স্কুপা পরিচালনা করেছিলেন। এখন স্বামীর অবর্তমানে তিনি নিজে পরিচালনা করছেন। আরেকটি উল্লেখযোগ্য থিয়েটার হল Radost Puppet Theatre। এটা Brno-এ অবস্থিত।

সারা দেশে ছোটখাটো ১০০০ অপেশাদার থিয়েটার আছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার আজ পুতুলনাচ শিল্প সরকারী মর্যাদায় নূতন মূল্য অর্জন করেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর পুতুলনাচ-শিল্পের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে আলোকবর্তিকাস্বরূপ দাঁড়িয়ে থাকবে।

॥ মস্কোর রাষ্ট্রীয় পুতুল নৃত্যনাট্যশালা ॥

অমল ভৌমিক

মস্কোর কেন্দ্রস্থলে ভ্লাদিমির মায়াকোভ্স্কি স্কয়ারের নিকটে একটি সাদাসিধা বাড়ির দেওয়ালে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা আছে "পুতুল-নৃত্যনাট্যশালা"। এই বাড়িতে বিভিন্ন রকমের দুই হাজার পুতুল "বসবাস" করে। ইহাদের মধ্যে কেহ বা ছোট মেয়ে, কেহ বা শয়তানের মতো চেহারার পাকামাড়িওয়ালা বুড়ো। আবার হরেক রকমের জন্তুজানোয়ারও ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে: হরিণ, বানর, খরগোস; আর আছে গোসাপ মতো চোখ আর বড়ির মতো নাকওয়ালা মজার চেহারার খুদে খুদে মানুষ। প্রত্যেকেরই চেহারার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছে তাহার নিজস্ব চরিত্র, প্রকৃতি আর মানসিক প্রবণতা।

এই বিচিত্র জগতে সবটুকুরই সৃষ্টি হইয়াছে "সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের জনশিল্পী" উপাধিধারী প্রতিভাবান সেরগেই ওব্রাজ্‌ৎসভের অদ্ভুতরস কল্পনাশক্তি হইতে। ওব্রাজ্‌ৎসভ ষ্টেট সেণ্ট্রাল পাপেট থিয়েটারের প্রধান পরিচালক এবং সোবিয়েৎ পুতুল-নাচের অবিসংবাদী নেতা। ওব্রাজ্‌ৎসভ-পরিচালিত এই পুতুল-নৃত্যনাট্যশালায় শিল্পকৌশলের মধ্যে সৃষ্টি সৌন্দর্য, উচ্চাঙ্গের শিল্পরুচি ও পরিচ্ছন্ন সহজবোধ্যতার সমন্বয় ঘটিয়াছে। ইহারই ফলে এই পুতুল-নাচ ছোট-বড়ো সকলের নিকটেই সমাদৃত হইয়াছে।

সব বয়সের, সব রকমের দর্শক আসে এই পুতুল-নাচ দেখিতে। ইহার প্রতিষ্ঠার দিন হইতে আজ পর্যন্ত এই কেন্দ্রীয় পুতুল-নৃত্যনাট্যশালায় প্রায় ২০ হাজার অনুষ্ঠান হইয়াছে এবং প্রায় ৯০ লক্ষ নরনারী, শিশু ও কিশোর-কিশোরী পরম আগ্রহের সহিত অনুষ্ঠান দেখিয়াছেন। লণ্ডন আর প্যারিসের সহরে রুচিসম্পন্ন দর্শক এবং সাইবেরিয়ার সুদূরতম গ্রামের দর্শক একই আগ্রহ ঔৎসুক্য লইয়া ওব্রাজ্‌ৎসভের পুতুল-নাচ দেখিয়া সমান আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

এই পুতুল-নাট্যশালার মন্তব্য-পুস্তকে যেসব মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে তাহা হইতেই ইহার জনপ্রিয়তা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। যেমন, একটি অনুষ্ঠান দেখার পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লিখিয়াছেন: "আমার জীবনে এই সন্ধ্যাটি রমণীয়তম সন্ধ্যাগুলির মধ্যে একটি। এমন আনন্দময় একটি অনুষ্ঠানের কথা আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই। ইহা এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।" বিখ্যাত ফরাসী চলচ্চিত্র অভিনেতা জেরার ফিলিপের মন্তব্যটুকু সংক্ষিপ্ততর কিন্তু কম প্রশংসাসূচক নহে: "ইহা যে একটি নিখুঁত অনুষ্ঠান হইবে তাহা আমরা আগেই জানিতাম, কিন্তু দেখিবার সময়ে আমরা রীতিমত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ধন্যবাদ।"

"মৃগরাজ", "অদ্ভুতপুরী ঐকতান", বিবাহ-বিভ্রাট", "শয়তানের কল", প্রভৃতি নাটক যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিয়াছেন, ওব্রাজ্‌ৎসভের পুতুলগুলি সাধারণ পুতুল নয়, মানব-অন্তরের সকল অনুভূতিই ইহারা প্রকাশ করিতে সক্ষম। পুতুল-নাচের সকল বৈশিষ্ট্য ও সকল সম্ভাবনা সেরগেই ওব্রাজ্‌ৎসভ বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

ওব্রাজ্‌ৎসভ প্রথমে পুতুলনাচের ব্যঙ্গ ও কৌতুকের দিকটাই গ্রহণ করেন। ইহার প্রেরণা তিনি পাইয়াছিলেন প্রাচীন রাশিয়ার "পেত্রুশ্‌কা" পুতুল নাচওয়ালাদের নিকট হইতে। ইহারা হাট-বাজারে মেলায় লম্বা নাকওয়ালা "পেত্রুশ্‌কা" পুতুলের নাচ দেখাইয়া বেড়াইত।

ওব্‌রাজ্‌ৎসক তাঁহার পুতুলচরিত্রগুলিকে যাদু ও রূপকথার কাব্যময় জগতে ব্যবহার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, সর্বকালের ও সর্বজাতির লোক-কাহিনীর যথোপযোগী নায়ক-নায়িকা হইতে পারে এই সব পুতুলগুলি। পুতুল-নাচের জন্তুগুলির চরিত্র খুবই উপভোগ্য। কিপ্‌লিং-এর বিখ্যাত রচনা "জাংগ্‌ল্‌ বুক"-এর ভিত্তিতে রচিত "মৌগ্‌লির কাহিনীর" বাঘ, শিয়াল, নেকড়ে, ভল্লুকবাঘ, সবই অপূর্ব। কখনো বা ওব্‌রাজ্‌ৎসক পুতুলদের মধ্যে জীবন্ত অভিনেতা ঢুকাইয়া নূতন ধরণের উপভোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করেন। যেমন, "বুট-পায়ে পুশি" নামক শিশুদের নাটকের মেয়ে এবং "রাজহাঁস" নাটকের ছোট্ট মেয়েটি পুতুল নয়, সত্যিকার অভিনেতা।

এতকাল লোকে মনে করিত, পুতুল কৌতুকাভিনয় করিতে পারে, প্রেম, বীরত্ব, প্রভৃতি মানবসুলভ অনুভূতি ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। ওব্‌রাজ্‌ৎসক কিন্তু এই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন মহৎ অনুভূতিগুলিও পুতুলের মারফতে সুস্পষ্টভাবে রূপায়িত হইতে পারে, কাব্যময় হইয়া উঠিতে পারে। তাঁহার "আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ" নাটকটিই তাহার প্রমাণ। আরব্য রজনীর সুপরিচিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই পুতুল-নাচটি গত ১৫ বৎসর যাবৎ অনুষ্ঠিত হইতেছে। তবু ইহা পূর্বের মতই জনপ্রিয়। সম্প্রতি মঞ্চস্থ "সুখের সন্ধানে হাসান" নাটকটি ওব্‌রাজ্‌ৎসকের শিল্পরূপের কাব্যময় রোমান্টিক দিকটিতে অব্যাহত রাখিয়াছে ও আরও উন্নত করিয়া তুলিয়াছে।

মস্কোর এই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পুতুল-নূতনাট্যশালা গত বৎসর ইহার প্রতিষ্ঠার পঞ্চবিংশ বার্ষিকী উদ্‌যাপন করিয়াছে। এই পুতুল-নূতনাট্যশালা মস্কোর রঙ্গমঞ্চ-জগতের গৌরব। এই পুতুল-নাচ প্রতিষ্ঠানে অনেক প্রতিভাবান অভিনেতা, পরিচালক, শিল্পী ও নিজস্ব নাট্যকার আছেন। সকলেই পরম উৎসাহী এবং সকলেই শিক্ষালাভ করিয়াছেন ওব্‌রাজ্‌ৎসকের নিকট হইতে।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি ছোট্ট ঘটনা……

ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত লেখক অস্কার ওয়াইল্ড গিয়েছেন আমেরিকা ভ্রমণে। তাঁকে যথারীতি শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের সম্মুখীন হতে হল।

একজন কর্মচারী তাঁদের সরকারী ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, ঘোষণা (Declare) করবার মত কি কি জিনিস আপনার সঙ্গে আছে বলুন।

অস্কার ওয়াইল্ড উত্তর দিলেন, একমাত্র প্রতিভা ছাড়া আর কিছুই ঘোষণা করার মত সঙ্গে আমার নেই।

ফ্রান্স

বন্দনা পাল

পুতুলনাচ শিল্প-চর্চায় ফরাসীদের ইতিহাস খুবই গৌরবজনক। সূক্ষ্ম কারুকলা, শিল্পকলা, জীবন-চর্চার নমনীয় এবং লাবণ্যময় ক্ষেত্রগুলোতে ফরাসীদের দাবী অন্যান্য ইউরোপীয়দের চেয়ে সর্বাগ্রে মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। পুতুলনাচশিল্পেও এর্ত পিছিয়ে থাকবেন, এটা ভাবতে যাওয়াটাই অযৌক্তিক। একটা গৌরবময় ঐতিহ্য ফরাসীরা তৈরী করেছেন এ শিল্পে।

আধুনিক অর্থে ফরাসীদের তৈরী হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে। ভ্রাম্যমাণ সঙ্গীতকুশলীর দল গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে এমন সময়গুলোতে পুতুলনাচ অভিনয়ের দিকে জনসাধারণকে টানলেন। একে ফরাসীরা বলেন, 'Marionnette a'la planchette'। প্রচুর জনসমাগম হত এ ধরণের প্রদর্শনীতে। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও এর চলন ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আরো এক ধাপ উন্নতির দিকে এগিয়ে গেল ফরাসীদের এ শিল্পকৌশল। Briocbes'-এর 'পাঞ্চ' পুতুল নাচ এ সময় প্যারিসের Pont Neuf-এ প্রদর্শিত হয়। La Grille-র যষ্টি-সমন্বিত পুতুলনাচ-ও এ সময় দেখা যায়। এটা এত বেশি সফল হয়েছিল যে, খোলা ময়দানে প্রদর্শনীর দাবী জানাতেন আসল অভিনেতারা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যযুগ পর্যন্ত ফরাসীদেশে এ পুতুলনাচ অভিনেতারা প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তারপর কিছুদিন চলল সেখানে এর অন্ধকার যুগ। ছায়া-অভিনয় সে জায়গা দখল করল। এ ছায়া-অভিনয়েও পুতুলদের ব্যবহার করা হয়েছিল সাফল্যের সংগে। Dominique Séraphin-এর বিখ্যাত থিয়েটার এ ছায়া-অভিনয়ে পুতুলের ব্যবহার দক্ষতার সংগে করে পুতুলনাচ-শিল্পের সম্ভাবনা এবং তার অপরিহার্যতাকে প্রমাণ করলেন। তিনি ১৭৭৭ সালে ভার্সাইলে প্রতিষ্ঠা এবং পরে প্যারিসে নিজ থিয়েটারকে স্থানান্তর করেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে Glove puppet এবং Flat puppet-এর ছায়া অভিনয়ে ব্যবহারই ছিল মুখ্য। Nohant-এ জর্জ স্যাণ্ডের বিখ্যাত থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৭ সালে। ১৮৭২ সালের ভিতর এ থিয়েটার মঞ্চে হাজির করেন ১২০টি নাটক। Valmondois-এ গায়ক ডুপ্রের থিয়েটার এবং Lemercier De Neuville থিয়েটার এ শতকের প্রভাবশালী বলে বিখ্যাত। জর্জ স্যাণ্ডের Théâtre des Amis প্যারিসে জন্ম নিল। এ মহিলা শিল্পীর পুত্র মরিস-ও এবিভাগে নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেন।

এঁরা ছাড়াও Doranty এবং Henri Signoret ফ্রান্সের পুতুলনাচ শিল্পে নিজেদের মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করেন। তাঁদের Leboeff-এর সাহায্যে' দুরান্টি Tuileries Gardens-এ নিজের থিয়েটারকে একটি বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন। এটা হল ১৮৩১ সালের কথা। ১৮৬৩ সালের Lemercier de Neuville-এ সমোধিক ঘটনাবলী প্রধান ভূমিকা নেয়। এবিল খোলা, মঞ্চে প্রমুখের 'বিনিয়েতার' প্রতিনিধিত্ব করেন Lemercier। কবি Henri Signoret পুতুলনাচশিল্পের ক্ষেত্রে যিনে

বিভিন্নমুখের অল্পপরিচিত অথচ বেশ উচ্চমানের নাটকগুলোর পুনর্জাগরণের জন্য সংগ্রাম করেন। Galerie Vivienne-এ অবস্থিত Signorete-এর Petit Théâtre-এ মোলের বিখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিকরা সমবেত হয়েন।

উনবিংশ শতাব্দে আরো তিনজনের নাম উল্লেখযোগ্য। টমাস হলডেন, ডিকিনস এবং জন হিউগেট। শেষোক্ত দুজন দুভাই।

ফরাসীদেশের পুতুলনাচশিল্পের শিল্পীদের তিনভাগে ভাগ করা চলে। (১) ভ্রাম্যমাণ শিল্পীর দল। এরা মেলায় মেলায় বা রাস্তার ধারে যখন তখন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এ পেশা তাদের পারিবারিক। (২) পেশাদারী যারা স্থানীয় এবং পুরানো ট্রাডিশন মেনে চলেন। (৩) আধুনিক।

প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন Pajot-walter। এদের উৎপত্তি ধরা যায় ১৪০ বছর পূর্বে।

দ্বিতীয় শ্রেণী লিঁতে অবস্থিত Théâtre Guignol Mourguet-এর পরিচালক Pierre Neichthauser দ্বারা পরিচালিত। Amiens-এ Les Amis de Lafleur এবং Chez Cabotans-ও এ দলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন বহু দল। Maurice Temporal-এর Les Bonhommes Tempo, Jacques Chesnais-এর থিয়েটার, André Tabon-এর Compagnie ইত্যাদি আরো অনেক দল।

এখন সেখানে Poppet সম্পর্কে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাহিত্যিকরা, শিল্পীরা, প্রকাশকরা সবাই এখন পৃষ্ঠপোষকতা করতে এগিয়ে এসেছেন। দুটো সমিতি এবিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন ব্যাপকভাবে। এ দুটো সমিতি হল Compagnons de la Marionnette এবং Federation des Marionnettes Francaises। লিঁ শহরেও একটি সমিতি Association Nationale des Marionnettes বিখ্যাত পুতুলনাচশিল্পী Laurent Mourguet-এর কাজগুলো সযত্নে সংরক্ষণ করেছেন এবং এর উৎকর্ষ সাধনের জন্যে এখন পরীক্ষার কাজে স্থানীয় শিল্পীদের উৎসাহ দিচ্ছেন।

যখন গানের কলির মতো জীবন বয়ে চলেছে তখন সুখী হওয়া কতো সহজ! কিন্তু যখন সবকিছুই চলে আসিতে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে তখন সে-ই হোল মানুষের মতো মানুষ যে তার ওষ্ঠে ফুটিয়ে তুলতে পারে একটুখানি মৃদু হাসি।

—এলা হুইলার উইলকক্স, (ওয়ার্ল্ড হোরাইজ্‌ন্)।

॥ ইতালী ॥

সঙ্কর্ষণ রায়

রেণেসাঁর জন্মভূমি ইতালী। আধুনিক জীবনের শুরু রেণেসাঁর কাল থেকে। মানবপ্রত্যয় এক সুন্দর এবং সাত্তাই এক অভিনিষ্ঠ রূপ পেয়েছিল রেণেসাঁর সন্তানদের হাতে। সেই রেণেসাঁর জন্মদাত্রী ইতালী। শিল্প, সাহিত্য তথা মানব সভ্যতার সমস্ত ক্ষেত্রে ইতালী এক অবিনশ্বর স্থান অধিকার করে আছে।

দুর্ভাগ্য গ্রীসের যে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার স্থান যে অমূল্য এবং তাকে এড়িয়ে যে পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো রচিত হতে পারে না, এ তথ্য আজ অনেকেই মনে রাখেন না। সংস্কৃতির পুনর্জন্ম সাধন করে ইতালী গ্রীসের কাছে তার ঋণশোধের জন্যে চিরস্মরণীয়। আধুনিক যুগে অর্থাৎ মানবেতিহাসের মনুষ্যত্বের মূল্যবোধের অন্তর্নিহিত মহত্তাকাঙ্ক্ষাকে উজ্জীবিত রাখতে যে যুগ একেবারেই অসমর্থ হয়েছিল এবং ইতিহাসে যে যুগকে অন্ধকার যুগ বলা হয়, সে যুগের পরে আধুনিক যুগে ইউরোপে ইতালীই পুতুলনাচ-শিল্পক্ষেত্রে প্রধান এবং প্রথম অগ্রণী হলে-ও, আসলে গ্রীসের কাছে তার সে ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছিল। গ্রীস-বিজয় এবং রোমান সাম্রাজ্যের চরম শীর্ষাধিকারের সময় সে ঋণ ইতালী নিয়েছিল। প্রথমে বা পরে ঋণ গ্রহণ করলেই চিরকালই যে পাওনাদারের অধিগত হয়ে থাকতে হবে, তার কোন স্থির সত্য নেই। তাই ইতালীও হতে পেরেছিল পাওনাদার সমগ্র ইউরোপের কাছে। যেহেতু জার্মানী ঋণী ছিল ইতালীর কাছে এবং আমেরিকা যেমন ভগ্নেশে আগত জার্মানদের কাছে ঋণী, সেহেতু আমেরিকাও ছিল ইউরোপের সাথে সাথে ইতালীর কাছে ঋণবদ্ধ। ইতালী হতে পেরেছিল ইউরোপের নায়িকা পুতুলনাচ-শিল্পের ক্ষেত্রে। সংখ্যায় এবং বৈচিত্র্যে ইউরোপে পুতুলনাচে ইতালী এখনো সম্রাজ্ঞী। সেখানকার প্রতিটি প্রদেশে ভাষার বৈচিত্র্যের মতই পুতুলনাচ-শিল্পের ধরণ ধারণ-ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। শুধু ভৌগোলিক কারণেই বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়, বরং সমৃদ্ধ-ও।

প্রথম যুগীয় বিষয়সমূহ নিয়েই ইতালীর এ শিল্পের চর্চ্চা হোত, যেমন আর আর দেশে এমিভাবে হয়েছে। তারপর আস্তে আস্তে নাট্যকে ঘিরে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে নাট্যরূপ দেওয়া হয়, তেমি সে সমস্ত সামাজিক বিষয়গুলোর দিকে বিস্তারিত হল ইতালীর পুতুল-নাচ শিল্প।

ধর্মযুদ্ধ (crusade) নিয়ে রচিত বিষয়সমূহ ইতালীর পুতুলনাচ-শিল্প রূপ নিয়ে অত্যধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 'Orlando Furioso' এমি এক ধরণের নাটক। এটা এমনই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে আজো ইতালীর সহরে সহরে প্রদর্শিত হয়। এমনকি, আমেরিকার শহরগুলোর বিশেষীপ্রধান অঞ্চলগুলোতে এই নাটকটি আজো প্রদর্শিত হয় প্রবল সমারোহে। এই নাটকটি যুগ যুগ ধরে একটিমাত্র লাইন বা কোন ছত্র পরিবর্তিত না করে অভিনীত হয়ে চলেছে।

রাস্তার একপাশে প্রদর্শিত হওয়া Burratini প্রদর্শনী এ সময়ে খুব বেশি রকম আদৃত হয়েছিল। অর্থাৎ ব্যাঙ্গচিত্রে। বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোকে এ ধরনের প্রদর্শনী এমন মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি তাঁর মূল্যবান সময়ের খানিকটা অংশ ব্যয় করেছিলেন পরামর্শ দিয়ে বা ছোট ছোট পুতুলগুলোর

জন্তে পোষাক বা অবয়বগঠিত নানা বিষয়ে নূতন নূতন 'ডিজাইন' নির্বাচন করে দিতে। Polcinella এই বংশের Burratini নামীয় একটি পুতুলনাচ। এই পুতুলনাচে বেশ মজা এবং আনন্দ লুটে নিতেন বা নেন দর্শকেরা।

রেণেসাঁর সময়েও এ পুতুলনাচ-শিল্প বিস্তর বিকাশসাধন লাভ করেছিল। রেণেসাঁর বিখ্যাত শিল্পীদের তত্ত্বাবধানে পুতুলনাচ-শিল্পের বৈচিত্র্য যে খুলে গিয়েছিল, তেমি ইউরোপের অন্যান্য দেশের চেয়ে এ শিল্প অনেক বেশি মৌলিক উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

ইতালীর মধ্যে সিসিলিবাসীরা এ পুতুলনাচ-শিল্পে সবচেয়ে বেশি দক্ষ এবং এঁদের জেতরই চর্চ্চা সবচাইতে বেশি। পুতুলনাচ অভিনয় ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন মিলানের Teatro Cerolamo, টিউরিনের Teatro Gian duja, এবং রোমের Teatro dei Piccoli। মিলানের থিয়েটার কর্তৃপক্ষ ১৫০ বছর ধরে এর পৃষ্ঠপোষকতা করার পর এখন হল বন্ধ করে দিয়েছেন।

রোমের থিয়েটার দলটিতে আধুনিক রুচি এবং চিন্তার সংগে মিলিয়ে পুতুলনাচ-শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিত ভাবে। এটা স্থাপিত হয়েছিল ১৯১৩ সালে বিখ্যাত আইনজীবী, সাংবাদিক ডাঃ ভিট্টোরিও পেজ্রেকার দ্বারা। বিশ্বযুদ্ধে এই দলটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং যুদ্ধের পরে পুনর্গঠিত হয়েছে। এ দলটি ভ্রাম্যমাণ হয়ে বিভিন্ন দেশে পুতুলনাচের জেতর দিয়ে অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়ে প্রশংসা অর্জন করেছেন। ইতালীর আধুনিক পুতুলনাচ-অভিনয় ইতিহাসে ডাঃ পেজ্রেকার অবদান বহুদিন মনে থাকবে। এ বিষয়ে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ Cyril Beaumont এ দলটি সম্পর্কে সঠিক মন্তব্য করেছেন: "As the Teatro dio Piccoli toured the world it helped to revive interest in those countries when it had lapsed into decline, and created demand for knowledge about the art and its history, while the more enthusiastic members of the audience, charmed by their introduction to a new and unsuspected world of fantasy and charm, at once so real and so full of make-believe, burned with a resolve to found their own puppet theatres. So enthusiasm grew and the puppet, rejuvenated and perfected, was restored to full favour." (Puppet and Puppetry পৃষ্ঠা : ৭)।

আমি গরীব, আমার কেবলমাত্র আছে স্বপ্ন ;
তোমার পায়ের নীচে আমি ছড়িয়ে দিলাম স্বপ্নগুলি ;
আলতো পায়ে আস্তে হেঁটে যাও, কেননা আমার স্বপ্নের ওপর দিয়ে তুমি চলেছ।

—ডব্লু, বি, ইয়েট্‌স্,
বি হুথস্ অফ্ হেভেন্।

॥ ব্রিটেনের পুতুল-নাচ ॥

প্রসাদ চক্রবর্তী

পুতুল-নাচ চলছিল—বিষয় ছিল আদম ও ঈভের কাহিনী। সেদিনের দর্শকদের মধ্যে ছিলেন এমন একজন যাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করতে পুতুলের অভিনয়ই ছিল পর্যাপ্ত।

বিশ্বের অমর মহাকাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট' সৃষ্টির প্রেরণা মিল্টন লাভ করেছিলেন পুতুল-নাচ থেকে।

ব্রিটেনের ইতিহাসে এলিজাবেথের যুগ নানা কারণে স্মরণযোগ্য। সে যুগে পুতুল-নাচেরও প্রচলন ছিল সংস্কৃতিচর্চার অঙ্গ হিসেবে। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে একজন ইতালীয়ান পুতুল-নাচের শিল্পী লণ্ডনে অভিনয়ের আসর বসিয়েছিলেন। মহাকবি শেক্সপীয়র ও বেন জনসনের লেখায় পুতুল-নাচের উল্লেখ দেখা যায়। তখন মঞ্চের সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রদর্শক নাচের ব্যাখ্যা করতেন। নীতিমূলক কাহিনী বা চলতি ঘটনাই তৎকালে অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হত।

সম্রাট দ্বিতীয় চার্লস এবং তাঁর পারিষদবর্গ ছিলেন পুতুল-নাচের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বিখ্যাত ইতালীয়ান শিল্পী Antonio di Voto-কে সম্রাট স্বয়ং অনুমতি দিয়েছিলেন চেয়ারক্রসে অভিনয় দেখানোর জন্য। ডায়েরীতে এর প্রদর্শনীর প্রশংসা করেছেন জন ইভলিন্। আর একজন বিখ্যাত সিনেলিপি-লেখক স্যামুয়েল পেপস্ ৯ই মে ১৬৬৭ তারিখের ডায়েরীতে ইতালীয়ান পুতুল-নাচের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

স্পেক্টেটর এবং টাটলার পত্রিকায় যে সব পুতুল-নাচের উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে কোন এক মার্টিন পাওয়েল প্রসিদ্ধ। এর রঙ্গমঞ্চটি ছিল কভেন্ট গার্ডেনের পিটস্ পিয়াজ্জায়।

পরবর্তী শতকে পুতুল-নাচের অভিনেতা হিসেবে পিস্টার পাকের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। নাটকের আখ্যানভাগ ছিল অল্পই। চরিত্র থাকত চারটি: পাক, এর স্ত্রী জোয়ান, শয়তান এবং একটি ডাক্তার অথবা কনস্টেবল্। পরে চরিত্র সংখ্যা হয় ছোট।

পরবর্তী যুগে নাটকের কাহিনী গৃহীত হল Black-Eyed Susan, Maria Martin, Sweeney Todd প্রভৃতি মেলোড্রামা থেকে। এ যুগে প্রদর্শক হিসেবে Jewell-Holden, Tillers, Wilding, Clowes ও Clunn Lewis-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য এঁরা প্রচুর আকর্ষণীয় সহকারে অভিনয়ের আয়োজন করতেন এবং বিপুল সরঞ্জাম নিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট সেন্ট জেমস হলে পিস্টার পুলকের পরিচালনায় রয়্যাল ম্যারিওনেট-এর উদ্বোধন হল। চতুর্দিকে বিপুল উত্তেজনা। দৃশ্যপট অতি সুন্দর, মূর্তিগুলিও তাই। ফলে উৎসাহ পেয়ে আরো কয়েকটি দল গড়ে উঠল।

ব্রিটেনে পুতুল-নাচের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য রক্ষা করেছেন পিস্টার পাক। তাঁর বিচিত্র কণ্ঠস্বর দর্শকদের মুগ্ধ করে। শীতে তিনি থাকেন শহরে, গ্রীষ্মে হন সমুদ্রতীরে নয় গ্রামে। এ সময় সম্ভবতঃ দু'খানেক নতুনতর পাক ও জুডির পুতুল-নাচের ব্যাপারে কর্মব্যস্ত থাকেন।

বর্ত্তমানের বস্তুযুগে কিশোরদের জন্য রচিত নাটক বিশেষ সমাদৃত হচ্ছে না। কঠিন বাস্তব কিশোর মনের কল্পনাপ্রবণতার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবু George Speaight-এর প্রচেষ্টার খেলনা পুতুল এখনো তার নিজস্ব ধারাটি বজায় রেখেছে। এই বিশ্ব ব্যক্তিটির লেখা 'হিস্ট্রী অফ দি ইংলিশ পাপেট থিয়েটার' পুতুল-নাচের ইতিহাস সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ।

আধুনিক যুগে যাঁরা এ বিষয়ে অগ্রণী তাঁরা হলেন : উইলিয়াম সিমণ্ডস্, ওয়াল্টার উইলকিন্সন্ এবং গেয়ার উইলকিন্সন্। ওলিভ ব্ল্যাকহ্যাম পুতুল-নাচ নিয়ে বহু পরীক্ষা করেছেন। শেক্সপীয়ার এবং চেকভের রচনা পুতুল-নাচের মাধ্যমে উপস্থাপিত করার উদ্যম ও দুঃসাহস তাঁরই। তিনিই জাপানী নো প্লে পুতুল-নাচের মাধ্যমে ফোটাতে চেষ্টা করলেন।

শিল্পী এবং পরিচালক হিসেবে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন ওয়াল্ডো হ্যাঙ্কাস্টার। ১৯৩৬ সালে মাল্টভার্থে স্থাপিত এঁর ম্যারিওনেট থিয়েটারটি বর্ত্তমানে স্ট্র্যাটফোর্ড-অন্-অ্যাভনে স্থানান্তরিত হয়েছে।

ব্রিটেনে যে সব পুতুল-নাচের পার্টি আছে তাদের মধ্যে পিকাডিলি পাপেট্স্, হোগার্থ পাপেট্স্, ল্যাকার্ড পাপেট্স্, ভিক্টরস্ রয়াল ম্যারিওনেটস্, অলিভ ব্ল্যাকহ্যাম, রেক্সনর্থ পাপেটস্ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এদের মধ্যে আবার জন বুলেল ও অ্যান হোগার্থের পরিচালনায় হোগার্থ পাপেট দল সবচেয়ে বড় দল। প্রায় সাতশ' শিল্পী এর এক একটি অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

ইংল্যাণ্ডে পুতুল-নাচ শিল্পের বিকাশ সাধনে আরো একটি দল উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে। সেটি হচ্ছে British Puppet and Model Theatre Guild. ১৯২৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুতুল-নাচ যে শিক্ষণীয় ভূমিকা নিতে পারে সে কথা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে এই দলটি বোঝাবার চেষ্টা করছেন। বলতে গেলে ইংল্যাণ্ডে শিল্পকলার এই বিশেষ ক্ষেত্রটির একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে এই গোষ্ঠিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই গোষ্ঠি ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী করে বেড়ায় এবং পুতুল-নাচ শিল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সর্বত্র একটি অনুকূল মনোভাব গড়ে তুলতেও সাহায্য করে।

ব্রিটেনে এই শিল্পকে প্রচারযন্ত্র হিসেবেও কাজে লাগানো হচ্ছে। এই ব্যাপারে শার্প্স্ পাপেট থিয়েটারই অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছে। আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত এই শিল্প প্রধানতঃ ছিল শিশু-মনোরঞ্জনী। বর্ত্তমানে এখানে এ ধারণার পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এর প্রয়োগকৌশল যাতে দিন দিন উন্নততর হতে পারে সেজন্য নূতন দৃশ্যপট, অভিনব আলোকসম্পাত, নূতন চরিত্র ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যাপার নিয়ে গবেষণা চলছে। এর নাটক লেখার জন্যে নাট্যকারগণ এগিয়ে আসছেন।

গ্রেট ব্রিটেনের একমাত্র স্থায়ী রঙ্গালয় হল এডিনবার্গের লী পাপেট থিয়েটার। কেবলমাত্র ছোটদের জন্য নয়, বড়দের জন্যও লণ্ডনে একটি কেন্দ্রীয় পাপেট থিয়েটার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। এখানে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে চলবে এর ভবিষ্যৎ উন্নয়ন-পরিকল্পনা আর অন্যদিকে অতীত-ইতিহাস সংগ্রহ। অতি প্রাচীন এই পুতুল-নাচের ইতিহাস, মানুষ নিজে অভিনয় করার আগে তার সৃষ্ট পুতুল অভিনয় করে গেছে থাকে, তার ইতিহাস সবে সংগৃহীত হচ্ছে। এদিক দিয়ে ব্রিটেন হতে পারে বিশ্বের অন্যতম পথিকৃৎ।

॥ চীন ॥

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রসশিল্পকলামাত্রেই কল্পনাপ্রধান। যে জাতির কল্পনা করার যত প্রচুর আছে, শিল্পকলাক্ষেত্রে তার অধিকার অনস্বীকার্য। চীন একটি সুপ্রাচীন সভ্যতার দেশ। চীনদেশের কল্পনা করার শক্তি পৃথিবীখ্যাত এবং অনস্বীকৃত। অতএব রসাকলাবিভাগে তার সূক্ষ্ম কৃতিত্ব অদ্বিতীয় অধিকারীর দাবী রাখে। পুতুলনাচ শিল্পের ক্ষেত্রেও চীন পেছিয়ে থাকবে এটা ভাবতে যাওয়াটাই মূর্খতা। বরং একথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে চীনদেশে পুতুলনাচ-শিল্পের জন্মকাল তিন হাজার বছর পূর্বে। খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে মু-ওয়াং রাজত্বকালে এ শিল্পের অস্তিত্ব এবং চর্চার সন্ধান পাওয়া গেছে। মু রাজত্বকালে অর্থাৎ আজ থেকে আটশ' বছর পূর্বে "The Book of Music" গ্রন্থপ্রণেতা চেন ইউয়ান তাই বিবৃত করে গেছেন।

পাশ্চাত্যদেশের বিশেষজ্ঞরা সংস্কৃত নাটকের 'সূত্রধার' শব্দ থেকে ভারতের প্রাচীনত্ব এবং চীনের প্রাচীনত্ব উভয় তথ্যই স্বীকার করে গেলেও তাঁরা প্রাচ্যদেশের এ শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তাঁদের বইগুলোতে বিবৃত করেননি! চীনের বেলায় অনেকে আবার মুখোস নৃত্যের সঙ্গে এই পুতুলনৃত্যকে এক করে বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে তুলেছেন। প্রথমে চীনা লেখক Sun Kai-ti তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "The Origins of the Chinese Puppet Theatre" এবং বিখ্যাত রাশিয়ান পুতুলনৃত্য পরিচালক Sergei Obraztsov তাঁর "The Chinese Puppet Theatre"—দুজন দু'পুস্তকে চীনের এ শিল্পের জগতে অতুলনীয় সম্মানের অধিকার প্রচুর তথ্য সহযোগে প্রমাণ করেছেন। এমন কি শেষোক্ত রাশিয়ান লেখকের চীন ভ্রমণের পূর্ব পর্যন্ত চীনদেশ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অসম্পূর্ণ এবং প্রায় অজ্ঞ। পরে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছেন সব দেখে শুনে।

তিন হাজার বছর পূর্বেই এ শিল্পে চীনের উৎকর্ষ নাকি ছিল বিস্ময়কর। সম্রাট মু-ওয়াং বিখ্যাত পরিচালক ইয়াংশি'র একটি পুতুল অভিনয় দেখে ভুল করে ফেলেছিলেন, তিনি জ্যান্ত ঘটনা বর্ণন করছেন না পুতুলনাচ দেখছেন। ঘটনাটা হল এই। ইয়াংশি তাঁর পুতুলগুলোকে এমন সূক্ষ্ম নৈপুণ্য সহকারে চালাচ্ছিলেন, তাতে নাকি মু-ওয়াং কেন অনেকেরি ভুল হবার কথা। পরিচালক সম্রাজ্ঞী এবং তাঁর রাজসভার সদস্যদের প্রতি এমন নিপুণভাবে কটাক্ষপাত করাচ্ছিলেন পুতুলগুলোকে দিয়ে, সম্রাট প্রথমে হকচকিয়ে গেলেন, পরে ক্রুদ্ধ হলেন এবং সবশেষে আদেশ দিলেন ইয়াংশিকে ফাঁসিতে ঝুলাবার। আজ্ঞা-বাহক কাছে আসবার আগেই ইয়াংশি নাচ রেখে দিয়ে দেখালেন যে এরা জীবন্ত নয়। আসলে পুতুলগুলোই নাচছিল। ভাবতে অবাক লাগে তিন হাজার বছর আগে চীনে এমন ঘটনা-ও ঘটেছিল।

অতীতে সামন্ততন্ত্রের যুগে চীনে মেয়েরা পুতুলনাচের অভিনয় দেখতে আসতে পারতেন না। ইন্দোনেশিয়াতেও এরকমটা ছিল কিছুদিন আগে পর্যন্তও। সেখানে ছায়ানৃত্যে পুরুষরা যদি সাজে বসতেন, মেয়েরা বসতেন পরদার পেছনে।

চীনা লেখক Sun Kai-ti পুরানো পুতুলনাচের প্রয়োগগত এবং তত্ত্বগত বিচারে পাঁচটি ভাগ করেছেন। (১) দস্তানা পুতুলনৃত্য (২) যষ্টিসমন্বিত পুতুলনৃত্য (৩) পাউডার পুতুলনৃত্য (৪) ঝোলাযমান পুতুল নৃত্য ৫) জীবন্ত পুতুল নৃত্য।

প্রথম দুটো সম্পর্কে অল্পবিস্তর সবাই পরিচিত। কারণ এ দুটো প্রায় সবদেশেই অল্পবেশি বর্ত্তমান। কিন্তু শেষের তিনটি চীন দেশেরই নিজস্ব। 'শাউডার' পুতুলনৃত্য এখন আর চীনে বেঁচে নেই। এটা বাহ্যিক কলাকৌশলে চালু করা হয় এবং তাদের জোর গতি দেবার জন্য ইঞ্জিনের বাষ্পের মতই শাউডার ব্যবহৃত হত। এ প্রবন্ধে উল্লিখিত রাশিয়ান লেখক একে বলতে চান 'Pyrotechnic Puppet।' তোষকের উপর থেকে মানবাকৃতির পুতুল ঘুর্ণায়মান কাঠের ওপর রাখলে তা ঘুরতে থাকে। সবশেষেরটি মূক রাজত্ব কালেরি বৈশিষ্ট্য ছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পুতুলের মতই রঙীন পোষাক প'রে বড়দের কাঁধে চেপে পুতুলনাচের অনুকরণে অভিনয় করত।

ছায়ানৃত্যের জন্ম হয় অনেক পরে তাং রাজত্বকাল বা সপ্তম থেকে দশমের ভিতর। জনপ্রিয়তার ভিত্তি অর্জন করে একাদশ খৃষ্টাব্দে। ছায়ানৃত্যগুলো দণ্ডের সাহায্যে সম্পাদিত হয়।

রজ্জু বা সুতোর সাহায্যে পুতুল নাচ (String Puppet) চীনদেশে যেরকম নৈপুণ্যের এবং সূক্ষ্মভাবে অনুষ্ঠিত হয়, পাশ্চাত্যদেশের অনুসৃত প্রক্রিয়া থেকে অনেক তফাৎ। শুধু পার্থক্যই বা বলি কী করে, অনেক বেশি উন্নততর এবং আকর্ষণীয়। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন মেয়ে তার কুড়িটি হাতে নেবে। পশ্চিমদেশের রীতিতে কুড়িটির সংগেও একটি ঘড়ি লাগানো থাকে এবং মেয়েটির হাতের সংগেও ঘড়ি লাগানো থাকে। মেয়েটির হাত কুড়িটির দিকে এগিয়ে গেল এবং পরিচালক কুড়িটি ঠিকমতো তুলে নিয়ে মেয়েটির হাতে স্থাপন করলেন। চীনারীতিতে, কুড়িটি এমনিই পড়ে থাকে। অর্থাৎ ঘড়ি লাগানো হয় না। মেয়েটির হাত এগিয়ে গিয়ে যথারীতি যেমন আপনি এবং আমি তুলি, তেমি তুলে নেবে।

তারের সাহায্যেও পুতুলনাচ সেখানে আজ বেশ প্রচলিত হচ্ছে।

চীনদেশে পুতুলনাচের উৎপত্তি নিয়ে অনেক মহলে দু'রকম ধারণা আছে। কেউ বলেন রঙ্গাভিনয়ের নকলে এ পুতুলনাচের সেখানে জন্ম। কেউ বলেন, বিপরীত অর্থে অর্থাৎ পুতুলনাচের অনুসরণে ধীরে ধীরে এখানকার রঙ্গাভিনয় জন্মলাভ করেছে। বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ এন, বনরাড The Oriental Theatre নামক সিম্পোজিয়মে বলেছেন পুতুলনাচই হল রঙ্গাভিনয়ের আদত উৎস। যদি এঁর বিরুদ্ধ মতই স্বীকার করে নেওয়া যায়, তবু একথা বলতে দ্বিধা নেই পুতুল নাচের শাখাটি নিজস্ব ধারায়, নিজস্ব চরিত্র রক্ষা করে এগিয়ে চলেছে। রঙ্গালয়ের নাটকগুলোর নকলে পুতুলনাচের নাটক চলেনি। তবে "The Three Kingdoms," "Journey to the West" and "The River Creeks." প্রভৃতি বই থেকে দু'টো শাখাই নিজেদের নাট্যবস্তু গ্রহণ করেছে। রঙ্গাভিনয়ের বৈচিত্র্য থেকে পুতুল নৃত্যাভিনয়ের বৈচিত্র্য অনেক অনেক বেশি। প্রায় দ্বিগুণ। বৈচিত্র্য বলতে এখানে কর্ম বা রীতির কথাই বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত রীতির অর্থে এই বৈচিত্র্য।

The Three Kingdoms বইখানিতে সামরিক বীরত্ব, The River Creeks-এ সমাজবিদ্রোহী বা নায়কত্ব দেখানো হয়েছে। পুতুলনাচের বিষয়গুলো বেশির ভাগই সামাজিক। যেমন বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংহতি, বীরত্ব, অত্যাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, লোভী জমিদার ইত্যাদি নানাশ্রেণীর অন্যায় সাধনকারী চরিত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিয়েই রচিত হয়। বিদেশী লেখকের বই নিয়েও যেমন শেখদের বই-ও অভিনীত হয়।

কম্যুনিষ্ট চীনের সংস্কৃতিশাখার মন্ত্রীমণ্ডল ১৯৫৯ সালে পিকিং-এ একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। All Chinese Festival of Puppet and Shadow Theatre। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায়

ছ'শ জন প্রতিনিধি যাঁরা এ শিল্প পুরুষানুক্রমে চর্চা করে আসছেন যোগদান করেছিলেন। এ উৎসবে এ শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে বহু আলোচনা হয়। অঞ্চলিক সংগঠনগুলো নিজেদের মধ্যে যোগ রেখে ভাবধারা রীতিনীতি দেওয়া নেওয়ার কাজ সরল করতে পারেন, তার জন্য বিশেষ প্রস্তাব নেওয়া হয়। কুকিয়েন প্রদেশের Chin-Pi-Shu একজন বিখ্যাত পরিচালক। তিনি নাকি দশ বছর বয়স থেকেই এ নিয়েই চর্চা করে আসছেন। Wang Hsiao-Chiang-ও নিজের ন বছর বয়স থেকে একই শিল্পে পড়ে আছেন। দু'জনেরি বয়স সত্তরের কাছে। এরি আরো অনেকে আছেন।

সংশেষে পিকিং-এর ইনস্ট্রাক্ট অফ্ ট্রিডিশ্যাল আর্ট ডিরেক্টর Chu Hsinnan-এর কথা উদ্ধৃত করি। তাতে চীনদেশে বর্তমানে এ শিল্পের যত্ন করার চরিত্রটি সুন্দর ভাবে ধরা পড়বে। তিনি দল নিয়ে রাশিয়া গেলে রাশিয়ান শিল্পীদের, বিশেষজ্ঞদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন :

"These puppets are very expensive. While in use, they are puppet actors, and when not in use, we have to regard them as valuable museum pieces. Many Of the puppets you have seen are a hundred or more years old. Even some of the recently made puppets can be regarded as works of art in themselves, because of the detailed costume decorations, the art of the sculptor or carver, and even the material they are made of. They are in fact carved from special, very expensive, literally precious woods." (The Chinese Puppet Theatre by S. Obraztsov. Page : 53)

———

॥ বিদ্যাসের বই মানেই সেরা লেখকের সার্থক সৃষ্টি ॥

সদ্য প্রকাশিত

সীতাদেবীর নবতম উপন্যাস
মহামায়া　৬·০০

নবগোপাল দাসের গল্প সংগ্রহ
প্রেম ও প্রণয়　৪·০০

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর উপন্যাস
আয় চাঁদ　৩·০০

যাদবেশচন্দ্র শর্মাচার্যের উপন্যাস
গোধূলির রঙ　৩·৫০

উল্লেখযোগ্য বই

আনন্দকিশোর মুন্সীর
তেলকি থেকে তেঘর (৩য় মু:)　৬·৫০

শশিভূষণ দাশগুপ্তের
ব্যাস ও বক্সা　৩·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
চলাচল (২য় মু:)　৬·৫০

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
ডক্টর বার্ণার্ড শ　৮·৫০

গোপাল হালদারের
আড্ডা (২য় মু:)　২·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
বাংলা গল্প-বিচিত্রা　৪·০০

মনোজ বসুর
জল জঙ্গল (৪র্থ মু:)　৫·০০

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
AFRICANISM　16/-

সাম্প্রতিক প্রকাশনা

বিমল ভট্টাচার্যের
রাণী পালঙ্ক　২·৫০

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নিকষিত হেম　৩·০০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
চরণিক　৩·০০

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত
শত বর্ষের শত গল্প
১ম খণ্ড—১৪·০০　২য় খণ্ড—১২·৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
রূপ হোল অভিশাপ (২য় মু:)　৭·০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

ঋতু পর্যায়ের ধারা বেয়ে উৎসব মুখর শীত উপনীত রাজ-সমারোহে! মুক্ত-প্রাণ শিশির-বিন্দু নেমে এলো ধরিত্রীর বুকে নিঃশব্দ নীরবে, সাজিয়ে দিয়ে ধরণীকে অভিনব কুসুম সম্ভারে!

স্বভাবতই এখন মনে পড়ে রাঙ্গাজবা গ্লিসারিন সাবানের কথা, যার শুভ্র কোমল ফেনপুঞ্জ শীতের রুক্ষতা জয় করে সর্বদেহকে স্নিগ্ধ, সুন্দর, লাবণ্যময় করে তোলে। প্রসাধন সাবানের এমন সর্বতো-ভদ্র রূপ আর কখনও দেখা যায় নাই।

অক্ষয় নির্ঝরিণীর ন্যায় উন্নত শীর্ষে অধিষ্ঠিত রাঙ্গাজবা গ্লিসারিন বিশুদ্ধতার, মৌলিকতায় ও গন্ধের মধুরতায় অনন্য।

শীতের বন্ধু

রাঙ্গাজবা

গ্লিসারিন সাবান

রাঙ্গাজবা কেমিক্যাল, কলিকাতা

SDRJ-4

॥ পাপেট ঃ জাপান ॥

বারীন মৈত্র

বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত কোণে নিরিবিলি আর নিশ্চিন্ত দিনযাপনের দিনে পথের ধুলোয় বসে বেদে বেদেনীর নিপুণ হাতের পুতুল গুলোয় যে নাচ দেখেছি তা' আজকের সংস্কৃতি অলোকিত সভ্যতার দরজায় পৌঁছতে গিয়ে দেখছি আরও ক্রমবিকাশ চলেছিল ; অলিখিতপটভূমেরও ঐতিহ্য আছে ইতিহাসে ; এই পাপেট নাচটাও সভ্যতা সৃষ্টির দিন থেকে ক্রমশ বিকশিত হয়ে উঠেছে দেশে দেশে। অ্যারিষ্টটল, প্লেটো ও হোরেসের সাহিত্যে তার নজীর মিলেছে, সভ্যতার ইতিহাসে খুঁড়তে গিয়ে গ্রীসে আবিষ্কৃত হোয়েছে প্রাচীন কালের এক পাপেটের মাটি-চাপা পড়া চিত্র , তার মুখে চোখে নাকি মিসিসি দেশের লোক গাঁথার পুতুলের ছাপ ; এতএব ধরে নেওয়া গেছে বহু প্রাচীন কালের ঐতিহ্য বহন করে আজকের দিনের যাযাবর বাজীকরের হাতের পুতুল দুটো এ কালের দরজায় উপস্থিত।

বিষধর সাপকে নিয়ে খেলা দেখাতো বেদে। তার আগে লোক জমাতে লোকটা গ্লাভসের (glove) মত কাপড়ের পুতুল দুটো দুপাতে। তারপর অতি দ্রুত ঝাড়া আউড়ে নিত তারস্বরে। তারপরেই দু'তের দুই সতীন হাত নাড়িয়ে মাথা নাড়িয়ে বাজীকরের গানের সঙ্গে তাল রাখতো। বাজীকর বলতো :

'খেঁদি নাচবি নাকি
রসের বিনোদিনী খেঁদি নাচবি নাকি—'

তারপরে উত্তরের অপেক্ষা না করে নাচ আর নাচ। সে নাচের আসর এক মিনিটের মধ্যে এমন জমে যেত যে দুই সতীন অত্যন্ত কোলাহল, কলহ সমাপন করে অবসন্ন হয়ে বাজীকরের ঝুলিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হত। নির্বিকার বেদে তখন সাপ বার করতো একে একে। তুমড়ী বাঁশী বেজে উঠত।

জাপানী পাপেটের কথা বলতে বসে এতগুলো কথা না বললে বোঝানো যেত না পাপেট জিনিসটা কি। সম্ভবতঃ অনেকের সঙ্গে আজও তাদের চাক্ষুস পরিচয় ঘটে নি। তাদের অংশটায় তাই পুতুল নাচের দ্বারা বিবরণী দিতে হল। পাপেটের বাংলা করে নিতে পারি পুতুল নাচ।

স্থান কাল পাত্র ভেদে একই বাজীকর বিভিন্ন রকম পুতুল নাচ দেখিয়ে থাকে। ভাত শিল্পীর হাতে পড়লে ওই সুতুল পুতুল কতা দিয়ে বাজীকর স্টেজ বেঁধে নাচ দেখিয়ে থাকে। সারা পৃথিবীতে এর প্রচলন আজও আছে। সহজ স্বচ্ছন্দ স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে প্রকাশিত হয়ে পৃথিবীর অনেক কাব্য এই পুতুলগুলোর মারফৎ প্রচারিত হয়েছে! ইটালীতে এর প্রচলন খ্রীষ্টের জীবন কাহিনী শোনাবার জন্যেই হয়েছিল। তারপর চার্চের দাওয়া থেকে ধনিকের প্রাঙ্গনতলে দিনে দিনে ছড়িয়ে পড়েছিল।

জাপানীরা পাপেট নাচকে বলে Waraog. ওদের দেশের একার নিজস্ব প্রযোগ-পদ্ধতি আছে এই পুতুলনাচের দৃশ্যকাব্যের অন্যান্য সব কিছুরই মতন। ওসাকায় ওদের নামকরা পুতুলনাচ-গৃহ হল বুনরকু-জু থিয়েটর। সেখানে নিয়মিত অভিনীত হয় পুতুল নাচের লোককাব্য। ওদের পৃথিবী-বিখ্যাত পুতুলনাচের কাহিনীর নাম জিন-জিসি।

ওরা কুরুকের ছাদে একরকমের ছায়া-নাচ করতো পুতুলদের দিয়ে। সিনেমার পর্দার মত স্টেজের সামনে পর্দা খাটিয়ে পেছন থেকে আলো ফেলতো। আর স্টেজের তলা থেকে একটা পুতুল কাঠের সঙ্গে এঁটে দাঁড় করিয়ে দিত এমন ভাবে যাতে তলার কাঠের অংশটা না চোখে পড়ে। কাঠটাকে মাটিতে একখানা কলাগাছ ফেলে তাতে গিঁথে রাখতো। আর পুতুলের হাত দুটো অন্য দুটো বাঁশে বেঁধে নিচে থেকে নাচাতো কিম্বা পাশের দুইজনের যার থেকে তার দিয়ে টানাটানি কোরে বক্তব্য বিষয়কে বোঝাবার চেষ্টা করতো। পাপেট ইতিহাসে একটাকে বলা হয় (Rod-Puppet)।

বিশেষত্বপূর্ণ হলো জাপানী Three-man-puppet এটা জাপানের একান্ত নিজস্ব ; এতে তিনটে মানুষ একসঙ্গে একটা পুতুলকে নাচায় ; সুন্দর কারুকার্য খচিত কাঠের পাপেটের মাথাটা চরিত্রানুগ বৈশিষ্ট্যে সাজানো হত। চোখ, নাক, চিবুক যথাসম্ভব সুন্দর কোরে তৈরী কোরে কখনও কখনও বিচিত্র উপায়ে চোখের দৃষ্টিকেও নানা ভঙ্গীতে বাঁকানো হত। কাঁধে দেহের সঙ্গে ঝোলানো হাত দুটো চালকের হাতের কারসাজি করতো। সব ঠিক কিন্তু একটা জিনিষ প্রত্যেকেরই চোখে পড়তো। দেহের তুলনায় প্রত্যেক পুতুলের মাথা অস্বাভাবিক ছোট ছোট কাঠের মাথার সঙ্গে দেহের ভারসাম্য রক্ষার জন্যেই হয়ত।

চালকেরা এখানে কখনও দর্শকের চোখের আড়ালে যান না। প্রধান চালক সুন্দর কাপড় চোপড় পরে উঁচু কিছুর ওপর দাঁড়ান দর্শকদের সামনে। বাঁ হাতে পাপেটটা ধরে থাকেন। এবং সেই হাতেই মাথাটাকে ঘুরিয়ে চড়িয়ে নাচাতে পারেন। ডান হাতে পাপেটের ডান হাতটা নাড়ান। দ্বিতীয় জন কালো সজ্জায় সজ্জিত হোয়ে পাপেটের বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতটা দেখান। তৃতীয় জন পাপেটের পেছনে দাঁড়িয়ে পুতুলের পা দুটো নিয়ে থাকেন। খেলা দেখাবার সময় কাব্যের অন্তর্নিহিত কাহিনী অনুযায়ী ও আবৃত্তিকারের আবৃত্তি অনুযায়ী পুতুলের খেলা চলতে থাকে তিন জনের সম্মিলিত নৈপুণ্যে। তবে ওই এক কথা। কৌশলী চালকের নিপুণতার ওপর এটা একান্ত নির্ভরশীল।

অনেক সময় পাপেটের আকার ছোট হলে তার পা দুটো বন্ধির সঙ্গে থাকে। বাঁধা চালকের পায়ের আঙুলের সঙ্গে। চালক একখানা টুলের ওপর বসেন। পাপেটগুলো এদের কমপক্ষে ২২ থেকে ৩৩ পাউণ্ড ভারী হয়। মানে চালকের হাতের নিপুনতার সঙ্গে তার হাতের পেশীর শক্তি সামর্থ্যও সেই উপযোগী হবে।

সব ক্ষেত্রেই দর্শকদের থেকেই সামনে চালক এই পুতুলগুলোর পরিচালনা করেন। সঙ্গীতশিল্পীও আবৃত্তিকারের দল ষ্টেজের বাইরে সার দিয়ে বসে নিজের কাজ করে যান। যে যিনের যা যন্ত্র। জাপানে এর দর্শকেরা এ বিষয়ে কোন আপত্তি করে না।

আমাদের দেশের যাত্রার আসরেও এরকম ঘটনা ঘটে! যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত সৈনিক এখানেও বহাল তবিয়তে গ্রীনরুমে ফিরে যান যুদ্ধ শেষ হোলো।

খুব সাধারণভাবে সংক্ষেপে বলতে গেলে জাপানী এই পুতুলনাচের ইতিকথা বহু প্রাচীন কালের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এগুলো সহজ স্বচ্ছন্দ ধারায় সারা পৃথিবীর দেশে দেশে সমৃদ্ধি লাভ করে অতীত থেকে বর্তমানের ওপর দিয়ে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চলেছে। সরলে মানুষের গ্রাম্য কলাকুশলতায় বিমূর্ত পুতুলনাচের ধারা সকল কালের সকল মানুষের উপভোগ্য।

।। ভারতবর্ষ ।।

চীনের মত অত প্রাচীন না হলেও ভারতবিশেষজ্ঞ পশ্চিমী পণ্ডিতদের মতে ভারতেও বহু কাল আগে পুতুল-নাচের মত রঙ্গশিল্পের অস্তিত্ব ছিল। সংস্কৃত নাটকের 'সূত্রধার' শব্দটি থেকে তাদের এ ধারনা। তার পর গুপ্তসাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগেও এ শিল্পের প্রবল চর্চ্চারও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। পুতুল তৈরীর শিল্প ভারতের মত অধ্যাত্মপ্রধান দেশে কল্পনাপ্রবণ শিল্পীর দল গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছেন। তাঁরা যে এ নিয়ে কিছু করেন না এটা ভাবতেই অবাক লাগে। তারপর যেখানে রামায়ণ মহাভারতের মতো দুটো বই সংস্র সংস্র কাহিনী যুগিয়ে চলেছেন ভারতবর্ষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেখানে ওই সমস্ত কাহিনী পুতুল-নাচের অভিনয়ে প্রেরণা দেবে এ জানা কথা। যদিও চীনের মত অত ব্যাপকভাবে এ শিল্পের বিভিন্ন কর্ম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়নি, তাহলেও গ্রামে গ্রামে বাজারে বা মেলায় বা কোন উৎসবে 'পুতুলওয়ালা'র দল অনেকের আনন্দ দান করে এসেছেন। হয়ত চীনের মত সফল হতে পারেনি ভারত এশিয়ের বৈচিত্র্যমণ্ডিত উৎকর্ষসাধনে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার, ভারতের কাছে এ বিষয়ে শীক্ষা নিয়ে জাভা দ্বীপ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। তবে জাভার সম্বন্ধে অনুশীলনে অর্জিত মৌলিকতা অনস্বীকার্য। গুপ্ত আমলে পুতুল-নাচের বিভিন্ন কলাকৌশল বা পুতুলের পোষাক নির্মাণে কৌশল এবং পোষাকের নমুনা জাভাদ্বীপে অনুসৃত হচ্ছে। পুতুল এবং পুতুলনাচ দুটোকে পৃথকভাবে দেখা উচিত। তাহলে এটা স্বীকারে অগৌরবের কিছুই নেই পুতুলের ব্যাপারে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন স্বীকার্য পুতুল নাচের ব্যাপারে তার চর্চ্চা তেমনি শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারেনি।

তার কারণও রয়েছে, হিন্দু আমলে যেরকম চর্চ্চা ছিল, মুস্লিম আমলে সে শিল্পের অন্ধকার যুগ যায় এবং তারপর ব্রিটিশ আমলে আস্তে আস্তে তার পুনর্জন্ম ঘটে।

উত্তর ভারতে রাজস্থানেই চর্চ্চা হয় বেশি পুতুলনাচের। ছেলেমেয়েদের মুখে 'পুতলীওয়ালা' শব্দটি প্রথম আসে এ রাজস্থানী শিল্পীদের দেখেই। এরা ছেলেমেয়েদের আনন্দদানের জন্যে মেলায় মেলায়, বাজারে, উৎসবে বা জমিদার বাড়ীতে পুতুল নাচ দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়ান। পুতলীওয়ালাদের দেখলেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। রাজপুত শিল্পীরা শৌর্যবীর্যের প্রতীক কাহিনী-ও অভিনয়ে রূপ দিয়ে দর্শকদের আনন্দদান এবং সে বিশেষ গুণটির দিকে নজর আকর্ষণ করেন। যেমন, সম্রাট শাজাহানের আশ্রিত অমর সিং রাঠোড়ের বীরত্ব সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীকে পুতলীওয়ালার দল বেশি আশ্রয় করেন। কথিত আছে, প্রকাশ্য সভায় অমর সিংহকে সম্রাটের উজীর অপমান করতে অমর সিং অপমানকারীদের প্রাণ কেড়ে নেন। এই কাহিনীই রাজপুতদের মধ্যে খুব প্রিয়। আধুনিক সিনেমার যুগে-ও এই শিল্পীরা গ্রামবাসীদের অর্থেই জীবিকা নির্বাহ করেন। শহরে নাগরিকদের কাছে যদিও এই সমস্ত শিল্পীরা যারা বংশপরম্পরায় এই শিল্পে কাজ করে আসছেন এখনো জনপ্রিয়তা পাননি, তবু গ্রামে এদের জনপ্রিয়তাই বেশি। ব্যক্তিগতভাবে হয়ত এই শিল্পীরা স্কুল কলেজী শিক্ষা পাননি, কিন্তু বংশপরম্পরাগতভাবে একটি উন্নত সংস্কৃতি চেতনা এবং বুদ্ধির অধিকারী এঁদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত পুতুল-নাচগুলোতে এমন একটি আলোকিত ভাব থাকে যাতে শিক্ষার-ও প্রসার সম্ভব হয়। এতে জানবার খুব সহজ হয়। উত্তর ভারতের শিল্পীরা মোঘল আমলের ধনী দরিদ্রদের জীবনকথা-ও রূপায়িত করেন। এর দ্বারা দিয়ে তখনকার আমলের জীবনযাত্রা কীরকম ছিল তার জ্ঞান-ও এঁরা দর্শকরা পান।

উত্তর ভারতের শিল্পীদের মধ্যে একটি সৃষ্টিকেন্দ্রিক সামাজিক জীবন সম্বন্ধীয় নাটক প্রিয়তা যেমন লক্ষিত

হয়, দক্ষিণ-ভারতের শিল্পীদের মধ্যে নীতিশিক্ষা দানই প্রধান এবং প্রিয় কাজ। দক্ষিণ ভারতের শিল্পীরা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে পুতুল-নাচের ভেতর রূপ দেন। দক্ষিণ ভারতে রাম ও তার স্বর্গারোহণের কাহিনীই বেশি আদর পায়।

দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক অঞ্চলে পুতুলের ছায়ানৃত্যের প্রিয়তা আছে। সেখানে পরিবারের সকলে মিলে এ অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। হরিশ্চন্দ্রের ত্যাগের কাহিনী ছায়ানৃত্যে এমন সুন্দরভাবে রূপ দিতে পারেন, দর্শকরা চোখের জল না ফেলে পারেন না।

এখন পর্যন্ত পুতুল-নাচের শিল্পে যাদের কথা বলা হল, তারা গ্রামের লোকদের কাছেই প্রিয়। কিন্তু শহরবাসীদের কাছে এর আবেদন পৌঁছিয়ে দেবার আন্দোলন দু' চারটি দল পরিচালনা করেছেন। যেমন 'প্রেসে' এর পরিচালনায় এ আন্দোলন বছর তিনেক আগে শহরবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গ্রামে যে আন্তর্জাতিক পুতুল নাচের প্রতিষ্ঠানটি আছে, তাদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এ দল শ্রেষ্ঠ প্রদর্শকের সম্মান লাভ করেন। বিদেশে এ দলটি বেশ সম্মান লাভ করেছেন।

তবে যিনি এ শিল্পটিকে শহরবাসীদের কাছে খুব আদরনীয় করে তোলেন এবং যাঁর অনুপ্রেরণায় এ শিল্প সম্পর্কে অনেক উৎসাহী ব্যক্তির মনের জন্মে এবং অনুশীলনে নামেন, তিনি হলেন বিখ্যাত শান্তি বর্ধন। বড় ভাই যদি বর্ধন-ও একজন বড় নৃত্যশিল্পী। শান্তি বর্ধন প্রথমে আলমোড়ায় উদয়শঙ্করের নৃত্য মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তারপরে বোম্বেতে এসে বিখ্যাত 'পিটুল ব্যালে ট্রুপ' প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তাঁর সঙ্গে তাঁর শুভরাটি পত্নী শুল বর্ধন এ প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন। এ দল 'ডিস্কভারী অফ ইণ্ডিয়া', 'ইণ্ডিয়া ইম্‌পর্টাল'—দুটো ব্যালে প্রদর্শনী করেন। তাদের বিখ্যাত এবং সফল নাটক হল 'রামায়ণ'। এইটি বলতে গেলে পুতুলনাচ সম্পর্কে শহরে শিক্ষিত ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এঁরা নিজেরাই পোষাক তৈরী করা থেকে যাবতীয় খুটিনাটি কাজ করেন। 'রামায়ণ'টির প্রদর্শনী করবার আগে তাদের ছয়মাস রিহার্সাল দিতে হয়েছিল। শান্তি বর্ধন মারা গেলেও তাঁর পত্নী শুল বর্ধন এ দলটিকে চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি দলবল নিয়ে রাশিয়া ঘুরে সেখানকার প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। ভারতীয় আধুনিক পুতুলনাচের শিল্পীরা শান্তি বর্ধনের কাছে ঋণী। শান্তি বর্ধন ত্রিপুরা জেলার লোক ছিলেন।

বোম্বে প্রবাসী অজয় চক্রবর্তী পুতুল নাচের রঙীন চলচ্চিত্র তুলেছেন, ভারতে বোধ হয় এ বিষয়ে এটাই প্রথম চলচ্চিত্র। তিনি ফিল্মটিতে 'নাচে-যুদ্ধে সিতারে' বিশ মিনিটের চলচ্চিত্র তুলেছেন। অজয় চক্রবর্তী নিজে এ ছবির প্রযোজনা, পরিচালনা, ফটোগ্রাফী, পোষাক তৈরী সব করেছেন। ভারতে এখন এ শিল্পের দিকে কিছু প্রতিভাবান শিল্পী এগিয়ে এসেছেন। কলকাতাতেই চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটার কর্তৃপক্ষ এ শিল্পকে শিশুদের আনন্দ দান এবং শিক্ষাদানের কাজে লাগানোর ব্যাপারে চিন্তা নিয়োগ করেছেন। তরুণ শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী-ও নিজস্ব একটি দল গড়ে তুলেছেন। তিনি প্রযোজক, পরিচালক এবং পোষাক পরিচ্ছদের সব নিজে তৈরী করেন।

ভারতে এ শিল্পের সম্ভাবনা যেমনি প্রচুর তেমনি এর প্রসার লাভ করাও লোক শিক্ষাদানের দিক দিয়ে অবশ্য প্রয়োজন। মনে হয়, এককালে প্রচুর অথচ পরবর্তী কালে অবহেলিত এ ছায়া শিল্পের বিকাশ সাধনের দিকে অনেকেই এগিয়ে আসছেন, এটাই আশার কথা।

॥ জাভা ॥

চিত্তরঞ্জন দেব

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য এ দু'জগতের পুতুল নাচের ভেতর পরিস্ফুট মনোভঙ্গীর পারস্পরিক পার্থক্য জীবনাচরণের ভঙ্গীর পার্থক্যের মতই সুস্পষ্ট। মিসর বা গ্রীস যখন সুপ্রাচীনকালে পাশ্চাত্য ধারাতেই তাদের পুতুল-নাচ শিল্পের গবেষণা করছিল, তখন ভারত-চীন-জাপান-বার্মা-জাভা সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব রীতি অর্থাৎ প্রাচ্য রীতিতেই নিজেদের চর্চাকে অব্যাহত রেখেছিল। প্রাচ্যরীতির মূল কথাই হল ধর্মপ্রধান নিরাসক্তির ভাব। অন্যদিকে পাশ্চাত্য রীতি হল আসক্তিপ্রধান।

যেহেতু পুরাণো ভারতবর্ষ ধর্মজীবনেই পুরোপুরি বাস করত, সেহেতু সেখান থেকে বাইরে প্রসারিত ভারতবর্ষের আদর্শপ্রাণিত দেশগুলো-ও ছিল তাই। বার্মা, ইন্দোচীন, জাভা শ্যাম প্রভৃতি দেশে এই ধর্মপ্রভাবিত নিরাসক্তি জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ভারতের মতই। অতএব যেহেতু জীবনের সর্বরকম শিল্প চর্চার উদ্যানে এই নিরাসক্তি যেমন সর্বসময়ে কোন না কোনভাবে অনুভূত, পুতুল নাচ-শিল্পেও জাভার এই নিরাসক্তি প্রবলভাবে বিদ্যমান।

জাভার পুতুল নাচ সচরাচর দৃষ্ট অন্যান্য দেশের পুতুল নাচের থেকে বেশ পৃথক। এখানে পুতুলের ছায়ানৃত্যই সর্বাপেক্ষা বেশি আদৃত। যদিও ফ্রান্সে পুতুলের ছায়া নৃত্য একসময় পুতুলনাচকে নিরুৎসাহ করে দিয়ে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছিল, পরে আবার সেই পুতুলের ছায়ানৃত্য সেখানে চাপা পড়ে গিয়েছে। শুনছি, পোল্যাণ্ডে এখন জাভার অনুকরণের সেই পুতুলের ছায়ানৃত্য চর্চিত হচ্ছে। শ্যামদেশে পোল্যাণ্ডের পূর্বেই জাভা থেকে এ ছায়ানৃত্যকে আদর জানানো হয়েছে।

জাভার এরকম প্রবল জনপ্রিয় পুতুলের ছায়ানৃত্য বস্তুটি কী?

পুতুলের ছায়ানৃত্যের স্থানীয় নাম হচ্ছে ওআইয়াং কুলিৎ (wajang koelit)। 'ওআইয়াং' কথাটির অর্থ হল ছায়া। মনীষী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নিজে সেখানকার নৃত্যগুলো দেখে এসেছেন এবং এ সম্পর্কে সুচিন্তিত, সুপাঠ্য এবং তথ্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ প্রবাসীতে লিখেছিলেন। তাতে তিনি এ ছায়া নৃত্যের সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। সেটি তুলে ধরা হল। 'নাটকের পাত্র-পাত্রীদের চামড়ায় কাটা মূর্তি বা ছবি নিয়ে প্রদর্শক একটি সাদা পরদার সামনে বসেন, প্রদর্শকের সামনে মাথার উপরে একটা আলো থাকে, এই আলোর রশ্মি পরদার সামনে ধরা পুতুলের উপরে প'ড়ে সাদা পরদার উপরে ছায়ার সৃষ্টি করে, পরদার ওধারেও ছায়া দেখা যায়। পুতুলগুলির হাত নড়াতে পারা যায়। আর প্রদর্শক মুখে মুখে ঘটনাবলীর বর্ণনা পাঠ করেন বা পাত্র-পাত্রীদের কথা অভিনয়ের ধরণে নিজেই ব'লে যান।" (প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩৩৮)

পুতুল নাচের শিল্পকলাকে অনেকে ছেলেমানুষী ব্যাপার বলে মনে করেন, কিন্তু আজ গবেষণা করে দেখা গেছে আনন্দ বিতরণের কাজই শুধু নয়, জনমত তৈরী করার এবং লোকশিক্ষাদানের কাজও করার ক্ষমতা এ পুতুলনাচের আছে। ছেলেমানুষী ব্যাপার মোটেই নয়। এ শিল্পকে কেন্দ্র করে সমগ্র জাভার একটি বৈশিষ্ট্যময় শিল্প-কলা গড়ে ওঠেছে।

ব্রহ্মদেশে যেমন বৌদ্ধধর্ম এবং তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় কাহিনী সেখানকার সমস্ত জীবনাচরণে কি চালচলন,

কি নাটক, কি, লোকনৃত্য, কি লোকসঙ্গীত, কি পুতুলনাচ সবখানে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, জাভায় তেমি বিষ্ণু-ধর্ম্মের এমনি প্রসার ঘটেছে। ভারতবিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে, ভারতের আদি নাটক হ'ত পুতুলনাচ আর ছায়া নাটাকে কেন্দ্র করে। সংস্কৃত নাটকের 'সূত্রধার' শব্দটিই ইঙ্গিত করছে যে পুতুল নাচ ভারতের বহুদিনকার সম্পদ। ইউরোপীয় পুতুলনাচ বিশেষজ্ঞরা ভারতের কাছে পুতুলনাচ-শিল্পের আদিম উৎপত্তির জন্যে ঋণ স্বীকার করে থাকেন। জাভার এই ছায়ানাটক ভারত থেকেই যায়

জাভার পুতুলের ছায়া নাটকগুলো পুরাণো রাজকাহিনী বা পাণ্ডি এবং রামায়ণ মহাভারত অবলম্বন করে রচিত। রামায়ণ মহাভারত নিয়ে এই ছায়া নাটকগুলোর নাম ওআইয়াং পুর্ব (wajang poerwa)। এর থেকেই রামায়ণ মহাভারতের লোকপ্রিয়তা জাভায় কিরকম বোঝা যায়।

পুতুলগুলো যেরকম ছাঁচে তৈরী হয়, সে ছাঁচে গুপ্তযুগের ভারতীয় পুতুলের ছাঁচের সঙ্গে একটা অবিকল মিল দেখা যায়।

পাণ্ডি বা পুরাণো স্থানীয় রাজকাহিনী অবলম্বনে রচিত ছায়া নাটকের তিনটি পাত্র জাভার লোক জীবনে প্রভাব বিস্তার করে আছেন। 'সেমার', তাঁর দু'জন পুত্র 'গারেঙ' এবং 'পেট্রক'। আপাতদৃষ্টিতে এদের মনে হয় সামান্য বিদূষক। কিন্তু আসলে লোক শিক্ষাদাতা হিসেবে এদের স্থানকে কেউ কেউ ঈশ্বরের চেয়েও বেশি মূল্য দেন।

পুতুলের ছায়ানৃত্য সমস্ত জাভায় অনুষ্ঠিত হয়। এটা সাধারণতঃ গ্রামের প্রধান ব্যক্তির বাড়িতে হয়। শহরে অবশ্য যেখানে সম্ভব সেখানেই হচ্ছে। যে জায়গায় হয়, সেটির নাম পেণ্ডাপো বা মণ্ডপ। সমস্ত মণ্ডপটি উৎসব বাড়ির মতই নানাভাবে সুসজ্জিত হয়। ছায়া নাটকের পরদার বাইরে মুখোমুখি মাঝামাঝি জায়গায় Dalang বা কথকের আসন। "দালাং বা কথকের মাথার ওপরে শিকলে ঝুলানো সুন্দর কাজ করা পিতলের একটি দড় প্রদীপ। কথকের দু'পাশে পরদার সঙ্গে লম্বালম্বি করে রাখা দুটো কলা গাছের গুঁড়ি; তাতে প্রায় শ'দেড়েক ওআইয়াং-এর মূর্ত্তি রাখা মূর্ত্তিগুলোর শিঙের বা বাঁশের কাঠির হাতল কলাগাছের গায়ে বিঁধিয়ে সেগুলোকে খাড়া রাখা হয়েছে। দালাং-এর পেছনে দোহার গাইয়েদের আর বাদকের দল; গামেলান্ বাজনা, ঢোল, সারেঙী এই সব বাজনা।' (শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)

পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞরা এই ছায়ানৃত্যকে সিনেমা শিল্পের সর্বপ্রাচীন স্তর বলে বর্ণনা করেছেন।

এই শিল্প সেখানকার অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এর জন্যে চামড়ার মূর্তি কাটা একটি প্রিয় লোকশিল্প। এই পুতুলের ছাঁচে ছবি-ও চমৎকার করে কাগজে আঁকা হয়। এ নমুনার ছবিগুলো দিয়ে রামায়ণ মহাভারত আর প্রাচীন যবদ্বীপের কাহিনীর বই-ও চিত্রিত করা হয়। রাস্তার ধারে বাড়ির দেয়ালে ছোটো ছেলেদের ছায়ানৃত্যের পুতুলের অনুকরণে ছবি আঁকতে মনীষী সুনীতিকুমার দেখে এসেছেন। সুতরাং এর থেকেই অনুধাবন করা যায়, এই শিল্প সেখানকার জাতীয় জীবনে কীরকম ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। যেমনি শিল্পকলার ক্ষেত্রে, তেমনি অর্থনীতিতেও জাভা ইনষ্টিটিউট এ শিল্পের পুরাণো পুতুল সংগ্রহ করে রাখছেন এবং ক্রমবিকাশের জন্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। বিদেশীরা-ও সেখানে এ সম্পর্কে গবেষণা করতে যান।

॥ পোল্যাণ্ড ॥

প্রণব ভট্টাচার্য

সমস্ত পশ্চিমী জগতে যেমি তেমি পোল্যাণ্ডেও ধর্মীয় ভাব অনুভাবের ওপর ভিত্তি করে পুতুল নাচের রঙ্গশিল্প তৈরী হয়ে ওঠেছিল। তিন শতক পূর্বে এর উৎপত্তি সেখানে হয়েছিল।

কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন এ আন্দোলন ক্রমশঃ পরিণতির ধাপে এগিয়ে চলেছে, যখন এ শিল্পকে বিভিন্নক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে, তখন তার এমন আবশ্যকীয় উপযোগিতা সম্বন্ধে একটা চেতনার ঢেউ পোল্যাণ্ডেও এসে পৌঁছল। কোথাও একে প্রয়োগ করা হয়েছে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য, কোথাও শিক্ষাদানের জন্যে, কোথাও সামাজিক ঘৃণ্য চরিত্রগুলোকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে জনমত গঠন করার কাজে। ১৯২০ সালের পূর্বে পোল্যাণ্ড এ সম্পর্কে খুব বেশি মাথা ঘামায় নি। ১৯২০ সালেই প্রথম পেশাদারী রঙ্গালয় স্থাপিত হয় যেখানে পুতুল নাচের অভিনয় প্রদর্শিত হয়।

১৯২০ সালে শিল্পবিষয়ে যে অর্ধচেতনা জাগ্রত হয়েছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এ অর্ধচেতনা আধুনিক যুগের পরিণত উপলব্ধিতে রূপ পায়। অবশ্য এ আন্দোলনের কর্তৃপক্ষ শিশুশিক্ষার শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবেই এ শিল্পের মর্যাদাই বেশি করে দেন।

আজ সেখানে তিনটি রাষ্ট্রকর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত রঙ্গালয় রয়েছে। এছাড়া বহু সৌখীন প্রতিষ্ঠানও সেখানে গড়ে ওঠেছে। হস্ত পরিচালিত পুতুলনাচই সেখানে বেশি চালু।

প্রাচ্যদেশের বিশেষ করে জাভার wajang বা পুতুলের ছায়ানৃত্যও সেখানে আজ অনুসৃত এবং চালু হয়েছে। জাভাবেশীর এ পুতুলের ছায়ানৃত্য তালরকম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

পোল্যাণ্ডে রঙ্গশিল্পে এখন পর্যন্ত শিশুদের আনন্দদানের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার রীতিই বেশি প্রচলিত। হ্যান্স এণ্ডারসনের শিশুদের প্রিয় কাহিনীগুলোই নাটকে রূপ দেওয়া হয় বেশি এবং সেগুলোই প্রদর্শিত হয় প্রবল ভাবে।

আধুনিককালের পোলিশ লেখকরা-ও পুতুলনাচের জন্য নাটক লিখতে এগিয়ে এসেছেন। যেমন হালিনা অভারস্কা, মারিয়া ক্যান প্রমুখ আরো বহু লেখকের নাম উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত পোলিশ লেখক কাওনাকার জনপ্রিয় পুস্তক 'The Brave Little Shoemaker" আজ পঁচিশ বছর ধরে সেখানে প্রদর্শিত হয়ে আসছে।

পুতুলনাচকে চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়াও সেখানে হচ্ছে। এণ্ডারসনের 'What the moon saw" এই বইটির যা নাকি ফরাসী বিপ্লবের সময়কার ঘটনা নিয়ে রচিত পুতুলনাচের ভেতর চলচ্চিত্ররূপ সেখানে অতিপ্রিয় হতে পেরেছে।

পোল্যাণ্ডে যদিও এখনো পর্যন্ত শিশুশিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবেই এ শিল্প মর্যাদা পাচ্ছে এবং যদিও এখনো পর্যন্ত এ শিল্প অন্যান্য বিভাগেও সর্বসাধারণের উপযোগী স্তরে প্রবেশ করেনি, তবুও একথা বলা চলে রাষ্ট্র আজ উদার হস্তে এ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। নতুবা কী করে তিরিশটি বিশিষ্ট রঙ্গালয় তৈরী হতে পারল। তাই আশা করা যায়, এ শিল্পের পদক্ষেপ অদূর ভবিষ্যতে বৈচিত্র্যের জগতে পড়বে।

———

সুলেখা

আজ আমাদের জাতীয় সম্পদ

গুণগত উৎকর্ষে সুলেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। অগণিত জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থনধন্য সুলেখা আজ সব চেয়ে বেশী বিক্রয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত। স্বদেশী শিল্পের একটি একান্ত প্রয়োজন মেটাতে পেরে সুলেখা আজ জাতীয় সম্পদে পরিণত।

কালির সেরা **সুলেখা**

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

অগ্রহায়ণ—১৩৬৮

সম্পাদক

শ্রীমহাশ্বেতা দেবী

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ
২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ,
কলিকাতা—৬

মূল্য—এক টাকা

সহঃ সম্পাদক——শ্রীকল্যাণ রায়

শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতাস্থিত, ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড,
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

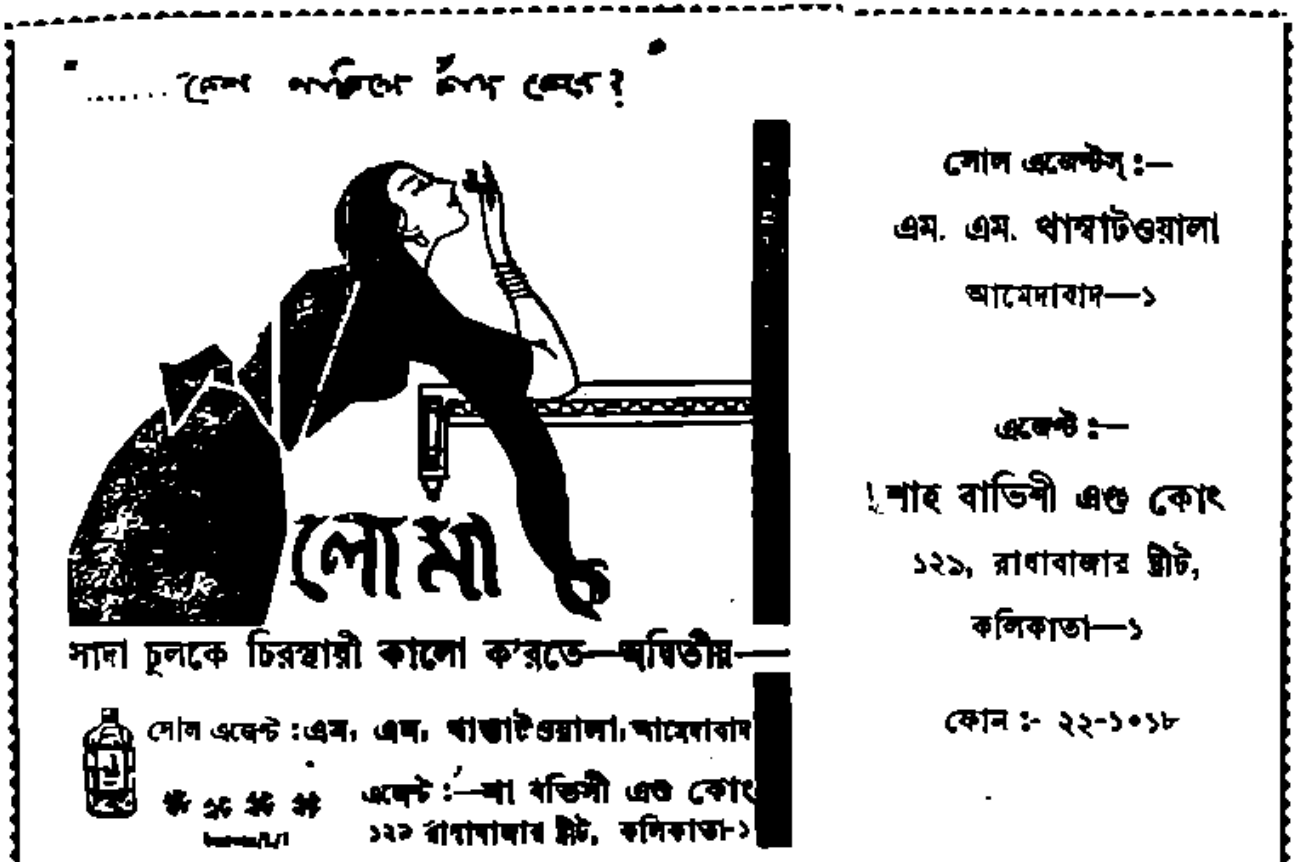

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়	৪২১
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৪২৪
বন্দিনী—সুশীল রায়	৪৩৭
পাহাড়ী গাঁয়ের কথা—নীলিমা দাশগুপ্ত	৪৪২
রায়বাঘিনী (উপন্যাস)—কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৪৫২

নতুন
জীবনের
নতুন
প্রয়োজন

পূরণ করতে নবজাতকের
জননীকে পুষ্টিকর
টনিকের ওপর নির্ভর
করতে হয়।
সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ
ভাইনো-মল্ট
ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায়
সাহায্য করে
এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি
ফিরিয়ে আনে।

ভাইনো-মল্ট

বেঙ্গল
ইমিউনিটি
কোং, লিঃ

এই সংখ্যায়

বাংলা রঙ্গালয়ের নব-রূপায়ণ—নবযুগের প্রথম আলো—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ৯২৭

একজন আর কয়েকজন—অনিলকুমার ভট্টাচার্য ৯০১

সমাজ ও সাহিত্য—শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ৯০৬

সাহিত্য ও সাহিত্যিক— ৯১১

সাহিত্য সংবাদ—পবিত্র পাল ৯১৩

অব্যাহত গতি

একদা মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া ইহাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন লেখকের খোঁজ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে পার্বতী-তনয় গণেশ এই শর্তে রাজি হইলেন যে তাঁর লেখনী মুহূর্তের জন্যও থামিবে না।

আধুনিক যুগের লেখকরাও চান যে তাঁদের লেখার গতি কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়। আর এই অব্যাহত গতির জন্যই সুলেখা আজ এত জনপ্রিয়

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ; কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

দেশবিদেশের খবরের জন্য

১। **উইক্লী ওয়েস্টবেঙ্গল**—পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা ; ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

২। **কথাবার্তা**—সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক ও অর্থ-নীতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা।

৩। **বসুন্ধরা**—গ্রামীণ অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। **শ্রমিক বার্তা**—শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত বাংলা—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১·৫০ টাকা।

৫। **পশ্চিম বংগাল**—নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা ; ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা।

৬। **মগবেরী বংগাল**—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা ; ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—(ক) চাঁদা অগ্রিম দেয় ;
(খ) সবগুলিতেই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় ;
(গ) বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই ;
(ঘ) ভি. পি. ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক—

রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা—১

এই ঠিকানায় প্রচার অধিকর্তার নিকট লিখুন।

এই সংখ্যায়

দেশ-বিদেশ— ৫১৬

বিশ্ব ব্যঙ্গ চিত্র— ৫২০

খেলাধূলা— ৫২৪

সাহিত্য-সংবাদ— ৫২৮

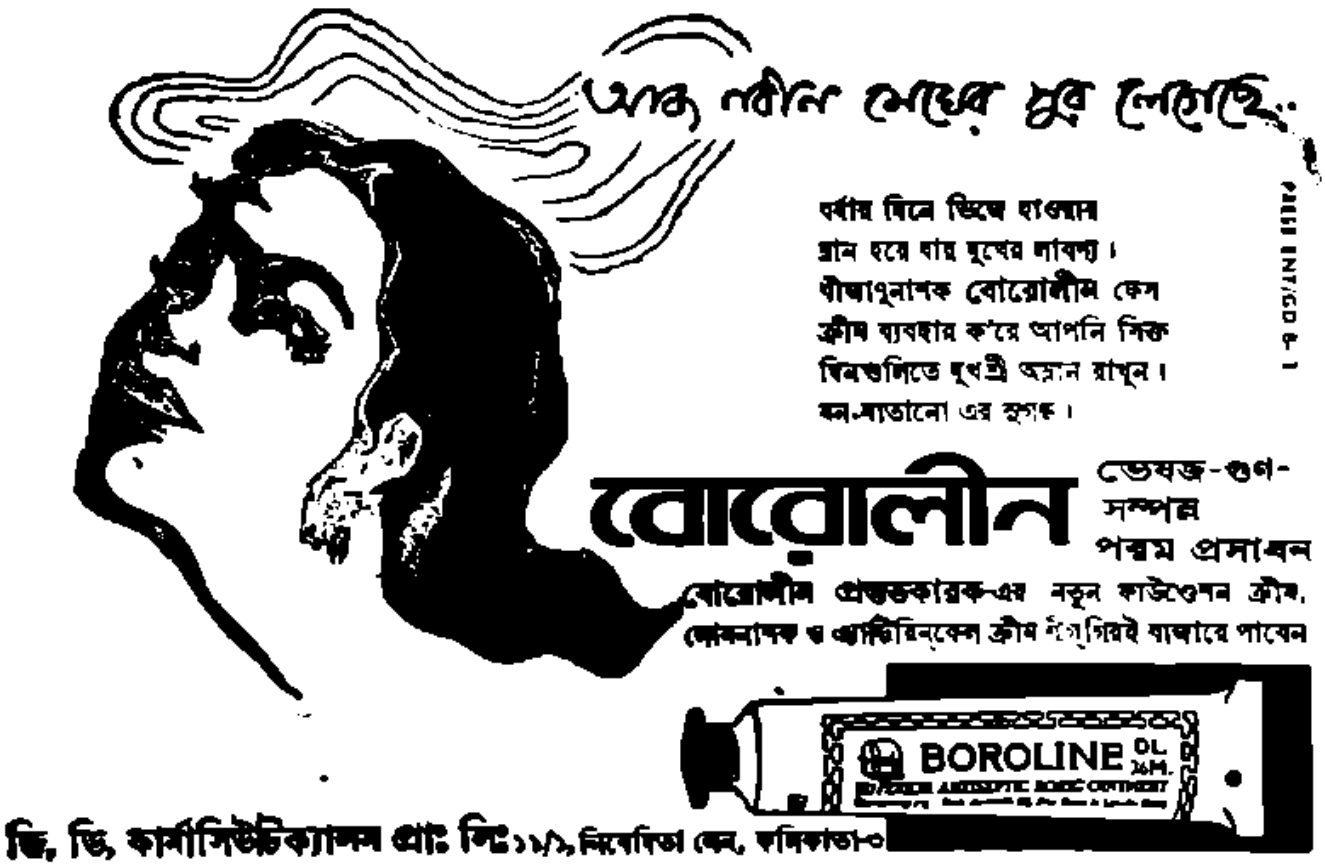

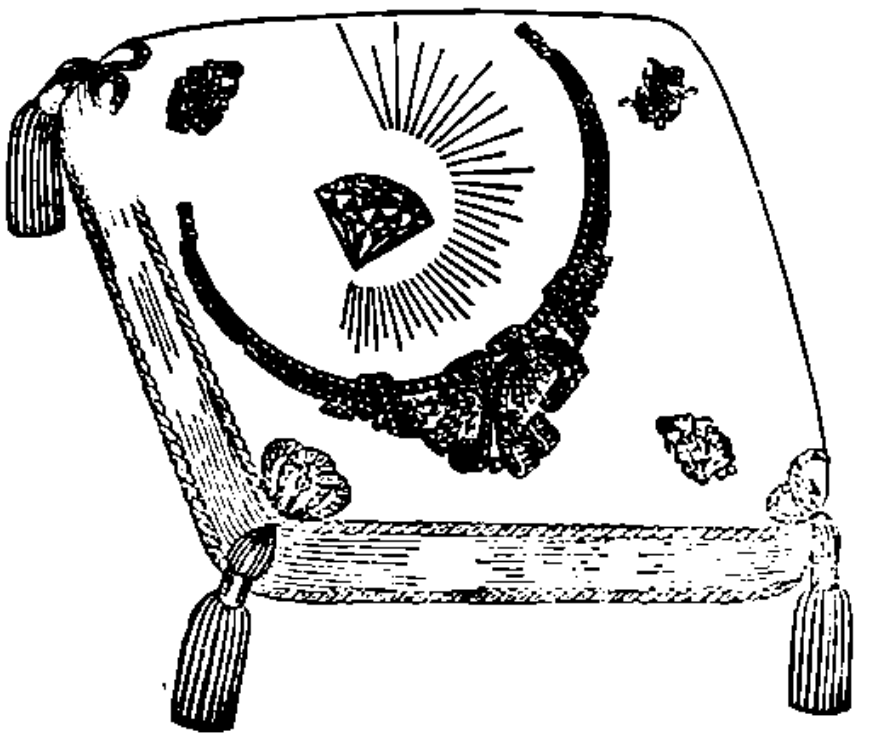

আধুনিকতম রুচির সর্ব্বপ্রকার স্বর্ণ-অলঙ্কার, মণি, মুক্তা, হীরা,
জহরত প্রভৃতির অপূর্ব্ব সম্ভার।
বিবাহ ও উৎসব অনুষ্ঠানে প্রিয়জনকে উপহার দিবার
নানাপ্রকার অভিনব ও চিত্তাকর্ষক অলঙ্কার।

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড জেনারেল মার্চেন্টস্

স্থাপিত ১৮৮২

১-এ, বেন্টিক ষ্ট্রীট (মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস্), কলিকাতা।

ফোন : ২২-২২৭০

ব্রাঞ্চ :—৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন : ৪৭-১২৫৮

এই সংখ্যায়

●

বিশ্বের পুতুল-নাচ

পুতুল নাচ শিল্প এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ—সুদর্শন পাল ৫৩১

পুতুল-নাচের শারীর স্থান—সঙ্কর্ষণ রায় ৫৩৩

গ্রীস—ছন্দা রায় ৫৩৫

তুরস্ক—প্রণব ভট্টাচার্য ৫৩৬

আমেরিকা—প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩৭

অষ্ট্রিয়া—সুচিত্রা মজুমদার ৫৩৮

পুতুল নাচ-শিল্পে অন্যান্য দেশসমূহ—সমীরকুমার বসু ৫৩৯

আনন্দে উৎসবে...

দৈনন্দিন প্রয়োজনে...

সবার মনোরঞ্জনে...

পরিশোধিত সুরভিত

কেশতৈল

কেশরঞ্জন

কলিকাতা কেমিক্যাল এণ্ড ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১

গল্প-ভারতী

সপ্তদশবর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ—১৩৬৮

সম্পাদকীয়

অগ্রহায়ণ দিয়ে হেমন্ত শুরু। এ মাসের ৭ই প্রায় ৩০ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিনী মৃণালিনী দেবী শয্যা নিলেন, আর উঠলেন না। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের এক হেমন্তে তিনি যশোহর থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুর সড়কে নববধূ হয়ে এসেছিলেন। নীরবেই তিনি সংসারের সব কাজ করে গেছেন, শুধু রেখে গেছেন স্নিগ্ধ কয়েকখানি চিঠি (পত্রাবলী ১ম সংখ্যা), আর মনীষী স্বামীর অপূর্ব কাব্য 'স্মরণে'—শোকই সত্য 'শ্লোক' হয়ে, স্বামীর লেখনী, মৃণালিনী দেবীকে অমর করেছে।

তিনি নিপুণা গৃহিণীরূপে একা বাড়ির কাজ করে গেছেন ও নাটোর মহারাজ জগদিন্দ্রনাথকেও খাইয়ে তৃপ্ত করেছেন। ১৯০১ সালে শিলাইদার পাট উঠিয়ে শান্তিনিকেতনে স্বামীর সঙ্গে ব্রহ্মচর্যাশ্রম গড়া তিনি শুরু করেছিলেন। ছাত্রদের খাওয়া হয় না দেখে নিজে রেঁধে খাইয়েছেন এবং টাকার টানাটানি দেখে (তখন মাত্র ৫০০৲ রবীন্দ্রনাথের আয়) নিজের গহনা আদর্শবাদী স্বামীকে দিয়েছেন।

এই সব কথা পূজনীয়া হেমলতা ঠাকুরের কাছে শুনে আমার প্রথম আবেগ আসে কবিপত্নীর নামে কিছু করা। রবীন্দ্র-শতাব্দীর প্রস্তুতিরূপে তাই আমাদের 'মৃণালিনী কুটীর'। নারী ও গ্রাম-সেবিকারা বোলপুরে এসে এখানে থেকে স্বচ্ছন্দে গুরুপল্লী, সঙ্গীত-ভবন, কলা-ভবন, বিনয়-ভবন ও বিশ্বভারতী দেখে আসতে পারেন। "শ্রীনন্দা" স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ হাতে এই মৃণালিনী-কুটীর গড়ে 'মাতৃ-ঋণ' কথঞ্চিৎ শোধ করে তবেই রবীন্দ্র-শতাব্দীর কাজ শুরু করেছে।

পত্রিকায় তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত 'গোরা' উপন্যাস প্রকাশ করেন ও সস্নেহে রথী ও বৌমাকে উৎসর্গ করেন। শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতন, পল্লী মঙ্গল, কলাভবন ও ক্রমশ বিশ্বভারতী গঠনের বহু জটিল সমস্যার সমাধানে তাঁর পিতৃদেবকে প্রধানত রবীন্দ্রনাথই বিশেষ সাহায্য করে গেছেন। প্রতিমা দেবী যেমন চিত্রে ও রবীন্দ্র-নাট্য ও নৃত্য-যোজনায় পারদর্শিনী, তেমনি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্থপতিরসিক পিতার 'স্থপতিজ্ঞ' পুত্র। তিনি ফুলের ছবি অনেক এঁকেছেন আর বাগান গড়ায় তাঁর জুড়ী ছিল না। উত্তরায়ণের উদ্যান-বাটিকাটি রবীন্দ্রনাথেরই রচনা। কারুশিল্পে (Art and Crafts) তাঁর অপূর্ব দক্ষতা ছিল, 'প্রবর্তনী'তে সবাই দেখেছি। পিতার স্মৃতিকথা যেটুকু তিনি লিখে গেছেন সবারে পড়বার মত। ১৯১১-১৩ দুই বৎসর, বিশ্বভারতীর উপাধ্যক্ষরূপে কাজ করার পর রবীন্দ্রনাথ দেরাদুনে বিশাল উদ্যান গঠনে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে যান। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা গভীর বেদনা পাই। কলা ভবনের সার্থক শিল্পী সুরেন কর (শিল্পাচার্য নন্দলালের আত্মীয়) মহাশয়—আশা করি "রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন" বিষয়ে লিখে যাবেন। সেই পুস্তিকায় নন্দলাল বসু ও তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের স্কেচ (sketch) জুড়ে দিলে সবাই আমরা সুখী হব। গুরুদেবের 'গানের ভাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিনুদা) বহু আগেই চলে গেছেন—সন্তোষ মজুমদার প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের সহপাঠীরাও গেছেন। রবীন্দ্রনাথের বংশে এখন রইলেন কন্যা প্রতিমা দেবী ও তাঁর কন্যা-জামাতা নন্দিতা ও কৃষ্ণকৃপালনী। মৃণালিনী দেবীর কথা লিখতে গিয়ে সবাইকে আজ আমাদের মনে পড়ছে।

পারিবারিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ এনেছিলেন এক অনন্যসাধারণ শ্রী ও ছন্দ। সাংসারিক রবীন্দ্রনাথের ধৈর্য, ত্যাগ ও নিষ্ঠার তুলনা নেই। সন্তানের প্রতি তাঁর মমতার পরিচয় মেলে জীবনের পদে পদে।

কবিপত্নীকে লিখিত পত্রের অংশ বিশেষ :

"তোমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা কোরো জামাইষষ্ঠি এসে আমি কি রকম যত্নআত্তির মনোযোগ করেছি। ঢাকাই মুড়ি চাষর ছাড়া আর কথা নেই। এখানকার [মজঃফরপুর] লোকে জানে আমি শরতের শত্তর, বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজের কর্তাপক্ষ, অগত্যাগত্ত মাননীয় অভ্যাগত রবি ঠাকুর—আমার বেলভূষা দেখে তাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেছে।"

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ॥

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

একশত বৎসর পূর্বে বাংলার আকাশে যে সকল মনীষী আবির্ভূত হইয়া আলোক বিস্তার করিয়াছিলেন—যাঁহাদিগের কৃত কার্যের ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছে—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব নামে পরিচিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদিগের অন্যতম। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুয়ারী সোমবার তারিখে ব্রাহ্মণ পরিবারে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জিলার খন্যান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম কলিকাতা হইতে প্রায় ৩৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। পিতা পুলিশ বিভাগে চাকরি করিতেন—কার্যব্যপদেশে নানাস্থানে যাইতেন ও থাকিতে হইত। মাতৃহীন ভবানীচরণ পিতামহীর স্নেহে লালিত পালিত। তাঁহার পিতৃব্য কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন।

এই সময় বাংলার—তথা ভারতের ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধে এদেশে ইংরেজ-প্রাধান্যের যুগ। তাহার ঠিক একশত বৎসর পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ অতর্কিত ভূমিকম্পের বা প্রবল বাত্যার মত দেখা দিয়াছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাহা বাঙ্গালীর শিক্ষাকেন্দ্র ও মনীষার কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ যেমন উল্লেখযোগ্য—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও তেমনই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে—শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে স্কুল সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সোসাইটী—"কলিকাতা কালীতলায় একটি বৃহৎ বালিকা বিদ্যালয় ও দুইটি ইংরেজী স্কুল সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুল একটি। তাঁহারা শহরের বাঙ্গলা পাঠশালার গুরুদিগকে পারিতোষিক দিয়া শিক্ষার উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিতে তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেন। ... এই সোসাইটির দ্বারা রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার পোষক 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' প্রবন্ধ ও বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষোপযোগী 'নীতি কথা' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।"

ভবানীচরণ যখন শিক্ষারম্ভ করেন, তখন বাংলায়—বিশেষ কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষা বদ্ধমূল হইয়াছে এবং দেশে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার ফলেই যে ভারতে জাতীয়তার ও রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভের আগ্রহ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে লালা লজপত রায় বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালীরাই এদেশে প্রথম ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেন—সেইজন্য তাঁহারা দেশে নবযুগ প্রবর্তন করিবেন—ইহা বিধাতার বিধান।

ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে ভবানীচরণের উপনয়ন সংস্কার হয়। তিনি ব্রহ্মচারীর মত ধর্মানুষ্ঠান পালন করিতে থাকেন এবং হিন্দুধর্মের সার তত্ত্ব অবগত হইবার চেষ্টায় ভট্টপল্লীতে টোলে পণ্ডিত মহাশয়দিগের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

বাল্যকালেই তিনি শরীরচর্চায় মনোযোগী হন এবং এক সময় তিনি কলিকাতার বিখ্যাত পালোয়ান অম্বিকাচরণ গুহের প্রিয় শিষ্য হইয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালীরা ইংরেজের অনুকরণে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা আরম্ভ করিয়াছিলেন—কিন্তু শ্রমসাধ্য বলিয়া ফুটবলে—রাগবী খেলায় বিরত ছিলেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রে তখন সুরেন্দ্রনাথ বিস্ময়কর বাগ্মিতা ও শক্তি লইয়া সমাগত—ইটালীর প্রথম স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের প্রেরণা প্রদানকারী ম্যাটসিনীর মত প্রচার করিতেছেন—সমগ্র ভারতে জাতীয়তার বাণী প্রচার করিয়া মহাভারত রচনার চেষ্টা করিতেছেন। বন্ধু আনন্দমোহন বসুর সহিত একযোগে তিনি 'ছাত্রসভা' প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছাত্রদিগকে জাতীয়তার মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছেন।

ভবানীচরণ উভয়ের প্রভাব অনুভব করিলেন—নূতন ভাবের ভাবুক হইলেন।

প্রথমে তিনি ম্যাটসিনীর মতই কার্যে পরিণত করিতে সংকল্প করিলেন—পিতৃবন্ধু আনন্দমোহনের বিপ্লবাত্মক রাজনীতিক আন্দোলনের (প্রতিবাদ, নিবেদন ও আবেদন) করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—লেখনীর দ্বারা পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করা যাইবে না—সেজন্য প্রয়োজন বাহুবল—তরবার।

গীতার যে শেষ শ্লোকে স্বামী বিবেকানন্দ পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন, ভবানীচরণ তখনও তাহার অন্বয় বুঝেন নাই—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রী বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতি র্মতির্মম॥"

"শেষ কথা এই মোর শুনহ রাজন—
যেই পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণজনার্দন,
যেই পক্ষে ধনুর্ধর পার্থ বীর রয়,
সেই পক্ষে রাজ্যলক্ষ্মী, সেই পক্ষে জয়,
সেই পক্ষে সমুন্নতি, সেই পক্ষে নীতি;
নিশ্চয় বলিনু আমি ইহা মোর মতি।"

সেই জন্যই যে ভবানীচরণ বহু বাধা সহিয়া—বহু কার্যে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া সেই পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অধ্যাত্ম-শক্তির প্রয়োজন আছে,—তাহা বাহুবলকে পশুবলে পরিণত হইতে নিবৃত্ত করিবে। বাহুবল ব্যতীত আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করা অসম্ভব।

এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই অরবিন্দ বলিয়াছিলেন—"ভারতীয়ের রাজনীতি বৈধাত্মিক; বেদান্ত কেন সত্য বা অসত্যার্থ বিচার করে না,—কোন পথে স্বল্প সময়ে অথচ নিশ্চিতরূপে মোক্ষ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ করা যায় তাহাই দেখে—আমরাও তেমনই উপায়ে সর্বাপেক্ষা স্বল্প সময়ে অথচ নিশ্চিতরূপে আমাদিগের আদর্শে উপনীত হইতে পারি তাহাই করি—সে আদর্শ ভারত এক, স্বাধীন ও অবিভাজ্য, এই সত্যই আমরা উপলব্ধি করিতে চাই।

ম্যাটসিনীর উক্তি—জাতীয় সমস্যার সমাধান ব্যতীতও যে আর্থিক উন্নতি সাধন করা যায়—এই ভ্রান্তমত পোষণ করিও না।

ভারতের জাতীয় সমস্যা—স্বাধীনতালাভ। ভবানীচরণ আনন্দমোহনকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায়, তিনি মনে করিতেন, যুদ্ধে ইংরেজকে পরাভূত না করিলে স্বাধীনতালাভ করা যাইবে না। কিন্তু উপায় কি? বাঙ্গালীর পক্ষে সেনাদলে প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ। সেইজন্য সামন্তরাজ্যের সেনাদলে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধকৌশল-শিক্ষা লাভের অভিপ্রায়ে তিনি সখী সংগ্রহ করিয়া গোয়ালিয়রে গমন করিলেন। কিন্তু অভিভাবকদিগের সন্ধানে ধরা পড়িয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাকে মেট্রোপোলিটন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি করা হইল—তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তথায় অধ্যাপক। তখনও তাঁহার মনে

সাময়িক সিদ্ধান্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী। তিনি আবার গোয়ালিয়র যাত্রা করিলেন। গোয়ালিয়রে সেনাপতির কথায় তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আশা ফলবতী হইবে না।

ইহার বহুদিন পরে (১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে) বাঙ্গালী ষষ্ঠীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে থাকিয়া গ্রাম্য হিন্দী শিখিয়া ষষ্ঠীধর উপাধ্যায় নামে বরোদার সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইনি পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নিরালম্ব স্বামী হইয়াছিলেন।

গোয়ালিয়রে ব্যর্থকাম হইয়া ভবানীচরণ কিছুদিন লক্ষ্যহীনভাবে ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ১৮৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিলেন।

তখন তাঁহার মন ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহার পরে তিনি পূর্বপরিচিত ইংরাজদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে যোগ দিবার জন্য হায়দ্রাবাদে গমন করেন এবং পিতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া মুলতানে যাত্রা করিয়া পিতার সেবায় প্রবৃত্ত হন। পিতার মৃত্যুতে তিনি তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া আবার কর্মস্থান হায়দ্রাবাদে গমন করেন।

এই সময় হইতে তিনি ধর্মালোচনায় আকৃষ্ট হইয়া প্রথমে ব্রাহ্মধর্মের মত প্রচারযোগ্য বিবেচনা করেন। কিন্তু তাঁহার চিত্ত খ্রীষ্টধর্মের দিকে অগ্রসর হয়। তিনি দেখেন, পৃথিবীতে সকল সাধু ও ধর্ম-প্রবর্তক আপনাদিগকে 'পাপী' স্বীকার করিয়াছেন; কেবল যীশুখ্রীষ্ট আপনাকে নিষ্পাপ বলিতে পারিয়াছেন। ক্রমে তিনি খ্রীষ্টধর্মে এমনই আকৃষ্ট হন যে বন্ধু ইংরাজদের নিবারণ অগ্রাহ্য করিয়া খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন; খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে ভক্তি দেখিয়া তিনি ক্যাথলিক মতাবলম্বী হন। দীর্ঘকাল তিনি ওই ধর্মমত প্রচারে বিশেষ আগ্রহ দেখান এবং তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার বিশেষ আগ্রহে ও উৎসাহে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মুখপত্ররূপে "সোফিয়া" পত্র করাচী হইতে তাঁহারই সম্পাদনায় প্রচারিত হইতে থাকে।

এই সময় তিনি বেদান্তবিরোধী হইয়া একদিকে স্বামী বিবেকানন্দের ও অন্যদিকে থিওসফিস্ট শ্রীমতী বেসাণ্টের বিরোধী হইয়া বলেন, তাঁহারা ভ্রমাত্মক ধর্মব্যাখ্যার দ্বারা দেশকে অবনতির দিকে লইয়া যাইতেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন—ক্যাথলিক ধর্মমতই ভারতকে সেই অবনতি হইতে রক্ষা করিয়া সত্য ধর্মের সন্ধান দিতে পারে।

ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, উপাধ্যায় বিশ্বাসানুযায়ী কাজ করিবার যে সৎসাহস দেখাইতে পারিতেন, তাহা অসাধারণ। পরে এই সৎসাহসই তাঁহাকে বেদান্তবাদী করিয়া প্রায়শ্চিত্তান্তে আবার হিন্দু হইতে প্ররোচিত করিয়াছিল।

ভারতবাসীর আত্মিক ও রাজনীতিক মুক্তি-কামনা হইতে তিনি কখনও বিচলিত হয়েন নাই।

উপাধ্যায়ের জীবনে এই সময়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য ভাব সপ্রকাশ হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্লেগ প্রবেশে মহামারী দেখা দেয়। উপাধ্যায় আপনার বিপদের আশংকা অনায়াসে বর্জন করিয়া রোগীর সেবা করিতে লাগিলেন। এই সেবাব্রত তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা ও সজ্জনতার প্রমাণ।

হাণ্টার লিখিয়াছেন—'A youth who starts life with such a wrench away from the order of things around him as is implied by conversion, may have strange an oscillations before he reaches true equilibrium or poise."

উপাধ্যায়েরও তাহাই হইয়াছিল। ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে তিনি ক্যাথলিক মতের সহিত হিন্দু আচার ব্যবহারের সামঞ্জস্য সাধনের সম্ভাবনা দেখিয়া সেই বিষয়ে সচেষ্ট হইলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার প্রথম ও প্রবল প্রভেদ এই যে উভয়েই বিচারবাদী এবং উভয়েই বুদ্ধিনিষ্ঠ হইয়া ধর্মের সাহায্যেই দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব মনে করিলেও বিবেকানন্দ প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন—হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থা ও আচার প্রভৃতি বর্জন করিলে তাহা কেবল সমাজে বিশৃঙ্খলা আনিবে। বিবেকানন্দ কালোপযোগী ও অবস্থার উপযোগী পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু বুঝিয়াছিলেন—"প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। সেই ভাব জগতে কার্য করছে—সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যেদিন সে আবশ্যকটুকু চলে যাবে, সেদিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ, দারিদ্র্য, ঘরে বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা জাতের জন্য এখনও আবশ্যক।"

এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া বিবেকানন্দ একদিকে বিদেশীদিগকে আর একদিকে বিদেশীর অনুরক্ত ভারতীয়দিগকে সত্য বুঝাইবার চেষ্টায় বলিয়াছিলেন—

"তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান্ নিজেকে ভাব, ওটা কল্পনা; ভারতেও বল আছে, মান আছে, এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি। "এটি তোমরাও বেশ কোরে বোঝ—যাঁরা অন্তর্বহিঃ সাহেব সেজে বসেছ এবং আমরা নরশিশু, 'তোমরা হে ইয়োরোপী লোক, আমাদের উদ্ধার কর' বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ। আর যীশু এসে ভারতে বসেছেন বলে, হাসেন হোসেন করছ। ওহে বাপু, যীশুও আসেন নি জিহোবাও আসেন নি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন।.....ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, ঐ কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এদেশে চিরকাল।"

এই যে ভাব—ইহারই পরিণতি কোথায় তাহা আমরা বিবেকানন্দের উক্তিতেই বুঝিতে পারি;—

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর, ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত, ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামায়ের ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ—ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের

কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন রাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; যা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

ভারতের সমাজের প্রতি এই যে অনুরাগ—ইহাতে কেহই যেন মনে না করেন, বিবেকানন্দ সমাজকে সময়োপযোগী পরিবর্তনবিমুখ করিতে চাহিয়াছিলেন—অকারণ রক্ষণশীলতার সমর্থক ছিলেন। কারণ, তিনিই বলেছেন—

"আর্য্য রাজন্যগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর,……তোমরা উচ্চবর্ণরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের 'মমি'।……স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরী কর কেন, এতে ভারত গরীবের রক্তমাংসহীন অঙ্গকূল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যায় না? তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলীতে পূর্ব পুরুষের সঞ্চিত রক্ত কি অমূল্য রত্নে অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বপুরুষের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন কোনও সুবিধা হয় নি। এখন, ইংরেজদের রাজ্যে, অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের হাত যত শীঘ্র পার হাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক।"

তিনি নূতন ভারতের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা অসাধারণ। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তাহা আমাদিগের আলোচ্য নহে। উপাধ্যায় যে প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টান ক্যাথলিক মতের সহিত ভারতীয় পদ্ধতি মিশাইয়া ভারতবাসীর গ্রাহ্য ধর্ম হইতে পারে, তাহার কারণ তিনি প্রথমে যাঁহার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, সেই কেশবচন্দ্র সেন হিন্দুর বেদান্ত অধ্যয়ন করেন নাই এবং উপাধ্যায় যখন তাঁহার প্রভাবে প্রভাবিত তখনও তিনি ইউরোপীয় প্রভাব হেতু তত্ত্বিতত্ত্বের সন্ধান পান নাই। পরে তিনি তাহা পাইয়াছিলেন।

উপাধ্যায় খ্রীষ্টান হিন্দু ধর্মের প্রচারকল্পে জব্বলপুরে নর্মদাতীরে এক মঠ স্থাপিত করিলেন। উদ্দেশ্য, এই মঠে একদল উৎসাহী সন্ন্যাসী গঠিত হইবেন—ধর্মের জন্য তাঁহারা সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত হইবেন। এই মঠ প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সহিত বারাণসীতে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মতভেদ হইল।

ইহার পরে তিনি নানাস্থানে পরিভ্রমণান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং দুইজন অবাঙ্গালী বন্ধুর সহিত একযোগে 'সোফিয়া' পত্র প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ক্যাথলিকরা উহা নিষিদ্ধ করিলেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহিত একযোগে তিনি "টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী" মাসিক পত্র প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহার পরে তিনি শিক্ষার দিকে মনোযোগ দিয়া জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিয়া কলিকাতায় এক বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই বোলপুরে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহকর্মী হইলেন। তিনিই এই বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র ও অধ্যাপক সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তখন আমার সহায় ছিলেন…তিনি তখন একদিকে বেদান্ত অন্যদিকে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন। কোনও কালেই বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা আমার না থাকাতে উপাধ্যায়ের সহায়তা আমার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল।"

ইহার পরে ইউরোপে বেদান্তমত প্রচারের জন্য তিনি ২৭৲ টাকা সম্বল করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলেন এবং মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ যাত্রা করিলেন।

যাত্রার পূর্বে তিনি 'বঙ্গবাসী' পত্রের সহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনি 'বঙ্গবাসী'তে "বিলাত প্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠি" লিখিবেন এবং সেজন্য পারিতোষিক পাইবেন।

ইউরোপে রোম দেখিয়া তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া কয়েকটি বক্তৃতা দেন। সে সকলের মধ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপাধ্যায় যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে আবশ্যক অর্থ ও উপযুক্ত অধ্যাপক পাইলে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-দর্শন চর্চা হইবে স্থির হয়। একালে প্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক স্টেন তাঁহাকে উৎসাহিত করেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে উপাধ্যায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। তখনও "স্বদেশী আন্দোলন" নামে পরিচিত স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ করে নাই। তবে সে আন্দোলন যে ভাবের অভিব্যক্তি সে ভাব তখন বাংলার শিক্ষিত সমাজে দেখা দিয়াছে। সেই ভাব দেশের লোকের—বিশেষ তরুণ সম্প্রদায়ের মনে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যে সকল কেন্দ্র স্থাপিত হয় সে সকলের মধ্যে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'ডন সোসাইটী' সর্বপ্রধান। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। উপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

নর্মদা তীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়েই উপাধ্যায়ের মন যত ভারতমুখী হইয়াছে, তত তিনি রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। সে সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি—

"আমার ঘর নাই—পুত্র কন্যা কেহই নাই। আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম, নর্মদাতীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া—সেই নিভৃত স্থানে ধ্যান-ধারণায় জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে প্রাণে কি এক কথা শুনিলাম।...ভারত আবার স্বাধীন হইবে—এখন নির্জনে ধ্যান-ধারণার সময় নয়—সংসারের রণস্থলে মাতিতে হইবে।...আমি চন্দ্র দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমি ওই মুক্তির সমাচার প্রাণে প্রাণে শুনিয়াছি।... আমি নর্মদার আশ্রম ছাড়িয়াছি বটে, আমার হৃদয়ে আর একটি আশ্রমের নূতন ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি দেখিতেছি, স্থানে স্থানে স্বরাজ-গড় নির্মিত হইয়াছে। সেখানে ফিরিঙ্গির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না।...আর গোলাম-গড়ে থাকিতে চাহি না—ওই স্বরাজ গড় গড়িতে—স্বরাজ তন্ত্রের প্রজা হইতে আমার প্রাণ সদাই আনচান।"

এই স্থানে একটি কথা বলা যাইতে পারে। 'সন্ধ্যা'র উপাধ্যায় ইংরেজকে 'ফিরিঙ্গি' ও 'টুপীওয়ালা' বলিতেন। এ বিষয়ে অরবিন্দের সহিত তাঁহার মতভেদ ছিল। অরবিন্দ একদিন সেই প্রসঙ্গে বর্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন—

"দেশের জনসাধারণে ইংরেজ ও জার্মান প্রভৃতিকে 'ফিরিঙ্গি' ও 'টুপীওয়ালা' বলিয়া জানে—কাজেই ইংরেজ ব্যতীত আর সব য়ুরোপীয় প্রভৃতির উপর বিদ্বেষ সৃষ্টি করা ভাল নহে—বিশেষ স্বাধীনতালাভের জন্য অর্থাৎ ইংরেজকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য হয়তো আমাদিগকে অন্য কোন না কোন জাতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদিগের সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের ঘৃণা উৎপাদন সেইজন্য কল্যাণকর নাও হইতে পারে। অরবিন্দের এই কথার মূলে কি ছিল, তাহা তখন অনেকে জানিতেন না।" আমি উপাধ্যায় মহাশয়কে সেই কথা বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন। তাহাতে উপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, অরবিন্দের কথার যাথার্থ্য তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু প্রস্তুতির সময়ে লোককে সহজ কথায় মনের ভাব বুঝানোই ভালো। যাঁহারা "ইহ বাহু—আগে কহ আর" করিবেন, তাঁহারা আমাদিগের আক্রমণের লক্ষ্য কে তাহা বুঝেন। আর বিদেশের সাহায্য পাওয়া ও পাইয়া তাহার সম্যক সদ্ব্যবহার করা, সে তো "হসোজ মিল্লী হুরুফ।"

য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগমনকাল পর্যন্ত উপাধ্যায় যে তাঁহার প্রকৃত কাজ সন্ধান করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার নানা বিষয়ে অবহিত হইবার স্বল্পকালস্থায়ী চেষ্টায় বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কখনও ধর্ম, কখনও শিল্প, কখনও বিদেশে ভারতীয় মত প্রচার তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে—তাহাতেই তিনি আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন। স্বদেশে নানাস্থানে ও বিদেশে তিনি যেন 'কিপ্ত এর প্রায়'—তাঁহার নির্দিষ্ট কাজের সন্ধানে ফিরিয়াছেন। রাজনীতিতে কখনও তিনি অখণ্ড মনোযোগ দেন নাই। কিন্তু তিনি যতই স্বদেশকেন্দ্রী হইয়াছেন, ততই তিনি সেই লক্ষ্যের নিকটবর্তী হইয়াছেন। তাঁহার সেই কাজ কি? তাহা রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া তিনি আদালতে যে বিবৃতি দেন তাহাতেই সপ্রকাশ। সেই বিবৃতিতে তিনি তাহার উল্লেখ করেন—"God ordained mission of Swaraj."

উপাধ্যায়ের সাংবাদিক প্রবণতা তাঁহাকে নানা পত্র প্রচারে প্ররোচিত করিয়াছিল। বর্তমান সময়ে সংবাদপত্রই যে লোক শিক্ষার উপায় তাহা তিনি জানিতেন। সেইজন্য ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে তিনি জনসাধারণকে হিন্দুর অতীত গৌরবের সন্ধান দিতে ও অপর দিকে ভারতবাসীর অধঃপতনের কারণ যে পরাধীনতা তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য স্বল্পমূল্যের বাংলা দৈনিক পত্র প্রকাশের আয়োজন করিতে থাকেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সেই আয়োজন সম্পূর্ণ হয় এবং ওই বৎসর নভেম্বর মাসে উহা প্রকাশিত হয়। উপাধ্যায় উহার নামকরণ করেন—"সন্ধ্যা"।

'সন্ধ্যা'র অনুষ্ঠান-পত্রে তাহার নামকরণের কারণ ও তাহার উদ্দেশ্য বিশদভাবে কিন্তু সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হয়। ওই 'অনুষ্ঠান-পত্র' এইরূপ—

"দুঃসময় পড়িলে লোক বলে, এই ত কলির সন্ধ্যা অর্থাৎ কালরাত্রির ভোগ মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়া সুপ্রভাত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব। কিন্তু কলির সন্ধ্যার একটি শাস্ত্রীয় অর্থ আছে। বার শত বৎসর ধরিয়া কলির এক একটি সন্ধ্যা। এইরূপ চারিটি সন্ধ্যা চলিয়া গিয়াছে। এখন পঞ্চম সন্ধ্যা।

"প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভব সাগরে জীব ডুবিয়া না মরে, তাই তিনি গীতারূপ ভেলা প্রদান করিয়াছিলেন। যাহারা উহার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা তুফান কাটাইয়া কূল পায়। আর যাহারা উহাকে অগ্রাহ্য করে, তাহারা হাবুডুবু খায়।

"দ্বিতীয় সন্ধ্যায় বৌদ্ধ বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। আশ্রম ধর্ম ভাসিয়া যাওয়ায় সমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল।

"তৃতীয় সন্ধ্যায় শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয়। তিনি বৌদ্ধদিগের গর্ব খর্ব করিয়া হিন্দু ধর্মের জয়পতাকা উড়াইয়াছিলেন।"

"চতুর্থ সন্ধ্যায় ম্লেচ্ছাধিকার। এইবার ভারতকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিয়াছে। অনাচারে ও অত্যাচারে দেশ বাঁচিয়া থাকিয়াও যেন মরিয়া গিয়াছে।"

পঞ্চম সন্ধ্যায় বোধ হয় সুদশার পালা আসিতে পারে। কিন্তু পঞ্চমেরও বার বৎসর চলিয়া গেল, তবু কোন সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। এখন উপায় কি? পুরাতন কথা ভাবিয়া দেখিলে উপায় কি, তাহা বোধ হয়, বুঝা যাইতে পারে। আমরা একটি লম্বা রশিতে বাঁধা আছি। কত ঘুরিয়া যাই না কেন, কতই ঘুরপাক খাই না কেন, খোঁটা ছাড়িবার যো নাই। সেই বেদ-বেদান্ত, সেই ব্রাহ্মণ, সেই বর্ণধর্ম ছাড়া হিন্দু সন্তানের আর গতি নাই।

"কলির পঞ্চম সন্ধ্যায় আমরা 'সন্ধ্যা' নামে যে এক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—কেবল এই একমাত্র উপায় ভালো করিয়া বুঝানো। রাজা ম্লেচ্ছ। উপজীবিকার জন্য মান-সম্ভ্রমের জন্য ম্লেচ্ছ ভাষা ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিখিতে হইবে, ম্লেচ্ছ হাবভাব ধরিতে হইবে, নহিলে উপায় নাই। এতে আর কি খাঁটি ধর্ম থাকে? সমস্যা শক্ত বটে, কিন্তু সিদ্ধান্তও আছে। রাজার সহিত সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। রাজার প্রজার কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে রাজনৈতিক কথা 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় বিস্তর থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির কার্য্যকলাপ ও দেশ-বিদেশের বিবিধ সংবাদ লিখিত হইবে। বিদেশীয় কলাকৌশল শিখিয়া কিরূপে ধনবাহুল্যের বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহারও মতটা থাকিবে। কিন্তু সকল কথার মাঝে সহজ কথায় বাঙ্গালীর প্রাণের কথা আমরা সদাই বলিব। যাহা শুধু—যাহা শিব—যাহা কর—'হিন্দু' থাকিও বাঙ্গালী থাকিও। সখের জন্য সাহেবি চং সকল করিলে আসল ভেস্তে যাবে। কিন্তু বিদেশী বিদ্যা শিখিলে বা পেটের দায়ে ধর্মে ব্যাঘাত না করিয়া বহিরঙ্গী ব্যাপারের অল্পসল্প বদল করিলে ক্ষতি নাই। সকল অবস্থায় কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়া জাতি মর্য্যাদা রক্ষা করিলে কোন দোষ স্পর্শ করিবে না। আমরা যতই নিজেকে ভুলি না কেন, আমাদের হৃদয়ে এক পুরাতন সুর যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বাজিতেছে।

"পূজাপার্বণ, শিল্প সাহিত্য, সমাজনীতি, গৃহস্থালী ইত্যাদি সকল কথাই বলা হইবে, কিন্তু সমুদয়ের ভিতরে ঐ এক সুরের খেল থাকিবে—বেদ, ব্রাহ্মণ ও বর্ণ ধর্ম। এলতলা বেলতলা সেই বুড়ির পায়ের তলা। আমরা যদি এই কথাটি বুঝিয়া একনিষ্ঠ হইতে পারি, নিশ্চয়ই ভগবানের কৃপা হইবে—অন্ধকার ঘুচিবে। নাস্তি গতিরন্যথা।

এই পত্রিকায় কোন নূতন কথা বলিবার স্পর্দ্ধা আমরা রাখিব না। আমাদের অগ্রজদিগের নিকট যাহা শিখিয়াছি, তাহাই কেবল নূতন আকারে প্রকাশিত করিব। তাঁহাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।"

এই সকল বিষয়ে ভূষিত হইয়া 'সন্ধ্যা' জনসমাজের মধ্যে প্রচারিত হয়।

যে দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া 'সন্ধ্যা' প্রচারিত হয়—তাহার মধ্যে রাজনীতিক উদ্দেশ্য দ্বিতীয় হইলেও ঘটনাচক্রে তাহাই অল্পদিনের মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্থান অধিকার করিল। তাহার বিশেষ কারণও যে ছিল না, এখন নহে। পরাধীন জাতিকে পদে পদে রাজনীতিক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। রাজনীতির প্রথম ও প্রধান কথা—স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতা। সুশাসনও কখন স্বায়ত্ত-শাসনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না এবং ইংরেজ শাসন সুশাসন ছিল না। সে কথা রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—

—এ দেশে ইংরেজের শাসনের দুই সংখ্যা দুই দিক—শাসন ও শোষণ, ইংরেজ সরকারী কর্মচারী ও ইংরেজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী একই উদ্দেশ্যে একই কাজ দুই ভাবে করিতেছে।

বাঙ্গালী সর্বপ্রথম বুঝিয়াছিল, বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন না করিলে উপায় নাই। কিন্তু সে আপনার সেই কাজ করিবার শক্তি প্রত্যয় হারাইয়াছিল। সেইজন্য লালা লাজপত রায় বলেন—বাঙ্গালী সিংহ! কিন্তু সে যে সিংহ তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। লর্ড কার্জন তাহাকে আঘাত করিয়া তাহাকে সেই সত্য উপলব্ধি করাইয়াছেন। সে আঘাত বাঙ্গালীকে বিভক্ত করিয়া বাঙ্গালীকে দুর্বল করা। তাঁহার প্রবেশ বিভাগের প্রস্তাবে দেশে বিক্ষোভ উপস্থিত হইল—যে সংগ্রাম আরম্ভ হইল তাহা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য যেমন শ্রীকৃষ্ণের মুখমন্ত্রাতে পূর্ণ হইয়া উঠায় করিয়াছিল—বাঙ্গালী তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আপনার বৈরুব্য হইতে মুক্তি পাইয়া তাহার জন্মের অধিকতর

সার্থকতা লাভের জন্য 'সত্য সিংহে প্রায়' কাজ করিতে লাগিল। বহুকট অর্থাৎ বিদেশী বহিষ্কার বাঙ্গালী যোদ্ধার হস্তে সুদর্শনচক্রের মত কাজ করিতে লাগিল। বাঙ্গালীর রাজনীতি বৈধাত্মিক হইল। কি উপায়ে সে তাহার লক্ষ্যে সর্বাপেক্ষা স্বল্পকালমধ্যে ও সুনিশ্চিতরূপে উপনীত হইতে পারে, তাহাই তাহার লক্ষ্য। লক্ষ্য—স্বাধীন অখণ্ড ভারত। সে জন্য যে উপায় প্রয়োজন বাঙ্গালী তাহাই গ্রহণে প্রস্তুত হইল—হিংসা ও অহিংসা উভয়ের মধ্যে প্রভেদ—অনেকক্ষেত্রে—প্রয়োজনে দূর হইয়া গেল। একজন ইংরেজই ইহাকে "awakening wave" বলিয়াছিলেন। খালা সম্প্রদায়—"আবেদন আর নিবেদন খালা বহে বহে নতশির"—সে সম্প্রদায় ভয় পাইলেন এবং তাঁহাদিগের সেই ভয়ের সুযোগ লইয়া অদূর ইংরেজ তাঁহাদিকে সামান্য সুযোগ-সুবিধাদানে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যে সম্প্রদায় ভয় পাইলেন না—সেই সম্প্রদায়ের মুখপত্র হইল—'সন্ধ্যা'।

'সন্ধ্যা'র বক্তব্য ভাব—উদ্দীপনার উদ্দীপক; তাহার ভাষা সরল ও সবল। তাহার পূর্বে বাংলা সংবাদপত্র কখন হাজারে হাজারে বিক্রীত হয় নাই। মনে পড়ে—অপরাহ্ণ, ঘোলটুমের আমলার দল অফিসে ও আদালতে কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিবার জন্য ট্রামে বসিয়াছেন, ধর্মতলায় ফিরিওয়ালা হাঁকিল—'সন্ধ্যা'—বাবু 'সন্ধ্যা'! বাবু উগ্র বিরক্তির ভাবে বলিলেন—"ঘাঃ—ও কাগজ কে পড়ে?" ট্রাম যখন ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মোড়ে তখন আবার ওই ডাক—"সন্ধ্যা"—বাবু, সন্ধ্যা", বাবুর সুর একটু নরম—"নাঃ।" তাহার পরে ট্রাম আসিল হ্যারিসন রোডের মোড়ে—আর একটু পরেই নামিতে হইবে—হয়ত তখায় "সন্ধ্যা" পাওয়া যাইবে না তাই ফিরিওয়ালার ডাকে বাবু একটি পয়সা দিয়া বলিলেন,—"দে, দেখি—কি লিখেছে।" যেন "সন্ধ্যা" না পড়িলে চলিবে না।

কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে 'সন্ধ্যা' কার্যালয় যেন একটি 'খরাজ গড়'—তথায় বহু মনীষীর সমাগম হইত। উপাধ্যায় বাহীত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী নিত্যলেখক। আর মধ্যে মধ্যে—আলোক চন্দ্র লিখেন—বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেনচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্তমান প্রবন্ধের লেখক, নরেন্দ্রনাথ সেঠ প্রভৃতি। দল গঠন করা হইত—দেশাত্মবোধ, রাষ্ট্রসচেতন, গণশক্তি প্রভৃতি। প্রবন্ধের নাম কি হইবে—তাহা বিবেচিত হইত। একদিন সেই সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন, কার্যাধ্যক্ষ—শ্যামসুন্দরের ভ্রাতা গিরিজাসুন্দর (ওরফে খাদিক)—"নট নড়ন চড়ন নট কিছু"।

শ্যামসুন্দর ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র। একদিন উপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ—ফিরিঙ্গির সম্বন্ধে ব্যঙ্গে তিনি বলিলেন—"লোক কিন্তু নিন্দা করিতেছে—আমরা নিরুত্তরে যাইতেছি।" উপাধ্যায় বলিলেন, "এসব কথায় কান দিবেন না। ইংরেজকে ফিরিঙ্গি বলা যায়—ব্যঙ্গ করা যায় লোক তাহা বুঝুক। নহিলে ভয় কাটিবে না।" পরদিন তিনি প্রবন্ধ লিখিলেন, "গোরা পায়ের লাথি।" পিতার পদে গোদ ছিল, তিনি ছেলেকে তা দেখাইতেন—'যারব এই পায়ের লাথি।' ছেলে ভয় পাইত। একদিন পিতা সত্যসত্যই সেই পায় পুত্রকে পদাঘাত করিলেন—ছেলের ভয় ভাঙ্গিল যেন ফুলার বধ্যা! তাহার ভয় কাটিয়া গেল। তেমনি ফিরিঙ্গিকে যে ওইরূপ কথা বলা যায় সে সম্বন্ধে ভারতবাসীর ভয় দূর করাই প্রয়োজন।

'খরাজ গড়' 'সন্ধ্যা' কার্যালয়ে 'সদাব্রত' ছিল। কত যুবক আসিত, যাইত, থাকিত। সেজন্য কখন অর্থের অভাব অনুভূত হইত না। অর্থ কে—কিরূপে যোগাইতেন, তাহা জানিতেন—উপাধ্যায়। অর্থের অভাব জানিলে যাঁহারা অধীর হইয়া গোপনে অর্থ পাঠাইতেন, তাঁহাদিগের অন্যতম—নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন। বাংলার স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় এই দেশপ্রেমিকের দানের পরিমাণ কেহ অবগত নহেন, —কখনও অবগত হওয়াও যাইবে না।

'সন্ধ্যা'কে কেন্দ্র করিয়া উপাধ্যায় নানা কাজ করেন—সাপ্তাহিক পত্র 'স্বরাজ' ও অর্ধসাপ্তাহিক পত্র 'করালী' প্রকাশ ; বঙ্কিমোৎসব, শিবাজী উৎসব, অর্ধোদয়যোগে সেবাদল গঠন।

অর্ধোদয়যোগে কলিকাতায় যে অগণিত জনসমাগম হইবে, তাহা বুঝিয়া স্বেচ্ছাসেবকদল গঠনের ব্যবস্থা হয়। পুলিশ প্রথমে এই দলকে কাজ করিবার অধিকার প্রদান করিতে অস্বীকার করে ; পরে সেবক-দিগকে পরীক্ষা করে। পুলিশ কয়জন স্বেচ্ছাসেবককে সাঁতারে লইয়া গঙ্গার মধ্যভাগে এক ব্যক্তিকে জলে ফেলিয়া দেয়। একাধিক স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া জলে পড়ে ও কিভাবে জলমগ্নকে কূলে লইয়া যাইতে হয়, তাহা দেখায়। পুলিশ তাহাদিগের কার্য দেখিয়া বিস্মিত হয়। যোগের সময় এই স্বেচ্ছাসেবক-দল ঘাটে ঘাটে ও পথে যে সেবাকার্য করিয়াছিল, তাহা অনন্যসাধারণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি—অরবিন্দেরই মত—উপাধ্যায়ের অসাধারণ ভক্তি ছিল। সেইজন্য উপাধ্যায় উদ্যোগী হইয়া কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃগৃহে বঙ্কিম-মহোৎসবের ব্যবস্থা করেন। কলিকাতা হইতে বহু লোক সে জন্য সাঁতারে গমন করেন। 'স্বরাজ' পত্রের প্রথম সংখ্যায় উপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন—

"যাঁহার 'বন্দেমাতরম্' পাঞ্চজন্যনাদে আজ কন্যাকুমারিকা হইতে গোমুখীধারা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ মাতিয়া উঠিয়াছে, যাঁহার সুললিত শব্দবিন্যাসের কলধ্বনি বঙ্গভাষার গদ্য রচনাকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে, যাঁহার নানা আখ্যায়িকার প্রমোদরসোচ্ছ্বাসে রঞ্জিত বাঙ্গালী বিভোর হইয়া আছে, যিনি বর্তমান যুগে যেরূপ সভ্যতা বিপর্যস্ত বাঙ্গালী সমাজের শিক্ষাদাতা,—প্রথমে সেই বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া আমরা 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছি। তাঁহার 'আনন্দমঠে' স্বরাজের মহামন্ত্র নিহিত আছে—তাই তাঁহার আলেখ্য সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার জীবনকথার আলোচনা করিয়া তাঁহার 'বন্দেমাতরম্' গীত গাহিয়া আমরা 'স্বরাজে'র মঙ্গলাচরণ করিলাম।"

এই মহোৎসব উপলক্ষে অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেন, তাহা 'বন্দেমাতরম্' পত্রে প্রকাশিত হয়।

শিবাজী উৎসব বৃহৎ ব্যাপার। ইহাতে যোগ দিবার জন্য বালগঙ্গাধর তিলক, খাপর্দে, ডক্টর মুঞ্জে প্রমুখ ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণ করা হয়। ইহার অঙ্গ হিসাবে একটি মেলা প্রতিষ্ঠিত হয়—তাহাতে স্বদেশী পণ্য বিক্রীত হইত। এই উৎসবে উপাধ্যায়ের পশ্চাতে ছিলেন—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সখারাম গণেশ দেউস্কর। ইঁহারই জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতা রচনা করেন।

এই উৎসবের আয়োজনকালে আবশ্যক অর্থলাভ সম্বন্ধে উপাধ্যায়ের বিশ্বাসের পরিচয় পাইয়াছিলাম। মেলার ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হয়। কপর্দকশূন্য অবস্থায় কিরূপে এই কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহাই উপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি যোগেন্দ্রকৃষ্ণ বসুকে ও আমাকে সঙ্গে লইয়া ডক্টর রাধাগোবিন্দ দেবের নিকটে অর্থসংগ্রহের জন্য গমন করিতেছিলেন। তিনি আমার প্রশ্নে বলিলেন—অর্থের অভাব হইবে না। এ কথা বলিয়া তিনি বলেন, কোন শহরে এক সাধু একদিন তাঁহার ভক্তদিগকে বলেন —শহরের সব কুকুরকে হালুয়া খাওয়াইতে হইবে—শহরে উহা ঘোষণা করিতে ও ওইদিন কুকুরগুলি তাড়াইয়া নির্দিষ্ট স্থানে আনিতে হইবে। যাহারা সে কথা শুনিল, তাহারা ভাবিল—ইহার কোন বিশেষ কারণ নিশ্চয়ই আছে। কেহ সুজি, কেহ চিনি, কেহ ঘৃত আনিয়া দিতে লাগিল। শহরের সব কুকুর জড় করিয়া তাহাদিগকে হালুয়া খাওয়ান হইল।

এক সপ্তাহকাল কলিকাতা শহর শিবাজী-উৎসবে মত্ত ছিল।

বহুদিন পরে গ্রন্থের বন্ধু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও আমি আমন্ত্রিত হইয়া রাজবলহাট গ্রামে গমন করি। তথায় আমাকে যে মানপত্র প্রদান করা হয়, তাহাতে শিবাজী-উৎসবের মেলার উল্লেখ দেখিয়া আমি বিস্ময় প্রকাশ করিলে, তত্রত্য সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় মনোহর বাবু বলেন, তিনি ওই মেলায় বস্ত্র বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন এবং মেলায় বক্তৃতায় তিনি এতই আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান হইয়াছেন যে, ফিরিয়া আসিয়া অন্য তরুণদিগের সহিত একযোগে গ্রামের কেন্দ্রস্থলে পাঠাগার গৃহ আপনারা নির্মাণ করেন।

সরকার যে 'সন্ধ্যা' দলন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সে সংবাদ পূর্বেই পাওয়া গিয়াছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আগস্ট পুলিস 'সন্ধ্যা' কার্যালয়ে খানাতল্লাস করিয়া ও কার্যাধ্যক্ষকে গ্রেপ্তার করিল। তখন কার্যালয়ে আর কেহ ছিলেন না। উপাধ্যায় যখন আসিলেন, তাঁহার ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধেও ওয়ারেণ্ট আসে। তখন তিনি পুলিসকে ডাকিয়া পাঠাইয়া গ্রেপ্তার হইলেন (৩রা সেপ্টেম্বর)।

মামলা আরম্ভ হইল। তাঁহার পক্ষে ব্যারিস্টার—চিত্তরঞ্জন দাস। ২৩শে সেপ্টেম্বর মামলার শুনানী আরম্ভ হইবার পূর্বক্ষণে উপাধ্যায়ের পক্ষ হইতে বিবৃতি দেওয়া হইল। উহাতে তিনি 'সন্ধ্যা' সম্বন্ধে সব দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যাহা বলিলেন, তাহাতে আদালতে যেন বোমার বিস্ফোরণ হইল—

"I do not want to take any part in this trial because I do not believe that in carrying out my humble share of the God ordained mission of Swaraj I am in any way responsible to the alien people, who happen to rule over us and whose interest is and necessarily be in the way of o true national development."

অর্থাৎ—আমি এই মোকর্দমার (বিচারে) কোন অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহি। কারণ, যে বিদেশী জাতি ঘটনাক্রমে আমাদিগের শাসক এবং যাহাদিগের স্বার্থসঙ্গতই আমাদিগের প্রকৃত জাতীয় বিকাশের অন্তরায় ও অন্তরায় হওয়া অনিবার্য—ভগবানের নির্দিষ্ট স্বরাজ ব্রত উদ্‌যাপনে আমার দীন কাজের জন্য আমি যে কোনরূপে তাহাদিগের নিকট কৈফিয়তের জন্য দায়ী তাহা আমি বিশ্বাস করি না।

যে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে 'সন্ধ্যা' কাগজ "কাজি কি কর্ম" বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন—এই রাজদ্রোহের মামলা তাঁহারই কাছে বিচার্য ছিল। তিনি অন্তর্বৃদ্ধি রোগভোগকারী উপাধ্যায়কে আদালতে বসিতে আসনও দেন নাই—ক্ষমা চাহিবার কথায় উপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—ছিঃ ফিরিঙ্গির নিকট প্রার্থনা। উহার ভদ্রতাজ্ঞান থাকেতো এ আপনিই আমাকে আসনে উপবিষ্ট হইতে বলিবে। কিংসফোর্ড বিবৃতি শুনিয়া বলিয়া উঠিল—"ওঃ—ওঃ!…"কিন্তু সে, বোধ হয়, বুঝিল—ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের নির্দেশ ঘোষিত হইল। আজ আসমুদ্র হিমাচল ভারতে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি বিজয়—স্বাধীনতার একটি প্রকট চিত্রণ ও বিকাশ ঘোষিত করিলেন। কারণ, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনে রাজদ্রোহের অভিযোগের উত্তরে একটি অভিযুক্ত ব্যক্তি ইতঃপূর্বে বলেন নাই—স্বরাজে তাঁহার অধিকার জন্মগত; তাহা অর্জনের চেষ্টা বিধাতার নির্দেশ—সে জন্য তিনি বিদেশী শাসকদিগের নিকট কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নহেন।

এদিকে উপাধ্যায় দুইটি কাজ করিলেন—

(১) তিনি বলিলেন, সন্ন্যাসীর গৈরিক বাসে তিনি কখন বিদেশী বিধর্মীর আদালতে আসামী হইয়া উপস্থিত হইবেন না। তিনি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ ব্যক্তিদিগের পরামর্শে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের ব্যবস্থানুসারে যথারীতি কৃত প্রায়শ্চিত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ গৃহীর বেশে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রূপে আদালতে যাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

(২) তিনি বলিলেন, ফিরিবার সাধ্য নাই যে, তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করে। (এ যেন coming events cast their shadows before, যে কাজের জন্য তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ওই বিবৃতিতে তাহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল।)

এদেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম রাজদ্রোহের অভিযোগে মোকর্দ্দমা—'বঙ্গবাসীর' বিরুদ্ধে—১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। সে মামলার আসামীর পক্ষে ব্যারিষ্টার জ্যাকসন সরকার পক্ষের যে সকল আইনগত ত্রুটি দেখাইতে থাকেন, তাহাতে সরকার বিব্রত হয়েন। এদিকে আসামীরাও ভীতি অনুভব করেন। সেই ভীতির সুযোগ লইয়া সরকার জমীদারসভার (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের) মাধ্যমে ব্যবস্থা করেন—আসামীরা মামলার কালে প্রবন্ধগুলি প্রকাশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন, সরকার মামলা প্রত্যাহার করিলেন।

তাহার পরে প্রথম যে মামলার বিচার হয় তাহা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই সভার 'কেশরী' সম্পাদক বালগঙ্গাধর তিলকের বিরুদ্ধে। সে মোকর্দ্দমায় তিলক প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে সরকার মামলা প্রত্যাহার করিবেন, এমন ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিলক তাহাতে সম্মত হইলেন না, পরন্তু বলিলেন, সংকটকালে জাতিবিদ্রোহ হইলে জনগণের সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় এবং জনগণের আস্থা হারাইলে তাঁহার পক্ষে মহারাষ্ট্রে বাস আর আত্মসম্মানে থাকার কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু তখনও বলা হয়, ভারতবাসীদিগের পক্ষে রাজদ্রোহী হওয়া অসম্ভব।

উপাধ্যায়ই প্রথম ঘোষণা করিলেন—ইংরেজের এদেশ শাসনের অধিকার নাই; ভারতবাসীর পক্ষে স্বাধীনতালাভ চেষ্টা সঙ্গত—তাহা রাজদ্রোহ বলা যায় না।

আসামীকে আসন ছিয়া উপবিষ্ট হইতে বলার মত শিষ্টাচার ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের ধাতুতে ছিল না। দিনের পর দিন কয় ঘণ্টা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকায় উপাধ্যায়ের রোগ বাড়িয়া গেল—অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হেতু তিনি ক্যাম্পবেল (বর্ত্তমান নীলরতন সরকার) হাসপাতালে ভর্ত্তি হইলেন। ২২শে অক্টোবর অস্ত্রোপচার হইল। এদিকে ২৪শে অক্টোবর 'সন্ধ্যা'র বিরুদ্ধে সরকার আর একটি মামলা রুজু করিলেন। এবার কার্য্যাধ্যক্ষ সারদাচরণ সেনকে অসুস্থ অবস্থায় গ্রেপ্তার করিয়া জামিন দেওয়া হইল না। সে সংবাদ উপাধ্যায়কে ব্যথিত করিল। ২৬শে অক্টোবর তাঁহার শারীরিক অবস্থার অবনতি লক্ষিত হইল এবং ২৭শে অক্টোবর বেলা ৩টার সময় তিনি শেষ শ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সেই সংবাদ দিবার জন্য 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কার্য্যালয়ে যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা চিরস্মরণীয়। সংবাদ শুনিয়া অতিবাবুর মুখে শোকের ছায়া লক্ষিত হইল; কিন্তু শিশিরকুমার সভাই আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"উপাধ্যায় খুব দেখিয়ে গেল, যে কথা সেই কাজ; ওদের কলা দেখিয়ে চলে গেল"। 'ওরা' অবশ্য ইংরেজ শাসকরা। মুক্তিকামী শিশিরকুমার মুক্তপুরুষের মুক্তির আনন্দ সম্ভোগ করিলেন।

হাসপাতাল হইতে শোভাযাত্রা করিয়া শব 'সন্ধ্যা' কার্য্যালয়ে নীত হইল এবং তাহার পরে সহস্র সহস্র কণ্ঠে গীত 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত করিয়া শোভাযাত্রা নিমতলা শ্মশানে উপনীত হইল। বহু মহিলার রোদন শ্রুত হইল—'সন্ধ্যা'র মাধ্যমে উপাধ্যায় তাঁহাদিগের অগ্রজ ছিলেন। শব চিতাশয্যায় শায়িত করা হইল—ডক্টর সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের পত্নী যাহা বলিলেন, তাহাতে নারী সমাজেও যে নবভাবের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়া ইংলণ্ডের 'টাইমস্' পত্রের প্রতিনিধি তাহা তার করিলেন।

উপাধ্যায়কে ইংরেজ কারারুদ্ধ করিতে পারিল না। দেশমাতৃকা তাঁহার ভক্ত সন্তানকে লইয়া গেলেন।

চিতায় কলসে কলসে সমাপ্তি জল দিবার সময় উপাধ্যায়ের বন্ধু সহকর্মী ও ভক্তদিগের মনে হইতে লাগিল— হে বীর—তোমার

"ধরাবদ্ধ প্রাণ হউক শীতল
মর-জনমের হা-হা;
সত্য সত্য তুমি মরণ-সফল
জীবনে খুঁজিলে যাহা।"

বন্দিনী ॥

সুশীল রায়

জানালায় ব'সে শিস দিই, আর গান করি। আনন্দের আর আমার সীমা নেই।

যারা বলে আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, আমি তাদের দলে না। আমি শেষ পেয়ে গেছি আমার আকাঙ্ক্ষার। এর চেয়ে বেশি উন্নতি জীবনে আর চাই নে।

আনন্দে তাই আমি শিস্ দিই, আর গান করি।

অনেক দিনের আশা পূর্ণ হয়েছে আমার, অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা। দোতলার ঘর পেয়ে গেছি একটা। জীবনে প্রথম এই আমার দোতলার জীবন। এতে আনন্দ কার না হয়?

মেটে কুঠুরি, আর কোঠাবাড়ি অনেক দেখা আছে। সে সব কিছু নতুন নয়। তারা সকলেই সমতলের সঙ্গে সমতালে বাঁধা। এই সমতলের জীবন ছিল আমার একটানা। তখন সেই নিচু থেকে আকাশের দিকে চেয়ে যে-স্বপ্ন দেখতাম দোতলায় বাস করার একটা রোমাঞ্চকর জীবনের। নিজেকে মাটি থেকে খানিকটা উঁচুতে টেনে তুলতে না পারলে চারদিক ঠিকমত দেখা হয় না।

ঠিক কি-জিনিস যে দেখা যায় প'ড়ে যায় জানি নে, বুঝিনে। কেবল এইটুকু বুঝি যে সমতলের এই নিচু জীবনটা কিছু না।

তাই উঁচুতে উঠেছি আমি। বেশি উঁচু না হলেও এই উঁচুটাই আমার কাছে অসামান্য। যারা তিনতলা কি চারতলায় বাস করে, আশ্চর্য; তাদের দেখে হিংসে হয় না আমার। কিন্তু আমার আগে যারা দোতলার ঘরে বাস করতো তাদের আমি মনে করতাম সম্রাট।

আমি এখন হয়েছি সেই সাম্রাজ্যের অধিকারী। আর কোনো আক্ষেপ আমার নেই। আমার জীবনের একটা ভীষণ স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে।

তাই আমি দোতলার এই জানালায় বসে আনন্দে শিস দিই, আর গান করি।

আমি নিজেই নিজের এই আনন্দের রকম দেখে হেসে মরি আর কি! এত আনন্দও আমার ছিল—মনের মধ্যে এমন ভাবে চাপা ছিল—এইটেই আমার বিস্ময়।

আকাশের দিকে তাকাতে ভুলে গেছি এখন। এখন আমি মাটির দিকে চেয়ে দেখি সকলকে। দূরের ওই মাঠ পার হয়ে হেঁটে গেছি কতদিন, কতবার। সে-মাঠ যে এমন আড়াআড়িভাবে পায়ে-হাঁটা পথ দিয়ে দুভাগ করা, তা চোখে পড়েনি। এখন দেখি আমারই ভূতপূর্ব জীবনের কোনো সহচরই হয়তো ওই হাঁটাপথে চলেছে একা একা। করুণা হয় ওর কথা ভেবে। ও জানে না, ও কি রকম একটা সাদা সিঁথির মত পরিচ্ছন্ন পায়ে-হাঁটা পথ ধরে চলেছে।

এখান থেকে যা দেখি তা-ই কেমন ভালো লাগে। ওই পানা-পুকুরটা ও। তিনটি ফ্রক-পরা মেয়ে কলার ভেলা বুকে দিয়ে ওই জলে সাঁতার কাটছে। এমন কী মধু আছে ওই সাঁতারে? তবু কেমন ভালো লাগে সব। এক-একবার কেমন ইচ্ছে করে—ঝাঁপ দিয়ে পড়ি গিয়ে ওদের মধ্যে। সারা গায়ে পানা মেখে সং সেজে কী আরাম। বসন্তের সবুজ ওড়িকার মত সর্বাঙ্গে পানার দাগ এঁকে জীবনে নতুন বসন্ত আনতে যেন ইচ্ছে জাগে।

একদিন সত্যি জাগলো এই বসন্ত। জানলায় বসে শিস্ দিচ্ছি আর গান করছি, অমনি কোন্ গাছের পাতার আড়াল থেকে কে যেন শব্দ ক'রে উঠল—কু-উ।

তিন বার শুনলাম ওই শব্দ। আমি তাকাতে লাগলাম এদিকে আর আর ওদিকে। কিছু দেখতে পেলাম না। আমার ঠোঁটের শিস্ আর গলার গান বন্ধ হয়ে গেল। কেবল দুটো চোখ ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগল চারধারে।

মোতলার জীবনে উঠে এসে জীবনের যে চরম শান্তি লাভ করেছিলাম, সামান্য একটা ওই শব্দে সেই শান্তি গেল উধাও হয়ে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখি কত বাড়ি। কোনোটা একতলা, কোনোটা দোতলা, কোনোটা-বা তিন-চার তলা। কোনো বাড়ির কোনো জানলায় কাউকে দেখি নে। উঁচু জীবনের সঙ্গে তারা নিশ্চয় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে; তাই তারা আমার মত এমন উৎকট আনন্দে আত্মহারা হয়ে এসে জানলায় বসে নি।

আমার গান বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু এবার প্রাণ হয়ে উঠেছে দিশেহারা।

ওই শব্দটার কথা ভাবি। আরো কয়েকবার শুনেছি ওই শব্দ। আশ্চর্য হয়েছি; যখনি আমি জানলায় গিয়ে দাঁড়াই ওই শব্দটা কেন—কেন তখনি বেজে ওঠে। অন্য সময় ও-শব্দটা তো হয় না।

কোকিলের ডাকের সঙ্গে পরিচয় আছে। প্রথমে একে কোকিলের গলা বলেই ধরে নিয়েছিলাম, কিন্তু বার কয়েক ও-শব্দ শুনে কেন—যেন মনে হল—এ শব্দ কোকিলের কণ্ঠের নয়, এ শব্দটা নিশ্চয় কোনো অন্য জীবের। মনের কথা অকপটে খুলেই বলি—আমার মনে হল, এ শব্দ নিশ্চয় কোনো কোকিলকন্যার।

কিন্তু কে সে? কেন সে অমন শব্দ ক'রে ডেকে ওঠে? ইচ্ছে করে জানলায় গিয়ে বসি; কিন্তু সেই সঙ্গে মনের মধ্যে ভয়ের শিহরণও অনুভব করি। আমি জানলার কাছে যাওয়া মাত্র যদি আবার বেজে ওঠে ওই শব্দ।

জানলার কাছে না গিয়ে একটু তফাতে থেকে চুরি ক'রে ক'রে দেখি চারধার। দুটো বাড়ি পরে একটা ছাতে রোজ ঠিক একই সময় বাচ্চাদের জামা আর ফ্রক মেলে দিতে আসে মাঝবয়সী একটি বউ। দুটো বাঁশের সঙ্গে তার বাঁধা—জামা—ফ্রকে ভরে যায় তার। কতকগুলো বাচ্চা যে আছে ওই বউটির জামা গুনে গুনে তাই হিসেব করার চেষ্টা করি। আর দেখি আরো দূরে চিলে কোঠা ডিঙিয়ে মাথা তুলে আছে নারকেল-গাছের কতকগুলো ঝালরদার পাতা। চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে এসে তেতলার ছাতে পাচ্চারি করে একটি বুড়ো। আমি এক পা এগিয়ে আলগোছে উঁকি দিয়ে দেখি আমার মোতলাবাড়ির দেওয়াল ঘেঁষা পেয়ারা গাছটা। দুটো শালিক তার ডালে ব'সে ঝগড়া করছে। আমার দিকে একবার তাকিয়েই পাখি—দুটো পালিয়ে গেল। আর-একটু এগোলাম—পেয়ারা গাছের ডালের গা থেকে যেন মরা চামড়া উঠছে, কচি কচি করেকটা ফল ধরেছে। কিছুক্ষণ দেখার পর অতি সন্তর্পণে আর—এক পা যেই এগিয়েছি অমনি সেই শব্দটা আচমকা বেজে উঠলো।

খেয়াল ছিল না, আমি একেবারে জানলার গায়ে গিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম; শব্দটা শোনা মাত্র আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো, আমি এক লাফে পিছনে হটে এলাম।

কিসের এই শব্দ। আমার এত সাধের মোতলার জীবন এমনভাবে বিষয় ক'রে তুলেছে যে-শব্দ কা'র—কা'র গলার?

ঘরের মেঝেতে চুপ ক'রে মাথা নিচু করে ব'সে পায়ের নখ খুঁটতে খুঁটতে কতক্ষণ ধরে যে এই গবেষণা করছি জানি নে। যখন মাথা তুলে তাকালাম, তখন দেখি পেয়ারা গাছের মগ ডালে পড়ন্ত দিনের নিভন্ত রোদে ব'সে চারটে কাক থেকে থেকে ডেকে উঠছে। তাদের এই কর্কশ গলার আওয়াজে কোনো আতঙ্ক বোধ করলাম না। কিন্তু মন কেমন উদভ্রান্ত হয়ে গেল। যে সুদূর নেপথ্য-দেশ থেকে সন্ধ্যাকাশের কোকিল পঞ্চমে কূজন ক'রে ওঠে, সেই সুদূর অজানা দেশের উদ্দেশে উৎকীর্ণ হল সারা মন।

আমার এই মোতলার জীবন বাসি হতে চলেছে। তার সমস্ত সুগন্ধ উধাও হয়ে গেছে, তার সমস্ত রোমাঞ্চ নিঃশেষ হয়েছে। এখন কেমন—যেন বিস্বাদ ঠেকছে এই জীবনটা। এক এক সময় মনে হয়, আগেই ভালো ছিলাম ওই সমতলের দেশে। সেখানকার জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া গিয়েছিল। এখন সেখান থেকে নিজেকে তুলে নিয়ে আসায় জীবনের তাল যেন কেটে গেছে একেবারে।

তাই ইচ্ছে করে চলে যাই : এই সাধে আর এই স্বপ্নে কাজ নেই আর। কিন্তু সাধ নয়, স্বপ্ন নয়, আমি বাঁধা পড়ে গেছি—কী-এক মায়ায়।

আপনারা বলতে পারেন, এটা মাথা খারাপের লক্ষণ ছাড়া কিছু না। আপনাদের অনুমান মিথ্যে নয়। আমার নিজেরই এক-এক সময় এমন সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু নিজেকে পাগল ব'লে ঘোষণা করতে পারিনি। নিজের পাগলামি নিজেই যদি ভালো মত ধরতে পারতাম, তা'হলে সে পাগলামি কবে ভালো হয়ে যেত।

কয়েকদিন জানালার ধারে যাই নি। সেদিন জানালার কাছ থেকে পালিয়ে আসার পর থেকে অনেক কয়েকটা দিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু আমি বুকের মধ্যে একটা ভীষণ মায়া আঁকড়ে পড়ে আছি। অনেক দিনই হয়ে গেল—ওই শব্দটাও শোনা হয়নি আমার। জীবনটা তাই কখনো-কখনো সোনা-সোনা ঠেকছে।

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে অনেক রাতে একদিন দরজা হয়ে গিয়ে বসলাম জানলায়। পেয়ারা গাছের পাতায় হাওয়া লেগেছে—পাতাগুলো একটু একটু কাঁপছে। গাছটার ওপারে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এক-তলা বাড়ি। ও-বাড়ির সব ঘর অন্ধকার। দূরে ওই চিলেকোঠায় মিটমিট করে জ্বলছে একটা আলো—চৌকো জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সেই আলোর রেশ মাত্র।

অনেকক্ষণ ব'সে আছি এই ভাবে। ভয়ের ভাবটা যেন কেটেছে। আমি আমার অজানিতেই গুন্ গুন্ করতে আরম্ভ করলাম। ভয় আরো কেটে গেল। গলা আর-একটু ছেড়ে অনেকদিন বাদে আবার এই জানালায় ব'সে ধরলাম একটা গান।

দু' চরণও গাওয়া শেষ হয়নি, অমনি আবার কানের একেবারে পাশেই হঠাৎ বেজে উঠলো; সেই কুহকিনী।

চমকে উঠলাম। ছিটকে সরে এলাম জানলার কাছ থেকে। অমনি শুনলাম একটা হাসির শব্দ। কে—যেন ব্যঙ্গ করল আমাকে।

চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ শব্দে জিজ্ঞাসা করলাম—কে তুমি, কে তুমি?

জবাব না পেয়ে জানলার কাছে গেলাম, বললাম,—কে তুমি?

জবাব না পেয়ে আমার বললাম,—এ কী মায়া?

পেয়ারা গাছের গোড়া থেকে যেন সাড়া এল; কে যেন বললো,—মায়া নই আমি মমতা।

ওই গলার স্বর অনুসরণ করে আমি পথের উৎসটা খুঁজতে লাগলাম। অনেকক্ষণ খোঁজার পর প্রাচীর-ঘেরা বাড়িটার জানলায় দেখতে পেলাম একটা ছায়া। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

রোমাঞ্চে সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

সাথের ষোড়শীর জীবন সাধনার পীঠস্থান হয়ে উঠলো, এক হয়ে উঠলো এক নিমেষে।

উঁচু প্রাচীরের নেপথ্যে ছিল যে এমন—একটা মমতার জগৎ; যদি সমস্তলের জীবনেই নিজেকে বেঁধে রাখতাম তা' হলে সেই জগতের সাক্ষাৎ পেতাম না কখনোই। এই জন্যে ষোড়শীকে নতুন ভালো লাগছে এখন। কত প্রাচীরের কত নেপথ্যে যে এমনি এক-একটা মমতাময়ী মূর্ছাহিত আছে—বসে বসে তাই ভাবি।

এখন আমার জীবন নতুন খাদে সুস্বাদু হয়ে উঠেছে। এখন প্রকাশ্য দিবালোকে আমি জানলায় গিয়ে আর বসি নে। আমাদের দু-জনের মধ্যে কেমন যেন একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে। আমরা এখন রাত্রের ঘন অন্ধকারের আড়ালে বসে আলাপ করি।

আমি বলি, তোমার নাম মমতা। আমার নাম তুমি নিশ্চয় জানতে চাও, কিন্তু এতদূর থেকে বলবো না। কাছে গিয়ে বলে আসবো একদিন।

উত্তর দেয় না। তবুও আনন্দ হয় নিশ্চয় ওর, কেমন অস্বাভাবিক ভাবে কিক্ কিক্ ক'রে হাসে।

যেদিন প্রথম আমি ওকে স্পষ্ট দেখলাম, সেদিন ছিল পূর্ণিমা। উদার জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট আলো এসে পড়েছে ওই জানলায়, আমি ষোড়শী থেকে চেয়ে দেখলাম ওকে ওই আলোয়। শুকনো ওঁড়ো ওঁড়ো চুল ফুরফুর করে উড়ছে হাল্কা বাতাসে, উপরের দিকে চেয়ে ও হাসলো।

ওই মুখ, ওই চোখ আর ওই হাসি দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। নিজেকে অসীম সৌভাগ্যবান বলে স্বীকার করলাম। প্রাচীরের অন্তরালবর্তিনী ওই বন্দিনীকে উদ্ধার করার জন্যে বীরত্ব জেগে উঠতে লাগলো। কিন্তু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একদিন বললাম, আমি গান গাইলে তুমি অমন বাধ কর কেন?

উত্তর দিল না, কিক করে হাসলো।

বললাম, তোমার গলা এমন মিষ্টি, তোমাকে আমি কি বলি জান?—কোকিলকণ্ঠী। তুমি গান গাও না কেন?

উত্তর দিল না। আবার কিক করে হাসলো।

বুঝতে পারলাম কথা বলার অসুবিধে ওর আছে। কেউ শুনে ফেলতে পারে। তাই কেবল ইসারায় কথা বলি শুধু।

ও না হলে আমার জীবন যে ব্যর্থ হয়ে যাবে—ক্রমশঃ আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল। সেই সঙ্গে অনুমান করতেও পারলাম, আমার সম্বন্ধেও ওই ধারণা ও-ও লালন করে।

আমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা অল্পদিনের মধ্যেই নিবিড় হয়ে এল। গভীর রাত্রে প্রত্যহ আমাদের এইভাবে দেখা সাক্ষাৎ চলেছে।

একদিন বললাম, চারদিক তো নিরিবিলি। আমি আসবো তোমার কাছে? প্রাচীর আর কতটুকু, ডিঙিয়ে ঠিক যেতে পারবো। বল আসবো? কিক্ করে হাসলো মমতা।

—আসছি কিন্তু।

আবার হাসলো। এর চেয়ে ভালোভাবে আর কী করে কাছে ডাকা যায়, তার এই অনুমোদন পেয়ে আমি নিচে নামলাম।

ধীরে ধীরে পেয়ারা গাছের ডালে পা দিয়ে প্রাচীরে উঠলাম। মমতা জানলায় দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। প্রাচীর থেকে লাফ দিয়ে পড়লাম। এই শব্দে কেউ জেগে উঠলো তো? একটু দাঁড়ালাম। মমতা শব্দ ক'রে হাসলো। বন্ধ হয়ে গেল আমার জীবন। আমি ধীরে ধীরে তার কাছে গেলাম। জানলার গরাদে ধরে দাঁড়ালাম, বললাম,—মমতা!

অমনি বিকট চিৎকার করে উঠলো সে, বীভৎস অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো যেন। সেই হাসির শব্দের সঙ্গে কানে এল লোহার—শেকলের শব্দ।

হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি। আর যেন ভয় নেই, কিছু নেই, আমি জানলার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম নিশ্চল মূর্তির মত।

ওদের বাড়ির সবাই জেগে গেল, ঘরে ঘরে চটপট আলো উঠলো জ্বলে। সেই আলোয় আমি আজ প্রথম এত স্পষ্টভাবে দেখলাম ওকে। দেখলাম, লোহার শেকল দিয়ে ওর দুপা বাঁধা।

এই বন্দিনীকে উদ্ধার করতে এসে আমি ধরা পড়ে গেলাম।

এর পরের কথা আমার মনে নেই। শুধু বন্ধুর বাবে কাল আমি ছাড়া পেয়েছি। আমার মাথা নাকি একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল, একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। এতদিন একটানা চিকিৎসার পর এবার নাকি সুস্থ হয়েছি। এখন আমার আচরণ নাকি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তাই মুক্তি পেয়েছি আমি।

তাই যদি চিকিৎসা করলে যদি এ রোগ সারে, তা'হলে মমতার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয় নি কেন? এখনো কি তার জন্যে কিছু করা যায় না? ওই বন্দিনীর পায়ের শিকল কেটে মুক্তি দেওয়া যায় না ওকে?

মাদ্রিদে তখন গোইয়া (Goya) স্প্যানিশ রয়্যাল ফ্যামিলির ছবি আঁকছেন।

একবার গুজব রটল তিনি ডাচেস অফ আলভার একখানি নিরাবরণ প্রতিকৃতি এঁকেছেন।

খবর শুনে ডাচেসের স্বামী ঘোষণা করলেন তিনি শিল্পীর স্টুডিয়ো দেখতে যাবেন, আর ব্যাপারটা যদি সত্য হয় তবে এই মর্যাদাহানির জন্যে উপযুক্ত শাস্তিও শিল্পীর ভাগ্যে লেখা আছে।

পরদিনই ভদ্রলোক গোইয়ার স্টুডিয়োতে এসে দেখলেন তাঁর স্ত্রীর ছবি আছে ঠিকই তবে সুন্দর পরিচ্ছদে ভূষিত। জনরব ভিত্তিহীন। ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত।

না, গুজব সত্য। একরাত্রের মধ্যেই গোইয়া দ্বিতীয় একখানি পোর্ট্রেট এঁকে ফেলেছেন, এমনই অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ছিলেন শিল্পী।

পূর্ব প্রকাশিতের পর

কিন্তু, ফুলমু তা নিতে পারে নি হাত পেতে। ওর মন সায় দেয় নি। ফুলমু পথে আসতে আসতে ভাবছিলো,—যেন ও নয়, যেন অন্য কোনো অচেনা শক্তি ওকে দিয়ে সকাল থেকে সব কিছু করালো। যে মনটা ওর চেনা জানা,—সে, ওই রুক্ষকে গোষাক, বল্গলে গয়না আর ওই আস্ত খস্ত ভেড়ার মাংসটা না নিয়ে একেবারে মুখ ফিরিয়ে বলবে, এটা একেবারেই যেন অবিশ্বাস্য ওর কাছে। পথে আসতে আসতে সে কথা বারে বারে ভেবেছিলো ফুলমু। যখন ভালপালা বোঝাই রেলগাড়িটা ওর সামনে দিয়ে গেলো, আর তার পেছন পেছন গেলো পাঁচজন কিষাণ—সুখী গলায় গল্প করতে করতে, তখন আরো বেশী করে মনে পড়ছিলো এ কথা।—নামুর নানী তো কেরৎ নিতে চেয়েছিলো না; ভেড়ার মাংসটা ফেরৎ দিয়ে ও ভাল করে নি,—ওর মন এ নিয়ে অনেকবার আফশোষই ক'রে ফেললো তখন।

কিন্তু, এই মুহূর্তে, ও যখন লাফ দিয়ে টুলে উঠে টানানো ভেড়ার মাংসটার বাঁধন খুলছিলো তখন ও মনে মনে ভাবলো যেওতার বিচার আছে, একেবারে নির্দয় নয় ওর ওপর। রসুই ঘরে এলো ওরা। পরমরাজ ভেঁড়াটাকে দু' টুকরো ক'রে নিয়ে, অর্ধেকটা সরিয়ে রাখলো, আর বাকি অর্ধেকটা ছোট ছোট টুকরো করতে লাগলো। যতবার তাকালো পর্ণা, ততবারই দেখলো ফুলমু অত্যন্ত সুখী মুখে সুখী চোখে নিষ্পলক চেয়ে আছে, ওর দিকে—ভেঁড়ার দিকে নয়। চেয়ে থাকুক ওর দিকে, তাতে কিছু ক্ষতি নেই পরমরাজের, কিন্তু চোখের চাউনিটা পাল্টাতে হবে ফুলমুর। ওকে তালিম দিয়ে পুরোপুরি দিলরাজ বানাতে হবে।

মাংস কাটা শেষ করে পর্ণা ফুলমুকে সামনের তাক্ থেকে নিমক, মিরচাই আর চাটনির শিশিটা নামিয়ে আনতে বললো। ফুলমু তার আপেল মতন লালাভ গালে টোল্ ফেলে, শঙ্খের মত গ্রীবাকে হেলিয়ে বললো, "আনছি সর্দার—" ছুটে গেলো ও তাকের কাছে। যেন ঘোড়োলো না, যেন হাল্কা পাখা মেলে ফুর ফুর ক'রে উড়ে গেলো।

ভুরু কুঁচ্‌কে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলো পর্ণা। ওর চোখের কোনায় রক্ত জমলো। ফুলমুর চলন বলন সবই বুঝিয়ে দেবে, ও মরদ নয়, ও মেড়্‌কি। যখন ফুলমু ওর দিকে চেয়ে বললো,—আনছি সর্দার—, তখন ওর চোখ দুটোতে অপূর্ব মদির কটাক্ষ—, সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা মন-মোচড়ানো দেহ-অবসকরা শিহরণ বয়ে গেলো পরমরাজের সারা শরীরে। তা'হলে কেমন ক'রে ও কাজ করবে। ফুলমুর ছুনিবার আকর্ষণ থেকে নিজেকে আত্মরক্ষা করতেই যদি ওর সমস্ত সময় কেটে যায়, তা'হলে ও আর কাজ করবে কখন।

ফুলমু নিমক মিরচাই এনে পর্বার চেহারা দেখে থাবড়ে গেলো। ক্যাল্ ক্যাল্ ক'রে পরমরাজের ভ্রু-যুগলের কুঞ্চন প্রসারণ দেখতে লাগলো।

"দেখছো কী? নিমক মিরচাই ভালো মাংসের ওপরে—"

হঠাৎ এমন একটা রুচ় ভর্ৎসনের জন্য ফুলমু একেবারে প্রস্তুত ছিলো না। ওর হাল্কা ভানা এক নিমেষে গুটিয়ে গেলো। চোখ নিচু ক'রে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে নিমক-মিরচাইয়ের শিশির ঢাক্না খুললো। মাংসে নুন-লংকা মাখানোর আগে চার টুক্রো মাংস ও ছাতুর মুখের সামনে ধরে দিলো।

ফুলমুর বিবেচনা দেখে খুশি হলো পর্বা, ভাব-ভঙ্গি দেখেও। এই মুহূর্তে মনে মনে মতলব স্থির নিলো ও,—মুখে এমনি একটা ছদ্মরোষ আর চোখে এমনিধারা একটা নির্দয় ভ্রুকুটি ফুটিয়ে রাখ্লেই আপাততঃ ওর কাজ চলে যাবে।

পরমরাজ কাঙ্ড়া শহরে এসে উঠলো, ওর বাপু সংসার রাজের বোন্ কর্পারচন্দ্রের বাড়িতে,—সঙ্গে দিল্রাজ। কর্পারচন্দ্রের কাছে পরিচয় দিলো দিলরাজের,—চাচাতো ভাই। কর্পারচন্দ্র কাঙ্ড়া শহরে কর্পার-মোড়ল নামে পরিচিত। কাঙ্ড়ার ব্যবসায়ীদের মধ্যে ও হলো সব চেয়ে প্রধান ব্যবসায়ী! কাঙ্ড়া-বাসীরা সকলেই কর্পারকে খুব খাতির করে, মান্য করে। সংসারে ওর কেউ নেই, দুটো লেড়কা-লেড়কি ভগবান দিয়েই আবার নিয়ে নিলো কেন কে জানে। বুড়িয়াটাও দু'সাল হলো ওকে ছেড়ে চলে গেছে, ছেলে-মেয়ের কাছে।—আমার বাড়িটা খা খা করতো, পরমরাজ, দিলরাজ, তোমরা এসেছো আমি খুব খুশি হয়েছি—। কর্পার মাথা নেড়ে নেড়ে বারে বারে সে কথা প্রকাশ করলো। বুড়োর অভিজ্ঞ চোখকে ফুলমুর ছদ্মবেশ ফাঁকি দিতে পেরেছে ব'লে ওরাও খুব খুশি হলো, সহজ হলো।

রাতের খানা শেষ ক'রে কর্পার ওদের নিয়ে সরস গল্পে মেতেছে। মাঝে মাঝে কলিতে (হুঁকোতে) সুখটান দিচ্ছে আর মাথা ঝাঁকিয়ে গল্প করছে।

: বুঝলে, সংসার-রাজের বেটা পরমরাজ, আজ তো আমার বাড়িতে তুমি খানা খেলে একটা সবজি দিয়ে, কিন্তু এমন দিন ছিলো আমাদের,—ওঃ! সে সব বোল্ বোলার কোথায় যে মিলিয়ে গেলো, কিরাগ্রামের সে সব কাহানী তোমার বাপুজী সব জান্তো—।

পরমরাজও জানে বুড়োরা একটু বেশী বক্তে ভালোবাসে, ওদের কথার মধ্যে যেই ধরালে আর রক্ষে নেই। কিরাগ্রামের নামই ও শোনে নি। কাজেই ওর সম্বন্ধে জানতে ওর ঔৎসুক্য হচ্ছিলো না তা নয়, বেশী বক্বকানি শোনার ভয়ে ও চুপ মেরে গেলো। কিন্তু ফুলমু না জিগ্যেস ক'রে পারলো না,

"কর্পার চাচা, কিরাগ্রামটা কোথায়? তার নাম তো কখনো শুনি নি?"

"শুনবি কী ক'রে বেটা, আমরা আমাদের রাজ্যও হারিয়েছি, আর তার সঙ্গে নামও হারিয়েছি, বৈজনাথের নাম শুনেছিস?"

ফুলমু ঘাড় নেড়ে বল্লো,

"হ্যাঁ, সেটা তো বড় তীর্থ স্থান—। পালমপুরের পরে—"

"ঠিক বলেছিস্। পালমপুর থেকে দশ মাইল দূরে হলো গিয়ে বৈজনাথ। এই বৈজনাথেরই নাম ছিলো কিরাগ্রাম,—"

কর্পার হাঁটু দুটো উঁচু ক'রে কলিতে একটা জোর টান দিয়ে নিলো,—"তা, কিরাগ্রামের সব চেয়ে নামী রাজা ছিলেন সুরথচন্দ্র আর তার ছেলে লক্ষণচন্দ্র। ত্রিগর্তের (জলন্ধর) মহারাজাদের খুব সুনজর ছিলো

কিরাগ্রামের রাজাদের ওপর। ত্রিসপ্ত রাজবংশেরই একটা শাখা কিনা কিরাগ্রাম—রাজবংশ। আর আমার শরীরে আছে সেই রাজবংশের রক্ত—", হাঁটু দুটো নামিয়ে আর কলিজার নড়িটা (নল) বাঁ হাতে নিয়ে কর্ণাক্ষ তার সরু বুক চিতিয়ে ডান হাতে একটা থাপ্‌পড় লাগালো বুকে। পর্ণা, ফুল্লু দু'জনেই হেসে উঠলো।

"হাসিস্ না রে বেটা—", বুড়া কলিজাতে আর একটা জোর টান দিতে গিয়ে দেখলো চিল্‌মে (কল্কি) আর এক ফোঁটা আগুন নেই নিতে গেছে। কলিজা নামিয়ে রেখে, হাঁটু উঁচু ক'রে, চাদর গায়ে পেঁচিয়ে নিয়ে, বেশ আয়েস ক'রে বসলো কর্ণাক্ষ।

"বৈজনাথের মন্দির দর্শন করতে তোরা তো একদিন যাবি—, কাণ্ডড়া এসি যখন, বাবা-বৈজনাথ দর্শন তো জরুর হোনা চাই, তখন মন্দিরের সেবায়েৎ-এর কাছে শুধিয়ে নিস্, সব বাতিয়ে দেবে। দুটো শিলালেখ আছে সেখানে,—তাতে কিরাগ্রাম রাজবংশের কথা সব লিখা আছে। রাজা লক্ষণচন্দ্রের দুর্গ আর প্রাসাদ যেখানে ছিলো,—সেখানে আজকাল হয়েছে বৈজনাথ—ডাকবাংলা। বৈজনাথের সারা আদমী এ বাত জানে—তারা ওটাকে বলে থাকপুর—"

কর্ণাক্ষর অসংলগ্ন কথা শুনে মজা লাগছিলো পর্ণার। উঁচু গলায় নিজেকে কিরাগ্রাম রাজবংশীয় ব'লে ঘোষণা করছে কর্ণাক্ষ, তাতে এখন ওর লাভ কী হবে? অবশ্য, হয়তো ওই মত্ত নন্দিরেই ও কাণ্ডড়ার প্রধান যাদুকর বনেছে, কে জানে! এর আগে, কর্ণাক্ষ কাণ্ডড়া দুর্গের একজন নাম করা গাইড ছিলো, সেটা জানে পর্ণা। আর ঠিক সেইজন্যেই ও কর্ণাক্ষ-চাচার কাছে এসে উঠেছে। ও মনে মনে স্থির করেছে কিছুকাল গাইডগিরি করবে কাণ্ডড়া-দুর্গের। তার জন্যে কর্ণাক্ষর সাহায্য এবং সহযো[illegible] দুই-ই চাই।

কর্ণাক্ষ-চাচা তুড়ি মেরে ওকে আশ্বাস দিয়েছে,—তিন রোজে ওকে পাক্কা গাইড বানিয়ে দেবে।

কাজেই বুড়োকে চটানো চলে না। ধৈর্য ধরে পর্ণা কর্ণাক্ষর কথা শুনে যাচ্ছিলো।

ফুল্লু গল্পের নেশায় মজে গেছে। কর্ণাক্ষ থামতেই বললো, "চাচাজী! বৈজনাথ দেখতে কেমন, তার মন্দির কেমন বলো না?"

এমন আগ্রহশীল শ্রোতা পেয়ে বুড়ো কর্ণাক্ষ মহাখুশি। "তা'হলে এক মিনিট ঠার্ যা বেটা—", পাশেই একটা বরীতে (বস্তা) কাঠ-কয়লা রাখা ছিলো, কর্ণাক্ষ চিলম্‌টা উপুড় ক'রে ছাই ফেলে, কাঠ-কয়লা ভরে নিয়ে আগুন ধরিয়ে নিলো। আবার আগের ভঙ্গিতে ব'সে গুড় গুড়িয়ে কয়েকটা টান দিয়ে বলতে শুরু করলো,

: সে অনেক কাল আগে, মহাপ্রতাপশালী দশাননের তখন সময়টা ভালো যাচ্ছিলো না। তলব করলেন দৈবজ্ঞকে। দৈবজ্ঞ গননা করে বললো, মহারাজ, কিরাগ্রামের অমুক জায়গায় বাবা বৈজনাথ (মহাদেব) মাটির নিচে ধ্যানস্থ অবস্থায় আছেন, এই মত্ত সুযোগ, আপনি সেখানে গিয়ে বাবাকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করতে পারলেই আবার লঙ্কায় রাজশ্রী ফিরে আসবে। রাক্ষসরাজ বৈজনাথের একজন গোঁড়া ভক্ত। তখুনি কিরাগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। তারপর কিরাগ্রামে এসে সেই নির্দিষ্ট জায়গায় বসে লেগে গেলেন তপস্যা করতে। কঠোর তপস্যা ক'রে বাবা বৈজনাথকে সন্তুষ্ট করে প্রসন্ন মনে বর নিয়ে ফিরে গেলেন রাক্ষসরাজ রাবণ। তার পরেই লঙ্কারাজ্যের ঐশ্বর্য এত বেড়ে গেলো, আর দশাননের দাপট এত বাড়লো, বহু রাজা ঈর্ষা করতে করতে শেষকালে শত্রু হয়ে গেলো, এমন কি মায়ের পেটের ভাইটা পর্যন্ত শত্রু বনে গেলো। সে যাক্—দশানন কাউকে পরোয়া করে না। কিন্তু, দশাননের দশটা মাথায় সোজা বুদ্ধি, বাঁকা বুদ্ধি, পেঁচালো বুদ্ধি—অনেক বুদ্ধি ছিলো বটে, কিন্তু ধর্মবুদ্ধিটা পাকা ছিলো না—,আবার একেবারে কাঁচাই বা বলি কী ক'রে—"

কর্ণাক কথা থামিয়ে কল্যিতে জোরে একটা টান দিলো। পর্দা হাসি চাপলো কিন্তু ফুলু হেসে ফেললো। কর্ণাক কপালে একটা ভাঁজ ফেলে ভাবতে ভাবতে বললো,—"না, রাক্ষসরাজের বুদ্ধিটা খুব ভালো ছিলো না। সীতা-মায়ীকে পাকড়ে আনলে কী হবে, স্পর্শ করেন নি। বনের সোতা দেখতে ভালো বাসতেন সীতা-মায়ী, সেজন্য অশোক বনে ভাল সাহারার ব্যবস্থা ক'রে সেখানে সীতা-মায়ীকে থাকতে দিলেন—

পর্দা বুঝলো কর্ণাক কথার খেই আবার হারিয়ে ফেলছে, ধরিয়ে দিলো একটু,

"চাচাজী, বৈজনাথের মন্দিরের কথা কী যেন বলছিলে—"

"সেই কথাই তো বলছি বেটা, রাক্ষসরাজ রাবণ কিরাগ্রামে এসে বাবা-বৈজনাথের কাছ থেকে অমর একটা বর নিয়ে গেলো, কিন্তু একটা মন্দির বানিয়ে দিয়ে গেলো না বাবার জন্যে। বাবার পাষাণমূর্তি রইলো মাটির নিচেই। তার অনেক কাল পরে, পাণ্ডবরা এসেছিলেন এখানে। কিরাগ্রামে পৌঁছেই ওঁরা বাবা বৈজনাথের মন্দির নির্মাণের আদেশ দিলেন। কর্ণাক ঘন ঘন কল্যিতে টান দিলো।

ফুলু বললো,

"বাবা বৈজনাথের মন্দির তা'হলে পাণ্ডব রাজাদের তৈরি? ওরে বাবা, সে তো বহুযুগ আগে—"

খক্ খক্ ক'রে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে কর্ণাক বললো,

"হাঁ। সে দ্বাপর যুগের ব্যাপার। তারপর বহু বছর পরে, একটু একটু করে মন্দিরের মেরামত বন্ধ পড়লো, হেলে পড়লো। কেউ মেরামত করলো না। কিরাগ্রামে আহুক আর মহুক নামে দুটি ভাই ছিলো। তারি ধার্মিক। তারা দুজনে ব্যবসা করতো, কিন্তু তাদের টাকা পয়সা বেশী ছিলো না তখন। তখন তারা, অবসর সময়ে দু'ভাই মিলে বলাবলি করতো,—কিছু টাকা যদি হাতে আসতো আমাদের, তা'হলে আমরা সবচেয়ে আগে বাবা বৈজনাথের মন্দিরটা মেরামত করতাম।

তার কিছুদিন পরে, একজন সাধুবাবা তীর্থে যাওয়ার পথে ওই দু'ভাইয়ের দোকানের সামনে একটা গাছের ডালে তাঁর ঝোলাটি ঝুলিয়ে রেখে যান, গাছের তলায় আহুক আর মহুকের কিছু লোহা গাদা করা ছিলো। ওরা লোহার ব্যবসা করতো। তখন ছিলো বর্ষাকাল। বৃষ্টির জল সাধুবাবার ঝোলা চুঁইয়ে নিচে গাদা করা লোহার ওপর পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে লোহা হ'য়ে গেলো সোনা। দুই ভাই তো কাণ্ড দেখে অবাক। সাধুবাবার ফেরার জন্য তারা যত গুনতে লাগলো। বাবা ফিরতেই দু' ভাই পা জড়িয়ে ধরলো। সাধু বাবা দেখলেন গাছের নিচে ভাল ভাল সোনা। আহুক আর মহুক সোনার তালগুলি নেবার জন্য সাধুবাবাকে পীড়াপীড়ি করলো অনেক, কিন্তু বাবা ছুঁলেন না। মন্দির মেরামতের উপদেশ দিয়ে নিজের ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে চলে গেলেন—"

ফুলু অভিভূত হয়ে গেলো একেবারে, কর্ণাকের কথা থামিয়ে দিয়ে বললো,

"লোহাগুলো সত্যি সত্যি সোনা হয়ে গেলো—"

"হাঁ রে বেটা। ওই সাধুবাবা ছিলো নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী বাবা বৈজনাথ"।

"তারপর?" ফুলুর প্রশ্ন।

"তারপর, দু' ভাই মিলে সুবর্ণাপুরে (প্রাচীন কাঙড়া নগর) গিয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলো অসিকের বেটা নায়ককে। সে তখন সব চেয়ে সেরা পাথুরে কারিগর (স্থপতি)। দুই বণিক ভাই ঢালাও হাতে খরচ করলো। সুন্দর মন্দির তৈরি হলো পাথরের। যেমন তার ভেতরের কারুকার্য, তেমনি তার বাইরের। আগাগোড়া চমৎকার। মন্দিরের ঢোকার পথে দু'পাশে দুটো, দাঁতের (বল্লমের) মূর্তি। যেন সত্যিকারের

ছুটো হাত এনে বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়েছে। মন্দিরের ভেতরে বাইরে এমনিধারা আরো অনেক পাথুরে মূর্তি আছে, সবগুলোই যেন একেবারে জীবন্ত—", ঘর্ ঘর্ করে কর্ণার কাসতে লাগলো।

কাশি থামলেই কর্ণার-চাচা পাছে আবার কিছু শুরু ক'রে দেয়, পর্ণা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে নিজের বিছানা খুলতে লাগলো।

কর্ণার দেখলো। বললো, ফুল্‌মুর দিকে তাকিয়েই বললো,—"আচ্ছা বেটা, আজ তোরা হয়রান হয়েছিস, আজ তোরা শোয়া। কাল আবার কিস্তাগ্রামের গল্প শোনাবো।"

কর্ণারের ঘরেই পর্ণাকে বিছানা পাততে দেখে হাত নেড়ে বাধা দিলো কর্ণার,

"এখানে শুবি না বেটা, সারারাত খা কাশি হয় আমার, একজন ঘুম আসবে না চোখে। ওই পাশের ঘরে বিছানা ক'রে দু'জনই দিলে ঘুম যে—।"

না চাচাজী, আমি তোমার কাছেই শোবো, আমার ভাই মন করছে। ওই ঘরে দিলরাজ শোবে—ওর আবার ঘুম তাড়াতাড়ি পাতলা কিনা, এক ফোঁটা শব্দ হলেই ওর ঘুম হয় না—" ফুল্‌মুর দিকে না তাকিয়েও পর্ণা যেন বুঝতে পারলো, ফুল্‌মু এখন খুব টিপে টিপে হাসছে।

পরদিন ফুল্‌মুর ঘুম ভাংলো বেশ বেলিতে। সূর্য উঠে গেছে অনেকক্ষণ। সারি সারি বাড়িগুলির স্লেটের চালে চালে রোদ পড়েছে। ওর ঘরের ভেতরটা পর্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে অনেকখানি।

কর্ণার চাচার চিল্লা চিল্লিতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দু'হাত দিয়ে চোখ রগড়াতে লাগলো। দু'চোখ থেকে ঘুমের অবসাদ কিছুতেই আর কাটতে চায় না। বেলার দিকে তাকিয়ে খুব শুকিয়ে গেলো ফুল্‌মুর। পরশরাজ নির্দেশ দিয়েছিলো, খুব ভোরে সকলের আগে ওঠা চাই। কর্ণার-চাচা জাগবার আগে, আগে পাশের সকলে ওঠবার আগে। কিন্তু প্রথম দিনই দোষ ঘটে গেলো ফুল্‌মুর।—ওর দোষ কী। রাত দুপুর, পর্যন্ত যদি ঘুম না আসে, তা'হলে চোখে ঘুমটা তো একটু চেপে বসবেই, সর্দার যেন তোর তোর ওকে একটু ডেকে দিলেই পারতো। কাল রাত্রে ওর ভাল ঘুম হয় নি। সারারাত্রি পর্যন্ত কেবল এ পাশ ও-পাশ করেছে।

ও, ওর আব্বার কথা, শনিচারি নানীর কথা একেবারে ভাবতে চায় নি, তবু জোর ক'রে ওকে ভাবতে হয়েছে। এমন কি মুন্নিয়ার কথা, নাজুর কথা, গাজুরাজের কথা পর্যন্ত ভেবেছে, কেন ভেবেছে ও তা জানে না।

তারপর যখন কিছুই ও ভাবছিলো না, তখনও কিন্তু ঘুম আসে নি ওর চোখে। কেমন যেন ঝোঁয়া ঝোঁয়া, আবছা আবছা ভাবনা ওর মাথার পাক্ খাচ্ছিলো—অথচ ওর কাছে ধরা দিচ্ছিলো না, স্পষ্ট হচ্ছিলো না। অনেক ছট্‌ফট ক'রে তারপর কখন যেন ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘরের ভেতর থেকেই সাড়া দিলো ফুল্‌মু,

"চাচাজী, এই আমি আসছি বিছানাটা পাট ক'রে—" বিছানা পাট না হাই, দ্রুত হাতে নিজের বেলবাস ঠিক করলো। মাথার ছাঁটা চুলে টুপিটা ভাল ক'রে চাপালো, তারপর বড় চাদরে ভাল ক'রে শরীর ঢেকে ঘর থেকে বার হলো ফুল্‌মু।

পর্ণা সামনে বসা। সরাসরি পর্ণার দিকে তাকালো ফুল্‌মু, বললো,

"সর্দার, তুমি আমাকে আগে একটু ডেকে দিতে পারো নি?" ফুল্‌মুর গলায় যেন একরাশ অভিযোগ। পর্ণা অবাক হলো। ফুল্‌মুর বেরিয়ে ওঠার আগে, যে রাগটা মনের মধ্যে জমা হয়েছিলো,

সেটা যেন এই মুহূর্তে উঠে গেলো, আর সেখানে খুশির ছোঁয়া লাগলো। এমন দীপ্ত দৃশ্য তাকেই তো সর্দার পরমরাজ চায়। হাসিমুখে পর্দা বললো,

"তাতে কিছু হয় নি দিলরাজ। তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে চা পীয়ে নাও। কাল ট্রেনের ধকল গেছে, খুব তাড়াতে একটু তো দেরি হবেই—"

—থাক্ বাবা, ফাঁড়াটা কাটলো,—ফুলমু তাড়াতাড়ি মুখ ধুতে চলে গেলো।

পর্দা হঠাৎ একটু অনমনা হয়ে পড়লো। ও উঠেছে সকলের আগে। ফুলমুকে তাড়াতাড়ি জাগিয়ে দেবে বলেই ও অত সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিলো। ফুলমুর ঘরে ঢুকে, নিচু হয়ে ফুলমুকে ডাকতে গিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। গায়ের বড় চাদরটা ফুলমুর গায়ে নেই, লাথি পাকিয়ে পায়ের দিকে সরে গেছে। ফুলমুর বক্ষস্পন্দনের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো পর্দা।—

চাচা তো উঠে গেছে টের পাচ্ছি, এ ঘরে এসে ঢুকলেই হয়েছে আর কী! যত ঘুমবেশই থাকুক, এখন ফুলমুকে দেখলে আর ছেলে ব'লে কিছুতেই মনে হবে না। ভেবেছিলো, চাদরটা খুলে ফুলমুর গা ঢাকা দিয়ে দেবে, কিন্তু তখুনি যদি ফুলমু জেগে ওঠে—কী ভাববে? কত কিছু ভাবতে পারে।

কাজেই পরমরাজ এ ঘরে এসে কর্দার-চাচাকে পাহারা দিতে লাগলো, যেন ফুলমু ওঠার আগে ও ঘরে না গিয়ে পড়ে চাচা।

কর্দার বিছানা ছেড়েই তার পরম বস্তু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে দিলরাজের নাম ধরে এক একবার হাঁক পড়ছিলো মুহুর্মুহু। তারপর কলিতে কয়েকটা টান দিয়েই শুরু হয়ে গেলো চিল্লাচিল্লি।

সেই ডাক শুনেই ফুলমু ধড়মড়িয়ে উঠে পড়েছিলো।

ফুলমু মুখ ধুতে চলে যাওয়ার পর, কর্দার পর্দার দিকে চেয়ে বললো,

"দিলরাজ তোকে বড়াভাই না ব'লে সর্দার বলে কেন? এ আবার কী রীতি?"

পরমরাজ মনে মনে হেসে ভাবলো, বয়েস হলে কী হবে, বুড়ার টনক আছে। মুখে বললো,

"গাঁয়ে জোয়ানদের কিছুদিন কুস্তি শিখিয়েছিলাম, তখন আমাকে সবাই সর্দার বলে ডাকতো, তারপর সেই ডাকটাই চালু হয়ে গেছে।

কর্দার আর কিছু বললো না।

কর্দার আর পর্দার চা খাওয়া আগেই সারা। চুলায় গরম জল বসানোই ছিলো। কাঙড়ায় দু'রকম চায়ের চলন,—কালো চা আর সবুজ চা। সবুজ চা খায় নুন মিশিয়ে। এ চা খেলে নাকি শরীর বেশী গরম হয়। ভোরবেলা এই চা খায় কর্দার। তারপর সারাদিনের মধ্যে আরো বার পাঁচেক চা ও খায়,—সে ওই কালো চা। কর্দারের পাল্লায় প'ড়ে পর্দা সবুজ চা খেয়েছিলো,—কিন্তু তাতে ওর চায়ের পিয়াস আদৌ মেটেনি। কর্দার-চাচা সবুজ চায়ের যে আজোয় গুনগান শুরু করেছিলো,—কাশ্মীর আর আফগানিস্থানের সমস্ত গরীব-গুরবারা শীতকালে শুধু এই সবুজ চা খেয়েই নাকি শরীর গরম রাখে, এর স্বাদে নাকি কোথায় লাগে অমৃত (মদ)। কাজেই খাবো না বলতে পারি নি।"

ফুলমু এক কথায় সবুজ চা'কে নাকচ ক'রে কালো চা বানালো। বললো, "চাচাজী, আমারই শরীর এমনিতেই খুব গরম, আর গরম হবে দরকার নেই।"

খুব সুন্দর চা বানালো ফুলমু। সোনালী রংএর চা। পর্দা আর কর্দারকে আগে দু'বাটি চা পরিবেশন ক'রে তারপর নিজে এক বাটি নিয়ে ওদের মুখোমুখি বসলো।

"চাচা, খেয়ে দেখো, তোমার চেয়ে আমি অনেক ভালো চা বানাই।" ফুলমুর কথার উত্তরে বুড়ো তার ঘুসর মাথা নাড়তে নাড়তে খুশি গলায় বললো,

"বেটা, তোর কচি নরম হাতের ছোঁয়াতেই সব জিনিসের আস্বাদ ভাল হয়ে যাবে, এই বুড়োর রগ-ওঠা হাতে কী তেমন মোলায়েম হ'তে পারে—" নিজের রসিকতায় কর্দারক হো-হো করে হেসে উঠলো।

ফুলমু সতর্ক চোখে এক পলক পর্দার দিকে তাকিয়ে নিলো, দেখলো,—সর্দারের মুখের ভাব খুব খুশি খুশি, কিন্তু সেটা প্রকাশ হয় তা বোধ হয় চায় না, তাই চায়ের দিকে স্থির চোখে চেয়ে আছে। পরমরাজ কিন্তু না তাকিয়েও ফুলমুর চোখা চাউনি স্পষ্ট টের পেলো। কানের দু'পাশটা একটু গরম হলো ওর। বাটিটা মুখের সামনে তুলে ধরে ঘন ঘন চায়ে চুমুক দিতে থাকলো পরমরাজ।

কর্দারক-চাচাকে নিয়ে কাঙড়া দুর্গ দেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওরা সবে বেরিয়েছে, একজন পাহাড়ী ছুটে ছুটে ওদের সামনে এসে কর্দারকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো,

"মোড়ল, তোমাকে এখুনি একবার পঞ্চায়েতী সভায় যেতে হবে, আর সব মাতব্বর তোমার জন্য অপেক্ষা করছে"—

"কেনরে বদন সিং? ব্যাপারটা কী?" কর্দারক জিগ্যেস করলো।

"সে আমি জানি নে মাতব্বর, তুমি সভায় তাড়াতাড়ি চলে এসো, আমি গিয়ে তোমার খবরটা দি—'। যেমন ছুটে ছুটে এসেছিলো তেমনি ভাবে ছুটে ছুটে চলে গেলো লোকটা।

কর্দারক যদিও এদের সামনে ভুরু দুটো কুঞ্চিত করলো, মুখের ভাব গুরু-গম্ভীর করলো, এবং মুখেও বললে,"—দুনিয়ার হালচাল কীই যে হলো—কি সপ্তাহে পঞ্চায়েতী সভা বসাতে হচ্ছে—", কিন্তু মনে মনে ও বেশ খুশিই হলো, পাহাড়ীদের জীবনে ওঠা-নামা কম, একটু বেশীরকম এক ঘেয়ে। কাজেই পঞ্চায়েতী সভা বসলে ওদের মনে বেশ বৈচিত্র্য আসে। তা'ছাড়া, ভোজ, সংসারয়াকের খুব নামডাক ছিলো,—তার বেটার সামনে মোড়োলি করার সুযোগ পাওয়া খুব ছোটোকথা নয়।

তালা খুলে, আবার ঘরে ঢুকতে হলো কর্দারককে। সভায় যাওয়ার পোশাক ওর আলাদা। হাতে একটা মোটা বাঁশের লাঠি নেবে, পায়ের জুতো বদলে বাঘ ছালের চপ্পল পরে নেবে, আর গায়ের রঙিন চাদর খুলে রেখে ভারি ঘুসর রঙের চাদরটা পেঁচিয়ে নেবে।

পর্দা, ফুলমু ভেতরে ঢোকে নি। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো। ফুলমু নিচু গলায় বললো,

"সর্দার, আমিও কী যাব পঞ্চায়েতী সভায়?"

পর্দা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষত একবার ফুলমুর আপাদমস্তক জরীপ ক'রে নিলো, তারপর বললো,

"কেন, তুমি সব জায়গায় যাবে না দিলরাজ—?" পর্দার কণ্ঠস্বরে অনেকখানি বাঁজ।

খক্ খক্ ক'রে কাশ্‌তে কাশ্‌তে বেরিয়ে এলো কর্দারক। পর্দার কথাটা কানে গেছে ওর। কাশি থামানো গলায় বুড়ো ব'লে উঠ্‌লো,

"দিলরাজ, তোর ভয় নেই বেটা, কাঙড়া দুর্গে আজ নিয়ে যাবো ঠিকই; এক ঘণ্টার মধ্যে সভার কাজ খতম ক'রে তোদের নিয়ে বেরিয়ে পড়বো—।"

ফুলমু মনে মনে হাসলো। ও যে মনে প্রাণে কবে দিলরাজ হ'তে পারবে তা দেবতাই জানেন।

পুরুষালি মনটা হ'লেই ও বেঁচে যায়। পর্ণার সান্নিধ্য ওর একান্ত কাম্য ছিলো, সেটা ও পেয়েছে। কিন্তু সদা সশংকিত হয়ে আছে মনটা—সেটা ওর ভাল লাগে না। ওর ছদ্মবেশের জন্যে ওর কোনো অনুবিধে নেই বা বিন্দুমাত্র আশংকা বোধ করছে না, তবু, সহজ সরল কেন যে ওর মনটা হতে পারছে না কে জানে!

তিন জনে মিলে হাঁটা ছিলো। ফুল্লু এক পা দু'পা যায় আর জিগ্যেস করে,—চাচাজী, এটা কী? ওটা কী?

কর্ণাঢ় হাত পা নেড়ে অনর্গল তার জ্ঞান বিতরণ করে যেতে লাগলো। ফুল্লুর এই কৌতূহলে কাঙড়া শহরের সব কিছু পর্ণাও জানতে চায়। পর্ণাও খুশি হয়েছিল জানতে চায়।

"এই কাঙড়া শহরে পাঁচ হাজার লোকের বাস",—পাঁচ হাজার কথাটা বলার সময় কর্ণাঢ় হঠাৎ গলাটা এমনভাবে চড়ালো, পর্ণা মুখ টিপে না হেসে পারলো না। একটা শহরে পাঁচহাজার লোকের বাস আবার বেশী নাকি।

—"এক কালে কাঙড়া দুর্গের রাজা ছিলো পাহাড়ী অঞ্চলের সব চেয়ে বড় রাজা"—মাথা ঝাঁকিয়ে বলে চললো কর্ণাঢ়,

"সেই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পর ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা যখন রাজ্যহারা হ'লেন, তখন তিনি কাঙড়ায় এসে দুর্গ বানালেন, নগর বানালেন,—তা'হলে তোমরা একবার হিসেব ক'রে দেখো, কাঙড়ার এই দুর্গ কত কালের, রাজা সুশর্মার রাজত্বের পর, বহুকাল ধ'রে ঝাঁকিয়ে কাটোচ ক্ষত্রিয় রাজারা কাঙড়ায় রাজত্ব ক'রে গেছেন। কাটোচ বংশের সবচেয়ে নামী রাজা ছিলেন সংসারচাঁদ—"

সংসারচাঁদ নামটা উচ্চারণ ক'রেই কর্ণাঢ় এক পলক তার দোস্ত্ সংসাররাজের বেটা পরমরাজের দিকে তাকিয়ে হাসলো,

"তা, কাটোচ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা সংসারচাঁদ, কাটোচদের বড় করবার জন্য কম কষ্ট করে নি, কম মেহনত করে নি, বহুবার বহু বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে লড়াই করেছেন,

মোগলদের সঙ্গে, শিখদের সঙ্গে, গুর্খাদের সঙ্গে—

—তবু হাল ছাড়েন নি,—শেষ পর্যন্ত কাটোচ-প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা ক'রে গেছেন—"

পর্ণা বললো,

"বাপুর কাছে শুনেছি, পাহাড়ী রাজাদের মধ্যে কাটোচ রাজারাই নাকি সবচেয়ে আগে মোগলদের কাছে নতি স্বীকার করেছিল।"

"ঠিক বলেছিস্ বেটা ঠিক—আমার কাছ থেকেই তো তোর বাপু এ সব গল্প শুনেছে।"

মোগলযুগে অবশ্য কাঙড়া মোগল সম্রাটদের অধীনেই ছিলো। তারপর মোগল সাম্রাজ্য যখন কমজোরী হয়ে পড়লো, তখন কাটোচরাজ ঘমন্ড্চাঁদ কাঙড়াদুর্গ জয় ক'রে নেবার চেষ্টা করেছিলো খুব। বেচারা ঘমন্ড্চাঁদ দুর্গ জয় করতে পারলো না, না পারলে হবে কী, পিছিয়ে গেলো না। খুব তেজীয়ান ছিলো এই কাটোচরাজ ঘমন্ড্চাঁদ। কাঙড়ার চল্লিশ মাইল দূরে হ'লো গিয়ে পালমপুর। এই পালমপুরের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে সুজানপুরে নতুন রাজধানী গড়লো ঘমন্ড্চাঁদ। তারপর, সুজানপুরের রাজা হয়ে কাঙড়াদুর্গ উদ্ধারের জন্য কাটোচদের ভেতরে ভেতরে খুব তালিম দিতে লাগলো, খুব উৎসাহ দিতে লাগলো। ঘমন্ড্চাঁদ নিজের রাজত্বকালে সফল হ'লো না বটে, কিন্তু কাঙড়ার সেই পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনলো তাঁর নাতি সংসারচাঁদ…"

ফুলুর এইসব কাহিনী শুনতে ভালো লাগছিলো না।

কর্ণাককে প্রসঙ্গান্তরে নেবার চেষ্টা করলো,

"চাচাজী, এই সরু সরু রাস্তাগুলো পাথর দিয়ে বাঁধানো কেন? এতক্ষণ যে বড় বড় পথ দিয়ে হাঁটলাম—সেগুলো তো এমন নয়?"

"হেঁ—হেঁ" ক'রে মাথা দুলিয়ে একটু হেসে নিলো কর্ণাক, মুখের ভাবখানা এই—এর মধ্যেও ইতিহাস আছে।

"এ পাথুরে পথগুলি তো সাধারণ পথ নয়, এ বড় পুরানো, বড় দামী পথ। এ পথ দিয়ে গজনির সুলতান মামুদ গেছে, মোহম্মদ তুঘলক গেছে, সুলতান ফিরোজ তুঘলক গেছে, খাওয়াস খান গেছে, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর গেছে, তারপর ছোট বড় মাঝারি কত অসংখ্য নবাব, সম্রাট, রাজাই না গিয়েছে এ পথ দিয়ে।

উনিশ শ' পাঁচ সালের ভূমিকম্পে কাঙড়ার সব গেছে, পুরানো দিনের নিশানা হয়ে এইরকম পথ দু চারটে আছে, আর কাঙড়া দুর্গ যখন দেখতে যাবি, চোখে জল এসে যাবে; সেই বিরাট দুর্গ, এখন বিরাট একটা ভগ্ন স্তূপ হয়ে পড়ে আছে—", কর্ণাক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

ফুলু মনে মনে ভাবছিলো,—বুড়োকে তো আজ্ঞা কথার নেশায় পেয়েছে। এর চেয়ে কিরাগ্রামের গল্প শুনতে ওর ভাল লেগেছে, সেটাই ঘুরিয়ে দেব নাকি কর্ণাক-চাচাকে।

ফুলুর মুখের চেহারা দেখে পর্ণা অনেক আগেই ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিলো, কিন্তু ও জানে কর্ণাককে চট্ ক'রে থামানো যাবে না। ওর বাপুর কাছে শুনেছিলো, কর্ণাক পাহাড়ীদের ইতিহাস যেমন জানেও বেশী, তেমনি এদের কাহিনী বলার নেশাও ওর বেশী। একবার শুরু করলে শেষ না করে কিছুতেই আর থামবে না। ওর কিন্তু শুনতে খারাপ লাগছিলো না। কাঙড়ার ইতিহাস পর্ণা ওর বাপুর কাছে কিছু কিছু শুনেছে, তবুও ওর ভালোই লাগছিলো শুনতে। ওরই মধ্যে পর্ণা একটু মুখ বদলাবার চেষ্টা করলো,

"চাচা, সুলতান মামুদ কাঙড়া জয় ক'রে, অনেক জিনিস হাতিয়েছিলো, তুমি জানো নাকি সে সব?

"তা আর জানিনা—" কর্ণাক তার রেখা ওঠা কপাল কুঁচকে হাসলো একটু।

তখন কাঙড়ার নাম ছিলো নগরকোট। এই নগরকোট লুঠ ক'রে মামুদ নিয়েছিলো সাতলক্ষ মণ জিনার (সুবর্ণ মুদ্রা), আর সাত লক্ষ মণ সোনার আর চাঁদির পাত, তা'ছাড়াও সোনা দু'হাজার মণ আর কুড়ি মণ হীরে, চুনী, পান্না, মুক্তো ইত্যাদি।"

"বলো কী চাচা?" ফুলুর গলায় এতক্ষণে আগ্রহের সুর লাগলো।

"হাঁ রে বেটা হাঁ।"

ফুলু মন-মরা গলায় বললো।

"কাঙড়ার এত ঐশ্বর্য লুঠ ক'রে নিলো, তেমন ক'রে কেউ বাধা দিলো না?"

কর্ণাক বললে,

"কই আর দিলো। শুনেছি, দুর্গরক্ষী সৈন্যরা সামান্য একটু বাধা দিয়েই তারপর প্রাণের ভয়ে দুর্গ ছেড়ে পালিয়েছিলো।"

ফুলু একটা নিশ্বাস ফেললো। বুড়োর কান খুব সজাগ। ফুলুর নিশ্বাসের শব্দ শুনে ফেলেছে। গলাটা আর একটু চড়িয়ে বললো,

"এর চেয়ে আরো কষ্টের কাহিনী ঘটেছে কাঙড়ায়,—

কাঙড়ার উপকণ্ঠে, জঙ্গলে, বজ্রেশ্বরী মাতাদেবীর মন্দির। যাঁর কাটোচ রাজবংশের কুলদেবী। শেরশার রাজত্বের সময় খাওয়াস খাঁ যখন কাঙড়া দুর্গ আক্রমণ করে জয় ক'রে নিলো, তখন মাতাদেবীকে পর্যন্ত রেহাই দিলো না। বজ্রেশ্বরী মাতার মূর্তিকে পাঠিয়ে দিলো দিল্লিতে। মাতার মাথায় বিরাট তামার একটা ছাতা ছিলো। সেটাও নিয়ে গেলো খাওয়াস খাঁ। সেই ছাতা গলিয়ে খাঁ সাহেব নিজের ব্যবহারের লোটা বদনা করলো, আর মাতার মূর্তি ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে বাটবারা করলো দিল্লির কসাইরা—"। কর্মাকর গলা আস্তে আস্তে তিমিত হয়ে মিলিয়ে গেলো যেন।

ঘুনঘুন কানে হাত চাপা দিয়ে আর্ত গলায় বলে উঠলো,

"চাচা, এ কাহিনী কেন শোনালে? এ যে কানে শুনলেও পাপ হয়—"

পর্মা সব কিছু যেন চাপা দিতে চাইলো। বললো, "তোমাদের পঞ্চায়েতী সভা কোথায় বসে চাচাজী? সে আর কতদূর?"

কর্মাকর চাদরে খুঁট তুলে চোখ দুটো মুছে নিয়ে বললো, "এই তো এসে গেলাম।"

(ক্রমশঃ)

দেহপট

মেয়েটির ঘাড়ের কাছটা আস্তে আস্তে পুড়ে যাচ্ছে, তামার গায়ের মত 'মোম্মা' পুড়ছে সেখানে, না, এর চেয়ে অনেক যন্ত্রণা শরীরের অন্যত্র, সারা পিঠে ছুঁচ ফুটিয়ে ছবি আঁকা চলেছে, সেই কষ্ট এড়াবার জন্যে মোম্মায় আগুন দেয়া হয়েছে।

কত কি আঁকা হবে সারা শরীরে—দুই সামুরাই-এর যুদ্ধ, ড্রাগন, পৌরাণিক উপকথার নানা চিত্র। তিন বৎসর ধরে চলবে এই আঁকার কাজ। এক একবার আঁকার পর বরফ ঠাণ্ডা জলে স্নান করে আসতে হবে, তবেই নানা রঙ ফুটে উঠবে দেহচিত্রে।

একদিন এ দেহের মূল্য হবে।

সেদিন টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয় দেহত্বকখানি কিনে নেবে, বিনিময়ে মৃতের সন্তানেরা পাবে কিছু অর্থ।

আজ তারই জন্যে দেহের বাইরে এই যাত্রা।

উপন্যাস

রায়বাঘিনী

কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়

॥ এক ॥

দামোদর নদের পূর্বদিকে, দামোদরেরই এক শাখা রোপ। উত্তর তীরে ঘন অরণ্য। শান্ত জলরেখার ওপর দিয়ে একখানি সাধারণ নৌকো ভেসে চলেছে দক্ষিণ দিকে, উত্তর গড়ভবানীপুর থেকে। নৌকোয় ক'জন মাঝি, আর এক সুন্দর পুরুষ—প্রৌঢ় হলেও সুন্দর যৌবনের অধিকারী। তাঁর পরনে সৈনিক-বসন, সৈনিক উত্তরীয় গায়ে, মুখেচোখে বৈরাগ্যের শান্তি।

বাংলার শ্যামল-সুন্দর মূর্তি দেখে মোগল লুব্ধ হয়েছে, পাঠান পাগল হয়েছে। শ্যামার ছেলেরাও নিজেদের ক্ষুব্ধ শক্তিকে কয় করেছে প্রবল, প্রলুব্ধ শক্তিকে মায়ের ছায়ায় ঘুরে রাখতে। তাদের চেষ্টা কখনো সার্থক হয়েছে, কখনো হয়েছে ব্যর্থ; কিন্তু সন্তানধর্ম তেমন ক্ষুণ্ণ হয় নি।

আকবরের জীবনের শেষ-অধ্যায়ে পাঠান-সর্দার কতলু-খাঁ উড়িষ্যা থেকে অভিযান শুরু করলো—আশা বাংলা-গ্রাস। সম্রাটের কাছে গেল সেই কথা। পাঠানের গতি রোধ করার জন্যে তিনি রাজা মানসিংহের ছেলে জগতসিংহকে সৈন্যদলের সেনাপতি ক'রে পাঠালেন এবং চাইলেন ভূরীশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ-সন্তান রাজা রুদ্রনারায়ণ ও বিষ্ণুপুরের রাজার বন্ধুত্ব। বর্তমান হাওড়া ও হুগলি জেলায়, দামোদরের দু'পাশে বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে রুদ্রনারায়ণের জমিদারি ছিল। তিনি নামেই রাজা ছিলেন না, কাজেও ছিলেন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজা। তমলুক, উলুবেড়িয়া, বক্সরডাঙা, খানাকুল প্রভৃতি স্থানে তাঁর ছাউনি ছিল। দামোদর ও রূপনারায়ণের জলে ভেসে বেড়াতো তাঁর যুদ্ধ-জাহাজগুলি। বাগদী, চাঁড়াল, হাড়ী, ডোম, সোয়ালা প্রভৃতি বাংলার সৈনিক ছেলেরা এই বীরপুরুষকে কেন্দ্র ক'রে বাংলার এই অঞ্চলকে স্বাধীন ও শান্তিময় ক'রে রেখেছিলেন।

তবু রুদ্রনারায়ণ সম্রাটপক্ষে যোগ দিলেন। এই যোগদানের কারণ তাঁর প্রবল পাঠান-বিদ্বেষ। রুদ্রনারায়ণের জ্ঞাতিভাই এবং তাঁরই সেনাপতি—মহাবলশালী ও রণনিপুণ রাজীবলোচন অর্থাৎ বঙ্গবিখ্যাত কালাপাহাড়কে, পরাজিত এবং কূট-নীতিজ্ঞ পাঠানরাজ সুলেমান কররানি কৌশলে মুসলমান ক'রে, ভূরীশ্রেষ্ঠরাজ্য, বাংলা তথা হিন্দুস্থানকে মারণ আঘাত দিয়েছিলেন। সেই কথা ভুলে যাওয়া রাজা রুদ্রনারায়ণের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি আকবরকে সাহায্য করতে এগুলেন; বিষ্ণুপুরের রাজাও যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে। সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমান সৈন্যের সাথে, পাঠান-সৈন্যের মাঝারণে ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। সেই যুদ্ধে শেষ হ'য়ে গেলেন কতলু খাঁ, মাঝারণ-দুর্গসহ দুর্গস্বামী এবং আরও শত শত লোক। মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে দাঁড়িয়ে সম্মিলিত সৈন্যের সেনাপতি মহাবীর রুদ্রনারায়ণ শুনলেন সেই সত্য-শিব বাণী, যা শুনেছিলেন মহারাজ অশোক কলিঙ্গের যুদ্ধক্ষেত্রে। ধরণ ধরের মধ্যে রাজা রুদ্রনারায়ণও ধরণ পরাজয়কে স্বীকৃতি দিলেন। রাজধানী গড়ভবানীপুরে ফিরে, সেনাপতি চক্রভূষণ চক্রবর্তী ও সেওয়ান দুর্লভ বসুর ওপর রাজ্যের শাসনভার দিয়ে তিনি চললেন কাটশাকড়া গ্রামে—স্বপ্রতিষ্ঠিত রুদ্রনারায়ণ শিবের সাধনায় বাকি জীবনটা কাটাতে। নিঃসন্তান

থাকার তার সংসারের বাঁধনও ছিল না তেমন শক্ত। রানী রাজধানীতেই রইলেন। সংসারকে উপেক্ষা ক'রে, সেবকরা-বাদ অঙ্গে নিয়ে রাজর্ষি ক্ষত্রনারায়ণই ওই যাচ্ছেন নৌকোতে গড়ভবানীপুর থেকে কাটগাঁকড়ায়।

নৌকো এসে গেল পেঁড়োগড়ের অদূরে। দু'দিকে বন বন। নিস্তব্ধ অপরাহ্ণ। নৌকোর দাঁড়গুলিও নিঃশব্দে জল টেনে যায়। রাজার বৈরাগ্য যেন সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করেছে। হঠাৎ পুব দিকের বনে মহিষ ও অশ্বের চিৎকার জমাট নীরবতা ভেঙে বনভূমিকে চমকিয়ে দিল। রাজর্ষির সতর্ক দৃষ্টি চ'লে গেল ওই স্বর লক্ষ্য ক'রে। দেখলেন—অদূরে বন্য মহিষেরা এক বন বালিকাকে আক্রমণ করেছে। রাজা তড়িৎ-গতিতে দাঁড়িয়ে ছুটে গেলেন হালের কাছে এবং কর্ণধারের হাতদুটি হাল ধরে নৌকোর গতি পরিবর্তন করলেন পূর্ব তীরের দিকে। গম্ভীর স্বরে বললেন তখনি—"তীরে তেড়াও তরী!"

তীর থেকে তরী এখনো কিছু দূরে। রাজা তখনই নৌকো থেকে তীরে লাফিয়ে পড়লেন, ছুটলেন আগ্নেয়াস্ত্রের বন বাঁপিয়ে—নিরস্ত্র। তাঁর দৃষ্টি সামনে, যেখানে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে এক তরুণী। দূরত্বের ব্যবধান কমে এলে রাজা থমকিয়ে দাঁড়িয়ে যান। দেখেন—এক বিরাট কৃষ্ণ ঘোটকীর পৃষ্ঠে উপবিষ্টা এক রক্তবসনা, ঘুবতী তরুণী; বাঁ হাতে বল্গা; ডান হাতের দীর্ঘ বর্শা এক বন্যমহিষকে বনতলে চেপে রেখেছে। উত্তেজিতা তরুণীর এলায়িত দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশরাশি বাতাসে উড়ছে, আঁচল বাতাসে উড়ছে। তাঁর চোখে জেগেছে বিজয়ের আলো। রাজা নির্বাক স্তব্ধ হ'য়ে দেখছেন ওই শ্রীদুর্গা-মূর্তি।

হঠাৎ তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন। লজ্জা পেলেন রাজর্ষি। বীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন এবং তরুণীর অদূরে দাঁড়িয়ে উদার-গম্ভীর স্বরে বললেন—"ভদ্রে, আমার সাহায্য কী দরকার?"

তরুণী চাইলেন সামনে। এতক্ষণে তাঁর দৃষ্টিপথে এলেন রাজা। তরুণীর সারা মুখে আনন্দ ও লজ্জার আলো ছড়িয়ে পড়ে। মহিষের মাথায় বিদ্ধ বর্শাটি একবার নাড়লেন; তারপর বর্শা টেনে নিয়ে তিনি নামলেন বনতলে। নিজের গায়ে বর্শাটি ঠেকিয়ে রেখে, রাজাকে প্রণাম করলেন যুক্তকর মাথায় ছুঁইয়ে এবং শান্ত সজীব স্বরে বললেন—"আমার প্রণাম নিন, মহারাজ!"

প্রণাম্ত রাজা উত্তরে বললেন—"আমি অপরিচিত নই তোমার?"

হাসিমুখে, শান্ত ভাবে ঘাড় নেড়ে তরুণী জানান—'না'। পরে বলেন—"আর সাহায্যের প্রয়োজন হবে না, মহারাজ! শত্রু হার মেনেছে।"

রাজার মনে এখনো বিবিধ বিস্ময়। তিনি প্রশ্ন করেন—"কী হয়েছিল, জানতে পারি?"

বাঁ-দিকে একটু মাথা বাঁকিয়ে তরুণী সম্মতি জানান। বলেন—"কয়েকটা নেকড়ে কোথা থেকে এসে আশপাশের গ্রামে বড় উৎপাত করছিল ক'দিন। মূহদের পোষা পশু-পাখী তো মারলোই; একদিন এক বাড়ির একটি শিশুকেও নিয়ে গেল। পথ দিয়ে যাবার সময় মায়ের কান্না শুনলুম—অনাথ ব্যথা।..... সব নেকড়ে মারতে পারি নি। আজ একটার পেছনে তাড়া ক'রে যাবার সময় মহিষগুলো আমাকে আক্রমণ করলো—সেও একটি। ওদের রাজ্যে এসে ওদের ওপর অত্যাচার করার ইচ্ছা আমার একটুও ছিল না; কিন্তু আত্মরক্ষা করতে—"

বীর রাজর্ষি আনন্দে ব'লে উঠলেন—"সুন্দর! এমন মেয়ের মা হ'য়ে আমার বাংলা-মা সত্যই ধন্যা। কে তুমি ভদ্রে?"

মাটির দিকে চেয়ে গম্ভীর স্বরে তরুণী বললেন—"অবলা না বললে, নারীর ভাগ্যবিধাতা পুরুষেরা কী ক'রে নারীর বল হরণ করতেন, মহারাজ?"

ব্যথাতরা স্বরে রাজা উত্তর দিলেন—"বড় সত্য! কিন্তু আমি কী নারী-শক্তির পীড়নকারী?"

তরুণী বলেন—"না! আপনার রাজ্যেই আমার জন্ম। ……নারীকে অবলা-বাঁধনে বেঁধে না রাখলে, শত শত জনা, খুল্লনা, দুর্গাবতী দেখা দিতেন ভারতে। তাতে দেশের কল্যাণ হ'ত; পুরুষজাতিরও হ'ত মঙ্গল!"—দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

রাজাও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—"এ যে এক দুর্ভাগা দেশ। সাধনায় মানুষ দেবতা না হ'য়ে সে এক কাল্পনিক দেবতা নিয়ে থাকে!"

"দেশের এ দুর্ভাগ্য কী ঘুচবে না?"—সজীব স্বরে বলেন তরুণী।

"ঘুচবে—যখন জাতির কলঙ্কের পাঁকে, বাবার শিলাস্তর ভেদ ক'রে এমনি শুভ্র-শুচি শতদল—বীরাঙ্গনা জাগবে ঘরে ঘরে—আপনা থেকে!"

"আপনার কথা সত্য হোক, রাজর্ষি! বড় দুঃখ, বড় কষ্ট! শক্তিং কেন্দ্র দুঃশাসনের পদতলে কেঁদে মরে।"

রাজা ধীর স্বরে তরুণীকে প্রশ্ন করলেন—"একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

বিনীত স্বরে বললেন তরুণী—"এই রাজ্যের রাজা আপনি। যে কোন প্রজাকে ভাল-প্রশ্ন করার অবাধ অধিকার আছে আপনার।"

রাজা তাঁর বিস্মিত দৃষ্টিকে একবার তরুণীর মুখে ফেলে, আনমনভরা শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে সেই পুরুষসিংহ, যিনি এই মহাশক্তির পথস্রষ্টা?"

তরুণী উত্তর দেন—"আপনারই চির-অনুগত সর্দার শ্রীযুক্ত ভীমনাথ চৌধুরী আমার পিতা।"

উচ্ছ্বসিত আবেগভরে রাজা ব'লে ওঠেন—"সর্দারজীর মেয়ে? এ-রাজ্যের যিনি শ্রেষ্ঠ বীর ও বিখ্যাত পণ্ডিত, তাঁর কন্যাই শ্রীদুর্গা হ'তে পারে। নমস্কার জানাই তাঁকে।"

বিনীতা তরুণী বলেন এবার—"সন্ধ্যা হ'য়ে আসে; আমি যাই।"

শান্ত হাসি হেসে রাজা বলেন—"অনধিকার চর্চা যদি কিছু ক'রে থাকি, ক্ষমা ক'রো।"

নীরবে নারী রাজাকে প্রণাম জানান এবং বর্শা নিয়ে ওঠেন তাঁর ঘোড়ায়। মৃত মহিষের দিকে একবার কঠিন দৃষ্টি ফেলে ঘোটকীকে চলার নির্দেশ দিলেন। তীব্র বেগে ছুটলো ঘোটকী বনভূমিকে সচকিত ক'রে; স্তব্ধ আনমিত রাজা একটুর জন্য দাঁড়িয়ে দেখলেন তা। দৃষ্টি-পথ থেকে নারী চ'লে গেলেন। রাজা তাঁর তরীর উদ্দেশে চললেন। তখনই তাঁর কানে এলো নারী কণ্ঠের সংগীত—অস্পষ্ট—

"হর হর মহাদেব,
হর হর মহাদেব,
হর হর মহাদেব!"

রাজা থমকিয়ে দাঁড়ান, সব লক্ষ্য ক'রে চান মুখ ফিরিয়ে, শোনেন একটু, তারপর চললেন নদীর দিকে। তরীতে উঠতেই স্রোতের টানে চললো তরী। রাজা বসলা জায়গায় ব'সে চেয়ে থাকেন সামনের দিকে নির্বিকার।

স্রোতের পশ্চিম-তীর ধ'রে একদল শৈব-সন্ন্যাসী চলেছেন দক্ষিণ মুখে। সমবেত স্বরে গাইছেন তাঁরা—

প্রভুমীশ-মনীশ-মশেষ গুণং
গুণহীন-মহীশ-গরাভরণম্।
রণনির্জিত-দুর্জন-দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্॥
শশলাঞ্ছিত-রঞ্জিত-সম্মুকুটং
কটিলম্বিত-সুন্দর-কৃত্তিপটম্
সুর-শৈবলিনীকৃত-পূতজটং
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্॥

সুদূরে দৃষ্টি মেলে রাজর্ষি ওই গান শুনছেন মন প্রাণ ঢেলে। তরী সাধুদের ছাড়িয়ে গেল। এই রাজ্যেরই অধিবাসী বৃদ্ধ মাঝি বিনীতভাবেই বলে—"কাল সকালে কাটশাকড়ায় মন্দির পিণ্ডিতে ফিনা। সন্ন্যাসী-ঠাকুরেরা থাকেন রাজামশাই-এর ঘর দিতে দিতে!"

রাজা নীরবে ঘাড় নাড়তে থাকেন—'না, না'! শান্ত সুন্দর স্বরে বলেন শেষে—"তাঁরা আমার ঘর দিচ্ছেন না, মাঝি, শিব-শংকরের ঘর দিচ্ছেন তাঁরা। শিব-শংকরের ডাকে আমরা চলেছি, তাঁরাও চলেছেন—একই পথের যাত্রী আমরা।"

॥ দুই ॥

পেঁড়ো-গড়ের অদূরে দীননাথ চৌধুরীর অভিজাত অট্টালিকা। প্রৌঢ় বীর সেনাপতি দীননাথ আসনে একা দাঁড়িয়ে আছেন। উদাস মন; মুখে—দীপ্ত রৌদ্রের পাশে মেঘের ছায়া। বৃদ্ধা শান্তা এসে দাঁড়ালেন দর্শকের সামনে। নারীর দেহ সুগঠিত। তাঁর মন কেমন উতলা। শান্ত স্বরে দীননাথ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—"মন উতলা কেন?"

সংযত কিন্তু উতলা স্বরে শান্তা বলেন—"শংকরী এখনো এলো না!"

"শংকরী এখনো এলো না! আসবে; এখনো তো সন্ধ্যা হয় নি।"

দূরে দেখা গেল শংকরীকে। উৎফুল্ল স্বরে শান্তা বললেন—"ওই আসছে।"

শংকরী এসে গেলেন, হাসিমুখে নামলেন ঘোড়া থেকে। বাবার পায়ে প্রণাম দিয়েই তিনি ছুটে গিয়ে শান্তাকে জড়িয়ে ধরলেন দু'হাত দিয়ে। বললেন পরে—"মুখ শুকিয়ে গেছে কেন, শান্তা মা?"

শংকরীর পিঠে মায়ার সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে শান্তা বলেন—"আজ এত দেরি হ'ল কেন, মা?"

শংকরী দুষ্টুমির ভাব নিয়ে বলেন—"আজ যে তোমার শংকরীকে বুনো ষোড় তাড়া করেছিল গো!"

শংকরীকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে ভীত স্বরে বললেন শান্তা—"কী সর্বনাশ! কী মেয়ে তুই হচ্ছিস্, শংকরী?"

বাবা না শুনতে পান, এইভাবে শংকরী বললেন—"দস্যি মেয়ে।" তারপর বাবাকে বলেন—"বনে এখনো নেকড়ে আছে, বাবা! আজ একটাকে তাড়া করেছে কুকা। তবুনো পাড়া আর আসাড়া তার গায়ের আঘাতে খুব শখ জাগিয়েছে? হঠাৎ একদল ষোড় এসে দাঁড়ালো সামনে। কী ভীষণ তাদের মূর্তি! রোষেতে জল খেতে যাচ্ছিল বুবি; আমাদের দেখে রেগে উঠেছে।"

শান্তা শংকরীকে আরও জোর ক'রে জড়িয়ে ধরেন। হাসিমুখী শংকরী তাঁকে বলেন—"ভয় নেই, শান্তা মা! এখানে মোষ আসবে না।"

সহজ স্বরে দীননাথ শংকরীকে জিজ্ঞাসা করেন—"তার পর?"

কৃষ্ণার গায়ে হাত রেখে শংকরী বলতে থাকেন—"কৃষ্ণা আমাকে কী ভালবাসে, বাবা! একবার আমাকে দেখে নিলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘন-কাঁপানো স্বরে ডেকে লাফিয়ে পড়লো সঙ্গলের মধ্যে। দলপতির বিরাট শিং দু'টোর পাশেই আমি। কী সুযোগই সে আমাকে এনে দিল। শংকরের নাম নিয়ে আমি বর্শা বসিয়ে দিলুম মোষটার মাথায়। ক'টা মুহূর্তের পরেই সে মাটিতে প'ড়ে গেল; তার আর্ত চিৎকারে কাঁপতে লাগলো সারা বনটা যেন। কী আশ্চর্য; তখন অন্য মোষগুলো ছুটে পালিয়ে গেল!"

দীননাথ বললেন—"সেনাপতি পড়লে এমনই হয় মা!"

শান্তা শংকরীকে জিজ্ঞাসা করেন—"কালও যাওয়া হবে তো?"

করুণাময়ী শংকরী বলেন—"যেতেই হবে, শান্তা মা! সেই সন্তানহারা মায়ের মুখটি সব সময় আমার চোখের সামনে ভাসছে! কী মর্মান্তিক, অসহ্য কান্না সে কেঁদেছিল!"

শংকরীর গালে চুমু খেয়ে শান্তা বলেন—"যেও, বাধা দেব না! মায়ের দুঃখ ঘোচাও! তবে, সাবধান হ'য়ে থেকো—দুর্গাকে সঙ্গে নিও!

নীরবে ঘাড় নেড়ে শংকরী সম্মতি জানান।

শান্তা বলেন—"সন্ধ্যারতির সময় হয়ে আসছে। আমি গিয়ে ব্যবস্থা করি; তুমি এসো।"

শান্তা চলে যেতে চান; আর শংকরী ঝুঁয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। ব্যস্ত হ'য়ে তিনি ব'লে ওঠেন—এ কী, শংকরী? কতবার বারণ করেছি না?"

প্রশান্ত স্বরে শংকরী প্রশ্ন করেন—"কেন বারণ শুনবো?"

"তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমি শূদ্রের মেয়ে—"

বাধা দিয়ে শংকরী বলেন—"কিন্তু তুমি যে মায়ের মত মানুষ করলে। সেটা কী কিছুই নয়? বাবুন শুমুর নিয়ে আহাম্মক সমাজ থাক—এখানে তুমি আমি, মা-মেয়ে!"

কাতর মুখ তুলে শান্তা সর্দারের দিকে চান। সর্দার একটু শান্ত-সুন্দর হাসলেন। সেই হাসি শান্তার মুখেও এনে দিলে আনন্দের ইশারা। তিনি ধীরে ধীরে চ'লে গেলেন।

দীননাথ মেয়ের মুখের ওপর আনন্দিত দৃষ্টি মেলে বলেন—"পরিত্রাণায় সাধুনাম্, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্—গীতার এই কথাটি সর্বদা মনে রেখো, শংকরী! গীতা পড়েই ক্ষান্ত হ'লে চলবে না, গীতার নির্দেশে কাজ করতে হবে!"

নত মুখে শংকরী বলেন—"আরও এক কঠিন ব্রত—"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে মেয়ের মুখে এনে ফেললেন সর্দার। শংকরী ওইভাবে থেকেই ব'লে যান—"মহারাজা রঘুনারায়ণ সংসার ছেড়ে চ'লে গেলেন শিব-নিবাসে!"

"গীতার নির্দেশই মানলেন রাজা, হলেন—রাজর্ষি। তিনি যে এই বাংলার শ্রেষ্ঠ বীর। গীতার কথা তিনি ভালভাবেই বোঝেন। দুর্বল ও অলসের জন্যে গীতা লেখা হয় নি, মা!"

"রোন দিয়ে যাবার সময় তিনি কৃষ্ণা আর আহত পশুর চিৎকার শুনতে পেয়েছিলেন। মৌকো থেকে নেমে বনে এলেন। আমাকে দেখে হয়তো ভেবেছিলেন, আমি বিপদে পড়েছি; তাই আমাকে

জিজ্ঞাসা করলেন—আমার সাহায্যের প্রয়োজন কি-না। শত্রু তখন মরেছে; সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না। তাঁকে প্রণাম জানিয়ে, তাঁর প্রশ্নের উত্তরে নিজের একটু পরিচয় দিয়ে এসেছি। তাঁকে—দ্বিতীয় অশোক ব'লে মনে হ'ল। তিনিও তোমাকে নমস্কার জানিয়ে গেলেন।"

দীননাথ মেয়ের মাথায় হাত রেখে বলেন—"যত তুমি। দেবমন্দির রাজর্ষির দেখা পেয়েছো!—এখন চলো—সন্ধ্যা হ'য়ে গেল।"

দু'জনেই বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন।

* * *

দীননাথের দেবালয়। অষ্টধাতু নির্মিত দশভুজা অষ্টদুর্গা ও শংকর-মূর্তি সিংহাসনে। ঘিয়ের জাগপ্রদীপ জ্বলছে দু'পাশে; সুগন্ধ ধূপের ধোঁয়া শীলায়িত ভঙ্গিতে উঠছে, ছড়িয়ে পড়ছে ঘরময়। লাল পেড়ে শাদা সরুদের শাড়িখানি প'রে, নিষ্ঠাবতী পূজারিণীর বেশে শংকরী ঘরে এলেন, প্রণাম করলেন দেবতাদের ভূমিষ্ঠ হ'য়ে। তার পর জাগপ্রদীপে পঞ্চপ্রদীপ ধরিয়ে ছন্দময়ী তরুণী তাঁর উপাস্য দেবতাদের আরতি করতে থাকেন, শিব স্তোত্র গাইতে গাইতে—

শিব শংকর, শম্ভু-মহেশ্বর,
মৃত্যুঞ্জয়-যোগী, শশাংক-শেখর;—
হর হর মহাদেব,
হর হর মহাদেব,
হর হর মহাদেব!
শিব-শংকর, পিনাকপাণি,
শংকা কর দূর শক্তি-শেল হানি,
বহ্নানল জ্বালি' ঘোচাও গ্লানি-কালি;—
হর হর মহাদেব,
হর হর মহাদেব,
হর হর মহাদেব।"

দেবালয়ের দ্বারে দাঁড়িয়ে দীননাথ, শান্তা এবং আর দু'টি স্বাস্থ্যবতী তরুণী; মুক্তপাণি সকলেই। আরতি শেষ হ'লে একটি তরুণী ছাড়া সকলেই দুয়ার থেকে চ'লে গেলেন। তরুণীটি ভেতরে এলেন এবং দাঁড়ালেন শংকরীর পাশে। শংকরী তাঁর ডান হাতটি ডান হাত দিয়ে ধ'রে লজ্জিতভাবে বলতে থাকেন—"মনে কষ্ট করিস্‌নে, দুর্গা! তোকে না নিয়ে যাবার একমাত্র কারণ হ'ল—তুই ঘুমিয়ে পড়েছিলি।"

"ঘুম ভাঙিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতো না?"

কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে শংকরী ব'লে ওঠেন—"কেন? আমি কি আপনার কাছে এমন কোন শর্তের বাঁধনে বাঁধা যে, সঙ্গে নিতেই হবে?"

প্রশান্ত স্বরে দুর্গা বলেন—"মনকে প্রশ্ন করো। আর কোনদিন একা বেরিও না। জানি আত্মরক্ষার যোগ্য শক্তি তোমার আছে; তবু আমাকে কাছে রাখবে, শংকরী। একা থাকলে আমার সময়ও যে কাটতে চায় না; মন তখন কেঁদে মরে!"

দুর্গার গলা জড়িয়ে ধ'রে আবেগভরা কণ্ঠে শংকরী বলেন—"সবই জানি, বোন! আর কোনদিন একা রেখে যাবো না। ঘুমিয়ে পড়েছিলি; ওদিকে কানে আসছিল সেই সন্তানহারা মায়ের কান্না—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি।"

"তোমার মন ও দেহের বল আমার ভালোই জানা আছে; তবু ভয় হয়। আজকের ওই ঘটনা একটা দুর্ঘটনা হ'তে পারতো না কী?"

"খুবই পারতো। মহিষাসুরের বল হঠাৎ ঘিরে ফেলায় বেশ চিন্তা হয়েছিল। শেষে, ওদের জব্দ করতে সবই ঠিক হ'য়ে গেল। তবে, উল্কা আর কৃষ্ণা যদি দুর্গা ও শংকরীকে নিয়ে পাশাপাশি থাকতো, তা হ'লে, সব ক'টা মোষকেই তাড়িয়ে দিতে পারতুম—যতই রাগ করুক তারা। ওদের অরণ্য-রাজ্য; তাই ওখানে গিয়ে ওদের ওপর অত্যাচার করতে মন মোটেই চাইছিল না। কিন্তু আত্মরক্ষার প্রশ্ন যে প্রবল হ'য়ে দেখা দিল।"

"অন্যায়কে ধ্বংস করতে গিয়ে, ন্যায়কেও কখনো কখনো আঘাত দিতে হয়। তুমি তো অন্যায় অত্যাচার কর নি!"

শংকরী দাঁড়ালেন এবং দুর্গার হাত ধ'রে বলেন—"চ', দুর্গা, ফুল তুলে আনি। অনেক ক'রে ফুল তুলবো আজ।"

দুর্গা উঠে বলেন—"অত ফুল কী হবে?"

"বরের জন্য গাঁথবো মালা"—বলেই শংকরী খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে ওঠেন।

অভিমান ক'রে দুর্গা বললেন—"কাজলামি রাখো।"

"তার মানে?"

"শুনি তো কত কথা; বর আনলে কই?"

ধীর স্বরে উত্তর দেন শংকরী—"জানিস্ তো, ভাই, আমার শপথের কথা!"

"উদ্ভট শপথ।"

"উদ্ভট নয়, অসম্ভব নয়—কঠিন মাত্র। এর আর একটি বড় সুন্দর দিক আছে। তাই তো তোকে এবং তোদের নিয়ে থাকতে পারছি। দুর্গা, তোকে আমি ছেড়ে যেতে, ভুলে যেতে পারি না। আমার সেই জীবনের মত জীবন তোকে তো দিতে পারবো না, বোন! হিন্দু নারীদের ভাগ্যবিধাতারা কী হৃদয়হীন,—কিরূপ ভ্রান্ত তারা!"—ঘৃণায়, উত্তেজনায় শংকরীর রাঙা মুখখানি টকটকে লাল হ'য়ে ওঠে।

দুর্গা নীরবে তাঁর গায়ে হাত বুলোতে থাকেন। তীব্র স্বরে শংকরী বলে ওঠেন—"তারাই মানুষ?"

দুর্গা নিজের কপালে তর্জনী ছুঁইয়ে বলেন—"সবই এই। দুঃখ ক'রে কী হবে দিদি? তুমি তো স্নেহ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে আমাকে সব ভুলিয়ে রেখেছ!"

সজীব স্বরে বললেন শংকরী—"কপাল দেখাসনে, দুর্গা! সবই পুরুষের কারসাজি। মায়া দিয়ে, নারী-জাতির একটা বিরাট অংশকে তারা আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। তুই বিধবা, আমি কুমারী; তোতে আমাতে হৃদয়ের দিক দিয়ে তফাত কোথায়? দুর্গা, একজন বীরাঙ্গনা হ'য়ে তুইও কপাল দেখাবি?"

ম্লান হাসি হেসে দুর্গা বলেন—"না বলা ছাড়া উপায় আর কী, শংকরী? সর্দার যৌবনাথের

মতো পুরুষ আর ভবশংকরীর মতো নারী এ-দেশে ক'জন আছেন, যাঁরা অসহায় পশুর দুঃখ বোঝেন, বিধবার জন্যে কাঁদেন যাঁরা!"

শর্ভার দীর্ঘশ্বাস ফেলে শংকরী দুর্গার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। দুর্গা তাঁর হাত ধ'রে টান দিয়ে বলেন—"চলো, ফুল তুলে ফেলি। রাত হ'য়ে যাচ্ছে।"

উন্মনা শংকরী সভীর স্বরে বলেন—"চলো!—কিন্তু একদিন এই দুর্গাবতীদেরই দুঃখ-ব্যথা দেশের বাতাস হাহিয়ে তুলবে—মহাকালী নরকপাল নিয়ে খেলবে রেনে-খেলা। আজকের তোলানাথও সেদিন হবেন নটরাজ—এ বাস্তব সত্য, জানিস্, দুর্গা! অন্যায় চিরদিন দেবতার আসন দখল ক'রে থাকতে পারবে না।"

সহজ হাসি হেসে বললেন দুর্গা—"এও বাস্তব সত্য যে, শংকরীকে শক্তি পরীক্ষায় হারিয়ে শংকরও একদিন আসবেন।"

"শক্তি-পরীক্ষায় হারিয়ে নয়, হয়তো শক্তির পরীক্ষা দিয়ে। তবে, আমিও তোকে ছুঁয়ে শপথ করলুম, নারী-জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তোকে আজকের মতই ধ'রে থাকবো!"—দুর্গার গায়ে হাত দিয়ে বললেন শংকরী।

দুর্গা তখন বলেন—"সে শক্তি তোমার আছে, আমি জানি। তুমি এসেছ, ভারতবর্ষে এক মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে, জগতকে জানিয়ে যেতে যে, বাংলার মেয়েরাও অবলা, অলস, অপদার্থ নয়।"

ঘর থেকে দু'জনে বেরিয়ে চললেন, কিন্তু ঘরের মধ্যে শংকরের শঙ্খে যেন নারীর ওই বাণীই বাজতে থাকলো। তোলানাথের বুকে দুর্গার হাত পড়েছে।

॥ তিন ॥

কাটশাকড়া।—আলো-ছায়ার বৈচিত্র্যময় গ্রাম। জাগতিক চঞ্চলতার ভরা লোকালয় থেকে কিছু দূরে, শান্ত পরিবেশে একটি বাগানের মধ্যে রুদ্র-নারায়ণ-শিবের মন্দির। প্রভাত সূর্যের আলোয় দেব-দেউল ঝল্‌মল্ করছে। ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজ্যের সংসার-বিরাগী রাজা রুদ্রনারায়ণ রায় আজ এই মন্দিরে শিব-শংকরের অভিষেক করবেন। মন্দিরের সামনে গৈরিক-বাস-পরিহিত রাজা—রাজর্ষি দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁর পাশে রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্য। মন্দিরের অদূরে গাছের তলায় সাধু-সন্ন্যাসী দলে দলে। কোন দল শিব-স্তোত্র আবৃত্তি করছেন; কারাও দিচ্ছেন শংকরের জয়ধ্বনি। আশপাশে পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ নরনারী। সবাই আনন্দিত, সবাই শান্ত। আজ যে তাঁদের সন্ন্যাসী রাজা এখানে শিবপ্রতিষ্ঠা করছেন।

বেলা বাড়তে থাকে, দেবতা প্রতিষ্ঠার আয়োজনও চলতে থাকে। দ্বিপ্রহরে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান শেষ হ'ল। রাণী এসেছেন; সর্দার দীননাথ, মন্ত্রী ও সেনাপতিও এসেছেন ছাউনী এবং যুদ্ধজাহাজগুলির অধ্যক্ষদের সঙ্গে। অপরাহ্নে দেবতার প্রসাদ পেয়ে সবাই ফিরে গেলেন; রুদ্রনারায়ণ রইলেন শুধু এখানে। তাঁর আজ কী আনন্দ! তিনি বুঝি সত্যই সংসারে থেকে সংসার ছাড়তে পেরেছেন।

* * *

দিন আসে দিন যায়। রেখে যায় কিছু, নিয়ে যায় অনেক। রুদ্রনারায়ণ শিব-সাধনা করছেন দিনের পর দিন। প্রত্যহ পূজার শেষে দেবতার ভোগ ধ'রে দেওয়া হয় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ নরনারায়ণের

সামনে। ক্ষুধিত মানুষ অন্ন পেয়ে তৃপ্তি পান, ক্ষুধিত রাঙা তাদের খুশিমাখা মুখ দেখে আনন্দিত হন। তোলানাথের মেলায় এমনি আনন্দ দেওয়া-নেওয়ার খেলা চলতে থাকে।

ক'টি মাস কেটে গেল এইভাবে।—

এক দুপুরে ভদ্রনারায়ণ পূজায় বসেছেন। মন্দিরের সামনে মন্দির-রক্ষক—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ঘুরে ঘরোয়ান গাছের ছায়ায় অনেকগুলি ক্ষুধিত মানুষ। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের রক্তচক্ষু ঘরোয়ান ও উপস্থিত লোকদের সন্ত্রস্ত ক'রে রেখেছে। সবাই নীরব—রাজা পূজা করছেন।

কিন্তু অহংকোষীর শাসন মানলো না এক শিশু। ভিখারিনীর শীর্ণ সন্তান ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হ'য়ে মাকে দেখাচ্ছে দেবতার মন্দির—ওখানে দেবতা আছেন, ওখানে খাবার আছে,—নিয়ে চলো, মাগি আনাবো। কিন্তু ভিখারিনী তো অবুঝ নয় ওর মতো। সে জানে—শিশুর নির্দেশ সত্য; কিন্তু সেখানে যাবার পথ কেমন, তা তো তার অজানা নয়। চোখে দেখা যায় সব ফাঁকা,—সবই ফাঁকা, আবার একটার পর একটা অদৃশ্য, দুর্ভেদ্য প্রাচীর। লৌহ-কপাট না খুললে সেখান দিয়ে যাওয়া যায় না; আর, কপাটের চাবি যাদের হাতে, তাঁরা—অন্ধ, নির্দয় দেবতা।

শিশু মায়ের কথা শুনবে না। সে মায়ের কোলে চেপে কেবলই দেখায় দেবতার ঘর। মা শংকিতা, ব্যথিতা; দু' পা এগোয়, দশ পা পেছোয়। শিশুকে তোলাতে চায়; কিন্তু সে কিছুতেই তোলে না। বুড়ো ঘরোয়ান এগিয়ে গিয়ে চুপি চুপি ভিখারিনীকে বলে—"এখনো তো ভোগ হয়নি; একটু ঘুরে এসো।"

নারী ফিরতে চায়; কিন্তু শিশু অস্ফুট স্বরে আপত্তি জানালো। ঘরোয়ান তাকে চুপ করতে বলে—ইশারায় দেখায় মন্দির রক্ষককে। নারী বলে—রোগের জন্যে কাল সে আসতে পারে নি পাত কুড়োতে, ছেলে তার খেতে পায় নি কিছু; আজ তাই খিদেতে এতটা অস্থির হয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরোয়ান বুড়ো বলে—"ব্রাহ্মণ-ভোজনের আগে উঠোনে গেলে পুরুত-ঠাকুর যে খেপে উঠবেন, মা! সুখী উনি; তোমাদের দুঃখ বুঝবেন না তো! একটু ঘুরে এসো।" শিশুকে বলেন—"যা, ভাই, একটু ঘুরে আয়। আমারো যে নেই কিছু এখন।"

মা ফিরতেই ছেলে কেঁদে উঠলো। পুরোহিত অমনি ছুটে এসে যান সেখানে এবং তীব্র রুক্ষ স্বরকে কিছু চেপে বলেন—"চুপ; রাজা বাহাদুর পূজায় বসেছেন।"

শিশু ভুলে গেছে খিদের কথা। চোখের সামনে ব্রাহ্মণের রুদ্র-রূপ দেখে সে এবার ভয়ে কেঁদে ফেলে। প্রাণপণে মা ছেলেকে থামাতে চায়; ঘরোয়ান ইশারায় শিশুকে থামতে বলে। বৃথা হ'ল সবি। ব্রাহ্মণ বুঝি খেপে উঠেছেন; আর তার রুদ্র শিশুকে ভয়ে আত্মহারা ক'রে দিচ্ছে। ব্রাহ্মণ শেষ পর্যন্ত চিৎকার ক'রে বললেন—"দূর হ', মাগী! ব্রাহ্মণ-সেবার আগে খেতে এসেছেন! দূর হ'!"

ভীতা, লজ্জিতা নারী জানায় তার কথা। এই কথা নিরুপায় ঘরোয়ানের মনে ব্যথা এনেছিল; কিন্তু পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সেই কথা শুনে আরও রেগে উঠলেন। তিনি তীব্র স্বরেই বলেন—"দূর হ', নইলে মেরে তাড়াবো।"

ভিখারিনীর মধ্যে হঠাৎ নারীত্ব ওঠে জেগে। সে গম্ভীর স্বরে ব'লে ফেলে—"রাজার ঘাটে আপনি মোড়লি করবেন না, ঠাকুর।"

"কী"—বলেই ব্রাহ্মণ ভিখারিনীর শিশুর কাঠির মত হাতটা চেপে ধরেন। মা'র কোল থেকে

তাকে টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চান। জীবন্ত কংকাল হলেও, নারী তো মা। সে দু'হাত দিয়ে ছেলেকে বুকে চেপে ধরলো; আর, ভয়ে ও ব্যথায় শিশু বুক ফাটানো কান্না কাঁদতে থাকে। দরোয়ানের দৃষ্টি রুদ্রনারায়ণ শিবের মন্দিরের দিকে। তার মুখ দেখে মনে হয়, মনে মনে সে বলছে—'পাষাণ, এখনো তুমি জাগলে না?'

পাষাণ জেগেছে।—

শিশুর কান্না রাজর্ষির কানের মাঝ দিয়ে মর্মে যেতেই তাঁর ধ্যান ভেঙে যায়। অস্থির হ'য়ে তিনি ব'লে উঠলেন—"আমার অন্তর থেকে কেন তুমি অমন ক'রে বেরিয়ে গেলে, শংকর?···কে কাঁদে? কে ডাকে তোমায়?" তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে এলেন। অদূরের অস্বাভাবিক দৃশ্য তাঁর চোখে পড়লো। মন্দির দ্বারে দাঁড়িয়েই উদার গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন—"পুরোহিত!"

রাজর্ষির সেই স্বর সবাইকে চমকিয়ে দেয়। পুরোহিত ছুটে চলেছেন ওই-দিকে। দরোয়ানের বিস্ফারিত দৃষ্টি তাঁর মুখের ওপর। রুদ্রনারায়ণ এসেই মায়ের কোল থেকে অজ্ঞানিক শিশুকে নিয়ে নিলেন নিজের কোলে। পবিত্র উত্তরীয় দিয়ে শিশুর মুখচোখ মুছিয়ে দিতে দিতে ব্যথিত স্বরে রাজা দরোয়ানকে বললেন—"বড় লাগে, না, বন্ধু?"

দরোয়ানের চোখে জল। একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুক থেকে সশব্দে বেরিয়ে এলো। ভীতা ভিখারিনী এবার কথা বলতে পারলো। কাতরতা স্বরে বলে সে—"রাজামশাই, রোগের ভয়ে কাল আসতে পারি নি পাতা কুড়তে; কাল থেকে খেতে পায় নি আমার ছেলে। খিদেতে কাঁদছিল। আমারই দোষ। ওকে ক্ষমা করুন।"

জল ভরা চোখ দু'টি আকাশের দিকে মেলে, মন্দিরের দিকে চলতে চলতে, ধীর স্বরে রাজা বলেন—"আমাকে ক্ষমা করো, শংকর। দেবতার মন্দিরে তুমিও এলো, মা।"

মন্দিরের মধ্যে এসে, রাজা শিশুকে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন ভোগের সামনে, বিনীত ভাবে বললেন—"তোমারই ভোগ ও, শংকর। খাও তুমি!"

পিছন থেকে পুরোহিতের ব্যস্ত স্বর ভেসে এলো—"এখনো দেবতাকে নিবেদন করা হয় নি রাজাবাহাদুর!"

না ফিরেই রাজা বলেন—"দেবতার ভোগ দেবতা গিয়ে খাচ্ছেন। নিবেদনের প্রশ্ন কেন তুলছেন, ব্রাহ্মণ!···শংকর, আমাকে ক্ষমা করো,—খাও!"

খুশি শিশু মাকে একবার দেখে নিল; তারপর হামা দিয়ে গিয়ে সামনের খাবার খেতে থাকে। রাজার মুখে হাসির বাঁধ ভেঙেছে, অশ্রুও পেয়েছে সোজা পথ। দুয়ারে মা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ছেলের খাওয়া; আর দরোয়ান আনন্দ বিহ্বল দৃষ্টিকে মেলে ধরেছে রাজর্ষির ওপর। ব্রাহ্মণ প্রাঙ্গণে—চিন্তাকুল, মাটি দেখেন।

সবাইকে চমকিয়ে দিয়ে এমন সময় মন্দির দ্বারে কার গুরুগম্ভীর স্বর বেজে উঠলো—"জয় শিব-শংকর!"

রাজা ফিরে দাঁড়ালেন; দেখলেন—দ্বারে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী; আজানুলম্বিত জটাজাল; বাঘ ছাল পরনে; হাতে কমণ্ডলু আর ত্রিশূল। প্রশান্ত দৃষ্টি রাজার মুখে ফেলে, প্রশান্ত স্বরে বললেন সন্ন্যাসী—"শিব-সাধনায় আজ তুমি সিদ্ধ হ'লে, রাজা,—স্বয়ং শংকরকে তুমি ভোগ খাওয়ালে! বড়

তুমি। পরে আমরা তা দেখে। রাজা, এবার তুমি ঘরে যাও; পুনরায় বিবাহ করো—তোমার যোগ্য সন্তানের প্রয়োজন। শিব-সাধনায় আসার সময় তুমি তোমার ভাবী পত্নীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলে।—শুভমস্তু।"

স্তব্ধ রাজা দেখেন—সন্ন্যাসী চ'লে যান, তাঁর কণ্ঠে আনন্দরঞ্জিত স্বরে উচ্চারিত হচ্ছে—'হর, হর, মহাদেব।' দেখলেন—তৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে শিশু গেল মায়ের কোলে; মায়ের মুখভরা আনন্দ আলোকে। রাজা শিবলিঙ্গের সামনে হাসিমুখে ব'সে, চোখ বুজে দেখতে থাকেন তাঁর অন্তর-রাজ্যের আনন্দ মেলা।

শিব-সাধনায় সিদ্ধ হলেন রাজর্ষি।

॥ ছাব্বিশ ॥

গড়ভবানীপুরের রাজপ্রাসাদ। অপরাহ্ণ গোধূলির মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে ফেলছে। রাজা রুদ্রনারায়ণ কাটশঁাকড়া থেকে, সেই সন্ন্যাসীর নির্দেশে, এইমাত্র ফিরেছেন প্রাসাদে। প্রাসাদের মধ্যে শুধু মহলাকক্ষে তিনি একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কপালে চিন্তা-রেখার জটিল আল্পনা; চোখে বেদনার শ্বেত চন্দন। সেই বাঘারনের যুদ্ধের কথা তিনি আজও একটুও ভুলতে পারেন নি; বৈরাগ্যের একতারা এখনও মাঝমাঝে তাঁর অন্তরের পথে মন-বাউল বাজিয়ে চলে। রাজাধিরাজকে নির্মমতার স্রষ্টা ভেবে, সাধারণ সংসার জীবনকে হীন স্বার্থের তৈরি অশান্তির চক্রব্যূহ ভেবে তিনি নির্লিপ্ততার পথে পা দিয়েছিলেন, সুখী হয়েছিলেন। কিন্তু আবার তাঁকে ফিরতে হ'ল—সেই অধিকার নিয়েই, সংসারে। স্বার্থ-গন্ধহীন সন্ন্যাসীর নির্দেশ তিনি না মেনে পারলেন না। কিন্তু—

"কে তুমি, সন্ন্যাসী? কেন দিয়ে গেলে ওই কঠোর নির্দেশ?"

বিস্ময় ও চিন্তার ভারে নত মাথা নিয়ে রাজা ধীরে ধীরে পদচারনা করতে থাকেন।—

"গুরুদেবের নির্দেশ উপেক্ষা করেছি, পতিব্রতা স্ত্রীর কথাও রাখি নি। কর্তব্য-সাধনই ছিল আমার ধর্ম। স্ত্রী বন্ধ্যা; তাই আবার বিবাহ করতে হবে? কিন্তু—"

ঘুরে বেড়ান থমথম। একবার আসেন, ভাবেন কি; আবার ঘোরেন। আর ঘোরা যায় না; ব'সে পড়লেন নিজের আসনে। বলতে থাকেন ধীর, চিন্তাভার স্বরে—"কিন্তু সন্ন্যাসীনির্দেশ যে বড় কঠোর, বড় প্রবল। একে তো উপেক্ষা করতে পারচি না। এতদিনকার পালিত স্ত্রীর-প্রতি-কর্তব্যকে উপেক্ষা করা যেমন দুঃসাধ্য ব্যাপার, সন্ন্যাসীর নির্দেশ অমান্য করাও তেমনি কঠিন কাজ।...'শিব-সাধনায় আসার সময় তোমার ভাবী-পত্নীর সাক্ষাৎ পেয়েছ তুমি' সন্ন্যাসী ব'লে গেলেন এই কথা। সর্বহারা জীবনাথের সেই বীরাঙ্গনা কন্যা ছাড়া আর কোন নারীর মুখ আমি সেই পথে তো দেখি নি? ওই কন্যার কথা সন্ন্যাসী জানলেন কী ক'রে? মহিষমর্দিনী শ্রীদুর্গার সামনে তিনি আমাকে কোথাও থেকে দেখেছিলেন, না—লোকাতীত শক্তিবলে তিনি জানলেন সব? কিন্তু—কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখায় পা দিয়ে যে, সে সেই নব-যৌবনা দেবী-রূপিনী নারীকে পত্নীরূপে পাওয়ার দাবি কোন্ ধর্মবলে করতে পারে? দারুণ অপরাধ, অধর্ম তা। সেই অন্যায়কে শক্তিমান্ পুরুষ হ'য়ে আমি কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারি না।"

চুপ ক'রে ব'সে থাকেন কিছুক্ষণ। শেষে বলেন—"নাঃ;' এ জটিল সমস্যার সমাধান আজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। গুরুদেবকে চাই।"

কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন। লেখা হ'লে ডাকলেন প্রহরীকে। প্রহরী এলো। তার হাতে চিঠিটি দিয়ে বললেন রুদ্রনারায়ণ—"চিঠিটি এখনি মন্ত্রী মহাশয়কে দিয়ে বলো, তিনি যেন এখনই নিজে গিয়ে গুরুদেবকে নিয়ে আসেন।"

প্রহরী চ'লে গেল; রাজা অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়লেন।

• • •

বেশ রাত হয়েছে। গড়ভবানীপুর রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে দু'খানি অতিজাত ধরনের পাল্‌কি এসে নামলো। পিছনেরটি থেকে মন্ত্রী দুর্লভ দত্ত বেরিয়ে সামনের পাল্‌কির কাছে গেলেন এবং গুরুদেব হরিদেবকে সসম্মানে বললেন বেরিয়ে আসতে। বেরুলেন হরিদেব। রাজগুরুই বটে! বেরুল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বার্ধক্যের সকল প্রভাবকে দমিয়ে সাধনায় জয় ক'রে উন্নতশির; মুখে চোখে প্রকৃত জ্ঞানের প্রভা। বেরিয়ে শান্ত হাসি হেসে, সরল স্বরে বললেন—"চলো, দুর্লভ। অমন ব্যস্ত হবার কিছু নেই, বাপ! চলো।"

চললেন দু'জনে অন্তঃপুরের দিকে।

রাজা ও রাণী উভয়ে এসে গুরুদেবকে প্রণাম করলেন, তাঁকে নিয়ে চললেন গুপ্ত মন্ত্রণাকক্ষেই। মন্ত্রী চ'লে গেলেন। গুরুদেবের জন্য নির্দিষ্ট আসনে গুরুদেবকে বসিয়ে রুদ্রনারায়ণ বসলেন তাঁর সামনে মেঝের ওপর; রাণী স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। গুরুদেব স্নেহমাখা স্বরে বললেন—"ওখানে কেন? তোমার আসনে ব'স, রাজা। শাসনকর্তা তুমি; দেশকে শাসন করাও তোমার কর্তব্য। কোন অবস্থাতেই ভেঙে পড়া রাজার পক্ষে শোভনীয় নয়। রাজা—সে রাজাই।"

রুদ্রনারায়ণ উঠে গিয়ে নিজের আসনে বসলেন; রাণী তাঁর সিংহাসন ধ'রে দাঁড়িয়ে। রাজা এবার তাঁর সমস্যাকে গুরুদেবের সামনে ধ'রে দিলেন, চাইলেন তাঁর নির্দেশ। গুরুদেব একটু চুপ ক'রে ব'সে রইলেন সব শুনে। হঠাৎ তাঁর মুখের উন্মনাভাব ঘুচে গিয়ে সেখানে দেখা দিল কান্তিতেজ,—রাত সোহালো। খুশি মনে বলতে থাকেন হরিদেব—"সত্যই তিনি মহাপুরুষ, রুদ্রনারায়ণ। প্রকৃত রাজশক্তি পরিচালনা ক'রে তাঁর নির্দেশ সার্থক করো। মহাপুরুষের কথা মিথ্যা হবার নয়। আপন স্বার্থ অপেক্ষা দশের স্বার্থ অনেক বড়। দেশ ও দশের কল্যাণের জন্যেই তুমি দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহণ করছো; সেই কর্তব্যসাধনে আমার রাণী-মা'রও আছে পূর্ণ সমর্থন। তুমি এই কাজ করলে মা আমার খুবই আনন্দ পাবে, ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজ্যও ধন্য হবে। আর কোন চিন্তা করো না। মহাপুরুষ যখন পাত্রী নির্বাচন করেছেন, তখন সর্দার দীননাথের সুচরিতা, বীরাঙ্গনা কন্যাই তোমার পত্নী হবেন। তোমাদের কল্যাণ হোক।"

গুরুদেবের মতো কথা বললেও, হরিদেব রুদ্রনারায়ণের মধ্যে তেমন কিছু পরিবর্তন আনতে পারলেন না। তাঁর পুরুষ-কর্তব্যবোধের ওপর বর্ষবাণীর ভারী বোঝা চাপিয়ে তাঁর অন্তরের ঠাকুরকে যেন এক অকর্তব্য পালনে বাধ্যই করা হচ্ছে। আদর্শ স্বামীর এই অবস্থা দেখে রাণী ব্যথা পেলেন; গলবস্ত্র হয়ে করযোড়ে গুরুদেবকে বললেন তিনি—"গুরুদেব, আপনার এই শুভাশিষ মহারাজকে শক্তি দিক। ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজবংশের মহিমার জাগ-প্রদীপ জীবন-শিখায় জাগিয়ে রাখুক চিরদিন—দেশ ও দশের স্বার্থে।"

গুরুদেব অম্লান হাসি হেসে বলেন—"তোমার সাধু মনের শুভেচ্ছা সার্থক না হ'য়ে পারে, মা? শিব-শংকর জেগেছেন তোমারই দ্বার আহ্বানে।"

গভীর স্বরে রাজা ব'লে ওঠেন—"শংকর, শক্তি দাও!···রাণী, গুরুদেবকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও! আমি আসছি।"

রাজা-রাণী উভয়েই গুরুদেবকে প্রণাম করেন। "শুভ হোক" ব'লে ব্রাহ্মণ তাঁদের যেন আন্তরিক আশীর্বাদ। পরে রাণী তাঁকে নিয়ে গেলেন অন্তঃপুরে। রাজা দাঁড়িয়ে রইলেন—"অন্তরের সমর্থন না পেলেও এ কর্তব্যও ক'রে যাবো। আমার জীবনে অন্যের—শংকর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!"

ডাকলেন প্রহরীকে। প্রহরী এলে, মন্ত্রীকে ডেকে দেবার নির্দেশ তাকে দিলেন। মন্ত্রী না আসা পর্যন্ত রাজা ঘরময় ঘুরে বেড়ান—অন্তর অস্থির। প্রৌঢ় মন্ত্রী এসে নতশিরে রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর নির্দেশ প্রার্থনা করেন। রাজা ধীর স্বরে বললেন—"অনেক রাত পর্যন্ত আটকিয়ে রেখেছি; ক্ষমা করবেন আমার অপরাধ! একটি কাজ সকালেই করবেন। নিয়ে সর্দার দীননাথ চৌধুরীর বাড়ি গিয়ে, অবিলম্বে একবার এখানে আসার জন্যে তাঁকে আমার বিনীত অনুরোধ জানাবেন।"

সন্ত্রস্ত মন্ত্রী ব'লে ওঠেন—"সেনাপতিকে এখন ডেকে দেব, মহারাজ?"

সরল হাসি একটু হেসে রাজা বলেন—"চতুর্ভুজ সবসময় কাজে লাগে না, মন্ত্রী! আপনি এবার আসুন।"

"এখনি আমি যাই না, মহারাজ!"—মন্ত্রী ব্যস্ত বেশ।

রাজা স্বচ্ছন্দে উত্তর দিলেন—"এত ব্যস্ত হবার কী আছে? ভোরে গেলেই হবে। অনেক রাত হয়েছে; আপনিও প্রবীণ। সর্দারজীর এতে কোন আপত্তি থাকবে না, জানি; কিন্তু—"

"আমি ঠিক পারবো, মহারাজ! আমি ডেকে আনছি"—ব্যস্তভাবে মন্ত্রী বেরিয়ে গেলেন।

বানপ্রস্থাবলম্বী রাজা হঠাৎ প্রাসাদে ফিরে এলেন—চিন্তাতুর; তার ওপর গুপ্ত মন্ত্রণাকক্ষে রাত্রে গুরুদেবকে আনিয়ে নিভৃতে রাণী ও তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ কাল আলোচনা; শেষে সুনিপুণ সৈনিক সর্দার দীননাথকে আহ্বান। এ-সব বিচক্ষণ মন্ত্রীকে কেমন অস্থির ক'রে তুলেছে। কোথায় যেন কি অকল্যাণ ঘটেছে। মন্ত্রী তাই রাত-দুপুরেই গড়ভবানীপুর থেকে পেঁড়োগড়ে চললেন।

মনে অর্থের লোভ থাকলেও দুর্লভ বস্তু রাজা ও রাজ্যকে ভালবাসেন।

॥ পাঁচ ॥

গভীর রাত্রি। সর্দার দীননাথের বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণে শংকরী তিনটি তরুণীকে অসিচালনা শিক্ষা দিচ্ছেন। আজকের মতো শিক্ষা দেওয়া শেষ ক'রে শংকরী শান্ত স্বরে তাঁদের বললেন—"মূর্তিমতী শক্তি তোমরা। অন্যকে শক্তি দিতে, অন্যায়কে ধ্বংস করতে জেগে ওঠো। দুর্গাবতী একদিন ছিল তোমাদের দু'জনের মতোই। আজ সে শংকরীর ডান-হাত! তোমাদের শংকরী-দি কী বরাবরই এমনি ছিল? না;—সাধনায় সে বড় হয়েছে; তোমরাও সাধনায় বড় হবে! নিজেদের চিনতে শেখো সবাই। নিজেরা অন্যায় করো না—অন্যকে অন্যায় করতে দিও না। অন্যায় করা, আর অন্যায় সওয়া—এ দুই-ই কঠোর অপরাধ।"

নতুন তরুণীদের নাম—জনা ও সুভদ্রা। সুভদ্রা বিনীতভাবেই বলেন—"নারী অবলা নয়, দেশ দুর্ভাগা নয়—তোমাকে দেখেই তা বুঝেছি, দিদি! পুরুষ যাদের নিচে নামিয়ে নিচেই ফেলে রাখলো, আত্মহত্যার মন্ত্র কানে দিয়ে গেলো চ'লে, তাদেরই তুমি হাসি মুখে টেনে তুলে নিলে কাছে, নির্মল ফুল ভেবে তাদের নিয়ে নর-নারায়ণের পূজায় লাগালে।"

সংকরী হাসিমুখেই বললেন—"যা করি, তা মানুষেরই কাজ। স্বপ্ন দিয়ে একে ঘিরে ফেলো না, বোন্। তোমরাও এমনি কাজ করবে; এমনি কাজই মানব-ধর্ম।" সব সময় মনে রেখো—নারী অবলা নয়, নারী উপেক্ষার পাত্র নয়। তথাকথিত সবলের অন্যায় সহ্য করতেই, অন্যের পাপের জন্যে নীরবে প্রায়শ্চিত্ত করতেই জন্মায় নি তারা। তারা পুরুষের মতোই বেঁচে থাকবে; পুরুষকে সাহায্য ক'রে, নর-পশুকে মানুষ ক'রে তারা মানুষের সংসারকে করবে আলো-ছায়াভরা এক বিচিত্র স্থান।"

জনা বলেন—"আমাদের জীবনে, দিদি, তোমার এ আশা পূর্ণ হবেই হবে।"

"হোক ভাই! তোমাদের নিয়ে আমাদের দুর্ভাগিনী মা একটু সুখ পাক।.....একটু বিশ্রাম করো তোমরা। আমি একটু পাহারায় থাকি।"—ব'লে সংকরী প্রাসাদের অন্য পাশে গেলেন।

* * *

মন্ত্রীর পাল্‌কি নিয়ে বেহারারা এসে গেল সর্দারজীর বাড়ির অদূরে। হঠাৎ পথচালক সর্দার দাঁড়িয়ে পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় আর তিনজন জোয়ান বাহক নেতার কোন্ সংকেত পেয়ে। ভেতর থেকে মন্ত্রী ব'লে ওঠেন—"থাম্‌লি কেন রে? চ'লে চ'।"

কাঁপা-স্বরে সর্দার-বাহক বললো—"মন্ত্রীমশয়, সর্দারজীর বাড়ির সামনে পড়ী!"

"হুম্, উঠুক! নামা পাল্‌কি এখানে।"—বললেন দুর্লভ দত্ত।

দৈত্যের মতো বাহক চারজন কাঁধ থেকে পাল্‌কি নামালো। মন্ত্রী বাইরে এসে দেখলেন সামনের দৃশ্য; হেসে বাহকদের বললেন—"ওঁরা পরী বটে, কিন্তু এই বাড়িরই—স্বর্গ থেকে আসেন নি।"

তখনই দুর্গা এসে গেলেন মন্ত্রীর সামনে, নমস্কার করলেন তাঁকে। দুর্গাকে আলো আঁধারে দেখে দৈত্যেরা কাঁপতে থাকে। দুর্গাকে প্রতিনমস্কার ক'রে মন্ত্রী বলেন—"অনুগ্রহ করে সর্দারজীকে সংবাদ দিন। আমি মহারাজার বিশেষ নির্দেশ নিয়ে এসেছি।"

বিনীতা বীরাঙ্গনা বললেন—"আপনি অনুগ্রহ ক'রে সভাকক্ষে এসে বসুন; আমি সর্দারজীকে সংবাদ দিচ্ছি।"

"আমি বাইরেই থাকি, ভদ্রে! বিশেষ দরকার।"

দুর্গা চ'লে গেলেন দ্রুতপদে বাড়ির মধ্যে এবং তখনই দীননাথের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। এসেই দীননাথ বলেন—"রাজার কী নির্দেশ ব'য়ে এনেছেন, মন্ত্রীমহাশয়?"

দীননাথের রণসাজ ও তাঁর যৌবন-দৃপ্ত কণ্ঠ মন্ত্রীকে বিস্মিত ক'রে তুলেছে। বিস্ময়কে জয় করতে না পারায়, দীননাথকে এতক্ষণে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে, তিনি প্রশ্ন করলেন—"রণবেশ কেন, সর্দারজী?"

হাসতে হাসতে সহজভাবেই সর্দার উত্তর দিলেন—"আজো যে ছুটি হয় নি, বন্ধু,—আজো যে সিংহাসন আর স্বার্থ আছে। বলুন—রাজার কি আদেশ।"

"তিনি আপনাকে স্মরণ করেছেন।—এখন যাওয়ার যদি অসুবিধা থাকে, তো—"

হাসিমুখে সর্দার বলেন—"আমি প্রস্তুত। আপনি আসুন।"—ডাকলেন এবার সংকরীকে।

সংকরী ছুটে এসে গেলেন। তাঁকে দেখে, কিছু শংকিত মন্ত্রী বলেন—"এঁরাও কেন রণবেশে, সর্দারজী?"—

সর্দারের মুখে পাতলা হাসি; তাঁর কণ্ঠে এলো জীবন্ত স্বর—"নারী শুধু মোহন-মূরতি ধরণী নন, মন্ত্রীবর, নারী অসুরনাশিনী দেবীও।—ওঁরা প্রাসাদের পাহারায়।"

শংকরীকে বললেন—"রাজা রুদ্রনারায়ণ আমাকে অনুগ্রহ ক'রে স্মরণ করেছেন, মা! একটু ঘুরে আসি।"

নীরবে শংকরী সম্মতি জানান।

সর্দার উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন—"চৈতক!"

সর্দারের প্রিয় ঘুড়ের ঘোড়া এগিয়ে এলো তার ঘর থেকে, দাঁড়ালো সর্দারের পাশে। সর্দার তার ওপর উঠে বসতেই, তীর বেগে ছুটলো চৈতক। মন্ত্রী অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখতে থাকেন। তাঁর স্তব্ধতা ভেঙে দিলেন শংকরী। তিনি বললেন—"আপনাকেও হয়তো মহারাজার এখনি প্রয়োজন হবে। না হ'লে আপনাকে—রাজ্যের মন্ত্রীবরকে অতিথি ক'রে সেবা করতুম আমি।"

বিনীতভাবেই মন্ত্রী বলেন—"আমিও তা হ'লে ধন্য হ'য়ে যেতুম, মা! মহারাজার প্রয়োজন হবে হয় তো আমাকে। আজ যাই।"—চলে গেলেন মন্ত্রী পাল্কির দিকে।

• • • •

রাত্রির তৃতীয় প্রহর। রুদ্রনারায়ণের গুপ্ত-মন্ত্রণাকক্ষে ঝাড়বাতি জ্বলছে—ঘর জনহীন। এসে গেলেন সেখানে দুই বীর পুরুষ—রুদ্রনারায়ণ এবং দীননাথ; কিন্তু প্রথম জন অবসন্ন, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কালজয়ী হ'য়ে জীবন্ত। নিজের সিংহাসনের পাশেই সর্দারকে হাত ধ'রে বসিয়ে নিজে বসলেন রাজা। কিন্তু প্রথমে কথা কইতে পারলেন না। সর্দার বসার পরই, অন্তরঙ্গ বন্ধু অথচ সম্মানিত রাজকর্মচারী হিসাবেই কথা শুরু করলেন—"আমাকে কী করতে হবে, মহারাজ?"

একটু হেসে রাজা বলেন—"তেমন কোন বিশেষ কাজ নেই, সর্দারজী! তবু, কেমন কষ্ট দিলুম আপনাকে?"

"কষ্ট?"—বিস্ময়সূচক প্রশ্ন।

"জানি—এটুকু সর্দারজীর কাছে কিছুই নয়। হাঁ—আমি নাকি শিব-সাধনায় সিদ্ধ হয়েছি, নিঃসংকোচে মানুষকে ভাবতে পেরেছি—সাধারণ মানুষকে, শিব-শংকর ব'লে।"

"কিন্তু মহারাজার মুখেচোখে যে এক গভীর চিন্তার ছায়া!"

রাজা হেসে বলেন—"সর্দার দীননাথের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া কী সম্ভব!—সংসারের সেরা জ্ঞান—চিন্তাকে না নেবার উপায় তো নেই। আপনার সঙ্গে একটু কথা ক'য়ে অন্তর মনের ভাওয়াই পাবো, এই আশাতেই রাজাগিরি ফলিয়ে, রাত-দুপুরে আপনাকে ডেকে আনলুম। ত্রুটি নিশ্চয়ই হয়েছে; মার্জনাও পেয়েছি। এই তো আনন্দ!"

"এমন প্রয়োজনে রাজদর্শন-প্রাপ্ত রাজকর্মচারীর পক্ষে নিতান্তই বাঞ্ছনীয়, মহারাজ।"

অস্বাভাবিক সংযতভাবে রাজা এবার সর্দারকে প্রশ্ন করলেন—"বাড়ির সব কুশল তো?"

"হাঁ, মহারাজ। শংকর-শক্তি আপনার মঙ্গল করুন।"

"যেদিন শিবনিবাস যাই, সেদিন পথে এক অভাবনীয় ব্যাপার দেখে বড়ই আনন্দ পেয়েছিলুম।"

বিস্মিত দীননাথ প্রশ্ন করেন—"যুদ্ধক্ষেত্রে যিনি বাস্তব নটরাজ, সংসারক্ষেত্রে যিনি প্রশান্ত শুকের, সাধন-ক্ষেত্রে ভোলানাথ যিনি, তিনি এমন কী দেখলেন, যা ভাবনার অতীত?"

"সত্যই অভাবনীয়, সর্দারজী! মোন দিয়ে চলেছি। সংসার ছেড়েছি। সত্যই আনন্দ। সংসার

এই অবস্থাকে স্বীকার ক'রে নেবে কিনা, তাই চিন্তাও মনে। হঠাৎ কানে এলো অদ্ভুত পশুর চিৎকার। বাঁ দিকে চেয়ে দেখি—ক্রুদ্ধ মহিষমহিষমর্দ্দনের মতো এক নারী। তীরে তরী ভিড়িয়ে যাই বনের মধ্যে। দেখলুম—মহিষমর্দ্দিনী শ্রীদুর্গাকে। আপনিই সেই বীরাঙ্গনার পিতা—প্রশ্নের উত্তরে এ-কথাও জানলুম। কী আনন্দ!"

"শংকরী সে-কথা গিয়েই বলেছিল।"

"ভূরীশ্রেষ্ঠ-রাজবংশ আপনার সঙ্গ লাভ ক'রে সত্যই ধন্য, ধন্য আমি!"

"এমন পুণ্য-ভূমিতে জন্মিয়ে, এমন রাজার স্নেহ-প্রীতি পেয়ে আমিও নিজেকে ধন্য বিবেচনা করি, মহারাজ!"

"মেয়ে কী আপনার কাছেই থাকে?"

"হাঁ।—বালিকা মেয়ে আর একেবারে শিশু-পুত্র রেখে স্ত্রী চ'লে গেলেন। ধাত্রীর হাতে শিশুকে দিয়ে মেয়েকে রাখলুম নিজের কাছে—ছেলের মতোই তাকে মানুষ করি। যুদ্ধ করাই আমার জীবন-ধর্ম। তখনকেরীও সেই ধর্মে দীক্ষা নিল। আজ সে আমার মতোই শক্তি ও বুদ্ধি ধরে। নারীই তো, মহারাজ, মহিষাসুর নিধন করেছিল।"

"সত্য, সর্দ্দারজী! নারীই শক্তি। এবার উপযুক্ত পাত্রে—" কথা শেষ করতে পারলেন না রাজা।

সর্দ্দার বললেন—"শংকরীর তপস্যা আজও শেষ হয় নি; শংকর তাই এখনো অনাগত।"

রাজা বুঝতে পারলেন না কথার মর্ম; তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ধরলেন সর্দ্দারের মুখে। সর্দ্দার ব'লে যান—"শংকরী আজ সাবালিকা; শংকরী যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতি, গার্হস্থনীতি ও ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। আত্মশক্তিতে সে সচেতন। তাই তার উপাস্য দেবতা শংকরের সামনে শপথ করেছে—যে পুরুষ তাকে অনিযুদ্ধে পরাস্ত করবে, সেই হবে তার স্বামী। কঠিন হলেও সাধু প্রতিজ্ঞা। কেন সে অযোগ্যের সহধর্মিনী হবে? আমি তাকে সংসারে এনেছি ব'লে সে বাসনাকে ব্যর্থ করার অধিকার আমি রাখি না। থাক, যতদিন না শংকর আসে। মনুও তো এমন নারীদের অপেক্ষা করতে বলেছেন। তবে আমি জানি, শংকরীর আশা পূর্ণ হবেই একদিন।"

রাজা সোৎসাহে ব'লে ওঠেন—"সে আশা পূর্ণ হবেই, সর্দ্দারজী! শংকরকে আসতেই হবে।"

"আমি তা হ'লে এবার উঠি, মহারাজ?"

রাজা ব্যস্তভাবে বললেন—"এই রাত্রে?"

সর্দ্দার দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন—"আজ্ঞে আমি ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজবংশের একজন সক্রিয় সর্দ্দার। এ-টুকু পথ আর রাত্রির ভয় আমার থাকার কথা নয়। এখন আমি চলি। যখনি আমাকে প্রয়োজন হবে, অনুগ্রহ ক'রে ডাক দেবেন। আজ তো আর কোন প্রয়োজন নেই?"

রাজা উঠে বললেন—"প্রয়োজন প্রতিক্ষণে, তবে এখন আর তেমন কিছু নেই, যার জন্যে আপনাকে ধ'রে রাখতে হবে। মনে রাখবেন।"

সলীল স্বরে বললেন সর্দ্দার—"এ জীবনে, এই বংশকে ভোলা সম্ভব নয়, মহারাজ।" অভিবাদন জানিয়ে চললেন সর্দ্দারজী। রাজাও জানান তাঁকে প্রত্যভিবাদন।

সর্দ্দার দৃষ্টির বাইরে গেলে রাজা বলেন—"এবার কোন্ পথে যেতে হবে, দেখিয়ে দাও, শংকর।"

॥ ছয় ॥

সুপ্রভাত। দেবীপুরে রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্যের কুটিরের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন এক বীর অশ্বারোহী পুরুষ। ঘোড়া থেকে নামলেন, শ্রদ্ধাজড়িত স্বরে ডাকলেন—"গুরুদেব!"

কৌশেয়-বাস পরিহিত হরিদেব বেরিয়ে এলেন বাড়ির দাওয়া থেকে, দেখলেন তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে ত্রুরীশ্রেষ্ঠ রাজ্যের রাজা। রাজা গুরুদেবকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে গুরুদেব তাঁকে আশীর্বাদ দিয়ে উঠতে বললেন। রাজা উঠলেন, চললেন গুরুদেবের পিছু পিছু।

ঘোড়াটি প্রভুর প্রতীক্ষায় রইলো।—

পরিষ্কৃত অঙ্গনে, তুলসীতলায় কম্বলের ওপর বসেছেন গুরুদেব—রুদ্রনারায়ণ সমুখে। বীর স্বরে উভয়ের কথাবার্তা হচ্ছিল। শেষে গুরুদেব বললেন—"কোন চিন্তা নেই, রুদ্রনারায়ণ! আমি এখনি দীননাথের কাছে গিয়ে তার মেয়েটিকে চেয়ে নিচ্ছি। আমার অন্তরের গোপাল বলছেন—আমি যাকে পাবোই। তুমি গৃহে যাও; আমি পাল্‌কি ক'রে গড়ভবানীপুর যাচ্ছি।"

এই ব্যবস্থামতোই কাজ হ'ল। রুদ্রনারায়ণ বিদায় নেবার পরই হরিদেব পেঁড়ো-পড়ে যাত্রা করলেন। দ্বিপ্রহরের পূর্বেই রাজগুরু গিয়ে পৌঁছুলেন দীননাথের বাড়িতে। দীননাথ ও শংকরীর কী আনন্দ তাঁকে পেয়ে। শংকরীর কাছ থেকে একটুর জন্য ছুটি নিয়ে গুরুদেব সর্দারকে নিয়ে বসলেন মন্ত্রণাকক্ষে। তিনি যে এক গুরুদায়িত্ব নিয়েই আজ এসেছেন এখানে। কিছু কথা হবার পর হরিদেব দীননাথকে বললেন—"তোমাদের রাজ্যের বিশেষ এক কল্যাণ-ব্রত উদ্‌যাপন করতেই আমি আজ তোমার কাছে এসেছি, দীননাথ! বীর তুমি, পণ্ডিত তুমি—আমাকে তুমি সাহায্য করো!"

বীর্য-দীপ্ত স্বরে সর্দার বললেন—"কি করতে হবে, অনুগ্রহ ক'রে আদেশ করুন, রাজগুরু! শক্তি ও বুদ্ধি ব্যয় করতে আমি একটুও ইতস্ততঃ করবো না।"

আনন্দের সঙ্গে গুরুদেব বলেন—"প্রকৃত বীরপুরুষ পণ্ডিতের যোগ্য কথাই এ। শোন।—রাজবাড়ির কোন জটিল কথাই তোমার অজানা নয়। রাজা অপুত্রক। আমার নির্দেশ ও রাণীর অনুরোধ বার বার ব্যর্থ হ'ল; রাজা কিছুতেই পুনরায় বিবাহ করলেন না। রাণীর প্রতি তাঁর এতই ভালবাসা। কিন্তু সেদিন শিবনিবাসে এক মহাপুরুষ তাঁকে জানালেন যে, তাঁর শিবসাধনা সিদ্ধিলাভ করেছে এবং তিনি ঘরে ফিরে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহণ করুন দেশ ও বংশের স্বার্থে। সেই মহাপুরুষের বাণী রুদ্রনারায়ণ অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। রাজা পুনরায় বিবাহ করতে রাজী হয়েছেন। এখন বরকন্যার রাজ্যে যোগ্য পাত্রীর। সেই মহাপুরুষই জানিয়েছিলেন রাজাকে—"শিব-সাধনায় আসার সময় তুমি তোমার ভাবী পত্নীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলে। রাজা যাবার সময় রোদের তীরে দেখেছিল শুধু তোমার বীরাঙ্গনা কন্যা—মহিষমর্দিনী দুর্গাকে।"

দীননাথ শুনে বললেন—"পরম সুদর্শাচার! একটু অপেক্ষা করুন গুরুদেব। ভবশংকরী আজ সুশিক্ষিতা, সাবালিকা নারী। তার জীবন নিয়েই যে কথা, সে কথা তার সামনেই হোক"।

"সাধু, সাধু"—ব'লে ওঠেন গুরুদেব। সর্দার কেবল শংকরীকে ডাকিয়ে আনলেন। শংকরী এসে বসলেন বাবার পাশে। সর্দার তাঁকে বললেন—"তোমার জীবন সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথার আলোচনা করতে চান গুরুদেব। তুমি শিক্ষিতা, সাবালিকা; তোমার সামনেই আলোচনা হওয়া উচিত। ব'সে শোন এবং যা বলার, তাই বল, মা"।

হরিদেব একটু আগে যে কথাগুলি দীননাথকে বলেছিলেন, সেই কথাই শংকরীকে ভিন্নরূপে শোনালেন। শুনে, ধীর-গম্ভীর স্বরে শংকরী বললেন—"খুবই মূল্যবান কথা; কিন্তু আমি যে আপনাকে আনন্দ দিতে পারছি না, গুরুদেব! আমি শংকরের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছি, যে পুরুষ আমাকে অসিযুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবেন, সেই পুরুষকেই আমি পতিত্বে বরণ করবো"।

পরম আনন্দের সঙ্গে গুরুদেব বললেন এবার—"এ তোমারই উপযুক্ত পণ, শ্রীহর্ষা। শংকর ছাড়া কে শিবানীর বরমাল্য নেবেন। তুমি নিশ্চয়ই জানো, মা, কুরিস্রোট-রাজ্যের রাজা কংসনারায়ণ কত বড় বীর। মাঝারনের যুদ্ধের কথা তুমি আমাদের চেয়ে বেশী জানো; কারণ তোমার পুরুষশ্রেষ্ঠ পিতা রাজার পাশেই ছিলেন।"

"সব জানি, কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, রাজগুরু!"—বিনীতভাবে বলেন শংকরী।

হরিদেবের মুখে চিন্তার রেখা দেখা দিল। ধীর স্বরে বললেন তিনি—"প্রৌঢ় হলেও কংসনারায়ণ যৌবনের শক্তি ধরেন। অসিযুদ্ধে তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই আনন্দ দিতে পারবেন। কিন্তু দেশের রাজার পক্ষে এরূপ অসিযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া কী শোভন হবে, মা?"

সজীব স্বরে শংকরী এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন—"সবি জানি, গুরুদেব! কিন্তু নিজের আদর্শ থেকে স্খলিত হওয়া কী অপরাধ নয়?"

ব্রাহ্মণ উদার স্বরে ব'লে উঠলেন—"নিশ্চয়ই অপরাধ। তোমাকে আদর্শচ্যুত করার ক্ষমতা কোথাও কারও নেই, ভবশংকরী। তোমাদের রাজ্যের স্বার্থে এই কঠোর সমস্যা-সমাধানের ভার রইলো তোমারই ওপর।"

একটু সময় শংকরী ভাবেন কি; তারপর সৌম্য স্বরে গুরুদেবকে বললেন—"আপনার কথা মাথা পেতে নিলুম। দেশ ও দশের স্বার্থে আমিই সমস্যাটির সমাধান ক'রে দেব। রাজগুরু এবং রাজার সম্মান ক্ষুণ্ণ করা আমার কর্তব্য হতেই পারে না। —গুরুদেব, এক পুণ্যদিনে দেবী রাজরাজেশ্বরীর পূজার ব্যবস্থা করুন। সামনে দু'জায়গায় একটি ক'রে মহিষ ও মেষ বাঁধা হবে। অসির আঘাতে রাজা একবারে এক গ্রন্থ পশুর শিরশ্ছেদ করবেন এবং আমিও অনুরূপ কাজ করবো। রাজা সফল হ'লে, দেব-দ্বিজ ও অগ্নির সাক্ষাতে তখনই আমি রাজার কপালে নিহত পশু-রক্তের তিলক পরিয়ে তাঁকে পতিত্বে বরণ ক'রে নেব। —গুরুদেব, সেই জটিল সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি কি?"

দু'হাত তুলে আনন্দিত হরিদেব ব'লে উঠলেন—"অপূর্ব, অপূর্ব, বঙ্গ-বীরাঙ্গনা! তুমি যে সার্থক বিদুষী, তার প্রমাণ মুহূর্তের মধ্যেই দিয়ে দিলে। রাজগুরু হরিদেব আজ ধন্য হ'য়ে গেল! তুমি নিজ কাজে যাও, মা; আমিও আমার কাজে যাই।"

হাসিমুখী শংকরী বললেন—"সময়ের ক্ষণ ব'য়ে যাচ্ছে না, গুরুদেব! রাজগুরুর একটু সেবা আমাকে করতে দিন এখন।"

"সেবা?—মায়ের সেবা ছেলে নেবে; শংকর-মাকে নেবে শংকরীর সেবা? সেবা নয়, মা,—আদর। চলো—আর্যীর জীবনে পূর্ণ করো তোমার মহিমা।"

শংকরী উঠলেন, আনন্দিত দীননাথ উঠলেন, উঠলেন হরিদেব। মধুময় হয়ে উঠেছে পরিবেশ।

॥ সাত ॥

রাজবল্লহাটে রাজবল্লভী দেবীর মন্দির। অনুমান চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা চতুরানন নিয়োগীর জামাতা ও উত্তরাধিকারী সনানন্দ মুখোপাধ্যায় এই দেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। আজ সেই দেবীর বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করেছেন রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্য, সর্দার দীননাথের মেয়ে শংকরীর নির্দেশে। আজই হবে এখানে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণনারায়ণের শক্তি-পরীক্ষা। দেবতার ডেউলে রাণী ও বামুনঠাকুর হরিদেব—আজকের অনুষ্ঠানের পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণ মনীষীর বেশে রাজা কৃষ্ণনারায়ণ। তাঁদের সামনে সৈনিক পুরুষ দীননাথ। ঠাকুর ঘরের অদূরে দু'জায়গায় পশু বেঁধে রাখা হয়েছে—একটি মহিষের নিচে একটি মেষ। এই ছিল শংকরীর নির্দেশ। প্রাঙ্গণ ঘিরে সেনাদল ও পল্লীর নরনারী। সবাই নীরব, সবাই কার প্রতীক্ষায়। রাজা একবার নীরবে আকাশ দেখে, সামনের সূর্য-ঘড়ির দিকে তাকালেন; তাঁর দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। এই ভাব লক্ষ্য ক'রে গুরুদেব বললেন—'চিন্তা নেই, রাজা! ভবশংকরী যথাসময়ে উপস্থিত হবে!'

সময়ের ক্ষণ ব'য়ে গেল না—দুর্গাকে নিয়ে শংকরী এলেন। কৃষ্ণা ও উল্কাকে অদূরে রেখে এলেন দু'জনে দেবালয়ে; দেবী, গুরু ও দীননাথকে প্রণাম দিলেন, প্রণাম জানালেন রাজাকেও। গুরুদেব ও পিতার অনুমতি নিয়ে শংকরী গিয়ে দাঁড়ালেন একপ্রস্থ পশুর পাশে। রাজাও গুরুদেবের আদেশে অন্য প্রস্থের পাশে যান। বীর পুরুষ ও বীরাঙ্গনার হাতের দীর্ঘ তরবারি একসঙ্গে ওপরে উঠলো, ঝল্‌মল্ ক'রে উঠলো প্রখর রৌদ্রে। তারপর চোখের নিমিষে দু'টি তলোয়ারই নেমে এলো এবং জনতার চোখে ফাঁকি দিয়ে চারটি পশুর মাথাকে তাদের দেহ থেকে আলাদা ক'রে দিল। বিজয়-বাদ্য বেজে উঠলো দেবতার মন্দিরে, বাইরে, সৈন্যদলের মধ্যে। হাসিমুখী শংকরী এগিয়ে যান হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দিয়ে একটু পশু রক্ত তুলে নিলেন, তাকালেন দেবতা, গুরু ও পিতার পানে এবং শঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে রক্তের তিলক পরিয়ে দিলেন রাজার কপালে।—

এ কথাই ছিল।—

এই সময় রাণী মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে দেবীকে নিবেদিত সিঁদুরের পাত্র। রাণী হাসিমুখে এসে, সবার সামনে, শংকরীর কপালে একটি সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিলেন—বললেন খুশিভরা স্বরে,—"আমি বড়, তুমি ছোট; আমরা দু'টি বোন।"

আনন্দিতা শংকরী তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন মাথায়। জয়ধ্বনি ওঠে চারদিকে। শংকরী আবার গুরুজনদের প্রণাম করলেন, মমতায় জানালেন জনতাকে; তারপর দুর্গার হাত ধ'রে অসি হাতে এগিয়ে উঠলেন ঘোটকীর ওপর। কৃষ্ণা ও উল্কা তীরবেগে ছুটে চললো। পিছনে—জয়বাদ্য বাজে।

• • •

শুভদিনে, শুভলগ্নে দীননাথের বাড়িতে ভবশংকরীর সঙ্গে রাজা কৃষ্ণনারায়ণের শুভ মিলন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হ'ল। অনুষ্ঠানের পুরোহিত ছিলেন স্বয়ং রাজগুরু হরিদেব। বীরশ্রেষ্ঠ স্বামী পেয়ে শংকরী সুখী। তাঁর সহচরী—নারী সৈনিকদেরও আনন্দের সীমা নেই। মাতৃহারা মেয়েকে যিনি মায়ের ব্যথা একেবারে ভুলিয়ে রেখেছেন, সেই পাত্রীদেবী শংকরীর প্রসন্ন মুখ দেখে গর্বিত। সর্দারের বাইরে কোনরূপ স্বাভাবিক পরিবর্তন না দেখা গেলেও, অন্তরে আজ তাঁর আনন্দেরই মেলা বসেছে। শংকরী যে শংকরের সঙ্গে সাযুজ্য হলেন। আবার দিদির বিবাহে বাল্য-গৃহ থেকে বিদায় সর্দারও এসেছে বাড়ীর সঙ্গে। ভাইকে পেয়ে, ভাইকে

কাছে নিয়ে শংকরীর কী আনন্দ! শংকরী আজই কুমারকে পেয়ে বসেন নি। মাঝে মাঝে ধাত্রী-গৃহে গিয়ে, বা তাইকে বাড়িতে এনে এই ভাবেই স্নেহের পশরার সাথে ভালোবাসার বন্ধনকে মিশিয়ে থাকেন। কুমার সেখানে থেকে, ভাবী সর্দার হবার যোগ্য শিক্ষা লাভ করেছে। আর সে যাবে না। এখানে তবে থাকবে কে?

বিবাহের পরদিন দীননাথের প্রাসাদ প্রায় অন্ধকার ক'রে শংকরী নিজের বাড়িতে চ'লে গেলেন—নিয়ে গেলেন নিজের সঙ্গিনী তিনজনকে। শাস্তার খুবই কষ্ট হ'ল; তবে শংকরী তাঁর কোলে কুমারকে বসিয়ে দিয়ে, সেখানের শূন্যতা পূর্ণ ক'রে গিয়েছেন। দুঃখ ভোলার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে গেলেন শংকরী।

গোধূলির সোনালী আলোর মাঝখানে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের নতুন রাণীর তাঞ্জাম এসে নামালো। রাজার তাঞ্জাম পিছনে; তার পরে ঘোটকীদের ওপর দুর্গা, জনা আর সুভদ্রা। নওবতখানায় সন্ধ্যা-বন্দনায় শানাই বাজছে; তার সঙ্গে যোগ দিয়ে ওঠে শুভ-শঙ্খ শুরু শুরু রবে। তাঞ্জাম থেকে বেরুতেই শংকরী দেখা পেলেন বধূ-রাণীর দেবীমূর্তি—হাসির রঙে মুখ রাঙিয়ে, পুণ্য বরণ-ডালা হাতে এসে দাঁড়ালেন তিনি শংকরীর সামনে। শংকরীর ডান হাতটি সাদরে ধ'রে সুন্দর স্বরে বললেন—"ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজবংশের জয়ন্তীরূপিনী বধূকে আমিই বরণ ক'রে নেব। এসো, কল্যাণময়ী কন্যা!" নিয়ে চললেন বাড়ির মধ্যে। হরিবোল দিয়ে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করছেন।

রুদ্রনারায়ণ বেরুলেন তাঞ্জাম থেকে। নারী সৈন্যেরা তাঁকে অভিবাদন জানান। রাজা হাসিমুখে তাঁদের নমস্কার জানিয়ে বললেন—"নেমে এসো তোমরা। আজ থেকে এ-বাড়ি তোমাদেরও। তোমাদের জীবনধারার সঙ্গে মিশে গেল ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজবংশের জীবনধারা। কোন মুহূর্তে তোমরা নিজেদের এর পর ভেবো না—এর কাছ থেকে অধিকার পেলেও। যে যাকে যত ভালোবাসে, সে তাকে ততই আঘাত দেয় তো!"

রাজাকে নিয়ে স্ত্রি-শক্তি প্রাসাদে ঢুকলেন। এখানের পথ তাঁদের কাছে একেবারে নতুন; কিন্তু চললেন সম্পূর্ণ পরিচিতার মত। সাধারণ ঘরের সমাজ-দলিতা, আত্মীয় নিগৃহীতা তরুণীরা ভবশংকরীর কাছে এমনি শিক্ষাই পেয়েছেন।

অন্তঃপুরে এক শয়নকক্ষে বড়রাণী, শংকরী, স্ত্রিশক্তি ও পুরনারীরা। শংকরীকে সামনে বসিয়ে, তাঁর ডান হাতখানি নিজের দু'হাতের মধ্যে নিয়ে, পরম সুখী বড়রাণী বলেছেন—"যে শিক্ষা তুমি পেয়েছ, বোন, তাতে কেবল এই অন্তঃপুরই তোমার স্থান নয়; তোমার স্থান সারা ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজ্যে। নারী-সমাজ অশিক্ষা আর কুশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে দেশকে অবনতির পথে ঠেলে দিয়েছে। নারীকে—শক্তির আধারকে আলো দেখাও, দেশের মানুষকে 'মানুষ' হবার শিক্ষা দাও। তাতেই তোমার জীবনের সার্থকতা। তাতেই হবে স্বামীর মুখ আরও উজ্জ্বল, শত্তর কুল হবে চিরস্মরণীয়। আমি অন্তঃপুর নিয়েই থাকবো।"

মৃদু হাসি হেসে শংকরী বললেন—"এত আশা যখন আমার ওপর, তখন তা পূর্ণ করার চেষ্টা না ক'রে আমি পারি, দিদি? আপ্রাণ চেষ্টা করবো।"

"জানি, তুমি এসেছ সেই কল্যাণ নিয়েই।"

শংকরীর মুখে একটু মধুর হাসিই জাগেন

এ শুধু নারীর সঙ্গে পুরুষের বিবাহ নয়—তারও বড় কিছু; এ পুরুষ-প্রকৃতির মিলনও। গার্হস্থ্য জীবন ছাড়িয়ে এই মিলনের প্রভাব পড়বে সমাজ ও রাষ্ট্রের জীবনে। তাই তো নব-দম্পতি মিলিত হয়েছেন গুপ্ত মন্ত্রণা কক্ষে,—চলেছে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে গভীর আলোচনা। অন্তঃপুর থেকে বড় রাণীর আহ্বান বার বার আসায় আলোচনা এখন শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছে। রাজা বললেন—"রাজ্যের রাজা আমি, কিন্তু রাজ্য তোমারও। তার কল্যাণের জন্যে এমনি পরামর্শই তুমি আমাকে দেবে। আমি শপথ করছি—পরামর্শমত কাজ করবার চেষ্টা আমি করবোই।"

"রাজ্যের সব কথাই আমি বাবার কাছে শুনেছি; আলোচনাও করেছি তাঁর সঙ্গে। রাষ্ট্রকে উন্নত করতে হ'লে দেশরক্ষা বিভাগকে বলিষ্ঠ করতে হয় প্রথমেই। সীমান্ত সুরক্ষিত না হ'লে ভেতরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও রক্ষা করা যায় না। আমাদের স্থল ও নৌ-বাহিনীকেও আরো সুসংহত এবং শক্তিশালী করা চাই। বিহার উড়িষ্যার সামনে আমাদের ঘাঁটে রাখতে হবে এক শক্তির স্তম্ভ; তাই অবিলম্বে ছাউনাপুরে একটি দুর্গম দুর্গ করিয়ে নিন। এই সঙ্গে রাজ্যের লোকদের আন্তরিকতার সঙ্গে জানিয়ে দিতে হবে যে, রাজ্য তাঁদেরই রাজা তাঁদের রক্ষক মাত্র। এই জানানোর ফলে, দেশের সমর্থ সন্তানের যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে বীর সৈনিক ক'রে তোলা যাবে। বাইরে করা সৈন্য নিয়ে দেশ রক্ষা করা যায় না, মহারাজ! আমরা যদি নিজেদের দেশ-সেবক ও সেবিকা ব'লে ভাবতে পারি, তা হ'লে, দেশবাসীও আমাদের ঘরের কল্যাণকারী লোক ব'লে ভাববেন। তখন দেশের উন্নতি অনিবার্য হ'য়ে উঠবে। মেয়েদের সচেতন গৃহিণী ও জননী করতে হবে; পল্লীতে পল্লীতে অবৈতনিক পাঠশালা করিয়ে ছেলে-মেয়েদের, বয়স্ক-বয়স্কাদের নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। অজ্ঞানতা বড় পাজি জিনিস, মহারাজ! আর এই কাজের ফলে অনেক কর্মহীন শিক্ষাবিমূঢ় ব্যক্তির অন্নসমস্যা ঘুচবে এবং তাঁদের কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠবে দেশে অপূর্ব সংস্কৃতি! মহারাজ, আমাদের নতুন হ'তে হবে!"

আনন্দিত রাজা বলেন—"প্রস্তুত। তুমি জেনে রেখো, শংকরী, তুমি শুধু আমার স্ত্রী নও, তুমি আমার বন্ধু, আমার মন্ত্রী। এতদিন মহাবীর, সুপণ্ডিত সর্দারজীর কাছে যে শিক্ষা পেয়েছ, এবার তাদের বাস্তব রূপ দাও। আমি সর্বদা পাশে আছি। ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজবংশ আমাদের মিলিত সাধনার ইতিহাসের এক অক্ষয় উপাদান হোক। ইতিহাসে নতুন অধ্যায় লেখার জন্যেই তোমার জন্ম।"

শংকরীর মুখে একটু সলজ্জ হাসি দেখা দেয়।—

তখনি দরজার ও-পাশ থেকে বড়-রাণী বলেন—"ভেতরে আসতে পারি?"

সহজভাবেই রাজা বলেন—"অবাধ স্বাধীনতা নেই কী?"

বড়রাণী এসে, শংকরীকে ঘ'রে সরস স্বরেই বললেন—"ভয় হয়—কী সোপন মন্ত্রণা হয় তো হচ্ছে।—থাক্; এখন কথা হচ্ছে, নতুন বউটিকে সব সময় মন্ত্রণা কক্ষে আটকিয়ে রাখলে তো চলবে না। সুন্দরবনের উঁচো পাখি, বাস্ত ধরবে যে! চল্ তো বোন,—খেতে হবে। মন্ত্রণার বাকি নেই তো?"

হাসিমুখী শংকরী ঘাড় নেড়ে জানায়—মন্ত্রণা শেষ।

রাজাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন বড় রাণী—"আপনিও উঠুন, রাজামশাই! রাত অনেকটা হ'ল।'

রাজা বললেন —'চলো; তুমিও তো খাও নি।" উঠে চললেন সকলে।

॥ আট ॥

ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজ্যে শুভ-পরিবর্তনের বাতাস বেশ বইছে। এরই মধ্যে পল্লীতে পল্লীতে পাঠশালা বসানো হয়েছে এবং বুঝিয়ে ও জোর ক'রে সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়েদের আনা হচ্ছে শিক্ষা দিতে। পল্লী-পথ

মেরামত করতে লোক লেগে গেছে। ছাউনাপুরে ভূগর্ভস্থ দুর্গ-নির্মাণের কাজও চললো। রাণী ভবশংকরীকে নিয়ে রাজা রুদ্রনারায়ণ মন্ত্রণা-কক্ষে মন্ত্রণা করেন। ছাউনিতে ছাউনিতে গিয়ে সৈন্যবাহিনীকে নতুন রসদও দেন। রাণীকে পেয়ে সৈন্যদল বড়ই আনন্দ পায়। তিনি যে ওদের নতুন রস এনে দিয়েছেন।

রাণীকে পেয়ে জনসাধারণও কম সুখী নন। শংকরী মাঝে মাঝে দুর্গাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, গিয়ে ওঠেন চাষীর বাড়িতে—পুরুষদের পুরুষ হ'তে বলেন; মেয়েদের জানিয়ে যেন—ওঁদের আদর্শ গৃহিণী ও জননী হতেই হবে। সাধারণ মানুষ প্রায়ই ভুলে যান সম্বন্ধের ও সম্পর্কের ব্যবধান। ঘরে ঘরে শংকরীর গুণগান। রাজকুমারের মা হবার আগেই তিনি শত শত নরনারীর মা হয়ে গেলেন।

রাজপ্রাসাদের দ্বার খুলে গেল সবার জন্যে। রাজ-অন্তরও আজ সবার কাছে মুক্ত। রাজ্যে আজ যেন কেউ অবিশ্বাসী প্রজা নন। নীরবই দেখা গেল, বারোয়ারী-তলায় জোয়ান চাষী-মজুরেরা সমবেত হয়ে শিক্ষিত সৈনিকদের কাছ থেকে যুদ্ধ-বিদ্যা শিখছেন। নারীরাও পিছিয়ে থাকেন না। শংকরী গড়ে তুলেছেন একটি নারী-বাহিনী এবং তাঁদের দিয়ে পল্লী-নারীদের খুন্তি-বাতা-ধরা হাতে হাতিয়ার তোলারও ব্যবস্থা করেছেন। নিজের শত কাজ থাকা সত্ত্বেও শংকরী কখনো কখনো মেয়ে বা পুরুষদের শিক্ষাক্ষেত্রে গিয়ে পড়েন; নিজে তাঁদের শিখিয়ে বা তাঁদের সঙ্গে কৃত্রিম যুদ্ধ ক'রে শিক্ষার্থী ও সাধারণের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন অপূর্ব উদ্দীপনা—সৈনিক হবার মনোবৃত্তি। শংকরীর কাজই তাঁকে ঘরে বাইরে একান্ত বাঞ্ছনীয় ক'রে তুলেছে। মনিব-বাড়ির 'মনগড়া নিন্দা' প্রচার করেও যারা আনন্দ পায়, তারা—বামুন ঠাকরুন এবং পরিচারিকারাও নতুন রাণীকে মনে প্রাণে না ভালবেসে পারে না। তবে, শংকরী যখন ঝড়ের বেগে বাড়িতে ঢুকে, রান্নাঘরে আসেন এবং বড় রাণীর হাত থেকে খুন্তি কেড়ে নিয়ে দেবতার ভোগ রান্না ক'রে যান, তখন ওই 'মজার জীবগুলি' স্বগোত্রিয়াদের পানে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাকাতে থাকে।

প্রথম যেদিন রান্না-ঘরে এসে শংকরী দিদির হাত থেকে খুন্তি নিয়ে রান্না শুরু করলেন, সেদিন বড়রাণী একটু ঘাবড়া পান মনে। সংসার যে অনেকদিনের! বলে ফেলেন দিদির মতই—"কোথা থেকে এসে ঠাকুরের ভোগ রাঁধতে লাগলি। হাড়ি-বাগদী-ছোঁয়া হাতটাও ধুলি নে"?

উত্তরে শান্ত শংকরী বলেছিলেন—"ওঁরাও তো, দিদি, এই দেবতারই সন্তান! সন্তানের স্পর্শ মা-বাবার মনে বিরক্তি আনবে"?

শংকরীর মুখের দিকে বড়-রাণী একটু সময় তাকিয়ে থেকে, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেন তাঁকে। তখন তাঁর চোখে বাদল নেমেছে। শংকরীর বুকে মুখ রেখে বলেন শুধু—"এমনি ক'রে ভুল ভেঙে দিস্, দিদি"!

• • •

দু'টি বছর কেটে গেল এইভাবে। ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজ্য আজ মধুময়; কিন্তু মউমাছির দল প্রভুর প্রাচীর তুলে রেখেছে মধুভাণ্ডের দক্ষিণে। সেই মধুরতার আরও মাধুর্য যোগ ক'রে একদিন এলো রাজকুমার—সন্ন্যাসীর বাণী সার্থক হলো। অহাপুরুষ সত্যই তিনি, স্বপ্ন-বিলাসী নন। জ্ঞান-দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন রাজার অন্তরের পরিবর্তন, দেখেছিলেন—অসুরনাশিনী দুর্গাকে, দেখলেন শেষে হিমালয়ের স্নেহক্রোড় ছাড়ার প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়তে; তখন তিনি অনুভব করলেন—সাধারণ মানুষের দুঃখ এবং মহাজিজ্ঞাসার কথা শোনালেন মানুষের। জটাজুটধারী, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত, কমণ্ডলু-শূলপাণি সন্ন্যাসী কম বড় কর্মযোগী নন।

রাজকুমার এক, কিন্তু ওঁর দুটি আদর্শ মা! শংকরী বড়-রাণীর কোলে সন্তানকে হাসিমুখে তুলে দিলেন; বড়-রাণীও রাখলেন কুমারকে দুইয়ের ক'রে। এ রাজকুমারের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে।

ভবশংকরীও চলেছেন নিজের পথে। শুভ কর্মপথে অভিযান চালানোর জন্যই বুঝি ওঁর জন্ম; সন্তানের ভার নিতে তাই এক আদর্শ নারী প্রস্তুত ছিলেন, তাই শংকরীকে ব্যস্ত হ'তে হয় নি সংসারের কথা ভেবে। ওঁর মধ্যে কাজ করার যে উৎসাহ দু'-বছর পূর্বে জেগেছে, আজও তা জেগেই আছে—অবসাদ আসে নি, ক্লান্তি লাগে নি। গণ-জীবনের মান-উন্নয়ন ক'রে নরাকার-জীবকে সার্থক নর-নারী করতে তিনি ওঁর জীবনের প্রতি কণা শক্তিকে নিযুক্ত করেছেন। নারী ভবশংকরী লিখছেন ভারত-ইতিহাসের একটি অমূল্য অধ্যায়।

* * *

কিন্তু রাত্রি আসে দিনের শেষে; জীবনের পরিণতি মৃত্যুতে। এই মৃত্যু জীবনের সাধনাকে বিশেষ করে, না তাকে বৃহত্তর, মহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দেয়—তা মানুষের আজও সম্পূর্ণ অজানা। তথাকথিত জ্ঞানী মানুষ মৃত্যু-পথের যে সব কথা বলেছেন বা বলছেন, সে সবই কল্পনার ফল; সত্য আজও জ্ঞানের অতীত।

দিনের শেষে রাত্রি আসার নিয়মেই একদিন রাজা কৃষ্ণনারায়ণের জীবনে চরম দুঃখময় পরিণাম এসে গেল। স্বাভাবিক মৃত্যুর সময় হয় নি, অস্বাভাবিক মৃত্যুর পথও রাজা গড়েন নি; তবু ওঁর মৃত্যু হ'ল—এক বিরাট ব্যক্তিত্বের হ'ল অবসান। শুধু রাজধানী নয়, সারা ভূতীয়ের রাজা শোকের সাগরে বট-পত্রটি হয়ে ভাসতে থাকে। ভবশংকরী নিশ্চয়ই প্রকৃত বীরাঙ্গনা; কিন্তু তবু তিনি এই মায়ামোহময় জগতেরই একজন—ওঁর অন্তর পাষাণে গড়া নয়। যে প্রিয়জন-বিচ্ছেদ-ব্যথা মহান্ কর্মযোগী, যুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গকেও অবসন্ন ক'রে ঘরছাড়া করেছিল, তাকে সহ্য করা কী এক সন্তানবতী, সংসারী নারীর পক্ষে সম্ভব?

তবে, ছাই-চাপা আগুন জ্বলতে লাগলো। রাজা যে ওঁর ওপর অনেক গুরু-দায়িত্ব দিয়ে গেলেন; সাধারণ নারীর মত উতলা হ'লে প্রভু-ভক্তের অপরাধে ওঁকে অপরাধিনী হ'তে হবে। গুরুদেব ঘর ছেড়ে এসেছেন রাজপ্রাসাদে; বড় রাণীও বুকে মর্মান্তিক ব্যথা চেপে কখনো কখনো সহজ ঘরে কথা বলেন এসে। আর, প্রধান দীননাথ—অশ্বের সেনাপতি, সুখে-দুঃখে নির্বিকার। আসলে, মেয়েকে কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু, তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন এক নব-জীবনকে। সেনাপতির সাজ ফেলে তিনি পরেছেন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের পোশাকে—কাঠের পাদুকা, খান-কাপড়, সাদা উত্তরীয়। বিপত্নীক হয়ে তিনি যা নেন নি, মেয়েকে ঘেরাঘেরা দেখে তাই নিলেন।

দীননাথ আর ভেতর-বাইরে সর্দার নন।

॥ সপ্ত ॥

শংকরের সাধনায় কিছুদিন মনকে নিবিষ্ট রেখে, কর্মক্ষমতাকে আবার যোগ্যপথে পরিচালনা করার যোগ্যতা অর্জনের কথা শংকরী একদিন জানালেন গুরুদেব ও বাবাকে। আপত্তির কোন কারণই থাকতে পারে না। শুধু নারী-বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ভবশংকরী কাটনাকড়ার শিব-নিবাসে চললেন; বড়রাণী, কুমার ও গুরুদেবও রইলেন সঙ্গে। সাময়িকভাবে রাজ্যের ভার রইলো মন্ত্রী ও সেনাপতির ওপর।

সেই রোদ মিষ্টি মৌকো চলেছে। আজও নদীর দু'পাশে বন; বাতাসে শাখা দুলছে, আলো-ছায়ার খেলা চলেছে বনতলে। পাখি ওড়ে, ডাকে, গান গায়; বনের প্রাণী ঘুরে বেড়ায় এদিক ওদিক। তন্ময় হয়ে ঔদাসীন ভবশংকরী তাই-সবই দেখছেন। হঠাৎ তিনি চমকিয়ে উঠলেন। বনের মধ্যের আন্দোলনের

আভাস এসে গেল মুখে, চোখে জল। বড়রাণী তাঁকে ঘিরে থাকেন, ঘিরে আছেন। এই পরিবর্তন ধরা পড়লো তাঁর চোখে। ব্যস্ত হয়ে বললেন—"কী হ'ল, শংকরী ?"—আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়ে দিলেন চোখের জল। অন্তরের আন্দোলনকে কিছু দমন ক'রে, ম্লান হাসি হেসে শংকরী উত্তর দিলেন—"ওইখানে সেই রবিদের সঙ্গে সংগ্রাম হয়, দেখা হয় মহারাজের সাথে।"

পরিবেশ হঠাৎ বেশ বিষাদ-স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। এখন পাখির ডাক, জলে দাঁড় পড়ার শব্দ—সবই দীর্ঘশ্বাসভরা গুমরানো কান্না হয়ে কানে আসে। কুমারের অট্টহাসি আর তাজা ভাষার কথার ঝর্ণাধারা উপস্থিত মানুষ-মানুষীদের বিক্ষুব্ধ চেতনা জগতে আশানুরূপ শান্তি আনতে পারলো না।

আট জন লোহার মানুষ বড় বড় দাঁড়ে জল টেনে নৌকোকে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যায়। রোদের অধিকার শেষ হ'ল, সায়াহ্নের এসে পড়লো তরী। আজ বর্ষা নয়; কিন্তু দামোদর তাই বোধ হয়ের। দামোদরে কিছুক্ষণ যাওয়ার পর তরীর যাত্রা হ'ল শেষ। তীরে পথের দু'ধারে কত নারী, কত পুরুষ। সবারই হাসিমাখা মুখ সহসা মলিন হয়ে যায়। রাণী-মা'র এই সকরুণ বেশ যে এই তাদের প্রথম দেখা। শংকরী হাসিমুখে থাকলেও, চোখে জল ছল ছলিয়ে উঠলো!

রত্নারায়ণ-শিবের মন্দিরে শংকরী এসে গেলেন সকলকে নিয়ে। পূজার্চনা হ'ল যথাসময়ে। উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও অনাথ-ভোজন করানো হ'ল দুপুরে। অপরাহ্নে শংকরী গুরুদেবের সঙ্গে কুমার ও বড়রাণীকে রাজধানীতে পাঠালেন। অন্তঃপুর ছেড়ে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়; তা ছাড়া, শিব-নিবাসে কুমারেরও থাকার অসুবিধা হবে। দিদিকে বললেন শংকরী—"যখন দরকার বুঝবে, তখনই প্রতাপকে নিয়ে আসবে। কতক্ষণেরই বা পথ। রাজধানীতে থাকলে শাসন-কার্যে তেমন বিশৃঙ্খলাও ঘটতে পারবে না। সেদিকে দৃষ্টি রেখো একটু দিদি। প্রতাপকে রাজা ক'রে তুলো।"

গড়ভবানীপুরে ফিরে গেলেন তাঁরা; শংকরী রইলেন নারী-বাহিনী নিয়ে। নারী-সৈন্যের সংখ্যা মাত্র দশ; কিন্তু তাঁরা একশ' নিপুণ সেনানীর সমান। শত্রুর ভয় তাই জাগে না শংকরীর মনে। শংকরী রাজকুমারের জননী এবং রাজ্যের প্রতিটি অধিবাসীর রাণী-মা হ'লেও সাধারণ বিধবার বেশে থাকেন সর্বদা; কিন্তু ওই শাদা সাজের নিচে লুকিয়ে থাকে বর্মে ঢাকা দেহ এবং ঢাল, তলোয়ার ও বর্শা থাকে কাছেই। নারীবাহিনী আছেন, পল্লীতে পল্লীতে রণনিপুণ সন্তান আছেন, দিকে দিকে আছেন রাজ-সৈন্য; তবু প্রস্তুত থাকা ভাল। সব দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়েও তো কালসাপ এসে পড়তে পারে কাছে। সাবধানের মার নেই।

সকালে শিব-শংকরের পূজা ক'রে যান বৃদ্ধ পুরোহিত; মধ্যাহ্নে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ ও অনাথকে দেবতার ভোগ খাওয়ানো হয়। ঢোল-শহরতে পল্লীতে পল্লীতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই অতিথি-সৎকারের কথা। মনের ক্ষতে শান্তি-প্রলেপ দেবার এ এক প্রচেষ্টা।—সন্ধ্যায় নারীবাহিনী সমবেতভাবে সন্ধ্যা বন্দনা করেন। গভীর রাতে চলে শংকরীর শিব-সাধনা—অনেকক্ষণ ধ'রে এইভাবে চলছে, দিনের পর দিন।

• • •

'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' কথাটা ক্ষমতাগর্বী মানুষের সৃষ্টি। এমনি অহিলা না দিলে কী ক'রে সে পরের রাজ্য গ্রাস করবে, শত্রুর ভাগ্য কেড়ে করবে নিজের সিন্দুকে? বিশেষ ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে, তাদের অনেকেই এই দুষ্প্রবৃত্তির দাস হয়—বিশ্বের ইতিহাস তার সাক্ষী। এ প্রবৃত্তি কখনো কল্যাণ আনে; বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সে সৃষ্টি করে বহুর দুর্ভাগ্য। প্রায়ই দেখা যায়, যিনি আগুন জ্বালেন,

তিনি তো গেলেনই, সেই সঙ্গে গেল আরও কত ঘর। সংসারের অশান্তির জন্য মূলতঃ দায়ী এই সব শক্তি-উন্মাদ মানুষ।

রাজা রুদ্রনারায়ণ মারা যাবার পরই সেনাপতি চতুর্ভুজের মাথায় ওই শয়তান চেপে বসলো। দুটি নারী আর একটি শিশু এত বড় জমিদারী ভোগ করবেন; আর প্রবীণ সেনাপতি তাঁদের হুকুম তামিল ক'রে কাটাবেন জীবন? কিন্তু লোভ প্রবল হলেও, আত্মসংযম কম নয়। রাণী ভবসংকরী বীরাঙ্গনা; আবার তাঁর পিছনে আছেন সর্দার দীননাথ ও রাজ্যের লোক। অনুগত মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে কী-ভাবে আশা পূর্ণ করা যায়? এই চিন্তা পেয়ে বসলো সেনাপতিকে।

শংকরী শিব-নিবাসে গেলে তিনিই হ'লেন ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজ্যের একমাত্র রক্ষক; কারণ বৃদ্ধ মন্ত্রীর শক্তি কই? মন্ত্রীর মাথা আছে সত্য, কিন্তু হাত নেই—ঠুঁটো জগন্নাথ। সেনাপতি শূন্য সিংহাসন দেখেন, আর সেখানে ছুটে যেতে চান; কিন্তু ক'পা এগোলেই কোন্ অদৃশ্য শক্তি ধমক দেয়। ভয়ে বিশ হাত পিছিয়ে যান। যত আঘাত পান চতুর্ভুজ, ততই তাঁর লোভ বেড়ে ওঠে। মন্ত্রীকে হাত করার ব্যবস্থা করলেন। লোকটা একেবারে অপদার্থ। শংকরী শিব-নিবাসে; এই ফাঁকে প্রজাপীড়ন ক'রে কিছু অর্থ শোষণ করতে রাজী হলেও, শূন্য সিংহাসনকেই তিনি সম্রদ্ধ নমস্কার দেন। কী করা যায়? একাও তো এগুনো চলে না।

প্রলোভন তাঁকে আরো পিছল পথে ঠেলে দেয়। সেনাপতি ঠিক করলেন, রাজ্যের শত্রু প্রবল পাঠান শক্তিকে তিনি ডাক দেবেন এবং কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে তিনি সেবে সিংহাসনে বসবেন উঠে। কিন্তু সংবাদ পাঠানোও তো খুব সহজ কাজ নয়। রাজকোষের অর্থ বেশ উদরসাৎ করলেও, মন্ত্রী যেন শাসন-ব্যাপারে বড়ই সচেতন হয়ে উঠেছেন, শাসনক্ষমতা হাতে পাবার পর থেকে। কুমার প্রতাপনারায়ণের সিংহাসনকে তিনি যেন বুক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। ওঁকে এড়ানো সম্ভব নয়; সরানোর চিন্তা দিবা-স্বপ্নই। প্রলোভন-পাগল সেনাপতি সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকেন।

ভূরীশ্রেষ্ঠ-রাজ্যের দুর্ধর্ষ রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর সংবাদ উড়িষ্যার পাঠান সর্দার ওসমান খাঁর কাছেও যথাসময়ে গেল। এমন সোনার দেশটিকে পাবার আশা পাঠানদের অতি পুরাতন। কিন্তু পাওয়া ঘটে নি। এবার সুযোগ এসেছে। তবে, মোগল-পাঠানের এ-দেশে আসার কারণ দস্যুবৃত্তি হ'লেও, মহাবীর ওসমানের রাজনীতি সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান ছিল। যে রাজ্য এতদিন শক্তিমান পুরুষের হাতে ছিল, তা যে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অরক্ষিত হয়ে পড়বে না, সে ধারণা তাঁর ছিল। পাঠান বহুবারই গুপ্তচর পাঠিয়ে রাজ্যের ভেতরকার খবর নিয়েছেন, আশা হারিয়ে ফেলেছেন রাজার সেনারক্ষার ব্যবস্থা দেখে। কিন্তু প্রলোভন তো সেখানেও কাজ করছে। তাই বাতুলের মত ঝাঁপিয়ে না প'ড়ে কূটনীতির আশ্রয় নিলেন পাঠান সর্দার। তাঁর জানা আছে, সিংহাসনের লোভ বড় লোভ এবং শিশু রাজার সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে সেনাপতিকে পাগল ক'রে দেওয়া নিপুণ কূটনীতিজ্ঞের কাছে তেমন কঠিন কাজ নয়।

ওসমান গুপ্তচর পাঠালেন গড়ভবানীপুরে।

সাধুর বেশে পাঠান-সেনাপতি এলেন, পেলেন সেনাপতিকে, পেলেন তাঁকে প্রলুব্ধ করার সুন্দর পরিবেশ। যে সিংহাসনের স্বপ্ন তিনি জেগে ঘুমিয়ে দেখছেন, সেই সিংহাসনই পাঠান সর্দার তাঁর হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত জেনেও সেনাপতি লাফিয়ে উঠতে পারলেন না। রাণী ভবসংকরীর দেবী মূর্তি তাঁর চোখের সামনে শ্মশান-রঙ্গিনী, নৃমুণ্ডমালিনী করালী কালী হয়ে তাঁর চোখে ভেসে উঠলো। কিন্তু

সিংহাসন! গুপ্তচরকে সেনাপতি বললেন—"প্রকাশ্য সংগ্রামে কার্যসিদ্ধি হবে না। কৌশলেই সব ঠিক করতে হবে। রাণী এখন আমতার কাছে কাটর্াকড়ার শিবমন্দিরে। বীরাঙ্গনা হলেও রাণী এখন স্বামী শোকে দুর্বলা। ওসমান খাঁকে বলুন, কয়েকজন সৈনিক সহচর সহ ছদ্মবেশে তথায় এসে এক রাত্রে তিনি রাণীকে ধরে নিয়ে যান। ছদ্মবেশে আসার যথেষ্ট সুযোগ আছে, কারণ রাণী প্রত্যহ অনেক সাধু ও ফকিরকে খাইয়ে থাকেন। রাণী ভীষণ সুন্দরী তরুণী, বলবেন খাঁ-সাহেবকে। কিন্তু সাবধান। তিনি নিজে বীরাঙ্গনা; আবার তাঁকে ঘিরে থাকে দুর্দান্ত নারী-বাহিনী। তাতে পাঠান সর্দারের ভয় পাবার নেই কিছু; কারণ রাণী তো স্ত্রীলোক, আর নারী-বাহিনীতে মাত্র দশটি মেয়ে।

বিশ্বাসঘাতক হিন্দু সেনাপতির কথা শুনে বীর পাঠান মনে মনে গর্জিয়ে ওঠেন, কিন্তু অন্তর তো সর্বদা আত্মসম্মান বাঁচিয়ে চলতে পারে না। অন্তরকে চোখ রাঙিয়ে চর জিজ্ঞাসা করলেন—"তার পর?"

জোর করে একটু ভীত হাসিকে সেনাপতি আনলেন মুখে এবং বললেন—"তার পর আমি সৈন্যদলকে বুঝিয়ে সিংহাসন দখল করবো। পাঠান-সর্দার এসে আমার আনুগত্য গ্রহণ করবেন।"

গম্ভীর স্বরে চর বললেন—"বেশ। কিন্তু অন্নদাতার সঙ্গে নিমকহারামি ক'রে নিমকহারামি যেন জীবনধর্ম না হয়ে যায়।"

ব্যস্ত হয়ে বললেন সেনাপতি—"না, না, খাঁ-সাহেব! মেয়ে মানুষের হাতে রাজদণ্ড থাকা ভালো নয় বলেই এই কাজে হাত দিয়েছি। পাঠান সর্দার সর্বদা আমার আনুগত্য লাভ করবেন।"

ওঠার সময় অস্ফুট স্বরে বলেন পাঠান—"নারীর হাত নিমকহারামের হাতের চেয়ে অনেক পবিত্র।"—স্পষ্ট ক'রে বলেন—"বেশ; আমি চলি। প্রস্তুত থাকবেন।"

চর চ'লে গেলেন; আর সেনাপতি চতুর্ভুজ ধনভুজ হয়ে স্বর্গের স্বপ্ন দেখে যান।

* * *

উড়িষ্যার পাঠান সর্দার ওসমানের দরবার। গুপ্তচর-মুখে সেনাপতি চতুর্ভুজের নির্দেশ শুনে ওসমান হাসলেন একটু, ভাবলেন শেষে—"তাই হোক্। আগে বেলেতের চিড়িয়াখানায় আনি, তার পর আনবো পিঞ্জরা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা হোক। কী বল, সেনাপতি?"

হুঁ; সেই ব্যবস্থাই হোক। কিন্তু সাবধান, সর্দার। পাহাড়ের চূড়া ভেঙেছে মাত্র। পাথর সরিয়ে পথ করতে গিয়ে, সব নিচে পাথর চাপা প'ড়ো না যেন।"

ছদ্মবেশে অবিলম্বে কাটকাকড়া অভিযানের ব্যবস্থা হ'তে থাকে।

* * *

কাটর্াকড়ার শিব-নিবাস। গভীর রাত্রি। কুমার প্রতাপনারায়ণকে নিয়ে আজ বিকালে বড় রাণী এসেছেন; ফিরে যান নি। কুমার ঘুমিয়েছেন; বড়রাণী মন্দির দ্বারে কুমারের পাশে। শংকরী শিব-সাধনায় নিমগ্ন। নারী-বাহিনী প্রহরারতা।

ধ্যানস্তব্ধ শংকরীর দেহ হঠাৎ ন'ড়ে উঠলো। আনন্দজড়িত স্বরে ডেকে ওঠেন 'মা' ব'লে। বড়রাণী ব্যস্ত হয়ে বলেন—"কী হ'ল, শংকরী?"

শংকরী ফিরে চাইলেন; তাঁর মুখে-চোখে অপূর্ব দীপ্তি। উঠে, এগিয়ে এসে দিদিকে ধ'রে ব'লে উঠলেন—"পেয়েছি, দিদি, পেয়েছি! আমার ধ্যানের পথে অন্তর্যামী এসে ব'লে গেলেন—সামনের পুকুরে যে তরবারিখানি পাবো, তা হাতে থাকতে কেউ আমাকে পরাস্ত করতে পারবে না। দিদি, আজ আমাদের কী সুদিন!"

শংকরীর মাথায় হাত রেখে বড় রাণী বলেন—"এমন সাধনায় সিদ্ধি কেন আসবে না বোন্! তোমার মঙ্গল হোক!"

"চলো, দিদি, আমার সাধনার সিদ্ধিকে খুঁজে আনি।"

একজন নারী-সৈনিকের ওপর মৃগু শিশুর ভার দিয়ে শংকরী চললেন রুদ্রনারায়ণ-শিব-মন্দিরের পুকুরে। বড়-রাণী তাঁর পাশে। দুর্গাবতীও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। রাণী ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন জলে; বড় রাণী ও দুর্গা জলের ধারে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি দিয়ে শংকরীকে দেখে যান। শংকরী জলে ডুব দিয়ে খুঁজতে থাকেন তাঁর সাধনার সিদ্ধি। শ্বাস নিতে ওঠেন, আবার ডোবেন—আবার, আবার! শেষে তাঁর আগে জলের ওপর উঠে এলো দু'টি সুন্দর হাতে ধরা এক কৃপাণ। দীপ্তিময়ী শংকরী উঠে এলেন উপরে। আলিঙ্গন দিলেন দুর্গাকে, দিদিকে প্রণাম করলেন।

পূর্বাকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে।—

তখনই সবার মন আকৃষ্ট হ'ল পুকুরের পরপারে। এঁরা দেখেন, এক তরুণ উদার স্বরে গান গাইছেন; দৃষ্টি তাঁর পূর্ব আকাশে। ওপারে কবি গাইছেন, এপারে শুনছেন শংকরী, বড় রাণী ও দুর্গাবতী স্তব্ধ হয়ে—

"সেনাপতি চতুর্ভুজ,
যাওয়ান দুর্জয় বড়;
রাণী থাকেন কাটশাকড়াতে,
রাজা হ'ল নওরঙ্গ।
আয়, রাণী-মা, আয় গো ফিরে,
তোর তরে যে নয়ন ঝুরে!
সোনার দেশ হ'ল মাটি,
দু'টোই যে পাষণ্ড!!
পাঠান করে আনাগোনা,
তবে প্রাণ বোধ মানে না।
বধ, মা, অসি, মুক্তকেশী,
মুসলমানে যে গো হানা—
নহিলে দেশ বাঁচে না॥
বাপ গেল, মা, আশা ছিল,
মায়ের কোলে থাকবো ভালো;
কেমনে নিষ্ঠুর হয়ে,
গেলি গো, মা, ছেড়ে দিয়ে,
আশা ভরসা হ'ল যে, মা,
তোর বিহনে সবই শূন্য॥"

গান হ'ল শেষ। কবি উঠে ধীরে ধীরে চ'লে যান, চ'লে যান দৃষ্টির অন্তরালে। এখানে নারী তিন জন যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেছেন। নীরবতা ভাঙলেন শংকরী। তীব্র স্বরে তিনি ব'লে ওঠেন—"এই তিন মাসেই এত! বেশ। দিদি, তুমি এখনই কুমারকে নিয়ে চ'লে যাও। গিয়ে মন্ত্রীকে ডাকিয়ে বলবে,

তিনি যেন অবিলম্বে ঘোষণা ক'রে দেন যে, ছোটরাণী আগামী কাল রাজধানীতে ফিরে আসছেন। যদি দেখ, মন্ত্রী ঠিকমত কাজ করলেন না, তবে প্রহরী পাঠিয়ে, ছাউনিপুরের দুর্গ-স্বামীকে আনাবে এবং তাঁকে দিয়ে ঘোষণা করাবে। এখানের সব ঠিক ক'রে আমি কালই যাবো রাজধানীতে। দুর্গা, এবার বুঝি শেষ হ'ল কাজের।"

হেসে ওঠেন শংকরী।—

কুমারকে নিয়ে বড়রাণী ফিরে গেলেন গড়ভবানীপুর, মন্ত্রীকে আদেশও দিলেন শংকরীর নির্দেশ মত। বৃদ্ধ ঠিক কাজই করলেন। তিনি সিংহকাটা চোর; ডাকাত তো নন। ঘোষণা শুনে সাধারণ মানুষ হাতে স্বর্গ পেলেন; আর আকাশ ভেঙে পড়লো সেনাপতির মাথায়। গভীর অবসাদে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

শংকরী এদিকে শিব-নিবাস ত্যাগের সব ব্যবস্থা শেষ করলেন। আগামী প্রাতেই তিনি যাত্রা করবেন। মুখে সর্বদা হাসি থাকলেও, মন তাঁর অস্থির।

দুপুরের আগেই তাঁর কাছে আবার এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ এলো। আবতার কোতোয়াল জানালেন—'কাটাকড়াগাধী করেকজন সাধুকে ছদ্মবেশী পাঠান ব'লে তাঁর সন্দেহ হয়েছে; কিন্তু প্রসাদপ্রার্থী ব্যক্তিকে আটক করার রাণীমা'র নিষেধ আছে ব'লে তিনি কিছুই করতে পারেন নি। রাণী-মা যেন সতর্ক থাকেন।'

হাসিমুখে 'কোন ভয় নেই' ব'লে শংকরী কোতোয়ালের দূতকে ফিরিয়ে দিলেও, তিনি নিঃসন্দেহ হ'তে পারলেন না। সতর্কতার ওপর আরও সতর্কতা নিয়োজিত হ'ল।

প্রসাদপ্রার্থী সাধুদের মধ্যে এসে বাসা বাঁধলেন পাঠান ওসমান ও তাঁর দল। কথা কইলে ধরা পড়ার ভয়; নড়াচড়া করলে গোপনীয়তা প্রকাশিত হবে; তাই তাঁরা ধ্যানেই সময় কাটান। হিন্দু দেবতার প্রসাদও গেল পেটে। স্বার্থের জন্য সবই করা যায়। আহারান্তে অদূরের গাছতলায় তাঁরা, শিবসাধনাই করতে থাকেন। রাত্রি এলো, বেড়ে চললো; নারী বাহিনী হলেন সক্রিয়। গভীর রাতে রাণী আজও সাধনায় বসলেন; তবে, বেশ সতর্ক। দেবদত্ত অসি তাঁর কোলে।

ওদিকে অন্ধকারের পর্দার আড়ালে পাঠান-দলও রূপ বদলালেন। সৈন্যদের নারী বাহিনীর কাছে পাঠিয়ে নিজে চললেন মন্দিরের দিকে। চিড়িয়াকে ধরতে তিনিই যথেষ্ট। কিন্তু এতই কী সহজ? নারী বাহিনী পাঠানদের বাধা দিলেন। জ্বলে উঠলো মশাল—ধরা পড়লো দৃষ্টি পথে শত্রুরা। ঝড়ের বেগে নারী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েন পাঠানদের ওপর। দুর্বার তাঁদের গতি; কিন্তু শত্রুদলেও যে বাছাই করা সৈনিক। চললো সংগ্রাম।

তলোয়ারে তলোয়ারে আঘাতের শব্দ; আহতের আর্ত স্বর—শংকরীর ধ্যান ছুটে গেল। তিনি উঠলেন, অসি বর্ম হাতে নিয়ে মন্দির দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। অদূরের মশালের আলোয় তাঁর দীপ্তি ঝলমল করছে। পাশের গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওসমান সেই রূপ দেখলেন—সিংহ হ'লেন শৃগালে পরিণত। বললেন পাঠান-সর্দার!

হঠাৎ নারী বাহিনীর অট্টহাসিতে কাপালিক পাঠানের চমক ভাঙালো। যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চেয়ে দেখেন, মশাল হাতে নারীরা শুধু; তাঁর লোক কেউ নেই। আত্মরক্ষার প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিল। এদিক-ওদিক বারকয়েক চেয়ে অন্ধকারে গা ঢাকলেন ওসমান। চতুর তো কম নন। কিছুদূর যেতেই এক চেনা স্বর শুনলেন। প্রশ্ন করলেন—"তুমি এখানে, সেনাপতি?"

রসালো স্বরে উত্তর হ'ল—"ওখানে গুলে তোমাকে কে পথ দেখাবে, খাঁ সাহেব? এসো আমার সঙ্গে।"

যাত্রা হ'ল শুরু।—

॥ দশ ॥

পরের দিন সকালেই শংকরী সহজভাবে ফিরে এলেন গড়ওয়ানীপুরে। গত রাতের ঘটনা শুধু তাঁর ও নারী বাহিনীর জানা রইলো। রাজধানীতে এসেই তিনি কুমার ও দিদিকে নিয়ে রাজসভায় গেলেন এবং জীবন্ত স্বরে ঘোষণা করলেন—"দেশবাসী ও কুমারের স্বার্থেই আজ থেকে আমি ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজ্যের শাসনভার নিলুম। যদি কারো আপত্তি থাকে, তিনি এখনি নিঃসংকোচে নিজের মত ব্যক্ত করতে পারেন।"

মন্ত্রী এগিয়ে, তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বলেন—"আমি সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার আনুগত্য স্বীকার করলুম, রাণী-মা! এই রাজ্যের জন্যে আমি জীবন পণ ক'রে কাজ করবো।"

অন্যান্য সেনাপতিও মন্ত্রীকে অনুকরণ করেন।

রাণী আবার বলেন—"আরও একটি কথা আছে। রাজ-সিংহাসনের প্রতি আন্তরিক সম্মান যিনি দেখাতে পারবেন না, তিনি বেরিয়ে যাবেন শাসন-কেন্দ্রের মাঝ থেকে। যদি কেউ কোনদিন বিশ্বাসঘাতক ব'লে প্রমাণিত হন, তা হ'লে, দেশবাসীর সামনে আমি নিজে এই অসি দিয়ে তাঁর শিরশ্ছেদ করবো।"

শংকরীর চোখ জ্ব'লে উঠেছে; তাঁর বলিষ্ঠ হাতে তলোয়ারখানা নেচে উঠলো। যে স্বরে শংকরী কথা কইলেন, তাও নারীর স্বর—স্ত্রীলোকের স্বরের কমনীয়তার চিহ্নও নেই তাতে।—

সেনাপতি চমকিয়ে উঠলেন।—এই দৃশ্য দেখে মন্ত্রীর মুখে ঘৃণার চিহ্ন ফোটে; কিন্তু শংকরী একটু হাসলেন।— রাজসভার কাজ সেরে, নারী-বাহিনী ও সেনাপতিকে নিয়ে শংকরী ছাউনীপুর দুর্গে গেলেন। এখানে শংকরীর তৈরি সৈন্যদল, তাঁরাই আজ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ এবং অমূল্য সম্পদ। তার পর প্রতিদিন একের পর এক ছাউনি পরিদর্শন করলেন; রূপনারায়ণ থেকে দামোদর পর্যন্ত জলপথের সব যুদ্ধ জাহাজও দেখা হ'ল এবং সর্বত্রই সৈন্যদের সৌজন্যে জানিয়ে দিলেন রাণী গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা। সৈন্যদের প্রকাশ্যে বললেন তিনি—"ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজ্য সাধারণ মানুষের, আপনাদের। সিংহাসন তার নিয়েছে সুশাসন রক্ষার। দেশের প্রতি আমিও যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি, আপনারা প্রকাশ্যে আমাকে হত্যা করবেন।"

সৈন্যদল রাণীর প্রতি একান্ত আনুগত্য জানিয়ে দেশ রক্ষার কাজে জীবন পণ করার শপথ নেন। শংকরী বুঝলেন, সাধারণ মানুষ খাঁটি আছেন, বিশেষ বিশেষ লোকই হারিয়েছেন সততা।

* * *

ওসমান ফিরলেন ওদিকে উড়িষ্যায়। কিছু পথ ছুটে গেলেন তাঁদের ঘোড়া; বাকি পথ ঘোড়ায় চড়েই আসা গেল নির্বিবাদে। মুসলমান ফকিরেরাও ঘোড়া ব্যবহার ক'রে থাকেন তো। ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজ্যের আকর্ষণীয় সিংহাসনের লোভের সঙ্গে এবার যুক্ত হয়েছে অসামান্যা সুন্দরী শংকরীকে লাভের উগ্র কামনা; ওসমান খাঁ প্রায় পাগল হয়ে উঠলেন। তিনি আবার গুপ্তচর পাঠালেন গড়ওয়ানীপুরে, পাঠালেন প্রচুর মণিমুক্তা—রাণীকে তাঁর চাই-ই। দরকার হ'লে, প্রকাশ্য যুদ্ধ-ঘোষণাও করতে তিনি প্রস্তুত।—

এবার নিপুণ গুপ্তচরকেও অনেক কষ্টে আসতে হ'ল, একতারা বাজাতে বাজাতে। ওসমানের কথা আরও ভালো ক'রে কয় সেনাপতিকে জানালেন। সেনাপতিরও আছে সিংহাসনের লোভ, তার ওপর

রাণীর প্রচণ্ড বিক্রম-বাণ তাঁর অন্তরকে ক্ষত বিক্ষত ক'রে দিচ্ছেই। কিন্তু ভয়ও যে বড়। সব শুনে বললেন তিনি—"যে বীর ওই নারীবাহিনীর কাছে পরাজয় স্বীকার করেন, তিনি কোন্ সাহসে রাজ-সৈন্যের সামনে দাঁড়াতে চান?"

চর এসেছে তাঁকে অপমৃত্যুর উত্তাল স্রোতেই ভাসিয়ে দিতে। তিনি অন্তরতের বাক্স খুলে ব্রাহ্মণের চোখ বলসিয়ে দিলেন, সিংহাসন প্রাপ্তির কথা বারবার জানিয়ে জানিয়ে দিলেন ক্ষমতাদর্পীর নিবু নিবু লোভের বাতি। অন্তর কুণ্ডের দাহিকা শক্তির কথা ভুলে পতঙ্গ আবার উড়লো। চরকে বললেন সেনাপতি —"আগামী অমাবস্যার রাতে রাণী ছাউনাপুর দুর্গের কিছু দূরে বাগড়ির ভবানী-মন্দিরে শক্তি-সাধনা করবেন। সঙ্গে থাকবে সেই নারী বাহিনী। ওই রাতে খানাকুল ঘিরে এসে সর্দার রাণীকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাবেন। একটি বাছাই-সৈন্যের দল নিয়ে লুকিয়ে আসতে হবে। এবার যদি ধরা পড়েন বা হারেন, তা হ'লে, সর্দার যাবেন, আমিও যাবো।"

চর জিজ্ঞাসা করেন—"আপনি কী করছেন?"

"আমি সন্ধ্যার আগেই সৈন্যদের নিয়ে দক্ষিণে চ'লে যাবো। মন্ত্রীকে ব'লে যাবো, ওদিকে শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। তারপর, ফিরে সৈন্যদের বলবো—রাণী যখন সর্দারের সঙ্গে গেছেন, তখন আর যুদ্ধে কী হবে? বরং ক্ষতিই হবে তাঁর! এখানে একটা কথা—খাঁ-সাহেব যেন সিংহাসনের দিকে দৃষ্টি না ফেলেন। অমন রাণী তো দিয়ে দিলুম!"

চরের মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। তাঁর উগ্র দৃষ্টি যেন বলতে থাকে—'দুষ্ট নরাধম, ধিক তোমাকে। এত অন্যায় করার সুযোগ পাবে তুমি?—একটু পরে, সংযত স্বরে বললেন সেনাপতিকে—"কুছ ডর নেহি; ঠিক রহো।"

চ'লে গেলেন চর; সেনাপতি আকাশ কুসুমের মালা গাঁথতে থাকেন নিরালায় ব'সে।

চর উড়িষ্যায় ফিরে ওসমানকে চতুর্ভুজের কথা জানালেন। সর্দার তো কামাতুর—সেরা সৈনিকদের নিয়ে যথাসময়ে যাত্রার আয়োজন করতে থাকেন। এদিকে পাগল, ওদিকে পাগল—স্বর্গের স্বপ্ন দেখেন; আর মাঝখানে মহাকাল দু'এর দিকে চেয়ে অট্টহাসি হেসে নাচতে থাকেন—হাতে বাজে ডমরু।

নির্দিষ্ট অমাবস্যার বিকালে নারী-বাহিনী নিয়ে রাণী ভবশঙ্করী ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরুলেন বাগড়ি অভিমুখে। গুরুদেব পালকি ক'রে চ'লে গেলেন। রাণী পথে তাঁর প্রিয় ছাউনাপুর দুর্গে গেলেন—সৈন্যদের দেখাশোনা করলেন। সন্ধ্যায় চললেন ভবানী-মন্দিরে। সন্ধ্যাতেই স্থানটি ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাণী পৌঁছিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করলেন এবং ঘোর অমাবস্যায় চললেন শক্তি-সাধনায়। সাধনরতা রাণীকে মূর্তিমতী শক্তি বলেই মনে হচ্ছে।

গভীর রাত্রে নারী-বাহিনীর সামনে এসে দাঁড়ালেন এক তরুণ সৈনিক এবং অভিবাদন জানিয়ে বললেন —"আমি খানাকুলের কোতোয়াল; মন্ত্রীমহোদয়ের চিঠি নিয়ে রাণী-মা'র কাছে এসেছি।"

দুর্গাবতী মশাল জেলে সৈনিককে দেখে নিলেন এবং পরে তাঁকে রাণীর কাছে নিয়ে গেলেন। মন্দিরের সামনে গিয়ে দেখেন—রাণী ধ্যানমগ্না, হরিণের ছালে উপবিষ্ট। দুর্গা তাঁকে প্রণাম জানিয়ে, সৈনিকের হাত থেকে চিঠি নিয়ে গুরুদেবের সামনে রাখলেন এবং বললেন—"মন্ত্রী মহোদয় রাণী-মাকে দিয়েছেন। ইনি খানাকুলের কোতোয়াল।"

দুর্গার কথায় গুরুদেবের ধ্যান ভেঙেছে। তিনি ফিরতে দুর্গা ওই কথাই জানালেন তাঁকে। ধরিত্রীর

রাণীর হাতে চিঠিটি তুলে দেন। রাণী আবরণ ছিঁড়ে চিঠি পড়লেন। তাঁর মুখে গাঢ় মেঘ জমেই প্রভাত-সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লো। গুরুদেবকে লক্ষ ক'রে শংকরী বলতে থাকেন—"সেনাপতি চন্দুর্ভুজ পাঠানের হাতে ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজা ও তাঁর রাণীকে তুলে দেবার ষড়যন্ত্র করেছেন, গুরুদেব!"

একসঙ্গে দুর্গা ও সৈনিকের হাতে বর্শা এবং অসি ন'ড়ে উঠলো।

রাণী ব'লে যান—থানাকুলের বনপথে পাঠান সৈন্যের আসার সংবাদ পেয়ে এই কোতোয়াল রাজধানী গিয়েছিলেন সংবাদ দিতে। মন্ত্রী আমাকে চিঠি দিয়েছেন, এখনি রাজধানীতে ফিরতে হবে; কারণ আমি গড়জয়ানীপুর ছাড়ার পরই সেনাপতি রাজধানীর সৈন্য নিয়ে দক্ষিণ দিকে চ'লে গিয়েছেন। ওদিকে নাকি হঠাৎ পাঠান আক্রমণের ভয় দেখা দিয়েছে।"

ভীত স্বরে হরিদেব বলেন—"তুমি এবার কী করবে, মা?"

হাসিমুখী শংকরী উত্তর দিলেন—"পাঠানের পদধ্বনি ব্রাহ্মণের বুকে শংকার পদধ্বনি জাগালো? আমার শংকরের মত হেসে উঠুন, গুরুদেব, অট্টহাসি। তাণ্ডব-নাচ নেচে নাচিয়ে দিন সকলকে। কোন ভয় নেই, গুরু! আজ আপনার সামনেই আপনার স্নেহের শংকরী তার শক্তি পরীক্ষা দেবে। দেখবেন—আপনার শিষ্যের আমি যোগ্য সহধর্মিনী,—দেখবেন, বাংলার মেয়ে কল্পনার শ্রীদুর্গার চেয়ে হীন নয়। ভবানীর বহ্নি-হাতে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তে দেখে যাবেন ভবশংকরীর ভবানী মূর্তি। আমার জীবনের নববর্ষ আজ। হাসুন, গুরুদেব। ওই দেখুন, আমার সন্তান ভয় লেশহীন, এই দেখুন—আমার বোনটি হাসছে।"

সজীব স্বরে দুর্গা প্রশ্ন করেন—"এবার কী করতে হবে, রাণী?"

"এখানেই থাকবো। ওসমান এখানেই আসবে। তার দরকার রাণী ভবশংকরীকে। কাটশাকড়ায় সে পায়নি; এখানে তাই আসছে বেশী শক্তি নিয়ে।"

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।—"না; আর বেশী দেরী নেই। কোতোয়াল, এখনি ছাউনাপুরের দুর্গ-স্বামীকে আসতে বলুন। এই নিন পাঞ্জা।"

রাণী পাঞ্জা বের ক'রে দিলেন দুর্গাকে। দুর্গা তা সৈনিককে দিতেই, তিনি ছুটে গিয়ে ঘোড়ায় উঠলেন;—ঘোড়া ছুটলো ঝড়ের মত। রাণী বলতে থাকেন—"যে দিনের অপেক্ষা করছি প্রথম যৌবন থেকে সেই দিনই বুঝি সমাগত। বোনদের সতর্ক ক'রে দিয়ে এসো; ঠিক রাখো বন্দুক আর ঘোড়া সব। ছাউনাপুর থেকে সৈন্য আসার আগেই যদি পাঠানেরা এসে যায়, তা'হলে আমরাই তাদের আগত জানাবো। যাও, বোন, ব'লে এসো।"

দুর্গা চ'লে গেলে, শংকরী উঠে তাঁর অসি বর্শা নিলেন, দাঁড়ালেন বাইরে এসে। নারী-বাহিনীর কয়েকজন এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। শংকরী বলেন—"তোমরা শুনেছ তো সব?"

নীরব থাকেন সবাই।

শংকরী ব'লে যান—"যে বংশের প্রতিষ্ঠা শ্মশানে, সেই বংশের এক বধূ শ্মশানেই আজ বংশের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করবে।—ভূরীশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-রাজবংশের গোড়ার কথা একটু শোন আজ। এক স্মরণাতীত কালে এক কাপালিক ভৈরবী-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় অনার্য-রাজা ছিলেন তাঁর শিষ্য। প্রতি অমাবস্যায় কাপালিক ভৈরবীর সামনে একটি নরবলি দিতেন এবং অনার্য-রাজ সেই বলি দিতেন সংগ্রহ ক'রে। এক অমাবস্যায় এক ব্রাহ্মণ-কিশোরকে আনা হয়; কিন্তু তখনো তাঁর বলি-যোগ্য বয়স হয় নি ব'লে কাপালিক তাঁকে যাড়ার ঘরে ঘরে আটকিয়ে রাখলেন। সৌম্যদর্শন কিশোর শংকিত মন

নিয়ে ঘুরে বেড়ান আগে পাশে। পাথারে কাট বসলো, বেরিয়ে এলো জল তা দিয়ে। সেই কিশোর চতুরানন একদিন হ'লেন রাজা—প্রতিষ্ঠা করলেন এই ত্রিপুরাব্দের রাজ-বংশ।—গুরুদেব, আজও তো সেই অমাবস্যা ?"

গুরুদেবের মুখে হাসি জাগে।—

তখনই এক নারী সৈন্য ছাউনাপুরের দুর্গ-স্বামীকে নিয়ে এলেন এখানে। রাণীকে অভিবাদন জানিয়ে বীর-পুরুষ সামনে দাঁড়াতেই রাণী তাঁকে প্রত্যভিবাদন জানালেন। বললেন পরে—"সেনাপতি পাঠানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছেন, আপনাদের রাজ্য ও রাণীকে ওসমানের হাতে তুলে দিতে। ওসমান এসে পড়লেন। আপনি অবিলম্বে, নীরবে ওই প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করুন অর্ধচন্দ্রাকারে। দু'পাশে তীর ও মধ্যে বন্দুক ; পিছনে বর্শা। আমি আজ সৈন্য পরিচালনা করবো। যান এবার।"

দুর্গ-স্বামী অল্প সময়ের মধ্যেই রাণীর কথামত সৈন্য সাজালেন। রাণী ভবানী ও গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে উঠলেন কৃষ্ণার ওপর ; চললেন নারী-বাহিনী নিয়ে সৈন্য পরিচালনা করতে। আজ তাঁর—কী আনন্দ !

সৈন্যদের সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁদের অভিবাদন নিয়ে, অন্ধকারেই বলতে থাকেন রাণী—"নীরবে আমার কয়েকটি কথা আপনারা শুনুন। শত্রু এসে গেল ব'লে। সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তী পাঠান-সর্দার ওসমান খাঁকে ডেকে আনছেন—আপনাদের রাজ্য ও রাণী-মাকে দিয়ে দেবার জন্যে। অস্থির হবেন না ; শুনুন। সন্ধ্যায় খানাকুলের বনপথে পাঠানদের দেখা গিয়েছে এবং সেনাপতি আমার আসার পরই সৈন্য নিয়ে চ'লে গেছেন দক্ষিণ দিকে। আমাকে যখন চাই, তখন, পাঠান এখানেই আসবে। এখানেই তার পরীক্ষা হয়ে থাক। আগামী কাল গড়ভবানীপুরে প্রকাশ্য সভাস্থলে আপনারা সেনাপতির পরীক্ষা নেবেন। শত্রু এসে গেল ব'লে। প্রস্তুত থাকুন ; আমি আজ—সেনাপতি।"

সৈন্যগণ আনন্দে গুঞ্জন ক'রে ওঠেন।—

রাণী বলেন—"আমি বন্দুক ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মশাল জ্বেলে উঠবে এবং বন্দুক ও তীর ছোড়া হবে বেশ লক্ষ্য ক'রে। তার পর সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বেন শত্রুর ওপর। মাত্র ক'টি মুহূর্তের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে যে যুদ্ধের কথা ইতিহাসে লেখা থাকবে।"

রাণী থামলেন। দূরে শোনা গেল বহু অশ্বের পদধ্বনি। কয়েকটা শিয়াল ওপাশ থেকে ভয়ে ছুটে এলো এদিকে। অশ্বের পদধ্বনি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'তে থাকে। হিন্দু-সৈন্য প্রস্তুত—মৃত্যুর বন্যার সামনে ছুটিয়ে দেবার জন্যে। রুদ্ধশ্বাসে সবাই শত্রুর প্রতীক্ষায়।

ওই দূরে, অন্ধকার জমে মেঘের মত জমাট বেঁধে উঠছে, ঝড়ের তাড়নে এগিয়ে আসছে। আরও একটু, আরও একটু ; হঠাৎ রাণীর হাতের গাদা বন্দুকটা গর্জিয়ে উঠলো—জ্বলে উঠলো শতাধিক মশাল, শতাধিক হাত থেকে তখনি ছুটে গেল বন্দুকের গুলি আর বিষাক্ত তীর। এমন আকস্মিক আক্রমণ যে, ঘায়েল হয়ে দুর্দান্ত পাঠান-সৈনিকরাও দাঁড়িয়ে মরতে লাগলেন। কর্তব্য নিরূপণে অক্ষম সবাই। প্রসিদ্ধ বীর ওসমানের চেতনা হ'ল তখনি, যখন তাঁর শত্রুরা অসি আর বর্শা নিয়ে এগিয়ে আসছেন বর্ষার বন্যাস্রোতের মত। ভেসে যেতেই হবে—তবু একবার বাঁচার চেষ্টা করা যাক। ওসমান অসি নিয়ে সামনে চাইতেই দেখলেন—তাঁর বুকের সামনে রাণী ভবশংকরীর রক্ত বর্শা। গ্রাস করলো জীবনকে। লাফ দিয়ে ওসমান পাশে প'ড়ে গেলেন, হারিয়ে গেলেন কোথায়—বিদ্যুতের মত গতি। অট্টহাসি হেসে ওঠেন শংকরী।

যুদ্ধ শেষ।—সামনে পাঠান-সৈন্যদের মৃতদেহ। আহত-সৈন্যের কাতর শব্দ এখনো উঠছে। বেশীক্ষণ তা শোনা গেল না। সাক্ষাৎ শমনকে যে তাঁরা প্রেমালিঙ্গন দিয়েছিলেন। বিজয়ী সৈন্যদল তাঁদের মা-রাণীকে ঘিরে চিৎকার ক'রে উঠলেন—"হর হর মহাদেব; হর হর মহাদেব; হর হর মহাদেব।" শীঘ্রই তাঁরা শান্ত হলেন। রাণী বললেন সকলকে সম্বোধন ক'রে—"আজ আমার মুখ রক্ষা করেছেন আপনারা। বাঙ্গালী ভীরু নয়, বাঙ্গালী শক্তিহীন নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁরা অনেকে অলস! সব বাঙ্গালী যদি এক হতেন, তা হ'লে আমি গড় ভবানীপুরকে ভারতের রাজধানী করতুম!"

অদূরে দাঁড়িয়ে গুরুদেব বলে উঠলেন—"তা তুমি পারো, ভবানী! আজ আমি দেখেছি, মন্দির থেকে ভবানী বেরিয়ে শত্রু-সৈন্য ধ্বংস করলেন। তোর ডাকেও কি সব বাঙ্গালী জাগবে না, মা শংকরী?"

"আলস্য, বিলাস, আর পরশ্রীকাতরতা হিন্দুকে শৈলীভূত জীবে পরিণত করেছে, গুরুদেব! তাঁরা ধর্মের জ্ঞান করেন; কেউ ধার্মিক নন। মানবতার পূজারী ব'লে পরিচয় দিয়ে মানবতার গলা টিপে ধরেন। হিন্দু যদি জাগতেন, তা হ'লে বীরশ্রেষ্ঠ কালাপাহাড়কে ভূয়োশ্রেষ্ঠ রাজবংশ ছেড়ে মুসলমান হ'তে হ'ত না; আজ পাঠান এ-দেশে থাকতো না—এক ফুলবধূর ওপর পশু দৃষ্টি ফেলতে। ব্রাহ্মণ আপনারা কোথায়?"

গম্ভীর স্বরে হরিদেব বলেন—"কলঙ্কিত, মা, এবং তা নিজেদের দুর্বুদ্ধির ফলেই।"

রাণী দুর্গ-স্বামীকে বলেন—"এইভাবেই দেশকে ভালবেসে যাবেন আপনারা। বাঙ্গালীকে বড় হ'তেই হবে। আজ আপনারা দুর্গে যান। আগামী কাল সেনাপতির বিচার করতে যেতে হবে।"

শুভ প্রান্তরকে শৃগালদের আনন্দরবে মুখর ক'রে দুর্গ-স্বামী সদলবলে চললেন দুর্গের দিকে। রাণী ভবশংকরী ও তাঁর নারী-বাহিনী সবার আগে। মাঝখানে চলেছে গুরুদেবের পালকি। পাঠানদের কয়েকটি মৃত অশ্বও চলেছে ভিন্ন পথে এবং ভিন্ন কাজে। সঙ্কট নয় তারা, যেতে চায় না তারা; তবু যেতে হয়। পশুদের প্রভুভক্তি মানুষের প্রভুভক্তির মত কখনই লোক দেখানো হয় না বুঝি!

॥ এগারো ॥

পরদিন গড়ভবানীপুর রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে শত শত লোক জমেছেন। আজ বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তীর বিচার হবে। রাণী ভবশংকরী বিচারের শেষে কি রায় দেবেন, তা জনতা জানেন, জানেন স্বয়ং আসামীও। রাজধানী থেকে দূরে গিয়ে সৈন্যদের সেখানেই বিশ্রাম করতে বলায়, এক তরুণ জানতে চান—"এখানে পাঠান কই? এখান দিয়ে শত্রু আসার পথ কই?" তখন সেনাপতি সদুত্তর দিতে পারেন নি। সৈনিকের পর সৈনিক এগিয়ে আসেন, প্রস্থান হানেন; সেনাপতির দুরভিসন্ধি ধরা পড়ে গেল—সৈন্যগণ তাঁকে বন্দী করে আনলেন রাজধানীতে। শংকরী রাজধানীতে ফেরার পরই এলেন তাঁরা; রাণীমা'র হাতে বিশ্বাসঘাতককে তুলে দিয়ে রাণীকে অনুরোধ করলেন—প্রকাশ্যস্থানে তিনি যেন দুর্বৃত্তের শিরশ্ছেদ করেন। রাণী হেসে তাঁদের শান্ত করে বিদায় দেন।—একটু পরেই সেই বিচার হবে।

সভা বসলো। কুমারকে নিয়ে রাণী এলেন; তাঁকে ঘিরে এলেন নারী-বাহিনী। মন্ত্রী উপস্থিত; হাউলাপুরের দুর্গ-স্বামী ও থানাকুলের কোতোয়ালও এসেছেন। সবার শেষে এলেন গুরুদেব ও রাজর্ষি জীবনাথ। রাণী প্রহরীকে আদেশ দিলেন—বন্দীকে সভায় আনতে। হাত-পা বাঁধা মৃতপ্রায় চতুর্ভুজ

এসে দাঁড়ালেন সামনে। ঘৃণাসূচক শব্দ উঠলো চারদিক থেকে। রাণী প্রহরীকে বললেন—"নরক্রপে পশু হলেও—বৃদ্ধ ; বাঁধন খুলে দিন।"

রাণীর আদেশ অবিলম্বে প্রতিপালিত হ'ল। এই করুণা অনেকের চোখে জল এনে দেয়। রাণী তারপর বলেন—"আজ থেকে ছাউনাপুরের দুর্গ-স্বামী রাজা-সৈন্যের সেনাপতি হলেন এবং খানাকুলের কোতোয়াল হলেন ছাউনাপুরের দুর্গ-স্বামী।"

চারদিকে হর্ষধ্বনি ফেটে পড়লো।

শংকরী বলতে থাকেন—"এবার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির বিচার। অনেক আগেই আমি বিশ্বাসঘাতক রাজপুরুষের দণ্ড ঘোষণা করেছি। তা—মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু মৃত্যু হ'লে অপরাধীর যোগ্য শাস্তি হ'ল না। সে বুঝলো না—পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী। অপরাধীকে জানাতে এবং অন্যকে অপরাধ থেকে দূরে রাখতে আমি এই নর পশুকে আজীবন নিঃসঙ্গ কারাবাস দণ্ড দিলুম! পিতা, গুরুদেব, সেনাপতি, কোন আপত্তি আছে?"

তিনজনই দাঁড়িয়ে উদার স্বরে ব'লে ওঠেন—"ন্যায় বিচার হয়েছে। সাধু, সাধু, সাধু!"

"সেনাপতি, বন্দীকে যথাস্থানে নিয়ে যান।"—

রাণীর নির্দেশ প্রতিপালিত হ'তে সময় লাগলো না। রাণীকে অভিনন্দন জানিয়ে জনতা চলে গেলেন। ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ্য নিষ্কণ্টক হ'ল।

* * *

রাণী ভবশংকরী পাঠান শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিলেন বলেই, ১৬০১ সালে বৃদ্ধ মানসিংহ বীর ওসমানকে পরাজিত ক'রে উড়িষ্যা থেকে তাড়াতে পেরেছিলেন। এই সময়ই রাজা মানসিংহ আকবরের কাছ থেকে রাণী ভবশংকরীর জন্য এনেছিলেন—'রায়বাঘিনী' উপাধি। রাজপুত বীর যজ্ঞ-বীরাঙ্গণাকে এই বীরত্বের পুরস্কারটি দেবার সময় নিশ্চয়ই পরম তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। তিনি চোখের সামনে দেখলেন—বাংলার নারী ক'জন জহরের আগুনে আত্মবিসর্জন না দিয়েও সতীত্ব রক্ষা করেছেন, শত্রু নিপাত ক'রে লিখেছেন এক নতুন ইতিহাস। ভারতের গৌরব তাঁরা,—তাঁরা নারী জাতির নমস্য।

শংকরী মানপত্রটি নিয়ে হাসিমুখে রাজা মানসিংহকে বলেছিলেন—"আত্মবিস্মৃত বাঙালী একদিন সব ভুলে এই পদবীরই কদর্থ অর্থ করবেন, রাজা।"

তার উত্তরে রাজা বলেছিলেন—"তবু রাণী ভবশংকরী 'রায়বাঘিনী'ই থাকবেন—।"

রায়বাঘিনী রাণী ভবশংকরী দেশ ও ধর্মের স্বার্থে, কুমার প্রতাপনারায়ণের অভিভাবিকারূপে ভূরীশ্রেষ্ঠরাজ্যের সিংহাসনে বসলেন। বড়রাণীই তাঁকে নিয়ে গিয়ে হাসিমুখে, পরম আনন্দের সঙ্গে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন।

এই অভিষেকের পূর্বে অন্তঃপুরের একটি দৃশ্য।—ঘাঘড়ির যুদ্ধের পরের দিন প্রকাশ্য সভায় শংকরী সেনাপতি চন্দ্রভূজকে নিঃসঙ্গ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন, নিযুক্ত করলেন নতুন সেনাপতি। সম্রাটের উপাধি রাণীকে দান ক'রে রাজা মানসিংহ চ'লে যেতে চান ; কিন্তু রাণী তাঁকে তখনই যেতে দিলেন না। হরিষের ও জীবনাথের সাক্ষাতে শংকরী এই বিশিষ্ট অতিথির সাথে রাষ্ট্রনীতি নিয়ে অনেক আলোচনা করলেন। তিনি উপকৃতা হলেন ; মানসিংহও কম উপকৃত হলেন না এই আলোচনার ফলে। সম্রাটের নিপুণ সেনাপতি জেনে গেলেন অনেক গোপনীয় বিষয়, যা অদূর ভবিষ্যতে, পাঠান সর্দার ওসমানের সঙ্গে যুদ্ধের

বেলায় বেশ কাজ করলো। এই বৎসরই রাজা মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ওসমান উড়িষ্যা ছেড়ে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান এবং প্রখ্যাত ভৌমিক ঈশা খাঁর ছেলেদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রলোভনের বশে উন্মাদ হয়ে পাঠান সর্দার যদি রাণী ভবশংকরীর দিকে না ছুটে আসতেন, তা হ'লে তাঁর এমন দুরবস্থা কিছুতেই হ'ত না। নিজের কবর তিনি নিজেই রচনা করলেন।

রাজা মানসিংহ গড়ভবানীপুর থেকে চ'লে যাবার পরই বড়রাণী শংকরীকে বললেন—"বোন, আমার কর্তব্য আমাকে এবার করতে দাও!"

শংকরী হাসিমুখে বলেন—"আমি কবে আপনার কর্তব্য সাধনের পথে কাঁটা হয়েছি, রাণীসাহেবা? ছোট বোন, শক্তি আছে; হুকুম করুন। রাজসূয়-যজ্ঞ হবে কী?"

বড়রাণী তাঁর দিকে চেয়ে ভাবতে থাকেন মেয়েটা কী? প্রলয়ের ঝড়ই বুঝি বয়ে গেল ওর মাথার ওপর দিয়ে; তবু তোলেনি শান্ত দিনের কথা। প্রকাশ্যে বললেন পরে—"এমন বীরাঙ্গনা বোন কখনো দিদির কাজে বাধা দেয় না। হাঁ রাজসূয়ই করবো; তোমাকে পাঠাবো দিগ্‌বিজয়ে। শংকরী, বোন, দেশ ও জনের জন্যেই তোমাকে ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজ্যের সিংহাসনে বসতে হবে।"

শংকরী একটু ভেবে বলেন—"বাধা দেব না; কিন্তু আপত্তি করার বিষয় আছে। তুমি বড়রাণী, তুমি থাকতে আমার ওই আসনে বসা সত্যের অপমান করা ছাড়া আর কী? এই সমস্যার সমাধান হবে—তুমি প্রতাপকে নিয়ে রাজার আসনে বসলে। আমি নিত্য তোমে থাকবো তোমাদের দেহরক্ষী হয়ে, তোমার মুখ্যমন্ত্রী হ'য়ে।"

"তোমার যোগ্য কথাই বলেছ, বোন! কিন্তু শয়তানের চোখ দুষ্টি সিংহাসনের দিকে আসতে থাকবেই, তাই সিংহাসনে শক্তির অধিষ্ঠান অপরিহার্য। আমি থাকবো না, কুমার থাকবে না; তুমি থাকবে একা। মানুষ কত কি বলবে; বলুক—মানুষই তো বলতে পারে; তারাই আবার জয়ও গাবে। সিংহাসনে বসে সুশাসন করো, কুমারকে ক'রে তোলো তোমার যোগ্য উত্তরাধিকারী।"—শংকরীকে দু'হাত দিয়ে ধ'রে স্নেহজড়িত স্বরে কথাগুলি বললেন।

"তাই হোক। তোমার ইচ্ছাই যেন পূর্ণ করতে পারি। এইভাবে কাছে থেকো কিন্তু।"—

"মৃত্যু ছাড়া আর কোন কিছুই তোর কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে নিতে পারবে না, শংকরী!" উদাস স্বরে বললেন বড়রাণী।

* * * *

অভিষেকের আয়োজন চললো এবং এক শুভদিনে রাজগুরু, দীননাথ ও রাজ্যের প্রধানদের সামনে বড়রাণী শংকরীকে এনে বসিয়ে দিলেন সিংহাসনে। সেই মুহূর্তে কামান গর্জিয়ে উঠলো; সৈন্যদল রণবাদ্য বাজালেন পুরনারীদের শঙ্খ ও রাজ্যবাসীদের আনন্দ-ধ্বনিকে অধিকতর সজীব ক'রে। রাজগুরু প্রশান্ত হরিদেব শান্তি-বচন সমাপ্ত ক'রে ধীর-গম্ভীর স্বরে বললেন—"রাজ্যের প্রধান রাণী দেবী রাজবল্লভীর সম্মুখে, দেবীকে নিবেদিত সিন্দুরের টিকা পরিয়ে প্রথম রাজরাণীরূপে দেবী শংকরীকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। আজ ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজ্যের সিংহাসনে রায়বাঘিনী রাণী ভবশংকরীর অভিষেক-অনুষ্ঠানে তিনিই পৌরোহিত্য করার যোগ্যতা রাখেন। আজকের এই অভিষেক কল্যাণপ্রসূ হোক; অষ্টভুজা ভবানীর কৃপাপাত্রী, শিব-শংকরের আদর্শ সেবিকা, বাংলার এই আদি-বীরাঙ্গনার নিবিড় স্পর্শ পেয়ে ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজ্যের সিংহাসন ধন্য হোক, সার্থকতায় ভরে উঠুক সনাতন হিন্দুস্থানের ইতিহাস।"

হরিদেব এগিয়ে গিয়ে, শ্বেতচন্দনের তিলক পরিয়ে রাণীকে আশীর্বাদ করলেন, আশীর্বাদ করলেন রাজর্ষি দীননাথ, স্নেহ-চুম্বন দিলেন এসে শংকরীর মাতৃসমা শান্তা দেবী। শংকরী সকলকে প্রণাম করলেন, অভিবাদন জানালেন রাজকর্মচারীদের। বললেন শেষে—"ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজ্যের কল্যাণের জন্যেই আমি আনন্দের সঙ্গে শাসনদণ্ড নিলুম। প্রতি রাজ্যবাসীর সামনে আমি শপথ নিচ্ছি—প্রাণ দিয়েও আমি রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করবো। সাধারণের তৈরি সিংহাসনে সাধারণের শুভেচ্ছাই আমাকে বসালো। যদি কোনদিন আমি সাধারণের অকল্যাণ করি, তবে সাধারণ মানুষই যেন আমার ন্যায়-বিচার করেন, আমাকে যোগ্য দণ্ড দেন।"

শুদ্ধ জনতা, শুদ্ধ সভাসদ্‌গণ শুনলেন রাণীর এই কথা; নত হ'ল সবার শির শ্রদ্ধাভরে।

রাণী তখনই বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"আমি যেমন রাজ্যবাসীর দেওয়া মাতৃপদ গ্রহণ করলুম, রাজ্যের প্রতি নরনারী তেমনই যেন আমার সন্তানরূপে আমাকে ঘিরে থাকেন।"

সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে রাণীর ওপর। সত্যিই তিনি মা। বিশ্ব-জননীর রূপ নিয়েই যেন দাঁড়িয়েছেন ভব-শংকরী। সুগঠিত সুন্দর দেহে শ্বেতবসন; আজানুলম্বিত কেশরাশি এলিয়ে পড়েছে পিঠে—উড়ছে বাতাসে; চোখে প্রাণপূর্ণ প্রশান্ত জ্যোতি, মুখে শান্ত হাসি।

মূর্তিমতী জগদ্ধাত্রী।

রাণী চাইলেন তাঁর সেনাপতি দুর্গাবতীর পানে। চোখে চোখে কি কথা হয়ে গেল; দুর্গা চলে গেলেন। একটু পরে কুমার প্রতাপনারায়ণকে নিয়ে ফিরলেন তিনি। তাঁর কোল থেকে ছেলেকে নিয়ে নিলেন শংকরী, ছেলের মুখে চুমা খেলেন। কত সতর্ক দৃষ্টিও দেখলো সামনে—কুমার কার্তিকেয়-কোলে শিখরবাসিনী দুর্গাকে।

সেনাপতি সভা-ভঙ্গের নির্দেশ ঘোষণা করলে সৈন্যবলের সঙ্গে জনগণও রাণীর জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠেন।

বাংলার আদি বীরাঙ্গনা, বাংলার প্রথম স্বাধীন শাসনকর্ত্রী হলেন রাজরাজিনী রাণী ভবশংকরী। শাসনভার নেবার পর তিনি আবার অতীতের কর্ম-জীবনকে স্বীকার ক'রে নিলেন। আজ তাঁর প্রধান উপদেষ্টা পিতা দীননাথ। দীননাথ ছেলেকে তাঁর অধিকারে বসিয়ে আজ সংসারের একরূপ বাইরে। কিন্তু তিনি আজও নির্বীর্য নন; তাই সংসারের ভার রাণীকে উপেক্ষা করতে পারেন না। দীননাথ ছেলেকে উপদেশ দেন; মেয়ের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যান। তরুণ সর্দারের চেয়ে তরুণী রাণী অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতির নির্দেশকে অনেক মুক্তভাবেই কাজে লাগাচ্ছেন। রাণী যে সেনাপতির হাতে গড়া নারী; তিনি যে যোগ্য-সাধনার সিদ্ধিলব্ধা সাধিকা—আবার তাঁর কাজও যে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ভবশংকরীর শাসনে বাংলার অনেকখানি ভূভাগ 'সোনার বাংলা'য় হ'ল পরিণত, অনুকরণীয় হ'ল অনেকের। শংকরী তাঁর নবযৌবনের সকল সাধ স্বপ্নকে একে একে রূপ দিতে থাকেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে কাজগুলি তিনি আরম্ভ করেছিলেন, এবার তাদের দিলেন পরম সার্থকতা এনে। গণ-শিক্ষার আলোক ছড়িয়ে পড়লো জীবনে জীবনে, মানুষ হলেন বীর্য সত্যবাদী।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা চতুরাননের আমাতা সদানন্দ মুখোপাধ্যায় শ্বশুরের রাজ্য লাভ করেন। তিনি নদীয়া জেলার শান্তিপুরের ছেলে। সদানন্দই রাজবল্লভী দেবীর প্রতিষ্ঠাতা। শান্তিপুরের সুপ্রাচীন কুটির-শিল্প বস্ত্র-বয়নকে তিনি এই নতুন নগরে প্রতিষ্ঠা দিলেন, দিলেন রাজশক্তির অকুণ্ঠ সহানুভূতি। অল্পদিনেই এখানের শিল্প শান্তিপুরকেও হার মানিয়ে দিল। প্রচুর কাপড় বোনা হয়; দিক-বিদিক থেকে লোক আসেন কাপড় কিনতে। এই ক্রয়-বিক্রয়কে কেন্দ্র করেই এখানে গ'ড়ে ওঠে

বিক্রয়কেন্দ্র বা হাট। তা থেকেই নগরের নাম হ'ল—রাজবল্লভীর হাট। মানুষ কালে সেই নামকে বুঝি আরও সহজ ক'রে নিলেন। রাজবল্লভীর হাট হ'ল রাজবল-হাট। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামকে এই ভাবে বিকৃত ক'রে মানুষ তাঁদের বিবেককে হয়তো বিক্রয় ক'রে ফেললেন শৃঙ্খলাহীনতার হাটে।

থাক, সন্তানন্দের পরবর্তী কালে, তাঁর উত্তর পুরুষগণ সবাই কীর্তিমান। কালের দুর্দান্ত গতির সামনে অতীতের যোগসূত্রকে ঠিকমত ধ'রে না রাখতে পারায়, ওই বিরাট ঐতিহ্যসম্পন্ন কুটির-শিল্পটি ঐতিহ্য হারাতে থাকে।

সন্তানন্দের বড় ছেলে কৃষ্ণচন্দ্রই ভূরীশ্রেষ্ঠের রাজা হন সন্তানন্দের মৃত্যুর পর। রাজধানী গড়ভবানীপুর প্রতিষ্ঠা করেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা চতুরানন। কৃষ্ণচন্দ্র পরম বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। তিনিই খানাকুল কৃষ্ণনগরকে আর্যভাষা ও আর্য-শাস্ত্র-শিক্ষার পীঠ করেছিলেন। তাঁর ছেলে দেবনারায়ণ, তপঃসিদ্ধ পুরুষ মণিনাথ গোস্বামীর নির্দেশে সন্ন্যাসী রাজা রূপে জীবন কাটিয়ে গেছেন। ১৩০৯ শকাব্দে, তিনি কালজয়ী মন্দির তৈরি করিয়ে 'মণিনাথ-শিব' প্রতিষ্ঠা করেন সেখানে গুরুর নামানুসারে। দেবনারায়ণের ছেলে দর্পনারায়ণের সময়ই গৌড়েশ্বর গণেশের ছেলে যদু, কুতুব উল আলাম নামে এক পীরের প্ররোচনায় মুসলমান হয়ে, ওই পীরের চক্রান্তেই রাজা গণেশকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং বঙ্গাধিপ হন। যদু, চেতন্য বা জালালুদ্দিন রাজা হয়ে হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করতে থাকায় (১৪১৪ খ্রীঃ), এই দর্পনারায়ণ তাঁর দর্প চূর্ণ করার জন্যে অভিযান করেন। যুদ্ধ না হলেও যদু বেশ ঘাবড়ে যান। দর্পনারায়ণের পুত্র উদয়নারায়ণ, পৌত্র সত্যনারায়ণ এবং প্রপৌত্র শিবনারায়ণ বৈচিত্র্যহীন জীবন নিয়ে কাল কাটিয়ে যান; তবে উদয় ও শিব তাঁদের নামানুসারে দুটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন দামোদরের পশ্চিম তীরে। দূর অতীতের উদয়নারায়ণপুর শিবনারায়ণপুর (শিবপুর) ওই দু'জন জমিদারের নাম অমর ক'রে রেখেছে। শিবনারায়ণেরই ছেলে মহাবীর রুদ্রনারায়ণ। তাঁর পূর্বে প্রায় দেড়-শ' বৎসর ধরে ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজবংশে বৈশিষ্ট্যহীনতাই রাজত্ব করেছিল। সকল অবসাদ ঘুচিয়ে রাজা রুদ্রনারায়ণ সেই বংশকেই করলেন বৈশিষ্ট্যময়; সেইজন্য ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান হলেও রুদ্রনারায়ণ দূর-অতীতের সকল ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। রাণী ভবশংকরী এবার রাজ্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার ক'রে চললেন। রাজবল্লহাটের কাপড়কে তিনি আবার কাছের ও দূরের লোকদের লোভনীয় ক'রে তুললেন। তাঁর সাধনায় সমৃদ্ধ রাজবল্লহাটই একদিন "ভারতের ম্যানচেষ্টার" নাম পেয়েছিল। মৃতপ্রায় সূত্রধর ও বুৎশিল্পী-বংশকেও শংকরী পুনর্জীবন দান করলেন। রাণী বুঝেছিলেন—সকলকে শক্তিমান করে মাঠে ছেড়ে দিলে জাতীয় জীবনের ধান উদয়ন হবে না; কারণ চাষের জমি কতটুকু যে সকলে সেখানে সাধনা করতে পারবেন? জাতীয় জীবনের প্রতিশুরুকে স্বাস্থ্যবান করতে হ'লে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পীর প্রয়োজন এবং কুটির শিল্পের মাধ্যমেই শিল্পীদের কর্মধারা প্রবাহিত করলে বেকার থাকবেন না কেউ। কর্মহীনই যে দেশের অকল্যাণ সৃষ্টি করে।

ভবশংকরীর সেই আশা পূর্ণ হয়েছিল।

সমাজ-জীবনে ধর্মের শক্ত সুতোর বাঁধন না থাকলে মানুষ কল্যাণব্রতী সংসারী হ'তে পারেন না। হিন্দু-সমাজ ধ্বংসকারী উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবল বন্যার গতি রোধ ক'রে যুগাচার্য শ্রীচৈতন্য এ-সংসার থেকে কিছুদিন আগে চ'লে গেলেও, তাঁর প্রেমের বন্যা এখনো প্রবল শক্তিমান। ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজবংশ শিব ও শক্তির উপাসনা ক'রে এলেও শিব শক্তির একান্ত সেবিকা শংকরী বৈষ্ণব-ধর্মকে স্বীকার ক'রে নিলেন। স্বয়ং শংকরই তো পরম বৈষ্ণব; শংকরী তা হ'লে কখনই বৈষ্ণব বিদ্বেষিনী নন—পরমা পতিব্রতা নারী তিনি যে। রাণী ভবশংকরী

বৈষ্ণবধর্মকে স্বীকৃতি দিলেন, তুরীস্রেষ্ঠ রাজ্যে নব ধর্মের বিস্তারের সুযোগ ক'রে দিলেন। সাম্যের উপাসিকা এই নব সাম্যবাদকে কী উপেক্ষা করতে পারেন?

রাজ্যময় কীর্তনিয়া তৈরি হলেন। সুমধুর কীর্তন গানের মনমাতানো সুর পল্লী-সন্ধ্যাকে লোভনীয় করতে থাকে। সারাদিনের পরিশ্রমের কষ্ট ঘুচিয়ে দিতে, ভুলিয়ে দিতে হিংসা আর শোকের কথা এবং সেই সঙ্গে ছোট বড়কে এক ক'রে দিতে এই কীর্তনের শক্তি অশেষ। সর্বনেশে ভেদাভেদ দূর ক'রে সব মানুষকে সমধর্মী করার একমাত্র ভারতীয় হিন্দু ধর্ম হ'ল—বৈষ্ণবধর্ম। ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের চেয়ে এই ধর্ম কোন অংশে হীন নয়; কিন্তু ধর্মের মানোন্নয়ন করার চেয়ে মান-অবনত করায় লোক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বেশী চওড়ায় এমন সমুন্নত মানব-ধর্মও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কালের পদাঘাত ও মানুষের অত্যাচার সহ্য ক'রে যাচ্ছে।

• • •

সুখ-দুঃখ আলো-অন্ধকার নিয়ে বৈচিত্র্যময়ী পৃথিবীতে যুগে যুগে কবি জন্মগ্রহণ করেন—পৃথিবীর বিচিত্রতা আর প্রকৃতির লীলাকে গানে কথায় সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দিতে। কবি বিপ্লব আনলেন, ঘুম পাড়িয়ে দিলেন বিপ্লবকে। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে, অভাবের নাগপাশে বাঁধা থেকেও কবি ওই কাজ ক'রে যান। ওই কাজই যে তাঁর পবিত্র জীবন ধর্ম।

সেই প্রভাতে, কাটশাকড়ার রত্নেশ্বর শিবমন্দিরের পুকুর-পাড়ে যে কবি অকস্মাৎ এসে শংকরীকে শুনিয়ে গেলেন রাজ্যবাসীর অন্তরাত্মার কান্না, তাঁকে শংকরী ভুলতে পারলেন না—বিক্ষুব্ধ কালসমুদ্রে বারবার তাঁর তরী বিপর্যস্ত হলেও। তীরে উঠেই রাণী তাঁকে পেতে চাইলেন, ডাকলেন নিত্য-সঙ্গিনী দুর্গাকে। দুর্গা এলে শংকরী বললেন তাঁকে—"যে কবি সে সুপ্রভাতে রাজ্যের মর্মবাণী শুনিয়ে গেলেন তাঁর কথা তোর মনে আছে, দুর্গা?"

"চারণ-কবিকে কি ভোলা যায়, শংকরী?"—প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করলেন দুর্গাবতী।

"সত্য কথা। কিন্তু তাঁকে কী ক'রে পাওয়া যাবে? রাজ্যের সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে তাঁকে চাই-ই।"

শান্ত হাসি হেসে, রসালো-স্বরেই দুর্গা বললেন—"হুজুরের যখন চাই, বাঁদী তখন এনে দেবেই।"

সখী, সহচরী ও সেনাপতিকে জড়িয়ে ধ'রে শংকরী বললেন তখন—"হাঁ গো, মহারাণী, এ দাসীর বাসনা পূরণ!"—তারপর দুর্গার গাল টিপে ধ'রে বলেন—"এই পোড়ারমুখী, অমন লম্বা লম্বা কথা কইতে শিখলি কোথা থেকে?"

"আপনারই কাছ থেকে, দিদিমণি!"

"গাল টিপে চোখ দিয়ে জল বের ক'রে দেব।"

"ইস্! দুর্গা বাদুন-ঠাকরুন নয় যে, গাল টিপে তার চোখের জল বের ক'রে দেবে। সে কাজ একটি শংকরীর দ্বারা সম্ভব নয়।"

খিলখিল্ ক'রে হেসে ওঠেন শংকরী।

দুর্গা বললেন—"আমি ব্যবস্থা করছি, তাই! তুমি কবি-সম্বর্ধনার বন্দোবস্ত করো।"

"সত্যি?"

"নিশ্চয়ই"—ব'লে দুর্গা চ'লে গেলেন। শংকরী তাঁর যাওয়া দেখতে দেখতে ভাবেন—ওর অনুষ্ঠ

প্রীতি, সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেয়েছিলুম বলেই, আমি অমন সব বাধা অতিক্রম ক'রে মাথা তুলে ঠিক দাঁড়িয়ে আছি। দুর্গাবতী এই বাংলারই এক মেয়ে কিন্তু।

কবি কখনো লুকিয়ে থাকতে পারেন না। গণজীবনের কল্যাণে জনগণ নিয়েই তাঁর কারবার। সেনাধ্যক্ষের মাধ্যমে গ্রামের স্বেচ্ছাসৈনিকদের মধ্যে দুর্গার নির্দেশ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ চারণকবি সকলের দৃষ্টিপথে এসে গেলেন, আরও অনেক কবির সাথে। রাণী ভবশংকরী তাঁর রাজ্যের সকল কবিদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করলেন।

আজ রাজ-সভায় ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজ্যের জ্ঞাত কবিদের রাণী, রাজ্যের হয়ে, সম্মানিত করবেন। রাজ্যের বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে ব'সে আছেন ক'জন কবি—অতি সাধারণ মানুষ তাঁরা। সকলে মলিন বেশ পরিবর্তন করেও আসেন নি। তাঁদের আবার লজ্জা কিসের? সংস্কৃতির ধারক ও বাহক যাঁরা, তাঁরা কিরূপে নৌখিন সাজে সাজবেন? মানবতার মনোময় মূর্তি বাস্তব-রূপ নিয়ে এসে বসেছেন রাজসভায় —ফরাসের ওপর। সবার থেকে আলাদা, তবু সবার মধ্যে; সবার নিচে নিজেদের ধ'রে রাখলেও, সবার ওপরেই তাঁরা আছেন।

রাণী দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে শ্রদ্ধাভরা বিনীত কণ্ঠে বলতে থাকেন—"ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ নরনারীর পক্ষ থেকে আজ আমি, এই শুভক্ষণে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কবিদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই, তাঁদের জানাই আমার প্রাণের প্রণতি। এই বিরাট জগত-মহাকাব্য রচনা করেছেন কবি; কবিই তাতে যুগে যুগে নব নব অধ্যায় যোগ ক'রে চলেছেন। শুধু যোগ করলেই হবে না, কবি! যোগ্য অধ্যায় যোগ করতে হবে, সংশোধন ক'রে মহাকাব্যকে করতে হবে কালোপযোগী। পাষাণের ঘুম ভাঙানো গান আপনারা গেয়ে যান। বিশ্বের উপেক্ষা আপনাদের কী করতে পারে? আপনারা মহাবট—যোগিবৃক্ষ। ছায়া দেবেন, আশ্রয় দেবেন, আহার দেবেন। মানুষ সব সময় আপনাদের দেখতে না পেলেও, মানুষের অন্তরের ঠাকুর ঠিক দেখে যাবেন আপনাদের—মহাকালের খাতার পাতায়, ওপর দিকে লেখা থাকবে আপনাদের কথা। রাজা-রাণী, মন্ত্রী-সেনাপতিও তো বিস্মৃতি সমুদ্রের অতল তলে হারিয়ে যান। তাঁদের সুখ-শান্তি কী ক'রে আপনাদের দুঃখ-শান্তির চেয়ে বড় হ'ল, কবি?"

এক বৃদ্ধ পল্লী-কবি এই সময় তাঁর হাতে ধরা বাঁশের লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—

"জেগে আছে কবি, জেগে রবে চিরদিন,
মানুষের হিতে আলোক-আঁখিতে
বেজে যাবে তার হাতের বিজয়ী বীণ!"

হাসিমুখে রাণী বললেন—"তাই হোক, কবি! মানবতার বড় ব্যথা; মানুষ বড় ভুল করেন।"

বললেন তারপর, তিনি প্রত্যেক কবিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সেবায় আত্মনিয়োগের সুযোগ দিতেই নিষ্কর ভূমি ও অর্থ সাহায্য করবেন। সভার মধ্যে আনন্দের গুঞ্জরন জাগলো এই কথায়; কবিরা নির্বিকার। রাণী ফুলের মালা নিয়ে প্রথমে গেলেন এক তরুণ উদাস কবির কাছে। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন শংকরী—"তরুণ কবি, আপনাকেই আমি প্রথম আমার প্রণতি জানাবো। আপনিই আমার ভুল ভেঙেছিলেন এক সুপ্রভাতে, আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন আমার চলার পথ। আপনি তরুণ হলেও আপনিই এ-রাজ্যের সবার বড় দরদী বন্ধু। তরুণই তো গণকল্যান-ব্রত উদ্‌যাপন করার মন্ত্রে গড়াকে

ভাঙেন, তাঙাকে গড়েন। ধন্য আপনি; আপনাকে পেয়ে ধন্য ভারতভূমি। আপনার মত সকল কবিই দেশবন্ধু হোন।"

কবি উঠে রাণীকে প্রণাম করেন। রাণী হাসিমুখে, সকলের আনন্দধ্বনির মধ্যে, তাঁকে মালা পরিয়ে দেন। সকল কবিই রাণীর সম্মান-মালিকা গ্রহণ ক'রে জাতীয়-সংস্কৃতি-বাহকের মর্যাদাকে রাখলেন অক্ষুণ্ণ। রাণী ভবশংকরীও গুণীর মান রেখে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার মান বজায় রাখলেন।

* * *

কালের নিয়মে দিন কেটে যায়। মহাকালের রথের চাকা থামার নয়, ঘুরছেই; আর তার সঙ্গে উঠছে, পড়ছে, পিষে যাচ্ছে কত মানুষ, আরও কত-কি। হাসি-কান্না আগিয়ে যায় এগিয়ে, ক্রমাগত এগিয়ে—দৃষ্টি সামনেই থাকে, মন আত্মদর্শনে উৎসুক।

ভূরীশ্রেষ্ঠ-রাজবংশের সুসন্তান রাজা রুদ্রনারায়ণ প্রায় আঠারো বৎসর পূর্বে মরণের পথে কোথায় গিয়েছেন, তা একমাত্র মহাকালই জানে। তাঁর মহাপ্রস্থানের পর যে শোকের উদ্দাম বন্যা জেগেছিল মনে মনে, তা কালেরই বিধানে কমেছে, থেমেছে, সেই দুর্যোগের কথা আজ তেমন স্পষ্ট মনে পড়ে না। কাল-বৈদ্যের চিকিৎসায় ক্ষত শুকিয়ে গিয়েছে কবে। চরণ-চিহ্ন কোথা থেকে সেই দিনটির কথা কখনো কখনো সেই স্মৃতি-পথে এনে ফেলে।

কুমার প্রতাপনারায়ণ আজ তরুণ। বীরাঙ্গনা জননীর শুশ্রূষাধীনে মানুষ হয়ে আজ তিনি বীর পিতার যোগ্য পুত্রই হয়েছেন। অমন মা-বাপের ছেলে এরূপ না হয়ে পারেন? বৃদ্ধ গুরুদেব ও পিতা এবং বৃদ্ধা দিদির সঙ্গে পরামর্শ করে শংকরী স্থির করলেন, কুমারের আগামী জন্মদিনে তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হবে। যদিও অনেকদিন পাশে বসিয়ে রাণী কুমারকে রাষ্ট্রনীতি শিখিয়েছেন; তবু কুমার নবীন। সিংহাসনে তাঁকে বসিয়ে শংকরীকে আরও কিছুদিন তাঁর পিছনে থাকতেই হবে। যে সিংহাসনে রাজা রুদ্রনারায়ণ বসেছেন, রাণী ভবশংকরী বসেছেন, সেই আসনে যেন দুর্বল বা চঞ্চল রাজা না বসে থাকেন। শংকরী প্রতিজ্ঞা করলেন—সেই আসনে, তাঁর সময়ে, যোগ্য ব্যক্তিই থাকবেন।

রাণীর কথায় বাধা দেবার কেউ নেই; কারণ তিনি তো দুষ্ট বুদ্ধির প্রভাবে কিছুই করতে যান না। সত্যের তিনি নিষ্ঠাবতী পূজারিণী; কল্যাণকর কর্মই তাঁর জীবনের ধর্ম।

কুমারের এই জন্মদিনে কুমার সাবালক হলেন। বিরাট উৎসবের মধ্যে, বড়রাণী ও রাণী ভবশংকরী কুমার প্রতাপ নারায়ণের হাত ধ'রে ভূরীশ্রেষ্ঠ রাজবংশের মহান্ ঐতিহ্যমণ্ডিত সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন তাঁকে। গুরুদেব হরিদেব ভট্টাচার্য আজও স্বস্তি-পাঠ করলেন। রাজর্ষি মাতামহ দীননাথ তাঁর হাতে তুলে দিলেন রাজদণ্ড আর রুদ্রনারায়ণের অসি।

সে তলোয়ার ধরার শক্তি কুমার অর্জন করেছেন।

ভূরীশ্রেষ্ঠ-রাজ্যের নতুন রাজা সবার সামনে মায়ের পায়ের ধূলি মাথায় নিলেন প্রথম। তারপর প্রণাম দিলেন গুরুদেব, পিতামহ, বড়-মা আর দুর্গা-মাসীকে। শেষে রাজারূপে শপথ নিলেন, সেই কথা ব'লে যে কথা বলেছিলেন রাণী ভবশংকরী রাজদণ্ড নিয়ে।

মহোৎসবের মধ্যেই কুমার প্রতাপনারায়ণের রাজপদে অভিষেকের শুভানুষ্ঠান সম্পন্ন হল।

* * *

মায়ের সঙ্গে তরুণ কুমার বহুবারই ছাউনিতে গিয়েছেন, যুদ্ধ-জাহাজগুলি পরিদর্শন করেছেন।

রাজা হবার পর তিনি আবার পরিবর্তন করলেন সকল ক্ষেত্রেই। এখনো রাণী ভবশংকরী তাঁর সামনে। জাগতিক প্রথা আজ শাসনদণ্ড প্রতাপনারায়ণের হাতে তুলে দিয়েছে বলেই প্রতাপনারায়ণ শংকরীর সামনে দাঁড়াতে পারেন? রাজাবাসীর অন্তর ভবশংকরীকে অক্ষয় রাজদণ্ডই দান করেছে। রাজা আজ যদিও রাজার প্রাপ্য সম্মান পাচ্ছেন, তবু তা রাজমাতার সম্মান প্রাপ্তির পর।

সৈন্যাবাস ও যুদ্ধজাহাজ পরিদর্শন শেষ হ'লে শংকরী প্রতাপকে নিয়ে গেলেন কাটশাকড়ায় শিব মন্দিরে, যেখানে শিব সাধনায় সিদ্ধ হলেন তাঁর বাবা, শিব ও শক্তি সাধনায় যেখানে মা সিদ্ধ হলেন। একদিন গেলেন—ঘাঘড়িতে, নিজের প্রতিষ্ঠিত ভবানী-মন্দিরে। যে মাঠে বাংলার এক বীর্যবতী মেয়ে, নারীবাহিনী আর রাজাবাহিনী নিয়ে পাঠানের গর্ব চূর্ণ ক'রে ছিলেন, সেই মাঠে দাঁড়িয়ে দুর্ধর্ষ নারীবাহিনীকে সামনে রেখে, শংকরী সেই যুদ্ধের কথা শোনালেন প্রতাপকে। আরও শুনিয়ে দিলেন কাটশাকড়ার পাঠানদের সঙ্গে নারীবাহিনীর খণ্ডযুদ্ধের কথা। আজই প্রথম শংকরী সেই রাত্রির কথা অন্যের কাছে বললেন। যে বড়রাণীকে শংকরী মা, বোন, বন্ধুর মত ভক্তি, ভালবাসা ও প্রীতি দিয়ে এসেছেন, তাঁকেও তিনি এ কথা বলেন নি। নারী-বাহিনী আর শংকরীই জানতেন তা ভূবনেশ্বরী রাজো। বাইরের একজন জানতেন—তিনি পাঠান সর্দার ওসমান। বড় রাণী শংকরীর মুখে সেই কথা শুনে বিস্মিত হলেন না; তিনি যে তাঁকে চিনতেন। কিন্তু, প্রতাপনারায়ণ, ছেলে হলেও, মাকে আজও ঠিক জানতে না পারায়, কথাটি শুনে বিষম বিস্ময়বোধ করলেন।

—তেমা কি এত সহজ কাজ?

* * *

যৌবনের সীমা-রেখা সামনে, তবু আলো যৌবন-সূর্য মাথার ওপর; কিন্তু একটা অবসাদ, একটা কি হতাশা অন্তরের কোন্ প্রান্তরে থেকে মনকে উৎসাহিত করছে অবসর নেবার জন্যে। বলে তারা—"আর কেন? কী সাধে আর বাসা বেঁধে থাকবে?"—বীরাঙ্গনা চাইলেন নিজের দিকে; এই বুঝি প্রথম চোখ মেলে নিজেকে দেখলেন, স্বামী-হারানোর পর। এ কী রূপ? কী আছে আর তার? হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল নব-যৌবনা দুর্গাবতীর কথা।.....সাধারণ বামুন বাড়ির মেয়ে, দগ্ধ বিধবা। যোগাশ্রিত রোগে ভুগে স্বামী মরলো, কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ি বললো—'রাক্ষুসী ছেলেকে খেলো।' স্বামী হারানোর ব্যথা এবং অনাগত ভবিষ্যতের ভয় নারীকে পাথর ক'রে ফেলেছিল। পাথরটাকে টেনে ফেলে দিল অভিভাবকেরা বাড়ির বাইরে। বাপ দাঁড়িয়ে। অপমানিতা ব্যথিতা নারী অঞ্চলার চোখ তুলে চাইলো তার পানে। পাথরের মূর্তির কালিতে আঁকা চোখ—মানুষের দৃষ্টি। তাতে ভাষার পথ নেই। এরপর ওই নারীর জন্যে আত্মহত্যার পথ ছাড়া আর কোন্ পথ খোলা আছে? মানুষ আর মরণ দুই-ই ওই পথ দিয়ে তাকে ডাকতে থাকে। সা বাড়ালো দুর্গা, কিন্তু শংকরী তাকে টেনে নিলেন কাছে, দিলেন নব-জীবন; কর্মব্রতে দীক্ষা দিয়ে ভুলিয়ে দিলেন সংসারের কথা। কর্ম-যজ্ঞে ব্যস্ত থাকায় তিনিও ভুলেছিলেন নিজেকে। আজ নিজেকে যখন চিনলেন, কী একটা অজানা বেদনায় ভ'রে উঠলো তখন তাঁর সমস্ত অন্তরই। আর কাজ নেই, আর ভুলে থাকার উপায় নেই। শংকরী ছুটে গিয়ে দুর্গাকে জড়িয়ে ধরলেন, জড়িয়ে ধ'রে রইলেন। দুর্গা বুঝলেন, ছুটির ঘণ্টা শুনেছেন নারী; আর তাঁকে ঘরে ধ'রে রাখা যাবে না।

শংকরীকে ঠিক পথটি দুর্গা দেখিয়ে দিলেন।

* * * *

শংকরী বুঝলেন ছুটি তাঁর চাই-ই। সংসারের স্বার্থপরায়ণতার মধ্যে তিনি যেমন শান্তি খুঁজে পাবেন না, তেমনই শান্তি মিলবে না তীর্থে বা তপস্যায়। দূরে, অনেক দূরে তিনি চ'লে যাবেন, ব'সে থাকবেন নিরালায়, দেখবেন উদাসী মহাশূন্যকে। অবসাদের বুকে অবসাদ জমতে থাকবে, শেষে শূন্য হয়ে যাবে সবই।

বাউল মনকে হাসির পর্দার আড়ালে ফেলে শংকরী সংসারধর্ম যেন পালন করতে থাকেন। অসমাপ্তকে সমাপ্ত করতে হবে তো! যোগ্যা পাত্রী এনে ছেলেকে সাংসারী-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন, বধূকে নিজের জীবনের সর্বও দিলেন কিছু। প্রতাপনারায়ণ এখন তাঁদের যোগ্য উত্তরাধিকারী। ভূরীশ্রেষ্ঠ তাঁকে নিয়ে সন্তুষ্ট বেশ! ওদিকে ভাই ও বাবার স্বাক্ষর রইবার যোগ্যতা লাভ করেছেন। বধূকে দেখার জন্য দুর্গা ছাড়া আর সব নারী-বাহিনীকে রেখে, দুর্গা, দিদি, বাবা ও গুরুকে নিয়ে রাজ্ঞাধিনী রাণী ভবশংকরী একদিন মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন শুভ। বারানসীর ভাগীরথী-তীরে ব'সে জল-কল্লোলিনীর গান শুনে নারী তাঁর শূন্যতাকে মহাশূন্যের সঙ্গী করার সাধনা ক'রে যাবেন। এই হবে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম ও ধর্ম। কি ব্যথা দর্শনকে তাঁর কাছে মিথ্যা স্বপ্নেই রূপান্তরিত ক'রে দিয়েছে।

শংকরী চলে গেলেন শত শত অশ্রুসিক্ত চোখের সামনে দিয়ে। তাঁর চোখ থেকেও তখন ছায়া গিয়ে যাদল নেবেছিল। কিন্তু উপায় কী? আর যে এ চোখে আলো তেমন আসবে না; ও-সব চোখও একদিন খুঁজে পাবে না দৃষ্টি-পথে এই দিনটিকে এমন ভাবে।

ছায়া আসে, চ'লে যায়; আলো তখন ফুটে ওঠে। আলো-ছায়ার বৈচিত্র্য নিয়েই এই সংসার।

দামোদর ছেড়ে ছিপ এসে পড়লো সমুদ্রে। কিছুক্ষণ ভাটার টানে, কিছুক্ষণ জোয়ারের তাড়নে চললো তরী; তার পরই উজান যাওয়া। রাত্রি আসবে, ঝড় উঠবে, বন্যা দেখা দেবে দূরে—তবু সেই উজান ভেসে যাওয়ায় ছেদ পড়বে না। ছেদ পড়বে সে-দিন, যে-দিন চাওয়া হয়ে যাবে পাওয়া। সে কত দূর?…

ছুটছে ছিপ উজান ঠেলে। সবারই দৃষ্টি সামনের সুদূরে। মাঝিরা তারস্বরে গেয়ে উঠলো—

হর হর মহাদেব,
হর হর মহাদেব,
হর হর মহাদেব।*

---

* পেঁড়োগড়ের অনতিদূরে রাণী ভবশংকরীর জন্মস্থান আজও দেখা যাবে, দেখা যাবে কাছেই জয়দুর্গার মূর্তি ও রাণীর সেই দেবদত্ত তরবারীর ভগ্নাবশেষ। মাটিন কোম্পানীর স্টেশন আটপুর থেকে দু' ক্রোশ দূরে রাজবল্লভীর মন্দির, যেখানে ভবশংকরী রাজা রত্নারায়ণকে পতিত্বে বরণ করলেন। গড়ভবানীপুরের গড় দেখা যাবে আজও। কাটাকড়ার রত্নারায়ণ-শিবমন্দির ও জলাশয় এই। বনের মধ্যে মাটির তলে ছাউনাপুরের দুর্গ; অদূরে ভবানী-মন্দির, রাজ্ঞাধিনীর গড়! বিস্মৃতির ধূলায় চাপা প'ড়ে আছে এক মহান্ অতীতের মূল্যবান ইতিহাস।

বাংলা রঙ্গালয়ের নব-রূপায়ণ

(৩)

নবযুগের প্রথম আলো

[১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ]

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

এই বৎসরেই বাংলা রঙ্গালয়ের অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার পাই।

প্রায় তেতাল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। সাধারণ রঙ্গালয়ে তখন যে সকল নাটক অভিনীত হ'ত তাদের আদর্শ ছিল পুরাতন,নূতন আদর্শে নাটক রচনা করার প্রয়াই ওঠেনি তখনও পর্যন্ত। কেউ সে-রকম নাটক লিখলেও রঙ্গালয় তা গ্রহণ করত না। আর নূতন আদর্শটা যে কি তা নিয়েও কেউ মাথা ঘামায় নি। হাতে অন্য কাজ ছিল না। একখানি দুই অঙ্কে বিতরু হাস্যনাট্য লিখে ফেললুম এবং তার নাম রাখলুম "প্রেমের প্রেমারা"। রচনাটি স্বনী সাহিত্যিক বন্ধুবর স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে পাঠ করতে দিলুম। তাঁর ভালো লাগল এবং তিনি সেই পাণ্ডুলিপি অর্পণ করলেন আমার আর এক বন্ধুর—অর্থাৎ শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের হাতে, কারণ-থিয়েটারের কর্তাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। সৌরীন্দ্রমোহন সেই পাণ্ডুলিপি নির্বাক থিয়েটারে-দাখিল করলেন।

তখনকার দর্শকদের একটি বাঁধা অভ্যাস ছিল। 'বহুরূপে সমাগছে' না করলে তাঁদের মন খুঁত খুঁত করত—অর্থাৎ বড় বড় পঞ্চাঙ্ক নাটকের গুরুভার আবর্তে ঘাবড়ুল্ খাবার পরে তাঁরা হাসিখুশিভরা ছোট ছোট পালা নিয়ে খানিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চাইতেন।

হিসাব নিলে দেখা যাবে, বাংলা রঙ্গালয়ের পুরাতন যুগে এই শ্রেণীর অসংখ্য ছোট ছোট হাসির পালা নাট্যসাহিত্যের এক বিশেষ অঙ্গকে রীতিমত পরিপুষ্ট ক'রে তুলেছে। মাইকেল মধুসূদন, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল মিত্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি আগেকার শীর্ষস্থানীয় নাট্যকারদের কেউই কৌতুক নাট্যরচনায় বিমুখ হন নি। প্রধানতঃ কৌতুকনাট্যের উপরেই নিজের খ্যাতির ভিত্তিস্থাপন করেছেন অমৃতলাল বসু। অভিনেতা হিসাবে তিনি গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতির সমকক্ষ ছিলেন না।

এমন কি সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে থেকেও রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই শ্রেণীর বহু রচনার দ্বারা বাংলা নাট্যসাহিত্যের সৌষ্ঠববৃদ্ধি করেছেন। তাঁর কয়েকখানি কৌতুকনাট্য হাস্যরসের জোগান দেবার জন্যে সাধারণ রঙ্গালয়ের আসরেও এসে দেখা দিয়েছে—যেমন 'চিরকুমার সভা' 'গোরক্ষা' 'বশীকরণ' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রভৃতি।

বাঙ্গালী যে এখনো হাসতে ভোলে নি সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু হাসি ভুলিয়ে বাঙ্গালীর মুখ গোমড়া ক'রে তোলবার জন্যে অতি আধুনিক নাট্য-পরিচালকদের প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি নেই। এখন আর হাসির পালা রচিত বা অভিনীত হয় না। বোধ করি শেষ হাস্যনাট্যের অভিনয় দেখেছিলুম অধুনালুপ্ত নাট্য-নিকেতনে—পালাটি হচ্ছে শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা রচিত 'বিপ্লব'।

আর একটি উল্লেখ্য বিষয় মনে হচ্ছে। কেবল উল্লেখ্য নয়, বিস্ময়জনক। পুরাতন যুগের ছোট-বড় নট-নটীরা জাতি ভাতি—বিশেষ ক'রে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক—নাটকে ভূমিকা পেলেই তাঁদের মুখে ফুটত কৃত্রিম সুর এবং দেহ প্রকাশ করত অস্বাভাবিক ভাবভঙ্গী। কিন্তু কৌতুকনাট্য দেখা দিলেই তাঁরা হয়ে পড়তেন একেবারে সহজ মানুষ এবং রীতিমত উচ্চশ্রেণীর ও একান্ত স্বাভাবিক অভিনয়ের দ্বারা প্রেক্ষাগারকে হাস্যরোলে মুখরিত ক'রে তুলতেন। হাস্যাভিনয়ে সেকালের কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাধুবাবু, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী, অহীন্দ্র বে, কার্তিকচন্দ্র বে ও হাঁদু বাবু প্রভৃতি শিল্পীর উপরে যেতে পারেন, অতি আধুনিক যুগের কোন অভিনেতাই সে প্রমাণ দাখিল করতে পারবেন ব'লে মনে করি না। গম্ভীর ও করুণ ভূমিকায় প্রখ্যাত ধানীবাবুও কয়েকটি হাস্যরসাপ্লুত ভূমিকায় অতুলনীয় অভিনয় ক'রে গিয়েছেন।

সেকালের বড়দিনে প্রত্যেক রঙ্গালয়েই এক-একখানি ছোট হাসির পালা খুলত। অবশ্য বড় পঞ্চাঙ্ক নাটক সাঙ্গ হলেই শুরু হ'ত হাসির পালা। অনেক সময়ে এও দেখা গিয়েছে, বড় বড় ঝিমিয়ে-পড়া নাটকেরও পরমায়ু বাড়িয়ে দিয়েছে ওই সব ছোট ছোট হাসির পালা। ও-গুলির মধ্যে অধিকতর বিখ্যাত হয়ে আছে মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীক বাবু', অমৃতলালের 'রাজ বাহাদুর', বৈকুণ্ঠনাথ বসুর 'নাটাবিকার', গিরিশচন্দ্রের 'হ্যায়সা-কা-ত্যায়সা', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বাবা ও মিষি', ও দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম', ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেলোর কীর্তি' প্রভৃতি।

এক বড়দিনেই মিনার্ভা থিয়েটার আমার 'প্রেমের প্রেমারা' খোলবার ব্যবস্থা করলে। আমি তখন বায়ু পরিবর্তনের জন্যে দেওঘরে। সৌরীন্দ্রমোহনের পত্রে আমার হাস্যনাট্যের অভিনয়ের কথা জানতে পারলুম এবং মণিলালের আহ্বানে কলকাতায় এসে শুনলুম মহলা আরম্ভ হবে অবিলম্বে।

মণিলালের মুখে আরো শুনলুম, আমার রচনাটি পাঠ করবার সময়ে ঘটনাক্রমে অমৃতলাল বসুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং পাঠের পর বলেন,—"মণিলাল, তোমার বন্ধু থিয়েটারের বাইরের লোক হয়েও এমন মঞ্চাভিনয়ের উপযোগী নাটক লিখলে কেমন ক'রে? আমি খুশি হয়েছি। স্থির করেছি আমি নিজেই নাটকের মহলার ভার গ্রহণ করব।" সে সময়ে মিনার্ভা সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং স্বেচ্ছায় নিঃস্বার্থ ভাবে তিনি মহলার ভার গ্রহণ করবেন শুনে কেবল আমি নই, রঙ্গালয়ের অন্যান্য সকলেও অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

প্রথম দিনেই থিয়েটারের অন্দরমহলে ঢুকে একটা অভাবিত, মৃদু ধাক্কা পেয়ে মনটা সচকিত হয়ে উঠল।

তখনও কথাবার্তার মহলা শুরু হয় নি, চলছিল নাচের মহলা। নৃত্যশিক্ষক একদল মেয়েকে নাচ শেখাচ্ছেন পেন্সিল আস্ফালন করতে করতে এবং তাঁর মুখ দিয়ে নির্গত হচ্ছে অনর্গল কটু ও অশ্রব্য ভাষা।

তারপর আরো কোন কোন বিখ্যাত ও অখ্যাত অভিনেতাকে প্রকাশ্য ভাবে অসংকোচে অশ্লীল ভাষায় কথা কইতে শুনলুম। দেখলুম এ হচ্ছে থিয়েটারের চলতি রীতি।

তার কিছুকাল পরে মহলার সময়ে চুনীলাল দেব ও অপরেশচন্দ্রের মুখেও মাঝে মাঝে যে সব ভাষা শুনেছি তাও শ্লীল ব'লে গ্রহণ করা চলে না। হয়তো পুরাতন যুগে সাধারণ থিয়েটারি রীতিই ছিল এইরকম।

রীতি বদলে যায় শিশিরকুমারের আবির্ভাবের পর। তাঁর রঙ্গালয়ে কুরুচি এবং অশ্লীল ভাষাও ব্যবহার একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। উপরন্তু নর্তকীদের নাচ শেখাবার সময়ে নৃত্য শিক্ষককে বেত্রদণ্ড ব্যবহার করতে হ'ত না। তারপর অন্যান্য রঙ্গালয়েও ওইরকম ভদ্র রীতি চলতি হয়।

যাক্ এ প্রসঙ্গ। অমৃতলাল বসু মহলা দিতে বসলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে বললুম,—"আমার বাবাকে আপনি চেনেন। আপনি নিজের হাতে লিখে যে সব গ্রন্থখন বাবাকে উপহার দিয়েছিলেন বাবার বইয়ের আলমারিতে আমি তা দেখেছি।"

অমৃতলাল কৌতূহলী হয়ে বললেন,—"তাই নাকি? আপনার বাবার নাম কি?"

—"শ্রীরাধিকানাথ রায়।"

আলবোলার নল টানতে টানতে অমৃতলাল কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তারপর বললেন,—"অনেকদিনের কথা কিনা, প্রথমটা স্মরণ করতে পারছিলুম না। এইবার মনে পড়েছে। তাঁর বই পড়ার বাতিক ছিল। শেক্সপিয়ার নাটক নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে কয়েকবার আলোচনা করেছিলেন। তাহ'লে দেখছি আপনি তো আমার বন্ধুপুত্র।"

অমৃতলাল যখন আসতেন, তার সঙ্গে সঙ্গে আসত আর একটি অপরিত্যাজ্য বস্তু—তাঁর ওই প্রিয় আলবোলাটি। ওরই নল হাতে ধ'রে বা মুখে দিয়ে তিনি মহলা পরিচালনা করতেন।

গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখরের মহলার কথা পুস্তকে পাঠ করেছিলুম। এও শুনেছিলুম স্টার থিয়েটারে থাকতে গিরিশচন্দ্র নিজেই অনেক সময়ে অমৃতলালের উপরে মহলা চালাবার ভার অর্পণ করতেন। সেইজন্যে অমৃতলালের মহলা দেওয়ার পদ্ধতি দেখবার জন্যে মনের মধ্যে আগ্রহও ছিল যথেষ্ট।

তাঁর পদ্ধতি দেখলুম। তিনি প্রথমে প্রত্যেক নট ও নটীকে তাঁদের গৃহীত ভূমিকার অর্থ ও বিশেষত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তারপর মহলা আরম্ভ করতেন। কে কোথায় দাঁড়াবে, কে কি ভাবে কথা বলবে, কে কেমন ক'রে প্রস্থান করবে, এ-সব বিষয়েও তাঁর দৃষ্টি থাকত সতর্ক। নটনটীদের উচ্চারণ ও ভাবভঙ্গিও তিনি সংশোধন ক'রে দিতে ভুলতেন না।

একদিন অভিনেত্রী চারুশীলা গান ধরেছেন। গানের এক জায়গায় ছিল—"আমার হৃদয়দোলা দোদুল দোলে" প্রভৃতি।

অমৃতলাল জিজ্ঞাসা করলেন,—"চারু, কেমন ক'রে হৃদয়দোলা দোদুল দুলবে বল দেখি?'

চারুশীলা হাত দিয়ে ওষ্ঠাধরের লজ্জাভরা হাসি চাপতে চাপতে বললেন,—"আজ্ঞে, আমি কেমন ক'রে বলব? আপনি রয়েছেন, দেখিয়ে দিন না।"

দ্বিরুক্তি না ক'রে বৃদ্ধ অমৃতলাল সোজা হয়ে বসলেন, তারপর দেহকে তালে তালে ভঙ্গিভরে ঈষৎ দুলিয়ে বললেন,—"চারু, এইবারে তুমি দেখাও দেখি।"

এর কিছুকাল পরেই মিনার্ভা থিয়েটারে অমৃতলালের শেষ নাটক 'যাজ্ঞসেনী' মঞ্চস্থ হ'ল। সেই সময়ে প্রতি রাত্রেই অমৃতলালের পাশে আসন গ্রহণ ক'রে আমি তাঁর মহলা দেওয়ার বিশেষত্ব লক্ষ্য করবার সুযোগ পেলুম এবং ফলে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনেরও সৌভাগ্য অর্জন করলুম।

তখন 'মিনার্ভা'য়, 'স্টারে', ও 'মনোমোহনে' যে সব নাটক চলছিল, তাদের নাম হচ্ছে 'মিলর

কুমারী' ও 'কিন্নরী', 'উর্বশী', 'বুদ্ধুখো সাপ', ও 'বৈবাহিক' 'বেহুলা দেবী' ও 'পরদেশী' প্রভৃতি। এর মধ্যে নাটকহিসাবে উল্লেখযোগ্য না হ'লেও দৃশ্যপট ও অভিনয়ের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল একমাত্র 'মিসরকুমারী'। নবযুগের পরেও তার লোকপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল এবং অভিনয়ের সুযোগ ছিল ব'লে শিশিরকুমার, নির্মলেন্দু, ও অহীন্দ্র চৌধুরীর মত শিল্পীরাও তার বিভিন্ন ভূমিকায় রূপায়ণ করেছেন।

কিন্তু প্রাচীন কবির ভাষায়—"সোনা রূপা নহে বাপা, এ বেটা পিতল।" 'মিসরকুমারী' মৌলিক নাটক নয়। গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনের পরে বাংলা দেশের অধিকাংশ নাট্যাভিনয়ই মনে আনন্দের ছাপ রেখে যেতে পারে নি, তার কারণ, এর আগেই আমাদের চোখের ঠুলি খুলে দিয়েছিলেন এক বিশ্ববরেণ্য পৌরাণিক নাট্যশিল্পী।

পেশাদার রঙ্গালয় আজ যে-সব প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার নাম নিয়ে গর্বপ্রকাশ করে তাঁদের কারুরই হাতে খড়ি হয় নি সাধারণ নাট্যশালায়। গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু ও মহেন্দ্র লাল বসু প্রভৃতি অতি প্রখ্যাত অভিনেতাদের প্রত্যেকেই প্রথমে আত্মপ্রকাশ ও যশ অর্জন করেছিলেন পৌরাণিক নাট্যজগতেই।

[এইখানে একটা কথা বলে রাখি। এদেশে শীর্ষস্থানীয় অভিনেতা ব'লে যাঁদের নাম করা হ'ল তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ চারজন যে সাহিত্য রসিক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল বসুর কথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু অনেকেই বোধ করি জানেন না যে, অর্ধেন্দুশেখর ও হেমেন্দ্রলাল বসুরও রচনাশক্তি ছিল। কোন্ রঙ্গালয়ে ঠিক মনে পড়ছে না, অর্ধেন্দুশেখরের একটি ছোট হাসির পালা মঞ্চস্থ হয়েছিল। কোন কেতাবে এ কথা পড়েছি তাও স্মরণে আসছে না। তবে তাঁর দ্বারা কয়েকটি চুটকী নাটকীয় রচনা আজও খুঁজলে পাওয়া যায়। 'নাচঘরে'ও তাঁর একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের প্রথম যুগেই (১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল মহেন্দ্রলাল বসু রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক 'পদ্মিনী' বা 'চিতোর রাজসতী'। নবযুগের শিশিরকুমার নিজে কোন নাটক রচনা করেন নি বটে, কিন্তু সাহিত্যরসজ্ঞানে কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিককেও তাঁর উপরে টেক্কা মারতে পারতেন না। সকলকেই যে সাহিত্যিক হতে হবে, এমন অসম্ভব কথা আমি বলছি না, তবে সাহিত্যজ্ঞান অর্জন না করে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে নাম কেনা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়।]

সাধারণ বাংলা রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হবার কিছু কাল আগে থেকে এখানকার পৌরাণিক নাট্যজগতে এসেছিল যেন নাট্যরসের পরিপূর্ণ জোয়ার। বিভিন্ন ধনী নাট্যরসিকের আবাসেই দেখা যায় বিভিন্ন রঙ্গালয়। সেই সব নাট্যাভিনয়ের আসরে হাজিরা দিয়েই যে গিরিশচন্দ্র প্রমুখ অভিনেতাদের চিত্তক্ষেত্রে নাট্যবীজ উপ্ত হয়, এ কথাটা অনায়াসেই অনুমান করা যেতে পারে।

সেকালকার পৌরাণিক নাট্যশালাগুলির মধ্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রঙ্গালয় যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং স্থায়িত্বের দিক দিয়েও সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করতে পারে।

সন্ত স্বর্গগত অধ্যাপক এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন: "নবনাটক-এর অভিনয় দেখে অর্ধেন্দুশেখর বলেছিলেন—অভিনয় সম্বন্ধে যা কিছু দেখবার, শোনবার ও জানবার বাকি ছিল এই অভিনয় দেখে তা সম্পূর্ণ হ'ল।"

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'নবনাটক' নয় বার অভিনীত হবার পর ঠাকুরবাড়ির রঙ্গালয় উঠে যায়। কিন্তু ওই বৎসরেরই শেষের দিকে যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা (রবীন্দ্রনাথের ভগ্নীপতি) হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

জোড়াসাঁকো কয়লাঘাটার বাড়িতে 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের অভিনয়ে অর্ধেন্দুশেখর একাই তিনটি বিভিন্ন ভূমিকায় সর্বপ্রথমে নাট্যজগতে আবির্ভূত হন। সেই অভিনয়ের সময়েই প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের আসনে বসে সকলে তাঁকে নটশ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করেন এবং তারই ফলে বাগবাজারের পথের সম্প্রদায়ে গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে তার যোগদান ও 'সধবার একাদশী'তে জীবনচন্দ্রের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ। আবার কয়লাঘাটার ওই প্রতিষ্ঠানেই আদি যুগের প্রখ্যাত মকাদাক্ষ দর্শবাস সুর মকশিল্পে সর্বপ্রথমে নিজের শক্তির পরিচয় দেন।

ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা-সূত্রে সংশ্লিষ্ট স্বর্গীয় যজ্ঞেশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন: "ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক অভিনয় মজলিসে একবার কবিকে খ্যাতনামা অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির সহিত রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করিতে হয়। মুস্তাফি মহাশয়ের অঙ্গভঙ্গি ও স্বরের কারুকার্য এত সূক্ষ্ম ও প্রচুর ছিল যে, সহযোগী অভিনেতাদের পক্ষে নিজ ভূমিকায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ রাখা কঠিন হইত। আমরা কবির নিজমুখে শুনিয়াছি যে, অচঞ্চা স্টেজ-ফ্রী এক্টরের সহিত মঞ্চে নামিতে তাঁহাকে সদা সতর্ক থাকিতে হইত এবং তাহাতে তাঁহার নিজের অভিনয়-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত হইত।"

বাংলাদেশের সাধারণ অভিনেতাদের সঙ্গে যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির শিল্পীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এটা দেখাবার জন্যই উপরের কথাগুলি বলা হ'ল।

ঠাকুরবাড়িতে দুই শ্রেণীর অভিনয় হ'ত—প্রকাশ্য ও পারিবারিক। এবং ওই সব নাট্যানুষ্ঠানের মধ্যেই অভিনেতারূপে সর্বপ্রথম দেখা দেন রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ীর রঙ্গালয় আদিযুগে আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের সামনে একটা বিশেষ আদর্শ তুলে ধরে এবং পরের যুগে এখানকার দুর্গত পেশাদার নাট্যশালাকে কিছুমাত্র আমল না দিয়েই যে অপূর্ব ও অভাবিত প্রযোজনৈপুণ্য এবং যুগোপযোগী নাটক, গান ও সুরের ঐশ্বর্য এনে আমাদের নাট্যাভিনয়কে বিচিত্র সৌন্দর্যে মণ্ডিত ক'রে তোলে, তা বর্ণনা ক'রে ঠিকমত বোঝানো যাবে না। নূতনের সেই জয়যাত্রা প্রথম আরম্ভ হয় ১৩১৬ সালে—পেশাদাররা যখন শুরু করেছে 'যোগল-পাঠান' প্রভৃতি কুখ্যাত কিন্তু হাস্যকর অথচ গভীর পালা।

রবীন্দ্রনাথ কেবল আমাদের কাব্যে, কথাসাহিত্যে ও চিত্রকলায় নূতনকে আমন্ত্রণ ক'রে আনেন নি, বাংলা নাট্যজগতেও তিনি নাটকের, গানের, সুরের ও নাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন এবং স্বয়ং প্রযোগ কর্তার আসন গ্রহণ ক'রে সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যথার্থ রসবেত্তা প্রযোজক না থাকলে কোন নাট্যাভিনয়ই শিল্পপদবাচ্য হ'তে পারে না।

ষোলো বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রথম যখন ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক রঙ্গালয়ে অভিনেতা রূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন, তখন সেখানে প্রযোগশিল্পীর কর্তব্যপালন করতেন তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখন অভিনেয় নাটকের মূল সুর কেমন ভাবে বাঁধা হ'ত তার কোনই লিখিত প্রমাণপত্র পাওয়া যায় নি। সে যুগে আলোকপাত কৌশল দেখাবার উপযোগী সুব্যবস্থা যে ছিল না, এটুকু সহজেই অনুমান করা যায়। সাজ-পোশাকের বিবরণও পাওয়া যায় না। আর দৃশ্যপটের দিক দিয়েও দেখি, তখনকার অন্যান্য শৌখিন নাট্যাভিনয়ের মত ঠাকুরবাড়ির রঙ্গালয়েও প্রযোগকর্তাও নকল ও অস্বাভাবিকতার ভক্ত ছিলেন। এর প্রমাণ স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই উক্তি: "দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বসন্তের সীনখানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং

তাহাতে ভাবস্থ জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত।"

সঙ্গীতবিভাগে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। সেখানে গানের এবং অন্যান্য বাজনার সঙ্গে হারমোনিয়মও বাজানো হ'ত। শোনা যায় এদেশে ও-যন্ত্রটিকে প্রথম আমদানি করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথই। তাহ'লে বলতে হয়, এবিষয়েও বাংলাদেশের পেশাদার নাট্যশালা ঠাকুরবাড়ির রঙ্গালয়ের কাছে ঋণী, কারণ এখানে গানের সঙ্গে ব্যবহার করবার জন্যে হারমোনিয়াম আজ পর্যন্ত প্রধান বাদ্যযন্ত্র বলেই গণ্য হয়ে আসছে। সেই সঙ্গে এখানে এ কথাটাও উল্লেখ্য যে, পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব নাট্যানুষ্ঠানে ওই বাদ্যযন্ত্রটির প্রতি নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন এবং তাঁরই নির্দেশ অনুসারে ভারতীয় বেতার সঙ্গীত আসরেও হারমোনিয়াম আর ব্যবহার করা হয় না।

কুড়ি বৎসর বয়সে (১৮৮১ খ্রীঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির রঙ্গমঞ্চে স্বরচিত 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় অবতীর্ণ হয়ে অভিনয়নৈপুণ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর গুরুদাস প্রমুখ মনস্বীগণকে চমৎকৃত করেন। তাঁর গীতিনাট্যের মাধুর্যও তাঁরা উপভোগ করেছিলেন—যদিও তখনো পর্যন্ত তিনি তাঁর কাব্যগুরু বিহারীলালের প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে পারেন নি।

স্বাভাবিক অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের রঙ্গাবতরণ যে অনুকূল হয়েছিল, সমসাময়িক সুধীবৃন্দের ও কাগজপত্রের অকুণ্ঠ প্রশস্তিই সেটা প্রমাণিত করে। কিন্তু প্রযোজনানৈপুণ্যের দিক দিয়ে সেই নাট্যাভিনয় কতখানি উৎরে গিয়েছিল সে সম্বন্ধে জোর ক'রে কিছুই বলা যায় না। যেটুকু বর্ণনা পাই, তা খুব আশাপ্রদ নয়, কারণ সে অনুষ্ঠানেও আধিক্য হয়েছিল পূর্বোক্ত নকল ও পঙ্গু বাস্তবতা। সে অভিনয়ের একাধিক আলোকচিত্র দেখলে মনে হবে, সাজ-পোশাকেও আদিকবি বাল্মীকির যুগকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হয় নি।

কিন্তু এজন্যে অবাক হবার কিছুই নেই। প্রথম স্বাধীনতা পেয়েই কেউ কোনদিন সর্বাঙ্গীন দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না—শিল্পী পদে পদে ক্রমশঃ অগ্রসর হন পরিণতির দিকে।

আর রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র কুড়ি বৎসর, এটুকু ভুললেও চলবে না। তাঁর ধ্যানধারণা তখনো সখী ছাড়িয়ে বেশীদূর এগুতে পারে নি। যে মননশক্তি পরে 'রাজা,' 'ডাকঘর' ও 'রক্তকরবী' প্রভৃতি ভাবগম্ভীর অপূর্ব নাটক সৃষ্টি করেছিল, তখনও তিনি তার অধিকারী হন নি। অর্থাৎ তখনো তিনি নাট্যকলার ক্ষেত্রে যথার্থ নিজস্বকে আবিষ্কার করতে পারেন নি। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দেও তিনি যে সমকালীন যুগধর্মকে এড়াতে পারেন নি, তার প্রমাণ দিলেন 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন' নাটক রচনা ক'রে।

সাধারণ বাংলা নাট্যশালা যে 'রাজা ও রাণী'র দিকে সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হয়েছিল তার সাধারণত্বই সেই প্রমাণ দেয়—যদিও কবিত্বের দিক দিয়ে ওই নাটক ছিল অসাধারণ ও অতুলনীয়। দর্শকরাও সাগ্রহে 'রাজা ও রাণী'কে গ্রহণ করেছিল, বাল্যকালে আমরা তার গান শুনেছি লোকের মুখে মুখে।

প্রতিমা বিসর্জনের যুগ না থাকলে 'বিসর্জন'ও সাধারণ রঙ্গালয়ে সাদরে গৃহীত হ'ত এ কথা শুনেছি আমি অমৃতলাল বসুর মুখ থেকেই। কিন্তু সেই সময় থেকেই সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক আরম্ভ। কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের লোকপ্রিয়তা দেখে তাঁর নাটকের অভাবে তাঁর

উপন্যাসগুলিরই নাট্য-রূপ দিতে লাগলেন এবং এইভাবে রচিত 'বউঠাকুরাণীর হাট' প্রেক্ষাগৃহকে রাতের পর রাত পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। তারপর 'চোখের বালি' 'ডালিয়া' ও 'মুক্তির উপায়' প্রভৃতিও অবলম্বন ক'রে নাটক-নাটিকা রচিত হয়েছিল। এবং 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'কচ ও দেবযানী' প্রভৃতি খণ্ড নাটিকাও বাদ যায় নি। গিরিশ-যুগের নাট্যপ্রিয় জনসাধারণ ওঁকেও অন্যতম প্রধান নাট্যকার ব'লে মেনে নিয়েছিল।

কিন্তু এই মেনে নেওয়াটা বিশেষরূপে স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল 'চিরকুমার সভা' মঞ্চস্থ হবার পরে। পেশাদার রঙ্গালয়ে এই হচ্ছে প্রথম নাটক, যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সরাসরি যোগ ছিল। কিন্তু এ নাটকও রবীন্দ্রনাথের পুরাতন দিনে রচিত। নূতন দিক দিয়ে নাট্যজীবন শুরু করবার পর রবীন্দ্রনাথের একখানি মাত্র নাটক 'স্টারে'র আসরে দেখা দিয়েছিল—'গৃহপ্রবেশ'। সাধারণ রঙ্গালয়ের জনসাধারণ তাকে দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। ফল, প্রায় ঐতিহাসিকভাবেই 'গৃহপ্রবেশ'এর মৃত্যু। তার কিছুদিন পরে শিশিরকুমারের "নাট্যমন্দির" থেকে জনপ্রিয় 'রাজা ও রাণী'র নূতন রূপ 'তপতী'—যার মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের আত্মগত পরিকল্পনা। ফল, "নাট্যমন্দির"-এর অন্তর্ধান।

পেশাদার বাংলা রঙ্গালয়ের কর্মকর্তা তখনও নূতনকে আমন্ত্রণ করার জন্যে প্রস্তুত হয় নি। আজও হয়েছে কি? বোধ হয়, না। নূতনের ভক্তরা আগেকার চেয়ে বলে কিছু ভারি হয়েছে, এইমাত্র। কিন্তু সেই সংখ্যাবৃদ্ধি সন্তোষজনক নয়। তাদের দ্বারা পেশাদার রঙ্গালয় বেশীদিন আত্মরক্ষা করতে পারে না।

কিন্তু এ সব তো নিছক নাটকের কথা। 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন'এর পর রবীন্দ্রনাথ বহুকাল গম্ভীর রসের নূতন পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন নি। ১৩০৩ সালে তিনি লেখেন 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নামে কৌতুক নাটিকা—সেই হচ্ছে পুরাতন ধারায় রচিত তাঁর শেষ নাটক। তারপর প্রায় একযুগ তিনি নাট্যজগৎ থেকে স'রে এসে সাহিত্য-জগতেই বিচরণ করেন। নূতন নাটকও লেখেন নি, অভিনয়ও করেন নি।

তারপর যে অভিনব রূপে অভাবিত ভাবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন, আমরা সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলুম। বাংলাদেশ লাভ করলে কেবল নূতন যুগের নাটক নয়,—সেই সঙ্গে যুগোপযোগী প্রযোজনৈপুণ্যও। অন্ধকারের পর্দা সরিয়ে সে এক আশ্চর্য প্রভাতের উদয়। রীতিমত 'রোমান্টিক' ব্যাপার, আমরা কেউই তার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। [আগামী বারে সেই কাহিনীই বলব]।*

---

* অনিবার্য কারণবশতঃ কার্তিক সংখ্যায় লেখাটি প্রকাশিত হয় নি। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। সঃ গঃ

একজন আর কয়েকজন ॥

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

'আয়ুর্বাতি দিনে দিনে।' দিন দিন আয়ু যাচ্ছে। কিন্তু মন? মনটা এক জায়গায় একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে চির তরুণ। দেহের সঙ্গে মনের এক অদ্ভুত পার্থক্যবোধ শুধু একজনের পক্ষেই সম্ভব। তিনি তুমি আমি আর পাঁচজনের মতন সাধারণ নন। তিনি একক। তাঁর সত্তায় দুই পুরুষ। একজন দেহ আর একজন মন।

দেহ বার্ধক্যে প্রপীড়িত—মন আসন্ন মৃত্যুকে মুখামুখি দেখিয়ে বলে,—'ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়।'

দেহকে ঘিরে অনেক উৎকণ্ঠা—বিশেষ করে সেই মানুষের যাঁর দৈহিক জীবনের মূল্যও সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

উপেন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করেন না, এমন নয়। কবি উপেন্দ্রনাথের পর গল্প-লেখক এবং ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে অনেক দিয়েছেন—কালের হিসাবে তা নগণ্য নয়। কিন্তু আর এক উপেন্দ্রনাথ উঠি উঠি করছেন—তার প্রকাশ সমাসন্ন। সেই উপেন্দ্রনাথকে জীবন চর্চায় আর এক ধাপ এগোতে হবে, তাই সত্তর বছরের উপেন্দ্রনাথ সত্বর হয়ে উঠলেন। ঘরে তাঁর দুটি বৈঠকের ব্যবস্থা। আমবৈঠক একতলায় সাধারণ মেলামেশার জন্যে; আর খাস-বৈঠক আম-বৈঠকের ঠিক মাথার উপর, অর্থাৎ দ্বিতলের প্রকোষ্ঠ—সেটি অন্তরঙ্গজনের জন্যে নির্দিষ্ট। দুটি বৈঠক থেকেই রসদ সংগ্রহ করছেন উপেন্দ্রনাথ। আর সেই সঙ্গে নিজেকে আরো ব্যাপ্ত করে তুলছেন।

দেওয়ার সঙ্গে নেওয়ার পালা। 'গ্রহণ করেছ যত তত করেছ আমারে'। উপেন্দ্রনাথের মনোভাব ঠিক তাই।

কল্পনাশ্রয়ী মন নিয়ে ছিলেন এতদিন। গল্প উপন্যাস প্রচুর লিখেছেন। বিভিন্ন চরিত্রের জন্যে বিভিন্ন লোক দেখতে হয়েছে। তার জন্যে অভিজ্ঞতাও প্রচুর সংগ্রহ করেছেন; কিন্তু সেখানে সব মানুষের দরকার নেই। যারা জীবন-সান্নিধ্যে এলো, মিলো কিছু, এবং নিলোও বা কিছু তাদেরও তিনি ফেলতে পারেন না। তাদের প্রতিজনই বেঁচে থাকুক তাঁর সাহিত্য-সৃজনীর মাধ্যমে—এই ইচ্ছা তিনি পোষণ করছিলেন পরিণত বয়সে।

দক্ষিণবঙ্গ পরিক্রমায় বেরুলেন। অবশ্য উপলক্ষ একটা আছে—সেখানকার লাইব্রেরির জন্ম-জয়ন্তী উৎসব; কিন্তু সেখানকার উৎসবের থেকেও তাঁর কাছে বেশি রমণীয় অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা—যিনি নিজে বসে সযত্নে পিঠে খাইয়েছেন।

একটি গ্রাম্য রন্ধন-শালায় অবগুণ্ঠনবতী কয়েকজন রমণী—যাঁরা সাহিত্যের সভার ধারে কাছেও নেই—তাঁরা উপেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন কয়েক মিনিটের মধ্যেই। তাঁদের তিনি আশ্বাস দেন,—'তোমরা থাকবে অন্য এক সাহিত্য সৃষ্টিতে। তোমাদের দেহ, তোমাদের গৃহ, তোমাদের মন নিয়ে স্নিগ্ধ-অন্দর-বৈঠক আমাকে লিখতেই হবে।'

গ্রামের চণ্ডী মণ্ডপের আদরে বৈঠকী-গল্পের আয়োজনে যেমন সমারোহ তেমনি সমারোহ লেগে গেল অন্দর মহলেও।

মাটির অঙ্গন ঘিরে গাঁদা ফুলের মেলা, মাটির দাওয়ায় গ্রাম্য পুরনারীর ভিড়—সেখানেও সভা বসেছে। সভাপতি কনস্টিটিউশন মানেন না, অ্যাজেণ্ডা নেই কিছু দরকার, প্রোগ্রামও নেই—তবু সভা জমজমাট।

সভাপতির মুখে হাসি, পেটে খুশি। সামনে তাঁর নানা সুখাদ্য—পৌষ-পার্বণের পিঠা পায়েস। গল্পের পর গল্প—হাসি আর খুশি।

উপেন্দ্রনাথের নতুন সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস।

হাওড়া জেলায় উলুবেড়িয়ায় চলেছেন উপেন্দ্রনাথ। চিরাচরিত তিনি হচ্ছেন সভাপতি। আমাকেও মর্যাদার আসন দেওয়া হয়েছে। আমি হলাম প্রধান অতিথি। উলুবেড়িয়া স্টেশন থেকে কিছুদূরে একটি স্কুলে সভা ক্ষেত্র।

ট্রেন থেকে নেমে দেখলাম দু'খানি সাইকেল রিকশা। একখানি সাইকেল রিকশা পুষ্প-পল্লবে সুসজ্জিত। আর একখানি সাধারণ। সভাপতি এবং প্রধান অতিথি উঠলেন সেই সুসজ্জিত সাইকেল রিকশায়। সাধারণ সাইকেল রিকশায় উঠলেন সভার আয়োজনকারী কর্তৃপক্ষীয় দু'জন।

সাইকেল রিকশা খুব আস্তে আস্তে চলেছে। আর একদল বাজনা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলেছে।

পথের দুধারে জনতা—অলিন্দে অলিন্দে পুরনারীর দল। ব্যাপার কী? এ যেন কোন শোভাযাত্রা। কীসের সমারোহ। প্রশ্ন করলাম,—'ব্যাপার কী দাদা? বরে আছে তো কোন বর দেখছি না।'

পরিহাসের হাসি হেসে উপেন্দ্রনাথ বললেন,—'জীবনের এই ক্ষোভ মেটাবার জন্যেই বিধাতার এই আশীর্বাদ। বাজনা বাজিয়ে নাগর দোলায় চড়ে রাজকীয় বেশে বিয়ের বর সাজা এখনকার দিনের তো আর হওয়ার নেই।'

আমি প্রতিবাদ জানালাম,—'কেন দাদা, আপনি তো রাজকীয় বেশেই আলো আর ফুল সাজানো গাড়িতে চড়েই বিয়ে করতে গিয়েছিলেন।'

'সে হচ্ছে বিগতদিন।'

সভা হয়েছিল যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ যেমন হয় না তাকে গ্রহণ করে সভাপতি উপেন্দ্রনাথ পুলকিত।

বললেন,—'তোমরা বলো শরীরের কথা। এখন বলতো এই পরিবেশে মন কী বলে?'

বললাম,—'এর ভেতর থেকে রসের রসদ গ্রহণ করতে পারেন যিনি, তিনি মাত্র একজন।'

'এই একজন আর কয়েকজনকে নিয়ে কিছু লেখা যায় না অনিল?'

প্রশ্ন করলাম,—'তার জন্যেই কী এই সব সরঞ্জাম দাদা?'

বললেন,—'আমি যদি না পারি তুমি তো রইলে।'

আমি আছি, কিন্তু উপেন্দ্রনাথ কী সত্যি সত্যিই নেই!

যে কালের অবসান ঘটেছে তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না—'যে আনন্দ আয়োজন সবই ছিল, সে আজ আমাদের শুধু মন কেমন করায়'। এই মন কেমন করার মধ্যে একটা আবেশ আছে, একটা স্পর্শকেও অনুভব করা যায়। এই প্রসঙ্গে একদিন আমাদের কথাবার্তা চলছিল উপেন্দ্রনাথের বৈঠকে।

বললাম,—'দাদা সেই সম্পর্ক অতীতকে বর্তমানে প্রকাশ করুন না কেন!' উপেনদা বললেন,—'হাঁ, সুবলের বিশেষ আগ্রহ উপন্যাসের কাহিনী থেকে কিছুদিন বিরাম নিয়ে নিজের কাহিনী কথা এইবার বলি।'

আমি সায় দিলাম এই কথায়। আগ্রহ প্রকাশ করলাম—'তা হলে শুরু হোক দাদা।' সুবল আনন্দ বাজার পত্রিকার বিশিষ্ট কর্মী সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-রসিক সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় উপেন্দ্রনাথের বৈবাহিক আমাদের অগ্রজপ্রতিম সুবলদা। উপেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র অমলপ্রসাদের সহিত সুবলদার কন্যা শ্রীমতী গোপার বিবাহ হয়েছে। সুবলদা উপেন্দ্রনাথের অনুজ প্রতিম শুধু নন, বিশিষ্ট বন্ধুও।

সুবলদার প্রস্তাবকে কার্যকরী করলেন 'দেশ'-এর সহকারী সম্পাদক বন্ধুবর সাগরময় ঘোষ। দেশ পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হতে লাগলো 'স্মৃতি কথা'—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড।

কবি, গল্প-লেখক এবং ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি 'স্মৃতিকথা এবং 'বিগত দিন'।

'নদীর জলে জোয়ার ভাঁটা আছে, জোয়ারের পর ভাঁটা আসে, ভাঁটার পর জোয়ার। জীবন নদীতে কিন্তু সেরূপ জোয়ার ভাঁটা নেই। উপেন্দ্রনাথ জীবনের দ্রুতগতায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন 'বিগত দিনে'।' একটি ঘটনাকেও প্রকাশ করেছেন এই প্রসঙ্গে—'বেলা তখন দুটো হবে, ডালহৌসিগামী বাসে আরোহণ ক'রে চৌরঙ্গি দিয়ে চলেছি, প্রয়োজনবশত: আমাকে মিড্‌লটন স্ট্রীটের মোড়ে নামতে হবে। মোড়ের কাছাকাছি পৌঁছুতেই সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার অভিমুখে অগ্রসর হই। দরজায় পৌঁছে একবার সামান্য একটু ঘটি বাজাব, তারপর বাসের গতি ঈষৎ মন্দ হ'লেই টপ করে পড়ব নেমে। তার পূর্বেই কিন্তু বেল বেজে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে কণ্ডাক্টার হাঁক দেয়,—"একদম বাঁধকে, বুড্‌ঢা বাবু উৎরেগা।" উপেন্দ্রনাথ আশ্চর্য হলেন,—'বুড্‌ঢা বাবুটি কে?'

"উৎরিয়ে উৎরিয়ে বড়াবাবু, জলদি উৎরিয়ে।"

'ও সর্বনাশ। বুড্‌ঢাবাবু তা'হলে অপর কেউ নয়—আমিই।'

এটি বাইরের রূপ, অন্তর তা নয়। বৃদ্ধত্ব শুধু দেহে, মনে নয়। উপেন্দ্রনাথ নিজেই বলেন,—'ইহ বাহ্য, অন্তর দেখ। তা যদি দেখ, তা'হলে দেখবে পাংশু দেহের মধ্যে সবুজ মনের শ্যামলতা।'

এই সবুজ মনের শ্যামলতায় তিনি সাহিত্যের প্রাঙ্গণে সবুজ ফসল ফলাবার নূতন উপকরণ সংগ্রহ করলেন।

ক্রিং, ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠলো।

'হ্যালো, আমি উপীন।'

'কে? সৌরেন বাবু!'

টেলিফোনের এ প্রান্ত বালিগঞ্জ প্লেসের উপেন্দ্রনাথের দ্বিতল কক্ষ। অপর প্রান্ত ভবানীপুর এলগিন রোডের সুরম্য গৃহের রম্য কক্ষে রসিক সৌরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপেন্দ্রনাথের খুশি ভরা মন, বৈঠক সাজাও অমিল! সৌরেনবাবু আসছেন।'

গল্প-ভারতীর অন্যতম পরিচালক শ্রীসত্যেন রায় তাগিদ দিচ্ছিলেন সম্পাদক উপেন্দ্রনাথকে—নতুন কোন লেখা, দাদা!

সেই নূতন লেখা শুরু হয়েছে 'শেষ-বৈঠক।' সৌরেনবাবু তার বিদগ্ধ পাঠক। শেষ-বৈঠক

শুরু হয়েছিল উপেন্দ্র অনুরাগী কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুকে নিয়ে। বৈঠকের শনি নয় বৃহস্পতির তুঙ্গে এলেন বিষ্ণু নাগ। বিষ্ণু নাগকে নিয়ে বৈঠক জমজমাট হয়ে রইল। প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারী'র পর বাংলা সাহিত্যে 'শেষ বৈঠক' প্রথম শ্রেণীর বৈঠকী সাহিত্য। সৌম্যেন ঠাকুর শেষ বৈঠকে সশরীরে ছিলেন না—ছিলেন অন্তরীক্ষে—ছিলেন উপেন্দ্রনাথের মনে প্রধান পাঠক রূপে।

ভাগলপুরের পর্বে শেষ-বৈঠক শেষ হল সেইখানেই।

গভীর রাত্রে এক্সপ্রেস ট্রেন। বর্ষার ঘন মেঘ আকাশে। ভাগলপুরের স্টেশন ওয়েটিং রুমে আমরা তিনজন। উপেন্দ্রনাথ, বনফুল এবং আমি। ট্রেন লেট। উপেন্দ্রনাথের মনে তখন দুটি ভাবের খেলা। পিছনে ফেলে আসা ভাগলপুর। তাঁর প্রিয় সেই ঘরখানি—যে ঘরে শশিনাথের সৃষ্টি। তার পূর্বে বাঙ্গালীটোলায় তাঁদের পৈত্রিক বাড়ি—গঙ্গার রহস্য ধারা যার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। শ্রীকান্তের সেই দেউড়ি। সেই দেউড়িতে এসে কিছুকাল স্তব্ধ হয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ। গঙ্গার ঘাটে যেখানে ইন্দ্রনাথের নৌকা বাঁধা থাকত সেইখানে দাঁড়িয়ে বললেন,—'শরতের সঙ্গে এইখানেই আমার প্রকৃত লেখার শুরু।'

সেইখান থেকে স্মৃতিকথার পত্তন তারপর তার ক্রমবিকাশ। শেষ বৈঠকও শেষ হল আষাঢ়পুরের বাড়ির ঘরটিকে আশ্রয় করে।

'বিগত দিনের আকাশের মেঘের চিন্তা মনের মধ্যে উদিত হলে সাধারণতঃ আমাদের মনে পড়ে কোনও এক শরৎ অপরাহ্নে দেখা পূবগগনে বিলম্বিত লঘু মেঘখণ্ডের কথা, যার ধারে ধারে তামল পাড়ের শোভা, আর বক্ষের উপর বেদনা রক্তের উত্তরীয়।'

সেই বেদনা রক্তের উত্তরীয়; সূর্যাস্তের রং—উত্তর রাগের পূর্বাভাষ। বৈঠক জমজমাট। বয়োবৃদ্ধ উপেন্দ্রনাথের হাস্য উচ্ছলিত। নিত্যই সভা সমিতি ঢাক ডাক। দীর্ঘদিনের সাহিত্যিক জীবনের স্বীকৃতি-লাভ করেছেন নতুন ভাবে 'স্মৃতি কথা' 'বিগত দিন' এবং 'শেষ বৈঠকে'র লেখক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন,—'বৈঠক শেষ হলে চলবে না উপেনবাবু।'

উপেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন,—'শেষটাই যে শুরু নয় এমন কথাই বা বলবে কে?'

সৌম্যেনবাবু উৎফুল্ল হলেন,—'বাঁচলাম উপেনবাবু, শেষ বৈঠক তা'হলে শেষ হয় নি। আর 'শেষ বৈঠক'ই শেষের বৈঠক নয়।'

উপেন্দ্রনাথ রহস্য প্রকাশ করলেন,—'লাস্ট ট্রেনের পরও তো ফার্স্ট ট্রেন আবার আসে। 'শেষের পরে নূতনের আরম্ভ,—এতো আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মোড়ে সর্বদা বহু বিষয়েই দেখতে পাই।'

'তা'হলে শেষ বৈঠকের পর নতুন বৈঠক কী হবে?'

সৌম্যেন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে উপেন্দ্রনাথ বললেন,'—তার নামকরণের ভার আপনার ওপরই দিলাম।'

'বেশ।' সানন্দে সৌম্যেন্দ্রনাথ স্বীকৃতি জানালেন।

'কিন্তু কানা ছেলের নাম যদি পদ্মলোচন হয়?'

'আমরা তা'হলে তার দুটিটুকু বাদ দিয়ে শুধু সৃষ্টি নিয়েই মশগুল থাকবো।'

'অর্থাৎ নামের বদলে নরুণ।'

'তাই বা মন্দ কী? পোলাও কালিয়ার ভোজ তো সমারোহের; কিন্তু রোজকার সুক্তনির আস্বাদ তো ফেলতেই বলেছি।'

কলকাতা পাথুরিয়া ঘাটা স্ট্রীটে কবি রবেন্দ্র মল্লিক আয়োজিত 'সাহিত্য তীর্থে'র উপেন্দ্র-সম্বর্ধনা সভায় রসিক সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপেন্দ্র-সাহিত্য বিশ্লেষণে ঠিক এই কথাই বলেছিলেন কিছুদিন পূর্বে,—'সাহিত্যের ভোজে নানা ভোজ্য আছে, কিন্তু সুক্তনির যে নিরন্ন ঘরোয়ানা স্বাদ সেই স্বাদ আজকের সাহিত্যে বিরল। উপেন্দ্রনাথ আজো আমাদের সেই সুক্তনির আস্বাদনকে ভুলতে দেন নি, তার জন্যে তাঁকে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ের অভিনন্দন জানাই।'

সমাজ ও সাহিত্য।

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

সমাজের সহিত সাহিত্যের যোগ অতি নিবিড়। যে সময়ে যে সমাজ যে পরিবেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, সে সময়ে সেই পরিবেশেরই ছাপ গিয়ে পড়ে সেই সমাজের সাহিত্যে। একে এড়াবার উপায় নেই। একটি অনতিক্রম্য নিয়তির মত সাহিত্য আর সমাজ পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ যুক্ত। ম্যাথু আর্নল্ড যে বলেছেন "Literature is the criticism of life"—এর মানে আর অন্য কিছু নয়, মানে হচ্ছে এই যে, সাহিত্য সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। সাহিত্য জীবনকে অনুসরণ করে। জীবনে যা ঘটে, যা করা হয়, যে কামনা-চিন্তা চলে, তারই রূপ অংশতঃ ভাবে প্রতিফলিত হয় তার সাহিত্যের মধ্যে। এ নিয়মের আর নড়চড় নেই।

কখনও কখনও এমন হয় যে জীবন সাহিত্যের অনুগামী হয়। সেও জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধেরই দ্যোতক। এই বিপরীত ক্রিয়াটি অতিশয় শক্তিশালী সাহিত্যের ক্ষেত্রে সত্য হয়ে উঠতে দেখা যায়। তা সে শক্তিশালী সাহিত্য আদর্শবাদীই হোক আর অন্য যে ধরনেরই হোক। গ্যেটের 'ভেটরের দুঃখ' পড়ে জার্মানীর তৎকালীন বহু যুবক জীবনের সার্থকতায় সন্দিহান হয়ে আত্মহত্যা করেছিল। এটি যদিও চরম হ'লেও সমাজের সাহিত্যকে অনুসরণ করবার, সাহিত্যের দ্বারা চালিত হবার নিদর্শন। আবার সমাজের উপর সাহিত্যের সুফল ফলবারও দৃষ্টান্ত আছে। সেরকম দৃষ্টান্তের সংখ্যাই বেশী। বিশেষ করে আদর্শবাদী সাহিত্যের বেলায় এ নিয়মের সার্থকতা সবিশেষ প্রত্যক্ষগোচর হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাস বাংলাদেশের মানুষের মনে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় মুক্তির অভীপ্সা জাগাবার মূলে। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে একদা বহু স্বদেশী যুবক ফাঁসীতে ঝুলেছে। সমাজের উপর সাহিত্যের প্রভাবের এ এক অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীতের প্রভাবও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সমাজের উপর কম দূর বিস্তৃত হয় নি।

কখনও কখনও এমন দেখা যায় যে পরবর্তী কালের মানুষের চিন্তার ভঙ্গী, ভাষার ধাঁচ, সংলাপের আদল পূর্ববর্তী কিংবদন্তী সাহিত্যিকের রচনা প্রভাবের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এটা রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের বেলায় বিশেষ ভাবে সত্য হয়ে উঠেছে দেখতে পাই। আজ আমরা যে ভাষায় কথা বলি, যে ভঙ্গীতে চিন্তা করি, তার উপর রবীন্দ্র-ভাষার প্রভাব অতি স্পষ্ট। 'আমরা' অর্থাৎ যাঁরা শহরাঞ্চলে বাস করি, সাহিত্য পড়ি, সংস্কৃতি-চর্চায় অভিমান যাঁদের কিছু-না-কিছু আছে। আমাদের চিঠির ভাষাতেও এই ছাপ গিয়ে পড়ে, যে ভাষাভঙ্গী অদীক্ষিতের নিকট, অপরিচয়ের দরুন, কিঞ্চিৎ অ-স্বাভাবিক মনে না হয়ে পারে না। কেন না কেজো ভাষার সঙ্গে এ ভাষার মিল কম। অন্যপক্ষে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের অনবদ্য সংলাপের ধাঁচ-ধরন জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে আমাদের সাহিত্য-পড়া শহরে শিক্ষিত মেয়েদের কথার চালের ভিতর ছায়াপাত করেছে বলে মনে হয়। এর ফল সবটাই ভাল হয়েছে এমন কথা বলতে পারি না। ক্ষেত্রবিশেষে সংলাপের আদল কৃত্রিম শোনায়। মুখের কথায় ছাপার ভাষার কথোপকথনের চাল বেশী মাত্রায় আনতে গেলে বুঝি কৃত্রিমতা পুরোপুরি পরিহার করবার উপায় নেই।

যাই হোক, আমাদের কথা হচ্ছিল সমাজ ও সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের তত্ত্ব নিয়ে। সমাজ সাহিত্যকে প্রভাবিত করে, আবার বিপরীত প্রক্রিয়ায় সমাজ সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ অনেকটা

মানবীয় দর্শনের সমাজ ও সমাজ-মানসের পারস্পরিক সম্বন্ধের মত। একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত, পরিবর্তিত, রূপান্তরিত হয়। পরিবেশ মানুষকে বদলায়, আবার মানুষ সজ্ঞান চেষ্টার দ্বারা পরিবেশের রূপান্তর সাধন করে। সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্কটাও কতকটা এইরূপ।

যে সকল সাহিত্যকে আমরা মূলত কল্পনাপ্রবণ সাহিত্যসৃষ্টির নমুনা বলে জানি, সেগুলিও সমাজবিরহিত মনে করবার কোন কারণ নেই। এ-সবের মধ্যেও সমাজচিন্তা রয়েছে তবে তার ক্রিয়া পরোক্ষ। প্রতিক্রিয়ার পথে এই ঐকান্তিক কল্পনাপ্রবণতার সৃষ্টি হয়। কীট্স্ তাঁর সমসাময়িক কালের বাস্তবতায় পীড়িত হয়ে মধ্যযুগের ইতিহাসের রোমান্সে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাপ্রবণ মনও তাৎকালিক সমাজ-জীবনের গদ্যময় বাস্তবতা আর উপকরণবহুলতার মধ্যে আহরণ করবার কিছু না পেয়ে অতীত ইতিহাসের বর্ণাঢ্য রোমান্সের অভিমুখে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন। এই দুই লেখকেরই সাহিত্যের মূলে কল্পনার কাজ প্রধান হ'লেও গোড়ায় রয়েছে সমাজ চেতনা। একে পরোক্ষ সমাজ-চেতনা বলা যায়। প্রতিক্রিয়ামুখে তার সৃষ্টি।

তেমনি উনিশ শতকের ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের দৃষ্টিভঙ্গীর মূলেও রয়েছে সমসাময়িক সমাজ পরিবেশ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব। অপরিসীম কল্পনাপ্রভাবে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কোলরিজ শেলী কীট্স্ প্রমুখ কবিরা যে স্বপ্নের জগৎ রচনা করেছিলেন তা তাৎকালিক বাস্তব সমাজের উল্টো পিঠের চিত্র। সমসাময়িক সমাজের গদ্যময় রূঢ়তা ও অসৌন্দর্য তাঁদের ভাল লাগে নি বলেই তাঁরা স্বপ্নের জগতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ একজন প্রথম শ্রেণীর প্রকৃতির কবি। তাঁর কবিতায় সংসার জীবনের মালিন্যের ছাপ চোখে পড়ে না। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যের ধ্যানে তাঁর কবিচিত্ত নিমজ্জিত। কিন্তু এই ঐকান্তিক সৌন্দর্যপিপাসু প্রকৃতি রসিক কবিই একদিন ফরাসী বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন তা কে ভাবতে পারে? ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য তা হলেও সত্য। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ফরাসী বিপ্লবের কাছ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সে প্রত্যাশা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের সন্ত্রাসের রাজত্বে হিংসার তাণ্ডব দেখে তাঁর সংবেদনশীল কবি-চিত্ত ফুঁকড়ে ওঠে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় তিনি রাজনীতি তথা বিপ্লবের আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুখ সরে গিয়ে অনাবিল শান্তি ও সৌন্দর্যের আগার লেক-ডিস্ট্রিক্টের নিভৃত নিলয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রকৃতির আত্মসমাহিত একাগ্র ধ্যান থেকে তারপর তিনি আর কখনও বিচ্যুত হন নি। সুতরাং পরে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা রাজ্যে বাস করলেও মূলে দেখা যাচ্ছে সমাজচেতনার ক্রিয়া। প্রখর সমাজচেতনার দ্বারা প্ররোচিত বাস্তববিমুখতাই অনেক সময় অনুভূতিপ্রবণ চিত্তকে প্রকৃতির কাছে অথবা অতীতের স্বপ্নলোকের কাছে আত্মসমর্পণ করবার মন্ত্রণা দেয়।

এ-রকম ব্যাপার ইংলণ্ডের ভিক্টোরীয় যুগের 'প্রি-র‍্যাফেলাইট' শিল্পী-গোষ্ঠীর বেলায়ও ঘটেছিল। কবি শিল্পী উইলিয়ম মরিস আর শিল্প-সমালোচক জন রাস্কিন ছিলেন এই শিল্পী-গোষ্ঠীর নেতা। শিল্প-বিপ্লবের অভ্যুদয়ের পরে কল-কারখানার বিস্তৃতির ফলে ইংলণ্ডের চেহারায় ও সমাজ-জীবনে যে বিকার দেখা দিয়েছিল তার কদর্যতায় পীড়িত হয়ে এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা মধ্যযুগের জীবনযাত্রার সৌন্দর্য ও কল্পনার ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। শিল্প-সভ্যতার শোষণ ও অত্যাচার এঁদের সংবেদনশীল চিত্তকে এতটাই বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী করে তোলে যে তাঁরা তাঁদের সমসাময়িক সমাজের দিকে মুখ ফিরিয়ে থেকে ওই সমাজকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করবারই চেষ্টা করেছেন। এই সমাজ বিমুখতা, এ-ও সমাজ সচেতনতারই রূপান্তরিত বেশ মাত্র। একে উল্টোমুখী সমাজ চেতনা বলা যায়। সকলেই জানেন রাস্কিনের 'Unto This Last' বইখানা গান্ধীজীর জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুতঃ গান্ধীজীর সর্বোদয় আদর্শের মূল

তিনটি পদ এই বই থেকেই নেওয়া। একজন শিল্প-সমালোচকের রচনা একজন বিরাট মানবপ্রেমী কর্ম-নায়কের চিন্তাকে আলোড়িত করল এর ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, কল্পনার সৌন্দর্যে যাঁরা বাস করেন, স্বপ্নকে যাঁরা জীবনভোর আঁকড়ে ধরে থাকতে চান, তাঁরা আপাতদৃষ্টিতে বাস্তব সম্পর্কশূন্য বলে মনে হলেও তাঁদের কাল্পনিকতা আর স্বপ্নাতুরতার পিছনে গভীর বাস্তব-চেতনার পটভূমি রয়েছে। সমাজের ভিত্তির উপর তাঁদের কল্পনার সৌধ দাঁড়িয়ে আছে। তাঁদের অতীতপ্রীতিই বলুন আর বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদই বলুন, সবই বর্তমান সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতনতার ফল। বর্তমান সম্পর্কে তাঁরা প্রবলভাবে সজাগ বলেই তার প্রতিক্রিয়ায় অতীতে সকরুণ প্রবাসী। অতীত তাঁদের নিকট বর্তমান থেকে পালিয়ে বাঁচার একটি ক্ষেত্র।

এই কথাটা আমরা সব সময় বুঝতে চাই না বলেই রোমান্টিক কবিদের বা অতীতমুখী শিল্পীদের "পলায়নবাদী" আখ্যা দিয়ে তাঁদের মূল্য খাটো করবার চেষ্টা করি। এটা তাঁদের প্রতি অবিচার। তাঁরাও একরকমের সমাজ সচেতন, তবে তাদের সমাজ চেতনার মূল উর্ধে, দীর্ঘশ্বাস তলার দিকে এই যা তফাৎ। তাঁরা তাঁদের স্বপ্নে কল্পনার গজদন্ত-প্রাসাদে বাস করেন ঠিকই, তবে সেই প্রাসাদ শূন্যে বিলম্বিত নয়, অদৃশ্য শিকড় দ্বারা মৃত্তিকার সঙ্গে সংলগ্ন। আমাদের সাহিত্যের কয়েকজন লেখকের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সমাজ-সচেতনতা ছিল না। তিনি প্রকৃতির ধ্যানে চুর হয়ে ছিলেন, অতি-প্রাকৃত সত্তার রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যস্ত ছিলেন; সেই অবসরে সমসাময়িক সমাজের সমস্যা ও প্রশ্ন তাঁর দৃষ্টির ফাঁক গলে বেরিয়ে গেছে। প্রকৃতির প্রতি নিবিড় অনুরাগের অত্যুৎসাহে তিনি পারিপার্শ্বিক সামাজিক আবেষ্টনীর দিকে মনোযোগ দেবার অবকাশ পান নি। তাঁর 'পথের পাঁচালী' প্রকৃতির কাব্য, 'আরণ্যক' অরণ্য মহিমার প্রশস্তি, 'ইচ্ছামতী' অতি-প্রাকৃত রহস্যের আবরণ উন্মোচনের কাহিনী। তাঁর এই তিন প্রধান সৃষ্টিতেই তাঁর চোখ সমাজ সংসারের দিক থেকে ফেরানো।

কিন্তু এ কথা কি আমরা জোর করে বলতে পারি? কে জানে বিভূতিভূষণ তাঁর সমসাময়িক সমাজের কৃত্রিমতা, রুক্ষতা আর আন্তরিক মনুষ্যত্বের চাপে রুদ্ধশ্বাস হয়ে প্রকৃতির দুয়ারে শান্তির আশায় সন্ধান মাগেন নি? সমাজের নানাবিধ অবিচারতা ও হীনতা তাঁর স্পর্শাতুর মনকে পীড়িত করে তোলবার ফলেই যে তার প্রতিক্রিয়ামুখে হাত বাড়িয়ে তিনি প্রকৃতির শান্তি আর অতীন্দ্রিয় সত্তার মায়াময়তাকে অবলম্বন করেন নি তা কে বলবে? অন্ততঃ বিভূতিভূষণের জীবনের ছাঁচ লক্ষ্য করলে এ কথাই মনে হয়। তিনি শহর-জীবন আদপে পছন্দ করতেন না। শহর-জীবনের কৃত্রিমতা, রুক্ষতা, অসৌজন্য তাঁর মনে তারের মত চেপে থাকত। এক সন্ধ্যায়, কোন এক সাহিত্যামোদী ভদ্রলোকের গৃহে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমরা জন দুই বন্ধু বিভূতিভূষণের সহযাত্রী হয়ে একদা সেই ভদ্রলোকের গৃহে গিয়েছিলাম। সেই সন্ধ্যার স্মৃতি আমি ভুলতে পারব না। ঘণ্টা দুই-আড়াই আমরা সেখানে ছিলাম। এই দীর্ঘ সময় কোথা দিয়ে যে কেটে গিয়েছিল তা বলতে পারি না। বিভূতিভূষণ একটানা নানা গল্প বলে গেলেন, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত সে-কাহিনী শুনে গেলুম। সে কাহিনীতে শহরের কথা নেই, সমাজের সমস্যার কথা নেই, রাজনীতি সাহিত্য শিল্পকলার প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত; কবে কোন্ পাহাড়ে গিয়েছিলেন, কোন্ বনের নিভৃতে নিঃসঙ্গ বাস করেছিলেন, কোথায়

কোন্ ফুল পাওয়া যায়, কোন্ ফুলের কী রঙ কী বৈশিষ্ট্য এসব বৃত্তান্ত অনর্গল ধারায় বলে চললেন। যেন এখানে শ্রোতা উপলক্ষ্য, নিজের ভিতরকার বলবার তাগিদেই বলা। এক লবটুলিয়া পাহাড়ের গলগলি ফুলেরই কত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন। আমরা শহরে শ্রোতা, সাহিত্য মনস্ক, ইচ্ছা, শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে দুটি মতামত তাঁর মুখ থেকে শুনি; কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। এই আত্মভোলা আবেশ, এই তন্ময়তা, এই পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি শুধু তাঁরই অধিগম্য হতে পারে যিনি শুধু শিল্প সাধনা করেন নি, শিল্পের চাইতেও যা বহুগুণে বড়, সেই জীবনের সাধনা করেছেন। এ রকম সাধনার প্রসাদ না পেলে কারও মধ্যে সমাজ-পরিবেশ সম্পর্কে এমনতর ঔদাসীন্য আসতে পারে না। এ ঔদাসীন্য বৈরাগ্যের নামান্তর। আর এ বৈরাগ্য বিভূতিভূষণের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে ছিল, এ আমরা বার বার লক্ষ্য করেছি। তিনি যখন সাহিত্যিক খ্যাতির শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত, কলকাতা শহরের ওষীয়ানী মহলে যখন তাঁর সমাদরের অন্ত নেই, তখন, হঠাৎ একদিন দেখা গেল, তিনি কলকাতা শহর থেকে ডুব দিয়েছেন। শহরের ভিড় আর কল-কোলাহল থেকে পালিয়ে তিনি তাঁর স্বগ্রাম ঘনশাঁর নিকটবর্তী বারাকপুর (পথের পাঁচালী গ্রন্থের নিশ্চিন্দিপুর)-এর জোপবাড় জঙ্গলে গিয়ে পুনরায় আশ্রয় নিয়েছেন। ইছামতীর তীরে তীরে ফিরেছেন। কলকাতার মোহ তাঁকে আটকে রাখতে পারে নি।

এ-ও এক প্রকারের ঘরবেদী সমাজ সচেতনতা। সমাজের প্রতি বৈরাগ্যের কারণে সমাজের প্রচলিত লৌকিক পরিবেশ থেকে দূরে গিয়ে বাস করা। এর পিছনে সুস্পষ্ট একটি দৃষ্টিভঙ্গী আছে। নিছক আকস্মিকতার খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করবার জন্যই সমাজের দিকে পিঠ দিয়ে থাকা নয়। আমেরিকার দার্শনিক থোরো যে কারণে শিল্প-সভ্যতার বিচিত্র সমারোহের আকর্ষণ সত্ত্বেও বনে গিয়ে ঘর বেঁধেছিলেন, কতকটা সেই প্রেরণাতেই বিভূতিভূষণ রাজধানীর সহস্রবিধ মোহের হাতছানি অগ্রাহ্য করে অখ্যাত গাঁয়ের নিভৃতে গিয়ে স্থায়ী বাসা বেঁধেছিলেন। এর থেকে যদি কেউ মনে করেন বিভূতিভূষণ শহরকে বুঝতেন না, সমসাময়িক সমাজের প্রশ্ন ও সমস্যাকে জানতে বুঝতে চাইতেন না, তিনি নিতান্ত ভুল করবেন। বরং বিভূতিভূষণ শহরের প্রকৃত রূপটিকে অন্যান্য অনেকের চেয়ে আরও বেশী করে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। আর তা করেছিলেন বলেই তিনি শহর-জীবন থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

এইরকম আরেকজন লেখকের কথা মনে পড়ছে, যাঁর রচনায় আপাত বিচারে সমাজের সমস্যার তেমন ছাপ পড়ে নি। তাঁর লেখায় আগাগোড়া একটা প্রসন্নতার সুর ছিল। তিনি উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর রচনায় সমসাময়িক সমাজের প্রশ্ন-সমস্যাগুলির প্রতি আপেক্ষিক অবহেলা দর্শনে আমরা যাঁরা আজকের দিনে নিজেদের সমাজ-সচেতন সমালোচক বলে দাবি করি তাঁরা আক্ষেপ প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে, তাঁর এই সামাজিক প্রশ্নাবলী এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা পরিকল্পনাবিহীন ছিল না। তিনি ইচ্ছাপূর্বক সমাজ-বাস্তবতা এবং তার আনুষঙ্গিক অন্যান্য লক্ষণগুলিকে তাঁর রচনার পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলেন। সমাজ-বাস্তবতার অতিরিক্ত অনুশীলনে মনের ভিতর তিক্ততা আর ক্ষোভ জন্মায়, মনের ভারসাম্য চঞ্চল হয়। সামাজিক অন্যায় অবিচারের প্রতি একনিবিষ্ট সজাগতার ফলে মনের ভিতর একটা ঘনঘনে ভাবের (tonalon) সৃষ্টি হয় আর সেই ভাবের ছাপ গিয়ে পড়ে লেখার উপর। যে লেখকের লক্ষ্য নিরাবিল সৌন্দর্য সৃষ্টি, পাঠককে কিছুকালের জন্য বিমল আনন্দ পরিবেশন করা, তিনি কেন সাধ করে তাঁর রচনায় ওই বিপর্যস্ত ভাবকে বরণ করতে চাইবেন? উপেন্দ্রনাথ তা চান নি। তাঁর প্রকৃতি ছিল সমানধর্মা, অপূর্ব মানবপ্রীতিমণ্ডিত। মানুষের বহিরঙ্গ দোষ-ত্রুটিকে অতিক্রম করে

তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পৌঁছেছিল মানুষের জীবনের গভীরে, যেখানে সব মানুষই সুন্দর, একই ভগবানের সন্তান। অমিত ভালবাসায় যাঁর মন ভরা তিনি কেমন করে অপ্রেম অশুভ বিদ্বেষ আর অত্যাচার অবিচার নিষ্ঠুরতা বর্বরতা—অন্ধকার দিনে যেসব লক্ষণের অন্য নাম সমাজ-বাস্তবতা—ইত্যাদিকে তাঁর জন্মদের মুখে ছুটিয়ে তুলবেন। উপেন্দ্রনাথের লেখনী সজ্ঞানে সমাজ-বাস্তবতাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। মানব জীবনের প্রেম আর আনন্দের জয়গানে তাঁর রচনা মুখর। এতে তাঁর রচনার অগভীরতার প্রমাণ হয় না, প্রমাণ হয় এই কথা যে, তিনি শিল্পের সাধনার চেয়েও মনুষ্যত্বের সাধনায় সমধিক বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর পাঠকদলকে অসুখী করতে চান নি, তাঁদের দুইদণ্ডের জন্য আনন্দদানের প্রয়াস করেছিলেন।

খতিয়ে দেখলে, শিল্প সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্যই তো আনন্দ দান। আমরা অনেক সময় অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণার দ্বারা শিল্পের মূল উদ্দেশ্যকে গুলিয়ে ফেলি। সাহিত্য সমসাময়িক সমাজের চেতনা থেকে বিচ্যুত হবে না নিশ্চয়ই, তবে ওই সমাজ চেতনার লক্ষণ দ্বারা চেনাজানাকে মণ্ডিত করাই তার চরম লক্ষ্য নয়, ওই লক্ষ্যকে ছাপিয়ে তার সামনে আরও বৃহত্তর লক্ষ্য আছে—পাঠকের চিত্তকে সৌন্দর্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত ও মন্থিত করা। কে কোন্ উপায়ে কোন্ উপকরণের সাহায্যে এই শিল্পের লক্ষ্য সাধন করল সেটা বড় কথা নয়; বড় কথা হল, সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যটি শিল্প সৃষ্টির মধ্যে সাধিত হল কি না। সাহিত্য বিচারের ওই এক মানদণ্ডই আছে, অন্য মানদণ্ড গ্রাহ্য নয়।

সমাজচেতনা সাহিত্যের লক্ষ্য সিদ্ধির পথে একটি সোপান মাত্র, গন্তব্য বিন্দু নয়।

———

ঈশ্বরের আহ্বান

মানুষ যখনি মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে—তখনি বিধাতা তাঁকে বলেছেন, তুমি বীর। ... তিনি মানুষকে আহ্বান করেছেন, হে বীর, জাগ্রত হও। একটি ঘরজার পর আরেকটি ঘরজা ভাঙো, একটি প্রাচীরের পর আরেকটি পাষাণ প্রাচীর বিদীর্ণ করো, তুমি মুক্ত হও, আপনার মধ্যে তুমি বদ্ধ থেকো না, তুমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হোক।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Calaveras Country" ১৮৬৭ সালে বেরুল। এই বইটিই তাঁকে সুনাম এনে দিল। ক্লামুয়েলের নাম ছাপা পড়ল সাহিত্যে, 'মার্ক টোয়েন' লোকের মুখে মুখে ঘুরতে লাগল। বন্ধুবৎসল, হৃদয়বান হয়ে রইলেন ক্লামুয়েল বন্ধুদের কাছে।

তারপর শুরু হ'ল তাঁর দেশভ্রমণ। ইউরোপ, এশিয়া ঘুরে এলেন। লিখলেন "The Innocents Abroad" (১৮৬৯ সাল) এবং "Roughing It" (১৮৭২ সাল)। ১৮৭০ সালে বিয়ে করলেন তিনি। সেই বছরেই কনেক্‌টিকাট রাজ্যের হার্টফোর্ডে তিনি স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন। তাঁর সবচেয়ে সমৃদ্ধ সময় আরম্ভ হ'ল বিয়ের পরই। ১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত সময়টা তাঁর লেখার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময়। শ্রেষ্ঠ বইগুলো বেরুল একে একে। ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হ'ল "The Adventures of Tom Sawyer", ১৮৮৩ সালে "Life on the Mississippi," ১৮৮৪ সালে "The Adventures of Huckleberry Finn"।

এই বইগুলো লিখে যেমন প্রচুর অর্থ আনলেন, তেমনি একদিন এল ধীরে ধীরে যেদিন তিনি সব খোয়ালেন। প্রকাশনী ব্যবসায়ে নামলেন। সমস্ত টাকা লোকসান হ'ল, যেহেতু ব্যবসা করতে তিনি জানতেন না। ফলে ১৮৯৫ সালে তিনি দেউলে হয়ে গেলেন। সর্বস্ব হারিয়ে যখন পথের ধুলায় দাঁড়াতে যাচ্ছেন, তখন শেষ চেষ্টা করলেন আবার মাথা তুলতে। বক্তৃতা ক'রে ক'রে বেড়াতে লাগলেন। সফল হলেন। ঋণ করেছিলেন চরম দুর্দিনে। সে ঋণ শোধ করলেন বক্তৃতার টাকা থেকে। কিন্তু ব্যবসায়ে অসাফল্য এবং তজ্জনিত চরম দারিদ্র্য ও সবচেয়ে বড় আঘাত জ্যেষ্ঠ-কন্যার মৃত্যু তাঁর শরীর ও মন আগেই ভেঙে দিয়েছিল। তারপর সর্বকনিষ্ঠার অসুখ এবং ১৯০৪ সালে পত্নীর মৃত্যু তাঁকে একেবারে বসিয়ে দিল। ১৯১০ সালে তিনি মারা যান।

শেষ জীবনে নৈরাশ্যবাদ তাঁকে আঁকড়ে ধরেছিল। কিন্তু প্রথম জীবনে তাঁর লেখা আনন্দময় ছিল, জীবনের জয়গানে মুখরিত ছিল। জাতিকে যেমন তিনি কৌতুক-লেখা উপহার দিয়ে মস্ত আনন্দ দিয়েছেন তেমনি জীবনশাসিত মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বের পক্ষে চিন্তারাশি দিয়ে গিয়েছেন। কৌতুক-জীবন সুস্থ হয়ে বাঁচার জন্যে অবশ্য প্রয়োজন।

আমেরিকার গণতন্ত্রের ইতিহাসে যেমন লিঙ্কনের নাম অনপ্রিয় এবং প্রাতঃস্মরণীয়, তেমনি মার্ক টোয়েনের নামও। আত্মবিশ্বাস এবং দুর্জয় সাহসের জন্যে দু'জনকেই মার্কিনদেশ সমান আসনে বসিয়ে রেখেছেন। দু'জনেই অত্যাচার এবং শোষণকে ঘৃণা করতেন। দু'জনের চারিত্রিক সাদৃশ্যের জন্য গত শতকের আমেরিকার ঔপন্যাসিক এবং সমালোচক উইলিয়ম ডীন হাওয়েল্‌স্ বলেছেন, মার্ক টোয়েন আমাদের সাহিত্যের 'লিঙ্কন'।

অন্তর্লীন উত্তরোল ও সিমন দ্য বোভোয়ার

পবিত্র পাল

নিজের সত্তার স্বাতন্ত্র্যই অস্তিত্বের বড় প্রমাণ। এ সত্তার বাইরে সব শূন্যতা। বহিঃপৃথিবী 'শূন্যতা' হলে-ও অস্তিত্বের বা সত্তার স্বাতন্ত্র্যের জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা যে নেই তা নয়। আছে ততটুকুই, যতটুকুতে বহিঃপৃথিবী সত্তার স্বাতন্ত্র্যকেই চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। সত্তার বিকাশ বা স্ফুরণের পক্ষে বহিঃপৃথিবী নিষ্প্রয়োজন। সত্তা নিজের কাছে আপন প্রেরণা খুঁজবে এবং আপন সত্তাই আপন অস্তিত্বকে সার্থক করবে। বহির্পৃথিবীশূন্য এ ধরনের আত্মনিমগ্নতা ইদানীংকালে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবিত করেছে। ফরাসীদেশে এঁদের সংখ্যাই বেশি। আত্মনিমগ্নতায় সমষ্টির কোন স্বীকৃতি নেই, সে সমষ্টি শূন্যতাকেই প্রকট করে বলে এ ধরনের বুদ্ধিজীবীরা তাদের জীবনযাত্রা তেমনিভাবে পরিচালনা করেন। এ আত্মনিমগ্নতার তরঙ্গাঘাতে ভারতবর্ষীয় কিছু কিছু বুদ্ধিজীবীও চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। অস্তিত্ববাদের আধুনিক প্রবক্তা জাঁ পল সার্ত্র-এর এমনি দুর্নিবার প্রভাবে শক্তিশালী যে সমস্ত ইউরোপীয় লেখক-লেখিকা চঞ্চল এবং অবশেষে সার্ত্র-এর শক্তি বৃদ্ধি করেছেন তাঁদের মধ্যে সিমন দ্য বোভোয়ার অন্যতম।

যুদ্ধোত্তর কালে তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা বলে অনেক মন্তব্য করেছেন। লেখকবৃত্তির মধ্যে যে পরিমান বুদ্ধির প্রাখর্য, চিন্তার ব্যাপ্তি, দৃষ্টির-বহুদূরগামিতা এবং অনুভবের তীক্ষ্ণতা প্রয়োজন, এই লেখিকা সমস্ত কিছুই অধিকার করেছেন। সার্ত্র-এর শিষ্যা বলে আপাত স্বীকৃত হলেও বোভোয়ার লেখার দিক দিয়ে সার্ত্রকেও ছাড়িয়ে গেছেন বলে অনেকে মনে করেন। আর অস্তিত্ববাদকেই কি আমরা অন্তর্লীন উত্তরোলের প্রতীক বলে ধরব, না অস্তিত্ববাদবর্জিত মানুষের অন্তর্লীন উত্তরোল অর্থাৎ অন্তরের বন্যা কি থাকতে পারে—এ দুইপ্রশ্নের কোনটাই পুরোপুরি সিমনকে অধিকার করে নি। দুটোই সমপরিমাণে তাঁর লেখায় এক আশ্চর্য নিটোল সমন্বয় পেয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি কীভাবে তাঁর ভেতর এসে বল সঞ্চার করেছে এবং অনেকখানি তাঁর লেখিকাবৃত্তিকে প্রাণদান করেছে—তার উত্তর সিমনের নিজের জীবন। সেকারণেই সার্ত্র তাঁকে লিখতে প্রেরণা দিলেও সিমন এখানেই নিজের স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। এবং সম্ভবতঃ ইউরোপীয় সাহিত্য জগতে তিনি একক।

॥ ২ ॥

১৯০৮ সালে সিমনের জন্ম হয় একটি রক্ষণশীল ক্যাথলিক পরিবারে। তাঁর পিতা ছিলেন আইনজীবী এবং অত্যন্ত রক্ষণশীল প্রকৃতির লোক। এই ভদ্রলোকের অভিনয়প্রীতি খুব বেশী পরিমাণ ছিল। সিমন সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হন। পড়াশুনার আগ্রহ তাঁর বাবার কাছ থেকে পাওয়া। সিমন যে-কোন বিষয়ের গভীরে যেতে বরাবর চেষ্টা করেন। লঘুচিত্ততাকে অল্প বয়স থেকেই বর্জন করতে পেরেছিলেন। ওর কারণ-ও রয়েছে। চোখের সামনে বাবা-মার সম্পর্কের শূন্যতা তাঁর চোখে সব সময় করুণ মনে হয়ে দেখা দিত। বাবা মার মনকে কোন রকমেই আমল দিতেন না। তিনি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন। মাকে বাড়ির দাসী বলেই মনে হত সিমনের। অল্প বয়সের সিমনের মনে তখন থেকেই ধীরে ধীরে বিদ্রোহের স্রোত বইতে শুরু করল। বাস্তব তিনি কখনোই

করবেন না। স্বতন্ত্র হয়ে রইবেন—এ সংকল্প তাঁর বাল্যকাল থেকেই অর্জন করা। পড়ার আগ্রহ সিমনের ছিল দারুণ, বুভুক্ষুর মত। সব ধরনের বই তিনি পড়তেন। সিমনের তাঁর মার মত ধার্মিকভাব প্রথম জীবনে তীব্র ছিল। চার্চে যেতেন নিয়ম করে। বই পেয়ে সিমনের মনের দরজাগুলো যতই খুলে যেতে লাগল আর ঠিক সে ভাবেই যখন বিশ্ব এসে নাচতে আরম্ভ করল সিমন চার্চে যাওয়া ছেড়ে দিলেন এবং বই আঁকড়ে ধরলেন। বই-ই হল তাঁর গীতা-কোরান-বাইবেল।

পনেরো বছর বয়স থেকেই তাঁর লেখক হবার বাসনা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে শুরু করেছিল। একদিন এক বন্ধু তাঁকে কতকগুলো প্রশ্ন করলেন: ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি কী হতে চাও? সিমন দ্বিরুক্তি না করে উত্তর দিলেন, বিখ্যাত লেখিকা। লেখিকা হওয়ার চিন্তা হঠাৎ আসে নি, এর পেছনে কিছু কারণও তিনি রেখিয়েছিলেন। যেমন, বই লেখকদের প্রতি সিমনের শ্রদ্ধা ছিল। যেমন, তিনি মনে করতেন লেখার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর জীবনের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে যেহেতু তিনি বাস্তবক্ষেত্রে বেশি লোকের সংগে মিশতে পারেন নি। যেমন, লেখার মধ্য দিয়ে নিজেকে বারবার সৃষ্টি করা যায়। এ সমস্ত কারণই তাঁকে লেখিকা হওয়ার পথে টেনেছিল।

বিশ্বখ্যাত সোর্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সাহিত্য এবং দর্শন পড়েন। ১৯২৯ সালে তিনি দর্শনের ডিগ্রী পান। পরীক্ষায় তিনি হয়েছিলেন দ্বিতীয়, সার্ত্র প্রথম। সার্ত্র-এর সংগে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনিই সিমনকে লিখতে উৎসাহ দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন নানাভাবে। প্রথম পরিচয়ে সার্ত্র বললেন, "From now on, I am going to take you under my wing." সিমনের পড়াশুনার ব্যাপারে বাবার উৎসাহ ছিল যতটা, মার ততটা না। সম্ভ্রান্ত ফরাসী পরিবারে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা নিন্দনীয় ছিল। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই সিমন চারপাশে মা এবং অন্যান্য মেয়ে-জগতের এমন দাসত্ব লক্ষ্য করে বিরক্তিতে একটি নিজস্ব মানসলোক গড়ে তুলেছিলেন, যা দেখে বাবা বলতেন, সিমনের ভাবনা চিন্তা, চলন-ধারণ সব কিছুই তো ছেলেদের মতন, সিমন তো মেয়েই নয়। বাবা তাঁকে যতই লেখাপড়ার উৎসাহ দিতে থাকুন না কেন, সিমন মার প্রতি বাবার ব্যবহারে খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং তা থেকেই পুরুষ জাতির সম্পর্কে একটা প্রবল বিদ্রোহের ভাব মেয়েদের স্বাধিকারের পক্ষে গড়ে উঠেছিল।

সিমনের লেখিকা-জীবনে এই চিন্তা প্রবাহের আরও প্রভাব রয়েছে স্পষ্টই। আরো একটি ঘটনা তাঁকে প্রবল আঘাত দিয়েছিল এবং সে আঘাতে সিমনের মানস পরিমণ্ডলে নৈরাশ্যের তথা জীবন-জগতের বহির্লোক সম্পর্কে এক প্রচণ্ড উত্তরোলের স্রোত বইতে লাগল। পরিবারের সংগে খুব সম্পর্কে যুক্ত এক বিবাহিত যুবার প্রতি তিনি আকর্ষণ অনুভব করলেন। এগুলো সার্ত্র-এর সংগে পরিচিত হবার বহুপূর্বের ঘটনা। মা এই যুবা ব্যক্তির সংগে মিশতে বাধা দিতেন। কিন্তু সিমন বরাবর স্বতন্ত্র হয়ে উঠতেই চেষ্টা করেছিলেন, বিশেষ করে মেয়েদের অসহায়তার কথা স্মরণ করে। তাই তিনি মার নিষেধ মানেন নি। ব্যক্তি কিন্তু খুব সংযমী এবং নির্লিপ্ত প্রকৃতির যুবক ছিলেন। পরীক্ষার কয়েকমাস শেষ করে ব্যক্তি উত্তর আফ্রিকায় চলে যান। সিমন কিন্তু তাতেও দমেন নি। তীব্র নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন তিনি। সচরাচর যেসব মেয়েদের আমরা চারপাশে দেখতে অভ্যস্ত সিমন ছিলেন তাদের থেকে উজ্জ্বল রকম স্বতন্ত্র। বিদ্যাবুদ্ধি ব্যক্তিত্ব তাঁকে এমনি এক প্রখর স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছিল যে তাতে তিনি ছিলেন একক, নিঃসঙ্গ। সকলের মত হতে তিনি পারেন নি। কিন্তু তিনি মিশতেন সবার সংগে অন্তরঙ্গ মিলতে চাইতেন সবার সংগে। যেভোয়ার তিনি প্রথমের পর প্রথম অতিবাহিত করেছেন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মতে। জীবন, বাঁচবার মুহূর্তগুলো, মানুষ—

সব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা। মদের গ্লাস হাতে নিয়ে রেস্তোরাঁয় তাঁর প্রহরগুলো কাটত উদ্ভ্রান্ত গতিতে। এই শিথিল জীবনের ফলে তাঁকে বহু বিপদে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রতি বারই বেঁচে গেছেন। এদিকে ঐক আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে তাঁর বন্ধুত্ব খুলে গেলেন। বিয়ে করলেন অন্য একটি মেয়েকে। যে দাগা পেলেন তিনি, তাতে আরো ক্ষতস্থান করল তাঁর একমাত্র বন্ধু জাভার আত্মহত্যা। জাভা যাকে ভালবাসতেন, পারিবারিক সংস্কার তাদের মিলনের বাধা হল, মরলেন। সিমন বলেন, জাভা মরে গিয়ে আমাকে মুক্তি দিয়ে গেল। বিবাহের সাধ যদিও কিছু ছিল, জাভার মৃত্যুর সংগে সংগে সে সাধেরও মরণ হল। আস্তে আস্তে সিমন নিজেকে গুটিয়ে ফেললেন নিজের ভেতর। বাঁচবার রসদ সংগ্রহ করতে চাইলেন নিজের সত্তার ভিতর। অবশেষে একদিন এলেন সার্ত্র্। লেখার ভিতর ডুবে গেলেন, যা ছিল তাঁর ছোট বেলাকার কিশোর স্বপ্ন। তিনি লিখলেন,—দি মাণ্ডারিনস, দি সেকেণ্ড সেক্স, মেমোয়ারস্ অফ এ ডিউটিফুল ডটার।

সেকেণ্ড সেক্স-এ তিনি জানালেন—মেয়েদের অসহায়তার, যে অসহায়তা পুরুষের পদতলে নিবেদিত, লুণ্ঠিত,—বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ। পুরুষের পরিচয়ে মেয়েদের পরিচয়, পুরুষের ইচ্ছাই মেয়েদের ইচ্ছা! সিমন উচ্চকণ্ঠে জবাব দিলেন এ ভুয়া পরিচয়ে এ ভুয়া জীবনের অবসান হোক। এ জবাব সিমন কারো কাছ থেকে শোনেন নি। ছোটবেলা থেকেই নিজের যে জীবন তিনি পারিবারিক প্রশাসনের ভেতর কাটিয়েছেন সে প্রশাসনই অর্থাৎ বাবা-মার সম্পর্কের মেকিত্বই তাঁকে এমনভাবে ভাবতে শিখিয়েছিল, বহুদিন ধরে চঞ্চল অন্তরের কথাই তাঁকে লিখতে বাধ্য করে।

'দি মাণ্ডারিনস'-এ তিনি জগদ্বিখ্যাতা হলেন। বাল্যবয়সের কালে জগত এবং জীবন তাঁর ভেতর যে উত্তরোলের জন্ম দিয়েছিল, বড় হয়ে আরো যা দেখলেন যেমন জাভার আত্মহত্যা, ঐকের প্রেম-প্রত্যাখান, সামাজিক পারিবারিক সম্পর্কের মেকিত্ব এবং সার্ত্র-এর অস্তিত্ববাদ যাতে তিনি আত্মীয়তার সন্ধান পেয়েছিলেন, সে উত্তরোলে প্রবল রক্তস্রোত বইয়ে দিল। সে অন্তর্লীন উত্তরোল আরো আরক্ত হল। প্যারিসের জীবনে যুদ্ধপরবর্তী কালে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের জীবন-ঘটনা বিবৃত হয়েছে দি মাণ্ডারিন্স্-এ। প্রত্যেকেই আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বাঁচতে চাইলেন। কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্য কাউকে মুক্তি দিয়েছে কি? এ্যান স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে একজন থেকে আরেকজনে গমন করলেন, তাতেও কই শান্তি পেলেন। তারি কন্যা নাদিন আপন সত্তাকে অপরাজিত রাখতে চাইলেন। সার্ত্রিত্বে ঐরি নিজ স্ত্রী পলাকে ফিরিয়ে দিলেন। পলা চেয়েছিলেন স্বামীকে আপন সত্তায় পুরে ফেলবেন এবং দু' সত্তাকে একত্রে ভোগ করবেন, তার জন্যে প্রচণ্ড খ্যাতির ক্ষেত্র সঞ্জীত এবং অর্জিত ধন ত্যাগ করলেন। পারলেন না পলা ঐরিকে ধরে রাখতে। পরে উন্মাদ হয়ে গেলেন পলা এবং কিছুদিন পরে পুনঃ চেতনা ফিরে পেয়ে আপন সত্তায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চাইলেন তিনি। ঐরি পলাকে নিষ্ঠুর এমনকি অমানুষিক হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়ে গ্রহণ করলেন নাদিনকে, ঐরির অস্তিত্ববাদী সত্তা উপহাসাস্পদ হয়ে রইল শেষ পর্যন্ত। সে সত্তায় স্বাতন্ত্র্য রাখতে পেরেছিলেন কি ঐরি? হক্রই একটি সুস্থ স্বাভাবিক চরিত্র। এই চরিত্রটি একটি ক্লাসিক সাহিত্যিক কৃপনতা অর্জন করেছে। প্যারিসের জীবন—রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সব জীবন এরে আশ্চর্যরকম দক্ষতার সংগে বিবৃত হয়েছে। এই বইটির ঐরি এবং হক্রই চরিত্রটি প্যারিসের সাহিত্যিকরা দাবী করেন তাঁদের নিজেদের চরিত্র বলে। এ নিয়ে সেখানে ব্যক্তিগত প্রবল রকম বর্তমান। এই বইটি সিমনকে এনে দিয়েছে ফ্রান্সের 'Prix Goncourt'। ব্রিটেন এবং আমেরিকার সাহিত্যিক মহলে এই বইটি যুদ্ধোত্তর কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে স্বীকৃত।

'মেমোয়ারস্ অফ্ এ ডিউটিফুল ডটার' সিমনের আত্মচরিত। সার্ত্র্-এর সংগে পরিচিত হবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর জীবন কাহিনী এই বইটিতে বিবৃত।

এই সম্মেলনে প্রেরিত ডঃ আর্নল্ড টয়েনবীর বাণী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং গভীর ভাবে চিন্তাযোগ্য। এটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

"The history of Asia is the history of human civilization and higher religion. During the last few centuries the true proportions of Asia's contribution to history have been obscured owing to the temporary economic and political predominance of the West in the world. It is in the interests of all scholars, western scholars included, that mankind's history should be seen in its true perspectives."

এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের নিজেদের ভাষায় তুলে দেওয়া হল,—"to make possible attempts at integrated interpretation of the various aspects of the historical development of Asia as a whole or of larger areas constituting it." তাঁদের এই চেষ্টাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন,—(১) জনসমাজের ও তাদের ভাবধারার চলাফেরা লক্ষ্য করতে হবে; (২) এশিয়াবাসীর পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তনশীলতা লক্ষ্য করতে হবে; (৩) এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলোর বিস্তৃত খবরাখবর রাখতে হবে।

উপরের প্রত্যেকটির নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে আয়ত্তে রাখবার জন্যে তিনটি আলাদা বিভাগ থাকবে।

এই সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনে শ্রীনেহরু বলেছেন,—"The immediate task of the Asian history congress is to straighten out the twists Asian history has received from European historians. So far as Asia is concerned, we have been grossly maltreated by other historians."

তাঁর কথাই মূলতঃ বিভিন্ন বক্তা প্রতিধ্বনিত করেন। কবীর, পানিক্কর প্রমুখ ভারতীয় প্রতিনিধি থেকে শুরু করে সমস্ত প্রতিনিধিরাই এই কথাই বলেন। এবিষয়েই ব্রিটিশ প্রতিনিধির বক্তব্য লক্ষ্য করার মত। প্রফেসার জন গালাঘের বলছেন, "European methods of historiography are not applicable to developments in Asia"। তিনি মনে করেন, 'বুর্জোয়া' ও 'পেটি বুর্জোয়া' শ্রেণীতত্ত্ব যা নাকি ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের কাছে মূল্যবান, এশিয়ায় রপ্তানি করা যায় না। কারণ এখানকার অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়। এই সংজ্ঞা দুটো তাঁর মতে যেখানে যৌথ পরিবার প্রথা আছে সে সমস্ত স্থানে প্রয়োগ করা যায় না।

আর্থিক সমস্যা

আজ পৃথিবীর আর্থিক সমস্যা এমনি দুরূহ হয়ে উঠেছে যে, বড় বড় পণ্ডিতেরা তার যথার্থ কারণ এবং প্রতিকার খুঁজে পাচ্ছে না। টাকা জমছে অথচ তার মূল্য যাচ্ছে কমে, উপকরণ উৎপাদনের ত্রুটি নেই, অথচ তা ভোগে আসছে না। ধনের উৎপত্তি এবং ধনের প্রাপ্তির মধ্যে যে কাটল লুকিয়ে ছিল আজ সেটা উঠেছে ফেঁপে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্ব
ব্যঙ্গ
চিত্র

ভারত বনাম ইংলণ্ডের তৃতীয় টেষ্ট

মহা দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠে ভারত বনাম ইংলণ্ডের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ভারতের প্রথম ইনিংস ৪৬৬ রানে শেষ হয়ে যায়। এই দিনের খেলায় বিজয় মঞ্জরেকার অবিস্মরণীয় ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। ভারতের খেলোয়াড়দের মধ্যে তাঁর ১৮১ রান করে নট আউট থাকা ভারত-ইংলণ্ড টেস্ট খেলার ইতিহাসের এক অভিনব ঘটনা। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বর্তমান টেস্ট খেলা পর্যন্ত মোট ২৭টি টেস্ট খেলায় ভারতের অন্য কোন খেলোয়াড়ের পক্ষে এত অধিক সংখ্যক রান তোলা সম্ভব হয় নি। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে বিজু মানকড় লর্ডস্ মাঠে ১৮৪ রান তুলেছিলেন—এটাই ছিল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান। কিন্তু ১৪ই ডিসেম্বরের খেলায় সে রেকর্ডও ম্লান হয়ে গেল। ১৯৫৩-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মঞ্জরেকার নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলে ১৭৭ রান তুলেছিলেন—আজ তিনি সেই রান সংখ্যা অতিক্রম করলেন। তাঁর খেলা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছে। বিশ হাজার দর্শকের সম্মুখে ক্রিকেট খেলার সমস্ত রকমের ধার তিনি দেখান—দর্শকবৃন্দের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে মঞ্জরেকারের কৃতিত্ব স্বীকৃত হয়। তাঁর দুর্ভাগ্য দ্বিশত রান করবার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য তিনি সহ-খেলোয়াড়দের কাছ থেকে পান নি। মাত্র ১৫ রানে ভারতের শেষ ৪ জন খেলোয়াড় আউট হয়ে যান। ফলে তিনি ডাবল সেঞ্চুরী করার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হন।

মঞ্জরেকার মোট ৪৮৭ মিনিট ব্যাটিং করেন। ২৯ বার বাউণ্ডারী হয়। ইংলণ্ডের অধিনায়ক আত্মরক্ষামূলক ফিল্ড সাজাতে বাধ্য হন।

মঞ্জরেকারের টেষ্ট সেঞ্চুরী

১৯৫২—লীডস্—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে—১০০
১৯৫২-৫৩—ক্রিসটন—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে—১১৮
১৯৫৫-৫৬—দিল্লী—নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে—১১৭
১৯৫৫-৫৬—হায়দ্রাবাদ—নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে—১১৮
১৯৬১—দিল্লী—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে—১৮৯

টেষ্টে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বড় রান

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে

বিজু মানকড়—২৩১ (মাদ্রাজ ৫৫-৫৬)
বিজু মানকড়—২২৩ (বোম্বাই ৫৫-৫৬)
পলি উমরিগড়—২২০ (হায়দ্রাবাদ ৫৫-৫৬)
পি. রায়—১৭০ (মাদ্রাজ ৫৫-৫৬)

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে

মঞ্জরেকার—১৮৯ (দিল্লী ৬১)
বিজু মানকড়—১৮৪ (লর্ডস ৫২)
হাজারে—১৭৬ (দিল্লী ৫১-৫২)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে

এস. এল. আপ্তে—১৮০ (পোর্ট অফ স্পেন (৫২-৫৩)

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে

চাঁদু বোরদে—১৭৭ (মাদ্রাজ ৬০-৬১)

টেষ্ট খেলায় যে সব খেলোয়াড় তিন সহস্র রান করেছেন তাঁদের নাম

মোট রান	খেলোয়াড়ের নাম	মোট টেষ্ট খেলা
৭,২৪৯	ওয়ালী হ্যামণ্ড—ইংলণ্ড	৮৩
৬,৯৯৬	ডন ব্র্যাডম্যান—অষ্ট্রেলিয়া	৫২
৬,৯৭১	লেন হাটন—ইংলণ্ড	৭৯
৫,৮০৭	ডেনিস কম্পটন—ইংলণ্ড	৭৮
৫,৭৫৪	নীল হার্ভে—অষ্ট্রেলিয়া	৭৪
৫,৪১০	জ্যাক হব্‌স্—ইংলণ্ড	৬১
৪,৫৫৫	হার্বার্ট সাটক্লিফ—ইংলণ্ড	৪৪
৪,৫০৭	পিটার মে—ইংলণ্ড	৬৬
৪,৪১৫	এ উইকস—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	৪৮
৩,৭৯৮	সি ওয়ালকট—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	৪৪
৩,৫৩৩	এ মরিস—অষ্ট্রেলিয়া	৪৬
৩,৫২৫	পি মেক্রেন—ইংলণ্ড	৪১
৩,৪৭১	বি মিচেল—দক্ষিণ আফ্রিকা	৪২
৩,৪১১	কলিন কাউড্রে—ইংলণ্ড	৪৪
৩,৪০২	সি হিল—অষ্ট্রেলিয়া	৭৯
৩,৩৮৬	ফ্র্যাঙ্ক ওরেল—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	৪১
৩,৩৫২	জি সোবার্স—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	৩৭
৩,২৮৩	ফ্র্যাঙ্ক টসি—ইংলণ্ড	৬৪
৩,১৬৩	ভিক্টর ট্রাম্পার—অষ্ট্রেলিয়া	৪৮
৩,০৭৩	এল হাসটে—অষ্ট্রেলিয়া	৪০
৩,১০৬	সি ম্যাকডোনাল্ড—অষ্ট্রেলিয়া	৪৭
৩,০৭৯	পলি উমরিগড়—ভারতবর্ষ	৫১

খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী

ভারত ও ইংলণ্ডের তৃতীয় টেষ্ট খেলার দ্বিতীয় দিনের শুরুতে গত দিনের অপরাজিত ব্যাটসম্যান দু'জন মঞ্জেরেকার ও উমরিগর যথাক্রমে ব্যক্তিগত ৬১ ও ৮ রান এবং দলীয় ২৪৩ রান নিয়ে খেলতে নামেন। বিপক্ষে নামেন অ্যালেন ও বারবার। প্রথম আধ ঘণ্টায় ভারতের ২৩ রান যোগ হয়। উমরিগড়ের বিরুদ্ধে বারবার পর পর ৩টি মেডেন ওভার লাভ করার পর অ্যালেন উমরিগড়ের বিরুদ্ধে প্রথম মেডেন ওভার পান। পরবর্তী ওভারের শেষ বলে অ্যালেন উমরিগড়কে এল-বি-ডব্লিউ আউট করেন। মোট ৪০ মিনিট উইকেটে থেকে ৪টি বাউণ্ডারীর সাহায্যে উমরিগর ১২ রান করে আউট হন। বোরদে আসেন। বারবারের বলে মঞ্জেরেকার বাউণ্ডারী করেন। প্রথম ঘণ্টায় ভারতের ৩৪ রান বোর্ডে ওঠে।

ভারতের ২৯৮ রানের মাথায় লক বল করতে আসেন। লকের বলে মঞ্জেরেকার ২ রান করে ৪১৫ মিনিটে দলীয় ৩০০ রান পূর্ণ করেন। পরবর্তী ওভারেই অ্যালেনের বলে ২ রান করে মঞ্জেরেকার নিজস্ব গৌরবজনক শত রান পূর্ণ করেন। ২৩৮ মিনিটে ১৫টি রান বাউণ্ডারীর সাহায্যে মঞ্জেরেকার নিজস্ব সেঞ্চুরি সমাধা করেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের সময় পর্যন্ত ভারতের ৮৩ রান যোগ হয়। ভোজের পর দ্রুত রান উঠতে থাকে। ৮টি বাউণ্ডারী সমেত নিজস্ব ৪৫ রানে বোরদে বারবারের বলে আউট হন। দুরানী আসেন। চা-পানের সময় পর্যন্ত ভারতের ৪৪৩ রান ওঠে। চা-পানের পর দ্রুত রান তুলতে গিয়ে ভারতের খেলোয়াড়রা ঘন ঘন আউট হন। আধ ঘণ্টার মধ্যে আর মাত্র ২৩ রান যোগ করে ক্রমান্বয়ে ৫ জন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যান।

ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস

শেষের দিকে ৪০ মিনিট বিলীয়মান দিবালোকের মধ্যে ইংলণ্ডের ১ উইকেটে ২১ রান ওঠে।

স্কোর বোর্ড (তৃতীয় টেষ্ট : দিল্লী : দ্বিতীয় দিন)

ভারত—প্রথম ইনিংস

জয়সিমা ক ও ব স্মিথ	...	১২৭
কণ্ট্রাক্টর ক পুলার ব লক	...	৩৯
মঞ্জেরেকার নট আউট	...	১৮৯
পতৌদির নবাব ক রিচার্ডসন ব এলেন	...	১৩
উমরিগড় এল বি ডব্লিউ ব এলেন	...	২২
বোরদে ব বারবার	...	৪৫
দুরানী ব এলেন	...	১৮
ইঞ্জিনীয়ার এল বি ডব্লিউ এলেন	...	১
কৃপাল সিং রান আউট	...	২
মেহাই এল বি ডব্লিউ ব নাইট*	...	৫
গুপ্তে ব নাইট*	...	০
অতিরিক্ত	...	৫
মোট	...	৪৬৬

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস			
রিচার্ডসন এল বি ডব্লিউ ব দেশাই		...	১
পুলার নট আউট		...	৭
ব্যারিংটন নট আউট		...	১৩
	অতিরিক্ত	...	০
	মোট (১ উইকেট)	...	২১

উইকেট পতন ১।২

বোলিং—	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
দেশাই—	৬	১	১৪	১
জয়সিমা—	৪	১	৫	০
গুপ্তে—	২	১	১	০

প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচের চতুর্থ দিনের খেলা বন্ধ থাকে। পঞ্চম দিনে আম্পায়ারদ্বয় মাঠের অবস্থা দেখে খেলা স্থগিত রাখার পক্ষে মত দিলেন। অতিবৃষ্টির জন্যে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ পরিত্যক্ত হ'ল—খেলায় জয় পরাজয়ের কোন মীমাংসা হ'ল না।

১৯৫২ সালে ভারত ও ইংলণ্ডের ওভ্যাল মাঠের টেষ্ট খেলাটি জল অভাবের জন্য পরিত্যক্ত হবার নজীর ক্রিকেটের ইতিহাসে আছে। কিন্তু দিল্লীতে এ অভাবনীয় ঘটনা এই প্রথম। ভারত ও ইংলণ্ডের পর পর ৩টি টেষ্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হ'ল। ৩০শে ডিসেম্বর থেকে কলকাতার ইডেন উদ্যানে ভারত ও ইংলণ্ডের চতুর্থ টেষ্ট খেলা আরম্ভ হবে।

বহিরাগত ক্রিকেট দল এলে ভারতীয় ক্রীড়ামোদীদের 'হৃদয় নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে' ভাব জেগে ওঠে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, হৃদয় ত নাচে না। পাঁচ দিনের খেলা যেন মন বন্ধ করে দেয়। কোন জীবন নেই খেলার মধ্যে। মন্থর গতিতে এবং নিদারুণ বিরক্তি ধরিয়ে খেলার প্রহরগুলো কেটে যায়। দিল্লীর খেলা দেখে ঠিক তাই মনে হলে মেনে না নিয়ে উপায় নেই। দিল্লীতে যখন এমনিভাবে খেলা চলছে, কিছু দূরে ডঃ জেরিয়াব এলুইন তখন 'প্রেমের দর্শন' বিষয়ে প্যাটেল মেমোরিয়েল বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং বলছেন, "Loveless Climate of our lives"।—আমাদের এখনকার জীবনের এই প্রেমহীন অস্তিত্বের মতই তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে-ও কোন আনন্দ নেই, নেই কোন উল্লসিত হবার মত সচকিত ভাব। এলুইন ঠিকই বলেছেন, "Loveless Climate of our lives"।

সাহিত্য-সংবাদ

মৃত্যুর পরে নোবেল পুরস্কার ॥

সারা জীবনের সাধনায় যাঁরা বিশ্বসাধারণের কাছে অমূল্য কীর্তি দিতে পেরেছেন, তাঁদের অনেকেই আবার বেঁচে থাকতে থাকতে বিশ্ববাসীর অন্তরের মানে সম্যক যথার্থ স্বীকৃতি পেয়ে যান না। অথচ ভাবুন, বেঁচে থাকতে থাকতে সে স্বীকৃতি পেলে পরম তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে, কাজের পেছনে আরো উৎসাহ, উদ্দীপনা বাড়ে, আরো বুদ্ধিচর্চা হয়। নোবেল পুরস্কার দান জগৎবাসীর স্বীকৃতিস্বরূপ।

দাগ হামারশীল্ড ও এরিক অ্যাক্সেল কার্লফেল্ড—তেমন দু'জন দুর্ভাগাবান পুরুষ যাঁরা বেঁচে থাকতে পারেন নি, বিশ্বের দুর্লভ নোবেল পুরস্কার তাঁদের জীবনের বিনিময়ে সাধনালব্ধ কর্মকীর্তির স্বীকৃতি-স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।

দাগ হামারশীল্ডকে বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্যে দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে কংগোতে শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করতে গিয়ে মারাত্মক বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। দুর্ভাগ্যজনক এই মৃত্যুই নাকি তাঁর জন্য ১৯৬১ সালের পুরস্কার ঘোষণার বাধ্য করেছে—এমন কথাও উঠেছে। কারণ, পুরস্কার ঘোষণা সম্পর্কে নোবেল কমিটির একটি আইন রয়েছে, সেটি হ'ল এই: "In order to be considered for the award of the year, nominations for the Noble Peace Prize shall be sent in to the Noble Committee of the Norwegian Storing in Christiana (Oslo) before the first day of February of the same year." এই নিয়মটি অনুসরণ করলে এটাই স্পষ্ট হয় যে, হামারশীল্ডের কাজের জন্য যে পুরস্কার মৃত্যুর পরে দেওয়া হয়েছে, সেটা অনেকদিন আগেই অন্ততঃ তার মৃত্যুর আগেই ঘোষণা করা যেত।

এরিক অ্যাক্সেল কার্লফেল্ড একজন সুইডিশ কবি। এই পুরস্কার তাঁর জীবিতকালে তাঁকে দেওয়া সম্ভব হয়নি বলেই বাধ্য হয়ে মৃত্যুর পরে এটা দিতে হয়েছে। ১৯১২ সালে তিনি সুইডিশ একাডেমীর নোবেল কমিটির স্থায়ী সেক্রেটারীরূপে নির্বাচিত হন। তার অনেক পূর্বেই তিনি নিজ দেশে একজন খুব জনপ্রিয় এবং শক্তিশালী কবি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন। সেবার কমিটি তাঁকে ১৯১২ সালে সাহিত্যের জন্যে পুরস্কার দিতে চাইলেন। তিনি প্রবল প্রতিবাদ করে সে প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তিনি বললেন, 'আমার কবিতা সুইডেনের বাইরে একেবারেই অপরিচিত।' তিনি যে আপত্তি জানিয়েছিলেন সেটা কমিটির কোন পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হয়নি। কারণ, প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে কমিটির সভ্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে, সে মতভেদ কোথাও লিপিবদ্ধ থাকবে না। তিনি ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে মারা যান। তিনি খুব বিনয়ী এবং আত্মপ্রচারে খুবই নারাজ ছিলেন। কার্লফেল্ড কমিটির সেক্রেটারী থাকাকালীন যাঁরা নোবেল পুরস্কার পান তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, রোমাঁ রোঁলা, আনাতোল ফ্রান্স, ইয়েটস্, বার্নার্ড শ, টমাস মান, সিনক্লেয়ার লুইস।

বিশ্বের
পুতুলনাচ

মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও সুনিদ্রার সহায়তা করে

ভৃঙ্গল শুধু যে কেশের পক্ষেই বিশেষ উপকারী তাহা নহে, ইহা মস্তিষ্ক সুস্থ ও শীতল রাখে এবং সুনিদ্রার সহায়তা করে।

ভৃঙ্গল

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল

দি ক্যালকাটা কেমিকাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

পুতুলনাচ শিল্প এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ॥

সুদর্শন পাল

পুতুলনাচ-শিল্পের আধুনিক অধ্যায় বা যাকে বলা যায় নবজন্ম রচিত হয়েছে বিশ শতকে। এ কলা শিল্পের অস্তিত্ব সভ্যতার আরম্ভকাল থেকে থাকলেও মূলতঃ বিজ্ঞানের উন্নতির সংগে সংগে আবির্ভূত সিনেমা-শিল্প এবং নাট্যশিল্পের প্রতিযোগিতায় পুতুলনাচ-শিল্প মারা যেতে বসেছিল। তারপর শিল্পী ও সাহিত্যিকের দল বিভিন্ন দেশে এ শিল্পের পুনর্জাগরণে আত্মনিয়োগ করায় আবার এ শিল্প বেঁচে উঠেছে। বিজ্ঞানের উন্নতিও এ শিল্পের বৈচিত্র্য সাধনে সহায়ক হওয়ায়, এবং অন্ধকার যুগ কেটে গিয়ে বিশ শতকে বিভিন্ন দেশে এ শিল্প প্রভূত পরিমাণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম যুগে এ শিল্প ছিল মূলতঃ অভিনয় শিল্পের একটি শাখা হিসেবে এবং সে শাখা শিশু মনোরঞ্জনেই মূলতঃ নিয়োজিত ছিল। বিজ্ঞানের প্রবল অগ্রগতিকে সাধকগণ এ শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। এবং এ শিল্পকে করলেন সমৃদ্ধশালী।

শিক্ষাদান কার্যে এ শিল্পের ব্যবহার আশ্চর্য রকম সফল হয়েছে। শিশুমনে চোখের সামনে চলমান দৃশ্যের প্রভাব পড়ে ভীষণ। পঠিত বস্তুর চেয়ে দেখে দেখা বস্তুর অধিকতর ক্ষমতা শিশুমনে সক্রিয় হয়ে থাকে এ সর্বজনবিদিত কথা। পুতুলনাচ-শিল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে শিশুদের কাছে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহকে পরিবেশন করার চেষ্টা চলছে। রাশিয়া, গ্রেটব্রিটেন, চেকোশ্লোভিয়া, জার্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের স্কুলে এই পুতুলনাচ-শিল্পকে শিক্ষাদান ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়। মেক্সিকোতে শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের এই শিল্প বিষয়ে বিশেষ কর্মসূচীই বাধ্যতামূলকভাবে রয়েছে। এ কর্মসূচী সর্বসাধারণের শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়। এবং মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে সমস্ত স্কুলে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে যত স্কুল আছে সমস্ত স্কুলেই চলমান প্রদর্শনীর মতই এ শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এ প্রদর্শনীর আয়োজন আজো হয় নি। অনেকের ধারণা, এ শিল্প শুধু শিশুদের জন্যে। কিন্তু এ ভুল ধারণার অবসান আজ হতে চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এ শিল্প কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রদর্শিত হবে। এ ধরনের প্রদর্শনী আমাদের চোখ, কান, কণ্ঠস্বর, মন সব কিছুকে চোখের পলকে নাড়া দিতে পারার ক্ষমতা অর্জন করেছে বলেই শিক্ষাক্ষেত্রে এর ব্যবহার আজ তর্কাতীত।

পুতুলনাচ-শিল্পের একটা সার্বজনীন আবেদন আছে। এ আবেদন আছে বলেই সমস্ত রকমের আবেগ বিতরণের ক্ষমতা এর আছে। একজন শয্যাগত রোগীও পুতুলনাচের প্রদর্শনী দেখাতে পারেন। এত সহজসাধ্য অথচ এত প্রভাববিস্তারী এবং এত মনজয়ী ক্ষমতাগর্ভ এ শিল্প যে, এর ব্যবহার সর্বত্র। এমন কি চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এ শিল্পকে আজ ব্যবহার করা হয়েছে। মনোরোগবিজ্ঞানীরা পশ্চিমে জন্তানা পুতুলনাচ দেখিয়ে থাকেন যখন রোগীকে পরীক্ষা করেন। অপরাধীদের অপরাধ-মনোবৃত্তির সংশোধন কাজেও এ শিল্প ব্যবহৃত হচ্ছে।

আনন্দদানের উপকরণ হিসেবে এ শিল্পের ব্যবহার বহু পুরাতন। পূর্বে যা সাধারণতঃ মেলায়, হাটে, বাজারে বা জমিদারবাড়িতে এ আনন্দলোকের আসর বসতো, আজ তা প্রাচীন সীমানা পেরিয়ে শহরের বিভিন্ন স্থানেও পরিবেশিত হয়। ক্লাব, ক্লাবঘর, রেস্তোরাঁয়, হোটেলে প্রকাশ্য স্থানে এবং রঙ্গালয়ে তো বটেই, সর্বত্র এ আনন্দলোক ছড়িয়ে পড়েছে।

বিজ্ঞাপনের জগতে বা প্রচার কাজের ক্ষেত্রেও পুতুলনাচ-শিল্পকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এদিক দিয়ে এ শিল্পকে ব্যবহার করার বিষয়ে কতকগুলো সুবিধে আছে। যেমন, এর খরচা খুবই কম। সহজেই বহনযোগ্য এবং যেহেতু এটি সংবাদপত্রে দুই বিজ্ঞাপন বা বেয়ালের পোষ্টারের মত সাধারণ এবং একঘেয়ে ব্যাপার নয়, সেহেতু এটি সহজেই সবার দৃষ্টি কাড়তে পারে। ফরাসী দর্জিরা বা পোশাক বিক্রেতারা পুতুলনাচ-শিল্পকে নিজেদের বিজ্ঞাপনের কাজেও লাগাচ্ছেন। ১৯৫৫ সালে লণ্ডনে এক প্রদর্শনীতে প্রচারের ব্যাপারে পুতুলনাচের যে আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে দু'জন ফরাসী তা দেখিয়েছেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে। ইংল্যাণ্ডে-ও ওয়াল্ডো ল্যাকাইার বলে এক ভদ্রলোক বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে এ শিল্পকে ব্যবহার করে নাম করেছেন। আবার বাড়িতে বিজলী বাতি রাখবার আবশ্যকতা সম্পর্কে নাটক লিখে সে নাটক পুতুলদের দ্বারা অভিনীত ক'রে কোনেথ উড ও তাঁর এক বন্ধু দেখিয়েছেন।

চলচ্চিত্রে এবং টেলিভিশনেও এ শিল্পকে ব্যবহার করা হচ্ছে। চলচ্চিত্রে এ শিল্পকে ব্যবহারের পরিকল্পনার জনক একজন পোলিশ ভদ্রলোক Ladislas Starewicz। তিনি ১৯১৩ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত পোকামাকড়ের জীবনবিষয়ক কোন ছবি তোলার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। যেহেতু আধুনিক চলচ্চিত্র শিল্পের আশ্চর্য ক্ষমতা তার মি তখনকার চলচ্চিত্র সেহেতু ভদ্রলোক সরাসরি ছবি তুলতে পারছিলেন না। ফলে পুতুলাকারে মডেল ব্যবহার করলেন। এগুলোর সাহায্যে ডকুমেন্টারী ছবি সমূহ তুললেন 'The Four Little Frogs' 'The Grasshopper and the Ant'। তারপর তিনি প্যারিসে চলে আসেন। দশ বছরের পরিশ্রমে তিনি শব্দ ও সঙ্গীত সহকারে বিখ্যাত পাপেটফিল্ম 'The Tale of the Fox' তোলেন। কয়েকজন প্যারিসবাসী তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এইধরনের ছবি তোলেন। কিন্তু পরিণতির ছাপ লাগান এ শিল্পে একজন হাঙ্গেরিবাসী জর্জ পল। তিনি 'আলাদীন এণ্ড্ দি ওয়াণ্ডারফুল ল্যাম্প' এবং 'লার্ডাস অব দি সাউথ সীজ' এবং বিজ্ঞান বিষয়ে আরো কয়েকটি পাপেট ফিল্ম তোলেন।

১৯৪৫ সালের পর থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া পাপেট ফিল্মের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে আসছে। বহু কৃতী গুণী সেখানে এ শিল্পে সেবা দিয়েছেন। যেমন, Trnka, Zeman, Tyrlova, Pojar, Karpas প্রমুখ। Trnka বিখ্যাত পুতুলনাচশিল্প পরিচালক জোসেফ স্কুপার সহকর্মী ছিলেন।

পোল্যাণ্ড চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছে প্রেরণা নিয়ে কয়েকটি ফিল্ম তৈরি করে। এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ ষ্টুডিও হচ্ছে Lodz-এ। পোলিশ পরিচালকদের মধ্যে Hanpe, Bielinska, Badrian প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত পুতুলগুলো তৈরী হয় কাঠ, উল, প্লাষ্টিক প্রভৃতির দ্বারা। ইদানীং রবারও উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিভিন্ন অঙ্গের সন্ধিস্থলে সাধারণতঃ নরম তার ব্যবহার করা হয়। পোষাক তৈরি করা হয় খুব কৌশলের সঙ্গে। পুতুলের বিভিন্ন অঙ্গচালনার ভিতর জীবন্তরূপ ফুটাতে গেলে রীতিমত পরিশ্রমের দরকার হয়। ছয় থেকে আঠারো মাস সময় লাগে সাধারণতঃ একটি পাপেট ফিল্ম তৈরি করতে। এ দীর্ঘ সময়ে কী পরিমাণ ধৈর্য বা মনঃসংযোগ প্রয়োজন হয়, তা সহজেই অনুমেয়। পাপেট ফিল্মকে সফল এবং আকর্ষণীয় করতে গেলে অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রের চেয়ে অনেক বেশি ধৈর্য, বুদ্ধি এবং পরিশ্রম দরকার হয়।

আজ পৃথিবীর বিভিন্নদেশে এ শিল্পের চর্চা বেড়ে যাওয়াতে এ বিষয়ে গবেষণার দিকে ঝোঁক-এ গিয়েছে অনেকের। অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে পুতুলনাচ-শিল্প চর্চিত হবে। যেহেতু এর প্রয়োজনীয়তা বিভিন্নক্ষেত্রে সফল ব্যবহারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেহেতু এর ব্যাপক চর্চা ভারতবর্ষে খুবই দরকার হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে ভারতের মত অনুন্নত দেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ঐর ব্যবহার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিশীলনে সহায়তা করবে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা এ বিষয়ে অপরিহার্য।

পুতুল নাচের শারীরস্থান ॥

সঙ্কর্ষণ রায়

পুতুলনাচের শারীরস্থান নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেতে হয়। সাধারণতঃ অবহেলিত এ শিল্প যাকে নাকি শিশুদের মনোরঞ্জনের বড় মাধ্যম বলে বিবেচনা করা হয়, তার পিছনে কত শিল্পী তাঁদের সাধনা ঢালিয়ে যাচ্ছেন তার ইয়ত্তা নেই। বিচিত্র দেহভঙ্গি, বিচিত্র কলা-কৌশল, বিচিত্র সাজপোশাক, বিচিত্র প্রয়োগ-পদ্ধতি সব মিলিয়ে এ পুতুলনাচের জগত এক অনন্য শিল্প জগত। এ শিল্পভুবন তৈরী করার পেছনে যা সহজে প্রমুখ করে না তা হ'ল খ্যাতি, পেছনে কাজ করছে মুখ্যতঃ ধৈর্য, সূক্ষ্ম শিল্পবোধ, নিজস্ব আইডিয়া ও কঠোর পরিশ্রম।

বিভিন্ন দেশে লক্ষিত নরীর গঠনাকৃতি নিয়ে এ পুতুল নাচ-শিল্পের শারীর স্থান তৈরি হয়েছে। চীনে যে পাউডার পাপেট ছিল, তা আর অন্য কোথাও ছিল না এবং নেই। আবার এমনও জায়গা হয়েছে, যেখানে অন্য দেশের জিনিষ আনা হয়েছে, চর্চা করা হয়েছে, অবশেষে নিজেদের চেহারা তৈরি হয়েছে। সাধারণতঃ পুতুল গঠনাকৃতি এবং কি দিয়ে তৈরি এবং কী ভাবে চালিত হয় ইত্যাদি দ্বারা শারীর স্থান বিচার করা হয়।

সংক্ষেপে এ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

String Puppet বা সুতোর সাহায্যে পুতুলনাচ—সমস্ত রকম পুতুলনাচের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশি জটিল। এর জন্য প্রচুর অনুশীলন প্রয়োজন। কারণ, মানুষের সবরকম গতিবিধি, চালচলন রূপ দেওয়ার চেষ্টা এর ভিতর দিয়ে করতে হয়। প্লিন-পাপেট বিভিন্ন উপকরণে তৈরি করা যায়। তুলো, মসলিন, মাটি, কাঠ। এর মধ্যে কাঠটাই বেশী ব্যবহার করা হয়। শরীরের প্রধান অংশটির সংগে হাত পা মাথা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবে যুক্ত করা হয়। কাঠের পিন, শক্ত তার, চামড়া ইত্যাদি সাধারণতঃ সংযোগকাজে লাগানো হয়। নয়টি সুতোর সাহায্যে পুতুলটিকে নাচানো হয়। কোনটা পিঠের সংগে লেগে থাকে, কোনটা বা কাঁধে, কোন কোনটা মাথার প্রতিটি দিকে, কোনটা জানুতে।

এ ধরনের পুতুলনাচকে ম্যারিওনেট বলা হয়। ইতালীর সিসিলিবাসীদের ব্যবহৃত পদ্ধতিই সবচেয়ে সহজ ও সরল। বহু পুরাতন কাল থেকে আজো তা ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ এগুলো কাঠের তৈরি এবং হাত পা গুলো হালকাভাবে যুক্ত করা হয়।

Rod Puppet বা লাঠির সাহায্যে পুতুলনাচ—এটার উৎপত্তি চীনদেশে প্রথম দেখা দিলেও মূলতঃ এধরনের পুতুলনাচের বিকাশ সাধিত হয়েছে জাভাতে। ছায়াপুতুল নৃত্যেই (Wayang) এগুলো ব্যবহৃত হয়। গোলাকার কাঠের নির্মিত এধরনের পুতুলের কোমর হয় সরু, হাত পা সব সরু। সন্ধিস্থলগুলোতে যুক্ত করা হয় হাত পা মাথা।

একটি লাঠি দ্বারা পুতুলটাকে ধরে রাখা হয়। মঞ্চের চেয়ে নিচু ভূমিতে যাতে না দেখা যায় এমনভাবে শায়িত কলাগাছে সে লাঠিটিকে প্রোথিত করা হয়। হাত পা বা মাথা নাড়ানো হয়-হাতের সংগে যুক্ত লাঠি দ্বারা।

কলাগাছের ভূমিরূপে ব্যবহার জানাতে হয় কিন্তু জার্মানীতে একেবারে মাটিতে প্রোথিত করা হয় যে লাঠিটিকে যেটি পুতুলটিকে ধরে রাখে। ফরাসী দেশে জেনরী সিনোরেট নিজে এক রকমের রড পাপেটের আবিষ্কর্তা। তাকে বলা হয় 'পেডাল' বা 'পিয়ানো পাপেট'।

Jigging Puppets—বাংলা ঠিক ঠিক প্রতিশব্দ দেওয়া মুশকিল এ পাপেটের। ফরাসী সঙ্গীতকাররা যেমন হাতে যখন বেতেন, সঙ্গে পুতুলনাচের আসরও জমাতেন। তাঁদের প্রদর্শিত পুতুলনাচকে বলা হয় Marionnette a la planchette। আলোচ্য পাপেটটি ঠিক এ ধরনের। একটি কাঠের বোর্ডের ওপর একটি পোষ্ট লাগানো থাকে। একদিকে পোষ্টের মাথাতে লাগানো সুতোটিকে অন্যদিকে একটু ফাঁকাতে সঙ্গীতকারের হাঁটুতে আটকানো হয়। সুতোর ওপর দুটি পুতুল সেলাই বা ফিট করে রাখা হয়। সঙ্গীতকার বাঁশী ও বাদ্য বাজানোর সঙ্গে পা নাড়াতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে পুতুলগুলো নাচতে থাকে।

Glove-Poppet বা দস্তানা পাপেট—বোতলের আকারে ভূমির দিকে উন্মুক্ত শরীর এবং শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয় মাথা এবং হাত। মাথাটি বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা তৈরি হয়। যেমন, কাঠ, প্লাষ্টার, প্যাড কাপড় বা নমনীয় জারতীয় রবার ইত্যাদি। হাতগুলোর ভূমিকা সাধারণতঃ সূক্ষ্ম-কাপড় তৈরি দাস্তা দিয়েই সম্পাদিত হয়। এগুলো সম্পূর্ণ খুলানো যাতে না হয়, তার জন্যে অনেক সময় কার্ডবোর্ড ব্যবহার করা হয়। মুণ্ডোটি তৈরি হয় চামড়া বা কাঠ দিয়ে। গ্লোভের মাধ্যমে আঙুল দ্বারা এ পুতুলগুলোকে নাচানো হয় বিভিন্ন আঙুল বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন করে। রাশিয়ান পুতুলনাচ পরিচালিকা নিনা ইয়েকিমোভা এক ধরনের গ্লোভ-পাপেট বা হাত-পাপেট তৈরি করেছেন। তাঁর এটি অনেকটা রড পাপেটের আকার নিয়েছে।

Magnectically Controlled Puppet—এ পুতুলনাচ সম্পাদিত হয় বৈদ্যুতিক চুম্বকের সাহায্যে। ষ্টেজের তলা থেকে সে বৈদ্যুতিক চুম্বকের ব্যবহার হয়।

Three-Man Puppet—এটি জাপানের নিজস্ব। পূর্ব বিবৃত কোনটির সঙ্গে এর মিল নেই। এটি জাপানের ওসাকার বুনরাকু-জু রঙ্গালয়ের সম্পূর্ণ নিজস্ব। তিন জন অপারেটার ষ্টেজে দাঁড়িয়ে এটি সম্পাদন করেন বলে এর নাম ও রকম রয়েছে।

আরো ছোটখাটো পুতুলনাচ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য এবং বেশী প্রচলিতগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে পরিবেশন করা হ'ল।

এখন যে মঞ্চের ওপর পুতুলনাচ দেখানো হয়, সে সম্পর্কে দু'চার কথা বলা দরকার। অন্য রঙ্গালয়ের মঞ্চের চেয়ে পুতুলনাচের মঞ্চ সংক্ষিপ্ত। দ্বিতীয়তঃ তা মঞ্চের পেছনে আড়ালে একটি প্ল্যাটফর্ম থাকে। এটি ষ্টেজের চেয়ে উঁচুতে অবস্থিত। এর ওপর দাঁড়িয়ে পরিচালক এবং চালকরা তাঁদের কাজ করেন। বিভিন্ন ধরনের পুতুলনাচে মঞ্চের গঠনও যথা-উপযোগী হয়। আলোকসম্পাত এবং পর্দাগুলো খুব সহজ পন্থায় হয়।

এভাবে বোঝা যায় পুতুলনাচের জন্যে শুধুমাত্র শিশু মনোরঞ্জনী বলে, এত কলাকৌশল বা বহু-রকম ভাবে এ নিয়ে কঠোর পরিশ্রম হ'ত না। উপরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় কী পরিমাণ পরিশ্রম, ধৈর্য্য সতর্কতা দরকার হয় এক একটি সফল প্রদর্শনীকরতে গেলে।

॥ গ্রীস ॥

ছন্দা রায়

সভ্যতার জন্মকাল থেকেই পুতুলনাচের অস্তিত্ব পণ্ডিতগণ স্বীকার করে আসছেন। সুপ্রাচীন সভ্যতার দেশ গ্রীসে এর অস্তিত্ব থাকবে, এ আর বিচিত্র কি। ক্লাসিক সাহিত্যে গতিশীল পুতুলের বহু উল্লেখ আছে। এরিস্টোটল, হেরোদ, প্লেটো প্রমুখের লেখায় বিশেষ করে String Puppet-এর উল্লেখ প্রচুর পরিমাণে আছে। বিখ্যাত গ্রীক কারিগর থাকে আলেকজান্দ্রিয়ার বীর নায়ক বলা হয় তাঁর নাকি একটি রঙ্গালয় ছিল এবং সে রঙ্গালয়ে Nonplius-এর উপকাহিনী অভিনীত হত। অবশ্য এটা আধুনিক কালে চলিত উৎকৃষ্ট পুতুলনাচের অস্তিত্ব ঘোষিত করে না বটে, তবু একথা বলতে বাধা নেই যে, পুতুল-নাচের অস্তিত্ব যে মূলতঃ ছিল তার প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, রঙ্গালয়ের অস্তিত্ব, পুতুলের অস্তিত্ব এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুতুল খেলার অস্তিত্ব।

আধুনিক গ্রীসে যে পুতুলনাচের চল হয়েছে, তার অনেকটাই তুরস্কের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে সম্ভব হয়েছে। তুরস্কের যে 'কারাগিউয়েজ' চরিত্রের ভারীয় চল আছে, সেটি ষোড়শ বছর পূর্বে গ্রীসদেশ গ্রহণ করেছে। 'গ্রহণ' বলতে এখানে শুধু অনুকরণই বোঝানো হচ্ছে না, গ্রীস সেটাকে আত্মসাৎ করতে সমর্থ হয়েছে। তারা 'কারাগেনসীস' রঙ্গালয়ের জন্ম দিয়েছেন। এটি গ্রীসে খুব জনপ্রিয় হয়েছে। সেখানে বহু দোকানে এ 'কারাগেনসীস' চরিত্রগুলোকে মুদ্রিত করে দোকানে টাঙিয়ে রাখা হয় শিশুদের জন্য।

এথেন্স-এ স্যাথারিস্ ছায়ানৃত্যের রঙ্গালয়-ও সেখানে আজ বিখ্যাত হয়েছে। স্যাথারিস্ সে রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিখ্যাত গ্রীক পুতুলের ছায়ানৃত্য-পরিচালক। তিনি বলেন, প্রাচীন গ্রীক অট্টালিকা, প্রাচীর গাত্রে খোদাই করা মূর্তিগুলো যা পুরোনো পুতুলগুলো তাঁকে ভীষণ প্রেরণা দিয়েছে। তিনি নিজেকে এ শিল্পের পেছনে পুরোপুরি নিবেদিত করেছেন। তাঁর ছেলেও এ নিয়ে কয়েকবছর থেকে তৈরি হয়ে উঠেছে। শিশুর মনোরঞ্জন তো বটেই, সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যঙ্গাভিনয়-ও এ শিল্প যথেষ্ট জবর পেয়েছে। সামাজিক জীবন-ও ধরা পড়ে। কারাগেনসীস রঙ্গালয় বিশেষ করে রাজনীতি ও সামাজিক বিষয় নিয়েই চর্চা করেন।

রুশ পরিচালক সার্গেই ওবরাৎসভ জাদু জানেন। মনে হয় যেন সত্যি সত্যিই বাবা তার দুরন্ত ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছেন। ছেলেটি কিছুতেই ঘুমোতে চায় না। বাবা গান ভালবাসেন, তাকে-ও গান গাইতে দেবে না। বাবার আঙুল কামড়াবে চুষবে। ছেলে এক সময় ঘুমোতে গেল। বাবা ঘুম পাড়ালেন শেষ পর্যন্ত। এ বিষয়টিই ওবরাৎসভ তাঁর 'The Lullaby' পুতুল নাট্যাভিনয়ে আশ্চর্য জাদুকরী প্রতিভায় ফুটিয়ে তুলেছেন। দর্শকরা মুগ্ধ। পুতুলও জীবন্ত হতে পারে। সত্যিই তিনি জাদু জানেন।

তুরস্ক।

প্রণব ভট্টাচার্য্য

তুরস্কের পুতুলনাচ-শিল্প মূলতঃ তৈরি হয়েছে তিন শতক পূর্বে। এর পূর্বে পুতুলের অস্তিত্ব থাকলেও পুতুলনাচের শিল্পটি খানা বাঁধে তিনশ' বছর আগে। এবং জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে বিস্তর।

তুরস্কের এ জনপ্রিয় পুতুলনাচ শিল্প ১৫০ বছর পূর্বে গ্রীসদেশকে প্রভাবিত করেছিল। গ্রীসের আধুনিক অধ্যায় শুরু হয়েছে এ তুরস্কের 'কারা গিউয়েজ' চরিত্র থেকে। এই 'কারাগিউয়েজ' শব্দটির অর্থ কৃষ্ণ চক্ষু। এবং একটি জিপসী জীবনই এ চরিত্রের অবলম্বন।

তুরস্কে এই পুতুলনাচ-শিল্প ছায়ানৃত্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। কারাগিউয়েজ একটি ছায়া পুতুল। হাস্যকৌতুকাভিনেতা কারাগিউয়েজ তার মাথার মস্ত বড় পাগড়ির জন্য তুরস্কে বিখ্যাত। কারাগিউয়েজ বলতে সাধারণতঃ এবং মুখ্যতঃ একটি চরিত্র বোঝালেও, ছায়ানৃত্য এবং একটি বিশিষ্ট অভিনয়কে-ও চিহ্নিত করে। অর্থাৎ একটি বিশেষ ষ্টাইলের ছায়ানৃত্যকে চিহ্নিত করে। কারাগিউয়েজ চরিত্রটি দর্শকদের বিভিন্নভাবে আমোদ আহ্লাদ বিতরণ করে। তার প্রেমকৌশল, তার শারীরিক বল, তার মস্ত বড় পাগড়ি, কৃষ্ণ চক্ষু এবং কৃষ্ণ দাড়ি—সব মিলিয়ে তুর্কীরা একে আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছে। পাশ্চাত্য দর্শকরা একে অশোভন (indecent) বলে উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু তুর্কীরা একে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

কারাগিউয়েজ চরিত্রটির আধুনিক রূপ দিতে গিয়ে একটি ইউরোপীয় শিক্ষার তৈরি আরেকটি চরিত্রকে যোগ করা হয়েছে। এই শেষোক্ত চরিত্রটি Hadjiavato পাশ্চাত্য দর্শকদের কাছে প্রিয়, বিশেষ করে তার মার্জিত চালচলন। এ নব্য যুবাটি কথায় কথায় আরবী শব্দও ব্যবহার করে। কারাগিউয়েজ ও তার এই আধুনিক বন্ধুটি তুরস্কে প্রিয়।

তুরস্কের ছায়ানৃত্যবহু জনপ্রিয় পুরোনো কাহিনী, প্রচলিত উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি অবলম্বনেই বেশী রচিত হয়।

ঘটনাটা ঘটেছিল তিন হাজার বছর আগে চীনে। বিখ্যাত পুতুলনাচ পরিচালক ইয়াংশি সম্রাট মু-ওয়াং-এর সামনে পুতুল-অভিনয় দেখিয়ে সম্রাটকে বিভ্রান্ত করেছিলেন। ইয়াংশি সম্রাজ্ঞী এবং রাজসভার সদস্যদের প্রতি এমন নিপুণভাবে কটাক্ষপাত করছিলেন তাঁর পুতুলগুলোকে দিয়ে, সম্রাট প্রথমে হকচকিয়ে গেলেন, পরে ক্রুদ্ধ হলেন এবং সবশেষে আদেশ দিলেন ইয়াংশিকে ফাঁসিতে ঝুলাবার। আজ্ঞা বাহক কাছে আসবার আগেই পরিচালক নাচ ভেঙে দিয়ে দেখালেন যে এরা জীবন্ত নয়। আসলে পুতুলগুলোই নাচছিল। তিন হাজার বছর পূর্বে চীনে এমন ঘটনাও ঘটেছিল।

আমেরিকা ॥

প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী দেশ আমেরিকা। অর্থে, বিজ্ঞানে সবদিক দিয়ে এদেশের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু যখন আমেরিকা ছিল নূতন দুনিয়া, তখন? তখন সেখানে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক ছুটে আসে সে কুমারী জমিতে সোনা ফলাবার জন্যে। ইতালী থেকে ইটালিয়ান, জার্মানী থেকে জার্মান, ইংল্যাণ্ড থেকে ইংরেজ, ফ্রান্স থেকে ফরাসী, এইভাবে বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন জাত এসে ভীড় করেছিল সে নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ডে। সংগে নিয়ে আসেন সমস্ত জাত তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যসমূহ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের বৈচিত্র্য সমৃদ্ধতর করে তোলা তারা। আজকের আমেরিকা আজকের পুরোনো দুনিয়ার কাছে সবদিক দিয়ে ঋণী। পুতুলনাচের ক্ষেত্রেও তাই। ফলে আমেরিকার পুতুলনাচ-শিল্পে বিভিন্ন দেশের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলে তাতে আর আশ্চর্যের কীইবা আছে।

দু'শতক পূর্বে সেখানকার ইণ্ডিয়ানরা নাকি পুতুলনাচ দেখাতেন তাদের ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে। ১৭৩৯-এ নিউইয়র্ক শহরে হুণ্টের সংরক্ষণে এক প্রদর্শনী হয়েছিল। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত বিদেশীরা জীবিকা উপার্জনের টানে নতুন দুনিয়ায় ভীড় করতে লাগলেন। সংগে আরো অনেকের সাথে পুতুলীওয়ালার দলও ভীড় করেন। তা'হলেও ১৯১৫ সালের পূর্বে সেখানে পুতুলনাচের উন্নতি বা জনপ্রিয়তা দেখা গেল না। ১৯১৫ সালে চিকাগো শহরে এলেন ভেন ডলকেনবার্গ মরিস-ব্রাউনের সাহায্যে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তারপর ধীরে ধীরে চিকাগোর লিটল থিয়েটারে কয়েকখানিই অনুষ্ঠান করলেন। এবং সেগুলো যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করে। প্রদর্শিত দুটি বই বিশেষ নৈপুণ্যসহকারে সম্পন্ন হয়েছিল। এ দুটি বই, Alice in Wonderland এবং A Midsummer Night's Dream।

এখান থেকে প্রেরণা পেয়ে টনি সার্গ নামক একজন ছবি আঁকিয়ে এগিয়ে এলেন এবং মিস ডলকেনবার্গের সংগে থেকারের 'দি রোক এণ্ড দি রিং' বইটি রূপ দেন ম্যারিওনেটের সাহায্যে।

তারপর চললো এশিয়ের সমৃদ্ধির যুগ। রেমো বুফানো বলে এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন। এবং সংগে সংগে আরো অনেকে।

শুধু অনুষ্ঠান করে গেলে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে না বলে থেকে উত্তরসূরীরা প্রয়োগকৌশল সম্পর্কে কিছু জানতে পারেন এবং আরো উন্নতির স্বাক্ষর দিতে পারেন। তাই প্রকাশিত হ'তে থাকল বই। যেমনো 'The Tony Sarg Marionette Book', বুফানোর 'How to be a Puppet Showman'।

ডেট্রয়েট শহরের ম্যাকক্লারলিন আমেরিকার পুতুলনাচ-শিল্পকে বেশ প্রভাবিত করেছেন। তাঁর প্রবর্তিত নিয়মকানুন, কলাকৌশল বেশী অনুসৃত হয়েছে আমেরিকায়। তিনি বই-ও লিখেছেন এবিষয়ে। ১৯৩০ সালে তিনি প্রকাশ করেন 'Puppetry' নামক বার্ষিকী এবং কয়েক বছর ধরে এই বার্ষিকী প্রকাশ করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে The Puppeteers of America নামক প্রতিষ্ঠানটির সংগঠনে ম্যাকক্লারলিনের অবদান অনেকখানি।

এখন আমেরিকায় এ পুতুলনাচ-শিল্প প্রচুর আদর পেয়েছে এবং পাচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ শিল্পের ব্যবহার আজ সেখানে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। টেলিভিশনে, চলচ্চিত্রে, বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে এবং সর্বোপরি শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এ পুতুলনাচ-শিল্পকে সেখানে ব্যবহার করা হয়। স্কুলের ছেলেদের শিক্ষাদান-কাজকে সহজ করার জন্যে প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে পুতুল নাচের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

আজ আমেরিকায় তাই পুতুলনাচ-শিল্প বিশেষজ্ঞ লোকের ছড়াছড়ি।

অষ্ট্রিয়া ॥

সুচিত্রা মজুমদার

ঠিক ঠিক কবে থেকে অষ্ট্রিয়ায় পুতুলনাচ-শিল্পের আবির্ভাব ঘটেছিল এ বলা মুশকিল। তবে ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানী ও ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে যে-জোয়ার এক সময় ষোড়শ শতাব্দীতে বয়েছিল এ শিল্পের চর্চার ব্যাপারে, তার ঢেউ ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত অষ্ট্রিয়ার বুকে এসে যা দেবে এ আর এমন বিচিত্র কি!

ইতিহাসের বুকে যেমন আর আর কতকগুলো ঘরে রাখার মত স্পষ্ট ঘটনার অধ্যায় শুরু হয় তেমনি অষ্ট্রিয়ায় সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম হাত কৌতুকাভিনেতার আবির্ভাবে সেখানে একটা সক্রিয় সাড়া পড়ে যায় এ শিল্পের জগতে। এ হাত কৌতুকাভিনেতা পুতুল চরিত্রটি হল ব্রিটেনের জ্যাক পুডিং-এর অনুকরণে সৃষ্ট Hanswurst। এই চরিত্রটি যুগপৎ জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ায় খুবই প্রিয়। অষ্ট্রিয়ায় এধরনের আরেকটি চরিত্র খুব শীঘ্রই দেখা দিল। তার নাম Kasperl। অনেকটা ব্রিটিশ পাঞ্চের মত। পাঞ্চের আবির্ভাব ব্রিটেনের পুতুল নাচের ক্ষেত্রে যে কৌতূহল, উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি এই Kasperl করেছিল অষ্ট্রিয়ায়। অষ্ট্রিয়ার এই আদুরে চরিত্রটি আবার জার্মানীতে খুব খাতির অর্জন করতে সমর্থ হয়।

তারপর উনবিংশ শতাব্দীতে একজন ভিয়েনাবাসী কারুশিল্পী গিসেল ব্রেখট্ তাঁর ম্যারিওনেট নিয়ে এ শিল্প-জগতে আবির্ভূত হলেন। তাঁর আশ্চর্য দক্ষতার গুণে তাঁর পুতুলগুলো আসল মানুষের ক্রিয়াকলাপ চমকপ্রদভাবে ফুটাতে পারতো। এই সময় থেকেই বাস্তব জীবনের ছাপ পড়তে লাগলো এই শিল্পের জগতে অষ্ট্রিয়া দেশে। ফলে পুতুল তৈরি এবং বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের ব্যবহার শুরু হ'ল।

বিশ শতকে আবির্ভূত হলেন আধুনিক অষ্ট্রিয়ার পুতুলনাচ শিল্পের জনক আন্টন আইচার এবং অধ্যাপক রিচার্ড টেক্স্নাইডার্। আন্টন ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন বিখ্যাত সালজবার্গ ম্যারিওনেট থিয়েটার। তিনি মোজার্টের 'Bastien and Bastienne' বইটি রূপায়ণে দেখান ম্যারিওনেটের সাধ্যের। তিনি ১৯৩০ সালে মারা গেলে তাঁর পুত্র হেরমান আইচার পিতার প্রেরণাধন্য প্রতিভাকে কাজে লাগালেন পুতুলনাচ-শিল্পের ক্ষেত্রে। আন্টন বহু প্রয়োগকৌশলের আবিষ্কার করে যান এবং তিনি ৩৩টি নাটক অভিনীত করে যান। তাঃ ফাউষ্ট নাটকটিই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এখনো তাঃ ফাউষ্ট সেখানে প্রদর্শিত হয়।

অধ্যাপক টেক্স্নাইডারের পুতুল নাচের দলও অষ্ট্রিয়াবাসীদ্বারা গৃহীত হয়েছিলেন। তিনি 'রড-পাপেট' নিয়েই মূলতঃ তাঁর আন্দোলন পরিচালনা করেন। যাদুকরী দক্ষতার স্পর্শে জনমনকে আকর্ষণ করেছিল তাঁর 'রড পাপেট'গুলো। ১৯৫১ সালে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ব্যবহৃত জিনিসগুলো অমূল্য বিবেচনায় অষ্ট্রিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারের রঙ্গালয় বিভাগে যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে।

পুতুল নাচ-শিল্পে অন্যান্য দেশ সমূহ।

সমীরকুমার বসু

পুতুল নাচ-শিল্প আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া, জাপান, ভারতবর্ষ, পোলাণ্ড, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশেই যথাযথ সক্রিয়, জনপ্রিয় এবং ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়। তবুও মোটামুটি অন্যান্য দেশগুলো যে একেবারে অন্ধকারে পড়ে আছে এ শিল্পে তা মোটেই নয়। এর কারণ হল, পুতুলনাচ-শিল্প একটি সার্বজনীন আবেদন বহন করে। এ সার্বজনীন আবেদনের জন্যেই উল্লিখিত বৃহৎ দেশগুলো ব্যতীত অন্যান্য দেশেও কম বেশি এ শিল্পের চর্চা আছে।

সংক্ষেপে এ দেশগুলোতে কী পরিমাণ চর্চা হয়েছে এবং এ শিল্পের কতটা বনেদ রয়েছে, তাই বিবৃত করা হবে।

রুমানিয়া—এদেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মেলা বা হাট বাজারে সীমাবদ্ধ ছিল পুতুলনাচের আসর। যুদ্ধের পর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়েছে এ শিল্পের এবং ব্যাপক আদর অর্জন করেছে। এখন সেখানে ১৯টি কেন্দ্রীয় পুতুলনাচের বনেদ আছে। এদের মধ্যে বিখ্যাত হল Teandirina Marionnette and Poppet Theatre বুখারেস্টে অবস্থিত। এটি ১৯৫৯ সালের পর ৩০০০ প্রদর্শনী দেখিয়েছে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত। এ বিখ্যাত বনেদে দু রকম পুতুলনাচ দেখানো হয়। (১) গ্লোভ অথবা হ্যান্ড পাপেট্স্; (২) রড পাপেট্স্ বা ম্যারিওনেট। অপারেটারদের সংখ্যা এ বনেদে প্রায় ৫০ জন। সব রকম বিষয়েরই নাটক অবলম্বিত হয়। সেপ্টেম্বর থেকে জুলাই পর্যন্ত শিশুদের প্রদর্শনী সময়। শুধু অগস্টে কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য।

বেলজিয়াম:—পুতুলনাচের আধুনিক অধ্যায় এখানে শুরু হয়েছে অঙ্কন-শিল্পী কার্লো স্পেডারের হাতে। তিনি তৈরি করেছেন ব্রাসেল্স্-এ বিখ্যাত বনেদ Theater du Perruchet। এ বনেদটি খুঁটিনাটি প্রয়োগ কৌশল, দৃশ্যাবলী সাজানো এবং সাজপোষাকের জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছে। সাধারণতঃ ম্যারিওনেটের ব্যবহার এ বনেদে বেশি। আরেকটি বনেদ সেখানে রয়েছে, সেটির নাম Theatre Toone। এখানে ঐতিহ্যাশ্রয়ী বিষয়সমূহ এবং চরিত্রগুলোই প্রদর্শিত হয়। যেমন Wolbje, Tchatchoes ইত্যাদি ধরনের ঐতিহ্যান্বিত চরিত্রই অবলম্বন করে শেষোক্ত বনেদটি।

সুইজারল্যাণ্ড—এদেশে জুরিকের Fred Schcechenburger-ই প্রভাবশালী ব্যক্তি এ শিল্পে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত আধুনিক এবং তিনি রড পাপেট ব্যবহার করেন বেশী। সমকালীন জীবনের বিভিন্ন দিককে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করার দিকেই তাঁর নজর অধিক। দারিদ্র্য, লোভ এবং হিংসার ভয়াল রূপ দেখাতে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি তাঁর পুতুল নাচের সাহায্যে।

ইতালি, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইস্রায়েল প্রভৃতি দেশেও অল্প বিস্তর চর্চা শুরু হয়েছে। গ্রীসে জর্জ পল নামক এক ভদ্রলোক পাপেট নিয়ে খুবই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিও তিনি অর্জন করেছেন। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ এবং দক্ষিণ সমুদ্রে প্রেমিকযুগল নামক দুটি বই তিনি পুতুলনাচের সাহায্যে চলচ্চিত্রে রূপ দেন। যুগোস্লাভিয়ায় Marionette Theatre Ljubljana বিখ্যাত বনেদ। এখানে বেশ কয়েকজন দক্ষ পরিচালকের দেখা মেলে। মারা ক্রালজেবার ভাঁড়টি একটি স্মরণীয় সৃষ্টি। Sleepy Little Star বইটি মিলনিলস্কির পরিচালনায় অপূর্ব এক স্বপ্নিল রূপ পেয়েছিল পুতুলগুলোর ভিতর। দক্ষিণ আফ্রিকার জন রাইট, ইতালির ফ্রান্সিস্কো টুসেনব্রোয়েক, ইস্রাইয়েলের বেনশালোম প্রমুখের নাম এ শিল্পের জগতে স্মরণযোগ্য।

উৎসব অনুষ্ঠানে ও পূজা পার্ব্বণে

লক্ষ্মী ঘি

বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দের বার্ত্তা বহন করে।

হাজার হাজার প্রশংসা পত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকটী —

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটী ভাল ঘিনিষ।

শ্রীসুধাংশুকান্তি ঘোষ
সম্পাদক – আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুবাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লক্ষ্মীঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

আমি লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডাঃ কালিদাস নাগ

লক্ষ্মীঘৃত ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি: ইহার ঘ্রাণ ও গন্ধ ভাল

শ্রীসীতা দেবী

লক্ষ্মীমার্কা ঘি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। ইহাতে লুচি পরাটার স্বাদ ভাল ও সুখাদ্য হয়।

শ্রীমায়া দেবী

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি খাওয়ার পর আমি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অভাব, অনায়াসে আমাদের ইহা ব্যবহার করিতে পারে।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

বিশুদ্ধ, পবিত্র ও স্বাস্থ্যপ্রদ

ছোট বড় সকল রকম টিনে পাওয়া যায়।

॥ লক্ষ্মীলাভ এজেন্সী • ৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ ॥

গল্প-ভারতী

সপ্তদশ বর্ষ । প্রথম সংখ্যা । আষাঢ় ১৩৬৮

UNIVERSITY

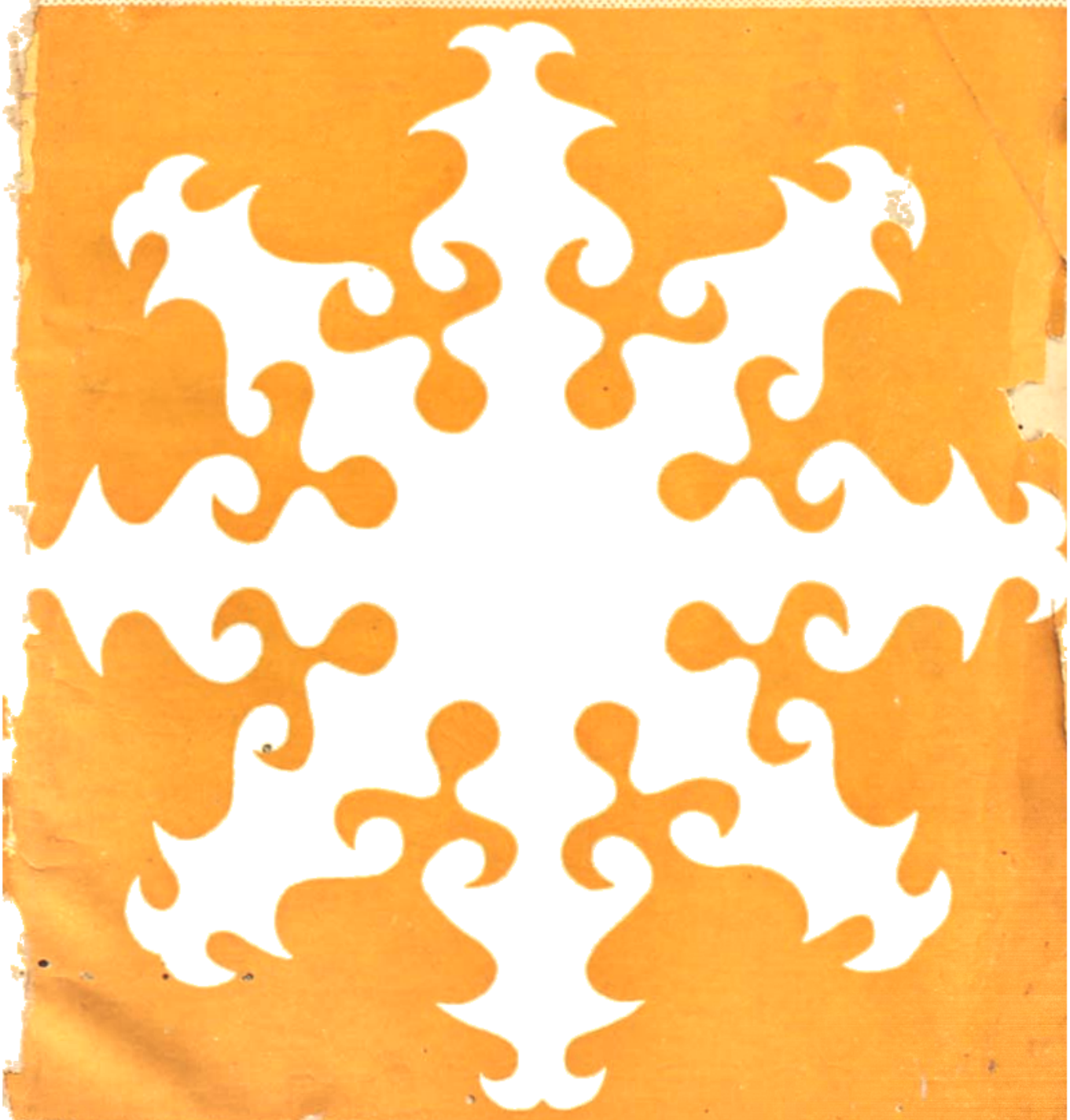

দুইটি নূতন উপন্যাস। একটি বড় গল্প।

লিলির রিচ নোনতা বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোং.প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

কথাপ্রসঙ্গে—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

শুক্তি-সৈকত—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

বিশ্ব-বাণী

রম্যাণি বীক্ষ—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

স্তুতি—ডাঃ নবগোপাল দাস ৩৬

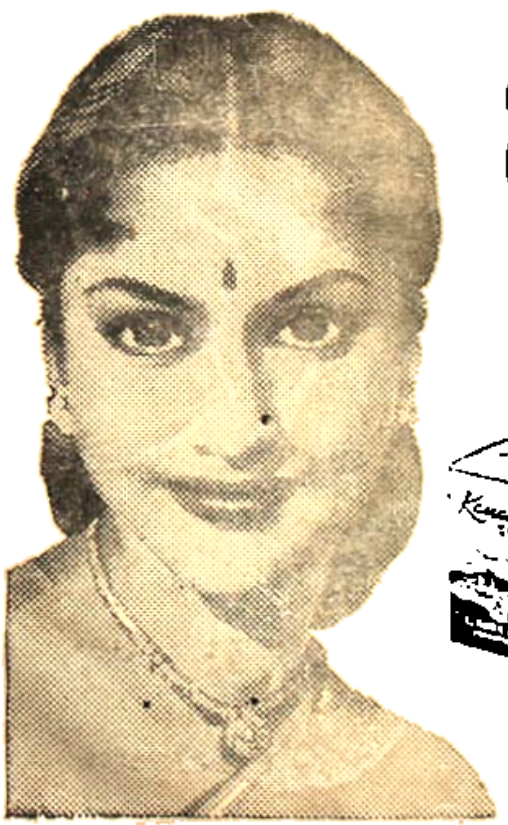

রূপচর্চ্চায়

কে, হোড়ের

প্রসাধনী

কে, হোড় এণ্ড কোং • কলিকাতা-১৪

// এই সংখ্যায়

ধনেশ দস্তিদারের সিংহ-শিকার

বাংলা রঙ্গালয়ের নব-রূপায়ণ—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার

সাহিত্য ও সাহিত্যিক—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

পাহাড়ী গাঁয়ের কথা (উপন্যাস)—নীলিমা দাশগুপ্তা

সমবেদনা—শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি

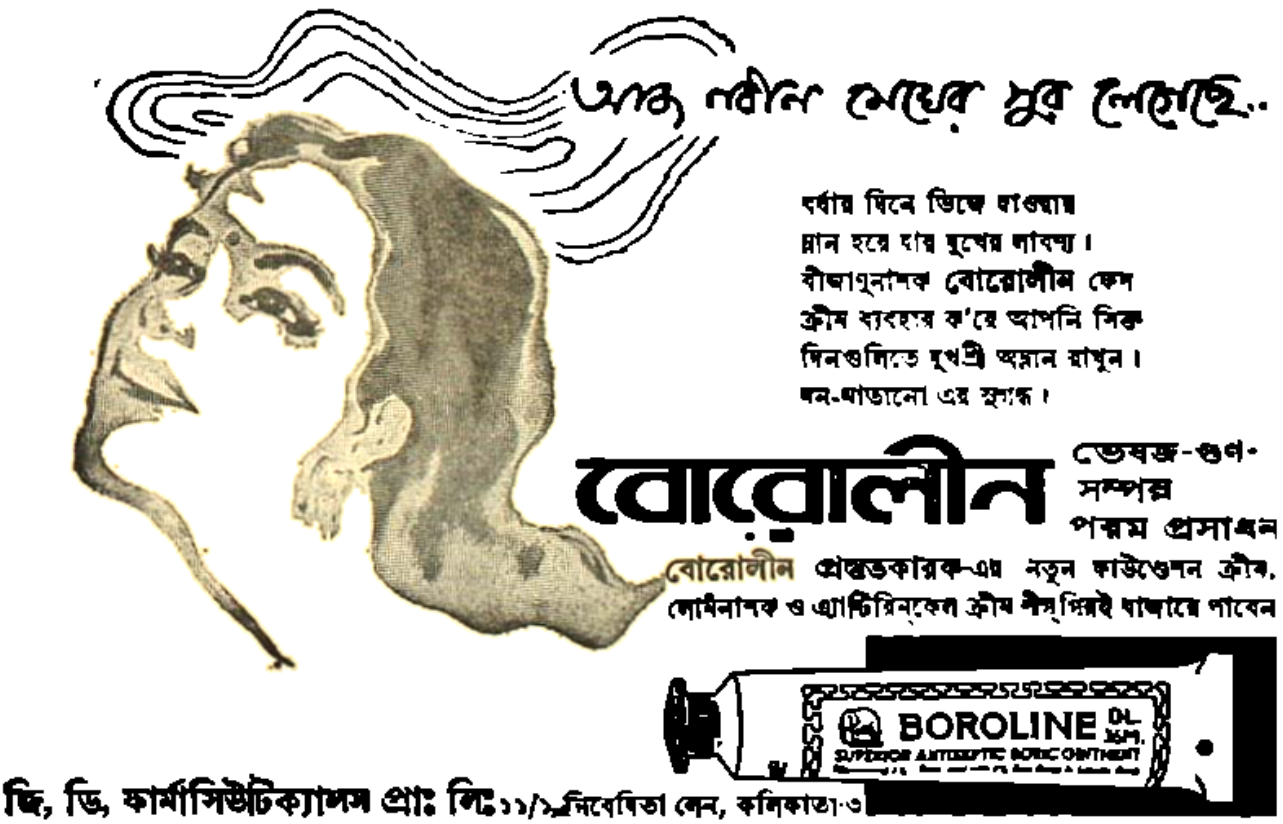

কী পেয়েছি কী পাইনি..

তার হিসেব ক'রে লাভ কী? অল্পস্বল্প যা পেয়েছি, তাকে ভালো ক'রে ধরবার চেষ্টা করব, আর যা পাইনি অথচ চাই, তা করতে হবে পাবার চেষ্টা।

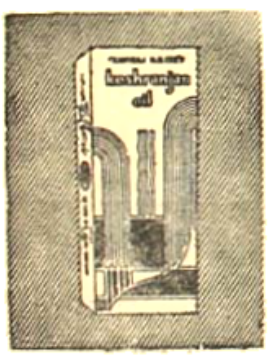

আপনার চুল ভাল জাতের হ'লে আপনার একমাত্র চেষ্টা হবে তা'র গৌরবটি বজায় রাখা। আর তেমন না হ'লে মোট-কথা চুলের জাত যেরকমই হোক না কেন, কেশরঞ্জন তেল তার শ্রীবৃদ্ধি করবেই।

কেশরঞ্জন একটি অভিজাত প্রসাধনী হলেও এর আবেদন কিন্তু সকলেরই মনে কেননা এর দাম সত্যই অসাধারণ।

প্রস্তুতকারক এন,এন সেনের

কেশরঞ্জন

ওডোফারন কেমিক্যাল

এই সংখ্যায়

চলতি দুনিয়া ৮৮

বাংলা উপন্যাসের সূচনা—সূর্য মিত্র

বিশ্ব ব্যঙ্গ চিত্র

খেলাধূলা—ক্রীড়ানোদী

পুরীতে রথযাত্রা—(ছবি)

অব্যাহত গতি

একদা মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া ইহাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন লেখকের খোঁজ করিতেছিলেন। কিন্তু কেহই এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইতেন না। অবশেষে পার্বতী-তনয় গণেশ এই শর্তে রাজি হইলেন যে তাঁর লেখনী মুহূর্তের জন্যও থামিবে না।

আধুনিক যুগের লেখকরাও চান যে তাঁদের লেখার গতি কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়। আর এই অব্যাহত গতির জন্যই সুলেখা আজ এত জনপ্রিয়

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ ; কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

এই সংখ্যায়

শিশির স্মরণে—

শিশির স্মরণে—শ্রীসুনিতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

রঙ্গমঞ্চ ও শিশিরকুমার—বিনয় ভট্টাচার্য

বিদেশীর চোখে শিশিরকুমার—অমল মিত্র

শিশিরকুমার—শ্রীদৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

7563

০০৪/৪

নিঃসঙ্গে কাজ করিতেই ভালবাসেন অর্থাৎ লোকমত ও ঘুষের কথা যে কর্মচারীরা নীতি পরিচালিত করিবেন তাঁহাদিগের মত গ্রহণও প্রয়োজন মনে করেন না।

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী সাধারণভাবে এই উক্তি না করিয়া প্রধান মন্ত্রীর সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন, দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন শাসক-সম্প্রদায়ের ত্রুটি দেখান ও তাহার সমালোচনা করাই লোক প্রয়োজন মনে করিত। কিন্তু তাহার পরে —ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার মন্ত্রী প্রভৃতির প্রশংসা করাই রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার ফলে প্রধান মন্ত্রী নিরপেক্ষ প্রশংসার ও তোষামোদের রাজ্যে বাস করিতেছেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে—কলিকাতার অসাধু ব্যবসায়ী হরিদাস মুন্দ্রার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত মামলায় জীবন বীমাবিভাগের টাকা তাঁহাকে ঋণদান সম্বন্ধে নানা অপ্রিয় অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছিল, এবং অর্থমন্ত্রী সেই কারণে পদত্যাগ করেন। অভি-যোগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য ভূতপূর্ব বিচারপতি ভিভিয়ান বসুর নেতৃত্বে অনুসন্ধান চলিতে থাকে। অনুসন্ধানফল না জানিয়াই প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীর প্রশংসা কীর্তনে পঞ্চমুখ হওয়ায় অনেকেই বিস্ময়ানুভব করেন। হরিদাস কংগ্রেসের তহবিলে অর্থ প্রদান করায় তাঁহার তাগো সরকারের তহবিল হইতে ঋণপ্রাপ্তি সম্ভব হইয়াছে এমন অভিযোগের উল্লেখ বসু মহাশয় করিলে প্রধান-মন্ত্রী ধৈর্য হারাইয়া তাঁহাকে স্নায়ুবৃদ্ধি বলিয়া দোষারোপ করিতে কুণ্ঠা অনুভব করেন নাই! প্রধান-মন্ত্রীর এই কার্য যে দেশে আইনের শাসনের মূলে কুঠারাঘাত করে শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহা দেখাইয়া দিলে তবে প্রধানমন্ত্রীর চৈতন্য উদয় হয় এবং তিনি বসু মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও আপনার ত্রুটি স্বীকার করেন। তিনি তাঁহার উক্তির যে কারণ দর্শাইয়া ছিলেন তাহা একান্ত হাস্যোদ্দীপক এবং গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তিনি বলেন, তিনি যখন

বিশ্ব ব্যঙ্গ চিত্র

আগন্তুক—
খোকা !
বেশ তো তোমার
ছবি আঁকার
হাত আছে
দেখছি !
চমৎকার
এঁকেছো ত !

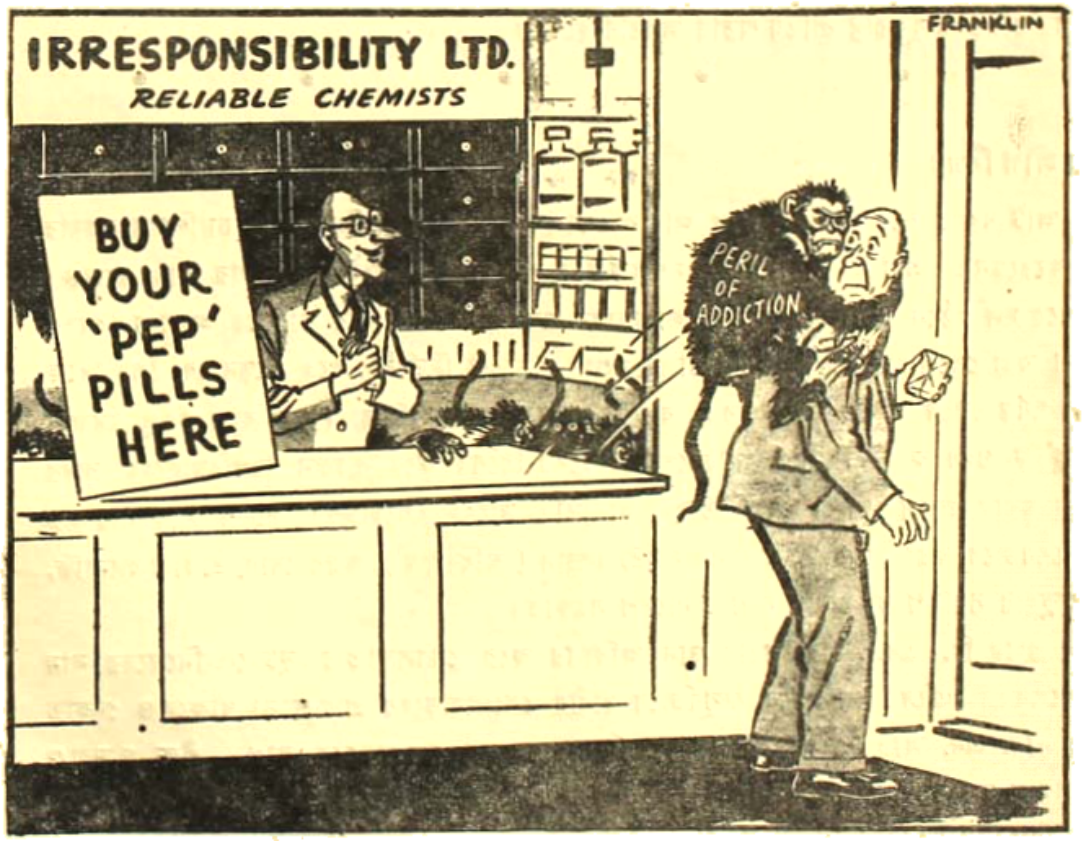

"THE MONKEY! OH, THAT'S PROVIDED FREE WITH THE PRODUCT, SIR!"

কতকগুলি ওষুধ আছে যা নিয়মিত ব্যবহার করলে এমন বদ্ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় যে তখন আর তা কিছুতেই ছাড়া যায় না— তারা ভূতের মত কাঁধে চেপে থাকে। বিলাতের বিখ্যাত কার্টুনিষ্ট ফ্রাঙ্কলিন রেখাচিত্রে এইটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

॥ শিল্পীর তুলিতে ॥

॥ পুরীতে রথযাত্রা ॥

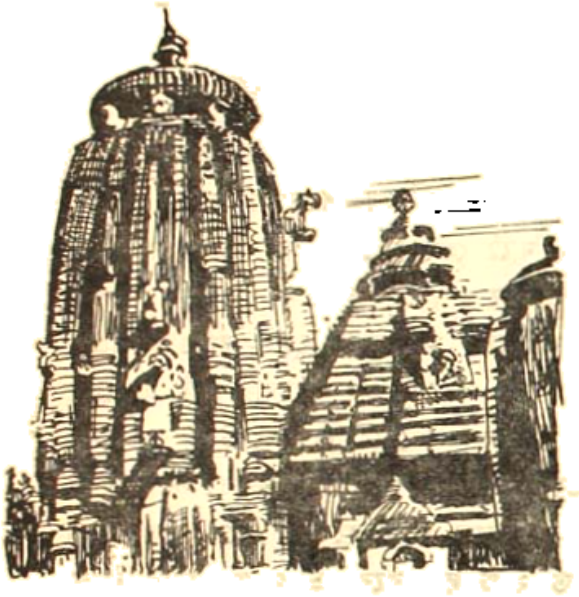

জগন্নাথের মন্দির

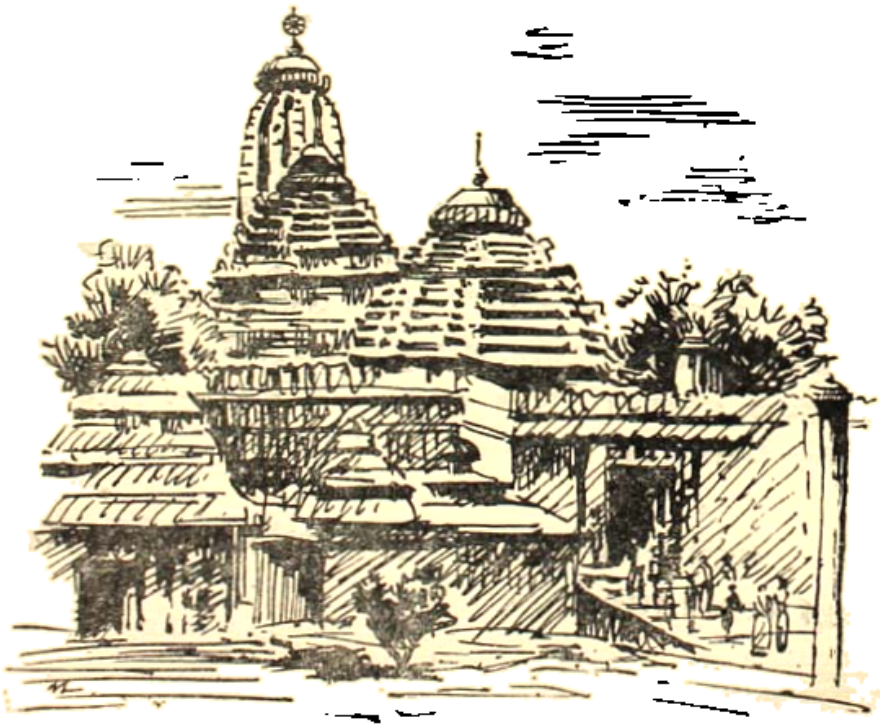

মন্দিরের প্রাঙ্গণ ও প্রবেশপথ

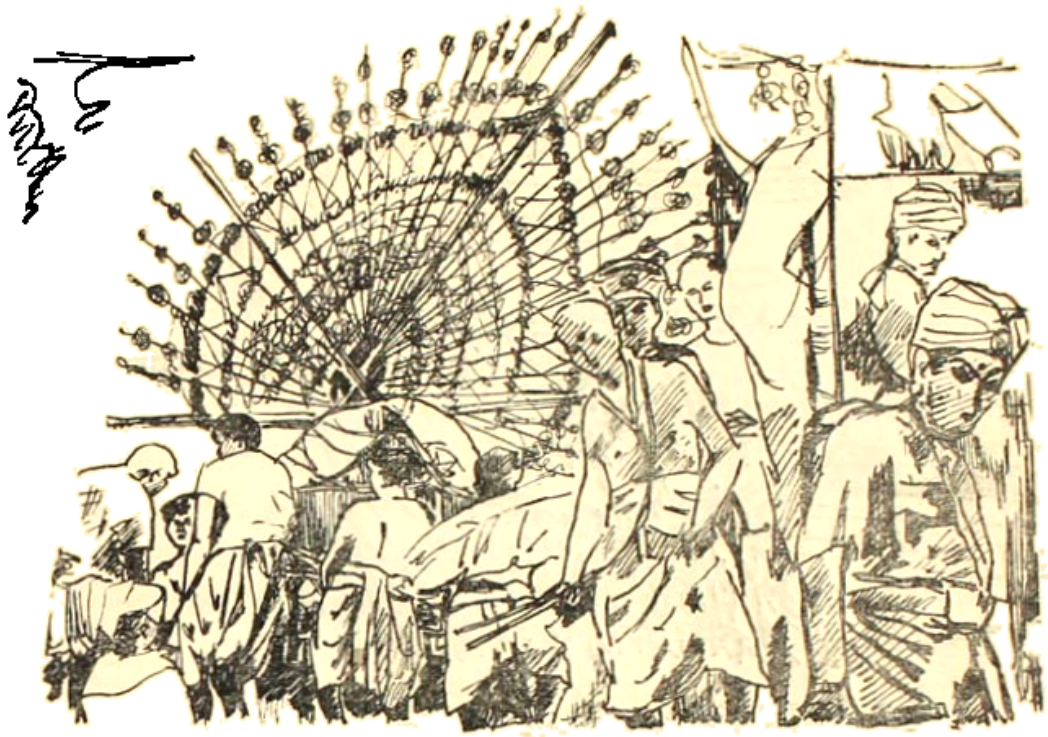

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথে আরোহণ

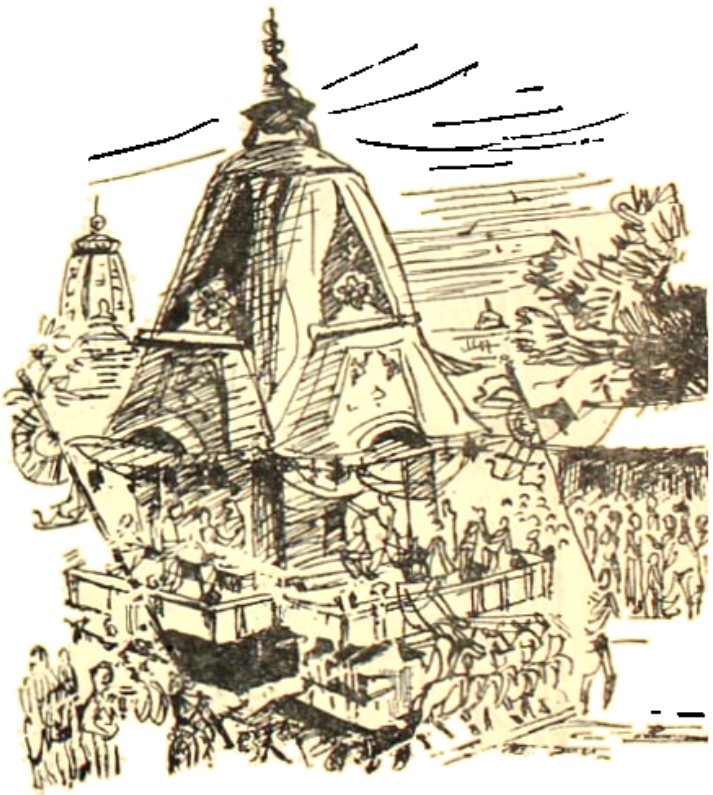

রথসজ্জা

রথটানা

রথের মেলা

National

CYCLE TYRES and TUBES
BELTINGS and HOSES

National's Manufacturing range includes:

ROADFINDER
Cycle Tyres & Tubes

Beltings — Transmission & Conveyor

Hose

Railway Rubber Fittings

Fan Belts & V-Belts

Rubber Flooring

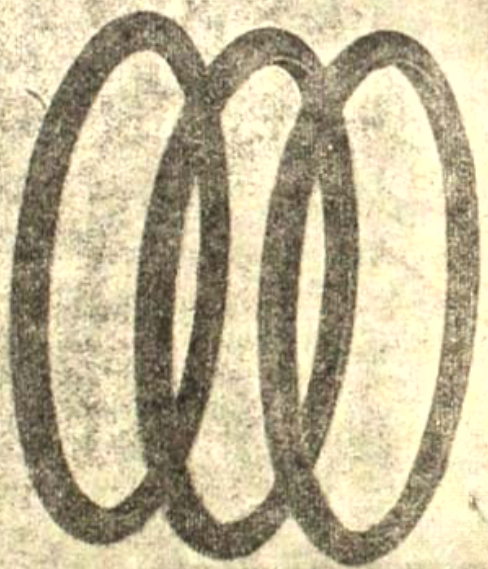

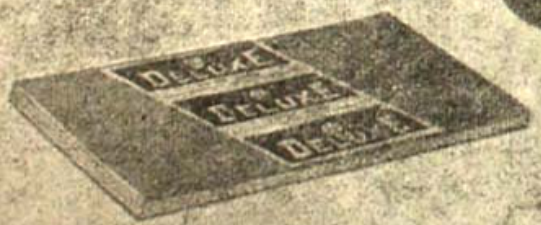

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

BOMBAY • CALCUTTA • DELHI
KANPUR • MADRAS • KOTTAYAM

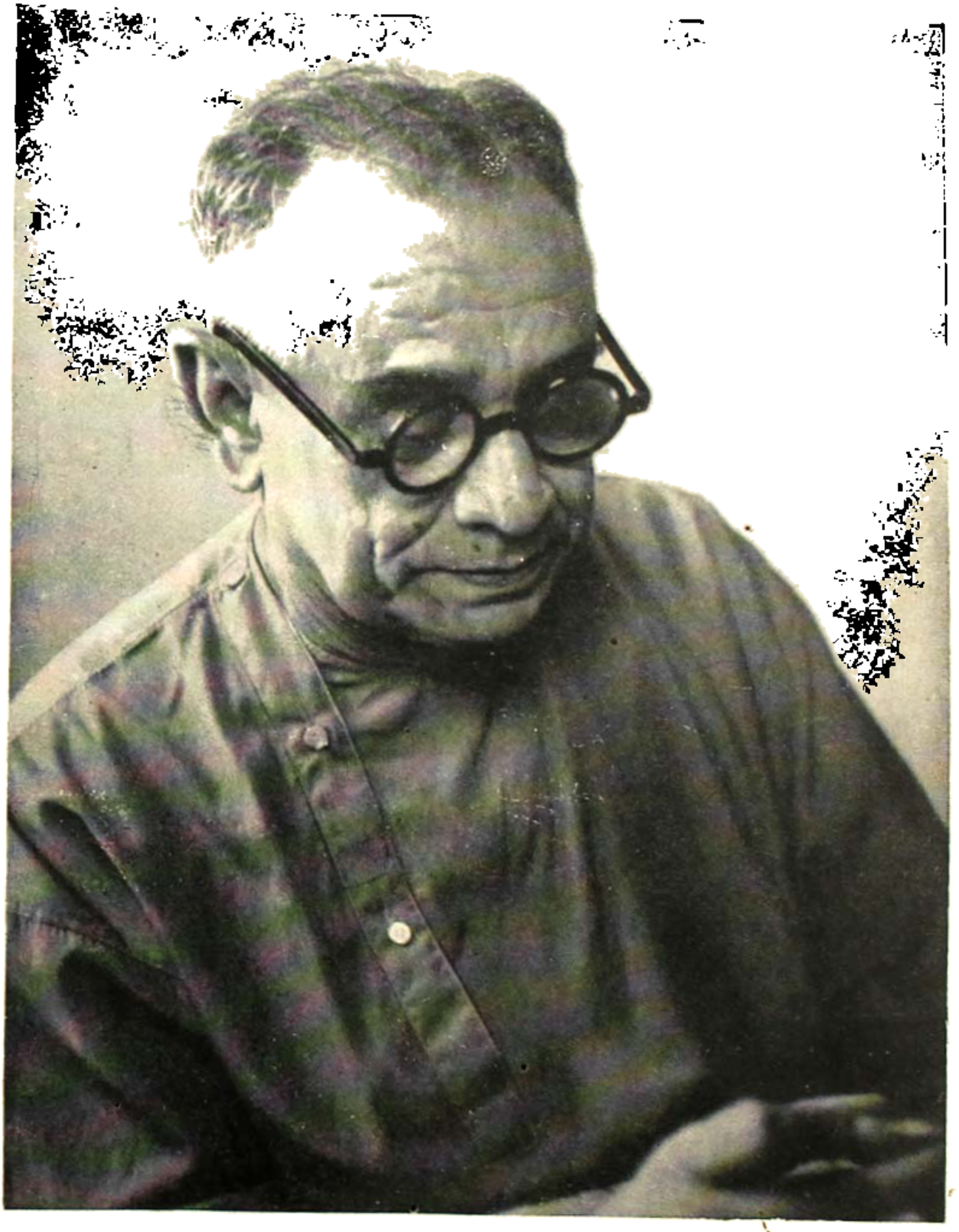

শিশির কুমার ভাদুড়ি (১৯৫৩)

"বিজিয়া" নাটকে বঙ্কিমরায়ের
ভূমিকায়—শিশিরকুমার।

সীতা নাটকে রাম—শিশিরকুমার, বাল্মিকী—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

সীতা নাটকে রাম—শিশিরকুমার
সীতা—কল্পাবতী

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টীটিউট এ, একটি অভিনয়ে অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ সহ শিশিরকুমার (দণ্ডায়মান প্রথম সারিতে দক্ষিণ হইতে তৃতীয়)
এই চিত্রে ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর যতেন্দ্র নাথ মিত্র, অধ্যাপক মন্মথ নাথ বসু প্রভৃতিকেও দেখা যাইতেছে।

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

কথাপ্রসঙ্গে—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সাহিত্য ও সাহিত্যিক—ভাষা ও সাহিত্য—শ্রীসুকুমার সেন

ওসামু দাজাই ও অস্তগামী সূর্যের মানুষ—সুধীর রায়চৌধুরী

এ যুগের নাটক : পাশ্চাত্ত্য প্রভাব—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

লম্পট ও কাউআর্ড—আনন্দকিশোর মুন্সী

এই সংখ্যায়

বাংলা রঙ্গালয়ের নব-রূপায়ণ—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রত্যাখ্যান—শ্রীবাসন্তী বন্দোপাধ্যায়

চলতি দুনিয়া—

অমৃত কথা ও কাহিনী—

পাহাড়ী গাঁয়ের কথা (উপন্যাস)—নীলিমা দাশগুপ্ত

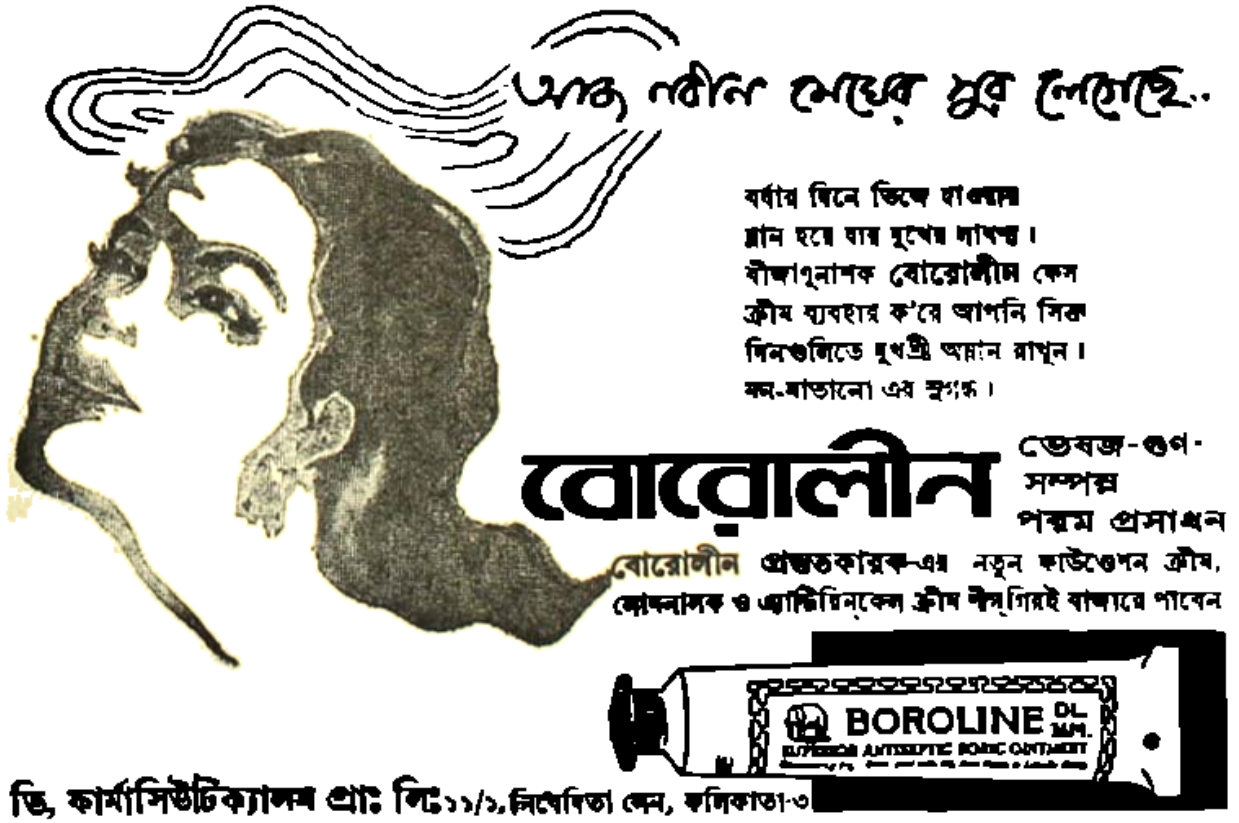

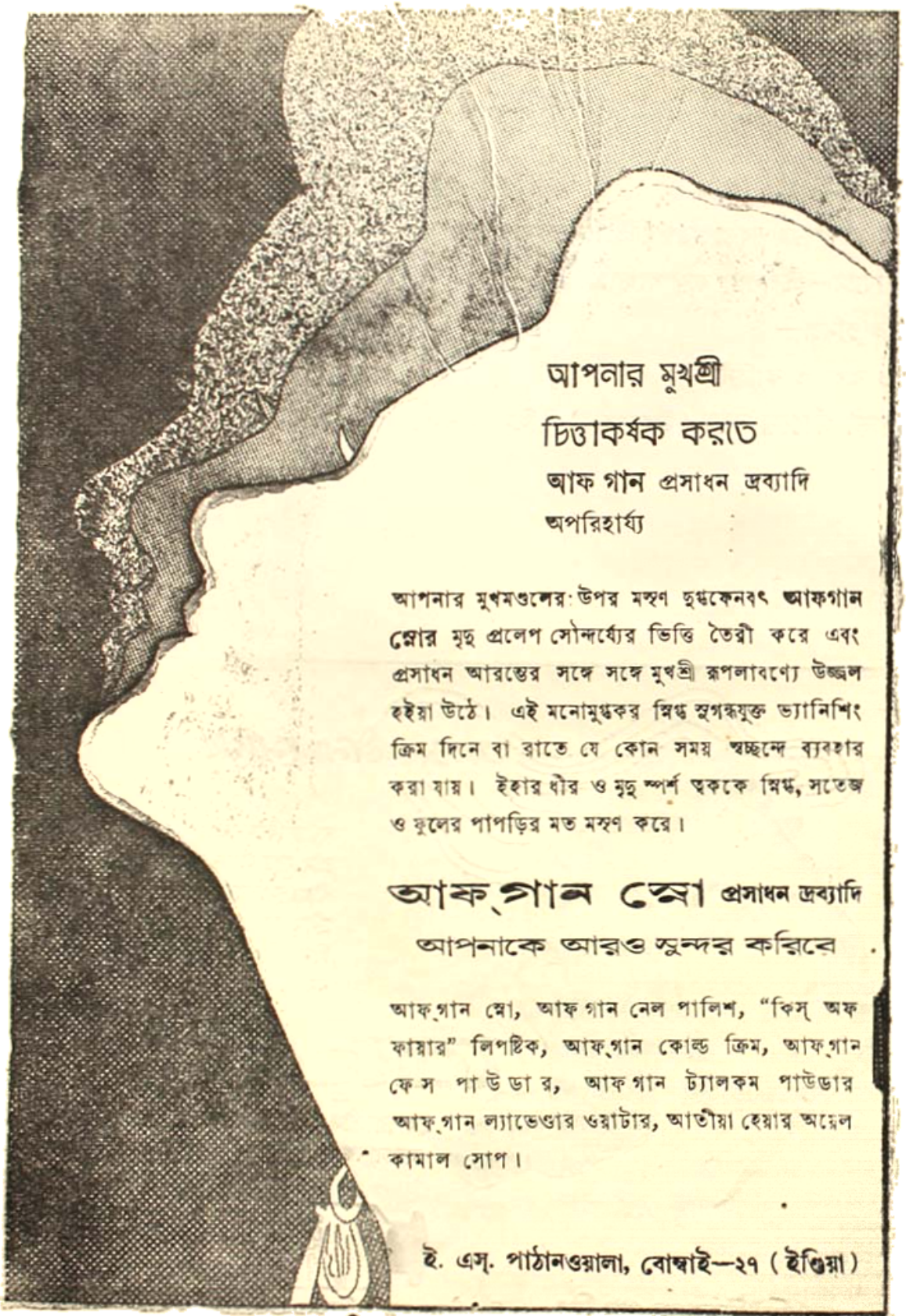

আপনার মুখশ্রী
চিত্তাকর্ষক করতে
আফ গান প্রসাধন দ্রব্যাদি
অপরিহার্য্য

আপনার মুখমণ্ডলের উপর মসৃণ দুগ্ধফেনবৎ **আফগান স্নোর** মৃদু প্রলেপ সৌন্দর্য্যের ভিত্তি তৈরী করে এবং প্রসাধন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে মুখশ্রী রূপলাবণ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই মনোমুগ্ধকর স্নিগ্ধ সুগন্ধযুক্ত ভ্যানিশিং ক্রিম দিনে বা রাতে যে কোন সময় স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়। ইহার ধীর ও মৃদু স্পর্শ ত্বককে স্নিগ্ধ, সতেজ ও ফুলের পাপড়ির মত মসৃণ করে।

আফ্‌গান স্নো প্রসাধন দ্রব্যাদি
আপনাকে আরও সুন্দর করিবে

আফ্‌গান স্নো, আফগান নেল পালিশ, "কিস্ অফ ফায়ার" লিপষ্টিক, আফ্‌গান কোল্ড ক্রিম, আফ্‌গান ফেস পাউডার, আফগান ট্যালকম পাউডার আফ্‌গান ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার, আতীয়া হেয়ার অয়েল কামাল সোপ।

ই. এস্. পাঠানওয়ালা, বোম্বাই—২৭ (ইণ্ডিয়া)

এই সংখ্যায়

বিশ্ব-বার্তা—শ্রীবিশ্বপথিক

এই প্রথম—লেখনী-লীলা—শ্রীমনোরঞ্জন জানা

শিল্পীর তুলিতে কুসমযাত্রা—

খেলাধূলা—শ্রীনিরীক্ষক

বিশ্ব ব্যঙ্গ চিত্র—

অব্যাহত গতি

একদা মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া ইহাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন লেখকের খোঁজ করিতেছিলেন। কিন্তু কেহই এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে পার্বতী-তনয় গণেশ এই শর্তে রাজি হইলেন যে তাঁর লেখনী মুহূর্তের জন্যও থামিবে না।

আধুনিক যুগের লেখকরাও চান যে তাঁদের লেখার গতি কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়। আর এই অব্যাহত গতির জন্যই সুলেখা আজ এত জনপ্রিয়

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ ; কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

বিশুদ্ধ, কোমল লাক্স এবার
৪টি রামধনু-রঙে
আর আপনার প্রিয় সাদাটিও রয়েছে!

দেখুন! লাক্স এবার চমৎকার কত সব নতুন রঙে ধরা দিয়েছে—
সাদাটিও রয়েছে। প্রতিটিই আপনার প্রিয় বিশুদ্ধ লাক্স—অফুরন্ত
ফেনা দিতে যে সাবান আপনি চিরদিনই চেয়েছেন।

মঞ্জুলা বারোজী বলেন
'আমার প্রিয় লাক্সে যেন
রঙের মেলা লেগেছে,
এ এক অভিনব রচনা।'—

চিত্রতারকার বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্য-সাবান

LTS.64-X32 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

শিল্পীর তুলিতে

॥ ঝুলনযাত্রা ॥

ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে কীর্তন

খুলনের মেলা।

প্রদর্শনী

[খুলনের মেলায় দুঃশিল্পে পৌরাণিক কাহিনী]

ঠিক দু'প্যাগন

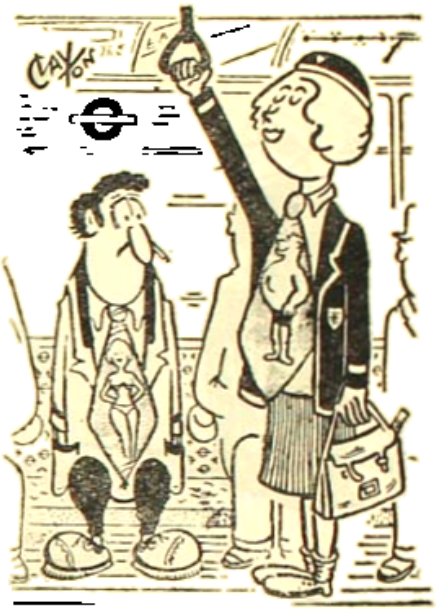

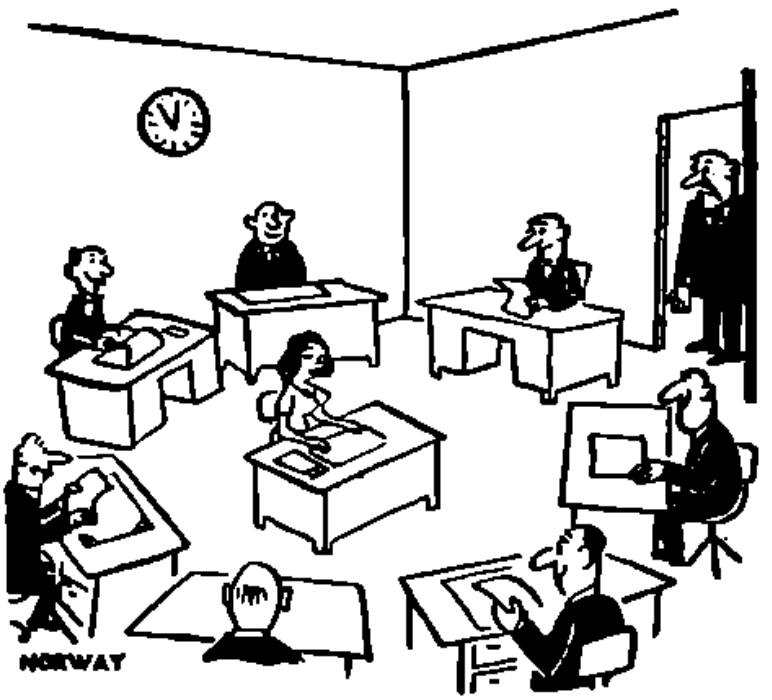

একী! ক'দিন ছিলাম না, তাতেই এই!
অফিসের ভোল পাল্টে গেছে দেখ্‌ছি!

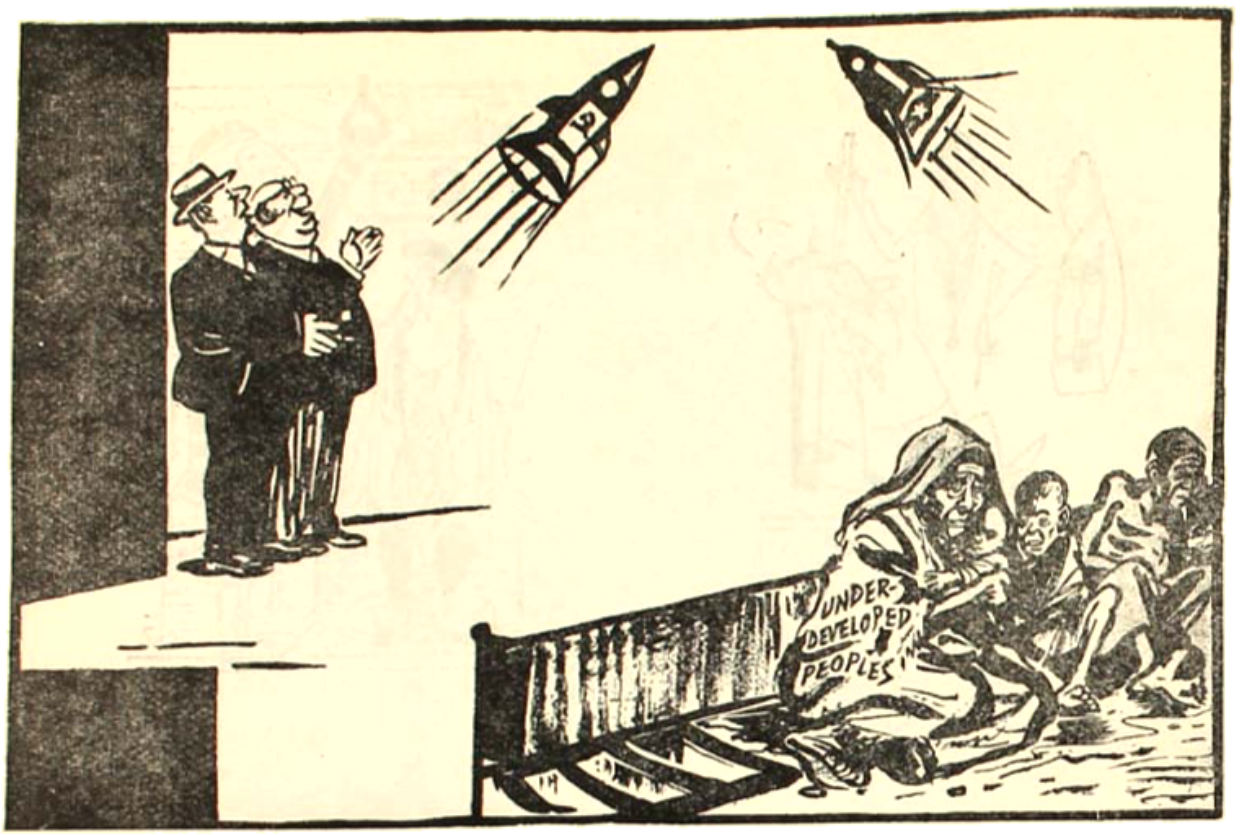

আশ্চর্য! এখন মানুষ মানুষকে আকাশে কত উঁচুতে তুলছে! কিন্তু যারা
নিচে পড়ে আছে তাদের তুলতে কত সময় লাগছে!

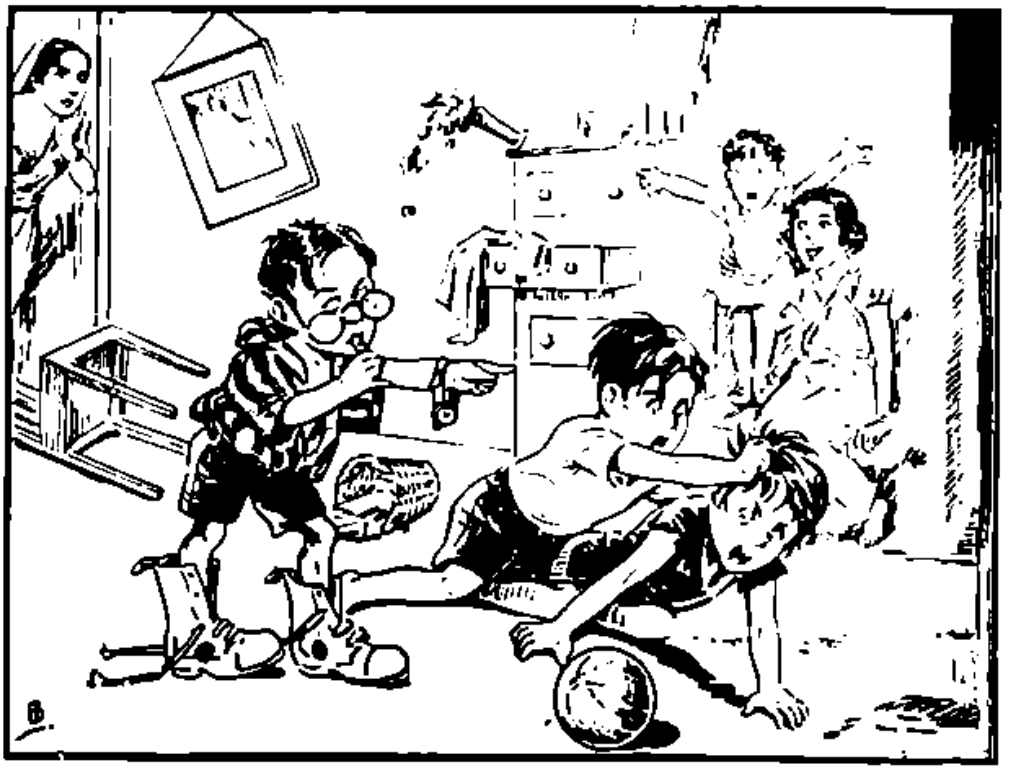

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
জন্মশতবার্ষিকী ॥

॥ যৌবনে প্রফুল্লচন্দ্র—এডিনবরা হইতে প্রত্যাগমনের পর ॥

(অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র রায়ের সৌজন্যে)

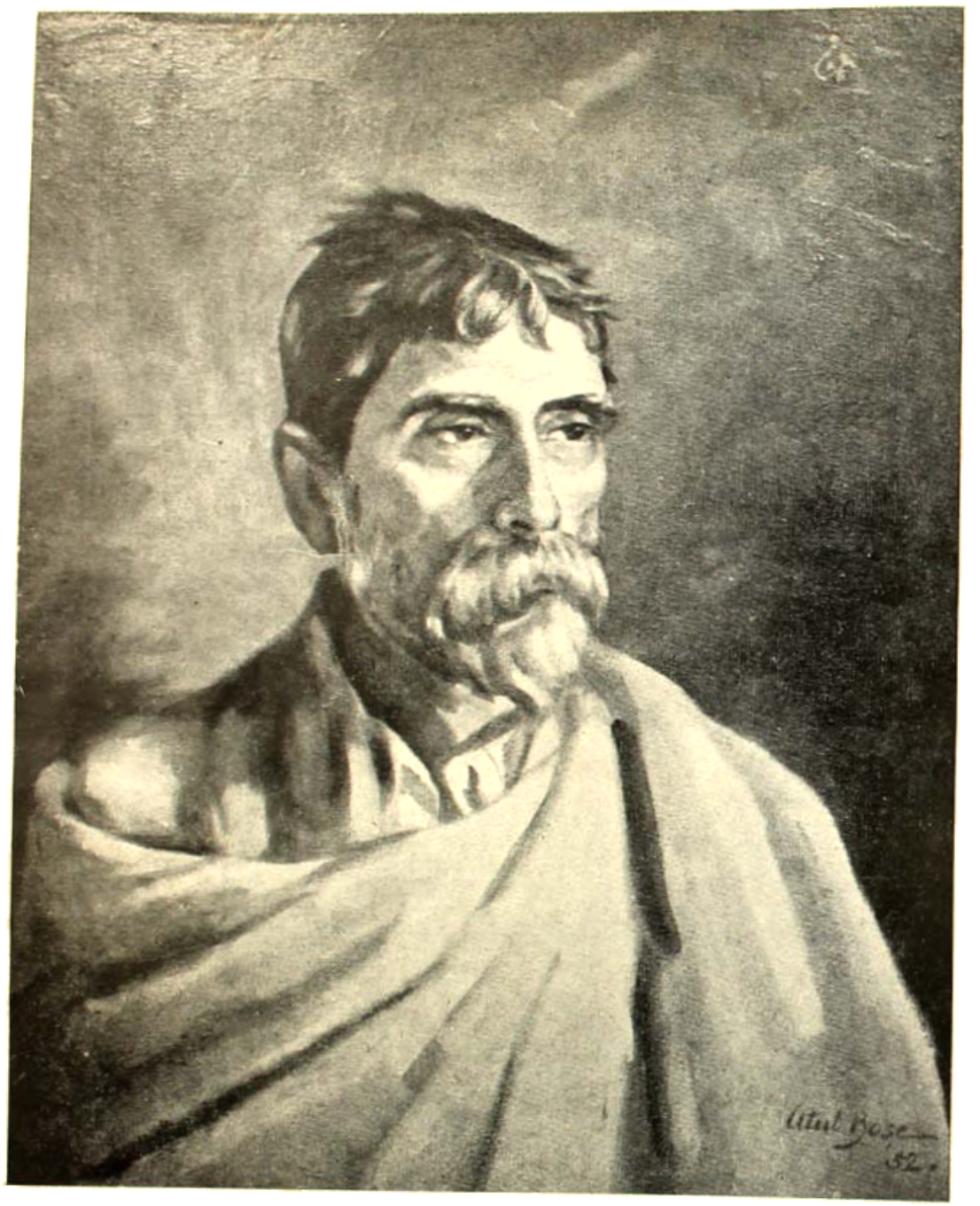

শিল্পীর তুলিতে—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শিল্পী : অতুলচন্দ্র বসু

(বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিমিটেডের সৌজন্যে)

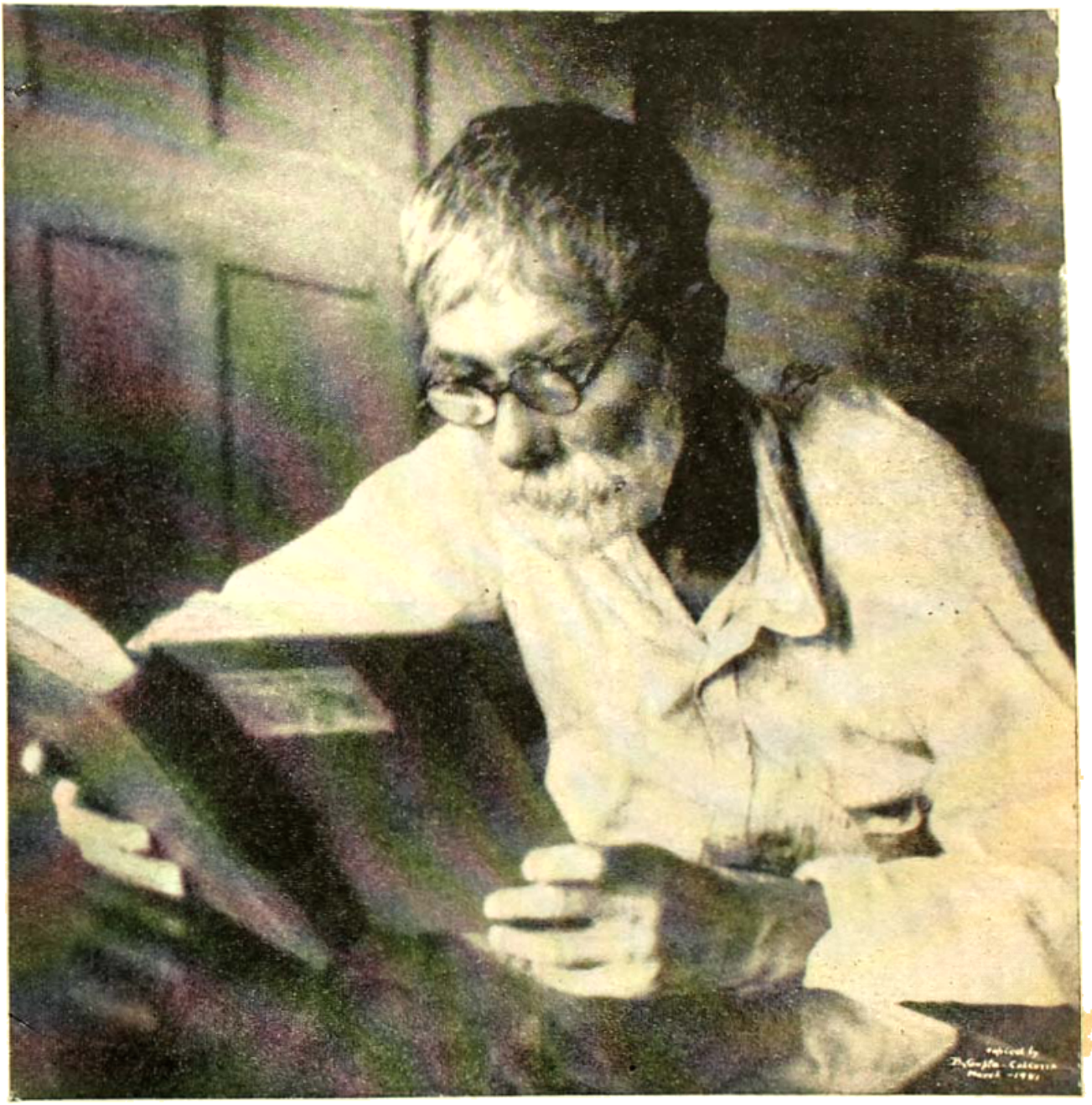

॥ অধ্যয়নরত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ॥

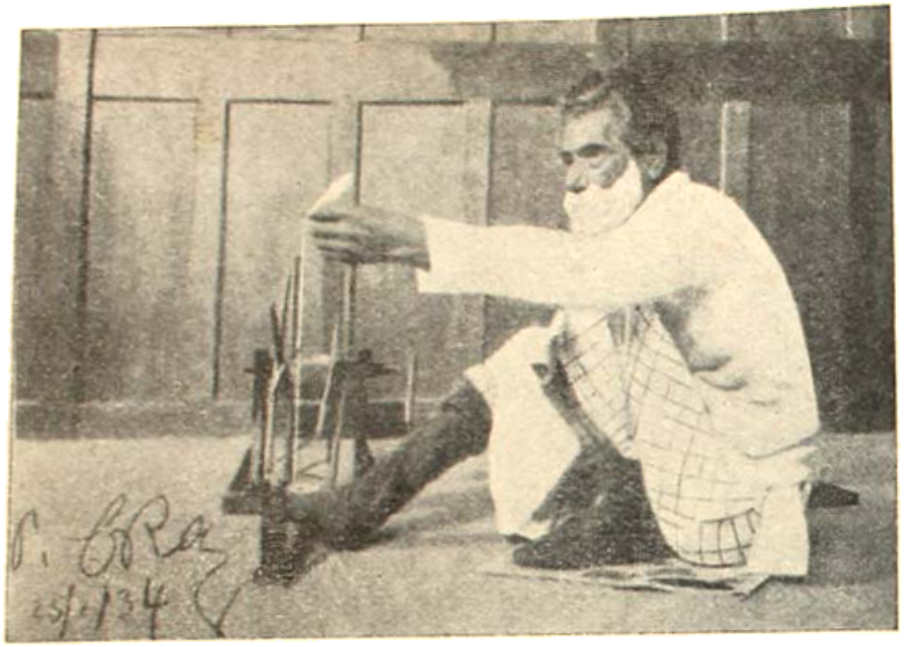

॥ আচার্যদেব চরকায় সুতা কাটছেন ॥

(বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেডের সৌজন্যে)

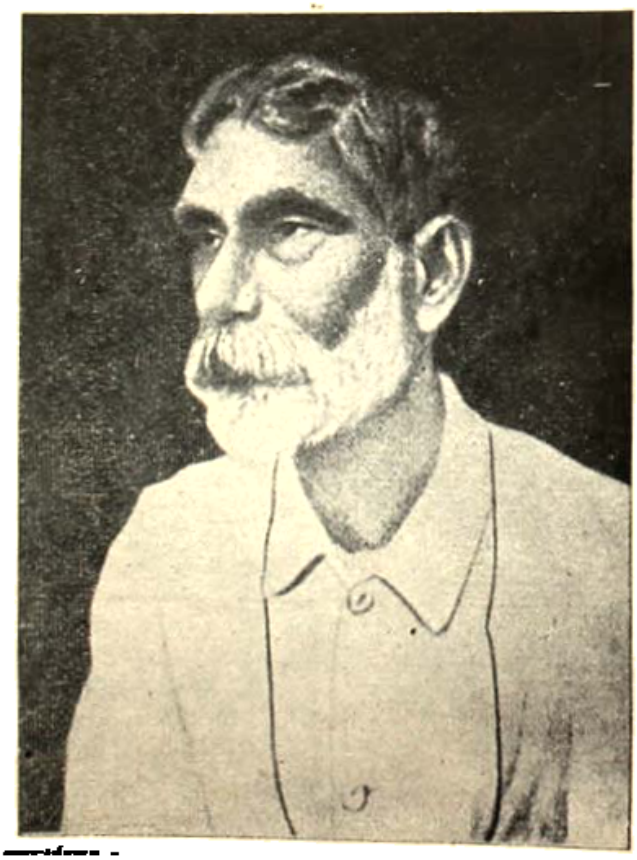

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

বর্ষামঙ্গল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্ব-বার্তা

সাহিত্যে পুরাতন ও নতুন—ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার

একটি গ্রামীণ চিত্র—নারায়ণ চৌধুরী

ব্রহ্ম কমল—ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

চলতি দুনিয়া

রাজুর মা—শ্রীগোপা গঙ্গোপাধ্যায়

বোধন—চিত্তরঞ্জন দেব ২৬৭

শশীকুমার হেশ : একজন বিস্মৃত বাঙ্গালী চিত্রকর—অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ২৭০

'এমন ছেলেকে সামলাতে হলে আপনার কাজের আর অন্ত নেই···! বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের যদি ফিট্‌ফাট রাখতে চান, তা'হলে কাপড় কাচাটাতো দেখেই আছে।'

'সানলাইটে কাচি, তাই বলে! শুধু ফেরে উঠছি সানলাইটের ফেনার ফেনায় কাচাটা খুবই সহজ হলে। কেবল এমন খাঁটি সাবানেই এত ভাল কাপড় কাচা যায় আর তাও কোন কষ্ট না করে।'

"৫৫ নং ফ্ল্যাট, তপতসিং মার্কেট, নয়া দিল্লীর শ্রীমতী ওয়াওলানি বলেন, 'কাপড় কাচায় সানলাইটের মতো এত ভাল সাবান আর হয় না।'

সানলাইট

কাপড়জামার সঠিক যত্ন নেয়!

SUNLIGHT SOAP

B. LL-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

এই সংখ্যায়

সাহিত্য ও সাহিত্যিক—কবি সুইনবর্ন ও 'কলা কৈবল্যবাদ'—অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে

রমাণি বীক্ষ্য—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

আড্ডা—তুলসী বসু

শুক্তি-সৈকত—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

বিশ্ব ব্যঙ্গ চিত্র

একজন আর কয়েকজন—অনিলকুমার ভট্টাচার্য

পুস্তক সমালোচনা

খেলাধূলা

দেশ-বিদেশ

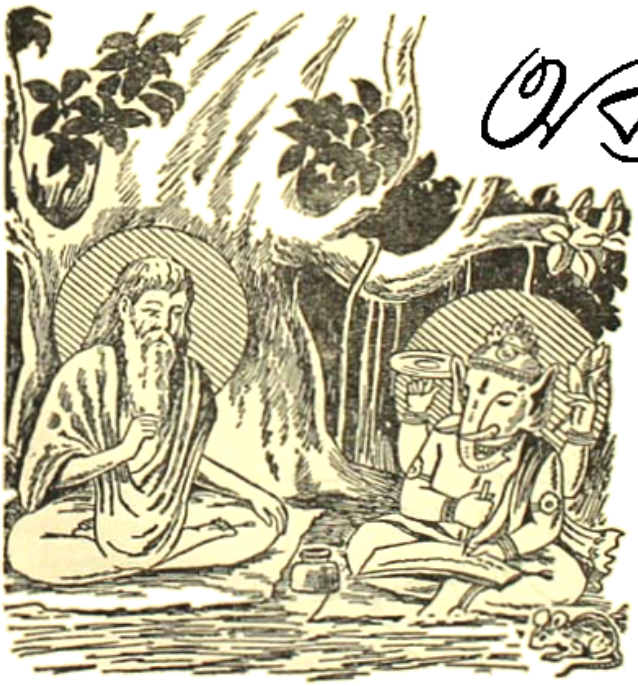

অব্যাহত গতি

একদা মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া ইহাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন লেখকের খোঁজ করিতেছিলেন। কিন্তু কেহই এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে পার্বতী-তনয় গণেশ এই শর্তে রাজি হইলেন যে তাঁর লেখনী মুহূর্তের জন্যও থামিবে না।

আধুনিক যুগের লেখকরাও চান যে তাঁদের লেখার গতি কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়। আর এই অব্যাহত গতির জন্যই সুলেখা আজ এত জনপ্রিয়

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ; কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

নতুন
জীবনের
নতুন
প্রয়োজন

পূরণ করতে বয়স্কাদের
জননীকে পুষ্টিকর
টনিকের ওপর নির্ভর
করতে হয়।
সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ
ভাইনো-মল্ট
ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায়
সাহায্য করে
এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি
ফিরিয়ে আনে।

ভাইনো-মল্ট

বেঙ্গল
ইমিউনিটি
কোং, লিঃ

বর্ষামঙ্গল

শান্তিনিকেতনের অবারিত আকাশ এবং দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তর যথার্থই ঋতুরঙ্গভূমি। এখানে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা যে আতিথ্য লাভ করেছে তার ভোজের ক্ষেত্রে নব নব রস পরিবেষণ করে ঋতুর দল। আনন্দের ঋণ আমরা শোধ করে থাকি, রঙে সুরে নাচে। তাকেই বলে উৎসব। বৎসরে বৎসরে এই উৎসবে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের মিলন ঘটে।

সহরের মধ্যেও ঋতু আসে, কিন্তু তার প্রকাশে বাধা থাকে বিস্তর, তাই এখানে উৎসবের সৃষ্টি সহরে হয় না।

কিছুকাল পূর্বে কোন এক বর্ষায় সহরবাসীকে আমাদের আশ্রমের উৎসবের ভাগ দিতে এসেছিলুম। সেদিনকার সেই বর্ষামঙ্গলের কথা হয়ত কারো কারো মনে আছে। কেবলমাত্র কয়েক ঘণ্টা আমোদের মধ্যে সেই অনুষ্ঠানের অবসান হয়েছিল বলে মনে হয় না। আমার বিশ্বাস সেই উপলক্ষে গীত-ভারতীর বীণার বাংলা সুরের বিশেষ একটি তার চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই তারের ঝঙ্কার আজো চলেছে। আজ বাংলা দেশ বাংলা গানে মুখরিত।

এই নবজাগ্রত বাংলা গানের ভরা বাদরে আমাদের আশ্রমের উৎসবকে আর একবার লোকালয়ে এনে উপস্থিত করেছি, মনে করিয়ে দিতে এসেছি বর্ষা এলো, ভারতবর্ষের কবিদের বর্ষা, যে বর্ষার হৃদয় থেকে মেঘদূতের বিরহ গান উৎসারিত হয়ে নিত্য কালকে অভিষিক্ত করেছে।

১৯শে ভাদ্র, ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

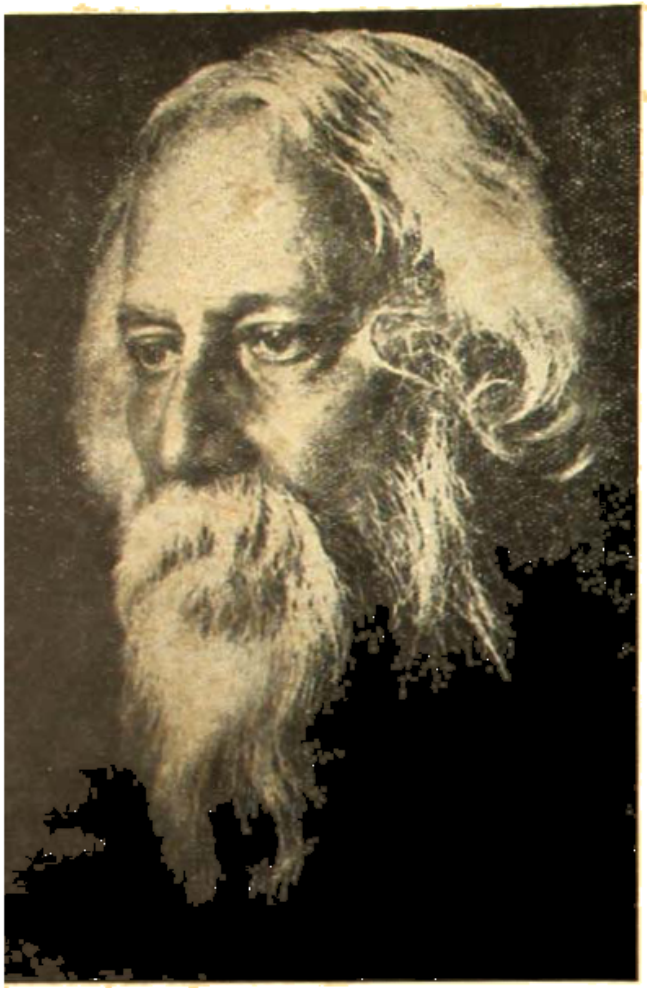

আপনাকে প্রকাশ করে,
জগতের প্রত্যেক
এই কথাই বলেছে

মানুষের পারিভাষিক শব্দসমূহে নয়—তাঁর অস্তিত্বের
অপূর্ব রহস্য তাঁর নিজের ভিতরেই বর্তমান—বাইরের কোন
কিছুর উপরেই তা নির্ভরশীল নয়

কাব্যের উৎকর্ষের মধ্যে নিহিত
অন্তিম সত্যতা এই সকল তাদের মধ্যে বিদ্যমান
তাদের মধ্যে থাকে এমনই একটি মূল্যবোধ চিন্তার
অন্তরালে যাকে লক্ষ্য করা যায় এবং এমনই একটি মৌলিক
গুণ যা নিজ মহিমান্বিত গুণের ন্যায় অথবা প্রকাশিত ভাবের
ন্যায় কোন অর্থজ্ঞাপক। এই টীকা একটি চিরন্তন
টীকা একটি গুণ যার কোনদিন কোন পরিবর্তন হবে না।
ক্রমশই আমার কাছে এ কথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, সারা জগতেরই
সৃষ্টির টীকা বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। তুমি
আমি গভীর রহস্যময় প্রকাশের মাধ্যম খুঁজে
পেয়েছি, এই আবিষ্কার আমাকে গভীর আনন্দ দিয়েছে।

—রবীন্দ্রনাথ

বিখ্যাত শিল্পী শশিকুমার হেশ।

শশিকুমার হেশ অঙ্কিত
সম্ভাবের কবি প্রমথ রায়চৌধুরী।

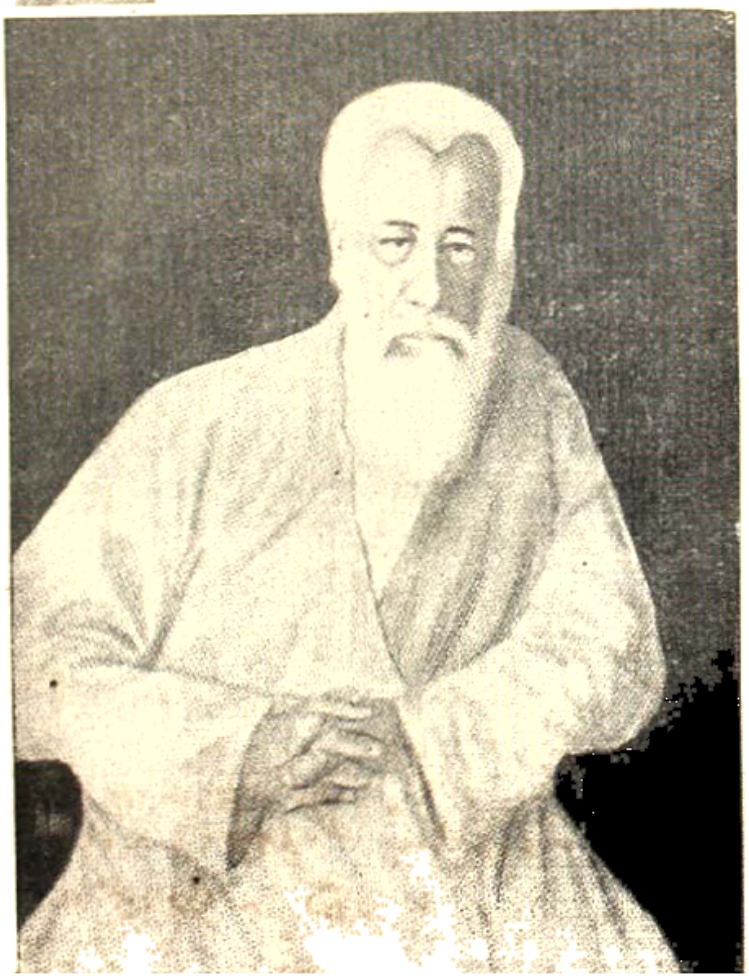

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়।
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কী যে গায়॥
—রবীন্দ্রনাথ
murphy radio
পূর্ব ভারতের একমাত্র পরিবেশক
দেবসন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * পাটনা

এই সংখ্যায়

১।	শ্রীদুর্গার উপাসনা—যুগে যুগে	—অধ্যাপক—শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ	১
২।	দুর্গাপূজা কেন ?	—শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য	৫
৩।	আগমনী	—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১১
৪।	বায়স মাহাত্ম্য	—আশাপূর্ণা দেবী	১৩
৫।	আচার্য্য প্রফুল্ল	—অন্নদাশঙ্কর রায়	২১
৬।	অনাবৃষ্টি	—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২৮
৭।	বান্ধবী	—দক্ষিণারঞ্জন বসু	৪১
৮।	কুতুবমিনার	—বনফুল	৪৭
৯।	দ্বিতীয় জন্মের ভূমিকা	—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	৪৯
১০।	শেষ রাত্রির গান	—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী	৬৬
১১।	চোখের বাহিরে (উপন্যাস)	—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৭৩
১২।	চক্র-ব্যূহ	—মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য	১৩৯
১৩।	দ্বৈপায়ন	—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়	১৪৭
১৪।	যখন দখিন হতে	—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী	১৬১
১৫।	কুমারসম্ভবম্ (বড় গল্প)	—বাণী রায়	১৭৩
১৬।	পুরস্কার	—চিত্তরঞ্জন মাইতি	১৮৭
১৭।	মালতির মন	—নীলিমা দাশগুপ্তা	১৯৩

এই সংখ্যায়

	খুরুলঝোরার ভূত	—পরিমল গোস্বামী	১৯৯
	শরৎ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য	—অরবিন্দ পোদ্দার	২০৪
২০।	গল্পগুচ্ছে নারী চরিত্র	—শ্রীশান্তা দেবী	২০৯
২১।	স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্	—অনিলকুমার ভট্টাচার্য	২১৯
২২।	ছায়াপথ (নাটক)	—বিজন ভট্টাচার্য	২২৩
২৩।	প্রেষ্টিজ	—সুলেখা দাশগুপ্ত	২৪১
২৪।	সতীলক্ষ্মী (রহস্য উপন্যাস)	—সমুদ্ধ	২৪৭
২৫।	গল্পিকা:-বিলাস	—ভাস্কর (শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ)	২৭৬
২৬।	সঙ্গীতের অধ্যাত্ম পটভূমিকা	—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	২৮১
২৭।	আর এক পৃথিবী (উপন্যাস)	—নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২৮৩
২৮।	বাংলার মন্দির প্রাচীরে সমসাময়িক সমাজচিত্র	—কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৩২৯
২৯।	মার্কিন দেশের যৎকিঞ্চিৎ	—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৪
৩০।	বানাস নদী পেরিয়ে (ভ্রমণ)	—প্রবোধকুমার সান্যাল	৩৩৯
৩১।	জনতা-এক্সপ্রেস ছেড়ে দিল	—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩৫৩
৩২।	মহাজীবনের অজানা কাহিনী	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩৬৩
৩৩।	রিণি	—আনন্দকিশোর মুন্সী	৩৬৭
৩৪।	প্রাণান্তকর গল্প	—প্র. না. বি.	৩৭৩

॥ সদ্য প্রকাশিত দুইখানা বই ॥

স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ

অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও
অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায়

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে **আনন্দবাজার পত্রিকার অভিমত**—"...১৯০৫ সনের স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বাভাস, প্রারম্ভ ও বিস্তৃতির এরূপ নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা বাংলা-ভাষার একটিমাত্র গ্রন্থে ইতিপূর্বে সন্নিবেশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ।..." মূল্য—৬·০০

দেশপরিচয় শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ·

দেশ পত্রিকার অভিমত :—স্বাধীন ভারতের কিশোর ও যুবকগণ যাতে নিজের দেশকে জানতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন।...মার খবর রাখা কেবলমাত্র কিশোর এবং যুবকদেরই প্রয়োজন নয় ; প্রয়োজন দেশের প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তির।

মূল্য—২·২৫

সরস্বতী লাইব্রেরী
৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

রূপ রচনায়
অপরাজেয়

ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

কেশ তৈল

গুণে ও গন্ধে
অতুলনীয়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা

দুর্গা প্রতিমা নির্মাণের
প্রাথমিক কাজ—মাটিবাঁধা

প্রতিমার কাঠামো বাঁধা হচ্ছে

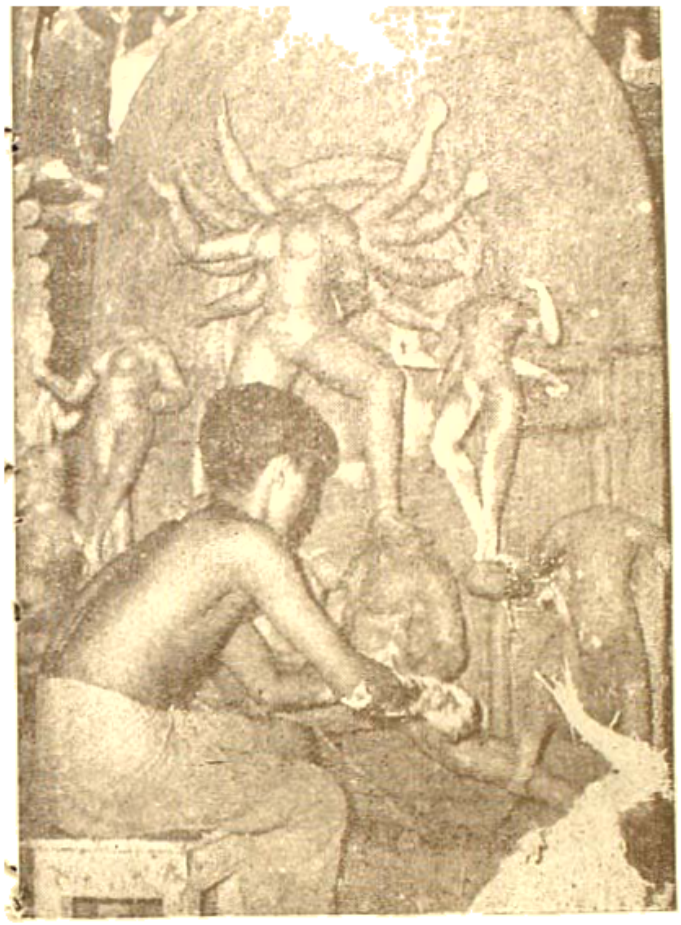

মাটি কেটে

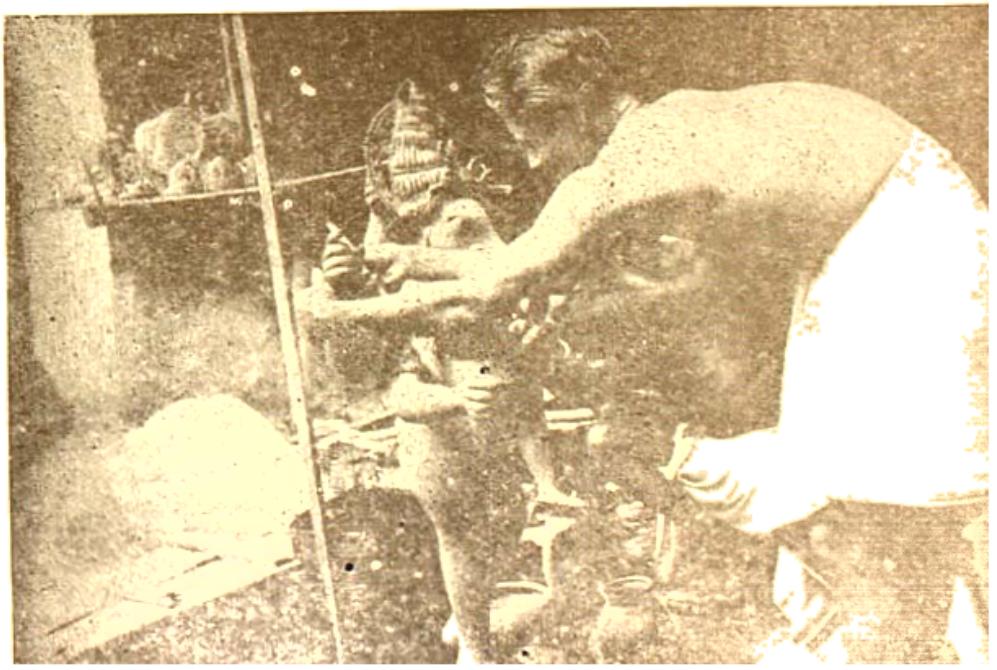

প্রতিমার গণেশ মূর্তি নির্মাণে
মৃৎ-শিল্পী

প্রতিমা প্রস্তুতির পট

হস্ত পোলার কাজে দুই-শিল্পী

প্রতিমার রঙ দেওয়া হচ্ছে

for superior performance

SAP
HACKSAWS

HACKSAW BLADES

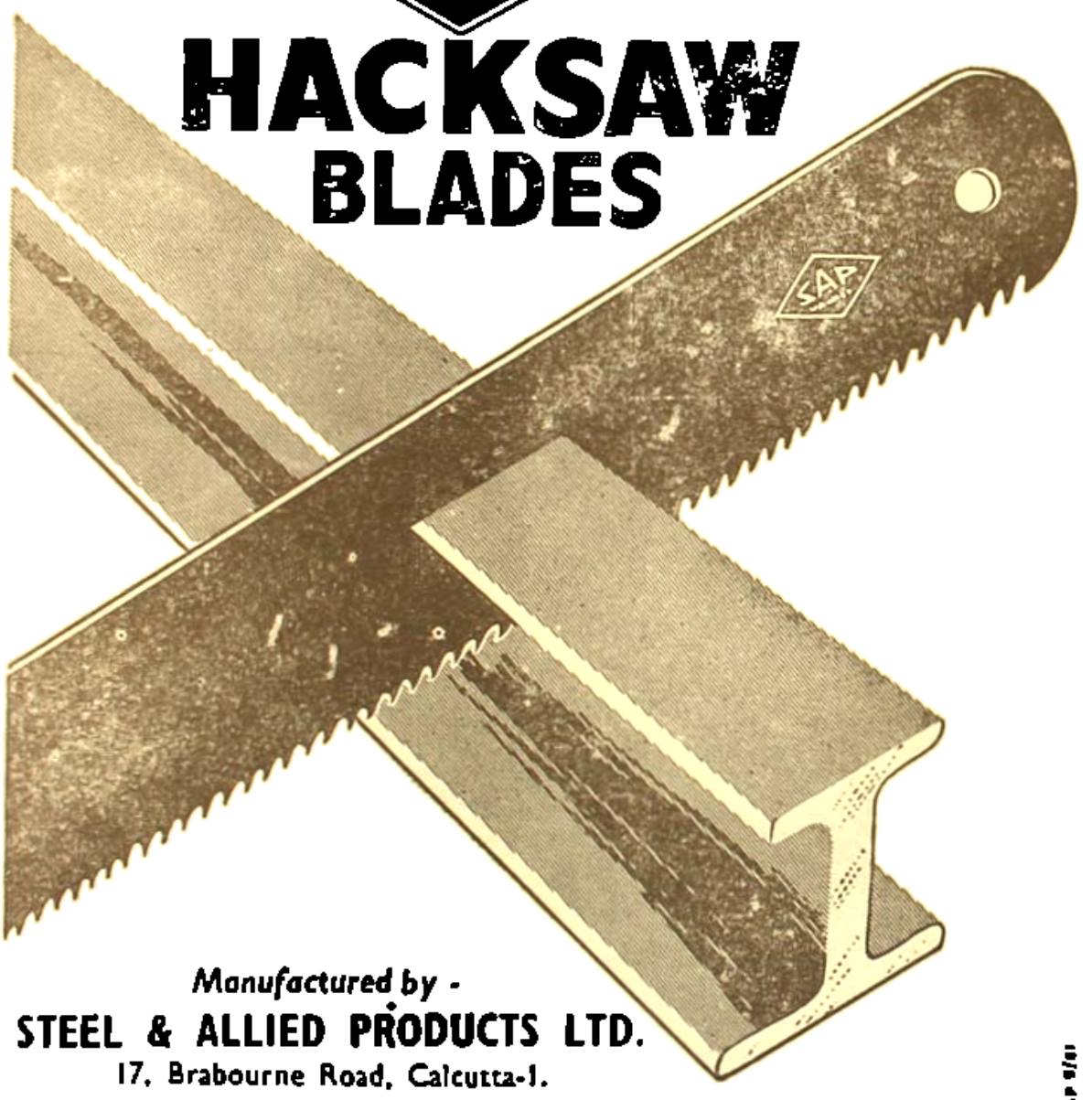

Manufactured by -

STEEL & ALLIED PRODUCTS LTD.

17, Brabourne Road, Calcutta-1.

Sole Selling Agents :

VULCAN TRADING CO. PRIVATE LTD. CALCUTTA · BOMBAY · MADRAS · NEW DELHI

SAP 9/61

বোরোলীন-বিধৃত লাবণ্য

বৃষ্টির দিন শেষ হোলো। আকাশ এখন স্বচ্ছ নীল। শরতের রৌদ্র-দীপ্ত উৎসবের দিন এলো উজ্জ্বল পরিবেশ নিয়ে।

প্রকৃতির-ও এখন নিজেকে আরো উজ্জ্বল করে তোলবার বাসনা। আপনার এই নব রূপায়ণে মৃদু-সুরভিত বোরোলীন ক্রীম উজ্জ্বলতম উপকরণ—আপনার প্রসাধনের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

কোমল স্নিগ্ধ বোরোলীন ক্রীমের ভেষজগুণযুক্ত স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ধূলা আর রৌদ্রের হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করে আর আপনার স্বাভাবিক লাবণ্য ফিরিয়ে আনে। বোরোলীন-বিধৃত সে মাধুরী আপনাকে আকর্ষণীয় ও বিশিষ্ট করে তোলে। নিয়মিত বোরোলীনের প্রলেপে নিজেকে লাবণ্যমণ্ডিত করুন।

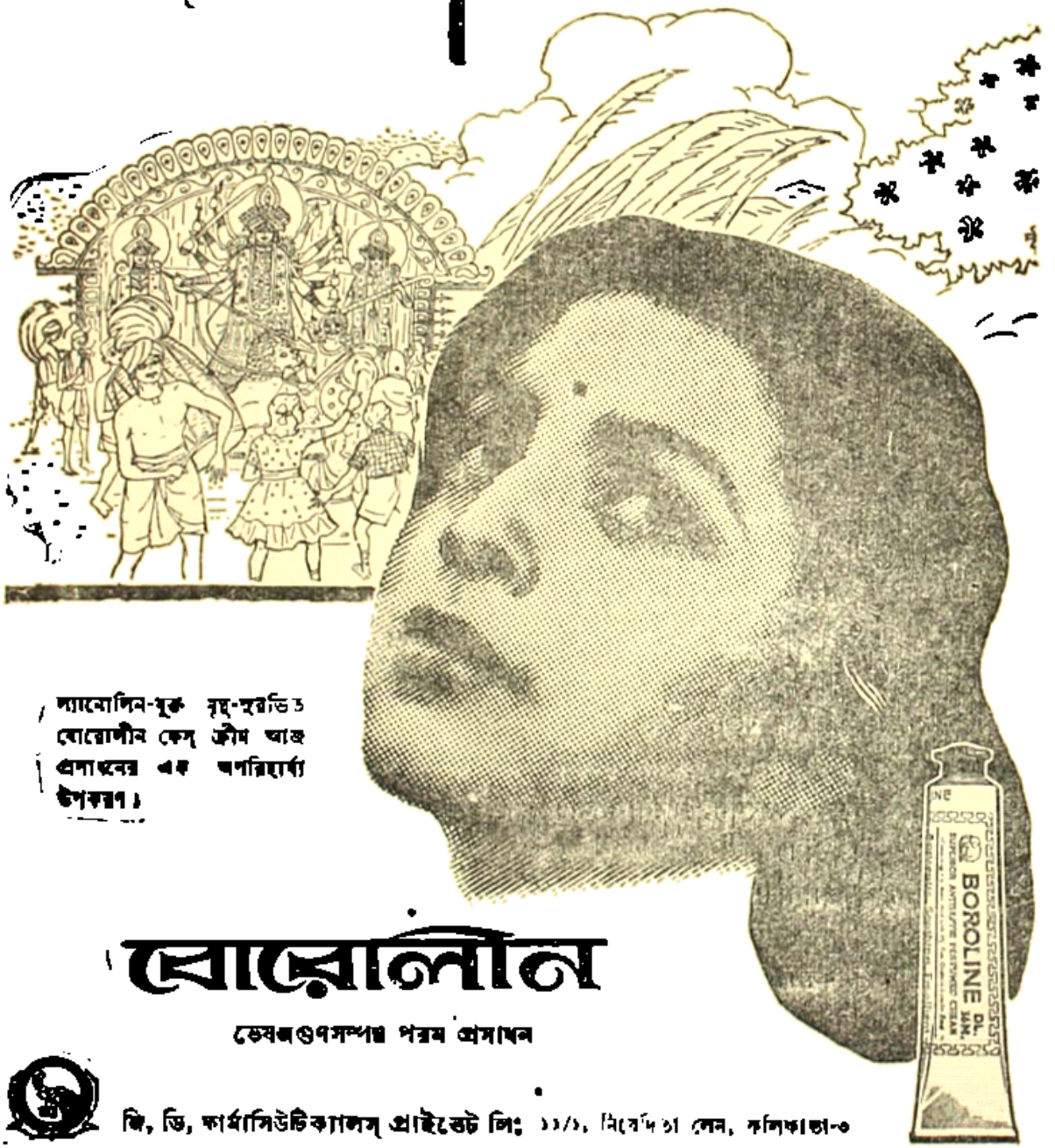

ল্যানোলিন-যুক্ত মৃদু-সুরভিত বোরোলীন ফেস্ ক্রীম আজ প্রসাধনের এক অপরিহার্য্য উপকরণ।

বোরোলীন

ভেষজগুণসম্পন্ন পরম প্রসাধন

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাইভেট লিঃ ১১/১, মিরেদিতা লেন, কলিকাতা-৩

ইতিহাস গবেষকের চোখ এড়িয়ে গেলে ...

আদিম মানুষের প্রথম বিলাসিতার এক [illegible] ছিল। মানুষের [illegible] ইতিহাস আজ আর অজানা নয়। কেমন করে এই প্রতিযোগিতার মধ্যে অজান্তেই জড়িয়ে—মানুষ আজ তাদের সবার—তারই ধারাবাহিক ইতিহাসে আছে। ইতিহাসের পুঁথিকার লুকানো কোনোকিছু থেকে উদ্ধার—মূর্তির আকারে—পুরোনো বসনাকারে—অলঙ্কারের মতন।

বৈদিক যুগে আর্যরা বালি ব্যবহার করতেন, আজও তারা ব্যবহার করছেন; কিন্তু সত্যি, বালি এবং তারই তিন ভাইয়ের প্রচার থাকলেও। তারপরে এল ঘষা এবং আরও অনেক কিছু। ...কিন্তু বালি মানুষের হাত হিসেবে থেকে গেল...আজও। তারপরে এখনো অনন্ত মানুষ বালির পানীয় নিয়েই জীবনযাপন করে। বালিসহ থেকে উৎপন্ন পার্ল বালি ও গুঁড়ো বালি প্রচুর পরিমাণে হয় এবং পানীয় ক্রিয়ায় সহায়ক হয় বলে তাদের ওষুধ এবং প্রসাধনে ব্যবহার।

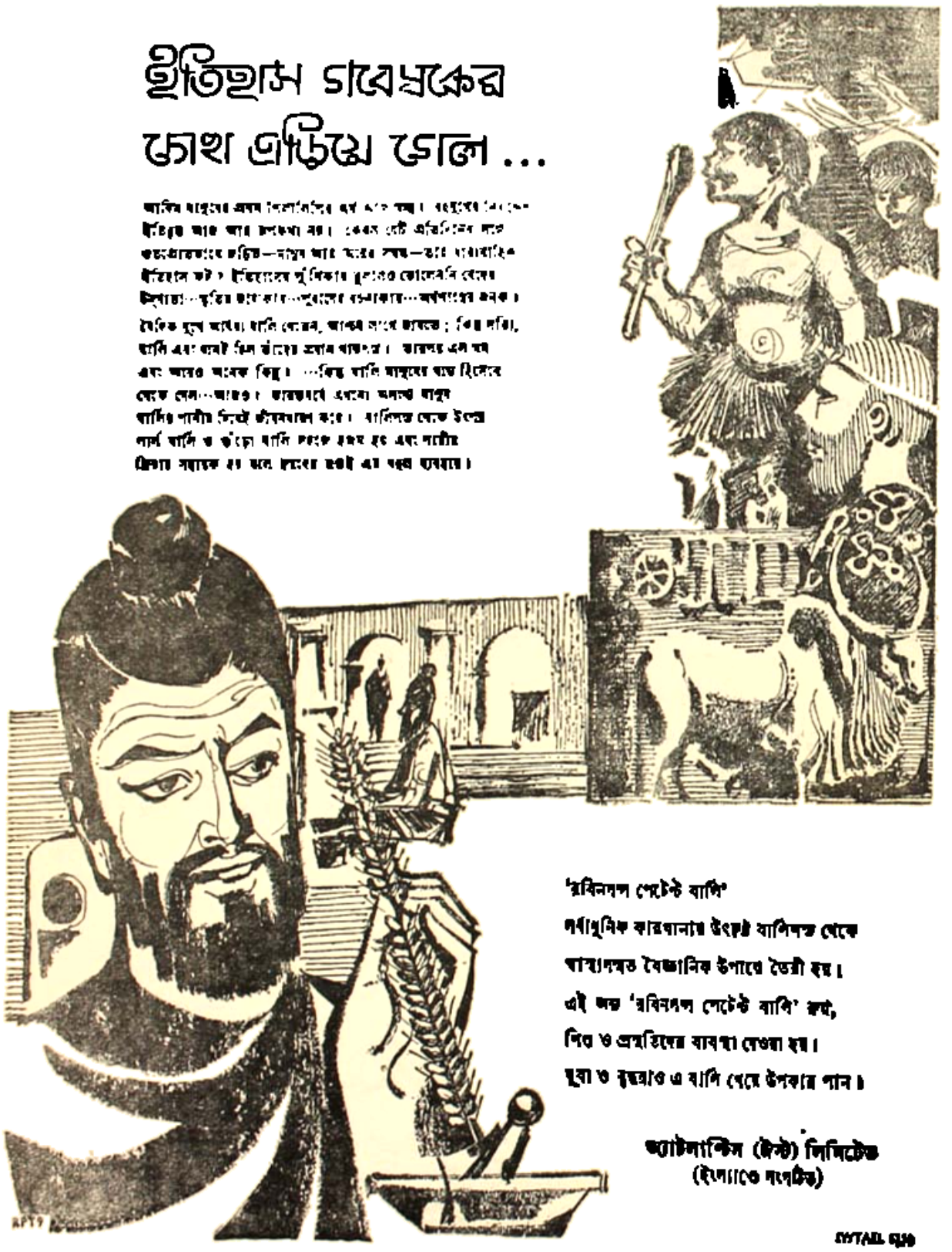

'রবিনসন পেটেন্ট বালি'
পর্যাপ্তমানিক কারখানায় উৎকৃষ্ট বালিসহ থেকে
স্বাস্থ্যসম্মত বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরী হয়।
এই জন্য 'রবিনসন পেটেন্ট বালি' শুদ্ধ,
শিশু ও প্রসূতিদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়।
যুবা ও বৃদ্ধরাও এ বালি খেয়ে উপকার পান।

অ্যাটলান্টিস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
(ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)

ATTAIL 0110

সে বরাত তোরা পাবি কোথায়? তবে ভাবছি, আর একটু বড়ো হলে খোকাকে পাঠাবো শান্তিনিকেতনে।

শান্তিনিকেতন! আমার চোখের আলোয় সে তো কখনো দেখা দিল না। তাই যেখানে আলো নেই, সেইখানেই তাকে আমি দেখতে পাই। কী দেখতে পাই? সে কথা কাউকে বলা যায় না—সে আমার নিজের জন্যেই থাকুক।

কিন্তু যে কথা বলছিলুম।

চলতে চলতে দিদি গান গাইত, আর বাবাও গলা মিলিয়ে দিতেন তার সঙ্গে।

দাওনা ধরা, হৃদয় তখন তোমার ভরা'—

কিন্তু আমার ভালো লাগত না। সেই দশ-এগারো বছরেও না। অন্ধকারের সঙ্গে আমার মনের মিতালি হয়নি কখনো, কোনোদিন অন্ধকারকে আমার পছন্দ হয়নি। আলোর রঙ দেখেছি সকাল দুপুর-সন্ধ্যায়, দেখছি শিশিরে ভেজা ঘাসের ওপর, পাতায় ঝিলিমিলিতে—নদীর জলে; পাখির রঙ দেখেছি—শালিক, দোয়েল, মাছরাঙা, বউ কথা কও। আমাদের বাগান ভরে জুঁই ফুটত—গাঁদা ফুলে আলো হত উঠোন—দোপাটি যেন রঙের মেলা বসিয়ে দিত। আমাদের পড়াই নদীর ওপর কত রঙ যে খেলা করে বেড়াত—বর্ষার মেঘ করলে, শরতের কাশ ফুটলে—এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পর তার

—তোমার পরীক্ষার পড়া কতদূর ?—চন্দ্রাদি হঠাৎ জানতে চাইল।

আমি আই. এ.র জন্যে তৈরী হচ্ছিলুম। আমাদের প্রিন্সিপাল ডবল এম. এ., তিনি খুব যত্ন নিয়ে পড়াতেন আমাকে। বললুম, চলছে একরকম। পাস করব।

—আমারও পড়বার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হয়ে উঠল না। চন্দ্রাদির নিঃশ্বাস পড়ল।

—পড়লে না কেন ?

—যে কারণে তুমি গান শিখলে না।—চন্দ্রাদি হাসল আরে সবাই যদি লেখাপড়া শিখে ফেলে, তা হলে দুনিয়ায় মুরুখু কোথায় পাওয়া যাবে বলো দিকি ?

একথার জবাব দিল। কিন্তু আমি কিছু বললুম না। চন্দ্রাদির কাছে এলেই মনটা কেমন ভারী হয়ে উঠতে থাকে। যখানিয়মে খেলা করতে তখন ভালো লাগে না।

দুজনে এগিয়ে চললুম চুপচাপ। বাঁ দিকে সীজন ফ্লাওয়ারের দল—হাওয়ায় তাদের পাতা কাঁপছে, পাপড়ি দুলছে। প্রজাপতি আর মৌমাছিদের ডানার আওয়াজ উঠছে। পাশের পুকুরে কলধ্বনি তুলছে জল। আমার গড়াই নদীর কথা মনে এল। সেই লাল কালো নদীর রঙ—চরের ওপর দিয়ে পোড়া মাটির পুতুলের মতো রঙধরা মানুষগুলো বাঁক কাঁধে নিয়ে কোথায় কোন দূরের গ্রামের দিকে এগিয়ে

কোলে

গ্লুকোস

বিস্কুট

রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দ্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত

বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা

কোলে

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

উৎকৃষ্ট বার্লি বলিতেই লিলি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, টাট্‌কা ও স্বাস্থ্যপ্রদ

সকল বয়সে ও ঋতুতে সমান উপযোগী

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

তার জীবনের এই অংশ আমার অজ্ঞাত। আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। এইমাত্র শুধু এইটুকু জানলুম যে কোন এক ডাক্তার তার জীবনের খুব কাছাকাছি এসেছে, কিন্তু এখনও তার নাগাল পায়নি। কিন্তু কেন পায়নি, সে কথা স্মৃতি বলবে না। গভীর উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। নিজে কথা না বলে আমি তার কথার অপেক্ষা করতে লাগলুম।

রাজাকে স্মৃতি কোথায় বসাবে ভাবছিল। দাবার ছকে মন্ত্রী আছে, রাণী নেই। আমার রাজা যদি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে না চলত, তাহলে আমি তাকে এগিয়ে দিতুম। স্মৃতি বলল : ডাক্তার নিজেই পাগল, তা না হলে একটা রুগীকে নিয়ে কেন পাগল হবে!

কোথায় তিনি?

কোথায়!

স্মৃতি চঞ্চল হয়ে উঠল।

আমি তার পরের কথার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম।

কোথায়! হয়তো আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কেন খুঁজে বেড়ায়, কেন বোঝে না—

উত্তেজনায় স্মৃতি উঠে দাঁড়িয়েছিল। বললুম : কী বোঝে না?

না না, আপনি সে কথা বুঝবেন না। আমিই পারব না আপনাকে বোঝাতে।

স্মৃতি তার নিজের ঘরে পালিয়ে গেল। আমি তার দরজা বন্ধ করবার শব্দ পেলুম।

ঘুম পেয়েছে? চুল বেঁধে শুতে কিন্তু ভুলবেন না!

প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততার পর রাত্রে যখন চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে আসে তখন স্বভাবতই ইচ্ছে করে কোনরকমে শুয়ে পড়তে। চুল আঁট করে না বেঁধে শুলে চুলের সাবলীলতা হ্রাস পায়। যাঁদের অসুখ বা অন্য কারণে চুল উঠছে বা যাঁদের চুলের সৌন্দর্য স্বভাবিকভাবে হ্রাস তাঁদের পক্ষে বিশেষ করে খানিক-ক্ষণ চুলের গোড়াগুলিতে জবাকুসুম তেল মালিশ করে, তারপর ভাল করে চুল আঁচড়ে, আঁট করে চুল বেঁধে, তবে শোওয়া উচিত। মনে রাখবেন, চুলের খোরাক আর যত্ন দুটোই সমান দরকার।

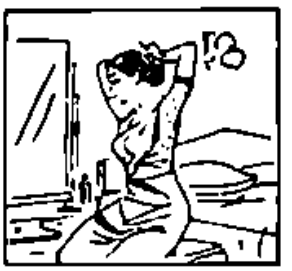

জবাকুসুম

সি. কে. সেন এণ্ড কোঃ প্রাইভেট লিঃ

জবাকুসুম হাউস, ৩৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩

উৎসব উপহার হিসেবে সেলাই কল আজকাল এত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে কেন? আপনার পরিবার খুশী হবে সেইজন্য কি? আপনার প্রিয়জনেরা আপনার বিবেচনার তারিফ ক'রবে, এই সুন্দর মনমত উপহারটি তাদের জীবনযাত্রার অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াবে, তাই? হ্যাঁ। কিন্তু শুধু তাই নয়—এই সেলাই কল প্রাচুর্য্যের স্বচ্ছলতার প্রতীক। আপনার পরিবারের জন্য আদর্শ উপহার। এ বছর 'উষা'-র নতুন 'স্ট্রীমলাইন্ড' মডেল দিয়ে আপনার পরিবারকে চমক লাগিয়ে দিন। সুন্দর, আধুনিক গড়ন আর নিখুঁত কাজের জন্য ভারতের বাইরে চল্লিশটিরও বেশী দেশে সমাদৃত —এদেশে এই প্রথম বাজারে ছাড়া হচ্ছে।

উষা

সেলাই কল

: সুমনার ঘেমাকী দাদার গর্ব তাহলে তাদের শেষ পর্যন্ত। এখনো ঠিক সেই আগের মতো ফাঁকালো এবং অন্তত। এত বেশী ফাঁক বরদাস্ত করা যায় না।…

প্রথমদিনই, অভিনয়ের পর, মালতি খোঁজ নিয়ে পবিত্রর আস্তানা জেনেছিলো। শিলাচল-কালীবাড়ি-গেস্টহাউসের রান্নাঘরের পাশের ছোটো ঘরটিতে, গিয়েছিলো সেখানে।—একজন মেয়েদার্ দেখা করতে চান—ওর সুস্পষ্ট আদেশ নিয়ে গেস্টহাউসের বয় ঘরে ঢুকে, পবিত্রর ঘাড় টানিতে পালিয়ে আসতে পথ পায় না। ঘরের ভেতর পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলো মালতির দুচোখ। একেবারে দরজার পাশেই, চোখ ঢেকে মাথা এলিয়ে একটা চারপাইতে শুয়েছিলো পবিত্র। মালতির কণ্ঠস্বর পবিত্রর কানে গিয়েছিলো তাতে সন্দেহ নেই।—উঠে একবার দেখতেও ইচ্ছে হলোনা মানুষটা চেনা মানুষ কিনা, কণ্ঠস্বর শুনেও না—। একটা মৌন-ব্যথা রিন্ রিন্ ক'রে উঠলো মালতির বুক জুড়ে।

ভাবতে অবাক লাগে মালতির, দারিদ্র্য নিয়ে পবিত্রর এত অহংকার কিসের?…সুমনা ছিলো উনিভার্সিটির একটি উজ্জ্বল রত্ন। তারই—কোনো খাতার পাতায়, পবিত্রর আঁকা কতগুলি ছবি দেখে ফেলেছিলো মালতি। পবিত্র সুমনার দাদা। মালতি ছবি বোঝে, সেই কৌতূহলই সুমনার কোনো বাধা-নিষেধ মানেনি। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে গিয়েছিলো সুমনাদের বাড়ি। তিনদিন গিয়েছিলো। তিনদিনই, পবিত্র চূড়ান্ত অভদ্রতা করেছিলো মালতির সঙ্গে। পবিত্রর নির্লিপ্ত মুখ, নির্নিমেষ দৃষ্টি আর সারা শরীরের বিরক্তির ঢেউ—এসব কিছুই আমল দিলো না মালতির মন। ওর সমস্ত উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে রইলো, টেবিলের ওপর ছড়ানো-ছিটোনো পবিত্রর আঁকা ছবিগুলি।

—কাঁসারিপাড়া রোডের কাটল ধরা একতলা একখানা বাড়িতে এ কী বিস্ময়কর বৈচিত্র্য লুকোনো আছে! ছবি বোঝে মালতি। দেখতে জানে। রঙিন কটি রেখায় ছবিগুলি কী অদ্ভুত জীবন্ত! কী আশ্চর্য ব্যঞ্জনা! কী নতুনরূপ ছবির! কী নতুন রীতি!—ছোটো ঘরের দেয়ালবদ্ধ-সীমাতে এ কী ঐশ্বর্য বন্দী হ'য়ে আছে! ভারতময় ছড়াতে হবে এই বন্দী প্রতিভা, বিশ্বময় ছড়াতে হবে, এবং এই ছড়ানোর কাজে অনেকের সঙ্গে হাত মেলাবে মালতি।

বাবার মাধ্যমে, মালতি বিরাট সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এলো। কিন্তু বৃথা। মালতির সমস্ত পরিকল্পনা পবিত্রর পাথুরে-পনের তলায় ধূলিসাৎ হ'য়ে গেলো।—শিল্প কারো কৃপা-কটাক্ষের প্রয়োজন বোধ করে না, তার সৃষ্টি নিয়ে সে প্রকাশ হবেই একদিন।—

বি. এ. পরীক্ষার পর মালতি মুলৌরি গিয়েছিলো। ফিরে এসে সুমনাকে দেখেনি। টাইফয়েড থাবা দিয়ে নিয়ে গেছে।—কলকাতায় থাকলে এমনটা কিছুতেই হতো না—এ শোক ভুলতে মালতির সময় লেগেছিলো। আর পবিত্র, গ্রোরোথাইসিটিনের টাকা ক'টা সংগ্রহ করতে পারেনি ব'লে, নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেনি—পারলো না। নিজের জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেললো। কলকাতা আর্টকলেজে লোভনীয় চাকরী মিললো—নিলো না। এদিক-ওদিক বহু কলেজ থেকে ডাক এলো, শুনলো না। তার

কন্যার নাম রাখলেন বেদান্তপ্রভা। স্বামী-স্ত্রীর এই বন্ধুহীন জীবন ও স্বামীর বিদ্যার অপরিসীম বিশ্বাস কোনো ক্ষেত্রেই তুলনা নয়। তবে একটা দ্বন্দ্ব অথবা অন্ততপক্ষে কোন একটা ফাঁকি কোথাও না থাকলে গল্প জমানো শক্ত। তাই নারী যেখানে স্বামীকে দেবতা বলে পূজা করছেন সেখানে লেখকই কৌতুকভরে স্বামীর তুচ্ছতা, অর্বাচীনতা বা নিরন্তর মূর্খতা দেখান; আবার বৈদ্যনাথের মত অকর্মণ্য কিন্তু অতি নিরীহ স্বামীর উপর স্ত্রী যখন খড়্গ ধারণ করেন, তখন লেখকের মনেই করুণা জেগে ওঠে। মনে হয় যেন বেচারীকে রক্ষা করাই তাঁর ধর্ম। অবশ্য দ্বন্দ্বের কাহিনীতে উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি লেখকের না থাকলে গল্পের দানা বাঁধে না। দৈব বা মানব কেহ যদি জীবনের স্বচ্ছন্দ গতির মধ্যে একটা বাধা সৃষ্টি না করে তবে উপকথার মত lived happily ever afterwards ছাড়া গল্পের আর কোন পরিণতিও থাকে না। মানুষের অপূর্ণতার জন্য মানুষ জীবনধারার মধ্যে বারে বারেই এই বাধা সৃষ্টি করে। দৈব ত আছেনই। তাই পল্লীজীবনের পটভূমিকাতে ও সেই ছোট বড় বিপত্তিগুলিকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের নায়িকেরা নানা চিত্রে দোষে-গুণে নানা রূপে দেখা দিয়েছেন। কবির মার্জিত মন গ্রাম্যতা দোষ অপেক্ষা পল্লীশ্রীই বেশী দেখেছেন এই নারীগুলির মধ্যে। কৌতুকভরে তাদের দুর্বলতা দেখিয়েছেন যেখানে তাঁরা নিতান্তই শ্রীমতী নন।

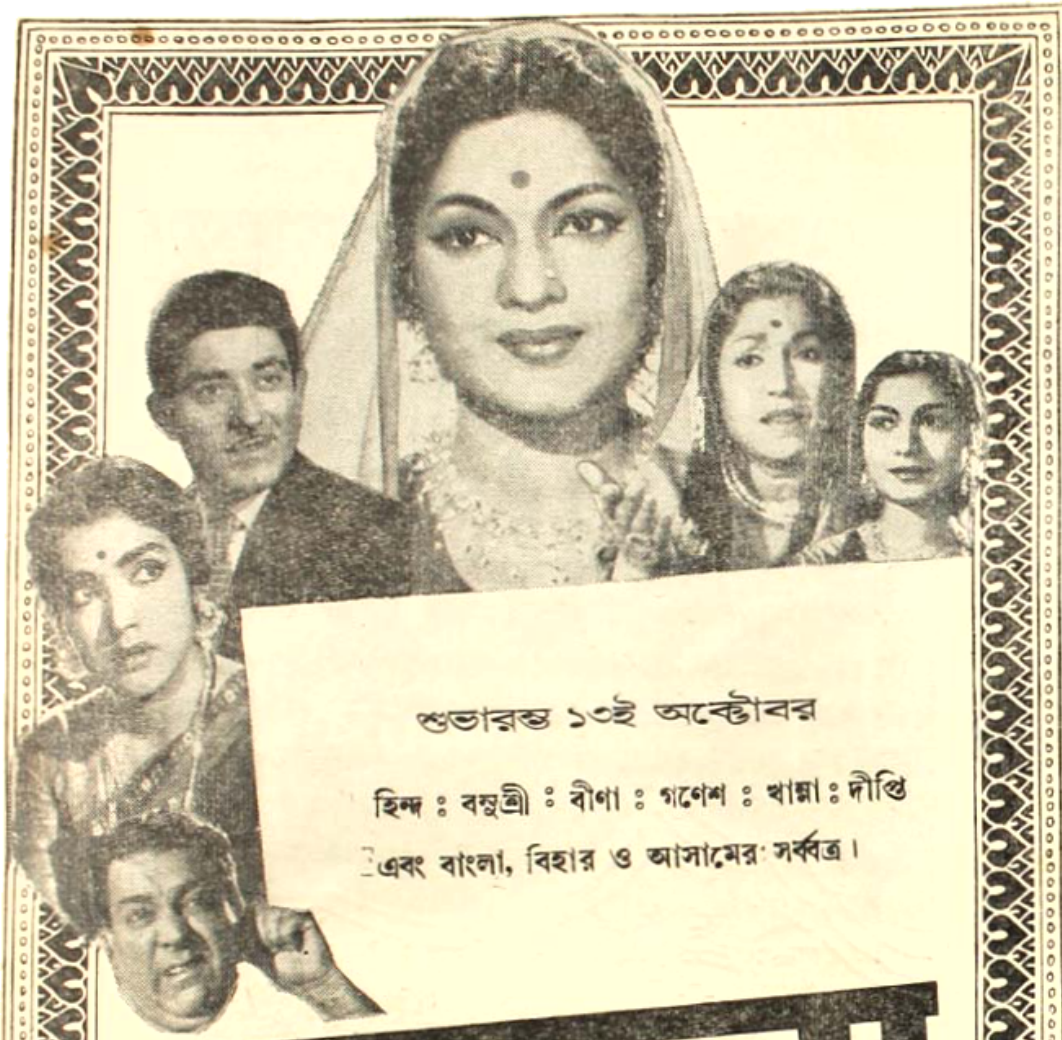

শুভারম্ভ ১৩ই অক্টোবর

হিন্দ ঃ বসুশ্রী ঃ বীণা ঃ গণেশ ঃ খান্না ঃ দীপ্তি

এবং বাংলা, বিহার ও আসামের সর্ব্বত্র।

ঘরানা

নির্মাতা ও নির্দেশক **এস, এস, ভাসান**

সঙ্গীত **রবি** গীতিকার **শাকীল**

জেমিনী **ছবি**

সঙ্গীলক্ষ্মী

সমুদ্ধ

● রহস্য উপন্যাস ●

দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিজের হাত কালা কালা করেছিল বাঘের ওপর রাগ করে। সবাই তাকে ভয় করে চলত, বেশী ঘাঁটাত না।

—হুঁ। তারপর?

—তারপর, বছর চারেক হবে। তার সেবার আই. এ. পরীক্ষা। ক'দিন শরীর খারাপ ছিল, তার ওপর ভাব—ইনফ্লুয়েঞ্জা। দু'তিন দিন খায়নি। তাই নিয়েই বেরিয়েছিল ক্লাসের কোন্ মেয়ের বাড়িতে যাবে বলে। বালিগঞ্জ থেকে, চাকুরের দিকে রেললাইন ধরে যাচ্ছে, হঠাৎ ট্রেন এসে পড়ল। দুর্বল শরীর সামলাতে পারল না—একেবারে ট্রেনের তলায় চলে গেল, টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

সেই খবর শুনে বসন্তবাবু একেবারে গুম্ হয়ে গেলেন। কান্নাকাটি চেঁচামেচি কিছুই করলেন না, একদম চুপ করে বসে রইলেন কদিন, তারপরই স্ট্রোক হল। কয়েক দিন অজ্ঞান, তারপর ক্রমে সুস্থ হলেন, কিন্তু বাঁ পায়ের আর জোর পেলেন না। সেই থেকে আর বাইরে বেরোন না। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশাও করেন না শুনেছি। বসে বসে খান আর শুয়ে শুয়ে বই নিয়েই পড়ে থাকেন।

ডাক্তার হঠাৎ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। কহিলেন, আর কবি?

—চেহারা ত দেখলেন।

—বাঘের মত।

—আপনি চেনেন?

—চিনতাম। বল।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর ক'রে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে। রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে কুলও জমবে না।

• বিনামূল্যে একসেট পলতে
• যে কোন অংশ সহজলভ্য

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

PATENT NO. 41114 OF—51

প্রস্তুতকারক:

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA.O.KLIPS

উৎকৃষ্ট ইস্পাত
হইতে প্রস্তুত
• মজবুত নির্ভরযোগ্য
সকল প্রধান প্রধান বিক্রেতার নিকট
পাওয়া যায়।

গোবিন্দ শীট মেটাল ওয়ার্কস্ এণ্ড ফাউণ্ড্রী

২১০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ : ফোন—৩৫-২৮৩৯

অভাব আছে নাকি? শুক্লা অবশ্য এসব স্বীকার করে না। সে তার জীবনের এত কথা বলেছে কিন্তু শৈলেনবাবুর সঙ্গে তার ও-ধরনের কোন সম্পর্ক ছিল তা কিছুতেই প্রকাশ করেনি। বরং রাগ করে বলেছে, 'তুমি তো দীপালির কাছে এসব আভাস পেয়েছ? সব মিথ্যে। আসলে দীপালি নিজেই—। যাকগে আমি কারো বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাইনে। ওদের মতো পিছনে কামড়ানো আমার মোটেই অভ্যাস নয়। বেশ তো আমাকে যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, আমি বারবার হাত বদল হতে হতে এসেছি—এই যদি তোমার ধারণা হয় আমাকে ছুঁয়ো না, আমার ছোঁয়া নিয়ো না, কথাও বলোনা আমার সঙ্গে। বেড যখন পেয়েছ তোমার সেবা কেউ না কেউ করবেই। কথা বলবার মানুষেরও তোমার অভাব হবে না।

ভারি কড়া মেয়ে শুক্লা। দেখতে অমন নরম হলে কী হবে; ওর হাতের মুঠি অমন মাখনের মত হলে কী হবে, বড় কড়া মেজাজের মেয়ে শুক্লা। গায়ে হাত বুলায়, মিষ্টি কথা বলে, বিড়ালের মত পোষ মেনে পায়ের কাছে বসে থাকবে, কিন্তু একটু খোঁচা দাও, বিরুদ্ধে কিছু বল, অমনি ফোঁস করে উঠবে, বেশি রেগে গেলে আঁচড়াতে কামড়াতেও দ্বিধা করবে না। অবশ্য শুধু কথায়, নখে দাঁতে নয়।

সুকুমারের সঙ্গে দেখা হবার আগে শুক্লা যে অসূর্যম্পশ্যা হয়েছিল তা সুকুমার বিশ্বাসও করে না, আশাও করে না। এ ধরনের মেয়ে যাকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে সে যে কখনো পা পিছলে পড়ে যায় নি, তার হাতের মুঠি আর কেউ যে কখনো শক্ত হাতে চেপে ধরেনি

অগ্রগতির পথে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পপ্রসার এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোকে দৃঢ় করাবার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যথাক্রমে প্রায় ৭২ কোটি ও ১৫৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও এই সর্বাংগীণ উন্নতি-প্রচেষ্টা সমভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে। এই নতুন পরিকল্পনা অনুসারে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে—কৃষি ও আনুষংগিক বিষয়সমূহ বাবদ ৭৬·৮৭ কোটি টাকা ; সমবায় সমষ্টি উন্নয়নের জন্য ২৩·৩৬ কোটি টাকা ; বিদ্যুৎশক্তি ও সেচ বাবদ ৫৭·৮৬ কোটি টাকা ; শিল্প ও খনি ১৩·০৪ কোটি টাকা ; পরিবহন ও যোগাযোগ ২৬·৫০ কোটি টাকা ; সমাজসেবা ৮৯·০১ কোটি ; অন্যান্য খাতে ৫৪·৬৬ কোটি টাকা ; মোট ৩৪১·৩০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়িত করে উন্নতির পথে আমরা আরো এক ধাপ এগিয়ে গড়ে তুলবো।

সোনার বাংলা

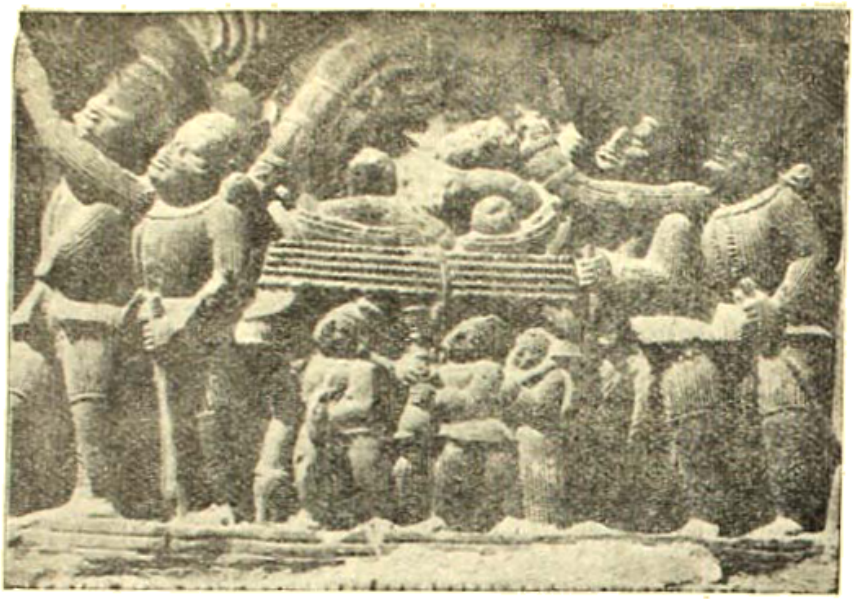

গান্ধী

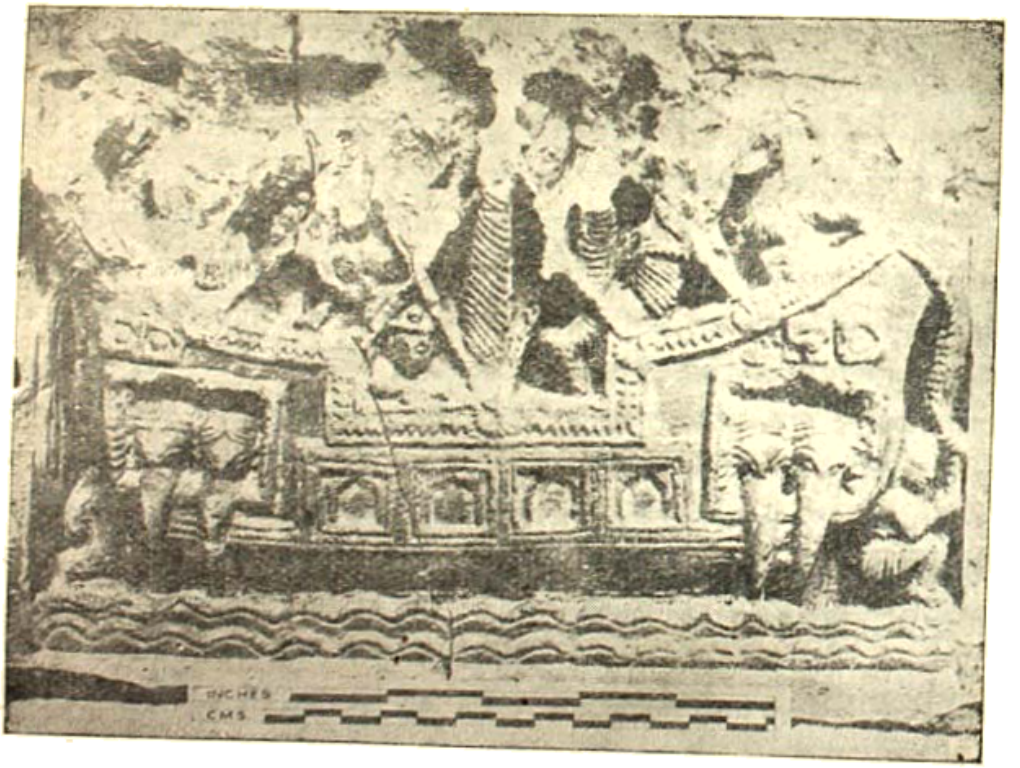

পর্তুগীজ
জাহাজ

আশুতোষ মিউজিয়ামের সৌজন্যে

মন্দিরের গড়নে এবং ভিত্তি নক্‌শায় যেমন বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, মন্দির প্রাচীরের অলঙ্করণেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বস্তুত ভারতীয় মন্দিরের প্রাচীর সজ্জায় যে পরিমাণ নক্‌শা অলঙ্কার, মূর্তি এবং চিত্র ব্যবহৃত হয়েছে তার তুলনা অন্য কোন জাতির নির্মিত কোন রকমের অট্টালিকাতেই পাওয়া যায় না। এই দিক থেকে বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সত্যই গণনাতীত যে প্রাচীরালঙ্করণ দেখা যায় তার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক পরিচয় এখনও হয় নাই। এখনও অনুরাগী তীর্থকামী বা কৌতূহলী পরিব্রাজকেরাই এই প্রাচীরালঙ্করণের প্রধান দর্শক এবং সমঝদার।

পাথরে মন্দির নির্মিত হওয়ার গোড়াতে মন্দির প্রাচীরে বিশেষ কোন অলঙ্কার থাকত না। তবে দেবস্থান বা বৌদ্ধ বিহারের প্রাচীরে ধর্মীয় চিত্র উৎকীর্ণ করবার প্রচলন খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকেই লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীর সজ্জার এই রীতি পরবর্তী যুগে মন্দিরের ক্ষেত্রে গৃহীত হতে খুব দেরী হয়নি; গুপ্ত আমলের শেষভাগ থেকেই মন্দিরের গায় দেবমূর্তি সন্নিবিষ্ট হতে থাকে। দেবমূর্তির ধ্যানসম্মত রূপসাড়ো পুরাণে অভিহিত দেবীলীলার নানা দৃশ্যও মন্দির প্রাচীরে সন্নিবিষ্ট হতে থাকে। এই সব লীলা বৈচিত্র্যের মধ্যে ইলোরা এবং এলিফেণ্টার গুহামন্দিরে শিব বিবাহের দৃশ্যগুলি উল্লেখ-যোগ্য নাটকীয় গুণ ও ভাবকল্পনার দ্যোতক। এই ভাববৈচিত্র্য এবং ভাস্কর্যের অন্তর্নিহিত রসের আবেদন স্বভাবতই স্থাপত্যশিল্পে প্রভাব বিস্তার করেছিল, এবং মন্দির প্রাচীরের অন্য নাট্যগুণ সম্বলিত গতিবিশিষ্ট সমৃদ্ধ ভাস্কর্যের নিদর্শন অচিরেই নিতান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নির্মিত রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত বিখ্যাত সোমপুর বৌদ্ধ বিহারের মন্দির প্রাচীরে খ্রীষ্টীয় অষ্টম—নবম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ কিছু প্রস্তর ফলক সন্নিবিষ্ট করা হয়। এই সব

বাংলার মন্দির

ফলকে শিব ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কয়েকটি দৃশ্য মন্দিরটির রূপ এবং শোভাকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে। শিব ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক এই সব ফলকচিত্রে পুরাণ বিহিত দৃশ্যের অবতারণা করা হয়ে থাকলেও স্বাভাবিক মানবিকতা গুণসমৃদ্ধ এই সব চিত্রের প্রসাদগুণ এগুলিকে যথেষ্ট জনপ্রিয় করে রেখেছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ধর্মীয় এই সব চিত্রে সাধারণ মানুষের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করার যথেষ্ট উপকরণ ছিল কিন্তু দেবতা নিকট হলেও চিরকালই দেবতা বিধায় এইসব ধর্মনির্ভরচিত্র মানুষকে বোধহয় পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে নাই। এইজন্যই পাহাড়পুরের মন্দির প্রাচীরে প্রস্তরফলকে বহু দেবীলীলার চিত্র থাকলেও মাটিতে তৈরী ফলকগুলির অধিকাংশেই সাধারণ

ক্যালকেমিকো'র

ক্যাষ্টরল

কেশ বিন্যাসে অতুলনীয়

কেশবিন্যাসে ক্যাষ্টরল ব্যবহার করলে কি সুন্দর দেখায়।

ক্যালকেমিকো'র প্রকৃতিজাত উদ্বায়ী তৈল (natural essential oil) সংমিশ্রণে প্রস্তুত সুরভিত ক্যাষ্টরল — কেশ তৈল কেশবর্দ্ধনেও বিশেষ সহায়ক।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লিঃ, কলিকাতা-২৯

CAL-3/11-57

দুর্গাপুর
ইস্পাত কারখানা

রাসবাকে দেবে
পুল এবং ইমারত
নির্মাণের জন্য
ইস্পাত,
কৃষিকার্যের
সরঞ্জাম,
রেলওয়ের জন্য
স্লীপার, ফিশপ্লেট
এবং হুইল সেট।

ইস্কন

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কনস্ট্রাক্শন কোং লিঃ

[illegible]

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত,

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুট হালকা ও সুস্বাদু। পুষ্টিকর, অল্পেই পেট ভরায়, এবং এত সহজে হজম হয় যে সুস্থ-অসুস্থ পুষ্টিহীন হলেও বয়স্ক নির্বিশেষে সব সময়ই এই বিস্কুট খেতে পারেন। আপনার শিশুর জন্যে চাই স্বাস্থ্য, সঙ্গে ও উপহারিয়ার সময়ের উপযুক্ত বিস্কুট ব্রিটানিয়া।

ব্রিটানিয়া বিস্কুট

বি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

'রাজার' ভূমিকায় ৭০ বছরের রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের চীন-জাপান ভ্রমণে
সঙ্গের শ্রীমতী নিং, অধ্যাপক কালিদাস নাগ
ও আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন।

চীনের বৌদ্ধ মন্দিরে
রবীন্দ্রনাথ ও সহযাত্রিগণ।

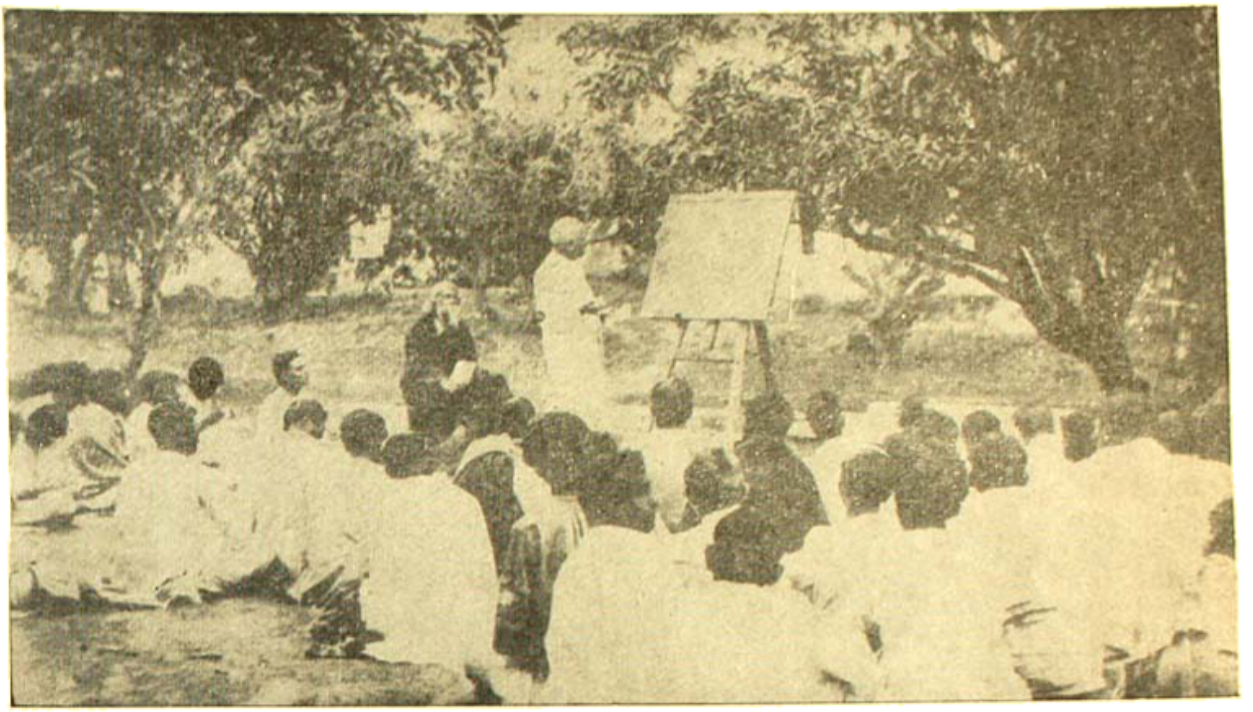

শান্তিনিকেতনে ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক ডঃ লেভী সিলভাঁ-চীন ভাষা
উপবিষ্ট : রবীন্দ্রনাথ ও ছাত্রেল

বিশ্ব-ভারতীর প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ ও অধ্যাপক
সিলভাঁ লেভী

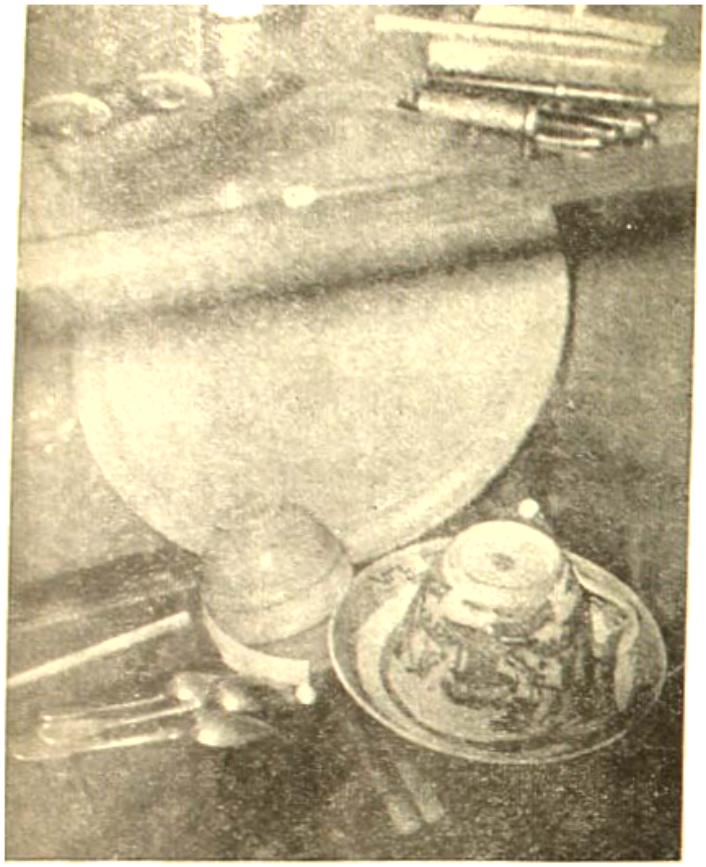

শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত
ব্যবহৃত সামগ্রী।

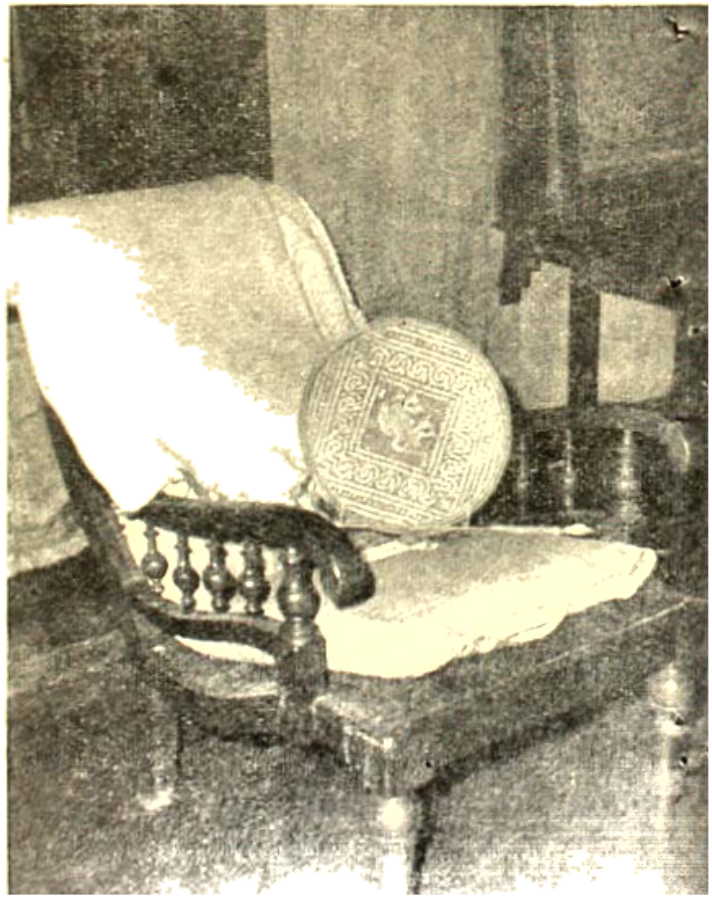

'তোমার আসন
শূন্য আজি—'

আলোকচিত্র—গল্প-ভারতী

॥ কবির আঁকা ছবি ॥

॥ রবীন্দ্রনাথ ॥

শিল্পী : অজিত ৬

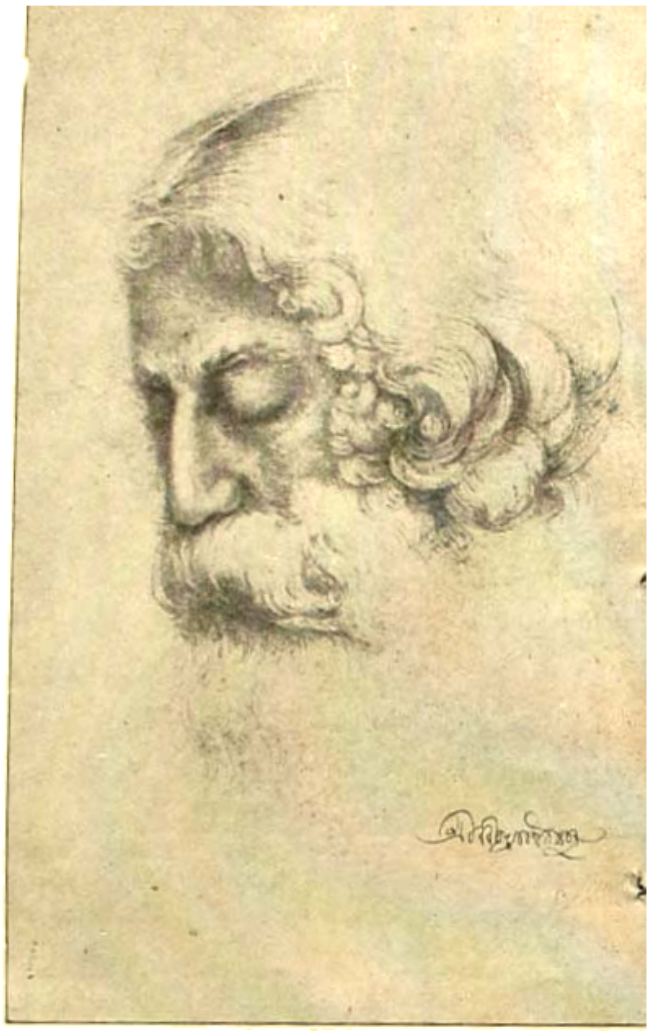

শিল্পী : মুকুল দে

রয়েছে—তাদেরও পরিবেশন সাধারণ্যে করা হয়নি, তবু বাংলার মাসিক পত্রিকাগুলি একাজ কিছু করে আমাদের ধন্যবাদ অর্জন করেছেন। এ যুগের মনীষী নৃত্যাগাগল ৺গুরুসদয় দত্ত তাঁর ব্রতচারী নৃত্যে পুনর্জীবন সঞ্চার করে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তাই বাঙ্গালীর ছেলেমেয়েরা পায়ের শিকল ছিঁড়ে নৃত্যচ্ছন্দে সারা ভারতে উদয়শঙ্করের দেশবাসী বলে গর্ব করে। মার্গসঙ্গীতের মত 'কথক' তথা ভরতনাট্যম্ উত্তর ও দক্ষিণের আড়ষ্ট কালোয়াতী পার হয়ে লোকনৃত্যের প্রেরণায় নব-জীবন পাবে। তাই দেখি রবীন্দ্র-শতাব্দী উৎসবে তাঁর প্রিয় নাতনী নৃত্যরসিকা নন্দিতার ডাক পড়েছে। অধ্য এশিয়া ও রাশিয়ার রবীন্দ্র-নাট্য প্রযোজনায় রুক্মিণী দেবী ও মৃণালিনী সারাভাই জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন।

ভাস্কর্যে প্রাচীন
ভারতের নৃত্যকলা

শান্তিনিকেতনের নৃত্য

শারদীয়া গল্প-ভারতী, ১৩৬৮

কথাকলি

ভারতনাট্যম্

শারদীয়া গল্প-ভারতী, ১৩৬৮

ভারতীয় নৃত্য

ইন্দোনেশিয়ার অনুপম নৃত্যকলা

চিত্রে এশিয়ার নৃত্যকলা

পূর্ব পাকিস্তানের কমল বোস: বাচ

পশ্চিম পাকিস্তানের একটি ক্লাসিকাল নৃত্য

সিংহলের তাণ্ডব নৃত্য

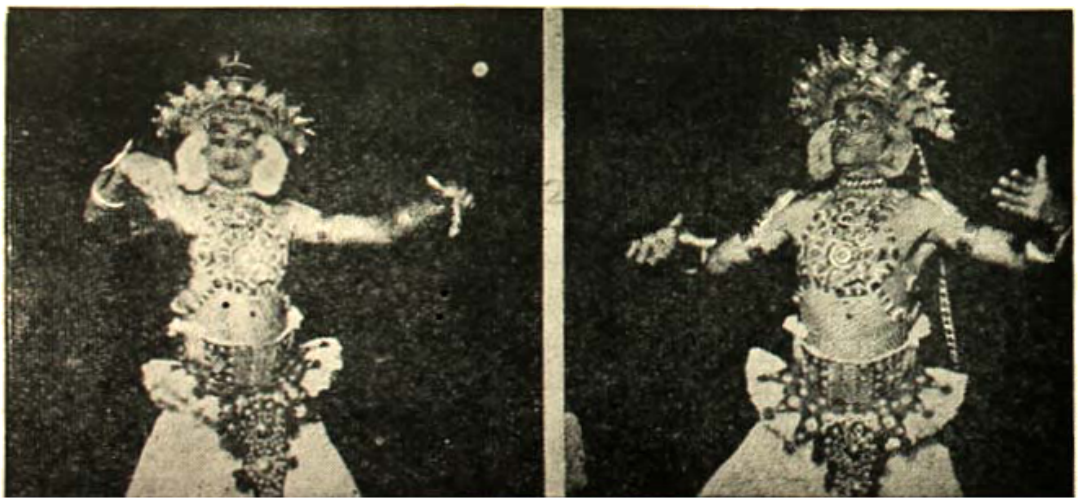

ব্রহ্মদেশের নৃত্যকলা

শ্যাম দেশে রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্যে সুগ্রীব এবং বানর সেনাপতিগণ

শ্যাম দেশীয় নৃত্যকলার একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় দু'জন শিল্পী

মালয়ের অনুপম নৃত্যকলায় শ্রীবেণী শর্তক

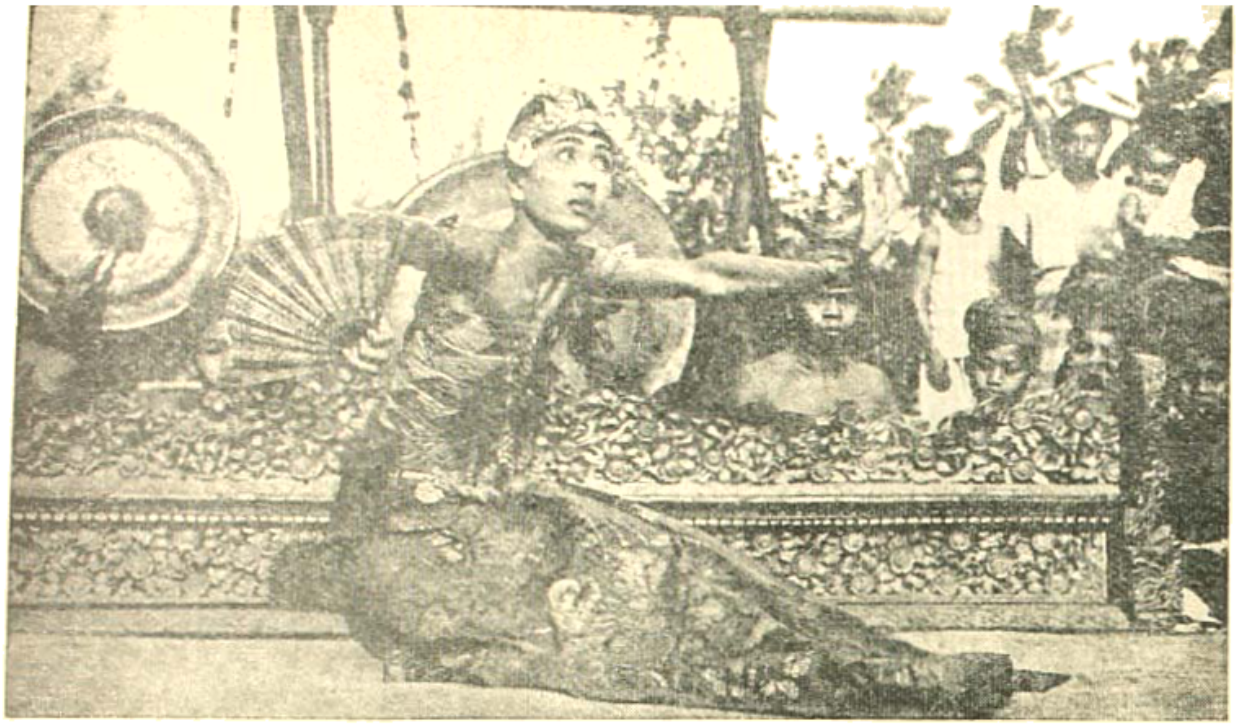

ইন্দোনেশিয়ার তিমর দ্বীপের 'প্রেমনৃত্য'

হিরেন্দ্রনাথের প্রজাপতি নৃত্য

হিরেন্দ্রনাথের গং নৃত্য

শারদীয়া গল্প-ভারতী

জাপানের প্রাচীন মুখোস নৃত্য
প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে এই নৃত্য খুব জনপ্রিয় ছিল

জাপানের রূপসী
গেইশা নৃত্য

উজবেক বাহার
নৃত্যচক্রের 'লক্ষ্মী' নৃত্য

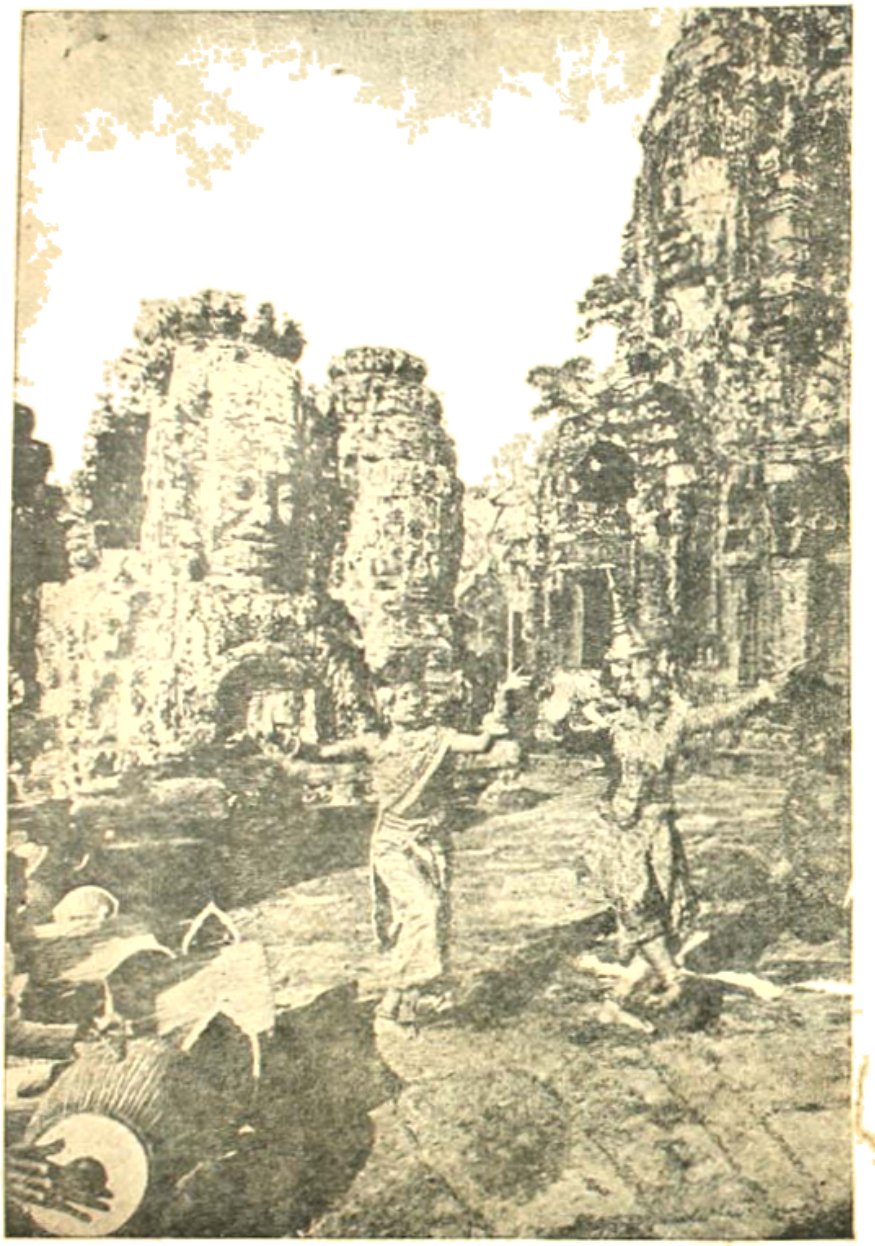

আঙ্কোরের স্থাপত্যকীর্তির পটভূমিকায়
কাম্বোডিয়ার নৃত্যকলা

দীপালি

গল্প-ভারতী

কার্ত্তিক ১৩৬৮

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ—

॥ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুতুলনাচের কথা ॥

(একটি সচিত্র সংযোজন)

একখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস।

বিশ্ব-বাঙ্ময়চিত্র।

★
★ ★

পুতুল
ও
পুতুলের নাচ

ছেলেমেয়েদের
যেমন প্রিয়
তেমনি প্রিয়

লিলি বিস্কুট

★
★ ★

লিলি বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৪

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়	৩২৯
শক্তি সাধনা ও মনুষ্যত্ব—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন	৩৩১
দুই নয়া পয়সা—সমুদ্ধ	৩৩৬
দেশ-বিদেশ	৩৪১
পারের বিমান—ডঃ হিরণ্ময় ঘোষাল	৩৪৫
সাহিত্য ও সাহিত্যিক—ক্নুট হামসুন—সুকুমার ঘোষ	৩৫৪
একজন ও আরেকজন—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫৭
অন্ধ—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৬৪

নতুন
জীবনের
নতুন
প্রয়োজন

পূরণ করতে নবজাতকের
জননীকে পুষ্টিকর
টনিকের ওপর নির্ভর
করতে হয়।
সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ
ভাইনো-মল্ট
ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায়
সাহায্য করে
এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি
ফিরিয়ে আনে।

ভাইনো-মল্ট

বেঙ্গল
ইমিউনিটি
কোং, লিঃ

এই সংখ্যায়

রোগ—জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬৬

দেওয়াল—শক্তিপদ রাজগুরু ৩৭১

সামনে তাকাও (উপন্যাস)—মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ৩৮৯

পুস্তক পরিচিতি—

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা : শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

অমনোনীত—ডঃ নবগোপাল দাস

বিশ্ব ব্যঙ্গ-চিত্র

এই সংখ্যায়

●

বিশ্বের পুতুল-নাচ

পুতুল নাচ এবং তার ক্রমবিকাশ—সুদর্শন পাল	৩
পুতুল-নাচের রঙ্গ : জার্মানীর মঞ্চে—নির্মলেন্দু মায়া	৫
চেকোস্লোভাকিয়া—ছন্দা রায়	৮
মস্কোর রাষ্ট্রীয় পুতুল নৃত্যনাট্যশালা—অমল ভৌমিক	৯
ফ্রান্স—বন্দনা পাল	১১
ইতালী—সঙ্কর্ষণ রায়	১৩
ব্রিটেনের পুতুল-নাচ—প্রসাদ চন্দ্র	১৫
চীন—প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭
পাপেট : জাপান—বারীন মৈত্র	২১
ভারতবর্ষ	২৩
জাভা—চিত্তরঞ্জন দেব	২৫
পোল্যাণ্ড—প্রণব ভট্টাচার্য	২৭

হিমেল হাওয়ার মেহ-পরশ লাভ করা কঠিন। শুকনো আবহাওয়া ত্বক-কে ক্ষণে ক্ষণে করছে বিবর্ণ, রুক্ষকে করছে কর্কশ ও বিশ্রী। নিজের ত্বকের জন্য করুন বোরোলীন-যুক্ত অ্যান্টিসেপটিক বোরোলীন ফেস-ক্রীম মেখে। বোরোলীন যে মুহূর্তে ত্বকে আনবে স্নিগ্ধ পরশ। আপনার মেহ-কাঙ্গাল নিজের দিকেও অবাক হয়ে দিবে বোরোলীন ব্যবহার করুন।

বোরোলীন
পরম প্রসাধন

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাঃ লিঃ • ১১।১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩

এখন পাওয়া যাচ্ছে

৫০ টির টিন-
১ টাকা ১২ নয়া পয়সা

১০ টির প্যাকেট-
২২ নয়া পয়সা

আর কিছু বলা বাহুল্য,

উইল্‌স-এর

এম্‌ব্যাসী

নিজেই তার পরিচয় দেবে

IWTE 164

আনন্দে উৎসবে...

প্রাত্যহিক প্রয়োজন..

সবার মনোরঞ্জনে...

পরিণামরমণীয়

কেশতৈল

কেশরঞ্জন

কবিরাজ এন্‌ এন্‌, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১

॥ ভারতবর্ষ ॥

উত্তর ভারতের পুতুল-নাচ

॥ ভারতবর্ষ ॥

নৃত্যনাট্যে রামায়ণ।
ভারতের শিল্পীদের পাপেট্ ড্যান্স।

॥ গ্রেট ব্রিটেন ॥

॥ ইটালী ॥

পুতুলে স্প্যানিশ গায়ক ও নর্তকী।

নাটকের একটি দৃশ্যে ডাক্তার রোগী দেখছেন। এটি এতই জীবন্তভাবে অভিনীত হয় যে বুকের ওঠাপড়া পর্যন্ত দর্শকরা দেখতে পান।

অন্য একটি দৃশ্যে – মদ ঢালা ও খাওয়া হচ্ছে – অভিনয় কত জীবন্ত!

মঞ্চের নেপথ্যে
পুতুল-নাচের কত বৈচিত্র্যময় চরিত্রের সমাবেশ!

॥ গ্রেট ব্রিটেন ॥

পুতুল-ক্লাউনের খেলা

রূপকথার কয়েকটি পুতুল

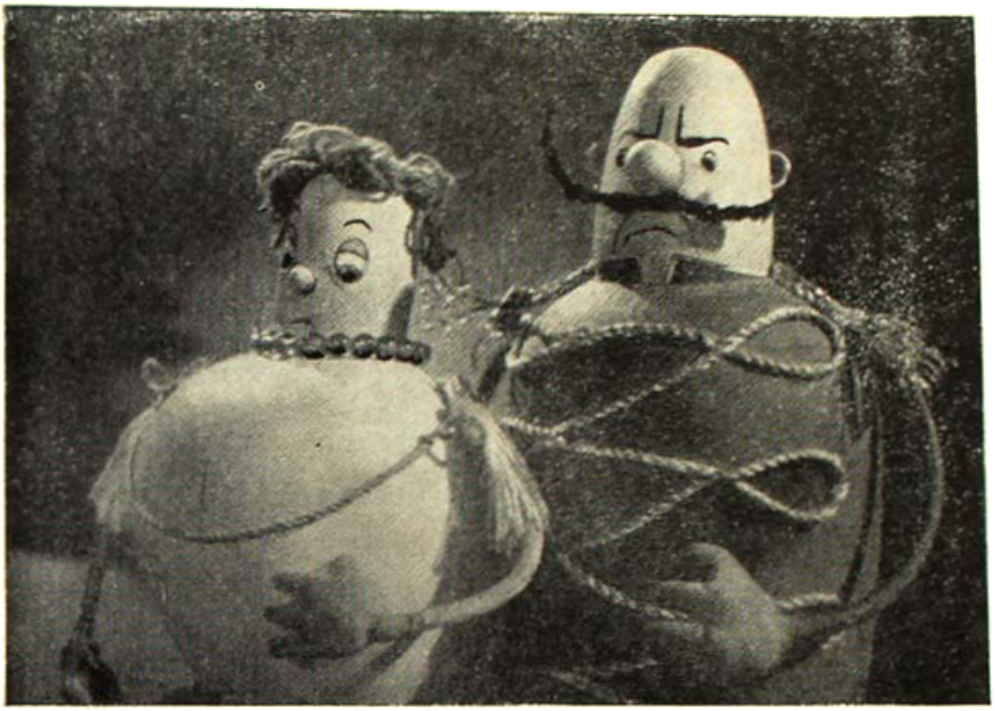

রঙীন
পাপেট ফিল্ম
'কিং লাভ্রা'র
একটি দৃশ্য।

॥ পোল্যাণ্ড ॥

সার্কাসের ওস্তাদ খেলোয়াড়
খেলা দেখাতে দেখাতে
চাঁদে চলে যাচ্ছে
আবার ফিরে আসছে।

জাপানী পুতুলের নানারূপ অভিনয়

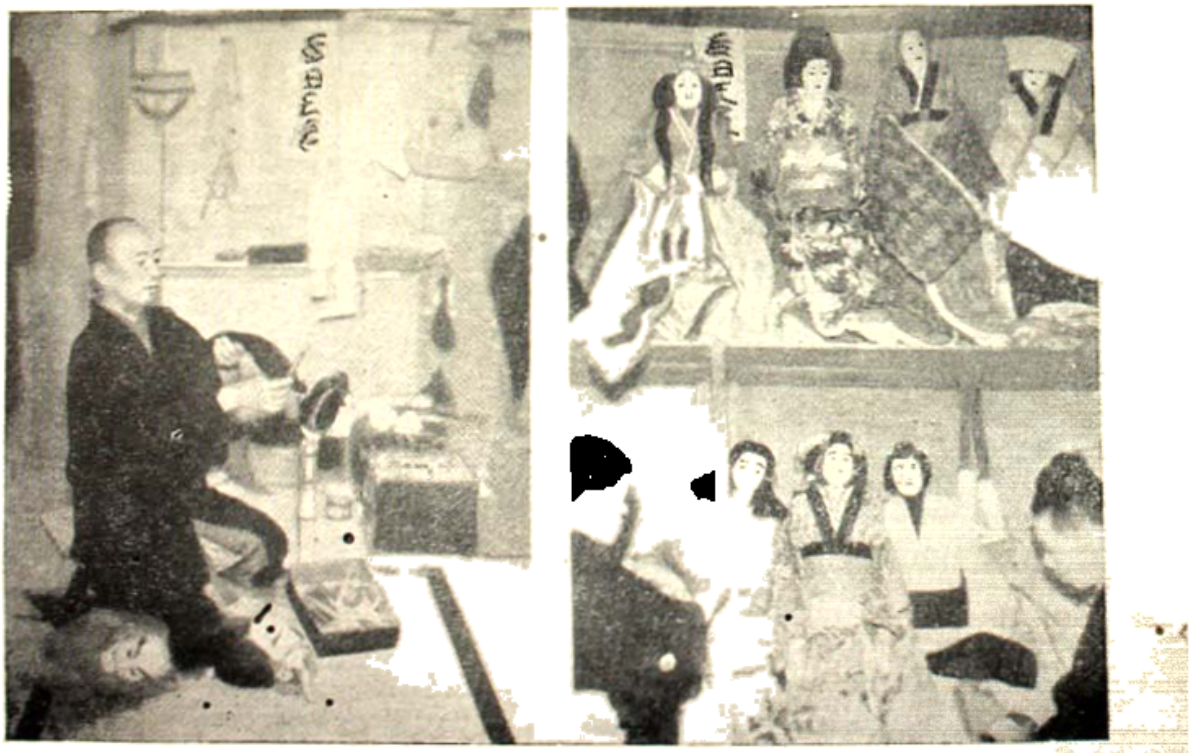

একটি অপূর্ব
নৃত্যের দৃশ্য

পিনোশিয়ো
নাটকের
একটি দৃশ্য

॥ পৃথিবীর পুতুল নাচ ॥

॥ যুগোস্লাভিয়া ॥

'দি উইকেড ব্যারণ' নাটকের দুটি দৃশ্য।

॥ চেকোস্লোভাকিয়া ॥

পুতুল-ঘোড়ার গাড়ী

॥ জার্মানী ॥

জার্মানীর পুতুল-নাচের একটি অভিনব চরিত্র

জার্মানীর 'রোজেনবার্গ পাপেট্ থিয়েটার'-এর বিচিত্রানুষ্ঠানে অভিনয়ের জন্য
রলব্ ট্রেয়লার্ নির্মিত একটি চরিত্র :
কর্মকর্তা

বেসুরো গাইয়ের দল
জার্মানীর 'রোজেনবার্গ পাপেট্ থিয়েটার'-এ চমকপ্রদ অনৈক্যতানের আসর।

এই সংখ্যার
বিশেষ আকর্ষণ—

॥ পৃথিবীর বিভিন্ন
পুতুলনাচের কথা ॥
(একটি সচিত্র সংযোজন)
॥ একখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস ॥
॥ বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র

গল্প-ভারতী

অগ্রহায়ণ—১৩৬৮

পুতুল
ও
পুতুলের নাচ

ছেলেমেয়েদের
যেমন প্রিয়
তেমনি প্রিয়

লিলি বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৪

১৯০২ সালে পত্নী-বিয়োগের পর মাতৃহারা কন্যা রেণুকা ১৯০৩ সালে ও শিশু-পুত্র শমীন্দ্রনাথ ১৯০৭ সালে মারা যান। রবীন্দ্রনাথের প্রাণে এ নির্মম আঘাত যেমন বেজেছিল, তেমনি তাঁর গল্প ও গল্প রচনায় যেন এক নূতন সুর ও দিব্য প্রেরণা দেখা দিল :

এই করেছ ভালো, নিঠুর হে।
এই করেছ ভালো…
বজ্রে তোমার আগুন করে
আমার যতই কালো।

কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী

গীতাঞ্জলীর মধ্যে কবির কত নীরব চোখের জল কত দাহনের চিহ্ন রয়েছে—শখের বৈঠকে ওই সব গান শোনাবার সময় মনেই থাকে না।

বিবাহের দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক কয়েকখানি লিখে অভিনয় করেন 'রাজা ও রাণী'তে শুধু একবার মৃণালিনী দেবী নারায়ণীর ভূমিকায় নেমেছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তার কোন ছবিই নেই!

মৃণালিনী দেবী তাঁর ননদ স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর সখীদের সঙ্গে কলকাতায় প্রথম 'সখী সমিতি' গড়ে তোলেন; তাঁদের দলে ছিলেন শ্রীমতী সরলা রায় (অধ্যক্ষ ডক্টর পি. কে. রায়ের পত্নী) যাঁর জন্ম-শতাব্দী পালন হবে এই মাসেই—তাঁর প্রতিষ্ঠিত গোখলে নারী শিক্ষায়তনে।

৭ই অগ্রহায়ণ মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু ও ১১ই অগ্রহায়ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র রবীন্দ্রনাথের জন্ম [২৭ নভেম্বর ১৮৮৮—মৃত্যু ৩ জুন ১৯৬১]। ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ Entrance পাশ করে স্বদেশী যুগের যুবক-দলের সঙ্গে আলাপ করে আমেরিকায় যান। সেখানে ১৯০৯ সালে B.Sc. উপাধি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাড়ি ফেরেন ও প্রতিমা দেবীকে [অবনীন্দ্র-ভাগিনেয়ী] বিবাহ করেন [১৯১০]। রবীন্দ্রনাথ তখন প্রবাসী

ভবানীচরণ সেই রাগযী খেলা প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহাকে চলিত কথায় 'ডানপিটে' বলা হয় বালক ভবানীচরণ তাহাই ছিলেন।

ভবানীচরণ যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তখন কলিকাতায় শিক্ষিত সমাজে দুইটি আন্দোলন প্রবলভাবে চলিতেছিল—ধর্ম-সংস্কার ও রাজনীতিক। প্রথম আন্দোলন আবার দুই ভাগে বিভক্ত

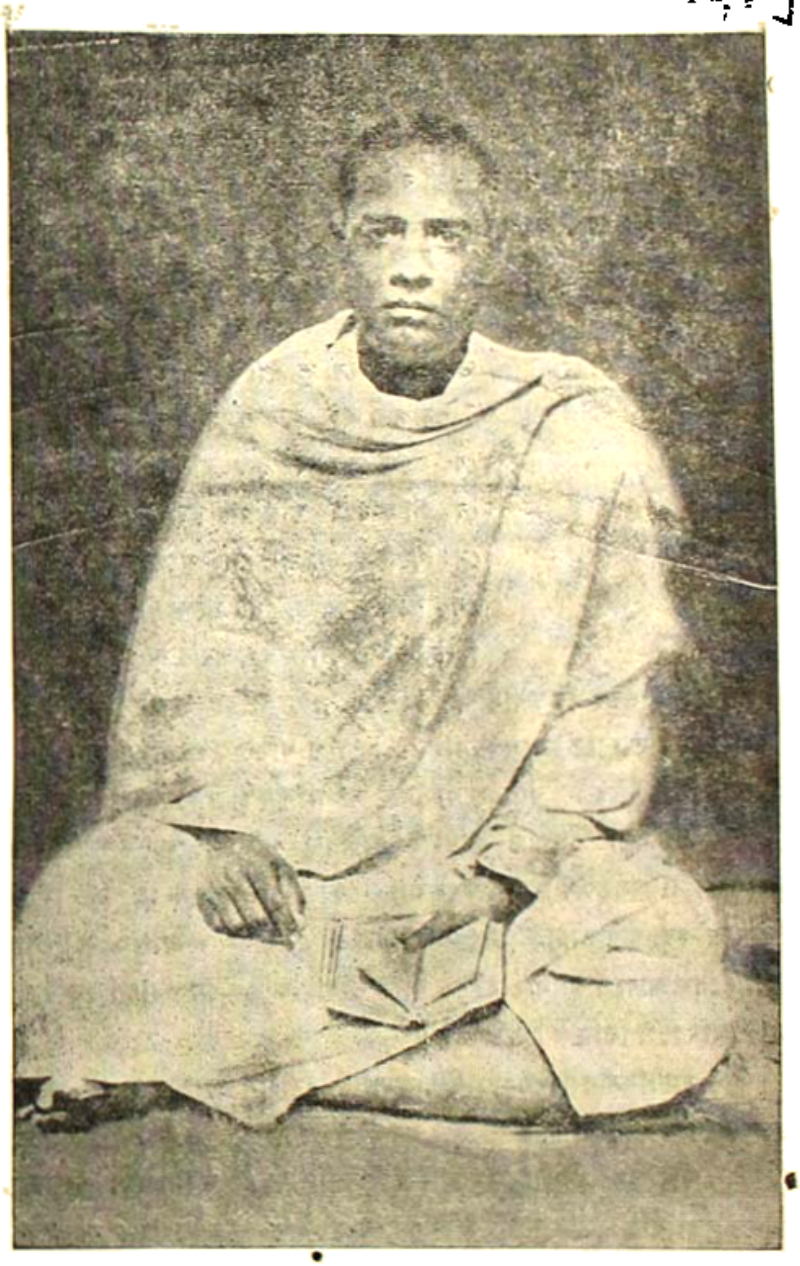

আবির্ভাব :
১১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ।
তিরোভাব :
২৭ অক্টোবর, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।

—ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান চেষ্টা। ব্রাহ্ম-প্রচারকদিগের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন সর্বাধিক সমাদৃত আর—যেন তাহারই প্রতিক্রিয়ায় একদিকে শশধর তর্কচূড়ামণি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি এক পন্থায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি অন্য পন্থায় হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা করিতে রত।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

আমেরিকান সাহিত্যের লিজেন্ড : মার্ক টোয়েন।

নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখে মার্ক টোয়েনের জন্মদিন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ তাঁর জন্ম-বছর। মিসৌরী রাজ্যের ফ্লোরিডা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইংল্যাণ্ডের কাছে যেমন সেক্সপীয়ার, জার্মানীর কাছে যেমন গ্যাটে, ভারতবর্ষের কাছে যেমন রবীন্দ্রনাথ, ইতালীর কাছে যেমন দান্তে, তেমনি ছিলেন আমেরিকার কাছে মার্ক টোয়েন। ৩০ নভেম্বর তাই মার্কিনদেশে আমাদের ২৫শে বৈশাখের মত।

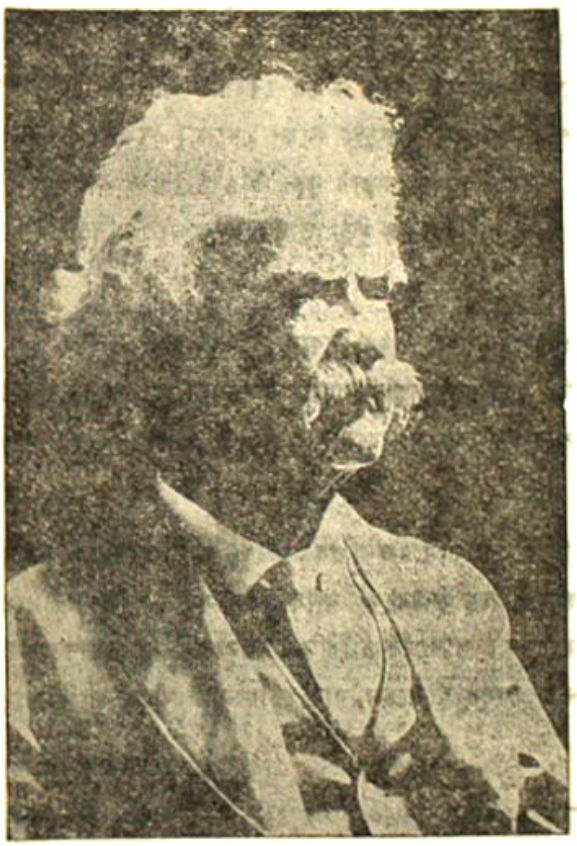

মার্কটোয়েন।

'মার্ক টোয়েনে'র অন্তরালে আসল নামটি চাপা পড়ে গেছে। স্যামুয়েল ল্যাংহর্ণ ক্লিমেন্স। পৃথিবীর ক'জন লোক সে নাম জানেন। জানেন মার্ক টোয়েনকেই।

তিনি বারো বছর বয়সে পিতাকে হারান। তারপরই শুরু হ'ল কঠোর বাস্তবজীবনের। ছাপাখানায় শিক্ষানবিশী নিলেন। পশ্চিমী বিশেষতঃ আমেরিকার অন্যান্য সাহিত্যিকদের মত তাঁকেও সাহিত্যে খ্যাতি অর্জনের পূর্বে বহুবিধ কাজ করতে হয়। মিসিসিপি নদীতে স্টীমবোটে পাইলটগিরি করেছিলেন, সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছিলেন, আবার খনিতে কাজ নিলেন এবং সর্বশেষে খবরের কাগজের অফিসে কাজ নিলেন। যে-মন অশান্ত হয়ে কেবলি স্থান থেকে স্থানান্তরে, এক চাকুরী থেকে অন্য চাকুরীতে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিল, খবরের কাগজের অফিসে আসল স্থান খুঁজে পেল। সাংবাদিক যখন হতে গেলেন, তখন তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েই ছিল।

তারপর ৩০ বছর বয়সে লিখতে শুরু করলেন। 'হিউমার' ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। তাই নিয়ে লেখা আরম্ভ করলেন। এ নিয়ে লেখা তাঁর জীবনের প্রথম বই "The Celebrated Jumping Frog of

দেশ-বিদেশ

ইউরি গাগারিন ॥

পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী মেজর ইউরি গাগারিন ও তাঁর পত্নী শ্রীমতি ভেলেন্টিনা গাগারিন ৫ই ডিসেম্বর কলকাতায় আসেন।

শ্রীগাগারিন

ইউরি গাগারিন ১৯৩৪ সালের ৯ই মার্চ মস্কোর পশ্চিমে অবস্থিত ছোট গঞ্জাৎস্ক শহরে আলেক্সি গাগারিনের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে ইউরি স্কুলে ভর্তি হন। তার কিছুদিন পরেই ফ্যাসিস্ট বাহিনীর আক্রমণের মুখে তাঁর শহরটি পড়ল। নিকটস্থ শহরে গাগারিন পরিবার সরে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন নষ্ট বাড়ির প্রতিটি কাঠ। তাদের গায়ে ছিল কারখানের পোশাক চিহ্ন। ইউরির পিতা ছিলেন দক্ষ সূত্রধর। নূতন শহরে এসে যখন আবার নূতন ঘর তৈরি হল, তাতে ইউরি-ও সূত্রধরের কাজ করেন। আবার তিনি স্কুলে ভর্তি হলেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর অধ্যবসায় ও বুদ্ধি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৯৪৯ সালে ইউরি লুবেৎসিতে বৃত্তি-বিদ্যালয় কাস্টিঙ্গ মোল্ডারের কাজে বিশেষজ্ঞ হবার জন্যে আসেন। ইউরির দলের ছাত্রেরা ধৈর্য, কঠোর শ্রম, অধ্যবসায়, নির্ভুলতার জন্যে ইউরিকেই মনিটর নির্বাচন করল। নিজের শিক্ষাবিভাগে শ্রেষ্ঠ ছাত্র বিবেচিত হওয়ার অধিকার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে গেলেন পূর্বদিকে সারাতোভ শহরে। নিজের মোল্ডিং-এর শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য বিষয়েও তিনি উৎসাহবোধ করতেন এবং সাহিত্যবৈঠকে ভাষণ দিয়েছেন কয়েকবার। তারপর একদিন তিনি সারাতোভ বিমান স্কুলে ভর্তি হলেন। সেখানে অভিজ্ঞ বৈমানিক দ্মিত্রি মাত্রিয়ানোফের নিকট শিক্ষালাভ করেন। প্রথম থেকেই উচ্চয়ন প্রতিভার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন। নিয়মানুযায়ী ১৫ ঘণ্টা হতে ১৭ ঘণ্টা উড়তে হয়। ইউরি সেখানে শিক্ষাদাতার সঙ্গে ১০ ঘণ্টা উড়ার পর নিজেই একা একা উড়তেন। ধীরে ধীরে উৎসাহ এবং দক্ষতা দেখাতে দেখাতে এক সময় ইউরি মোল্ডার হবার বদলে মনে প্রাণে বৈমানিক হয়ে পড়লেন। আরো দক্ষ এবং পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন বৈমানিক হবার জন্যে তিনি ওরেনবুর্গ বিমান বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। এখানেই মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রী ভেলেন্টিনার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। বর্তমানে তাঁদের দুটি কন্যা।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর রাশিয়া প্রথম স্পুটনিক ক্ষেপণ করলো। তখনও গাগারিনরা আশা করতে থাকলেন শীঘ্রই মানুষ মহাকাশে যাবে। সত্যিই মানুষ গেল। এবং সে প্রথম মানুষ হলেন ইউরি

ভোস্তকের কক্ষ পথে ভ্রমণ

গাগারিন। ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল বিশ্বের প্রথম উপগ্রহ মহাকাশযান 'ভোস্তক' কক্ষপথে গেল। আর ইউরি গাগারিন সে উপগ্রহের যাত্রী।

ডাঃ পল সাইপল ঃ

ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে মার্কিন বৈজ্ঞানিক দক্ষিণ মেরু অভিযানকারী খ্যাতিমান ডাঃ সাইপল কলকাতায় আসেন। তিনি ভারতে আসেন নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে। বোম্বে, পুনা, আমেদাবাদ ও দিল্লী পরিদর্শন করে কলকাতায় আসেন।

১৯০৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি দুঃসাহসিক ভ্রমণে উৎসাহ বোধ করতেন। ১৯২৮ সালে যখন এডমিরাল রিচার্ড ই. বার্ড দক্ষিণমেরুর অভিযানে বের হ'লেন, তখন উনিশ বছরের যুবক ডাঃ সাইপল তাঁর অন্যতম সঙ্গী হন। আমেরিকান বয় স্কাউটসের প্রতিনিধিরূপে তিনি সে অভিযানে অংশ নেন। বার্ডের সঙ্গে দক্ষিণমেরুতে তিনি নৌকোযোগে এবং পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। যেতে তাঁর সেবার ১০০ দিন লেগেছিল। ফিরে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন বিমানে চড়ে মাত্র ৪০ ঘণ্টায়। এবার তিনি গিয়েছিলেন মানুষ, পোষাক পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি প্রভৃতির ওপর জলবায়ু ও ভৌগলিক অবস্থানের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণার জন্যে। হিমাঙ্কের নিচে ৭০ ডিগ্রির চেয়েও বেশী ঠাণ্ডায় তিনি কয়েকমাস সেখানে বাস

করেন। সে অবস্থায় নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ হয় হুস হুস করে বাষ্প বার হবার শব্দের মত। ডাঃ সাইপল বলেন, সেখানে ভূ-বিজ্ঞান মানচিত্র তৈরি বরফের মধ্যে ভূ-কম্পনের শব্দ ধরা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য কয়েকজন গবেষক ছাড়া আর অন্য কোন মানুষ নেই। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জল ও বায়ু থাকা সত্ত্বেও উচ্চ মণ্ডলের তুলনায় এখানে দ্রুত গাছপালা জন্মে ও প্রাণীর বংশ বৃদ্ধি পায়। মেরু অঞ্চলে বৃহত্তম সামুদ্রিক প্রাণী নীল তিমির বংশ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই তিমি দৈর্ঘ্যে প্রায় একশত ফুট এবং ওজন কখনো কখনো একশত

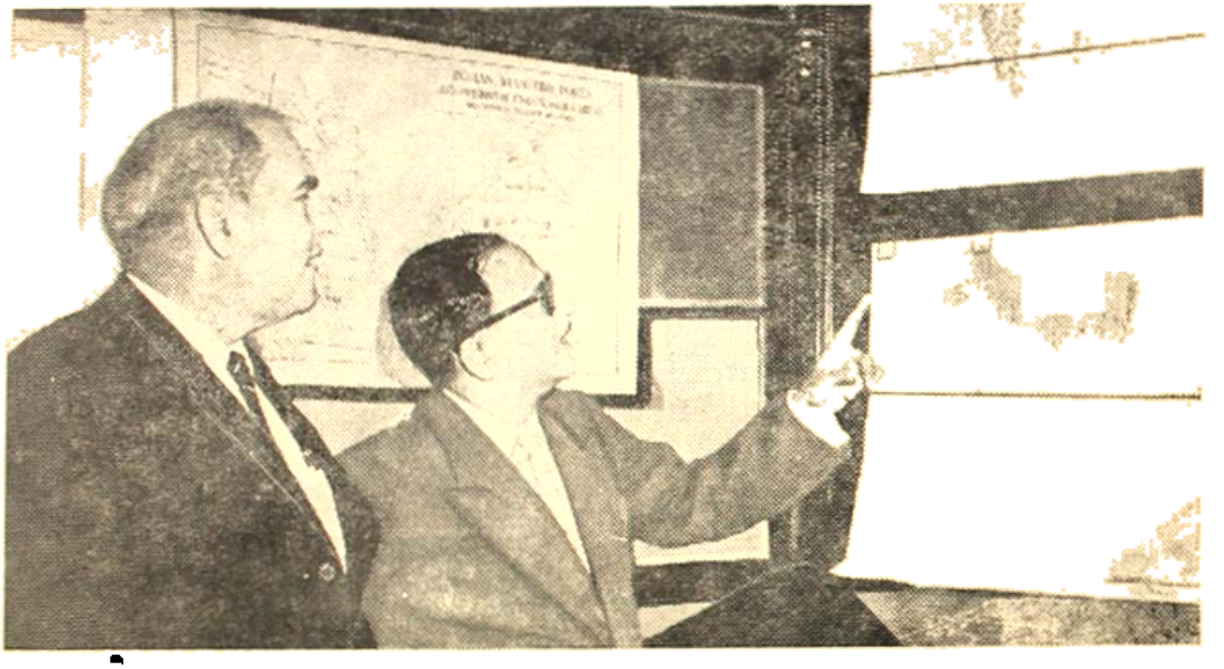

বিখ্যাত দক্ষিণমেরু অভিযাত্রী ডাঃ পল সাইপল (বামে) কলকাতায় আঞ্চলিক আবহবিদ্যা বিষয়ক কেন্দ্রে একটি চার্ট দেখছেন। দেখাচ্ছেন কেন্দ্রের ডিরেক্টর ডাঃ এস. এন. সেন।

টনের উপরেও হয়ে থাকে। সেখানে এক ধরনের প্রাগৈতিহাসিক পাখি ছাড়াও ১৮ রকমের পেঙ্গুইন পাখী দেখা যায়। প্রথম যখন তিনি মেরু অঞ্চলে যান, তখন অল্প কিছু জায়গা তাঁর জানগোচর হয়েছিল। এখন এই উপমহাদেশের সমস্ত কিছুরও সংগে তিনি পরিচিত হয়েছেন। তাঁর মতে, পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশে যে পরিমাণ পানীয় জল আছে, তার চেয়েও পরিমাণ পানীয় জল এখানে বরফের আকারে রয়েছে।

এশিয়ার ইতিহাস সম্মেলন।

৯ই ডিসেম্বর দিল্লীতে ৪দিন ব্যাপী এশিয়ার প্রথম ইতিহাস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এর উদ্যোক্তা হলেন কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস্। সহযোগিতা করেছেন ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার ও ভারতীয় ইতিহাস সম্মেলন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশ থেকে প্রায় শতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। কম্যুনিস্ট চীন এ সম্মেলনে যোগ দেয় নি। এই ধরনের সম্মেলন এই প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

॥ বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র ॥

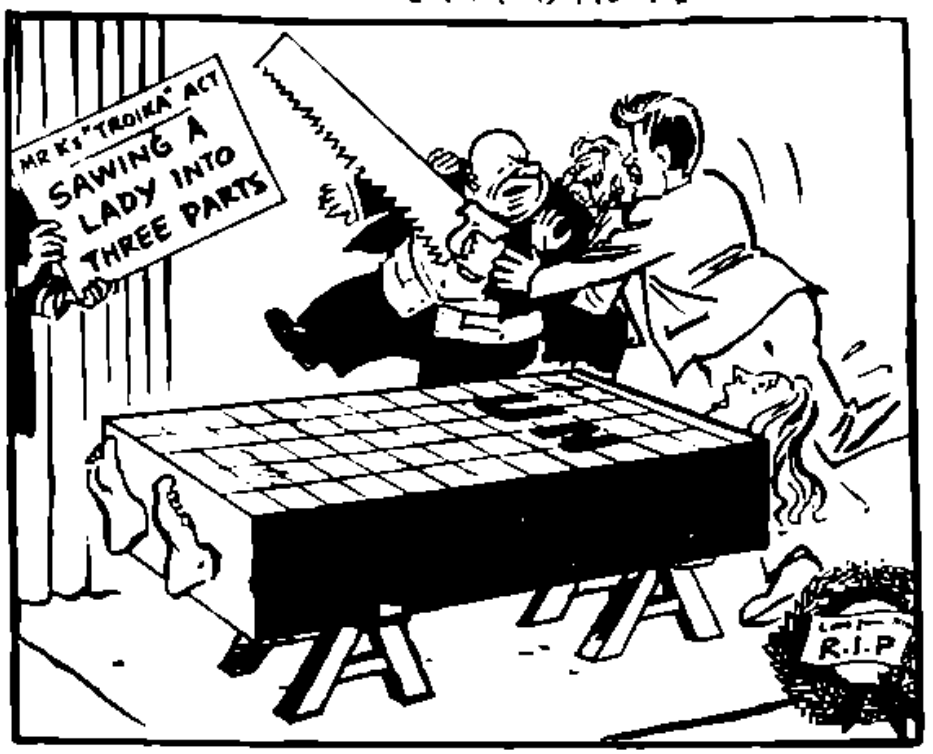

"Sorry, Mr K—you can't fool us with this trick"

Talking of wild life, I notice some of the older species are re-appearing

বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিককালে যে সংকট দেখা দিয়েছে তার পটভূমিকায় ও পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কিত দুটি চিত্র।

—জেনি মিয়ারের সৌজন্যে

॥ বিশ্ব-ব্যঙ্গচিত্র ॥

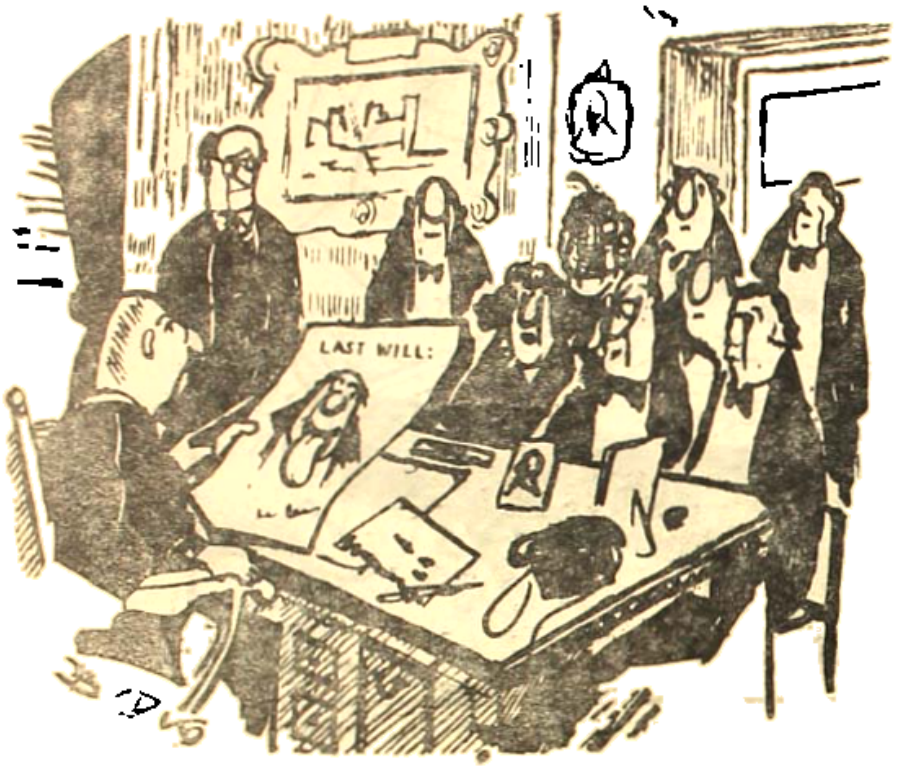

(মৃতব্যক্তির পরিবারবর্গের প্রতি)

.....উইলে যা দেখতে পাচ্ছি তাতে আপনাদের ভাগ্যে আশা করার মত কিছুই নেই।

"বি. বি. সি. থেকে বলছি—আজকের সন্ধ্যায় আমাদের আলোচ্য বিষয় : কিভাবে স্বামীরা তাঁদের অবসর সময় কাটান।"

টেস্ট ম্যাচের দুই অধিনায়ক :
এম. সি. সি'র ডেক্সটার ও ভারতের নরী কন্ট্রাক্টার

খেলাধূলা

॥ তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ প্রসঙ্গে ॥

ক্রীড়ামোদী

— চীন —

বিখ্যাত শিল্পী সুইলিয়েন সুই

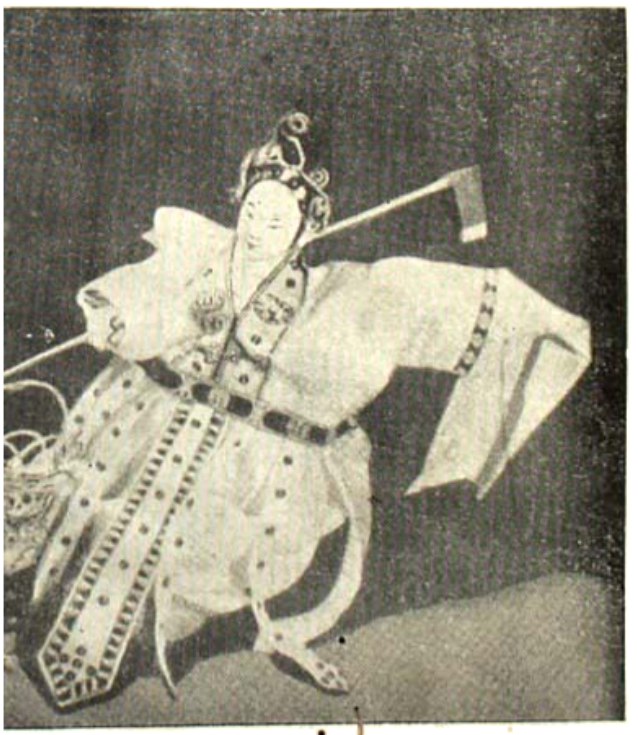

পুতুল-পরী নাচতে নাচতে ফুল ছড়াচ্ছে।

চাইনিজ-আর্ট পাপেট্ থিয়েটারে অভিনীত নাটকের

— ইসরায়েল

— দক্ষিণ আফ্রিকা —

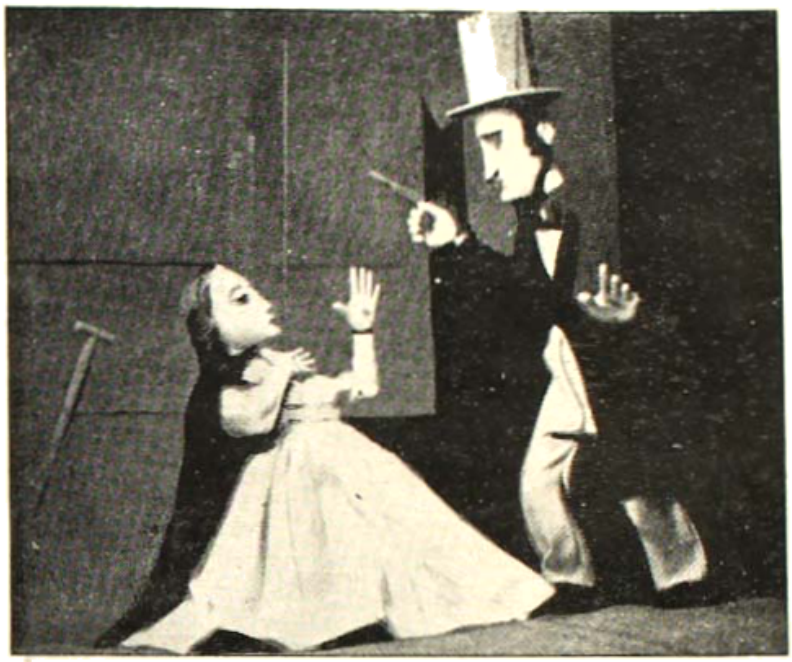

প্রাচীন নাটক 'মার্ডার ইন্ দি রেড বার্ন'-এ হত্যার দৃশ্য।

সুরকার স্যাবাট-এর 'মোমেন্ট মিউজিক্যাল'-এ পুতুল-অভিনেতা গান গাইছে।

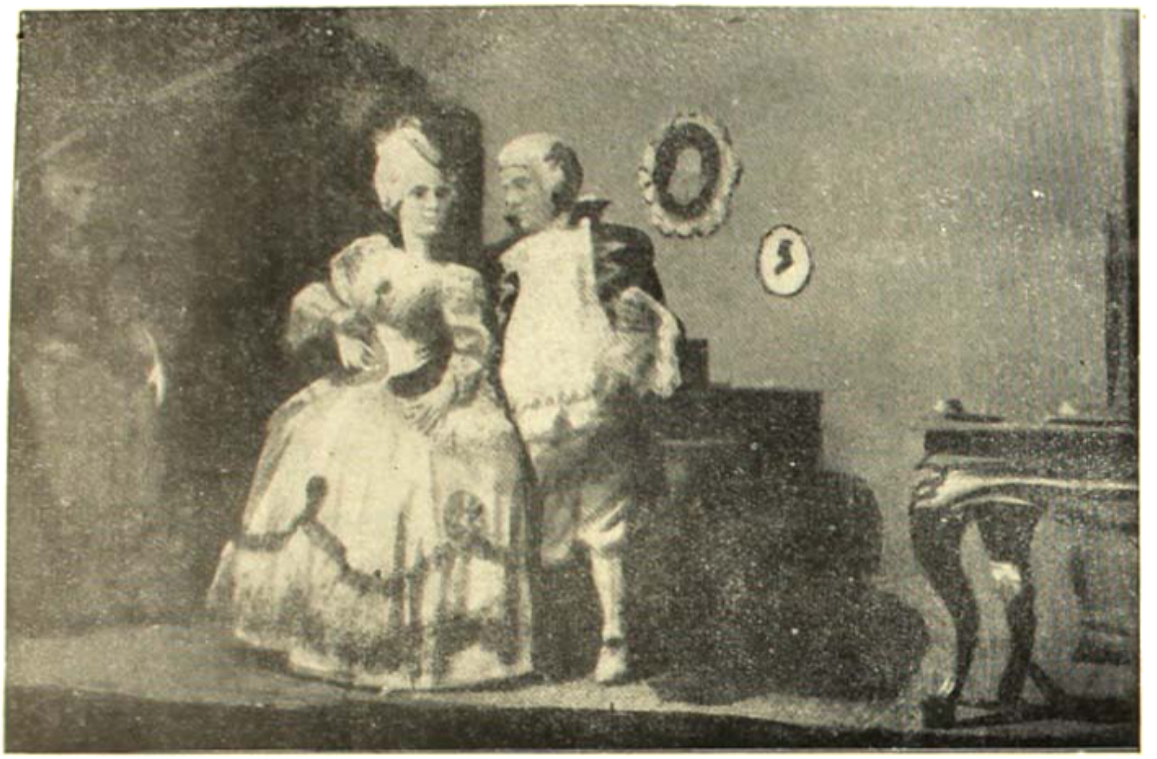

'দি মোৎসার্ট ফ্যামিলি এ্যাট হোম' নাটকের একটি দৃশ্য।

— সুইজারল্যাণ্ড —

'দি কিউরিয়াস ওল্ড মেড' নাটকের একজন অভিনেত্রী।

এই ছবির মাধ্যমে শিল্পী দারিদ্র্য লোভ

পুতুলনাচকে
কেন্দ্র করেই
গড়ে ওঠে
ছেলেমেয়েদের
স্বপ্নরাজ্য

তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য্য

লিলি বার্লি

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৪

GALPA-BHARATI, Bengali Monthly, Regd. No. C3643. Price

পুতুলখেলাই

ছেলেমেয়েদের আনন্দোৎসব !

তাদের সুস্থ, সবল ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে

লক্ষ্মী ঘি

অদ্বিতীয়।

॥ লক্ষ্মীদাস প্রেমজী, কলিকাতা-১২ ॥